



মাহবুব আলম

যুদ্ধাপরাধীদের
বিচার চাই।
আমারবই.কম

গোলা থেকে সমুখ পুরুষ



‘গেরিলা থেকে সম্মুখ যুদ্ধে’ প্রস্তুতির প্রথম খণ্ডের প্রকাশ
চন্দক দিয়েছিলো পাঠককে। খুব বেশি পাঠক আনুকূল্য
যে লাভ করেছিলো এই গ্রন্থ তা নয়, কিন্তু যারাই
পড়েছেন মাহবুব আলমের বই স্মরণীয় অভিজ্ঞতার

যুদ্ধাপরাধীমুক্তি হয়েছেন তারা এবং আর দশজনকে অনুপ্রাণিত
বিচার চার্চকরেছেন এর পাঠে। ফলে পত্র-পত্রিকার মনোযোগ

আমারবাই.কম কিংবা জনপ্রিয় মাধ্যমের সওয়ার হয়ে এই প্রস্তুতির প্রচার

ব্যাপকতা লাভ করে নি, এক পাঠকের কাছ থেকে

জেনেছেন আরেক পাঠক আর এমনিভাবে বৎসরান্তে

ফুরিয়েছে এর প্রথম সংস্করণ। বিস্তৃত পটপরিসরে

মুক্তিযুদ্ধকে এমন সজীব আর বাস্তবিক করে তুলতে আর

কে পেরেছেন তার মতো! দিনাজপুরের প্রত্যন্ত

অঞ্চলের এক গেরিলা কমান্ডারের প্রতিদিনের যুদ্ধকথার

ভেতর দিয়ে সহস্র কষ্টে কথা বলে উঠেছে মুক্তিসংগ্রামী

বাংলাদেশ, যেনো একান্তরে নয়, এই এখন, এই মুহূর্তে

সেই মহান যুদ্ধ সংঘটিত হচ্ছে চোখের সামনে। আর

সেই যুদ্ধের অনিবার্য অংশীদার সাধারণ মানুষের বীরত্ব,

সাহস ও তাদের নির্বিশঙ্খ আত্মান, ছোটো আর বড়ো

অযুত ঘটনার ভেতর দিয়ে জীবন্ত হয়ে উঠেছে এই

প্রস্তুতির অধ্যায়। ‘গেরিলা থেকে সম্মুখ যুদ্ধে’র

দ্বিতীয় খণ্ড এখন তুলে দেওয়া হলো পাঠকদের হাতে।

প্রায় মহাকাব্যপ্রতিম এই গ্রন্থধূত মুক্তিসংগ্রামের বিস্তৃত

পটভূমি বাংলার বিশাল প্রান্তরের মতোই বিপুল।

মুক্তিযুদ্ধের ব্যাপক পরিসরকে ধারণ করেছে এমন প্রস্তুতির

অপেক্ষায় অধীর ছিলাম আমরা সবাই। আমাদের সেই

আকাঙ্ক্ষা পূরণে পরমাশৰ্চর্য কাজটি সম্পাদন করলেন

মাহবুব আলম, মুক্তিযুদ্ধের অবিস্মরণীয় গ্রন্থকপ মেলে

ধরলেন দেশবাসীর সামনে।

ISBN 984-465-027-9



গরিলা থেকে সম্মুখ যুদ্ধে

[দ্বিতীয় খণ্ড]

মাহবুব আলম

যুদ্ধাপরাধীদের
বিচার চাই।
আমারবই.কম

সাহিত্য প্রকাশ



প্রচন্ড পরিকল্পনা : অশোক কর্মকার

কেচ ম্যাপ : কিলীটি বিশ্বাস

তৃতীয় সংস্করণ : নভেম্বর ২০০৮, কার্তিক ১৪১৫

দ্বিতীয় সংস্করণ : মেক্সিয়ারি ১৯৯৭, কার্তুন ১৪০৩

প্রথম প্রকাশ : মেক্সিয়ারি ১৯৯৩, কার্তুন ১৩৯৯

ISBN 984-465-027-9

যুদ্ধাপরাধীদের বিচার চাই। আমারবই.কম

মূল্য : চারশত পঞ্চাশ টাকা

প্রকাশক : মহিমুল হক, সাহিত্য প্রকাশ, ৮৭ পুরামা পাস্টন লাইন, ঢাকা ১০০০

হস্তক্ষেপ বিল্ডার : কলিগ্রাফি প্রকাশ, ৮৭ পুরামা পাস্টন লাইন, ঢাকা ১০০০

মুদ্রক : কমলা প্রিকার্চ, ৮৭ পুরামা পাস্টন লাইন, ঢাকা ১০০০

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~



যুদ্ধাপরাধীদের
বিচার চাই।
আমারবই.কম

উৎসর্গ

বড় ভাই বদরগল আলম ও
ছোট ভাই শামসুল আলম

যারা মোচন করেছেন
আমার পিতৃদেহের অভাব



ৰ থা

অজন্তের বাংলাদেশে স্বাধীনতার দু'দশক পরে আমার দার্মণভাবে ইচ্ছে করে ফিরে যান্দাগোত্তে বৈষ্ণবিদিতভাবে। ফিরে যেতে সেখানে, যেখানে ছিল যুদ্ধের সাথে আমাদের
প্রতিদিনের বন্ধুসম। যেখানে ছিল নৃশংসতা, নিষ্ঠুরতা, বিভীষিকা আর বীভৎসতা। ছিল
বিচৰ্চিত গুণ, গ্রাস ভয় আর অজানা অঙ্ককারাঙ্কন ভবিষ্যৎ। ছিল হত্যা, মৃত্যু আর রক্তের
আমুরবই কম। সীমাহীন ছিল ঝুঁকি। ছিল শ্রান্তিতে, অবসাদে ভরা দিন আর রাত। বড় মন
খারাপ করা সময় ছিল সেই দিনগুলো। কিন্তু এর পাশাপাশি জীবনও তো ছিল
প্রবহমান। ছিল উদ্বাম যৌবন। ছন্দোময় জীবন ছিল, ছিল উচ্ছ্঵স, হাসিগান আর সবুজ
প্রাণের মাতামাতি। সুখ-দুঃখ, হাসিকান্নার পাশাপাশি জীবন ছিল ভালো লাগা আর
ভালোবাসায় মুখরিত।

১৯৭১-এর সেই যুদ্ধের দিনগুলোতে আমার ফিরে যেতে ইচ্ছে করে তাঁদের সকলকে
নিয়ে, যাঁরা বেঁচে আছে সেইসব সাথী যোদ্ধাদের নিয়ে। ইচ্ছে করে ফিরে যেতে সেই
পরমাত্মায় মানুষজনের মাঝে যাঁরা দুঃসময়ের দিনগুলোতে দিয়েছিল আশ্রয়, যুগিয়েছিল
আহার, চিনিয়েছিল পথঘাট, অকৃতোভয়ে যাঁরা অংশগ্রহণ করেছিল একের পর এক
লড়াইয়ে। ভেতরগড়ের মহারাজ দিঘিরপাড়ে বিজয় দিবসে সকলকে নিয়ে একটা
পুনর্মিলনী, সকলকে নিয়ে একসাথে বসা, একটা গোটা দিন কাটিয়ে দেয়া, সকলকে
নিয়ে আবার সেই অতীত দিনগুলোতে ফিরে যাওয়া...।

যুদ্ধকালের দিনপঞ্জি লিখতে হতো ফিল্ড নেটৰুকে। কমান্ডিং অফিসারের কাছে
যুদ্ধের বিবরণীসহ প্রতিটি অস্ত্র, গোলাবারুদ্ধ আর রেশনের হিসেব দিতে হতো। যুদ্ধের
পর সবকিছু যেন কেমন এলোমেলো হয়ে গেল। যুদ্ধের শৃতিগুলো সব কেমন হারিয়ে
গেল। আমার ক্রটের কোথাও এখন আর যুদ্ধের কোনো চিহ্ন নেই। বর্বর পাকবাহিনীর
অত্যাচার নিপীড়ন আর তাদের নিষ্ঠুর ধর্মসলীলার কোনো ছাপ নেই। নেই তাদের
বাংকার, ট্রেডিং, নিপীড়ন কেন্দ্রের অস্তিত্ব। যুদ্ধের দরকন ক্ষতবিক্ষিত হয়ে যাওয়া মাঠঘাট,
প্রাস্তর, ক্ষতিগ্রস্ত পথঘাট, সেতু এসবের এখন আর কিছুই নেই। একই ছবি অন্যান্য
ক্রটের, সারাদেশের। এতো বড় একটা যুদ্ধ, কত ব্যাপক এর ধর্মসলীলা, সারাদেশ
জুড়ে শত-সহস্র এর ক্ষত চিহ্ন, কিছুই রইলো না।

যুদ্ধদিনের প্রায় প্রতিটি ঘটনার কথা রিপোর্টিং আকারে সংক্ষেপে লেখা ছিল আমার

ফিল্ড নোটবুক তিনটিতে। যুদ্ধের পর নানা বাড়ুঝগ্নার মধ্যেও আমি পরম যত্নে রক্ষা করেছি সেগুলো। বলা যায়, পুরো যুদ্ধটাই জীবন্ত হয়ে ধরা আছে নোটবই তিনটিতে।

এর ওপর ভিত্তি করেই একদিন লিখতে শুরু করেছিলাম। শেষ করতে লেগেছে দু'দশক। মুক্তিযুদ্ধ এমনভাবে গেথে আছে যন্তের গভীরে যে, চেখ বুজলেই ভেসে ওঠে সেই পথঘাট, নদীনালা, খালবিল, ঝোপজঙ্গল, বাড়িয়ার, লোকালয়, বসতি, গ্রাম। সেইসব পরমাঞ্চীয় মানুষজন, সহযোদ্ধা বন্ধুরা। নোট বইয়ের পাতা খুলে শুধু দিনক্ষণ মিলিয়ে নেয়া। আর সত্য ঘটনাগুলো সব গল্প বলার মতো করে বলে যাওয়া। অধিকাংশ চরিটাই বর্তমানে জীবিত। জীবিত মানুষদের নিয়ে লেখা আসলেও কষ্টকর।

তাগিদ ছিল অনেকেই। আমার নিজের ছিল কমিটমেন্ট। তাদের সকলের কথা লিখবার। আমার সহযোদ্ধাদের এবং সেইসব অগণিত মানুষের কথা যাদের সহযোগিতা আর অংশগ্রহণ ছাড়া কোনো যুদ্ধজয়ই সম্ভব ছিল না। আর তাঁরা না থাকলে চূড়ান্ত বিজয়ও কোনোদিন সম্ভব হতো না। কারোর জন্মই কিছু করা যায় নি। তাঁদের কোনো স্বীকৃতি নেই ইতিহাসের পাতায়। বর্তমান ও আগামী প্রজন্মকে জানাতে হবে তাঁদের প্রত্যেকের কথা। এই কমিটমেন্ট ও তাগিদ থেকেই একদিন 'গেরিলা থেকে সম্মুখ যুক্ত' লেখা হয়ে যায়।

মুক্তিযুদ্ধের প্রতি আর এক নিবেদিত মানুষ মহিমামূল্য হচ্ছে। পাতুলিপি একনজর দেখেই তিনি সিদ্ধান্ত নেন ছাপাবার। এতে তাঁর ব্যবস্থাপনিক বুকি ছিল প্রচুর। তাঁর সাহসী সিদ্ধান্ত এবং বন্ধুর আখতার হস্তের অস্ত্রণ্ত পরিশৃঙ্খল ও সহায়তার কারণে ১৯৯২-এর ফেব্রুয়ারিতেই বইটির প্রথম খণ্ড ছাপার কাজের বেরিয়ে আসে।

পিন্টুর পকেটে এখন শুধু ম্যাচ থাকে না, সিগারেটও থাকে। একটা বিদেশী ওষুধ কোম্পানির এরিয়া ম্যানেজার স্টে এখন। সারা বই জুড়ে পিন্টু রয়েছে অত্যন্ত সাবলীলভাবে যেমন সে ছিল যুক্তের মাঠে। ছাপার অক্ষরে তার নিজের চরিত্রকে এভাবে উঠে আসতে দেখে আবেগাপূর্ণ পিন্টুর চোখে পানি আসে। আনন্দাশ্রু। মতিয়ার বইটি হাতে পেয়েই বুকে জড়িয়ে ধরে। উন্নতের মতো চুম্বো থায়। তারও চোখে পানি আসে। জহিরুল পাগলের মতো খুঁজে বেড়ায় বইটির প্রাণিস্থল। পিঠে গুলি খাওয়া হাসান খুঁজে পায় তার নাম। ঝর্ণায় আনন্দে ঝলমল করে তার মুখ-চোখ। রাউফের পয়সা নেই বই কেনবার, কিন্তু সে বইটি যেগাড় করেই ছাড়ে। গনি ভাই তার পরিবারের তরফ থেকে ধন্যবাদ দেন তার ভাই শহীদ গড়েসের প্রতি স্বীকৃতি প্রদানের জন্য। বাবলু বাম রাজনীতির পাশাপাশি এখন ব্যবসা করে। সেই একমাত্র সকলের যোগসূত্র। গাঁটের পয়সা খরচ করে সে ঠাকুরগাঁও-পঞ্চগড় যুক্ত এলাকায় গিয়ে মজিব, দুলু, মন্টুদের বই দিয়ে আসে। তার কাছে আসে সকলে। ছাপার অক্ষরে ছেলেরা দেখে তাদের নাম। কী আনন্দ! বইটি হাতে নিয়েই সেদিনের সহযোদ্ধারা বলে ওঠে, 'বাহে যুই বইখান ধরি গেনু'। বাবলু অঞ্চান বদনে বলে, যা। পয়সা দিতে পারে না তারা। বাবলু চায়ও না। তার নিজেরই পয়সা নেই। কিন্তু যা আছে তার সবকিছুই সে বিলিয়ে দিতে পারে।

সানজিদা শামস লিখেছে, চাকু বইটা পড়ে মনে হচ্ছে আমি ভেতরগড়-সোনারবান-নালাগঞ্জের সেই রাস্তার বনেজঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্ছি। রানার কথা, মনে হচ্ছে আমার কাঁধে

রাইফেল, আমি যুদ্ধ করতে যাচ্ছি। ফয়সালের কথা, একজন গেরিলা দলের সদস্য হয়ে আমিও বন্দরঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্ছি। অনির অভিযোগি, চোখের সামনে মনে হচ্ছে দেখছি সব, মুক্তিযুদ্ধকে এভাবে আগে দেখি নি। তিসনা লিখেছে, এভাবে মুক্তিযুদ্ধের কথা আর পড়ি নি। মুক্তিযুদ্ধটা যেন পরিষ্কার ভাসছে চোখের ওপর। আনারকলি বলেছে, মনে হচ্ছে আমি এদের একজন, নিবিড়ভাবে মিশে আছি মহারাজদিঘি, নালাগঞ্জ, সোনারবান, সর্দারপাড়ার সেই সুবৃজ-শ্যামলিমা গামীণ জীবনে...। ইয়েনের কথা, সম্মুখ যুদ্ধে আমিও তাদের সাথে উয়ে আছি, রাইফেলের ট্রিগার চাপছি একটা পর একটা। নিপার গা শিউরে উঠে তাবতে, কী দাক্ষণ ব্যাপার। তার মনে হয় কাঁধে রাইফেল ঝুলিয়ে সাঁ সাঁ মুক্তিযোদ্ধারা হেঁটে যাচ্ছে গ্রামের পথ ধরে যুদ্ধের দিকে। আবদুল হাই-এর বয়স ছিল না, কিন্তু তার প্রবল আকাঙ্ক্ষা ছিল মুক্তিযুদ্ধে যোগদানের। এক নিষ্পাসে বইটি শেষ করে তার যুদ্ধে না যাবার দুঃখবোধ আরো বেড়ে গেছে।

এরা সকলে এ প্রজন্মের সত্ত্বান। মুক্তিযুদ্ধ দেখে নি। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধকে জানবার তাড়না তাদের কতো প্রবল। এইসব নবীন প্রজন্মের কথা শুনে মনে হয়, এদের সকলকে মুক্তিযুদ্ধের কথা জানাবার জন্যই তো আমার এই প্রয়াস। এটাই তো ছিল আমার কঢ়িটেমেন্ট। বইটির পাণ্ডুলিপি পড়ার পর সাংবাদিক-সম্পর্কিতিক বস্তু আবত্তার হস্তের উচ্ছ্বসিত মন্তব্য ছিল এরকম... একটা সীমিত জায়গায় মুক্তিযুদ্ধে জড়িত হয়ে আছে কতো ঘটনা, কতো চরিত্র, কতো মানুষ। একটা ফ্রন্টেরই যদি এই অবস্থা হয়, সারাদেশেই তখন চলছিল মুক্তিযুদ্ধ, কি দক্ষতায় ব্যাপার ছিল... সারাদেশটাই যেন উঠে এসেছে একটা ইউনিটের মুক্তিযুদ্ধ পরিচয়বিদ্য...।

আসলে আবত্তার হস্তেই তো চিন্ত। মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ তো ছিল সারাদেশের, গোটা জাতির। সেই সময়, সেই অভ্যাচার, নৃশংসতা, বীভৎসতা, বর্বরতা, লুঁচন আর লাম্পটের কাহিনী, হত্যা আর মৃত্যুর কাহিনী, অধিকৃত দেশের মানুষের সেই দুর্দশা আর দৃঢ়সময়ের কাহিনী, এর পাশাপাশি মানুষের অসীম সাহসিকতা, ত্যাগ আর সংগ্রামের অমর কাহিনী, এগুলোর মধ্য দিয়েই তো জনালাভ করেছে আমাদের এই স্বাধীন দেশ। এর জন্মের প্রকৃত ইতিহাস নতুন ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে জানানো দরকার। মুক্তিযুদ্ধের বার্তা তাদের সকলের কাছে পৌছানো দরকার। তারা এটা জানতে চায়। জানতে চায় গভীর আগ্রহের সাথে। গভীর বিশ্বাসের সাথে।

‘গেরিলা’ থেকে সম্মুখ যুদ্ধের প্রথম খণ্ডে যুদ্ধযাত্রা এবং গেরিলা যুদ্ধের কথা বলা হয়েছে। যুদ্ধযাত্রা এবং হাইড আউট প্রথম পর্বে। আগস্ট ‘৭১ পর্যন্ত মুক্তিযুদ্ধ সংগঠন এবং গেরিলা যুদ্ধের গতিপ্রকৃতির বর্ণনা দেয়া হয়েছে তাতে। দ্বিতীয় খণ্ডে রয়েছে হাইড আউট-২, হাইড আউট-৩ এবং সম্মুখ যুদ্ধ পর্ব। গেরিলা যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে সম্মুখ যুদ্ধের ডাক আসে এবং নিয়মিত বাহিনীর সাথে মার্চ করে আমাদের যেতে হয় সামনে। প্রচণ্ডতর সম্মুখ যুদ্ধে হতে হয় অবর্তীণ। একটির পর একটি শহর-বন্দর-জনপদ দখলে আসে। এলাকার পর এলাকা হতে থাকে শক্রমুক্ত। মানুষের বিজয় উল্লাস, মুক্তিপ্রাপ্ত জনতার উজ্জ্বল-আনন্দ আর উন্নততা। এভাবে একদিন এসে যায় বিজয়ের পরম লপ্ত। ১৬ ডিসেম্বর ‘৭১-এ ভেসে আসে সেই চূড়ান্ত বিজয় বার্তা।

শুন্দেয় শওকত ওসমান, জিয়া হায়দার, রশীদ হায়দার, বেলাল চৌধুরী, মাহমুদুল হক, সুফি মোতাহার হোসেন-সহ অন্যদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। তাঁরা সকলে বইটি লেখার জন্য আমাকে প্রেরণা যুগিয়েছেন। ইউএসআইএস-এর শামসুল আলম, ব্যাক্সার শরিফুল আলম আমাকে প্রচুর প্রেরণা ও উৎসাহ যুগিয়েছেন। আমি কৃতজ্ঞ তাঁদের প্রতি। আমি কৃতজ্ঞ মফিদুল হকের প্রতি। তাঁর উৎসাহ আর তাগিদ না হলে হয়তো দ্বিতীয় খণ্ড লেখা এতো সহজে হয়ে উঠতো না। কৃতজ্ঞ আবত্তার হস্তের প্রতি, যিনি আমার পাঞ্জলিপি দেখার কষ্টকর কাজটি অত্যন্ত দৈর্ঘ্য ও সময় নিয়ে করেছেন। আমার সহধর্মী মর্জিনা বেগম রাতের পর রাত জেগে কষ্ট করেছেন, প্রতিটি লেখার পাতা দেখে দিয়েছেন, তাঁর ধৈর্য, সহিষ্ণুতা, সাহস আর প্রেরণা ছাড়া দ্বিতীয় খণ্ড লেখা আমার পক্ষে সম্ভবই হতো না। এজন্য তাঁর প্রতিও আমার গভীর কৃতজ্ঞতা রইলো।

হাইড আউট থেকে সম্মুখ যুদ্ধের এ পর্বে এসেছে মানুষ মানুষ। তাঁদের অনেকের সাথে গড়ে উঠেছিল নিবিড় সম্পর্ক, পরমাণুরের বন্ধনে মকতু মিয়া, জোনাব আলী, মতিন, হাজি সাহেব, সোনা মিয়া, মতি, হজুর, মজিদুব্বার রহমান দুলু, মজিব, সফিক, হালিম মাস্টার, হাসান মাঝি, মন্টু, রফিউ, লুক্মান, আবদুল হক, মুরু মিয়া, বসির মেহুর, জয়নালাসহ আরো অনেক নামের নামের সাথে তালিকার মানুষ। যাঁরা একনিষ্ঠভাবে আমাদের সাথে কাজ করেছেন, যিনিহেন সীমাহীন বিপদের ঝুঁকি। আর সেইসব অসংখ্য নাম-না-জানা বাড়িঘরের মা-বোন-মহিলাগণ, যাঁরা রাতেবিরাতে আশ্রয় দিয়েছেন, আহার যুগিয়েছেন, ত্রয়ম ত্যাগ স্বীকার করেছেন কেউ কেউ। তাঁদের কথা নামাভাবে প্রথম খণ্ডে এসেছে। এ খণ্ডেও রয়েছেন তাঁরা অত্যন্ত জীবন্তভাবে। স্বাধীনতার প্রতি লালিত অদম্য বাসনা তাঁদের ছিল, আজ এতোদিন পর স্বাধীন বাংলাদেশে, স্বাধীনতার স্বাদ তাঁরা সকলে পেয়েছেন কি না জানি না। তবে আমার এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টার দ্বারা তাঁরা যদি দেশবাসীর কাছে পরিচিতি পান, বর্তমান এবং আগামী প্রজন্ম যদি তাঁদের চিনতে পারে এবং সারাদেশে মুক্তিযুদ্ধের সাথে নিঃস্বার্থভাবে জড়িয়ে থাকা অগণিত এ ধরনের মানুষের জন্য সামান্য হলেও যদি কিছু করা যায়, তাহলে আমার শ্রম কিছুটা হলেও সার্থকতা পাবে। সে প্রচেষ্টায় শরিক হওয়ার জন্য সকলের প্রতি আমার বিনীত অনুরোধ রইলো।

জুন, ১৯৯২
ঢাকা

মাহবুব আলম



সূচি পত্র

ভাইড আর্ট (দেই)
হাইড আউটের জীবন

যাদ্বা প্রকল্পীন মৌলিক
কালাজোড় ইন্টার্নেশনাল
বিশ্বাস্ত্ব প্রসম্পর্ণেন!
ভায়েজ ডিন রাজাকার
আপ্রুবিত কৃত্তম
ক্ষেত্র ক্ষেত্র

ক্যান্টেন দয়াল সিং
পাকা সড়ক দখলের লড়াই
ইন্দিরা গান্ধীকা পাস যায়গা
শিফ্ট ক্রম কুমানিয়া
অপারেশন তালমা
উড়ে যাওয়া কালভার্ট এবং টেকা কমাভারের এ্যাকরোবেটিক
কাউন্টার অ্যাটাক-অ্যাম্বুশ
গণবিচার, পিন্টুদের বেঁচে যাওয়া এবং তনখা প্রাপ্তি
শক্তির গাঢ়ি আটক এবং খতম চার পাকসেনা
ও আমার দেশের যাতি
বিষণ্ণ বদল সেই মেয়েটি
আফজালুর রহমান : হাইড আউটের অতিথি
শহীদ মতিয়ার রহমান
খন এসেছে
চূঁ চিটাগাং ভায়া লভন
স্বার চেতনায় বাংলাদেশ
মোসলেম বিয়ার বিয়ে
জগদলহাট আক্রমণ : শালমারা ব্রিজ ধ্বংস
ধূর্করিপাড়ার যুদ্ধ
বিজয় উদ্ঘাস এবং পাকবাহিনীর পাল্টা আক্রমণ
সোনারবান তালমা পাড়ের যুদ্ধ
অন্য কোথাও আবার
ফিরে আসা সেই প্রিয় নালাগঞ্জে
এবের টেলিফোন লাইন এবং পাকা সড়কের বোগাযোগ বিনষ্ট
বুটির ওপর লটকে ধাক্কা সফিজউদ্দিন
অমরখানায় সেন্ট্রি সাইলেন্ট
মুক্তি প্রেম করো
হাবিলদার-সুবেদার খতম
নবাগত এক এক দল এবং বীকৃতির আনন্দ

১
২
৩
৪
৫
৬
৭
৮
৯
১০
১১
১২
১৩
১৪
১৫
১৬
১৭
১৮
১৯
২০
২১
২২
২৩
২৪
২৫
২৬
২৭
২৮
২৯
৩০
৩১
৩২
৩৩
৩৪
৩৫
৩৬
৩৭
৩৮
৩৯
৪০
৪১
৪২
৪৩
৪৪
৪৫
৪৬
৪৭
৪৮
৪৯
৫০
৫১
৫২
৫৩
৫৪
৫৫
৫৬
৫৭
৫৮
৫৯
৬০
৬১
৬২
৬৩
৬৪
৬৫
৬৬
৬৭
৬৮
৬৯
৭০
৭১
৭২
৭৩
৭৪
৭৫
৭৬
৭৭
৭৮
৭৯
৮০
৮১
৮২
৮৩
৮৪
৮৫



১৪ মাত্রাই যুক্তে যাওয়া
ভেটে কেতে হবে, আরো ভেতরে
সড়ক হাইড আউট
সিব ফিল্ডে

জে হাসান মাঝি
মিয়ার চৃত দেখা
ইন্দুমাটী উনিট বেসের এফ.এফ.দল
কোণান কম্বার মালেকের দরবার এবং প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা

যাদ্বা পেন্সুক কৌরক্যান্দিনমঞ্জুর গাইডের ভাগ্যে
খতম রাজাকাৰু কম্বার দুঃখ

বিস্তারিত মুক্তি

কম্বার কুমু ও লিজা
আধুন পড়েছে রাজাকার

পেলিহান আগনের শিকার এবং আবার মারেয়ার যুক্ত
জুহে শতবর্ষের বাড়িবর, সভ্যতা

কেমন করে বাঁচবো আমরা

বৰ্গ হতে বিদায়

ভিন্ন ধরনের এক অভিযান

আমি একজন রাজাকার

অভূতপূর্ব সেই দৃশ্য

লড়াইটা সবার

রেকি মিশন নয়াদিঘি

মধ্যারাতে বিক্ষেপণ - উড়িয়ে দেয়া হলো পাকিস্তানি বাস্কার

শক্তমুক্ত নয়াদিঘি, ওড়ানো হলো স্বাধীন বাংলার পতাকা

শবেবরাতের কাকড়াকা ভোরে আক্রান্ত মালেক

অক জেদ - কভার দল নিয়ে এগিয়ে যাওয়া

নৱক যেন গ্রাস করছে সবকিছু

শহীদ আবদুল মালেক ও আবদুল মজিদ

এবার নিজ ঘোটি আক্রমণ

শবেবরাতের বৰাত

এবার কোথায় যাবো আমরা

দিনভৰ শক্তির অপেক্ষা

ওগো নদী

মানিকগঞ্জ বিশ্বপির নাটক

ছবির মতো হাম - কালিয়াগঞ্জ হাইড আউট

তরুণ আগন্তুক : সাইফুল

হায়াক খালি জয়বাংলাটা করি দেন

মণ্ডলের হাট আক্রমণ - খতম রাজাকার কম্বার হাতেম আলী

গলেয়া আক্রমণ, দখল ও খতম দুই রাজাকার

খালেক জামান ও মধ্য অটোবৰের ফ্রন্ট

আবার নয়াদিঘি অভিযান

সুপ্রিমার দীপি তার সারা মুখাবঘবে

লাইলি - মজিনু

রঙ্গরঞ্জ

কালিয়াগঞ্জের যুক্ত : যুক্তাহত হাসান

নতুন অ্যাসাইনমেন্ট আবার

১৫
১৬
১৭
১৮
১০৩
১০২
১০৪
১০৫
১০৮
১১০
১১২
১১৫
১১৯
১২০
১২৩
১২৬
১২৮
১৩০
১৩৩
১৩৭
১৪০
১৪৩
১৪৮
১৪৭
১৫০
১৫৯
১৬১
১৬৫
১৬৭
১৭০
১৭৩
১৭৫
১৭৭
১৮০
১৮৩
১৮৬
১৮৮
১৮৯
১৯১
১৯২
১৯৪
১৯৭
২০০
২০৩
২০৭
২০৮
২০৯
২১১
২১০



১০৭	ডেট (তিন)	২২৫
১০৮	চার্টার্ড আবার	২২৭
১০৯	ফজেলেন এভরি বিডি	২২৮
১১০	সেন্ট্রাল	২৩১
১১১	বেন স্টেট	২৩৩
১১২	বালকসনা : ধর্মিত বাংলাদেশ	২৩৫
১১৩	অভিযান	২৩৭
১১৪	আট-বেল্ট পার্শ	২৪১
১১৫	একাচ অন্য বৈঠক	২৪৩
১১৬	যুদ্ধা প্রোজেক্ট স্টাইল মোনোলিট বিকেল	২৪৬
১১৭	অমরবানায় জীবনমারী	২৪৭
১১৮	বিচারিকার ইনস্ট্রুচ ক্যাণ্টেন নদা	২৫১
১১৯	জনসেবাকের নিম্নলিখিত	২৫৩
১২০	আমরবানার ধাক্কার	২৫৬
১২১	যুক্ত দর্শনে আগত একদল পৌরিন মহিলা এবং তারপর	২৬০
১২২	বিনয়, বাদল, দীনেশের গঢ়	২৬৪
১২৩	জগন্মহাটে সফল অভিযান ও যুক্তাহত সফিক	২৬৬
১২৪	শর্কর বি-ইনফোর্মেন্ট এবং আবার অভিযান	২৭২
১২৫	শ্যামল কোমল তার মৃৎ	২৭৩
১২৬	কালো ধোয়ার আড়ালে উড়ে যাওয়া ব্রিজ চৈতন্যগাড়ী	২৭৫
১২৭	হিমালয়, মাথায় তার চকচকে মুকুট	২৭৯
১২৮	সফলতা— প্রতিটি কমান্ডারের কাম্য	২৮২
১২৯	আঘাত, মূলশক্ত ধাঁচি অমরবানার ওপর	২৮৩
১৩০	আলতো করে ছুঁয়ে যাওয়া মৃত্যুবাণ	২৮৭
১৩১	কোয়াড্রন লিডার সদকবিন্দু	২৯১
১৩২	বিদায়ের সুর বাজে	২৯২
১৩৩	বিদায় চাউলহাটি, আলবিনা ক্যাণ্টেন নদা	২৯৩
১৩৪	ফ্যাডম আইছে, ফ্যাডম	২৯৫
১৩৫	মহানদী	২৯৮
১৩৬	সেই তেঁচুমিয়া	২৯৯
১৩৭	দালালের বিচার চাই	৩০১
১৩৮	৩-এ মধুপাড়া কোম্পানি	৩০৩
১৩৯	পিলিগ্রি-কল্যা	৩০৫
১৪০	দাদু আপ আয়া	৩০৭
১৪১	শীতের সক্ষয় যাত্রা, পুরনো পথে	৩০৮
১৪২	নালাগঞ্জ, আবার যুক্ত ফিরে আসা	৩১০
১৪৩	বেলতলার সেই শরণার্থী পরিবারের দুর্সংবাদ	৩১১
১৪৪	দলের নতুন বিন্যাস, নতুন কৌশল	৩১৩
১৪৫	হস্যের তার বাংলাদেশ	৩১৪
১৪৬	কেনো কাদে ও এভাবে	৩১৬
১৪৭	মুজিব বাহিনী	৩১৭
১৪৮	সাইকেলিস্ট বদিউল আলম	৩২০
১৪৯	খোলো খোলো আর	৩২১
১৫০	সেই পুরাতন পথ, পুরাতন মানুষ	৩২৩
১৫১	অভিধি পার্থি	৩২৫
১৫২	সোনারবানার সেই বস্তুরা	৩২৫
১৫৩	ধূত রাজাকার এবং জেগে ওঠা মানুষ	৩২৬
১৫৪		৩২৭



শিমান বসে থাকা কিন্তু আসে না ওরা
তাহলুকের আশা-হতাশার কথা
জনপ্রশ়িল আয়মবুশ
হ অকিয়ে
বদে পায়েল দুই সৈনিক
পেশাকের সৈনিক এবং ডাঙি কার্ড সমস্যা
সন্ত-সেঁকের হেড কোয়ার্টার
আকাশচাটা বেয়াদিক নেমে এসেছেন মাটিতে
দেবা হয়ে যুদ্ধের পর যদি বেঁচে থাকি
যাদ্বা প্রাণিমৃগী দেন্দে স্কিউল ও আয়মবুশের ফাঁদ
সোনালি ফসল ঘরে তুলবে তারা

বিশ্বকূরে প্রাইমার্টি

চুম্বকের কিন্তু ধরে রাখা যায় না
আমুরবুকুল কৃষ্ণ পাহাড়ের দেশের মানুষটি
এক লেড়ুকি আয়ি থি
ডাঙার নন্দী
ইয়ে হামারা দেশ হ্যায়
লালমুখো মেজের
আমার সকল দৃশ্যের প্রদীপ
যিশন দেওয়ানহাট
একান্তরের রাজাকার ধরা এবং ভালো ভালোবাসার জীবন
ষিল দিয়ে তৈরি মুক্তিযোদ্ধার বুকের খাচা
যেখানেই থেকে ভালো থেকো
হস্তরের ইফতার পার্টি এবং জঙ্গল অভিযান
হতাহত তিন শক্ত সৈনিক : মাইন এপি-১৬ এর ধন্সোত্তম ক্ষমতা
ফির মারিমো উমহাক, কি কহেন
মানুষের ডেতের থেকে মানুষকে নিয়ে যুদ্ধ
জানিয়ে পেলাম, আমরা আছি
সবার আকৃতি, এক সাথে থাকি আগের মতো
অন্তঃপুরের মেঝে
অটুট থাকবে চিরদিন ভালোবাসার বক্সন
আহত, বিশ্বামের অবকাশ
ইন্দুল ফিতর
অমরবানার পতন

সমুখ যুদ্ধ

ক্রটে যাবার ডাক
গেরিলা যুদ্ধ শেষ, এবার ক্রটে যাওয়ার প্রস্তুতি
শীতের মধ্যাতে চাউলহাটি
বড় ভাই নুরুল হক এবং খুলে যাওয়া অমরখানা পথ
যাত্রা, সমুখ সমরে
পদানত অমরখানা
এই সেই অমরখানা
ক্রট
শহীদ হাবিলদার সকিমউদ্দিন
রক্ত আর মৃত্যুর রাজ্য
ভাইয়া ইয়ে জঙ্গ কিছুকা লিয়ে

৩৬০	
৩৩৪	
৩০৫	
৩৪০	
৩৪০	
৩৪১	
৩৪৪	
৩৪৬	
৩৫০	
৩৫২	
৩৫৬	
৩৫৭	
৩৫৮	
৩৫৯	
৩৬১	
৩৬৩	
৩৬৬	
৩৬৮	
৩৭০	
৩৭২	
৩৭৬	
৩৭৮	
৩৭৯	
৩৮০	
৩৮৩	
৩৮৬	
৩৮৯	
৩৯০	
৩৯১	
৩৯৩	
৩৯৫	
৩৯৬	
৩৯৮	
৪০১	
৪০৫	
৪০৫	
৪১০	
৪১২	
৪১৪	
৪১৫	
৪১৬	
৪১৮	
৪২১	
৪২১	
৪২৩	



অবিভাইন

বই প্রকাশন লেফ্ট ফ্ল্যাক : ডেন্ট গিড অব পজিশন

সম্পাদক : অনভিষ্ঠেত পরিষ্কৃতি

ও প্রক্রিয়া এবং ফ্যাডম কোম্পানি

শর্ক আসছে

নান আক্রমণ, কবর হয়ে যাওয়া নায়েকের ট্রেক

আগ্রহান শর্ক : নায়ের সুবেদার সফির পোষ্ট হেডে যাওয়া

বিমান ক্রু লাইন : বেঁচে থাকার আনন্দ

যাদ্বা প্রস্তুতি প্রস্তুতির প্রাঞ্চীরের সারি
গঞ্জে উচ্চ পুরো ডিফেল্স লাইন

বিশ্বকূপিণী স্কুলছে, ঠিকাও তাদের 'চু অর ভাই'

স্কুলিয়ে দেয়া হলো শক্তিদের

জগদলহাট দখলে এলো, সামনে পঞ্চগড়

গড়া হবে শৃঙ্খলোধ, রচিত হবে বীরতৃগাণ্ডা

জয়চ্ছেত

মৃত্যুহেট অর্জার

আগুন জ্বালো, আগুন জ্বালো

পদানত সেই জগদল

কুখ্যাত সেই বাক্তার

অ্যাভিভাস : ওভাদ আপ ক্যায়সা হ্যায়

সোনালি ধান, পিটুর গান ও পেছনে দাঢ়িয়ে থাকা মহিমাবিত হিমালয়

ইয়ানো এহন গান কিয়ারে

সর্বীস্তক মুছের তেতরে অ্যাভিযান

শীত বিকেলে নতুন ডিফেল্স লাইন

কুচবরণ কন্যারে তোর মেঘবরণ কেশ

ক্রন্ট— মলানী শিংপাড়া

বড় ধরনের প্রস্তুতি : দল বিন্যাস

মনার গলা ও রাজতর ঘূম তাড়িয়ে বেড়ানো

জিটারিং পার্টি ও গুলিবিদ্ধ নায়েক তকসির

লঙ্গি রাইফেলের ট্রেটার ও ক্রান্তিকর পশ্চাদপসরণ

ফিল্ড হাসপাতাল ও ডা. শামসুজ্জিন

ওয়্যারলেসে ডেসে আসা নিদেশ

তালমা পাড়ে মৌখ অভিযান

মিত্র বাহিনীর ডিফেল্স লাইন

বাঁকড়া মাথার ছাতিয়ান গাছ

দেশ আমাদের, যুক্তিটাও

আরে ইয়ে ঝুমনে কেয় কিয়া

তালমার লড়াই

ওরা চলে গেছে

মুক্ত খারীন জগদলে সুরী জীবনের ছবি

খারীন বাংলা সরকারের প্রতিনিধি ফজলুল করিম

লে. মাসুদের সাথে মেরি মিশন

এগিয়ে গেল ক্রন্ট

শক্তিধাটি তালমাৰ পতন

সুবেদার বালেক-শুভলা পরায়ণ ঝানু সৈনিক

এগিয়ে যায় মিত্রবাহিনীৰ অকুতোভয় তৰণ অফিসাৱ

৪২৪	
৪২৫	
৪২৭	
৪২৮	
৪৩০	
৪৩৩	
৪৩৪	
৪৩৬	
৪৩৭	
৪৩৯	
৪৪১	
৪৪২	
৪৪৩	
৪৪৫	
৪৪৬	
৪৪৮	
৪৪৯	
৪৫০	
৪৫১	
৪৫২	
৪৫৪	
৪৫৬	
৪৫৭	
৪৫৮	
৪৫৯	
৪৬০	
৪৬১	
৪৬২	
৪৬৩	
৪৬৪	
৪৬৫	
৪৬৬	
৪৬৮	
৪৬৯	
৪৭০	
৪৭১	
৪৭২	
৪৭৩	
৪৭৪	
৪৭৫	
৪৭৭	
৪৭৮	
৪৭৯	
৪৮০	
৪৮১	
৪৮৩	
৪৮৪	
৪৮৪	
৪৮৬	
৪৮৭	
৪৮৮	
৪৮৯	
৪৯০	
৪৯২	
৪৯৩	
৪৯৪	
৪৯৫	
৪৯৬	
৪৯৭	
৪৯৮	



পঞ্জগড় দখলের যুদ্ধ
সংক্ষিপ্ত, পঞ্জগড়ের উপকষ্টে উপস্থিতি
পঞ্জগড়ে
বাৰ যুদ্ধ, শহীদ আবদুল খালেক
মুল এলাকা, শহীদ হাৰন অৱ রশীদ রবি
ভালোবাসা
বিজয়জ্ঞান ফসলের মাঠ, এগিয়ে চলা শুধু
ট্যাঙ্ক সম্মুখৰে

যুদ্ধা গোৱালি অভিযানৰ
এয়াৰ বেইড ছিঃনল
বি চৈয়ন্দননাটি মুক্তি হলো

আমুন্দৰ অভিযানৰ মুক্তীশূলগত অবস্থান বোদা
দখলে আসে দালাল রাজাকার গ্রাম- মাৰণ্যাম
মুক্তি হলো বোদা থানা
পাঠান মূলকেৱ নিঃসন্ধি সৈনিক শুল মোহাম্মদ খান
সুলুলীৰ পতন, সামনে ঠাকুৰগাঁও
চলমান কলাম-মুক্তিবাহিনী মিত্রবাহিনী
মাইন অপসারণেৰ গুৰুদায়িত্ব
মুক্ত হলো ঠাকুৰগাঁও
সেতুন বাগানেৰ আশ্রয়
যুদ্ধ ঘোষণা, উড়ে যাওয়া যুদ্ধ বিমান
আপনজনেৰ শিষ্ট ডাক
উষ্ণ ভালোবাসাৰ ডালা
বিমান হামলা
বীৰুতি পেলো বাংলাদেশ
সৰ্চিশ মাহিলেৰ পতন
মুক্ত বীৰগঞ্জ
রোড টু খানসামা
এপারে আমৰা, ওপাৱে ওৱা
জুটেৰ মাল
থেমে পেলো অঞ্চল্যাতা
বীৱগঞ্জ-নিচপাড়া ক্রস্ট
একটি অনন্য রেকৰ্ড
মিত্র বাহিনীৰ হেডকোয়ার্টাৰ
পৰ্যবেক্ষণ মিশন, দশমাইল
জেনারেল মানেক শৰ আহ্বান : সারেভাৱ, সারেভাৱ কুইকলি
খানসামান পতন : সামনে সৈয়দপুৰ
ফিল্ড টেলিকমুনিকেশন পুৰ ত্ৰিগেড
দিনাজপুৰ অভিযান
ম্যাসাকুৱ
অছিৰ আৱ দম বক্ষ কৰা সময়
যুক্তবন্দি
ভেসে আসে সেই বিজয়বাৰ্তা
ডাহৰেৱিৰ শেষ পাতা

৫০০
৫০১
৫০৪
৫০৭
৫১০
৫১২
৫১৩
৫১৪
৫১৬
৫২০
৫২১
৫২৫
৫২৬
৫২৭
৫৩০
৫৩৩
৫৩৫
৫৩৮
৫৪০
৫৪১
৫৪৫
৫৪৯
৫৫০
৫৫৩
৫৫২
৫৫৫
৫৫৭
৫৫৮
৫৫৯
৫৬০
৫৬৩
৫৬৬
৫৬৭
৫৬৯
৫৭০
৫৭২
৫৭৩
৫৭৪
৫৭৭
৫৭৮
৫৭৯
৫৮২
৫৮৩
৫৮৭
৫৮৮

2.9.71

3 P.M. R.F. at first dot. - EXPOSURE OF AMMUNITION
at 11-30 A.M. - 303 - 540

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

After 8 months of treatment, the patients were evaluated by means of the following tests:

କାହାରେ ପାଇଲା ତାହାର ମଧ୍ୟ କିମ୍ବା କିମ୍ବା
କାହାରେ ପାଇଲା ତାହାର ମଧ୍ୟ କିମ୍ବା କିମ୍ବା

विनायक राजा द्वारा दीप विधुति

CENTRAL INSTITUTE OF INDUSTRIAL RESEARCH

१८५ अनुवाद संस्कृत से अंग्रेजी

وَالْمُؤْمِنُونَ إِذَا قُتِلُوا لَا يُمْلَأُوا حُيُّوكَةً وَلَا يُنْهَىٰ عَنِ الدِّينِ

وَالْمُؤْمِنُونَ إِذْ يَرَوْنَهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا
يَرَوْنَنَا لِمَنْ نَرَى وَلَا يَرَوْنَا
أَنَّا نَرَى مَا يَرَوْنَا وَكُلُّ أَنْعَامٍ
يَرَى مَا يَرَى وَكُلُّ حَسَنَةٍ يُرَدُّ
إِلَيْهَا وَكُلُّ سُوءٍ يُرَدُّ
إِلَيْهِ وَلَا يُؤْتَ إِلَيْنَا مِنْ
مَا نَحْنُ نَعْلَمُ وَلَا يُؤْتَ
إِلَيْهِ مِنْ مَا لَا يَعْلَمُ

卷之六



যুদ্ধাপরাধীদের
বিচার চাই।
আমারবই.কম

হাইড আউট (দুই)

হাইড আউটের জীবন

হাইড আউটের জীবন শুরু হয়েছিলো বদলুপাড়া থেকে। একান্তরের জুলাই মাসের ২৪ তারিখ ছিলো সেদিন। সে ছিলো বৃষ্টিভোজ কালো রাতে এক বিপদসঙ্কল যাত্রাশেষে খুঁজে নেয়া অভাবিত এক আন্তর্বান। সহযোগী সজিমউদ্দিনের বাড়ি ছিলো সেটা। সজিমউদ্দিন দারুণ এক ঝুঁকি নিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের তুলেছিলো তার নিজের বাড়িতে। কিন্তু এর জন্য বড়ো ধরনের মাসুল দিতে হয়েছিলো তাকে। তচলছ হয়ে গিয়েছিলো তার সাজানো পরিবার। বদলুপাড়া থেকে এরপর বারাখান। তারপর ডাবুরডাঙা। সেখান থেকে মধুপাড়া। মধুপাড়া থেকে নালাগঞ্জ, সোনারবান, কালাজোড়, ভেতরগড়, পেয়াদাপাড়া, কুমারপাড়া, মারেয়া ও কালিয়াগঞ্জ, এমনি অসংখ্য গ্রামের পর গ্রামে আমাদের খুঁজে নিতে হয়েছে হাইড আউট। শক্রের নাগালের বাইরে লুকিয়ে-ছাপিয়ে থাকতে হয়েছে দিনের পর দিন। শক্রের দৈনন্দিন গতিবিধির ওপর রাখতে হয়েছে নজর। রাতের আঁধারে ঝটিকা আঘাত হানতে হয়েছে নানাভাবে। আবার তাদের আগমনকে ঠেকাতে পড়েছে মরণপণ করে। জড়িয়ে পড়তে হয়েছে দিনরাতের সব ভয়াবহ যুদ্ধে।

হাইড আউট মানে লুকিয়ে থাকার জায়গা। গেরিলা যুদ্ধে হাইড আউটের ব্যাপারটা খুবই জরুরি। গেরিলা যোদ্ধারা নিয়মিত বাহিনীর অতো যুদ্ধ করতে পারে না। হাইড আউট বা লুকিয়ে থাকার গোপন আন্তর্বান থেকে শক্রপক্ষের ওপর আঘাত করা ছাড়াও নানাভাবে তাদের ক্ষতিসাধন করাই গেরিলা দেশকর্মসূল মূল কাজ। এতে করে শক্রপক্ষের শক্তি আর স্বষ্টি বিনষ্ট হয়। তাদের গতিবিধি হয়ে পড়ে সীমিত। তাদের শক্তি ট্রাস পেতে থাকে ক্রমাগতে। আর মনোবলও অস্ফুটে থাকে কর্মে। শেষত তারা দুর্বল হয়ে পড়ে। আর তখন বড় ধরনের আঘাত হেনে শক্রের ঘাঁটি দখল করে নেয়া যায়।

গেরিলা যোদ্ধাদের থাকতে হয় গ্রামগঞ্জে, অজপাড়াগায়ে, জঙ্গল আর বোপঝাড়ে। সাধারণ মানুষের ভেতরে থেকে তাদের মন জয় করতে হয়, তাদের বিপদেআপদে বাড়িয়ে দিতে হয় সাহায্যের হাত। যুদ্ধের বাইরেও জড়িয়ে পড়তে হয় অনেক যুদ্ধে। জনযুদ্ধের ধর্মই এই। মানুষের ভেতরে থেকে মানুষকে নিয়ে এগিয়ে যেতে হয় এ যুদ্ধে।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে গেরিলা যুদ্ধের ভূমিকা অনন্য। গেরিলা যোদ্ধা হিসেবে সেই একান্তরে আমাদেরকেও খুঁজে নিতে হয়েছিলো অসংখ্য সব আন্তর্বান। পরিত্যক্ত গ্রাম জনপদগুলোর ভেঙে-পড়া জঙ্গলাকীর্ণ বাড়িঘরগুলোর থাকতে হয়েছে দিনের পর দিন। অসংখ্য সব মানুষ, বিচ্ছিন্ন সব চরিত্র, আর সজ্ঞাতপূর্ণ সেই সব দিন আর রাত্রি। দুঃখকষ্ট আনন্দ বেদনায় মেশামেশি হাইড আউটের সেই জীবন, তার দিনানৌদেনিকতা।

পরাধীন মানুষ

সুব সকালে আমরা সোনারবানের পথ ধরি। পথে গড়ালবাড়ি বি.ও.পি.তে সুবেদার দাদুর কাছে খৌজ নিই, কর্নেল উবা গোলাবারুদ পাঠিয়েছেন কি না? রাজ্ঞার পাশের জলভো খন্দে নেপালি সুবেদার বড়শি ফেলে ছিপ হাতে দাঁড়িয়ে আছেন। হাসিমুখে তিনি মাথা নাড়েন। হাবিলদারকে ডেকে আমাদের গোলাবারুদ আনতে বলেন। আমরা দাঁড়িয়ে থাকি তার পাশে। তার মাছ ধরার নিবিষ্টতা পরথ করি। পাকা সড়কের পার্শ্ববর্তী খাল পানিতে টইটসুর। পাট কেটে পচানোর জন্য জাগ দেয়া হয়েছে পানিতে। ক'জন দিনমজুর ধরনের লোক পাটের পচা আঁশ ছাড়ানোর কাজে ব্যস্ত। বর্ষার বাংলাদেশে পাট পচানোর সেই চিরপরিচিত গুরু আর দৃশ্য এখানেও। দারুণভাবে মনে করিয়ে দেয় ফেলে আসা জন্মভূমি। মনের গভীরে একটা দীর্ঘস্থায় সুব কষ্টে চেপে রাখি। সুবেদারকে জিগ্যেস করি, দাদু আপ আজ্ঞা হ্যায়? সুবেদার সারা মুখে হাসি নিয়ে মাথা নেড়ে বলেন, আজ্ঞা হ্যায়। পিন্টু বলে, দাদু মাছ পায়া!

— নেহি বলে মাথা নাড়েন তিনি।

— মিলতা নেহিং পিন্টু আবার প্রশ্ন করে। আবার নেহি বলেন তিনি তেমনি হাসিমুখে।

— তব কিউ আব কোশেস করতা হ্যায়? আমি ডেক্স জিগ্যেস করি তাকে।

— নেহি দাদু ম্যায়তো মাছ নেহি মারতা ভাই কিলিং টাইম। তিনি হাসিমুখে তার মাছ মারবার প্রচেষ্টার ব্যাখ্যা দেন এইভাবে। হঁচোহলে এই ব্যাপার! আমরা বিওপিতে এলেই দেখি সুবেদার একটা ছিপ নিয়ে রাজ্ঞার পাশে পানির দিকে চেয়ে। হয় দাঁড়িয়ে, নয় বসে থাকেন। আসলে তিনি সময় কাটলেন কোথায় নেপালের কোন্ পাহাড়ি গাঁয়ে তিনি ফেলে এসেছেন তার পরিবার-পরিজন। সীমান্তে কাটিয়ে অবসর নেবার পর এসেছেন চুক্তিভিত্তিক বি.এস.এফ-এর চাকরিতে। সীমান্ত এলাকাগুলো আর আগের মতো নেই। চোরাচালান প্রায় বন্ধ হবার পথে। সীমান্তের ওপারে ই.পি.আর.দের বি.ও.পি.গুলো সব পরিত্যক্ত। অর্ধাং বি.এস.এফ-এর কাউন্টার পার্ট ই.পি.আর-রা বর্তমানে নেই। এখন সীমান্তও বলে কিছু নেই। সব খোলা। সীমান্তের এপারে মানুষের আসবার পথে কোনো বাধা নেই। তাই এপারে শরণার্থী মানুষের ঢল। ওপারে বাংলাদেশে পাকবাহিনীর নৃশংস তাওবলীলা সীমান্ত এলাকার চেহারাই পালটে দিয়েছে। এখন বি.ও.পির নিরাপত্তা ব্যবস্থা মজবুত করে বাক্সারে চোখ লগিয়ে এল.এম.জি হাতে সীমান্তের দিকে তাকিয়ে বসে থাকে সদাজাহত সেন্ট্রি। এছাড়া বর্তমানে বি.এস.এফ-এর আর কোনো কাজ নেই। কমইন এই পরিবেশে একজন বৃক্ষ সৈনিক তার জন্মভূমি নেপাল থেকে সুন্দর এই বাংলায় এসে সময় কাটাবেন কীভাবে? ফলে তিনি চমৎকার একটা বৃক্ষ বের করেছেন। বড়শিতে মাছ গাঁপুক

আর নাই গাঁথুক সময় কাটাতে ব্যাপারটা মন্দ নয়।

হাবিলদার আমাদের গোলাঞ্চি নিয়ে আসেন। সেগুলো নিয়ে রওনা দিই আমরা হাইড আউটের উদ্দেশ্যে।

সকাল নটার মধ্যেই হাইড আউটে শৌছে যাই। উৎকর্ষিত ছেলের দল আমাদের দেখে আগ্রহ হয়। একরামুল আর মুসা এগিয়ে আসে। বড়ো কাকের মতো চেহারা নিয়ে।

— কী ব্যাপার মুসা, খারাপ কিছু জানতে চাই তার ঝান্সি চেহারার দিকে তাকিয়ে।

— না, খারাপ কিছু খবর নাই। সারারাত পেট্টল দেয়া হয়েছে, সবাই জেগে ছিলো। জায়গাটা মনে হয় নিরাপদ নয়। দিনের বেলা ওরা হামলা করতে পারে।

— ঠিক আছে রাতের বেলা হাইড আউট বদলানো হবে। এখন চারদিকে কড়া সেক্সি লাগাও। মতি, মালেক ওদের ডাক দাও। ওদের একজন যাবে অমরখানার দিকে, একজন জগদলের দিকে। পাকবাহিনী যদি আসে, সকালের দিকেই আসবে। ওরা রাত্তায় বসে থাকবে দুপুর পর্যন্ত। ওপক্ষের কোনো মুভমেন্ট দেখলে দৌড়ে এসে খবর জানাবে। মুসা আর একরামুল চলে যায় নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করতে। মিনহাজ সামনে এসে দাঁড়ায়।

— কী খবর কোয়ার্টের মাস্টার, নাশতা আছে?

— জি, আছে। আপনাদের জন্য আলাদা করে রেখে দিয়েছি রাতের খাবারও রাখছিলাম।

মিনহাজ তার মনের গভীর থেকে ভালোবেসে ফেলেন্ত আমাদের। অসম্ভব দরদ আর যত্ন নিয়ে সে সদাতৎপর আমার জন্য, পিন্টুর জন্য, পৈরিবেশ-পরিস্থিতির মুখে কতো বদলে যায় মানুষ! যুক্তের আগে ছিলো আনসার ক্যার্যারে যুক্তের প্রথম দিকে তার কথাবার্তা-চলচলন ছিলো ভীষণ উক্ত ধরনের। অপূর্ব জিনে দিনে লোকটার মধ্যে কত পরিবর্তন এসেছে। অসম্ভব দৈর্ঘ্য নিয়ে কষ্ট করে হাইড আউটের সবার জন্য। তাই মিনহাজ এখন হাইড আউটের জন্য একজন অপরিহার্য চরিত্র।

কুয়োর পানিতে হাত-মুখ ধূৰ্ণ ক্ষফসুতরো হয়ে নিই। মিনহাজ মজিদ মিয়ার সাহায্যে নিজেই নাশতা নিয়ে এসে যান্তে সাথে সেটা পরিবেশন করে। খেতে খেতে দেখতে পাই, রাত-জাগা ছেলেরা এদিকওদিক ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ঘুমিয়ে রয়েছে। একটু পরে হজুর আসেন খোঝখবর নিতে। তাকে বসতে বলে মিনহাজকে চা দিতে বলি। হজুর বলেন, কোনো অসুবিধা হবে না বাবাজিরা। ওরা আসবার আগেই আমরা খবর পেয়ে যাবো। লোক পাঠিয়েছি চারদিকে। আপনারা ঝান্সি পিণ্ডাম নেন।

বিশ্বাম নেয়া হয় না। নাশতা শোষে হজুরকে নিয়ে তালমার পাড়ে আসি। কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলে তাকে বিদায় দিয়ে পিন্টু আর মুসাসহ আমরা তালমা পার হয়ে এপারে চলে আসি। একটা নতুন হাইড আউট খোজা দরকার। হজুর যাই বলুন, সোনারবানে আর থাকা যাবে না। পাকবাহিনী নিচয়ই জেনে গেছে সোনারবানে আমাদের উপস্থিতির খবর। মতিকে পাওয়া যায় তার বাড়িতে। তাকে সাথে নিয়ে আমাদের হাইড আউট খোজার কাজ শুরু হয় দুপুরের ভেতরেই। হাঁটতে হাঁটতে একসময় কালাজোত গ্রামের জঙ্গল আর বেপৰাড়ের ভেতর থেকে উকি দেয়া পরিভ্যক্ত বাড়িগুলো নজরে আসে। মোটামুটি পছন্দ হয়ে যায় জায়গাটা। সিঙ্কান্ত নিয়ে ফেলি, এখানেই হবে আমাদের পরবর্তী হাইড আউট, জায়গাটা যদি ও জগদল-অমরখানার আরো একটু নিকটবর্তী এবং নদীর এপারে। তবুও ২/১ দিনের হাইড আউট হিসেবে জায়গাটা মন্দ হবে না।

କାଳାଜୋତ ହାଇଡ ଆଉଟ

ସମ୍ବ୍ୟାର ଖାଓୟାଦାଓୟାର ପର ସୋନାରବାନ ହାଇଡ ଆଉଟ ଛେଡେ ଦେଯା ହୁଏ । ରାତର ମିଶମିଶେ ଅନ୍ଧକାରେ ସୋନା ମିଯାର ବାଡ଼ି ଥେକେ ବେର ହୁଏ ଆସେ ସବାଇ ଏକ ଏକ କରେ । ହଜୁରେର ସାଥେ ଦେଖା କରେ ତାକେ ଆମାଦେର ହାଇଡ ଆଉଟ ଛାଡ଼ାର କଥା ଜାଣାଇ । ଉନେ ତିନି ହଠାତ କରେଇ ଚମକେ ଓଠେନ । ପରେ ବଲେନ, ଠିକ ଆଛେ । ବାବାଜିରା ଏଥାନେ ଆମି ତୋ ରଇଲାମ । କୋନେ ଅସୁବିଧା ହଇଲେ ଆପନାରା ଥବର ପାବେନ ସାଥେ ସାଥେ । ହଜୁରକେ ଦୋଯା କରତେ ବଲେ ତାର କାଛ ଥେକେ ବିଦାୟ ନିଇ । ଏବାର ହାଇଡ ଆଉଟ କାଳାଜୋତ ।

କାଳାଜୋତେର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜ୍ଞାଯଗାୟ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଛନେର ସରଗୁଲୋତେ ହାଇଡ ଆଉଟ ଗଡ଼େ ତୋଳା ହୁଏ ରାତ ଆଟ୍ଟଟାର ଭେତରେଇ । ଚାରଦିକେ ବନଜଙ୍ଗ । ସରଗୁଲୋର ଭେତ୍ତେ-ପଡ଼ା ଅବଶ୍ୟ । ଏଗୁଲୋ ଛେଡେ ମାନୁଷଜନ ସବ ପାଲିଯେଇଛେ । ଏକଦିକେ ଡାକାତେର ଉପଦ୍ରବ, ଅନ୍ୟଦିକେ ପାକବାହିନୀ ଆର ରାଜାକାରଦେର ଭୟ । ଏମନିତେଇ ଦୀନ-ଦରିଦ୍ର ଆର ନିରମ-ନିଃସ୍ଵ ମାନୁଷ ଏବା । ତାର ଓପର ଚାପିଯେ ଦେଯା ଏହି ଅସମ ଯୁଦ୍ଧ ତାଦେର ବେଂଚେ ଥାକବାର ଭିତ ଏକବାରେଇ ନାଡ଼ିଯେ ଦିଯିଛେ । ଏହି ରକମ କଠିନ ଆର ଦୂଃଖ ଅବଶ୍ୟାର ମୂଳେ କାଳାଜୋତ ଥାମେ ଏଥିନ ଏକଜନ ମାନୁଷ ଓ ନେଇ । କେବଳ ଭୁତୁଡେ ଅବସର ନିୟେ ତାଦେର ପରିତ୍ୟକ୍ତ ବାଡ଼ିଘରଗୁଲୋ ଦାଁଡିଯେ ଆଛେ । ବର୍ଷାର ପାନିତେ ପିଛଲ କାଦାପାକେ ଭରା ସ୍ୟାତସେତେ ଘରର ମେବେ ଆର ଆଭିନା । ବେଢେ-ଓଠା ସାମେର ଝୋପଖାଡ଼ର ଭେତରେ କିଲବିଲ ଚିମେ ଝୋକେର ବାସ । ସାମାନ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶେଇ ଲାହିରୁ ଉଠେ ଆସେ ଶରୀରର ଓପର । ଶରୀରର ଚାମଦ୍ଦାର ଓପର ମେଟେ ଶିଯେ ରକ୍ତ ଉଷେ ନିତେ ଥାଇବ । ପ୍ରଥମେ ଟେର ପାଓୟା ଯାଏ ନା । ପାଓୟା ଯାଏ ପରେ, ବେଶ କିଛିଟା ରକ୍ତ ଟେନେ ନେବାବ ଥାଏ । ଆର ରଯେଇ ବୁନୋ ମଶାର ବୀକ । ଅନେକଦିନ ପର ମାନୁଷର ଅନ୍ତିତ୍ବ ଟେର ପେଯେ ଦେଖି କୁଣ୍ଡିକ୍ଷପୀତ ଅବଶ୍ୟ କାଟିଯେ ଉଠିତେ ତାରା ବୀପିଯେ ପଡ଼େଇଁ ଆମାଦେର ଓପର । ପ୍ରତିଟି ହାତେ ତାଇ ଧୋଯାର ବ୍ୟବଶ୍ୟ କରେଇଁ ହେଲେରା । ଭେଜା ଥିବା ଜ୍ଞାଲିଯେ ଘନ ଧୋଯା ତୈରି କରେ ଫେରୁତ୍ତି ଘରର ମଶା ତାଡ଼ାନୋର ଜନ୍ୟ ଯେତାବେ ବ୍ୟବଶ୍ୟ ନେଯା ହୁଏ, ଆମାଦେର ଓ ତାଇ କରତେ ହେଯେଇଁ ପ୍ରାଚୀର ଆକ୍ରମଣ ମୋକାବେଳେ କରାର ଜନ୍ୟ ।

ରାତ ଦଶଟାର ଦିକେ ପେଟ୍ରିନ ପ୍ଲାଟ ନିୟେ ବେରିଯେ ପଡ଼ି । ପିନ୍କ ଥାକେ ହାଇଡ ଆଉଟଟର ଦାୟିତ୍ବେ । ଚୌଧୁରୀଓ ଏକଟା ପ୍ଲେଟ ନିୟେ ଯାଏ ସୋନାରବାନ ହୁଏ ତାଲମା-ଶାଲମାରା ବ୍ରିଜେର ଦିକେ । ବିଶ୍ଵିର ଜଳଭୂମି ହାଟୁ ସମାନ ଥକଥିକେ କାଦାଯ ପା ଦେବେ ଯାଏ । ସେଟୋ ପାର ହୁଏ ଜଗଦଲହାଟେର ରାନ୍ତା ଧରି । ଥୁକରିପାଡ଼ାର ପରେର ବଡ଼ ଗ୍ରାମ ମଧୁପାଡ଼ାଯ ଏସେ ଥାମି । ଜାନା ଛିଲୋ, ଏଥାନକାର ଲୋକଜନ ପ୍ରାୟ ସବାଇ ହାଧୀନତାର ପକ୍ଷେ । ଏ ଥାମେ କଯେକଜନ ଉତ୍ସାହୀ ଯୁବକଙ୍କ ଆଛେ, ଯାରୀ ସୋନାରବାନେ ଶିଯେ ଦେଖା କରେ ଆମାଦେର ସବ ଧରନେର ସାହାୟ-ସହ୍ୟୋଗିତା କରତେ ଚେଯେଇଁ । ମନେ ମନେ ଥାଯି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନିୟେ ଫେଲି ଏ ଗ୍ରାମଟା ଆମାଦେର ପରବର୍ତ୍ତୀ ହାଇଡ ଆଉଟ ହତେ ପାରେ । ଟ୍ର୍ୟାଟେଜିକ କାରଣେ ଗ୍ରାମଟାର ଅବଶ୍ୟାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁରୁତ୍ତପୂର୍ଣ୍ଣ । କିନ୍ତୁ ଏର ନିରାପତ୍ତାର ଦିକଟା ଥୁବେଇ ଦୂର୍ବଳ । ମାତ୍ର ମାଇଲ ବାନେକେର ଦୂରତ୍ବେ ପାକା ସଢ଼କ । ସକାଳ ହଲେଇ ପାକସେନାଦେର ଦଲ ବା ତାଦେର ଅନୁଚରସହ ରାଜାକାର ବାହିନୀ ଚଲେ ଆସେ ଗ୍ରାମଟାଯ । ଗରୁ-ଛାଗଲ-ମୁରାଗ ଆର ଡିମ-ଚାଲ-ଡାଲ ସଞ୍ଚାର କରେ ନିୟେ ଯାଏ ତାରା । ଜୋର କରେଇ ବିନେ ପଯସାଯ । ରାତର ଯୁଦ୍ଧେ ବିଧିନ୍ତ ପାକ ଧାଟି ମେରାମତେର ଜନ୍ୟ ମଞ୍ଜୁର ହିସେବେ ବେଗାର ଖାତାର ଜନ୍ୟ ଧରେ ନିୟେ ଯାଏ ମାନୁଷଜନକେଓ । ସବ ଥେକେ ଦୁଃଖଜନକ ଘଟନା ହଜେ, ମେଯେମାନୁଷ ସରବରାହ କରାର ବ୍ୟାପାରଟା । ଏ ଗ୍ରାମଟାକେ ଏ ଧରନେର ଗ୍ରାମ ଆର ଲଜ୍ଜାଜନକ ବ୍ୟାପାରଟିଓ ସାମାଲ ଦିତେ ହଜେ । ବେଶ ସଞ୍ଚଳ ଏଲାକା । ମାନୁଷଜନଓ ବେଶ ସମ୍ବାନ୍ଧ ଧରନେର । କିନ୍ତୁ ତାରା ଆଜ କ୍ଳାନ୍ତ ଆର କ୍ଷୁକ ହୁୟେ ଉଠେଇଁ ପାକବାହିନୀର ।

ওপৰ তাদেৱ এসব বৈৱাচাৰী কাজকৰ্মেৰ জন্য। আৱ এই স্বৰূপতাই আমাদেৱ জন্য তাদেৱ সাপোর্ট পাওয়াৰ সুযোগ এনে দিয়েছে।

গ্ৰামেৰ সামনেৰ দিককাৰ প্ৰথম বাড়িটাৰ পুকুৰ ঘাটেৰ পাশে বাঁকড়া আম গাছটাৰ তলায় আমাদেৱ যাজ্ঞবিৱৰিত হয়। একটা বাঁশেৰ মাচা, স্থানীয় ভাষায় যাকে বলে টঁ, তাৱ ওপৰ বসা যায়, শোয়া যায়। মোট কথা, গ্ৰামেৰ মানুষজনেৰ বসাৱ জায়গা, বিশ্বাম নেয়াৱ জায়গা, গঁণগুজুব, আলাপচাৰিতা কিংবা গ্ৰাম্য সালিশ ইত্যাদিৰও জায়গা এটা। আমৱা টঙ্গেৰ ওপৰ বসি। অলঞ্চক্ষণেৰ ভেতৱেই আমাদেৱ উপস্থিতি টেৱ পেয়ে যায় মানুষজন। তাৱা আসে। তাদেৱ মধ্যে একজন প্ৰবীণকে দেখা যায়। তাৱ মাথায় সাদা টুপি। শৃঙ্খলাপৰিত। সম্ভাস্ত চেহাৱা। তিনি তাৱ কথা শুৰু কৱেন। পাকবাহিনী আৱ তাদেৱ অনুচৰদেৱ হাতে তাৱা কীভাৱে অত্যাচাৰিত আৱ নিশ্চৰীত হচ্ছেন তাৱই বিভূতিৰিত কহিনী। যতোই তাৱ কাহিনী এণ্ঠতে থাকে, ধীৱে ধীৱে শিহৱিত হতে থাকি। বুকে জুলে উঠতে থাকে আণ্ডন। কাঁধে ঝোলানো ষ্টেনগানেৰ কঠিন ধাতব শৰীৱে হাতেৰ আঙুল চেপে বসে শক্তভাৱে। কিন্তু এখন কিছু কৱাৰ নেই। সময় আসে নি এখনও। তবে আসবে। তাৱ জন্য অপেক্ষা কৱতে হবে কিছুদিন। এই সময় এ গ্ৰামেৰই পৰিচিত ক'জন মুৰককে পাওয়া যায়, তাদেৱ ভেতৱ থেকে দুঁজনকে সাথে কৱে পুকুৰেৰ কোপেৰ দিকে যাই। ওৱা আজ দিনেৰ বেলায় স্পাইং কৱে যে থবৰ সংগ্ৰহ কৱেছে সেসব বিশ্বামিত্ৰজনেৰ জানায়।

আজ রাতে বানিয়াপাড়ায় এসেছে এই এলাকাকুমুস পাকিস্তানি অনুচৰ দালাল হাফিজউদ্দিন। স্থানীয় লোকজনকে ডেকেছে তাৱ বাঁকিতে। পাকিস্তানেৰ সংহতি রক্ষা আৱ মুক্তিযোৰ্ধনেৰ কীভাৱে প্ৰতিৱোধ কৱা যায়। স্টেনগানেৰ কৱণীয় ইত্যাদি কৱাৰ জন্যই ডাকা হয়েছে আজকেৰ মিটিং। মুৰকক এন্টেনাকে ভাষায়, আজ রাতে হামলা চালালে হাফিজউদ্দিনকে ধৰা যেতে পাৱে। হাফিজউদ্দিন ধৰা পড়লে এই এলাকায় অনেকখানি শাস্তি ফিৱে আসবে। আজকেৰ এন্টেনাৰ পেট্টলোৰ বিশেষ কোনো কাজ ছিলো না। কাজ পাওয়া গোলো। সিদ্ধান্ত নিয়ে ছেলেল, হাফিজউদ্দিনকে ঠাণ্ডা কৱতে হবে এবং আজ রাতেৰ ভেতৱেই। এ উদ্দেশ্যে মোতালেবকে রওনা কৱিয়ে দেই ৭ জনেৰ একটি দলসহ। এৱপৰ আমৱা ফিৱে চলি হাইড আউটেৱ পথ ধৰে।

২৯. ৮. ৭১

শাবাশ শামসুন্দিন!

দিনটা কাটে অলসভাৱে। হাইড আউটেৱ চাৱদিকে কড়া সেন্ট্ৰি মোতায়েন কৱা হয়। জলাভূমিতে নামবাৱ রাস্তাটা অনেকা সুড়সেৰ মতো। দু'পাশে ঘন ঝোপজঙ্গল। শুক্ৰবাহিনী জগদলহাটেৱ দিক থেকে হাইড আউট আক্ৰমণ কৱতে এলে জলাভূমি পাৱ হয়ে এই সুড়ঙ্গ পথে উঁচুমতো বিষ্টীৰ্ণ প্ৰান্তৰ ভূমিতে এসে উঠতে হবে। তখন তাদেৱকে এই সুড়ঙ্গ পথেই আটকে দেয়া যেতে পাৱে।

সকাল হতেই মাটিতে গৰ্ত খুঁড়ে সুড়ঙ্গ মুখেৰ দু'ধাৱে দুটো ট্ৰেঞ্চ বানিয়ে ফেলা হয়। মোতালেবেৱ এল.এম.জি বাহিনী সেখানে পালাত্ৰমে ডিউটি দিতে থাকে ঝোপেৰ আড়ালে নিজেদেৱ লুকিয়ে রেখে। দিনেৰ বেলা কখনো রোদ, কখনো ধিৰ বিৱানো বৃষ্টি। সেই সাথে ভ্যাপসা গৱম। গা পিটিগিট কৱে। সজিমউদ্দিন নালাগঞ্জ থেকে ছুঁটি নিয়ে শিয়েছিলো তাৱ

বাড়িয়ের ঘোঁজ নেয়ার জন্য। দৃশ্যমানের দিকে সে সোনারবান হয়ে কালাজোত পৌছায়। তার কাছ থেকেই জানা যায়, পানিমাছ-বিসমনি এলাকার খবরাখবর। পানিমাছে পাকবাহিনীর আগত নতুন দল আবার গ্রামে গ্রামে অত্যাচার শুরু করেছে। সম্ভবত ওরা জানতে পেরেছে মুক্তিবাহিনীর ওই অঞ্চল থেকে সরে যাবার খবর। সজিমউদ্দিন আরো জানায়, দলাল গফুরউদ্দিন এসেছে পঞ্চগড় থেকে। প্রত্যেকদিন তার বাড়িতে মিটিং বসছে। রাজাকার বাহিনীতে কারা কারা যাবে, তাদের তালিকা করছে সে। স্থানীয় মানুষজন নিদারশ ডয়-ভূতির ভেতরে রয়েছে, কখন কারি কি ক্ষতি হয়, এই দুষ্টিত্ব অঙ্গীর রয়েছে তারা। হাফিজউদ্দিনের মতো গফুরউদ্দিনকে ঠাণ্ডা করা প্রয়োজন। পিটু আর মুসাকে নিয়ে পরিকল্পনা করতে বসি।

বিকেলের দিকে বিরাট একটা দৃঢ়ত্বনা ঘটে। চৈতন্যপাড়া অপারেশনে দুটো ঘোনেড়ের লিভারের ওপর থেকে পিন খুলে নিয়ে লিভারে চাপ দিয়ে দু'জন ব্রিজ হামলায় এগিয়ে পিয়েছিলো। কিন্তু বিলা বাধায় ব্রিজ দখল হওয়ায় ঘোনেড় দুটো আর ঝুঁড়তে হয় নি। ওদিকে পিন দুটোও অঙ্ককারে মাটিতে পড়ে হারিয়ে পিয়েছিলো। সারা রাত্তা লিভারের ওপর আঙুল চেপে রেখে ঘোনেড় দুটো সাবধানে নিয়ে আসতে হয়েছিলো। হাইড আউটে ফিরে ঘোনেড় দুটোর লিভারে সুতলি পেঁচিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছিলো শক্ত করে। ঘোনেড় দুটোয় তখনো তাজা ডেটোনেটের ভরা রয়েছে। সে জন্য সবসময় ও দুটো সাবধানে রাখতে হচ্ছিলো। আজ সকালে পাহারাদার ছেলেদের হাতে সেই ঘোনেড় দুটো দেয়া হয়েছিলো। পাকবাহিনী গত রাতের অপারেশনের প্রতিশোধ নিতে এখানে হাতের করতে পারে। তাদের সম্ভাব্য হামলা প্রতিরোধে ঘোনেড় দুটো কাজে লাগবে। পিটু বোলা ছিলো বলে সারাদিন লিভার চেপে ধরে ডিউটি করেছে ওরা। ঘোনেড় দুটো প্রতিটি নিয়েই বিকেলের দিকে সুড়ং পথের ডিউটি সেরে আইয়ুব ফিরে আসে।

বাড়ির আঙ্গিনায় তখন ছেলের দলের জলচলা। ফল ইন করে রাতের ডিউটি বাটছে মুসা, একরামুল আর চৌধুরী। রাতের অস্থায়েশন নিয়ে পিটুর সাথে কথা বলছি তখন 'আমি' ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে। এমন সময় আইয়ুব আসে। ঘরে চুক্বার মুখে সামান্য হেঁচট খায় সে। ফলে তার হাত পিছলে ঘোনেড়টা পড়ে যায় আঙ্গিনায়। বট করে লিভার আলগা হয়ে ডেটোনেটের আঘাত করার শব্দ হয়। ধোঁয়া বের হতে থাকে শুটার মুখ বেয়ে। আইয়ুব ত্যাবাচ্যাকা খেয়ে ঘোনেড়ের দিকে তাকিয়ে থাকে ড্যাবড্যাবে চোখে। পরিস্থিতি এবং বিগদ বুঝে আমি চিক্কাক করে উঠি 'ঘোনেড় ফাটলো, ঘোনেড় ফাটলো পজিশন নাও' বলে। কে কোথায় পজিশন নেবে এই নিয়ে বাড়ির আঙ্গিনায় দলা পাকানো ছেলেদের ভেতরে হল্লাড় আর ধাক্কাধাকি শুরু হয়ে যায়। প্রতি মুহূর্তে মনে হয়, এই বুঝি ঘোনেড় বিক্ষেপিত হয়ে সব কিছু ম্যাসাকার করে দেবে। এই সময় হঠাৎ করেই শামসুদ্দিন একটা অসীম সাহসিকতার কাজ করে বসে। সে আইয়ুকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিয়ে ঝাপিয়ে পড়ে ছোঁ ঘেরে তুলে নেয় হাতে জ্বলন্ত ঘোনেড়টা। তারপর সেটা মুহূর্তের ভেতরে ছুঁড়ে দেয় ঘরটার চালের ওপর। দু'হাতে কান ঢেকে আমি ঘরের ভিটির কাছে বসে পড়ি। আমার দেখাদেখি একইভাবে পিটুও। শামসুদ্দিনও ঘোনেড়টা ছুঁড়ে দিয়ে একইভাবে আমাদের সামনে দু'হাতে কান ঢেকে উঠে পড়ে। প্রচণ্ড বিক্ষেপণের ধ্বনি তুলে ছেনের চালে বিক্ষেপিত হয় ঘোনেড়টা। দারুণ একটা সর্বনাশ হতে পারতো। শামসুদ্দিন নিজে মারা পড়তে পারতো। অনেকেই হয়তো হতে পারতো শুভ্রতর আহত। কেউ কেউ ঘোনেড়ের আঘাতে মারা যেতে পারতো ছিল্লিন

হয়ে। ছেনেডের কাছাকাছি ছিলাম আমি আর পিন্টু। নিশ্চিন্তভাবে আমরা দুজনই বিফোরিত ছেনেডের টুকরোর আগাতে মারা যেতে পারতাম। কিন্তু এসবের কিছুই হলো না। শামসুদ্দিন নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বাঁচিয়ে দিলো সবাইকে। সারা শরীর বেয়ে তখন দরদরিয়ে ঘাম বেরহচে। শামসুদ্দিনকে শোয়া থেকে তুলে বুকে জড়িয়ে ধরি। মুখে বলি, শাবাশ শামসুদ্দিন: তুই বাঁচিয়ে দিলি সবাইকে ভাই। সারাজীবন মনে থাকবে তোর কথা।

উদ্ভৃত বিপদ কেটে যাওয়ায় সবার মধ্যে এবার প্রাণচাপ্তল্য ফিরে আসে। সবাই শামসুদ্দিনকে ঘিরে বাহবা দেয়। আভিনার মাটির চতুরে বসে পড়ি আমরা। মিনহাজকে চা দিতে বলি। টানটান নার্ত হঠাৎ করে ছাড়া পেয়ে শরীর জুড়ে একটা নিষেজ ভাব বয়ে আনে। মতিকে বলি বিড়ি দিতে। পিন্টু নিজে নেয়। ধরিয়ে দেয় আমারটা। বিড়ির ধোয়া টানতে টানতে ভাবি, কী ঘটতে যাচ্ছিলো অথচ ঘটলো না। মানুষের জীবনটা বুঝি এমনই। মাথার ওপর বিপদ অবশ্য়াবীভাবে নেমে আসে; কিন্তু ঘটে না। আর সেটাকেই বলা হয় মিরাকলু। আমরা শামসুদ্দিনের উচ্ছিলায় একটা মিরাকলের সাহায্যে আজকের মতো বেঁচে গেলাম। অদ্ভুত ব্যাপার! এখনো বিশ্বাস হতে চায় না।

রাতে তিনজনের কমান্ডো দল যাবে গফুরগাঁওনের বাড়িতে ছেনেড হামলা করার জন্য। একাববরের নেতৃত্বে সজিমউদ্দিন আর মজিদ মিরা যাবে এই অপারেশনে। রাতে আর কোনো অপারেশন নেই। শুধু প্রেটেল ডিউটি চলবে হাইকুন্টের চারদিকে। সে অনুযায়ী সেন্ট্রি আর প্রেটেল ডিউটি ভাগ হয়ে যায়। সঙ্ক্ষ্যার পর মিনহাজ সবাইকে রোজকার মতো খাওয়া দিয়ে দেয়। রাত ৮টার দিকে রওনা দেখে কমান্ডো বাহিনী। ওদের করণীয় দায়িত্ব বুঝিয়ে দেয়া হয় বারবার করে। ধোয়া, মশা আর সেই সাথে ওমেট গরম। শক্তর হামলার সংঘর্ষনা নিয়ে না-স্বুম-না-জাগরণ এই রকম একটা অবস্থার ভেতর দিয়ে রাতটা কেটে যায়। সকালের দিকে কমান্ডো বাহিনী ফিরে আসে। একাববর রিপোর্ট দেয়, গফুরগাঁওনের বাড়িতে মিটিং চলা অবস্থায় দুটো ছেনেডের সাহায্যে তারা সফল হামলা চালিয়েছে। এতে নিহত হয়েছে একজন। আর আহত শীঁচ।

৩০. ৮. ৭৩

ঘায়েল তিন রাজাকার

হাইড আউট সরিয়ে নেয়া হয় নালাগঞ্জে। কালাজোত কিংবা সোনারবান— এ দুটো আশ্রয়ই এই মুহূর্তে বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে। এদিককার অনেক কাজ থাকি থেকে গেলেও নিজেদের নিরাপত্তা আগে। অন্তত সপ্তাহবানেকের জন্য সরে থাকতে পারলে পাকবাহিনীর পালটা হামলার সংঘর্ষনা এড়ানো যাবে। তাই সঙ্ক্ষ্যার দিকে হাইড আউট গুটিয়ে নেয়া হয়।

আজ রাতে পানিমাছ পাকবাহিনীর ঘাঁটি আক্রমণের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। মিনহাজ নতুনহাট হয়ে যাবতীয় মালসামানা আর গোলাবারুদ নিয়ে যাবে নালাগঞ্জে। নতুনহাট থেকে সর্দারপাড়া-ঠাকুরপাড়া হয়ে আমরা যাবো পানিমাছে। সেভাবেই দলটাকে তৈরি করা হয়েছে। নতুনহাট পর্যন্ত একসাথে এসে মিনহাজকে তার দলবল নিয়ে নালাগঞ্জ রওনা করিয়ে দিয়ে আমরা হাঁটতে থাকি পানিমাছের দিকে। আসবার সময় হজুর চা করে থাইয়েছেন। তারও পরামর্শ, আমরা যেনো কঢ়িন একটু সরে থাকি। সোনারবান জায়গাটা নিরাপদ নয় ব্যাপারটা তিনিও অঁচ করতে পেরেছেন। হজুরকেও নিরাপদে থাকবার পরামর্শ দেয়া হয়েছে।

পাকবাহিনী যদি সত্যিকারভাবেই সোনারবালে মুক্তিযোদ্ধাদের ঘোঁজে এসে যায়, তবে তিনিও যেনো তাদের সাথে উপস্থিত না হয়ে দূরে সরে থাকেন। হজুরকে আমাদের বড় দরকার। ওই এলাকার মানুষজনের মধ্যে তার সম্পর্কে গড়ে উঠা শ্রদ্ধামণিত ইমেজ আমাদের কাজে লাগবে। এছাড়া মুক্তিবাহিনীর সাথে হজুরের যোগাযোগের ব্যাপারটাও হ্যাতে পাকবাহিনী জেনে গিয়ে থাকবে। এ অবস্থায় হজুর যতো পরহেজগারই হোন না কেনো, মুক্তিবাহিনীকে আশ্রয় দেয়া আর তাদের সাথে তার যোগাযোগের জন্য তাকে বিস্মৃত ক্ষমা করবে না। তাকে ধরতে পারলেই তারা শুলি করে মেরে ফেলবে। হজুরের ওপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করছে সোনারবালের মানুষজন। তাকে হারালো চলবে না কোনোভাবেই।

সর্দারপাড়া এসে যায়। হালিম মাস্টার আমাদের পেয়ে যেনো নিজের ছেলেদের বহুদিন পর কাছে ফিরে পাবার মতো করে খুশি হয়ে ওঠেন। হাঁকড়াক করে আমাদের অভ্যর্থনা-আপ্যায়নের কাজ শুরু করে দেন। চটেজলদি চা আর জলখাবার এসে যায়। সেগুলো মুখে ঝুলতে ঝুলতেই এক ফাঁকে দেখে নিই তার উড়িয়ে দেয়া ঘরটা। কোনোরকমে একটা ছনের চালা দিয়ে তিনি আবার সেটাকে বাসযোগ্য করে তুলছেন।

মজিব তখন মহাব্যস্ত। সেও ভয়ানকভাবে খুশি হয়েছে তাদের বাড়িতে হঠাত করে আমাদের পেয়ে। মজিবের মা নাকে নোলক দুলিয়ে আসেন। মাথায়-শরীরে হাত বুলিয়ে খাঁটি ময়মনসিংহের ভাষায় তার আনন্দ প্রকাশ করেন। ~~মুক্তিসঞ্চার আর মজিবকেই নয়,~~ আমরা বাঁচিয়ে দিয়েছি তাদের পুরো গ্রামবাসীকে। ~~সেই~~ কৃতজ্ঞতার কথা তারা ভুলতে পারবে না সহজে। ভেঙে-পড়া, ভীত মানুষজনের জীবন আবার কি সুন্দরভাবে দাঁড়িয়ে গেছে। জীবনযাত্রা স্বাভাবিক এবং সাবগৃহীত হয়ে এসেছে। পাক আর্মি আমাদের অপারেশনের পরের দিন এখানে এসেছিলো। তখন হালিম মাস্টারসহ অন্যরা তাদের বলেছিলো, মুক্তিবাহিনী তাদের গ্রাম আক্রমণ করে যুবকদের ধরে নিয়ে গেছে। বাড়ির উড়িয়ে দিয়ে গেছে। পাকিস্তানি ~~প্রক্রিয়া~~ সাপোর্ট করার জন্যই তাদের এই সর্বনাশ হয়েছে। মুক্তিবাহিনী আবার আসবে। ~~মুক্তিবাহিনীর~~ উচিত তাদের রক্ষা করা। তারা যদি তাদের রক্ষাই করতে না পারলো, তবে তারা যেনো এই অহেতুক চাপ তাদের ওপরে না দেয়। সেই থেকে পাকবাহিনী আর আসে নি। সম্ভবত তার পেয়ে আসে নি তারা।

রাত একটায় পানিমাছ ধাঁটি আক্রমণ করা হয়। মুসা আর একরামুল বদলুপাড়া-বিসমনির দিক থেকে। পিন্টু আর আমি কামারপাড়ার পুরাতন ঝুঁটের দিক থেকে। একযোগে পানিমাছের ওপর আঘাত হানা হয়। হঠাত আক্রমণ পাকবাহিনী প্রাথমিক ধাক্কা সামলে উঠে জবাব দিতে থাকে স্থান পাল্লায়। পিন্টুর হাত থেকে ঘর্টার নিয়ে পরপর দুটো শেল পাঠাই, ওদের অবস্থানের ওপর প্রচও শব্দ করে বিস্ফোরিত হয় শেল দুটো। এইভাবে যুদ্ধ চলে থেমে থেমে রাত প্রায় তিনটা পর্যন্ত। এরপর ফেরার সিদ্ধান্ত নিই।

ফেরার পথে কামারপাড়া আম পার হয়ে রাস্তার তিন মাথায় উপস্থিত হতেই আকস্মিক চ্যালেঞ্জের ধৰনি, কে যায়ঃ থামো, তা নইলে শুলি খাবেন!

অঙ্ককারের ফিকে আলোয় ৩ জন লোকের আবছা অবয়ব ভেসে ওঠে। হাতে তাদের উদ্যত হতিয়ার। কারা এরা? পেছন থেকে ঘিরে ধরতে এসেছে কি তাহলে শুক্তিবাহিনী? বুকের মধ্যে বিপদের এলার্ম বেজে উঠবার শব্দ শুনতে পাই। ওরা কিছু বুঝে উঠবার আগেই টেনগানের টিগারে চাপ দিই। সাথে সাথে পিন্টুর টেন থেকেও একরাশ জ্বলত বুলেট ছুটে যায়

চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেয়া সেই লোকগুলোর দিকে। রাস্তার ওপর পড়ে যায় লোকগুলো। দৌড়ে কাছে যাই। অন্যদের দ্রুত পজিশন নিতে বলি। শক্রবাহিনী এই লোকগুলোকে ক্ষট হিসেবে পাঠিয়ে সম্ভবত পেছনে পেছনে আসছে।

তিনজনের মধ্যে ১ জন মৃত, ২ জন ছটফট করছে আহত হয়ে। একটা রাইফেল পাওয়া যায়। পাওয়া যায় কয়েক রাউণ্ড গুলিও। খুব দ্রুত সরে যাওয়া প্রয়োজন। পেছনে শক্র কোথায় ওঁৎ পেতে রয়েছে, কে জানে? মাটিতে পরে থাকা লোকগুলোকে পরীক্ষা করে মোতালেব উত্তেজিতভাবে বলে, এমরা রাজাকার গে!

— দ্যাখ আর কিছু পাস কি না, তাড়াতাড়ি কর।

মোতালেব তাদের শরীর হাতড়ে রাজাকারের ব্যাজ, আইডেন্টিটি কার্ড আর কিছু কাগজপত্র পায়। পজিশনে থাকা ছেলেদের উঠে আসতে নির্দেশ দিয়ে আমরা দ্রুত নালাগঞ্জের পথ ধরি। আজকের শিকার তিনজন রাজাকার। যুদ্ধের শুরু থেকে এই প্রথম সরাসরি রাজাকারদের ঘায়েল করা গেলো। আজকের মিশনের ফলাফল মন্দ নয়।

৩০. ৮. ৭১

শক্রের ঝাঁদ

দারিকামারি গ্রামে পৌছনো মাঝ সাথনের রাস্তার যে মোড়ে ছেই মোড়ের বাঁ-দিকের ঝোপটা থেকে হঠাতে করে একরাশ গুলি খেয়ে আসে। মাথার ছল আসতো করে নাড়া দিয়ে উড়ে যায় অগ্নিবাণগুলো। নিজেকে রক্ষার অবচেতন তাগিদ থেকে যেই আপনাআপনি ভূমিশয়ার পজিশনে চলে যাই, অমনি পেছন থেকে হানিফের স্লার শব্দ ভেসে আসে, মরি শেনু বাহে! আর সেই চাপা আর্টিনাদ শব্দে শরীরের ওপর পাক থেকে দ্রুত চলে যাই রাস্তার ডান পাশের ঢালুতে। কাঁটাময় বুনো গাছের বোপে শক্রের খামচে ধরে। কোনো কিছু দেখার সময় নেই। মনের মধ্যে কেবল একটাই তাগিদ প্রচলিত আড়ালে যেতে হবে। মাথা বাঁচাবার, শরীর বাঁচাবার মতো আড়াল। রাস্তার ঢালুতে প্রচলিত সাথে সাথে চমৎকার আড়াল পাওয়া যায়। শক্রের গুলি আসছে সমান বেগে। মৌমাছির শঙ্খন তুলে উড়ে যাচ্ছে সেগুলো ত্রুমাগত। এখন আর মাথা তুলে কিছু দেখবার উপায় নেই। একবার মাথা বেঁচে গেছে, পরেরবার নাও বাঁচতে পারে। হানিফের সম্ভবত গুলি লেগেছে, না হলে ও হঠাতে করে অমনি চিক্কার দিয়ে উঠবে কেনো? রাস্তার ওপর ও পড়ে আছে কি না সেটা বুঝবার উপায় নেই। এপারে সবাই আসতে পেরেছে বলে মনে হয় না। রাস্তার ওপর থাকলে নির্ধার মৃত্যু। ওপারে গিয়ে থাকলে শক্র হাতে ধরা পড়বার সমূহ সম্ভাবনা। চমৎকার ঝাঁদ পেতেছিলো পাকবাহিনী মুক্তিযোদ্ধাদের ধরবে বলে। আর আমরা ওদের সেই ঝাঁদে পা দিয়েছি। ওদের অ্যামবুশের মধ্যে এখন আমরা নিজেদের রক্ষা করার জন্য লড়াই করতে হবে। টিকে থাকতে হবে এবং সরে পড়ার সুযোগ তৈরি করে নিতে হবে। ছেলেদের হাতে ধরা মাইনগুলো রাস্তার ওপর ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে রয়েছে। গ্যান্টি ট্যাঙ্ক মাইনের ওপর যদি শক্রের গুলির আঘাত লাগে, তাহলে ভয়াবহ বিক্ষেপণে আমাদের কারোর অস্তিত্ব থাকবে না। উড়িয়ে নেবে সবকিছু ধুলোর মতো করে। ভয়াবহ বিপদের সম্ভাবনা রাস্তার ওপর রেখে অদূরবর্তী পাকসেনাদের অবস্থান বুঝে নেবার চেষ্টা করি। মোতালেবের কাছে গড়াতে গড়াতে চলে আসি। ফিসফিসিয়ে বলি, তাড়াতাড়ি এল.এম.জি সেট করে গুলি শুরু কর। আমাদের তরফ থেকে গুলিবর্ষণ শুরু না হলে শুরু ভাববে, আমরা

সবাই ঘায়েল হয়ে গেছি। একযোগে আসবে তারা তখন চার্জ করতে।

মোতালেব এল.এম.জি চালু করে। অন্যরাও যে যার অবস্থান থেকে নিজের শরীর আড়াল করে শুলিবর্ষণ শুরু করে। এতে পাকসেনাদের দল যেনে কিছুটা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যায়। হঠাৎ তাদের শুলিবর্ষণ থেমে যায়। কিন্তু না। ধামে মাঝে কিছুক্ষণের জন্য। আবার তারা সোৎসাহে শুলি-বৃষ্টি শুরু করে। জাত সৈনিক ওরা। ওদের পেশাই হচ্ছে যুদ্ধ করা। তার ওপর প্রত্যেকের হাতে সর্বাধূনিক চাইনিজ রাইফেল। যেগুলো অত্যন্ত সহজে ব্যবহার করা যায় এবং ফয়ার পাওয়ারও অত্যন্ত বেশি।

তাদের তুলকালাম শুলিবর্ষণের জোয়ার যেনে আমাদের অবস্থানটাকে তচ্ছন্দ করে তাসিয়ে নিয়ে যাবে। আমাদের ছেঁড়া একটা শুলি জায়গায় ওদের দশটা ভেসে আসে। মোতালেব অবচলভাবে এখনো এল.এম.জি. চালিয়ে যাচ্ছে। সামনে শক্র অবস্থানের দিকে নল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে। অন্যরাও মাথা না তুলে এস.এল.আর. এবং রাইফেলের ট্রিগার টিপে চলেছে। এলোপাতাড়ি শুলিবর্ষণ। প্রচণ্ড ভয় আর অস্থিরতা সবাইকে যেনে গ্রাস করেছে। এ ধরনের অভাবনীয় পরিস্থিতিতে মাথা ঠিক রাখা সত্যিই মুশকিল। টেনগান থেকে দুটো ত্রাশ করেই আমি থেমে গেছি। ম্যাগজিন একেবারে শেষ করা যাবে না। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত নিজেকে রক্ষার করার জন্য কিছু শুলি জমা করে রাখতে হবে। মনে হয়, পাকসেনাদের দলটি এগিয়ে আসছে এবং তারা মরিয়া হয়ে উঠেছে। শুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে দ্রুত পুলিং করে এগিয়ে এসে তারা কাঁপিয়ে পড়ে ধরে ফেলতে চাইছে আমাদের। এ এক সাম্ভাব্যিক অবস্থা। এখন সরে পড়বারও উপায় নেই। অবস্থান ছেড়ে উঠে পালাতে গেলে নিষ্পত্তি শুলি-বৃষ্টির মধ্যে পড়ে নিশ্চিত মৃত্যুর সম্ভাবনা। টিকে থাকতে হবে এখানেই। চৰম স্টেইস আর ধৈর্যই এখন আমাদের বাঁচাতে পারে। মোতালেবকে এল.এম.জি চালিয়ে প্রস্তুত বলি। একরামুল, শুরু আর মালেককে দ্রুত ঘেনেড় চার্জ করতে বলি। নিজের জাহাজ ট্রাঙ্কেট থেকে ঘেনেড় দুটো বের করে নিই। দাঁত দিয়ে কামড়ে পিন খুলি। ডান হাতে ধরে মাথা সামান্য উঁচু করে ক্রিকেট বলের মতো ঘেনেড়টা ছুঁড় দিই। কিছুক্ষণের মধ্যে আরো ৪টা ঘেনেড় সামনের দিকে ছুঁটে যায়। প্রচণ্ড শব্দ ঝুলে বিস্কেরিত হতে থাকে সেগুলো একটার পর একটা। পরের ঘেনেড়টা আবার ছুঁড়ে দিই একইভাবে। এরপর আরো একটা ঘেনেড় ছুঁটে যায় সামনের দিকে। এই ফোটার মতো ঘেনেড়গুলো ঝুটতে থাকে আগুয়ান পাকসেনাদের সামনে। মোতালেবের এল.এম.জি.র সাথে অন্য হাতিয়ারগুলোও সমানে সক্রিয় থাকে। পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হয়। পাকসেনারা থমকে যায় হঠাৎ করে এবং এরপর যথন তাদের শুলিবর্ষণ শুরু হয়, তখন তারা বেশ কিছুটা পিছিয়ে গেছে। তার মানে ওরা সরে যাচ্ছে। পেছনে পালাচ্ছে। মোতালেবকে বলি, এল.এম.জি.টা রাস্তার ওপর সেট করে না থেমে শক্রকে লক্ষ্য করে একইভাবে শুলি চালিয়ে যেতে। একরামুলসহ আর সবাইকেও একই মতো নির্দেশ দিই। ছেলেদের হাতের অন্তর্গুলো যেনে নতুন করে প্রাণ ফিরে পায়। সামনের মূর্তিমান বিপদ কেটে যাচ্ছে। ওরা পিছিয়ে যাচ্ছে দ্রুত। এখন আর কোনো ভয় নেই। সূতরাং, পিছু হটতে থাকা পাকবাহিনীকে লক্ষ্য করে সবাই ঝাড়া শুলিবর্ষণ করে যেতে থাকে। ১৫/২০ মিনিট এভাবে চালানোর পর ওপক্ষ থেকে আর কোনো সাড়া পাওয়া যায় না। অর্থাৎ ওরা একেবারেই চলে গেছে। আর ব্যাপারটা আঁচ করতে পেরেই আমরা সবাই গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াই।

যেনে সাক্ষাৎ মৃত্যুর হাত থেকে এইমাত্র ফিরে এলাম সবাই। এমন একটা অনাবিল

শান্তি আৰ আনন্দবোধ ঘিৰে ধৰে আমাদেৱ সবাইকে। তখন হানিফেৰ খৈজ কৰি। ডাকি ওৱ নাম ধৰে। রাস্তাৰ ওপৰ ছড়িয়ে থাকা মাইনগুলো অক্ষকাৰে হাতড়ে হাতড়ে খুজতে থাকে একৰামূল। মধু আৱ মোতালেৱ তাদেৱ এল.এম.জি নিয়ে সম্মুখেৱ রাস্তাৰ ওপৰ পজিশন নেয়। বিক্ষেৱণেৱ ধোয়া, বাকুদেৱ গক্ষ আৱ ঘন কালো অক্ষকাৰ সমষ্ট পৰিবেশটাকে বিভীষিকাৰ্পূৰ্ণ কৰে তুলেছে। তাৰ ভেতৱেই আমি হানিফেৰ নাম ধৰে ডাকি। রাস্তাৰ ওপৰ থেকে সাড়া ভেসে আসে। রাস্তাৰ ঢালুৰ সাথে বাদ। ঘন ঝোপঝাড়েৱ ছাউনি। তাৰ ভেতৱেই হানিফকে পাওয়া যায়।

না, এমন বড় কোনো ধৰনেৱ আঘাত নয়। পিঠীৰ পেছন থেকে কিছুটা মাংস তুলে নিয়ে গেছে শক্রৰ বুলেট। গামছা পেঁচিয়ে বেঁধে দেয়া হয় ক্ষতস্থানটা। এৱপৰ যুক্তিক্ষেত্ৰ থেকে ফিরতিযাতা। পঞ্চগড়-হাড়ভাসা রাস্তায় পাকবাহিনীৰ চলাচল পথে আজ আৱ মাইন বসানোৱ পৰিকল্পনা কাজে পৱিণ্ঠ কৰা সম্ভব হয় না।

৩৩. ৮. ৭৫

ক্যান্টেন দয়াল সিং

ক্যান্টেন দয়াল সিং নতুন কমান্ডিং অফিসাৱ হিসেবে রিপোর্ট নিতে এসেছেন। চাউলহাটি ইউনিট বেসে যোগ দিয়েছেন তিনি গতকাল। মাথায় পাগড়ি মুখেৱ দাঢ়ি পাতলা জাল দিয়ে সাইজ কৰে বাঁধা, ডান হাতে লোহার বালা, লম্বা দেওতাৰা চেহাৱাৰ চৌকস অফিসাৱ ক্যান্টেন দয়াল সিং। জাতিতে শিখ। তাৰ কথাৱ উচ্চারণে পাঞ্জাবি টান। টেনে টেনে হিন্দি ইংৰেজি বলেন। কথায় কথায় দাঢ়ি আৱ গোকে হাত কেসেন। প্ৰথম সাক্ষাতেই সুন্দৰ সৌম্য দয়াল সিংকে ভালো লাগে। খুবই অন্তৰঙ্গভাৱে বৃহস্পতি হয়। বলেন, তিনি কাজ চান। কথা বলতে বলতে পাঞ্জাবি মেজাজ ফুটে ওঠে। প্ৰশংসন আলাপচাৰিতায় তিনি আমাদেৱ গেৱলা যুদ্ধেৱ ধৰনটা বোঝাৰ চেষ্টা কৰেন। রিপোর্ট নেন। নেন অন্ত-গোলাবাৰুলদেৱ হিসাব। আমাদেৱ অবস্থান অৰ্থাৎ হাইড আউট সংজ্ৰে ব্যব নেন। শেষে বলেন, তুমহাৱা নেৱৰুট প্ৰোগ্ৰাম কেয়া হ্যায়! তাকে ইমপ্ৰেস কৰাৰ জন্য বলে ফেলি, হামনে সুইসাইড কোয়াড ভেজনে চাহতে হ্যায়।

- সুইসাইড কোয়াড! কাহা?
- পঞ্চগড়, তালমা আওৱ জগদলহাট।
- ইজ ইট পসিবল?
- ইয়েস।

ক্যান্টেন কিছুক্ষণ আমাদেৱ মুখেৱ দিকে তাকিয়ে থাকেন। তাৰপৰ বলেন, ইয়েস তুমনে জৱন্ম ভেজোগে। ইট গো এন্ড কিল দেম। দে আৱ কিলিং ইয়োৱ পিপ্ল ক্ৰটালি। উই আৱ উইথ ইট।

বেশন, গোলাবাৰুদ আৱ আনুষঙ্গিক জিনিসপত্ৰ নামিয়ে দিয়ে দয়াল সিং চলে যান। আমৰা পাকা সড়কেৱ ওপৰ দাঢ়িয়ে থাকি। বি.ও.পি.ৱ সামনে রাস্তাৰ বালে বুড়ো সুবেদাৰ আবাৰ ছিপ ফেলেন।

হাড় জিৱজিৱে ৮/১০টা ছাগল, চাল-ডাল-তেল-আটা-ময়দা আৱ সবজি ইত্যাদিৰ বোঝাৰ পাশাপাশি গোলাগুলিৰ বাকু ছেলেদেৱ মাথায় তুলে দিয়ে রওনা হই হাইড আউটেৱ দিকে।

হাইড আউটে ফিরতেই শুটি শুটি পায়ে এগিয়ে আসে হাফেজ। বলে, ওস্তাদ একটা

কথা কহিবা চাহিছু ।

— বল বলে ওর মুখের দিকে তাকাই ।

— দুই দিন ছুটি লাগিবে ।

— কোথায় যাবি?

— কোটগোছ যাম ভজনপুর হয়ে ।

হঠাতে করে মনের মধ্যে সেই মরালির গ্রীবা নিয়ে পরীর মতো উড়ে যাওয়া মেরেটির মুখ তেসে ওঠে । বলি, ঠিক আছে যা তবে ওদের খবর নিয়ে আসিস । কোনো অসুবিধে থাকলে জেনে আসিস ।

— ঠিক আছে বলে হাফেজ মিয়া ঝুশি মনে চলে যায় ।

যুদ্ধের মাঠ থেকে ছুটি পাবার ব্যাপারটা অসম্ভব আনন্দায়ক । যারা ছুটি নিয়ে যায়, তাদের চেহারার মধ্যে তেসে ওঠে সেই আনন্দের প্রতিচ্ছবি । সীমান্ত এলাকা থেকে যারা যুদ্ধ করতে এসেছে, ইদানীং তাদের মধ্যে অনেকেই ছুটি চায় । সবাইকে তো আর একসাথে ছুটি দেয়া যায় না । চাউলহাটি ইউনিট বেসের ক্ষিয়ারেল ছাড়া ছুটি দেয়া নিষিদ্ধ । এছাড়া অফিসাররা ছেলেদের সহজে ছুটি দিতে চান না । ছুটি চাইলেই নানা রকমের সন্দেহ করে বসেন । সব থেকে বড় সন্দেহ যেটা সেটা হলো, এরা ছুটিতে বাড়ি গিয়ে পাকবাহিনীর সাথে যোগাযোগ করে কি না । এদিকের খবর দখলদার বাহিনীজুড়ে জানাতে স্পাইং করে কি না । অফিসারদের দোষ দিয়ে লাভ নেই । এ ধরনের কিছু ঘূর্ণনা ইতিমধ্যেই ঘটেছে । বেশকিছু ছেলে ছুটিতে বাড়ি চলে গেছে, আর ফেরে নি । এজন্য ছুটি প্রায় বন্ধ । কিন্তু মাঠ থেকে প্রতি সপ্তাহে ২/৪ জনকে ছুটি দিতেই হয় নিজের স্টেশনায়তে । যদিও এতে প্রচুর ঝুঁকি থাকে । ছুটিতে যাওয়া ছেলেদের কোনোরকম দৃঢ়ত্ব ঘটতে পারে । বাড়িতে গিয়ে ধরা পড়ে যেতে পারে পাকবাহিনী, রাজাকার বা তাদের প্রচুরদের হাতে । কিন্তু যুদ্ধের তারপরও কিছু করার নেই । রণাঙ্গনে যুদ্ধ পরিচালনার ক্ষেত্রে কমান্ডারদের কিছুটা স্বাতন্ত্র্য আর স্বাধীনতা ভোগ করতেই হয় । তা না হলে এ ধরনের জনযুক্তে ছেলেদের ধরে রাখা মুশকিল হয়ে দাঁড়াবে ।

পাকা সড়ক দখলের লড়াই

রাতটা যায় পেট্রেল আর রেকি করে । ভেতরগড়-সোনারবান ও জগদলের কাছাকাছি এলাকা পর্যন্ত রেকি করা হয় । মতির কাছ থেকে খবর পাওয়া যায়, পাকবাহিনীর একটা দল চৈতনপাড়ায় স্থায়ী ঘাঁটি স্থাপনের পাইয়াতারা করছে । গতকাল থেকে তারা নিয়মিত সেখানে আসছে । পঞ্জগড় চিনিকল থেকে ইঞ্জিনিয়ার -মিস্ট্রি রড-সিমেন্ট এনে চৈতনপাড়া বিজ মেরামত করে কোনো রকমে তারা সেটাকে চলাচল উপযোগী করে তুলেছে । অমরখানা-পঞ্জগড় পাকা সড়কের ওপরকার এই বিজিটি তারা যেভাবেই হোক রক্ষা করার চেষ্টা করবে । অমরখানা পাক ঘাঁটির একমাত্র যোগাযোগ ঝুটটি তারা নষ্ট করতে দেবে না । নষ্ট হলে তাদের পক্ষে সেখানে টিকে থাকাই কষ্টকর হয়ে উঠবে ।

অতএব আমাদের সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে, রাতে চৈতনপাড়ায় পাকবাহিনীর নতুন অবস্থানের ওপর হামলা চালানো । কোনো অবস্থাতেই তাদের সেখানে স্থায়ী ঘাঁটি করতে দেয়া হবে না । নালাগঞ্জ হাইড আউট থেকে এ অপারেশন চালানো হবে । আমাদের লক্ষ্যবস্তু প্রায় ৮/১০ মাইলের ব্যবধানে হলেও রাতের ভেতরেই হামলা করে ফিরে আসতে হবে । অপারেশন

পরিকল্পনা করা হয়। এজন্য গঠন করা হয় শক্ত একটা দল। ১১ জন রাইফেলধারী, দুটি অটোমেটিক রাইফেল, ১টি এস.এল.আর ২ ইঞ্জিং মৰ্টার এবং স্টেনগান ২টি। প্রত্যেকের সাথে থাকবে প্রচুর গোলাগুলি আর ছেনেড থাকবে দুটো করে। পিন্টু-মুসাসহ মূল কমান্ডার সবাই অংশ নেবে আজকের অপারেশনে। মিনহাজ থাকবে হাইড আউটের দায়িত্বে।

সক্ষ্যার অক্কার নামতেই হাইড আউট ছাড়া হয়। সোনারবান পৌছুতে রাত প্রায় নটা বেজে যায়। ভজর নিজের হাতে তৈরি করে চা খাওয়ান। স্থানীয় খবরাখবর দেন। সত্যিই অসঙ্গে শক্ত মনোবলের অধিকারী এই মাওলানা সাহেব। না হলে এই বৈরী পরিবেশে টিকে আছেন কী করে? নিজের দেশের বাড়ি ফরিদপুরের কোনো খবর তিনি পান না। তার পরিবার-পরিজন কেমন আছে, তাও তিনি জানেন না। এখন এই এলাকার ভীত আর ভেঙে-পড়া মানুষজনদের নিয়েই তিনি গড়ে তুলেছেন নিজের এক চমৎকার সংসার। তার ছির বিশ্বাস, জয়বাংলা একদিন হবেই।

রাত দেড়টার দিকে আঘাত হানা হয় চৈতনপাড়ার উপর। মতির দোষ্ট খবর দিয়েছে, প্রায় ২০ জন পাক আর্মি অবস্থান নিয়েছে চৈতনপাড়া বিজে। লাল স্কুলের কাছাকাছি অবস্থান থেকে একযোগে সবার অস্ত থেকে গুলিবর্ষণ শুরু হয় চৈতনপাড়া বিজ লক্ষ্য করে। শক্তপক্ষ প্রথম কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকে। সম্ভবত তাদের অবস্থান সুসংহত করার সুযোগ নেয় আক্রমণের প্রাথমিক ধার্কা সামলে পেটে। তারপর শুরু হয়েছে তাদের তবক থেকে প্রচণ্ড প্রতি-আক্রমণ। যুদ্ধের মাঠে আগে থেকে অবস্থান নেয়া বাহিনীর সুবিধা আক্রমণকারী বাহিনীর থেকে অনেক বেশি। আক্রমণকারী বাহিনীর অবস্থান হয়ে থাকে অনেকটা ভাসমান ধরনের, মজবুত থাকে না তার ভিত্তি। আর অবস্থানে পাক-বাহিনী নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য মরিয়া হয়ে লড়ে। এ ক্ষেত্রে তাহেক্ষণ্য-বাঁচার প্রশ়ৃতাই বড়োভাবে কাজ করে। অবস্থান ধরে রাখতে না পারলে আক্রমণকারী বাহিনী তাদের ঘিরে ফেলবে চারদিক থেকে। ফলে তাদের মৃত্যু অবধারিত। এই স্থিতিনা আর মানসিকতা থেকেই তারা শেষ পর্যন্ত লড়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু আক্রমণকারী বাহিনীর এ মানসিকতা থাকে না। বটিকা আক্রমণ করে অবস্থানে থাকা শক্ত বাহিনীকে তারা যদি তুলতে না পারে, তাহলে যুক্তি হয়ে পড়ে প্রলম্বিত এবং এ ক্ষেত্রে আক্রমণকারী বাহিনী অনেক সহজ ফিরেও আসে।

চৈতনপাড়া পাকা সড়কের ওপারে সুসংহত অবস্থান থেকে পাকবাহিনী পাল্টা আক্রমণ শুরু করে। তাদের অবস্থান সুবিধাজনক জায়গায়। রাস্তার উচুমতো জায়গা থেকে সরাসরি তারা গুলি চালাতে পারছে আমাদের দিকে। একসাথে তাদের স্বয়ংক্রিয় হাতিয়ারগুলো গর্জে গর্জে উঠছে। গুলির তুকন ছুঁটে চারদিকে। এই পরিস্থিতির মুখে গুলির জবাব গুলিতে দেয়া ছাড়া উপায় নেই। আমাদের মূল আক্রমণ চালানো হচ্ছে বাম দিক লক্ষ্য করে। ডানদিকের কাঁচা রাস্তার দু'পাশের অবস্থান থেকে অটো রাইফেল বা এল.এম.জি দিয়ে আর একটা আক্রমণ চালাচ্ছে মোতালেব, অন্যটা একরামুল। তাদের দু'পাশে এবং মাঝখানে অবস্থান নিয়ে রাইফেলধারী ছেলেরা একটার পর একটা গুলি ছুঁড়ে এবং জায়গার পরিবর্তন করছে। মোতালেব আর একরামুল সরে যাচ্ছে ঘন ঘন তাদের অবস্থান থেকে। এস.এল.আর. রয়েছে শুরু কাছে। মাঝামাঝি অবস্থান থেকে সে তার হাতিয়ারের সাহায্যে অবরাম গুলি চালাচ্ছে। পিন্টু তার পেছনে ২ ইঞ্জিং মৰ্টার নিয়ে। আক্রমণের শুরুতে সে একটা মৰ্টারের শেল ছাঁড়েছে। তারপর চুপচাপ। সম্ভবত যুদ্ধের পরিস্থিতি বুঝবার চেষ্টা করছে। উভয় পক্ষ থেকেই প্রচণ্ড

গোলাগুলি ছোঁড়ার পাশাপাশি তরু হয়েছে কামানের গোলা ছোঁড়ার ভুমূল প্রতিযোগিতা। ভারতীয় দিক থেকেও মর্টার আর কামানের গোলা ছুটে আসছে। মাথার ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে জগদলহাট-পঞ্চগড়ের দিকে। একইভাবে পঞ্চগড়ের দিক থেকেও উড়ে আসছে মর্টার আর কামানের গোলা। আর সেগুলো ভারতীয় সীমান্ত অতিক্রম করে সোজা শিয়ে পড়ছে মাটির ওপরে। প্রচণ্ড শব্দের তরঙ্গ তুলে বিস্ফোরিত হচ্ছে সেগুলো। আর এরি ভেতরে ধীরে ধীরে এগুচ্ছি আমরা। শক্রবাহিনী আগের মতোই এখনো মাটি কামড়ে পড়ে থেকে বাড়ের বেগে তাদের প্রতি-আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে। মাথা তুলবার উপায় নেই। একটুখালি দাঁড়িয়ে নিজেদের অবস্থান বুবাবার উপায় নেই। অগ্নিবাণ নির্যাত বীৰুৱা করে দেবে শরীর।

এই অবস্থায় পেছন থেকে তুলে আনি একাব্বর আর মালেককে। দুঁজনের কানে ফিসফিসিয়ে বলি লাল কুল পার হয়ে রাস্তার ওপর ঝেনেড ছুঁড়তে। নির্দেশ পাওয়ামাত্র ওরা এগিয়ে যায় শুই সাপের ভঙ্গিতে। ওদের মাথার ওপর দিয়ে স্টেনগানের ব্রাশ আর এস.এল.আর.-এর কভার ফায়ার চলতে থাকে। মিনিট দশকের ভেতরে রাস্তার ওপর দুটো ঝেনেড বিস্ফোরিত হয় আগন্তনের বলক তুলে। পেছন থেকে উড়ে আসে তখনি পিন্টুর ২ ইঞ্জিং মর্টারের গোলা। সবাইকে 'ফায়ার এন্ড মুভ' অর্থাৎ 'গুলি চালাও এবং এগিয়ে যাও' এই ভঙ্গিতে এগুবার নির্দেশ দিই। নির্দেশ অনুসারে স্ব-স্ব অবস্থান থেকে এগুতে থাকে সবাই। ঘন কালো রাত। শরীরের নিচে ভেজা ঘাস। বাতানে স্তুর্কদের গন্ধ। নিশানাবিহীন গোলাগুলির ছোটাছুটি। এরি ভেতর দিয়ে এগুতে থাক্কে সবাই। মনের মধ্যে তখন অন্য কোনোরকম ভাবনা আর কাজ করে না। শুধু একটুকুলক্ষ্য, পাকা সড়ক। লাল কুল পার হয়ে দ্রুত পাকা সড়কে পৌছে যাই। পৌছেই ক্লো সড়কের পাশের অবস্থান থেকে ব্রিজের দিক লক্ষ্য করে আক্রমণ শুরু হয়। পাককান্ডার বুকে উঠবার আগেই ব্যাপারটা ঘটে যায়। ফলে দিশেহারা হয়ে তারা অবস্থান ছেড়ে দিয়ে পেছনে সরে যেতে থাকে দ্রুত। রাতের বেলা পলায়নপর শক্রবাহিনীকে আক্রমণ করা বা ধরে ফেলা কঠকর। তবুও রাস্তার দখল নিয়ে আমরা এগিয়ে যাই ব্রিজের দিকে। ব্রিজ দখলে এসে যায় আমাদের। দেখতে পাই, রাস্তার পাশে খোলা টেক্স ৩/৪টা। নতুন কোনো বাক্সার তারা তৈরি করতে পারে নি।

এখন আর আমাদের করণীয় কিছু নেই। লক্ষ্য ছিলো পাকা সড়ক, ব্রিজ দখল করা এবং শক্রবাহিনীকে বিভাড়িত করা, সেটা সফল হয়েছে। তবে এখানে আর বেশিক্ষণ থাকা যাবে না। গুলিগোলার মজুদ কমে গেছে একেবারে। পাকবাহিনী নতুন উদ্যমে হামলা চালালে এখন আর টিকে থাকা সম্ভব হবে না। সুতরাং সিঙ্কান্ত নিই রিট্রিট অর্থাৎ পিছিয়ে যাবার।

এবার দ্রুত পিছিয়ে যাবার পালা। পিন্টু অধীন আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষমান রাস্তার মোড়ের বাঁশতলায় তার মর্টার বাহিনী নিয়ে। ওদের সাথে মিলিত হয়ে কিছুক্ষণের জন্য বিশ্রাম নিই। মুসাকে মাথা শুন্তির কাজে লাগিয়ে দিই। হ্যা, সবাই ফিরেছে অক্ষত অবস্থায়। শেষ রাতের ভিজে ঘাস আর কাদাপাঁকে একাকার পথ মাড়িয়ে হাইড আউটের দিকে এবার ক্লান্ত বিধ্বন্ত শরীরগুলোকে টেনে নিয়ে যাবার পালা। আজকের মুদ্রের সফল সমাপ্তি এবং ফিরে আসার এই পর্বে একটা কথাই বারবার মনে হয়, আসলে সাহসটাই হচ্ছে বড় কথা। এই সামান্য হাতিয়ার আর অপেশাদার ছেলেদের নিয়ে জাত সৈনিক পাকবাহিনীকে মোকাবেলা করে, তাদের অবস্থান কেড়ে নেয়ার ঘটনা মাঝুলি ব্যাপার নয়। কেবল সাহস আর মনোবল আমাদের নিয়ে গেছে তাদের অবস্থান পর্যন্ত। আর মনের দিক থেকে হীন দুর্বলচিত্তের

পেশাদার সৈনিকেরা এতে করে কাবু হয়ে তাদের অবস্থান ছেড়ে পালিয়ে গেছে। হয়তো একদিন তারা একইভাবে এদেশটা ছেড়েও পালিয়ে যাবে। কবে আসবে সেইদিন, কে জানে?

১.৯.৭১—২.৯.৭১

ইন্দিরা গান্ধীকা পাস যায়গা

ক্যাটেন দয়াল সিং মহাগরম। তুমনে কেয়া কিয়া? হাউ মেনি পাক আর্মিজ ইউ হ্যাড কিল্ড? হাউ মেনি হাতিয়ার তুমনে ক্যাপচার কিয়া? খান লোগকো পাকড়ানে কিউ নেহি স্যাকা? বোলতা হ্যায় সুইসাইড ক্লোয়াড ভেজেগা, কাঁহা তুমহারা সুইসাইড ক্লোয়াড? দেখা হওয়ার সাথে সাথে কুশল বিনিময়, খৌজখবর নেয়া, তখন পর্যন্ত সুষ্ঠু স্বাভাবিক, হাসিখুশি ছিলেন, কিন্তু যতো রকমের গোল বাঁধে লড়াইয়ের রিপোর্ট দেবার সময়। দয়াল সিং একবারে তেলেবেগুনে যেনো জুলে ওঠেন। তার পাঞ্জাবি রঙ টগবগিয়ে ফুটে ওঠে। ক্ষেপে গিয়ে একাধারে গালাগালি দিয়ে চলেন। গত রাতের এতো বড় অপারেশন পরিচালনা, প্রচও ঝুঁকির মধ্যে জীবনবাজি রেখে শব্দের অবস্থানের ওপর হামলা করে তাদের ঘাঁটি কেড়ে নিয়ে সেখান থেকে তাদের তাড়িয়ে দেয়া, ৮/১০ মাইল রাস্তা হেঁটে গিয়ে অপারেশন শেষে সবাইকে অক্ষত অবস্থায় সাথে নিয়ে আবার ফিরে আসা, সারা রাত জেগে থাকা, প্রচও উজ্জেব্জনন প্রেরণ করা, এগুলোর যেনো কোনো মূল্য নেই। এই এখন ক্যাটেনের কথা শনে মনে হচ্ছে আমরা যেনো কিছুই করি নি। গতকাল চৈতনপাড়া পাকা সড়কে শক্তির অবস্থানে গিয়ে যেনো কেবল পিকনিক করে এসেছি। যেখানে দিনরাত টেলপুল সার টানটান নার্ত নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে পদচারণা করতে হচ্ছে, নিয়মিত যেখানে শক্তিবাহনীর স্থাথে মোকাবেলা করে একটা অসম যুদ্ধের মধ্যে নিজেদের টিকিয়ে রাখতে হচ্ছে, যুম মেইঁ বিআম নেই, আরাম-আয়েশ নেই, ভালো খাওয়া-দাওয়া নেই, যেখানে আঞ্চলিক প্রাপনজন বিবর্জিত এক অচেনা প্রতিকূল পরিবেশে দিনরাত যুদ্ধ, গোলাবারদ, রঙ আর মৃত্যুর ভেতরে বসবাস, ফাঁকি নেই কোথাও, এতটুকু আন্তরিকতা আর বিশ্বস্ততার অভাব নেই, সেখানে অফিসারের এহেন আচরণে মনটা সত্যিই বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। মনে মনে বলি, দয়াল সিং তুমি তো নিরাপদ দূরত্বে বসে যুদ্ধ পরিচালনা করছো, তুমি একজন ভিন্নদেশী, তোমার জানা নেই অধিকৃত বাংলাদেশের ভেতরের প্রকৃত অবস্থাটা। জানা নেই তোমার, সেটা কত ভয়াবহ আর নিষ্ঠুর!

ক্যাটেন তখনো বলে চলেছেন, তুম যুদ্ধ নেহি করতা, তুম স্বেফ যুদ্ধতা হ্যায় ফিরতা হ্যায় আওর বগোয়াস করতা হ্যায়, শালে লোগ জয়বাংলা করে গা...?

এবার মাথায় আগুন চড়ে যায়। ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যায়। পিন্টুর দিকে আড় চোখে ঢেয়ে দেখি সেও রাগে ধৰথেরিয়ে কাঁপছে। চোখ তার বড় বড় আর লাল হয়ে উঠেছে, হাত মুটিবেদ্ধ। কী হয়, বসা থেকে ঝট করে উঠে দাঁড়িয়ে পড়ি ক্যাটেনের শেষ করার মুখে, কেয়া বোলা আপনে, কেয়া বোলা! ইউ উইথ ড্র ইউর কমেন্টস বলে টেবিলের ওপর চাপট মারি প্রায় চিৎকার করে। নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখা দায় হয়ে পড়ে। সমস্ত রঙ যেনো মাথায় উঠে গেছে। আমার সাথে সাথে পিন্টুও চেঁচিয়ে ওঠে, ইয়েস উইথ ড্র করনে হোগা আপ কো বাত। নেহি তো হাম লোগ চলা যায়গা। উইশ্যাল নট গিড এনি রিপোর্ট টু ইউ। হামলোক ব্রিডেডিয়ার জেশিকা পাস যায়গা, জেনারেল ওসমানি কা পাস যায়গা, তাজউদ্দীন

কপাস যায়গা, আপকা প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকা পাস যায়গা...। পিন্টুর থামাখামি নেই। যেনো হিতাহিত জানশূন্য হয়ে পড়েছে। কথা বলছে আর ছুঁড়ে চলেছে মৃষ্টিবদ্ধ হাত ক্যাষ্টেনের সামনে। সে হয়তো যেতে যেতে ইন্দিরা গান্ধীকে ছাড়িয়ে আরো অনেক দূর যেত। সেই অবস্থায় নেপালি সুবেদার দৌড়ে এসে ওকে জড়িয়ে ধরেন। আমাদের সশ্রদ্ধ কথাবার্তা তনে অন্য আরো বি.এস.এফ সদস্যরাও কাজ ফেলে ছুটে এসেছে। বাইরে দাঢ়ানো একরামুল তার রেশনবাহী বাহিনী নিয়ে বি.ও.পি.র তেতরে চুকে পড়েছে। পিন্টুর অবস্থা দেখে আমি নিজেকে সংহ্যত করে ফেলি কঠ করে। কিন্তু পিন্টু তখনও বলে চলেছে, নেহি আজ হাম নেহি রোখেগা, ক্যাষ্টেন সাব হাম সবকো আজ অপমান কিয়া হ্যায়।

ক্যাষ্টেন দয়াল সিং একজন শিখ যুবক। সেনাবাহিনীর চাকরির জীবনে তার খুব বেশি দিনের নয়। তিনি তার এই চাকরির জীবনে তার অধস্তুন সৈনিকদের যেভাবে গালিগালাজ করে এসেছেন, যে রকম আচার-আচরণ এতোদিনে তিনি পেশাগত জীবনে রঙ করেছেন, মুক্তিযোদ্ধাদের ক্ষেত্রেও সেই একই রকম কিছু প্রয়োগ করতে গিয়ে এখন দারুণ বেকায়দায় পড়ে গেছেন। নেপালি সুবেদার পিন্টুকে সামাল দিতে দিতে ক্যাষ্টেনের দিকে চেয়ে রাগত হুরে বলেন, সাব আব নয়া আয়া হ্যায়। আপ কুছ নেহি জানতা ইন লাড়কে কো বাঢ়ে মে। হাম জানতা। ইয়ে লাড়কে লোক দিনরাত জানবাজি রাখকার লড়াই লড় রাহে হ্যায়, হ্যাম সব কুছ দেখতে হ্যায় আর বোল সাকতা, ইয়ে লাড়কে সুর্ভুত্বে হ্যায়, হিরো। আপ কেয়া বোলা সাব, আপ কুছ নেহি জানতা...।

দয়াল সিং একবারে ভ্যাবাচ্যাক খেয়ে গেছেন। এক্ষম পরিস্থিতির উন্নত হবে, তিনি সেটা ভাবতে পারেন নি। সেই সাথে, তার মনের প্রত্যেক কিছুটা ভয়ও চুকে গেছে। একটা অপেশাদার গেরিলা দলকে তিনি পরিচালনাপ্রক্রিয়ার দায়িত্বে রয়েছেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা নিয়ে বিস্ময়াপী দারুণ হৈচে সৃষ্টি হয়েছে রাজনৈতিকভাবে এই ইস্যুটাকে ভারত সরকার বিশ্বের দরবারে তুলে ধরবার চেষ্টা করছে। আর সেই সাথে মুক্তিযোদ্ধাদের দিয়ে গেরিলা যুদ্ধ চালিয়ে দখলদার পাকবাহিনীকে মুক্তি আর ব্যতিব্যন্ত করে রাখবার স্ট্র্যাটেজি নিয়েছে। তারই সূত্র ধরে ক্যাষ্টেন দয়াল সিং চাউলহাটি ইউনিট বেসের মুক্তিযোদ্ধাদের অফিসার হিসেবে দায়িত্বভাগ গ্রহণ করেছেন। রাজনৈতিকভাবে সৃষ্টি মুক্তিযোদ্ধাদের বিষয়টি অবশ্যই নাজুক ধরনের। রাজনৈতিক সূত্র ধরে মুক্তিযোদ্ধারা অনেক উচু ঘরে চলে যেতে পারে, এই বিষয়টাও হয়তো তার মনে কাজ করে থাকবে। তাই স্বাভাবিকভাবেই তিনি একটা আপস মীমাংসায় দ্রুত পৌছতে চান। চেয়ার ছেড়ে এগিয়ে এসে তিনি পিন্টুর হাত জড়িয়ে ধরে বলেন, আরে ইয়ার ম্যায়তো জোক কিয়া, ডোন্ট মাইভ। ফরগেট ইট। আই এ্যাম সরি। একইভাবে তিনি আমার সাথেও হাত মেলান। জোর করে ধরে আমাদের বসিয়ে দিয়ে নিজে পিয়ে তাঁর আসনে বসেন। এবার মুখে তার আপসের হাসি। এই ফাঁকে সুবেদার দাদু তখন চা আর সাথে চমৎকার মচমচে বেসনের তৈরি পিয়াজি নিয়ে ঢোকেন। নেপালি সুবেদারের মুখ জোড়া হাসি। বৃক্ষ ভদ্রলোকের ভালোবাসার হনদয়টা যেনো তার সারা অন্তর ঝুঁড়ে বসে আছে। এই এখন পৃথিবীর সবচাইতে নিকটতম মানুষ তিনি আমাদের।

এরপর সবকিছু কোনোরকম ঝামেলা ছাড়াই ভালোভাবে মিটে যায়। ক্যাষ্টেনের সাথে সম্পর্ক সহজ আর স্বাভাবিক হয়ে আসে। তিনি শুভ উইশ জানিয়ে চলে যান।

পিছট ফরম কুমানিয়া

তার চলে যাবার পর পাকা সড়কের ওপর দাঁড়িয়ে পিন্টু বলে ওঠে, যাই কল মাহবুব ভাই, শালা সব খানদের চরিত্রই এক। এরা যা বুবাবে, তা দিয়ে তাবে বাইরের দুনিয়ায় আর কিছু নেই। আমি ওর কথা কিছুটা শুধরে দিই। বলি, পিন্টু, দয়াল সিং কিন্তু খান নয়, পাঞ্জাবি।

—ঐ হলো, খান আর পাঞ্জাবি-বেলুচি সব এখন আমাদের কাছে এক। ব্যাটা বলে কি, পাকার কে কিউ নেহি লায়া? আরে এটা কি ইয়ারবাজি নাকি যে, পাকিস্তানি সেনাদের যেয়ে বললাম, এই যে, ভাইয়েরা আপনেরা পশ্চিম পাঞ্জাব থাকি আইসছেল, আপনাদের সোন্ত পূর্ব পাঞ্জাবের দয়াল সিং গড়ালবাড়ি বি.ও.পি.তে আসি বসি আছেন আপনাদের দেখা কইবাবে বলিয়া।

পিন্টুর ডায়লগ অনে হো হো করে হেসে ওঠে সবাই। পরিবেশটা আবার নির্মল হয়ে ওঠে। সকলকে নিয়ে ফিরে চলি হাইড আউটোর দিকে।

রাতে পানিমাছ-বিসমনি-পঞ্চগড় রাস্তায় ২টি এ্যান্টি ট্যাঙ্ক মাইন এবং ৪টি এ্যান্টি পারসোনেল মাইন সুচারুভাবে ক্যামোফেজ করে পুঁতে রাখা হয় একটা ছোট বাশের কালভার্টের দু'পাশে। এ রাস্তায় প্রায়ই পাকসেনারা রাজাকারদের সামনে রেখে দলবল নিয়ে টহলে বের হয়। এবার এদিকে এলে মাইনের ফাঁদে তাদের পড়তেই হবে।

গনি ভাই আবার এসেছেন। এবার এসেছেন ৯৫ টিন মাছ নিয়ে। কুমানিয়ার তৈরি সামুদ্রিক মাছ। টিনজাত করা। টিনের গায়ে লেখা, পিছটি ফ্রম কুমানিয়া। বেলতলা গোলজারদার বাড়িতে উঠেছেন তিনি। শোলাম গড়সের সঁথির বাধানোর কাজ শেষ হয়ে নি। দু'দিনের জন্য কুচবিহার গিয়ে আবার ফিরে এসেছেন। সাথে নিয়ে এসেছেন মুক্তিযোদ্ধা ছেলেদের জন্য তার প্রথম ভালোবাসার উপন্টেন্স ভালো লাগে গনি ভাইয়ের ভালোবাসার উপহার গ্রহণ করতে। নৃঙ্গদিন আর রাতেক দু'জন কামলার সাহায্যে বহন করে এনেছে মাছের টিনগুলো। ১০/১৫টা টিন ক্ষেত্রে কাছে দিয়ে দিই গোলজারদা আর বেলতলার শরণার্থী পরিবারদের জন্য। ওদের ক্ষেত্র থেকে আরো জানা যায়, গনি ভাই প্রতিটা ছেলের জন্য জামা-গেঞ্জি আর লুঙ্গির ব্যবস্থা করেছেন। পরের ট্রিপে আসছে সেগুলো। ভালো। গনি ভাই তা হলে প্রবাসী নেতাদের বোঝাতে পেরেছেন যুদ্ধরত ছেলেদের দুরবস্থার কথা।

গনি ভাইয়ের সাথে দেখা করবার তাগিদ থাকলেও যেতে পারি না। পিন্টুকে পাঠিয়ে দিই। রাতের বেলা তালমা অপারেশনে ব্যস্ত থাকতে হয়। মধ্য রাতে তালমা ত্রিজে নিয়োজিত পাকবাহিনীর সাথে প্রচণ্ড গুলিবিনিয়ন চলে এক ঘটা ধরে। পঞ্চগড় থেকে মোটরগাড়িতে করে দ্রুত রিইনফর্মেন্ট আসে তালমা ত্রিজ রক্ষকারী বাহিনীকে সাহায্য করার জন্য। তারা এপারে এসে ডেতরগড়ের দিকে আসতে পারে মনে করে রাস্তার দু'পাশে গ্রামবুশ লাগিয়ে বসে থাকি শেষ রাত পর্যন্ত। কিন্তু ওরা আসে না। শেষ পর্যন্ত আমরা চলে আসি। সর্দরপাড়ার কাছাকাছি আসতেই ভোরের আকাশ কর্ণা হয়ে যায়। উত্তরে জেগে ওঠে হিমালয়। কী মহিমাভিত্তি তার রূপ! এই মাটি, এই আকাশ আর মাথার ওপর হিমালয় সব কেমন যেনো আপন হয়ে গেছে এই কদিনের জীবনে!

৩.৯.৭১— ৪.৯.৭১

অপারেশন তালমা

অপারেশন তালমা আজ রাতের মিশন। আমাদের এই অপারেশনের মূল লক্ষ্য পাকবাহিনীর পানিমাছ ধাঁটিকে পঞ্চগড় ও তালমার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা। এজন্য তালমা ত্রিজের

২০০ গজ সামনে পানিমাছ-হাড়িভাসা জেলা বোর্ডের রাস্তার ওপর ১৫ ফুট স্প্যানের কালভার্ট উড়িয়ে দেয়া হবে। রাস্তার ওপর বসানো হবে এ্যান্টি ট্যাঙ্ক ও এ্যান্টি পারসোনাল মাইন। কালভার্ট ওড়ানোর সংবাদ পেয়ে অবশ্যই পাকবাহিনীর সদস্যরা রাতের বেলাতেই ওই রাস্তা দিয়ে অসম হওয়ার চেষ্টা করবে। এ অবশ্যই তারা পেতে রাখা মাইনের ফাঁদে পড়তে বাধ্য। গাড়ি নিয়ে হড়মুড়িয়ে এলেই এ্যান্টি ট্যাঙ্ক মাইন গাড়িসহ তাদের উড়িয়ে নেবে। অপারেশন পরিকল্পনা অনুযায়ী মোট তিনটি দল গঠন করা হয়েছে। মূল দল আমার সাথে। টৌপুরীর নেতৃত্বে কট আপ দল। আর পিন্টুর নেতৃত্বে ঘর্টারসহ কভার বা সাপোর্ট দল। কালভার্ট ওড়ানোর জন্য প্রেসার চার্জ বানিয়ে নেয়া হয়েছে। এল.এম.জি, এস.এল.আর, রাইফেল, স্টেণগান ও বেয়েনেটসহ সবার কাছে দেয়া হয়েছে দুটি করে প্রেনেড। পর্যাণ গুলিগোলা দেয়া হয়েছে প্রতিটি অঙ্গের জন্য। তালমা ব্রিজে রয়েছে পাকবাহিনীর জোরদার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা। তাদের ঢোকের ওপরে সারতে হবে আজকের রাতের কাজ। প্রচণ্ড বাধার সম্মুখীন হতে হবে, কোনো সন্দেহ নেই। সে অনুযায়ী মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে বারবার ব্রিফিং-এর সময় বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে সবাইকে কার কি দায়িত্ব।

প্রায় ৯/১০ মাইলের পথ। সঙ্গ্যের খাওয়া-দাওয়ার পর কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে রাত ৯টার পর রঙ্গনা দিয়েছি আমরা। আজ দল গড়া মোট ৩০ জনকে নিয়ে। গাইড হিসেবে রয়েছে দুরু আর টেকা কম্বার। টেকার বাড়ি তালমার কাছাকাছি। যুক্তের স্মার্টেছিলো সে আনসার কম্বার। পরে পাকবাহিনীর সাথে যোগ দিয়ে রাজাকার কম্বার হাতেছিলো। তিন দিন আগে সে বাড়িতে এলে তাকে ধরে ফেলা হয় এবং হাইড আউটের আভ্যন্তর বাঁশের খুঁটির সাথে পিছমোড়া করে রেঁধে রাখা হয়। সিদ্ধান্ত ছিলো তাকে গুলি করে দেয়ে ফেলা হবে। কিন্তু বারবার করে তার ক্ষমা প্রার্থনা এবং মুক্তিবাহিনীর পক্ষে কাজ করবার জন্য সুযোগ দেয়ার কানুতিমিনতির পর তাকে মেরে ফেলবার সিদ্ধান্ত বাতিল করে আসে। তার কাছ থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতেই আজকের এই অপারেশনের পরিকল্পনা দাঢ় করানো হয়েছে। রাজাকার কম্বার হিসেবে সে এতোদিন তালমা ব্রিজ পাহারা দেন্তের কাজে নিযুক্ত ছিলো বলে দিনরাত পাকসনাদের সাথে থাকার ও মিশবার সুযোগ পেয়েছে। তার কাছ থেকে তাই বিস্তারিত খুটিনাটি তথ্য জানা গেছে তালমায় অবস্থানরত পাকবাহিনীর শক্তি, স্ট্র্যাটেজি আর তাদের গতিবিধি সম্পর্কে। যদিও একজন রাজাকার কম্বারকে এভাবে বিশ্বাস করার ভেতরে অনেক বিপদের ঝুঁকি রয়েছে, তবুও সেটা আমরা যখন নিয়ে ফেলেছি তখন আর পেছানো যাবে না। দেখা যাক না একটা ঝুঁকি নিয়েই। বেতের মতো শুকনো পাকানো শরীর টেকার, আজকের অপারেশনের মূল গাইড। সে আমাদের নিয়ে যাবে তালমায় অবস্থানরত পাকবাহিনীর প্রায় নাগালের ভেতরে। টেকা বারবার করে বলছিলো, যোক তুমহারা কয়টা ঘেনেড় দ্যান, মুই একলায় যায়ে হেনে উমহারলার বাক্সার উড়ায় দিম, সব গুলাক মারে আসিয়, শালারা মানুষ নহে। জানোয়ার, পিচাশ। টেকা হাঁটছে নীরবে। আমার পাশে পাশে। কাঁধের ওপরে একটা কোদাল রেখে। পঞ্চাশের ওপর বয়স। ভাবছি, শেষ পর্যন্ত তার ওপর নির্ভর করা যাবে কি না!

বোপবাড়, বনবাদাড়, ফসলের মাঠ আর খালপানি এগুলো পেরিয়ে টার্পেটের কাছাকাছি রাত ১২টার দিকে পৌছানো গেলো হাফিজাবাদ মোন্টফাদের বাড়ির সামনের মাঠে। এটা আমাদের শেষ জমায়েত স্থল। অঙ্ককার ছাওয়া জনবিরল গ্রাম। চারদিকে সুন্দর নিকৃষ্ণ কালো নিভৃতি রাত। কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিতে হয়, দীর্ঘ বস্তুর পথ একটানা হেঁটে এসে পরিশ্রান্ত হয়ে

পড়েছে সবাই। চার্জ-মাইনসহ হাতিয়ারপত্র সব পরীক্ষা করে নেয়া হয়। এরপর ছড়ান্ত ব্রিফিংয়ের পালা। আজকের রাতের অপারেশনের সাফল্য অনেকটা নির্ভর করবে চৌধুরীর কাটআপ এবং পিন্টুর সাপোর্ট দলের ওপর। আমাদের সময় দরকার প্রায় আধ ঘণ্টার মতো। এ সময়ের জন্য তুরা তালমা আর পানিমাছ পাক ঘাঁটি দুটোকে আটকে রাখবে। মূল অপারেশনে আমার সাথে থাকবে মুসা ও একরামুল। মোতালেব আর মধুসূন থাকবে তাদের এল.এম.জি. সেকশনসহ।

বিশ্বামের বিরতিশেষে সবাই উঠে দাঢ়ায়। শেষবারের মতো সবাইকে বুঝিয়ে দেয়া হয়। তাদের নিজের নিজের দায়িত্ব। এবার লক্ষ্যস্থলের দিকে এগিবার পালা। কিছুদূর এক সাথে এসে তিনটা দল ভাগ হয়ে যাই আমরা। পিন্টুর মার্টের বাহিনী এগিয়ে যায় সোজাসুজি হাঁটাপথ ধরে। চৌধুরী বাঁ দিককার আলপথ ধরে এগিয়ে যায়। টেকা আমাদের নিয়ে নেমে পড়ে হাঁটু সমান ভূসভূসে কাদাগাঁকে ভরা পাটখেতের ভেতরে। পাটখেত পার হবার পর একটা ধানখেত। আবার পাটখেত। এরপর কোমর পর্যন্ত ডোবানো একটা জলাভূমি। চেষ্টা করেও কাদাগাঁনি আর খেত ধরে হাঁটবার শব্দ দেকে রাখা যায় না। তবুও সন্তর্পণে যতদূর সম্ভব কম শব্দ তুলে হাঁটবার চেষ্টা করতে হয়। সবাইকে বারবার সতর্ক করে দিতে হয়। ওইভাবে হাঁটতে হাঁটতে এক জায়গায় এসে টেকা দাঁড়িয়ে পড়ে। বলে, এ যে সামনের পাটখেত। এটা পার হইলেই খাল। খালটার পানি পার হবার পারিলেই হামরা সড়কেত উত্তীর্ণ, পারিমো এ্যাক্যোবারে ব্রিজের কাছেত। টেকার কথায় ঝাঁকুনি খেতে হয়, একেবারে ব্রিজের কাছে তাও রাস্তার পাশের খালের পানি পেরিয়ে পানি বুক সমান হতে পারে, আবার স্থলী ডোবানো হতে পারে। পানির মধ্যে আমাদের চলমান ছায়া প্রতিফলিত হয়ে ব্রিজের পিন্টুর দাঁড়িয়ে থাকা শক্তির নজরে আসবে এবং এর ফলে শক্তপক্ষের বাঁক বাঁক ঘাতক রাস্তাটির নির্যম শিকার হওয়া ছাড়া আর আমাদের গত্যন্তর থাকবে না। এতোবড় ঝুঁকি নিছে শহের হাতের থাবায় পড়বার কোনো মানে হয় না। সবাইকে তাই থামতে বলি। মুসা এন্ডেস্যামুলের সাথে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নিই, ব্রিজের এতো কাছাকাছি রাস্তায় ওঠা চলবে না। অন্তত ৩০০ গজ দূরে হাড়িভাসার রাস্তায় উঠবো। টেকাকে বলি, কি টেকা পারবে না? জি পারিম নি কেনহে, পারিম। আসেন তা হইলে বলে টেকা এগোয়। আমরা পেছন থেকে তাকে অনুসরণ করি সর্বাঙ্গক সতর্কবস্থায়। উদ্যত হাতিয়ার হাতে। দেরি হয়ে যাচ্ছে। পিন্টু আর চৌধুরী হয়তো তাদের টার্মিনে কাছাকাছি পৌছে গেছে। দ্রুত এগুতে বলি সবাইকে।

অবশ্যে আমাদের ইলিস্ত জায়গায় পৌছানো গেলো প্রায় ২০ মিনিট পর। হাড়িভাসা-পঞ্চগড় জেলা বোর্ডের প্রায় ২০ ফুট চওড়া কাঁচা সড়ক। খালের বুক সমান পানি পেরিয়ে ভেজা সপসনে কাপড়চোপড়সহ রাস্তার ওপর উঠেই সরাসরি শোয়া অবস্থানে চলে যাই সবাই। কিছুক্ষণ চৃপ্তাপ তয়ে থেকে নিজেদের খাতঙ্গ করে নেবার চেষ্টা করি। রাস্তায় উঠবার সময় শক্ত টের পায় নি বোধ গেলো। বুৰাতে পারলে অবশ্যই শক্তির বাঁক বাঁক শুলি ছুটে আসতো আমাদের অভ্যর্থনা জানাতে। ডানদিকে কালভার্টের অবস্থান। কালভার্টের ওপারে একটা গাছ। টেকা অবস্থানটা দেখিয়ে দেয়। কালভার্টের অপর দিকে তালমা বিজ। ব্রিজটা দেখা যায় না। টেকা ফিসফিসিয়ে বলে, কালভার্টের ওপর পাহারা আছে। কান পাতি শনেন, মানুষের কথার শব্দ শনিবা পাবেন। আসলেও তাই। অস্ফুট কথার ধৰণি শোনা যায় রাতজাগা মানুষজনের। তার মানে কালভার্টের ওপর শক্তবাহিনীর অবস্থান রয়েছে। কালভার্ট উড়িয়ে

দিতে হলে আগে তার দখল নিতে হবে এবং দখল নিতে হলে লড়াইয়ে নামতে হবে শক্র।
সাথে। সামনে শক্ত বাধা। এ ছাড়া তো কোনো উপায় নেই। দেখা যাক কি হয়।

মুসা আর একরামুল দু'জন ছেলেকে নিয়ে কাজ শুরু করে দেয়। মালেক আর মশুর
ওদের দু'পাশে কভারে থাকে। মোতালেব আর মধুসূদন রাস্তার দু'পাশে এল.এম.জি. বসিয়ে
তালমা ব্রিজ এবং কালভার্টের দিকে ঝুঁক করে পঞ্জিশনে থাকে। অন্যরা সেইভাবে তাদের
হাতিয়ার নিয়ে পঞ্জিশন নেয়। এ্যান্টি ট্যাঙ্ক মাইন বসানোর জায়গা চিহ্নিত করে দিতেই মুসা
আর একরামুল মাটি খোঁড়ার কাজ শুরু করে দেয়। জনসাধারণের যাতায়াতের পথ। ব্রিটিশ
আমলের তৈরি। বুবই শক্ত মাটি। খুঁড়তে কষ্ট হতে থাকে। কোমরে বাধা বেয়নেট খুলে
নিয়ে সেটা মাটি খোঁড়ার কাজে লাগাতে হয়। দুটো এ্যান্টি ট্যাঙ্ক মাইন এবং ৪টা এ্যান্টি
পার্সেনেল মাইন বসাতে হবে। সাইজমতো শক্ত মাটি খুঁড়ে গর্ত করতে কষ্ট হচ্ছে। সময়ও
পেরিয়ে যাচ্ছে দ্রুত। আমাদের অপারেশনের নির্ধারিত সময় রাত একটা। টোকুরী আর
পিন্টুর দল এ সময়ই পরিকল্পনা অনুযায়ী তাদের শুলিবর্ণ শুরু করবে। ওরা শুরু করলেই
মৃল টার্গেটের ওপর আমাদের ঝাপিয়ে পড়ার কথা।

সবার ভেতরেই অস্ত্রিভাতা। দু'পাশে প্রায় হাতের নাগালের ভেতরেই শক্রের অবস্থান।
তাদের অশ্পষ্ট কথাবার্তা বাতাসে ভেসে আসছে। চাউলহাটি ইউনিট বেসের বাছাই করা
আর যুদ্ধে পোড়া-খাওয়া একোক অসীম সাহসী ছেলেসিয়ে কাজ করলেও সবারই
অবচেতনে কেমন যেনো ভয়। কাজ করতে করতে ত্রুটিমতো কাঁপছে সবাই। আমার
নিজের পিঠের শিরদাঁড়ার ভেতর দিয়েও বয়ে যাচ্ছে শিরশিরে হিমশীতল একটা অনুভূতির
স্মৃত। কাজ করতে করতে ওরা বলে উচ্ছ্বেষণ, এটা দে, ওটা আন্। ইইভাবে ওরা
পরিবেশটাকে প্রায় গোলমেলে করে ফেলেছে। বারবার আমি তাগিদ দিয়ে চলেছি, তাড়াতাড়ি
কর। হারিআপ, টপ টকিং। একদম ক্ষয় সহ্য। গোলমাল নয় ইত্যাদি।

টেকা কমান্ডার আমার পাশে পড়েয়া। সেও রীতিমতো কাঁপছে, ভয়ে আর আতঙ্কে।
পাকবাহিনীর সাথে এতেদিন প্রজাকার হিসেবে থাকবার অভিজ্ঞতা থেকে সে তাদের
নৃশংসতা আর নির্মমতার পরিচয় চাকুষ দেখে এসেছে। স্বাভাবিক কারণেই তার ভয়ে-
আতঙ্কে তাই ভৃত্যাস্তের মতো দশা। বারবার করে বলছে, ছার, তাড়াতাড়ি করেন। এখনই
উম্হার পেট্রল পার্টি আসিবার পারছে।

মুসা গড়িয়ে গড়িয়ে আমার পাশে আসে। ফিসফিসিয়ে বলে, ২টা এ্যান্টি ট্যাঙ্ক বসানো
হয়ে গেছে।

আমার হাতে এপি-১৪। সেটা মাটির নিচে ঢুকিয়ে মাটি চাপা দিতে দিতে বলি, তালো
করে ঢেকে দিয়েছিস?

— হ্যাঁ।

— চল দেখি।

হাতের কাজ শেষ করে উঠে দাঁড়াই। শক্রের গুলি আসবে না এই বিশ্বাস নিয়ে। এগিয়ে
গিয়ে দেখি ৫/৭ গজ দূরে মুসারা কাজ করছে। ওখানে পৌছে আর একটু এগুবার জন্য ডান
পা বাড়িয়েছি, অমনি বিদ্যুৎ গতিতে একরামুল হা-হা করে অস্কুট চিক্কার দিয়ে হামলে পড়ে
জায়গাটার ওপর। আমার বাড়ানো পা গিয়ে পড়ে ওর পিঠের ওপর। ওর বুকের নিচেই
মাইন। একরামুল বুক লাগিয়ে শুয়ে পড়ে বাঁচিয়ে দিল আমাকে। আমার বাড়ানো পা ঠিক

গিয়ে পড়তে যাচ্ছিলো মাইনের ওপর। একটা সাংঘাতিক কিছু ঘটতে যাচ্ছিলো একবারুল যদি মাইন আগলে না বসতো। বেঁচে গেলাম সামান্য একটুর জন্য। টেনে তুললাম ওকে। এখন আবেগ দেখানোর সময় নয়। মুখে শুধু বললাম, থ্যাক ইউ।

এরপর বুকে শয়ে প্রতিটা মাইন শ্পট পরীক্ষা করে দেখলাম। দেখলাম ক্যামোফ্লেজের কাজ ঠিকমতো হয় নি। দিনের বেলা শক্ত সহজেই ধরে ফেলবে। ভিজে মাটি সরিয়ে শুকনো ধূলোমাটি আনতে বললাম। অঙ্ককারে হাতড়ে হাতড়ে রাস্তার ওপর থেকে ধানের শুকনো খড় আর কিছু আবর্জনা কুড়িয়ে নেয়া হলো। শুষ্ক ঝুঁজে ঝুঁজে কিছু শুকনো গোবর নিয়ে এলো। মণ্ড যেখানে শয়েছিলো, সেখানে তার বুকের নিচেই কাঁচা গোবর। গোবরে গোবরে তার শরীর লেপটালেপটি হয়ে গেছে। আগে সে টের পায় নি। এখন সে মাটি চেঁছে নিয়ে এলো সেই গোবর। সব মিলিয়ে চমৎকার ক্যামোফ্লেজ করা গেলো।

এমন সময় ধাম্য শব্দে একটা রাইফেল গর্জে উঠলো কালভার্টের ওপর থেকে। শব্দটা এমন আচমকা এলো যে, সবাই হতকিত হয়ে দৌড়োনোড়ি করে পজিশনে চলে গেলো। রাস্তার ঢালুতে মণ্ড তার রাইফেলের ট্রিগার টানতে যাচ্ছিলো, হাত ধরে টেনে থামিয়ে দিই ওকে। এরপর আবার একটা শব্দ— ধাম্য একটু দূরে তালমা ব্রিজের ওপর, সাথে সাথে বামে পেছন থেকে আরো একটা। টেকা ঘেঁষতে ঘেঁষতে কাছে এসে জানায়, এটা হচ্ছে সময় সংকেত। রাত ১২টার পর প্রতি এক ঘন্টা পরপর কর্তব্যরক্ষণজ্ঞাকার বা সৈনিকদের এভাবে শুলি ছাঁড়ে সিগনাল দিয়ে জানাতে হয় যে, তারা সজ্ঞাপ্ত আছে। ঘূর্মায় নি। ডিউটিরিত সেন্ট্রিরা যাতে ঘুমুতে না পারে, সে জন্যই পাকবহিষ্ঠাত্রকমাত্বার এই রীতি ঢালু করেছে।

শক্রপক্ষের জাহাত বাহিনীর এই সিগনাল শুলি দিয়েছে পানিমাছ কাটাওপ দলের কম্বাতার চৌধুরীকে। ভালো করে কিছু ব্যর্থ করার আগেই তার দলের সবগুলো হাতিয়ার থেকে ছেলেরা একযোগে শুলিবর্ষণ করে দিয়েছে। প্রায় ৪০০ গজ দূরত্বে ওদের অবস্থান থেকে। একেবারে তুলক্ষ্য কাও বাধিয়ে দিয়েছে চৌধুরী পানিমাছকে লক্ষ্য করে। এদিকে পিন্টুর সাপোর্টিং দল প্রেজ্বেরেই চুপচাপ। না, আর দেরি করা যায় না। শক্র জেনে গেছে আমাদের উপস্থিতি। মধুসূদন আর মোতালেবকে নিয়ে এল। এম.জিসহ.দ্রুত রাস্তার এ পাশের ঢালুতে চলে আসি। রাস্তার ঢালের প্রান্ত দিয়ে সবাই হামাঙড়ি দিয়ে এগিয়ে চলে কালভার্টের দিকে। সবারই হাতে উদ্যত হাতিয়ার। এইভাবে সামান্য কিছুদূর এগুবার পর হঠাতে এক বৌক শুলি আসে সামনে থেকে আচমকা। মাথার ওপর দিয়ে শিস বাজিয়ে চলে যায় সেগুলো। কালভার্ট রক্ষাকারী বাহিনী শুরু করেছে এবার এলোপাতাড়ি শুলিবর্ষণ। আর থামা নয়। সবাইকে দ্রুত এগুতে বলি রাস্তার ঢাল বেয়ে। ব্রিজ দখলে নিতে হলে এভাবে শুলির মুখে এগিয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই। রাস্তা সোজা শুলি ঢালাচ্ছে ওরা। আমরা ঢাল বেয়ে এগুচ্ছ শুলির আক্রমণ এড়িয়ে। হঠাতে করেই গনি কঁকিয়ে ওঠে, ওরে বাপ, মোর পাণ্ডু শুলি নাইগছে বাহে। দ্রুত পিছিয়ে আসি গনির কাছে। গনি বসে পড়েছে মাটিতে। পা চেপে ধরেছে। আর মুখে চিৎকার করে বলছে, বাহে, মুই মরি গেনু বাহে, তোমরা মোক বাঁচান। কষে এক চৱ লাগাই গনির গালে। মুখে বলি, হারামজাদা, চুপ। শুলি লাগছে তো চিল্লাইস ক্যান। চুপ, একদম শব্দ করবি না। গনির চিৎকার থেমে যায়। ওর পায়ের গোড়ালির দিকে হাত দিয়ে দেখলাম জায়গাটা ভেজা ভেজা। গরম রক্ত ঝরছে। কতদূর শুলি লেগেছে, আঘাতের পরিমাণ কতটুকু, খুঁটিয়ে দেবার সময় নেই এখন। চাপা স্বরে তাই

তাকে বলি, কোমরের গামছা খুলে জ্যাগাটা বেঁধে ফেল। এখানে চুপচাপ বসে থাক। একদম শব্দ নয়। দ্রুত চলে আসি তারপর আবারো সামনে।

উড়ে যাওয়া কালভার্ট এবং টেকা কম্বারের এ্যাকরোবেটিক

কালভার্টের কাছাকাছি এসে গেছি। দেখা যায় অশ্পিট আলোয় শান বাঁধানো পাটাতন। এক পাশে উচু ঢিবির মতো দেখতে আর কী যেনো একটা। বাঙ্কারই সম্ভবত। টেকা বলেছিলো, দুটো বাঙ্কার আছে কালভার্টের দু'পাশে। এদিকে তালমা ঘাঁটি থেকেই তখন তরু হয়েছে শুলিবর্ষণ। এলোপাতাড়ি ঝাকে ঝাকে। এ সময় পিন্টুর সাপোর্ট দরকার। একমাত্র পিন্টুর মর্টাৰ পারে শুদ্ধের থামিয়ে দিতে।

এই সময় একটা শব্দ হয় 'টাপ' করে। তারপর কয়েক সেকেন্ড চুপচাপ। এর পরপরই বুম শব্দের একটা প্রচও বিস্ফোরণ। পিন্টুর মর্টাৰ শুরু করেছে কাঞ্জিত কাজ। সেই সাথে ওর দলের সব কঠি হাতিয়ার সত্ত্বিং হয়ে উঠেছে। ব্যাপারটা অনেকখানি অঙ্কের ফর্মুলার মতো। ফর্মুলায় ফেলে দিলে যেমন হিসেব মিলে যায়, এক্ষেত্রেও তাই হলো। শক্রুর হাতিয়ারের নলগুলো ঘুরে গেলো পিন্টুর অবস্থানের দিকে। আমাদের ওপর থেকে চাপ কমে গেলো। ঠিক এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে প্রথমে ঘেনেড হামলা, এরপর সবগুলো হাতিয়ার থেকে একযোগে শুলিবর্ষণ শুরু করে আমরা কালভার্টের ওপর বাঁপিয়ে পড়তেই শক্রু বাপাবাপ করে কালভার্টের তল দিয়ে বয়ে যাওয়া পানিতে ঝাপিয়ে পড়ে। রাস্তার এদিকে পালিয়ে গেল কেউ। ব্রিজ দখলে চলে এলো আমাদের। আসজ্ঞান্তৃচিট করে কালভার্টের ওপারে পজিশনে চলে যায় মধুসূন্দন আর মোতালেব এল.এম.জি. নিয়ে। একরামুল দ্রুত এপি-১৪ লাগাতে থাকে রাস্তায়। আমি কালভার্টের ওপর প্রত্যন্তে চার্জ লাগিয়ে ফেলি মুসার সাহায্যে। টেকা মাটি কাটতে থাকে। অন্যরা হাতে ছাঁজে সেগুলো বয়ে আনতে থাকে। মাটির চাপ দেয়ার কাজ হয়ে যাবার পর সার্কিটগুলো স্টার্ট করে নিই। মুসাকে দুটো রেমার চার্জ বাঙ্কারে লাগাতে বলি। তখনো গোলাগুলি চলতে সামান্য ওপর দিয়ে। মধুসূন্দন-মোতালেবসহ অন্যরা মাথা ঠাণ্ডা রেখে শক্রুর মোকাবেলা করে চলে ভালোভাবে। একরামুল তার মাইন বসানোর কাজ শেষ করে ফেলে। মুসার কাজ হয়ে যায়। এবার সবাইকে কালভার্টের এপারে আসবার কথা বলে পিছিয়ে যাবার নির্দেশ দিই। মুসাকে ফিউজে আগুন দিতে বলি বাঙ্কারের চার্জে। আমি কালভার্টের পাটাতনে বসানো চার্জের সেফটি ফিউজে আগুন ধরিয়ে দিই। এরপর মুসাকে সাথে নিয়ে মাথা নিচু করে দৌড়ে পিছিয়ে আসি। তবে পড়ি মাটিতে বুক লাগিয়ে। তীব্র আলোর বিচ্ছুরণ ঘটিয়ে কানে তালা লাগানো শব্দে ফেটে পড়ে চার্জগুলো। টেকা ডানে রাস্তার পাশের খালের ধারে বসেছিলো গুটিসুটি মেরে। তীব্র আলোর ঝলকানি দিয়ে প্রথম বিস্ফোরণের সময় দেখলাম, উল্টো দিকে ডিগবাজি খাওয়ার ভঙ্গিতে শূন্যে জোড়া পা নাচাতে নাচাতে সে খালের পানিতে পড়ে গেলো। টেকা কম্বারের এ্যাকরোবেটিক কায়দায় শূন্যে ডিগবাজি খাওয়ার ভঙ্গি দেখে সে অবস্থাতেও হাসি পেয়ে যায়। বেচারার এটা প্রথম অভিজ্ঞতা। ও বুঝতেই পারে নি, প্রেসার চার্জের বিস্ফোরণ কতো ভয়াবহ হতে পারে।

শরীর থেকে ধূলোমাটি খেড়েবুড়ে ওঠে দাঢ়াই। মুসাকে সাথে করে যাই কালভার্টের কাছে। সেটা নেই। সম্পূর্ণ উড়ে গেছে। কিছুক্ষণ আগেও কালভার্টটা দাঁড়িয়েছিলো। এখন জ্যাগাটা ফঁকা। পোড়া বারুদের সাথে একরাশ খোয়া এখন সে জ্যাগাটাকে দেকে রেখেছে।

কাজ শেষে খালের পানি পার হয়ে ফসলের খেতের ভেতর দিয়ে সরাসরি হাঁটা দিয়ে এসে পৌছুলাম ভেতরগড়-তালমা রাস্তায় অবস্থিত মিঞ্জির বাড়ির সামনেকার বাঁশতলাটায়। এখানেই সাইকেল মেকার যুদ্ধের প্রথম দিকে আমাদের ধরিয়ে দিতে চেয়েছিলো পাকবাহিনীর হাতে। অঙ্গের জন্য বেঁচে গিয়েছিলাম সে যাত্রা। ওই রাতে আমাদের তিনি সদস্যের অন্যতম গোলাম গড়স মারা গেছে টোকাপাড়ায়। মতিয়ার এখন যুদ্ধেরত পেয়াদাপাড়া ফ্রন্টে। আর আমি আবার সেই মেকারের বাড়ির পাশে। তবে আজ আমাদের অবস্থা অনেক বদলেছে। সেদিনকার মতো অসহায় অবস্থা আর নেই। পিংইকে বলি, মেকারকে পেয়েছো, শালা বিশ্বাসঘাতক।

— হ্যা, পেয়েছিলাম। হারামজাদাকে হাত বেঁধে নেয়া হয়েছিলো নদীর পাড়ে। শালা গুলি করার আগেই নদীতে ঝাঁপ দিয়ে পড়লো। এই জন্যই তো সাপোর্ট দিতে দেবি হয়েছিলো।

— ঠিক আছে, ব্যাটা যাবে কোথায়? একদিন-না-একদিন ধরা তাকে পড়তেই হবে। মুসা বলে, একটা বেয়নেট পাওয়া যাচ্ছে না। বোধহয় মাইন লাগানোর জায়গায় ফেলে আসা হয়েছে।

— কার বেয়নেট?

— করিমের।

— ঠিক আছে, করিম যাবে বেয়নেট আনতে। সাথে যাবে জয়নাল।

ওরা প্রথমে আপত্তি তোলে মৃতু। কিন্তু কাজ হয় না, কিন্তু পর্যন্ত ওদের যেতেই হয়। এটা যুদ্ধের মাঠ। কোনো হাতিয়ার ফেলে যাবার উপায় নেই। ওরা চলে যেতেই সবাই রাস্তার ওপর হাড়িয়ে-ছিটিয়ে বসে।

আকাশে এক চিলতে চাঁদ। কেমন যাপস ত্রৈমাসিক আলো। যুদ্ধ আর গোলাগুলি থেমে গেছে। অপারেশনের সফলতায় সবাই মেটামাট উৎসুক্ষ। অল্প কিছুক্ষণের ভেতরেই করিম আর জয়নাল ফিরে আসে। সামান্য দূর থাকে আমাদের দেখতে পেতেই আয় চির্কার করে বলে ওঠে, বেয়নেট পাওয়া গেছে!

একরাত্মুল তখন এস.এল.জান। হাতে মধু আর শঙ্কুকে নিয়ে এগিয়ে যায় তালমা ব্রিজটার দিকে। আবছা আলোতে ব্রিজটার গোটা কাঠামো দেখা যায় এখান থেকে। ব্রিজের কাছাকাছি নিয়ে ওরা ধমাধম গুলি ছেঁড়া শুরু করে। না, শক্রপঞ্চের তরফ থেকে কোনোরকম জবাব নেই। ওরা ভাবে, পাকবাহিনী বুঝি পালিয়েছে ব্রিজ ছেড়ে। তখন ওরা ওঠে যায় ব্রিজের ওপর গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে। আর তখনি ঘূর্ণত সিংহের জেগে উঠবার মতো করে ব্রিজের ওপর থেকে শুরু করে পাকবাহিনী প্রচণ্ড গুলিবর্ষণ। গুলির তোড়ে একরাত্মুলরা দৌড়ে চলে আসে। ওদের পিছু ধাওয়া করে আসতে থাকে পাকবাহিনী।

পাকবাহিনী এভাবে এগিয়ে আসবার ভঙ্গিতে মনে একটা জেদ চেপে যায় মুহূর্তে। হঠাৎ করেই সিন্ধান্ত নিই, এ্যামবুশে যাবো। পেছন থেকে ধেয়ে আসা পাকবাহিনীকে এ্যামবুশের মধ্যে ফেলে কাউন্টার এ্যাটাক করবো। রাত আয় তিনটা তখন।

কাউন্টার এ্যাটাক-এ্যামবুশ

সময় কম। দ্রুত ছেলেদের তিনটা গ্রন্টে ভাগ করে ফেলা হয় এবং ৫০ গজ পিছিয়ে ভেতরগামী রাস্তাটা যেখানে বাঁক নিয়েছে, সেখানে অবস্থান নিয়ে ফেলি। রাস্তার ঢালে ঝোপের আড়ালে শরীর লুকিয়ে রাখি। সোজাসুজি রাস্তার বাঁকটায় একরাত্মুল-চৌধুরীসহ

আমরা তিনজন অবস্থান নিয়েছি। সামান্য তানে হাসান, বাঁয়ে প্রায় ২০/৩০ গজ দূরে মুসা
তার সেকশনের দলবল নিয়ে। যোতালের মধ্যসূদন ক'জনসহ রয়েছে ওদের পেছনে কভার
দল হিসেবে। পাশের আড়জলের আড়ালে নিজেদের ঢেকে ফেলে সবাই রাস্তার এবং
জমির আড়ালে অবস্থান নিয়েছে। সবাই ঝুঁত আর বিশ্বস্ত। আমাদের গোলাগুলির
পরিমাণও কমে এসেছে সাংঘাতিকভাবে। সিন্ধান্তটা বজ্জ গরম মাথায় হঠাতে করেই নেয়া
হয়েছে। এখন আর করার কিছু নেই।

আমার তানে শোয়া একরামুলকে জিগোস করি, তোর ম্যাগজিনে কতগুলো গুলি আছে?
— ছ’-সাত রাউন্ড হবে, নির্লিঙ্গভাবে জানায় একরামুল।
— চৌধুরী তোর?
— দশ পনেরো রাউন্ড।

সর্বনাশ! আমার টেলগানের দু’ম্যাগজিনের একটা তো অনেক আগেই খালি হয়ে গেছে।
আর একটাতে ক’রাউন্ড অবশিষ্ট আছে কে জানে। তিনজনের কাছে ঘেনেড মাত্র দুটো।
শক্রুরা রাতে আসছে। তার মানে, তারা দলে ভারি এবং অস্ত্রশস্ত্রে বলীয়ান হয়েই আসছে।
অন্য দলগুলোকে ত্রিফিং দেয়া হয় নি। আর সেটা তাড়াহড়ো করে অবস্থান নেয়ার জন্যেই।
এখন পিছিয়ে যাওয়ারও উপায় নেই। শক্র আসছে, আমরা তাদের ফাঁদে ফেলার জন্য
গ্রামবুশে আছি, এটাই এখনকার বাস্তবতা।

রাত তিনটির ওপর বাজে। হঠাতে করেই শক্রুর প্লাটফর্ম বক্ষ হয়ে যায়। তবে ওরা যে
আসছে, এটা নিশ্চিত। তাদের পা ফেলার ভারি শক্র হাতিতে কান পাতলেই শোনা যাচ্ছে।
১৫/২০ মিনিট পার হয়ে গেছে। অনেক দীর্ঘ আর স্থির, অনড় সময়। বুকের ভেতরে
অস্থিরতার দাপাদাপি। যশা জাঁকিয়ে ধরেছে। শরীরের বিস্তৃত অংশে কীট-পতঙ্গের অবাধ
যাতায়াত আর নড়াচড়া। শিরশিলিয়ে ধূঢ়ে গা। বেশি নড়বার উপায় নেই। শব্দ করবার
উপায় নেই। শুধু ট্রিগারে হাত দেখিয়ে সামনের ঘন কালো অঙ্কারের দিকে দৃষ্টিকে যতদূর
সম্ভব প্রসারিত করে অপেক্ষা দিচ্ছিলে থাকা।

অবশ্যে দেখা গেলো ওদের। ওরা এসে গেছে আমাদের সেই ছেড়ে আসা বাঁশ
বাড়টার তলা অবধি। দেখা যায় ওখানে কয়েকটা কালো ছায়া। লৰা-চওড়া ভৌতিক
চেহারা নিয়ে তারা নড়াচড়া করছে। বাঁশ ঝাড়ের অঙ্কারে। একরামুলের হাত চেপে ধরি।
কাঁপছে সে। চৌধুরীও উন্ডেজনায় আমার শরীর চেপে ধরতে চাইছে। ওদের সাহস দিতে
যিয়ে যেনো আমি নিজেই সাহস খুঁজবার চেষ্টা করি।

— তব পাস না। মাথা ঠাণ্ডা রাখ, বলা মাত্রই ফায়ার ওপেন করবি। ফিসফিসিয়ে বলি
ওদের।

অঙ্কারে ছায়াগুলোর সংখ্যা যেনো বেড়ে উঠছে। প্রথমে ছিল ৩/৪ জন, এখন ১০/১২
জনের কম নয়। পেছনে আরো আছে বোৰা গেলো। ওরা এগুচ্ছে না জায়গাটা থেকে।
সম্ভবত ওরা এখন এগুবার পক্ষতি নিয়ে সলাপরামর্শ করছে। না, আর দেরি করা চলে না।
সময় হয়ে এসেছে। ওদের প্রস্তুত হতে বলি, একরামুল-চৌধুরী শেট রেডি। টাগেট ঠিক
কর। ম্যাগজিন শেষ করবি না একবারে। র্যাপিড ফায়ার দিবি। রেডি, ফায়ার!

বলা মাত্রই ধামধাম করে গুলি ছুটে যায় দাঁড়িয়ে থাকা ছায়াগুলো লক্ষ্য করে। হঠাতে করে
গুলির শব্দে ৪০/৫০ গজ সামনে থাকা শক্রবাহিনীর ভেতরে শব্দ হয়ে যায় একটা

এলোমেলো দশার। শোনা যায় একটা আর্তচিকারের মতো খনিও। কিন্তু অঙ্গুক্ষণের ভেতরেই অবস্থা সামলে নেয় তারা এবং প্রচন্ডভাবে শুলিবর্ষণ করে আমাদের অবস্থান লক্ষ্য করে। ওদের শুলির তোড়ে চারপাশের বৌপজঙ্গলের লতাপাতা আর ডাল ইত্যাদি তচ্ছব্দ হয়ে যেতে থাকে। ওদের ছুঁড়ে দেয়া গোলাগুলি রাস্তার মাটি যেনো খাবলে তুলে নিতে থাকে। মোতালেব আর মুসার দলবল কয়েক রাউন্ড শুলি ছুঁড়েই তখন চুপ হয়ে গেছে, ডানদিককার অবস্থানে থাকা হাসান তার হাতিয়ার থেকে শুলি ছোঁড়া শুরুই করতে পারে না। উপরস্থু শক্তির শুলিবর্ষণের মাঝে বাড়তেই থাকে ক্রমশ। একরামুল ও চৌধুরীর শুলিবর্ষণের উপায় নেই। ২/৪ রাউন্ড মাত্র শুলি রয়েছে ওদের কাছে। আমার টেনগানের একটা মাত্র ব্রাশের পর আর ট্রিগার টিপতে সাহস পাচ্ছি না। নিজেদের বাঁচাবার জন্য সর্বশেষ ২/৪ রাউন্ড শুলি থাকা প্রয়োজন। মাথা তুলবার উপায় নেই। ওদের দু'জনকে ফ্রেনেড চার্জ করার নির্দেশ দিলাম। এক সাথেই দুটো ফ্রেনেড ছুঁড়লো ওরা। ছুটে শিয়ে বিকট শব্দে বিক্ষেপিত হলো। তারা আমাদের ১০/১৫ গজ সামলে রাস্তার ওপর। ধোয়ায় জাহাঙ্গীটা তরে গেল। এখানে আর এক মুহূর্তে থাকা যাবে না। বুকের ভেতর থেকে জেগে ওঠা প্রচণ্ড তাগিদ থেকে বলে উঠি, নে ঝাপিয়ে পড়, বলে পেছন ফিরে ঘন বোপঘাড়ের ভেতরে ঝাপিয়ে পড়লাম এক সাথে তিনজনে। হাসানকে ওর অবস্থান থেকে তুলে আনা হলো না। একা রইলো ছেলেটা রাস্তার পাশে শক্তির একেবারে হাতের সম্মতিল। ঝাপ দিতে গিয়ে আমরা একটা বড় গর্তের মধ্যে গিয়ে পড়ি। বুনো লতাপাতা আর কাটাময় গাছগাছালির ডালপালার আঁচড়ে আমাদের শরীরের বিভিন্ন অংশ কেটে যায়, ছুঁড়ে যায়; কিন্তু সেদিকে লক্ষ্য করবার সময় নেই মোটেও। এখন শুধু সড়সড় করে স্টিক্টের তলদেশে নেমে পড়বার প্রাণান্ত চেষ্ট। এক সময় গর্তের মাটিতে পা লাগে। আমাদের নেমে পড়া শেষ হয়। তৎক্ষণিকভাবে গর্তের অপর কিনার বেয়ে হেঁড়েচেপেচড়ে উঠে ঝাঁপিল ওপরে, তারপর মাথা নিচু করে দৌড়। শক্তির বুলেট-বৃষ্টি তখন তেমনিভাবে চলছে প্রচলন থেকে।

আমরা দৌড়ুছি। জঙ্গল থেকে হয় তালমা নদীর একেবারে ঢায়া এসে। এরপর আখখেত। সেটা পার হতেই আবার জঙ্গল। জঙ্গল পার হয়ে ধানখেত। ধানখেতটা পার হলেই ভেতরগড়ের রাস্তার হদিস। পেছনে শক্তির গোলাগুলি তখন থেমে গেলেও আমরা তখনো দৌড়ে চলেছি। ধীরে ধীরে আকাশ ফর্সা হয়ে আসে। সামনের দিকে জেগে ওঠে হিমালয়। আমরা তখন পৌছে গেছি নতুন হাটে। শক্তির নাগালের সম্পূর্ণ বাইরে। পিন্টু আর মুসা আমাদের জন্য অধীরভাবে প্রতীক্ষা করছিলো তাদের দলবল নিয়ে। আমাদের আসতে দেখে ওরা আনন্দে হৈচৈ করে ওঠে। পিন্টু এগিয়ে এসে বুকে জড়িয়ে ধরে। কেনো জানি ওরা প্রায় ধরেই নিয়েছিলো আজ আমরা তিনজন ফিরতে পারবো না। ফিরে এসেছি, তাই আনন্দ আর উন্নেজনায় ওরা প্রায় কেঁদেই ফেলে। অন্যরাও পৌছে যায়। এমনকি পায়ের শুলির আঘাত নিয়ে গনি মিয়াও। কেবল হাসান ফেরে নি। মুক্ত মুক্তই। মুক্তের বাস্তবতা অত্যন্ত নির্মম। গনিও কাঁদছে আমাদের ফিরে আসায়! অথচ এই গনিকেই আমি প্রচণ্ড চড় কমে দিয়েছিলাম পায়ে শুলি খাওয়ার পর না কাঁদবার জন্য। জীবন বুবি এরকমই। যুদ্ধের ভেতরে এভাবে বেঁচে থাকা। সবাইকে ভালো লাগা। সবাইকে ভালোবাসা।

৫. ৯. ৭১

গণবিচার, পিন্টুদের বেঁচে যাওয়া এবং তনৰা প্রাপ্তি

সকালের দিকে খবর পাই, জগদলহাট থেকে একদল রাজাকারসহ কয়েকজন পাক অনুচর বানিয়াপাড়া পার হয়ে কালজোতের কাছাকাছি এসেছে। খবর পাওয়া মাত্র যত দ্রুত সঙ্গে সেনারবান পৌছে যাই। তালমা নদী পার হয়ে কালজোতে পৌছে জানা যায়, দলটি চলে গেছে জগদলের দিকে। ওদের পিছু ধাওয়া করে জগদলের কাছাকাছি বানিয়াপাড়া আমে এসে ৪ জন পাকবাহিনীর অনুচরকে ধরে ফেলা হয়। ওরা তখন জোরজবরদস্তি করে পাকবাহিনীর জন্য খাদ্য সঞ্চাহ করছিলো গ্রামবাসীদের কাছ থেকে। গ্রামের লোকজন স্বতঃস্ফূর্তভাবে ধরতে সাহায্য করে লোক চারটিকে।

বিকলে নালাগঙ্গের সাঁওতাল প্রধান মহেন্দ্র সর্দারের বাড়িতে ধানের খড়ের গাদার ওপর বিচার সভা বসে। পিন্টু ও মুসা থাকে আমার সাথে বিচারকমণ্ডলীর সদস্য হিসেবে। ধরা-পড়া লোক চারটির পক্ষে-বিপক্ষে ভেতরগড়-সোনারবান আর তালমা থেকে আসা মানুষদের সাক্ষ নেয়া হয়। দেখা যায়, প্রথম দু'বাণি পাকবাহিনীর সাথে থাকলেও, ততোটা ক্ষতিকর কেনো কাজকর্ম লিঙ্গ নয়; কিন্তু অন্য দু'জন ঘোরতর পাকিস্তানি সমর্থক, পাকবাহিনীর বৎশবদ দালাল এবং অনুচরও ওরা। বহু ধরনের অত্যাচার করেছে ঐ এলাকার মানুষজনের ওপর। পাকবাহিনীকে গতকালও তারা গাইড করে এনেছিলো ওখানে। তাই সিদ্ধান্ত হয়, ধরা-পড়া এ দু'জনকে ছাড়া যাবে না কোনোভাবেই। এর স্বর্ত্রান্তে দেশের জন্য, জনগনের জন্য অত্যন্ত বিপজ্জনক। ওদের আজকে ছেড়ে দিলেই কোলকাই ওরা পাকবাহিনীকে গাইড করে নিয়ে এসে বানিয়াপাড়াসহ আশপাশের গ্রামগুলি জলিয়ে-পুড়িয়ে ছারখার করে দেবে। সুতরাং কোনোভাবেই এ দু'জনকে যেতে প্রস্তুত হবে না। বিচার শেষে, প্রথম দু'জনকে স্বাধীনতা মুক্তির পক্ষে কাজ করবে, এটি কোলকা আদায় করে ছেড়ে দেয়া হয়। অপরাধী দু'জনকে ছেড়ে দেয়া হয় মোতালেবের হাতে। মোতালেব তার সেকশনের ছেলেদের নিয়ে অপরাধীদেরসহ চলে যায় টোকাপুকুর দিকে, তাদের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার জন্য।

রাতের বেলা পেট্টেল নিয়ে ঘুরি ভেতরগড়ের দিকে। মুফলধারে বৃষ্টি নামতে শুরু করে রাত নটার পর থেকে। মতিনের বাড়ির বাইরের দাওয়ায় কাছারি ঘরে আশ্রয় নিতে হয়। রাত ১১টার দিকে বৃষ্টি একটু ধরে এলে একরামুলসহ একটা সেকশন নিয়ে আমি চলে যাই ভেতরগড়-মহারাজ দিঘি পর্যন্ত। পিন্টু থাকে মতিনদের বাড়িতে একটা সেকশন নিয়ে। বাইরের ঘরের ছনের ছাউনি বৃষ্টির পানি ঠিকমতো আটকাতে পারে না। মতিন তাই ভেতরের আঙিনায় ওর শোবার ঘরে আশ্রয় দেয় ওদের। বাইরে তখনো বৃষ্টির মাতামাতি। ক্রান্ত শরীর বিছানায় এলিয়ে দিতেই ঘুমিয়ে পড়েছিলো পিন্টুসহ প্রায় সবাই। মধ্য রাতে পাকবাহিনী ঘেরাও করে বাড়ি। ঘুমস্ত পিন্টুর দল প্রায় ধরা পড়তে যাচ্ছিলো পাকবাহিনীর হাতে। মতিনের মা ও স্ত্রী ছুটে এসে পিন্টুদের নিয়ে বাড়ির পেছন দিককার বাঁশবাড়ি দিয়ে আখখেতে ঢুকিয়ে দেয় ওদের। সেখান থেকেই পিন্টু শোনে পাকবাহিনীর হাঁকডাক, কাঁহ গিয়া শালে মুক্তি, নিকালো। কাঁহ গিয়া মুক্তিকা দো কমাভার? কাহা গিয়া মতিন? অর্থাৎ তারা শুধু মুক্তিবাহিনীকে নয়, তাদের গাইড মতিনসহ তার দুই কমাভারকেও খুঁজছে অর্থাৎ আমাকে আর পিন্টুকে। ভয়ানক বিপদ আঁচ করতে পেরে পিন্টু আখখেতের ভেতর দিয়ে সোনারবানের দিকে চলে যায়। এলাকাটাকে তার আর নিরাপদ মনে হয় না।

সকালের দিকে ফিরতি পথে মতিনের বাড়ির হাল দেখে চোখ উল্টে যাওয়ার যোগাড়।

পাকসেনারা তার বাড়ির ভেতরে চুকে সবকিছু একেবারে তচ্ছচ করে দিয়ে গেছে। বুকের ভেতরটা ছাঁত করে ওঠে। তাহলে মতিনের বাড়ি হামলা করে কি পাকসেনারা পিন্টুকে ধরে নিয়ে গেছে?

না, নিতে পারে নি, বলেন মতিনের বাবা। পাকবাহিনীর হামলায় বিষ্ফল মতিনের বাবা আরো বলেন, অঙ্গের জন্য বেঁচে গেছে তো। মতিনও। মতিন যেনো বাড়িতে ক'দিন না আসে। নালাগঞ্জে আপনাদের আশ্রয়ে থাকে। বৃক্ষ মতিনের বাবা হাতজোড় করে এ অনুরোধ জানান।

পিন্টুর দলকে রাস্তায় পাওয়া যায়। আমাকে দেখেই পিন্টু ঘটে-যাওয়া ঘটনার সরসম বর্ণনা জুড়ে দেয়। বলতে থাকে কীভাবে সে আর মতিন শাড়ি পরে বাড়ির পেছন দিক দিয়ে মতিনের বউ ও মায়ের সাহায্যে পালিয়ে এসেছে। অঙ্গের জন্য বেঁচে গেছে পিন্টু আর ঠোকুর ১০ জন ছেলে। বিরাট একটা ঝাঁঢ়া কেটে যাবার মতো অনুভূতি নিয়ে সরাসরি গড়ালবাড়ি বি.ও.পি.তে রিপোর্টিংয়ের জন্য চলে আসি।

ক্যাপ্টেন দয়াল সিং আসেন নটার দিকে। হাতে আজ তার একটা চামড়ার ব্যাগ। আমাদের হাসিমুখে বলে ওঠেন, আজ তোমহারা তান্ত্রা মিলে গা। আজ তার মেজাজ ভালো। হাসিখুশি ব্যবহার করেন। এর আগেকার রিপোর্টিং দিনের সেই অগ্রীভিকর পরিস্থিতির মতো আর কিছু যাতে আবারো সৃষ্টি না হয়, সে প্রয়াসই আজ তিনি স্থত্রে চালিয়ে যাচ্ছেন। আমরা তাকে গত তিনদিনের যুদ্ধের ব্যতিযান দিয়ে তিনি টুকে নেন। তাকে বাড়তি গোলাবারঞ্জের চাহিদারও তালিকা দেয়া হয়। তিনি সেজেসো যথা শিগগির সম্বর পাঠাবেন বলে আশ্বাস দেন। এরপর আসে বেতন দেয়ার প্রলঠ ছেলেপ্রতি একশো টাকা। সবার হয়ে আমাদের দু'জনকেই নিতে হবে টাকাগুলো উভে ঠিকঠাক মতো সই দস্তখত দিয়ে। অনেকগুলো টাকা। আপাতত ছেলেদের হাতেরচের সমস্যা মিটিবে এতে করে।

রাতের বেলা রাজাকারের একটা বন্ধুর সাথে ঠাকুরপাড়া হাটের কাছে খণ্ড যুদ্ধ হয়ে যায়। বিশিষ্ট টিকতে পারে না কেউ। আমরা ওদের তাড়িয়ে দিয়ে আসি বদলপাড়া-বিসমনি এলাকার দিকে।

৬. ৯. ৭১

শক্তির গাড়ি আটক এবং ব্যত্য চার পাকসেনা

পাকা সড়কের পাশে অবস্থান নিয়েছি আমরা সেই সক্ষ্য থেকে। উদ্দেশ্য শক্তিপক্ষের গাড়ি গ্র্যামবুশের সাহায্যে ফাঁদে ফেলা এবং বিক্ষেপকের সাহায্যে সেটাকে উড়িয়ে দেয়া। কালাজোত হাইড আউট থেকে বিকেলের দিকে রওনা দিয়ে সক্ষ্যার অক্ষকারের মুখে এখানে এসে অবস্থান নেয়া হয়েছে। সেই থেকে দলের সবাই পাকা সড়কের পাশে ঘাপটি মেরে বসে রয়েছি। বিকেলে রওনা দেয়ার সময় আকাশ ভেতে বৃষ্টি নেমেছে। একটানা বিরতিহীন সেই বৃষ্টি। অবোরে ঝারে পড়ছে ছেলেদের গায়ের ওপর। জামা-কাপড়-শরীর সবকিছু ভিজে চুবচুবে। অবোর ধারার এই বৃষ্টি দৃষ্টির সম্মুখে যেনো একটা গাঢ় কুয়াশার পর্দা টাঙিয়ে দিয়েছে। ফলে দৃশ্যমান সবকিছুই ঝাপসা আর অশ্পষ্ট। বিরামহীন বৃষ্টির বড় বড় ফেঁটা শরীরের ওপর শুধু পড়ছেই না, শরীর ভেদ করে যেন হাড় পর্যন্ত তা স্পর্শ করছে। এ বকম একটানা ভিজতে শরীরের উষ্ণতা প্রায় উবে গেছে। এখন রীতিমতো হাড় কাঁপানো ঠাণ্ডায় দাঁত কামড়ে পড়ে থাকতে হচ্ছে। হাতিয়ারের নল দিয়ে যাতে পানি চুক্তে না পারে,

সেভাবেই সেগুলো ধরে রাখতে হচ্ছে। হাতে ধরা ঘোড়গুলোও ভিজছে। শুকনো রেশন অর্থাৎ রাতের খাবার হিসেবে রুটি আর চিনি গামছায় পেঁচিয়ে কোমরে বাঁধা আছে। সেগুলো ভিজে গলেটে পানিতে-কাদায় মাঝামাঝি হবার যোগাড়।

অর্থাৎ রাত ৮টা পেরিয়ে ৯টা বাজতে চলালেও আমরা পাকা সড়কের ওপর পাকবাহিনীর যে চলমান গাড়ি পাকড়াও আর ধূংস করতে এসেছি, এখনও তার দেখা নেই। সন্ধ্যা থেকে রাত ৮টার মধ্যে পাকবাহিনীর একটা গাড়ি পঞ্জগড় থেকে অমরখানা যাবার কথা। অর্থাৎ সময় পেরিয়ে গোলেও সে গাড়ির পাসা নেই। হয়তো রাতে যে-কোনো সময় আসবে, নয়তো সকালের দিকে। প্রতিদিনই রুটিনমাফিক একটা কিংবা দুটো গাড়ি পঞ্জগড় থেকে অমরখানা ঘাঁটিতে যায় রসদ, অন্ত, গোলাবারুদ আর আনুষঙ্গিক যুদ্ধের উপকরণ নিয়ে। ফেরবার সময় বহন করে নিয়ে যায় রাতের যুদ্ধে আহত কিংবা নিহত সৈনিকদের। সাদা রঙের জিপ গাড়ি সেটা। সাধারণ একলা-একাই গাড়িটা আসে। প্রয়োজন পড়লে কখনো কখনো তাকে ক্ষট করে নিয়ে আসে আর্মি ভ্যান। নতুন একক ট্রিপে সেই জিপ গাড়িটি অনেকটা সবার অলঙ্কৃত ঘাঁটায়াত করে থাকে। আমরা সেই গাড়িটিই ধরবার লক্ষ্য নিয়ে এখানে এসেছি।

ক্যাপ্টেন দয়াল সিং নির্দেশ পাঠিয়েছেন এই বলে, উহু গাড়ি পাকড়ানে হোগা, তুম ক্যায়সে পাকড়োগে উহু গাড়ি হাম নেহি জানতা। মগার উসকো পাকড়ানে চাহিয়েই। আই ডোট লাইক টু সি দ্যাট ব্রাডি জিপ ইজ কার্মিং টু অমরখানা এন্ড অন ইলেভেন্থ মর্নিং। ম্যায় খোদ অমরখানা অবজারভেশন পোস্ট মে টেলিস্কোপ সেকার বইঠা রাহঙ্গা টু চেক ইট, হোয়েদার ইউ হ্যাত এ্যাবল টু স্টপ দ্যাট ব্রাডি এন্ড মিস্টি জিপ। অর্থাৎ ক্যাপ্টেন দয়াল সিং কাল সকালে অমরখানার উটেটাদিকে উহু আমগুট্টির ওপর স্থাপিত অবজারভেশন পোস্টে টেলিস্কোপ নিয়ে লক্ষ্য রাখবেন, সেই চিহ্নিত গাড়িটি প্রতিদিনের মতো অমরখানা গেছে কি না। যদি গাড়িটা তিনি দেখতে না পাইলেন, তাহলে বুবাবেন অপারেশন সফল হয়েছে। কীভাবে শক্র সৈনিকবাহী গাড়িটি আটকানো হবে, সেটা আমাদের ব্যাপার। তার সোজাসাপটা কথা, গাড়ি আটক করতে হবে, সেটা ধূংস করতে হবে, শক্রসেনা গাড়িতে থাকলে পাকড়াও করতে হবে বী হত্যা করতে হবে তাদের। এ কাজটা সম্পূর্ণভাবে করতে হবে আমাদের একক দায়িত্বে। নিজেদের রচিত পরিকল্পনার ভিত্তিতে। তিনি শুধু দেখতে চান, শক্র গাড়ি প্রতিদিনকার মতো অমরখানা যায় নি।

যুদ্ধের মাঠে কমান্ডিৎ অফিসারের কিছু চাওয়া মানে আদেশ। তাঁর অধীনস্থ সৈনিকের এ ধরনের আদেশ প্রতিপালন করতেই হয়, এতে যতো বিপদ আর ঝুঁকিই থাক না কেনো। সুতরাং আমাদেরও তাই দয়াল সিংয়ের আদেশ প্রতিপালনের জন্য নালাগঞ্জ হাইড আউট থেকে আসতে হয়েছে সোনারবান। সেখান থেকে কালাজোতের পুরনো সেই হাইড আউটে। সকালে রেকি করা হয়েছে। সারাদিন গেছে পরিকল্পনা প্রণয়নে। শক্র গাড়ি আটকের সম্ভাব্য স্থান নির্ধারণ করা হয়েছে। অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ অপারেশন এটা। পাকা সড়কের ওপর শক্র চলমান গাড়ি আটক করতে হবে, সেটা দখলে নিতে হবে। গাড়ির আরোহী শক্র সৈনিকেরা বাধার সৃষ্টি করবে, বাধা যোকাবেলো করতে হবে। আটক করা গাড়ি উড়িয়ে দিতে হবে। শক্র সেনাদের পারলে ধরে ফেলতে হবে। আর তাদের হাতিয়ারপ্রসঙ্গে গোলাবারুদ দখলে নিতে হবে। শক্র অশুরিত এলাকা জগদল এবং অমরখানা ঘাঁটির মাঝামাঝি জায়গা হবে এ অপারেশনের কেন্দ্র। দুটো ঘাঁটি থেকেই শক্র সেনা পাকা সড়ক ধরে দ্রুত চলে আসতে পারে উদ্ধার অভিযানে।

দেক্ষেত্রে অপারেশনের জয়গা থেকে নিজেদের নিরাপত্তা এলাকায় সরে আসবার সময় মাও পাওয়া যেতে পারে। আবার শক্রবাহিনী এ অপারেশনের সংবাদ পূর্বেই জানতে পারলে, অবস্থানে থাকা আমাদের সবাইকে পেছন থেকে ঘোও করে পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারে। এ অপারেশন থেকে দলের অনেকেই নাও ফিরতে পারে। এখানে যেমন রয়েছে সফলতা লাভের উজ্জ্বল সংজ্ঞানা, তেমনি রয়েছে শক্র হাতে হতাহত হওয়ার সমূহ বিপদ। মনের বলিষ্ঠতা, প্রচণ্ড সাহস আর আত্মপ্রত্যায়ের পাশাপাশি প্রয়োজন নিখাদ পরিকল্পনা।

তো, প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ শেষে সারাদিন ধরে পরিকল্পনা তৈরি করার পর ইউনিটের বাছা বাছা ছেলেদের নিয়ে দল গঠন করা হয়েছে। হাতিয়ার দেয়া হয়েছে ছেলেদের যার যেমন পারদর্শিতা, সে অনুযায়ী ২ ইঞ্জিং মর্টারসহ ইউনিটের সকল ধরনের হাতিয়ার, পর্যাণ গোলাবারুদ এবং গ্রেনেডসহ ছেলেদের যুক্তসাজে সঞ্চিত করা হয়েছে। বিকেল পাঁচটার মধ্যে রঙনা দিয়ে ঠিক সন্ধ্যার মুখে নির্দিষ্ট জায়গায় সবাইকে অবস্থান নিতে হয়। আর সে কারণেই রাতের খাবার প্রত্যেকের কোমরে গামছার সাথে বেঁধে নেয়া হয়েছে। তখনো খাবার, দুটো করে মোটা আটার কুটি এবং সাথে চিনি। বিকেলে ঢুঢ়ান্ত ব্রিফিং শেষে রঙনা দেয়ার আগেভাগে প্রচণ্ড বৃষ্টি নামতে শুরু করে। অঙ্ককার হয়ে আসে চারদিক। এটাকে আশীর্বাদ মনে হয় সবার কাছে। বৃষ্টির অবোর ধারা আর ঘনীভূত মেঘাচ্ছন্ন আকাশ যে অঙ্ককার ডেকে আনে, তাই আমাদের আড়াল করে গন্তব্যে যাবার সহজ সূযোগ এনে দেয়।

সেই যে বিকেলে বৃষ্টি নেমেছে, তার আর থামাখাই নেই। করুণেত, শাটির বন আর অন্য অনেক গুলুলতা জাতীয় গাছে ফাঁকফোকে আয়োজিত অবস্থান। চৈতন্পাড়া গ্রামের পাকা সড়কের লাগোয়া বাড়িটার পেছনেই আমাদের টেলিপু মাথার ওপরে হেলানো বাঁশবন, বুকের নিচে ভেজা স্যাতসেঁতে মাটি আর পচা পাতার পাসের সাথে বাতাসে একটা অন্য ধরনের মোত্তো গন্ধ। অনেকক্ষণ পর সে গন্ধের উৎস ঝুঁটিগোলো। উৎস আর কিছু নয়, একটা কাঁচ পায়খানা বাড়ির পেছনে। তার জমে-জ্যো মর্মৰাচ্ছাপাশে বাড়ত কু গাছ আর শাটি বন। বাঁ দিকে মাত্র চার-পাঁচ হাত দূরে সেটার অবস্থান। সন্ধ্যার অঙ্ককারে সাত তাড়াতাড়ি বৃষ্টি মাথায় নিয়ে এ জায়গাটায় অবস্থান নেবার সময় দুর্দৃষ্টের আধার এই পায়খানার অস্তিত্ব বোৰা যায় নি। মুসাই প্রথম টের পায় ব্যাপারটা। বলে, এতো পায়খানার মধ্যে পজিশন নিয়েছি আমরা। 'ঠিক আছে' বলে চুপ করিয়ে নেই তাকে। এখন আর কিছুই করবার নেই। গাড়ি ধরবার জন্য সব থেকে সুবিধেজনক জায়গা এটাই। এখান থেকে মাত্র ১৫ গজের মতো দূরত্বে পাকা সড়ক। সেই সড়কের দিকে একাথে দৃষ্টি নিবন্ধ করে তাকিয়ে আছি আমরা সবাই। হাতিয়ারগুলো সেট করা হয়। গ্রেনেড হাতের কাছে সামনে রাখা, একদম সর্তক উদ্যত অবস্থা। টানটান স্নায়। বুকের ভেতরে প্রচণ্ড অস্ত্রিতা। সবাইই অপেক্ষা একটা গাড়ির জন্য। আবার অনিচ্ছয়তা কখন আসবে সেই গাড়ি কে জানে? ইলিত শিকার অর্থাৎ সেই গাড়িটা দেখা দেয়া মাত্র অবস্থানে থাকা ছেলেরা তাদের ওপর আরোপিত দায়িত্ব অনুযায়ী কাজ শুরু করে দেবে। আজকের দলের শক্তি ৩৫ জন। বাঁয়ে প্রায় ৫০ গজ দূরে একইভাবে অবস্থানে আছে চৌকুরী তার দলবল নিয়ে। ডানে প্রায় সম দূরত্বে একরামুলের অবস্থান। মাঝখানে আমি মুসাকে নিয়ে। সাথে রয়েছে যোতালেব, জয়নাল, বাসারতসহ মোট ১২ জন। পিটুর অবস্থান পেছন দিকে, বাড়িগুলো প্রায় ৩০০ গজের দূরত্বে। ২ ইঞ্জিং মর্টারসহ সাপোর্ট দল হিসেবে। তার সাথে রয়েছে ৫ জন।

আমাদের ইলিত পাকবাহিনীর গাড়িটি অত্যন্ত ধীরগতিতে চলাচল করে থাকে, এ তথ্য

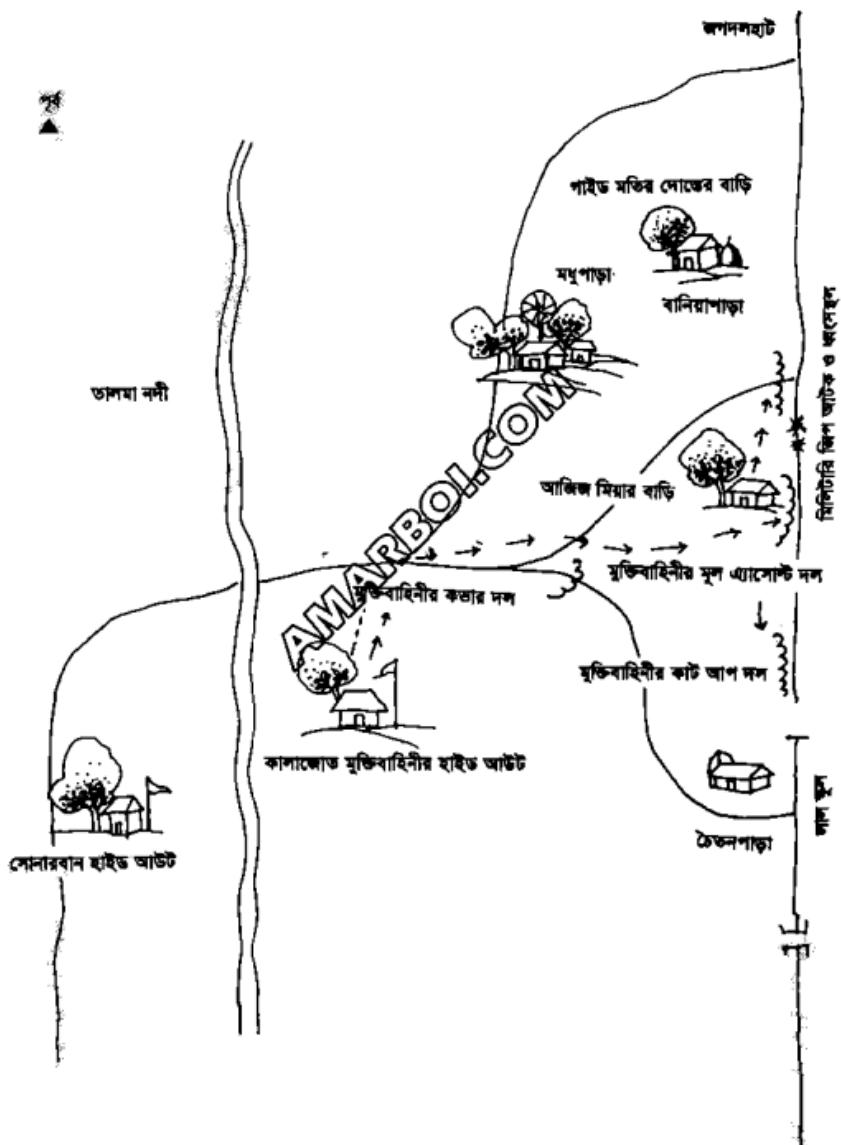
জানা গেছে। সুতরাং গাড়িটি যখন তার সেই ধীরগতি নিয়ে আসতে থাকবে, দূর থেকেই তার শব্দ পাওয়া যাবে। গাড়ির শব্দ পাওয়ার সাথে সাথে সবাই আঘাত হানার জন্য তৈরি হয়ে নেবে। প্রথমে বাঁয়ে চৌধুরীর দলের সামনে দিয়ে গাড়িটি আসবে, চৌধুরী গুলিবর্ষণ না করে তাকে তার সামনে দিয়ে এগুতে দেবে। চৌধুরীকে পার হওয়ার সাথে সাথে একরাহুল ডানে থাকা তার অবস্থান থেকে গাড়িটিকে লক্ষ্য করে প্রচও বেগে গুলিবর্ষণ শুরু করবে। সেই সাথে চৌধুরীও গাড়ির পেছন থেকে আঘাত হানবে। স্বাভাবিকভাবে গাড়ির সামনের দিককার গতি থমকে যাবে, পেছনে যাবার অবস্থাও থাকবে না। আর এ অবস্থাটা ঘটবে ঠিক আমাদের সামনে। তাৎক্ষণিকভাবে গাড়ির দিকে ছুটে যাবে আমাদের ফ্রনেড। যোতালেবের এল.এম.জি অনবরত ত্রাশ চালিয়ে যাবে, অন্য হাতিয়ারগুলো থেকেও না থেমে একনাগাড়ে গুলি চলতে থাকবে। এ অবস্থায় গাড়ি আটকে যাবে এবং আটকে যাবার সাথে সাথে সরাসরি ঝাপিয়ে পড়ে গাড়ির দখল নিয়ে নেয়া হবে। তারপর দ্রুত অন্যান্য কাজ সমাপন এবং ত্বরিত গতিতে ঘটনাস্থল ত্যাগ।

মাথার ওপর কালো আকাশ যেন বালতি ঢেলে পানি দিচ্ছে। শরীরের নিচে পচা গঙ্কযুক্ত কর্দমাক্ষ মাটিতে শরীর মাখামাখি। অনেক কষ্ট আর যত্ন করে রক্ষা করবার চেষ্টা করলেও কোমরে জড়িয়ে রাখা চিনি মাখানো রক্ত শুকনো রাখা যায় নি। পানিতে ভিজে রুটি চিনি প্রায় গলে যাবার যোগাড়। মালেক-মঞ্জু দু'জন রানারের কাছে ত্বরাছে, সবগুলো দলের সাথে দোড়াদৌড়ি করে খবরাখবর আনা-নেয়া করাছে। স্যান্ডেলে কাঁচা জায়গা মশককুলের উর্বর বাসস্থান। একেবারে জঁকিয়ে ধরেছে মশার পাল। স্যান্ডেল সাথে লাফিয়ে লাফিয়ে আক্রমণ করাছে ছেট ছেট চিনে জঁক। আকাশে কালো মেঘ ঢাকালকে ঘনায়মান অঙ্ককার। বড় বড় ফেন্টার অবোর ধারার বৃষ্টিপাত, মশা আর জঁকের অক্রমণ, হিম হয়ে আসা শরীর, এর ভেতরেই দাঁত কামড়ে পড়ে থেকে শক্তির গাড়ির অপেক্ষাটি সকলের। এভাবে হয়তো গোটা রাতটাই কাটিয়ে দিতে হবে। মনের মধ্যে তখন একটি অনুভূতিই গুঁজিত হতে থাকে, এক সময় রাতটা কেটে যাবে, আমরা হয়তো সকালের ছেঁজেরেই শক্তির গাড়ি ধরে ফেলবো। আমাদের কাজ শেষ হয়ে যাবে। তারপর সবাইকে নিয়ে নালাগঞ্জে ফিরবো। সেখান থেকে যাবো বেরবাড়ি, বেরবাড়ি থেকে জলপাইগুড়ি। একটা গোটা দিন ছাটিয়ে আড়া দিয়ে ছুটি কাটিয়ে ফিরবো।

রাত সাড়ে ন'টাৱ দিকে হামাগুড়ি দিয়ে মুসা কাছে আসে। ফিসফিসিয়ে বলে, রুটি-চিনি বৃষ্টিতে ভিজে ডাইল হয়ে গেছে মাহবুব ভাই, এখন খাওয়া দরকার।

— ঠিক আছে, বলি তাকে। মঞ্জু মালেককে দিয়ে খবর পাঠাই সকলের কাছে যার যার রেশন খেয়ে নেবার জন্য। কিন্তু পজিশন যেন কেউ না ছাড়ে। মঞ্জু ও মালেক চলে যায়। সেদ্ব আটার দলার মতো খাবার কোনোৱকমে গলাধ়ঢ়করণ করতে হয়। সময় আরো গড়িয়ে যায়। ডান দিকের অবস্থান থেকে একজনের নাসিকাগর্জন শোনা যায়, অর্থাৎ এইরকম অবস্থার ভেতরেও ঘুমিয়ে পড়েছে সে। এ ধরনের বৃষ্টি-বাদল আর কাদাপানির ভেতরে উদ্যত অঙ্গের দ্রিগারে হাত রেখে অপেক্ষার ঝাঁকিতে ছেলেদের মুম আসছে, দু'একজন ঘুমিয়েও পড়েছে! তাদের নাসিকাগর্জন কানে আসতেই উঠে দাঁড়াই। একরাহুলের পাশে ঘুমত করিম না শাহজাহান টের পাওয়া যায় না। ধৰাম করে তার পঢ়াদেশে লাখি কষি। ধড়মড়িয়ে উঠে বসে সে। এমনি আরো দু'তিনজনকে পাওয়া যায় ঘুমত বা আধা ঘুমত অবস্থায়। রাত গভীর হওয়ার সাথে সাথে পরিবেশ-পরিস্থিতি যত প্রতিকূলই হোক না

কেচ ম্যাগ-১
পাকা সড়ক অভিযান— পাকবাহিনীর মিলিটারি জিপ খাস
১০-৫-৭১
(কেল শাড়া)



কেনো, ছেলেদের চোখে ঘুম নেমে আসতে থাকে। অস্থির লাগে এ অবস্থায়। একটা অসহায় ক্রোধ এসে ভর করে মনে। কিন্তু পরিস্থিতি সামাল দিতে প্রত্যেকের ঘুম তাড়িয়ে বেড়াতে হয়। সবচেয়ে প্রয়োজনীয় হাত হচ্ছে মোতালেব। ওর কাছেই এল.এম.জি.। ও যাতে ঘুমিয়ে না পড়ে, সে জন্য বারবার ঘুরেফিরে ওর কাছে যেতে হয়। মোতালেব নিশ্চিত করে প্রতিবারই এই বলে, নাগে মুই ঘুমাম নি, তোমরা দেখেন।

পিটুর অবস্থান বেশ শেষেন। তার দলের অবস্থা যাচাই করবার উপায় নেই। মুসাকে দায়িত্বে রেখে চৌধুরীর অবস্থান দেখতে যাই। ওদের পাওয়া যায় পাকা সড়কের ধারে একটা টিনের চালার ঘরে। সম্বত মঙ্গব কিংবা মণ্ডসা ঘর সেটা। বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচবার জন্য নিজেদের অবস্থান ছেড়ে ওরা দিবি ঘরের ভেতর আশ্রয় নিয়েছে। দলের অধিকার্থ ছেলে হাতিয়ার ফেলে রেখে ঘুমে কাদা হয়ে আছে। চৌধুরী কিছু একটা কৈফিয়ত খাড়া করতে চায়। ওদের এই আয়োশিভাব দেখে মুখের কথা বক্ষ হয়ে যায় আমার। রাগে-দুঃখে-ক্ষোভে। কি অস্তুত ব্যাপার, এরা সবাই এভাবে ঘুমিয়ে থেকে মারা পড়বার উপক্রম করেছে! চৌধুরীকে শুধু বলি, তোমাদের পজিশনে যাও। ডেন্ট ইন্ভাইট ইউর ডেথ লাইক দিজ ওয়ে। গুটিসুটি মেরে আবার ওরা ওদের নিজের নিজের জায়গায় অবস্থান নেয়। আসবাব সময় ওদের বলি, এরপর কেউ জায়গা ছাড়লে কিংবা ঘুমালে, পাকাবাহিনী নয়, আমিই তোদের সব কঠাকে শুলি করে ফেলে যাবো, মনে থাকে যেন। নিজেদের অবস্থানে ফিরে এসে একরামুলের খবর নিতে যাবো, এমন সময় মুসা উত্তেজিত গলায় ফিসফিসিয়ে বলে এটু, সামনে দেখেন ওরা কারা? বুটের খটখট শব্দ তুলে পাকা সড়কের ওপর দিয়ে আসছে একদল সৈনিক। আসছে অমরখানার দিক থেকে। আর সেই প্রত্যাশিত ঘটনাটা দেখে অনেকের সকলেই সহজাত প্রত্যন্তে সজাগ হয়ে উঠে। মোতালেব উত্তেজিত গলায় বলে, যত কিংকরিষ্ম শুলি চালাম নাকি গো?

— না, সাথে সাথে তাকে সিন্ধান্ত জানিয়ে দিই। মালেক-মঙ্গুকে পাঠাই দুদিকে অর্থাৎ চৌধুরী আর একরামুলের অবস্থানের উদ্দেশ্যে। কেউ শুলি ছুঁড়ে না এই নির্দেশ দিয়ে।

রাত একটার মতো সময় ক্ষমতা বৃষ্টি ধরে এসেছে। কিন্তু ধরে আসলে কি হবে আকাশে তখনো ভারি ঘনকালো মেঘের ছায়া। তারাই ভেতর দিয়ে পাকা সড়কের ওপর বুটের শব্দ তুলে পাক সৈনিকের দলটি সমান তালে এগিয়ে আসছে। অবশ্যে এলো ওরা। লম্বা চওড়া কালো ছায়া ছায়া শরীর নিয়ে। চোখের সামনে মাত্র ১৫ গজ দূর দিয়ে তিন সারিতে পায়ে পায়ে তাল মিলিয়ে পাক সৈনিকের দলটা পার হয়ে গেলো। এতো কাছে দিয়ে শক্ত সৈনিক যাচ্ছে, তাদের ছায়া ছায়া ভৌতিক অবয়বগুলোর অস্তিত্ব যেনো সবকিছু এলোমেলো করে দিতে চায়। মাথায় প্রচণ্ড রক্তচাপ। বুকের মধ্যে হাতুড়ির বাড়ি। স্টেনগানের ট্রিগারে বসানো হাতের আঙুলে অস্থিরতা, বাঁ হাতের মুঠোয় উঠে আসা প্রেনেড। অনড় নিস্পন্দ আর শব্দহীনভাবে পড়ে থেকে শক্তির কলায়টা পার হতে দেখি। সংখ্যা ওরা ২৫/৩০ জনের মতো। রাতের অক্ষকারে মার্ট করে যাচ্ছে অমরখানা থেকে জগদলহাটের দিকে। ওরা চোখের সামনে দিয়ে চলে যায়। আমরা ওদের আঘাত করি না। ওরাও টের পায় না আমাদের অস্তিত্ব। ওরা চলে গেলে রাস্তার ওপর চলে যাই। কিন্তু হাঁটাহাঁটি করে আবার ফিরে আসি মুসাহসহ। ওরা যেভাবে গেলো, সেই অবস্থায় ওদের ওপর আচম্পিতে আঘাত হানলে হয়তো ৮/১০ জনকে নিশ্চিত ধরাশায়ী করা যেতো; কিন্তু নিজেদের সংবরণ করতে হলো এই ভেবে যে, আমাদের গাড়ি ধরার পরিকল্পনা ভেস্টে যাবে তা না হলে। এছাড়া

রাতের আধারে প্রাথমিক আঘাতের পর ওরা সামনে ওঠে যদি প্রতিঘাত হানতে শুরু করে, তা হলে আমার এই অপেশাদার গেরিলা যোদ্ধার অনেককেই হয়তো হারাতে হতে পারে।

পাক সৈনিকের দলটি ভূতের মতো এভাবে চোখের সামনে উদয় হয়ে চলে যাওয়ায় একটা কাজ হয়। ছেলেদের চোখের ঘূম একেবারে উধাও হয়ে যায়। আসলেও সাক্ষাৎ যমতুল্য পাকবাহিনীকে এভাবে একেবারে চোখের সামনে দেখায় ভয় চুকে যায় প্রত্যেকের মনের গভীরে। মানুষের জীবনের মতো পিয় তো আর কিছু নেই পৃথিবীতে। সুতরাং এভাবে সাক্ষাৎ মৃত্যুকে সামনে নিয়ে আর কেউ ঘূমোবার সাহস করে না, বরং হাতিয়ারগুলো আরো ভালো করে বাগিয়ে ধরে মৃত হয়ে বসে প্রত্যেকেই যে যার অবস্থানে।

মধ্যরাতে বৃষ্টি একেবারে থেমে যায়। শেষ রাতের দিকে আকাশ ধৰ্বধৰে পরিষ্কার হয়ে আসে। রাতটাও কেটে যায় একসময়। দলের সবার দৈর্ঘ্য আর কষ্ট সহিষ্ণুতার অবস্থা প্রায় চরমে। ভোরের আলো ফোটে। ধীরে ধীরে ফর্সা হয়ে আসে সবকিছু। আমাদের নিজেদের ছন্দছাড়া অবস্থা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ঝড়-বাদল, মশা, পোকামাকড়, শক্র আগমন ও তারা চলে যাওয়া ইত্যাদি ঘটনার ভেতর দিয়ে একটা অস্ত্র কষ্টকর দীর্ঘ রাত পার হয়ে গেল। প্রত্যেকের চেহারায় তার সুস্পষ্ট প্রভাব। সাদা ফ্যাকাশে হয়ে গেছে চেহারা। প্রত্যেকের চোখ রক্তজ্বার মতো লাল।

একটু পরে পুরুদিক থেকে নরম আলো নিয়ে সৃষ্টি হয়ে উঠে। একটা চমৎকার ঝরবরে সকাল। ঠিক এই সময় চোখের সম্মুখবর্তী রাস্তার ওপর দিয়ে একটা কালো মোটাসোটা মতো লোককে ৮/১০টা ছাগল টানতে নিয়ে যেতে দেখো যায়। মতি মিয়া পেছনে থেকে এসে বলে, কালা আবদুল। এই সেই বিখ্যাত কালা আবদুল, যাকে পাকবাহিনীর প্রধান অনুচর হিসেবে এ অঞ্চলের লোক যমের মতো জ্বরকরে থাকে। একপাল ছাগল নিয়ে সে চলেছে জগদলহাটে তার প্রভুদের ভেট হিসেবে উঠতে। ফন্টবড় একটা টার্ণেট সে। নিরিয়ে তাকেও যেতে দেয়া হলো। যে বাড়ির পেছনায় আমাদের অবস্থান, সেই লোকটাকে নিয়ে এলো মুসা। রাতে এ বসতির বাড়িঘরে কেউ যাচ্ছে না, কোনো বাড়িতেই পরিবার নেই। শুধু দিনের বেলায় তারা আসে। মেঝে মানুষ, বাচ্চা ছেলেমেয়েদের তারা অন্যত্র সরিয়ে দিয়েছে।

মুসার ধরে আনা লোকটা মাঝে বয়সী। সরল সোজা মানুষ। চোখেমুখে রাজ্যের ভয়ভীতি। তাকে জিগ্যেস করি কিছু খাওয়াতে পারবেন? মাথা নাড়ে সে। বলি, কিছু খাবার যোগাড় করে দিতে হবে যেমন করে হোক। লোকটা মিনিমিন করে বলে, চাউল ভাজা খাবেন! কহেনতো লে হেনে আসি। অন্য কিছু পারিল যাবে নাই।

— ঠিক আছে তাই আনেন, বেশি করে আনবেন, রাত থেকে খাওয়া নেই আমাদের, বলি লোকটাকে। ঠিক আছে বলে লোকটা উঠে দাঁড়ায়। মালেককে বলি তার পেছনে পেছনে গার্ড দিয়ে থাকতে। এখন দিন হয়ে গেছে। শক্র এলাকার এতো গভীরে এবং শক্র অত্যন্ত নিকটবর্তী অবস্থানের কাউকেই বিশ্বাস নেই। পাকা রাস্তা ধরে পশ্চিমাংশের দিক থেকে একটা রিকশা এগিয়ে আসে। কাছে আসতেই দেখা যায় ওতে আরোহী দু'জন পুলিশ খাকি পোশাকে। হাতে অলস ভঙ্গিতে ধরা রাইফেল তাদের। রিকশার পেছনে সাইকেলে আর একজন পুলিশ। রাইফেলটা তার পিঠে ঝুলছে। রিকশার গতি মুম্ভ। পুলিশ তিনটা গল্ল করতে করতে আসছে। দেশের এ অবস্থায় তিনজন পুলিশ খোশ মেজাজে কোনো তদন্ত কাজে, কিংবা ওয়ারেট জারি করে কোনো আসামিকে ধরতে যাচ্ছে। একেবারে স্বাভাবিক অবস্থা যেনে দেশের। মাথায় রোখ

চেপে যায় মুহূর্ত। ছুটে গিয়ে রিকশা থামিয়ে রাইফেলসহ পুলিশ তিনটাকে ধরে আনা যায় একেবারে সহজভাবে। কিন্তু নিজেকে সামলে নিই। যাক ওরা। সারারাত যে উদ্দেশ্যে এতো কষ্টের মধ্যে কাটানো গেলো, মাঝপথে এই তিনি বাণিলি বিশ্বাসঘাতক পুলিশ মেরে সেটা নষ্ট করে লাভ নেই। পুলিশেরা চলে যায়। আমরা আমাদের নিজেদের অবস্থানে নড়েচড়ে বসি আর শুছিয়ে নিই আবার সবকিছু। গ্রেনেড রেডি রাখতে বলি জয়নাল, বাসারাত, মালেক, মঙ্গ আর শাজাহানকে। নিজের হাতেও গ্রেনেডটা তৈরি রাখি। মুসাকেও তৈরি হতে বলি। মন বলছে, এবার আমাদের শিকার আসছে। সুতরাং সর্বিকভাবে প্রস্তুত করে নিই সবাইকে।

মালেকসহ লোকটা ফিরে আসে গামছায় চাল ভাজা বুলিয়ে। কিছুটা লবণও এনেছে বুদ্ধি করে। মালেক প্রত্যেকের কাছে পৌছানোর ব্যবস্থা করে টাটকা মোটা আউশের চাল ভাজা। পেটের ভেতর স্ফুর্ধার আগুন। পৃথিবীর সর্বশেষ সুস্থান খাবারের স্বাদ নিয়ে চাল ভাজা চিবুই আমরা আর শীরীর থেকে চিনে জোক সরিয়ে দিতে থাকি। মাত্র তিনি চার গ্রাস খাওয়া হয়েছে কি হয় নি, এমন সময় দূর থেকে একটা ভোঁ-ও শব্দ ভেসে আসে। শব্দটা আসছে বাঁ দিক থেকে। হ্যাঁ, খাবামান গাড়ির ইঞ্জিনেই শব্দ। তার মানে পঞ্জাবীর দিক থেকেই আসছে গাড়িটা। গাড়ি আসছে, গাড়ি আসছে এই শুঙ্গন ছড়িয়ে পড়ে আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে। অস্ত্রির হয়ে ওঠে সবাই। গত সক্ষ্য থেকে যার জন্য অধীর অপেক্ষা, সেটা আসছে এখন সকাল আটটার দিকে। বানার মঙ্গ আলোক ছুটে যায় দুদিকে— চৌধুরী আর একরামুলের কাছে। গাড়ি আসছে। ওটা ধরতে হবে। এর সফলতা নির্ভর করবে চৌধুরীসহ আর সকলের সফল কাজের ওপর।

যাথা তুলতেই দেখলাম জিপ গাড়িটা। গাড়িটায় চারজন আরোহী। চারজনই সৈনিক। এক সময় ওরা আমাদের টার্গেট রেজেন্সির ভূমিতে এসে পড়ে। ধীরগতিতে এগুচ্ছে গাড়িটা, নিরুৎসুগভাবে। আঘাত করার কথা প্রস্তুত একরামুলের। কিন্তু প্রথম আঘাত হানলো চৌধুরী। ওদের সামনে দিয়ে পার হওয়ার ক্ষেত্রে শুলি শুরু করে ওরা একযোগে। গাড়িটা তখন স্পিড নেবার চেষ্টা করছে আচমকা আক্রমণ হওয়ায়। সাথে সাথে মোতালেবকে ফায়ার দিতে বলি। অব্যর্থ লক্ষ্যভেদে ভরতৰ করে মোতালেব তার এল.এম.জি.র ফায়ার জুড়ে দেয়। গাড়ি থেমে যায়। একরামুল তখন তার দল নিয়ে শুলিবর্ষণের তুলকালাম কাও শুরু করে দেয়। আর দেরি নয়, চিংকার করে বলে উঠি, চার্জ! এরপর পায়খানার পেছন দিককার জঙ্গলের ভেতর দিয়ে সবাইকে নিয়ে দ্রুত এগিয়ে যাই। গাড়িটা থেমেছে কিছুটা দূরে রাস্তার ওপর। চোখের পলকে সেই দূরত্ব অতিক্রম করে প্রথম গ্রেনেড ছুঁড়ি আমি। সাথে সাথে অন্যদের হাতের গ্রেনেডগুলো ছুটে যায়। মাটিতে শোয়া অবস্থায় গ্রেনেডগুলো বিস্ফোরিত হতে দেখি। এরপর হাঁটু গেড়ে স্টেনগানের ব্রাশ দিতে থাকি। আর চিংকার করে সঙ্গীদের বলতে থাকি, 'চার্জ, দৌড়া, আগা, গাড়ি ধরা পড়েছে, শালারা আটকা পড়েছে, দৌড়া, ধরে ফেল হারামজাদাদের...'। চিংকার করে কথা বলতে বলতেই দেখলাম, রাস্তার ওপর কিছুটা মুখ ঘূরিয়ে গাড়িটা কাত হয়ে গেছে। গাড়ির ওধার থেকে কয়েকটা এলোপাতাড়ি শুলির শব্দ হয়। জাত সৈনিক ওরা, পরিস্থিতির ভয়াবহতা উপলক্ষে করার সাথে সাথে তাদের হাতিয়ার থেকে শুলিবর্ষণ শুরু করেছে। কিন্তু এখন আর তাদের কিছুই করার নেই। চারদিক থেকে শুলি ছুড়তে ছুড়তে এগিয়ে আসছে ছেলেরা। ওদের বন্যার স্থানের মতো অঞ্চল ঠেকানোর এখন আর কোনো উপায় নেই। শুরু সেনারা তখনো শুলি ছুড়ছে। ওদের ঠাঁঞ্চ করার জন্য

ওন্দের দিকে আরো চারটা ছেনেড খেয়ে যায়। সেগুলো বিস্ফেরিত হয় গাড়ির ওপর সাথে সাথে। আর কোনো সাড়া-শব্দ পাওয়া যায় না শক্ত সেনাদের।

গাড়ি দখলে এসে যায় আমাদের। ৪ জন সৈনিকের মধ্যে তিনজনকে পাওয়া যায় মৃত অবস্থায়। একজন আহত হয়েও সরে পড়েছে রাস্তার ওপাশের জঙ্গলে। বুর তাড়াতাড়ি পাকসেনাদের হাতিয়ার-গোলাবারুদ এবং তাদের মাথার ক্যাপ আর ব্যাঙ্গণুলো সঁজহ করা হয়। আহত সৈনিকটির পিছু ধাওয়া করবার সময় এখন আমাদের নেই। গাড়ির ভেতর রেয়ার চার্জ লাগিয়ে ফিউজে আগুন দিয়ে সবাইকে 'ফল ব্যাক' করতে বলি। এমন সময় ধ্যাধম দুটো ২ ইঞ্জিং মর্টার শেল উড়ে এসে বিস্ফেরিত হয় রাস্তার ওপরে। বোৰা গেলো পিণ্টু সরব হয়ে উঠেছে। আর একটু এদিক-ওদিক হলেই ওর অন্ত থেকে বর্ষণ করা শেল আমাদের মাথায় এসে পড়তো। গাড়িতে বসানো রেয়ার চার্জের ফিউজ ঝুলেছে। আর আমরা পাকা সড়ক থেকে নেমে দিঘিদিক জানশূন্য অবস্থায় দৌড়ুচ্ছি প্রাণপণে। বাড়িয়র সব পার হয়ে ধানবেটার ওপর যেই এসে পৌছেছি, অমনি কড়াৎ শব্দ তুলে হলো বিস্ফোরণ। পায়ের নিচেকার মাটি কেঁপে উঠলো। বাতাসের প্রচণ্ড শব্দ তরঙ্গের চেউ এসে গায়ে লাগলো ধাক্কা। সে ধাক্কা সামলে টালমাটাল পায়ে দৌড়ুচ্ছি তখনো আমরা প্রাণপণে। মনের মধ্যে একটাই তাপিদ সরে যেতে হবে যতো তাড়াতাড়ি সষ্টি সেই দূরত্বে, যেখানে নিরাপত্তা আছে। জীবন আছে। ভালোবাসার পৃথিবী আছে।

১০. ৯. ৭১

ও আমার দেশের মাটি

ক্যাট্টেন দয়াল সিং বলেন, কুচ চাহিয়ে (বাল্প) ইয়েস স্যার। কেয়া চাহিয়ে, হোয়াট ডু ইউ ওয়াট? চোখে উজ্জ্বল দৃষ্টি তার। স্বিত হেসে জিগ্যেস করেন, কী চাই তোমাদের বলো?

— ছুটি চাহিয়ে স্যার একদিনক্ষেত্রে! একদিনের জন্য ছুটি দরকার, বলি তাকে।

— কী করবে ছুটি নিয়ে? কোথায় যাবে? এদেশে যাবার কোনো জায়গা আছে? একইভাবে তিনি জানতে চান।

— শিলিঙ্গড়ি যায়েগা স্যার। শিলিঙ্গড়ি যাবো। পরিচিত লোকের সাথে দেখা করতে, চট করে চিন্তাভাবনা না করেই বলে ফেলি।

— ঠিক হায় ইয়ার, মঞ্জুর— বলেই তিনি ওঠেন। এর আগে তিনি বিস্তারিতভাবে শব্দের গাড়ি উড়িয়ে দেবার বিবরণ নিয়েছেন। শক্রুর কাছ থেকে দখল করা চাইনিজ হাতিয়ার এবং গোলাবারুদ বুরো নিয়ে সেগুলো উচ্চেপালে দেখেছেন। নিহত শক্র সৈনিকদের ক্যাপ ব্যাঙ— এসব তিনি পরীক্ষা করে দেখেছেন ঝুঁটিয়ে। এ অপারেশন সফলভাবে মুক্তিযোদ্ধারা বাস্তবায়ন করতে পারবে এটা যেন তিনি ভাবতেই পারেন নি। তিনি অপারেশনের কাজটি দিয়ে আমাদের পরীক্ষা করতে চেয়েছেন। বলা যায় যেনো এভাবে তিনি একটা মজা করতে চেয়েছেন আমাদের সাথে। ক'দিন আগে তার সাথে আমাদের যে লাগালাগি হয়েছিলো, সংবত সে কারণেও তার পাঞ্জাবি শিখ রক্ত কাজ করে থাকবে। আর সেই জেদ থেকেই তিনি হয়তো আমাদের এমন একটা ঝুঁকিপূর্ণ কঠিন অপারেশনের দিকে ঠেলে দিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, কাজটা আমরা করছি কি না, সেটা পরীক্ষা করে দেখবার জন্য তিনি সকালে গিয়ে অমরখানা অবজারভেশন পোষ্টে বসেছিলেন। প্রতিদিনের মতো অমরখানায় সেই চিহ্নিটি পঞ্চগড়

থেকে সেদিন আসে নি। তখনি তিনি বুঝে যান কাজ হয়ে গেছে। এরপর তাদের ইউনিটের বেতার কর্মী-বাহিনী পাকবাহিনীর ওয়ারলেস বার্তা ইন্টারসেপ্ট করে তার থেকে জানতে পেরেছে মুক্তিবাহিনীর অপারেশনে তাদের জিপ গাড়ি উড়িয়ে দেবার ঘটনা। সেই সাথে ৪ জন পাক আর্মির নিহত হবার খবর। আজ আর দয়াল সিংয়ের আমাদের অপারেশন সম্পর্কে সন্ধিহান হবার কিছু নেই। তিনি সেটা এরি মধ্যে যেমন জেনেছেন, তেমনি তার প্রমাণস্বরূপ তাঁর সামনে এখন উপস্থিত শক্ত সৈনিকের হতিয়ার, পোলাবারুদ এবং আনুষঙ্গিক জিনিসপত্র। আর এসব প্রামাণ্য নির্দেশনাই বলে দেয় অপারেশনের বাস্তব সফলতার খবর। আমাদের প্রতি তাই তাঁর ‘কলচারালেশন্স’, উভেষ্য বা ধন্যবাদের শেষ থাকে না। যাই হোক, সব কাজ শেষ হলে তিনি বলেন, কুছ চাহিয়ে? আমরা বলি, ছুটি চাই। উদারভাবে বলেন তিনি, মঙ্গল।

যুদ্ধের যয়দান থেকে একদিনের ছুটি মিলেছে। এটা একটা অভিবিত পাওয়া। অনুপস্থিতিতে পিন্টু রয়েছে হাইড আউটের চার্জে। কালাজোত থেকে হাইড আউট সরিয়ে আনা হয়েছে সোনারবানে। মালসামানসহ মুসাকে সোনারবান রওনা করিয়ে দিয়ে পথ ধরি জলপাইগুড়ির। ছুটি কাটানোর জন্য একজন যোগ্য সঙ্গীর প্রয়োজন। দুরু আজ আমার সেই সঙ্গী। আমরা দুঁজনে চলেছি জলপাইগুড়ি, সেখান থেকে যাবো শিলগুড়ি। শিলগুড়ি নয়, শিলগুড়ি শহরের চার কিলোমিটার আগে আমাইদিঘিতে। ওখানে গেলেই দেখা পাবো আফজালুর রহমানের। বাংলাদেশ থেকে এক সাথে চারজন সিলে সীমান্ত পাড়ি দিয়ে একটানা দুশো মাইল সাইকেল চালিয়ে আমরা প্রাথমিক আশ্রয় প্রয়োচিলাম যেখানে, আমাইদিঘির পাকা সড়কের পাশে সেই কোঠা বাড়িটায় যাবো প্রথমে। আফজালুর রহমানের বড় ভাইয়ের ক্ষেত্রবাড়ি সেটা। বাম রাজনীতির সাথে জড়িত স্টোন। ক্ষেত্রমজুর সমিতির নেতা আফজালুর রহমান ভারতে আসা অবধি সেখানে অবস্থানকার তাঁর দলীয় কাজকর্ম চালিয়ে যাচ্ছেন।

জলপাইগুড়ি থেকে শিলগুড়ির দূরত্ব ২৫/৩০ কিলোমিটারের মতো। পাকা সড়কপথ আসাম বেঙ্গল হাইওয়ে ধরে টেক্ট স্টেচিস প্রায় উড়িয়ে আনে আমাদের আমাইদিঘি পর্যন্ত। আমাইদিঘি জায়গাটা বাংলাদেশের উত্তর দিকের সর্বশেষ সীমান্ত বাংলাবান্ধার ঠিক উল্টেদিকে। মে মাসের ১৭ তারিখে আমরা যখন প্রথমে এখানে এসেছিলাম, তখন এখানে ছিল বিবাট অস্থায়ী শরণার্থী শিবির। শিবিরটি উঠে গেছে। জায়গাটা তাই এখন অন্যরকম লাগে। আফজালুর রহমান তো আমাদের পেয়ে হৈচৈ করে ওঠেন। তাঁকে বলি, বেঁচে আছি, আপনি কেমন আছেন? বিষণ্ণভাবে বলেন তিনি, ভালো কি থাকবার উপায় আছে? চারদিকে কতো সমস্য। কৃশ্ল বিনিয়ন পর্ব শেষ হতেই এবার আমি দূরুর সাথে পরিচয় করিয়ে দিই। ওকে তিনি আন্তরিকভাবে গ্রহণ করেন। এরপর বাড়ির ভেতরে নিয়ে যান তিনি। এ বাড়িতে তিনদিনের মতো অত্যন্ত দুঃসময়ে আশ্রিত হয়েছিলাম। তখন নিজের কোনো পরিচয় ছিলো না। আফজালুর রহমান আমাদের পাড়ায় তাঁর ভগ্নিপতির বাড়িতে থেকে কারমাইকেল কলেজ পড়াশোনা করতেন। আমাদের একেবারে লাগোয়া বাড়ি অর্থাৎ নিকট প্রতিবেশী হিসেবে চার ক্লাস সিনিয়র ছাত্র হলেও একটা নিবিড় সম্পর্ক গড়ে ওঠে তাঁর সাথে। তাদের নিজেদের আদি নিবাস পঞ্চম দিনাঙ্গপুরে। পঁয়বটি সালের যুদ্ধের পর তাদের পুরো পরিবার এক্সচেঞ্জ করে রংপুর জেলার শ্যামপুরের চন্দনপাট গ্রামে চলে আসে। সে গ্রামটির অবস্থান রংপুর ক্যাটলমেটের কাছাকাছি। আমাদের প্রতিবেশী মাহত্বাব সাহেব অর্থাৎ তাঁর ভগ্নিপতি ও সপরিবারে চন্দনপাটে এসে আশ্রয় নেন। সেখানে তাদের অবস্থানটা দারুণ বিপজ্জনক হয়ে

ওঠে। বিশেষ করে বয়স্ক মেয়েদের জন্য পরিবার কর্তাদের ভারতে পাড়ি জমানোর সিদ্ধান্ত নিতে হয়। পরিবারের সকল মহিলা সদস্য আর ছেট ছেলেমেয়েদের আগে বর্জন পার করিয়ে দেয়া হয়। পরবর্তীকালে তাদের নিজেদের সীমান্ত পাড়ি দেয়ার সময় আসে। তখন রংপুর শহরের চারদিকে একের পর এক বধ্যভূমি সৃষ্টি করে চলেছে অধিকৃত পাকবাহিনী। প্রতিদিন মানুষ মারছে তারা ঠাণ্ডা মাথায় আর বধ্যভূমিতে কোনোরকমে মাটি চাপা দিয়ে পুঁতে রাখছে। বিভাষিকাপূর্ণ এমন দিনে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ছাত্র ভাগনে সাইফুলসহ ভারতে পাড়ি দেবার জন্য চলে আসি চন্দপাটে। সেখান থেকে আফজালুর রহমান, কৃষি বিভাগের চাকুরে মাহতাব সাহেব এবং ভাণ্ডে সাইফুল ওরফে মুনাসহ রওনা দিই দীর্ঘপথ সাইকেলে চেপে। একান্তরে ১৬ মে সেদিন। ১৭ তারিখে এখানে অর্থাৎ আমাইদিঘিতে পৌছাই। মাহতাব সাহেব চলে যান তার পৈতৃক বাড়িতে, যেখানে তাঁর পরিবার আশ্রয় নিয়েছে। মুরাও তাঁর সাথে চলে যায়। আমি থেকে যাই মুক্তিবাহিনীতে নাম লেখাবো বলে। ১৯ তারিখে মুক্তিবাহিনীতে যাবার ডাক আসে বাংলাবাঙ্কা থেকে। আফজালুর রহমান থেকে যান। আমাইদিঘি শরণার্থী শিবিরের মোট ৭ জনের সাথে আমি যোগ দিই বাংলাবাঙ্কায় মুক্তিবাহিনীতে রিস্ট্রেটের উদ্দেশ্যে। সাতজনের সে দলে সেদিন মাঝবয়সী নুরুল হকও একজন সদস্য ছিলেন। এই নুরুল হকই পরবর্তীকালে চাউলহাটি ইউনিট বেসের উইং কমান্ডার হিসেবে দায়িত্ব পান এবং সকলের কাছে বড় ভাই হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন।

প্রায় চার মাস পর আবার সেই আমাইদিঘিতে এসেছি। এবার মুক্তিযোদ্ধা কোশ্চানি কম্যান্ডারের পরিচিতি নিয়ে। তাই ব্রাতৰিক কার্যক্রমে এখানে আঙ্গীকৃত সেই পুরনো শরণার্থী পরিবারগুলোর মধ্যে এবং স্বয়ং গৃহস্থীর কাছে আজ অন্যরকম কদর পাওয়া যায়। সবার চোখেমুখে আঘাত, কোতুল। সবাই জানতে চায় যুদ্ধ সম্পর্কে। চায় উন্তে অপারেশনের গন্ধ। তাদের আগ্রহের আতিশয়োর কাছে হার মেনে নিয়ে যুদ্ধের অর্থাৎ অপারেশনের দু'একটা ঘটনার কথা বলতেই হয়ে সময় একটা বড় জিনিস। সময় মানুষকে কোথা থেকে কোথায় নিয়ে যায়, তার ঠিকচিকিৎসা নেই। মাত্র চার মাসের ব্যবধানে আমরা এদের কাছে অনেক বড় কিছু এবং 'হিরো' বলে শেষ। সবার চোখেমুখে সমীহ, এমনকি আফজালুর রহমান পর্যন্ত সমীহ করে কথা বলছেন।

— চলো কোটগোছ যাই, ওদের দেখে আসি, আফজালুর রহমান বলেন।

আমার তখন চকিতে মনে পড়ে, দু'পাশে ঝাঁকড়া গাছগাছালির সারি। তার ভেতর দিয়ে একটা চমৎকার পিচালা সোজা পথ। মনে পড়ে সে পথে হজুরোলা রিকশায় বসে মরালির গ্রীবামণ্ডিত পরীর মতো উড়ে যাওয়া সেই মেয়েটির কথা।

— তোমার ভাণ্ডেরও খোজ নেয়া হবে, আমার নিজেরও বোন-ভগ্নিপতি, ভাগ্না-ভগ্নিদের খবর নেয়া হবে। চলো যাই, আফজালুর রহমান আবার জোর দিয়ে বলেন।

অফিসিয়ালি ছুটি নিয়ে এসেছি, এখন যুদ্ধ নেই, দায় নেই, দায়িত্ব নেই, নির্ভর মুক্ত লাগছে এখন নিজেকে। ছুটি কাটাতেই তো এসেছি, সুতরাং প্রস্তাব মতো যাওয়ার ব্যাপারে ভেতর থেকে আপনির বাধা এলো না।

— ঠিক আছে চলেন, আমি তাঁর প্রস্তাবে সায় দিয়ে বলি। দেখলাম, দুলুও সানন্দ সায় রয়েছে এতে। অতএব আমাইদিঘি থেকে শিলিশুড়ি, সেখান থেকে পর্যটক দিনাজপুরের ইসলামপুরের উদ্দেশ্যে গাড়ি ধরি। হিমালয়ের পাদদেশ দিয়ে উঁচু হাইওয়ে ধরে ছুটে চলে

সরকারি বাস। জানালার পাশে সিট। ঢোক তুলে তাকালেই দেখা যায় ডানে হিমালয়ের কালো বিশাল শরীর যেন কোনো মূনি-ঝরির মতো গভীর ধ্যানে মগ্ন। তার অবয়বে শত সহস্র বছরের সেই ধ্যানমগ্নতারই ছাপ যেনো অঙ্কিত। মাথায় তার সুউজ্জ্বল বরফখচিত মুরুট। হালকা ধ্বল মেঘ দলের পাহাড়ের গায়ে ভেসে বেড়ানো আর লুকোচুরি খেলা। জানালা দিয়ে মাথা গলালেই উজ্জ্বল বাতাসের ঝাপটা মাথার চূল এলোমেলো করে দেয়। মনের গভীর থেকে ভেসে আসে তালো লাগার এক অনাবিল অনুভূতি। এই অবস্থায় দুলু গান ধরে, ‘ও আমার দেশের মাটি তোমার ‘পরে ঠেকাই মাথা...’’ ওর গানের সাথে গলা মেলাই আমরা। সারাটা পথ কেটে যায় একই গানের কলি বারবার ঘূরিয়েফিরিয়ে গাইতে গাইতে।

বিষণ্ণ বদন সেই মেয়েটি

সঙ্ক্ষ্যার আগেভাগে কোটগোছ পৌছনো গেলো। উষ্ণ সংবর্ধনা সেখানে সকলের তরফ থেকে। প্রাথমিক কৃশল বিনিময়ের পর আপ্যায়নের ব্যবস্থা। এখানেও সবাই হিসেবে দেখছে আমাদের। তাম্ভে মুন্নাকে দেখে মনে হলো, সে কষ্টের মধ্যে রয়েছে। লাঞ্ছুক কিন্তু উচ্চাভিলাষী সম্ভাস্ত ছেলে মুন্না। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর কমিশন অফিসার হতে চায় ও। হতে যদি পারে ভালোই তো!

গঞ্জে গঞ্জে রাত হয়ে যায়। এক সময় দেখা হলো মরাবিলিজ্ট্রিভার্টসি নিয়ে উড়ে যাওয়া সেই মেয়েটির সাথে। কেমন যেনো সে মিহয়ে গেছে। কষ্টে আছে এরা সবাই এখানে, স্পষ্টত বোৰা যায়। শরণার্থী হিসেবে কার্ড পাওয়াতে সাধারিক মেশেন এরা পায়। তাই দিয়ে এবং নিজেদের সম্পত্তি থেকে পাওয়া কিছু ফসল দিয়ে দিন চলে যাওয়া। কিন্তু এভাবে কতোদিন চলবে? দেশ কি স্বাধীন হবে না? কবে হবে জয় বাংলা? এইর দেশের মাটিতে ফিরতে পারবো? মাহতাব সাহেবসহ সবার এই এক প্রশ্ন, এক জিজ্ঞাসা। এ জিজ্ঞাসার সম্মুখীন আমাদের হতে হয় সব জায়গায়। সবাই আমাদের কাছে প্রজ্ঞাত্প্রত্যাশা আর বিশ্বাস নিয়ে এসব প্রশ্নের উত্তর খোঁজেন। আমরা সমরাঙ্গনে যুদ্ধ করছি, এসের সবার ধারণা, এসব প্রশ্নের জবাব একমাত্র আমরাই দিতে পারবো। কিন্তু আমাদেরও কি জানা আছে এসব প্রশ্নের জবাব? দেশ কি কোনোদিন স্বাধীন হবে, হবে না, এরকম প্রশ্নের উত্তর যুদ্ধের মাঠে বসে আমরা নিজেরাই তো খুঁজে ফিরছি।

রাতে আফজালুর রহমান দূরে একটা গ্রামে নিয়ে যান আমাদের। সেখানে দেখা হয় আশৰাফুল নামের দুবলা-পাতলা লসা মতোন এক ভদ্রলোকের সাথে। পঞ্জগড়ের ভাসানী ন্যাপের নেতা তিনি। খুবই গভীর বিশ্লেষণধর্মী কথাবার্তা তাঁর। এখান থেকে সরাসরি যুক্তিযোক্তাদের নিয়ে মীরগড়ের দিকে তিনি নিয়মিত অপারেশনে যান। ভালো লাগে ভদ্রলোককে। রাতে ফিরে এসে ঘুমুতে যাবার সময় কোটগোছ ফ্রন্টে ধমাধম শেলিং শুরু হয়ে যায়। যুদ্ধ চলতে থাকে রীতিমতো। এখানে ছুটিতে এসেও বিছানায় শুয়ে যুদ্ধের পরিচিত শব্দ শুনতে হয়। কিন্তু কী করা যাবে, সারাদেশটাই তো এখন যুদ্ধক্ষেত্র! সুতরাং যুদ্ধের হাত থেকে পালাতে চাইলে তো আর পালানো যায় না।

সকালে বিদায় নেবার সময় আমাদের জন্য অত্যন্ত গভীর মহত্ব আর মেহ বারে পড়ে মাহতাব সাহেব আর তাঁর স্ত্রীর গলা থেকে। তারা আশীর্বাদের ব্রহ্মে বলেন, ভালো থেকো, খুব বেশি রিক্ষ নিও না। তোমার জন্য আমাদের সবাইকে দুচ্ছিমায় থাকতে হয়, এ ধরনের কথা বলেন তাঁরা। তাদের কথার জবাবে আমি বলি, আপনারা ভেঙে পড়বেন না। কোনো

অসুবিধা হলে খবর পাঠাবেন, স্ফরণ করবেন যে কোনো বিপদে। বাড়ির সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে পাকা সড়কে পা রেখে বাসট্যান্ডের দিকে হাঁটতে থাকি। আমরা যখন বিদায় নিয়ে চলে আসছি, তখন সেই মরালি ঝীবার মেয়েটাকে দেখা যায় নি। গভীর সত্ত্ব দৃষ্টি তাকে খুঁজে বেঢ়ায়। বাড়ির পেছন দিক দিয়ে যখন চলে আসছি, তখন তাকে দেখা যায় একটা গাছের গায়ে ঠেস দিয়ে একলা দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায়। কেমন বিষণ্ণ আর নিতান্ত একা ও অসহায় মনে হয় তাকে। সে কী কিছু বলতে চেয়েছিল আমাকে এখানে এভাবে একান্তে একাকী দাঁড়িয়ে? কি জানি? হয়তো এমনিতেই দাঁড়িয়েছিলো। এমনও তো হতে পারে হয়তো অবস্থার বিপক্ষে এখানে এ অবস্থায় নিজেকে সে খাপ খাওয়াতে পারছে না।

গাড়ি ছেড়ে দেয়। ছুটি ফুরিয়েছে। আবার যুক্তের ময়দানে ফিরে যাওয়ার পালা। সকালের নরম আলোয় বিষণ্ণ বদন সেই মেয়েটার ছবি বারবার মনে পড়তে থাকে। মন বলে, এদের জন্যই তো আমরা লড়ছি। হয়তো দেশ স্বাধীন হবে একদিন। আবার স্ব-মহিমায় দেশে নিজেদের বাড়িতে ফিরবে এরা। স্বাধীন দেশে আবার মেয়েটি হড় খোলা রিকশায় চড়ে পরীর মতো উড়ে যাবে কারমাইকেল কলেজের সেই মসৃণ সোজা ছায়াময় পথ ধরে। আসবেই সেদিন অবশ্যই আসবে একদিন।

১২. ৯. ৭১-১৩. ৯. ৭১

আফজালুর রহমান : হাইড আউটের অতিথি

আফজালুর রহমানকে সাথে করে নিয়ে আসি সোনারজানে। মতিয়ার রহমান সেদিনই অর্থাৎ ১৪ সেপ্টেম্বর তারিখে মারা যায় অমরখানা অক্ষয়শেখ। শুরুতরভাবে আহত হয় জহিরুল। ঘেনেড বিক্ষেপণে সমস্ত শরীরে আঘাত পাইয়ে একেবারে রক্ষণ্য অবস্থায় কেবল মনের জোরে চেতন-অবচেতনের একটা মাঝেমাঝে অবস্থার ভেতর দিয়ে নিজেকে টেনে নিয়ে যায় সীমান্তের ওপার পর্যন্ত। একেবারে স্বত্ত্বায় অবস্থা থেকে তাকে উদ্ধার করা হয়। মতিয়ারের লাশ উদ্ধার করা হয় অমরখানা প্রায়ে ঢুকবার রাস্তার মোড় থেকে। জহিরুলকে চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয় বাগড়োগড়া কস্বাইত মিলিটারি হাসপাতালে। চাউলহাটি ইউনিট বেসের তৃতীয় শহীদ মতিয়ার। তাকে যথাযথ মর্যাদায় গান স্যাল্যুটের ভেতর দিয়ে সমাহিত করা হয় ভজনপুর বাজারের পাকা সড়কের ধারে।

আফজালুর রহমানকে ছেলেরা অসম্ভব আত্মিকতার সাথে গ্রহণ করে। মিনহাজ দ্রুত তাঁর মেহমানদারিতে শশব্যস্ত হয়ে পড়ে। পিন্টু বলে, এ দু'দিন মো অপারেশন মাহবুব ভাই। কড়া সেন্ট্রি ডিউটি, রাতে পেট্রল আর সারাদিন শয়ে-বসে বিশ্রাম। দু'দিন পর হাইড আউটে ফিরে এসে মনে হয় নিজেদের একান্ত জগতে ফিরলাম। শহরের চাকচিক্য, যানবাহনের ব্যস্ততা, বিপণি কেন্দ্র, জনতার গিজগিজে ভিড়, আয়েশি নাগরিক জীবন, অন্যদিকে শিক্ষা আর কৌলীন্যের পালিশহীন বর্তমান এই বাস্তবতাকে নিয়ে গড়ে উঠা আমাদের হাইড আউটের জীবন। সমাজের বিভিন্ন স্তর থেকে আগত ছেলেদের নিয়ে জীবন আর মৃত্যুর মাঝখানে গড়ে উঠা অতি আপন সংসারের চৌহানিতে এখন আমাদের বসবাস। ছেলেদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা রয়েছে, বিভিন্নতা রয়েছে, রয়েছে চিন্তা আর চেতনার মধ্যে বিস্তৃত ফারাক। সেই ফারাক শিক্ষিত ও অশিক্ষিত ছেলেদের মধ্যে, তাদের কথাবার্তা ও চালচলনে। ফারাক রয়েছে ধৰ্ম ও দরিদ্র আর কৃষক-মজুর ও নিঃশ্ব পরিবার থেকে চলে আসা ছেলেদের অভ্যাস ও আচরণে।

কিন্তু বিগত চার মাস ধরে একই লক্ষ্য আর উদ্দেশ্য নিয়ে বিপদসঙ্কল ও প্রতিকূল পরিস্থিতি দিনবারাত একই পরিমাণে বসবাসরত ছেলেদের পরম্পরের মধ্যে নেকট্য এনেছে, এনেছে একের প্রতি অন্যের সহযোগিতা ও সহমর্মিতাবোধ আর দৃঢ়-কষ্ট সমানভাবে ভাগ করে নেয়ার মানসিকতা। নিজেদের এই আপন জগতে ফিরে এসে তাই ভালো লাগে খুব। মনে হয়, এই যে দুসময় আর দুর্দিনে যুদ্ধের মাঠে বনবাদাড়ে ঝোপে-জঙ্গলে বৃষ্টি-বাদলায় থেয়ে না থেয়ে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে আমাদের সকলের সম্মিলিত সংগ্রামে জয় বাংলা সৃষ্টির যে প্রয়াস, একটা স্বাধীন জাতি হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য যে মহান স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ এবং এর দ্বারা সৃষ্টি একজনের প্রতি আরেকজনের যে গড়ে ওঠা আঞ্চলিক সম্পর্ক, তা হয়তো কোনোদিনই হারাবার নয়।

পিন্টু বলে, বাঁচলায় আমি। জিগ্যেস করি কেনো? হাসতে হাসতে সে বলে, এতোগুলো মানুষের জীবনের হয়ে থাকার ব্যাপারটা খুব কষ্টকর। আপনি আসলেন, বেঁচে গেলাম আমি। মুসা বলে, খানের দল আসতে পারে যে-কোনো সময়। এ জায়গাটা আর নিরাপদ নয়। এ দুর্দিন কী করেছে? জিগ্যেস করি পিন্টুকে। অঞ্জন বদনে সে বলে, খাওয়া-ঘুম আর সেন্ট্রি ডিউটি। একরামুল বলে, রাইতোত পেট্রল ডিউটি ও দিছি হামরা।

মিনহাজের পরিবেশনায় চা-নাস্তা আসে। আফজাল সাহেবকে সকলে আস্তরিকভাবে গ্রহণ করে, তিনিও সহজ হয়ে যান সকলের কাছে। রাতের অন্ধকারের পর বসে আলোচনা সভা। আফজালুর রহমান রাজনীতির সাথে জড়িত মানুষ, তাঁর কাছে ছেলেদের জিজ্ঞাসার শেষ নেই। ভারতীয় সেনাবাহিনীর অফিসারদের কমান্ড, অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ সরবরাহ, রেশন, ভাতা, চিকিৎসা ব্যবস্থা, পোশাক-আশাক সরবরাহসহ নানা ধরনের অভাব-অভিযোগের কথা উত্থাপিত হয়, আলোচিত হয়। সব থেকে প্রাণে জড়িত প্রশ্ন যেটা, সেটা হচ্ছে, আমাদের তথা যুক্তিযোক্তাদের বিচ্ছিন্নতার ব্যাপারটি। অন্য শব্দে ভারতীয় কমান্ডের অধীনে এভাবে ছেড়ে দিয়ে কেউ আমাদের কোনো খোজখবর নেওতেন কেনো? আমরা কেমন আছি, কেমন যুদ্ধ করছি, কী ধরনের প্রতিকূলতা এই যুদ্ধের মাঠে বিরাজমান— এইসব দেখতে কেউ আসে না কেন? আপনি কেনো আসেন না? সরাসরি প্রশ্নে আফজালুর রহমান অস্ত্রির হয়ে ওঠেন। ছেলেদের এক ঘোক প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে তিনি বিচলিত বোধ করেন। বায় রাজনীতি তথা কমিউনিটি পার্টির সাথে জড়িত তিনি। এ যুদ্ধ তাঁর দল পরিচালনা করছে না। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রবাসী সরকার গঠিত হয়েছে। সহায়ক শক্তি হিসেবে তারা যুক্তিযুক্ত শার্মিল হয়েছেন। যুদ্ধের এ পর্যায়ে তাঁদের দলের নীতি ও ভূমিকার আওতায় তাঁর দলের কর্মকাণ্ড পরিচালিত। অতএব আফজালুর রহমান সব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন না। তবুও তিনি চেষ্টা করেন তাঁর ব্যক্তিগত চিন্তাচেতনা থেকে প্রশ্নগুলোর জবাব দিতে।

দীর্ঘ ও প্রলম্বিত যুদ্ধের সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা হয়। আলোচনায় আসে ভিয়েতনাম, কয়েডিয়া ও লাওসসহ অন্যান্য দেশের যুক্তি সংগ্রামের কথা। চে শয়েভারা, হোচিমিন, ফিদেল ক্যাটো এইসব নাম বারবার ঘুরেফিরে আসে উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতো। যুদ্ধটা চলবেই, পাকিস্তানের সাথে কোনোভাবেই আর মীমাংসায় পৌছানো যাবে না। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের তাকে এ যুদ্ধ। এ যুদ্ধ থেকে ছেলেদের আর ফেরানো যাবে না। বিশ্বের সকল সমাজতাত্ত্বিক দেশ এ যুদ্ধে আমাদের সাপোর্ট করছে, চীন কেনো করছে না? একটা জাতি যখন মুক্তির জন্য সংগ্রামে লিপ্ত, যখন পাকিস্তানি দখলদার বাহিনী সমস্ত দেশকে পদচালিত করে রেখে

এক ভয়াবহ আর নৃশংসতা নিয়ে হত্যায়জ্ঞে মেতেছে, সেখানে মুক্তিকামী বিশ্বের পক্ষে মানবতাবাদী ও সমাজবাদী চীন আমদের সাপোর্ট না করে পাকিস্তানকে সাপোর্ট করছে, এ কী করে হয়? পূর্ব ইউরোপের সমাজতাত্ত্বিক দেশের অন্ত আর গোলাবারুদ দিয়ে আমরা যোকাবেলা করছি আরেকটি সমাজতাত্ত্বিক দেশের অন্ত সঞ্চারে। কমিউনিজম সোশ্যালিজম তো মানুষের মুক্তির জন্য, সব ধরনের শোষণ থেকে মুক্তির জন্য। তবে একই আদর্শে বিশ্বাসী দৃষ্টি সমাজতাত্ত্বিক শিবির কেনো দুই নীতি গ্রহণ করছে? একপক্ষ সমর্থন করছে বাঙালির মুক্তি সংগ্রামকে, অন্যপক্ষ সমর্থন করছে এই মহান যুদ্ধের বিরোধীপক্ষকে। আফজালুর রহমান এর জবাব দিতে গিয়ে খেই হারিয়ে ফেলেন।

আমার নিজের কাছে অবাক লাগে এই ভেবে, রাজনীতি, এটা এমন একটা জিনিস, যা সহজ সূত্র দিয়ে বুঝবার উপায় নেই। আমেরিকা আর চীন দুটি দেশ নীতিগতভাবে দুই মেরুর অবস্থানে এবং উভয়েই একে অপরের শক্তি। অথচ তারা ভারত বিরোধিতার নামে কি সুন্দরভাবে একই নীতি গ্রহণ করে পাকিস্তানকে পেছন থেকে সব ধরনের সাহায্য-সহযোগিতা আর মদদ দিয়ে যাচ্ছে। আমেরিকার ব্যাপারটা তবু বোৰা যায়, কিন্তু চীনের ব্যাপার-স্যাপার তো সব মাথা গুলিয়ে দেবার যোগাড় করছে। মানব জাতির মুক্তির প্রতীক মাও সেতু, চৌ এন লাই— এরা কেনো বাঙালির মুক্তির জন্য সমর্থন ব্যক্ত করছেন না? কেনো মাওলানা ভাসানী তাদের সমর্থন আদায় করতে পারছেন নাঃ? এসব ঘূর্ণাওয়াই বারবার ঘূরেফিরে আসে আলোচনায়। এই জঙ্গলধেরা বসতিতে, ঘনকালো বাস-স্বাদলের রাতে আমরা আলোচনায় মগ্ন! এক অনিচ্ছিত ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে এসব প্রশ্নাই বারবার ঘূরেফিরে আসে, কেনো সমাধান ধরা দেয় না সহজে। কিন্তু অমরখান প্রতিক থেকে টাক-ডুম ধ্বনি তুলে হঠাতে করে সরব হয়ে ওঠা চাইনিজ হাতিয়ারগুলো যেজো প্রের জবাব দিয়ে দেয়।

শহীদ মতিয়ার রহমান

মনে হয়, কাছাকাছি কোথাও পাকিস্তানী তাদের আঘাত হেনেছে। দ্রুত উঠে দাঢ়াই। পিন্টুকে আফজালুর রহমানের নিরাপত্তার ভার দিয়ে মুসা আর একরামুলসহ একটা দল নিয়ে এগিয়ে চলি। গোলাগুলির উৎসের সঞ্চানে। শালমারা বিজের কাছাকাছি গিয়ে মনে হয়, অমরখানা গ্রামের দিকে একটা খণ্ডুদ্ধ চলছে। আরো কিছুটা এগিয়ে আলতাফ কেরানির বাড়ির কাছ পর্যন্ত যাই। সেখানে অবস্থান নিয়ে পাকবাহিনীর গোলাগুলির উৎস লক্ষ্য করে সবগুলো হাতিয়ার থেকে একযোগে গুলিবর্ষণ শুরু করি। পাকবাহিনীও কিছুক্ষণের মধ্যে তাদের জবাব পাঠাতে থাকে তীব্রতার সাথেই। চারদিকে ঘৃতঘৃটে অঙ্কার। এই অঙ্কারের আড়াল নিয়ে দুই শক্তি বাহিনীর সাথে জমে ওঠে এক ধরনের লুকোয়ির যুদ্ধ। কেউ কাউকে দেখে না। শুধু অঙ্কের মতো গুলি ছেঁড়ান্ডি চলে অদৃশ্য প্রতিপক্ষকে লক্ষ্য করে স্ব-স্ব অবস্থান থেকে। আমরা আর এন্তো না, কিন্তু আমাদের প্রতিপক্ষ এন্ততে পারে, এ সংজ্ঞবন্ধ ছিলো। কিন্তু তারা আর এগিয়ে আসে না। রাতের অঙ্ককারে শক্তির দিকে এগনোটা বিপজ্জনক, এটা জাত শক্তি সৈনিকেরা তাদের অভিজ্ঞতা থেকে জেনে গেছে। প্রায় ঘন্টাখানেক এভাবে একনাগাড়ে গোলাগুলি চালানোর পর মধ্যরাতের খণ্ডুদ্ধ শেষ হয়। হলেও আরো ঘন্টাখানেক অবস্থানে থেকে ফিরে আসি হাইড আউটে, তখন ভোরের আলো ফুটে উঠেছে পুবের আকাশে।

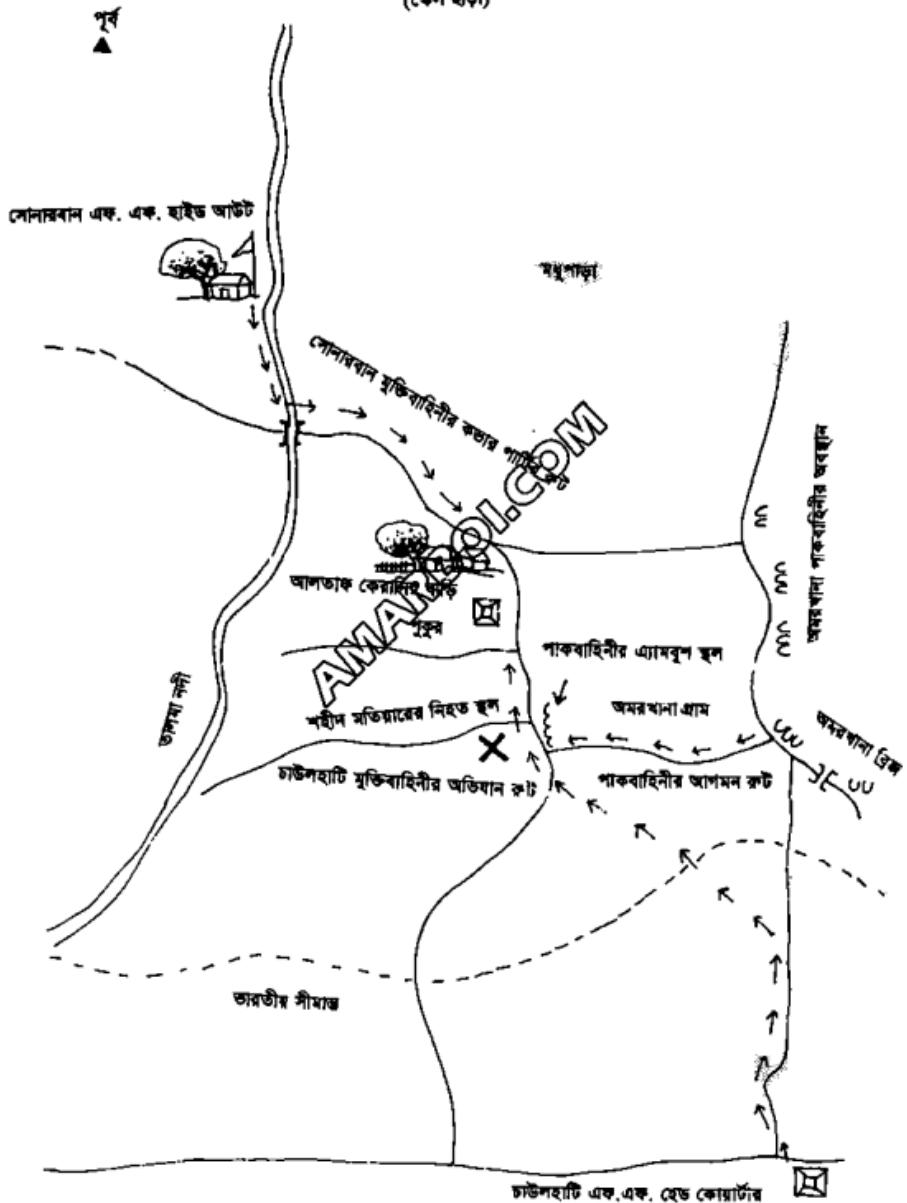
সকাল ৯টার দিকে খবর আসে গতরাতে অমরখানার যুদ্ধে মতিয়ার মারা গেছে এবং

জহিরুল আহত হয়েছে গুরুতরভাবে। সোনারবান থেকে এগিয়ে গিয়ে আক্রমণকারী পাকবাহিনীকে প্রতিহত না করলে আরো বড় ধরনের ম্যাসাকার হতে পারতো। মতিয়ারের মৃত্যু এবং জহিরুলের আহত হওয়ার ঘটনা হাইড আউটের ছেলেদের ভেতরে শোকের ছায়া ফেলে। বিষ্ণু গলায় একরাশুল বলে, এর মধ্যে ৩ জন গেলো মাহুর ভাই। আর কঙ্গোজন যে যাবে, তার ঠিক নেই! ভজনপুরের ছেলে হাফেজসহ অন্য কয়েকজন হাউমাউ করে কেঁদে ওঠে, চোখ মুছে হাতের তালু দিয়ে। অন্য ছেলেদের মনেও তাদের এই শোকের বহিঃপ্রকাশ সংক্রমিত হয়। ভজনপুরে বাড়ি শহীদ মতিয়ারের। হাফেজের আশ্চর্য, দূর সম্পর্কে। তার কান্নার উন্নাদনাটা স্বাভাবিক কারণে তাই একটু বেশি। এই রকম শোকাচ্ছন্ন পরিবেশে সমস্ত হাইড আউটটা যেনো বিমিয়ে পড়ে। রাতে অনেকটা অনুমানের ওপর নির্ভর করে এগিয়ে গিয়ে পাকিস্তানি আক্রমণ প্রতিহত করার পরও মতিয়ারকে বাঁচানো গেলো না। আহত মৃতপ্রায় জহিরুলকে কি বাঁচানো যাবে? কে জানে?

চাউলহাটি ইউনিট বেস থেকে আসা রানারের কাছ থেকে বিস্তারিত জানা যায়। ইউনিট বেস হেড কোয়ার্টারের স্ট্রাইকিং ফোর্সের সাহায্যে ক্যাপ্টেন দয়াল সিং অমরখানা এলাকায় শক্ত বাহিনীর পেছন থেকে আঘাত হানার জন্য পরিকল্পনা হাতে নেন। গুরুত্বপূর্ণ এই অপারেশনগুলো পরিচালনার জন্য কিছু সাহসী আর বাছাই করা ছেলের প্রয়োজন হয়। দয়াল সিংয়ের চাহিদা অনুযায়ী বাসারতসহ ৭ জনকে পাঠানো হয় চুজিহাটিতে আমাদের দল থেকে। চাউলহাটি ইউনিট বেসে তখন তিনজন মতিয়ার। মতিয়ার-১-এর বাড়ি পঞ্চগড়ের বোদা থানা এলাকায়। মতিয়ার-২ এসেছে কুড়িয়াম থেকে। তার ঝাতুয়ার-৩ এসেছে পঞ্চগড়ের ভজনপুর এলাকা থেকে। মতিয়ার-১ যুুক করছে পেয়াদানগড় এলাকায় আহিদার-বাদিউজ্জামানের দলের সাথে। মতিয়ার-২ ও মতিয়ার-৩ চাউলহাটি ইউনিট বেস হেড কোয়ার্টারে। ১৪ তারিখ রাতে ক্যাপ্টেন দয়াল সিং হেড কোয়ার্টার থেকে একটা দলকে পাঠিয়েছিলেন অমরখানা পাক ঘাটিতে পেছন থেকে আক্রমণের নির্দেশ দিয়ে। ভারতীয় প্রতিরক্ষা লাইন পার হয়ে দলটি সরাসরি সীমান্ত পেরিয়ে চুকেছে অমরখানামের উত্তর প্রান্তের রাস্তায়। সেখানেই তাদের সাক্ষৎ হয় একটা টহলদার রাজাকার হৃপের সাথে। তারা রাজাকার দলের দুঁজন সদস্যকে ধরে ফেলে অন্তসহ, অন্যরা পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। রাজাকার দুঁজনকে বেঁধে ফেলে জহিরুল আর মতিয়ার-৩কে তাদের পাহারায় রেখে দলটি এগিয়ে যায় সোজাসুজি, যাতে তারা অমরখানা পাক ঘাটিতে ঠিক পেছন থেকে আঘাত হানতে পারে এমন সুবিধামতো স্থানে।

জহিরুল আর মতিয়ার রাজাকার দুঁজনকে রাস্তার পাশে রেখে তাদের পাহারা দিতে থাকে এবং অধীর আঘাত নিয়ে অপেক্ষা করতে থাকে তাদের মূল দলটির কাজ শেষে ফিরে আসবার। তারা যে জায়গায় রাজাকার দুঁজনকে নিয়ে অপেক্ষা করছিল, সেখান থেকে একটা সরু হাঁটাপথ চলে গেছে দক্ষিণে অমরখানা গ্রামের দিকে। অক্ষকার কালো রাত। আকাশে জ্যুটি মেঘ। বৃষ্টি-বাদলার দিন। চারদিকে ফসলের খেত। বর্ধার পানিতে টাইটস্লুর। রাস্তার ওপর বৃষ্টি ভেজা ঘাস কান্দা পানিতে পিছল পথ। নিকষ কালো আঁধারে আশপাশের পরিবেশ ভালোভাবে দৃশ্যমান নয়। অক্ষকারে জোনাকির মেলা, রাস্তার আশপাশের বোপ আর ফসলের খেত থেকে ভেসে আসে ব্যাঙের ঐক্তান এবং সেই সাথে নানা ধরনের পোকামাকড়ের একঘেয়ে ডেকে চলার শব্দ। এছাড়া আর কোনো কিছুর অঙ্গত্ব নেই। কেমন যেনো একটা নিঃসাড় থমধরা পরিবেশ। রাজাকার নিয়ে এভাবে অপেক্ষা করাটা ওদের দুঁজনের কাছে

কেচ মাপ-২
পাকবাহিনীর এ্যামবুশ ও শহীদ মতিযার
৩৪-১-৭৩
(কেল ছাড়া)



ভালো ঠেকে না। মূল দল ছেড়ে তাদের যাবারও উপায় নেই। তাই ওরা রাজাকার দুঁজনকে রাস্তার পাশে বসিয়ে রেখে হাঁটাহাঁটি করতে থাকে। তখন এক ঝাঁক গুলি ধেয়ে আসে ওদের লক্ষ্য করে। খুব কাছ থেকেই। কিছু বুবুবার আগেই মতিয়ার গুলিবিদ্ধ হয়ে পড়ে যায়। তখুন তাই নয়, পড়ে যাওয়ার পর গুলিবর্ষণের সাথে ওদের লক্ষ্য করে চলে ফ্রেনেড হামলা। অমরখানার সেই দক্ষিণযুবী রাস্তা ধরে পাক সৈনিকের দল এভাবেই চুপিসারে এসে ওদের ওপর আচমকা ঝাপিয়ে পড়ে। পালিয়ে যাওয়া রাজাকারের দল তাদের দুঁজন ধৃত সাথীকে উদ্ধার করার জন্য অমরখানা ঘাঁটি থেকে পাক সৈনিকের দলটিকে নিয়ে আসে। মতিয়ার রাস্তার ওপর লুটিয়ে পড়ার সাথে শেষ নিষ্পাস ত্যাগ করে। জহিরল্ল গুরুতর আহত অবস্থায় রাস্তার পাশে ঢালে পড়ে যায়। পাক সৈনিকের দল মতিয়ারকে সেখান ফেলে রেখে রাজাকার দুঁজনকে উদ্ধার করে ফিরে যাবার সময় এগিয়ে যাওয়া মুক্তিযোদ্ধা দলের সাথে খণ্ডুদে লিপ্ত হয়। গুলি এবং ফ্রেনেড হামলার শব্দ পেয়েই বিপদের বিপর্যটি আঁচ করে ওরা দৌড়ে আসছিলো জহিরল্লদের কাছে। তাদের উভয়ের মধ্যে গুলিবিনিময় চলতে থাকে। জহিরল্ল এরি মধ্যে তার জ্ঞান ফিরে পায় এবং নিজেকে বাঁচানোর তাড়নায় সম্পূর্ণ ইচ্ছেশক্তির জোরে সে আহত ও রক্তপূত অবস্থায় টলতে টলতে সীমান্ত পার হয়ে এসে একটা চৰা খেতের ওপর অজ্ঞান অবস্থায় মৃতের মতো পড়ে থাকে। সকালে অচার্বত্তী লাইনের অবস্থানে থাকা বি.এস.এফ বাহিনী তাকে উদ্ধার করে এবং মৃত মৃত্যুরকে সবাই মিলে উদ্ধার করে নিয়ে যায় অমরখানা গ্রামের সেই রাস্তার ওপর থেকে। একটা সফল অপারেশনে দুঁজন রাজাকারকে অন্তর্সহ জীবন্ত বন্দি করেছিলো ওরা। ক্ষতি অপারেশনের শেষ পর্যায়ের কাজে জড়িয়ে পড়তে গিয়ে পুরো মিশনটারই দুঃখজনক সাময়িক ঘটলো। রাজাকার দুঁজনকে ধরে আনা গেলো না। কিন্তু নিহত হলো সাহসী যুদ্ধক মতিয়ার। আর সদা চক্রে সকলের প্রিয় সহযোগ্য জহিরল্ল গুরুতর আহত অবস্থায় চুতার সাথে লড়ছে এখন পাঞ্জা।

১৪. ৯. ৭১

খান এসেছে

রাতভর কাজ শেষে সরাসরি গড়ালবাড়ি যাছি রিপোর্ট করার জন্য। হাইড আউট সোনারবানে ফিরে যাওয়া হয় নি, রাতজাগা ছেলের দল নিয়েই চলেছি গড়ালবাড়ি। ক্যাপ্টেন দয়াল সিং সেখানে অপেক্ষা নিয়ে বসে থাকবেন। টোকাপাড়া গড়টার ওপর আসতেই পেছন থেকে একদল মানুষের হাঁকডাক আর তাদের ছুটে আসতে দেখা যায়। জয়নাল-মতিনরা মানুষগুলোর আগে আগে দৌড়ে আসছে আর সেই সাথে তাদের তিক্কার করে ডাকাডাকি, মাহবুব তাই, পিটু তাই থামেন। ওদের এভাবে পাগলের মতো ছুটে আসার ব্যাপারটা দেখে মনের মধ্যে শক্ত জাগে। নিচয়ই কোনোরকম বিপদ ঘটেছে! তা নাহলে ওরা এভাবে ছুটে আসছে কেনো? গড়টার ওপরে তখন উঠে গেছি। ওপারের ঢালের পাড়েই ভারতীয় সীমান্ত। আমাদের আর সীমান্ত পেরুনো হয় না। দাঁড়িয়ে থাকি দ্রুত ধাবমান লোকগুলোর জন্য।

জয়নাল-মতিনরা কাছাকাছি এসে পৌছায়। আর আসতেই আমাদের জিজ্ঞাসা, কী হয়েছে, এভাবে দৌড়াচ্ছিস কেনো? এ জিজ্ঞাসার উত্তরে এক সাথে ওরা বলে ওঠে, খান আসছে, খান আসছে।

— খান আসছে কোথায়? জিগ্যেস করি আবার।

— ভেতরগড়ে।
— ভেতরগড়ে? ভেতরগড়ে কোথায়? কতোজন? বিস্তারিত জানতে চাই।
— অমরখানা রাস্তা ধরে আসছে, ১৫/২০ জন। এতোক্ষণে বোধহয় পৌছে গেছে মতিনের বাড়ি পর্যন্ত।

মনটা একেবারে তেতো হয়ে যায় এ স্থাদে। সারারাত কেটেছে টহলদারিতে। নির্দিষ্ট কাজ শেষ করে শেষ রাতের দিকে মতিনের বাড়ির সামনে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেয়া হয়েছে। শেষ রাতে মতিন চা আর চিড়ে ভাজা খাইয়েছে। মতিনের বাড়িতে এর আগে ওরা একবার হামলা চালিয়েছিলো। সেবার পিন্টুসহ অন্যরা কেবল কপাল গুণেই ধরা পড়ে নি। মতিনের পরিবারসহ তাদের পুরো বসতি এ ঘটনার ফলে ভয়ে অস্থির। পাকবাহিনী মতিনকে টার্গেট করে ফেলেছে। শুধু তাই নয়, এই সাথে তারা জেনে ফেলেছে মুক্তিবাহিনীর কালো জামা আর লুঙ্গি পরা দুই কমান্ডার অর্ধৎ মাহবুব ও পিন্টু মানিকজোড়কে। একজন একহারা পাতলা আর একজন মোটা নাদুনন্দুস ঢেহারা। সে রাতে মতিনদের বাড়ি রেইড করার পর তারা বারবার উচ্চারণ করেছে এই দুটো নাম। রাণে গড়গড় করতে করতে তারা বলেছিলো, কাঁহা শিয়া শালে মেহবুব, শালে পিন্টু। রাতের টহলদার পার্টি নিয়ে বেরুলে কিংবা অপারেশনে যাবার সময় কিংবা ফিরে আসবার সময় মতিনদের বাড়িটাকে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেয়ার জায়গা হিসেবে ইদানীং ব্যবহার করা হয়। যতো রাতই হোক মতিনের মিস্টা-চাচারা আমাদের হাসিমুখে অভ্যর্থনা জানান। আন্তরিক আর প্রকৃত ব্যবহারযী মায়ের মতো মতিনের মা 'বাবাৰা আইছেন' বলে বেরিয়ে এসে গায়ে-মাথায় হাত বুলোন। একটা জ্বরাত অজপাড়াগোয়ের অনাস্থীয় মহিলা যেনো তাঁর সম্পূর্ণ মেহসুস ঢেলে দেন দিমে ও মন্তব্য অধিকাংশ সময় কষ্ট আৱ বিপদের ঝুকি নিয়ে চলাক্ষেত্রে করা আমাদের মতো অজপুরী ছেলেদের প্রতি। হয়তো তিনি আমাদের উপস্থিতির ভেতর দিয়ে তাঁর পরিবারের নিরাপত্তা খোজেন, হয়তো তাঁর ভাবনায় রয়েছে, তাঁর ছেলে মতিনকে একমাত্র আয়ৱাট প্রাপ্তি বাচাতে। এছাড়া ক’দিন আগেকার এক মাঘবাতের হামলার পর মতিনকে তিনি অস্তিন্দের হাতে তুলে দিয়েছিলেন। মতিন থাকছে সব সময় আমাদের সাথে। এখন তাদের বাড়ির ওপর দিয়ে আসা-যাওয়া করার সময় সেখানে কিছুক্ষণ বসলে তারা নিরাপত্তা খুঁজে পান, নিরাপদ বোধ করেল, ফলে সাহসও পান। মতিনের যুবতী স্ত্রী দোড়াৰাপ করে ছেলেদের জন্য চাল-চিড়ে ভাজা কিংবা মুড়ি যখন যা জোটে তাই পরিবেশন করে। সেই সাথে চাও ভেতরবাড়ি থেকে তৈরি করে পাঠিয়ে দিতে বিধা করে না। লক্ষ্মীপ্রতিম যুবতী বউ মতিনের। তার জন্য সব সময় তার বিস্তর চিত্ত। ফলে মনও খারাপ হয়ে থাকে। মতিন সময় পেলেই বাড়ির ভেতরে যায় তার সংসারের খৌখবর নেয়। স্ত্রীকে সামুদ্রণ দেয়। শোনায় অভ্যবাধি। আবার রাত ভোর হবার সাথে সাথে চলে আসে আমাদের সাথে হয় নালাগঞ্জ, নয় সোনারবানে। আজ শেষবারতেও মতিনের বাড়ির সামনে বসে তাদের পরিবারকে সামুদ্রণ দেয়া হয়েছে এই বলে, কোনো ভয় নেই, আমরা তো আছিই। পিন্টু জোৱা গলায় বলেছে, এবার শালারা এলে একটাও ফিরে যেতে পারবে না। মতিন এক প্যাকেট মতি বিড়ি সরবরাহ করেছে। রাত ভোর না হওয়া পর্যন্ত মোটা চুকুটের মতো মতি বিড়ির ধোয়া টেনে টেনে ঘূম ভাঙাতে হয়েছে। ভোরের আকাশে সূর্যের আলো ফোটার সময় আমরা রওনা দিয়েছি। কী মনে করে মতিন লাজুক হেসে বলেছে, এখন আপনেরা যান, আমি বিকেলের মইধো আইসতেছি। রাত কেটে গেছে, পাকবাহিনী আসবার আর সঞ্চাবনা নেই, এই রকম

বিশ্বাস নিয়ে মতিনকে তার বাড়িতে রেখে আমরা রওনা দিয়েছি।

টোকাপাড়া গড়ের সীমান্ত না পেরুতেই একে দৌড়ে আসতে দেখা গেলো। তার সাথে রয়েছে ভেতরগড়ের মহারাজ দিঘির পাড়ের মুবক জয়নালসহ অনেক প্রামাণ্য। সবাই দোঁড়াচ্ছে, হাঁকড়াক চিংকার করছে। তারা কাছে আসতেই তাদের কাছ থেকে জানা গেলো ১৫/২০ জন 'খান' অর্থাৎ পাকসেনা এসেছে ভেতরগড় অবধি। সারারাত জাগার ঝাঁপ্তিতে একে তো শরীর ভেঙে পড়ছে, তদুপরি দিনের বেলায় পাকসেনাদের মোকাবেলা করার তেমন অন্ত আর গোলাবারুদের সরবরাহও আমাদের সাথে নেই। এ অবস্থায় কী করা যেতে পারে? চিন্তাশক্তি প্রায় শুলিয়ে যাবার যোগাড় হয়। উপায়সহ না পেয়ে গড়টার ঢালে হঠাৎ করে বসে পড়ি। পিন্টুসহ সাথের ছেলেরাও বসে পড়ে আমার মতো করেই। দু'পায়ের মাঝখানে অন্তর্গুলো খাড়া করে রেখে ঝাঁপ্তি আর একটা অসহায় ভঙ্গিতে বসে থাকে ওরা। মতিনসহ আগত ভীত-শক্তিত ভেঙে-পড়া মানুষগুলোর মুখের দিকে তাকাই। পিন্টু তেমনি পাশে বসা। ওর দিকে জিজাসু দৃষ্টি মেলে তাকাই। ওর মুখভঙ্গিতে এমন একটা প্রত্যয়ের ছাপ, দেখে মনে হলো, সিদ্ধান্ত যা-ই নিই না কেনো, তাতে তার অসম্মতি থাকবে না। হাতে সময় কম, কিন্তু চিত্তার স্তোত্র বয়ে চলে দ্রুত। ছেলেদের বিধ্বস্ত চেহারা দেখে মায়া লাগে। কিন্তু কিছু করার নেই। এ লোকগুলো আশ্রয় আর নিরাপত্তার সকানে ছুটে এসেছে আমাদের কাছে। এদের নিরাশ করে ফেরত পাওয়াটিক হবে না। তিল তিল করে গড়ে-ওঠা শুভিবাহিনীর প্রতি তাদের আশ্চর্য তা হলে নষ্ট হয়ে যাবে।

সিদ্ধান্ত নিয়ে নিই বলতে গেলে প্রায় একজনেরা জেনি মানুষের মতো। ভেতরগড় আমাদের নিজস্ব মুক্ত এলাকা। আমাদের নিজস্ব বিচরণক্ষেত্র। সেখানে পাকসেনারা আসবে, তাও দিনের বেলায়, এটা হতে দেয়া যাবেনা। তাড়াতে হবে তাদের যে করেই হোক। পিন্টুকে বলি উঠতে। অন্য আর সবকিছুকে তাদের অন্ত লোড করে নিতে বলি। তারপর লোকগুলোকে পেছন থেকে আসতেই এলে আমরা প্রায় দৌড়ে চলি ভেতরগড় নতুন হাটের রাস্তা দিয়ে। জয়নাল ওলিয়ার মাত্তন থাকে আমাদের সাথে। পুবের আকাশে সূর্যের মুখ তখন আরো কিছুটা স্পষ্ট হয়েছে। একটা চকচকে ঝোল্দান্ত সকাল। প্রামের ঘূর্মভাঙ্গ অধিকাংশ মানুষই টের পায় নি কী ধরনের বিপদ তাদের পেছন থেকে এগিয়ে আসছে। নবদেবপাড়া পার হয়ে ডানে নেমে পড়ি আমরা। সেখান থেকে সোজাসুজি এগিয়ে খালটা পার হয়ে উঠি গিয়ে মহারাজ দিঘির দু'পারের ঢালের দিকটায়। কাঁটাবন, জঙ্গল, ঝোপবাড় ঠেলে এগুতে থাকি সোজাসুজি। এখানেই অমরখানাগামী রাস্তাটা মিলিত হয়েছে ভেতরগড়ের রাস্তার দিকে। জায়গাটার প্রায় কোয়ার্টার মাইল দূরে পৌছতেই দেখা যায়, একদল থাকি পোশাকধারী লোক রাস্তার পাশে বসে আখ খাচ্ছে নিবিট মনে। তারা আমাদের উপস্থিতি এখনো টের পায় নি। কিছু বুঁৰে উঠবার আগেই একরামুলের হাতের অন্ত গর্জে ওঠে। এলোমেলো নিশানা তবু শক্তপক্ষ এর মুখে হতচকিত হয়ে দ্রুত পজিশনে ঢলে যায়। আমরাও আমাদের অবস্থান থেকে নড়চড় না করে ওদের দিকে আমাদের সমস্ত হাতিয়ার থেকে শুলিবর্ষণ করে যাই। অতর্কিত আক্রমণে শক্তপক্ষ ভরকে যায়। আমাদের মাত্র কয়েকটা শুলির পাল্টা জবাব দেবার পর ওরা দ্রুত রাস্তার ঢাল বেয়ে রপ্তে ভঙ্গ দিতে থাকে। প্রায় ২০ মিনিট শুলিবর্ষণের পর ছেলেদের থামবার নির্দেশ দিই। জয়নাল আর করিমকে এগিয়ে গিয়ে অবস্থানটা আঁচ করতে বলি। ঠিক এমন সময় দৌড়ে আসে মকতু,

মিয়া। তার কালো মুখের উজ্জ্বল চকচকে দাঁতের চিরাচরিত হাসি দিয়ে সে জানায়, হগস খানেরা পালাইছে।

— তুমি ঠিক জানো? দেখেছো? জিগ্যেস করি মকতু মিয়াকে। সে মাথা কাত করে বলে, হ দ্যাখ্ছি, আমাগো বাড়ির পিছন থাইকা দ্যাখ্ছি খানেরা জান লইয়া ভাইগা যাইতেছে।

মকতুকে অবিশ্বাস করার প্রশ্নই আসে না। খানেরা তথা পাকসেনারা দিনের বেলায় তাদের অমরখানা ঘাটি থেকে প্রায় ও মাইল দূরে এসে মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে যুদ্ধ করবার ঝুঁকি নেয় নি, সাহসও পায় নি। এতো সহজে ওরা পালাবে যুদ্ধ না করেই এটা ভাৰাই যায় না। এক সহয় দলবলসহ হেঁটে গিয়ে হাজির হয়ে যাই পাকসেনাদের অবস্থানের জ্ঞানগাটায়। পাশেই আখখেত। টহলদারিতে বের হওয়ায়, ক্ষুধা তৃঝায় কাতর পাকসেনারা এখানে বসে খেত থেকে আখ ভেঙে এনেছে আৰ খেয়েছে। জ্ঞানগাটায় আখের ছোবড়া জমে আছে। ওরা মোট ৭ জন ছিলো, জানায় মকতু মিয়া। শালারা শিয়ালের মতোন কুশার খাইছে। কথাটা সে বলে অনেকটা স্বগতোভিত্তি মতো করে। তার কথায় হেসে ওঠে সবাই।

উপস্থিতি লোকজনদের শুনিয়ে পিন্টু গুলাৰ হৰ বেশ উঁচিয়ে, বলতে গেলে বক্তৃতাৰ ঢঙেই বলতে থাকে, শালা হাৱামজাদার বাস্তা খানের দল নেড়ি কুতুৰ মতো লেজ শুটায়ে ভাগছে। আৱ কিছুক্ষণ থাকলৈও একটাকেও যাইতে দিতাম না, সব শালাকে ছারপোকাৰ মতো টিপে টিপে মারতাম। বলেই চলে পিন্টু, আৱ ভয়মন্তি মিয়াৱা, এই যে ওৱা ল্যাজ শুটিয়ে পালালো আৱ কোনোদিন আসবে না। বলছি তো, আমাদেৱ ওপৰ ভৱসা রাখেন, আমৱা আপনাদেৱ বাঁচাইতে পাৰি কি না, দেখৰেন তো? উপস্থিতি লোকজনেৰ চোখে-মুখে এবাৱ ফুটে ওঠে স্বত্তিৰ আনন্দধৰণি। গভীৰ ক্ষেত্ৰতাৰ ছাপও পাশাপাশি সেইসব মুখে-চোখে। পিন্টু এবাৱ প্ৰসংগতৰে ফেৰে। বিশেষজ্ঞ একটা থাপড় কৰে মতিনেৰ কাঁধ সোজা, এই ব্যাটা মতিন। ভূতি দে। আৱ চৰু স্যাটা, তোৱ বাড়িতে চা-নাস্তা খাওয়াবি। মতিন গাইষণ্টি কৰতে কৰতে তাৱ কোমুজু প্যাচ থেকে ভূতি অৰ্থাৎ 'মতি বিড়ি' বেৱ কৰে দেয়। আমৱা মতিনেৰ বাড়িৰ অভিষ্ঠান রাস্তা ধৰি। ক্যাষ্টেন দয়াল সিংকে আজ্জ আমাদেৱ অপেক্ষায় অনেকক্ষণ বসে থাকতে হবে। হোক। ভেতৱগড়ুবাসীকে একটা বিৱাট ফাঁড়া থেকে তো বাঁচিয়ে দেয়া গেলো।

১৫. ৯. ৭৫

টু চিটাগাং ভায়া লভন

গড়ালবাড়িতে ক্যাষ্টেন দয়াল সিংয়েৱ কাছে রিপোর্টশৈষে নিজেকে হালকা মনে হয়। এবাৱ যেতে হবে বেৰুবাড়ি। তাই পাশে দাঁড়ানো দুলুকে জিগ্যেস কৰি, যাৰেন নাকি?

সহায় বদলে দুলু বলে, চলেন ঘুৱে আসি। যা টেনশন গেলো, শহৰ ঘুৱে ঘনটা ভালো কৰে আসি। দুলু উত্প্রোত্তভাবে জড়িয়ে গেছে এখন আমাদেৱ সাথে। যুদ্ধেৰ সাথে তাৱ এখন প্ৰায় নিয়তই বসবাস। দিনৱাতেৰ ছায়াসঙ্গী সে এখন আমাদেৱ। যুদ্ধেৰ প্ৰতিটি পৱিকল্পনায় সে থাকছে এবং অপাৱেশনেও সে বাঁপিয়ে পড়ছে একজন নিয়মিত মুক্তিযোদ্ধার মতো। আমাদেৱ মতো তাৱ টেনিং নেই সত্যি; কিন্তু যুদ্ধেৰ প্ৰতিয়াৱ ভেতৱে থেকে সে পাৰদৰ্শী হয়ে উঠেছে প্ৰায় প্ৰতিটি হাতিয়াৰ চালানোৰ ব্যাপাৱেই। এখন সে শুধু একজন গাইড মাৰ্ত নয়, একজন মুক্তিযোদ্ধা সদস্যও বটে। বকঝকে পৱিচন ছেলে দুলু। কথাৰ্ত্তায় চৌকস।

সফরসঙ্গী হিসেবেও সে অতিউন্মত। প্রাণ রেশনসাময়ী আর মালসামানাসহ ছেলেদের পাঠিয়ে দিই হাইড আউটের দিকে। দুলু বলে, গতকাল বোনের চিঠি পেয়েছি লভন থেকে।

— কী লিখেছেন? জিগ্যেস করি।

— আমাদের নিয়ে অত্যন্ত দৃষ্টিভাব ভেতরে রয়েছে। লভন যাবার সময় তাঁর ও বছরের বাচ্চাটিকে রেখে গেছে আমাদের সাথে। তার চিঞ্চায় অস্থির তাঁর।

— খুবই স্বাভাবিক। এখন যে রকম সময় তাতে করে প্রবাসী সবারই নিজেদের আশ্চীরণজনকে নিয়ে অস্থির থাকবার কথা। লিখে দেন বাচ্চাটা ভালো আছে।

— লিখবো। সে কারণেই তো যেতে চাচ্ছি বেরুবাড়ি।

দুলুর কথা শেষ হতেই আমার মনে পড়ে তাঁকে। আমার মেজো ভাই শামসূল আলমের কথা। চট্টগ্রাম আমেরিকান কালচারাল সেন্টারের অফিসার। শৈশবে বাবা মারা যাওয়ায় পুরো পিতৃস্মৃতি দিয়ে মানুষ করেছেন তিনি আমাকে আর আমাদের ছোট ভাইবোনদের। মনে পড়ে এই সাথে বেবী ভাবি, তাঁর স্ত্রীর কথাও। অনিন্দ্য সুন্দরী সেই মহিলা। একজন অসমৰ দয়াবতী নারী। একটা স্বিঙ্গ মা-মা চেহারা তাঁর। এন্দের কথা মনে পড়তেই কি হয়, হঠাতে বুকের ভেতরটা ছ্যাঁৎ করে ওঠে। বেঁচে আছেন তো তাঁরা? অধিকৃত বন্দরনগরী চট্টগ্রামের শক্তপুরীতে তাদের বসবাস। আমেরিকা আমাদের মুক্তিযুদ্ধকে সাপোর্ট করছে না। সেই অফিসের চাকুরে তিনি। স্বভাবতই তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের টাগেট। অন্যদিকে আমি নিজে মুক্তিবাহিনীর সত্ত্বিয় সদস্য। ফলে স্বাভাবিক কাহুদেই তিনি পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষের ও টাগেট হয়ে পড়েছেন। চট্টগ্রাম দখলের যুক্তে তিনি ও তাঁর স্ত্রী এবং শিশুকন্যাসহ যদি বেঁচে নিয়েও থাকেন, তবুও কি তিনি শেষ পর্যন্ত রেঞ্চে থাকতে পারবেন? এখন তিনি টার্টেট হয়ে পড়েছেন পাকবাহিনীর। মুক্তিযোদ্ধারা কেন্দ্রে তাঁর কোনো ক্ষতি করবে না, কিন্তু পাকবাহিনী? গন্ধ ওঁকে ওঁকে ঠিক তাঁকে উত্তোলিত করে ফেলবে, ধরে ফেলবে তাকে একজন মুক্তিযোদ্ধার ভাই হিসেবে। আর মন্দিরেই ফেলে তা হলে তাকে তারা নৃশংস নিহৃত মৃত্যুর শিকার করে তাদের জিঘাংসা নিরুপ্ত করবে। সে ক্ষেত্রে বেবী ভাবির কী হবে?

মাথা বিমর্শিম করে ওঠে। বেশি আর ভাবতে পারি না। গলার কাছে একটা অবদমিত কান্নার দলা এসে আটকে থাকে। উঠে আসতে চায়। আর সে অবস্থাতেই বসে পড়ি পাকা সড়কের ওপর। দুলু শশব্যুত্তাবে বলে ওঠে, কী হলো মাহবুব ভাই? শরীর খারাপ?

নিজেকে সামলে নিতে হয়। দুলুকে পাশে বসতে বলি। পিন্টুও এই সময় উদয়ীর মুখে এগিয়ে আসে। দুলুকে আমি জিগ্যেস করি, আপনার লভনের বোনের নাম কি?

— জলি।

— কী করেন তিনি?

— সেতো সেখানে প্রবাসী বাঙালিদের নিয়ে সংগঠন গড়ে তুলতে ব্যস্ত রয়েছে। মিটিং-মিছিল আর বক্তৃতা করে বেড়াচ্ছে। মুক্তিযুদ্ধের জন্য ফান্ড যোগাড় করছে। সে দেশের মানুষের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীন বাংলার পক্ষে জনমত সৃষ্টি করছে ...।

— ভগিনীপতি?

— ইঞ্জিনিয়ার। চাকরি করছে। বোনের পাশাপাশি মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে সেও জনমত গড়ে তোলার কাজ করে যাচ্ছে।

— তাঁরা আমার জন্য একটা কাজ করবেন?

— কী কাজ বলেন? আপনারা আমাদের জন্য এতো করছেন। বলতে গেলে তাদের হলে বাপীকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। এটাতো ওরা জানে। বলেন, কী কাজ?

— একটা চিঠি পাঠাবো। টু চিটাগাং ভায়া লভন। আমার ভাইয়ের কাছে। সরাসরি দেশের ভেতর দিয়ে তো পাঠানো যাবে না। লভনে আপনার বোন জলির কাছে পাঠাবো সে চিঠি। তিনি তা পাঠিয়ে দেবেন তার নিজের গ্যাডরেস দিয়ে চিটাগাং ইউ.এস.আই.এস.-এর কালচারাল অফিসার শামসুল আলমের নামে। পারবেন না?

— পারবো না কেনো? আমি আজ চিঠি পাঠাচ্ছি। আপনিও লিখে দেন।

— ঠিক আছে।

কথা শেষ করেই হাঁটুর ওপর প্যাড রেখে খসখস করে লিখে চলি। লিখে চলি নিজেকে গোপন রেখে ছানামে। লিখি—

ছেট ভাই,
সালাম নিবেন।

তারিখ : ১৫. ৯. ৭১

দেশে গোলমাল তরু হ্বার পর অনেক ইতিহাস তৈরি হয়েছে এ ক'মাসে। কত পরিবার ঘৰবাড়ি ছেড়েছে; কত ছেলেকে বাড়িয়ার ছেড়ে চলে অস্বীকৃত হয়েছে একান্ত বাধ্য হয়ে। বিবেকের তাড়নায়। আপনি তাদের দেখেন নি। দেখতে পাবেন হয়তো কোনোদিন, সে অনেক পরে। আপনি কেমন আছেন? আর বেবী ভাত্তি? তেনেছিলাম একটা মেয়ে হয়েছে। ও ভালো আছে তো? ... আপনারা ভালো থাকুন, মিষ্টখাকুন যে-কোনো প্রকারেই হোক...।

বেরুবাড়ি পোষ্ট অফিসে দুলুর সাথে কাঞ্জলামা চিঠি পোষ্ট করি। কে জানে ভায়া লভন এ চিঠি পৌছুবে কি না আপকের হাতে ফেলে মনে ভাবি, এ চিঠি যদি সত্যিই ভাইয়ের কাছে পৌছায়, তাহলে তিনি জেনে যাবেন ক্ষাম বেঁচে আছি। এবং যুদ্ধ করছি। কিন্তু ততোদিনে বাঁচবো কি? কে জানে?

সবার চেতনায় বাংলাদেশ

বেরুবাড়ি যেতে হয় ৩ জন অসুস্থ ছেলেকে নিয়ে চিকিৎসার জন্য। বৃষ্টি আর বড়বাদলে রাতদিন পরিশ্রম আর স্যাতস্মৈতে অঙ্গুলে পরিবেশে থাকতে থাকতে ইদানীং কেউ কেউ অসুস্থ হয়ে পড়েছে। চাউলহাটি ইউনিট বেস হেড কোয়ার্টার থেকে সরবরাহ করা প্রাথমিক চিকিৎসার সরঞ্জাম ও ঔষুধগত যথেষ্ট পরিমাণে নয়। কিছু ব্যাডেজ, আয়োডিন, ডেটল, মাথাধৰা ও জরের ট্যাবলেট, পেটের অসুখের ট্যাবলেট এসব পাওয়া যায় মেডিক্যাল সাপ্লাই হিসেবে। মেডিক্যালম্যান তথ্য চিকিৎসা করবার মতো জ্ঞান আছে, এমন কাউকে দেয়া হয় নি আমাদের মতো গেরিলা দলগুলোর সাথে। নিয়মিত বাহিনীর প্রতিটি ইউনিটে মেডিক্যালম্যান পোস্টিং দেয়া হয়। সাধারণত যুদ্ধ ও অন্ত পরিচালনা প্রশিক্ষণগ্রাহক পাশাপাশি চিকিৎসা জ্ঞানসম্পন্ন লোকজনকেই এ ক্ষেত্রে নিযুক্ত দেয়া হয় মেডিক্যাল কোর থেকে। প্রয়োজনে তারা ছেটোখাটো অপারেশন পরিচালনাসহ যুদ্ধের সৈনিকদের চিকিৎসা সাপোর্ট দিয়ে থাকে। মুক্তিযোদ্ধাদের দেশের ভেতরে হাইড আউটে থেকে গেরিলা যুদ্ধ পরিচালনার সময় তাদের সাথে এ ধরনের চিকিৎসা জ্ঞানসম্পন্ন ২/৪ জনকে দেয়া যেতে পারতো। ব্যাপারটা এমন

কোনো কঠিন ব্যাপার ছিলো না। আলাদাভাবে কিছু ছেলেকে বেছে নিয়ে চিকিৎসা বিষয়ে প্রাথমিক জ্ঞানটুকু শিখিয়ে-পড়িয়ে দিলেই হতো। কিন্তু তেমনটা করা হয় নি। হয়তো যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী বা প্রলম্বিত হলে আমাদের নিজেদের ছেলেদের নিয়েই মেডিক্যাল টিম গড়ে উঠবে, প্রতিষ্ঠিত হবে ফিল্ড হাসপাতাল। আপাতত নিজেদের জ্ঞানগম্যের ওপর নির্ভর করেই ছেলেদের চিকিৎসার ব্যাপারটা চালিয়ে নিতে হচ্ছে। মাথা ধরা, পেট ব্যাথা, সর্দিজ্জর—এসবের জন্য নির্দিষ্ট চেনা ট্যাবলেটগুলো দিয়েই চালিয়ে নেয়া হয়। কিন্তু কিছু কিছু ছেলের অসুস্থতা বেড়ে যায়, ফলে তাদের চিকিৎসার উদ্যোগ নিতে হয় নিজেদেরই। গ্রাম্য হাতুড়ে ডাঙ্কারকে ডেকে আনা হয়, কিংবা তাদের নিয়ে যাওয়া হয় বেরুবাড়ি শরণার্থী শিবিরের হাসপাতালে। তো, আজ যাদের নিয়ে যাচ্ছি তারা ক দিন থেকে অসুস্থতায় ভুগছে। কী হয়েছে সহজে বুঝবার উপায় নেই। দুর্ভিল রকম বড় খাইয়েও ওদের সারানো যায় নি। তাই ওদের অসুস্থতার চিকিৎসা হওয়া প্রয়োজন। আর এই তাগিদ থেকেই তাদের বেরুবাড়ি নিয়ে আসা হয়েছে।

বেরুবাড়ি শরণার্থী শিবির এখন বেশ শুভায়ে উঠেছে। সার সার টিনের ছাউনি দেয়া ঘর, মুলি বাঁশের পার্টিশন দিয়ে খুপিরির মতো এক একটা কামরা বানানো হয়েছে। এছাড়া তাঁবুর সারিও রয়েছে। দু'সারি তাঁবু বা ঘরের সারির মাঝখানকার রাস্তা অর্থাৎ হাঁটাচলার যে জায়গা, সেটা কাদা পানিতে থকথকে হয়ে থাকতো, একটা অস্বাস্থ্যকর স্যাতসেতে আর গা ঘিনঘিনে পরিবেশ বিরাজ করতো। এখন ইট বিছিয়ে জামুনাটির পরিবেশ—পরিপূর্ণ কিছুটা উন্নত করা হয়েছে। স্যানিটেশনের ব্যবস্থা ভালো করা হয়েছে, প্রত্যেক লাইনের মাথায় টিউবওয়েল বসিয়ে খাওয়ার পানির ব্যবস্থা করা হয়েছে। শরণার্থী শিবির পরিচালনার জন্য স্থায়ী অফিস বসেছে। সেখানে কর্মকর্তা ও নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে। যুবা বয়সের এক ঝাঁক ছেলেমেয়ে কর্মী হিসেবে দিনরাত কাজ করে আছে এখানে। একটা বড় তাঁবুতে স্থাপিত এই চিকিৎসা কেন্দ্র। ঢাকা মেডিক্যালের প্রযোজনের একজন ছাত্র এখানে ডাঙ্কার হিসেবে কাজ করছেন। এছাড়াও রয়েছে কর্তৃপক্ষ সিয়েজিত চিকিৎসক এবং মেডিক্যাল সহকারী। ঢার লাখ শরণার্থীর জন্য চিকিৎসা স্টেস্টা মোটেই পর্যাপ্ত নয়। প্রয়োজনের তুলনায় চিকিৎসা সামগ্রী এবং চিকিৎসক ও চিকিৎসা সহকারীও কম। দিনরাত কাজ করে যাচ্ছেন এই অপর্যাপ্ত সরবরাহ আর সীমিত সুযোগের ভেতরে চিকিৎসক এবং তাঁদের সহকারীবৃন্দ। এর মধ্যে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের আমার সেই ছাত্র ডাঙ্কার বকুটিও।

বেরুবাড়ি হাসপাতালে আমার সেই ডাঙ্কার বকুটিকে পাওয়া যায়। সে আমার দলের ছেলে তিনটিকে ভালো করে পরীক্ষা করে কি জটিলতা দেখতে পায় আর তখন তখন জলপাইগুড়িতে একজন ডাঙ্কারের কাছে রেফার করে তাদের। সুতরাং এবার জলপাইগুড়ি অভিযুক্তে যাত্রা করতে হয় অসুস্থ ছেলে তিনটিকে নিয়ে। শহরে বড়ো ডাঙ্কার তাদের ভালোভাবে পরীক্ষা করেন। তারপর ওয়েথ লিখে দেন। তাদের পুরো বিশ্রামে রাখতে পরামর্শ দিয়ে বলেন, চিন্তা নেই। ঠিক হয়ে যাবে। তিজিট দিতে গেলে নেন না তিনি। বলেন, অন্য কারো জন্য হলে নিতাম। আপনারা 'জয় বাংলা'র জন্য লড়ছেন, আপনাদের কাছ থেকে নেবো না।

কথা শনে এই মাঝবয়সী ডাঙ্কার মানুষটিকে ভালো লাগে। জয় বাংলা প্রতিষ্ঠার জন্য এপারের প্রতিটি শিক্ষিত প্রগতিশীল বাঙালি, শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবী, এমনকি একজন সাধারণ খেটে-খাওয়া মানুষেরও রয়েছে আন্তরিক সহানুভূতি ও শ্রদ্ধা এবং আকাঙ্ক্ষা। বাঙালি জাতি একটাই। ধর্মের নামে সাম্প্রদায়িকতার দেয়াল তুলে কেবল

তাদের পৃথক করা হয়েছে। '৪৭-এর ভারত বিভাগের সময় পাঞ্জাব আর বাংলাকে ভাগ করা হয়েছে। এপার বাংলা ওপার বাংলায় এখন সীমান্তের রেখা টেনে বাঙালি জাতির বসবাস। স্বাধীনতা আদায়ের সংগ্রামে বাঙালি জাতি সব সময়ই অন্য ভারতীয় জাতির চেয়ে অনেক বেশি এগিয়ে ছিলো। বহু কষ্ট আর ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে এ জাতিকে নিকট ও দূর ইতিহাসের পটভূমিতে। 'জয় বাংলা' হলে এপার বাংলার বাঙালিদের কোনো লাভ নেই জানি। কিন্তু বাঙালি জাতির একটা অংশ স্বাধীনতা পাবে, মুক্তি পাবে, এটাই এপার বাংলার মানুষের জন্য অনেক বড় ঘটনা। তাদের সংক্ষণ আকাঙ্ক্ষা কৃপায়ণের এ যেনো এক মনন্তাত্ত্বিক ভাড়না। এ জন্য এপারের বাঙালিয়া জয় বাংলা প্রতিষ্ঠার জন্য তাদের সমস্ত আবেগ, ভালোবাসা আর নিবিড় আন্তরিকতা নিয়ে স্বাধীন বাংলা প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করে যাচ্ছেন নিরলসভাবে। সকলেই কমবেশি ত্যাগ স্বীকার করছেন। আমাদের ডাক্তার সাহেবও এই তাদেরই একজন।

মোসলেম মিয়ার বিয়ে

ছেলে ক'জনার জন্য শুধু পথ্য, কিছু খুচরা কেনাকাটা সেরে বেরুবাড়ি ফিরতে বিকেল হয়ে যায়। ঢাকাইয়া নুরুর দোকানে কিছুক্ষণ ধূম আড়ডা মেরে ফিরে চলি হাইড আউটের রাস্তামুখো। নালাগঞ্জ পার হতে সক্ষ্য হয়ে যায়। খালটা শুরুহয়ে ছলগাছ আর ছেট ছেট বোপঘাড়ে ঘেরা ছাড়া ছাড়া বসতিগুলোর তেতুরেন্তে ইচ্চাপথ দিয়ে হনহনিয়ে চলছি সোনারবানারের দিকে। তিন-চারটা বাড়ি নিয়ে একটু একটা বসতির সামনে দিয়ে পার হওয়ার সময় একটা লোক হাউমাউ করে পথে ঝিস্টেল ধরে দু'হাত দু'দিকে প্রসারিত করে।

আকাশে ফিকে চাঁদ। লোকটাকে সেই আলোতে চেনা যায়— মোতালেব মিয়া। মধুপাড়া যুদ্ধের দিন পরিশ্রান্ত বিকেলে এ লোকটাই আমাদের চাল ভেজে এনে আইয়েছিলো। এরপরও বেশ ক'বার মোতালেব মিয়া আস্থাতের কাজে এসেছে। কিন্তু এই এখন, একেবারে হাত প্রসারিত অবস্থায় সামনে পথ আঙ্গুলে দাঁড়ানো হাউমাউ কান্নারত মোতালেব মিয়াকে দেখে ব্যাপারটা কেমন যেনো ঠেকে।

— ব্যাপার কী মোতালেব মিয়া, কাঁদেন কেনো? কী হয়েছে? জিগ্যেস করি তাকে সোজাসুজি। গামছার ঝুঁট দিয়ে চোখ মুছে মোতালেব মিয়া। বলে, বিচার চাই।

— কিসের বিচার? এবার পিন্টু মুখ খোলে।

— আপনাদের বিচার, ফৌগানো গলায় মোতালেব মিয়া বলে। আমি আপনাদের বিচার চাই। কী অন্যায় আমি কইরছি কনু? আমার মাইয়াডার ক্যান্ এই সর্বনাশ হইলো? কি কইরছি কনু, আমি কি মইরা যাইবাম? বিষ খাইবাম? হঠাতে থম্বকে যেতে হয় মোতালেবের এতোসব প্রশ্নের সম্মুখে। প্রায়শই এ বাড়ির পাশ দিয়ে আমাদের যেতে-আসতে হয়। দু'চারদিন মোতালেব তার বাড়ির আঙ্গুলাতেও আমাদের নিয়ে গেছে। মোতালেবের যুবতী বয়সের কোনো সোমস্ত মেয়ে নেই। থাকলে নিচ্যাই চোখে পড়তো। কোনু মেয়ের কথা বলছে সে? কে ক্ষতি করেছে তার সে মেয়ের? আমাদের কাছে আমাদেরই বিচার চাইবে কেনো সে হঠাতে করে? মনের মধ্যে ধাক্কা লেগে যায়। পিন্টুকে নিয়ে মোতালেবের বাড়ির বাইরে পাতা বাঁশের মাচায় এসে বসি। পিন্টুকে বলি, পাতা লাগাওতো পিন্টু, কী হয়েছে। পিন্টু মোতালেবকে জেরা করে সবকিছু জেনে নিতে থাকে। মাচায় শুয়ে আমি তখন

আকাশের দিকে মুখ করে জলপাইগুড়ি শহর থেকে কেন্দ্র পানামা সিগারেটের প্যাকেটটা বের করি। এরকম একটা সময়ে মগজে ধোয়া পাঠিয়ে সেটা সচল না রাখলেই নয়।

— হামার মোসলেম মিয়া মোতালেবের বেটিক বিয়া করছে মাহবুব ভাই, মোতালেবকে জিজ্ঞাসাবাদশৈলে আমার দিকে এগিয়ে আসতে আসতে পিন্টু তার নিজের স্টাইলে রিপোর্ট পেশ করে।

— কী বললে? শোয়া অবস্থা থেকে ঝট করে উঠে বসি।

— হ্যা, জোর করিয়া বিয়া করছে মোসলেম গতরাতে। তার সাথে আর যেনো কাঁয় একজন আসছিলো, তার হাতোত নাকি ঘেনেড় ছিলো। তারা সেই ঘেনেড় দিয়া ভয় দেখায় মোতালেব মিয়ার বেটিক বিয়া কইরছে। তার বেটির নয় বছর বয়স।

একই স্কেলে গলার স্বর রেখে বলে যাওয়া পিন্টুর কথাগুলো যেনো মাথায় আগুন ধরিয়ে দেয়। মোতালেব তখন এগিয়ে এসে বলে, আপনেরা যদি নিরাপত্তা না দেন, কোথায় যাবো কন্তু আপনাদের মুখের দিকে চাইয়া এই বিপদের মইধোও বাড়িয়ার ছাড়ি নাই, এখন কি মইরবাম, কই যাইবাম? মোতালেব মাটিতে বসে পড়ে তার হাত দিয়ে পাগলের মতো কপালে চাপড় মারতে থাকে।

এটা কী করে সম্ভব? আমার আর পিন্টুর সাধের গড়া ছেলেদের নিয়ে এই দল, এতোদিনের ব্যবধানে কেউ সামান্যতম বদনাম হতে পারে নাম কাজ করে নি, কতোবাৰ কতো রকমের সুযোগ এসেছে, প্রলোভন এসেছে, ছেলেবুক কেউ বিচুতি হয় নি তাদের আদর্শ থেকে সামান্য পরিমাণেও। মুহূর্তে মোসলেমের চেহারাটি ভেসে ওঠে চোখের সামনে। একটা লম্বা ঢ্যাঙ্গা মতো মানুষ, বয়স প্রায় তিরিশের পঞ্চাশ হবে, সিএন্ডবিটে পিওন ধৰনের চাকরি করতো যুক্তের আগে। দেশের বাড়ি ময়মনসুরে হৈ। তার বৌ-বাচ্চা রয়েছে। খুব একটা যুক্তে যেতে চায় না। ফাঁকি দেয়া যেতে পারে নাম কাজ— যেমন সেন্ট্রি ডিউটি, লঙ্গরখানার সাহায্যকারী, বকরির পালকে ঘাস পুঁচতা খাওয়ানো— এ জাতীয় কাজে সব সময় সে ব্যস্ত রাখে নিজেকে। খুব ভালো সেন্ট্রি ডিউটি করে। এমনিতে সাদাসিধে ভালোমানুষ, কারো কোনো সাতে-পাঁচে নেই। সেই মোসলেম কি না বিয়ে করেছে একটা 'ন' বছরের বাচ্চা মেয়েকে! মন্টা পলকে বিধিয়ে ওঠে, রাগে-দৃঢ়ত্বে নিজেকে দিশেহারা লাগে। কাঁধে ঝোলানো টেনগানের ট্রিগারের ওপর আঙুলগুলো নিষ্পিশ করে ওঠে। বেরুবাড়ি-জলপাইগুড়ি যাবার সময় হাতিয়ারগুলো বেলতলার নিরাপত্তা বাহিনীর কাছে রেখে যাওয়া হয়েছিলো। আসবাৰ সময় সেগুলো সঞ্চাহ করে নিয়ে আসা হয়েছে। এখন সামনে মোসলেম নেই, থাকলে নির্ধারণ ও মারা পড়তো।

পিন্টু পাশ থেকে বলে ওঠে, কল্পনা মাহবুব ভাই, ঐ ধাঁড়া মুদ কেবল করিয়া বিয়া করে এই বাচ্চা বয়সের মেয়েটাক। মেয়েটার সিয়ানা হইতেও তো অনেক সময় লাগবে, শালার ডাকাইতের মতো চেহারা, মারি ফেলাইবে তো মেয়েটাকে।

পিন্টুর কথার কোনো জবাব দিই না। কী দেবো জবাব? মোতালেবের কান্না তখন থেমেছে, হা-হতোশ ভাবটাও স্তুপিত হয়ে এসেছে। তখন তাঁর কাঁধে হাত রেখে বলি, বিচার পাবে মোতালেব মিয়া, অবশ্যই এর একটা বিচার হবে, তুঁমি দেখো। কথাটা বলতেই মোতালেব আমার হাত ধরে টানে, আসেন, আমার মাইয়াডারে একটুখানি দেইখা যান।

তার সাথে সাথে আমরা তার ভেতর বাড়িতেই যাই। সঙ্গী ছেলেরাও আসে পেছনে পেছনে।

মোতালেব তার শোয়ার ঘরে আমাকে আর পিন্টুকে নিয়ে যায়। একটা কুপি বাতি তার হাতে। কুপির কাঁপা কাঁপা আলোয় দেখি, লাল শাড়ি পরা জনুরুবু অবস্থায় একটা ছেট কচি মেয়ে বিছানার ওপর বেঁচে ঘুমিয়ে আছে। টুকটুকে চাঁদের মতো মেয়েটার মুখ। হয়তো সে বুঝতেই পারে নি তার কতো বড়ো সর্বনাশ হয়ে গেছে। না, এ সর্বনাশ ঘটতে দেয়া যাবে না, তিল তিল করে গড়ে তোলা সাধারণ মানুষজনের তেতরে মুক্তিযোদ্ধাদের গড়ে-গঠা আস্থা, বিশ্বাস আর ভালোবাসা নষ্ট করা যাবে না কোনোভাবেই।

এক সময় ঘর থেকে বের হয়ে এসে জিগ্যেস করি মোতালেবকে, কীভাবে বিয়েটা হলো? মোতালেব দৃঢ়ুক্ষী গলায় জবাব দেয়, মোসলেম মিয়ার বাড়ি ময়মনসিংহে। আমাদের দেশী মানুষ। সেই হিসেবে সময় পাইলেই সে আসা-যাওয়া করতো। কাইল রাইতে আইসা কয়, মৌলবী ডাকেন, আপনার মাইয়ারে বিয়া কইবাবাম্। তার সাথের মানুষটা তার দেখায়, কোমর থেনে ঘেনেড বাইর কইবা কয়, বিয়া না দিলে বাড়ির বেবাক কিছু ঘেনেড দিয়া উড়াইয়া দিবাম। তখন একজন মৌলবী ডাইকা কলেমা পড়ানো হয়। যাওয়ার সময় তেনারা কইয়া গেছেন, কাউরে কথাড়া কইলে জীবন থাইকবে না।

ব্যাপার তাহলে এই? মোসলেমকে তো পাওয়া যাবে, ঘেনেডধারী ব্যক্তিটা কে তাহলে? পিন্টুকে জিগ্যেস করি, চিনতে পারো, কোন হারামজাদা ঘেনেড নিয়ে এসেছিলো?

— সন্দেহ তো হয় অনেককেই, চলেন আগে ইনকোমফ্রন্সের করা যাক। শালা মোসলেমকে পাকড়াও করা দরকার আগে।

মোতালেবকে সাত্ত্বনা আর অভয়বণী দিয়ে স্বেচ্ছারবানের রাস্তা খরি। চলতি পথে সারাটাক্ষণ্ণ কুপির কাঁপা কাঁপা আলোর শিখন উষ্ণসিত মোতালেব মিয়ার চাঁদসোনা সেই কচি শিশু মুখখানা চোখের সামনে বারবার ভাস ওঠে।

পরদিন সকালে সবাইকে ফল-ইন-ক্ষয়ানো হয়। মোসলেমকে লাইন থেকে বের করে এনে সবার সামনে দাঁড় করানো হয়ে আর দাঁড় করিয়েই সরাসরি ছেলেদের সামনেই তাকে জিগ্যেস করি, তুই নাকি বিয়ে কঞ্জেছস মোসলেম!

হতচকিত অবস্থা মোসলেমে। আমি আমার রাগ চেপে রাখতে পারি না, হারামজাদা, সত্যি কথা বল সবার সামনে, বিয়ে করেছিস তুই মোতালেব মিয়ার বাক্তা মেয়েটাকে? মোসলেম এবার কিছু একটা বলতে চায়। কিন্তু তার আশেই শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে চড় মারি তার গালে। প্রায় ছিটকে কাত হয়ে পড়ে যায় সে। তখন পিন্টু এগিয়ে গিয়ে চুলের মুঠি ধরে তুলে নিয়ে তার পাছায় লাখি করে ধাম করে। আবার পড়ে যায় সে। আবার ধরে তোলে তাকে পিন্টু। এবার মারে হাত দিয়ে বেশ কয়েকটা খাড়া কোপ। ওকে থামতে বলে মোতালেবকে একটা লাঠি আনতে বলি আমি। গোফ পাকাতে পাকাতে মোতালেব একটা বাঁশের কঁালি জাতীয় লাঠি নিয়ে আসে। বলি, বানা হারামজাদাকে, শালার বিয়ের সাধ মিটিয়ে দিই। মোতালেব এবার মোসলেমকে মারতে শুরু করে ওর নিজস্ব স্টাইলে। বাবা গো, মাগো, মইরা গোলাম, আমারে ছাইড়া দেন এ ধরনের কথা বলে বলে চিৎকার করে কাঁদতে থাকে মোসলেম। মোতালেবকে থামতে বলে 'ফল ইন'-এ দাঁড়ানো ছেলেদের এবার সমস্ত ঘটনা খুলে বলতে বলি পিন্টুকে। পিন্টু তখন মোসলেমের বিয়ের আদোপান্ত ঘটনা ছেলেদের কাছে খুলে বলে। মোসলেম তখন পাশে দাঁড়িয়ে ফুসফুস করে চলেছে। আমি ছেলেদের বলি, মোসলেম একটা জবন্য অপরাধ করেছে, এ জন্য আমাদের সবার মানসম্মান আর ইমেজ স্ফুরণ

হতে বসেছে। মোসলেমকে এই বিয়ে ভাঙ্গতে হবে। আজই মোতালেবের মেয়েকে শিয়ে সে তালাক দেবে। আর আগে হবে ওর 'গণধোলাই'। তোরা সবাই ওর কাছে আসবি আর গায়ের যতো শক্তি আছে, তাই দিয়ে একটা করে মারবি ওকে। নির্দেশ পেতেই ছেলেরা এক এক করে এগিয়ে আসে, আর ধার্মধার করে মোসলেমের শরীরে মারতে থাকে মোসলেমের এই কাজে, সবাই যে অসঙ্গ তুক্ষ হয়েছে তাদের মারের বহর দেখেই সেটা বোঝা যায়। এবার মোসলেমকে মারার জন্য এগিয়ে আসে তার দেশোয়ালি তাই চাঁদ মিয়া। দুঃজনের দোষি খুবই নিবিড়। কিন্তু সে মোসলেমকে মারতে এসে আলতো করে তার গায়ে হাত ছেঁয়ায় আর বলে, কেনো আপনি বিয়া কইরচুন? কেনো কইরচুন কল? ব্যাপারটা পিন্টুর সহ্য হয় না। দ্রুত এগিয়ে শিয়ে সে চাঁদ মিয়ার পাছায় একটা 'কিক' মারে প্রচও জোরে। আর মুখে বলে, শালা পিরিতের আলাপ! শালা কইরচুন-এর বাচ্চা, মার জোরে, মার বলছি! বি আর করা, চাঁদ মিয়া নিজে এবার মার খায়, আর মোসলেমকে মারতে থাকে। আর এই দৃশ্য সবার মধ্যে তোলে প্রচও হাসির হজ্জোড়। মারের পর্ব শেষ হলে মোতালেব তাকে বেঁধে রাখে পিছমোড়া করে গামছা দিয়ে। বিকলে মুসার নেতৃত্বে মোতালেবসহ একটা সেকশন পাঠিয়ে দিই নালাগঞ্জের মোতালেব মিয়ার বাড়িতে। মুসাকে বারবার করে বুবিয়ে দিই ওর দায়িত্ব। ওখানে শিয়ে সেই মৌলবীটিকে ডেকে এনে সাক্ষী-সাবুদ রেখে, লিখিত-পড়িতভাবে মোসলেম তালাক দেবে মেয়েটিকে। তারা তাকে দুঁজন স্কট দিয়ে পাঠিয়ে দেবে জগদলহাট। মোসলেম আর হাইড আউটে ফিরবে না। তাকে চাউলহাট ইউনিট বেসে মেহসুজ পাঠানো হলো— এই মর্মে কারণ জানিয়ে বড় তাই নুরুল হককে একটা চিরকুট লিখে দিই। হাইড আউটের প্রত্যেকের হাতের মার খেয়ে কাহিল অবস্থা তখন মোসলেমের ল্যাঙ্কাতে ল্যাংচাতে এগিয়ে চলে সে দলটির মাঝখানে থেকে। এবার বর হয়ে বিয়ে কর্তৃত নয়, শ্বতুরবাড়ি অভিমুখে যাত্রা তার সদ্য বিবাহিত বাচ্চা বটাটিকে কলেমা পড়ে ক্ষমতাক দিতে।

১৫.৯.৭১

জগদলহাট আক্রমণ : শালমারা ত্রিজ ধৰ্মস

জগদলহাট পাকবাহিনীর ঘাঁটি আক্রমণ আর তালমা শালমারা ত্রিজ উঞ্জিয়ে দেবার মিশন নিয়ে দুটো দল বের হয় রাতে। জগদলহাটের দল নিয়ে আমি রঙনা দিই রাত আটটার দিকে। পিন্টু নিয়ে যাবে রাত দশটায় তালমা নদীর ওপর শালমারা ত্রিজ ধৰ্মস করার জন্য গঠিত দলটিকে নিয়ে। অনেক ভাবনাচিন্তা করে জগদলহাট শক্তিবাহিনীর অবস্থানের ওপর আক্রমণের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। জগদলহাটে অবস্থানকারী শক্তিশালী পাকবাহিনীর এতোদিন মোকাবেলা করে আসছে তাদের সামনাসামনি অবস্থান গ্রহণকারী মুক্তিফৌজদের সাথে। নিয়মিত মুক্তিফৌজ বাহিনী অমরখানার উল্টোদিকে ভজনপুর থেকে দেবনগর পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চলে প্রতিরক্ষা লাইন স্থাপন করেছে। মজবুত বাস্তার, টেক্স আর ত্রিলিং ট্রেক্সের লাইন চলে গেছে ভজনপুর থেকে দেবনগর পর্যন্ত। ই.পি.আর.-আনসার-মুজাহিদ নিয়ে গঠিত মুক্তিফৌজ তাদের অবস্থান অত্যন্ত মজবুত করে নিয়ে অমরখানা থেকে ভজনপুর-তেঁতুলিয়া থানা পর্যন্ত পাকবাহিনীর অগ্রগতি ঠেকিয়ে রেখেছে। প্রতিদিনই তারা অমরখানা-জগদলহাট থেকে টেক্স মুক্ষ চালিয়ে যাচ্ছে। কখনও কখনও পাকসেনার দল এগিয়ে যায় মুক্তিফৌজের অবস্থানের দিকে। প্রচও বাধার মুখে তারা ফিরে আসে। মুক্তিফৌজের দল কখনও পাকসেনার এগিয়ে যায় অমরখানা-জগদলহাট পাক

ঘাঁটির দিকে, পাকবাহিনীর মরিয়া প্রতিরোধের মুখে তারা ফিরে যায়। এসব যুক্তে উভয়পক্ষ কেউ কারো জায়গা থেকে নড়তে পারে না, দখল করতে পারে না কেউ কারো জায়গা। কিন্তু নিয়মিত এ ধরনের খণ্ডন চলতেই থাকে। এসব যুক্তে উভয়পক্ষে আহত হয় অনেকেই। অপরদিকে অমরখানার বিপরীত দিকে সীমান্তের ওপারে ভারতীয় সেনাবাহিনী তাদের অবস্থান মজবুত করে মাটির নিচে বসে থাকে। তাদের স্থূলবর্তী অবস্থানে অবস্থান নেয়া বি.এস.এফ. বাহিনী। তারা রাত হলেই অমরখানা ঘাঁটির পাক অবস্থানের দিকে থেমে থেমে মেশিনগানের গুলিবর্ষণ চালিয়ে যায়। পাকবাহিনীও সারারাত ধরে তাদের মেশিনগান মুখরিত করে রাখে এবিকে এবং সেই সাথে ভজনপুর-দেবনগর লাইনে বাংলাদেশের মুক্তিফৌজের দিকেও একইভাবে গুলিবর্ষণ চালিয়ে যায়। পাকবাহিনীর এই অবিশ্বাস্ত গুলিবর্ষণের ঘটনা থেকে দুটো ধরণ মনে আসে। প্রথমত, তারা অদৃশ্যামান আগুয়ান মুক্তিফৌজ বা ভারতীয় বাহিনীকে ঠেকানোর জন্য এ কাজ করে। দ্বিতীয়ত, উকুরাষ্টলে তাদের সর্বশেষ অঘাবর্তী ঘাঁটির চারদিকে শক্ত পরিবেষ্টিত অবস্থায় থাকাতে সারারাত এ ধরনের বিরতিহীন গুলিবর্ষণের ভেতর দিয়ে তারা নিজেরা যেনো সাহস খোজে নিজেদের অবস্থানের মাটি কাষড়ে পড়ে থাকবার, নিজেদের ঘাঁটিকে টিকিয়ে রাখবার এবং নিজেদের বাঁচিয়ে রাখবার।

মুক্তিযুদ্ধের প্রথম দিকে, ঠাকুরগাঁও-দিনাজপুর ই.পি.আর. উইং-এর বাঙালি সদস্যরা বিদ্রোহ করেন। অবাঙালি অফিসার জেসিও আর জোয়ানদের পক্ষজুত করে সমস্ত অন্তর্শ্রেণি আর গোলাবারুন নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নেন। তারপর এসিয়ে গিয়ে ভূসির বন্দর ত্রিজ এবং দশ মাইলে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন, যেনো সৈয়দপুর গ্যারিসন থেকে পাকবাহিনী দিনাজপুর-ঠাকুরগাঁওয়ের দিকে এগতে না পারে। দিনাজপুর-ঠাকুরগাঁও-পঞ্জগড় এলাকা তখন মুক্তাষ্টল। প্রায় মধ্য এগিল পর্যন্ত প্রতিরোধ যোদ্ধারা স্কটিশ দিনাজপুর জেলাকে এভাবে মুক্ত রাখতে সমর্থ হয়। এগিলের গোড়ার দিক থেকে পুরুষ সৈয়দপুর গ্যারিসনের পাকবাহিনী দিনাজপুর-ঠাকুরগাঁও দখলের জন্য এগিয়ে আসে। এগিল প্রতিরোধ মুক্ত হয় ভূসির বন্দর ত্রিজে। ওই জায়গা থেকে সরে এসে প্রতিরোধ বাহিনী দশ মাইল নামের জায়গায় দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করে। পাকবাহিনী সাথে তাদের সেখানে ক’দিন ঘোরতর যুদ্ধ হয়। হতাহত হয় অনেকেই। এরপর পাকবাহিনী ট্যাক্সের সহযোগিতায় প্রতিরোধ বাহিনীর সমস্ত বাধা প্রতিয়ে দিতে সমর্থ হয়। তখন পিছিয়ে গিয়ে প্রতিরোধ যোদ্ধারা সমবেত হয় পঞ্জগড় ত্রিজের এপারে। সেখান থেকে অমরখানা ত্রিজের ওপারে, তারপর ভজনপুর ত্রিজ ভেঙে দিয়ে সে ত্রিজের ওপারে। দিনাজপুর-ঠাকুরগাঁও-পঞ্জগড় কোনোটাকেই মুক্তাষ্টল হিসেবে ধরে রাখা গেলো না, এখন কেবল বাকি রয়েছে তেঁতুলিয়া থানা, বাংলাদেশের ম্যাপের মাথায় পারির ঠোটের আকৃতি নিয়ে যার অবস্থান।

পাকবাহিনী অমরখানা পার হয়ে ভজনপুর পর্যন্ত এগিয়ে যায়। কিন্তু এবার তারা আর ভজনপুরের প্রতিরোধ বাহিনীর প্রতিরক্ষা লাইন ভাঙতে পারে না। তারা তখন অমরখানা ত্রিজের এপারে পরিয়ত্যক্ত ই.পি.আর. ক্যাম্পটাকে কেন্দ্র করে তাদের উকুরাষ্টলের শেষ অঘাবর্তী ঘাঁটি অত্যন্ত শক্তিশালীভাবে গড়ে তোলে। গড়ে তোলে জগদলহাটে তাদের অন্য একটি শক্তিশালী ঘাঁটি। যোটামুটি এভাবেই প্রতিরোধ বাহিনীর পিছু নিয়ে অসিত বিজয়ে যুক্তের প্রথম দিকে পাকবাহিনী প্রতিরোধ যোদ্ধাদের তাড়িয়ে এনে অমরখানা জগদলহাটে এসে থমকে যায়। তারা আর তেঁতুলিয়া থানা দখল করতে পারে না। পাকবাহিনীর অয়মাত্রা থেমে যাওয়ার পর তখন তারা নিজেদের অবস্থানে ঘাঁটি গড়ে তাদের দখল করা জায়গা ঠেকানোর জন্য দীর্ঘ প্রতিরোধ

যুক্তে জাড়িয়ে পড়ে। অমরখানা-জগদল-পক্ষগড়-মীরগড় পর্যন্ত তার প্রতিরক্ষা বৃহৎ রচনা করে। তাদের উচ্চোদিকে তেমনি প্রতিরোধ বৃহৎ রচনা করে পিছিয়ে আসা প্রতিরোধ বাহিনী। তারা টেক্স-বাস্কারে থেকে নিয়মিত বাহিনী হিসেবে নিজেদের সংগঠিত আর সুসংহত করে নিয়ে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে থাকে। এই প্রতিরোধ যোদ্ধাদের নামকরণ করা হয় মুক্তিফৌজ হিসেবে। পাশাপাশি পেরিলা যুক্তের জন্য যে দল গড়ে তোলা হয়, তাদের নামকরণ করা হয় এফ.এফ. বা ফ্রিডম ফাইটার। মুক্তিফৌজ বাহিনী স্থায়ী ঘাঁটি গাড়ার পর পাকবাহিনীর সাথে সম্মুখ্যকু চালিয়ে যেতে থাকে। আর এফ.এফ.রা রাতের অস্তকারে পেরিলা যুদ্ধ চালিয়ে শক্তির পেছন থেকে আঘাত হেনে তাদের ব্যতিব্যস্ত করে রাখে। এই হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার বর্তমান চিত্র। এর পাশাপাশি ভারতীয় বাহিনী বাংলাদেশের সীমান্ত পেরিয়ে পাকবাহিনীর সাথে সরাসরি যুদ্ধে লিঙ্গ হয় নি। বাংলাদেশের ভেতরে সমস্ত অঞ্চলের যুদ্ধ আর অন্যান্য তৎপরতা মুক্তিফৌজ আর এফ.এফ.রাই চালিয়ে যাচ্ছে।

এতেদিন পর্যন্ত জগদলহাট-অমরখানার পাকবাহিনী তাদের সম্মুখ্যবর্তী অবস্থানের মুক্তিফৌজের সাথে সম্মুখ্যকু চালিয়ে আসছে, পেছন থেকে তাদের ওপর আঘাত আসতে পারে, এটা তাদের ভাবনাতেই ছিলো না। তবে, চৈতন্পাড়া এবং পাকা সড়কের যুদ্ধ থেকে তারা এটা ধরণা করতে শুরু করেছে যে, মুক্তিযোদ্ধারা ভেতরগড়-সোনারবান-মধুপাড়া এলাকায় ঘোরাঘুরি করছে। দুয়েকটা দল পাঠিয়ে তারা চেষ্টাও করেছে স্বার্থীর দলকে পাকড়াও করার জন্য। আমাদের এ অঞ্চলে তৎপরতার কারণে ইদানীং তারা দুর্দল্লভের সাথে নিয়েছে ব্যাপারটা। হয়তো তারা টোকাপাড়ার মতো বড়ো ধরনের একটা ক্ষেত্রে একটা অপারেশন চালাতে পারে সোনারবান, ভেতরগড়, এমনকি নালাগঞ্জ পর্যন্ত। এ ধরনের একটা অপারেশনের সামনাসামনি হওয়া আমাদের শক্তিতে বুলোবে না এবং এটা তারা বিবারট ক্ষতি হয়ে যাবে আমাদের। এ এলাকার জানমাল, সহায়সম্পত্তি সবকিছু ছেড়ে, লুটপাট আর জুলানো-পোড়ানোর শিকার হবে। পাকাসেনাদের ছোট ছোট দলের ইদানীং ভেতরগড় পর্যন্ত আনাগোনা এই সঞ্চাবনাকেই ইঙ্গিত করছে। সুতরাং সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে, তালমার ওপরকার শালমারা বিজ, যেটা এখনো যানবাহন চলাচলের যোগ্য, সম্পূর্ণ উড়িয়ে দিতে হবে। ফলে অমরখানা থেকে ভেতরগড় পর্যন্ত পাকবাহিনীর আক্রমণ অভিযাত্রা ব্যাহত হবে। সেই সাথে জগদলহাটের মূল ঘাঁটিতে আক্রমণ করে তাদের বুঝিয়ে দিতে হবে মুক্তিযোদ্ধাদের ব্যাপক ও জোরাদার উপস্থিতির বিষয়টি। এই দুটা লক্ষ্য নিয়েই আজ রাতের অপারেশন। ২ ইঞ্জি মৰ্টারসহ ২৫ জনের শক্তিশালী একটি দল নিয়ে আমি মধুপাড়া পার হয়ে সোজা রাস্তা ধরে চলেছি জগদলহাটে। পিন্ডু বড় আকারের ৮/১০টা চার্জ নিয়ে গেছে শালমারা। সেখানে শক্ত নেই। ঠাণ্ডা মাথায় সে ক্রিজটির ওপর চার্জ লাগিয়ে সম্পূর্ণভাবে তা উড়িয়ে দেবে। ওর সাথে রয়েছে ১০ জন।

মোটামুটি নির্বিজ্ঞেই পৌছনো শেলো জগদলহাটের সামনের দিকে গ্রামটি পর্যন্ত। গ্রামটি পার হয়ে রাস্তার ঢাল ধরে এগিয়ে যাই সামনের দিকে। এরপর রাস্তা ছেড়ে ফসলের মাঠে। সন্তুষ্পণে আরো এগিয়ে গিয়ে সামনের কয়েকটা বোপাড়াড়ের আড়ালে পৌছনো যায়। এখান থেকে মাত্র শ'খানেক গজ সামনেই পাকা রাস্তা। পাকা রাস্তার ওপরেই জগদলহাট বাজারে শক্তির মূল ঘাঁটি। পেছনে প্রায় ২শ' গজের ব্যবধানে মৰ্টার পার্টিকে রাখা হয়েছে মুসাৱ নেতৃত্বে। আমাদের তরফ থেকে গুলিবর্ষণ শুরু হওয়ার সাথে সাথে মুসা মৰ্টার আক্রমণ

চালিয়ে যাবে শক্তির অবস্থান বাস্কার লক্ষ্য করে। আগেই রেকি করে পরিষ্কার ছবি এঁকে নেয়া হয়েছে, জগন্মহাট ঘাঁটির শক্তির প্রকৃত অবস্থান।

রাত বারোটায় আঘাত হানা হয় শক্তির ওপর। প্রথমে এল.এম.জি. তারপর এস.এল.আর.সহ রাইফেলের আক্রমণ। মুসা এ ব্যাপারে যোগ্য ছেলে। সময়মতো সেও মর্টারের শেল ফাটাতে থাকে হিসেব করে একেবারে নির্ভুলভাবে। প্রচণ্ড শব্দের সাথে মাটি কাপিয়ে শেলগুলো বিস্ফোরিত হতে থাকে শক্তির ঘাঁটির ওপর। সেই সাথে ঝাকে ঝাকে গুলিবৃষ্টি। জগন্মহাট শক্তি ঘাঁটি প্রথম আঘাতেই বেসামাল হয়ে ওঠে। তাদের ধারণাতেও ছিলো না এভাবে পেছন থেকে ঘাড়ের ওপর তাদের আঘাত আসতে পারে। একজনের প্রচণ্ড চিৎকার শোনা যায়, সম্ভবত পাটা আক্রমণের নির্দেশ হিসেবেই সেই চিৎকার।

— হ্যালো, হ্যালো, হামারা উপার এ্যাটাক কিয়া.. টেলিফোন কিংবা ওয়ারলেসে চিৎকার করে বার্তা প্রেরণের শব্দ প্রায় স্পষ্ট শোনা যায়। মিনিট দশকের মধ্যে ওরা নিজেদের সামলে নিয়ে পাটা আক্রমণ করে; কিন্তু আমাদের অবস্থান তারা ঠিক ধরতে পারে না। শুলি চলে যায় ডান-বাঁ অনেক দূর দিয়ে। এমন সময় ওপারে দেবনগর কামাতের দিক থেকে নিয়মিত মুক্তিফৌজ বাহিনী জগন্মহাটের ওপর ঝাড়া শুলি চালাতে থাকে। পঞ্চগড়ের দিক থেকে ভেসে আসে পাকবাহিনীর কামানের সাপোর্ট, অমরখানার ওপার থেকে আসে ভারতীয় সাপোর্ট। শুরু হয়ে যায় উভয়পক্ষের কামানবৃক্ষ। সেই সাথে এপার-ওপার স্ট্রাইক থেকে মুক্তিবাহিনীর আক্রমণ অনেকটা কাকতালীয় ব্যাপারের মতো। উন্নাদের যত্নে শুলি চালিয়ে নিজেদের অবস্থান ধরে রাখে পাকবাহিনী। একটা পুরোপুরি যুদ্ধ লাগিয়ে দিয়ে আমরা তখন যুদ্ধের ভেতর অবস্থান করছি। চারদিকে শুলির শিস বাজানো শব্দ, দুর্মুক্ত ওপর দিয়ে একের পর এক ছুটে যায় কামানের শেল। উজ্জ্বল আলোর বিলিক ভুঁক্ত ছুল সেগুলোর বিস্ফোরণ কানে লাগিয়ে দিতে থাকে তালা। বারবার কেঁপে কেঁপে উচ্ছ্বেষ্ট ঝাকে ঝুকের নিচেকার মাটি। একেবারে সামলে এসে একটা শেল বিস্ফোরিত হয়। প্রচণ্ড প্রদর্শনের 'শক' ধাক্কা দিয়ে যেনো উচ্চে ফেলে দেয়, চোখ দুটোকে ধাঁধিয়ে দেয় ডয়ানক উচ্ছ্বেষ্ট আলোর দৃতি। তখন মাথা নিচু করে উচ্চে দাঁড়াই। কোমর বেঁকিয়ে দৌড়তে বলি সবাইকে। নিজেও দৌড়তে থাকি ওদের পেছন পেছন। প্রায় ৪০/৫০ গজ সামনে ফেটেছে শেলটা। এর পরেরটা মাথার ওপর পড়তে পারে। রাস্তার ওপর অপেক্ষামান মুসাও আমাদের সাথে দৌড়ে যোগ দেয়। আয় মাইলটাক পিছিয়ে রাস্তার মোড়ের বাড়িগুলোর কাছে এসে থামি। সকলেই বসে পড়ে হাঁপাতে হাঁপাতে। বসেই দম নিতে থাকে। আমরা নিরাপদ দূরত্বে চলে এসেছি ঠিকই; কিন্তু জগন্মহাটে তখনো চলছে শুধুমাত্র যুদ্ধ। ব্যাপারটা ভেবে হাসি পায় খুব। মুসাকে বলি, বিড়ি দে মুসা, দেবেছিস কী নৱক শুরু হয়েছে! অন্দকারে নিপাট ভালোমানুষি হাসি হেসে সে বিড়ি বের করে দেয়। তখন তাকে বলি, ভিমরূলের চাক দেখেছিস?

— হ্যাঁ বলে সায় দেয় সে। বলি, ভিমরূলের চাকে ঢিল দিলে যা হয়, এখন ওখানে তাই হচ্ছে। আমরা ভিমরূলের চাকে আঘাত করে চলে এসেছি, এখন সারারাত চলবে এই কারবার। চলো যাওয়া যাক বলে সবাইকে উঠিয়ে নিয়ে হাঁটা ধরি সোনারবানের দিকে।

তোরের আলো ফুটফুটি যখন করছে, ঠিক সেই সময় হাইড আউটে ফিরে আসি। পিন্টু তার কিছুক্ষণ আগে এসে পৌছেছে। রিপোর্ট দেয় সে তার চিরাচরিত ভঙ্গিতে— সব শ্যাম মাহবুব ভাই, কিছু নাই।

— তার মানে! কী হয়েছে? শক্তিভাবে জিগ্যেস করি। পিন্টুর উদাস কষ্টের জবাব—
ত্রিজটা শ্যাম! সবটাই উড়ে গ্যাছে।

— তাই নাকি? কঞ্চ্যাচুলেশনস্ বলে তার কাঁধে একটা চাপড় মারি। তারপর জিগ্যেস
করি, ঠিক তো?

— বিশ্বাস করেন, এটা মিথ্যা কথা নয়, দিনের বেলা গেলে দেখতে পারবেন।

— ঠিক আছে বিশ্বাস করলাম। চলো ভেতরে যাওয়া যাক।

কথা শেষ করে পিন্টুসহ ভেতরে আসি। ছেলেরা আগেই এসে স্টান শয়ে পড়েছে গায়ে
কাদা-পানি আর ভেজা কাপড়চোপড়সহ। দুটো মগে ধূমায়িত চা নিয়ে মিনহাজ সামনে এসে
দাঢ়িয়ে। ভোরের সূ�্যের সোনালি আলো তখন কেবল এসে পড়েছে গাছের মাথায়, ঘরের
চালে। সেই নরম কোমল পৰিব্রত আলোতে মিনহাজের এই চা নিয়ে দাঢ়িয়ে থাকার
ব্যাপারটা স্মরণ করিয়ে দেয় সেইসব আপনজনকে, যাদেরকে আমরা ফেলে এসেছি দেশের
ভেতরে। তাদের সাথে আর কোনোদিন দেখা হবে কি না কে জানে। মিনহাজের হাত থেকে
চা নিই, জিগ্যেস করি, ছেলেদের নাশ্তাঃ?

— রেডি হয়েছে বলে সে উন্নের জানায়।

— রেশনের অবস্থা?

— চলবে আগামী রিপোর্ট-এর তারিখ পর্যন্ত।

— আজ দুপুরে কী খাওয়াবি?

— গরু।

— পালি কোথায়?

— জোনাব আলী নিয়ে এসেছে। তেজস্বিডের মানুষেরা পাঠিয়েছে।

ভালোবাসা দিলে ভালোবাসা পদ্ধতি যায়। ভেতরগড়ের মানুষ তাদের ভালোবাসার
উপর্যোগ পাঠিয়েছে। মনটা অস্তিত্ব ভালো হয়ে যায়। এটাই তো চাই। এভাবে চলতে
পারলে দেশের মানুষই একদিন সাম্রাজ্যিকভাবে শক্ত তাড়িয়ে দেশ স্বাধীন করে ফেলবে।
হয়তো দেরি হবে কিছুটা, তবে প্রতিক্রিয়া তরু হয়ে গেছে।

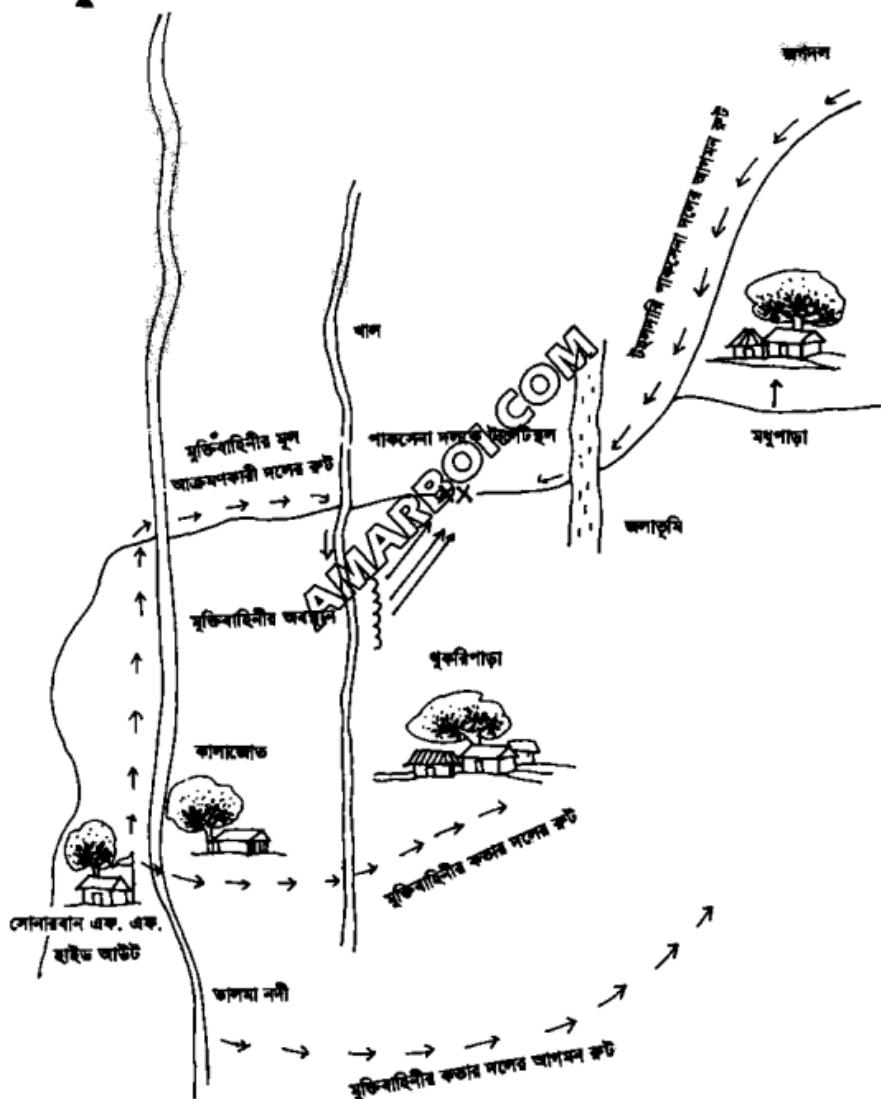
১৬. ৯. ৭৩

পুকরিপাড়ার যুক্তি

সেপ্টেম্বর মাসের ১৭ তারিখ। চমৎকার রৌদ্রকরোজ্বল দিন। সকাল নটার মতো সময়
তখন। সকালের নাস্তা সেবে সেন্ট্রিরা তাদের পোষ্টে চলে গেছে। একটা ঢিলেচালা ভাব
সবার মধ্যে। ঠিক এই রকম পরিস্থিতিতে তালমা পারের বাঁ দিকের সেন্ট্রি মঞ্জু হাঁপাতে
হাঁপাতে ছুটে আসে, ভয়ানক উত্তেজিত অবস্থা তার। বীতিমতো কাঁপছে। আর ঠিক এই
অবস্থায় তার মুখ থেকে যা বের হলো, সেটা বীতিমতো হতচকিত করে দেয় আমাদের। মঞ্জু
ভয়মিশ্রিত জড়ানো গলায় একনাগাড়ে বলতে থাকে, ওরা আসছে। প্রায় তিন চারশোজন।
তালমার ওপারে আধ মাইলের মহিদ্যে ওমুরালা অসি গেইছে...।

মঞ্জুর কথায় অবিশ্বাস করার কোনো কারণ নেই। ওরা শেষতক তা হলে এলো! অল্প
সামান্য সময় লাগে ব্যাপারটা বুঝে উঠতে। তারপর মনস্থির করে তৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত নিয়ে
ফেলি, তালমামুখী আক্রমণোদ্যত পাকবাহিনীকে বাধা দেয়া হবে। পিন্টু-মুসা ও একরামুলকে

কেচ ম্যাপ-৩
পুকরিপাড়ার মুক
৩৭-৬-৭৩
(কেল হাত)



দ্রুত তৈরি হওয়ার নির্দেশ দিই। সময় বেঁধে দিয়ে চড়াগলায় তাদের বলি, পেট রেডি উইন্ডহিন ফাইভ মিনিটস্। প্রতিটি হাতিয়ারের জন্য যতো বেশি সংক্ষ গুলি ইস্যু করবে, ২ ইঞ্জিং মৰ্টার নেবে সবগুলো শেলসহ। সবার কাছে প্রেনেড নেবে চারটা করে। হাইড আউটের দায়িত্বে থাকবে লঙ্ঘনবান কমার্ডার ইন্বাহিম। সে হাইড আউটের সব মালসামান গুটিরে নেবে। অবস্থা বেগতিক দেখলে স্থানীয় মানুষজনের সহযোগিতায় সে সরে পড়বে ভেতরগড়ের নিকে। তাকে সাহায্য করার জন্য থাকবে তিনজন।

ওরা নির্দেশ পাওয়ার সাথে সাথে অত্যন্ত পারদর্শিতা দেখিয়ে দ্রুত হেলেদের যুদ্ধের সাজে তৈরি করে নিতে থাকে। আফজালুর রহমানের উপস্থিতি এই ডামাডোলের মধ্যে প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম। তাকে কিছুটা দূরে ভ্যাবাচ্যাকা খাওয়া অবয়বে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখি। একজন রাজনৈতিক নেতা যুদ্ধের ফ্রন্টে এসেছেন, কিন্তু এ অবস্থায় তাকে পড়তে হবে, সেটা সম্ভবত ভাবতেই পারেন নি তিনি। কী করবেন, কোথায় যাবেন, এমন একটা অস্ত্র অবস্থা তার। তাকে সে অবস্থায় জিগ্যেস করি।

— আগে কখনো রাইফেল ছুঁড়েছেন?

— সির্জিটি ফাইভের ওয়ারের সময় কারমাইকেল কলেজে ছাত্র থাকা অবস্থায় কিছুদিন রাইফেল ট্রেনিং নিয়েছিলাম।

— ওভেই চলবে। তাকে আর কিছু বলতে না দিয়ে আপ্যার সিন্দ্বান্ত জানিয়ে দিই এই বলে, আপনি যাবেন আমাদের সাথে। পিন্টু তুমি ওনাক্স একটা রাইফেল দাও, আর তাকে সব সময় তোমার সাথে সাথে রাখবে। টেক কেয়ার ভব হিম।

সব হেলে তৈরি। লাইনে দাঁড়িয়েছে তার স্লোগান আভিনা জুড়ে। সবাইকে উদ্দেশ করে সংক্ষিপ্ত ব্রিফিং দিই, আজ দিনের বেলায় শুচ্ছ মোকাবেলা হবে সামনাসামনি, তাদের সঠিক শক্তি আমরা জানি না। যেভাবেই হোক আঠাকাতে হবে তাদের। শেষ গুলি পর্যন্ত সবাইকে শক্তির মোকাবেলা করতে হবে। ক্ষেত্রে অবস্থাতেই পিছু হাঁটা চলবে না। বেশি গুলি ঝরচ করা যাবে না। গুলি আমাদের কম। যাবে তামে তার দলবল নিয়ে। সে শালমারা ব্রিজের কাছ দিয়ে তালমা পার হবে এবং এগিয়ে গিয়ে পেছন থেকে শক্তিকে আক্রমণ করবে। পিন্টু তার দল নিয়ে সোজাসুজি নদী পার হয়ে শক্তিকে ডান দিক থেকে আক্রমণ করবে। আমার সাথে থাকবে একরামুল। আমরা এগুবো বাঁদিক থেকে শক্তি যে দিক দিয়ে আসছে, সেদিকপানে। শক্তিকে টার্চেটের মধ্যে পেলেই ফায়ার ওপেন করতে হবে। বানারের মাধ্যমে সবাই দলের সাথে যোগাযোগ রাখার চেষ্টা করবে। মনে রাখবে শক্তিকে কোনোভাবেই তালমা নদী পার হতে দেয়া যাবে না। এটাই হচ্ছে চূড়ান্ত সিন্দ্বান্ত। নাউ লেট আস মুড, খোদা হাফেজ।

ব্যাটম্যান ঠাঁদ মিয়া, আমার প্রিয় টেনগান দুটো ম্যাগজিনসহ ততোক্ষণে আমার হাতে ধরিয়ে নিয়েছে। চার পকেটটালা কালো জামাটার পকেটগুলো প্রেনেড ভর্তি হয়ে ফুলে আছে। টেনগানের জন্য অতিরিক্ত গুলির দুটো প্যাকেট সেখানে গোঁজা। টেনগানটা কাঁধে দুলছে, আমরা দৌড়ুছি ডান দিকে তালমা অভিযুক্তে। মঞ্জু পাশে রয়েছে। পিছল আলপথ, বোপঘাড়, কাঁটাবন, এবড়োখেবড়ো উচুনিচু জমি পার হয়ে আমরা দৌড়ে চলেছি মঙ্গুর সেন্ট্রি পোস্টের দিকে। ওখান দিয়েই আমরা তালমা পার হবো। প্রতিটি দলের সদস্যসংখ্যা ১৫ থেকে ২০ জনের মতো করে। একটা ২ ইঞ্জিং মৰ্টার, একটা এল.এম.জি, দুটো অটো রাইফেল, বাকি সবকিছু এস.এল.আর. এবং প্রি.নট.প্রি রাইফেল। এই অন্তর্বল নিয়েই আমরা মোকাবেলা

করতে চলেছি আধুনিক চীন। অন্ত সম্ভাবে সজ্জিত জাত সৈনিক পাকবাহিনীর সাথে। মনে দৃশ্য, ওদের সাথে শেষ পর্যন্ত পেরে গঠা যাবো তো? দেখা যাক কি হয়!

মঙ্গুর সেন্ট্রি পোস্টে পৌছুতে হঠাৎ করেই অভাবনীয় দৃশ্য ঢোকে পড়ে। শত শত মানুষ ছুটে আসছে। নদীতে বুক সমান পানি। সেই পানি ভেঙে কোলের শিশু ও নানা বয়সী বাচ্চাকাচাসহ 'শ' 'শ' গ্রামবাসী পাগলের মতো নদী পার হবার চেষ্টা করছে। প্রায় অধিকাংশেরই মাথায় পোটলাপুটলি, সাথে গুরু-চাগল। তাই নিয়ে তারা প্রাণপণে ছুটছে নদীর এপারে আসার জন্য। সবারই উদ্ভ্রান্ত দিশেহারা চেহারা, চেখেমুখে ডয়কর মৃত্যুর ছায়া।

তড়িঘড়ি নদীতে নেমে পড়ি। মানুষের ঢল আসছে এদিকে। আমরা কোমর বুক সমান পানি ঠিলে ঠিলে দ্রুত ওপারে দিয়ে পৌছাই। সামনে একটা সুড়ঙ্গ মতো পথ নদীর পাড় পর্যন্ত উঠে গেছে প্রায় ১৫/২০ ফুট উচুতে। সমস্ত শরীর তখন ভিজে চূবচুবে। সেই অবস্থাতে জঙ্গলাকীর্ণ সেই সুড়ঙ্গ মতো পথ বেয়ে ওপারে গিয়ে উঠি। সামনে বেশ কিছুটা সমতলভূমি। না, সেখানে পাকবাহিনী এখনো এসে পৌছায় নি। তবে ওরা আসছে। তাড়া-খাওয়া গ্রামবাসী তখনো ছুটে আসছে এলামেলো এলোগাতাড়ি ভঙিতে। পাকবাহিনীর অবস্থান সঠিক করে কতোটা দূরে, সেটা জানা দরকার। একদল মানুষকে থামিয়ে জিগ্যেস করি, আপনারা আসছেন কোথা থেকে?

— মধুপাড়া থেকে, দলের প্রবীণ ব্যক্তির উন্নর।

— ওদের সংখ্যা কতো হবে জানেন?

— অনেক বাবা, অনেক।

— ওদের দেখেছেন?

— না।

— এখন ওরা কতো দূরে আছে?

— এতোক্ষণে বোধহয় মধুপাড়া প্রায় হয়ে এসেছে।

প্রবীণ ব্যক্তি আর দাঁড়ান না। প্রায় সন্তুরের মতো বয়স তার। কিছুটা কুঁজে হয়ে গেছেন। হাতে লাঠি। আর ক'দিনই-বা বাচ্বেন এই বৃক্ষ! কিন্তু যে ক'দিনই বেঁচে থাকুন না কেনো, তিনি পাকবাহিনীর বর্বরতার শিকার হয়ে বেঁঘোরে প্রাণ দিতে চান না। একজন মানুষের কাছে তার জীবনের চাইতে শ্রেষ্ঠতর আর কী হতে পারে! মরতে কেউই চায় না। এই পৃথিবীর কঠিন বাস্তবতার ভেতরেও সুখ-দুঃখ, হাসিকান্না, ভালো লাগা আর ভালোবাসা নিয়ে বসবাসের মধ্যে যে একটা মায়াময় জগৎ রয়েছে, সেটা ছেড়ে সহজে কেউ যেতে চায় না। একজন সাধারণ মানুষের জন্য মানব সভ্যতার উষালগ্ন থেকেই এই জীবনদর্শন চলে এসেছে।

কিন্তু একজন সৈনিক! সৈনিকের বেলায় এর দর্শন ঠিক উষ্টো। একজন সৈনিক এগিয়ে যাবে যুক্তের দিকে, মৃত্যুর ভয়াবহ তাঙ্গবের দিকে। একজন সৈনিক যখন যুক্তের দিকে এগিয়ে যায়, হয় তার জয় হয়, না হয় পরাজয়— এ দুটো ধারণা তার মনের মধ্যে কাজ করে। ইউ কিল দা এনিমি আদারওয়াইজ হি কিল্স ইউ অর্থাৎ শক্তির মুখোমুখি হলে প্রথমেই তুমি শক্তকে মারবে, তা না হলে সে তোমাকে হত্যা করবে, যুক্তের ময়দানে একজন সৈনিকের এটাই হচ্ছে ধর্ম। এর মাবামাখি কিছু নেই, কোনো বিকল্প নেই। যুক্তের জন্য আগুন সৈনিক তাই বাধা হয়ে অনেকটা ভাবলেশহীন হয়ে যায়। সম্মুখে মৃত্যু জেনেও সে এগিয়ে যায়। আসলে সে তখন তার সকল মানবিক চিঞ্চাভাবনা থেকে মুক্ত হয়ে যুক্তের দিকে এগিয়ে যায়। এখানেই

একজন সাধারণ মানুষের সাথে যুক্তরত সৈনিকের পার্থক্য। অনেকটা চেতনা ও অনুভূতি-শূন্য অবস্থায় তাকে যুদ্ধের ময়দানে নিয়ে যায় বিভীষিকা, নিষ্ঠুরতা আর মৃত্যুর দিকে।

যে ব্যাপারটা কাজ করছে এখন এই মুহূর্তে আমার মধ্যে, আমার সহগামী একরামুল, মধুমুদ্রন, শঙ্খ, হাফেজ, মালেক আর মঙ্গুর মধ্যে। ঠিক একই অনুভূতি তাড়িয়ে স্মরণে মুসা, পিন্টু আর তার দলবলকে। কিন্তু আফজালুর রহমান? তার কথা ভেবে এই মুহূর্তে শঙ্খ জাগে। দ্রুতলোক যুদ্ধের ফ্রন্ট দেখতে এসেছিলেন। এখন তিনি নিজেই একজন সৈনিক বনে গেছেন।

দ্রুত সামনের সমতল ভূমিটি পার হয়ে যাই। এরপর একটা খাল। খালে নেমে পড়ি উচ্চ পাড় ধরে ঝিপ খাওয়ার ভঙ্গিতে। সামান্য পানি কিন্তু ভূরভূরে নরম কানা। হাঁটতে গেলে পায়ের হাঁটু পর্যন্ত গেড়ে যেতে চায়। কষ্টকর পদচারণা। কিন্তু উপায় নেই। দ্রুততার সাথে খাল পার হতে হবে। তা না হলে খালের ওপর থেকে পাকবাহিনীর চমৎকার টার্ণেট হয়ে যাবো আমরা। খাল পার হওয়া গেলো। এপার বেশ উচু। পাড় বেয়ে উঠতে কষ্ট হয় খুব। কিন্তু এক সময় ওঠা গেলো। খালের পাড়ের ওপর বুক ও মাথা, পা জোড়া ঝুলছে তখনও খালের খাড়া পাড়ের নিচে। ক্লান্তির চরম সীমায় পৌছে গেছি তখন। হাঁ করে মুখ দিয়ে নিষ্পাস নিতে হচ্ছে। সে অবস্থাতেই সামনের দিকে দৃষ্টি দিয়ে প্রায় জমে যাবার যোগাড়।

খালের এপার থেকে ভুক্ত হয়েছে বেশ বড়োসড়ো একটা ঘাসে ডরা সমতল ভূমি। ছোটোখাটো বোপুরাড় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে এদিকে-সেদিকে ওখান থেকেই প্রায় ৬০/৭০ গজ দূরে ওরা লসাদেহী কালো পোশাক পরা ৪ জন। আপাকসেনা। ওরা পলায়নরত একটা দলকে ঘিরে ধরেছে। ওদের মধ্যে সব থেকে প্রেস্টেজের পেট মোটা সৈনিকটি একজন অল্প বয়স্ক মহিলার কোমরে হাত দিয়ে তাকে নিজের পুরুকের সাথে সেঁটে রেখেছে। ছটফট করছে মহিলাটি। মহিলাদের মধ্যে আর একজনের প্রায় ধরে টানাটানি করছে অন্য একজন সৈনিক। বাদবাকি ওরা এমনভাবে হাসাহাসি করছেসবে মনে হচ্ছে যেনো দারুণ একটা মজার কাজ করছে। দেখলাম তাদের, কাছ থেকে সৈনের বেলায় রোদ্রুকরোজ্জ্বল দিনে। বহুবার মোকাবেলা হয়েছে তাদের সাথে; কিন্তু আজকের মতো এতো স্পষ্ট করে দেখা হয় নি এর আগে আমাদের জাতশক্তি পাকসেনাদের। যারা সমস্ত দেশটা দখল করে খাবলে খাবলে খাচ্ছে শকুনের মতো, পাশবিক বর্করতা আর নিষ্ঠুরতা দিয়ে অত্যাচারের বন্যা বইয়ে দিচ্ছে, দেশ জড়ে বিষফেঁড়ার মতো বাক্সার গড়ে তুলে দেশটাকে নিজেদের দখলে রাখার চেষ্টা করে যাচ্ছে প্রাণপন।

ওদের আমরা দেখছি কিন্তু ওরা আমাদের অতিভু টের পায় নি। ব্যস্ত নিজেদের কাজে। পাশে একরামুল মুখ তুলেছিলো, ব্যাপারটা একনজর দেখে ও তার মুখ নামিয়ে নিয়েছে। মঙ্গ, শঙ্খ ও অন্যরা উঠতে চাইছিলো; কিন্তু ওদের সেটা করতে নিষেধ করে আমি নিজেও সন্তর্পণে নিচে নেমে আসি। এখান থেকে ওদের আক্রমণ করা ঠিক হবে না, তাহলে ওরা যাদের ঘিরে রেখেছে তারা মারা পড়বে। তাই বটপট সিঙ্কান্স নিয়ে নিই, হাঁটা পথটা যেখানে খালে এসে ঠেকেছে, সেখান থেকেই হামলা চালাবো বিদ্যুৎভিত্তে। এর ভেতরেই সংবিত্ত নরপত্নো ঘিরে রাখা দলটাকে ছেড়ে দেবে এবং সামনের দিকে আসতে থাকবে। সিঙ্কান্স অনুযায়ী সবাইকে নিয়ে দৌড়ুতে থাকি ইঙ্গিত লক্ষ্য অভিযুক্ত। সবাইকে এই সাথে তাদের হাতিয়ারগুলো লোড করতে বলি।

আলপথের মুখে পৌছুতে বেশি সময় লাগে না। জায়গাটা খাড়া নয়। মোটামুটি ঢালু। তাই দ্রুত ক্রিলিং করে ওপরে উঠে আসি। সামনে ছোটো একটা ঝোপ। দোড়ে গিয়ে তার

আড়ালে পজিশন নিই। আমার পাশে একরামুল, হাতে ওর এস.এল.আর। পেছনের ওরা এখনও এসে পজিশনে যেতে পারে নি। আমাদের হিসেব ঠিক ছিলো। পাকসেনারা দলটিকে ছেড়ে দিয়েছে। ছাড়া পেয়ে উর্ধ্বর্খাসে ছুটে আসছে দলটি। কিন্তু পেছন দিককার মোটাসোটা সৈনিকটি তখনো তার পাকড়াও করা মেয়েটাকে জড়িয়ে ধরে আছে। ওরা এগুচ্ছে না আর। সেখানেই দাঁড়িয়ে কী যেনো পরামর্শ করছে, এগুবে না পিছুবে দোটানার মধ্যে রয়েছে হয়তো। আর সময় নষ্ট করা ঠিক হবে না। আমার পাশে একরামুল শক্তির দিকে তার এস.এল.আর. তাক করার চেষ্টা করছে। আমার হাতে স্টেনগান, এটা হচ্ছে কাছ থেকে যুদ্ধ করার অঙ্গ। মনে হচ্ছে এটার জায়গায় একটা এস.এল.আর. বা রাইফেল থাকলে ভালো হতো। একটা রিস্ক থেকেই যাচ্ছে। পেট মোটা সৈনিকটির বাহবক্ষনে রয়েছে মেয়েটি। গুলি চালালে তার ক্ষতি হতে পারে। কিন্তু সময় নেই। শক্তি একেবারে নাগালের মধ্যে। এ সুযোগ হাতছাড়া করা যাবে না। ফিসফিসিয়ে একরামুলকে বলি, রেডিঃ

— জি।

— পারবি?

— হ্যাঁ।

— র্যাপিড ফায়ার দিবি। থামবি না। টার্গেট মিস করিস না। শুরু কর। ফায়ার—!

ধাম্ ধাম্ করে একরামুলের এস.এল.আর. থেকে গুলি ছুঁড়িত থাকে। আর ছুটতেই ইয়া আল্লামার গ্যায়া' ধরনের শব্দ ভেসে আসে আক্রান্ত শক্তিশালীর তরফ থেকে। ব্যাপারটা দেখে মনে হলো, একরামুল ঠিকঠাক টার্গেট হিট করতে পেরেছে। আমার স্টেনগান থেকে পুরো এক ম্যাগজিন ত্রাশ চালিয়ে দিই। হাফেজ, মধু, শশু ও ওরা ও এরি মধ্যে পজিশনে এসে অনেকটা উদ্ব্রান্তের মতো গুলি ছুঁড়ে চলেছে। শক্তি স্টার্য়ার অবস্থাটা ততোক্ষণে পুরোপুরি অংচ করতে পেরেছে। তাই ওরা ও পজিশনে গিয়ে প্রাণে গুলি ছুঁড়তে শুরু করে। তবে ওদের গুলিবর্ষণের ধারা এলোমেলো। বোৰা যায়, আক্রমকার জনাই তারা নিশানাবিহীনভাবে গুলিবর্ষণ করে চলেছে। এমন সময় ডান পাশ থেকে গুলিবর্ষণ শুরু হয়ে যায়। সে এক এলোপাতাড়ি তুলকালাম কাও। পিন্টুর দলের কাজ এটা। কিছু দূর থেকে মুসার দলও শুরু করেছে একইভাবে। তারা আমাদের মতো শক্তদের সামনে পেয়েছে কি না কে জানে? তবে শক্তি সেনারা যে তিনিদিক থেকে আক্রান্ত, সেটা তারা বুঝতে পেরেছে। এখন চারদিকে শুধু গুলিবর্ষণে বাতাস কাঁপানো শব্দ। একটা ঝীতিমতো রণক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে পুকুরিপাড়া নামের এই জায়গাটা।

আমাদের সামনের শক্তদল হঠাতে করেই তাদের গুলিবর্ষণ থামিয়ে দিয়ে একেবারে চুপচাপ হয়ে যায়। ওরা কি তাহলে স্ট্র্যাটেজি পালিতেছে দু'ধার দিয়ে আসবার পরিকল্পনা করছে? না পালাচ্ছে? হঠাতে করেই মনটা বলে ওঠে, ওরা পিছু হটচে, পালাচ্ছে। এমনিতেই ওরা দলে কয়, সম্ভবত রেকি প্রেটেল এসেছিলো পেছনে বড় দল রেখে। শুরুতেই ওদের দু'একজন ঘায়েল হয়েছে। এছাড়া চারদিক থেকে ওরা আক্রান্ত। সৈনিকের র্ধম অনুযায়ী এ সময়টায় ওদের পিছু হটার কথা। না, ওরা পালাচ্ছে। উঠে দাঁড়াই ঝট করে। সাথের ছেলেদেরও উঠতে বলি এবং নির্দেশ দিই, দৌড়া, ফলো মি। শালারা পালাচ্ছে। ধরতে হবে ওদের। দৌড়া বলে সামনে দৌড়াতে থাকি। গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে অনেকটা পাগলের মতো দৌড়াচ্ছি খোলা মাঠের ওপর দিয়ে। শক্তি যদি এখন ঘাপটি মেরে বসে থাকে, তবে আমাদের বুক খাঁবারা হয়ে যেতে পারে যে-কোনো সময়। কিন্তু সেটা এ মুহূর্তে চিন্তাবনার ভেতরে নেই।

মাঠ পেরিয়ে একটা জলাভূমি। জলাভূমির ভেতর দিয়ে একটা কর্দমাকু হাঁটাপথ। এ পথ দিয়ে আমরা বহুবার মধুপাড়া-জগন্দলহাট-চৈতনপাড়া অপারেশনে এসেছি।

হ্যা, আমাদের অনুমান ঠিক। শক্ত পালাছে সে পথ দিয়েই উর্ধ্বস্থাসে। সামনের দুজন একজন শায়িত লোকের দুহাত ধরে কর্দমাকু জলাভূমির ওপর দিয়ে টেনে-হিচড়ে নিয়ে যাচ্ছে। একজন আলপথের আড়ালে হামাগুড়ি দিয়ে চার পেয়ে একটা জানোয়ারের মতো এগছে। জলাভূমির মাঝামাঝি ওরা। আমাদের টার্গেটের মধ্যে। চিংকার করে বলি, শুলি চালা একরামুল, মধু, শুভ। সব শালাকে খতম কর। শুয়োরের বাছাদের আজ যেতে দেবো না। পাশাপাশি পলায়নপর সন্তুষ্ট গ্রামবাসী মানুষজনের উদ্দেশে চিংকার করতে থাকি সমানতালে, ভাইয়েরা আপনারা পালাবেন না। আমাদের সাথে আসেন। আজ ওদের ধরা হবে। ওরা পালাতে পারবে না। আসেন, আমাদের সাথে আসেন।

একরামুল ও অন্য সহযোগিকারা শুলি ছুঁড়ে চলেছে। ওরা জলাভূমির মাঝামাঝি পার হয়ে গেছে। আলপথের আড়ালে শুয়ে পড়ে ওরা দ্রুত এগনোর চেষ্টা করছে। কালো কালো কটা সরীসৃপ জাতীয় প্রাণী যেনো এক বুক কাদার ভেতর দিয়ে সাঁতার কেটে এগবার চেষ্টা করছে। মানুষের জীবন তার কাছে কত প্রিয় আর প্রাণভয় কতখানি ভয়াবহ হতে পারে, পলায়নপর পাকসেনাদের এই পালিয়ে যাবার দৃশ্য থেকেই সেটা সুস্পষ্ট। ওরা আর পালাতে পারবে না, ধরে ফেলা হবে ওদের, এই আঘাবিষ্ঠাসে ক্ষণক্ষণে জলাভূমিতে নেমে পড়েছি। পাগলের মতো সেইসাথে লোকজনকে প্রাণপণে ডেকে চলেছি, আপনারা আসেন চারদিক থেকে। ওদের ঘিরে ধরেন। ওরা আর যেতে প্রস্তুতি দেবে; কিন্তু কোনো মানুষ এগিয়ে আসে না। তবুও একনাগাড়ে ডেকে চলেছি গলা ছাঁচাটে। আলপথের পিছল পথে দৌড়াতে দৌড়াতে কাদায় মাঝামাঝি হামাগুড়ি দিচ্ছে এগনো শক্তদের উদ্দেশেও আবার একইভাবে বলছি, তুম লোগ সারেভার করো, কেন্দ্রিতা শুলি করেগা। সব লোগ মরেগা, খতম হো যায়েগা। কিন্তু এ অবস্থায় একরামুলের প্রস্তুতি, মালেক, মঙ্গ, শুভ আর মধু আরো পেছনে। তাই ওদের দিকে তাকিয়ে মুখ দিয়ে খিঞ্চি বের হয়, হারামজাদা শুয়োরেরা দোড়া। জোরে দোড়া। ওরা জীবন গেলেও সারেভার করবে না মনে হচ্ছে। কিন্তু হাতের এতো কাছ থেকে আহত অর্ধমৃত পাকসেনা কটা ফসকে যাবে, ধরতে পারবো না, এটা হয় না। সুতরাং ছুটছি পাগলের মতো। যে করেই হোক ওদের আটক করে ফেলবো এই বিষ্ঠাসে। জলাভূমির মাঝ বরাবর জায়গাটা যখন পার হয়ে এসেছি, ততক্ষণে ওরা পৌছে গেছে শেষ মাথায়। ওদের দিকে লক্ষ্য করে এলোপাতাড়ি শুলি ছুঁড়ছি থামাবার জন্য কিন্তু থামছে না ওরা।

না, জলাভূমির কাদাপাকের ফাঁদে ওদের আটকানো গেলো না। খাল পার হয়ে হেঁচড়ে হেঁচড়ে ওপারে উঠে পড়েছে ওরা। খালের ওপারে ছোট ছোট বোপজঙ্গল। একটা বোপের আড়ালে ফিলিয়ে গেলো ওরা। আমরা তখন পৌছে পৌছি জলাভূমির শেষ মাথায়। খাল পাড়ের বোপ-জঙ্গল পার হয়ে এলাম। এবার সামনে বিস্তীর্ণ ফাঁকা জায়গা। সব আবাদি জমি আর ধানখেত হাঁটু সমান কোমর সমান উচু। মাঝে মধ্যে পাটখেত। ফসলের মাঠ পার হলেই বর্ধমুণ্ড গ্রাম মধুপাড়া। একটা গ্রাম রাস্তা চলে গেছে মধুপাড়ার দিকে। পলায়নপর খানসেনারা হারিয়ে গেলো তাহলে? কিন্তু ওরা যাবে কোথায়? ওদের একজন তো আহত। বোপের বাইরে খোলা জায়গায় এসে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম। দেখা যাচ্ছে না ওদের। চারদিকে সতর্ক দৃষ্টি

বুলিয়ে ওদের ঝুঁজছি। এতো সহজে পালাতে পারবে না ওরা। ফসলের মাঠ দিয়ে পালাবার চেষ্টা করলে বোৰা যাবে। এ পথে যেদিক দিয়েই ওরা পালানোর চেষ্টা করুক না কেনো, ফসলের শরীর তাদের মাথা নাড়িয়ে জানান দেবে ওদের তৎপরতার ব্যাপারটি।

— হারামজাদারা এদিক দিয়ে গেছে, হঠাৎ একরামুল বলে গুঠে। একরামুল যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলো, তার সামনের ধানখেতের কর্দমাক্ত মাটিতে তাদের পায়ের দাবানো বুটের শপ্ট ছাপ রয়েছে। তাছাড়া ন্যাতানো সবুজ ধান গাছগুলো জানিয়ে দিছে ওদের পালানো পথের দিশা। তার মানে, ধানখেতের ওপর বা আড়াল দিয়ে ওরা এখনো পালাতে তৎপর। শুব বেশি দূরে ওরা তাহলে যেতে পারে নি। না, ধরা যাবে।

— দৌড়া একরামুল, বলে ধানখেতে নেমে পড়ি। আমরা পেছন দিক থেকে আসা সহবদ্ধ ৪ জনকে দু'ধার দিয়ে এগুতে নির্দেশ দিই। হাতে উদ্যত হাতিয়ার। দ্রুত হাঁটাছি। ধানখেতটার বাঁ দিকের আলটা সামান্য উঁচু। তার আড়াল নিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে এগুচ্ছে ওরা। আর ওদের দেখামাত্রই চিক্কার দিয়ে উঠি, তুমলোগ সারেভার করো, নেইহিতো মর যায়েগা, হাম লোগ তুমলোগকে ঘির লিয়া হায়। সারেভার করো, সারেভার করো...। একরামুলকে সাথে নিয়ে দ্রুত দৌড়াচ্ছি। মনে প্রচণ্ড বিষ্ণাস, ওদের সারেভার করাতে পারবোই। ধরা ওরা পড়বেই। পরপর দুটো ধানখেত, তারপর পাটখেতে। আমরা দৌড়াচ্ছি ওদের সমান্তরালভাবে। উদ্দেশ্য, ওদের আগেই পাটখেতের কিনারে পৌছে সামনাসামনে সারেভার করে ওদের সারেভার করানো। দৌড়াচ্ছি আর চিক্কার করছি ওদের সারেভারের জন্য। একটানা চিক্কারে গলার স্বর প্রায় বসে গেছে তখন। এমন সময় হঠাৎ করেই পুর্ণিমে হামাগুড়ি দেয়া পাকসেনাটি দাঁড়িয়ে পড়লো। অনেকটা সারেভারের ভঙ্গি তার চিক্কায় মাখামাখি কালো ইউনিফর্ম, দীর্ঘদেহী একজন পাকসেনা মাত্র $15/20$ গজের বিষয়ধানে। এখন মুখোযুবি আমরা। সে আমাদের দেখছে, আমরা দেখছি তাকে। দিনের বেলায় একজন শক্ত একেবারে মুখোযুবি দাঁড়িয়ে তাও পাক আর্মি! দৃশ্যটা অকল্পনীয়, অ্যাকশ একরামুল, হাতে তাক করে ধরা এস.এল.আর. তার দিকে। আর মাত্র ক'টা মুহূর্ত, অরপর সৈনিকটি সারেভার করবে!

না, আমাদের ধারণা ভুল প্রমাণিত হলো। সারেভারের ভঙ্গিতে হাত তুলে দাঁড়ালেও মুহূর্তের ভেতরে সে তার নিজের হাতিয়ার টেনে নিয়ে আমাদের লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়লো। এটা যে করবে, সেটা আমার ধারণাতেও আসে নি। তার ছেঁড়া শুলিটা ঠিক পায়ের ফুটখানেক সামনে এসে থপাস্ শব্দ তুলে কিছু কাদাপানি ছিটিয়ে দেবে গেলো মাটিতে। আর পলকেই আমার আঙুল টেনিগানের ট্রিগারে চাপ দেয়। নতুন লাগানো ম্যাগজিনটা খালি না হওয়া পর্যন্ত আমার আঙুল তেমনি দেবে থাকলো ট্রিগারে। সৈনিকটা প্রথমে একটা হাত ওপরে তোলার চেষ্টা করলো। তারপর পড়ে গেলো ধপাস করে। তারপর এক অসম্ভব অবসাদ আর ক্লান্তি এসে হঠাৎ করে যেনে জড়িয়ে ধরে আমার সারা দেহ-মন। আমি ও ধপ্ করে বসে পড়ি পায়ের পাতা ভেজানো পানি আর গোড়ালি পর্যন্ত দ্রুবে যাওয়া কাদাপাঁকে মাখামাখি জলের মধ্যে। তার আগেই একরামুল বসে পড়েছে। শোয়া অবস্থায় এখন সে এস.এল.আর.টাৰ ম্যাগজিন পাল্টানোৰ কাজে ব্যস্ত। কিন্তু হঠাৎ করেই তার মুখ ফকে বেরিয়ে আসে সেই ভয়াবহ কথাটা, এস.এল.আর.টা আৰ চলছে না।

— কী বললি?

— এস.এল.আর.টা চলছে না।

— কেনো?

— বুঝতে পারছি না। কার্বন জমে গেছে বোধহয়।

— চেষ্টা করে দ্যাখ। ওটা ঠিক করতেই হবে। আমার টেলগানের শুলিও প্রায় শেষ।
মাত্র এক প্যাকেট আছে। দ্যাখ, হাত ঢালা।

একরামুল ওর এস.এল.আর.টা পরীক্ষা করতে থাকলো ধানের সোড়া ডোবানো কাদার মধ্যে
শয়ে শয়ে। আমি ওর পাশে শয়ে শন্ত ম্যাগজিনটায় শুলি ভরতে থাকি। এক সময় শুলি ভৱা
শেষ হলো; কিন্তু একরামুলের এস.এল.আর আর আর ঠিক হলো না। এখন আমাদের দু'জনের জন্য
মাত্র একটা সচল হাতিয়ার। আর সেটা আমার টেলগান। তাতেও মাত্র একটা ম্যাগজিন ৩০
রাউন্ড শুলি আর পকেটে রয়েছে ৪টা ফ্লেনেড। মাত্র এই। কিন্তু সামনে শক্তির অস্তিত্ব বিদ্যমান।
খুবই অসহায় লাগে নিজেকে। সামান্য মাথা তুলে ঘঞ্জ-হাফেজদের অবস্থান জানার চেষ্টা করি।
না, সম্ভবত ওরাও হারিয়ে গেছে। এখন চৃপচাপ ঘাপটি মেরে পড়ে থাকা ছাড়া আর কোনো
উপায় নেই। একরামুলকে ফ্লেনেড বের করে হাতে নিতে বলি, নিজেও একটা বের করে হাতে
ধরে রাখি। মাথার ওপর থেকে স্রদ্ধদের তার প্রচণ্ড তাপ ঢেলে দিচ্ছেন তখন। বুকের নিচেকার
কাদাপানি উঙ্গল হয়ে উঠেছে ধীরে ধীরে। শরীর জুড়ে ছেট ছেট পোকামাকড়ের সূচসূড়ি দিয়ে
চলাচল টের পাইয়ে দেয় তাদের অস্তিত্বের কথা। ভ্যাপসা, দম বন্ধ করা গরম, পানি-কাদার
মেশামেশিতে এক ধরনের পচা দুর্বৃক্ষ। তার মধ্যে শয়ে আছি শৈমুরা দু'জন পশাপাশি।

মাঝ বরাবর অবস্থানে পিন্টুর দল তখনো সত্ত্বিয়। আরো ডানে মুসার দলের গোলাগুলি
চলছে থেমে থেমে। ওরাও কি আমাদের মতো শক্তিকে সামনাসামনি পেয়েছে, না সাপোর্ট
ফায়ার পাঠাচ্ছে, বুবুবার উপায় নেই। তবে প্রক্রিয়াইনীর মূল দল যে আসে নি, এটা বোঝা
গেছে। জগদলহাট থেকে রেকি পেট্রলে ঘৃসেরকে পাঠিয়েছিলো ওরা, আমরা তাদেরই
মুরোমুরি হয়েছি। এই অবস্থায় এখন একজন রানারের প্রয়োজন। পিন্টু-মুসাকে খবর পাঠাতে
হবে যেনো ওরা অর্ধবৃত্তাকারে মধুপাত্তি সতর পৌছাতে পারে। এমন সময় মঞ্জু আসে পেছন
থেকে। নিঃশব্দে বুকে হেঁটে প্রক্রিয়া বিটিতি আমার ডান পাশে টেনে এনে উইয়ে দিই।
ক্লান্তিতে ইঁপিয়ে উঠেছে ছেলেটা। ওর হাত থেকে রাইফেল আর শুলির মালাটা নিয়ে
এস.এল.আর.টা ধরিয়ে দিই ওর হাতে। ওটা এখন একটা লাঠির চাইতেও খারাপ অন্ত।
একরামুল তার নতুন অন্ত্রে যোগান পেলো। মঞ্জু এখন রানারের দায়িত্ব পালন করবে।
ফিসফিসিয়ে বুঝিয়ে দিই ওকে, কী করতে হবে। মাথা কাত করে সে যেভাবে এসেছিলো,
সেভাবেই পিছিয়ে যায়। মঞ্জুর ওপর অগাধ আস্থা আমার। কোনো অবস্থাতেই সে তার
দায়িত্ব পালনে অবহেলা করে না বা করবে না। এভাবে বেশ কিছুক্ষণ সময় কেটে যায়।

মিনিট বিশেক হতে পারে, আধ ঘণ্টাও হতে পারে, সামনের দিক থেকে তখন কিছু
মানুষের গলা তনতে পাওয়া যায়। বেশ উত্তেজিতভাবেই নিজেদের মধ্যে জোরে জোরে কথা
বলছে তারা। মানুষগুলো আসছে সম্ভবত মধুপাত্তির রাস্তার দিক থেকে, এ সময় ওদের
কথাবার্তা আরো স্পষ্ট হয়। ওদের একজন বলছে, শালা খানেরা ছিলো ৪ জন, ২ জন
পালাবার দেখিলো আর ২ জন গেইল কুস্তে? মুক্তিকোজেরা গেইল বা কুন দিক? এবার অন্য
একজনের গলা, যে যুক্তা হইল সে মুক্তিকোজারাও মরহিবার পারে কতগুলান...।

মানুষ ক'জন আমাদের ডান পাশের রাস্তা ধরে এগিয়ে যায় তালমার দিকে। তা হলে
দু'জন ভেগে গেছে! বাঁ হাতে ফ্লেনেড, ডান কাঁধে টেলগান ঝুলিয়ে উঠে দাঁড়াই। ভাবি,

দু'জন যদি ভেগে গিয়ে থাকে, তাহলে বাকি দু'জন নিচয়ই রয়ে গেছে। একজন চিরকালের জন্য শায়িত সামনের আলটার ওপারে। তার হিসেব নেয়া দরকার। অন্যজনের হিসেব পরে। আহত শক্ত একজন জাত সৈনিক। তবে আহত সৈনিক আর আহত বাবের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। সুতরাং সমস্ত ইন্দ্রিয় সংজ্ঞার রেখে চেনগানের ট্রিগারে অঙ্গুলি রেখে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে এগুতে থাকি শায়িত সৈনিকটির দিকে।

মরে গেছে সৈনিকটি। কাদার ওপর মুখ খুবড়ে পড়ে আছে সে। কিছুক্ষণ আগেও সে আমাদের শক্ত ছিলো। এখন এই রক্ত-কাদায় মাথামাথি নিখর নিষ্পন্দ দেহটার মধ্যে আর শক্ততার বিদ্যুমাত্র লেশ নেই। আসলে যুদ্ধে বেঁচে থাকাটাই বড় কথা। যুদ্ধে বেঁচে থাকতে না পারলে যুদ্ধ করা যাবে না। আর যুদ্ধ করতে না পারলে শক্তকে পরাজিত করা যাবে না। শক্তকে পরাজিত করতে না পারলে নিজেদের পরাজিত হতে হবে, মারা পড়তে হবে শক্তর হাতেই। পঞ্চম পাকিস্তানের কোনো মুলুকে নিচয়ই এর বাড়ি। এখানে এই বিদেশ বিভুইয়ে কীভাবে মরে পড়ে আছে এখন সে! তার রাইফেলটা কাত হয়ে পড়ে আছে হাতের ডান পাশে। তুলে নিই সেটা। একরামুলকে দ্রুত সার্চ করতে বলি তার দেহ। সে কাজে লেগে পড়ে। মাথায় ক্যাপ নেই। দৌড়াবার সময় সঞ্চাবত পড়ে গেছে হাতের ব্যাজটা খুলতে খুলতে একরামুল বলে, শালা পাঞ্জাব রেজিমেন্টের লোক।

— ঠিক আছে, তাড়াতড়ি কর। দেখ আর কী আছে একরামুলকে তাগিদ দিয়ে আমি মৃত সৈনিকের অঙ্গটা পরখ করতে থাকি। চাইনিজ রাইফেল। বেশকিছু গুলিও রয়েছে। অবাক লাগছে এই ভেবে, মাত্র কিছুক্ষণ আগেই সে এই মারণান্ত দিয়ে আমাকে গুলি করে মারতে চেয়েছিলো, ফসকে গেছে সামান্যের ঝল্প। যদি না ফসকাতো, তাহলে হয়তো ওই সৈনিকটার মতোই আমিও পড়ে থাকতাম। প্রানখেতুটার মধ্যে মুখ খুবড়ে। শক্তর সাথে সামনাসামনি লড়াইয়ে বেঁচে থাকাটাই ছিলো একটা অবিশ্বাস্য ব্যাপার। দু'জনেই দু'জনের দিকে গুলি ছুঁড়ছে। যার টাগেটি হলো সে অপরের টাগেটি হয়ে মুখ খুবড়ে পড়ে থাকলো। পৃথিবীতে মানুষে মানুষেসকল যুদ্ধের ধর্মই এক ধরনের।

একরামুলের সার্ট শেষ হয়। এমন কিছু আর পাওয়া যায় না কিছু কাগজপত্র আর ঝুচরো কটা পাকিস্তানি টাকা ছাড়। আইডেন্টিটি কার্ড পাওয়া যায় না। একটা হাতঘড়ি পাওয়া যায়। সেটা একরামুলকে পরে নিতে বলি। তারপর আমরা দুই সৈনিক এগুতে থাকি মধুপাড়ার দিকে। আহত আর একজন পাকিস্তানি কোথায় আছে পিন্টুরা এলে তার হিসেব করতে হবে।

১৭. ৯. ৭১

বিজয় উল্লাস এবং পাকবাহিনীর পাঠ্টা আক্রমণ

মধুপাড়া পৌছতেই লোকজন উল্লাসধরনি দিয়ে ওঠে। শূন্য-হাফেজরা আগেই এখানে পৌছে গেছে। ওদের মুখে উভাসিত হাসির ঝিলিক। কয়েকজন যুবক ধরনের ছেলে ঘিরে ধরে আমাদের। পরিচিত গাইড ছেলে দুটোও আছে তাদের মধ্যে। আগে থেকে পরিচিত একজন বৃক্ষ এগিয়ে এসে বলেন, বাবাজিরা তুমহারলার কিছু হয় নাইতো? তাঁর কষ্টে উদ্বেগ। তাঁকে আশ্বস্ত করি একরাশ হাসি দিয়ে, না চাচা মিয়া, আমাদের কিছু হয় নাই। তবে ওদের একজনকে সাবাড় করে দিয়েছি আর একজনকে ঝুঁজে পাঞ্চি না। শাবাশ! বলে বৃক্ষ বাহবা দেন আমাদের। এরি ফাঁকে কে একজন বলে ওঠে, জয় বাংলা। তার কষ্টে কষ্ট মিলিয়ে

উপস্থিত সবাই একসাথে বলে উঠে, 'জয় বাংলা'। প্রাণ মাতানো সেই শ্লোগান ভেসে
বেড়াতে থাকে আকাশে-বাতাসে তরঙ্গায়িত হয়ে।

ক্লান্ত বিদ্রহ অবস্থা আমাদের। শরীর ভেঙে আসতে চায়। পুরুর পাড়ে আমগাছের ছায়ার
নিচে পাতা বাঁশের মাটাটার ওপর বসে পাঢ়ি। বৃক্ষকে বলি, পানি খাওয়াতে পারবেন চাচা!

— পানি খাবেন? বলে তিনি তাড়াতাড়ি করে বাড়ির ভেতর চুকে যান। ততোক্ষণ পিন্টু-
মুসার দল চুপ হয়ে গেছে। চারদিকে এখন আর কোনো গোলাগুলির শব্দ নেই। হঠাতে করেই
যেনে যুদ্ধের তাঙ্গৰ থেমে গিয়ে একটা শান্তির পরিবেশ ফিরে গেছে।

একটু পর বৃক্ষ এলেন পানি নিয়ে। পেছনে একটা ছেলের হাতে এক গামলা মুড়ি, সাথে
গড়। তার হাত থেকে পানির গ্লাসটা নিয়ে কেবল মুখ লাগিয়েছি, আর তখনি জগদলহাটের
দিক থেকে ভেসে আসে সশব্দ গোলাগুলির ঝাঁক। এক চুমুকে পানিটা খেয়ে নিই; কিন্তু মুড়ির
গামলায় আর হাত দেয়া হয় না। জগদলহাটের পাকবাহিনীর সমস্ত ডিফেন্স যেনে উঠে
আসছে তাদের সমস্ত শক্তি আর প্রচণ্ড তাঙ্গৰ নিয়ে। ওদের গুলিবর্ষণের ধারা জানিয়ে দেয়,
তারা আসছে 'ফায়ার এন্ড মুভ' ভঙ্গিতে। হ্যাঁ, ওরা এগিয়ে আসছে দ্রুত থেকে দ্রুততার সাথে।

আমরা এখন সংখ্যায় মাত্র ৪ জন। সকলেই ক্লান্ত, শ্রান্ত, বিদ্রহ। গোলাগুলিও প্রায়
শেষ। পিন্টু-মুসার সাথেও যোগাযোগ নেই। ওরা এখন কোথায় আছে, সেটা জানা যাচ্ছে
না। জগদলহাটে পালিয়ে যাওয়া পাকসেন দু'জন তাদের হাতের নাকানিচুবানি খাবার ঘটনা
নিষ্পত্যই জানিয়েছে তাদের কমান্ডারকে। তাদের দু'জন ত্যবেষে পারে নি, সূতরাং তারা সবাই
চুটে আসছে প্রচণ্ড প্রতিশোধ স্মৃহা নিয়ে তাদের হাতে সৈনিককে উঞ্চার করতে। এটাই
হাতাবিক। এটা তাদের করতেই হবে। যুদ্ধের এটাই নিয়ম। আর সেই নিয়মের দাস
পাকসেন তাদের পুরো একটা কোম্পানি নিষ্পত্য সব রকম ফায়ার পাওয়ারসহ এগিয়ে আসছে।
এমনও হতে পারে, তাদের দল ভারি হ্রাসে জন্য অমরখালি ডিফেন্স থেকেও সৈনিকদের তুলে
গেনেছে। তাদের রেয়ার হেড কোম্পানি পঞ্জগড় থেকেও হয়তো তারা রিঃ-ইনফোর্মেন্ট চেয়ে
পাঠিয়েছে। এই রকম আশঙ্কা হাত্ত্যাদির কথা যখন ভাবছি, ঠিক তখনি শ্রি ইশ্বিং মর্টারের
একটা শেল উড়ে এলো মাথার ওপর দিয়ে, সশব্দে বিক্ষেপিত হলো সেটা কিছুদূরে, একটা
ধানখেতের মধ্যে। মুহূর্তে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললাম, আমাদের সরে যেতে হবে, পিছিয়ে যেতে
হবে দ্রুত। তালমার অপর পাড়ে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। কোনো অবস্থাতেই তাদের
তালমা পার হতে দেয়া যাবে না। দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে হয়। মধুপাড়ার লোকজনকে নিরাপদে
সরে যাবার জন্য নির্দেশ দিয়ে আমার তিন সহযোগী যোদ্ধাসহ দ্রুত তালমার দিকে এগিয়ে
যেতে থাকি। মাথার ওপর দিয়ে বৃষ্টির মতো তখন ঝাঁক ঝাঁক ওলি উড়ে যাচ্ছে সেই পরিচিত
ধ্বনি তুলে। মর্টারের শেলও উড়ে যাচ্ছে একটার পর একটা। সশব্দে ফাটছে সেগুলো চৰাচৰ
অকল্পিত করে। আমরা চার সৈনিক বৃক্ষ-সহযোগী তখন দ্রুত চুটিছি তালমার দিকে।

তালমার পাড়ে এসে পৌছুতেই ওদের গুলিবর্ষণের মাত্রা আরো বেড়ে যায়। বোঝা যাচ্ছে,
অনেক কাছাকাছি এসে পৌছেছে ওরা। সম্ভবত এতোক্ষণে তারা মধুপাড়া পার হয়ে
পুরুপাড়ার সেই জলাভূমিতে নেমে পড়েছে। আমরা তাই তালমা নদীর পানি কেটে কেটে
দ্রুত এপারে চলে আসি। বাঁদিকে তাকিয়ে দেখি পিন্টু তার মোটাসেটা শরীর নিয়ে নদী পার
হওয়ার আগ্রাম চেষ্টা করছে। তার পাশে আফজালুর রহমান। মাথার ওপর দিয়ে চুটে যাচ্ছে
অজস্র অগ্নিবাণ। এই রকম বিপদের মুহূর্তেও পিন্টু আর আফজালের নদী পার হওয়ার

ব্যাপারটা কষ্টকর হলেও চমৎকার একটা দৃশ্যের অবতারণা করেছে। আফজাল পিন্টুকে পেছন থেকে আঁকড়ে ধরেছেন, কোমর আর বুক সমান পানি পার হতে শিয়েও তাদের পড়ে গিয়ে নাকানিজ্বানি খেতে হচ্ছে। আবার সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পানি ভাঙ্গতে হচ্ছে। কোমর বাঁকা আর মাথা নিচু করে শক্রে হেঁড়া গুলির হাত থেকে বাঁচবার প্রাণান্তর অবস্থায় নদীর চরার দিকে ছুটবার মরিয়া প্রচেষ্টা তাদের। অবশ্যেই নদীর বালুর চরায় উঠে এসে কোনোভাবে হামাগুড়ি দিয়ে নদীর এপারে এসে পৌছানো সম্ভব হয় তাদের পক্ষে অস্ফত অবস্থায়। পিন্টুর দলের ছেলেরাও এরি মধ্যে নদী পার হয়ে এসেছে। মুসার দলের খোজ নেই তখনো।

সোনারবান তালমা পাড়ের যুদ্ধ

তালমার এপারে ঝোপঝাড়ের আড়ালে কিছুটা ঢালুমতো জায়গা। সেখানে এসে পড়েছি আমরা। এখন দ্রুত আগুয়ান পাকবাহিনীকে মোকাবেলা করার একটা স্ট্রাটেজি ঠিক করা দরকার। কুড়িয়েকাড়িয়ে মোট ১৭ জনকে যোগাড় করা গেলো। সবাই অত্যন্ত পরিশ্রান্ত। শরীরের শক্তি নিঃশেষপ্রায়। গোলাবারুদের মজুদও কমে এসেছে। চাউলহাটি হেড কোয়ার্টারের কমান্ডার নূরুল্ল হকের কাছে রানারের সাহায্যে দ্রুত খবর পাঠানো প্রয়োজন গোলাগুলি যোগান দেয়া এবং সম্ভব হলে রিজার্ভ এফ.এফ. থেকে রি-ইনফোর্মেন্ট পাঠানোর জন্য। এক টুকরো কাগজে পরিস্থিতি বর্ণনা দিয়ে হাসানুক্ত একটা সাইকেলে করে দ্রুত চাউলহাটি গিয়ে বড় ভাই নূরুল্ল হকের কাছে রিপোর্ট কর্তৃত বলি। এরপর সোনারবান হাইড আউট অর্থাৎ পুরো সোনারবান জনবসতিকে রক্ষা করার জন্য প্রতিরোধ ব্যুৎ রচনায় হাত দিই। এখন হাতে যে অস্ত্র আর গোলাবারুদ আছে তাই দিয়ে এ কাজ সারতে হবে। পিন্টুকে ক'জন ছেলেসহ ডানে হাইড আউট সেক্ষেক্ষেজি পজিশন নিতে বলি। তালমা পারাপারের জায়গায় মোতালেবকে এল.এম.জি.সি.জাশন নিতে বলি। তার সাথে থাকে মালেক। দুইঘণ্ট মৰ্টারসহ আমার সাথে প্রায় একরাম্ভলসহ অন্যরা। মতিকে যেতে বলি শালমারা ত্রিজের দিকে মুসার সাথে দ্রুত যোগাযোগ করার জন্য। সবার প্রতি নির্দেশ থাকে, এলোপাতাড়ি গুলি খরচ করবে না কেউ। ওরা ৫০টা গুলি ছুঁড়লে তোমরা ছুঁড়বে মাত্র ১টা। ঘনঘন জায়গা বদল করবে। এক জায়গা থেকে একলাগাড়ে শক্রের দিকে গুলি ছুঁড়বে না। শক্র যদি নদী পার হতেই থাকে, তখন একযোগে যতদূর সম্ভব টার্গেট করতে হবে। নদী পার হয়ে এপারে ওরা এলে একটার পর একটা ঘেনেড়ে চার্জ করবে। মিনহাজ আর ইব্রাহিম সবার কাছে অতিরিক্ত গুলি আর ঘেনেড়ে পৌছাতে থাকবে। সোনারবানবাসীরা গ্রাম ছেড়ে ভেতরগড়ের দিকে চলে যাবে। এ দায়িত্বে থাকবেন মাত্তলানা সাহেব অর্থাৎ 'হজুর'।

বিফিং শেষে ছেলেরা দ্রুত তাদের নির্দেশিত স্ব-স্ব পজিশনে চলে যায়। মোতালেব আমার মাথার ওপরের দিকে ডান পাশেকার উচ্চ জায়গাটায় তার এল.এম.জি. সেট করে ফেলেছে এরি মধ্যে। মোতালেবের ডানে-বামে অন্যরা ছাড়িয়ে-ছিটিয়ে পজিশন নিয়েছে। আমার ব্যাটম্যান চাঁদ মিয়া দুইঘণ্ট মৰ্টার হাতে এবং শেলের বান্ডিলগুলো কাঁধে নিয়ে কিছুটা কুঁজো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এতোক্ষণ খানসেনাদের বাড়ের গতিতে এগিয়ে আসা, তাদের প্রচও গোলাগুলি আর শেলবর্ষণ আর তড়িঘড়ি করে আমাদের প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলার ব্যক্ততার ভেতরে কোনো দিকে খেয়াল দেবার ফুরসত ছিলো না। সবকিছু মোটামুটি সেট হয়ে আসবার পর খেয়াল হতেই দেখলাম সামনে দাঁড়িয়ে আফজালুর রহমান। হাতে তার রাইফেল

ধরা। মুখখানা ফ্যাকাসে। ঠিক কী করবেন, বুঝতে পারছেন না। জিগ্যেস করি তাকে,

— আপনি এখন কী করবেন?

— আমি? একটু বলেই থমকে যান তিনি। আর কিছু বলতে পারেন না।

— অবস্থাতো দেখছেন। উইল ইউ স্টে উইথ আস এ্যান্ড ফাইট ব্যাক উইথ পাক আর্মিংজ অর ইউ উইল গো?

— আমি থাকি তোমাদের সাথে।

— থাকবেন? যা অবস্থা কখন কি হয় বলা যায় না।

— তোমরাতো আছো...।

— ঠিক আছে, বলে তাকে আমার পাশে পজিশন নিতে বলি।

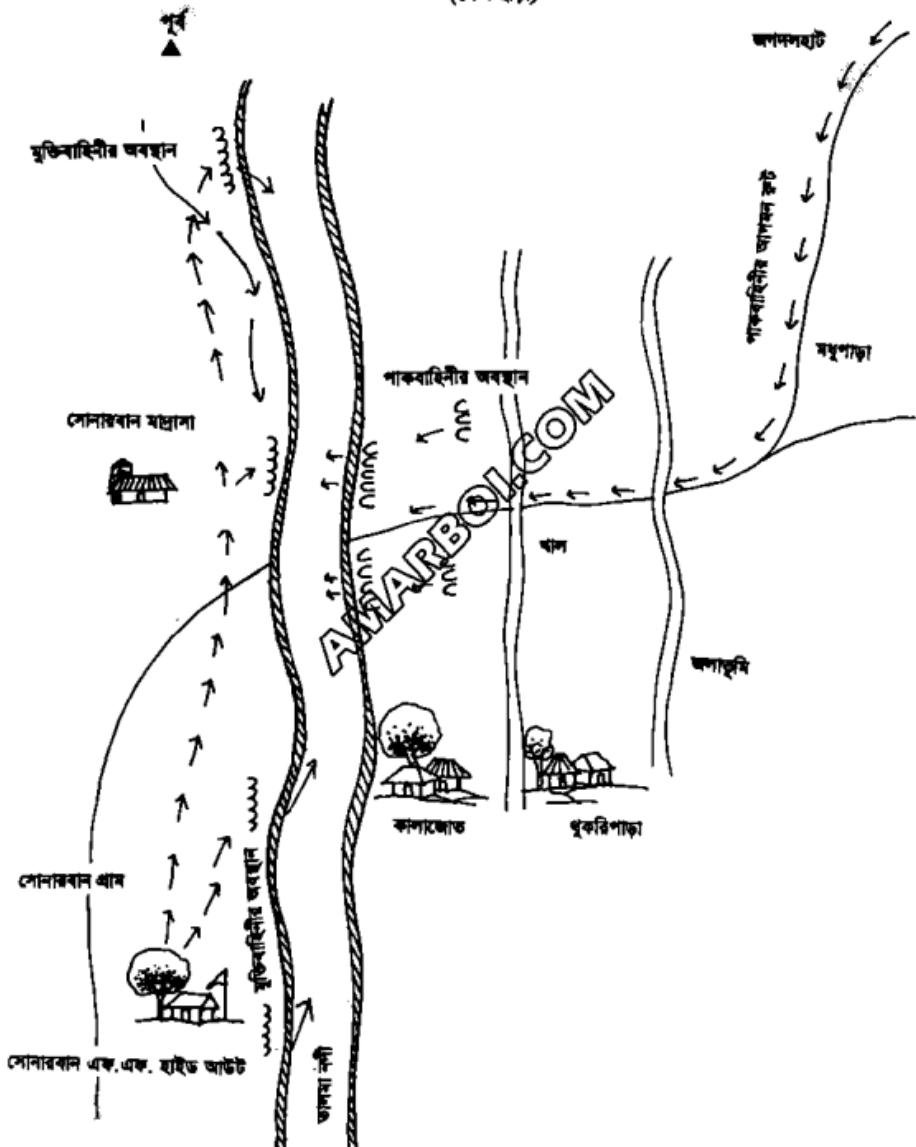
এমন সময় ওপর থেকে মোতালেব চেঁচিয়ে ওঠে, উমহার লাক দেখা যাচে গে।

ফায়ার ওপেন কর বলে চিঢ়কার দিয়ে উঠি। নিজে চাঁদ মিয়ার কাছ থেকে মর্টারটি নিয়ে হাঁটু গেড়ে এ্যাসেল ঠিক করতে থাকি। আফজালুর রহমান সামান্য দূরে ওয়ে পড়েছেন। পাকা যোদ্ধার মতো তার হাতে রাইফেল ধরা। ইশারায় তাকেও শুরু করতে বলি।

যুদ্ধ শুরু হয়ে গেলো। নদীর ওপারে ওরা, এপারে আমরা। ওদের ফায়ার পাওয়ার অত্যন্ত বেশি। বেশ কটা মেশিনগান ব্যবহার করছে ওরা। মাথার ওপর দিয়ে শুলির বাঁক উড়ে যাচ্ছে বাতাসে শিস বাজিয়ে। মোতালেব তার এল.এম.বি.সি.সিলিয়ে যাচ্ছে অবিশ্রান্ত। মালেক তাকে শুলির যোগান দিয়ে যাচ্ছে। পিন্টুর দলও সমস্ত অততে তালমার ওপার থেকে ছুটে আসা প্রতিপক্ষের আক্রমণের জবাব দিয়ে যাচ্ছে। তালমা নদী চওড়ায় দু' আড়াইশ' গজের মতো। নদীর ওপার দিয়ে পানির মূলধারা, একটী বেশ কিছুটা জায়গায় বালুর চরা। নদীর দু'পাশের পাড় একদম খাড়া। ঝোপঝাড় সঙ্গে জঙ্গলে পূর্ণ নদীর দু'পাড়ই। জঙ্গলযুদ্ধের জন্য এটা একটা অত্যন্ত উপযুক্ত স্থান। আস্তরা শক্তকে দেখতে পাচ্ছি না, তারাও দেখতে না আমাদের। কেবল শুলির উৎস লক্ষণ করে টার্সেট শির করার চেষ্টা সকলের। এমন সময় মুসা দৌড়তে দৌড়তে পেছন থেকে এসে যায়। ইশারায় মুসাকে তার দল নিয়ে বাঁ দিকের ভায়গায় পজিশন নিয়ে যুদ্ধ শুরু করতে বলি। স্বল্প সময়ের ব্যবধানে মুসার সবগুলো হাতিয়ার চালু হয়ে যায়। কোয়ার্টার মাস্টার মিনহাজও হাইট আউটের অবশিষ্ট ছেলেদের নিয়ে পিন্টু আর আমাদের মাঝামাঝি অবস্থানে থেকে যুদ্ধে নেমে পড়েছে।

এখন তালমা নদীকে কেন্দ্র করে পুরো এলাকাই একটি ঘোরতর যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয়ে গেছে। শক্রপক্ষ কিছুক্ষণের জন্য থেমেছিলো, আবার তাদের শুলির্বর্ষণের তাপ্তি যেনে দিশে হয়ে গেলো। ওরা কি এবার নদী পার হবার চেষ্টা নেবে? হয়তো তাই, যেভাবেই হোক ওদের থামাতে হবে। নদী পার হতে দেয়া যাবে না ওদের কিছুতেই। তাহলে চরম সর্বনাশ হয়ে যাবে। এ সময় কমান্ডারের মাথা ঠাঁঘা রাখা অত্যন্ত জরুরি। দারুণ অস্ত্রিভায় ভূঁচি আমি। মনস্থির করতে পারছি না, কখন কি ঘটে যায়। চাঁদ মিয়ার কাছ থেকে একটা মর্টারের শেল নিলাম। এতোক্ষণ মর্টার ব্যবহার করি নি, এখন করার সময় এসেছে। শেলের ঢাকনা বা আবরণ খুলে ফেলি দ্রুত। ৪৫ ডিগ্রি এ্যাসেলে আমার বাঁ হাতে মর্টার ধরা। শেলটা মর্টারের চোঙার মুখ দিয়ে চুকিয়ে দিয়েই চোখ বুরে লিভারে চাপ দিই। একটা টাপু করে শব্দ করে কিছুটা ধোঁয়া আর আগনের ফুলকি তুলে উড়ে যায় শেল, শরীরে একটা বাঁকুনি লাগে। মাত্র ২৫/৩০ সেকেন্ড, তারপর সেটা সশ্বে বিস্ফেরিত হয় সামনে শক্র অবস্থানের ওপর। এরপর আবার আর

কেচ ম্যাপ-৪
সোনারবান তালমা পাড়ের যুক্ত
৩৭-১-১৩
(কেস রাত)



একটা শেল, এভাবে পরপর পাঁচটি শেল পাঠিয়ে আমরা জায়গা বদল করে নিই। প্রায় ৩০ গজ ডানে সরে এসে আবার শুরু করি শেল বর্ণন। পাশে শোয়া মাজেদ মিয়া শেলের মুখের ঢাকনা খুলে আমার হাতে ধরিয়ে দেয়, আমি মর্টারের মুখগহুরে তা ঢুকিয়ে দিয়ে লিভার টিপে যাচ্ছি। পুনরায় জায়গা বদল এবং আন্দজের ওপর অ্যাসেল ঠিক করে মর্টারের শেল পাঠিয়ে চলেছি একটার পর একটা। শক্রপক্ষ থেকেও মর্টারের জবাব আসছে। সেগুলো ফাটছে আমাদের অবস্থানের বেশ পেছনে। চারদিকে গোলাগুলি, শেল বিক্ষেপণের কান ফাটানো শব্দ, ধোয়া আর বাতাসে পোড়া বাকলদের গুঁজ। এর ভেতরেই চাঁদ মিয়াকে ওপরে যেতে বলি। আর নির্দেশ নিই, নদীর পার থেকে মাথা খুলে মাঝে মাঝে দেখবে শক্র নদীতে নেমেছে কি না।

বেলা গড়িয়ে আসছে। যুদ্ধ তখনো চলছে সমান গতিতে। ইব্রাহিম ঠিকমতো লোকজন দিয়ে সবার কাছে গোলাগুলির সরবরাহ পৌছে দিয়ে যাচ্ছে। শক্র অনেকগুণে শক্তিশালী হলেও এখন পর্যন্ত তারা নদীতে নামার সাহস পায় নি। আমাদের এপারের শক্তি সম্পর্কে তারা সম্মিহান। নদীর পাড়ে মাইন ফিল্ডের কথ্যাও তাদের মনে ভয় জাগাতে পারে। বারবার অবস্থান পরিবর্তনের ফলে তাদের মনে হয়তো এ ধারণা হয়ে থাকা স্বাভাবিক যে, আমাদের সাথে মর্টার রয়েছে বেশ কটা। চাঁদ মিয়া তার অবজারভেশনের কাজ চালাচ্ছে আর থেকে থেকেই পেছন ফিরে তিক্কার করে বলছে, উমহাক দেখা যাচ্ছে না, এলহাও নামে নাই— নামিলে দেখে ফেলাম... উত্তেজিত চাঁদ মিয়া থেমে থেমে এভাবে শক্র-বিবরণী দিয়ে যাচ্ছে শক্রের অবস্থানের। এরি মধ্যে বেলা গড়িয়ে গেছে আরো খালিকটা। আয় চারটার মতো সময় তখন। হঠাৎ করেই শক্রের গোলাগুলি থেমে যায়। অ্যামেটের গুলিবর্ষণের ধারা তখনো চলছে একইভাবে। আরো কিছুক্ষণ কেটে যায়। শক্রগুলোই যে থেমেছে আর শুরু করে নি। তবে কি তারা ঘাপটি মেরে বসে আছে সুযোগের অঙ্গোচায়? তারা কি সোজাসুজি পার না হয়ে ডানে অথবা বাঁয়ে দূর দিয়ে নদী পার হওয়ার ক্ষেত্রে করছে? না কি তারা পিছু হটছে? ঠিক মনের এই রকম অবস্থায় ভয়াবহ খবরটা দেয় স্ক্রাইম।

— বাহে চাঞ্জি গুলি শ্যাষ হয়ে গেছেইছে!

— কী বললি?

— হ, আর একটা গুলিও নাই বাহে, কয়টা ঘেনেড খালি হাতোত আছে। এই রকম কঠিন পরিস্থিতিতে পরিবেশিত খবরটা হজম করা সত্যিই কঠিন, কিন্তু উপায় নেই। মালেককে মুসার কাছে, হাফেজকে পিন্টুর অবস্থানের দিকে পাঠাতে পাঠাতে বলি, দোড়ে যা তোরা, ওদের গুলি চালানো বন্ধ করতে বল, অর্ডার না পেলে কেউ আর এক রাউন্ড গুলিও ছুঁড়বে না। ওরা দু'জনে দু'দিকে ছুটে যায়, সামনে অবস্থানরat একরামুলকেও একই নির্দেশ দিই। কিছুক্ষণের মধ্যে গোলাগুলি থেমে যায়। হঠাৎ করেই যেনো নদীর পাড়ের ঘোপাবাড় আর জঙ্গলযুক্ত এলাকাটার গভীর নিষ্কৃতা নেমে আসে।

যুদ্ধ থেমে গেছে। পাকবাহিনী নদীর পার হতে পারে নি। আমরা তাদের ঠেকাতে পেরেছি। বেলা শেষ হয়ে আসছে। ওরা পিছিয়ে গেছে, না তালমা পারের অবস্থানে আছে, এ ব্যাপারে আগে নিশ্চিত হওয়ার দরকার। কিন্তু কাকে পাঠাবো? কে যাবে? এমন সময় মতিকে দেখলাম বেশ পেছনে একটা ছনের ঘরের আড়াল থেকে উঁকি মারছে। ওকে হাতের ইশারায় ডাকলাম। দোড়ে এলো তালমা পারের টগবগে আর বিশ্বস্ত মুক্ত মতি মিয়া। ওপরের অবজারভেশনের জায়গা থেকে ডেকে আনি চাঁদ মিয়াকে। মাত্র ঘোল-সতরে বছর বয়স

ওর। তেঁতুলিয়ায় বাঢ়ি। শুবই বিষ্ণুত আর প্রিয় সে আমার। বেচারা হাইফ্লে যেতে পারে নি অর্থাতবে; কিন্তু ঠিক যুক্তে এসেছে। যাহোক, সিদ্ধান্ত নিই চাঁদ মিয়া যাবে ওপারে, ওর সাথে থাকবে মতি। এপারে অবস্থানরত সমস্ত বাহিনী তাদের কভার দেবে। ব্যাপারটা ওদের বুবিয়ে দিই ভালোভাবে। তারপর খোদা হাফেজ বলে ওদের এগিয়ে যেতে বলি। সামান্যতম ছিদ্র না করে রওনা দেয় ওরা। মোতালেবের কাছে গিয়ে, হাঁটু গেড়ে আমি নদীর দিকে চেয়ে থাকি। মোতালেব তার দুই পাইলা এল.এম.জি. সেট করে নিয়ে ট্রিগারে আঙ্গুল চেপে তৈরি হয়ে থাকে। পড়স্ত বিকেল, সূর্যের আলোর তীব্রতা কমে এসেছে। শেষ বিকেলের ছায়া নেমে এসেছে।

ওদের দেখা গেলো। ওরা দু'জন পড়স্ত বিকেলের সোনালি আলো আভা গায়ে মেঝে এপারে নদীর বালুময় চরাভূমি ভেঙে এগিয়ে যাচ্ছে। সামনে চাঁদ মিয়া। হাতে উদ্যত রাইফেল। পেছনে মতি শূন্য হাতে। ওদের ছায়া পড়েছে উল্টোদিকের বালু চরার ওপর লম্বা হয়ে। ছায়া এগুচ্ছে ওদের সাথে সাথে যেনো পাল্লা দিয়ে। ওদের চলার গতিতে কোনো অস্ত্রিতার ছাপ নেই। দ্বিধান ওরা এগিয়ে যাচ্ছে নদীর ওপার লক্ষ্য করে। কোথায়, কী কাজে যাচ্ছে যেনো এটা জেনেই ওদের এই যাত্রা। কিন্তু ওদের সামনে যে মৃত্যুগুহা, সেখানে তাদের জন্য কী ধরনের বিপদ ওঁ পেতে আছে, সংভবত সে ব্যাপারটা ওদের চেতনায় তেমন কাজ করছে না। এখন শুধু তাদের লক্ষ্য একটাই, যে কর্তৃপক্ষের ওপারে পৌছতে হবে। শক্রের সর্বশেষ অবস্থান বিষয়ে খবরাখবর সঞ্চার কর্তৃত হবে। এখান থেকে শ্পষ্ট দেখতে পাইছ ওরা পানিতে নেমেছে এখন। চরম উত্তেজনা আর অবস্তির ভেতরে দুর দুর বুকে ওদের গমন পথের দিকে তাকিয়ে রয়েছি আমি। আবার চিন্তা শুরু হয়, ওদের তো পাঠালাম, কিন্তু পারবে তো? ওদের পাঠাতে হয়েছে এক মাঝের বুকির ভেতরে। এছাড়া উপায়ও ছিলো না। যুদ্ধের স্বার্থেই পাকবাহিনীর বর্তমান অবস্থাটি জানা এতোই জরুরি হয়ে পড়েছে যে, কাউকে না কাউকে যেতেই হতো। কেউ যেতেন নিজেইলে, আমাকেই সে কাজটি করতে হতো।

ওরা নদীর বুকে মাঝামাঝি অবস্থানে পৌছে গেছে। আর তো সামান্য পথ থাকি। দেখা যাক কি হয় শেষ পর্যন্ত। হ্যা, তারা পৌছে গেছে ওপারে। তালমায় নামার সুড়ঙ্গ পথ ধরে ওরা এগিয়ে গেল এবং তারপর হারিয়ে গেলো চোখের আড়ালে।

কিছুক্ষণের মধ্যে ভেসে এলো ওপার থেকে একটা রাইফেলের গুলির শব্দ। চাঁদ মিয়ার প্রতি নির্দেশ ছিল, পাকবাহিনী পিছু হটে গেলে একটা রাইফেলের ফাঁকা আওয়াজ দিয়ে সে আমাদের সিগনাল পাঠাবে। তার সিগনাল বলে দিলো, পাকবাহিনী তাদের অবস্থান ছেড়ে পিছিয়ে চলে গেছে তাদের মূল ডিফেন্স জগদলহাটের দিকে। আজকের মতো যুদ্ধের তা হলে এখানেই শেষ? উঠে দাঁড়াই নিজের অবস্থানে। নির্দেশ পাঠিয়ে দিই সবার উদ্দেশে, যুদ্ধ শেষ। স্ব-স্ব অবস্থান থেকে তারা যেনো উঠে আসে।

নদীর ওপার থেকে বেশ শোরগোল ভুলেই কিছু মানুষ এদিকপানে আসছে। ক্লান্ত পদচারণায় এগিয়ে যাই সোনারবানের শেষ মাথায় গম্ফুরউদ্দীনের ছনের বাড়িটার দিকে। বাড়িটার সামনেকার চতুরে বেশ বড় একটা আমগাছ। তার তলায় বাঁশের তৈরি মাচা। তার ওপরেই বসে পড়ি। প্রিয় স্টেনগানটা কাঁধ থেকে নামিয়ে রাখি। শক্রের কাছ থেকে পাওয়া চাইনিজ রাইফেলটা শুইয়ে রাখি মাচানের ওপর।

অন্য কোথাও আবার

সঙ্গে প্রায় ঘণ্টিয়ে এসেছে। সকাল নটা থেকে তত্ত্ব হয়েছে যুদ্ধ, সারাটা দিন কেটে গেছে যুদ্ধের ডামাডেলের ভেতরে। যুদ্ধের টেনশনে। এখন এক বিশাল ক্রান্তি আর অবসাদ জড়িয়ে থারেছে সমস্ত শরীরকে। পেটের অবস্থা জানান দিচ্ছে, সারাদিন কিছু খাওয়া হয় নি। বসে থাকা কষ্টকর, ওয়ে পড়ি মাচানের ওপর মাথার নিচে হাত দিয়ে। হাঁ, ওরা আসছে এক এক করে নিজেদের অবস্থান ছেড়ে। অবসাদ, ক্রান্তি, ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় অবশ হয়ে ওদের কেউ বসে পড়ছে, কেউ তরে পড়ছে খোলা চতুরে মাটির ওপরে। পিন্টু ও মুসা আসে। ওদের অবস্থাও একেবারে ভেঙ্গে-পড়া, মানে বিক্রম। পিন্টু শুয়ে পড়ে মাচানের ওপর আমার পাশে। কিছুক্ষণ চুপচাপ। তারপর বলে ওঠে, মাহবুব ভাই আজকের মতো তা হলে যুদ্ধ শেষ হলো?

— হলো, বলে আমি তার কথায় সায় দেই।

— আগামীকাল যদি ওরা আসে?

— আসতে পারে। ওদের দু'জন সৈনিক হারানোর প্রতিশোধ ওরা নেয়ার চেষ্টা করবে হয়তো।

— যদি কাল আসে?

— অসম্ভব তো কিছু না।

— আমরা এখন কী করবো? গোলাগুলি তো প্রায় শেষ। চাউলহাটি থেকে এখন পর্যন্ত কিছু এসে পৌছলো না, না গোলাবারুদ, না রিং-ইনফোস্মিস্ট।

— হয়তো আসছে। খিদে পেরেছে তোমার?

— খুব, সারাদিন স্ফ্রে উপবাস। তবে তারপর পানি পেটে ঢুকেছে অনেক।

পিন্টুর এই একটা বড় গুণ যে চরম অক্ষণ্যকূল অবস্থাতেও ওর রসিক মেজাজটি অক্ষণ্য থাকে। হাসি পায় ওর কথার ভঙ্গিতে, পিন্টু, তালমার পানি পেটে ঢুকলো কেমন করে?

— আফজাল সাহেবসহ নদী পুর হবার সময় নদীর পানিতে পড়ে শিয়ে নাকনিচুবানি খেতে হয়েছে দু'জনকে। সে সমস্ত তালমার পানি অটোমেটিক ঢুকে গেছে পেটের মধ্যে।

— যাক, তবু আফজাল সাহেবকে নিয়ে আসতে পেরেছো, রাজনীতিবিদ মানুষ, বেচারা যুদ্ধ দেখতে এসে সত্যিকার বিপদে পড়ে গেলেন।

— শেষ পর্যন্ত তার কোনো বিপদ হয় নি। কিছু হলে কেলেক্ষারির শেষ থাকতো না।

— আর তুমি?

— আমি আর কি বলেন? আমার কিছু হলে হয়তো এতোক্ষণ তালমার পানিতে মরে ভেসে থাকতাম। কথাটা বলে একটা দীর্ঘ নিষ্পাস ছাড়ে পিন্টু। আসলে পিন্টুর কথাই হয়তো ঠিক। যুদ্ধের মাঠের এই তাঙ্গবের ভেতরে কে যে কখন কোথায় লাশ হয়ে পড়ে থাকবে কে জানে?

সোনারবানের লোকজন ফিরে আসছে। এরি মধ্যে চাঁদ মিয়াও ফিরে এসেছে। সে মধুপাড়া পর্যন্ত গিয়েছিলো। যাবার সময় ওরা সেই আহত সৈনিক আর মৃত সৈনিকের লাশ নিয়ে চলে গেছে। সেই সাথে ধরে নিয়ে গেছে কিছু লোকজনকে। তাদের মধ্যে সকালের সেই বৃক্ষও আছেন, যিনি আমাদের আপ্যায়িত করেছিলেন গুড়-মুড়ি আর পানি দিয়ে। কষ্ট লাগে বৃক্ষের জন্য। অনেকটা বাবা বাবা চেহারার। তার কথাবার্তাও সে রকমই শেহ জড়ানো। তিনি কি আর ফিরতে পারবেন? আর যাদের ধরে নিয়ে গেছে তারাও কি ফিরবে? হয়তো নিজেদের লোক হারানোর প্রতিশোধ নেবে ওরা তাদের ওপর যত্নগাদায়ক মৃত্যুদণ্ড চাপিয়ে দিয়ে।

বাধীনতার জন্য এ ধরনের কতো মানুষকে জীবন বলি দিতে হবে, তার শেষ নেই।

সক্ষে পার হয়ে নেমে এসেছে কালো রাত। ক্লাস্ট-শ্রান্ত সব ছেলেকে এবার উঠতে বলি। আমাদের মধ্যে শঙ্খু সামান্য আহত হয়েছে। শঙ্খুর শেলের স্প্রিটার উড়ে এসে ওর ডান উকুতে থাবা বসিয়েছে। আহত জায়গাটা গামছা দিয়ে বেঁধে রক্ত বক করা হয়েছে। সোনারবানের প্রতিটি বাড়িয়ের আলো জ্বলছে। প্রাপের সাড়া জেগেছে আবার পুরো গ্রামটাতে। আমরা হাঁটছি ঘন গাছগাছলি আর বাঁশবাড়ের ভেতর দিয়ে কালো ঘুটঘুটে অঙ্ককারে ছেয়ে থাকা রাত্তা ধরে। সাথনে অনেক কাজ। আজ রাতেই সম্পূর্ণ হাইড আউট গুটিয়ে নিয়ে অন্য কোনো নিরাপদ স্থানে সরে পড়তে হবে। হজুরকে দায়িত্ব দিতে হবে, যেনে তিনিও পুরো গ্রামবাসীকে নিয়ে ভেতরগাড়ের দিকে সরে যান। পাকবাহিনী কাল আসতে পারে। যদি না আসে, দু'একদিনের মধ্যে আসবেই। সোনারবানবাসী মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয় দিয়ে বিরাট অপরাধ করে ফেলেছে। তাই তারা সমস্ত গ্রাম ম্যাসাকার করে দিয়ে এর প্রতিশোধ নিতে চাইবে। দেখা যাক কী হয়! আমরা সোনারবানের আশপাশেই থাকবো। ওরা সোনারবানের দিকে আসতে চাইলে আবার যুদ্ধ বাঁধবে ওদের সাথে। আজকের মতোই আমরা প্রতিহত করবো ওদের আবার। সোনারবানে ওরা চুক্তে পারবে না কোনোদিনই। পিন্টু গুণগুণিয়ে গান গাইছে। তার সেই প্রিয় গান, আগুন জ্বালো, আগুন জ্বালো...।

হাইড আউটে ফিরে এসে পিন্টু-মুসা, একরামুল, চৌধুরীজার মিনহাজকে ডেকে তাদের দায়িত্ব বুঝিয়ে দিই। ওরা জানতে চায়, এখন কোথায় যাচ্ছে আমরা?

— এখনও জানি না। তবে অন্য কোথাও প্রভাবে সোনারবানে একরাতে এসে উঠেছিলাম, তেমনি অন্য কোথাও গিয়ে উঠেছে স্ক্রোল।

— এভাবে আর কতেদিন চলবে?

— হয়তো অনেক দিন। নে তোরা তাড় হয়ে নে বলে তাড়া লাগাই ওদের। ওরা চলে যায় নিজেদের কাজে। তখন আমি কিছু মিয়ার বাড়ির বাইরের চতুরে এসে দাঁড়াই। আকাশ জুড়ে তারার মেলা। চারদিকে ছাঁচ্বাটে অঙ্ককার। জোনাকির দল যাক বেঁধে তাদের আলো জ্বলিয়ে আলো নিয়ে ছুটোছুটির খেলায় মন্ত। পেছনের অমরখানা থেকে ভেসে আসে সেই পরিচিত যুদ্ধের শব্দ। কেমন একটা অজানা অনুভূতি এসে সমস্ত মন জুড়ে বসে থাকে। মন খারাপ করে দেয়। পিন্টু পেছন থেকে এসে পাশে দাঁড়ায়। বলে, চলেন খেয়ে নিই।

— ছেলেরা সব খেয়েছে!

— হ্যাঁ।

— চলো।

ভুতুড়ে অঙ্ককার ঠেলে ঠেলে আমরা এগিয়ে যাই হাইড আউটের ভেতর। আজ শেষবারের মতো আমরা এখানে আহারবিহার করবো, কাল কোথায় কী খাবো, জানি না।

আফজালুর রহমানকে আমাদের সাথে সাথে রাখা আর নিরাপদ নয়। তাই তাকে যাবার কথা বললে তিনি কিছুটা আপত্তি তোলেন। মুক্তিযোদ্ধাদের এই লংভও অবস্থায় রেখে তার মন হয়তো যেতে সায় দেয় না। তাকে বুঝিয়ে বলি, এটা যুদ্ধ। যুদ্ধে একজন সৈনিক মারা গেলে আর একজন সৈনিক তৈরি করা যাবে; কিন্তু একজন রাজনীতিবিদ সহজে তৈরি হয় না। যুদ্ধের বাইরে আপনাদের প্রচুর কাজ রয়েছে। তবে আপনি নিজে যুদ্ধ দেখে গেলেন, যুদ্ধ করে গেলেন, একথা মনে রাখবেন। কী অবস্থায় মুক্তিযোদ্ধারা যুদ্ধ করছে, সেটা জানাবেন সবাইকে।

রাতের অক্ষকারে তিনি রওনা দেন : যাবার সময় উষ্ণ করমদ্দন করেন। আবেগাপুত হয়ে উঠেন তিনি। চোখে তার পানি। এ ক'দিন হাইড আউটে থেকে তিনি ছেলেদের সত্যিকারভাবেই ভালোবেসে ফেলেছেন। 'খোদা হাফেজ' বলে তিনি অক্ষকারে এগিয়ে যান। তার সাথে ক্ষট হিসেবে যায় মোতালেবসহ দু'জন। তাঁরা তাকে সীমান্ত পার করে দিয়ে বেরবাড়ি পর্যন্ত পৌছে দিয়ে আসবে।

১২. ৯. ৭১

ফিরে আসা সেই প্রিয় নালাগঞ্জে

সোনারবান হাইড আউট শটিয়ে নালাগঞ্জে ফিরে আসা হয়েছে। নালাগঞ্জ জায়গাটা আপন হয়ে উঠেছে সবার কাছে। বারবার করে ফিরে আসতে হয় এখানে। লাল রঙের টিনের বাড়িটি এখন নিজের বলে মনে করে সবাই। মনে হয়, যেখানেই যাই না কেনো ফিরে আসবো আবার এই বাড়িটায়। এখনকার পরিয়াস্ত বাড়িয়ার, বনবাদাড়, ফসলের মাঠ আর পুরুর পাড়ের সেই ধাঁকানো আশ্পাছ, আকাশ-বাতাস সবকিছু মিলেমিশে যেনো আমাদের ফেলে আসা প্রামের বাড়িঘর হয়ে গেছে। নিজের বাড়ির নিরাপত্তা নিয়ে এখানে বসবাস করা যায়, রাতে ঘুমনো যায় নিচিত্তে। আকাশ পরিকার থাকলে বিশাল কালো শরীরের হিমালয় দেখা যায় মাথায় সোনালি বরফের মুকুটপুরা অবস্থায়। রাতে সর্পিল রাস্তা দিয়ে গাড়ি ঝুঁকনামার ঝলসানো আলো দেখা যায়। পাহাড়ের কোলে তিনধারিয়া রেলস্টেশনের উজ্জ্বল ভালোকমালা রাতের অক্ষকারে দারুণ এক চমৎকার দৃশ্যের অবতারণা করে। দিনের বেলায় জীবশাশ্বতের গাছগাছালিতে নানা ধরনের পাখির কলরবের সাথে ঘূর্ন ডেকে-যাওয়া সুজোপ দেয়, আবরা আছি আমাদের নিজেদের দেশে, যেটা একদিন হয়তো সত্যিকারভাবে খুঁজাদেশ নামে পরিচিত হবে।

নালাগঞ্জ জায়গাটা! এরি ভেতরে মিসিপদ হাইড আউট হিসেবে পরীক্ষিত হয়ে গেছে। এখানে পাকসেনারা এতেদিনে অস্তিত্বে পারে নি, আর তারা আসতেও পারবে না। দীর্ঘ প্রলম্বিত যুদ্ধ আমাদের যদি করবেই হয়, তবে নালাগঞ্জে হবে আমাদের স্থায়ী হেড কোয়ার্টার।

দিনের বেলা অঘোর ঘূমে কেটে যায়। ক'দিনের একটানা ছুটোছুটি, টেনশন, লাগাতার যুদ্ধ আর অপারেশন সবাইকে পরিস্কার করে তুলেছে। তাই নাস্তা খাবার পর ছেলেরা তাদের সুবিধেমতো জায়গায় ঘরের ভেতর ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে ঝুঁতির রেশ পুরিয়ে নেয় কিছুটা। বিকেলের দিকে পরিচিত লোকজন আসে। তাদের কাছ থেকে ভালোমদ্দ সব ধরনের খবরাখবর পাওয়া যায়। বরের পাওয়া যায়, বেরবাড়ি দিয়ে সীমান্ত পেরিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের একটা দল জয় বাল্লা হাটের কাছে আস্তানা গেড়েছে। এরা চাউলহাটি ইউনিট বেসের কমান্ডের আওতার বাইরে। বাল্লাদেশের শশস্ত্র কমান্ডের আওতায় ভজনপুর থেকে সাব-সেক্টর কমান্ডের তাদের সরাসরি পাঠিয়েছেন। চাউলহাটি ইউনিট বেস কমান্ডের অধীনে অমরখানা থেকে তুরু করে বোদা থানার মারেয়া সাকোয়া পর্যন্ত এলাকা আওতাভুক্ত করা হয়েছে। এ এলাকায় একক অপারেশন পরিচালনা করছে চাউলহাটি ইউনিট বেসের এফ.এফ. দল। ভারতীয় সেনাবাহিনীর অফিসার এ কমান্ড পরিচালনা করছেন। এরি মধ্যে হঠাৎ করে মাঝামাঝি জায়গায় একটা নতুন দল কেনো আনা হলো, তার কারণ বোধগম্য হয় না। আর তারা যখন চাউলহাটি বেসের ৪টা দলের মাঝখানে থেকে তাদের তৎপরতা চালাবে, তখন তাদের সাথে অবশ্যই আমাদের সমন্বয় থাকতে হবে, তা না হলে রাতের অক্ষকারে এক দল আর একদলের ওপর ঢাকাও হলে সব

য্যাসাকার হয়ে যাবে। এভাবে এখানে বিচ্ছিন্নতাবে দল পাঠানোর উদ্দেশ্যটাই-বা কি? তাদের সাথে আমাদের যোগাযোগ নেই কেনো? দীর্ঘদিন ধরে আমরা এ ল্লাকায় যুদ্ধ করছি, শক্রকে মোকাবেলা করছি, তাদের মোটামুটি কোপঠাসা করে রেখে এ ল্লাকার প্রায় সবটাই মুকাফিলে পরিগত করেছি, তখন আর একটা বিচ্ছিন্ন দলের অনুসরণে মনের দিক থেকে খটকায় ফেলে দেয়। তারা একাকী করবেটাই-বা কি? এ দলটিকে এখানে আনবার ঘটনার সাথে প্রফেসর আনোয়ার ও মোষ্টফা সরাসরি জড়িত রয়েছেন। তারা আবার কেনো? মনটা খারাপ হয়ে যায় এ ব্যাপারটা ভেবে। মুক্তিযুদ্ধ যখন একটা পূর্ণাঙ্গ আকার নিয়ে কিছু মানুষের স্বার্থ চরিতার্থ করার প্রয়াসটাকে ভালো মনে হয় না। মুক্তিযুদ্ধের প্রায় শুরু থেকেই যেহেতু আমরা এ ফ্রন্টে রয়েছি, ব্যাপারটা সেহেতু আমাদের অন্তত জানানো উচিত ছিল। যাহোক, ব্যাপারটা দেখতে হবে, নতুন দলটার সাথে যোগাযোগ করতে হবে, তাদের যদি এই ফ্রন্টে যুদ্ধ করতে হয়, তা হলে আমাদের সবওলো দলের সাথে সমন্বয় করেই তা করতে হবে। ওদের এখানে আনার পেছনে যার যে উদ্দেশ্যই থাকুক না কেনো, সবকিছু ম্যানেজ করে নিতে হবে নিজেদের মতো করে। ওদের সাথে আলোচনায় বসতে হবে, আমাদের কর্মধারা আর মুক্ত পরিকল্পনার মধ্যে তাদের নিয়ে আসতে হবে। সব মুক্তিযোদ্ধার লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য এক, আমরা লড়ি জয় বাঞ্চার জন্য, আমরু লড়ে যাবো জয় বাঞ্চা না হওয়া পর্যন্ত। পিন্টুকে বলি, পরে দেখা যাবে ব্যাপারটা। আসো এখন রাতের প্ল্যান করি। খুব রাগ পিন্টুর। বলে সে, না এটা হ্যাঁ মা। চলেন ব্যাটাদের আজ রাতেই বেরবাড়ি পার করে দিয়ে আসি। হায়ার খেলতে এসেছে ভাইজানেরা। ঠিক আছে, বেলুক না দুঁচারদিন। তারপর, নাও বলে ওকে বিড়ি ধরবেন্তুল এবং তারপর মুসাকে ডেকে এনে বসি পুরুর পাড়ের সেই জায়গাটায়। বিকেলে চা প্রস্তুত খেতে পরিকল্পনা চূড়ান্ত হয়ে যায়।

এবার টেলিফোন লাইন এবং প্রক্রিয়াসড়কের যোগাযোগ বিনষ্ট

দুটো দল যাবে আজ রাতে। স্ক্রিপ্টিন্স ধরনের অপারেশন পরিকল্পনা আজকের। পঞ্চগড়-অমরখানা পাকা সড়কের পাশ দিয়ে টেলিফোন লাইন এখনও অক্ষত আছে। শক্ররা পঞ্চগড়-অমরখানা-জগদলহাটে যোগাযোগ ব্যবস্থা বজায় রেখেছে টেলিফোনের মাধ্যমে। আজ রাতে সেটা বিনষ্ট করে দেয়া হবে। সেই সাথে জগদলহাটের পেছনে পঞ্চগড়গামী পাকা সড়কের ওপর এক্সপ্রেসিভের চার্জ দিয়ে রাস্তার মাঝে বড় বড় গর্ত করে সড়কপথের যোগাযোগ নষ্ট করে দেয়া হবে। কাজটার মধ্যে নতুনতু রয়েছে কিন্তু যথেষ্ট ঝুকিপূর্ণ। দেখা যাক না ঝুকি নিয়ে কতদূর কি করা যায়। অন্য একটি দল যাবে পানিমাছ পাক ঘাটিতে মাইন পুঁততে। একেবারে ঘাটির কাছাকাছি এমন জায়গায় তারা মাইন পুঁতে রেখে আসবে যাতে থান সাহেরা সহজেই তাতে পা দেবেন এবং উড়ে যাবেন বিক্ষেপিত মাইনের সাথে।

মুসা ১০ জনের দল নিয়ে চলে যায় পানিমাছ শক্রঘাটির দিকে। পিন্টুসহ ১৫ জনের দল নিয়ে আমি রওনা দিই জগদলহাটের উদ্দেশ্যে। মতিন তার ল্লাকায় এসে বৌজখবর নিয়ে দেখে, সব ঠিকঠাক মতোই আছে। পিন্টু বলে, আজ থাক তুই মতিন। তোর ছুটি। বউয়ের চন্দমুখ দেখিব শালা সারারাত। বিগলিত হাসি দিয়ে মতিন থেকে যায়। মানুষের আনন্দ আর সুখটা যে কতো প্রয়োজনীয় বেঁচে থাকবার জন্য এবং তার জন্য তার কষ্ট ও ত্যাগের কোনো সীমাও নেই। এই মুহূর্তে এক স্বর্গীয় আনন্দে উদ্ভাসিত মতিনের মুখ-চোখের দীপ্তি

খুবই ভালো লাগে। পিন্টু তাকে হঠাতে করে ছুটি দেয়ার ব্যাপারটিকে আমি অনুমোদন করি। সামনে দেখা হয়ে যাওয়া মকতু মিয়ার সাথে। সেও তার চকচকে সাদা দাঁতের হাসি দেখিয়ে অল ক্রিয়ার সিগনাল দেয়। বলে সব ঠিক আছে, যাইন গা।

সোনারবানে পৌছুবার পর লোকজন সব স্বতন্ত্র আনন্দ সহকারে ছুটে আসে। আজ রাতেই আমরা আবার তাদের মধ্যে আসবো, এটা হয়তো তারা ভাবে নি। প্রচণ্ড ভয়ে ভয়ে কেটেছে ওদের দিনের বেলাটা। গতকালকের ভয়াবহ যুদ্ধের পর ওদের এ ধরনের ভয় পাওয়াটা অঙ্গভাবিক কিন্তু নয়। আমাদের দেখে তাদের হারানো সাহস তাই ফিরে আসে। সোনারবান গ্রাম আর এখানকার লোকজন আমাদের অত্যন্ত কাছের মানুষ হয়ে উঠেছে। গতকালকের যুদ্ধে এদের বলিষ্ঠ সহযোগিতা, আমাদের শেষ পর্যন্ত যুক্ত ঢিকে থাকতে সাহায্য করেছে। এখন সোনারবান গ্রামটায় যেনো মুক্তিযুদ্ধের একটা দুর্গ গড়ে উঠেছে, আর এ গ্রামের প্রতিটি মানুষ এখন সে দুর্গ রক্ষায় এক একজন বলিষ্ঠ প্রহরী। এভাবে এ অঞ্জলটায় আমাদের অনেকগুলো দুর্গ গড়ে উঠেছে। মুক্তিযুদ্ধের চেহারা পাল্টে যাচ্ছে। এখন মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে এ অঞ্চলের প্রতিটি গ্রাম আর জনবসতি। প্রতিটা মানুষ এখন মুক্তি চাইছে, জয় বাংলা চাইছে, স্বাধীনতা চাইছে। আমরা গত জুন মাস থেকে শুরু করে সেপ্টেম্বরের এ সময়টা পর্যন্ত ক'জন আর শক্ত নিখন করতে পেরেছি কিন্তু এ ক'মাসে এলাকার সমন্ত মানুষের মন জয় করে তাদের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে আনা পেছুন। এটাই আমাদের বড় ধরনের একটা সাফল্য। একটা জনযুক্তে মানুষকে দলে আনতে নো শারলে তো যুক্তে জেতা যায় না। সেই মানুষেরা আমাদের দলে এসে গেছে। তাদের দেখাদেবি আরো মানুষ আরো গ্রাম-জনবসতি আমাদের পক্ষে চলে আসবে। এভাবে গোটা দেশই একদিন দুর্ভেদ্য দুর্গ হয়ে উঠবে, সেদিন খানসেনাদের পিঠাটান দিয়ে তাদের দেশে পাড়ি জমানো ছাড়া আর উপায় থাকবে না। হজুর তাঁর ঘরে বসিয়ে নিষ্ক্রিয় হাতে চা বানিয়ে খাওয়ালেন আমাদের। তারপর বিদায়ের সময় বললেন, ভালোভাবে চুক্তিরে আসেন। আমি জেনে থাকবো আপনাদের জন্য।

রাত ১২টার দিকে ইঙ্গিত লিঙ্গেস্ট্রেলে পৌছে যাই। পিন্টুকে মর্টার দিয়ে পেছনে রেখে জগদলগামী কাঁচা রাস্তা ধরে এগিয়ে যাই আমরা। অত্যন্ত সতর্কতার সাথে রাস্তার বাম পাশের ঢাল বেয়ে সোজা গিয়ে উঠি পাকা সড়কে। সামনেই জগদলহাট। ৩০০ গজের মতো দূরত্বে। রাস্তার ওপর ৪টা চার্জ বসাই। প্রতিটা চার্জ ৫ পাউন্ডের প্লাস্টিক বিক্ষেপণক দিয়ে তৈরি। দ্রুত চার্জগুলোর ওপর একরামুলকে মাটির চাপ বসাতে বলে আবার নিচের জমিতে নেমে আসি। কাঁচা রাস্তাটার লাগোয়া একটা টেলিফোন পিলার। দ্রুত সেটাতে কাটিং চার্জ লাগাই। পেছন দিককার টেলিফোন পিলারটায় গিয়ে একইভাবে ওপর-নিচ করে কাটিং চার্জ লাগিয়ে ফেলি। দুটো পিলারের চার্জে সাকিট দুটোর মাথায় সেফটি ফিউজ ধরে দাঁড়িয়ে থাকতে বলি মধুসূদন আর জয়নালকে। আবার ফিরে আসি পাকা সড়কের ওপর। একরামুল চার্জ চারটার ওপর মাটির তাল জমিয়ে ফেলেছে। দুটো করে সাকিট ঠিকমতো সেট করে নিয়ে একটা একরামুলের হাতে ধরিয়ে দিই, অন্যটা আমার হাতে। এবার চান্দ মিয়া আর হাসানকে দৌড়ে গিয়ে মধু আর জয়নালকে বলতে বলি ফিউজের মাথায় আঙ্গন দিতে টেলিফোন পিলারে লাগানো কাটিং চার্জ দুটোয়। সামান্য কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে একরামুলকে ইশারা দিই। ফরফর করে ভুলে ওঠে সেফটি ফিউজের বারুদ। দুই ফিট সেফটি ফিউজ জুলতে সময় নেবে এক মিনিট। এই সময়সীমার মধ্যে দৌড়ে ততোদ্ধূর যেতে হবে, যতোদ্ধূর যাওয়া সম্ভব। সেফটি ফিউজ লাল

আলো নিয়ে ঝুলে উঠতেই একবায়ুলৰ হাতে টান দিয়ে দৌড়তে বলি। জগদলহাটের দিকে এল.এম.জি. তাক করে নিয়ে গয়ে থাকা মোতালেবসহ অন্যদেরও দৌড়তে বলি। মাথা নিচু করে সে দৌড় হয় দেখবার মতো। পেছনে উদ্ভাসিত হয় আকাশে চমকানো বিদ্যুতের মতো আলোর তরঙ্গ। তারপর করাও করাও শব্দের সাথে বিকট শব্দের বিক্ষেপণ। লাফিয়ে পড়ি সামনের মাটিতে। কানে দুঃহাতের তালু চেপে ধরি। রাস্তার বিক্ষেপণের সামান্য পরেই প্রথমে পেছনের টেলিফোন লাইনটায় বিক্ষেপণ, সাথে সাথে দূরের অন্যটাতেও ঘটলো একই ধরনের ঘটনা। বিক্ষেপণের শব্দ কেটে না যাওয়া পর্যন্ত তামে থাকি। তারপর একবায়ুল, মধু ও মোতালেবকে সাথে নিয়ে এগিয়ে যাই শেষ পর্যন্ত কী ঘটেছে সেটা দেখবার জন্য। টেলিফোনের লাইন দুটো একেবারে কেটে গিয়ে কাত হয়ে পড়ে আছে, রাস্তার ওপরে সৃষ্টি হয়েছে গভীর চারটা গর্ত। জায়গাটা ধোয়ায় ধোয়ায় আচ্ছন্ন। বাফন পোড়ার গন্ধ বাতাসে। আচমকা জগদলহাট ঘাটি সরব হয়ে ওঠে। প্রচণ্ড গোলাগুলি তরু করে তারা এলোপাতাড়িভাবে। এ নরক ছেড়ে পালানোর তাগিদে আপনাআপনি দৌড় শুরু করে দেয় সবাই। এক দৌড়ে আমরা সবাই চলে আসি পিন্টুর অবস্থানের কাছে। পিন্টু বলে, শেল রেডি করে রাখছি, ছাড়ি দুইটা?

— ঠিক আছে, ছাড়ো, কথাটা বলেই ওর পেছনে গিয়ে বসে পড়ে ছা করে নিখাস নিতে থাকি। পিন্টু তৎক্ষণিকভাবে তার সেট করে রাখা মার্টার থেকে টাপু টাপু শব্দ তুলে দুটো শেল পাঠিয়ে দেয় জগদলহাটে অবস্থানৱত শক্তির মাথার প্রক্ষেপণ। এরপর সবাই হিলে আবার দৌড় লাগাই। দৌড়ানো অবস্থাতেই পেছন থেকে পিন্টুর মার্টারের শেল দুটো বিক্ষেপিত হবার শব্দ তরঙ্গ ভেসে আসে। এরপর আর থামাখালি নয়। হলহলিয়ে হেঁটে এসে একেবারে সোনারবান। হজুর জেগেই ছিলেন। পিতার স্নেহ নিয়ে আলিঙ্গন করেন তিনি। চা-চিনি-বিকুট তার কাছে আগে থেকেই যোগাযোগ করা ছিলো। কেরোসিন কুকার জুলিয়ে বশ সময়ের ব্যবধানে চা বানিয়ে ফেলেন তিনি। নিদাহীন শেষৱাতে প্রচণ্ড ঝুঁকি নিয়ে কাঞ্জ শেষ করে এসে ক্লান্ত বিক্ষেপণ শরীর হজুরজুর চা খেয়ে চাঙ্গা হয়ে ওঠে। হজুরকে সাবধানে থাকতে বলে পথে নামি আবার নালাগঞ্জের উদ্দেশ্যে।

আকাশে সূর্য উঠবার মুহূর্তে মুসা ফিরে আসে তার দল নিয়ে। এসেই বলে, গাও ধূবার নাইগৰে, গন্ধ!

— কিসের গন্ধ রে? জিগ্যেস করি, কাজ করতে পেরেছিস?

— হয় শব্দটা উচ্চারণ করে এবার শাহাজাহান কথা বলে ওঠে, হামরা একেবারে ওমার হাগার জায়গাত মাইন পুঁতি আলছি! আগোত্ টের পাই নাই। গড়েয়া মাইন পুঁতবার সময় দেখি কি ট্রেটা ওমার হাগার জায়গা, সবার গাওত হামার ময়লা নাগচে। মুসা অত্যন্ত বিরক্তির সাথে তখন বলে ওঠে, শ্বালী খানের বাচস্রা খায় যেমন, হাগেও তেমন। শালার গন্ধ কেমন? পিন্টু তখন বলে ওঠে, তার মানে তোরা ওদের টাট্টিখানায় মাইন পুঁতে এসেছিস! খানের টাট্টি বাবা! উত্তম খানাদানা, গন্ধ তো বেশি হবেই। ঠিক আছে যা, কাপড় ঝুলে গোসল করে ফেল ভালো করে সাবান দিয়ে।

মুসাদের এ কাজে চমৎকৃত হতে হয়। পাকসেনাদের প্রাক্তিক কর্ম সারবার জায়গায় ওরা গিয়ে মাইন পুঁতে এসেছে। মুসার এটা খুবই ভালো সিদ্ধান্ত। ওরা যে জায়গাটায় মাইনের ফাঁদ পেতে এসেছে, সে ফাঁদে ব্যাটাদের দু'একজনকে পড়তেই হবে।

ঝুটির ওপর শটকে ধাকা সফিজউন্ডিন

পরদিন অর্থাৎ ১৯ তারিখের রাতে আবার টেলিফোন লাইন বিচ্ছিন্ন করার মিশন নিয়ে বের হই। আজো দুটো দল। আজকের দ্বিতীয় দলটা পিন্টু নিয়ে যায় ভেতরগড়ের বসুনিয়াপাড়ার দিকে। ওদের কাজ পেট্রল দেয়া আর জনসৎযোগ স্থাপন করা। পিন্টু এই কাজটা তালো পারে। বেশকিছু দিন ওদিকটায় যাওয়া হয় নি। জোনাব আলী গাইড হিসেবে যায় পিন্টুর সাথে। আমি মুসাকে নিয়ে আগের রাতের মতো জগদলহাটের রাস্তা ধরি। চেনা রাস্তা। প্রতিটা জনবসতিতে আপন বিশ্বাসী লোক রয়েছে। খেমে খেমে খোজ নিয়ে মেতে অসুবিধে হয় না। রাত একটার দিকে পৌছে যাই গতরাতের স্পটের কাছাকাছি। পৌছেই রাস্তার ডান দিকে নেমে যাই। গত রাতে রাস্তার বাঁ দিকে টেলিফোনের পিলার দুটো উভয়ে দেয়া হলেও টেলিফোন তার বিচ্ছিন্ন করা যায় নি। গতকাল তার কাটার যন্ত্র অর্থাৎ প্লাস সাথে ছিলো না। আজ জলপাইগড়িতে দু'জনকে পাঠিয়ে সেটা কিনে আনা হয়েছে। চাউলহাটি হেড কোয়ার্টারের চাহিদা পাঠিয়ে এবং ক্যাট্টেন দয়াল সিংকে দু'বার তাগিদ দেয়া সত্ত্বেও প্লাস পাওয়া যায় নি। অথচ এদিকে টেলিফোনের তার কাটার তাগিদ। এজন্য নিজেদের পয়সা দিয়েই যন্ত্রটা কিনে আনতে হয়েছে। নিনিট পিলারের কাছে হামাগড়ি দিয়ে উপস্থিত হই। তেতুলিয়ার ছেলে সফিজউন্ডিনকে বলি, পারবি! সে অঙ্কারে মাথা নেড়ে যন্ত্রটা কোমরে উঁজে নিয়ে সুপুরি গাছে উঠবার মতো করে পিলারের মাধ্যমে দিকে উঠতে থাকে। মধুসূন্দন, শাহজাহান ও জয়নালসহ অন্যরা জগদলহাট পাক ঝাঁটি তাক করে হাতিয়ার বাণিয়ে পজিশন থেকে সফিজউন্ডিনকে কভার দিতে থাকে। পাকা রাস্তার এপারে টেলিফোনের লোহার পিলার। পিলার সোজাসজি পাকা রাস্তার ওপারে জগদলহাট বাজার। পাকিস্তানের দ্বিতীয় অঞ্চলতী ঘাঁটি সেটা। ৫০ গজ দূরত্বে হবে না, এমন কাছাকাছি এসে গেছি আমরা ওদের থেকে। দারুণ ঝুঁকি নিয়ে আসেন্তে হয়েছে। ওদের এতো কাছাকাছি যে আমরা, সেটা ওরা হয়তো কল্পনাও করতে পারবো। একবার যদি ওরা টের পেয়ে যায়, আর থেয়ে আসে, তাহলে ধরা পড়ে যাওয়া হাড়া আর কোনো গত্যন্তর নেই। সফিজউন্ডিনের দিকে ওপরে তাকিয়ে দুরু দুরু বুকে অপেক্ষা করতে থাকি। সফিজউন্ডিন ওপরে উঠে গিয়ে দু'পাশে বাড়ানো লোহার অ্যাসেলটা ধরে নিজের ব্যালাস ঠিক করে নেয়। আমি নিচ থেকে গলার স্বর নামিয়ে বলি, নে কাট। শুরু কর সফিজউন্ডিন। নির্দেশ পেয়ে সফিজ তার কাজ শুরু করে। তামার শক্ত তার। পাশাপাশি দুটো। প্রথমটায় যন্ত্র লাগিয়ে কাটা শুরু করতেই ঘটাত ঘটাত ঘনাত ঘনাত ধরনের শব্দ করে ওঠে। বলি, আস্তে কাট। ওপর থেকে সে বলে আস্তে কাটা যাচ্ছে না। শব্দ হচ্ছে। ঝুবই শক্ত তার।

— ঠিক আছে দেখ চেষ্টা করে, বলে ওকে উৎসাহ দিই নিচ থেকে। চৃপচাপ দাঁড়িয়ে থাকলেও সর্বক্ষণ শরীরের সবগুলো ইন্দ্রিয় খাড়া হয়ে থাকে। বুকের মধ্যে আশঙ্কার ধূকপুকানি শব্দের সাথে শরীরের সমস্ত লোমকৃপ খাড়া হয়ে যায়। গা কাঁটা দিয়ে ওঠে। তার কাটার শব্দ ঢাকা যায় না। সেই সাথে মাথার ওপর কেমন যেনো একটা শব্দশন্ন শব্দ হতে থাকে। মোটামুটি ধন্তাধন্তি করেই সফিজ একটা তার কাটতে সক্ষম হয়। কাটা তারটা বাপাৎ করে নিচে পড়ে যায়, আর সেই সময় জগদলহাট থেকে চিৎকার করে একজনের গলা শোনা যায়, সম্ভবত টেলিফোনে কিংবা ওয়ারলেসে কথা বলার চেষ্টা করছে সে গলা ফাটিয়ে, হ্যালো-হ্যালো কু-ই লোক হামারা টেলিফোন লাইন কাটতা হ্যায়, হ্যালো...।

সর্বনাশ! ওরা তাহলে টের পেয়ে গেছে, এখন উপায়ঃ কী করবো বুঝে উঠতে পারছি না। সফিজউদ্দিনকে ওভাবে পিলারের মাথায় রেখে পালাতেও পারছি না। কভাবে থাকা ছেলেরা ভয় পেয়ে অস্ত্রি হয়ে উঠছে। মনে হচ্ছে, এই বুঝি এলো একদল উঁচা-লম্বা মানুষ। এসেই কাঁপিয়ে পড়ে ধরে ফেললো বুঝি আমাদের সবাইকে।

ঠিক এমন সময় জগদলহাটের সামনের দেবনগর-কামাত এলাকার মুক্তিফৌজ বাহিনী সরব হয়ে উঠলো আচমকা। মনে হয়, তারা অঙ্ককারের আড়াল নিয়ে জগদলহাট উপকর্ত্তে এসে একেবারে হামলে পড়ছে যেনো সব ধরনের হাতিয়ারের গোলাগুলি বর্ষণের তেতর নিয়ে। তাদের এ ধরনের আক্রমণে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছে পাকবাহিনী। তারবৰে ওয়ারলেসম্যান পঞ্জগড়ের উদ্দেশ্য চেঁচিয়ে বলছে, হ্যালো, হ্যালো, মুক্তি লোগ চারি তরাফসে এ্যাটাক দিয়া, আর্টিলারি ফ্যায়ার কিজিয়ে জালদি....। পাকবাহিনীর বাকারের মেশিনগানগুলো তখন সরব হয়ে উঠছে। সফিজউদ্দিনের তার কাটা কেবল শেষ হয়েছে, কাটা তারটা নিচে এসে সবে পড়েছে, আর অয়নি জগদলহাটের আকাশ জুড়ে জলে ওঠে উজ্জ্বল ঝোয়া বা প্যারা বোম। পুরোটা এলাকা দিনের আলোর মতো উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। এমন আলো যে, মাটিতে পড়ে থাকা হারানো পিন পর্ণত তাতে ঝুঁজ নেয়া যাবে। আমি টেলিফোন খুঁটির নিচে মাটির ওপর বসে পড়ি। ওপরের দিকে তাকিয়ে দেখি, সফিজউদ্দিন বাঁদরের মতো খুঁটির মাথার জাটকে আছে। দূর থেকে ওকে একদম পরিকার দেখা যাচ্ছে। এখন শুধু একটা গুলির ঝুঁটিপরকার ওকে লক্ষ্য করে। তাহলেই সে পাকা আমের মতো টপ করে প্রাণহীন দেহ নিয়ে হিঁটে পড়ে যাবে ধপাস করে। পরিস্থিতির এই আকস্মিকতায় সফিজউদ্দিন এমন ভ্যাবচ্যুৎ খেয়ে গেছে যে, সে সম্পূর্ণ দিশেহারা অবস্থায় খুঁটির মাথায় লটকে রয়েছে। মনের মধ্যে প্রচণ্ড দাপাদাপি। এই বুঝি এক বাক গুলি ছুটে আসে, এই বুঝি সফিজউদ্দিন ঝুঁটিত্বয়ে মুখ পুরুড়ে পড়ে গেলো। এই বুঝি আমরা গুলিবিদ্ধ হলাম, এই বুঝি দৌড়ে স্মরণে ওরা আমাদের ধরে ফেলতে। সে এক দারুণ মুহূর্তের পর মুহূর্ত। জীবন আর মৃত্যুর স্থিতিশীল সবাই বুঝি এমনটাই হয়।

এক সময় প্যারা বোমটা তার উজ্জ্বল আলো নিয়ে ধীরে ধীরে নিচে নেমে আসে। তুমুল গোলাগুলি চলতে থাকে সমানে। চুই-চুই শব্দ তুলে আকাশ দিয়ে গুলি ছুটে যায়। ধার্ম ধার্ম করে কামানের গোলা ছুটে আসে পঞ্জগড়ের দিক থেকে। দিগন্ত কাঁপিয়ে বিক্ষেপিত হয় সেগুলো জগদলহাট বাজার পার হয়ে সামনে। প্যারা বোম এক সময় নিচে নেমে এসে মিইয়ে যায়, আবার চারদিক ঘৃতঘৃটে অঙ্ককারে ছেয়ে যায়। আর ঠিক তখনি সড়াৎ করে সফিজউদ্দিন মাটিতে নেমে আসে। না, আর এখানে নয়, দৌড়া সবাই—বলে, মাথা নিচু করে দৌড়াতে থাকি। একেবারে প্রাণ হাতে নিয়ে দৌড়ানো, যাকে বলে, তেমনি দৌড় দিয়ে মোটামুটি নিরাপদ দূরত্বে চলে আসি। সমস্ত শরীর বেয়ে দরদরিয়ে ঘাম ঝরছে। মাত্র গোসল সেরে উঠেছি যেনো সবাই। রাস্তার পাশে ঘাসের ওপর বসি। ব্যাপারটা তলিয়ে দেখার চেষ্টা করি। সফিজউদ্দিন তার কাটতে পেরেছে। কিন্তু শব্দের নাকের ডগায় একেবারে জীবন্ত টার্গেট হয়ে থেকেও বাঁচতে পারলো কী করে ও? আমরাই-বা কীভাবে বেঁচে এলাম? ইঁরেজিতে একটা শব্দ আছে মিরাকল বলে। সম্ভব সেই মিরাকলের জোরেই কি আমরা বেঁচে রইলাম? কাকতালীয়ভাবে সহযোগী মুক্তিফৌজ বাহিনীই-বা কেনো সেই তখনি আক্রমণ করে বসলো? ব্যাপারটা কি আমাদের বাঁচানোর জন্য? কে জানে হতেও

পারে। এভাবেই বুবি মানুষ হায়াতের জোরে বেঁচে যায়। আর হায়াত না থাকলে এর চেয়ে অনেক সামান্য কারণেই মানুষের মৃত্যু হয়। নির্মেষ আকাশে ঝুলজুলে তারার মেলা। ভিজে ঘাসের ওপর দিয়ে ফিরছি আমরা। সফিজউদ্দিন বলে, পানি খাম মুই, খুব তিয়াস নাগিছে।

পানি আমরাও খাবো, বুক ফেঁটে যাচ্ছে ত্বক্যায়। বলি, চলো সামনের গ্রামটায়। ওখানে গিয়ে প্রাণভরে পানি খাবো সবাই।

— যত্নটা হারে গেছে, কুণ্ঠে যে পড়িল। ইতস্ততভাবে সফিজউদ্দিন তখন তার প্রাসটা হারিয়ে যাওয়ার কথা বলে।

— যাক, ওর পিঠ চাপড়ে দিয়ে সঙ্গেহে বলি, কতো যত্ন পাওয়া যাবে, এ নিয়ে তুই চিন্তা করিস না। তুই যে বেঁচে এসেছিস, এটাই সব থেকে বড়ো কথা। সফিজউদ্দিন আর কিছু বলে না। সামনের গ্রামটা লক্ষ্য করে সবাই তখন নীরবে হেঁটে চলি।

১৯. ৯. ৭৩

অমরখানায় সেক্সি সাইলেন্ট

গড়ালবাড়ি বি.ও.পি. জমে ওঠে দুই শিখের লড়াইয়ে। দু'জনারই মাথায় চূড়া করে বাঁধা চুল, কালো গৌফ, দাঢ়িতে ঢাকা মুখ, হাতে লোহার বালা। একজন লো-চওড়া আর একজন বেঁটে-খাটো। একজন বি.এস.এফ.-এর কোম্পানি-ক্লান্টার, অন্যজন ভারতীয় ফার্স্ট গার্ড রেজিমেন্টের অফিসার। একজন যুবা বয়সী শুক্রান্ত সুদর্শন। অন্যজন প্রায় মধ্য বয়সী। একজন ঝককাকে ঝুঁচিবান, অন্যজন ধূর আর নোংরা। কথা বলতে বলতে হঠাতে করেই লেগে যায় এই দুই শিখ। দু'জনের মধ্যে কথাকাটাকাটি শুরু হয়ে যায়। একে অপরের দিকে হাত অথবা আঙুল তুলে ধূলিম কথা বলতে বলতে। শুরু হয়েছিলো হিন্দি দিয়ে। তারপর ইংরেজি। এখন চলচ্ছ তাদের নিজেদের মাত্তাধা পাঞ্জাবিতে। তাদের বোলচাল কিছুই বোঝা যায় না। ক্ষুণ্ণ বাক্য ব্যবহারের গভীরতা এবং কর্কশ ভাষা ব্যবহার বলে দেয় মাত্তাধায় তারা একে অপরকে গালাগালি করছেন দারুণভাবে। সৌম্যদর্শন যুবা বয়সী দয়াল সিং আমাদের অফিসার, ক্যাট্টেন নারায়ণ সিং বি.এস.এফ.-এর। ঝগড়াটা হচ্ছে বি.এস.এফ. ক্যাপ্টেন মধ্যে। বি.এস.এফ.-এর লোকজন এসে দাঁড়িয়েছে আমাদের পাশাপাশি। তারাও উপভোগ করছে দুই শিখের ঝগড়াটা। এটা তাদের মুখ দেখেই বেশ বোঝা যায়। আমরা দয়াল সিংয়ের পক্ষে। নারায়ণের ওপর ঝাড়ের বেগে তার গালাগালি চালানোয় খুবই খুশি আমরা। নতুন অফিসার ক্যাট্টেন নন্দা দাঁড়িয়ে থাকেন একপাশে। মুখে মিটিমিটি হাসির ঝলক ফুটিয়ে।

তো, ব্যাপারটা শুরু হয়েছে একটা অপারেশন পরিকল্পনাকে কেন্দ্র করে। ক্যাট্টেন দয়াল সিং চাউলহাটি বেসের তাঁর অধীনস্থ এফ.এফ.দের দিয়ে বেশ কটা সফল অপারেশন পরিচালনা করেছেন অমরখানা পাকবাহিনীর শক্তিশালী অবস্থানের ওপর। এর মধ্যে সবচেয়ে আলোড়িত ও আলোচিত যে অপারেশন, সেটা হচ্ছে প্রকাশ্য দিবালোকে অর্ধীৎ বেলা এগারোটার দিকে অমরখানা ঘাঁটির মূল বাঙ্কারের সামনে দণ্ডায়মান সেক্সিরে শুলি করে হত্যা করার ঘটনা। মতিয়ারের মৃত্যুর প্রতিশোধমূলক আকর্ষণ এটা। ক্যাট্টেন দয়াল সিং অনেকটা জেদের বশেই এ ধরনের একটা ডেয়ারিং অপারেশন পরিচালনার ডিজাইন করেছিলেন। আমগাছের ওপর স্থাপিত বালুর বস্তা দিয়ে তৈরি নিরাপদ অবজারভেশন পোস্ট থেকে পরিষ্কার

দেখা যায় অমরখানা ঘাঁটি-জোড়া পাকবাহিনীর অবস্থান, তাদের বাস্তার আর টেক্সের সারি, তাদের চলাচল, তৎপরতা মাঝ সরকিছু। মূলত পাকসেনারা বাস্তারেই অবস্থান করে। রাস্তার ওপার দিয়ে তৈরি আঁকাৰ্বিকা গভীর টেক্স দিয়ে তারা যাতায়াত করে। বাস্তারের বাইরে এলে কিংবা রাস্তার ওপর দিয়ে চলাচল করলে তাদের দেখা যায়। প্রায় মাইলথানেকের দূরত্ব, তবুও তাদের ছোট আকৃতিৰ চেহারা স্পষ্ট করে ধৰা পড়ে টেলিলেন্সে। ঠিক রাস্তাটা বাঁক নিয়ে যেখান থেকে ভজনপুরুর দিকে চলে গেছে, সেখানে একটা ছোট ঝীকড়া আমগাছের নিচে তাদের মূল বাস্তার বা ডাগ আউট। বেশ বড় সাইজের সেই বাস্তারটা তাদের কমান্ড পোষ্ট হিসেবে ব্যবহৃত হয়। দিনরাত সেই বাস্তারে প্ৰবেশমূৰ্তি একজন সেন্ট্রি সশস্ত্র অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকে। সেই সেন্ট্রিকে সাইলেন্স বা হত্যা কৰাৰ সিদ্ধান্ত নেন দয়াল সিং। বাসারতেৰ নেতৃত্বে বাছাই কৰা ৭ জন ছেলে দিয়ে দল গঠন কৰে সবাৰ হাতে এস.এল.আৱ. এবং ফ্রেনেড দিয়ে সকাল নট্টৰ দিকে রওনা কৰিয়ে দেন তিনি। নিজে গিয়ে বেসেন টেলিস্কোপ হাতে সেই আমগাছের মগডালে স্থাপিত অবজারভেশন পোষ্টে। দিনেৰ বেলায় এভাৱে অমরখানা মূল ঘাঁটিৰ দিকে ছেলেদেৰ পাঠানোটা অনেকটা পাগলামোৰ শামিল। পাক ঘাঁটিৰ কাছাকাছি গোলে ওদেৱ তারা দেখে ফেলতে পাৱে, টেৱে পেয়ে যেতে পাৱে তাদেৱ উপস্থিতি। তাদেৱ বাস্তারে বসানো মেশিনগান থেকে শুলিবৰ্ষণে তাদেৱ সবাইকে ঝোঁপো কৰে ফেলতে পাৱে। এমনকি তাদেৱ দিকে পাকসেনারা একযোগে দৌড়ে এসে ধৰে ফেলতে প্ৰস্তুতস্বাইকে। সেক্ষেত্ৰে আমদেৱ গৈ এই ৭ জন ছেলেৰ ফিরে আসাৰ সংভাবনাটা শতকৰা ৫০% অৰ্থাৎ আধাৰাধি। তারা ফিরতে পাৱে আৰাৰ নাও পাৱে।

এমন একটা সংভাবনাৰ ভেতৱে পেছনে কেননো কভাৱ ছাড়াই দয়াল সিং তাদেৱ পাঠিয়েছেন। বাসারত পাতলা শৰীৱেৰ ছোটোখাটো ছেলে হলেও তাৰ বুকেৰ মধ্যে পাহাড় সমান সাহসৰেৰ বসবাস। সকাল নট্টৰ অবজারভেশন পোষ্টেৰ সামনে দিয়ে সীমান্ত পেরিয়ে তারা যুদ্ধৰত দুই শৰ্কুপক্ষেৰ মাঝখন্তকৰ 'নো ম্যান্স ল্যান্ড'-এ পৌছে যায়। তাৰপৰ শুলু কৰে ক্রলিং। 'নো ম্যান্স ল্যান্ড'-এৰ জমিৰ অবস্থান এবড়োখেবড়ো, উচুনিচু, জনমনিষ্যৰ চলাচল বা চাষবাস না থাকায় বুনো ঘাস বেড়ে উঠেছে আপন খুশিমতো। মাঝে মাঝে মনখাগড়া আৱ বুনো কঁটালতাৰ ঝোপ। ওৱা এগিয়ে যায় ক্রলিং কৰে। বুকে হেঁটে পেৱোয় পুৱো এলাকাটা। অসম্ভব ঝুকিসন্ধূল আৱ শ্রান্তিকৰ এভাৱে এগিয়ে যাওয়াৰ ব্যাপারটা। জেনেতনে ওৱা এগিয়ে যায় মৃত্যু-গহুৱেৰ দিকে। সন্তৰ্পণে নিৰুদ্ধেগ চিষ্টে। হয়তো তখন ওদেৱ মনে এটা কাজই কৰে না, যাছে কোথায় ওৱা। এক সময় ওৱা গিয়ে পৌছায় দীনিত লক্ষ্যবস্তু থেকে ৫০/৬০ গজেৰ ব্যবধানে। একটা বুনো ঘাসেৰ ঝোপেৰ আড়ালে লুকিয়ে থেকে সোজাসুজি টার্ণেট কৰে আমগাছেৰ নিচে সেই বড় বাস্তারেৰ সামনে দাঁড়িয়ে থাকা লোক জোয়ান সেন্ট্রি সৈনিকটিকে। বাসারতসহ তিনজন টার্ণেট কৰে তাকে, অন্য চারজন থাকে কৰতাৰে। লক্ষ্য হিঁকে হয়ে যাওয়া মাত্ৰ ওৱা তিনজন একসাথে ট্ৰিগাৰ টিপে ধৰে। ধাম্ ধাম্ কৰে ছুটে যায় মৃত্যুবাণ অলসভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকা সেন্ট্রিৰ দিকে। অব্যৰ্থ লক্ষ্যভেদে। সাথে সাথে চলে পড়ে সে। পাক আৰ্মি কিছু বুঝে উঠিবাৰ আগেই ওৱা দ্রুত পিছিয়ে আসে মোটামুটি নিৰাপদ দূৰত্বে। এৱপৰ পাক ঘাঁটি যখন তাদেৱ মৃত সেন্ট্রিৰ অবস্থা দেখে সক্ৰিয় হয়ে উঠে শুলিৰ বন্যা বইয়ে দিয়ে, তখন ওৱা সীমান্ত পেরিয়ে চাউলহাটিৰ রাস্তা ধৰেছে। বাসারতেৰ এ সাফল্যে ফ্ৰেন্ট জুড়ে আলোড়ন পড়ে যায়। হিৱো বনে যায় বাসারত।

মুঝে প্রেম করো

ক্যাপ্টেন নারায়ণ সিংহের মধ্যে জেদ ফেনিয়ে ওঠে এ ধরনের একটা অ্যাডভাঞ্চার-তুল্য অপারেশন পরিচালনার জন্য। তিনি তার বি.এস.এফ কোম্পানি নিয়ে সরাসরি তাদের সীমান্ত এলাকায় প্রতিরোধ ঘাঁটি গেড়ে দিনবাতত ঠেকিয়ে রেখেছেন অমরখানার পাকসেনাদের। মাঝে মাঝেই তারা এগিয়ে আসে সীমান্তের দিকে। তখন তাকে মরিয়া হয়ে তাদের ঠেকাতে হয় তার বি.এস.এফ সেনা সদস্যদের সাহায্যে। ভারতীয় ফার্স্ট গার্ড রেজিমেন্টের অবস্থান তাদের পেছনে। আর্টিলারি মার্টের ব্যাটারি আরো পেছনে প্রায় পাকা রাস্তার কাছাকাছি। নারায়ণ সিংকে দিনবাতত পাকসেনাদের মোকাবেলা করতে হচ্ছে; কিন্তু তিনি দেখাবার মতো কোনো কাজ করতে পারছেন না। ক্যাপ্টেন দয়াল সিং এফ.এফ.দের নিয়ে চমৎকার একটা কাজ দেখিয়ে সবার বাহবা কুড়িয়ে নিলেন মাঝখান থেকে। সুতৰাং তাকেও কিছু কাজ দেখাতে হয়। তাই তিনি একটা পরিকল্পনা গঠনে হচ্ছেন। তার এই উচ্চভিলাষী পরিকল্পনা মাফিক তিনি পাকবাহিনীর সেই মূল বাস্কারটি খৎস করে দিতে চান। এর জন্য প্রয়োজন কিছু সাহসী এফ.এফ. বাহিনীর সদস্য। বি.এস.এফ.দের দিয়ে এটা তিনি করতে পারছেন না। সীমান্ত অতিক্রম করবার অনুমতি বি.এস.এফ. বা ভারতীয় সেনাবাহিনীর নেই।

তার পরিকল্পনাটা এককম যে, মুক্তিবাহিনীর দল এগিয়ে যাবে অমরখানার দিকে। তাদের মাথার ওপর দিয়ে বি.এস.এফ বাহিনী তুমুল কভার ফার্মের দিতে থাকবে। পেছন থেকে মার্টের ব্যাটারি আর কামানবাহিনী দেবে প্রচণ্ড গোলারঞ্জ। বি.এস.এফ. বাহিনীর সরাসরি অমরখানা তাক করে ছেঁড়া মেশিনগানের গুলির পথে নিচ দিয়ে মুক্তিবাহিনী ক্রলিং করে এগিয়ে যাবে অমরখানা পাক ঘাঁটি পর্যন্ত। তাস্টেক্স বাস্কারের মেশিনগানারকে গুলি করে মেরে এগিয়ে যাবে বাস্কার পর্যন্ত। এইভাবে বাস্কারের দখল নেবে। তারপর বাস্কারে ফ্রেনেড চার্জ করে তা উড়িয়ে দিয়ে আসবে, তাই সাথে হত্যা করবে যতোগুলো সঙ্গী পাক সৈনিককে। তিনি এ পরিকল্পনা প্রাথমিক আলোচনা করছেন দয়াল সিংহের সাথে। তার উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকেও তিনি স্টার্ট জানিয়েছেন। আর্টিলারি ইউনিটের সাথে কথা বলে, তাদেরও রাজি করিয়েছেন। এখন ক্যাপ্টেন দয়াল সিং আর তার এফ.এফ.দের রাজি করাতে পারলেই হয়ে যাব পরিকল্পনা চূড়ান্ত করার কাজ।

প্রস্তাবটা দয়াল সিংহের মনোগৃহ হয়নি। এ ধরনের একটা বড় ধরনের বুকিপূর্ণ অপারেশনে ছেলেদের পাঠানো মানে স্বেচ্ছা তাদের জেনেভনে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়া। বি.এস.এফ.-এর ক্ষমতার তার নিজস্ব উচ্চভিলাষ পূরণের জন্য এফ.এফ.দের ব্যবহার করতে চান। এজন্য তিনি পিন্টুসহ আমাকেও রিকুইজিশন দিয়েছেন। বাছাই করা সাহসী ১৫ জনের একটি দলের নেতৃত্ব দিতে হবে আমাকে। নারায়ণ সিংহের ধারণা মাহবুব-পিন্টু ছাড়া এ অপারেশন পরিচালনা করা সম্ভব হবে না। নারায়ণ সিং এফ.এফ.-দের ক্ষমতাং অফিসার নন। তিনি সরাসরি এফ.এফ.দের কোনো নির্দেশ দিতে পারেন না, তাদের তিনি কোনো অপারেশনে পাঠানোরও ক্ষমতা রাখেন না। ক্যাপ্টেন দয়াল সিং-এর কাছে এ প্রস্তাব রাখলে তাতে তিনি রাজি হন নি। তারপরও নারায়ণ সিং জোরাজুরি করলে তিনি ব্যাপারটা আমাদের ওপর ছেড়ে দিয়েছেন পাশ কাটানোর জন্য। বলেছেন, ঠিক আছে, চলো যাবা যুদ্ধটা করবে তাদের সাথে কথা বলি, তারা রাজি হলে আমার কোনো আপত্তি নেই। ক্যাপ্টেন দয়াল সিং আগেই গড়ালবাড়ি পৌছে বিষয়টা সম্পর্কে বিস্তারিত জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, উহ শালে নারায়ণ তুমকো মারনে চাহ্তা হ্যায়। ডেট

গ্রামীণ উইথ হিম। ব্যাপারটা সহজ হয়ে আসে দয়াল সিংহের গরবাজিতে। তিনি রাজি থাকলে ওই মৃত্যুর রাজ্যের যাওয়া ছাড়া আমাদের কোনো গত্যন্তর থাকতো না। তিনি বলেন, নারায়ণ তোমাদের খুব অনুরোধ করবে, পীড়াপীড়ি করবে, বাট ডোক্ট গ্রাগরি। আমি চৃপচাপ থাকবো। কিছু বলবো না। তোমরা সরাসরি তার প্রস্তাব অঙ্গাহ্য করে বসবে। ব্যাট মুরগি কী আভ্লাদ, মেরা এফ.এফ. ইউনিট ইউটিলাইজ করকে হিরো বননে ঢাকে হ্যায়।

ক্যাটেন নারায়ণ আসেন কিছুক্ষণের মধ্যে। সকাল ১০টার মতো সময়। বি.ও.পি.র আমগাছের নিচে পেতে রাখা টেবিলের চারদিকে বসে আলোচনা সারেন তিনি। বিস্তারিত আলোচনায় তার পরিকল্পনা তুলে ধরেন। খুবই সহজ লাগে শুনতে। এফ.এফ.রা এন্ডতে থাকবে ক্রলিং করে, বুকে হেঁটে। বাস্কারের অবস্থান থেকে বি.এস.এফ. দল মেশিনগানের ফায়ার দিতে থাকবে তাদের মাথার ওপর দিয়ে। মেশিনগানের গুলির ছবিহায়ায় এফ.এফ. দল অমরখানা পৌছে যাবে এবং দ্রুত তাদের কাজ শেষ করে চলে আসবে। শত্রুর মেশিনগান স্কন্দ করে দিতে হবে। তাদের বাস্কার উড়িয়ে দিতে হবে এবং যতজন সজ্জব শক্তকে খত্ম করে দিতে হবে। বাস, এই হচ্ছে কাজ। মন দিয়ে শুনি তার পরিকল্পনা ও অপারেশন ডিজাইন। এটাকে কোনো সুস্থ মানুষের রচিত পরিকল্পনা মনে হয় না। মনে হয়, ভাসা ভাসা ধারণা নিয়ে সম্পূর্ণ স্থানভিলাসী একটা পরিকল্পনা। এর সাথে বাস্তব অবস্থার কোনো মিল নেই। দিনের বেলায় সংঘটিত করতে হবে এই কাজ। অমরখানা ঘৃণ্ণিত! পাক আর্মি প্রতিরক্ষা বৃহৎ এমনভাবে সৃষ্টি করেছে, যেটা ধ্রংস করা অসম্ভব বলে জ্ঞান পর্যন্ত সবারই ধারণা। ওখানে অবস্থানরত দুর্বর্থ জাত সৈনিকদের মেশিনগান স্কন্দ করে দিয়ে, তাদের বাস্কার দখল নিয়ে তাদের হত্যা করে আসতে হবে। তারা আমদের সুযোগ দেবে? কানিন আগেই বাসারতের দল সিয়ে তাদের একজন সেন্ট্রিকে হত্যা করেছেন। স্বাভাবিক কারণেই এখন তারা আগের চাইতেও অনেক বেশি সতর্ক অবস্থায় থাকবে তাদের প্রতিপক্ষকে মোকাবেলায়। সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু নারায়ণ সিং কেবল স্কন্দক করেই চলেন তার পরিকল্পনা নিয়ে। আমরা তার কথা শুনি আর দয়াল সিংহের স্মিতে তাকাই। দয়াল সিংহের চোখে শ্পষ্ট নিষেধ। নারায়ণ সিং তার পরিকল্পনা সম্পর্কে বর্ণনা শেষ করে থামেন। তারপর বলেন, আভি বলিয়ে, তুম সাব কব আওগে? যেনো তিনি ধরেই নিয়েছেন আমরা আসছি তার সাথে। প্রথমে তার কথার পিঠে কিছু বলি না। চৃপচাপ থাকি। তখন আবার তিনি প্রশ্ন রাখেন, দ্যান ফ্রেডস, কব আওগে তুমলোগ?

— হাম যানে নেহি সাকেগ্যা সাব। আমরা যেতে পারবো না। দুম্ করে কথাটা বলে ফেলি তার মুখের দিকে তাকিয়ে।

— কিউ? বলে তিনি উঠে দাঢ়ান।

— ইয়ে কোই আইডিয়াল প্ল্যান নেহি স্যার। আপতো হামনে মারনে কে লিয়ে ভেজনে চাহতে হ্যায়!

— কেয়া বোলায়! বলে উত্তেজিত হয়ে প্রায় ফেটে পড়েন নারায়ণ। তখন পিন্টু বলে ওঠে, হামলোগ আপকা আভার মে নেহি হ্যায়, আপ এয়ায়সা অপারেশন মে হামকো ভেজনে নেহি পারতা হ্যায়। নারায়ণ তখন আরো রেগে উঠে বলেন, কিউ নেহি পারতা!

— নেহি পারতা, বিকজ উই আর নট আভার ইয়োর কমান্ড, বলি আমি তার কথার সাথে পাল্যা দিয়ে। আমার সাথে সাথে পিন্টু যোগ করে, আপ হাম লোগকো মারনে কে লিয়ে পাঠাতে হ্যায়, আপ ডারাতে হ্যায়। আপ কিউ নেহি যাতা, কিউ হামলোগকো বোলাতা

হ্যায়! পিন্টু রাপে গরগর করে উঠে দাঁড়িয়েছে। মুখে বলছে, আপ বাইঠকে বাইঠকে মজা দেবেগা আর হামলোগ যায়গা অমরখানা পাক আর্মিকা পাস, উহ লোগ উধার বাইঠা হ্যায়, হামলোগকা লিয়ে ইয়ে ছোককে যে, আইয়ে ভাইলোক, তুমলোগ হামার মেশিনগান লেকে যাইয়ে, বাক্সার উড়াকে যাইয়ে..। হামে গোলি সে মারকে যাইয়ে..।

পিন্টু রেগে গেলে ওর হিতাহিত জ্ঞানগম্য থাকে না। ক্ষেপে গেলে কথাবার্তায় কোনো ব্যালাস থাকে না। মুখের ওপর কথা বলতে ছাড়ে না। পিন্টুর এই রাগাভিত এবং ঊহ্যমৃতি দর্শনে ক্যাপ্টেন নারায়ণ মোটামুটি ভরকে যান। তারপর এগিয়ে আসেন সামনে। বলেন, কিউ ক্ষেপতা হ্যায়? মুখেছে প্রেম করো, মহবত করো, মুখে চুমা খাও...।

এরপরই লেগে যায় দুই উত্তাপজি অর্থাৎ দয়াল সিং আর নারায়ণ সিংয়ের মধ্যে। হিন্দি-ইংরেজি ছেড়ে এখন তারা আপন মাত্তাষায় একে অপরের গুষ্টি উদ্ধার করতে থাকেন। ক্যাপ্টেন দয়াল সিংয়ের এক কথা, আই উইল নট স্পেয়ার মাই এফ.এফস্স. ইউ ক্যান গো টু হেল। নারায়ণ সিংয়ের চ্যালেঞ্জ, ঠিক হ্যায় হাম দেখ লেঙ্গে। নারায়ণ সিং তার পাগলামো আর স্কাপাটে কাজে শামিল হওয়ার জন্য আমাদের নিতে রাজি করাতে পারেন না। দুই শিখ ঝগড়া করতে করতে সময় পার করে দেন। অবশেষে রেগে ভঙ্গ দিয়ে নারায়ণ কেটে পড়েন। দয়াল সিং বিজয়ীর হাসি হেসে বলেন, শালে মুরগি কা আওলাদ ভাগ গিয়া। শালে প্রমোশন চাহতা হ্যায় ইয়ে অপারেশন দেখাকে। হিস্ট্রিয়া তো শালে তুম যাও।

এরপর তিনি তার সাথে আনা নবীন অফিসার ক্যাপ্টেন নন্দার কাছে আমাদের দায়িত্ব বুঝিয়ে দেন। বলেন, ইয়ার, ইট ওয়াজ মাই লাস্ট প্রেট টু মিট ইউ। হেয়ার ইজ ক্যাপ্টেন নন্দা, তু ইজ ইয়োর নেক্সট অফিসার ইনচার্জ অস্ট্ৰেলিয়াটি ইউনিট বেস।

রেশন ও গোলাবারদ ইত্যাদি বুঝে নেয়া হচ্ছে। ক্যাপ্টেন নন্দার সাথে পরিচিতিমূলক সংক্ষিপ্ত আলোচনা হয়। একদম তরুণ কিন্তু তুরুরাতি অফিসার নন্দা, ইউপিতে বাঢ়ি। ভালোই লাগে তাকে। যাবার সময় তিনি বলেন, ওয়েলকে ফ্রেন্স মিট ইউ স্যুন। তাদের গাড়ি চলে যায়।

পিন্টু রাস্তায় দাঁড়িয়ে গজরাটে থাকে নারায়ণের বিরুদ্ধে। বলে, কন তো মাহবুব ভাই, শালা বলে কি, মুখে প্রেম করো, চুমা খাও, শালা উয়ার ওই ভোকড়া দাড়িত কায় চুমা খায়, কায় তাক প্রেম করো!

ঠিকই তো, বলে পিন্টুর কথায় সায় দেই হাসিমুখে। তারপর হাঁটতে থাকি হাইড আউটের দিকে।

২০. ৯. ৭১

হাবিলদার-সুবেদার ষষ্ঠম

পাকবাহিনীর একজন হাবিলদার ও একজন সুবেদার মারা গেছে মাইন বিক্ষেপারে। হাবিলদারটা মারা যায় বারাথানে, সুবেদার গুরুতরভাবে আহত হয়ে পঞ্চাড় যাবার পথে মারা যায়। সে আহত হয় পানিমাছে। ২১ তারিখের সকালে বারাথানে হাবিলদার নিহত হওয়ার খবরটা পাওয়ার পর সমস্ত নালাগঞ্জ আনন্দে ঘেতে ওঠে। পরদিন পানিমাছে সুবেদারের নিহত হবার খবরে ছেলেদের আনন্দ চরম ওঠে। দুটো বিরাট খবর, বড় ধরনের সাফল্য আমাদের জন্য। তাদের ফাঁদে ফেলার জন্য মাইন পুঁতে রাখা হয়েছিলো। তাতে তারা মারা পড়বেই এ ধরনের কোনো নিচয়তা ছিলো না। কিন্তু সঠিকভাবে চিহ্নিত স্থানে মাইন বসানোয় বিরাট

নুটো সাফল্য এলো আগপিচু করে পরপর দুদিনে।

প্রথম মাইন বারাথানে বসিয়েছিলো একরামুল আর মোতালেব গিয়ে। সজিমউদ্দিনের রিপোর্টিংয়ের ভিত্তিতে। পাকসেনারা নিয়মিত টহল দিতে বের হয়। বারাথানের সেই রাস্তায় একটা ছোট বাঁশের সাঁকো, স্থানীয় ভাষায় যাকে বলে খটখটি। তার এ পাশের মাথায় ক'দিন আগে মাইনগুলো এমনভাবে পাতা হয়েছিলো যে, সাঁকো পার হয়ে প্রথম পদক্ষেপটি পড়বে অ্যাটি পারসোনাল মাইন তথা এপি-১৪র ওপর। অন্যান্য দিনের মতো রাজাকার ৪/৫ জনকে সাথে নিয়ে পাকসেনাদের টহলদারি ৮/১০ জনের একটি দল আসছিলো গ্রামের দিকে। মোটামুটি নিরবিঘিন্তিতে হাঁটছিলো তারা ঢিলেচালা ভঙ্গিতে। বাঁশের সাঁকোর ওপর দিয়ে মোটাসোটা হাবিলদার কাঁধে চাইনিজ রাইফেলটা কাত করে ধরে পার হচ্ছিলো। পেছনের সঙ্গীদের সাথে কথা বলছিলো সে হাঁটতে হাঁটতে। সাঁকোটা পার হয়ে প্রথম বাড়নো ডান পা-টা পড়ে তার ক্যামোফ্লেজ করা এপি-১৪ মাইনের ওপর। পা-টা দাবিয়ে পেছন থেকে অন্য পা-টা টান দিতে যাবার সময়ই হাবিলদারের শরীরের পুরো চাপ পড়ে মাইনের ওপর। তাৎক্ষণিকভাবে জীবন্ত হয়ে উঠে মাটির নিচে অপেক্ষমাণ মাইন। প্রচণ্ড বিক্ষেপণে হাবিলদারের পাটা উড়ে যায়, ঝলসে যায় শরীরের ডান অংশ, মুখ পুড়ে যায়। বিকৃত অবস্থায় উক্ত পর্যন্ত উড়ে যাওয়া হাবিলদারকে উক্তার করে পানিমাছ পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ার আগেই সে মারা যায়। ঘটনাটা পানিমাছ ঘাঁটির শক্তবাহিনীর মধ্যে বিস্তৃত এক শোকের ছায়া ফেলে এবং মুক্তিবাহিনীর ফাঁদ পাতা মাইন সম্বন্ধে তাদের নতুন করে ভূষিত করে তোলে। ঘাঁটি ছেড়ে বের হবার ব্যাপারটায় তারা সংযত হ্যাত চায়।

পরদিন সকালেই ঘটে দ্বিতীয় ঘটনাটি। এবার পানিমাছ ঘাঁটির দায়িত্বে নিয়োজিত সুবেদার ঘায়েল হয়ে মারা যায় মাইনের আঘাতে। মুসা গত ১৮ তারিখের রাতে পানিমাছ ঘাঁটির কাছাকাছি পাকসেনাদের টাট্টিখানা আক্রমণ আকৃতিক ডাকে সারা দেয়ার জায়গায় মাইন পুঁত রেখে এসেছিলো অত্যন্ত খুঁকি নিয়ে। এ কাজ করতে গিয়ে মুসা আর তার দলের সাঞ্চীদের সমন্ত শরীর মাখামাখি হয়েছিলো যায়লায়। সারা শরীরে কাপড়চোপড়ে দুর্ঘন নিয়ে ফিরে এসেছিলো ওরা সেদিন। কাজটা ওরা সেদিন সফলভাবে সম্পন্ন করেও খুশি হতে পারে নি, ওদের শরীর, জামা-কাপড় সয়লাব অর্থাৎ খানসেনাদের ত্যাগ করা গা ঘিনঘিন মলে মাখামাখি হয়ে গিয়েছিলো বলে। আর তাই নিয়ে ওদের সেদিন বিরক্তি আর স্ফুর্কতার অন্ত ছিলো না। কিন্তু ওদের পাতা সেই মাইনের আঘাতে দ্বয়ং সুবেদার নিহত হয়েছে এই খবরে আজ ওদের উল্লাস প্রকাশের অন্ত নেই। ধেই ধেই করে নাচ শুরু করে দেয় তারা হাইড আউটের ভেতরেই। জীবনের খুঁকি নিয়ে করে আসা তাদের কাজের পরিণতিতে এ ধরনের সফলতায় তাদের সাথে সাথে পুরো হাইড আউট মেঠে উঠে। মিনহাজ তার সংগ্রহ থেকে একটা গরু জবাই করে ফেলে বড়ো ধরনের একটা খানাপিলার আয়োজনে।

সজিমউদ্দিন খবরটা নিয়ে আসে বিজ্ঞারিত বিবরণসহ। সে অত্যন্ত গ্রাজুল ভাষায় বর্ণনা করে কীভাবে সুবেদারজি মাইনের ফাঁদে ধরা পড়লো। ঘটনাটা এরকমের : ভোরের দিকে সুবেদারের আকৃতিক ডাক চাপায় ঘুমজড়িত চোখে তিনি যান টাট্টিখানায় পানির লোটা হাতে। রাতের যাওয়া ছিলো জবরদস্ত। শুট করা, মুকতে পাওয়া দালালের সরবরাহ করা থাম থেকে কেড়ে আনা উত্তম সামৰ্থ্য দিয়ে তৈরি রাজসিক খানাদান। তো, সুবেদারজি তার নির্দিষ্ট বাস্তার থেকে পেট চেপে ধরে হনহনিয়ে ঘুম ঘুম ঢোকে গিয়ে উপস্থিত হয়েছেন মুসাদের পুঁতে আসা মাইনের

জায়গাটায়। কিছু না ভেবে তিনি বেগ খোলসা করার জন্য বসেছেন কাপড় তোলে। ডান হাতখানা তার লোটার ওপর। এদিকে তার ডান পা ঠিক একটা মাইনের মাথার ওপর। অথবে কিছুই ঘটে নি। সুবেদারজিকে তার পেট খোলসা করবার জন্য একটু কসরত করতে হয় এবং তার ফলে তার শরীরের শক্তি এসে ভর করে ডান পায়ের ওপর। তাতে পায়ের ওপর চাপ পড়ে। পা দেবে যায় মাটির ওপর। ফলে ঘূমন্ত মাইন জেগে উঠে। চাপ প্রয়োগের ফলে মাইনের লিভার গিয়ে আঘাত করে ডেটোনেটের ওপর এবং তাতেই ঘটে যায় প্রচণ্ড একটা বিস্ফোরণ। সুবেদারের মুখ দিয়ে শুধু আর্ডেন্স বেরোয়, মর গিয়া এবং তার ডান পা আর উভয় ডেতে দিয়ে পশ্চাদ্দেশ উড়িয়ে নিয়ে যায় মাইন এপি-১৪। এ বিস্ফোরণের শব্দে সময় ঘাটিতে শব্দ হয়ে যায় দোড়াসৌত্তি ছেটাছুটি। মাইনের আঘাতে রক্তাক্ত ও বিকৃতদেহী সুবেদারকে বাঁচাবার জন্য পঞ্চগড়ের দিকে ছাটিয়ে নেওয়া হয়। স্থানীয় ক'জন মানুষও তাদের এ কাজে সহযোগিতা করে। কিন্তু সুবেদার পঞ্চগড় যাওয়ার আগেই শেষ। আগের দিন হাবিলদার, পরদিন সুবেদার— পাকবাহিনীর দুটো বড়ো ধরনের শিকার জমা হয় আমাদের ক্ষেত্রিটে।

নবাগত এক-এক দল এবং ঝীকৃতির আনন্দ

জয় বাংলা হাটে হাইড আউট স্থাপনকারী মুক্তিযোদ্ধাদের দলটির সাথে যোগাযোগ করা প্রয়োজন। হয় তারা চলে যাবে এ এলাকা ছেড়ে, নয় অস্থায়ের কমান্ডের সাথে যৌথভাবে তাদের অপারেশনাল সমন্বয় ঘটাতে হবে। এ এলাকায় ড্রেক এবং স্বাধীনভাবে বিচ্ছিন্নধারায় তারা অপারেশন পরিচালনা করতে পারবে না। এতে স্বত্ত্ব যে-কোনো সময় একে অপরের মধ্যে গোলাগুলি বেধে যাওয়াও বা সেমসাইটের ঘটনাক্ষেত্রে যাবার রয়েছে সমূহ সম্ভাবনা। সম্ভাব্য পর রঙনা দিই তাদের হাইড আউটের উদ্দেশ্য স্থাথে থাকে মুসা-একরামুলসহ সশস্ত্র একটা দল। বলা যায় না, তাদের অভ্যর্থনার ধরন ক্ষেত্রে হবে। প্রয়োজনে নিজেদের টিকিয়ে রাখার জন্য যথেষ্ট পরিমাণ শক্তি দরকার। সেন্ট্রুনেয়া হয়েছে সাথে। প্রায় মাইল চারেক হাঁটতে হয়। ঘুটঘুটে অক্ষকার রাত। আকাশে সেব নেই। চকচকে তারকারাজির নিচে ভেজা ঘাস মাড়ানো রাস্তায় হাঁটতে পৌছে যাওয়া যায় রাত নটার দিকে তাদের হাইড আউটের কাছাকাছি। পিন্টুকে বলি, গলা ছেড়ে গান ধরো, আমরা যে এসেছি, সেটা ওদের জানান দেয়া দরকার। তা নাহলে অক্ষকারে আমাদের দলকে এভাবে এগুতে দেখলে শুলিবর্ষণ শব্দ করবে ওরা। সদ্য ট্রেনিং থেকে এসেছে, যুদ্ধ সম্পর্কে এখনো তারা নবীন। কথামতো পিন্টু তার স্টেনগানটা পিটারের মতো করে ধরে উদাস কঠে গান গেয়ে ওঠে, আগুন জ্বালো, আগুন জ্বালো...।

কালো অক্ষকার রাতে চলমান পথের আশপাশে, আকাশে-বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে পিন্টুর গভীর সুরেলা গলার উদ্বিষ্ট গানের ধ্বনি। সমস্ত পরিবেশটাই যেনো বদলে যায়। গান গাইতে গাইতে আমরা ঢুকে পড়ি তাদের হাইড আউটে। সেন্ট্রু বাধা দেয় না। একটা উচ্চ মতো টিনের ঘরে বেশ জমিয়ে আস্তানা গেড়েছে নবাগত এই দলটি। বাড়ির আডিনায় দাঁড়াতেই হারিকেন হাতে কয়েকজন এগিয়ে আসে।

— আপনারা কে? কোথা থেকে আসছেন? এ প্রশ্নের মুখোমুখি হতেই গায়ক পিন্টুর রূপ বদলে যায়। বলে, তাতে কি দরকার? ডাকো তোমাদের কমান্ডারকে। পিন্টুর এ চেহারা দেখে দোড়ে গিয়ে একজন ডেকে আনে তাদের কমান্ডার এবং সহকারী কমান্ডারকে। তবে কথাবার্তা শব্দ হতেই তাদের সাথে প্রাথমিক বোঝাপড়া করার ব্যাপারটা শেষতক বাগড়ার আকার ধারণ

করে। বলতে গেলে শাসানো কষ্টই জিগ্যেস করি, কী মায় আপনার? জবাব আসে, মোখলেস। এখানে কী জন্য এসেছেন? কে পাঠিয়েছে আপনাদের? জানেন না এটা আমাদের এলাকা? আমাদের জানান না দিয়ে আপনাদের কে পাঠিয়েছে এখানে? মোখলেসের পেছনে দাঁড়ানো কুচকুচে কালো চেহারার তার সেকেন্ড-ইন-কমান্ড মুবকটি প্রায় তেড়েমেড়ে ওঠে। কর্কশ গলা তার। বলে, কী দরকার আপনাদের, এখানে কী জন্য এসেছেন? কার পারামিশনে এসেছেন? তার কর্কশ গলা এবং অশালীন বাকতঙ্গিতে মাথায় রক্ত চড়ে যায়। পিন্টু নিজেকে সামলাতে না পেরে স্টেনগান টেনে নেয় কাঁধ থেকে। আমি ওকে ধরে রাখি। মোখলেস তখন বলে, কি ব্যাপার গোলমাল করতে চান নাকি? এখানে আসার জন্য কি জবাবদিহি করতে হবে?

— আলবৎ করতে হবে, পিন্টু ধরকে ওঠে। আমি তাকে চেপে ধরে থাকি। আমাদের পেছনে দাঁড়ানো থাকে মুসাসহ অন্য ছেলেরা। তাদের হাতের হাতিয়ারগুলো তুলে ধরে সোজা করে। মোখলেস তুলনামূলকভাবে বয়ঃক এবং ঠাণ্ডা প্রকৃতির। অবস্থা সে আঁচ করে নেয়ার চেষ্টা করে। আমি বলি, আমাদের এলাকায় একটা নতুন দল এলো, কীভাবে এলো, কারা আনলো, তারা কোথায় যুদ্ধ করবে, কীভাবে যুদ্ধ করবে এটা আমাদের জানতে হবে। তা না হলে তো এ এলাকায় থাকা চলবে না।

— থাকা চলবে না? তার মানে চলে যেতে হবে? মোখলেস ঠাণ্ডা গলায় বলে।

— ইয়েস জেন্টেলম্যান, চলে যেতে হবে বলে মোখলেসকে আমাদের উপস্থিতির ক্রম্ভু অনুধাবন করার সুযোগ দিই।

— এটা কি আপনাদের অর্ডার? মোখলেস তেমনভাবে জিগ্যেস করে।

— ইয়েস অর্ডার বলে ওঠে পিন্টু।

— যদি এ অর্ডার আমরা না মানিং মেইলেস এবার হেসে ফেলে।

— মানতে বাধ্য করানো হবে, পিন্টু তার ভারি দেহ ঝাঁকিয়ে কথা বলে।

— ঠিক আছে দেখা যাবে, অফিস, আপনারা তো মাহবুব তাই, পিন্টু তাই, তাই না! বসেন, এতোদূর এসেছেন কষ্ট করবেন? আমাদের প্রথমেই যাওয়া উচিত ছিল আপনাদের কাছে। কাল যাবো ভেবেছিলাম, আমাদের গোছগাছ করে উঠতে সময় লাগলো, বলে এগিয়ে এসে মোখলেস হাত ধরে। বুক দিয়ে উষ্ণ আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরে। সেই কালো মুবক তখন বলে ওঠে। কী সৌভাগ্য আমাদের! মাহবুব তাই, পিন্টু তাই আপনারা নিজেরাই এসেছেন? টেনিং সেন্টারে মুরতি ক্যাম্পে বছৰার ওস্তাদদের কাছে আপনাদের কথা অনেছি। এই জায়গা কর, খাওয়ার ব্যবস্থা কর। বিরাট মেহমান এসেছেন আমাদের হাইত আউটে। এগিয়ে এসে সেও উষ্ণ আলিঙ্গন করে। বলে, চিনতে পারি নাই, তাই কি বিছিরি ব্যাপার একটা হয়ে গেলো।

অলস্ক্ষণের ভেতরেই জমে যায় তাদের সাথে। পিন্টুর সাথে কালো মুবক হাকিমের তো গ্রীতিমতো বঙ্গভূই জমে ওঠে। চা-নাটা আসে। তারপর এলাকেনা হয় বিস্তারিতভাবে। মুরতি টেনিং সেন্টার থেকে তারা সরাসরি রিপোর্ট করেছে ভজনপুর মুক্তিবাহিনীর সাব-সেন্টার কমান্ডারের কাছে। তিনি কোথায় পাঠাবেন আমাদের তাই নিয়ে ভাবছিলেন। তখন এ এলাকার এম.পি. যান সেখানে। সার-সেন্টার কমান্ডারকে বলেন, বেরুবাড়ি এলাকাটা ফাঁকা রয়েছে, সেখানে একদল এফ.এফ. পাঠানো দরকার। তখন তিনি আমাদের এখানে পাঠিয়ে দেন। আসবাব সময় তিনি বলে দিয়েছেন, চাউলহাটি ইউনিট বেসের এফ.এফ. অর্থাৎ আপনাদের সাথে সময় করে কাজ করতে। তিনি এটাও বলে দিয়েছেন, কোনো রাজনৈতিক নেতার

কথামতো আমরা যেনো পরিচালিত না হই। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর অধীনে থেকে আমাদের সব ধরনের তৎপরতা পরিচালিত হবে। সাব-সেক্টর কমান্ডার সব ব্যাপার দেখবেন। আমাদের রেশন-গোলাবারুদ্দিসহ সবকিছুই আসবে তার মাধ্যমে। মোখলেস তাদের এখানে আসবার প্রেক্ষাপট বর্ণনা করে। তাকে ভালো লেগে যায় পরিকার প্রতিশীলমনা ধীরঙ্গিত যুবক বলে। এরা ভিন্ন কমান্ডের অধীনে হলেও কোনো ক্ষতি নেই। এদের লোকবল অস্ত্র-গোলাবারুদ্দ এসব এ অঞ্চলে আমাদের শক্তি বৃদ্ধি করবে নিঃসন্দেহে। এরা এলাকায় থাকলে আমাদের দায়িত্ব অনেকটা হালকা হয়ে যাবে। হাড়ভাসা এলাকায় অপারেশনে যৌথভাবে কাজ করা যাবে এখান থেকে। আলাপে আলাপে রাত হয়ে যায়। পিন্টু তাদের অনুরোধে বেশ কঢ়া গান শোনায়। রাত বেড়ে যায়। ওদের সাথে শরিক হতে হয় রাতের আহারপর্বে। রাত প্রায় ১২টায় ফিরতি পথ ধৰি। পিন্টুকে খুব খুশি খুশি লাগে। হালকা গলায় বলে, ছেলেগুলান ভালো কি কৰ মাহবুব ভাই! অঙ্ককারে মাথা নেড়ে সায় দিই আমি। একটা কথা, বলে পিন্টু বিড়ি ধরায়, আমাকে দেয়। তারপর গাঁজা টানার মতো করে লোচ টান দিয়ে বলে, ওরা কি বলছিলো, জনেছেন?

— কী বলছিলো? জিগোস করি।

— এই যে, মুরতি টেনিং সেটারের কথা, ওস্তাদরা নাকি ট্রেনিংয়ের সময় আমাদের কথা, আমাদের অপারেশনের কথা ওদের বলতো।

— হয়তো বলেছে। বলার মতো তুমি আমি আমরুচিরাই হয়তো কাজ করেছি একমাস। পিন্টু তখন আর কিছু বলে না। নীরবে হাঁটে। তখন পিন্টুসহ অন্যদের বলি, আসলে এটাই হচ্ছে আমাদের স্বীকৃতি। আমরা দুঃখ পাছি আমাদের খোজ নিছে না কেউ বলে, অথচ দেখে পাহাড়ের মাথায় তিন হাজার পেট ওপরে আমরা ঠিকই আলোচিত হচ্ছি। কাজ করলে তার স্বীকৃতি অবশ্যই পাওয়া যায়। এটার জন্য কারো কাছে যেতে হয় না। দেনদরবার করতে হয় না। মানুষ আপনার পানিই সেটা জেনে যায়।

আমার বলে যাওয়া কথাগুলো পেছোরা মন দিয়ে শোনে। খুশি হয়। আমরা এসেছিলাম এদের সাথে বোৰাপড়া করে সেটার এখান থেকে উচ্ছেদ করে দিতে। কিন্তু ওরা থেকে গেলো আর আমরা ওদের কাছ থেকে পাওয়া প্রাণচালা স্বীকৃতির আনন্দ আর ভালো লাগার অনুভূতি নিয়ে ফিরে যাচ্ছি।

তখন মধ্যরাতের প্রচণ্ড যুদ্ধ শুরু হয়েছে। অমরখানায়-জগদলহাটে। আমরা সেই রণাঙ্গনমুখো হয়ে ফিরছি আমাদের আশ্রয়ের দিকে।

২৩. ৯. ৭১

বৃষ্টি মানেই যুক্তে যাওয়া

মোখলেস খবর পাঠিয়েছে একদল পাকসেনা এসেছে হাড়ভাসায়। রাতে তাদের আক্রমণ করে হাটিয়ে দিতে হবে, এজন্য সাহায্য দরকার। একদল এফ.এফ.সহ সক্রে পরপরই যেনে আমরা হাজির হই ওদের নতুন হাইড আউটে। রাতে আমাদের অন্য নির্দিষ্ট একটা কাজ ছিলো। পানিমাছের পেছনে, পঞ্জগড়ের রাস্তায় বিসমনিতে এ.টি.এম তথা অ্যান্টি ট্যাঙ্ক মাইন লাগানোর পরিকল্পনা রয়েছে রাতে। পানিমাছ-হাড়ভাসগামী পাকবাহিনীর একমাত্র চলাচল পথ পঞ্জগড়-হাড়ভাসা জেলা বোর্ডের রাস্তায় কিছু চিহ্নিত জায়গায় এ.টি.এমসহ এপি-১৪ লাগানোর একটা নিরিডি পরিকল্পনা তৈরি করা হয়েছে। রাস্তাটির মাঝে মাঝে

মাইন ফিল্ড স্থাপন করে শক্তকে তার ফাঁদে আটকাতে হবে এবং তাদের একমাত্র যোগাযোগের লাইফ লাইন বন্ধ করে দিতে হবে। সেই পরিকল্পনার অংশ হিসেবে আজ রাতে বিসমনিতে মাইন পাততে যাবার কথা। মোখলেসের ডাক এসেছে। তাকে কথা দেয়া হয়েছে, সে ডাকলেই আমরা যাবো। এছাড়া একেবারে নবিশ রঙরঞ্জনের নিয়ে এককভাবে যুদ্ধ করাও ওদের পক্ষে সম্ভব নয়, যেখানে ওদের প্রায় ঘাড়ের কাছে শক্ত এসে হাজির হয়েছে। ফ্রন্টে অভিজ্ঞ হিসেবে তাদের সহযোগিতার জন্য যাওয়াটা একান্তভাবে আমাদের জন্য জরুরি। পিন্টুকে নিয়ে ১৪ জনের একটা শক্ত দলসহ রঙনা দিই মোখলেসের হাইড আউটোর উদ্দেশ্যে। মুসা-একরামুলও থাকে। অন্যান্য হাতিয়ার-গোলাবাকুদের সাথে অ্যান্টি ট্যাঙ্ক মাইন নেয়া হয় তিনটা। রাতে সেগুলো পাতা হবে পানিমাছগামী সড়কে।

যাঘড়া বি.ও.পির কাছাকাছি একটা পরিত্যক্ত বাড়িতে পাওয়া যায় মোখলেসদের। তাদের ডাকে সাড়া দিয়ে আমাদের এই যে উপস্থিতি, তাতে করে তারা খুবই আনন্দিত হয়। যুদ্ধের মাঠে পাশাপাশি দুটো দলের এই কমরেডশিপ তাদের সবাইকে উৎসুলিত করে। এটা তাদের মধ্যে অনুকরণীয় একটা শিক্ষাবোধের ও জন্ম দেয় সম্ভবত। এরপর আমাদের ডাকে তারাও নিশ্চয়ই আসবে।

মেঝেয় পাতা শুকনো খড়ের গাদা। তার ওপরে বসে রাতের অপারেশনের পরিকল্পনা চূড়ান্ত করার কাজ চলে। মুসা-একরামুলসহ মোখলেসকে সেকেন্ড-ইন-ক্যাল্ড হাকিম ছেলেদের যুদ্ধের সাজ পরাতে থাকে। টিমটিমে একটা কুপ জুলে। তাতে ঘরের বাশের ভাঙচোরা দেয়ালে চলমান ছেলেদের ছায়া পড়ে। ছায়াটিলো কাঁপে, স্থির হয়, নড়াচড়া করে। বাইরে বিদ্যুৎ চমকে চমকে ওঠে। বিকেল থেকে আকাশ গভীরভাবে মুখ ভার করে ছিলো। একটা গুমোট গরম। সঙ্কার মুখে আকস্মীয় ঘনকালো রূপ দেখে মনে শঙ্কা জাগছিলো, হয়তো বৃষ্টি আসবে। বাইরে এখন তেক্ষণস্থানে বিদ্যুৎ চমকের সাথে মেঘ ডেকে ওঠে। যে বৃষ্টি আসি আসি করছিলো, সেটি আবার এসে যায়, প্রথমে ছিটকেটা ধরনের। তারপর শুরু হয় বৃষ্টি অবোরধারায়। মোখলেস তখন হতাশ হয়ে পড়ে। বাইরে বৃষ্টির দিকে তাকিয়ে সে বলে, এখন কী হবে! বৃষ্টি এলো যে?

— আসুক না, বলে তার মনোযোগ আকর্ষণ করি যুদ্ধ পরিকল্পনার দিকে। সে কিছুক্ষণ শোনে পরিকল্পনাটা; কিন্তু তেমন মন দিতে পারে না যেনো। বলে, বৃষ্টি এলো যে, অপারেশনে তো যাওয়াই যাবে না।

— ঠিক আছে দেখা যাবে, বৃষ্টিতে কিছু যাবে আসবে না। অপারেশনের ব্যাপারস্যাপারণগুলোও আগে ঠিক করে নিই বলে তাকে আবার মনোসংযোগ করতে বলি পরিকল্পনায়।

— না, হতাশ হয়ে সে বলে, বাইরে কি বৃষ্টি এসেছে দেখেছেন? এর মধ্যে তো অপারেশনে যাওয়াই যাবে না, প্র্যান করে কী হবে?

আড়চোখে পিন্টুর দিকে তাকাই। সে রেগেছে। চোখে তার খরখরে দৃষ্টি। পাশে এসে বসা মুসা-একরামুলের মুখেও বিরক্তি। তখন আমি মোখলেসসহ তার অধীনস্থ কমান্ডারদের বলি, যুদ্ধের মাঠে, বিশেষ করে বাংলাদেশের গেরিলা যুদ্ধের এ পর্যায়ে একটা কথা প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে, সেটা হচ্ছে, বৃষ্টি মানেই অপারেশন, বৃষ্টি মানেই যুদ্ধ-যাওয়া। জেন্টেলম্যান আপনারা যুদ্ধ করতে এসেছেন, গেরিলা যুদ্ধ। যুদ্ধের অধিক্ষেপ্তা বুঝতে হবে, বাস্তব যুদ্ধক্ষেত্র সহজে

জানতে হবে, শক্তির অভ্যাস সম্বন্ধে জানতে হবে। শক্তি এসেছে একটা নিদিষ্ট শক্তিসহ, তাদের মোকাবেলা করার জন্য আমাদের যুদ্ধের দিকে দৌড়ে যেতে হবে অবস্থা যা-ই হোক, যুদ্ধের ব্যাকরণ তা বলে না। গেরিলা যুদ্ধে শক্তির অভ্যেসটা জানা অত্যন্ত জরুরি। ঝড়বাদল বৃষ্টির মধ্যে আমাদের শক্তি অর্থাৎ পাকসেনার দল কোনো অবস্থাতেই তাদের শেল্টার ছেড়ে বেরোয় না, বেরুবে না। এটাই তাদের অভ্যেস আর দুর্বলতা। ওরা যখন তাদের শেল্টারের মধ্যে আবদ্ধ থাকবে, তখনই তো আমাদের বেরুতে হবে। ওরা ঝড়-জলে অভ্যন্ত নয়, পানি-কানায় অভ্যন্ত নয় দেখে বেরোয় না, কিন্তু ঝড়-বাদল, পানি-কানায় বেরুতে আমাদের কোনো অসুবিধা নেই। সুতরাং বৃষ্টির আড়াল নিয়ে মোটামুটি নিচিতে এগিয়ে যাওয়া যায় ওদের অবস্থানের দিকে। শক্তিকে হামলা করা যায় তাদের অগোচর। যেটা শক্তির দুর্বলতা, সেটাই আমাদের সফলতার উত্তম উৎসরূপ। সুতরাং ঝড়-বৃষ্টি আসুক, সারাবাত বরুতে থাক কোনো অসুবিধা নেই। আমরা অপারেশনে যাবো, পিংজ পেট রেডি উইথ ইউর ম্যান। মোখলেস ব্যাপারটা বুঝে নেয়; কিন্তু পেছন থেকে একজন বলে ওঠে, বৃষ্টিতে ভিজতে হবে নাকি? বৃষ্টিতে ভিজলেই তো জামা-কাপড় ভিজে যাবে, ঠাণ্ডা লাগবে। ছেলেটার দিকে তাকাই। আমের কোনো জোতদার পরিবারের আদুরে ছেলের মতো লাগে তাকে। বলি তাকে মুখে হাসি ধরে রেখেই, তা হলে তুমি যেও না, যদি ঠাণ্ডার দোষ থেকে থাকে।

— না, না তা বলছি না বলে ছেলেটা চুপ করে যায়। স্বত্ত্বাঙ্ক একজন যেনো একক্ষেত্রে মতো বলে বসে, বৃষ্টির দিনে খানেরা বের হয় না, এমন কোনো সুযোগ আছে; তাকেও সেভাবে বলি, চলো না পরীক্ষা করে দেখবে। এদের কথাবার্তা এক্সেন্ট বিলাসী জীবনযাপনের সচেষ্ট প্রয়াস ভালো লাগে না। এদের প্রশ্নের ধরন এবং বেয়াভিন্ন ব্যবহারও মনকে বিশুল্ক করে তোলে। মনে হয়, না এলেই বুঝি ভালো হতো। স্বত্ত্বাঙ্কের অপচয়। আমরা নিজেরা হলে পরিকল্পনা অনুযায়ী চমৎকার অপারেশন চালিয়ে সেতাম। বৃষ্টির এই কালো দুর্ঘাগপ্রণ রাতেও। মোখলেসকে বলি, আমরা আসি স্বত্ত্বাঙ্কে আপনার ছেলেরা বৃষ্টিতে ভিজতে চায় না। একটু বসেন, বলে সে তার ছেলেদের সাথে আলোচনায় বসে অন্য ঘরে, আমরা এগ ভর্তি চাগলাধ়করণ করতে থাকি। তখন রাত ১০টার মতো সময়।

মোখলেস ফিরে আসে কিছুক্ষণের মধ্যে। বলে, যাবো।

— ঠিক আছে রেডি হন তাড়াতাড়ি বলে আমরা ঝড়ের গদিতে শুয়ে থাকি। বাইরে একটানা ঝরবর শব্দ তুলে বৃষ্টি বারেই চলেছে। মনে হয় এ ধারা চলবে সারাবাত। মোখলেস তার ২০ জনের দল তৈরি করে। মুসা-একরামুলকে মাইনগুলো বুঝিয়ে দেবার পর তাদের সাথে ৩ জনের একটা দল দিয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিই। পানিমাছের কাছাকাছি গিয়ে তারা আগেভাগে মাইনগুলো বসিয়ে ফেলবে। হাড়িভাসায় খানসেনারা থাকলে তারা হয়তো রাতেই পিছু হটে যাবে। যাবার সময় পড়বে মাইনের ট্যাপে। ওরা বেরিয়ে যায় নিদিষ্ট কাজ নিয়ে কোনো প্রশ্ন না তুলে। তাদের গমনপথের দিকে তাকিয়ে মনে হলো, ডিসিপ্লিন অর্থাৎ শৃঙ্খলাবোধটাই হচ্ছে মূল কথা। সেই সাথে থাকতে হবে কমাভারের প্রতি বিশ্বস্ততা। এটা যুদ্ধের মাঠে একান্তভাবে প্রয়োজন। যুদ্ধের বাইরেও এর প্রয়োজন রয়েছে সর্বক্ষেত্রে, কিন্তু যুদ্ধের মাঠেই এর কার্যকারিতা সব থেকে বেশি।

রাত এগারোটায় মোখলেসের দলকে নিয়ে বের হই। হাড়িভাসার কাছাকাছি গিয়ে তারা দ্বিখণ্ডিত হয়ে পড়ে। ক্ষেত্র পাঠিয়ে যুদ্ধের ব্যাকরণ অনুসরণ করে এগুতে চায় তারা। তাই

ঠিক আছে, বলে ওদের মতো করে কাজ করবার স্বাধীনতা দিয়ে আমরা আকাশভাঙ্গ বৃষ্টি মাথায় করে বসে থাকি রাস্তায় পিঠ ওপর করে দিয়ে মুখ নামিয়ে। পিন্টু বলে, কি জইন্যে আইসন্লো এমার সাথে? এমরাতো টেনিং সেন্টারের মহড়া শুরু করে দিছে।

— কি আর করা যাবে বলো, ওদের কমাত ওরাই চালাক। দেখা যাক না কি করে! পিন্টুর কথার জবাবে তাকে ঠাণ্ডা করতে চাই। তেতে আছে সে খুব ওদের ওপর। কিন্তু তার বহির্প্রকাশ করবার সময় এটা নয়। ওকে বলি, বিড়ি খাবা!

— এই বৃষ্টির মধ্যে বিড়ি কোথায়? সব তো ভিজিয়া নাশ, বলে সে নিরাসক গলায়।

— আছে পলিথিনে ঘোড়া একাবরের কাছে। এরপর অবোর বৃষ্টি মাথায় নিয়েও বিড়ি ফোকা চলতে থাকে। মুদ্র আমাদের কতো কিছু শিখিয়েছে। আর এর মধ্যে বৃষ্টিভজা বাদল দিনে কীভাবে মুখ নিচু করে বিড়ি-সিগারেট টানতে হয়, ছেলেদের তাতে অভ্যন্ত হওয়ার ব্যাপারটা অন্যতম।

হাড়িভাসায় আদৌ কেউ আছে কি না মোখলেসের ক্ষট পার্টি সেটা জেনে আসতে পারে নি। সুতরাং হাড়িভাসা দখলের জন্য শুরু করতে হয় তুমল গোলাগুলি। একত্রফা এই গোলাগুলি চলে আধা ঘটা ধরে। কিন্তু ওপাশ থেকে কেউ সাড়া দেয় না। আর তাই আমরা সরাসরি হাড়িভাসায় উঠে যাই। না, কেউ নেই। মোচামুটি ফাঁকা মাঠে গোল দেয়ার মতো করেই মোখলেসের দল হাড়িভাসা দখলে নেয়। আর এটা করেই তারা যুদ্ধজয়ের স্বাদ পেয়ে যায়। বৃষ্টিতে কাকভেজা অবস্থা সবার। পার্টি-সেটের একটা প্রেট্রল পার্টি সকালের দিকে এসেছিলো হাড়িভাসায়। ফিরে গেছে তারা বিকলেই। এখন আর কোনো কাজ নেই। বৃষ্টিস্বাত শরীরে মাঝরাতে ফিরে আসি তাদের হাতড় আউটে।

সেখানে অধীর অপেক্ষায় বসে থাকতে দেখা যায় ইসমাইলকে। কী খবর, কেনো এসেছিস, কে তোকে পাঠিয়েছে? একবারে এক সাথে জিগোস করি তাকে শঙ্কা মেশানো চিপ্পে নিয়ে গলায়। ইসমাইল বলে ক্ষেপণী ভাই পাঠিয়েছে। বড় ভাইয়ের একটা চিঠি আছে, কথাটা বলেই সে এগিয়ে দেবে সেটা। চিঠি নয়, একটা চিরকুট। তাতে লেখা, কাম পজেটিভি এ্যাট চাউলহাটি। ক্যাপ্টেন নন্দা আসক্রত ইউ টু রিপোর্ট চাউলহাটি বাই নাইন মার্নিং শার্প। পিজ বিং দা ডকুমেন্টস ইউ ক্যাপচারড ফর্ম কিলিং অব হাবিলদার এ্যান্ড সুবেদার। বিশেডিয়ার যোশী উইল মিট ইউ। দিস ইজ মোষ্ট আরজেন্ট। অর্ধাং কাল সকালের মধ্যেই চাউলহাটি যেতে হবে। বিশেডিয়ার যোশীর সাথে বৈঠক আছে। যাবার সময় সুবেদার আর হাবিলদারের নিহত হওয়া সংক্রান্ত প্রমাণাদি নিয়ে যেতে হবে। পিন্টুকে চিরকুটটা দেখাই। পড়তেই তার মুখে চিত্তার রেখা ফুটে উঠে। বলে, কেনো ডাকলো যোশী আমাদের? সুবেদার-হাবিলদার নিহত হওয়ার কোনো প্রমাণ শো করবার মতো কোনো কিছু তো আমাদের হাতে নেই। ওকে ডেকে পাশে খড়ের নরম বিছানায় শোয়াই। বলি, রাতটা শেষ হতে এখনো দেরি আছে, এসো বাকি রাতটা ঘুমনো যাক। সকালে দেখা যাবে কী করা যায়।

২২. ৯. ৭৩

ডেতরে যেতে হবে, আরো ডেতরে

কাকডাকা ভোরে মোখলেসের কাছ থেকে বিদায় নিই। নালাগঞ্জে ফিরতে রোদ উঠে যায়। পিন্টুকে বলি, খোঁজ নাও কি পাওয়া যায়। থুকরাবাড়ির মুক্তি দখলকৃত চাইনিজ হাতিয়ারটা

ছিলো সাথে গুলিসহ। পাঞ্জাব রেজিমেন্টের ক্যাপটা জমা দেয়া হয় নি। চাইনিজ হাতিয়ার, গোলাবারুদ, শক্তর ক্যাপ আর থাকি ইউনিফর্ম এগুলো একসাথে তুলে দেয়া হবে ক্যাপ্টেন নদ্দার হাতে। নদ্দা সেগুলো তাঁর মতো করে উপস্থাপন করবেন ব্রিগেডিয়ার যৌশীর কাছে।

মিনহাজ তাড়াছড়ো করে নাস্তা দেয়। নাকে-মুখে কোনোমতে তা গুঁজে মুসা এবং আরো পাঁচজনকে নিয়ে রওনা দিই গড়ালবাড়ি উদ্দেশে। গড়ালবাড়ি থেকে রিকশায় জলপাইগুড়ি রাস্তায়। সেখান থেকে বাসে করে চাউলহাটি। বেলা তখন নটা পার হয়ে গেছে। দুর্ঝ দুর্ঝ বুকে চাউলহাটি পুরুর পাড়ের হেড কোয়ার্টারে এসে পৌছাই।

অধীর আঘাহে অপেক্ষা করছিলেন নদ্দা আর বড় ভাই। আমাদের দেখে তারা যেনো হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন। আমাদের পৌছানোর প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে আসেন ব্রিগেডিয়ার যৌশী। বেশিক্ষণ থাকেন না তিনি। ক্যাপ্টেন নদ্দার তাঁবুতে বসে তিনি তার নতুন পরিকল্পনার কথা বলেন। তিনি বলেন, পাকিস্তান সরকার জাতিসংঘসহ পৃথিবীর অন্যান্য দেশকে বোঝাতে চাইছে যে, বাংলাদেশের জনগণের জীবনে কোনো অশান্তি নেই। তারা পাকিস্তানকে ভাঙ্গতে চায় না। বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্থাৎ জয় বাংলার জন্য তাদের কোনো আকাঙ্ক্ষা-আকৃতি নেই। পূর্ব পাকিস্তান এখন ঠাণ্ডা। কেবল ইতিয়ান গর্ভন্মেন্ট পাকিস্তানকে ভাঙ্গার জন্য বর্জার এলাকায় নাশকভাবে তত্পরতা চালিয়ে যাচ্ছে। তাদের বক্তব্যের সত্যতা প্রতিষ্ঠা করার জন্য ডেকে এনেছে তারা জাতিসংঘ টিমসহ বিদেশী সংবাদিত্বাব্দীতে তারা তাদের বর্জারে বর্জারে নিয়ে আসছে। পাকিস্তানিদের এই প্রোগ্রাম নস্যার ক্ষমতা জন্য আমাদের পাটা ব্যবস্থা নিতে হচ্ছে। তোমাদের একটা দলকে ভেতরে চুক্তেহস্ত, আরো ভেতরে। পারলে সৈয়দপুরের কাছাকাছি পর্যন্ত যেতে হবে। এ দলের জন্ম টিম্বাচিত কমাত্তার, নদ্দার সুপারিশ অনুযায়ী মাহবুব তুমি। বাছাই করা ছেলেদের নিয়ে কিল গঠন করা হবে। তাদের নিয়ে যতোটা সন্তুষ ভেতরে চুক্তে। ইফ ইউ ফাইড এ্যামিন্টেশন ডেলিপেট, এ্যানি ইউ এন মিশন, এ্যানি ফরেন জার্নালিষ্ট অর লোকাল জার্নালিষ্ট, কোম ইফ ইউ ফাইড এ্যানি সাইকেলম্যান, ইউ কিল হিম। তাদের দেখাতে হবে, বর্জার এলাকায় তারা শান্তি এনেছে বলে যে দাবি করছে, তার অবস্থা কেমন। ইউ গো ডিপ ইন ইয়োর কান্ট্রি এ্যাজ ফার এ্যাজ পসিবল, মেক হ্যাভোক এ্যান্ড হৱ্, কিল এভির ওয়ান হ ইজ এগেনেন্ট আস। মেক দা লাইফ হেল ইনসাইড দেয়ার ওকুপায়েড টেরিটরি। ডোন্ট হেজিটেট টু ডু দিস বাই নো মিন্স্ব।

যৌশীর তাড়া ছিলো, বক্তব্যশেষে তিনি আমাদের সাফল্য কামনা করেই উঠে দাঁড়ান। দাঁড়াতেই নদ্দা তাকে দেখান পাকসেনার হত্যা সংশ্লিষ্ট আমাদের বয়ে আনা প্রমাণাদি। চাইনিজ হাতিয়ারটা নেড়েচেড়ে তিনি বলেন, ইয়েস, বয়েজ, ওয়েল ডান। আশা করি, বর্তমান মিশনেও তোমরা সফল হবে। নদ্দা তোমাদের নতুন এই মিশন সহজে বুঝিয়ে দেবে সবকিছু। শুভ বাই, জয় বাংলা।

যৌশী চলে যান। আমরা নদ্দার তাঁবুতে বসি। তিনি তার ফিল্ড ম্যাপ টেবিলের ওপর বিছিয়ে বুঁবিয়ে দিতে থাকেন আমাদের এই মিশনের খুঁটিনাটিসহ বিস্তারিত সব দিক। নতুন এই দলকে অপারেট করতে হবে ডানে বোদা থানা, বাঁয়ে দেবীগঞ্জ থানার মধ্যবর্তী স্থানে। অপারেশনের এলাকা বিস্তৃত হবে ঠাকুরগাঁওয়ের খানসামা থেকে সৈয়দপুর পর্যন্ত। এজন্য সীমান্ত এলাকার কাছাকাছি থেকে নয়, চুক্তে হবে আরো গভীরে। মুক্তিবাহিনীর অস্তিত্ব রয়েছে এবং জয় বাংলার জন্য মুক্তিযুদ্ধ চলছে, এটা অধিকৃত এলাকার গভীরে সিয়েই জনগণ এবং দখলদার কর্তৃপক্ষকে

বুঝিয়ে দিতে হবে। এজন্য নিতে হবে প্রাচুর ঝুকি, পরিশৃম করতে হবে অসম্ভব। মাথা ঠাণ্ডা রেখে নিজেদের বাঁচিয়ে করতে হবে অপারেশন। এ মিশনের টার্গেট হবে অধিকৃত এলাকার সবকিছু। বিদেশী মিশন, কূটনৈতিক ব্যক্তিবর্গ, বিদেশী সাংবাদিক, সিভিল পরিবহন ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত সব ধরনের যানবাহন, এমনকি একজন সাইকেল আরোহী পর্যন্ত। প্রাচুর কাজ করতে হবে, সবকিছু ধর্ম করে দিতে হবে, রাস্তাঘাট, যোগাযোগ ব্যবস্থাসহ ভেতরের স্বাভাবিক জীবন প্যারালাইজ করে দিতে হবে। রিপোর্ট পদ্ধতি থাকবে আগের মতোই। মানিকগঞ্জ বি.ও.পি.তে এসে নিয়মিত রিপোর্ট করতে হবে। অস্ত্র-গোলাবারুন্দ-রেশনসহ অন্যান্য সরবরাহ যাবে এখনকার ব্যবস্থা অনুযায়ী। আপাতত মানিকগঞ্জ বি.ও.পি. দিয়ে সীমান্ত পার হয়ে ভেতরে ঢুকতে হবে, এরপর হাইড আউট খুঁজে নিয়ে অপারেশন পরিকল্পনা করতে হবে। এই এলাকাটায় এখন পর্যন্ত মুক্তিবাহিনীর তৎপরতা শুরু না হওয়ায় জায়গাটা ফাঁকা রয়েছে। শক্তির অবস্থান নয়াদিঘি, সাকোয়া, বোদা, শালডাঙ্গা, দেবীগঞ্জ— এ জায়গাগুলোর ওপর ব্যাপক আঘাত হেনে তাদের ব্যতিব্যন্ত করে রাখতে হবে এবং তাদের ক্ষতিসাধন করতে হবে। দালাল শাস্তি কমিটির লোকজনকে নির্মূল করতে হবে।

ক্যাটেন নদা তার ত্রিফিং শেষ করেন। করেই আমার দিকে তাকিয়ে বলেন, মি. মাহবুব ইউ আর সিলেকটেড দিস মিশন কমাত্তার ফর বেস্ট রিজন্স। তুমি প্রথমে ৩০ জনের দল নিয়ে এ মিশনে যাবে। পরে প্রয়োজন অনুযায়ী তোমাকে নিউম্ফোর্সমেন্ট করা হবে। নিজের ক্ষোভের ছেলেদের ভেতর থেকে নুরুল হকের সাথে ভ্রালোচনা করে দল গঠন করবে। এ দলের জন্য হাতিয়ার থাকবে .৩০৩ রাইফেল ১৮টা এস.এল.আর. ৬টা, টেনগান ৪টা সেই সাথে পরিমাণমতো গোলাবারুন্দসহ অন্য ড্রেপস্ট্রাইডি। আজ রাতেই মুভ করতে হবে। কালকের মধ্যেই পৌছুতে হবে নির্ধারিত জায়গায়। কিন্তু হলে কি হবে, নতুন মিশনের জন্য বরাদ্দকৃত অন্ত আমার মনোপূত হয় না। তাই অত্যন্ত পঙ্কজে একটা এল.এম.জি. আর একটা ২ ইঞ্জিন মার্টাৰ দেয়ার জন্য অনুরোধ করুন। রাজি হন নন্দা। বলেন, ঠিক হ্যায়, এগুলো দেয়া হবে হেড কোয়ার্টার থেকে। বাকি অঙ্গুলো তোমরা হাইড আউট থেকে নিয়ে আসবে।

দুপুরের পর যাত্রা করে ফিরে আসি নালাগঞ্জে। এরপর গোছগাছের পালা। সন্ধ্যার পর রাতের আহারশৈষে নালাগঞ্জ থেকে রওনা দিই আমরা। রওনা দেবার সময় অবশ্য একটা শোকাবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় সবার মধ্যে। যারা থেকে গেলো এবং যারা বিদায় নিচ্ছে উভয় দলের মধ্যে বিদ্যায়কালীন চিরন্তন শোক প্রকাশের ব্যাপারস্যাপারগুলো বহিপ্রকাশ ঘটতে থাকে। উক্ত আলিঙ্গনে পিন্টু জড়িয়ে ধরে। হাত দিয়ে চোখের পানি মোছে। অন্য ছেলেরাও তাদের বক্সুদের একে অপরকে জড়িয়ে ধরে তাদের অবদমিত কান্নার উচ্ছ্঵াস নিয়ে। বাচ্চা ছেলের মতো হাউমাউ করে জোরে জোরে কাঁদতে থাকে হাফেজ। পিন্টুর সাথে মুসা থেকে গেলো। থেকে গেলো চৌধুরী-মোতালেসহ পোড়-খাওয়া সাহসী ছেলের দল। পিন্টু তবুও যেনে কেমন মিহয়ে যায়। তার পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলি, এবার তোমাকে একক নেতৃত্ব নিয়ে চলতে হবে পিন্টু। মাথা ঠাণ্ডা রেখে হিসেব করে চলবে। পার করে আসা দিনের অভিষ্ঠতার পথ ধরে চললে, চমৎকারভাবে পেরে যাবে তুমি, দেশো। আবেগমথিত বিষণ্ণ গলা পিন্টুর, কি জানি কি হবে? আপনি গেলে বড়ো একা হয়ে যাবো মাহবুব ভাই।

দীর্ঘদিন পর ছাড়াচাড়ি হয় পিন্টুর সাথে। পিন্টুর সার্বক্ষণিক সঙ্গ একটা অভ্যন্তরীণ দীর্ঘিয়ে গিয়েছে, এখন ওকে ছেড়ে যেতেই হচ্ছে। যুদ্ধের মাঠে এটা একটা নিরেট বাস্তব ব্যাপার।

ভারতীয় এলাকার একটা প্রাইমারি স্কুল ঘরে অত্যন্ত কষ্টকর রাত কাটে। প্রবল বাড়ুষ্টির ভেতরে দরজাবিহীন ফাঁকা জায়গা দিয়ে, কপাটবিহীন জানালা গলিয়ে বৃষ্টির ছাঁট এসে প্রায় সারারাত ভেজাতে থাকে আমাদের। এখান থেকে রওনা দিয়ে সকাল ন'টার দিকে গড়ালবাড়ি এসে পৌছাই। নন্দার পাঠানো গাড়ি, সঙ্গাহের রেশন, গোলাবারদ আর অন্য অনুষ্ঠিক জিনিসপত্র নিয়ে আসে দৃশ্যের বারোটার দিকে। সেই গাড়ি আমাদের জলপাইগ়ুড়ি, বেঙ্গুবাড়ি, হলদিবাড়ি পার করে পাকা রাস্তা ধরে মানিকগঞ্জ সীমান্তে পৌছে দেয়। মানিকগঞ্জ জায়গাটা বেঙ্গুবাড়ির মতোই একটা বর্ষিষ্ঠ জনপদ। বি.এস.এফ.-এর কোম্পনি হেড কোয়ার্টারের সম্মুখবর্তী মাঠের বাজারটার পাশ ঘেঁষে প্রায় ১ লাখ লোকের শরণার্থী শিবির। শিবিরটার পরিবেশ গমগমানো, কোলাহলপূর্ণ। এক সময় বি.ও.পি.র কমান্ডারের সাথে পরিচিত হই। তাকে অনুরোধ করি আমরা যে এখানে এসে পৌছেছি, সেটা তাদের ওয়ারলেসের সাহায্যে চাউলহাটিতে পাঠাবার জন্য। হাফ প্যান্ট পরা সাদা শার্ট গায়ে চাপানো পেটমেটা ইস্পেন্টের পদবির ভদ্রলোক বেশ ভালোই। তিনি আমাদের চা-পানে আপ্যায়িত করেন। সক্ষ্যার মুখে একজন গাইডসহ রওনা দিই পেয়াদাপাড়ার উদ্দেশ্যে। সেখানে আহিদার রয়েছে তার দলবল নিয়ে। ওর আশ্রয়স্থল পেয়াদাপাড়া হবে এই ক্রটে আমাদের প্রথম হাইড আউট। মুক্তের মাঠে কোথাও জড়িয়ে পড়তে নেই। নালাগঞ্জ, ভেতরগড়, সোনারবান এলাকায় বড়ো শিবিড় হয়ে জড়িয়ে পড়েছিলাম সবার সাথে। সেই পরিচিত জায়গা, পরিচিত মানুষজন, মেহপ্রতিম ছায়ার পেন্টসহ সবাইকে ছেড়ে এই নতুন দায়িত্ব নিয়ে আসতে খুবই কষ্ট হয়েছে। কষ্টের মৈল অনুভূতিতা বুকের ভেতরে চিনচিন করে বেজে চলেছে। ওদের সবাইকে ছেড়ে আসার দেশটা বেন্দনাবোধ বুকের গভীরে বহন করে আমরা এগিয়ে যাই নতুন গন্তব্যের দিকে।

২৩. ৯. ৭১.

পেয়াদাপাড়া হাইড আউট

মানিকগঞ্জ থেকে পেয়াদাপাড়া ৬/৭ মাইলের ব্যবধান। পথঘাট ভালো নয়। একটানা হেঁটে রাত ৮টার দিকে এসে পৌছি পেয়াদাপাড়ায়। পরিচিত বন্ধুদের সাথে অনেকদিন পর সাক্ষাৎ। আমাদের পেয়ে মোটামুটি একটা হল্লোড় পড়ে যায় ওদের মধ্যে। আহিদার খুশিতে প্রায় চিৎকার করেই ওঠে। বদিউজ্জামান ও ইয়াকুবসহ অন্য সবাই উষ্ণ সংবর্ধনা জানায়। মতিয়ার এক গ্লাস দুধ নিয়ে এসে বলে, খান, বাঁটি গাইয়ের দুধ। পাশে তার খলিল। এই সেই মতিয়ার আর খলিল, মুক্তের প্রথম দিককার আমাদের দুই স্থায়ী ক্ষট। অমিত সাহস আর প্রাণের ঝুকি নিয়ে যারা অনেকগুলো কঠিন অপারেশন সফল করতে সাহায্য করেছিলো। অত্যন্ত প্রিয় সহযোগী ছিলো এরা আমার। তাই আমাদের পেয়েই অভিভূত হয়ে পড়েছে, কী করবে না করবে এই রকম আনন্দের আতিশয়ে আমাদের জন্য গ্লাস ভর্তি করে দুধ নিয়ে এসেছে ওরা।

আহিদার আর বদিউজ্জামান শোরগোল আর হাঁকডাক করে একটা ঘরে ছেলেদের জায়গা করে দেয়। অন্তর্পাতিগুলো রাখা হয় তাদের জিম্মায়। রাতের আহারপর্ব সারা হয় একসাথে। তারপর শুরু হয় আলোচনা চত্রের কাজ।

পেয়াদাপাড়া হাইড আউটে এরা দারুণ জমিয়ে বসেছে। বেশ বড়ো একটা বসতি। মাঝখানে বড় আভিনা। দু'পাশ জুড়ে তার সার বাঁধা ঘর, অধিকাংশই টিনের। আভিনার মাঝে

মাঝেও ঘর; কিন্তু তাতে করে আঙিনা দিয়ে চলাচল করার ব্যাপারটা বিস্ফীত হয় নি। খুবই নিরাপদ আশ্রয়ে প্রায় স্থায়ী হাইড আউট গড়ে তুলেছে এরা। নিরাপত্তা বিস্ফীত হবার কোনো সংগ্রাম নেই। বেশ আরামদায়ক বসবাস। এখানকার সবকিছুতেই কেমন একটা ঢিলেচালা ভাব। এদের সামনে অন্দরেই পাকবাহিনীর গলেয়া আর টুনির হাটের ঘাঁটি। এ দুটো শক্ত ঘাঁটিকে কেন্দ্র করেই চলছে এদের মূল তৎপরতা। সামনে মাইলখানেক দূরের করতোয়া নদী পেরিয়ে প্রায় ৩/৪ মাইলের ব্যবধানে পাকবাহিনীর মণ্ডলের হাট ঘাঁটি। সে ঘাঁটির শক্তদের দিকেও এদের নজর রাখতে হয়। আহিদারের বিছানায় বসে জমে ওঠে কথাবার্তা। মোটায়টি সব ক'জন কমান্ডারই আলোচনার সময় উপস্থিত থাকে। এছাড়াও থাকে কয়েকজন উজ্জ্বল টগবগে তরঙ্গ। সাকাতি থেকে প্রফেসর আনোয়ারের সহযোগিতায় এরা এসে পেয়াদাপাড়ায় ঘাঁটি গেড়েছে। তারপর তারা এখন থেকে আর কোথাও নড়ে নি। এ জায়গাটা নিরাপদ বলে এখানেই স্থায়ীভাবে ঠাই গেড়ে বসেছে। চারদিকে গাছগাছালি ঘেরা এটা একটা বর্ধিষ্ঠ বসতি। এখানকার মানবজন যে বেশ অবস্থাসম্পন্ন, তাদের বাড়িঘর দেখেই সেটা স্পষ্ট বোৰা যায়। অধিকাংশ পরিবারই চলে গেছে সীমান্তের ওপারে শরণার্থী শিবিরে। কেউ কেউ রয়ে গেছে কেবল ঘরবাড়ি পাহারা দেয়ার জন্য। মুক্তবাহিনীর সাথে হাত মিলিয়ে তাদের সহযোগিতা দিয়ে, রাতের বেলা গাইড হিসেবে কাজ করে তাদের পরিত্যক্ত বাড়িঘর আর সহায়সম্পদ রক্ষা করে চলেছে এরা। আহিদার চুপচাপ থাকে। বন্ডিজামান তাদের অপারেশন আর সে ক্ষেত্রে তাদের সফলতার বর্ণনা দিয়ে চলে। ইয়াকুব এন্দের মাঝে সব থেকে চটপটে চৌকস ছেলে, আগ বাড়িয়ে কথা বলার অভ্যেস তার। দালাল শাহিদবাহিনী নিধনের কথা সোংসাহে বলে সে। এরা দুটো ক্ষোড় এক সাথে থাকছে। পিন্টু আন্তর্মান যেমন ছিলাম এবং আমাদের ধারাতেই উভয় কমান্ডই অপারেশন পরিচালনা করছে প্রাথমিকভাবেই।

অনেক রাতে আলোচনা চত্রের অন্তর্ভুক্ত তাঁতে। তাদের জানাই, আমার মিশনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে। আমি এখন থেকে তাদের ছাঁচাকাছি থাকবো। এ সংবাদে খুবই উৎসাহিত বোধ করে। আলোচনা চক্র তাঁতার পর আহিদার তার বিছানা পরিপাটি করে শোয়ার জায়গা করে দেয়। পাশাপাশি তই দুঃজনে।

বাইরে নিরুম অঙ্ককার রাত। শুধু সেন্ট্রিদের জেগে থাকার, টহল দেয়ার শব্দ ভেসে আসে। আহিদার বলে, পিন্টু কেমন আছে মাহবুব তাই?

- ভালো।
- অনেকদিন দেখা হয় না। একসাথে ছিলাম, এখন কেমন ছাড়া ছাড়া হয়ে গেলাম।
- আসেও তাই। তুই কেমন আছিস, তাই বল!
- ভালো না।
- অপারেশন কেমন হচ্ছে?
- ভালো না।
- তাহলে কী হচ্ছে এখানে?
- টুকটাক কিছু, এই আর কি। বড়ো ধরনের কিছু না।
- তুই কট্টোল করতে পারছিস না?
- হচ্ছে না মাহবুব তাই। চেষ্টা তো করছি।
- তুই নিজে শক্ত হ। নিজের কট্টোলে নেয়ার চেষ্টা কর। এখানে কেমন যেনো ছাড়া

ছাড়া ভাব। এভাবে তো চলবে না।

— দেখা যাক!

আহিদার একটা দীর্ঘস্থাস ছাড়ে। তারপর বলে, আমি কিন্তু আপনার সাথে যাচ্ছি।

২৩. নং ৭১

আবার আসিব ফিরে

সকালেই রওনা দিই আহিদারকে সাথে নিয়ে। একটা হাইড আউট খুঁজে বের করে দিন থাকতেই জায়গাটা ভালো করে দেখে নেয়া দরকার। একটা খাল পার হতে হয় বেশ কষ্ট করে। বৃষ্টিভেজা ভাঙচোরা কর্মসূক্ষ পেছল রাস্তা। একটা পরিত্যক্ত ই.পি.আর. ক্যাম্প। নাম ডানাকটা ক্যাম্প। অসুস্থ নাম! ক্যাম্পটি পেরিয়ে এগিয়ে যাই। রাস্তার দু'পাশে বাড়ত ঝোপঝাড়। আশপাশের বাড়িঘর ও জনবসতিগুলো সবই পরিত্যক্ত। মনে হয় একদা মানুষজন পরিবেষ্টিত গমগমানো এই জনপদগুলো কোনো জাদুকরের জাদু মন্ত্রবলে যেন এরকম পরিত্যক্ত বিরান্তভূমি হয়ে গেছে। বাড়বৃষ্টির ঝাপটায় বাড়িঘরগুলোর আজ চরম ছন্দছাড়া দশা। ছনের ছাউনি দেয়া ঘরগুলো যেনো মুখ পুবড়ে পড়ে যেতে উদ্যত। কবে জয় বাংলা হবে, কবে ফিরবে আবার মানুষজন আপন বাসভূমে, কবে জমে উঠবে দুঃখ-কষ্ট, আনন্দ-বেদনা যেরা সেই চিরস্মৃত গ্রামবাংলার পরিচিত জঙ্গল আদৌ সেদিন আসবে কি? ‘আবার আসিব ফিরে এই বাংলায়’... জীবনানন্দ দাশগুপ্ত কি দারুণ আকৃতি, মৃত্যুর পরেও এই বাংলার মাটিতে ফিরবার। শঙ্খচিল-শালিকের বেশেও তিনি আসতে চেয়েছেন, মানুষ হয়ে যদি আসতে নাও পারেন। তার কল্পনার ক্ষেত্রে ‘রূপসী বাংলা’ আজ শুশানত্ত্ব। কবি বেঁচে থাকলে আজ কি লিখতেন? আজো ক্ষেত্রে ফিরতে চাইতেন এই বাংলায়? মনে মনে ভাবি, ভাগ্যস, তাঁকে দেখতে হয় নি ক্ষেত্রে আজকের এই রূপ।

রাস্তার মাঝখানে ড্রেনের মতো ক্ষেত্রে কেটে একজন মানুষ মাছ ধরছে। বেতমার মাছ। রাস্তার বাঁ দিককার উচু জায়গা দিয়ে ছলছল শব্দ তুলে পানি নেমে যাচ্ছে ডানমুখী ঢালু জমিতে। ওখানেই তিনি কোনা আকৃতির একটা ‘হেঙ্গা’ জাল পেতেছে লোকটা। বয়ে যাওয়া পানির ধারায় ভেসে যাওয়া মাছের পরে মাছ আটকা পড়ছে তাতে। বর্ষার ভাসা পানিতে সব ধরনের মাছ, চাঁদা, পুঁটি, ডেরকা, টাকি, শিং ও মাঞ্চুর থেকে শুরু করে ছোট সাইজের শোল মাছ পর্যন্ত। মাছের পরিমাণ আর তাদের লাকালাফি দেখে আহিদার নিজেকে সামাল দিতে পারে না। লোকটাকে বলে, এই যিয়া, মাছ দিতে হবে।

— কেনেহে তুমরা মাছ নিবেন?

লোকটা বেয়াড়া প্রশ্ন করে বসে। বোৰা যায় ঘাড় টেরা ধরনের মানুষ।

— কি কইল শা....? বলে আহিদার হিড়হিড় করে তাকে টেনে নিয়ে আসে। স্টেনগানটা তার বুক সোজা তাক করে ধরে বলে, শালা রাস্তা কাটিয়া মাছ ধরতেছো আর কও ক্যানো মাছ নিবেন? চেনো আমাদের? প্রচণ্ড রাগে আহিদারের ফেটে পড়বার দশা। এই বুঝি গুলি করে মারে লোকটাকে, এমনই তার রাগের বহর।

রাস্তার এপারের পানিতে কালো হয়ে থাকা মাছের ঝোক, ওপারে ‘হেঙ্গা’ জালে জমে ঝঠা চকচকে তাজা মাছের লাকালাফি, দেখার মতো মনোহর একটা দৃশ্য। গ্রামবাংলার রাস্তা কেটে প্রবাহিত পানির ধারায় জাল পেতে মাছ ধরার ব্যাপারটা অপরিচিত কিছু নয়। কিন্তু

এখন, এসময়, এক অনিদিষ্ট পদযাত্রায় পথিমধ্যে মাছ ধরার এ দৃশ্য চমৎকৃত করে ইনকে। ভালো লাগে দারুণ। মনে হয়, দেশেই রয়েছি, কোথাও কোনো অস্তিত্ব নেই, খুনখারাবি, লুটতরাজ নেই, গোলাগুলি নেই, যুদ্ধ নেই। আমাদের চির পরিচিত শাস্তিময় গ্রামবাংলা সেই আগের মতোই রয়ে গেছে।

আহিদার তখনো রাগারাগি করছে। লোকটাকে বলে চলেছে— বল ব্যাটা মাছ কোথায় নিবি?

— ভাবতে, তব পাওয়া গলায় জবাব দেয় লোকটা। এবার আমি এগিয়ে যাই। তাকে নিরস্ত করি। লোকটাকে বলি, দুই ঢাকি মাছ আলাদা করে রাখবে আমাদের জন্য। পয়সা দিয়ে নিয়ে যাবো।

মাথা নেড়ে রাজি হয় সে। তার মুখ থেকে শঙ্কা ও ভীতির ছায়াটা কেটে যায়। তখন সে বলে, পাইসা দিবা হবে নিশ্চে। তুমহারালা মুক্তিফৌজ। কতো কষ্ট করেছেন। তুমহারালা কেনহে পাইসা দিবেন? কত্ত্বা আর মাছ খাবেন?

লোকটার কথার উভয়ে কিছু বলা যায় না। গ্রামের সহজ-সরল মানুষ। আসলেই কতো ভালো। ছাড়া পেয়ে সে আবার মাছ ধরায় ব্যস্ত হয়ে পড়ে। আমরা আবার পথ ধরি সামনের দিকে। মাইল তিনেক এগিয়ে করতোয়া নদীর পারে এসে রাস্তাটা শেষ হয়। একটা খেয়াঘাট।

ওপারের গ্রামটার নাম মারেয়া। তারপরই সাকোয়া শালভাঙ্গ। আহিদার সামনের দিকে আঙ্গুল তুলে দেয় আর একে একে দেখিয়ে বলে যায় খুল্লকাগুলোর নাম। খেয়াঘাটের এপারে ৮/১০টা বাড়িঘরের একটা জনবসতি। নাম মুগাই পাড়া কাটালী হাঁটু পানি ভেঙে তারপর জনবসতিটায় যেতে হয়। এপারে করতোয়া পেছনে মাইলখানেক দূর দিয়ে চলে গেছে ঘোড়ামরা নদী। পরিত্যক্ত জনবসতির ছনের বাড়িগুলোর অবস্থা বর্ষায় খুবই খারাপ হয়ে পড়েছে। স্যাতসেতে তাদের জীবন। সাপ, ইন্দুর আর অন্যান্য পেকামাকড়ের অবাধ বিচরণক্ষেত্র সেগুলো। এসবের উভয়েই প্রথম বাড়িটা আমাদের পছন্দ হয়ে যায়। তিনটা মাঝির আকারের ছনের মূল সামান্য ঝাড়পোচ করে নিলেই বাসযোগ্য হয়ে উঠবে। সিদ্ধান্ত নিই, এখানেই হবে আহিদের হাইড আউট। দু'পাশে নদীর প্রাকৃতিক বাধা। আর শুরুপক্ষকে এখানে আসতে হলেও হাঁটু পরিমাণ পানি ভেঙে আসতে হবে। মোটামুটি নিরাপদ মনে হয় জ্যাগাটা। আহিদারও সায় দেয়। সুতরাং রাতের ভেতরেই এখানে চলে আসা হবে, এ সিদ্ধান্ত নিয়ে ফিরে চলি আবার পেয়াদাপাড়ার দিকে।

২৪. ৯. ৭৩

কমরেড মন্তু

দুই ঢাকি মাছ আনা হয়েছে। দুপুরে ছোট মাছের চকচড়ি দিয়ে হাইড আউটের প্রায় দুশো ছেলের চমৎকার আহারপর্ব সারা হয়। সঙ্ক্ষ্যার মুখে দু'জন সঙ্গী নিয়ে একজন মুবক আসেন। লম্বা একহারা গড়ন, গায়ের রঙ শ্যামলা। আহিদার তাঁকে পরিচয় করিয়ে দেয় আমার সাথে এই বলে, ইনি হচ্ছেন কমরেড মন্তু। আমাদের মন্তু মামা। এ অঞ্চলে কমিউনিস্ট পার্টির নেতা। কমরেড মন্তুর সাথে কুশল বিনিময় হয়। একজন পরিচ্ছন্ন মনের প্রগতিশীল মানুষ। স্ত্রী, শিক্ষিত, আর পরিশীলিত তাঁর ব্যবহার। প্রাথমিক আলাপেই তাঁকে ভালো লেগে যায়। আমরাও তাঁকে মন্তু মামা বলে ডাকা শুরু করি। মারেয়া গ্রামে তার বাড়ি। প্রাথমিক কুশল বিনিময়ের পর তাঁর সাথে নিরিবিলিতে বসে আমার নতুন মিশন সমষ্টি বিস্তারিত আলোচনা করি। কমরেড মন্তু

অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করেন ব্যাপারটায়। তিনি বলেন, সব ধরনের সহযোগিতা পাবেন আমাদের। তাছাড়া আপনাদের নতুন অপারেশন ক্ষেত্রটা তো আমাদের এলাকাতেই। খুব ভালো হবে। ব্যাটাদের এবার ভালোভাবে টিচ করা যাবে। তাকে বলি, মামি কোথায়?

- বাড়িতে। মারেয়ায়।
- কতোদিন বাড়ি যান নি?
- প্রায় ২০/২৫ দিন হবে।
- যাবেন যামিকে দেখতে?

আমার কথায় এবার অঙ্ককারে হেসে উঠেন মন্টু মামা। বলি, চলেন যাই আপনাদের গ্রামটি রেকি করে আসা যাবে আর সেই সুযোগে আপনিও যামির সাথে দেখা করে আসবেন। একবারুলকে দায়িত্ব দিই নতুন হাইড আউটে যাবার জন্য, সবকিছু গোছগাছ করে তৈরি থাকতে। রাত নটার দিকে রওনা দিই মারেয়ার উদ্দেশে ৫ জনের সশ্রেষ্ঠ দলসহ। আহিদার সাথে থাকে। মন্টু তার নিজের ফেলে আসা গ্রামে যাবার জন্য আজ রাতের গাইড। ঘুটমুটে কালো রাত। সেই অঙ্ককার কেটে পথ হাতড়ে হাতড়ে এগিয়ে চলি আমরা সামনে। করতোয়ার পার যেঁধে।

নদী পার হয়ে একটা বিস্তীর্ণ খোলা প্রান্তর। সেটা পার হলেই মন্টুদের গ্রাম মারেয়া। তাদের বাড়িতে অবশ্যে পৌছানো যায় রাত ১১টার দিকে। এসেই মন্টু বেশ ভীতসজ্জ্বল হয়ে পড়েন। তার ভয়, কেউ যদি তাকে দেখে ফেলে তামারেয়া স্কুলে রাজাকারদের ক্যাম্প থাকবার সংঘর্ষণ। মন্টু গ্রামে এসেছে শক্রপক্ষের অবসরেরা জানতে পারলে সমৃহ বিপদ হতে পারে। তাই সরাসরি মন্টুদের বাড়িতে যাওয়া কেন না। ও বাড়িতে ফিরছে এ খবর পেলে শক্রপক্ষ দ্রুত তার বাড়ি ঘেরাও করে তাকে খেয়ে নিয়ে যাবে। কিছুক্ষণ সলাপরামর্শ করে তাই মন্টুর চাচাতো ভাই আবদুল হককে দেবে জানা হয়। তিনি এলাকার আওয়ায়া লীগের নেতা। ঘন বাঁশবাড়ের নিচে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমরা হকের সাথে কথা বলি। তিনি কোনোরকম ঝজর-আপন্তি না তনে তাদের বাড়ির আভিন্নায় নিয়ে যান আমাদের।

বাইরে সেন্ট্রি পাহারা রেখে হকের সাথে তাদের বাড়িতে ঢুকি আমরা। তিনি আভিন্নায় চেয়ার পেতে বসার আয়োজন করেন। মন্টু দু'বাড়ির লাগোয়া ফঁকা জায়গা দিয়ে তার নিজের বাড়িতে ঢুকে যায় চুপিসারে। হকের বাবা বেরিয়ে আসেন খবর পেয়ে। বাড়ির লোকজনও জেগে উঠে। গ্রামের সচল পরিবারের বিরাট দোষহলা টিনের বাড়ি। দেখেই বোঝা যায় এরা বেশ অবস্থাসম্পন্ন জোতাদার। পুরনো বনেদি পরিবার বলতে যা বোঝায়, তাই। শক্ত কাঠ আর মজবুত টিনের ঘরবাড়ি, উচু উচু ধাপ। এই বাড়িঘর আর সম্পদ ইত্যাদি ছেড়ে এইরকম ভয়াবহ বিপদের মধ্যেও সম্ভবত এরা সীমান্ত পার হতে চান নি। হকের বয়সী বাবা খুবই রাসিক মানুষ। কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁর সাথে আমাদের আলাপ জমে উঠে। আমরা তাকে নানা বলে ডাকতে শুরু করি কোনোরকম ভূমিকার অবতারণা না করেই। আর তিনি চিক্কার আর হঁকড়াক করতে থাকেন বাড়ির বট-বিদের উদ্দেশে, যোর নাতিরা অসিছেগে। নাস্তা পানি, খানাদান তৈরি করো জলদি। বাড়ির মেয়েরা তাঁর নির্দেশ পেয়ে দৌড়াদৌড়ি শুরু করে দেয়। তারপরেই তিনি আমাদের লক্ষ্য করে বলে উঠেন, দেও হে নাতিরা ভালো সিগারেট আছে নাকি তোমার ঠে। বিড়ি খাইতে খাইতে মুখ একেবারে পচে গেছে। পকেট থেকে লেঙ্গস্ সিগারেট বের করে দিই তাকে। সিগারেটে আঙুল ধরিয়ে তাতে টান দিয়ে খোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে তিনি বলেন, জয় বাঙ্গা

হবে নিশ্চে নাতিরা! এই দোজখের মইধ্যে আর কতোদিন থাকিল যাবে কহেন দি? বুড়ো নানার কথাগুলো যেনো অক্ষকারে ধাক্কা মারে আমাদের, কী জবাব দেবো এর? জবাব তো আমাদেরও জানা নেই। কহেন দি মুই কি জয় বাংলা দেখে যাবার পারিম! বুড়ো তার জীবন্দশায় জয় বাংলা দেখার সাধ পূরণ করতে চান। জীবনে অনেক সাধই হয়তো পূরণ করেছেন এই শৌখিন প্রগতিমনা মানুষটি। জীবনের শেষভাগে এসে এখন একটাই মাত্র প্রশ্ন তার, তিনি কি দেখে যেতে পারবেন জয় বাংলার সৃষ্টির?

আবদুল হকের সাথে কথা হয় বিস্তারিত। এ এলাকায় রাজাকারদের উৎপাতের কথা তিনি বলেন। বলেন, অসমৰ ভয় আর শক্তির ভেতরে আছেন তারা। যে-কোনো মুহূর্তে পাকবাহিনী আর রাজাকারদের হামলার শিকার হতে পারেন। তার কথা শেষ হলে সাহস দিই। সমবেত অন্য আর সবাইকেও ভরসা দিই। দিয়ে বলি, আমরা এসে সেছি, এতেদিন বাধা পায় নি। এবার পাবে। দেখবেন, আর কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। কাছাকাছিই তো আমরা থাকছি। যে-কোনো অবস্থাতে আমাদের সাহায্য চেয়ে পাঠাবেন। অসুবিধা হবে না কোনো, আমরা সময় মতো চলে আসবো।

চা-নাট্টা শেষ হয়। আলোচনা চলতেই থাকে। ফুককে কেন্দ্র করে। রাত বাড়ে ধীরে ধীরে। মন্টুর জন্য অপেক্ষা করতে হয়। এরি মধ্যে তিনবার তাগিদ পাঠানো হয়েছে; কিন্তু মন্টুর পাতা নেই। আমাদের মাথার ওপরে এখন মাঝ রাতের তারা। তাই দিয়ে খোলা অঙ্গীয়ার বসে থাকি। সিগারেটের পর সিগারেট ধরাই। নানাকেও দিই। আর স্বাস্থ, অনেকদিন পরে মন্টু এসেছে তার বাড়িতে বউ-বাচ্চাদের কাছে। তাকে তাগাদা দিয়ে দেখতেও কেমন যেনো লাগে।

কিন্তু বুড়ো নানা এক সময় হক্কির দিয়ে ঘোষণা ব্যাটা পরিবার চাহেছে নাকি? ওমরা খবর পালেই তো দৌড়ে আসিবে ধরিবার। যাবার আন ওক। বড়য়ের সাথেও কথা কহিবার সময় অনেক মিলিবে।

হক তখন নিজেই যান মন্টুকে আকতে। এ এলাকায় মন্টু হচ্ছে পাকবাহিনীর এক নথর টাগেট। এভাবে তার আসার স্বৰ্য্যাদ ওদের কালে গেলেই সমস্ত পরিবারের জন্যই ঘনিয়ে আসবে সমৃহ বিপদ।

অবশ্যে মন্টু আসে। নানা, আবদুল হক আর অন্যদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে মধ্যারাতের পর পথে নামি আমরা আবার। রাত্তায় মন্টু কথা বলে না। চুপচাপ হাঁটে। আহিদার টিপ্পনী কাটার সুরে বলে, মন খারাপ মাঝ! মামি আসতে দিতে চায় নি, না! মন্টু সহজ হওয়ার ভঙ্গিতে বলে, বউ ছাড়ে অসিবার মন চাহে নাকি? তোমরা তো বেহা করেন নাই। করিলে বুঝিবেন।

তারপর আর কথা হয় না। শুধু হনহনিয়ে ফিরে চলা।

২৪. ৯. ৭১

করতোয়া পাড়ের হাসান মাঝি

করতোয়া নদীর পাড় ঘেঁষে কুমারপাড়া কাটালিতে হাইড আউট স্থাপন করা হলো। যে বাড়িতে আমাদের হাইড আউট তার মালিক হাসান মাঝি এসে হাজির। তাঁর পরিবার রয়েছে সীমান্তের ওপারে মানিকগঞ্জ শরণার্থী শিবিরে। কোথা থেকে সে খবর পেয়েছে মুক্তিযোদ্ধারা তার বাড়িতে আস্তানা গেড়েছে। ছুট এসেছে সে শরণার্থী শিবির ছেড়ে। এসেই তার বাড়িতে মুক্তিযোদ্ধাদের উপস্থিতি দেখে খুশিতে একেবারে আঘাতারা। লেগে গেছে সকল ধরনের আয়োজনে। কোথা

থেকে শুকনো খড় যোগাড় করে আনে, তাই বিছিয়ে দেয় স্যান্ডসেঁতে ঘরের মেঝের ওপর। রান্নাঘরটা সাফ-সুতরো করে ব্যবহারোপযোগী করে তোলে। শুধু তাই নয়, আমাদের উপস্থিতির থবর পেয়ে সে তার নদীর পানিতে ডুবিয়ে রাখা নৌকোটাও ভাসিয়ে ভুলেছে। মারেয়া খেয়ালগাটের মাঝি সে। আবারো শুরু করেছে খেয়া পারাপারের কাজ। শরীরের রঙ তার কালো। লম্বা-পাতলা শরীরের মাঝি বয়সী মানুষ হাসান মাঝি। মুখে লম্বা কাঁচা-পাকা দাঢ়ি, মাথায় সার্বক্ষণিক গোল তেল চিটচিটে সাদা টুপি। অফুরন জীবনীশক্তি তার। তাই নিয়ে সৌজ্ঞ্যাপ করছে সে তার ১৩/১৪ বছর বয়সী কিশোর ছেলেটিকে সাথে নিয়ে। বারবার হাইড আউট এসে খৌজববর নিয়ে যাচ্ছে দলের জন্য আর কোনো করণীয় আছে কি না। ফাইফরমাশ খাটোবার জন্য তার নিজস্ব একজন লোক এনে হাজির করে তাকে এরি মধ্যে ঘরের কাজে লাগিয়ে দিয়েছে। এসব করার ফাঁকফোকরেই সে তার নদীতে ভাসানো খেয়া নৌকোর গল্বইতে গিয়ে বসছে আর অপেক্ষা করছে কোনো কিছুর। আসলে হাসান মাঝিকে দিয়ে নদীর পাড় জুড়ে চমৎকার অবজারভেশনের কাজ চলে যাচ্ছে। হাসান মাঝির এ ধরনের উদ্যমতা আর পাগলপারা ভাব দেখে তালো লাগে খুব। বল্ল সময়ের মধ্যে সে আমাদের প্রিয়ভাজন আপন মানুষ বনে গেছে। তার বাড়িতে মুক্তিবাহিনী আশ্রয় নেয়াতে সে তার বাড়ি পর্যন্ত আসতে পেরেছে, আবার নৌকো ভাসিয়ে খেয়া পারাপার করার কাজে লিঙ্গ হতে পেরেছে বলেই তার ধারণাটা এমন যে, দেশ যেনে অর্ধেকটা স্বাধীনই হয়ে গেছে।

২৫ তারিখের শেষ রাতে এখানে হাইড আউট মেঝেইয়েছে পেয়াদাপাড়ার আশ্রয় ছেড়ে এসে। আর সকালবেলাতেই হাজির হয়েছে হাসান মাঝি তার কিশোর ছেলেকে সাথে নিয়ে। তার সাহায্যে হাইড আউট শুষিয়ে নিতে সকলেবলাটা ব্যস্ত থাকতে হয়েছে সবাইকে। লঙ্গরখানার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে মমতাজ আর মূরাউদিনকে। কোয়ার্টার মাস্টার আর টেরের দায়িত্ব রেখেছে একরামুল তার নিজের কাঁচে। বর্তমান দলে পিন্টু নেই, মুসা নেই, চৌধুরী, মিনহাজ ও ইক্বাহিমের মতো প্রয়োজনস্থাবান ছেলেদের কেউ নেই। দলটাও ছোটো, যদিও দায়িত্ব সীমাহীন। তো, কোনো ক্লিনিক কার্ম্মই অভাবে পড়ে থাকে না। কোনো ব্যক্তির অভাবই অপূরণীয় নয়। এখানে মুসার জায়গা দখল করে নিয়েছে একরামুল। আর পিন্টুর জায়গা আহিদার। অভাব যোগ্যতার সাথে একরামুল সবদিক সামলে যাচ্ছে আর সমানে চালিয়ে যাচ্ছে তার সৈয়দপুরের আশ্রমিক টানে অক্তিম খিণ্টি খেউর। শুদ্ধিকে করতোয়ার পাড়ে রয়েছে হাসান মাঝি তার সজাগ পাহারায়। মালেক আর বাচ্চাকে পাঠানো হয়েছে সোজা করতোয়া নদীটা বাঁক নিয়ে যে জায়গা দিয়ে চলে গেছে দেবীগঞ্জের দিকে, সেখানে। অনেকগুলো লম্বা লম্বা শালগাছের বন সেখানে। শালগাছের মাথায় চড়ে ওরা শক্রের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করবে। আহিদার রয়ে গেছে ছায়াসঙ্গীর মতো। প্রতিটি পদক্ষেপ প্রতিটি সিদ্ধান্তে সে আন্তরিকভাবে অংশ নিছে। তার নিজের দল পেয়াদাপাড়ায়। এ নিয়ে তার কোনো দুশ্চিন্তা নেই।

দুপুরের খাওয়াদাওয়া সারা হয় নতুন লঙ্গর কম্বানারের তত্ত্বাবধানে। এরপর মাঝানের ঘরটার মেঝেতে পাতানো বিছানায় কিছুক্ষণ বিশ্রাম। একপাশে মন্টু, আহিদার অন্য পাশে। ছনের ভাঙা ছাদের দিকে মুখ করে চিত শুয়ে থাকা তিন শুবক। টুকটাক এলোমেলো আলোচনা।

আপনারা এসে গেছেন, এখন অনেকটা নিশ্চিন্ত। আমাদের ফ্যামিলিটা নিরাপত্তা পাবে, মন্টু বলেন।

— আপনি যে ধরনের বড়ো টার্ণেট খানসেনাদের, ফ্যামিলি শিফ্ট করলেই বুঝি ভালো হতো মন্তু মামা, বলি তাকে ।

— কোথায় সরাই, এতো বড়ো ড্যাস্টাবলিশমেন্ট বলেন তো? শুধু আমার পরিবার তো নয়, চাচসহ অন্যরা প্রায় ৩০/৪০ জন মানুষ। এতো বড়ো বাড়ি, চাল-ভাল গোলায়, মোষ-গরুসহ কতো জিনিসপত্র, কথাটা বলেই একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়েন মন্তু।

— এখন আর ভয় নেই। এখন মাহবুব ভাই এসে গেছে। আমার নিজের দল রয়েছে পেয়াদাপাড়ায়। এখন তো অনেক শক্তি বেড়ে গেলো আমাদের। ওদের ঠিক ঠেকিয়ে দেবো আমরা। আহিদার বলে কথাগুলো ।

— কী জানি কী হবে! মন্তুর গলায় হতাশার সুর ।

— আসবেন মাথে মাথে মন্তু মামা। আপনি এলে সুবিধা হবে। আপনার অনেক রাজনৈতিক কর্মী রয়েছে। ওদের সাথে যোগাযোগ করে আমরা বোদা পর্যন্ত হামলা করবো।

— আসবো, বলেন মন্তু। তবে ওদিকে অনেক কাজ, পার্টির কাজ, শরণার্থী শিবিরের নামা ধরনের ঝামেলা। ঘুরুডাঙ্গায় আমাদের পার্টির ছেলেদের জন্য স্থাপিত ট্রানজিট ক্যাম্পে ছেলে পাঠানো, ক্যাম্পের দেখাশোনা, ছেলেদের এফ.এফ. হিসেবে ট্রেনিংয়ে পাঠানোর ব্যাপারে যোগাযোগ-তদবির— এসব নিয়ে প্রায় সারাক্ষণই ব্যস্ত থাকতে হয়। একদম সময় পাই না ।

— কিন্তু লীজা মায়ি! তাকে এভাবে অরক্ষিত অবস্থায় রেখে এসেছেন, তার কী হবে? আহিদার হঠাতে করেই যেনো আসল প্রশ্নটা করে বসে মন্তু কিছুক্ষণ চুপ থাকেন। তারপর বলেন, আপনারা তো রইলেন, মাহবুব মামা রয়েছে, আপনারা দেখবেন তাকে। আপনাদের হাতেই সঁপে দিয়ে গেলাম আমার বউ-বাচ্চাসহ প্রোটা পরিবারকে ।

আবার বাচ্চা মিয়ার ভৃত দেখা

মন্তু মামা চলে যান বিকেলের আনন্দে। তার বর্তমান কর্মক্ষেত্র মানিকগঞ্জে। তিনি চলে যাওয়ার প্রায় সাথেই শুরু হয় একটা হুলুঙ্গুল কাও। পড়িমরি করে দৌড়ে আসে বাচ্চা মিয়া। মুখে প্রায় ফেন্না তুলে বলতে থাকে, ওমরা আইসোছে, অনেকগুলা মানুষ দল বাঁধিয়া ।

— কারা আসছে? ধরকে উঠি মৃদু রোগীর মতো কাঁপতে থাকা বাচ্চা মিয়াকে ।

— খানের ঘর, বলে সে একইভাবে কাঁপতে কাঁপতে ।

— খানের ঘর মানে পাকবাহিনী? কোথায় তারা? কীভাবে দেখলি? আবার জিগ্যেস করি তাকে সন্দেহভরা চোখে ।

— নদীর ঐ পাড়োত, হাঁচিয়া হাঁচিয়া আইসোছে তারা ।

বাচ্চার একেবারে নিশ্চিত রিপোর্টিং। সে আর মালেক ছিলো সামনের নদীর মোড়ে শালগাছের মাথায় পর্যবেক্ষণের দায়িত্বে। তাড়াহুড়ো করে শালগাছের মগডাল থেকে নামতে বাচ্চার বুকের চামড়া ছড়ে গিয়ে রক্ষাকৃত হয়ে গেছে ।

— মালেক কোথায়? জানতে চাই ।

— এ আছে ওটেই, গাছের ওপরোত। মুই দোঢ়ায়া দোঢ়ায়া আনু। বাচ্চাকে বিশ্বাস করা কঠিন। যুদ্ধের প্রথম দিকে ভাটপাড়া ক্যাম্পে থাকতে সে একবার এ রকমভাবে পাটখেতের মধ্যে ভৌতিক খানসেনা দেখে হুলুঙ্গুল কাও বাঁধিয়ে বসেছিলো। এবার এখানে সে কী দেখে এসেছে কে জানে? কিন্তু যুদ্ধের মাঠে পর্যবেক্ষণকারীর রিপোর্ট একেবারে উড়িয়ে দেয়ার জো

নেই। হয়তো এবার বাচ্চা মিয়া প্রাকসেনাদের সত্ত্ব সত্ত্ব দেখেছে। অতএব তাড়াতাড়ি তৈরি হতে বলি সবাইকে। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই তৈরি হয়ে যায় ২০ জন ছেলে। একরামুলের নেতৃত্বে ১০ জনের একটা দল পাঠিয়ে দিই নদীর বাঁকে শাল বাগানের দিকে, যেখানে বাচ্চা মিয়া পর্যবেক্ষণের দায়িত্বে ছিলো। মধুসূনকে সামাল দিতে বলি হাইড আউট। নিজে বাকি ছেলেদের নিয়ে করতোয়া পাড়ে খেয়াঘাটের কাছে অবস্থান নিই। হাসান মাঝি নৌকো নিয়ে ওপারে ছিলো, তাড়াতাড়ি নৌকো নিয়ে ফিরতে বলি এপারে। মারেয়ার দিকে মুখ করে নদীর ওপারের দিকে দৃষ্টি নিবন্ধ রেখে সময় কাটে। স্টেগনান হাতে আহিদার আমার পাশে। উশুশুশ করে চলে সে থেকে থেকে। ঘন ঘন বিড়ি ধরায় আর টানে। নাহ বলে একরাশ বিরক্তি প্রকাশ করে সে বলে, কিছু না মাহবুব ভাই, সেফ গাঁজা। ঐ শালা বুঝি একপাল গুরু দেখেছে, তাকেই মানুষের দল মনে করেছে। হারামজাদা ভাট্টাচার্যেও এমনি একবার ভূত দেখেছিল।

বিকেল গড়িয়ে সঙ্গে নামে। একরামুলের দল ফিরে আসে। কিছু নেই বলে সে রিপোর্ট দেয়। আহিদার বাচ্চাকে তখন তেড়েতুড়ে মারতে যায়। দোড়ে বাচ্চা এসে আড়াল নেয় আমার পেছনে। আহিদার গলা থেকে তখন রাজের বাগ ঘরে পড়েছে, শালা বদমাইশ, খান দেখেইছে। হারামজাদা, যদি আর কোনোদিন এমন সংবাদ দেইশ তা হইলে গুলি করিয়া তোর লাশ ভাসেয়া দেয়া হইবে এই করতোয়া নদীত, খেয়াল থাকে যেনো। আমার পেছন থেকে মিনমিনে গলায় বাচ্চা বলে, আর হবার নয় দেখেন তোমরা হাতুর কসম, আস্তার কিনা।

সারারাত রেকি পেট্টলে কেটে যায় নদীর ওপারে মাঝেয়াসহ আশপাশের এলাকাগুলো। হাসান মাঝি খেয়া নৌকা নিয়ে নদীর এপারেই অপ্রকাশ ছিলো, আমাদের ফেরবার পথ চেয়ে। ভোরের আলো ফুটবার মুহূর্তে আমাদের ক্ষিরতে দেখে সে আক্ষত হয়। বোৰা যায়, গভীর উহেগ নিয়ে সে রাত জেগে বসেছিল তার নৌকো নিয়ে আমাদের পারাপার করার জন্য। জিগ্যেস করি, তুমি এখনো রয়ে আছে হাসান, কষ্ট করলে খুব। ঘুম জাগানিয়া চোখে সে জবাব দেয়, তুম্রা কখন ফিরে আসব নাই। কে তুমারলাক পার করিবে কহেন দিঃ

হেমকুমারী ইউনিট বেসের এফ.এফ. দল

গোড়ামারা নদীর ওপারে জমাদারপাড়ায় হেমকুমারী ইউনিট বেসের এফ.এফ.দের অবস্থান। কোশানি কমান্ডার আবদুল মালেক সেখানে হেড কোয়ার্টার স্থাপন করে দেবীগঞ্জ-ডোমার-চিলাহাটি এলাকায় তৎপরতা চালাচ্ছে। মালেকের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করার তাগিদ অনুভূত হয়। আমাদের এখানে উপস্থিতি এবং হাইড আউটের অবস্থানসহ অপারেশন পরিকল্পনা নিয়ে ওর সাথে আলোচনা করা প্রয়োজন। ডানে পেয়াদাপাড়ায় আহিদার-বদিউজ্জামানের দল। বাঁয়ে জমাদারপাড়ায় মালেকের দল, মাঝখানে আমরা। পেয়াদাপাড়ার দলের সাথে অপারেশন সমন্বয় বিষয়ে আলোচনা হয়েছে বিস্তারিতভাবে। এখন জমাদারপাড়ায় মালেকের সাথে সেটা করা প্রয়োজন। হেমকুমারী ইউনিট বেসের কমান্ডিং অফিসারের নেতৃত্বে মালেক তার দল নিয়ে অপারেশন চালিয়ে যাচ্ছে। চাউলহাটির সাথে তাদের কোনো সমন্বয় নেই। তারা তাদের নিজস্ব কায়দায় তৎপর, যেমন আমরা আমাদের নিজস্ব ধারায় কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছি। ভিন্ন ইউনিট বেস এবং আলাদা কমান্ড হলেও কাছাকাছি অবস্থানে থেকে নিজেদের মধ্যে সমন্বয় স্থাপন করাটা খুবই জরুরি। ইউনিট বেসের কমান্ডিং অফিসাররা চান আর না চান, দেশের ভেতরকার অবস্থান অর্থাৎ হাইড আউটে থেকে একে অপরকে না জানলে এবং নিজেদের ভেতরে সমন্বয়

সাধন করতে না পারলে আমাদের সবাইই তৎপরতা পরিচালিত হবে বিচ্ছিন্নভাবে এবং কখনোই
শক্তি পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে সফলতা অর্জন করা সহজ হবে না।

এখানে আসবাব পর থেকেই মালেকের নামডাক শোনা যাচ্ছে খুব। দারুণভাবে জঁকিয়ে
বসেছে সে এবং শক্তির বিরুদ্ধে দুর্যোগ সব অপারেশন চালাচ্ছে, এ ধরনের কথাবার্তা শোনা
যায় স্থানীয় লোকজনের কাছ থেকে। আহিদারও বলে সে ধরনের কথা ; কিন্তু তার কথা
থেকে মালেক এবং তার দল সম্পর্কে তেমন কোনো ভালো ধারণা পাওয়া যায় না। এরা
পাশাপাশি দুই ইউনিটের দুই কমান্ডার। একজনের ব্যাপারে অন্যজনের উচ্চ ধারণা পোষণ না
করার ব্যাপারটা পেশাগত দ্বন্দ্ব বা প্রফেশনাল জেলাসি বলে মনে হয়। আহিদারও হয়তো এ
ধরনের কোনো কিছুতে ভুগছে। তাকে জিগ্যেস করি, মালেকের সাথে দেখা হয়েছে
কখনো?—নাঃ বলে আহিদার। বলে, কি দেখা করবো বলেন, যা অহমিকা আর ঠাট্টবাট,
নিজেকে বিরাট কিছু মনে করে। আসলে তো ছিলো পাকিস্তান আর্মিতে নন্দ-কমিশনড পদে।
এখন তো সে কমিশনড অফিসারদেরও ছাড়িয়ে গেছে অনেক দূর। ওর কথা শেষ হতেই
আহিদারকে বলি, চল দেখা করে জেনে আসি আসল ব্যাপারটা। এতে করে আমাদের
উপস্থিতিটাও জানান দেয়া যাবে। আহিদার আপত্তি তোলে না। সম্ভিস্তুক মাথা নেড়ে
বলে, চলেন দূরে আসা যাক। এলাকাটাও দেখা হয়ে যাবে।

তো, সকালে নাস্তা সেরে আহিদারসহ রঙনা দিয়েছি স্টেজেরপাড়ার উদ্দেশে। একবারুল
থেকে গেছে হাইড আউটের দায়িত্বে। সাথে চলছে ৫ জনের একটা সশস্ত্র দল। বিপদ-আপদের
কথা তো আর বলা যায় না। প্রায় মাইল দেড়েক চতুর্থ স্থানচান্দিৎ মাঠ পেরিয়ে একটা উচ্চল
নদী। ওপরের দিকে বাঁক নিয়ে সোজা নেমে এলেছে নচের দিকে। চমৎকার গতিময়, নদীটার
নামও বিচির। ঘোড়ামারা। রেকর্ডগতে অন্তর্ভুক্ত নেমে এলেছে নচের দিকে। চমৎকার গতিময়, নদীটার
নামও বিচির। ঘোড়ামারা। রেকর্ডগতে অন্তর্ভুক্ত নেমে এলেছে নচের দিকে। নদীর এপারটা জনবিরল কিন্তু ওপারে
চমৎকার আবাদি ফসলের খেত। বিদ্যুৎ জনপদ আর লোকালয়। দৃশ্যটা কেমন যেনে লাগে।
নদীর এপারে একেবারে বক্ষ্য উচু মাঠের পর মাঠ। আর ওপারে কী চমৎকার মানুষজনের
পদচিহ্ন শোভিত কোলাহলমুখৰ জনপদ! এপারের জমি হয়তো উর্বর ফসল উপযোগী নয়,
ওপারের নদী বিধৌত জমি ফসল ফলবার উপযোগী বলে স্বাভাবিক নিয়মেই মানুষ গড়ে তুলেছে
তার বসবাসের ঠাই। মানুষের স্বাভাবিক ধর্মই এই। যে ভূমি উর্বর আর ফসল ফলাতে সক্ষম,
মানুষতো তার সভ্যতার উৎসাহ থেকে স্থানে গড়ে তুলেছে তার বসতভিটে। ঘোড়ামারা নদীর
দু'পারের অবস্থান এই ধারণাকে আবার নতুন করে মনে করিয়ে দেয়।

খেয়াঘাটের মাঝি নদী পার করিয়ে দেয়। পাশাপাশি দুটো খেয়া নৌকো এখনো
মানুষজনের নদী পারাপারে ব্যস্ত। কেনো জানি বিপজ্জনক মনে হয় খেয়া দুটোকে। বিপদ যদি
আসে, এ দুটো নৌকার ওপর ভর করেই আসবে। না, ব্যাপারটা নিয়ে ভাবতে হবে পরে।

নদীর পাড় যেমনে বর্ষা-বাদলের তোড়ে ভাঙ্গাচোরা রাস্তা ধরে উজান পথে এগিয়ে নদীর খাড়া
ভাঁজটার কাছে পৌছানো যায়। প্রায় ভারতীয় সীমান্ত ধরে নদী এসে বাঁক নিয়ে সোজাসুজি চলে
গেছে বাল্মীদেশের দিকে। নদীর বাঁক থেকে শুরু হয়েছে জনবসতি। একটা রাস্তা সোজা চলে
গেছে উত্তরে। রাস্তার দু'পাশে একটার সাথে আরেকটা লাগালাপি বাড়িয়ার। বিরাট গ্রাম। বর্দিষ্যু
জনপদ। বেশ সজ্জল মানুষজনের যে এসব বাড়িয়ার সেটা দেখায়াত্তি বুবতে অসুবিধে হয় না।

এ গ্রামের নামই জমাদারপাড়া । নদীর বাঁকটার রাস্তার পাশ দিয়ে বাড়িটার সামনে একটা বাঁশের
মাচা । একটা গাছের নিচে পাতা মাচাটায় অলসভঙ্গিতে বসে আছে ৫/৭ জন তরুণ । চেহারাই
বলে দেয় তারা এফ.এফ. সদস্য । তাদের সামনে দাঁড়িয়ে কৃশ্ল বিনিয় করতে গিয়ে ধাকা
থেতে হয় । অত্যন্ত বেয়াড়া ধরনের ছেলেগুলো, উন্যত আর আক্রমণাত্মক ভাবভঙ্গি তাদের ।

— আপনারা কে? এখানে বসে কী করছেন? আহিদার এ ধরনের প্রশ্ন করায় ছেলেগুলো
বিজ্ঞাপনে ক্ষেপে যায় । কী দরকার? কী চাই? এখানে কী প্রয়োজন? কেনো আসা হয়েছে? কোথা
থেকে আসা হয়েছে এ দিকে? চেহারা দেখলে বোবা যায় না আমরা কারা? তাদের মধ্যে থেকে
সব থেকে উন্দৰ ছেলেটা এ ধরনের প্রশ্ন করে বসে সরাসরি চার্জ করার ভঙ্গিতেই । মনে হয়,
পেছনে সশ্রম অনুকূলীন দল না থাকলে বোধহ্য তারা ধরেই ফেলতো আমাদের । কষ্ট হয় বেশ
সুশ্রী মতো দেখতে এই তরুণ ছেলেদের এই ধরনের ব্যবহারে নিজেকে সংযত রাখতে হয়
ততোধিক কঠে । পাশে দাঁড়ানো আহিদারের ঢোয়াল শক হয়ে উঠেছে, হাত মুষ্টিবন্ধ দেখতে
পাই । ইশারায় ওকে সংযত হতে বলি । নিজেকেও শেষ পর্যন্ত সংবরণ করি । এই পরিস্থিতিতে
হাসা যায় না । তবুও হেসে উঠি । বলি, তোমরা এখানে যা খুশি করতে পারো । আমাদের তাতে
বলার কি থাকতে পারে? রাগো কেনো? রাগের মতোতো কিছু ঘটে নি । রাগী কঠের ছেলেটা
আমাদের কথায় সম্ভবত দমে যায় কিছুটা । আর তাই আমাদের দিকে তাকিয়ে দেখে ভালো
করে । তবুও তার গলার কাঠিন্য বজায় রেখে বলে, আমরা স্বাক্ষরকৌজ এ সেঁষ্টিরে । আপনারা
আমাদের খোজ নেবার কে? কোথায় যাওয়া হবে শুনি? এজন আহিদার বলে, আমাদের চেহারা
দেখে বুঝতে পারো না আমরা কারা? তোমাদের পাশেই আৰু । ভুভাবে কথা বলতে পারো না?

— ভুভা শিখতে হবে নাকি আপনাদের কেই থেকে? এবার তার পাশ থেকে অন্য
একজন ছেলে তার গলার সাথে গলা ছেলে(৩) এদের সাথে কথা বলে অথবা ঝগড়ার মধ্যে
ফেঁসে যেতে হচ্ছে । ছেলেগুলো কেনেভে এরকম বেয়াদপি আর উন্দৰ আচরণ করছে,
ব্যাপারটা সত্যি ভালো লাগে না । প্রত্যুক্তে শত সহস্র তরুণ-মূবককে সংক্ষিপ্ত টেনিং দিয়ে
হাতে হাতিয়ার তুলে দেয়া হয়েছে সেই হাতিয়ারই কি এদের উদাম আর এমন বেপরোয়া
হতে শিখিয়েছে । একজন মুক্তিযোদ্ধার কথাবার্তা ও আচার-ব্যবহার ভন্দ, মার্জিত না হলে
এবং তার মধ্যে দৈর্ঘ্য আর সহনশীলতা না থাকলে সে কীভাবে প্রভাবিত বা পরিচালিত
করবে অন্যদের বা দেশের সাধারণ মানুষকে? মনে হয়, এই ছেলেগুলো ঠিকভাবে নেতৃত্ব
পাচ্ছে না । এদের কাছ থেকে চলে যাওয়াই ভালো । এ ধরনের কথাবার্তা থেকে খারাপ কিছু
ঘটে যেতে পারে । তাদের পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যাবার জন্য তাই পথ ধরি । হঠাৎ সেই
অবস্থায় আমাদের দেখে একটা পাতলা গড়নের ফর্সা চেহারার ছেলে বসা থেকে উঠে
আসে । বলে, যাবেন কোথায় আপনারা? তার কথা নরম আর যিষ্ঠি । বেশ আন্তরিকতাপূর্ণ ।
বলি, মালেকের সাথে দেখা করতে যাবো, কোথায় পাবো তাকে? হাতের জজনি তুলে সোজা
রাস্তাটা দেখিয়ে বলে, সোজা রাস্তা ধরে চলে যান । ডাইনে দেখবেন পুকুর । পুকুরের পাশে
একটা বড়ো টিনের বাড়ি ওখানেই পাবেন তাকে । ধন্যবাদ দিয়ে চলা শুরু করতেই ছেলেটা
আবার বলে, আপনাদের পরিচয়টা কিন্তু জানা হলো না ।

— আমার নাম আহিদার আর ইনি মাহবুব ভাই, এবার নিশ্চয়ই চিনবে আমাদের ।

— ছেলেটা কিছু বলে না, শুধু ঘাড় কাত করে, পেছনের ছেলেগুলোও মাচা থেকে নেমে
সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে যায় । বোবা যায়, আহিদারের তুলে ধরা আমাদের পরিচয় ওদেরকে

সচকিত করে তুলেছে। পাশের ইউনিটের দুঁজন সিনিয়র কমান্ডারের সাথে দুর্বিবহার করে ফেলেছে, ব্যাপারটা ভেবে ওরা হয়তো এখন কিছুটা অস্তির, নয়তো মনে মনে লজিজ্ঞ হবে। তব পাওয়াটাও অস্বাভাবিক কিছু নয়।

কোম্পানি কমান্ডার মালেকের দরবার এবং প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা

কোম্পানি কমান্ডার মালেককে তার আস্তানার সামনে পাওয়া যায় চেয়ার টেবিল নিয়ে বসে থাকা অবস্থা। সামনে দাঁড়ানো তার বেশকিছু লোক। যেনো দরবার বসিয়েছে। বেশ জাঁকালো অবস্থা। আমাদের পরিচয় পেয়ে বসা থেকে উঠে আসে। উঁধ সংবর্ধনা। প্রায় জড়িয়ে ধরে তার পাশের চেয়ারে বসায় আমাদের। লম্বা চওড়া স্বাস্থ্যবান মানুষ আবদুল মালেক। এ ইউনিটের কোম্পানি কমান্ডার। এখানে বীতিমতো দরবার সাজিয়ে বসে লোকজনের আর্জি তলছে। বিচার করছে। এখন চলছে একজন অভিযুক্ত লোকের বিরুদ্ধে শুনানি। অভিযুক্ত লোকটি কোম্পের দড়ি বাঁধা অবস্থায় সামনে দাঁড়ানো। একজন সাক্ষীর জেরা চলছিলো। মালেক আমাদের আপ্যায়নের জন্য হাঁক দেয়। মেহমান আসছে, তাড়াতাড়ি চান্সাতার ব্যবস্থা করো। মুখে বিনয়ের হাসি ফুটিয়ে বলে, একটু বসেন, বিচারটা সেরে নিই।

— কিসের বিচার চলছে? জানতে চাই।

— আর বলবেন না, কতো রকমের যে নালিশ মানুষের। যুদ্ধ করবো, না মানুষের নালিশের বিচার করবো? এই হারামজাদা নাকি দালাজ প্রাকস্তানি স্পাই। একে ধরে আনা হয়েছে। কিন্তু এ বলছে, জায়গা-জমি নিয়ে শক্ততাৰ জন্য তার বিরুদ্ধে এই নালিশ আনা হয়েছে। এখন দুই পক্ষের সাক্ষী যোগাড় করছে হচ্ছে। জলপাইগুড়িতে লোক পাঠানো হয়েছে এই ব্যাটার পক্ষে সাক্ষী আনার জন্য। তাৰঁগুড়িক সাক্ষী নাকি এখন থাকে জলপাইগুড়িতে শরণার্থী হিসেবে, যার কাছ থেকে সে জন্ম গ্রহণ কৰেছে। সাক্ষীকে নিয়ে আজ আসবার কথা।

— আর ঐ লোকটা? ওকে? আর একজন পিটুনি খাওয়া আহত লোকের দিকে ইশারা করে জানতে চাই। লোকটাৱ দিকে তাকিয়ে মালেক খিণ্টি করে উঠে, ও হারামজাদা বউ ছেড়ে দিয়েছে। প্রথম বউকে ছেড়ে আর একটা বিয়ে করছে। প্রথম পক্ষ এসে নালিশ করেছে এর বিরুদ্ধে, মারাধোর করে নাকি শালার ব্যাটা তাকে তাড়িয়ে দিয়েছে। এখন ধরে এনে বানানোৰ পৰ বলছে, সে বউ ছাড়ে নাই। অন্য একজনের হাত ধরে সে তেগেছে।

— এতো দারুণ সমস্যা! চমৎকৃত হয়ে আমি বলে উঠি।

— সমস্যা মানে, এ রকম সমস্যার অন্ত নাই। এখন এ শালা বউ ছেড়েছে, না তার বউ ভেগেছে, সেটা প্রমাণ কৰার জন্য জলপাইগুড়ি, হলদিবাড়ি ও মানিকগঞ্জে লোক পাঠানো হয়েছে।

— বউটা কোথায়? মালেকের কথার পিঠে জিগ্যেস করি।

— সে তো শরণার্থী শিবিরে, মানিকগঞ্জে। তাকেও আনতে গেছে লোক।

— কাদের পাঠাচ্ছেন এই সব সাক্ষী-সাৰুদ যোগাড়ে? তথ্যটা জানতে চাই।

— কাদের আবার, আমাদের লোক, এফ.এফ. মুক্তিবাহিনীৰ ছেলেদেৱ, সিভিল ড্রেসে এদেৱ কাছে ঠিকানা নিয়ে কয়েকজনকে পাঠানো হয়েছে। এজন্য পয়সা খৰচ হচ্ছে। ছেলেদেৱ অপাৱেশন ছেড়ে অন্য কাজে পাঠানো হচ্ছে; এছাড়া কী আৱ কৰা যাবে? বিচারটা ঠিকমতো কৰতে না পাৱলে তো আল্লাৱ কাছে দায়ী থাকতে হবে।

চা-নাস্তা আসে। মালেক অতিথি সেবায় তৎপর হয়ে ওঠে। সামনে জড়ে হয়ে থাকা লোকদের জানিয়ে দেয়, এখন বিচার সভা শেষ। আবার কাইল চলবে বিচার। এখন যান আপনারা। কেবল এই দুইটা বাদ্য থাকবে সাক্ষী না আসা পর্যন্ত। মালেকের নির্দেশ অনুযায়ী পেছন থেকে দুজন এসে অভিযুক্ত ধৃত ব্যক্তিদের নিয়ে যায় বাড়ির ভেতরে। ভিড় সরে গেলে এবার মালেক বলে, বলেন কেমন আছেন, হঠাতে কী মনে করে এসেছেন? আমি দু'একদিনের মধ্যে আপনাদের সাথে যোগাযোগ করতাম। দেবীগঞ্জ থানা আক্রমণের প্র্যান করেছি। এ ব্যাপারে আপনাদের সাহায্য-সহযোগিতা আমাদের দরকার। আমরা নিজেরাই দেবীগঞ্জ আক্রমণ করবো। আপনারা শুধু সাকোয়া শালডঙ্গা হয়ে বোদাআলাদের আটকে রাখবেন। এরপর ক'দিন আগে তাদের করা দেবীগঞ্জ আক্রমণের বিস্তারিত বিবরণ দিতে থাকে। আমি ঝুঁটিয়ে ঝুঁটিয়ে দেখি মালেকের আস্তানা। তার প্রতিরোধ ব্যবস্থা।

যে বাড়িটাকে মালেক আস্তানা অর্থাৎ হাইড আউট করেছে, সেটা স্থানীয় এক জোতদারের মস্ত বড়ো বাড়ি। বড়ো বড়ো টিনের ঘর, গাছগাছালি আৰ সুপুরি বাগানে ঘেৱা। অনেক জায়গা বাড়িটার। বাঁয়ে বড়ো একটা পুকুৱ। তার পাশ দিয়ে চলে পেছে কাঁচা রাস্তা ভাঙলাগঞ্জ বড়শশী হয়ে চিলাহাটি পর্যন্ত। পুকুৱের চারদিকে বাঙ্কার আৰ ট্ৰেঞ্চ তৈরি কৰা হয়েছে প্ৰয়োজনে ব্যবহাৰ কৰাৰ জন্য। মালেক জানায়, এটা তার কোম্পানি হেড কোয়ার্টাৰ। এখান থেকে সে যুদ্ধ পৰিচালনা কৰে থাকে। পেছনে নদীৰ ওপৰে রয়েছে আৰ একটা আস্তানা। সেখানে লঙ্ঘৰখানা, টোৱস—এগুলো রয়েছে। এক প্লাটুন এসেছে ও থাকে ওখানে। সামনে প্ৰায় আধমাইল দূৰে রয়েছে আৰ একটা প্লাটুন। রাস্তাৰ প্ৰাণিশহ একটা বাড়িতে গোপন আস্তানা অর্থাৎ হাইড আউট পেতেছে ওৱা। গতকাল এসেছে নতুন একটা প্লাটুন। ওদেৱ রাখা হয়েছে সামনেৰ গ্ৰামে। গোলাবাৰুদসহ মাইন, ক্রেতিপ্রাসিত ও অতিৰিক্ত হাতিয়াৰ সব এই হেড কোয়ার্টাৰে অর্থাৎ এই আস্তানাতেই রাখা হয়েছে। সামনেৰ আকবৰেৰ প্লাটুন রয়েছে প্ৰথম সাৰিৰ ডিফেন্স হিসেবে। আকবৰ সেলালাতে না পাৰলে আমৰা এখানে রয়েছি। চারদিকে বাঙ্কার, ট্ৰেঞ্চ ইত্যাদি কৰে এমনভাৱে ডিফেন্স কৰা হয়েছে যে, শক্তিৰ বাপৰে ক্ষমতা নেই এখানে হানা দেয়। তবুও যদি আসে, তবে পেছনে নদীৰ ওপৰেৰ পাটি রয়েছে। নদী পাৰ হয়ে চলে আসবে ওৱা। আৰ নতুন ছেলোৱা তো সামনেই আছে। ওৱাও এসে বাঁপিয়ে পড়বে। মালেকেৰ কথা অনুযায়ী এই হচ্ছে তাৰ ছেলেদেৰ বিন্যাস ব্যবস্থা এবং তাদেৰ সামনে, মধ্যে এবং পেছনে এই লাইনে তিন স্তৱবিশিষ্ট প্ৰতিৰক্ষা ব্যবস্থাৰ বৰ্ণনা। সামনেৰ অবস্থানে থাকা আকবৰ অত্যন্ত দুর্বৰ্ধ কমান্ডাৰ। তাকে পৰাণ্ত কৰে শক্তিৰ পক্ষে এগিয়ে আসা কঠিন। এখানে তাৰ কোম্পানি হেড কোয়ার্টাৰে সে আৰ তাৰ সেকেন্ড ইন কমান্ড গোলাপসহ অন্য কমান্ডাৰৱা থাকে। এক প্লাটুন শক্তিশালী ছেলেও এখানে রাখা হয়েছে। অপাৱেশন পৰিকল্পনা প্ৰয়োজনেৰ জন্য কমান্ডাৰদেৰ এখানে থাকা প্ৰয়োজন। শুধু আকবৰ থাকে সামনে এবং পেছনে থাকে লঙ্ঘৰ কমান্ডাৰ। প্ৰয়োজনে আকবৰেৰ সাথে সমন্বয় কৰা হয়।

মালেকেৰ প্ৰতিৰক্ষা ব্যবস্থা এবং অপাৱেশনাল প্ৰ্যানগুলো নিয়ে আমাৰ মন ঝুঁতুঝুঁত কৰে। এতো বেশি প্ৰকাশিত মালেকেৰ হেড কোয়ার্টাৰ! চিলাহাটি পর্যন্ত উৰু বড়ো রাস্তা, কোথাও প্ৰতিবন্ধকতা নেই। এতো লোকজনেৰ আনাগোনা, দেনদৰবাৰ আৰ বিচাৰ-সালিশ যে এদেৱ মধ্যে কে শক্তি, কে মিত্ৰ বোৰা মুশকিল। এদেৱ মধ্যে শক্তিৰ অনুচৰ থাকা বিচিত্ৰ কিছু নয়। মালেকেৰ খোলামেলা প্ৰতিৰক্ষা ব্যবস্থাৰ কল্যাণে তাৰ দখলে থাকা

হাতিয়ারপত্রসহ গোলাবার্কদের মজুদ এবং যুক্ত করবার শক্তি সংক্রান্ত সব ধরনের তথ্য হয়তো শক্তির অনুচরদের মাধ্যমে পৌছে যাচ্ছে পাক সেনাবাহিনীর ক্যাপ্সে। এইসব পাক অনুচর বঙ্গ সেজে তাকে সহযোগিতা করার নাম করে তলে তলে তার সর্বানাশ করে যাচ্ছে। মালেক গেরিলা যুদ্ধের নিয়মকানুন বা এথিক্স ইত্যাদি অনুসরণ করছে না। সে নিয়মিত সেনাবাহিনীর মতো ডিফেন্সিভ এবং অফেন্সিভ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে চেয়েছে। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সাবেক সৈনিক সে। তার মনের মধ্যে নিয়মিত সেনাবাহিনীর যুদ্ধের কায়দা-কৌশলগুলোই কাজ করছে। মনের মধ্যে কেমন যেনো একটা বিপদের আশঙ্কা জেগে উঠে। তাই নিজেকে সং্ঘত রাখতে পারি না। কথাটা বলেই ফেলি, 'মালেক সাহেব, আমাদের তো গেরিলা যুদ্ধ করার কথা। আপনি যেভাবে ওপেনলি ডিফেন্স সাজিয়েছেন, এটা কি ঠিক হচ্ছে? আমাদের তো বাস্কা-ট্রেনিং করার কথা নয়। আমরা এমন জায়গায় হাইড আউট নিয়ে থাকবো, যাতে আশপাশের মানুষও তা জানতে পারবে না।

দিলখোলা হাসি হাসে মালেক আমার কথা শনে। বলে, কী হবে ওভাবে থেকে? এতেওলো মুক্তিযোদ্ধা লোক-লক্ষ্য নিয়ে কি গোপনে হাইড আউটে থাকা যায়? আমরা যে ব্যবস্থা নিয়েছি, শালারা আসতেই পারবে না। দেখুক না একবার চেষ্টা করে।

সে এক রাজকন্যা—দিনমজুর গাইডের ভাগ্যে

পুরুরের পাড় দিয়ে তখন চার-পাঁচজন ভারবাহী ক্লান্তিক দেখা যায়। উদিকে তাকিয়ে মালেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে সে বলে, খাবার নিয়ে যাচ্ছে তারা ভারে চাপিয়ে আকবরের পার্টির জন্য। রান্না হয় একসাথে সবার নদীর প্রেরণের প্রথম ক্যাপ্সের লঙ্ঘনখানায়। সেখান থেকে ভারে করে বাশের ডালায় ভাত আর ক্ষেরোসিনের টিনে তরকারি-ডাল ইত্যাদি বয়ে আনে এরকম ভারবাহী পার্টি। কিছুক্ষণের মধ্যে আসবে আমাদের হেড কোয়ার্টারের খাবার। আপনাদের থেয়ে যেতে হবে।

— না, না আজ নয় বলে ঝটিলাড়াই। বলি, আপনার সাথে পরিচিত হতে এবং আমরা যে কুমারপাড়ায় হাইড আউট করেছি সেটা জানাতে এসেছিলাম। কখন, কবে প্রয়োজন পড়ে তার তো ঠিক নেই। আমরা একজনের প্রয়োজনে যাতে অন্যজন দৌড়ে আসতে পারি, এ ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করতেই এসেছিলাম।

— আলোচনা তো হলো, আন্তরিকভাবে বলে মালেক, আমরা নিজেদের মধ্যে সহযোগিতা অবশ্যই রাখবো। দেবীগঞ্জ আক্রমণের দিন ঠিক করে ফেলা হলেই আপনাদের কাছে খবর যাবে। প্রয়োজনে আমি নিজেও যেতে পারি বিস্তারিত আলোচনার জন্য। চলেন, আপনাদেরকে আমাদের ভেতরের অবস্থা দেখাই, বলে সে আমাদের বাড়ির ভেতরে নিয়ে যায়। দেখায় তাদের অন্তর্গার ও থাকার জায়গা এইসব। সেকশন কমাত্তার মজিদ থাকে সাথে। সে-ই ঘুরিয়েফিরিয়ে দেখায় সবকিছু। কিন্তু না, এবার যেতে হবে। বিদায় নিতে হবে। বাইরে এসে, মালেক নাছোড় বাঢ়া, না এতোদূর থেকে এসেছেন, থেয়ে যেতেই হবে বলে জেদ করতে থাকে। তার পায়ে পায়ে ঘোরে কুচকুচ কালো গায়ের রঙের একজন লম্বা পাতলা গড়নের মানুষ। চেহারা-সূরত দেখতে তেমন ভালো নয়। মালেক তাকে দেখিয়ে বলে, এ হচ্ছে আমাদের গাইড। যুব ভালো আর বিশ্বাসী মানুষ, এর বিয়ে দিয়েছি এই বাড়ির মেয়ের সাথে।

— তার মানে? চমকে উঠে জিগ্যেস করি।

— তার মানে আবার কি? এটা কার বাড়িতে আছি জানেন তো? মুসলিম লীগার এক দালালের বাড়ি। এই ‘গাইডার’ এই বাড়িতে কামকাজ করতো। তাতে কি হইছে? এগুলো মানুষ, নাকি? এর পছন্দ বাড়ির বড় মেয়েটাকে। তো চাকর-বাকরের সাথে জোতদার মানুষ তার মেয়েকে কি আর বিয়ে দেয়? কিছু ব্যাটা দালালের বাচ্চাকে এখন দিতে হয়েছে। তাকে বলে দেয়া হয়েছে, হয় তুমি আমার ‘গাইডারের’ সাথে তোমার সুন্দরী মেয়ের বিয়া দাও, তা না হলে দালাল হবার অপরাধে তোমার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। তখন ব্যাটা রাজি হয়েছে। দুই-একদিনের মধ্যেই বিয়ের অনুষ্ঠান, ধূমধাম হবে। এইভাবে শালা দালালদের প্রতিশোধ নিতে হবে। এই পর্যায়ে মালেককে কেমন ক্ষ্যাপাটে ক্ষ্যাপাটে লাগে। জোতদার ঘরের ঝুঁপসী সুন্দরী মেয়ের সাথে তাদের কাজকর্মের মানুষ যে এখন কি না মুক্তিযোদ্ধাদের গাইড, তার বিয়ে দেয়া হয়েছে। জোতদার মানুষটা না হয় তার প্রাণের মায়ায় এ বিয়েতে রাজি হয়েছে, কিছু সেই মেয়েটি? তার অবস্থা কি? ভালো করে তখন তাকাই মালেকের কথিত সেই কালো ঢাঙ্গ গাইডার মানুষটার দিকে। যুদ্ধ আজ তাকে একটা অমূল্য রঞ্জ পাওয়ার সুযোগ করে দিয়েছে। রাখতে পারবে কি সে তার সেই পরম পাওয়া অমূল্য রঞ্জটিকে? কে জানে!

মালেকের খাওয়া তখনো আসে না। আমরা বিদায় নেয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছি। নতুন হাইড আউটে একরামূল একা, কিছু একটা বিপদ আবার নেওঁচুট যায়। আমাদের ওই অবস্থা দেখে মালেক বলে, ঠিক আছে যান, কিছু যাবার সম্ভব থিয়ে যাবেন আমাদের পেছনের ক্যাম্প থেকে, কথা দেন! ক্যাম্পটাও দেখা হবে। বাঁওয়াদাওয়া হয়ে যাবে আপনাদের। এই দুপুরে আপনারা না থেয়ে যাবেন, এটা হয় না।

মজিদকে ডাক দেয় মালেক। সে একেশ্বরকে বলে, এই মেহমানদের তুমি নিয়া যাও। নিজে থাইক্যা যত্ক কইরা খাওয়াইবা বিদেয়ের সময় হাত জড়িয়ে ধরে আবেগমিথিত গলায় অনেকটা শপথের মতো করে মার্কেটেলে, কুমিল্লা জেলায় বউ-বাচ্চা-পরিবার ফালায়া ঝুইয়া আসছি। এমনিতে পাকিস্তানি সেন্টাইনার পলাতক সৈনিক আমি। তার ওপর মুক্তিবাহিনীতে যোগ দিছি। ওরা হয়তো মারি ফ্যালাইছে আমার বই-বাচ্চা, আঘীয়ান্ত্রজনরে। বাড়িঘর জ্বালাই দিছে, কোনো খবর পাই নাই তাগো। বাঁচাই আছে, না মইরা গেছে, তাও জানি না। শালাগো আমি ছাড়য় না। খানের বাচ্চাদের পাইলে শ্যায় করিয়া ফ্যালামু। মালেক তার গভীর বিশ্বাস আর শপথের মধ্যে ক্ষ্যাপাটে চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। মজিদকে নিয়ে আমরা পথে নামি। কমান্ডর গোলাপের সাথে দেখা হয় না। নদীর ওপারে কোথায় যেনো গেছে সে।

মালেকের প্রথম ঘাঁটিতে পৌছাতে নদী পার হতে হয়। বেশ কিছুটা হেঁটে একটা জংলা মতো জায়গায় ক'খানা পরিত্যক্ত ঘরবাড়িতে স্থাপিত হয়েছে এ ঘাঁটি। চমৎকার নিরাপদ জায়গা। এখান থেকে বর্ডারও বেশি দূর নয়। এখানেই মালেক তার মূল হাইড আউট অর্থাৎ হেড কোয়ার্টার স্থাপন করতে পারতো। এখানে এই চমৎকার নিরাপত্তা বেষ্টনীর মধ্যে থেকে সে তার দলকে ছোট ছোট ভাগে ভাগ করে সামনের বিভিন্ন সুবিধেমতো জায়গায় হাইড আউটের জন্য নিতে পারতো। নির্দিষ্ট অপারেশন থেকে আবার ফিরে আসতে পারতো এখানে। তা হলে এইসব ডিফেন্স এবং শক্রুর হ্যাকির সম্মুখে তাকে থাকতে হতো না। এদিক থেকে চাউলহাটি ইউনিট বেসের মুক্তিযোদ্ধাদের পরিচালনা পদ্ধতি সঠিক বলে মনে হয় আমাদের কাছে। হেমকুমারী বেসের কমান্ডিং অফিসার তার অধীনস্থ মুক্তিযোদ্ধাদের

গেরিলা যুদ্ধের সঠিক দিকনির্দেশনা দিতে ভুল করেছেন। মুক্তিযোদ্ধাদের যে পরিমাণ অস্ত্র আর গোলাবারুন্দ দেয়া হয়েছে, তা দিয়ে টুকটাক গেরিলা যুদ্ধই শুধু করা যেতে পারে, পাকিস্তানিদের সমরাত্মের সাথে সরাসরি যুদ্ধে চিকে থাকা সম্ভব নয় এই শক্তির সাহায্যে। তাদের ঠেকানো যেতে পারে নিজেদের সুবিধাজনক অবস্থানে থেকে, কিন্তু বাক্সার ট্রেক্সে থেকে নিয়মিত বাহিনীর মতো এই ছেলেদের নিয়ে এবং সামান্য অন্তর্শক্তি নিয়ে কিছুতেই টিকে থাকা সম্ভব নয়। মালেক যা করছে, সেটা তার নিষ্ঠক স্ফ্যাপাটে ধরনের চিন্তাভাবনা থেকেই। তার কমাডিং অফিসারও তাকে এ ব্যাপারে সুষ্ঠু গাইড লাইন দিতে পারে নি।

এই ক্যাম্পের ছেলেরা বেশ ভালো। বেশ আন্তরিকতার সাথে তারা গ্রহণ করে আমাদের। আপ্যায়নও করে স্থগণ যত্নে। তাদের ধন্যবাদ দিয়ে আমরা আবার পথে নেমে আসি।

২৬. ৯. ৭৩

ব্যতম রাজাকার কমান্ডার ঘৃটু

হাইড আউটের অবস্থা মহাগরম। উৎসাহ-উদ্দীপনায় সবারই ফেটে পড়বার উপক্রম। একটা উৎসবের ছোয়া লেগেছে যেনো সবারই মনে। বেলা তিনটার দিকে জমাদারপাড়া থেকে হাইড আউটে ফিরে আসতেই একরামুল দৌড়ে সামনে এসে দাঁড়ায় আর ততোধিক উৎসাহের সাথে বলে ওঠে, ঘৃটু ভাক্সার ব্যতম।

—তার মানে? কী হয়েছে কথাটা বলেই তাকে এক হাতে দিয়ে জাপটে ধরে নিয়ে এসে বসে পড়ি ঘরের উচু ধাপের ওপর। বলি, বল এবার কী হয়েছে ঘৃটু ভাক্সার ব্যতম হলো কীভাবে?

সফলতার আনন্দে চকচক করছে তার দুটো হাতে। মুখে তারই খুশিতে বিন্দু লাজুক হাসি। মুহূর্তে ঘৃটু ভাক্সারের কাছ থেকে দখল করা হাতিফেল নিয়ে এসে আমার সামনে রাখে। পুরাতন মার্ক-৩ রাইফেল। নেড়েচেড়ে দেখি অস্ত্রটা। একরামুল বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করে সকালবেলাকার তার সফল অভিযানের কথা। তার সহগামীসহ অন্যরাও দাঁড়িয়ে থাকে সামনে। আহিদার বসা আমার পাশ দেঁকে তারও মুখে খুশির হাসি এখানে আসবার সাথে সাথে এ ধরনের একটা বিরাট সাফল্যের খবর পেয়ে। আমার হাত থেকে রাইফেলটা নিয়ে সে নেড়েচেড়ে দেখতে থাকে।

আমরা সকালে বের হয়ে যাবার পর একরামুলের কাঁধে হাইড আউটের সামগ্রিক দায়িত্ব এসে চাপে। বাইরে সেন্ট্রি মোতায়েন রেখে একদল ছেলেকে লাগিয়ে দেয় হাতিয়ারগুলো পরিষ্কার করে তেলটেল দিয়ে পুল ফুল মারতে। আরেকটা দলকে নিয়ে নিজে লেগে পড়ে হাইড আউটের ভেতর এবং চারপাশেকার জঙ্গল ও বোপবাড় পরিষ্কার করার কাজে। গতকাল বেশ ক'টা সাপ দেখা গেছে বাড়ির উঠোনে এবং তার আশপাশে। কাঁকড়া-বিছা জাতীয় পোকামাকড়েরও এখানে অন্ত নেই। পানি থেকে সোজা উঠে আসে ঘরের ভেতরে বা উঠোনে-দাওয়ায়। আঙিনা জুড়ে থকথকে কাদা, হাঁটাচলার সুবিধার জন্য ভাঙ্গা ইট আর কাঠের তক্তা এইসব বিছানোর কাজেও লাগিয়েছে দুতিনজলকে। লঙ্ঘন কমান্ডারের খুব কষ্ট। বর্ষার দিন বলে সবকিছু ভিজে সয়লাব। শুকনো লাকড়ি পাওয়াই মুশকিল। পাশের বাড়ির পড়ে যাওয়া ঘরের বাঁশের বেড়া-খুঁটি এসবও খুলে আনতে হয়েছে। দুপুরের আহারের যোগাড়যন্তর চলছে তখন লঙ্ঘনখানায়। হাইড আউট জুড়ে ছেলেরা মোটাঘুটি নিজেদের কাজে ব্যস্ত। একটা ঢিলোচলা নিরন্দেগ ভাব সবার মধ্যে। ঠিক এমন সময় নদীর ওপার থেকে ডাক ভেসে আসে।

একদল মানুষ ছুটোছুটি করতে করতে আসে। হাসান মার্বিই তাদের নদী পার করিয়ে নিয়ে আসে হাইড আউটে। ভীত-সন্ত্রিত ভাব লোকগুলোর চোখেমুখে। তাদের কাছ থেকে জানা যায় ঘুটু ডাক্তারের নেতৃত্বে একদল রাজাকার এসেছে। তারা লুটপাট করছে। মানুষজনকে মারধোর করছে। শুধু তাই নয়, তারা মনুসহ অন্যদের খৈজন্ধবর চাইছে। তাদের মূল উদ্দেশ্য মনুকে ধরে নিয়ে যাওয়া। তাকে না পেলে হয়তো ব্যাপক লুটরাজ চালাবে তারা। হয়তো যাবার সময় বাড়িঘরে তাদের তরফ থেকে আগুন লাগিয়ে দেয়াও বিচ্ছিন্ন কিছু নয়।

সংবাদটা বিচলিত করে একরামুলকে। কী করবে ত্বরে পায় না সহজে। মাহবুব ভাই নেই। তার সাথে যোগাযোগ করাও এই মুহূর্তে সম্ভব নয়। এদিকে সময়ও নেই। খবর নিয়ে আসা লোকজনের মধ্যে অস্থির তাগাদার দাপাদাপি। একরামুল তখন একা একাই সিদ্ধান্ত নিয়ে নেয়। সে যাবে মারেয়ায় রাজাকারদের মোকাবেলা করার জন্য। দ্রুত তৈরি করে ফেলে ১২ জনের একটা দল। তারপর আগত লোকদের সাথে করে ছুটে চলে নদীর দিক বরাবর। দুর্বারে তাদের সবাইকে নদী পার করিয়ে দেয় হাসান মার্বি। নদীর ওপারে বিস্তীর্ণ ঘাসে ছাওয়া প্রস্তর। মাঝে মাঝে কাঁটা গুলোর বোপবাঢ়। ওরা দৌড়তে থাকে বোপবাঢ় প্রস্তর ভেঙে এলোমেলো উদ্ভাস্তের মতো। তারা কোথায় যাচ্ছে, জানে না, কীভাবে তারা মোকাবেলা করবে রাজাকার দলটির, সে ব্যাপারেও তাদের নেই পরিকল্পিত কোনো ধারণা। রাজাকারদের মোকাবেলা করতে হবে, তাদের সাথে যুদ্ধের্বিষ্ণ হয়ে তাদের তাড়িয়ে দিতে হবে, গ্রামবাসীকে রক্ষা করতে হবে তাদের অত্যাচার আম সূচিতরাজের হাত থেকে। কেবল এ চিঞ্চাটুকু সম্বল করেই ওরা দৌড়ে চলে। সাথে দৌড়ে চলা মানুষগুলো যেদিকে তাদের গাইড করে নিয়ে যায়, ঠিক সেদিক পানে।

এক সময় তাদের দৌড় শেষ হয়। যান্ত্রিক গামের দক্ষিণে নয়াদিঘি-বোদা রাস্তার পাশে কয়েকটা বাড়িঘরের মধ্যে একটা টিনের ত্বরের দিকে আঙুল দেখিয়ে একজন বলে, ওখানেই ওরা আছে স্বত্বত। ভয় পাওয়া কুকুর গ্রামবাসী একরামুলদের উপস্থিতিতে মনোবল ফিরে পেয়ে এগিয়ে আসে। বলে, লুটক্রমজের মাল নিয়ে তারা বাড়িতে চুকচে। ঘুটু ডাক্তার ৭ জন রাজাকারের দল নিয়ে এসেছে। সবার কাছে রাইফেল আছে। সবাইকে ভয় দেখাচ্ছে তারা। বলছে মনুসহ অন্যান্য আওয়ামী লীগার এবং জয় বাংলার লোককে হাজির করো, নইলে নিষ্ঠার নাই কাহারো। একটু দয় নিয়ে লোকটা আবার বলে, ওয়রা বুঝিল আজ ছাড়িবেনি হামাক। গোটা গ্রাম জুলায়ে দিবে। দুপুরে খাওয়াদাওয়া করিবে ঐঠে। ফির নাবিমে উমহার কাজোত। তার মানে রাজাকারের দল এখন ঘুটু ডাক্তারের বাড়িতে সমবেত হয়েছে তাদের লুটরাজের প্রাথমিক পর্ব সেরে। এখন চলছে ভূরিভোজ। ওদের ওপর আক্রমণ চালাবার এটাই মোক্ষম সুযোগ বলে মনে হয় একরামুলের কাছে। ছড়িয়ে-ছিটিয়ে অবস্থান নিয়ে ছেলেদের সে একযোগে গুলিবর্ষণের আদেশ দেয়। টার্ণেট করা বাড়ি লক্ষ্য করে। হঠাৎ করে এ ধরনের গুলিবর্ষণের শব্দে সকালবেলাকার গ্রামীণ শাস্ত সমাহিত পরিবেশটা ভেঙে খান খান হয়ে যায়। সচকিত হয়ে যায় সবাই। চিংকার আর ছোটাছুটি করে পালাতে থাকে গ্রামের মানুষজন যে যেদিকে পারে। বাড়ির বউ-বি-মেয়েরাও পালাতে থাকে গ্রামের পেছন দিকে। তাদের সবার মনে শক্তা, রাজাকার বাহিনীর সাথে বিরাট একটা যুদ্ধ লেগে গেছে মুক্তিযোদ্ধাদের। রাজাকাররা সহজে ছাড়বে না। কেন্দ্রা, তাদের সাথে রয়েছে এ এলাকার সব থেকে বড় শাস্তি কমিটির দালাল আর রাজাকার কমান্ডার ঘুটু ডাক্তার।

একরামুলদের ঝড়ের বেগে গুলি চালানোর জবাবে ওপাশ থেকে প্রথম কোনো সাড়া মেলে না। তারপর বিচ্ছিন্নভাবে কয়েক রাউণ্ড গুলি ছুটে আসে বাড়ির ভেতর থেকে। রাজাকারের দল সংঘবন্ধ প্রতি-আক্রমণ শুরু করতে পারে না। বিচ্ছিন্নভাবে ফাটফুট করছে মাত্র। আর সেটা ঘুটু ডাঙ্কারের বাড়ির ভেতর থেকেই। ওদের আর সংহত-সংঘবন্ধ হওয়ার সুযোগ দেয়া ঠিক হবে না এই ভেবে একরামুল এগিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত নেয়। আমের লোকজনদের পেছনে থাকতে বলে তারা এক সাথে ছাড়া ছাড়াভাবে গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে এগুতে থাকে রাজাকার বাহিনীর অবস্থান লক্ষ্য করে। মুক্তিযোদ্ধাদের এইরকম অঞ্চলিয়ানের মুখে রাজাকার বাহিনী ভয় পেয়ে যায়। ঘুটু ডাঙ্কারের বাড়ির পেছন দিয়ে বের হয়ে দৌড়াতে থাকে নয়াদিঘির সড়ক অভিমুখে। শুরা পালাছে বলে ওঠে একজন। ধৰ্ শালাদের, বলে একরামুল দৌড়ে ছুটে চলে তার দলবল নিয়ে পলায়নপর রাজাকারদের দিকে। এক দৌড়ে পৌছে যায় ঘুটু ডাঙ্কারের বাড়িতে। বাড়িটা চার্জ করা দরকার। ওদের সবাই পালিয়েছে কি না, না কেউ কেউ ঘাপটি মেরে পড়ে আছে পেছন থেকে আক্রমণ করার জন্য, সেটা একটুখানি খতিয়ে দেখা দরকার। আর তাই তারা ঝড়ের বেগে চুকে পড়ে ঘুটু ডাঙ্কারের বাড়ির ভেতরে। চুকতেই সামনে পড়ে একটা লোক। রাইফেল তুলে তাদের দিকে গুলি ছুঁড়তে উদ্যত। কিন্তু তার আগেই একরামুলের পেছন থেকে দু'তিনটা অন্ত গর্জে ওঠে এক সাথে। অন্ত থেকে ছেঁড়া গুলির সরাসরি আঘাতে লোকটা ভূল্পিত হয় সাথে সাথে। স্টেডেজ গিয়ে একরামুল তুলে নেয় রাইফেল ভূল্পিত রঙাক লোকটার দেহের অদূর থেকে। যেটা ছিটকে পড়ে গিয়েছিলো তার গুলিবন্ধ হওয়ার সময়। লোকটার পেছনে আরো দু'জন রাইফেলধারী লোক এই সময় চকিতে দেখা দিয়েই চুকে যায় ঘরটার ভেতরে। ওদের ~~বৃক্ষ~~ থাবে— এই বলে একরামুল ঘরের ভেতরে চুকে যায় সহযোদ্ধাদের নিয়ে। না, তাদের ~~প্রশংস্য~~ যায় না। ঘরের পেছনকার বাঁশের বেড়াটা কোনার দিকে ভাঙ। তার মানে তারা ~~বৃক্ষ~~ বেড়া ভেঙে পালিয়েছে প্রাণ নিয়ে। তবে এখনো ওরা বেশি দূর যায় নাই। দৌড়ে দৌড়ে রাস্তার দিকে বলে, সে ছেলেদের নির্দেশ দেয়। রাজাকারদের পলায়নপর অবস্থা জৈবে পেছন থেকে কয়েকজন মানুষ দৌড়ে আসে। তাদের মধ্যে উৎসাহী কয়েকজন ছেলেছোকরা ও রয়েছে। তাদের মধ্যে একজন বলে ওঠে, শালা ঘুটু ডাঙ্কার খতম, শালা শাস্তি কমিটির দালাল রাজাকারের বাচ্চা। ঘুব অসেছিলো মুট করিবার জইন্যে। হামাক বলে ধরে বাক্সে নিয়া যাবে কহছিলো শালা। এখন কি হইলো? কুঠে গেলগে তোর চেলা রাজাকারের দল। সবতো পালে গেল লেজ তুলে। আর তুই পড়ে থাকিল নিজের বাড়িত। লোকটার গলায় একরাশ ঘৃণা ঝরে পড়ে। এ গ্রামেরই লোক ঘুটু ডাঙ্কার ওরফে সবেদ আলী। হাতুড়ে গ্রাম ডাঙ্কার। মুক্তিযুদ্ধের সাথে সাথে দালাল শাস্তি কমিটির নেতা হয়ে যায়। নিজে রাজাকারের ট্রেনিং নিয়ে রাজাকার কমান্ডার সেজে নিজের গ্রামে এসেছে লুটতরাজ আর স্বাধীনতার পক্ষের চিহ্নিত লোকদের ধরে নিয়ে যেতে। নিজেদের গ্রামের একজন লোকের এহেন বিশ্বাসঘাতকতা ক্ষমা করতে পারে না গ্রামবাসী। এতোদিন এর ভয়ে সবাইকে শক্তিত থাকতে হতো। আজ সেই প্রচও ক্ষমতাবান পাকবাহিনীর অন্যতম অনুচর কেমন মুখ পুরড়ে নিষ্ঠেজ পড়ে আছে! দেখা গেলো বাড়ির আঙিনার এক কোণে লুটের মাল জমানো হয়েছে। উপস্থিত একজন মুরবিকে ডেকে আনে একরামুল। সেই মুরবিকে যার যা মাল, তাকে তা বুঁধিয়ে দেয়ার দায়িত্ব দিয়ে বেরিয়ে পড়ে। ছেলেরা তখনো আশপাশের বোপঘাড়গুলো তন্ত্ম করে খুঁজে বেড়াচ্ছে সেখানে পলাতক রাজাকারের কোনো সদস্য

লুকিয়ে আছে কি না তার হন্দিস করার জন্য। না, পাওয়া যায় না। কাউকে পাওয়া যায় না। আর এ অবস্থায় ছেলেদের দ্রুত অন্তর্শ্রমহ পলায়নপর রাজাকারের পিছু ধাওয়া করে ময়াদিঘির রাস্তা ধরে। কিন্তু রাজাকারদের নাগাল আর পাওয়া যায় না। তারা পালিয়েছে উর্ধৰ্ষাসে তাদের প্রাপ নিয়ে। ছেলেরা পলাতক রাজাকারদের ধরতে না পেরে থামে ফিরে এলে সমবেত গ্রামবাসী তাদের প্রাণচালা আবেগ দিয়ে স্বাগত জানায়। কেউ কেউ দোয়া করে এই বলে, ‘বাঁচে থাকো বাবা, অনেকদিন বাঁচে থাকো।’

এরপর সফল অপারেশন শেষে বিজয়ী বীরের মতো ফিরতে থাকে একরামুল হাইড আউটোর দিকে। মাথার ওপর তখন দুপুরের সূর্য। কাঁধে দুলতে থাকে তার সাফল্যের প্রতীক দখল করা শক্তির রাইফেল আর ১০ রাউণ্ড টলি।

২৬. ৯. ৭৩

মারেয়ার যুদ্ধ

এক হাঁটু পানি ভেঙে হাঁফাতে হাঁফাতে এলো হাসান মাঝি। বিকেল গড়িয়ে এসেছে তখন। একরামুলের নেতৃত্বে সকালের সফল অপারেশনের পর ছেলেরা তখন অলসভাবে শয়ে-বসে সময় কাটাচ্ছে। কয়েকজন হাতিয়ারগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া আর পরিষ্কার করার কাজে ব্যস্ত। অন্যরা নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা আর হাসি-ঠাপ্পায় মন্তব্য। শতরঞ্জির বিছানা মাটির মেঝেতে। দুটো ইট দিয়ে বালিশ বানানো হয়েছে। খাটো মাথা রেখে শয়ে আছি। পাশে আহিদার। পাটখামের জোতদার ঘরের ছেলে সে— তার বাড়ির পাশের এক মেয়ের গল্প করছিলো। মেয়েটার জন্য তার একটা গজুটি শুদ্ধযজ্ঞনিত টান আছে, আছে একটা দুঃখবোধও। কোনোদিন কি সে দেখা পাবেন্টো? হয়তো পাবে, হয়তো নয়। কে জানে? আহিদার তার প্রিয় পাটখামের কথা, শুশের বাড়ির মেয়েটার প্রতি তার দুর্বলতার কথা বলছিলো অকপটে। আমি শুনছিলুম। শোনা ছাড়া আর কী-ই-বা করার আছে। এখন যুদ্ধের সময়, সবকিছুই তো অস্থির দেশের মাটিতে ফেলে এসেছি।

তো, এমন সময় হাসান মাঝি এলো হাঁফাতে হাঁফাতে। এক হাঁটু কাদাপানিতে ভিজে জবুথবু পঞ্চশোর্ধ হাসান উদ্ব্রান্তের মতো বলতে লাগলো, ওরা এসে গেছে, মারেয়া আক্রমণ করেছে। তাড়াতাড়ি চলেন।

- ওরা কারা? ত্বরিত লাফিয়ে উঠি শোয়া থেকে।
- রাজাকার আর পাকবাহিনী।
- কে খবর দিলো?
- খোকা, মটুর চাচাতো ভাই।
- কোথায় সে?
- নদীর ওপারে।

সামান্য সময় মিহি ব্যাপারটা বুঝতে। ওরা তা হলে আবার এলো? সকালে একরামুল থাটিকা আক্রমণ চালিয়ে ওদের একজন কমান্ডার মেরে এসেছে, তার প্রতিশোধ নিতে ওরা যে আসবে বা আসতে পারে, এরকম একটা ধারণা বলা যায় মনের মধ্যে প্রায় বদ্ধমূল হয়েই ছিলো। কিন্তু ওরা যে আজ বিকেলের মধ্যেই এসে হাজির হবে, এমনটা ধারণা করা যায় নি। ওরা এসে গেছে এবং আক্রমণ করেছে মারেয়ার ওপর—এটাই এখনকার

বাস্তবতা। সুতরাং যেতেই হবে ওদের মোকাবেলা করতে। তাই দ্রুত সিন্ধান্ত নিয়ে বলি, ও.কে. চলো। একব্রামুল, মধুসূন গেট রেডি, কুইক! যোট দু' সেকশন যাবে। হাতিয়ারপত্র যাবে সব ধরনে। প্রত্যেকের কাছে ফ্লেনেড থাকবে দুটো করে। প্রতি হাতিয়ারের জন্য পঞ্চাশ রাউন্ড গুলি। গেট রেডি উইথ ইন ফাইভ মিনিট্স। আহিদার থাকবে হাইড আউটের চার্জে। প্রয়োজনে খবর পাওয়ার পর সে আমাদের সাহায্যের জন্য রিইনফোর্সমেন্ট করবে।

মাত্র পাঁচ মিনিটের ভেতরেই গোটা দল হাজির হয়ে যায় করতোয়া নদীর পাড়ে। হাসান মাঝি অঙ্গুরভাবে নৌকার দাঢ় ধরে অপেক্ষা করছে। ওপারে ১৬/১৭ বছরের ছেলে খোকা তারস্বত্বে চিংকার করে চলেছে, আপনারা তাড়াতাড়ি আসেন। ওরা আমাদের বাড়ি ঘিরে রেখেছে, গুলি করে মারবে। ধরে নিয়ে যাবে, তাড়াতাড়ি আসেন ইত্যাদি।

হাসান মাঝি ক্ষিপ্রগতিতে দাঢ় টেনে নিয়ে যায় তার খেয়া নৌকো। খোকা দোড়ে আসে। হাউমাউ করে বলতে থাকে পরিস্থিতি সম্পর্কে।

— তারা কতোজন? জিগ্যেস করি।

— দেড়শো জনের মতো হবে, উদ্ভ্বাস্তের মতো জবাব দেয় সে। সংখ্যাটা শুনে ধরকে দাঢ়াতে হয়। কয়েক মুহূর্তের জন্য। তারপরই সবাইকে নির্দেশ দিলাম দৌড়াবার জন্য। সবারই হাতে হাতে অন্ত চলে এলো। ছড়ানো এলাকা দিয়ে আমরা এগুলে লাগলাম। গ্রামের কাছাকাছি এসে সক্ষ্ট দলকে তিনটা ফ্লেনেড দিয়ে এগুলুক নির্দেশ দিলাম। আমি রইলাম বাঁ দিককার প্রথম দলটির সাথে। নতুন জায়গা, রাস্তাঘাট প্রায়োচিত নয়। মাত্র দু'রাত আগে মন্তুর সাথে একবার এসেছিলাম মারেয়া গ্রামটা রেকি করবলৈ। এই এখন কোন্ দিক থেকে এগুলো শক্রের মোকাবেলা করা যাবে, সেটা কিন্তুই প্রায়োচিত করা যাচ্ছে না। ওদের তরফ থেকে কোনো গোলাগুলি হচ্ছে না। মন্তুদের বাড়িটা কুণ্ঠীঘরে রেখেছে, এটাই এখন আমাদের কাছে একমাত্র খবর। সুতরাং সেদিক বরাবরই এগুলো লাগলাম। তখন শেষ বিকেল। আর কিন্তুক্ষণ বাদেই সক্ষেবেলোকার ছায়া নামজে ফুকবে। গ্রামটা এমনিতেই জনবিবান। মন্তুদের বাড়ির কাছাকাছি একটা খোপের ধারে দোহে গেছি। পথ প্রদর্শক হিসেবে পাশে রয়েছে খোকা, আর রয়েছে বিষ্ণু সঙ্গী চাঁদ মিয়া। হাতে তার রাইফেল অনেকগুলো এক্সটা রাউন্ডসহ।

মন্তুদের বাড়িটা সামনেই। গত পরশু রাতেই এখানে আমরা এসেছিলাম। সেই বাড়িটারই পঞ্চাশ গজের মধ্যে খোপের আড়ালে এখন শুয়ে আছি আমি সঙ্গী সহযোগদের নিয়ে। খোকা ফিসফিসিয়ে বলে, গুলি চালান। ওরা আমাদের বাড়ির ভেতরে আছে। তা বছি কি করবো। এমন সময় ডান পাশ থেকে গুলি শুরু হলো। বোধহয় একব্রামুল, কেননা বরাবরই সে আগেভাগে গুলি চালায়। মধুসূনের দলও গুলি শুরু করে দেয় তার পরপরই।

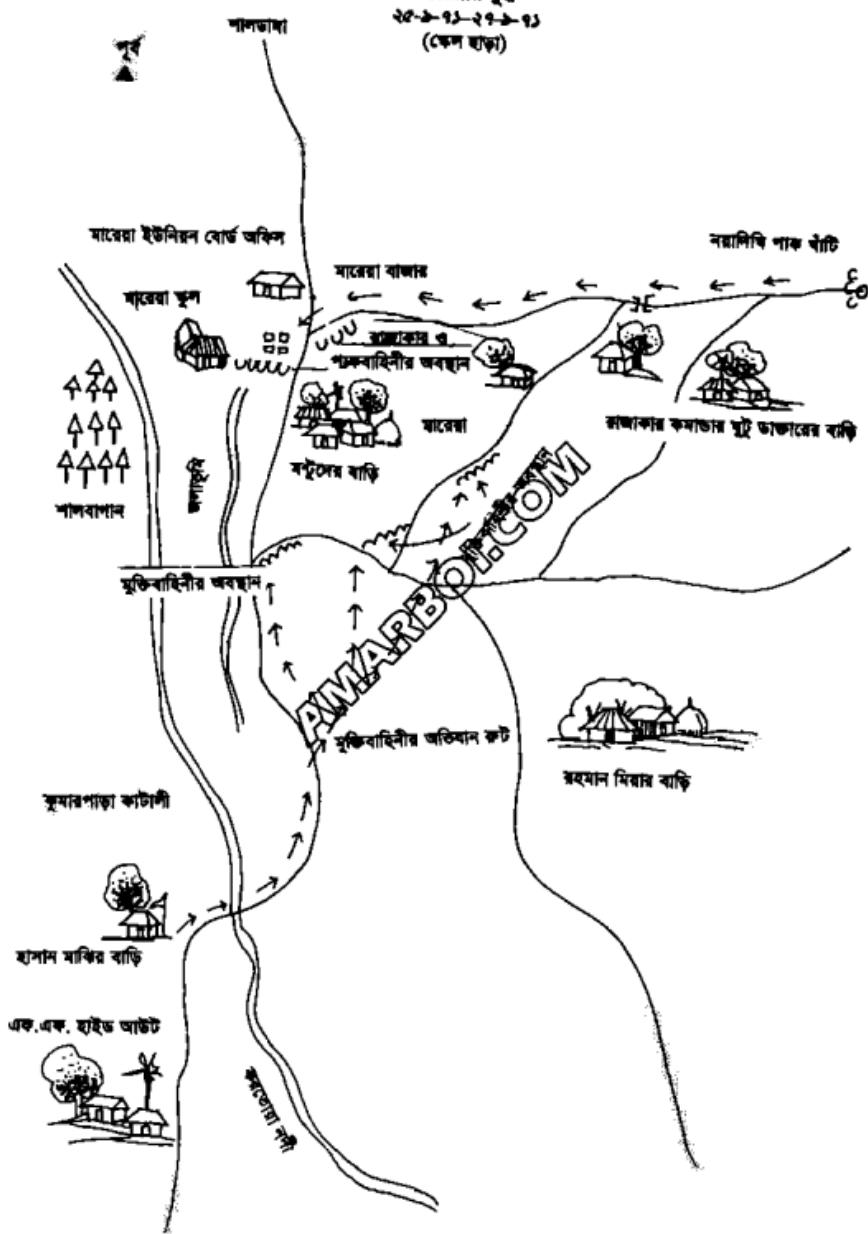
মন্তুর বাড়ির একদম কাছাকাছি রয়েছি আমি। বাড়ির মধ্যে হঠাৎ করেই যেনে গোলাগুলির শব্দে শোরগোল পড়ে গোলো। দৌড়াদেড়ি ছুটাছুটি করে বের হয়ে আসছে ওরা, স্পট টের পাই। এই রকম অবস্থায় এবার গুলিবর্ষণ শুরু করলাম আমি। আমার পাশে তখন সহযোগী চাঁদ মিয়া, পহর আলী, শুভ ও সফিজউদ্দিন। অল্পক্ষণের মধ্যেই মন্তুদের বাড়িটাকে কেন্দ্র করে যুদ্ধ শুরু হয়ে গোলো। রাজাকার আর পাকসেনারা ওপাশে। আমরা এপাশে। গুলিবিনিয়ম চলছে। তবে কেউ কাউকে দেখছি না। টেলগানটা চাঁদ মিয়াকে দিয়ে ওর রাইফেলটা এবার তুলে নিলাম হাতে। এ ধরনের যুদ্ধে রাইফেলের কার্যকারিতা অনেক বেশি। রাইফেল থেকে গুলি ছুঁড়ছি আর সাথে সাথে জায়গা বদল করছি। তুলিং করছি আর এগুচি ধীরে ধীরে। পেছন

থেকে টাঁদ মিয়া কভার দিছে। খোকা রয়েছে পাশে ঘয়ে। একরামুল ও মধুসূন্দনের দলের সাথে কেনো যোগাযোগ করা যাচ্ছে না। তবে ওদের দিক থেকে তুমুল গুলি চালানোর শব্দ ভেসে আসছে। সক্ষ্য ঘনিয়ে আসছে। এলোপাতাড়ি গুলির শব্দ বেড়েই চলেছে। এখন চারদিক থেকে শুধু গুলি বর্ষিত হয়ে চলেছে। কে কোথায় গুলি চালছে, কেন্টা শক্রের গুলি, কেন্টা আমাদের গুলি, সব একাকার হয়ে গেছে। গুলিবর্ষণের প্রাবল্যে সমন্ত এলাকা প্রকল্পিত। একটা দক্ষজ্ঞতা ব্যাপার শুরু হয়ে গেছে যেনো চারদিক জুড়ে। কিছুক্ষণ পর মনে হলো শক্ররা পিছিয়ে যাচ্ছে।

সক্ষ্যার মুখে আমরা মন্দুদের বাড়ির সম্মুখবর্তী বাঁশবনের তলায় পৌছে যাই। বাড়ির মূল প্রবেশপথের সামনাসামনি রাস্তার এপারে অবস্থান আমাদের। কিছুক্ষণ অবস্থানে থাকলাম সেভাবেই। না, নেই ওরা। ভালো করে দেখবার জন্য রাস্তার ওপর উঠে দাঢ়িয়েছি। হঠাত এক ঝাঁক বুলেট ঝাঁক দিক থেকে এসে শিশ বাজিয়ে চলে যায় মাথার সামান্য ওপর দিয়ে। আস্তরঙ্গার সহজাত প্রবৃত্তিতে মাটিতে শোয়া পজিশনে চলে যাই মুহূর্তের ভেতরে। বাঁদিক থেকে বুলেট আসছে, অর্থাৎ শক্ররা অবস্থান নিয়েছে এপাশে। এবার আমাদের পাল্টা জবাব দেবার পালা। চলে গুলি, পাল্টা গুলির খেলা। ধোঁয়া, বারবন্দের গন্ধ, অঙ্ককার, নারকীয় তাঙ্গুর শুরু হয়ে যায় যেনো। মাথা তোলা যায় না। ঝাঁকের পর ঝাঁক গুলি উড়ে যাচ্ছে বাতাস কেটে কেটে মাথার ওপর দিয়ে। রাইফেলের নল গরম হয়ে উঠেছে। গুলির মজুদও শেষ হয়ে আসছে। একরামুল মধুসূন্দনের দল তখনো গুলি চালিয়ে যাচ্ছে, তবে থেমে থেমে পিছিয়ে আমার দলের অন্য সঙ্গীরা একটু পিছিয়ে অবস্থান নিয়েছে। ঠিক এই সময় প্রশ়ির তোলপাণ্ডি শুরু হয় মনে। শক্ষা মেশানো প্রশ়ি, শক্ররা কি আরো এন্ডবেং আমরা কি টিকতে পারবো? আর কতোক্ষণ? এরপরেই মনে হয়, এই এখন এল.এম.জি.টা থাকলে ভালো হতো। কিন্তু রয়েছে একরামুলের দলের সাথে। তুমুল গোলাগুলির মধ্যে কোন দিকে কী হচ্ছে কেবল যাচ্ছে না। পরপর দুটো হেনেড ছোঁড়া হলো। প্রচণ্ড শব্দে বিক্ষেপিত হয় সেগুলো সন্দেশে মধুসূন্দনের দিক থেকে ২ ইঞ্জিং মার্টারের গোলা ছোঁড়া হয় দুটো। মাটি কাঁপিয়ে বিক্ষেপিত হয় শেলগুলো আমাদের প্রায় ৫০/৬০ গজ সামনে। মনে হয়, এতে করে কাজ হবে। শক্ররা এগুলে সাহস করবে না। আমার দলের পেছনে থাকা পাঁচ সঙ্গী এগিয়ে এসে আমার পাশ থেঁবে পজিশন নিয়েছে। সামনে সভ্যত ৩০/৪০ গজ দূরেই শক্র অবস্থান। গুলি করছে ওরা প্রবল এবং বিরতিবিহীনভাবে। ওদিকে অঙ্ককারও গাঢ় হয়ে আসছে। গোলাগুলির তাঙ্গবলীলা মারেয়া গ্রামের এই অংশে যুদ্ধের এক বীতস্ম রূপকেই ফুটিয়ে তুলেছে। পহর আলী এই সময় কুলিং করে আমার একেবারে পাশে চলে আসে। তারপর উৎকর্ষ মেশানো গলায় বলে, গুলি শ্যাষ হয়া আসিছে, এলুহা হামুরা কি পিছয়ো? না, বলে থামিয়ে দিই ওকে। দাঁতে দাঁত চেপে সবাইকে বলি, পেছানো যাবে না। একবার এই পজিশন ছেড়ে গেলে আমরা যুদ্ধে হেবে যাবো। মাটি কামড়ে পড়ে থাকতে হবে। গুলি কম খরচ করো। হেনেড রেডি রাখো সবাই। প্রয়োজনে ওদের ওপর চার্জ করা হবে, যদি এগিয়ে আসে ওরা। কিন্তু পজিশন ছাড়ার কথা চিন্তা করবে না কেউ।

হঠাত দেবি ডান পাশ দিয়ে কারা যেনো এগিয়ে আসছে। হ্যাঁ, একরামুল। ওর পরিচিত উচু গলার নির্দেশ ভেসে আসে, এ্যাডভাল, সামনে আগাও সবাই। তার মানে, ওদের ওদিক থেকে ওরা শক্রকে হটিয়ে দিয়ে এখন এদিকে এগিয়ে আসছে। আমরা এদিকে এখনো অঙ্ককারে মাটি কামড়ে পড়ে থেকে গুলি চালিয়ে যাচ্ছি। শক্ররাও যেনো মরিয়া হয়ে উঠেছে। অঙ্ককারে কি ওরা চূড়ান্ত আঘাত অর্থাৎ এস্টল করবে? দেখা যাক। শয়ুকে ডেকে নিই পেছন

କେତେ ଶାଖ-୫
ଶାରୀରିକ ସୁଖ
୨୮-୯-୧୩-୨୭-୧୩
(କେତେ ଶାଖା)



থেকে। ওর কোমর থেকে ঘোনেড দুটো বের করে হাতে ধরিয়ে দিই এবং যতোন্নূর সঙ্গে এগিয়ে গিয়ে চার্জ করতে বলি। সাহসী ছেলে শঙ্খ। রাস্তার বাঁ খাদ দিয়ে অকৃতোভয়ে এগিয়ে যায় সে। মজিদকে পাঠাই পেছনে পেছনে শঙ্খকে কভার দেয়ার জন্য। এর কিছুক্ষণ পরই বিকট শব্দে দুটো বিফোরণ। বিফোরণের সাথে সাথে ওদিক থেকে চিঢ়কার, এলোমেলো ধনি আর গুলির শব্দ। তার পরপরই সবকিছু চুপচাপ। হঠাতে করেই যেনে সবকিছু থেমে গেলো। তবে কি ওরা পালিয়েছে, না এগিয়ে আসছে চুপিসারে? আরো ক'রাউন্ট ফায়ার দিলাম আমরা, কিন্তু উত্তর নেই। শঙ্খ, পহর আলী ও মজিদকে এবার বলি এগিয়ে গিয়ে ব্যাপারটা দেখতে। ওরা এগিয়ে যায় এবং ফিরে আসে কিছুক্ষণের ভেতরই। শক্ররা নেই, পালিয়েছে। তার মানে মারেয়ার যুক্তে আমরাই জিতে গেলাম।

কমরেড রাউফ ও লিজা

পজিশন ছেড়ে গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। পেছনে ওদের অনুসরণ করতে বলে রাইফেল বাগিয়ে ধরে সোজাসুজি চুকে পড়লাম সামনের বাড়ির আভিনায়। মন্টদের বাড়ির লাগোয়া বাড়িটায়। পরশ রাতে যে বৃক্ষ লোকটার সাথে নানার সম্পর্ক পেতে গিয়েছিলাম, এটা তারই বাড়ি। বাড়িতে চুক্বার মুখে মজিদ একটা লোককে শার্টের কলার চেপে ধরে নিয়ে হিডহিড করে টেনে বের করে গোলাঘরের মাচার নিচ থেকে। লেক্সিট পটিসুটি মেরে লুকিয়ে ছিলো ওখানটায়।

— ভাইজান, রাজাকার বলে চিঢ়কার করে ওটে আজিদ। শালা রাজাকারের বাঢ়া এইটে লুকায়ে ছিলো। লোকটা হাউমাউ করে কেন্টেন্ট আর্তস্বরে বলতে থাকে, না না আমি রাজাকার নই। আমার সবকিছু ওরা নিয়ে পঞ্চাই।

— রাজাকার নহেন তো এইটে কী করেছেন? একদম শুলি করে দেবো। শঙ্খ ধরকে উঠে লোকটার পেটে রাইফেলের নল কেন্টেন্ট ধরে।

— আমাকে বাঁচান, আমি রাজাকার নই, একটা পোটলা হাতে লোকটা হড়মুড়িয়ে আমার সামনে এসে বসে পড়ে এবং কান্নাভেজা গলায় তার আকৃতি জানাতে থাকে।

— উঠে দাঁড়ান, বলে আমিও লোকটাকে লক্ষ্য করে ধরকে উঠি। কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়ায় সে তার পোটলাটাকে বুকের সাথে ঠেসে ধরে। লুঙ্গ-শার্ট পরা একটা বিধ্বন্ত মানুষ, অঙ্ককারে স্পষ্ট করে তার মুখ দেখা যায় না।

— হোয়াট ইজ ইয়োর নেম? আর ইউ রাজাকার? কঠিন গলায় প্রশ্ন করি তাকে।

— মাই নেম ইজ আবদুর রাউফ, আই এ্যাম এ মেয়ার অব কমিউনিন্টি পার্টি, বোদায় আমার বাড়ি। ভারতে যাওয়ার জন্য আজ এখানে এসেছিলাম। ওরা আমার সব নিয়ে চলে গেছে। দুই প্যাকেট সিগারেট ছিলো তাও কেড়ে নিয়ে গেছে। তোতলাতে তোতলাতে এক নিষ্পাসে কথাশুলো শেষ করেন বোদার কমিউনিন্টি নেতৃ আবদুর রাউফ।

— ঠিক আছে রাউফ সাহেব আর ভয় নেই। আপনি আমাদের সাথে থাকেন।

এরপর তাকে নিয়ে বাড়ির আভিনায় চুকলাম আমরা। বড়ো ঘরটার মধ্যে বাড়ির সব মেয়েকে আটকে রেখেছিলো রাজাকাররা। তাদের বের করা হলো। মুক্তির আনন্দে কলঘরে চিঢ়কার করে উঠে তারা। কেউ কেউ কেন্দেও ফেলে শব্দ করে। বাড়ির পুরুষেরা এদিক-ওদিক থেকে ফিরে আসতে থাকে। অভ্যবাণী শুনিয়ে চলি তাদের, আর ভয় নেই। বিপদ

কেটে গেছে। আমরা মুক্তিবাহিনী। শক্রো পালিয়েছে। আর আসবে না তো। প্রচণ্ড ভয় আঙ্গনায় সমবেত হওয়া পুরুষ ও মেয়েদের চোখে-মুখে। এ অবস্থায় তারা নিরাপত্তার নিশ্চিত আশ্বাস খোজে আমাদের কাছে। বয়োবৃন্দ সেই নানাও রয়েছেন তাদের মধ্যে। একেবারে বাকরুন্দ অবস্থা তার।

এমন সময় একজন মহিলা এলেন বাইরে থেকে একটা বাচ্চার হাত ধরে। পেছনে তার একজন বুড়ো মানুষ। মহিলার পরনের কাপড়চোপড় ভেজা। তখনো কাপছেন। সামনে এগিয়ে এসেই তিনি সরাসরি আমাকে চার্জ করে বসেন, আলম চৌধুরী কোথায়? আলম চৌধুরীকে বাঁচাতে পারলেন না? যান তাকে উদ্ধার করে নিয়ে আসেন।

কয়েক ঘণ্টা ধরে একটা মুদ্র, নার্তের ওপর পড়া প্রচণ্ড চাপে আমাদের শ্রান্ত বিষ্ফল অবস্থা। দৈর্ঘ্যে বাঁধ তখন শেষ সীমায় পৌছে গেছে। এ অবস্থায় মহিলার রক্ষ ব্যবহার আমার মেজাজ খিচড়ে দেয় একেবারে। ধমকে উঠি আমি, হ ইউ আলম চৌধুরী!

— আলম চৌধুরীকে চেনেন না?

— না, চিনি না। ইজ হি এ ভেরি ইমপরটেন্ট ম্যান! আপনি কে? কোথায় ছিলেন এতোক্ষণ? আমার ক্রোধ মিশ্রিত প্রশ্নবাণে ঘূর্মত খেয়ে যান এবার সেই মহিলা। যেনো সহিং ফিরে পান।

এরি মধ্যে বাড়ির মেয়েরা হারিকেন জালিয়েছে। সে আলোতে দেখলাম এবার তাকে। ছিপছিপে একহাতা গড়ন। শ্যামলা সুন্দী চেহারার এক মহিলা। ভেজা শাড়ি তখনো শরীরে লেপ্টে রয়েছে। বৃন্দ এবং বাচ্চাটারও জামাকাপড় ভেজা। শক্রো আসার পর বাড়ির পেছন দিক দিয়ে বের হয়ে ডোবার পানিতে ডুবে ছিলেন এতোক্ষণ তারা। শক্র বাহিনীর লোকজন চলে যাবার পর পানি থেকে উঠে এসেছেন। মহিলা শান্ত ও হির দৃষ্টিতে আমাকে দেখেন কিছুক্ষণ। তারপর মুদ্র উচ্চারণে বলেন আলম চৌধুরী পার্টির একজন নেতা। আমাদের আঞ্চলিক। আজ এসেছিলেন ভারতে স্মৃতির বলে। অসুস্থ বৃন্দ নানি ছিলো তাঁর সাথে। রাজাকারুরা তাকে ধরে নিয়ে গেছেন আপনি বোধহয় আর বাঁচবেন না।

— ঠিক আছে দেখছি তাঁর উদ্ধার করা যায় কি না। আপনি ধরে যান, ভেজা কাপড়চোপড় বদলে নেন। বাচ্চাটাকে তকনো কাপড়চোপড় দেন।

মহিলা আমার কথায় আশ্চর্ষ হয়ে চলে যান। খোকা পাশ থেকে ফিসফিস করে বলে, ইনি লিজা ভাবি, মন্টু ভাইয়ের স্ত্রী। আর মন্টুর স্ত্রী লিজার সাথে এভাবেই পরিচয় হলো আমার।

ধরা পড়েছে রাজাকার

একরামুল আমার কাছে হাসানকে পাঠিয়েছে। উজ্জেননায় টগবগ করতে করতে সে খবরটা পরিবেশন করে, একজন রাজাকার ধরা পড়েছে হাতিয়ারসহ।

— তাই নাকি!

খবরটা আনন্দের হিল্লোল বইয়ে দেয় আমাদের সবার মনে। শঙ্কুকে এখানকার দায়িত্বে রেখে দ্রুত বাড়ির পেছন দিককার আবাহনে মাড়িয়ে পৌছে যাই একরামুলের কাছে। রাজাকারটাকে পিঠ-মোড়া করে বেঁধে মেরামত করতে শুরু করে দিয়েছে একরামুল। কিন্তু ক্রোধ মেশানো গলায় বলছে, বল শালা তোর নাম কি? মারের চোটে রাজাকার উভয় দিতে দিয়ে বেই হারিয়ে ফেলছে। যাহোক, শেষ পর্যন্ত রাজাকার দেখলাম, জীবন্ত ধরলাম এবং হাতিয়ারসহই! এর আগে আমাদের কেউ রাজাকার দেখে নি, ধরা তো দূরের কথা।

চাউলহাটি ইউনিট বেস অর্থাৎ ৬-এ সেক্টরের জন্য এটা একটা রেকর্ডই বলা যায়।

মাথায় হঠাতে করেই যেনো খুন চেপে যায়। রাগে, ঘৃণায়, যুক্তের ক্লান্তি, দেশ থেকে বিভাগীভূত হওয়ার প্রাণি, অধিকৃত দেশের মাটিতে অত্যাচার, নিপীড়ন, হত্যা, রক্ত আর শাধীনতার জন্য আকৃতি সব যিনিয়ে প্রচণ্ড এক ঘৃণার বিহুর্ধকাশ ঘটলো। আর তাই দেখামাত্রই পাগলের মতো শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে রাজাকারটাকে মারতে থাকি। আর বলতে থাকি মুখে, বল শালা তোর নাম কি?

- দেলোয়ার।
- বাড়ি কোথায়?
- বোদা।
- কতোজন এসেছিলি আজ?
- ৫০ জন।
- পাক আর্মি কতোজন?
- ১০ জন।

রাজাকার দেলোয়ারকে নিয়ে সবাই ফিরে আসি আবার আমাদের আগের জায়গায়। মেয়েরা দেলোয়ারকে দেখে হৈচে করে ওঠে। একজন মহিলা তো তাকে মারবার জন্য লাঠি হাতেই দ্রুত ছুটে আসেন এই হারামজাদা অনেক খারাপ কৃষ্ণ কইছে। মোক বিহা করিবার চাহিছে। শুয়োরের বাচ্চা এখনও ঘৃণা আর ক্ষেত্রে শ্যাম কথাশুলো বলতে বলতে তিনি লাগিয়ে দেন লাঠির কয়েকটা ঘা। তাকে থামানো হয় অনেক কঠে।

লিজা ততোক্ষণে কাপড় পাল্টেছে। আঙ্গুলে বসার আয়োজন করে সেখানে চা আর মুড়ি পরিবেশন করা হলো আমাদের জন্য।

— নাতিরা অনেক কষ্ট করেছেন হৃষের জন্য। এবার একটু চা খান, বলে বুড়ো নানা হাত ধরে টেনে নিয়ে বসান চেয়েছেন। তার ছেলে আবদুল হক শক্রুর আগমন সংবাদ পেয়ে গা ঢাকা দিয়েছে। মন্টুর মতেও আবদুল হক শক্রুর কাছে ঘোষণা করেন। চা-মুড়ি খেতে খেতে তাদের অভিজ্ঞতার কথা শনি। রাজাকাররা বাড়ি দেরাও করে প্রথমে। তারপর বাড়ি ভেতরে ঢোকে। মন্টু, আবদুল হকসহ অন্যদের খৌজ করে। এরপর এক এক করে মেয়েদের সবাইকে তারা শাবের বড় ঘরটায় আটকে রাখে। মন্টুকে বের করে দিতে বলে। বলে আবদুল হককে বের করে দিতে। না হলে তারা মেয়েদের সবাইকে ধরে নিয়ে শাবে বলে শাসাতে থাকে। শুধু তাই নয়, আলমারি ভেঙে, সূর্কিস ভেঙে সবকিছু লুটপাট করে। বারবার আটকে রাখা ঘরে প্রবেশ করে অকথ্য সব কথা বলতে থাকে মেয়েদের লক্ষ্য করে। আর ঠিক সেই অবস্থায় আপনাদের গুলির শব্দ এলো। যেনে আল্লাৱ তৱফ থেকে এলো এটা। শুনুর্ত্তরখানের ভেতরে শুরু হয়ে গেলো প্রচণ্ড যুদ্ধ। ওরা বাইরে গিয়ে পঞ্জিশন নিলো। খাটের নিচে, চোকির নিচে শয়ে বসে আমরা তখন শুধু আল্লা আল্লা করছি। আপনারা এলেন, তাই আমরা সবাই বেঁচে গেলাম।

একরামুল তখন আঙ্গুল থেকে উঠে গিয়ে রাজাকারটাকে হিড়হিড় করে টেনে এনে ঠেলে দিলো সামনে, শালা রাজাকার শুয়োরের বাচ্চা। দুই পা ধরে মাফ চা সকলের কাছে। রাজাকার দেলোয়ার তখন মহিলাদের মা বলে সংবোধন করে এবং পায়ের কাছে হুমড়ি থেয়ে পড়ে মাফ চাইতে লাগলো সবার কাছে।

কমরেড রাউফ তখনো পাশে স্থাবির হয়ে দাঢ়িয়ে। যেনো তখনো তাৰ সঙ্গে ফিরে আসে নি। আলয় চৌধুরীৰ সঙ্গানে ব্যাপক খোজাবুজি কৰা হলো। নয়াদিঘিৰ দিকে রাঙ্গা ধৰে অনেক দূৰ যাবাৰ পৰও তাদেৱ সঙ্গান পাওয়া গোলো না। বোদার দিকে ঝিটি কৱেছে শক্ত বাহিনী। জানা গোলো শুল্কত আহত তাদেৱ বাহিনীৰ দুঁজন সদস্য। তাদেৱকে কাঁধে বহন কৱে নিয়ে যেতে দেখা গৈছে।

মারেয়াৰ এই যুক্তে আজ আমৱা জিতেছি। মন্টুদেৱ পৰিবাৱ বিশেষ কৱে সব মেয়েকে উদ্ভাৱ কৱতে পেৰেছি। কমরেড রাউফকেসহ বাড়িৰ পুকুৰদেৱ সবাইকে বক্ষা কৱতে পেৰেছি। পাশাপাশি একজন রাজাকাৰকেও ধৰেছি জীৱন্ত অন্তুসহ। শুধু কি তাই, শক্তপক্ষেৰ দুঁজন শুল্কত আহত হয়েছে আমাদেৱই নিষ্কিণ্ঠ শুলিৰ আঘাতে। আমাদেৱ তৰফে কোনো ক্ষতি নেই। সুতৰাং এ যুক্তে আমাদেৱ লাভ হয়েছে অনেক; কিন্তু ওৱা আবাৰ আসবে। আজকেৰ এই দিনটায় ওৱা দু' দু' বাৰ মাৰ খেয়েছে। সকালেৱ যুক্তে তাৰা তাদেৱ একজন বড় নেতাকে হারিয়েছে। বিকেলেৱ এ যুক্তে ওদেৱ একজন ধৰা পড়েছে। এছাড়াও আহত দুঁজন। আমি নিষ্কিণ্ঠ তাদেৱ এই ক্ষতি আৱ মাৰ খাওয়াৰ প্ৰতিশোধ নিতে ওৱা আবাৰ আসবে। ওৱা আসবে আৱো অনেক বেশি শক্তিশালী হয়ে। তখন হবে শক্ত মোকাবেলা। হয়তো তাদেৱ সাথে ত্যাবহ যুক্তেও জড়িয়ে পড়তে হতে পাৱে আমাদেৱ। সেই যুক্তেৰ ক্ষেত্ৰ হবে মারেয়াৰ এই জাহাগীটা। আমৱা কি পেৱে উঠতে পাৱবো ওদেৱ সাথে স্মৃতিয়ে জৰাৰ দেবে এই প্ৰশ্ৰেৱ।

মন্টু ভাৱতে। আবদুল হকও সৱে গৈছেন। তাঁৰ পৰিবাৱেৱ অন্য পুৰুষ সদস্যৱাও বাড়িছাড়া। প্ৰায় ৩০/৩৫ জনেৱ পৰিবাৱেৱ দায়িত্ব দেয়াৰ মতো কেউ নেই। শুধু দু' বৃক্ষ এবং খোকাৰ মতো দু' চাৰটা বাচ্চা কিশোৰ ছুল। এ পৰিস্থিতিতে দ্রুত সিন্ধান্ত নিতে হয়। মারেয়া এদেৱ জন্য আৱ নিৱাপদ বাঞ্ছা। আমাদেৱ পক্ষেও সাৰ্বজনিক প্ৰহৱায় থেকে তাদেৱ নিৱাপত্তাৰ ব্যবস্থা কৰা সম্ভব নহ'ল। আৱ সে ধৰনেৱ শক্তিও আমাদেৱ এখন নেই। সুতৰাং এদেৱ নিৱাপদ আশ্রয়ে কুঁড়িয়ে নিতে হবে। আমাৰ এই সিন্ধান্তেৰ কথা ওদেৱ জানিয়ে দিই। তাৰা এতে দিক্ষিণ বা দিখা প্ৰকাশ কৱে না। আমাৰ সিন্ধান্ত মেনে নিয়ে সবাই তড়িঘড়ি কৱে তৈৰি হয়ে নেয়। দুটো গুৰুগাড়িতে তুলে দেয়া হয় মহিলা আৱ বাচ্চাকাচাদেৱ শূন্য বাড়িতে রাইলো শুধু ক'জন বিহুষ্ঠ কাজেৰ লোক।

অন্ধকাৰ রাত। গাড়ি দুটোৱ আগে-পিছে পাহাৰা দিয়ে চলেছি আমৱা ক'যুবক। ক্লান্ত-বিহুষ্ঠ সবাই।

- কিছু বলবেন?
- আমাৰ ওপৰ রাগ কৱেছেন?
- না, তা কেনো?
- ওকে কি খবৰ দেয়া যাবো?
- কাকে? মন্টুকে?
- জি।
- সকালেই খবৰ পাঠাৰো। কালই এসে যাবে।
- আচ্ছ।

লিজা আর কিছু বলে না। গাড়ি এগতে থাকে। নিজেদের বাড়িয়ের, সাজানো সংসার ইত্যাদি ফেলে রেখে ওরা এগিয়ে চলে এক অজানা ভবিষ্যতের দিকে। ফিরতে পারবে কি ওরা কোনোদিন নিজেদের বাড়িতে? নিজেদের সংসারে? এ জিজ্ঞাসা মনের ভেতর বারবার পাক দিতে থাকে; কিন্তু এর উপর এখন আমার নিজের কাছে জানা নেই।

ওদের সবাইকে তিন মাইল দূরবর্তী নিরাপদ একটা আশ্রয়ে অর্থাৎ রহমান নামে ওদেরই এক আঞ্চলিকের বাড়িতে থাকবার ব্যবস্থা করে দেয়া হলো। মধুসূনকে ওর সেকশন নিয়ে ওদের নিরাপত্তার স্বার্থে রাতের মতো রেখে দিলাম। তারপর ফিরবার জন্য রওনা হলাম ওদেরকে প্রচুর সাহস দিয়ে।

তোর হতে তখন সামান্যই বাকি। করতোয়া পাড়ের হাসান মাঝি তখনো তার খেয়ালে নৌকো নিয়ে আমাদের জন্য অপেক্ষায় বসে আছে। ঝুঁক আপন মনে হলো হাসান মাঝিকে।

— ভাইজানেরা অসিছেন? তুমহারলার চিনতাত মোর হস হারায়ে ফেলাবার অবস্থা। কথাগুলো বলতে বলতে নৌকো থেকে নেমে এসে হাসান মাঝি আমাদের জড়িয়ে ধরে। ওর উষ্ণ আলিঙ্গনে মনে হয়, হাসানরা আছে বলেই আমরা যুদ্ধ করছি। খেয়াল নৌকোর মাঝি হাসানের জন্যও তো স্বাধীনতা প্রয়োজন। কেননা, ওর বিশ্বাস, দেশ স্বাধীন হলে ওর সমস্ত দৃঢ়ব্যক্তিটের শেষ হবে। করতোয়া পাড়ের হাসান মাঝির দু'চোখে তাই গভীর স্বপ্নাবেশ। সে জন্যই এ যুদ্ধ। আর সেই যুদ্ধের সেও একজন সৈনিক।

২৬, নং ৭৩

লেপিহান আনন্দের শিকার এবং আবার মানেন্দুষ্য

সকাল নটার দিকে নদীর ওপার থেকে কিছু মানুষের সমবেত চিৎকার ধনি ভেসে আসে। হাসান মাঝি ঘপাই ঘপাই শব্দ তুলে ছাঁচেসমান পানি মাড়িয়ে দৌড়ে আসে। গতকালকের মতোই চরম উন্নেজিত অবস্থায় ছিল থাকে, উমরা আসিছে ফির মারেয়া গ্রামোত। সকালের নাস্তা সেরে মাত্র বিশ্রামে আশায় মেঝের পাতা বিছানায় শরীর লাগিয়েছি কি অমনি পাকসেনাদের নিয়ে মারেয়ার রাজাকার বাহিনীর আগমনের এ সংবাদ আসে। ওরা যে আসবে, সেটা আমরা আগেই ধারণা করেছিলাম। কিন্তু এতো দ্রুত, একেবারে আজ সকালেই এসে হাজির হবে, সেটা ধারণার বাইরে ছিলো। মনটা একেবারে তেতো হয়ে যায়। গতরাতে মারেয়ার যুদ্ধশেষে মন্দুদের পুরো পরিবারকে নিরাপদ জায়গায় শিফ্ট করে হাইড আউটে ফিরতে ফিরতে তোর হয়ে যায়। ফিরেই ধরে আনা রাজাকারটাকে একটা খুঁটির সাথে তালোভাবে হাত-পা বেঁধে, সেই সাথে তার পেছনে সার্বক্ষণিক সশস্ত্র প্রহরার ব্যবস্থা হয়। হাইড আউটের চারদিকে কড়া সেন্ট্রি প্রহরা বিসিয়েও নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। করা হয়েছে হতিয়ারপত্র আর মজুদ গোলাবারুদের হিসেবনিকেশ। এর ভেতরে আর বিদ্যাম মেলে নি। মাত্র কিছুক্ষণ আগে লঙ্ঘনখানা কমান্ডার গরম চা-পুরি দিয়ে নাস্তা সরবরাহ করেছে। গতরাতে খাবার জোটে নি। নাস্তা সেরে তাই ঝাউ শরীর নিয়ে মেঝেয় পাতা বিছানায় শুতেই গভীর ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছিলো। আর ঠিক তখনি হাসান মাঝি উদ্ভ্বাসের মতো দৌড়ে আসে। পরিবেশন করে শক্তর আগমনের খবর। বিশ্বাম নেয়া আর হলো না। ভেঙে আসা শরীর এই দৃঢ়সংবাদে আবার চাঙ্গা হয়ে ওঠে। যেতে হবে আবার শক্ত মোকাবেলায়। শয়ার পাশে শোয়ানো স্টেলগানটা বলতে গেলে ছেঁ মেরে তুলে নিই কাঁধে।

অতিরিক্ত ম্যাগজিন-গুলি স্বেচ্ছায় নিই কোমরে। মেনেড চারটা চুকিয়ে নিই শার্টের পক্ষেটে। একরামুল আর মধুসূনকে বলি তৈরি হয়ে নিতে। পাকবাহিনী-রাজাকাররা আবার মারেয়ায় এসেছে। হয়তো তাদের সহযোগী আমাদের হাতে বলি রাজাকারটাকে উদ্ধার করার জন্যই। তাদের গতকালকের পরাজয়ের প্রতিশেধ নেবার জন্য তারা এগিয়েও আসতে পারে নদী পার হয়ে হাসান মাঝির বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত আমাদের ইই হাইড আউট পর্যন্তও। কিন্তু সেটা হতে দেয়া যাবে না। ওদের আটকাতে হবে মারেয়াতেই এবং সেখান থেকেই বিভাড়িত করতে হবে তাদের। কোনোভাবেই তাদের মারেয়া পার হতে দেয়া যাবে না।

মোট ২০ জনের একটা দল তৈরি হয়ে নেয় দ্রুত। আহিদার থেকে যায় হাইড আউটের নিরাপত্তা ব্যবস্থার দায়িত্বে। বলি রাজাকারকে পাহারা দিয়ে রাখার দায়িত্বও স্বাভাবিকভাবেই অর্পিত হয় তার ওপর। ওর প্রতি নির্দেশ থাকে অবস্থা বেগতিক দেখলে সে যেন ধৃত রাজাকার আর মালসামানা নিয়ে পেছনে সরে যায়। কোনো অবস্থাতেই রাজাকারকে হাতছাড়া করা যাবে না।

নদীর ওপারে দাঁড়ানো মানুষগুলো অধীর চিংকারে আমাদের দ্রুত এগিয়ে আসার আহান জানায়। হাসান তার খেয়া নৌকো দিয়ে আমাদের পার করে দেয় করতোয়া নদী। কোথায় ওরা এখন? কতোজন হবে? দলে তাদের পাকসেনা আছে, না শুধু রাজাকার? আমাদের প্রশ্নের উত্তরে অনেকগুলো মুখ একসাথে সরব হয়ে ওঠে। তাদের হৈচৈ অস্ত্রে কথাবার্তা থেকে এটা বোঝা যায় যে, সংখ্যায় তারা দেড়শোজনের মতো হবে। সাথে পাকসেনাও রয়েছে। নয়াদিঘির রাস্তা ধরে বাঁক বেঁধে তাদের অস্তিত্বে দেখা গেছে। এতোক্ষণে হয়তো পৌছে গেছে মারেয়ায়। গতরাতে নেয়া আমন্ত্রণসম্ভাব্য পুরোপুরি সঠিক ছিলো। মন্টুদের পরিবারকে সরিয়ে না নিয়ে গেলে আজ ইতো রক্ষা করা যেতো না তাদের অনেককেই। পরে ভাবা যাবে ব্যাপারটা নিয়ে। একজন সামনে শক্ত তাই উদ্বেগগ্রস্ত মানুষজনকে নিয়ে এগিয়ে যাই শক্তির অবস্থান লক্ষ্য করিব। খোলা মাঠের ওপর দিয়ে দৌড়ে চলি। মারেয়ার কাছাকাছি এসে কালকের মতো অন্তর্ভুক্ত দলকে ভাগ করে ছড়িয়েছিটিয়ে অগ্রসর হতে থাকি। এক সময় পৌছে যাই পতকালকের সেই ঝোপটার কাছে। আর শিয়ে সেখান থেকে দৃষ্টি মেলে দিতেই দেখতে পাই অন্দরে একটা পাকিয়ে ওঠা ধোয়ার কুঙ্গলী। হ্যাঁ, সেটা মন্টুদের বাড়ি থেকেই উঠেছে। শয়তান জানোয়ারগুলো বাড়িতে বাড়িতে আগুন দিচ্ছে। মুহূর্তে মাথায় রক্ত চেপে যায়। তাই 'গুলি চালা' বলে চিংকার করে নির্দেশ দিই সঙ্গীদের। দিতেই সাথে সাথে গুলিবর্ষণ শুরু হয়ে যায় হাতে হাতে ধরা সবগুলো হাতিয়ার থেকে। নিজে দাঁড়িয়ে থেকে কাঁধে খোলানো টেনগানটা সামনে এনে ত্রাশের পর ত্রাশ দিতে থাকি সম্মুখবর্তী ধোয়ার কুঙ্গলী লক্ষ্য করে। পেছনের দিকে আরো কঢ়া ধোয়ার কুঙ্গলী দেখা যায়। একরামুল আর মধুসূনও তখন গুলির ফোয়ারা ছুটিয়ে চলেছে। ধারধার করে ২ ইঞ্চি মর্টারের শেল উড়ে যায় ওদিকে। আর সেই নিষিক্ষণ গোলার প্রচণ্ড বিক্ষেপণের শব্দ মাটি কাঁপিয়ে তোলে। তখন এর প্রতিউত্তর শুরু হয় শক্তির তরফ থেকে।

আমাদের সামনে ধোয়ার কালো কুঙ্গলী পাকিয়ে পাকিয়ে ওপরে উঠেছে। বোঝা যায়, ওপারে কী রকম তাঙ্গুলীলা চালাচ্ছে। আজ দিনের বেলা, সংখ্যা-শক্তিতে অনেক শুণ বেশি ওরা। ধেয়ে এসে বাঁপিয়ে পড়তে পারে আমাদের ওপর যেকোনো সময়। সে সংস্কারনার কথা উড়িয়ে দেয়া যায় না একেবারে। আমাদের দল এবং অন্তর্শক্তির দিক দিয়ে ওদের চেয়ে

ছেট ও দুর্বল। ওদের প্রকৃত শক্তি জানবার কোনো উপায় নেই। তবে লোকজনের কাছ থেকে পাওয়া সংবাদ থেকে জানা গেছে যে, আজ ওরা সংখ্যায় অনেক বেশি। সম্ভবত বোদা সাকোয়া শালভাঙ্গা ও নয়াদিঘি ঘাঁটি থেকে রাজাকার এবং পাকসেনাদের তুলে এনেই ওরা এই সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটিয়েছে। আমাদের দল ওদের ওপর তিনিদিক থেকে আক্রমণ চলা করেছে। এতে করে আমাদের শক্রপক্ষ বিভ্রান্ত হতে বাধ্য। আমাদের শক্তি এবং সংখ্যা সম্পর্কেও তাদের মনে ভীতিজনক শক্তি থাকতে পারে। পরপর স্থান বদল করে আমাদের গুলি চালানোর ট্র্যাটোজি তাদেরকে অবশ্যই ধারায় ফেলে দিতে পারে। মন বলে ওঠে, ওরা সরাসরি আমাদের দিকে এ্যাসল্ট করার ভঙ্গিতে এগুনোর চেষ্টা করবে না। জঙ্গল যুদ্ধ অর্থাৎ ‘বুশওয়ার’-এ আক্রমণকারী বাহিনী সব সময়ই অসুবিধাজনক অবস্থায় থাকে। এছাড়া গতকাল ওরা আমাদের শক্তি এবং রণকৌশল সম্পর্কে ধারণা পেয়ে গেছে। এ পরিস্থিতিতে তাদের পক্ষে রিস্ক নিয়ে এগিয়ে আসা সম্ভব নয়।

সামনের বাড়িগুলো থেকে কালো ধোয়ার কুঙ্গলী পাকিয়ে পাকিয়ে উঠছে। মন্টুদের বাড়ি ওটা। ওরা কি সমস্ত গ্রামটাকে আজ জ্ঞালিয়ে-পুড়িয়ে দেবে? মনের ভেতরে ভয়ানক একটা প্রতিরোধ স্মৃহা দাপিয়ে ওঠে। তাই কালবিলম্ব না করে মজিদ মিয়াকে রানার বানিয়ে একরামুল আর মধুর দলের সাথে যোগাযোগ করে ওদের প্রচও গোলাগুলি আর গ্রনেড বিস্ফোরণ ঘটাতে ঘটাতে দ্রুত এগুবার নির্দেশ দিই। আমার সঙ্গী শঙ্খসহ জঙ্গলের পাগলের মতো সমানে গুলি চালিয়ে যাচ্ছে। আর তার প্রতিউত্তরও আসছে একইজ্যোতি। তাদের ফায়ার পাওয়ার অত্যন্ত বেশি। মাথার অনেক ওপর দিয়ে গুলির রাশি ঝোঁড়ে মতো বয়ে যেতে থাকে। উচু গাছের ছোটো ডালপালা ইত্যাদি বারে বারে পড়ছে। শঙ্খসহ অবস্থান সম্ভবত মারেয়া বাজারের দিকে। সেখানে আগে থেকেই গড়ে তোলা তাদের অঙ্কার ও ট্রেফের নিরাপদ অবস্থান থেকে ওরা গুলিবর্ষণ করে চলেছে। সময় কাটছে নেক্ট। সম্মুখবর্তী জনপদে দৃশ্যামান ধোয়ার কুঙ্গলী ভেদ করে আগুনের লেলিহান শিখা উৎপন্নকে উর্ধ্বমুখী এখন। এভাবে চলতে থাকলে কিছুক্ষণের মধ্যেই তা মন্টুদের সমস্ত বাড়িগুলোর আস করে নেবে। আর এইভাবে সেটা ছড়িয়ে পড়বে অন্য বাড়িগুলিগুলোতেও। আর দেরি করা যায় না। চাঁদ মিয়ার কাছ থেকে বাটকায় রাইফেলটা নিজের হাতে তুলে নিই। টেলগানটা ওর কাঁধে ঝুলিয়ে দিয়ে বলি পেছনে আসতে। শঙ্খসহ দলের অন্যদেরকেও সশ্রদ্ধে বলি, অ্যাডভাস! এগিয়ে যাও সবাই ফায়ার দিতে দিতে। নির্দেশ দেয়া সেরে গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে দৌড়ে হাজির হই গতকালকের বাঁশতলার কাছে এসে। সম্ভবত শক্রপক্ষ আমাদের দেখে ফেলেছে। ফলে তাদের অবস্থান থেকে ঝোক ঝোক গুলি আসতে থাকে আমাদের দিকে। দ্রুত মাটিতে শয়ে পড়ে তাদের দিকে জোর ফায়ার দিতে বলি সবাইকে। যুদ্ধ চলতে থাকে এভাবেই। আর সামনে আগুনের লেলিহান শিখা যেনো ঝাপিয়ে উঠতে থাকে মন্টুদের বাড়িতে।

একরামুল এগিয়ে গেছে অনেকখানি ভেতরের দিকে। আর সামান্য কিছুটা এগুলৈই সে শক্রে পিছিয়ে যাবার পথ কাট করে দিতে পারে। একরামুলের যা শক্তি, সেটার ওপর নির্ভর করে রিচিট অর্থাৎ পেছানোর পথ কেটে দিয়ে তাদেরকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলার মতো পদক্ষেপ নিতে যাওয়াটা হবে একটা খুবই বিপজ্জনক ব্যাপার। শক্র পেছানোর সময় নিশ্চিতই মরিয়া হয়ে একরামুলের স্কুল দলটাকে ম্যাসাকার করে দিতে পারে। কেন জানি মনে হয়, একরামুলের যা গোয়াজুমি, এখন এরকম মুহূর্তে যুদ্ধের কোনো ব্যাকরণই সে

মানবে না । ও ওর জেন নিয়ে এগিয়ে যাবেই । আমার বিশ্বাস, ও এখন তাই করছে । অধুও এগিয়ে আসছে । দু'পাশে জুলন্ত বাড়িয়রগুলোর মাঝখান দিয়ে সেও এগিয়ে আসছে শৌয়ারের মতো । আর আমরাতো এখানে শক্রুর সামনাসামনি হয়ে তাদের সাথে ধূসুমার মুক্ত লিঙ্গ হয়েই আছি । কিন্তু না, বেশিক্ষণ এ অবস্থা থাকে না । ১০/১৫ মিনিট । শক্রুর দিক থেকে বিক্ষিপ্ত গোলাগুলির বেগ কমে আসে । তারা সম্ভবত তাদের পেছন দিক থেকে আমাদের দ্বারা ঘেরাও হয়ে পড়ার ব্যাপারটা টের পেয়ে যায় । তাই শুলি চালাতে চালাতে পিছিয়ে যেতে থাকে । এ অবস্থায় শুলসহ দলের ৫ জনকে রাস্তার ওপর দিয়ে মারেয়া বাজার লক্ষ্য করে গুলিবর্ষণের কাজ চালিয়ে যেতে বলি । ওরা তৎক্ষণিকভাবে সে আদেশ পালনে তৎপর হয়ে ওঠে । আর আমি মজিদ ও চাঁদ মিয়াকে নিয়ে এগিয়ে যাই মন্টুদের বাড়িগুলোর দিকে ।

জুলছে শতবর্ষের বাড়িঘর, সভ্যতা

মন্টুর বাড়ির একটা ঘর জুলছে দাউডাউ করে । আবদুল হকের বাড়ির গোয়ালঘর জুলছে । সদ্য আগুন লেগেছে একটা টিনের ঘরে । বাড়ির সামনে দাঢ়ানো একটা গুরুর গাড়ি । বাড়ির গুরুগুলো বাখানে বাঁধা । একটা মানুষ নেই কোথাও । ফটফট করে ফাটছে ঘরের টিন, বাশ আর কাঠ । আগনের শিখা তখনো লাফিয়ে লাফিয়ে ওঠে দ্রুত গ্রাস করে চলেছে চারপাশের বাড়িগুলি । তখনো বাড়ির ভেতরে টিনের বড়ো ঘরগুলো অস্তিত্ব রয়েছে । বাড়ির বেড়া পুড়ে প্রায় ছাই হয়ে মাটিতে পড়ে গেছে । শূন্য হয়ে গেছে বাড়ির ভেতরটা । শক্রুর সাথে আমাদের গুলিবিনিয়ন আর তাদের দেয়া আগনের পরিণতি এই স্মার্তিঘরগুলো । এ অবস্থায় কিছু একটা করা দরকার এবং এক্ষণি । প্রথমেই নেভাটো দরকার আগুন । ঘর থেকে মূল্যবান জিনিসপত্রগুলোও বের করা প্রয়োজন । হঁজুন্টোড়াড়িটার কাছাকাছি কামলা গোছের একজনকে দেখা যায় উকিবুকি মারতে । ডাক দিই আঁচক । লোকটা আসে না । চিংকার করে তখন তাকে বলতে থাকি, লোক ডাকেন, গ্রামবাসুদের ডাকেন । আগুন নেভাতে হবে । জিনিসপত্র বের করতে হবে । এখনো সময় অক্ষয় মানুষ ডাকেন । বালতি আনেন । পানি আনেন... । কিন্তু কেউ আসে না । আগনের লেলহান শিখা বাড়তে থাকে । আগুন লাফিয়ে লাফিয়ে যেতে থাকে এবর থেকে ওহর অভিমুখে । চোখের সামনে মন্টুদের পরিবারের বাড়িগুলি জুলছে । একশো বছরেও বেশি পুরনো বাড়িগুলি জুলছে । সেই সাথে জুলছে ইতিহাস । তিল তিল করে গড়ে ওঠা শতাব্দী প্রাচীন এক পরিবারের জিনিসপত্র, ধনসম্পদ ও সাংস্কৃতিক নির্দর্শন । ছাই হয়ে যাচ্ছে অথচ করার কিছুই নেই, কেবল জুলেপুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে ইতিহাসের এমন নির্দর্শনের সামনে সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা ছাড়া । মজিদ মিয়ার কথায় হঠাত সর্বিং ফেরে ।

— গুরুগুলান বাচান যায় ভাইজান ।

আমি চিত্তার ঘোর থেকে প্রায় চমকে ওঠার মতো করে বলি, হ্যাঁ ঠিক বলেছিস । নে তাড়াতাড়ি কর ।

মজিদ দৌড়ে এগিয়ে যায় । নিজেও এগিয়ে যাই । কোমরে গৌজা বেয়ানেট বের করে তাই দিয়ে ঘচাঘচ কাটতে থাকি গুরু ও মোষগুলোকে আটকে রাখা দড়ি । আগনের হলুকা দমকে দমকে বাড়তে থাকে । মুখ-চোখ মায় সারা শরীর যেনো ঝল্সে দিতে চায় । মাথা নিচু করে দাঁতে দাঁত চেপে শরীরের সহ্যসীমার শেষ পর্যায়ে পৌছে কাঙগুলো সারা হয় । বলি নিরীহ পঙ্গুলো ছাড়া পেয়ে দোড়াতে থাকে । আর আমরা সরে আসি আগনের নরক

থেকে দূরে। তবুও তখনো সমস্ত গায়ে-মুখে আগন্তনের বাপটার জ্বলা। এই সময় শঙ্খবা এগিয়ে আসে। এসেই খবর দেয় চলে গেছে পাকিষ্ঠানি আর রাজাকার বাহিনী। চল পিছু ধৰ ওদের, আমি বলি। একরামুল আর মধুর সাথে যোগাযোগ কর। শালার এভাবে বাড়ির জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে শেষ করে দিয়ে ভাগবে, সেটা হতে দেয়া যাবে না। দৌড়া, ফলো মি।

মন্টুদের বাড়িঘর, তাদের যাবতীয় সহায়সম্পদ দাউদাউ করে জুলতে থাকে। আর আমরা তাই পেছনে রেখে দৌড়ে চলি মারেয়া বাজারের দিকে। বাজারের পাশে তাদের ডিফেন্স নিয়ে থাকা অবস্থানে পৌছে দেখা যায়, একটা লোক উপুড় হয়ে পড়ে আছে হাত ছড়িয়ে। কাছে যেতেই বোৰা যায়, মরে গেছে লোকটা। মর্টারের শেলের আঘাতে স্ফুরণ-বিক্ষিক তার শরীর। পাশেই খোলা টেক্ষণ, তার সামনে একটা ছোট বোপের কাছে পড়ে আছে দুটো রাইফেল। রোদের আলো পড়ে চকচক করছে ব্যারেল দুটো। প্রায় ৫০/৬০ রাউণ্ড গুলি থাকি কাপড়ের তৈরি বিন্দি অর্থাৎ কোমরে জড়নোর খোপ খোপ করা বেশটের ভেতরে। রাইফেল দুটো আর গুলির মালাটা নিতে বলি চান্দ মিয়া আর মজিদকে। এরপর আবার শুরু হয় দৌড় নয়াদিঘি রাস্তা লক্ষ্য করে। গ্রামের শেষ মাথায় পৌছে দেখা হয়ে যায় একরামুলের দলের সাথে। তারা পেছন দিক দিয়ে এসে নয়াদিঘির রাস্তায় উঠেছে। কিন্তু শক্রকে পেছন থেকে আটকাতে পারে নি। ওরা রাস্তায় পৌছনোর আশেই শক্র দল পেছন কেটে বের হয়ে গেছে। মধুকেও তার দলবল নিয়ে আসতে দেখা যায় পিছ দিক থেকে। তখন নিয়াদিঘির রাস্তা ধরে দৌড়ে চলি শক্রের পেছন পেছন। মনের মধ্যে প্রচণ্ড একটা ক্রেতে মুস্তকে উঠতে থাকে, ওদের দৌড়ে গিয়ে ধরতে হবে। অবিরাম গুলি চালিয়ে হত্যা করতে হবে মনুপত্নদের। যতোগুলোকে সম্ভব।

পেছনে মারেয়া গ্রামের বাড়িঘরগুলো তেমনি জুলতে থাকে। আর আমরা ওই আগন্তনের লেলিহান শিখার মতোই জুলতে জুলতে শান্তিত হই শক্রের পেছনে পেছনে তাদের ধরবার জন্য। অনেকটা দিহিদিক জ্ঞানশূন্য মাঝের মতো। আমরা কেউ যেনো আর নিজেদের মধ্যে নেই। কেবল একটাই লক্ষ্য মুস্তকে ধরতে হবে।

নয়াদিঘির কাছাকাছি পর্যন্ত শক্রের পিছু তাড়া করে এসে অভিযানে ক্ষমতা দিতে হয়। কিন্তু শক্রের দেখা মেলে না। ওরা এতোক্ষণে নিশ্চয়ই পৌছে গেছে নয়াদিঘিতে ওদের পাকা প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে। এই বিশ্বাস অবস্থা আর গোলাবারুদের স্বল্পতা নিয়ে তাদের ধাঁচির ওপর চড়াও হওয়া অসম্ভব। তাহলে আর ফেরা যাবে না, ব্যাপারটা সুইসাইডাল হয়ে দাঁড়াবে। ওরা ওদের প্রতিরক্ষা বেষ্টনীর মধ্যে থেকে দিনের আলোতে পাখি শিকারের মতো মারতে থাকবে এক এক করে আমাদের।

ফিরে আসি আগন্তনে আগন্তনে ভয়ীভূত গ্রাম মারেয়ায়। একটার পর একটা জুলতে থাকা বাড়ির পাশ দিয়ে। মোট নটা বাড়িতে আগন্তন দিয়েছে ওরা। মারেয়া গ্রামের চিহ্নিত বড়ো বড়ো পরিবারের বাড়িগুলো সব জুলে ভয়ীভূত হয়ে চলেছে তখনো, নেভানোর কেউ নেই। কোনো উদ্যোগ নেই। গ্রামের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত পর্যন্ত সবখানেই আগন্তনের বিস্তৃতি। সবাইকে নিয়ে ফিরে আসি মন্টুদের বাড়ির সামনে। এখন ওদের বাড়ির সবশেষ বড়ো টিনের ঘরটা জুলছে দাউদাউ করে। সামনের ঘরগুলো জুলে ভয়ীভূত হয়ে গেছে। গোয়াল ঘর, ধানের গোলাসহ অন্যান্য ঘরের কোনোটাই আর অবশিষ্ট নেই। বাড়ির সামনের চতুরে পড়ে থাকা গরঞ্জাড়িটাও ছইসহ জুলে চলেছে। জুলেপুড়ে ছাই হয়ে যাওয়া মন্টুদের বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে থাকি কেমন নিম্নপায়। গত দু'রাতে দেখা মানুষজনে জমজমাট বাড়িটা

চোখের সামনে থেকে যেনো একটা জাদুশক্তির বলেই উধাও হয়ে গেলো। অবাক লাগে, অবিশ্বাস্য মনে হয় ব্যাপারটা। এতোদিনকার পুরনো এই বাড়ি। চোখের পলকে কীভাবে অদৃশ্য হয়ে গেলো! এ বাড়ির সম্মত, সচ্ছল আর বনেদি মানুষগুলো কীভাবে দেখতে দেখতে নিঃশ্ব হয়ে গেলো। সেইতো আমরা এলাম, কিন্তু কিছুই করতে পারলাম না। বাধা দেবার আগেই শক্রপক্ষ তাদের আগুন দেয়ার কাজ শেষ করেছে। তারা মন্টুদের পায় নি, তাদের চিহ্নিত মানুষজনকে পায় নি, মুক্তিযোদ্ধাদের পায় নি। তাই তাদের প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে আগুন দিয়ে সারা গ্রামটা জ্বালিয়ে দিয়ে গেলো।

হঠাতে কী হয়, প্রচণ্ড ঝুঁতি জড়ানো একটা বিরাট অপরাধবোধ মনের ওপর এসে ভর করে। আমরা ব্যর্থ হলাম। আমাদের দায়িত্বের আওতায় থাকা এদের সম্পত্তি রক্ষা করতে। মনে হয়, এখনে না এলে, এখানকার রাজাকার ও পাকবাহিনীর সাথে যুক্তে লিঙ্গ না হলে এদের বাড়িঘরগুলো হয়তো সমস্ত সম্পদসহ জলেপুড়ে ছাই হয়ে যেতো না। দেহমনে একটা গভীর অবসাদ আর একটা বিপন্ন বোধ নিয়ে ফিরতে থাকি। হঠাতে মন্টুদের বাড়ির পেছনদিককার উচু বড়ো গাছের মাথায় একটা শুকনকে বসে থাকতে দেখি। চুপচাপ বসে আছে শুকনটা। কী হয়, ওটা চোখে পড়তেই মুহূর্তে মন্টা ক্ষিঁড় হয়ে ওঠে। চাঁদ মিয়ার কাঁধ থেকে রাইফেলটা টেনে নিই। তারপর সেটা শুকনটার দিকে টাগেটি করে টিগার টিপে ধরাম করে শুলি ছুঁড়ে দিই। জলন্ত ছুঁড়ে দেয়া বুলেটটা সরাসরি শুকনটার লাগে শুকনটার বুকে। পাখা বাপটে ঘুরে ঘুরে গাছের ডালপালা ভেদ করে সেটা ক্ষিঁড় করে এসে পড়ে সামনে রাস্তার ওপর। একরাশ ঘৃণা আর ক্রোধ নিয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকি মৃত পাখিটার দিকে।

শুকনটা নিশ্চিতই এসেছিলো মরা মানুষের সঙ্গানে। পাকসেনা অথবা রাজাকারদের হাতে নিহত কোনো গ্রামবাসীর লাশের প্রক্রিয়াপিয়ে পড়ে তার মাংসে উদর পূর্ণি করতে। তাই শুকনটাকে দেখা মাত্র গায়ে জলে উচ্ছেচ্ছলো আগুন। ওটাকে হত্যা করতে পেরে তাই এতোক্ষণ ধরে মনের জ্যে থাকে ক্ষেত্রের উপশম হয়। তারপরও সেই অপরাধবোধের খচখচানিটা বুকের গভীরে পুরে দিয়ে ফিরতে থাকি হাইড আউটের দিকে। তাকিয়ে দেখি পহর আলী খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছে। আগুনের ওপর দিয়ে চলার সময় তার বাঁ পায়ের একটা অংশ ঝলসে গেছে। ওর জরুরি চিকিৎসা প্রয়োজন।

২৭. ৯. ৭৩

কেমন করে বাঁচবো আমরা

নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে অভ্যর্থনা জানাই ওদের। নৌকো থেকে নেমেই সরাসরি প্রশ্নটা করে বসে লিজা, এবার কেমন করে বাঁচবো আমরা? প্রশ্নটা বড়ো শক্ত। চট করে এ প্রশ্নের উত্তর দেয়া কঠিন। তবুও মুখে হাসি ফুটিয়ে বলি, বাঁচবেন, বাঁচতে তো হবেই। দেখবেন সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে। আমরা তো আছি।

একটা দীর্ঘ নিষ্কাস ছেড়ে লিজা বলে, আপনারা তো করছেন, আর কতো করবেন বলেন?

— সে দেখা যাবে বলে সফিজউদ্দিন আর মজিদ মিয়াকে দিয়ে তাদের রওনা করিয়ে দিই। লিজাকে বলি যান, আপনারা এগোন। জায়গা ঠিক করে রাখা হয়েছে আপনাদের জন্য। দেখেন পছন্দ হয় কি না!

হাসান মাঝি তখন অপর পাড়ে অপেক্ষমাণ দলটিকে নিয়ে আসছে তার নৌকোয় করে।

আমি দাঁড়িয়ে থাকি তাদের জন্য। মহিলারা সব আগের খেপে এসেছে। এবার সব পুরুষ
আর বাচ্চা ছেলেমেয়েদের পালা।

ঘাটে নৌকো ভিড়তেই এ দলটার সাথে দু'জন বৃক্ষ নামেন। মন্টুর চাচা আর তার
শ্বাতর। মন্টুর শ্বাতর দুবলা-পাতলা ঝুঁতুভাষী মানুষ। গতরাতে তাকে দেখেছি, কিন্তু আলাপ
হয় নি। নৌকো থেকে নেমেই তিনি একটা ফ্লাইরি হাসি মুখে ফুটিয়ে বলেন, নাতিরা কেমন
আছেন? কিন্তু অপর বৃক্ষ, যিনি মন্টুর চাচা, এরি মধ্যে যাঁর সাথে আমাদের নানা-নাতির
সম্পর্ক মোটামুটি দানা বেঁধে উঠেছে, তিনি তার শ্বাতবসুলত সরল উচ্ছ্বাসভরা গলায়
কলকলিয়ে বলে উঠেন, কি হে নাতির ঘর, হামাকতো তোমহারা খুব নিহা আলেন, এ্যালা
বিলা দি কি খিলাছিস? মোর কিন্তুক সিগারেট নাই। সিগারেট আনে দিবা হবে। একেই
বোধহয় বলে বনেদি ঘরের সিংহসনদয় মানুষ। মন্টুদের পুরো পরিবারের একমাত্র মুরব্বি
অর্থাৎ গার্জিয়ান তিনি। যার প্রতিটা আদেশ-নির্দেশ বিনা বাক্য ব্যয়ে পালিত হয়, যার
হাঁকড়াকে বাঘ-মোয়ে একঘাটে পানি খায়, বাড়িঘর, ফসলের গোলা, সহায়সম্পদ, সঞ্চিত
টাকা-পয়সা, মূল্যবান জিনিসপত্র, আজ সকালে সবকিছু পুড়ে ছাইভয়ে পরিণত হয়েছে,
তার জন্য দুঃখবোধ কিংবা বিমর্শতা এই বৃক্ষ মানুষটিকে কিছু মাত্র শ্পর্শ করে নি। অদ্ভুত
জীবনীশক্তি আর প্রাণচাক্ষল্যের অধিকারী এই মানুষটি। বৃক্ষের শিশুসুলত সারল্য আর
প্রাণখোলা হাসি নিজের বুকের মধ্যে এতোক্ষণ ধরে পুরুষের আপরাধবোধটা অনেকখানি
হালকা হয়ে যায়। ভালো লাগে এই মহৎপ্রাণ মানুষটাকে। পকেট থেকে তাই সিগারেটের
প্যাকেটটা বের করে বৃক্ষের হাতে গুঁজে দিই। তিনি দয়াশালাই টুকে সিগারেট জ্বালান।
তারপর সুখটান দিতে থাকেন ঘনঘন। মুখ-স্নেহি তার খুশির উচ্ছলতায় ভরে যায়। তাদের
নিয়ে আমি এগিয়ে চলি নতুন আবাসস্থলের দিকে।

হাসান মাবির বাড়ির পেছন দিকে উচ্ছুটা ফাঁকা জায়গা পেরিয়ে আর একটা পরিত্যক্ত
বাড়ি। তিনটা ছনের ঘর। মাটির পুরুষস্তে দাওয়া। সমস্ত আঙিনা জড়ে কাদা-পানিতে
থকথকে অবস্থা। একেবারে হাঁচিটাইট লাগোয়া আমাদের নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় এই
জীর্ণ বাড়িটাতেই তাদের থাকবার ব্যবস্থা করা হয়। ৮/১০ জন মহিলা, বাচ্চা ছেলেমেয়ে আর
পুরুষ সদস্যসহ তাদের মোট সংখ্যা ২৯ জন। সামান্য কিছু বিছানাপত্র নিয়ে প্রায় এক কাপড়ে
চলে আসতে হয়েছে তাদের। সাথে আহারবিহারের কোনো রসদ নেই, হাতে টাকা-পয়সা
নেই। বলতে গেলে একেবারে সর্বস্ব খোয়ানো কপর্দকহীন অবস্থা তাদের। তাই এদের
দেখাশোনার পুরো দায়দায়িত্ব এখন আমাদের। তিনবেলা আহার যোগানসহ তাদের
নিরাপত্তার ব্যবস্থা করার দায়িত্বও এখন আমাদের কাঁধে। যুক্তের মাঠে দিন-রাত যুক্তে জড়িত
থাকার পাশাপাশি এতোগুলো মানুষের ভরণপোষণের ব্যবস্থা অর্থাৎ তাদেরকে তিন বেলা
আহার যুগিয়ে যাওয়া সভ্যতাই একটা বড়ো দায়িত্ব আর কুঁকিপূর্ণ কাজও। কিন্তু এছাড়া এখন
আর উপায়ই-বা কি? জনযুক্তের এ পর্যায়ে যুক্তের বাইরেও এ জাতীয় সমস্যা মোকাবেলার
মতো অন্য এক ধরনের যুক্তেও লিঙ্গ থাকতে হবে এখন আমাদের। এদের বাঁচানোর জন্য এ
দায়িত্ব নেয়া ছাড়া আর কোনো উপায় বা বিকল্প তো এখন আমাদের সাথনে নেই।

শক্রপক্ষ মারেয়ার ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিয়ে যাবার পর রহমানদের বাড়িতে মন্টুদের
পরিবারকে রাখা আর নিরাপদ মনে হয় নি। শক্র বাহিনীর সমস্ত রাগ মন্টু আর আবদুল
হকের ওপর। আজো তারা তাদের ধরতে এসেছিলো। তাদের পরিবারের সদস্যদের বন্দি

করে জিপ্পি করে রাখতে চেয়েছিলো বোদার হেড কোয়ার্টারে। বোদার রাজাকার কমান্ডার আকবরই নেতৃত্ব দিছে মারেয়ামুর্বী প্রতিটি অভিযানের। সে তার প্রভু পাকবাহিনীকে বুঝিয়েছে, মন্তু আর আবদুল হকই হচ্ছে এই অঞ্চলে মুক্তিযোদ্ধাদের যেসব তৎপরতা চলাচ্ছে, তার প্রধান দুই হোতা। তাদের পরিবারের সদস্যদের ধরে বাংলি করবার চেষ্টা ব্যর্থ হয়। মারখানে তাদের প্রচুর ক্ষতি হয়ে যায় মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে সরাসরি সংঘাতে লিপ্ত হয়ে। তারই ফলে তাদের এতো রাগ আর প্রতিশোধ স্পৃহা। আজ সকালে এসে তারা প্রথম আগুন দেয় মন্তু আর হকদের বাড়িতে। সেই সাথে সন্দেহভাজন অন্য আর সব বাড়িতেও। আজও মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে সংঘাতে তাদেরকে তাদের একজন সঙ্গীর মৃতদেহ, দুটো অন্ত আর গোলাবারুদ ফেলে পালাতে হয়েছে। সুতরাঙ আবার তারা আসবে। মন্তুদের পরিবারকে কোথায় সরিয়ে নেয়া হয়েছে, সেটা তারা জেনে ফেলবে যেভাবেই হোক। অতএব এবার রহমান মিয়ার বাড়ির ওপর ওদের আক্রমণ হবার সমূহ সম্ভাবনা। হাইড আউটে তাই ফিরে এসে এরকম একটা সংশ্লিষ্টন কথা চিন্তা করে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়, মন্তুদের পরিবারকে সরিয়ে নিয়ে আসতে হবে নদীর এপারে। আপাতত আমাদের নিরাপত্তা বেটনীর ভেতরেই তাদের সবাইকে আশ্রয় দিতে হবে। হাসান মারিয়ার পেছনদিককার বাড়িটা এ কারণেই দেখেননে এসে তাদের আশ্রয়স্থল হিসেবে নির্ধারণ করা হয়। একদল ছেলে নিয়ে পরিত্যক্ত বাড়িটা মোটামুটি বেড়েমুছে কোনোরকমে প্রয়োগ্য করে তোলার জন্য একরামুলের ওপর দায়িত্ব দেয়া হয়। মধুকে ১০ জনে^১ একটা জোরদার দল সাথে দিয়ে পাঠানো হয় রহমান মিয়ার বাড়িতে। সেটা করা হয় প্রস্তুর পরিবারের সদস্যদের প্রহরা দিয়ে সেখানে নিয়ে আসার জন্য। আহিদার সকান্তে^২ লোক পাঠিয়েছে মন্তুকে জরুরি ভিত্তিতে আসবার ব্যব দিয়ে। নেতা মানুষ মন্তু, হিজোর পার্টির কাজকর্ত্তা নিয়ে ব্যস্ত। এখনো তিনি এসে পৌছান নি। কখন এসে পৌছেন^৩ তারও ঠিক-ঠিকানা নেই। এরকম অবস্থায় তার পরিবারের সদস্যদের সরিয়ে আনন্দসন্ধান নিতে হয়েছে আমাদেরকেই। অবশ্য তারা যে একেবারে কপর্দকহীন অবস্থায় এসেছেন, প্রথমটায় আমাদের তেমন ধারণা ছিলো না। গ্রামের জোতাদার ধনী মানুষ, কিছু-না-কিছু টাকা-পয়সা তাদের সাথে থাকবেই, এমনটাই ভবা গিয়েছিলো। কিন্তু কার্যত সেটা দেখা যায় না। যাই হোক, নতুন অবস্থায় তুলে দিয়ে তাদের মোটামুটি গোছগাছে সাহায্য করে আমাদের ছেলেরা। মেয়েরা একটা ঘরের স্বাতসেতে মেঝের ওপর বিছানাটিছানা বিছিয়ে কোনোমতে শোয়ার ব্যবস্থা করে নেন। বৃক্ষ দুই নানাসহ অন্যদের পাশের ঘরটায় একইভাবে ব্যবস্থা করা হয়।

স্বর্গ হতে বিদায়

বিকেলের আলো তখন দ্রুত ফুরিয়ে আসছে। আহিদারকে নিয়ে আমি সবকিছু তদারক করছি, তাদের সার্বক্ষণিক নিরাপত্তার জন্য দু'জন সেন্ট্রি নিযুক্ত করা হয়েছে। মোটামুটি সবকিছু সেট করে দিয়ে হাইড আউটে ফিরবো বলে যখন ঠিক করেছি, তবুনি লিজা নেমে আসে আভিনায়। তার বাচ্চাটা কেঁদেকেটে বিরক্ত করছে খুব। তাকে ঘরের ভেতরে একজন মহিলার কোলে দিয়ে এসেছে সে। সামনে এগিয়ে এসে সে বলে, একটা কথা। কী কথা সেটা জানবার জন্য তাকাই তার মুখের দিকে। সামান্য ইততত করে সে বলে, নিয়ে তো এলেন, খাওয়াবে কে?

- কেনো আমরা!
- এতোগুলো লোককে খাওয়াবেন, আপনাদের টান পড়বে না?
- সে ম্যানেজ করে নেয়া যাবে।
- এতোগুলো লোকের তিনবেলা আহার যোগালো, রাজ্ঞি হবে কোথায়?
- আমাদের লঙ্গরখানায়। ওখানে রান্না করে আপনাদের জন্য পাঠিয়ে দেয়া হবে।
- তিনবেলাই?
- জি।
- এতোটা কি পারবেন?
- দেখেন না পারি কি না?
- আপনারা কেনো কষ্ট করবেন আমাদের জন্য?
- কষ্ট আর কি! দেশ স্বাধীন হলে সব শোধ করে দেবেন।
- আর দেশ স্বাধীন! বলে সে একটা দীর্ঘশ্বাস চাপে। তারপর বলে, দেশ স্বাধীন হলে
কি আপনারা আসবেন?
- বাবে আসবো না কেনো! আর যদি না আসি, দাওয়াত করে আনবেন। আনবেন না?
- আনবো। খুবই নরম আর কোমল হয়ে ওঠে তার গলা। সূর্যের অঙ্গরাগের সোনালি
আলো এসে পড়ে তার মুখে। সেই আলোয় অত্যন্ত কমনীয়ত্বাত্মক তাকে।
- ঠিক আছে আপনারা রেস্ট নেন। তা দিতে বলেছি এসে যাবে কিছুক্ষণের মধ্যে।
- গতো এলো না এখনো।
- কে, মন্টে? এসে যাবে। তাকে আনবার ক্ষমতালোক পাঠানো হয়েছে।
- আর একটা কথা আপনাদের বলা উচিত।
- বলেন।
- আমাদের কাছে কিন্তু টাকা পরাসা নেই। একটা কানাকড়িও নেই। কিন্তুই আনতে
পারি নি। টাকা-পরাসা, গয়নাপ্রতিপক্ষক না। কাপড়চোপড়েরও তো একই অবস্থা। কী যে
হবে? এসব কথা আপনাদেরকেই-বা কীভাবে বলি?
- লিজার কথায় প্রায় থমকে যেতে হয়। এতো বড়ো পরিবার অথচ কিন্তুই নেই সাথে, তার
মানে এদের সবকিছুই যুগিয়ে যেতে হবে আমাদের। এতোটা কি পারা যাবে? আমাদের
নিজেদের রেশনই তো সীমিত। হাসান মারিসহ ৭/৮জন চলছে এরই উপর নির্ভর করে।
এখন অতিরিক্ত ২৯ জনকে আমাদের প্রাণ সেই সীমিত রেশনসামগ্রীর ওপর নির্ভর করে
চালাতে হবে; কিন্তু কীভাবে করবো? কী দিয়ে করবো? চিন্তাটা মাথায় উদয় হতেই গুলিয়ে
যেতে চায় সবকিছু।
- ছেট বাচ্চা ছেলেমেয়েরা কাঁদাকাটি আর চিঢ়কার করতে থাকে। এর ডেতের দ্রুত
অঙ্ককারের ছায়া নেমে আসতে থাকে এই জঙ্গলমেয়েরা জীর্ণ বাড়ির আনাচেকানাচে। লিজা
তখন বলে, দুধ হবে?
- দুধ? কেনো?
- বাচ্চাকে খাওয়াতে হবে।
- আমাদের তো মিছ পাউডার, গুরুর দুধ তো হবে না।
- আপাতত ওতেই চলবে। বাচ্চারাও বুবুক, এটা যুদ্ধের সময়। এখন চাইলেই সবকিছু

পাওয়া যায় না। কথাটা বলেই লিজা হেসে ওঠে। আমরাও যোগ দিই তার সেই হাসির সাথে। এর ভেতরেই পাশের ঘরের দাওয়া থেকে নানা বলে ওঠেন, কইহে নাতির দল, বেড়াবার আনিলেন তোমহার বাড়ি, চা-নাস্তা মেহমানদারি হবে নাই?

— হবে নানা আসছে বলে তার কথার জবাব দিই। তখন বড়ো একটা কেতলিতে করে চা এবং টিনের মগ হাতে সামনে একজন, তার পেছনে একটা ভাণ্ডে গরম গরম পুরি ভাজা নিয়ে আর একজন এবং তাদের পেছনে হারিকেন হাতে আর একজন, মোট তিনজনকে আসতে দেখা যায়। লিজাকে বলি, চা-নাস্তা করেন, আমরা নানাদের সাথে বসছি। হারিকেনধারী হাসানকে বলি, জলদি গিয়ে দুধ গুলে একটা ভাণ্ডে গরম করে নিয়ে আয়। চিনি চামচ আলাদা করে আনবি।

হাসান মাথা কাত করে সায় দিয়ে চলে যায়। আমরা নানাদের পাশে বসি, মহিলারা আনা খাবার পরিবেশন করেন। একটামাত্র হারিকেনের আলোয় খুব বেশি অঙ্ককার দূর হয় না। কিন্তু টিমাটিমে আলো-আঁধারিতে চা-নাস্তা খাওয়ার মতো চমৎকার একটা পরিবেশ তৈরি হয়ে যায়। তখন মনে হয়, আসলে আন্তরিকতার সাথে নিজেদের যে-কোনো পরিস্থিতিতে মানিয়ে নেয়াটাই বড়ো কথা। সাধারণ স্বাভাবিক অবস্থায় এই অবস্থাপন্ন পরিবারের লোকজনেরা এখানে এই ঝুঝুড়ে পরিবেশে, পোকামাকড়ের আর এই স্যাতসেতে কাদা-পানির রাজ্যে বসবাস করার, অনাঞ্জীয় অচেনা মানুষদের অনুভাবজন হয়ে থাকার কথা স্বীকৃতও পারতেন না। এ যেনে স্বর্গ হতে বিদায়। অবস্থার ফেরে এরা এখন সবকিছু মেনে আঁওয়েছেন। ব্যাপারটা ভালো বলতেই হবে। এতে করে আমাদের বেশ সুবিধেই হবে। আস্তুর সময় লিজা বলে, আমাদের কিন্তু অনেক কিছু লাগবে।

— কী কী বলেন?

— সবার জন্য শাড়ি, বাচ্চাদের আড়তোপড়, পুরুষদের জন্য লুকি-গামছা, সাবান, বালতি, মগ, বাতি, বাক্সার দুধ, সুস্থিতির আর...এ পর্যন্ত বলে খেমে গিয়ে লিজা আবার হেসে ওঠে। অন্য মহিলারাও হাসেনশ্বেদ করে। চাহিদার কথা তনে দমে যাবার অবস্থা হলেও সহজভাবেই বলি, আর কী লাগবে বলেন।

— মশারি। এখানে খুব মশা। জঙ্গলের বড়ো বড়ো সব মশা। মূখের হাসিটা একইভাবে ধরে রেখে লিজা তাঁর শেষ চাহিদাটার কথা পেশ করে। আমি আড়তোখে আহিদারের দিকে তাকাই। সে তাকায় আমার দিকে। তারপর আমি বলি, ঠিক আছে, আপনারা চিন্তাভাবনা করে সবকিছুর একটা লিট তৈরি করেন। কাল সকালে দেবেন। সবকিছু ম্যানেজ হয়ে যাবে। আমরা যাচ্ছি, রেষ্ট নেন। আপনাদের ওপর দিয়ে অনেক ধক্ক গেছে।

কথাটা বলে আসবার জন্য যেই আবার পা বাড়িয়েছি, আবার পিছু ডাক লিজার, আজ রাতে কি আপনারা অপারেশনে যাবেন?

— কেনো? যেতে হতে পারে।

— না গেলে হয় না!

— কেনো?

— আমরা এতোগুলো মানুষ, অচেনা জায়গা, আমাদের ভয় করবে।

— সেন্ট্রি তো থাকবে। ভয়ের কী আছে বলেন?

— না, তবুও।

— ঠিক আছে বলে আহিদারকে নিয়ে ফিরে আসি। বিম মেরে থাকে আহিদার।
রাতের নিরাপত্তাজনিত কারণে ধূত রাজাকারটাকে এখানে রাখা নিরাপদ মনে করি না।
আহিদারের সাথে পরামর্শ করে ৫ জনের একটা স্ট দিয়ে তাকে পেয়াদাপাড়ায় পাঠিয়ে
দেয়া হয়। রাতে খাওয়াদাওয়া শেষ হয়। অভিধিদেরও খাইয়ে আনা হয়। হাইড আউটের
চারদিকে কড়া প্রহরা বসানো হয়। একরামুল আর শস্তু পালা করে থাকে প্রেটল ডিউটির
চার্জে। আহিদার আর আমি পাশাপাশি শয়ে দৃঢ়েখ মেলে রাত জেগে থাকি। জাগরণের
থোক্ষ দাওয়া হিসেবে সিগারেট টেনে চলি একটার পর একটা। অক্ষকারে পাশে জেগে
থাকা আহিদার প্রশ্ন করে, মাহবুব ভাই এখন কী হবে?

— কী হবে বলঃ উটো জিগ্যেস করি তাকে। তারপর বলি, এতো ধীরী মানুষ, হাতে
একেবারে কিছুই নাই, বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়। আনতে পারে নাই কিছুই। আমাদের চেখের
সামনেই তো সব ঘটলো।

— কিস্তু এদের চলবে কী করে?

— স্টোই তো প্রশ্ন, ভাবতে হবে।

— যুদ্ধ করবো, না এদের সমস্যা নিয়ে ভাববো?

— এদের বাদ দিয়ে তো আর যুদ্ধ নয়। এদের সমস্যাসহ আর সব সামাজিক সমস্যা
নিয়েই ভাবতে হবে।

— মন্তু মামার তো দেখা নাই, তার পরিবার বট মজিল এদিকে ভাসি যায়ছে, আর তিনি
আছেন পলিটিকস নিয়া, সীমান্তের ওপারে শব্দধ্বনি শিখিবে বসিয়া পলিটিকস। সব
পলিটিসিয়ানদের ভেতরে আসা উচিত বুঝালেন মানুষ ভাই।

— বুঝালাম, কিস্তু তাদের আনবি কী করলো?

— সেওতো কথা, আচ্ছা লিজা মাঝকে যে আপনি তালিকা তৈরি করতে কইলেন,
তালিকা যদি দেয়, তখন কী হবে—কোথা থেকে আনবেন তালিকার জিনিস?

— তোকে একটা কাজে লাগিয়ে।

— কী কাজ? বলে আহিদার বিছানার ওপর উঠে বসে।

— নে শয়ে পড়। কাল জানতে পারবি। এখন ভালোভাবে একটু ভেবে নিই।

আহিদার আর কিছু বলে না। শতরঞ্জির বিছানায়, ইটের বালিশে মাথা রেখে চুপচাপ
শয়ে রাত জাগতে থাকি দুঁজন।

২৭. ৯. ৭১

ভিন্ন ধরনের এক অভিযান

আহিদারকে বলি, একটা ভিন্ন ধরনের অভিযানে যেতে হবে আজ রাতে, তৈরি থাকিস।

চমকে উঠে আহিদার, কী ধরনের অপারেশন? একা যেতে হবে আমাকে?

— একা কেনো যাবি? দল নিয়ে যাবি। হাতিয়ারপত্র গোলাবারুদ সাথে নিবি। আমিও
থাকবো তোর সাথে। কিস্তু অপারেশনটা করতে হবে তোকে।

— কাজটা কী? প্রচণ্ড উৎসুক্য আহিদারের চোখেয়ুবে। ওর চোখের ওপর চোখ রেখে
বলি, ডাকাতি, ডাকাতি, লুট করতে হবে সবকিছু।

— কোথা থেকে?

— শান্তিবাহিনীর লিভার, পাকবাহিনীর দালালের বাড়িতে। তাদের সঞ্চিত সব মাল দুট করে নিয়ে আসতে হবে।

— কার বাড়িতে যেতে হবে?

— তাদের বেশ ক'জনের নাম আছে। যাতার সময় জেনে যাবি, যেখানে সুবিধা পাবি, যে সব থেকে বেশি নটরিয়াস তাকে টাগেটি করবি। তারপর নিয়ে আসবি সব। আপসে দিতে না চাইলে জোর করে ছিনিয়ে নিবি। বেশি বাড়াবাড়ি করলে শেষ করে দিবি একেবারে। আহিদার বুকে নেয় ব্যাপারটা। বলে, ঠিক আছে।

বিকেল তখন চারটার মতো। আহিদারকে বলি ১৪ জনের একটা দল তৈরি করে নিতে। রাত ৮টার পর যাতা।

সকালে লঙ্ঘনখনা থেকে নাস্তা গোছে আশ্চিতদের জন্য। সেন্ট্রি পোস্টে ছেলেরা পাহাদায় নিয়োজিত রাইফেল হাতে। হাসান মাঝি নাস্তা থেয়ে তার নৌকোর গলুইয়ে গিয়ে বসেছে। এপারে ভিড়িয়ে রাখা নৌকোয় বসে ওপারের দিকে তার প্রথর সতর্ক দৃষ্টির প্রহরা।

একটা কষ্টকর নির্ধূম রাত কেটে গেছে। সকাল হতেই দুই বৃক্ষ চলে আসেন। এসেই বলেন, নাতি রাইতে একেবারে ঘুমাল যায় নি হে, যা তোমার এইটে মোশা। উদার হাসিতে মুখ উত্তসিত করে বলেন বৃক্ষ। হক সাহেবের বাবা। মন্টুর শ্বতুর কিছুটা মুখচোরা ভদ্রলোক। ঠাকুরগাঁও শহরে তাঁর বাড়ি। শহরের চাকচিক্কের পালিশ তার চেহারা আর কথাবার্তায়। তিনি কিছু বলেন না। শুধু বিষণ্ণ হেসে বাল্জা মন্তু তো এলো না এখনো।

— এসে যাবে। আসেন বসেন বলে তাদের ঢেকে মাটির বিছানায় বসাই।

— মোরতো সিগারেট ফুরায় গোছে, য্যাল^{ক্রে} খিলাবো নাতি কহেক?

আমাদের কাছে আর সিগারেট নেতে, প্রতিকাল বৃক্ষকে দিয়ে যা ছিলো, রাত জাগবার মোক্ষম সহায়ক উপকরণ হিসেবে সুমাঝি নিজেরা ব্যবহার করেছি। তাই তাকে এখন সিগারেট অফার করতে পারি না। সায় ৮/১০ মাইল দূরে মানিকগঞ্জ বাজার, সেখানে কাউকে পাঠিয়ে সিগারেট আনলে প্রশংসিত। আশপাশে দোকানপাটের কোনো বালাই নেই। আহিদার তাই বলে, নানা সিগারেট তো নাই, বিড়ি চলবে?

— কি আর করিল যাবে কহেক? মুই আর রাজাও নহো, মোর রাজত্বও নাই। তুমহারলার মাথার ওপর চাপিছি ফকিরিহাল নিয়া হেনে, তুমরা যদি এখন হামাক আলকাতরা খাবা কহেন, তাও খাবা হবে। একনাগাড়ে কথাশুলো বলে হো-হো করে তিনি হাসেন।

— দে দে বিড়িই দে, বিহান থাকে প্যাটেট ধূমা যায় নাই, নেশা মাথার উপর চড়ে হে গেছে হে।

আহিদার ছেলেদের কাছে গিয়ে বৃক্ষের জন্য বিড়ির প্যাকেট সঞ্চাহ করে এনে দেয়। সেই বিড়ি ধরিয়ে তাতে সুরক্ষান দিতে দিতে তিনি বলেন, তো আইজ দুপরোত খিলাছেন কি!

— গরু।

— কী কহিলো! চকচক করে ওঠে বৃক্ষের চোখ-মুখ।

— হ্যা, নানা গরু। তবে আমাদের তো ডালডার পাক, মশলাও তেমন নাই। ছেলেরা পাক করে, রান্না হয়তো তেমন ভালো হবে না। বৃক্ষকে বিনীতভাবে জানাই। বৃক্ষ লাফিয়ে ওঠেন, কেনহে, হামার বেটি ছাওয়া গুলাতো রাধিবার পারে। মুই যায়ে হেনে উমাক কহেছো। তারা বসে আছে আর খাচে। ওমহারা আসিয়া গোশত্ রাঙ্কে দিয়া যাবে। কথাশুলো

বলেই তারা দুঁজন চলে যান। আহিদার বিছানায় বসে আমার মুখের দিকে তাকায়। তাকিয়ে
বলে, এখন? এখন কী হবে? গরু খাওয়াবেন তো বললেন, পাবেন কই?

আছে একটা গরু। হাসান মাঝি কোথা থেকে যেনো ঘোগড় করে এনেছে। শুকে ডেকে
পেড়ে দে সেটা। গরু যখন খাওয়াতে চেয়েছি, গরুই খাওয়ানো হবে। আলকাতরা নয়।
একরামুলকে ডেকে বলি সব ম্যানেজ করতে। সব কাজের কাজি একরামুল সেইমতো
কাজে লেগে পড়ে।

আর এদিকে থেকে থেকেই আহিদার বলে উঠছে, অসভ্য মাহবুব ভাই। পারা যাবে না;
গুঠিসুন্দ এতোগুলো লোককে এভানে টানা যাবে না। কতোদিন এদের এভাবে রাখবেন,
খাওয়াবেন?

— কথাটা তো ঠিক। কিন্তু উপায়ই-বা কি? এ অবস্থায় তাদের তো আর না বলা যাবে
না। এদের গার্জিয়ান তো দুই বৃক্ষ। বাদবাকি সবাই মেয়েমানুষ, বাচ্চাকাচা আর চাকর-
বাকর। বর্তমানে তাদের যাওয়ার কোনো জায়গাই নেই। কোথায়ই-বা যেতে বলি বল?
ওদের বাঁচিয়ে নিরাপত্তা দিয়ে এখান পর্যন্ত যখন নিজেদের দায়িত্ব নিয়ে এসেছি, তখন
বাকিটাতো টানতেই হবে। কথাগুলো আহিদারকে বলি মনের গভীর থেকে। কিন্তু তারপরও
আহিদারের প্রশ্ন, কিন্তু খাওয়াদাওয়ার কী হবে?

— একরামুল জানিয়েছে, আজকের রেশনের মঙ্গলদিয়ে চলবে আর একদিন।
আমাদের যা রেশন তার ডবল খরচ হচ্ছে এখন।

— তারপর চলবে কী করে? আবার উৎসেগমাধা হলু আহিদার।

— চলবে, চালাতে হবে। এখন আর ফিরিবার পথ নেই। আজ রাতেই ব্যবস্থা করতে
হবে। এখানে তারা উদ্বাস্তু হয়ে এসেছে তাদের সব ছিল, কিন্তু শক্রুরা তার সবকিছু
জ্ঞালিয়েপুড়িয়ে ছারখার করে দিয়ে গেছে। এ কাজে যাদের মদদ ছিলো, যারা রাজাকার আর
পাকসেনাদের ডেকে এনেছে, তারপর কাছ থেকে নিয়ে আসতে হবে ক্ষতিপূরণ। আজ
রাতেই। এটা যুক্তের সময়, অফিসারের পিঠে হাত রেখে বলি, যুক্তের কোনো ধর্ম নেই,
কোনো ন্যায়নীতি নেই, কোনো মানবিক ব্যাপারস্যাপার নেই। হারলে চলবে না। যারা
যুক্তের নামে গ্রামের বাড়িঘর, সহায়স্পন্দন সব জ্ঞালিয়েপুড়িয়ে দিয়ে গেলো, তার ক্ষতিপূরণ
আমরা আদায় করবোই। তবে আজ যা করতে হবে, সেটা উদ্বাস্তু এই পরিবারের সদস্যদের
হার্ষে। তাদের জন্য খাবার সংগ্রহের জন্য। যারা তাদের খাদের গোলা ধূংস করে দিয়েছে,
তাদেরই একজনের গোলা আজ সাফ করে নিয়ে এসে তাদের বাঁচানোর ব্যবস্থা করতে
হবে। এ রকমের কাজ দু'একবার আমাদের আগেও করতে হয়েছে। আর এবারও করতে
হবে। তবে একটুখানি বড়ো আকারে, এই যা।

বৃক্ষরা চলে যাওয়ার কিছুক্ষণ পর হাজির হই আমাদের আশ্রিতদের ডেরায়। লিজা
অনুযোগ করে বসে এই আপনাদের সময় হলো! সন্ধ্যার অক্ষকারে আমাদের এখানে রেখে
একেবারে গায়েব!

— কোনো অসুবিধা হচ্ছে?

— অসুবিধা নাই কোনো, তবে আছে হাজারটা, বলে হাসে লিজা। হাসেন অন্যান্য
মহিলাও।

— খাওয়াদাওয়া হচ্ছে তো? ঠিকমতো পাচ্ছেন?

— সেদিকে কোনো অসুবিধা নাই। আপনাদের ছেলেরা খুব ভালো, একজন বয়স্ক
মহিলা তার বিগলিত গলায় বলেন।

— রাতে অপারেশনে গেছেনে? লিজা হঠাতে করেই জিগ্যেস করে।

— না, আপনি নিষেধ করলেন না। আপনাদের নিরাপত্তার কথা বললেন না। তাই ...।

— ওঃ বলে কিছুক্ষণ থমকে থাকে লিজা। তারপর বলে, খুব অসুবিধায় পড়ে গেছেন
আপনারা, না?

— অসুবিধা আর কি? এটুকু তো করতেই হবে।

— ওতো এলো না এখনো।

— আসবে, এসে যাবে আজকেই। আপনাদের ফর্মগুলো লিখেছেন?

— কি আর লিখবো? অতো বড় ফর্দ কি লেখা যায়? সব জিনিসেরই তো প্রয়োজন।

— ঠিক আছে, হয়ে যাবে। আজকের দিনটা শুধু ম্যানেজ করে নিন। কাল ইন্শাল্যাহ সব
ঠিক হয়ে যাবে।

— আমাকে কি যেতে হবে দু'একজন সাথে নিয়ে?

— কেনো? কোথায়?

— গোশ্ত রাঁধতে আপনাদের লঙ্ঘনখানায়?

— দরকার নেই। রেষ্ট নেন। আপনাদের ছেলেরা যা খাচ্ছে, কোনো বকমে তাই দিয়ে
চালিয়ে নিতে হবে আর কি।

— ঠিক আছে। মাথা কাত করে তার মুখে ধূঁধে রাখা নরম হাসিতে সায় দেয় সে।
আমরা চলে আসি আপনাদের হাইড আউটে।

দুপুরের দিকে মন্টু আসে। ঘটে-যাঞ্জা-চিটনা বিজ্ঞানিতভাবে তাঁকে জানাই। তারপর
বলি, যান আপনার বড়-বাঢ়া আর প্রজাতারের সবার চার্জ নিন গিয়ে। বড় দেরি করে
ফেলেছেন আপনি।

আমার কথার জবাবে মন্টু কহে, চার্জ তো নেবো। আমি তো নিজেই এখন নিঃশ্ব মানুষ।
তার ওপর এতোগুলো নিঃশ্ব মানুষ। কীভাবে চার্জ বুঝে নেবো বলেন?

— সে হবে খন। এখন যান। পিল্জ মিট ইয়োর ওয়াইফ। মন্টু চলে যান। দুপুরের
আহারের পর খালিকটা বিশ্রাম। এরপর শুরু হয় আহিদারের সেই রাত্তিকালীন অভিযানে
যাবার প্রস্তুতির কাজ। রাতের খাবারদাবারের পর তার দলের সাথে এগিয়ে গিয়ে নদী পার
করে দিয়ে আসি। বিদায় দেবার সময় তাকে ৩/৪ জন দালালের নাম দিই। দিয়ে বলি,
কোনো অবস্থাতেই খালি হাতে ফিরবি না। আর বিনা প্রয়োজনে কোনো অত্যাচার যেনো না
হয়। এ কথাটা মনে রাখবি। আহিদার খোদা হাফেজ বলে তার দলবল নিয়ে রওনা দেয়।
হাসান মাঝি তার খেয়া নৌকোয় করে আমাকে নিয়ে আসে এপারে।

শেষ রাতের দিকে রীতিমতো হাঁকডাক শোরগোল তুলে আহিদার তার কাজ শেষ করে
ফিরে আসে। ফিরে আসে দুটো মোষের গাড়ি ভর্তি মালপত্র আর একপাল গরু-ছাগলসহ।
সরাসরি নদী অতিক্রম করে নিয়ে এসেছে মোষের গাড়ি দুটো। জিগ্যেস করি, কী খবর
আহিদার, সব ঠিক আছে তো? কোনো অসুবিধা?

— না, সব সাফ করে নিয়ে চলে এসেছি। একরামুলকে লাগিয়ে দিই সব মালপত্র
খালাস করে উদ্বাস্তুদের আস্তানায় নিয়ে তুলতে। আহিদারের সারামুখে তখন সাফল্যের

হাসি। হাতিয়ারপত্র রেখে, বিছানায় বসে পড়ে সে। তারপর বলতে থাকে তার অপারেশনের কাহিনী।

এ এলাকার সব থেকে বড়ো লুটেরা আর পাকবাহিনীর পা-চাটা দালাল নফি মিয়ার বাড়ি রেইড করার সিদ্ধান্ত নেয় সে চলতি পথে। অক্ষয়কারে বাড়িটা ঘিরে ফেলে ভেতরে ঢুকবার মুখে দু'জন পাহারাদার লোক 'কে-কে' বলে চেঁচিয়ে ওঠে। 'চোপ্ ব্যাটা চিলাইস না, শুলি খাবি' বলে তাদের হাত-মুখ-পা গাছের সাথে বেঁধে ফেলা হয়।

দালাল নফি মিয়া তখন ঘর থেকে বের হয়ে আসে। কে কে বলে সেও চিংকার করতে থাকে। মুরগির মতো তাকে খপ্ করে ধরে ফেলা হয়। তয় পেয়ে সে জিগ্যেস করে, তুম্রা কারা বাহেঁ তোর বাপ বলে আহিদার তাকে শুরু করে দেয় টেনগানের বাঁট দিয়ে রাম খোলাই।

'বাগে যোক মারেন না গে, তুম্রা যা চাহেন নিয়া হেনে যান, বলে সে ঢুকবে কেন্দে ওঠে আহিদারের পা ধরে। দে ব্যাটা, গোলার চাবি দে' বলতেই চাবি আসে। তারপর নফিকে বাইরে নিয়ে এসে একদিকে চলতে থাকে ধোলাই পর্ব, অন্যদিকে গোলা থেকে মাল খালাসের কাজ। দুটো যোষের গাড়ি তার বাড়ির সামলেই ছিলো। তাতে মালপত্র সব তোলা হয়। গোয়াল থেকে ৮/১০টা গুরু বের করে নেয়া হয়। একটা ছাগল তখন ভ্যা-ভ্যা করে চিংকার করছিলো। ছেলেরা সেটাকেও তুলে নেয়। তারপর আধমরা নফি মিয়াকে গাছের সাথে বেঁধে ওরা নিচিস্তে রওনা দেয় হাইড আউটের দিকে।

তোরের আলো ফোটার সাথে সাথে রিপোর্ট-এন্ড-জন্য রওনা দিতে হয়। মন্তুদের আস্তানায় এসে মালপত্রের স্তুপ দেখে সত্যিই বৈত্তিহ্যতা অবাক হতে হয়। আহিদার একি করেছে। ধান-চাল সরবে-কলাই-তিল-তিসিস পৌরণ কয়েক মণ পাট পর্যন্ত নিয়ে এসেছে। সাথে দুটো গাড়িসহ ৪টা বড়ো সাইজের প্ল্যাশ এবং ১টা ছাগল আর ছোটোবড়ো গুরুর পাল। ঘোট ১০টা গুরু সেই পালে, কিন্তুকে বুঝিয়ে দিই, এসব মালপত্রের সবকিছুই আপনাদের জন্য। আপাতত এ দিনে ক্ষয়তো সামাল দিতে পারবেন।

মন্তু কিছুটা ইতস্তত করকে তাকে বলি, দায়দায়িত্ব তো সব আমাদের। সোজা কথা, আপনাদের বাঁচতে হবে। কোনো দয়াদাক্ষিণ্য নয়। নিজের পাওনা মনে করে, এগুলো দিয়ে আপাতত সমস্যার সামাল দেন। একজোড়া যোৰ আজই হলদিবাড়ি-মানিকগঞ্জে নিয়ে গিয়ে বেচে দিয়ে প্রয়োজনীয় সবকিছু কিনে আনেন।

লিজার দু'চোখে অবাক দৃষ্টি। তার মুখের দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে বলি, এবার তালিকাটা আপনার হাসব্যান্ডকে দেন। দেখবেন সব এসে যাবে।

২৮. ৯. ৭৩

আমি একজন রাজাকার

রাজাকার দেলোয়ারের বুকে-পিঠে গোটা গোটা অক্ষরে সাদা কাগজের ওপর কালো কালিতে লেখা, 'আমি একজন রাজাকার'। কাঁধে আড়াআড়িভাবে ঘোলানো তার নিজস্ব রাইফেল। কোমরে বাঁধা থাকি কাপড়ের তৈরি বুলেটের মালা। তার চোখ খোলা, হাত দুটো পিছমোড়া করে দড়ি দিয়ে শক্তভাবে বাঁধা। পেছনে রশি ধরে আছে একজন ছেলে। সামনে পেছনে তার সশস্ত্র গার্ড। রাজাকার দেলোয়ারকে এ অবস্থায় সামনে রেখে আমরা চলেছি মানিকগঞ্জ বি.ও.পি.র উদ্দেশে। একজন জীবন্ত রাজাকার সশস্ত্র অবস্থায় সম্মুখ্যুক্ত ধরা হয়েছে এবং

তাকে রাস্তার ওপর দিয়ে হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে মানিকগঙ্গের দিকে, বরবটা কেমন করে জানি বিদ্যুৎবেগে ছড়িয়ে পড়ে আশপাশের জনবসতি জুড়ে। ছড়িয়ে পড়ে বিচ্ছিন্নভাবে আল্পিত এই জনপদের শরণার্থী পরিবারগুলোর মধ্যে। খেতখামারে কর্মরত মানুষজনের মধ্যে, রাস্তার পার্শ্ববর্তী দোকান, বাড়িগুলির আর পুরুরের ঘাটাটার অলস সময় যাপনরত গ্রামবাসীদের মধ্যে। দৌড়ে ছুটে ছুটে আসে সব বয়সের মানুষ-গৃহবধূ, তরুণ-তরুণী, ছেট ছেট ছেলেমেয়ে দলবদ্ধভাবে। তারা এতোদিন রাজাকারের নাম শনেছে শুধু। উনেছে তাদের অত্যাচার, লুটতরাজ আর নির্দৃষ্ট সম্পর্কে নানা কাহিনী। নিজেদের চোখে দেখে নি কখনো। দেখবার প্রশ্নই উঠে না। তাই তারা রাস্তার পাশে ভিড় করে আশা মিটিয়ে জীবন্ত রাজাকার দেখে। রাজাকার নামের জীবিত মানুষ, না অন্য কোনো কিছু, এ রকমের কোতুহল থেকে সবাই রাস্তার ওপর এসে ভালোভাবে দেখে নেয় রাজাকার দেলোয়ারকে। সবাইর প্রশ্ন, কোথায় ধরলেন? কীভাবে ধরলেন? কী নাম তার ইত্যাদি। ‘আমি একজন রাজাকার’ তার বুকেপিঠে সাঁটা কাগজে লেখা এই পরিচিতি ফলকই যথেষ্ট এইসব প্রশ্নের জবাব হিসেবে। কাঁধে রাইফেল ঝুলিয়ে, শুলির মালা কোমরে বেঁধে রাজাকারের সশস্ত্র ঝুপ ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। আর এই অবস্থায় কোতুহলী শতশত নানা বয়সের মানুষের চোখের সামনে দিয়ে তাদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে তাকে একটা ভ্রাম্যমাণ প্রশ্ননীর মতোই নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। মানুষ তাকে দেখছে দু'চোখে রাজের বিশ্ব অস্তুর্গামিত্বিত দৃষ্টি নিয়ে। এখন রাজাকার দেলোয়ার একজন মানুষ নয়। মানুষজনী চুম্বকীর যোগ্য একজন পণ্ডি।

রাজাকার দেলোয়ারের অবস্থা খুবই শোচনীয়। একজন বোকা মানুষের ডাবড়েবে ঢাউনি নিয়ে সে পথ হাঁটে। প্রচণ্ড শঙ্কা আর মৃত্যুর ভয় ক্ষেত্রে তার চোখেস্থৈর স্পষ্ট। মানুষজন ছুটে ছুটে এসে তাকে মারতে চায়। ছেট ছেলেদের প্রক্ষেত্রে কেউ মাটির ঢেলা কুড়িয়ে তাকে তাক করে ছেড়ে। উপচে পড়া ভিড় সামলানো সম্ভুক্ত গার্ড দলের সদস্যদের পক্ষে সত্যিই কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। তারা রায়তিমতো হিমশিম প্রক্ষেত্রে থাকে। ভিড়ের অনেক মানুষই দাবি করতে থাকে, তাদের হাতে ধৃত রাজাকারকে ছেড়ে দিতে, জিঘাসার প্রয়োগ এতোই প্রবল যে, নাগালে পেলে রাজাকারটাকে তারা মুহূর্তের ভেতরে পিটিয়ে মেরে ফেলবে যেনো। অথচ রাজাকার দেলোয়ারকে অক্ষত অবস্থায় মানিকগঞ্জ বি.ও.পি.তে পৌছে দিতে হবে। ক্যাণ্টেন নদী সেখানে অপেক্ষা করছেন আমাদের জন্য। একজন জলজ্যান্ত খাঁটি রাজাকারকে দেখবার এবং তাকে তাদের হেড কোয়ার্টারে নিয়ে যাবার জন্য নিশ্চয়ই তিনি এতোক্ষণে অধীর হয়ে উঠেছেন।

এ অবস্থায় আমাদের এই মূল্যবান যুদ্ধবন্দির যাতে কোনোরকম ক্ষতি না হয়, সেদিকে কড়া দৃষ্টি রাখে ১০ জন সশস্ত্র গার্ড। মানিকগঙ্গের দিকে যতোই এগিয়ে যাচ্ছি, ততোই বাড়তে থাকে ভিড়। আমাদের সাথে যাওয়া ছেলেদের আরো ৫ জনকে গার্ড দলের সাথে যুক্ত করা হয়। একরামুল, মতিয়ার আর খলিলরা মানুষের ভেঙেপড়া ঢল আটকাতে অস্থির হয়ে উঠে। স্বাভাবিকগতিতে এগুনো যায় না। খেমে খেমে, ভিড় পরিষ্কার করে, কোতুহলী মানুষের প্রশ্নের অক্রূত জবাব দিতে দিতে এগুতে হয়। মতিয়ারকে এ অবস্থায় এক পর্যায়ে দ্রুত মানিকগঞ্জ চলে যেতে বলি। ক্যাণ্টেন নদীকে সে গিয়ে জানাবে, তিনি যেনো একদল বি.এস.এফ.কে মানিকগঞ্জ বাজারের সম্মুখবর্তী ব্রিজটা পর্যন্ত পাঠিয়ে দেন। তা না হলে মানিকগঞ্জ পৌছানো মাত্র হাজার হাজার শরণার্থী মানুষ তাদের সমস্ত ঘৃণা আর প্রতিশোধ স্পৃহা নিয়ে বাঁপিয়ে পড়বে এই যুদ্ধবন্দি রাজাকারটির ওপরে এবং তাকে মেরে তুলোধুনো

করে ফেলবে। এজন্য মানিকগঞ্জ বাজারে উঠবার আগেই বি.এস.এফ.-এর প্রোটেকশন প্রয়োজন। মতিয়ার খবরটা নদাকে দেয়ার জন্য প্রায় দৌড়ে ছুটে চলে মানিকগঞ্জ বি.ও.পি.র উদ্দেশে। আর রাজাকার দেলোয়ারকে হাঁটিয়ে নিয়ে চলে সমুখবর্তী গার্ডের দল। আমরা পেছনে পেছনে হাঁটি আর প্রশ্নের পর প্রশ্নের জবাব দিতে দিতে ছেলেরা এগুতে থাকে। ভিড় সামলাতে সামলাতে আর প্রশ্নের পর প্রশ্নের জবাব দিতে দিতে ছেলেরা এগুতে থাকে। অহিদার, বন্দিউজ্জামান আর ইয়াকুবদের সাথে নিয়ে আমি এগিয়ে চলি পেছন পেছন। বুকের ভেতরে বয়ে চলে প্রশ্নাতি আর স্বত্তির একটা খিরিবিরি হাওয়া। আর সেটা যুক্ত করবার, যুক্তে টিকে থাকবার, যুক্তে জয়লাভ করবার, রাজাকার কমান্ডারসহ আরো কিছু রাজাকারকে হতাহত করবার, সমুখ-যুক্তে সশস্ত্র অবস্থায় একজন জ্যান্ত রাজাকারকে বন্দি করবার, একটা বিরাট গ্রাম জনপদকে নিরাপত্তা প্রদান করবার, মহিলা ও একবোক বাচ্চাকাচাসহ একা বিপদ্ধাত্ত পরিবারকে ভরণপোষণের সাহায্য করবার কৃতিত্বের জন্য। গত ৪ দিনের প্রতিটি পল কেটেছে যুক্তে যুক্তে। আর সেই যুক্তে আমাদের সফলতাও সন্তোষনজক। মনের ভেতরে তাই প্রচণ্ড ভালো লাগা একটা আলতো শিহরণ থরথর করে উঠেছে। বিগেড়িয়ার ঘোশীর চেহারা ভেসে ওঠে চোখের সামনে। ক্যাপ্টেন নদার কাছে ব্রিফিংয়ের দৃশ্যটাও মনে পড়ে। তাঁরা যে মিশনের দায়িত্ব দিয়ে নতুন একটা দল গড়ে আমাকে এ অঞ্চলে পাঠিয়েছিলেন, সেটা বর্ষে হয় নি। ৪ দিনের সাফল্যের খতিয়ান নিচ্যাই জন্মস্তুকে সমৃষ্ট করবে।

যা ধারণা করা গিয়েছিলো শেষতক তাই-ই ঘটলো। জ্যোতি ধরা পড়া রাজাকারের সংবাদ পৌছনো মাত্র শত শত শরণার্থী মানুষ তাকে একনজরে দেখবার জন্য ছুটে আসে। তাদের প্রভোকের চোখে-যুখে প্রবল কৌতুহল আর প্রত্যাশাধের আনন্দ। মনে হয়, রাজাকারটাকে তারা তাদের হাতের নাগালে পেলে নিয়মিত ছিড়ে দেবে মেরে ফেলবে। তবে ভাগ্য ভালো, ক্যাপ্টেন নদার পাঠানো বি.এস.এফ., কাহিনা শরণার্থী মানুষের ভিড় ব্রিজের যুখে আটকে দেয়। তারপর তাদের সহযোগিতায় এফ.এফ. গার্ড দল অক্ষত অবস্থায় রাজাকার দেলোয়ারকে বি.ও.পি.তে নিয়ে আসে। ক্যাপ্টেন নদা আজ আনন্দের আতিশায়ে স্বাগত জানান। উষও করমদনে তিনি তার সন্তুষ্টির কথা ব্যক্ত করেন। কেননা, এ সফলতা শুধু আমাদের নয়, তার নিজেরও। কারণ তিনিই আমাদের কমান্ডিং অফিসার।

বি.এস.এফ.-এর ক্যাপ্সের ভেতরে রাজাকার দেলোয়ারকে বেঁধে বসিয়ে রাখা হয়। বাইরে তখন হাজার হাজার উৎসুক মানুষ। কেবল একনজর তাকে দেখবার জন্য তাদের মধ্যে চেলাটেলি হড়েছড়ি। বি.এস.এফ.-এর ইঙ্গেলেরসহ অন্যরা রাজাকার দেলোয়ারকে এটা সেটা প্রশ্ন করার কাজে লেগে যান। তাদের ইনটেলিজেন্স ব্রাফের লোকজনও লেগে পড়ে তার কাছ থেকে শক্রপক্ষের নানা তথ্য আদায় করার জন্য।

এ রকম একটা সাফল্যের জন্য নদাসহ বি.এস.এফ.-এর উপস্থিত সদস্যরা আমাদের দারুণ খাতিরআতি করতে থাকেন। তা পানে আপ্যায়িত করেন তারা আস্তরিকতার সাথে। নদা রিপোর্ট নেন। রাজাকার ধরার বিস্তারিত বিবরণ শোনেন একরামুলের কাছ থেকে। একরামুল তাঁকে জানায়, যুক্ত করতে করতে কীভাবে সে রাস্তার পার্শ্ববর্তী বাঁশতলায় রাজাকারের অবস্থানের ওপর জীবন বাঁজি রেখে বাঁপিয়ে পড়ে পাকড়াও করেছে রাজাকার দেলোয়ার হোসেনকে। একটা বিশ্বাবোধ নিয়ে নদাসহ অন্যরা সে কাহিনী শোনেন। আমি নিজেও নদার কাছে গত ৪ দিন ধরে আমাদের দিনে-রাতে যুক্তে জড়িত থাকার বিবরণ পেশ

করি। নিহত ঘুটু ডাঙ্কাৰ, মারেয়া গ্রামের যুদ্ধ। নিহত রাজাকাৰ এবং উক্তাৰ কৰা হাতিয়াৰ ইত্যাদিসহ গোলাবারুদ্দেৱ খত্তিয়ানও পেশ কৰি এই সাথে। তিনি সবকিছু টুকু নেন তাৰ নেটোবইয়ে। সব কাজ শেষ হলে রেশন আৰ গোলাবারুদ্দেৱ সৱবৱৱাহ বুঝিয়ে দেন। রাজাকাৰ দেলোয়াৱকে চোখ বেঁধে এৱপৰ তুলে দেয়া হয় নন্দাৰ গাঢ়িতে। যাবাৰ সময় তিনি গভীৰ আস্তৱিকতাৰ সাথে বলেন, মাহুব হবে। ইউ উইল গ্যাচিভ ইয়োৱ ফ্ৰিডম সাম ডে। গো অন মাই ফ্ৰেণ্ড। তু নট স্টপ।

২৯. ৯. ৭১

অভৃতপূৰ্ব সেই দৃশ্য

সঙ্ক্ষ্যার আগেভাবে হাইড আউটে ফিরেই একটা অভৃতপূৰ্ব দৃশ্যৰ সম্মুখীন হতে হয়। দেখতে পাই একজন সুৰী গৃহস্থ মানুষেৰ মতো চোখেমুখে পৰম আস্তাণ্তিৰ হাসি নিয়ে মন্তু তাৰ শ্ৰী লিজাৰে হলদিবাড়ি-মানিকগঞ্জ বাজাৰ থেকে কিনে আনা জিনিসপত্ৰেৰ প্যাকেট খুলে খুলে সব বুঝিয়ে দিছে। একজোড়া যোৰ বিক্ৰিৰ টাকা দিয়ে কিনে আনা হয়েছে এইসব নিত্যপ্ৰয়োজনীয় জিনিস। আৰ সেগুলোকে ধিৰে সাধাৰে সমবেত মন্তুদেৱ পৰিবাৱেৱ ছোটোবড়ো সব সদস্য, এমনকি সেই বৃক্ষ দু'জনও। মানিকগঞ্জে রিপোর্টিংশেৰ পেয়ানাপাড়াৰ বন্দুদেৱ বিদায় জিনিয়ে হাইড আউটেৰ উদ্দেশে সোজা হেঁটে চলে এসেছি প্ৰায় মন্তু মাইলৰ পথ। সাৰাটা পথ রেশন সামগ্ৰী আৰ গোলাবারুদ্দেৱ বোৰা বহন কৰে আস্তাণ্তি হয়েছে। ক্রান্তি সত্ৰেও ছেলেদেৱ হাইড আউটে যেতে বলে মন্তুদেৱ আস্তানায় খোজ মিলে যাই তাদেৱ সৰ্বশেষ অবস্থা জানিবাৰ আঘাত থেকে। বাড়িতে চুকেই এই অভাৱিত অন্তিমক্ষত হৰাৰ মতো দৃশ্যেৰ সম্মুখীন হতে হয়। একটা অস্থায়ী সংসাৰ চালাতে যা কিছু ইয়োজন, মন্তু তাৰ প্ৰায় কিছুই বাকি রাখে নি। ডেক্চি, হাড়িপাতিল, রান্নাবান্নাৰ সামগ্ৰী বাচ্চাদেৱ জন্য দুধেৰ টিন, ঘৃণ্ডপত্ৰ, প্ৰত্যেক মহিলাৰ জন্য শাড়ি, কাপড়, বাচ্চাদেৱ পোশাকআশাক, পুৰুষদেৱ জন্য লুঙ্গি-জামা ইত্যাদি সবই। যা হোক, সম্পূৰ্ণ সহায়তালহীন, আৰ কপৰ্দিকশূন্য কিছু মানুষেৰ আহাৱিহাৱসহ নিত্যদিনকাৰ প্ৰয়োজনে একদল মুক্তিযোদ্ধাৰ ওপৰ তিনবেলা মুখাপেক্ষিতাৰ অবসান হলো তাহলে! তাৰা তাদেৱ নিজেদেৱ পায়েৱ নিচে আহাৰ ঠাই খুজে পেলো অবশেষে। ভালো লাগাৰ একটা পৰম অনুভূতি চনমনিয়ে ওঠে মনেৰ ভেতৱে। মন বলে ওঠে, এবাৰ এৱা বাঁচবে। আৰ অসুবিধে নৈই। মন্তুৰ মুখে সপ্রতিত হাসি। বলে, মামা প্ৰয়োজনীয় সব জিনিস আপাতত নিয়ে গোলাম।

— ভালো, উভৰে বলি, যা আনা হয় নি, সেগুলোও নিয়ে আসবেন পৱে। লিজাৰ চোখ-মুখেও তণ্ড গৃহকৰ্তাৰ তৃষ্ণি। অনাবিল হাসি নিয়ে চোখ তুলে তাকায় সে। তাৰ চোখে দৃষ্টি রেখে বলি, মশাৱি পেয়েছেন? এনেছে?

— হ্যা বলে ঘাড় কাত কৰে তুলে দেখায় সে মশাৱিগুলো। তাৰপৰ বলে, বসেন। চা খাবেন। তৈৰি কৰি।

তাৰ মানে চায়েৰ সৱজামও মন্তু নিয়ে এসেছেন। বলি, এখন না। অনেক দূৰ পথ কাদা-মাটি মাড়িয়ে এসেছি, আগে পৱিষ্ঠাৰ হয়ে নৈই। গুছিয়ে নেন আপনারাও। কথাটা শেষ কৰেই আস্তাজ কৰি, গতৰাতে মন্তুকে যা কিছু দেয়া হয়েছে, তাতে কৰে তাদেৱ মাস দূয়েক দিবি চলে যাবে।

এদিকে আরেক ঘটনা। আমাদের ডেরায় ফিরে এসে দেখি, রাতের প্রেটেল পার্টি ধরে এনেছে সহযুদিন নামের পিস কমিটির একজন সমর্থক এবং পাকবাহিনীর একজন সন্দেহভাজন অনুচর অর্থাৎ স্পাইকে। হাইড আউটের অঙ্গিলায় খুটির সাথে বেঁধে রাখা হয়েছে তাকে। গামছা পেঁচিয়ে শক্ত করে তার চোখ বাঁধা। আমাদের হাইড আউটের অবস্থান আর মুক্তিযোদ্ধাদের শক্তি সম্পর্কে সে যাতে কোনো ধারণা করতে না পারে সে কারণেই। সারাদিন তার মুখ থেকে কোনো কিছু বের করা যায় নি। কিছু জিগ্যেস করলেই সে বলে, মুই কিছু জানো না গে, কাহিবা পারো না। এবার আমি তার কাছে এগিয়ে যাই। জিগ্যেস করি তাকে, তোমার নাম কি?

- সহযুদিন।
- বাড়ি?
- মারেয়া।
- মন্তুকে চেনোঁ?
- না।
- আবদুল হককে চেনোঁ?
- না।
- পিস কমিটির লিডার নুরুল ইসলাম চেয়ারম্যানকে চেনোঁ?
- না।
- নফি খিয়াকে?
- না।
- তাহলে কাউকেই চেনো না?
- না।
- তোমার বাড়ি মারেয়ায় আর মন্তুকের এতে নামিদামি লোকদের চেনো না? নির্মনের থাকে তখন সে আবার আমার জন্মস্থানের পালা, তুমি কি রাজাকার, টেনিং নিষ্ঠা?
- না।
- রাজাকার আর পাকবাহিনীর সাথে মারেয়া এসেছিলে?
- না।
- তোমার রাইফেলটা কোথায়?
- মোর রাইফেল নাই।
- তুমি মারেয়ায় না থেকে বোদায় থাকো কেনো?
- নির্মনের।
- তুমি মারেয়ায় এসেছিলে কেনো?
- বাড়িঘরের খৌজ করিবার।
- বাড়িঘরের খৌজ নিতে, না মুক্তিবাহিনীর খৌজ নিতে?
- না হয়, বাড়িত অসেছিনু।
- সত্যি বলো তুমি কে, তাহলে তোমাকে ছেড়ে দেয়া হবে, তুমি রাজাকার, না পাকিস্তানি স্পাই?
- না হয়, মুই কিছু নহ গে। তুমরা মোক ছাড়ে দেন।
- ব্যাটার মুখ দিয়ে সহজে কথা বের হবে না বুঝতে পারি। তাই একরামুলকে একটা লাঠি

আনতে বলি। সে একটা মোটাসোটা বাঁশের কঢ়ি নিয়ে আসে। আসতেই তাকে বলি, শালাকে বানা, চোর পেটাবার মতো করে।

একরামুল খুটির সাথে বাঁধা অবস্থা থেকে সইযুদ্ধিনকে ঝুলে নেয়। তারপর শুরু করে চোর পেটানো মার। ঝাড়া পাঁচ মিনিটের মতো মারে সে শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে।

— বাগে, মরে শেনু গে। ছাড়ে দেন গে বা সব কহেছু।

যাক শেষ পর্যন্ত লাঠির বাড়িই কাজ দেয়। সইযুদ্ধিন ত্রাহি চিংকার করতে থাকে। একরামুলকে থামতে বলি। এবার কাতরাতে কাতরাতে সইযুদ্ধিন বলে, মুই পানি থাম। পানি দিতে বলি তাকে। ঢকঢক করে প্রায় এক বদনা পানি থায় সে। তারপর নেতৃত্বে তয়ে পড়ে। একরামুল তার চুলের মুষ্ঠি ধরে আবার বসিয়ে দিয়ে শুরু করতে চায় ছিতীয় দফা মার। আমি ইশ্বরের হারতে নিবেধ করে লোকটাকে বলি, সইযুদ্ধিন মিয়া একার সত্ত্ব কথা বলবে, না আরো চলবে?

— না না মোক আর মারেন না, কহেছু সব কহেছু।

— মিয়া কথা কিন্তু বলবে না।

— না, তোমার পা ধরে কহিছু তুমরা মোর বাপ, সত্ত্ব কথা কহিম।

— ঠিক আছে বলো তাহলে সত্ত্ব কথা।

— মোক বোদা থাকে রাজাকার কমান্ডার আকবর মিয়া পাঠাইছে। মুক্তিবাহিনীর খৌজ নিবার তানে আর মন্তু মিয়ার ঘরের পরিবার কুন্তলে ভাঙ্গে সেইটা জানিবার তানে। মুই রাজাকার ট্রেনিং নিছো, কিন্তুক রাজাকার বাহিনীত আগত নাই, মোক ওমরা রাইফেল দেয় নাই। ওমরা মোক বিশ্বাস করে না।

— মারেয়া গ্রাম জুলানোর জন্য কে এসেছিলো?

— আকবর মিয়া, অনেকগুলান রাজাকার ধরে আসেছিলো। খানের দলও আছিলো সাথোত।

— এখন ওরা ডিফেন্স করছে কোথায়?

— নয়াদিঘিত কাইল থাকে ডিফেন্স করেছে। ঐঠে উমরা ঘাঁটি করিবে। বাক্সার তৈরি করেছে।

মার, যাকে বলা হয় লাঠ্টোষধ তা স্বীকৃতির জন্য মারাত্মক কাজ দেয়। সইযুদ্ধিন মারের ঠেলায় গড়গড় করে সব বলে দেয়। মন্তুকে ডেকে আনা হয়। আনার পর তার সামনে সইযুদ্ধিনের চোখ ঝুলে দেয়া হয়। হারিকেনের আলোয় চোখ পিটিপিট করে তার। তারপরেই মন্তুকে সামনে দেখতে পেয়ে আর্তিচকার করে হ্যাড়ি বেয়ে পড়ে তার পায়ের ওপর। আর বলতে থাকে, বাগে মন্তু চাচা, মোক বাঁচান গে বা, মুই আর উমহার ঠে যাম নি। এইঠে থাকিম। মোক মাপ করি দেন। মুই আর উমার কাজ করিম নি। তুমার সাথে থাকিম। সব কাজ করছে দিম তুমার। মোর জান বাঁচায়ে দে মন্তু চাচা, মোর বাপ।

মন্তু তার দিকে তাকিয়ে থাকে কিছুক্ষণ। তারপর বলে, এই ব্যাটা তো আমাদের বাড়িতে মাঝে মাঝে কাজ করতো।

— সে জন্যই তো আপনাকে আর আপনার পরিবারকে মারবার জন্য আপনাদের খৌজ নিতে এসেছে, মন্তুর দিকে তাকিয়ে বলি আমি। একরামুলের মাথায় যেনো রক্ত চেপে গেছে। একটা রাইফেল ঝুলে নিয়ে আসে দ্রুত। আর বাগে গড়গড় করতে করতে বলতে

থাকে, শালা রাজাকারের বাচ্চাকে শেষ করে দিয়ে আসি নদীর পাড়ে নিয়ে যায়ে। একরামুলের মুখের টান টান পেশির দিকে তাকাই। তাকাই মন্তুর বিমর্শ মুখের দিকে। আর কি হয়, মনের ভেতরে একটা দ্বিধা ভাব জেগে ওঠে। বলি, একরামুলকে লক্ষ্য করেই, না থাক। কাল দেখা যাবে। এখন তালো করে বেঁধে রাখ। রাতে খেতে দিস।

লড়াইটা সবার

মন্তু তার ডেরায় নিয়ে আসে। লিজার এরি মধ্যে চা বানানো সারা। তাই পরিবেশন করে। চায়ের সাথে বিস্তুটও। ভালোই লাগে। নানাকে বিরক্তি প্রকাশ করতে দেখা যায়। বলেন, দেখতো বাহে, নাতি সব জিনিস আনিছে, খালি ঘোর সিগারেট বাদে। কথাটা শুনে মন্তুকে অগ্রসূত হতে দেখা যায়। তাই ব্যাপারটাকে স্বাভাবিক করার জন্য আমার পকেটে রাখিত ‘পানামা’ সিগারেটের আস্ত প্যাকেটটা বের করে দিয়ে নানাকে বলি, আমি এনেছি আপনার জন্য। দামি সিগারেট। নেন, ধরান। বৃক্ষের চোখ-মুখ যেনো হঠাতে করেই এক স্বর্গীয় সুখের দ্যুতিতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। আসলে বৃক্ষ মানুষেরা কতো অল্পতেই তুঁট হন। একেবারে বাচ্চা শিশুদের মতোই। লিজাকে বলি, কেমন লাগছে এখন?

নরম কোমল হাসির ছাঁটা তার মুখে।

— কতো করলেন আমাদের জন্য, আরো কতো যে ক্ষতিতে হবে কে জানে? এখন আর কোনো অসুবিধে নেই। তারপর মন্তুর দিকে ইশারা করে বলে, ওতো চলে যেতে চায়। অনেক নাকি কাজ। বলেন তো এ অবস্থায় কাল স্কালেই নাকি চলে যাবে?

— না যাবে না। এ অবস্থায় তার যাওয়া স্কেল না। কথাটা বলেই মন্তুকে নিয়ে বাইরে আসি। হাঁটতে হাঁটতে চলে আসি সোজা মন্তুর ঘাটে। বালুর চরার কাছাকাছি ঘাসের ওপর বসে পড়ি দুঁজন পাশাপাশি। মন্তু মন্তু কাল সকালে একবার মানিকগঞ্জ যেতে চাই। পার্টির কিছু কাজ আর কিছু প্রয়োজন কেনাকাটা আছে। বিকেলেই ফিরবো।

— ঠিক আছে যাবেন, তবে ক্ষতিশৈলী ফিরে আসবেন। এ অবস্থায় আপনার থাকাটা জরুরি।

মন্তুর দৃষ্টি এখন নিবন্ধ নদীর ওপারে তার নিজের মারেয়া ধামের দিকে। নিশ্চূপ তাকিয়ে থাকে কিছুক্ষণ একভাবে। তন্ময় সে দৃষ্টি। হঠাতে বলি তাকে, ধামে যাবেন?

— কী হবে বলেন? কিছুই তো নাই। মাঝখানে কে টার্ণেট করে বসবে কে জানে।

এ কেমন দুঃসময়! নদীর ওপারে যার নিজের ধাম, জন্মভূমি, বাড়িয়ের, যার সবকিছুই আজ শক্তের লাগিয়ে দেয়া আগনে পুড়ে ছাই, সেই স্থানে, তার আজন্মের আবাসভূমে আজ সে যেতে পারছে না। যাবার সাহস পর্যন্ত করতে পারছে না। এই এলোমেলো দুর্বহ দুঃসময়ের অবসান কবে, কতোদিনে, আনন্দ হবে কি না, কে জানে! না, মন্তু নিজেকে সামলে নেয়। বাস্তবে ফিরে আসে। এসে বলতে থাকে তার পার্টির তৎপরতার কথা। বলে জলপাইগুড়ি সোনাউল্লাহ হাইসে কমরেড শামসুন্দেহা আন্তর্না পেতেছেন। সি.পি.আই.-এর (কমিউনিটি পার্টি অব ইন্ডিয়া) সাথে একটা সমরোতা হয়েছে। নানাভাবে সহযোগিতা করে যাচ্ছেন তারা বাহ্লাদেশের কমরেডদের। হলদিবাড়ির অদূরে মুক্তিবাহিনীর টেনিন্যে পাঠাতে নানা রকমের ঝুঁকি পোছাতে হচ্ছে। তবে তাদের মুক্তিবাহিনীর টেনিন্যে পাঠাতে নানা রকমের ঝুঁকি পোছাতে হচ্ছে। আওয়ামী লীগ কংগ্রেসের সহযোগিতা পাচ্ছে সর্বভোগীভাবে। কংগ্রেস ভারতের ক্ষমতাসীন দল হওয়ায় আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলিঙ্গের ছেলেদের কোনো অসুবিধে হচ্ছে না।

আমাদের নিয়ে কেবল সমস্যা হচ্ছে। বোধহয় তারা বিশ্বাস করতে পারছে না আমাদের।

— কিন্তু স্বাধীন বাংলা সরকার পরিচালনার জন্য তো সর্বদলীয় কমিটি হয়েছে। মাওলানা ভাসানী, কমরেড মণি সিংহসহ স্বাধীনতার পক্ষের সব রাজনৈতিক দল বা শক্তি তাতে রয়েছেন, মন্টুকে বলি আমি।

— তাতো আছেই। কিন্তু নিচের লেভেলে সময়োত্তাটা হচ্ছে না।

— কারণটা কি?

— কারণ সম্বৰ্ত অঞ্জলিভিত্তিক রাজনৈতিক নেতাদের দেশ থেকে বয়ে আনা বৈরিতা।

— এটা ঠিক না। আমাদের স্বাধীনতার প্রয়োজনে সবাইকে এক থাকতে হবে। নো বিভেদ। বিভেদ চলবে না। সামনে আমাদের যে যুক্তি, পারপ্রারিক রাজনৈতিক মতান্বয়গত বিরোধিতা আর রাজনৈতিক নেতাদের নিজেদের ভেতরকার শক্রতা কিংবা বৈরিতা সেই যুক্তের মাঠে পর্যন্ত চলে আসতে পারে। এটা কোনোমতেই হতে দেয়া যাবে না। আমরা লড়ছি জয় বাংলার জন্য। আপনারাও কাজ করছেন জয় বাংলার জন্য। এর মধ্যে কোনো রাজনৈতিক নেই। থাকা উচিত নয়। আমাদের এই ম্যাসেজ পৌছে দেবেন নেতাদের কাছে। আমার সোজা-সরল বুঝ আর বোধ থেকে কথাগুলো বলে মন্টুর মুখের দিকে তাকাই। মন্টুও আমার দিকে তাকায়। তাকিয়ে বলে, দেখা যাক। সংক্ষিণ উত্তর দিয়ে মন্টু একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে। আলাপচারিতাশেষে নদীর পাড় থেকে ফিরে চলি আমরা নিজের নিজের আঙ্গানার দিকে।

রাজাকার সইযুদ্ধনকে মাফ করে দিই। তার অপরাধের শান্তিস্থান তাকে হত্যা করার ব্যাপারে মন থেকে সায় মেলে না। দু'জন ক্ষট দিষ্টে তাকে পাঠিয়ে দিই পেয়াদাপাড়ায়। সেখানে ক'দিন বন্ধ জীবনযাপনের পর তাকে স্মৃতি পার করে দেয়া হবে। মারেয়ার দিকে ফিরবে না সে আর কোনোদিন।

মানিকগঞ্জ থেকে আহিদার চলে পৌছে পেয়াদাপাড়ায় তার দলের খৌজববর নিতে। একদিন থেকেই চলে আসবে বন্ধ জীবনযাপনে স্মৃতি পার করে দেয়া হচ্ছে। এখান থেকে আসবার সময় তাকে ১০ জন বাছাই করা ছেলের একটা মুল নিয়ে আসতে বলেছি। এখানে এখন যেভাবে নিয়মিত শক্রের সাথে লড়াই করতে হচ্ছে, তাতে করে দলের শক্তি বৃদ্ধি করা অতি আবশ্যিকীয় হয়ে দাঢ়িয়েছে। রাতের বেলা পেট্টেল দল যায় মারেয়া পর্যন্ত। আর একটা দল হাইড আউট আর মন্টুদের আঙ্গানার আশপাশে টহল দিয়ে ফেরে।

৩০. নং ৭৩

রেকি মিশন নয়াদিঘি

দিনটা কেটে যায় মোটামুটি ঝামেলা ছাড়াই। ছেলেদের কেউ কেউ নিজেদের হাতিয়ার সাফসুতরো করার কাজে ব্যস্ত। পাশাপাশি অলস আড়া আর তাস পেটানোর ধূমও চলে। বিকেল হতেই একরামুলকে বলি তৈরি হতে। আহিদার আসে সক্ষ্যার মুখে। রাত আটটার পর বের হয় রেকি পেট্টেল। ১৫ জনের দল নিয়ে নয়াদিঘির শক্রবাহিনীর অবস্থান রেকি করতে রওনা দিই। রহমানদের গামে বাবুল আর সুলতানসহ ৪/৫ জন চৌকিস টগবগে ছেলে আমাদের গাহড় হিসেবে দলে যোগ দেয়। ঘোরাপথে প্রায় ৮/১০ মাইল হেঁটে রাত একটার দিকে নয়াদিঘির উপকাষ্ঠে এসে পৌছাই। রাঙ্গাটা সোজা চলে গেছে নয়াদিঘি বাজারের দিকে। তামে বিরাট উঁচু একটা পুকুর। এখান থেকে প্রায় ৩শ' গজ দূরে নয়াদিঘি বাজার। বাজারের

ওপারে ইউনিয়ন বোর্ডের অফিস। তার পেছনে স্কুল। সম্ভবত রাজাকার আর পাকবাহিনী ও দুটো জায়গাতেই এখন অবস্থান করছে। রাস্তা থেকে নেমে দিঘির পাড়ে চলে যাই সন্তর্পণে। দিঘির ঢালে ছোটো ছোটো জঙ্গল আর আগাছা। তার ভেতর দিয়ে পাড়ে উঠে আসি। আর আসতেই হঠাৎ করে দৃশ্যটা চোখে পড়ে। সর্বোশ! সামনেই একটা উচু বাক্সার। ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়ে বাক্সার দখল নেয়া হয়। কেউ নেই। দিঘির ঢাল বেয়ে এতে এতে এতে অবশিষ্ট বাক্সারটার দেখা মেলে। দিঘি পার হতেই কিছুটা জঙ্গল মতো জায়গা চোখে পড়ে। এরপর বাজার। শুধু আর মালেককে পাঠাই এগিয়ে গিয়ে শক্রের অবস্থান দেখে আসার জন্য। বোপজঙ্গলের ভেতরে মশার কামড় খেতে খেতে ওদের জন্য গভীর আগ্রহ নিয়ে বসে থাকি।

আকাশে ফিকে ঢাদের আলো। চারদিকের বাড়িগুলি সেই আলোতে মোটামুটি দৃশ্যামান। প্রায় আধুনিক পর ফিরে আসে ওরা। এসেই হাঁফাতে হাঁফাতে চাপা উত্তেজনায় ফিসফিসিয়ে বলে, ওরা আছে।

— কোথায়?

— স্কুল ঘরে, বোর্ড অফিসে। রাস্তার তেমাথায় পাকা বাক্সার আছে।

— আর কিছু দেখেছিস?

— হ্যাঁ, ওদের সেন্ট্রির টহল দিঙ্গে।

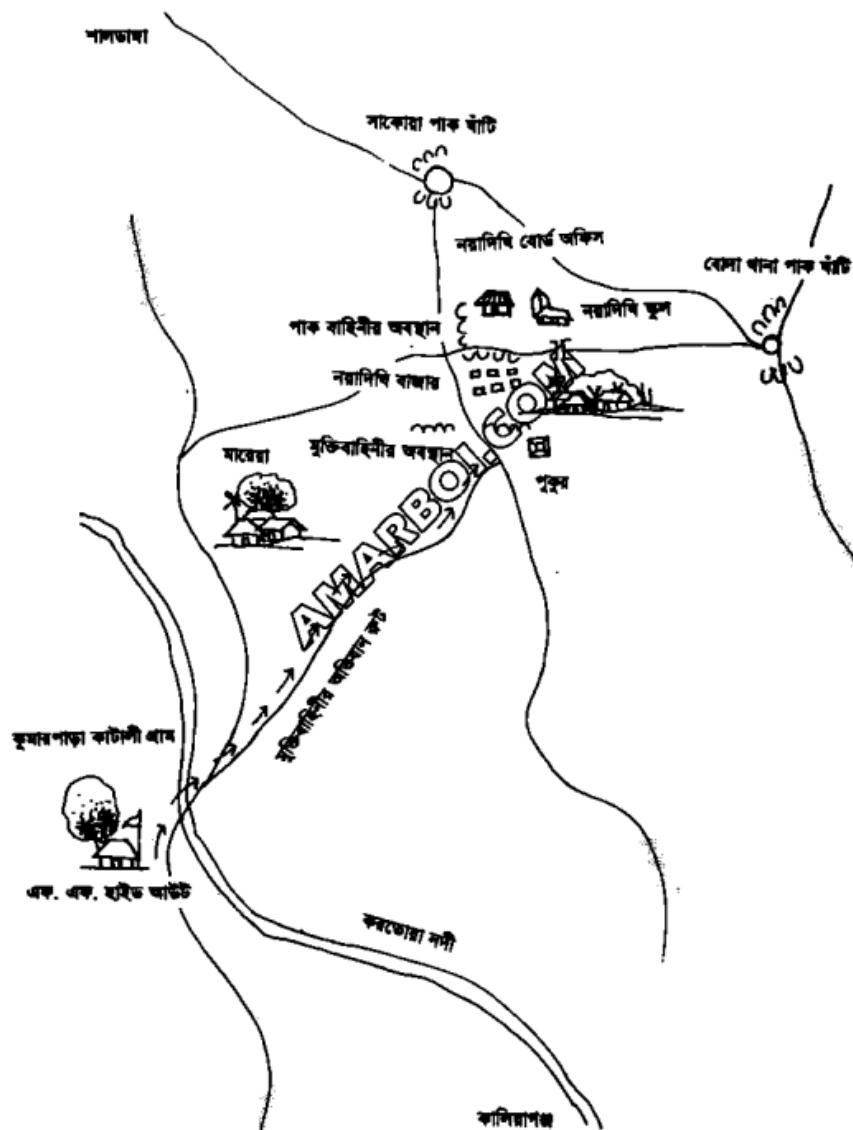
— তার মানে একেবারে পাকা ডিফেন্স নিয়ে বসেছে কুকুর। ঠিক আছে চলো, লেটস শো ব্যাক। আজকের কাজ শেষ।

অক্টোবর মাস পড়ে গেছে। আজ ১ তারিখ। হেল্পরাতের দিকে বেশ শীত শীত করে। আকাশের জুলে থাকা ঝাপসা আলো পথ দেশের আমাদের। ঘাসের মাথায় মাথায় জমে থাকা ফোটা ফোটা শিশির। সেই শিশিরে পা ভিজিয়ে ভিজিয়ে দলবলসহ ফিরে চলি করতোয়া পাড়ের দিকে। হাসান ক্লাস সেখানে অধীন প্রতীক্ষারত আমাদের জন্য। উদ্বেগভোগ মনে বসে আছে নিচৰুজি। তার খেয়া নৌকোর গলুইয়ে মাথা ঠেকিয়ে। নির্মূল। জগত প্রহরীর মতো। কলনার ফুল্যাটা স্পষ্ট দেখতে পাই।

রাতের মধ্যেই আঘাত হেনে নয়াদিঘির শক্রের বাক্সারগুলো উড়িয়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। সে অনুযায়ী একরামুলকে ডেকে দল গঠন করতে বলি। আহিদার নাস্তা থেয়ে তার লিজা মামির কাছে গিয়ে জমিয়েছে আড়তা। মন্তু চলে গেছে মানিকগঞ্জে। আহিদার লিজাদের দূর সম্পর্কের আঁচীয় বলে সে তার নিজের দায়িত্বে তাদের সুবিধা-অসুবিধার ব্যাপারগুলো দেখাশোনা করছে। ফলে সুবিধাই হয়েছে আমার। উদ্বাস্তু পরিবারগুলোর নানা ধরনের সমস্যা আর শত বায়নার হাত থেকে কিছুটা হলেও রেহাই পাওয়া গেছে। কিন্তু কতোদিন এভাবে তাদের দেখেওনে রাখা যাবে, এ প্রশ্নটা এখন বড়ো হয়ে দেখা দিয়েছে।

তাছাড়া এখান থেকে হাইড আউটও গোটাতে হবে দু'একদিনের ভেতরেই। হাসান মাঝির বাড়িকে ঘিরে কুমারপাড়া-কাটালির এই হাইড আউটের অবস্থানের কথা আর আজনা নেই আশপাশের লোকজনের কাছে। মানিকগঞ্জে শরণার্থী হিসেবে আশ্রিত এই গ্রামের মানুষজন আসছে দু'একজন করে তাদের ফেলে যাওয়া বাড়িগুলি দেখতে। শরণার্থী শিবিরের কট আর মানবেতের জীবনযাপনের হাত থেকে তারা মুক্তি পেতে চায়। ফিরতে চায় তাদের আনন্দময় পুরনো সুস্থ জীবন আর সংসারে। এখন মুক্তিবাহিনী এসেছে এই অঞ্চলে। খানসেনা আর রাজাকারের ভয় তাদের ততোটা নেই। আমাদের উপস্থিতিতে

কেচ ম্যাপ-৬
মিশন—সরাদিবি
৩-১০-৭৩
(কেস রাষ্টা)



তাদের মনে নিরাপত্তার আর কিছুটা ব্রহ্ম ফিরে আসায় তারা উদ্ধীর হয়ে উঠেছে বাড়িয়ের ফেরার জন্য। মারেয়ার দিক থেকে মনুদের পরিবারের বৌজ্ঞবর নেয়ার জন্য লোকজনও আসতে শুরু করেছে। আর সে কারণেই আশঙ্কা, এরি মধ্যে শক্ত অবশ্যই জনে গেছে আমাদের হাইড আউটের অবস্থান সম্পর্কে। বাম-ডান দু'দিক থেকেই তারা ব্যাপক হাতলা করতে পারে আমাদের ওপর। ঠিক এরকম অবস্থার মুখেই হাইড আউট পরিবর্তনের ব্যাপারটা নিয়ে ভাবতে হচ্ছে এবং গভীরভাবেই। কিন্তু এক্ষেত্রে বিরাট একটা বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে মনুদের পরিবার। উদের সরানো হবে কেখায়? মনুর কাছ থেকে এ ব্যাপারে কোনো পরামর্শ বা পরিকল্পনার কথা জানা যায় নি। সব থেকে মুশকিলের ব্যাপার এরা ভারতে শরণার্থী হতে চান না। বৃক্ষ নানাতো একথা শুনতেই পারেন না। তাঁর সাফ কথা, তিনি ভারতে শরণার্থী হবেন না কোনো অবস্থাতেই। '৪৭-এর ভারত ভাগাভাগির সময়কার কোনো তিক্ত ঘটনার স্মৃতি এর মূলে কাজ করছে কি না, কে জানে।

মালেকের কোশ্পানির তরফ থেকে কোনো খবর আসে না। দেবীগঞ্জ থানা আক্রমণের ছড়ান্ত ব্যাপারটা সম্পর্কে তাদের কাছ থেকে কিছু জানা দরকার।

বোদা এলাকা থেকে ভান দিয়ে নিয়মিত শক্তবাহিনী আসছে। বাঁ দিকটা মালেকের পাহারায় রয়েছে। মারেয়া এলাকায় শক্তপক্ষের যে ব্যাপক তৎপরতা চলছে, সে সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা দিয়ে প্রয়োজনবোধে তাদের সাহায্যের জন্ম তাকতে হতে পারে। দেবীগঞ্জ থানা আক্রমণের ব্যাপারে যৌথ পরিকল্পনা তৈরি করে আর একটা সমন্বিত ঝুপরেখা বের করা দরকার। ঠিক এই সময়ে মালেকের সিগনাল নিষ্ঠাপনের আসে মধুর নেতৃত্বে দু'সদস্যের দলটা। দেবীগঞ্জ থানা আক্রমণের দিনক্ষণ সন্ধান করে ফেলেছে মালেক। তার ম্যাসেজ অনুযায়ী সাকোয়া ডিফেন্সকে নিউটালাইজেশনের পথে রেকি করে আসতে হবে।

মধ্যরাতে বিশ্বেরণ— উড়িয়ে উঠে হলো পাকিস্তানি বাহ্যকার

বিকেল থেকেই প্রস্তুতি শুরু হয়ে যায়। নয়াদিঘিতে পাক-রাজাকার বাহিনীর যৌথ অবস্থান এখনো মজবুত হয়ে ওঠে নি। তাই এখনি তাদের ওপর আঘাত হানবার মোক্ষম সময়। তারা পাকাপোক্তভাবে ঘাঁটি শেডে বসলে সেটা আর সহজে সত্ত্ব হবে না। নয়াদিঘিতে রেকি করে আসা হয়েছে। আর সেই রেকি সূত্রে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে আহিদার আর একরামুলকে নিয়ে পাক ও রাজাকার বাহিনীর ওপর আক্রমণের পরিকল্পনা রচনা করে ফেলি। রেকিতে নয়াদিঘির বড়ো পুরুষ পাড়ে দুটো বাক্সারের সঞ্চালন পাওয়া গেছে। ভেতরের দিকে আরো বাক্সার থাকতে পারে। বাক্সারগুলো উড়িয়ে দিতে হবে। তার জন্য চার্জ তৈরি করা দরকার অপারেশনের প্রস্তুতি হিসেবে। দু'জনকে সাথে নিয়ে নিজেই রেমার চার্জ তৈরি করতে লেগে যাই। একরামুলকে হাতিয়ারপত্র উঠিয়ে নিতে বলি। আহিদার অসম্ভব ছটফটে। একবার লিজাদের ওখানে যায়, একবার ফিরে এসে আমার পাশে বসে। ওকে দেখলেই পিন্টুর কথা মনে হয় গভীরভাবে। ছেলেটা তার একান্ত নিজের নেতৃত্বে নালাগঞ্জ আর ভেতরগড় এলাকায় তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। এখন সে কেমন আছে, কে জানে?

সক্ষের ভেতরেই সব প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়ে যায়। সিদ্ধান্ত হয়, আহিদার থাকবে হাইড আউটসহ উদ্বাস্তু পরিবারের নিরাপত্তার দায়িত্বে। সিদ্ধান্তের কথা তবে আহিদারকে বেশ সন্তুষ্টই

মনে হয়। এখানে থাকার সুবাদে সে তার লিজা মায়িসহ অন্য মারি-খালাদের সাথে চুটিয়ে গঢ় করতে পারবে। একরামুল এরি মধ্যে যথেষ্ট পারদর্শী হয়ে উঠছে সবকিছু সুস্মরণভাবে শুচিয়ে নেবার ব্যাপারে। যুদ্ধের প্রথম দিকে যে ছিলো একটা হ্যাঙ্গল-পাতলা ঢ্যাঙ্গা মতোন, ফর্মা অথচ বোকাটে ধরনের ছেলে। সেই একরামুল গুরুত্বপূর্ণ প্রায় প্রতিটি যুক্তে আমার সাথে অংশগ্রহণ করেছে। পরিশ্রম করেছে অসুরের মতো, আন্তরিকতা আর নিষ্ঠা দিয়ে সে প্রতিটা আদেশ-নির্দেশ মেনেছে, বুকি নিতে ভয় পায় নি কখনো, প্রায় অজ্ঞেয় প্রতিকূলতা আর জীবন-মৃত্যুর মুখোযুদ্ধ হয়েও তাকে কখনো সাহস হারাতে দেবি নি, যাই নি পিছিয়ে। তার বিস্মিততা সত্যিই অতুলনীয়। প্রথমদিককার অপারেশনে তার উদ্যমী কর্মতৎপূর্তা আমার মন কেড়ে নেয়। আমার সাথে সাথে রাখতে থাকি প্রায় প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ অপারেশনে। আর এর ফলে একরামুলের সহায়ী শুগাবলি, বুকি গ্রহণের অদম্য সাহসের ব্যাপারটি জন্মেই বিকশিত হবার সুযোগ লাভ করে। অনেক পেছনে পড়ে থাকা একরামুল তাই সাহসের কৃতিত্বেই সামনের সারিতে চলে আসে। বর্তমানে সে আমাদের দলের একজন গুরুত্বপূর্ণ কমান্ডার। একই অবস্থা মোতালেবেরও। একরামুল আর মোতালেব দু'জন প্রায় সমানভাবে এগিয়ে এসেছে যুদ্ধের এক মাসের অভিযান প্রতিয়ায়। মোতালেব এখন পিন্টুর সাথে রয়েছে। একরামুলের পরেই মধুসূদনও তার সত্ত্বে ভূমিকার কারণে দীক্ষিণান হয়ে উঠছে দিনের পর দিন। মধুরও অঙ্গগতি ভালো। বয়সে একেবারেই তরুণ। তার মতো বয়সের নববিজ্ঞানাদের মধ্যে যারা এই কঠোর ব্যন্তিবত্তা উপেক্ষা করে নিজেদের গড়েপিটে যোদ্ধার মৌখিকরে তুলেছে, শুধু তার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। আমার দলের এইসব যোদ্ধা-সদস্যের ওপর এইসী আস্থা রাখা যায় পরম নির্ভরতায়।

এখানে আরো আছে আমার ব্যাটম্যান চাঁদ পাত্রা, যার বিস্মিততা পরীক্ষিত, কঠিপাথের যাচাই করা নিখাদ খাঁটি সোনার মতো। একই শ্রেণির আমার রওনা হওয়ার প্রত্যুত্তিপর্ব সারার কাজে ব্যন্তি। সন্ধ্যার মুখে আমি মন্তব্যে অস্ত্রান্বয় দিয়ে হাজির হই। নতুন হারিকেনের উজ্জ্বল আলোয় অস্থায়ী সংসার সাজানের প্রচলিত চোখে পড়ে। ঘেনেড় নানার কাছে গিয়ে বসি। শহরে নানা, লিজার বাবা, অথচ মন্তুর ক্ষত্র। তাঁকে বিমর্শ বদনে সামান্য দূরে বসে থাকতে দেখা যায়। দুই বৃক্ষ সম্পর্কের দিক থেকে একে অপরের বিয়াই। তাদের মধ্যে রসের সম্পর্ক। প্রথম থেকেই দেখছি, দু'জনের মধ্যে মোটেই মিল নেই। দু'জনের মধ্যে কথা কাটাকাটি লেগেই আছে। এমন কি মাঝে মাঝে তাদের সম্পর্ক তিক্ততার পর্যায়ে পর্যন্ত চলে যায়। ফল আর কিছু নয়, পরম্পরের মুখ দর্শন হলেও, বক্ষ থাকছে কথা। যুদ্ধের এই ডামাডোলের কারণে আজ দুই বৃক্ষই বাস্তুভাবে নিজেদের বাড়ি থেকে বিভাগিত। অপরের দয়ানাক্ষিণ্যের ওপর বর্তমানে তাদের পরম্পরার বসবাস। স্বত্বাবতই তাদের মন ভালো থাকবার কথা নয়। তার ওপর রয়েছে ঘেনেড় নানার গ্রামের 'অসংক্ষিপ্ত' রাসিকতা। এছাড়া রাজনৈতিক চিন্তাচ্ছেনার দিক থেকেও দু'জন দুই মেরুর বাসিন্দা। সামান্য কথা, বিশেষ করে রাজনীতির কথা নিয়েই তাদের মধ্যে মূলত মতবিভোধের সূচনা, কথা কাটাকাটি, কথা বক্ষ এবং কিছুক্ষণ পর আবার কথা চালু— এরকমটাই দেখে আসছি একেবারে প্রথম দিন থেকে।

— ঘেনেড় নানা, কেমন আছেন? হাসেন তিনি। নির্বল হাসি। বলেন, তুমরা যোক ঘেনেড় নানা কান্হে ফেলালেন?

— আপনি তো আপনি করলেন না প্রথম দিন।

— কেনহে করিম, মোর যে দুটা বড়ো বড়ো ঘেনেড় আছে। কথাটা শেষ করেই তিনি

উদার হাসির বান ডাকেন। তার এই শিখতোষ প্রাপখোলা হাসি বাড়ির এই সঙ্গ্যার ভুতুড়ে পরিবেশে চমৎকার এক আবহ সৃষ্টি করে। ‘গ্রেনেড নানা’ নামটা চালু করার পেছনে কৃতিত্ব আহিদারের। মন্টুর এই চাচার রয়েছে একটা বিশেষ রোগ। আহিদার ব্যাপারটা টের পেয়েই তার নাম দিয়ে ফেলে ‘গ্রেনেড নানা’। পরে মুখে মুখে চালু হয়ে যায় নামটা। তো, আমাদের সেই গ্রেনেড নানা পরম মেহে জড়ানো গলায় বলেন, ভালো আছিস ভাই!

— জি বলে তার পাশ যেঁষে বসি। তিনি তার শীরীরের কাছে আমাকে টেনে নেন। গায়ে মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বলেন, তুমরা যে কুণ্ঠে যে হাজির হলেন হামাক বাঁচাবা, কতো ঝামেলা সহেছেন হামারলার তাহানে, আল্লাহ তুমারলার ভালো করিবে।

বৃক্ষের অন্তরের গভীর থেকে উৎসারিত আশীর্বাণী সঙ্গ্যার আলো-আধারিত এই ভুতুড়ে পরিবেশে এক অনিদ্য সঙ্গীত ও সুরের মতো ছড়িয়ে পড়ে।

একটু পড়ে লিজা আসে ধূমায়িত চা আর চিড়া ভাজা নিয়ে। এখন এরা নিজেদের খাবারদাবারের ব্যবস্থা নিজেরাই করেছেন। এর পেছনে রয়েছে মন্টুর উদ্যোগ প্রচেষ্টা। হাসতে হাসতে লিজা বলে, চা খান। আমাদের নিজেদের তৈরি। প্রথম দু'তিম দিন তো আপনাদের দেয়াটাই শুধু খেলাম।

তাকে বলি, মোটামুটি তো গুছিয়ে নিয়েছেন, আর কোনো অসুবিধা আছে?

— অসুবিধার কি কোনো শেষ আছে বলেন? দেশ স্বাধীনের স্থানে হলে নিজেদের বাড়িতে না ফিরলে সব অসুবিধা শেষ হবে না। তবে এখন সেসময়ট চলে যাচ্ছে। এছাড়া আহিদার যামা তো সব দেখাশোনা করছে। আহিদারের দিক্কে তাকিয়ে লিজা সহজ পরিহাস মেশানো কথাগুলো বলে। গ্রেনেড নানাকে সিগারেট দিই। চুপচাপ সিগারেট টেনে চলি কিছুক্ষণ। বাড়ির চারদিকে ঝিঝি, ব্যাঙ আর গোলাপঘূঁকড়ের ডাক। গাছ থেকে গাছে বাদুড় কিংবা হুতোষ পেঁচার ছটোপুটি।

চা-টা খাওয়া শেষ হলে একটু শুরু আহিদারকে নিয়ে আমি উঠি।

— কুণ্ঠে যাচ্ছেন আজ? গ্রেনেড নানা জানতে চান নরম গলায়। তার মতোই নরম গলায় জবাব দিই, তাদের সাথে একটু খাতির করে আসি নানা, যারা আপনাদের এখানে বনবাসে পাঠিয়েছে। আসবার সময় লিজা জানতে চায়, বড়ো ধরনের অপারেশন?

— দেখা যাক বলে এড়িয়ে যেতে চাই তাকে।

— প্রস্তুতি দেখে তো তাই মনে হচ্ছে। সাবধানে থাকবেন। বাংলার এই সেই চিরস্তন শ্রেহময়ী নারী, যারা সর্বকালে সর্বযুগে পুরুষদের যাত্রার সময় যঙ্গল কামনা করে এসেছে অন্তরের গভীরতম প্রদোষ থেকে।

— আহিদার থাকবে হাইড আউটে। ও-ই নিরাপত্তার দিকটা দেখবে। চলি। কথাটা বলেই অক্ষকারে কাদা-পানি যাইয়ে চলে আসি হাইড আউটে।

মোট ১৮ জনের দল। হাসান মাঝি দুই খেপে পার করে দেয় নদী। তরুণ বয়সী গাইড বাবুল ও সুলতানসহ আরো দু'তিনজন পথ দেখিয়ে নিয়ে চলে আমাদের। চেনা পথ। এ পথ ধরেই রেকি করে এসেছি গতরাতে নয়াদিঘি।

আকাশে মেঘের সাথে চাঁদের লুকোচুরি চলছে তখন। শক্রবিহীন ঘোরাপথে লক্ষ্যস্থলের দিকে এগিয়ে যাই হমহনিয়ে। কালিয়াগঞ্জ যাবার রাস্তার ওপর উঠে সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়। ফলে এবার সামনে দু'জন ক্ষট দিয়ে ডবল ফাইল অর্ধাৎ দুই সারিতে এগিয়ে

চলি। পুরুরের কাছাকাছি নির্বিজ্ঞে পৌছে গিয়ে ডানে নেয়ে যাই। তারপর ছেলেদের সবাইকে একটুক্ষণ বসিয়ে আক্রমণ পরিকল্পনাটা চূড়ান্তভাবে জানিয়ে দিই। মধু ৭ জনের দল নিয়ে নয়াদিঘি বাজারের কাছে রাস্তার ওপর কভার নেবে। একরামুল ৭ জনকে নিয়ে পুরুরের সামনের দিকে কভারে থাকবে। নির্দেশ অনুযায়ী ওরা চলে যায়।

রাত সাড়ে বারোটার দিকে যুদ্ধের ব্যাকরণ অনুযায়ী শুরু হয় হামাগুড়ি অর্থাৎ ক্লিং করে এগিয়ে চলা। এবং কষ্ট করে ভাবে প্রায় ২০ মিনিট ধরে এগুবার পর পৌছে যাই পুরুর পাড়ের প্রথম বাক্সারটার কাছে। না, কেউ নেই, বাক্সার চার্জ করে দেখা যায়। এরপরই দ্রুত বাক্সারের ভেতর রেমার চার্জ বসানো হয়। এবার সেফটি ফিউজে আগুন দেয়ার পালা। চাঁদ মিয়াকে পাশে রেখে সবাইকে রাস্তায় যেতে বলি। চাঁদ মিয়ার কাছ থেকে সেফটি ম্যাচ নিয়ে আগুন দিই ফিউজে। ফিউজ জুলে উঠে ফরমুর শব্দ জুলে দোড়াতে থাকে। দোড়ে এসে দ্বিতীয় বাক্সারটার ফিউজে আগুন দিই। এরপর পুরুরের ঢাল বেয়ে উর্ধ্বশাসে দৌড় লাগাই রাস্তা বরাবর। পেছনে জুলে উঠে সেই তীব্র আলোর বিচ্ছুরণ। আকাশে বঙ্গপাতের মতো কড়াৎ কড়াৎ দুনিয়া কাঁপানো শব্দ জুলে চার্জ দুটো বিস্ফেরিত হয় পরপর। সেই সাথে উড়ে যায় বাক্সার দুটো নিয়িবে। এর পরপরই পেছন থেকে ধেয়ে আসে প্রচও শব্দের শকওয়েভ। তার ধাক্কায় হমড়ি ধেয়ে পড়ি ভিজে ঘাসের ওপর। শব্দের প্রচণ্ডতায় দুকান বধির হয়ে আসতে চায়। শকওয়েভের ধাক্কা কাটতে কিছুটা সময় লাগে। একরামুল আর মধু দ্রুত ফিরে জাসে তাদের দল নিয়ে। না, আর দেরি নয়। তাড়াতাড়ি ফিরে চলি নিজেদের নিরাপত্তা এজন্তুর দিকে।

মানসিক টেনশনটা কেটে যাবার পর শরীরের জড়ে ওয়েই আসতে থাকে অবসাদ আর ঝুঁতি। সেই ঝুঁতি আর অবসাদ জড়নো শরীরে আমরে সবাই ফিরতি যাত্রায় পথ চলি। একটা ছেট বাশের সাঁকো পার হওয়ার সময় নিচের পাহাড়ে একটা খলখল দাপাদাপির শব্দ শোনা যায়। হাসান বলে উঠে, বাহে গাড়া বড়শিশু পাহাড়ে তোতার শউল মাছ আটকিছে থামেন একনা নিয়া আইসো। কথাটা বলেই কৃত্তুকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে সে দোড়ে গিয়ে পানিতে নামে এবং প্রায় চোখের পাঞ্চাকে বড়ো সাইজের একটা শোল মাছ দুহাতে আঁকড়ে ধরে নিয়ে আসে। তার চোখ-যুবে তখন বিরাট একটা কিছু পাওয়ার পরিত্তিমাখা হাসি। সবাই ঝুঁশ মাছটা পেয়ে। আবার শুরু হয় ভিজে ঘাস মাড়িয়ে ফিরতি যাত্রা। হাসানের মাছ ধরার দৃশ্যটা হঠাৎ করেই মন জুড়ে এনে দেয় এরকম একটা ভাবনা, দেশের অবস্থা স্বাভাবিক থাকলে আজকের আমার দলের ছেলেদের অনেকেই হয়তো এভাবে বাত জেগে মাছ মেরে বেড়াতো। কে জানে, আবার তারা পারবে কি না তাদের নিজেদের দেশের মাটিতে এভাবে মাছ ধরে বেড়াতে? কোনোদিনই সম্ভব হবে না, যদি না জয় বাংলা হয়।

১.১০.৭১

শক্রমুক্ত নয়াদিঘি, ওড়ানো হলো বাঁধীন বাংলার পতাকা

জিন্নাহ সাহেবের ছবিটার দিকে টেনগান তাক করে ম্যাগজিন খালি করে দিলাম। বানবান শব্দ জুলে কাচ বাঁধানো ছবিটা নিচে পড়ে গেলো। টুকরো টুকরো হয়ে গেলো কাচে বাঁধানো ফ্রেমটা। শতভিত্তি হয়ে গোলেন মহামতি কায়দে আয়ম, পাকিস্তানের জাতির পিতা।

নয়াদিঘি বাজার এলাকা তখন ছেলেরা শক্রমুক্ত করে ফেলেছে। চার্জ করছে প্রতিটি ঝোপবাড়, বাড়িঘর, দোকানপাট আর বাক্সার-ট্রেণ্ট। শক্র কোথাও ঘাপটি মেরে বসে আছে

কি না, সেটা দেখার জন্মই সন্দেহজনক প্রতিটি খালে ঝৌঁজা হচ্ছে তন্মতন্ম করে। চাঁদ নয়াদিঘিতে নতুন করে একদল পাক সৈনিকসহ রাজাকার বাহিনীর আগমনের সংবাদ সকালেই পাওয়া যায়। তারা সেখানে শক্তিশালী শক্তি স্থাপনের পরিকল্পনা নিয়ে এসেছে। গতরাতে তাদের খোদ ঘাঁটিতে চড়াও হয়ে বাঙার উড়িয়ে দিয়ে আসার এবং মারেয়া এলাকায় পরপর কয়েকটা মুক্তি তাদের চরমভাবে মার দেয়ার পরিপ্রেক্ষিতে তারা এবার নয়াদিঘি ঘাঁটি সুরক্ষিত আর পাক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলবার প্রয়াস নিয়েছে। মুক্তিবাহিনী তাদের মূল ঘাঁটি বোদা থানা আক্রমণ করবে, সম্ভবত এবার তাদের মনে এরকম একটা ভয় চুকে গেছে, আর তাই বোদায় মুক্তিবাহিনীর অগ্রাভিয়ান ঠেকাতে ট্রাটেজিক পয়েন্ট নয়াদিঘিতে মজবুত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা প্রয়োজন। এছাড়া নয়াদিঘিতে তাদের স্থায়ী ঘাঁটি প্রতিষ্ঠিত হলে আশপাশের মুক্তিবাহিনীর তৎপরতাও তারা প্রতিষ্ঠিত ক্ষেত্রে পারবে। আর খতম করতে পারবে তাদের তালিকাভুক্ত জয় বাংলার চিহ্নিত লোকসমূহকে। কিন্তু এরকম অবস্থায় আমরা দিনের বেলায় সরাসরি তাদের ওপর আগাত হেনে দ্রুতগতি মুক্ত করার সিদ্ধান্ত নিই। আগের থেকে নেয়া সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আহিনীর তাই প্রেসিপাড়া থেকে বাছাই করা ১০ জন ছেলেকে এখানে নিয়ে এসেছে। এদের মধ্যে রয়েছে আমরা দ্বাই প্রিয় সহযোগী খলিল আর মতিয়ারও।

সব রকমের প্রস্তুতি শেষ। মেঘল প্রকাশ। তার ওপর টিপটিপে বৃষ্টি। আকাশের গোমরা মুখ দেখলে এমনিই মন খারাপ হয়ে যায়; কিন্তু আজ আর সেটা হয় না। কেননা মেঘ কালো আকাশ, টিপটিপে স্বচ্ছ— এরকম প্রাকৃতিক পরিবেশই আমাদের পরিকল্পিত অপারেশনের সহায়ক।

গ্রাম ন'মাইল দীর্ঘ পথ। সবটাই পিছল, কাদায় ভরা। সবাইকে ভিজতে হবে। অঞ্চোবরে হিমালয় এলাকার ঠাণ্ডা, বৃষ্টিভোজা বাতাস তয়ানক কামড় বসাতে স্বর্ম করেছে। কষ্ট হচ্ছে সবার। হোক। এর ভেতরে, এই রকম বৈরী আবহাওয়া আর বৃষ্টির আড়াল নিয়েই আমরা ঠিক ঠিক পৌছে যাবো শক্র অবস্থান নয়াদিঘির উপকর্ত পর্মস্ত। বৃষ্টির দিনে শক্রপক্ষের ওরা কথনোই বেরোয় না, আজো বের হবে না।

আজকের অপারেশন পরিকল্পনাটা মোটামুটি এরকমের : নয়াদিঘির রাস্তা ধরে প্রকাশ্য দিবালোকে আক্রমণাত্মক অবস্থান নিয়ে একসাথে সরাসরি এগুবে সবাই লক্ষ্যস্থলের দিকে। অতর্কিত হামলা করা হবে শক্রের ওপর। প্রচণ্ড গোলাগুলি চালিয়ে এক চাসেই দখল করে নেয়া হবে তাদের অবস্থান। শক্রকে সামনে পেলেই শলি করে হত্যা করা হবে, সম্ভব হলে জীবিত ধরা হবে যে কটাকে পাওয়া যায়। ওদের রসদ আর হতিয়ারপত্রের ডিপো উড়িয়ে দেয়া হবে। সবগুলো বাঙার ধূংস করা হবে বিক্ষেপক দিয়ে। নয়াদিঘি-সাকোয়া রাস্তায় অ্যান্টি পারসোনাল মাইন বসিয়ে সাকোয়া থেকে আগুয়ান বাহিনীর জন্য মাইন ফিল্ডের ট্র্যাপ তৈরি করা হবে। বোদার রাস্তায় তেমনিভাবে মাইনের ট্র্যাপ বসানো হবে। উড়িয়ে দেয়া হবে নয়াদিঘি থেকে

মাইলখানেক দূরবর্তী বোদা অভিযুক্তি মূল রাস্তায় ১৫/২০ ফুট স্প্যানের কংক্রিটের তৈরি ত্রিজটি। ফলে নয়াদিঘির সাথে বোদার সরাসরি সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। এক সাথে অনেক কাজ। সামনে শক্তিশালী শক্তির শক্তি বাধা। সুতরাং ভেবেচিন্তে সেভাবেই মোট ৩০ জনের একটা দল গড়তে হয়েছে। পেয়ালাপাড়া থেকে আসা মতিয়ার ও খণ্ডিলদের পেঁয়ে দলের শক্তির ক্ষেত্রে একটা ভারসাম্য এসেছে। নেয়া হয়েছে গোলাবারুন্দ যত্কথানি সম্বৰ। সবারই কোমরে জড়নো দুটো করে ছেনেড। রাইফেল, এস.এল.আর. এবং সবেধন নীলমণি এল.এম.জি. আর দুইধি মার্টরসহ দলকে সুসংহতভাবে সজিয়েছে একরামুল, মধু, মতিয়ার আর শঙ্কু। আহিদার পুঁজানুপুঁজভাবে সবকিছু পরীক্ষা করে নিয়েছে এরি মধ্যে। বাস্তুর গড়নোর জন্য রেমার চার্জ, ব্রিজ গড়নোর জন্য প্রেসার চার্জ এবং যথেষ্ট পরিমাণে এ.পি.এম.-১৪ অর্ধাংশ এন্টি পারসোনাল মাইন সাথে নেয়া হয়েছে। চাঁদ মিয়া আমার টেনগান, অতিরিক্ত গুলি ভর্তি দুটো ম্যাগজিন, দু'প্যাকেট গুলি আর ছেনেড গুছিয়ে দিয়েছে। প্রিয় টেনগানটা কাঁধে ঝুলিয়ে নিই। সবকিছু এখন প্রস্তুত। চূড়ান্ত ত্রিফিং শেষ। এখন শুধু যাত্রা করার অপেক্ষা।

সকাল ন'টায় যাত্রা শুরু হয়। টিপ্পিটে বৃষ্টি আর সেই সাথে হিম বাতাসের ঝাপটা। মাথার ওপরে মুখ গোমরা করে থাকা আকাশ। অল্পক্ষণের ভেতরেই দলটা এসে হাজির হয় করতোয়া পাড়ে। হাসান মাবি তার খেয়া নৌকোয় তিনবারে পার করে দেয় সমস্ত দলটাকে। তারপর নিজেও কিছুদুর এগিয়ে এসে দাঁড়িয়ে প্রতিক। পেছনে তাকালেই দেখা যায় ওকে। মাথায় তার গামছা জড়নো। উদোম শরীরে মাথায় বৃষ্টি নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে সে। শিল্পী জয়নুলের আঁকা একটা ছবির দৃশ্যের ছাঁটো লাগে তার অবস্থানটাকে। অন্তু চরিত্র তার, আর কী গভীর ডেডিকেশন! প্রাইজেন্স সে তার খেয়া নৌকোয় মুক্তিযোদ্ধাদের পার করিয়ে দিয়ে আবার তাদের ফেরত পথেও নদী পারাপারের কাজ করে থাকে। যতোক্ষণ পর্যন্ত ছেলেরা অপারেশনশেষে সা ফিরবে, ততোক্ষণ অধীর প্রতীক্ষায় নৌকোসহ অপেক্ষায় থাকে। আজও থাকবে তাদের সবার মতো তারও দেশের স্বাধীনতা দরকার আর তারই জন্য ক্লান্তিহীন প্রাইজেন্স সে এভাবে খেটে যাচ্ছে। হাসান মাবিদের মতো মানুষেরা আছে বলেই তো আমরা যুদ্ধ করে যাচ্ছি। জানি না, যুদ্ধশেষে হাসান মাবিদের মতো মানুষদের কথা স্বাধীনতা বা যুক্তিশুক্রের ইতিহাসে দু'কলম লেখা হবে কি না।

করতোয়ার উচুনিচু পাড় ভেঙে সামনের বিস্তীর্ণ পতিত মাঠ পেরিয়ে মারেয়ার মন্তুদের অগ্নিদণ্ড গ্রামখনা বাঁয়ে রেখে পুরো দল নিয়ে উঠে আসি নয়াদিঘির জেলা বোর্ডের রাস্তায়। বৃষ্টিতে আমাদের সবার শরীর ভিজে তখন চুপচুপে। মাথার চুল ভিজে পানি গড়িয়ে চুকছে শরীরের ভেতর। বারবার হাত দিয়ে চুল মুছছি, চোখ মুছছি আর এইভাবে চোখের দৃষ্টি সামনের দিকে প্রসারিত রাখবার চেষ্টা করছি। ছেলেরা এসবের ভেতরেই হাঁটছে নির্বিকার যুদ্ধে। তারা ভয় পেয়েছে কি না, সেটা বুঝবার উপায় নেই। একরামুল আমার কাছাকছি থাকবার চেষ্টা করছে। আহিদার হাঁটছে আমার পাশাপাশি প্রায় গা ঘেঁষে। মনে হয়, তাকে ঠাণ্ডা এবং ভয় দুটোই পেয়ে বসেছে। পায়ের নিচেকার কর্দমাঙ্ক মাটি খুবই পিছল, পায়ের আঙুল তাতে চেপে ধরে ধরে কষ্ট করে এগুতে হচ্ছে। আজকের অপারেশনের অন্যতম ভূমিকা পালন করবে মতিয়ার। স্টেনগান ঝুকে ঝুলিয়ে টিগারের ওপর আঙুল রেখে হাঁটছে সে সামনে। শরীর জুড়ে পেঁচিয়ে নিয়েছে সে একটা চাদর। ভাবখানা এরকম যেনো আমের একজন সাধারণ মানুষ চাদর গায়ে বৃষ্টির ভেতর দিয়ে জরুরি কোনো কাজে বেরিয়েছে।

রাস্তার ঠিক মাঝি বরাবর হাঁটছে সে মূল দলের সাথে বেশ কিছুটা ব্যবধান রেখে। তার কিছুটা পেছনে তাকে কভার দিতে দিতে এগুচ্ছে খলিল, মালেক আর মঞ্জু। যুদ্ধের প্রথমদিককার সেই চৌকস সাহসী জুটি আবার একসাথে হয়েছে অনেকদিন পর।

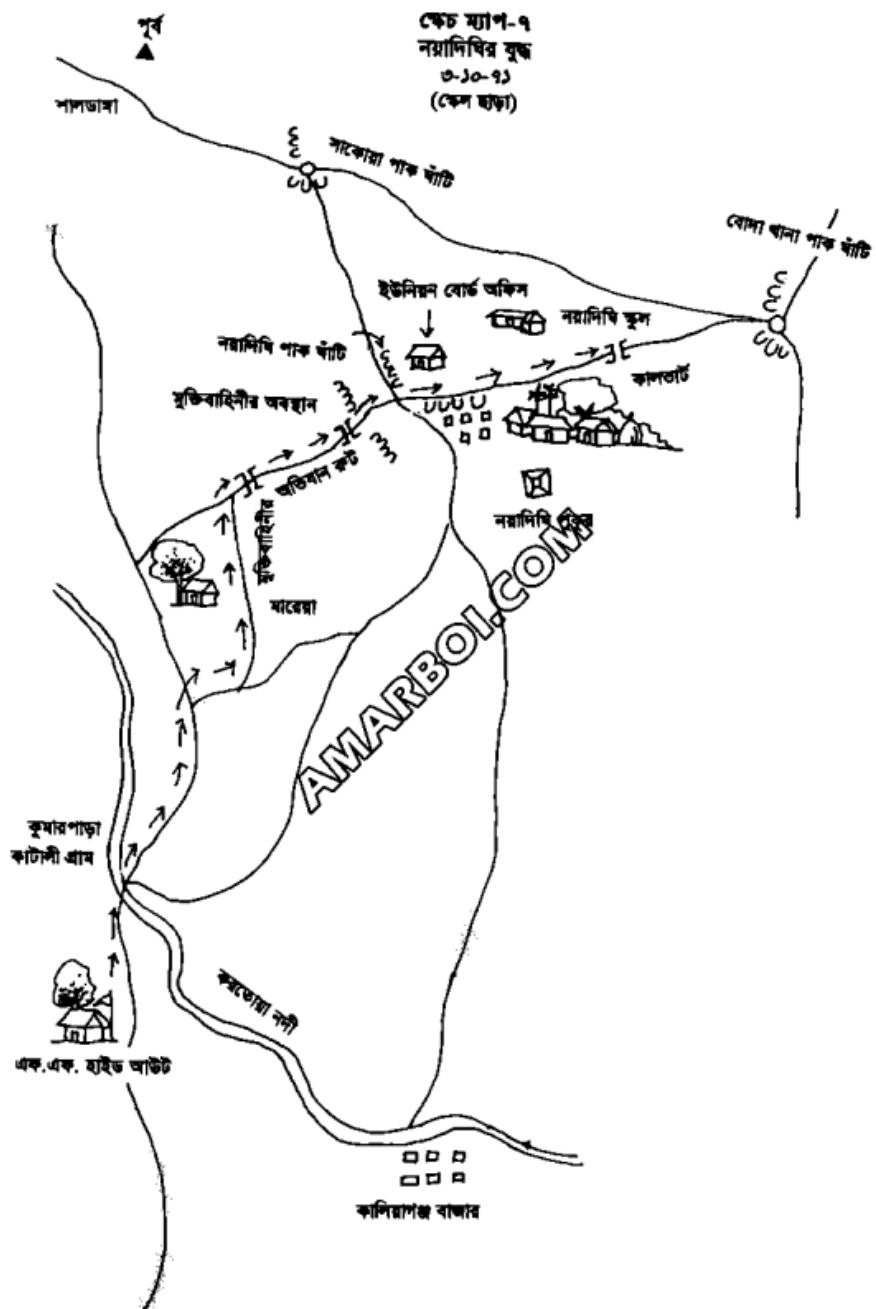
মূল দল বেশ পেছনে থাকলেও সামনে অগ্রসরমান চার যুবকের দৃষ্টিশীমার ভেতরে, রাইফেলের নিশানার আওতায়। ওরা হঠাতে আক্রান্ত হলে যাতে তাদের 'কভার' দেয়া যায়, এ কারণেই মূল দল 'গ্যারো হেড' পজিশন অর্থাৎ তীরের মাথার আকৃতিতে এগুচ্ছে। দলের মাথায় আমি। পাশে অহিদার। সবারই হাতে ধরে রাখা উদ্যত-উদ্বৃত হতিয়ার, আঙুল বসানো টিপারে। দ্রুত হাঁটছি আমরা।

মোট ৩০ জন মূল যোদ্ধার সাথে আরো ৫ জন এসেছে গাইড হিসেবে। আমি এদের কয়ান্তর। সামনে শক্র শক্ত বাধা, অনেক কাজ। সমস্ত দায়দায়িত্বই আমার। দায়িত্বের বেঁোটা অনেক বড়ো। মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হবে। মনের সমস্ত একাঘাতা দিয়ে সে চেষ্টা করে চলেছি। প্রকাশ্য দিবালোকে শক্র ধাঁটি দখলের এই অভিযান নিদারণ ঝুঁকিপূর্ণ। এখন মনে হচ্ছে, ঝুঁকির মাঝাটা একটু বেশি হয়ে গেছে।

নয়াদিঘির কাছাকাছি পোছে গেছি। সামনে একটা কালভার্ট। সেটাও পার হওয়া গেলো নির্বিন্দে। এবার নয়াদিঘি স্পষ্ট দেখা যায়। বাজার, কুল, ইউনিয়ন অফিস, একটা গোড়াউনের মতো দালান, এইসব। আরো এগিয়ে গেলাম। সামনে মাঝেমাঝে এগুচ্ছে দৃঢ় পায়ে। আমরা ওকে পেছন থেকে অনুসরণ করছি। এইরকম অনুসরণ করে হাঁটতে হাঁটতেই চোখ বুলিয়ে দেখি নয়াদিঘিতে মানুষজনের তেমন চলাচল মেঠে কেমন যেনো ফাঁকা ফাঁকা সবকিছু। তার সামনে আর যাত্র চারশো গজের মতো পথ।

কিন্তু এসময়ই, বলতে গেলে হঠাতে কুকুর মতিয়ার একটা ভুল করে বসে। তার চাদরের ভেতরে লুকিয়ে রাখা টেনগান থেকে ক্ষেপ্তা ত্রাশ বেরিয়ে যায় সশস্ত্রে। আকস্মিক এ ঘটনায় সবাই হকচকিয়ে যায়। বিচু অবস্থারেই। মতিয়ার ত্রাশ করেই পেছনে তাকিয়ে জয়ে পড়তে যাচ্ছিল মাটিতে। আমি ইশ্রা~~দিন~~ তাকে সামনে দৌড়াতে। পদ্ধতি কলেজের প্রথম বর্ষের ছাত্র মতিয়ার। সে তার নার্তক সহ্যত রাখতে পারে নি। অথচ কথা ছিলো, একজন সাধারণ গাঁও-গেরামের মানুষের মতোই সে সোজাসুজি নয়াদিঘি বাজারে গিয়ে উঠেরে এবং একটা সুবিধাজনক জায়গায় নিজেকে আড়াল করে এলোপাতাড়ি শুলিবর্ষণ শুরু করবে। আর সেই ফাঁকে আমরা রাস্তা ধরে ডানে-বাঁয়ে ফসলের খেত মাড়িয়ে, ছড়িয়ে-ছিটিয়ে অভিশান্তভাবে গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে এগিয়ে দিয়ে ঝাপিয়ে পড়েরে শক্র অবস্থানের ওপর। শক্ররা এভাবে আমাদের আকস্মিক হামলার শিকার হয়ে এবং মুক্তিযোদ্ধাদের শক্তি আর সংখ্যাধিকের কথা ভেবে ভড়কে যাবে। ছের্টন্স হয়ে পড়বে তারা। কিন্তু মতিয়ার সবকিছু গুলেট করে দিলো। এখন আর সময় নেই। যা হবার হয়ে গেছে। কালক্ষেপ না করে দ্রুত সরাসরি শক্র-অবস্থানের দিকে যেতে না পারলে শক্র তাদের সূরাক্ষিত বাস্কারের অবস্থান থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি পাঠিয়ে ঝাঁঝারা করে দেবে রাস্তা ধরে সার বেঁধে এগিয়ে যাওয়া আমাদের বাহিনীকে।

তুরিত সিঙ্কান্ত নিয়ে আহিদারকে নির্দেশ দিলাম এখানে রাস্তার ওপর থেকে সরাসরি নয়াদিঘির ওপর দুইঘণ্টা রে শেল বর্ষণ করতে। একরামুলকে তার দল নিয়ে ডানে নেমে এগিয়ে যেতে বললাম গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে। খলিল নেমে গেলো বাঁয়ে একইভাবে। আমি মূল রাস্তা ধরে মধুসূন, মালেক, মঞ্জু আর মতিয়ারকে নিয়ে দৌড়ছি গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তেই।



প্রথম মিস ফায়ারের পরই শক্রপক্ষ টের পেয়ে গিয়েছিলো। পরপর চারটা মটারের শেল পড়লো বাজারের মাঝ বরাবর। বিকট শব্দ তুলে ফাটলো সেগুলো কালো ধোয়ার কুঙ্গলী পাকিয়ে। রাস্তার দু'পাশ দিয়ে একরামুল আর খলিলের দল তুমুল গুলির তুবড়ি ছাটিয়ে কান্দা-পানি ভেঙে দৌড়ে চলেছে। এখন আর কারুরই কোনো দিকে খেয়াল নেই। আড়াল নেই কারুর সামনে। সবার একটাই লক্ষ্য, ঝড়ের বেগে গিয়ে নয়াদিঘি পৌছাতে হবে। এই রকম অবস্থায় শক্র গুলিবর্ষণ আমাদের যে কাউকে চিরকালের মতো ওইয়ে দিতে পারে জামির কান্দা-পানির ওপর। ঝড়ে দূমড়েমুচড়ে পড়া কলাগাছের মতো অবস্থা হতে পারে আমাদের। কিন্তু এখন এই রকম শক্তার কথা কারো ভাবনাতে নেই। যুদ্ধের উন্নাদনা একটা গভীর নেশার মতো। সেই নেশার ঘোরে হিটিরিয়াগ্রাস্তের মতো মানুষ দিস্থিক জানশূন্য এগিয়ে যায় মারতে অথবা মরতে। আমরাও সেইভাবে এখন এগিয়ে চলেছি শক্রের দিকে রাস্তার মাঝ বরাবর অবস্থান নিয়ে। এই এগিয়ে চলা জীবন অথবা মৃত্যু ঝুঁয়োর বাজি ধরার মতো একটা ব্যাপারেই সামিল। আসলে আমাদের এখন এগিয়ে যাওয়া ছাড়া আর তো কিছু করার নেই। এগিয়ে যেতে পারলেই হয়তো একটা কিছু করা যাবে। মাঝপথে ঘেমে গেলে, কিংবা পেছাতে চাইলে নির্ধার মৃত্যু ছাড়া আর কিছু কপালে জুটিবার সম্ভাবনা শূন্য। তাই এগিয়ে যাওয়া। বাঁচার জন্য। শক্রেকে পরাবৃত্ত করে বিজয় ছিনিয়ে আনার জন্য।

বাজারের দক্ষিণ দিক থেকেই পাকবাহিনী শুরু করলো আক্রমণের পার্টা আক্রমণ। তার মানে ওরা আমাদের আচমকা আক্রমণের মুখে ছেত্তেজ হয়ে ঝুল দাঢ় ছেড়ে আশ্রয় নিয়েছে বাজারের ডানপাশেকার পুরুর পাড়ে। ওখান থেকেই আমরাত্তেজেদের জবাব। অসংবিধ অনেকগুলো হাতিয়ার থেকে এলাপাতাড়ি গুলি ছুটে আসছে। হাতিয়ারসহ আমি রাস্তার বাঁ পাশেকার ঢালু মতো জায়গাটার আড়ালে চলে যাই। এক্ষেত্রে একেবারে শক্রের মুখোমুখি অবস্থানে। তাকে লক্ষ্য করেই তাই শক্রপক্ষের মূল প্রতিষ্ঠানমণ্ডের ধারা। একরামুলের দল ক্ষেতবাড়ির ভেতরে একটা বড়ো মতো আলো আড়াল স্থিত পেরেছে। মঞ্জুকে পেছনে দৌড়ে যেয়ে আহিদারকে পুরুরের দিকে মর্টার হেঁড়ার নির্দেশ পাঠাই। আমাদের বাঁদিক দিয়ে খলিলের দল প্রায় পৌছে গেছে নয়াদিঘি-সাকোয়া রাস্তায়। ওদিকটা থেকে কোনোরকম বাধা আসে না। আমরাও রাস্তার ধার ঘেঁষে ঘেঁষে প্রায় পৌছে গেছি তাতোক্ষণে বাজারের ওপর। মর্টারের শেল এসে পড়তে লাগলো বাজারের পেছনবর্তী পুরুরের আশপাশ জুড়ে। মেনেড চার্জ কর, বলে সঙ্গীদের প্রতি চিৎকার করে নির্দেশ দিই। এক সাথে পাঁচ পাঁচটা মেনেড উড়ে যায় বাজারের দিকে। বিকট শব্দ তুলে সেগুলো বিস্ফেরিত হতে থাকে। এই ফাঁকে লক্ষ্য করতেই দেখতে পাই ঠিক আমাদের হাতের নাগালেই শক্রের দুটো বাক্সার। মতিয়ার চট করে উঠে দাঁড়িয়ে বাক্সার দুটোর ফোকরে দৃষ্টি গলিয়ে দিলো। না, কেউ নেই। বিলম্ব না করে দুজন সঙ্গীকে নিয়ে আমি বাক্সার দুটোর দখল নিয়ে নিই। রাস্তার ওপরকার আরো দুটো বাক্সার শৃঙ্খু আর মালেককে দ্রুত দখল নিতে বলি। ওরা ছুটে গিয়ে সেগুলোর ওপর নিজেদের দখল কায়েম করে।

একরামুল তখনো লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। আহিদার মর্টার ছুঁড়ে চলেছে। খলিল আর মধুসূদন রাস্তায় উঠে পড়েছে। চাঁদ মিয়াকে পাশে নিয়ে হাঁটুর ওপরতক লুঙ্গি তুলে, গায়ে চাপালো কালো শার্টের পকেটে মেনেড আর গুলির প্যাকেট ঠেসে নিয়ে আমি চৌরাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে। একটা চমৎকার ছবি যেন। সমস্ত ভয়ভীতি অস্থিরতা কোথায় তখন কর্পুরের মতো উবে গেছে। আমরা তাহলে নয়াদিঘি দখল করে নিতে পেরেছি! ব্যাপারটা আমার নিজের কাছেই কেমন অবিস্ময়

লাগছে। খলিলের দল 'জয় বাংলা' ধৰনি দিয়ে দৌড়ুচ্ছে। আকাশের দিকে স্টেনগানের ঘঁষকা ত্রাশ দিয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম ওদের। এমন সময় শুধু আর হাসানকে এগিয়ে আসতে দেখা যায়। ওদের হাতে ধরা পড়া একজন পলায়নপর রাজাকার। মোক ছাড়ে দেন গে, বলে তার আহি চিৎকার। কিন্তু সেই চিৎকারের রেশ মিলিয়ে গোলো একরাশ গুলির শব্দের দমকে। এ ঘটনার পরপর দেখা গোলো শুভসহ আরো দুতিনজন ছেলে একটা মোটামতো লোককে টেনে-হিঁড়ে নিয়ে আসছে কাদাপাঁকে ভরা মাটির ওপর দিয়ে। রাস্তার ধারে ঘোপের আড়াল থেকে ধরেছে ওরা তাকে। পরনে তার লুঙ্গি আর গেঞ্জি কাদা-পানিতে মাঝামাঝি। লোকটার লম্বাটে মুখে বড়ো আকারের গৌফ। আমার সামনে এসে লোকটাকে দাঁড় করাতেই তয় পেয়ে যায় সে সাজ্জাতিকভাবে। পাগলের মতো আচরণ করতে থাকে। শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে ধরে রাখা ছেলেদের হাত ফস্কে দৌড়ে পালিয়ে যাবার উপক্রম নেয়। স্টেনগানের ট্রিগারে আঙ্গুল চেপে ধরি। সাথে সাথে কাজ হয়। লোকটার পিঠ মুহূর্তে ঝীঝীরা হয়ে যায়। তারপর ধপাস করে পড়ে যায় সে রাস্তার ওপর। আর আমার মুখ থেকে আপনাআপনি বেরিয়ে আসে তীব্র ঘৃণা মেশানো একটা গাল, শালা কুন্তার বাঢ়া পাকিস্তানি।

রাস্তার ওপর পড়ে থাকে সে নিখির নিষ্পন্দ। বাড়-বৃষ্টিতে আরামের সাথে বাঙারের নিরাপদ-নিরাপত্তায় সম্বৃত ঘূর্ণিছিলো এই পাকিস্তানি সৈনিকটি। যখন সে জেগে ওঠে, তখন আর সময় ছিলো না। মুক্তিযোদ্ধাদের দখলে চলে এসেছে তাদের অবস্থানস্থল। তাই বাঙ্কার থেকে বের হয়ে পাশেই রাস্তার ধারের একটা ঘোপে লুকিয়ে বাঁচবার জেটি করছিলো। কিন্তু শেষতক সেটা আর তার পক্ষে পারা হয়ে ওঠে নি। তার দলের সঙ্গীর প্রেরণ আগেই তাকে একলা রেখে পিঠাটান দিয়েছিলো। ধরা পড়ে যায় সে আমাদের ছেলেদের হাতে একেবারে অসহ্য অবস্থায়।

বাঙ্কারগুলো চার্জ করে একটা চাইনিজ প্রেটিয়ার আর কিছু গোলাবারুদ পাওয়া যায়। মৃত সৈনিকটির শরীরে ইউনিফর্ম আর মার্জিন থাকায় তার পরিচয় জানা যায় না। হয়তো পিছিয়ে যাবার সময় তারা তাদের অস্ত্রাস্তিক সবকিছু যথাসম্ভব নিয়ে চলে গেছে। মতিয়ারকে তখন রওনা করিয়ে দিই চারটা প্রেটোর চার্জসহ বোদার রাস্তার সেই ১৫/২০ ফুট লম্বা স্প্যানের ত্রিজটা উড়িয়ে দেবার জন্য। পাঁচজন সঙ্গী নিয়ে মতিয়ার প্রায় দোড়াতে দৌড়াতে এগিয়ে যায়।

গোলাগুলি তখন থেমে গেছে। একরামুল আর খলিলের দু'পাশ থেকে গোলাগুলির প্রচণ্ড চাপ এবং আহিদারের পেছন থেকে পাঠানো মার্টারের গোলাবৰ্ষণ শক্তপক্ষকে ছত্রস্থ করে দিয়ে। একরামুল একটু পর কাদা-মাটিতে একাকার হয়ে রাস্তার ওপর উঠে আসে। এরি মধ্যে খলিল পুরুর দখল করে ফেলেছে। পাকবাহিনীর লোকজন পুরুরের ওপর দিয়ে তাদের অবস্থান গুটিয়ে নিয়ে সোজাসুজি জঙ্গল আর ক্ষেতবাড়ি ভেঙে সম্বৃত তাদের নিরাপত্তা এলাকা বোদার দিকে পালিয়ে যাচ্ছে। তাদের পিছু ধাওয়া করে আর লাভ নেই। নয়াদিঘি স্কুলে রাজাকারদের যে ক্যাম্প ছিলো, সেটিও আমাদের দখলে এসেছে কিছু গোলাবারুদসহ। স্কুলের মেঝেতে সার সার বিছানা, টিমের তোরঙ্গ, সুটকেস ও কাপড়ের ব্যাগ ইত্যাদি যত্নত ছড়ানো। সুটকেস আর বাস্ত-তোরঙ্গগুলো ভেঙে ফেলা হয়। কিছু খুচরো কাপড়চোপড় আর লুটের মালপত্রে ভর্তি সেগুলো। গৃহস্থ বাড়ি থেকে লুট করে আনা ছোটোখাটো কভো ধরনের জিনিস, এমনকি টাকা-পয়সাও রয়েছে এসবের কোনো কোনোটিতে। লুট করো আর ভোগ করো এরকম মনোভাবে গুলুজ করে পাকবাহিনীর কিছু লোভী মানুষকে রাজাকার বানিয়োছে। লুটপাটের এরকম প্রক্রিয়া চালাতে থাকলে নিঃশ্ব হয়ে যাবে মানুষ, শূন্য হয়ে যাবে দেশের

সম্পদ ভাগার। এর পরিসমাপ্তি ঘটাতেই হবে। ঠিক এই রকম ভাবনা যখন ভাবছি, তখনি
একটা প্রচণ্ড বিক্ষেপণের শব্দ ভেসে আসে বোদার দিক থেকে। কাজিক্ত এই বিক্ষেপণের
শব্দ। তার মানে মতিয়ার তার ত্রিজ ওড়ানোর কাজ সম্পন্ন করলো।

নয়াদিঘি বাজারের সব থেকে বড়ো দোকানের দরেজা ভেঙে ফেলেছে ছেলেরা। অন্য কটা
দোকানঘরের বাঁপও ভেঙে ফেলেছে তারা। বড়ো দোকানটায় মালপত্রে ঠাসা। চাল, চিনি,
ময়দা, ডাল, তেল আর নুসসহ সব ধরনের জিনিসপত্র মজুদ রেখেছে দোকানের মালিক।
মালেক দৌড়ে এসে বলে, বাজারের দোকানে অনেক মাল, এঠে যাবা হবে। দ্রুত রাস্তা পেরিয়ে
বাজারে ঢুকি। মালপত্রে ঠাসাঠাসি বড়ো দোকানটার সামনে শিয়ে চোখ আটকে যায়। কতো
বিচিত্র সব জিনিসপত্র স্থানে থেরে থেরে সাজানো। ছেলেদের চকচকে চোখের দিকে তাকাই।
তাদের দৃষ্টিতে স্মৃতির প্রার্থী। সেই কতোদিন হলো এরা ভালো কিছু যায় না, ভালো কিছু পরে
না, গায়ে-মাথায় তেল-সাবান দেয় না, সিগারেটের কথাতো ভূলে যাবার যোগাড়। পরিমিত
রেশনে ছেলেদের স্মৃতি আর চাহিদা পূরণ হয় না। ঝোপে-জঙ্গলে, অজ্ঞায়গায়-কুজ্ঞায়গায় বন্য
প্রজন্ম মতোই জীবন কাটে সবার। এরকম জীবনে অভ্যন্তর আমাদের চোখের সামনে সাজানো
ভোগ্যপণ্য আর শৌখিন দ্রব্যাদির সমাহারকে আলিবাবার ছেটোখাটো একটা রত্নভাণ্ডার বলেই
মনে হয়। আমাদের চাল দরকার, ময়দা দরকার, চিনি দরকার, তেল-সাবান দরকার, বিড়ি-
সিগারেট দরকার, প্রয়োজন মতো এবং নিয়মিত। কিন্তু তামাছিছ না। অঞ্চল দোকানি ব্যাটা
আমাদের সেইসব প্রয়োজনীয় আর কাজিক্ত জিনিসপত্রই সোজায়ে রেখেছে। এখানে পাকসেনা,
রাজাকার, আলবদর বাহিনীর জন্য। পাকদালাল আর শাস্তি কমিটির লোকজনদের জন্য।
ভাবনাটা আসতেই খলিকে বলি, নে, যা পালিল থেতো পারিস, যা কিছু আমাদের প্রয়োজন,
সবকিছু ভূলে নে। কিন্তু নো বিশ্বাসলা পালিল তার দলবল নিয়ে লেগে যায় কাজে।
একরামূলকে নিয়ে আমি রাস্তার ওপরে ঝুঁকে। সাথে করে নিয়ে আসা এপি-১৪ মাইনগুলো তার
হাতে দিয়ে বলি, সেগুলো নয়াদিঘি লাগোয়া রাস্তায় সুবিধে মতো ব্যবধানে অর্থাৎ একটির থেকে
আরেকটির খুব দূরত্ব সৃষ্টি না করে পুরু ফেলতে। একরামূল চলে যায় ৪/৫ জনকে সাথে
নিয়ে। মধু, চাঁদ মিয়া আর মালেককে নিয়ে আমি বাক্সারগুলোয় রেমার চার্জ লাগিয়ে ফেলি। এরি
মধ্যে আহিদার চলে এসেছে তার মর্টার পার্টি নিয়ে। এখন শুধু মতিয়ারের জন্য অপেক্ষা।

বাজারের সাথেই লাগোয়া বিরাট অবস্থাপন্ন একটা লোকের বাড়ি। তার সামনে রাস্তার ওপর
এই সময় একটা ঘটনার সম্মুখীন হতে হয়। লুঙ্গি পরা একজন যুবককে আমাদের ছেলেরা 'কে
আপনি?' কোথা থেকে আসছেন? এখানে কি? রাজাকার? পাকিস্তানি স্পাই?' এই ধরনের প্রশ্নের
পর প্রশ্ন করে চলে। সাইকেলের হ্যান্ডেল ধরা হাতে যুবকটিকে চারদিকে ঘিরে ধরেছে তারা।
যুবকটি সম্ভবত পিঙ্কিত। কিছুটা টেরা আর তেজি ধরনের। ছেলেদের প্রশ্নের জবাবে গলার স্বর
উচ্চয়ে বলে, রাজাকার হবো কেনো? এই বাড়িতে দাওয়াত থেকে আসছিলাম।

— শালা যুদ্ধের মধ্যে দাওয়াত থেকে এসেছে, আঞ্চলিক-মেহমানদারি, শালা রাজাকারের
বাক্সা— কথাগুলো বলেই ছেলের দল এবার ক্ষিণ হয়ে শুরু করে তাকে এলোপাতাড়ি মার।
মারের চোটে যুবকটি এবার সাইকেল ছেড়ে দিয়ে যাচিতে পড়ে যায়। কাদায় গড়াগড়ি থেকে
থেকে আর্তন্ত্বের চিকিৎসা করে বলতে থাকে, বিশ্বাস করেন, মুই রাজাকার নহো। দোহাই
তোমার, খোদার কসম কইছু, মুই রাজাকার নহো, উমার দালাল নহো।

এবার আমি এগিয়ে যাই ঘটনাস্থলে। আমাকে দেখেই যুবকটি পায়ের কাছে এসে হংড়ি

থেয়ে পড়ে। ছেলেদের থামিয়ে দিয়ে যুবকটিকে দোড়াতে বলি। কষ্ট করে উঠে দাঢ়ায় সে। গায়ের জামাটা ওর ছিড়ে ছিন্ন অবস্থা। লুঙ্গি খসে পড়েছে কোমর থেকে। একহাতে সে লুঙ্গি ঢেপে ধরে কোনোরকমে সামাল দিয়ে রেখেছে নিজেকে উদোম হবার হাত থেকে। সারা শরীর কাদায় মাখামাখি হয়ে ভূতের মতো অবস্থা এখন তার। নাক-মুখ দিয়েও রক্ত ঝরে পড়ছে। তালো করে একটুখানি দেখি যুবকটিকে। দেখে মনে হয়, এ লোক রাজাকার বা পাকিস্তানি অনুচর হতে পারে না। হলে, যুদ্ধের এই তাওয়ের মধ্যে রাস্তায় সাইকেল নিয়ে বেরুবার সাহস করতো না। ছেলেদের কে একজন তাক করে শুলি ছুঁড়তে গেলে আঁতকে উঠে ভয়ার্ট গলায় কান্না ঝুঁড়ে দেয় সে। আমি তাকে বলি, ভাগো। অথবা সে বুবাতে পারে না। অবিশ্বাস-ভরা চোখে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকায় আমার দিকে। তখন তাকে ধমকে উঠি, ভাগো। দৌড়াও রাস্তা ধরে। থামবে না কোথাও। তখন সে ইতস্তত করে বলে উঠে, মোর সাইকেল?

— শালা তোর সাইকেল চাহচিস, বলে মালেক তার পেটে একটা গুঁতো মারে রাইফেলের বাঁট দিয়ে ভয়ানক জোরে। কঁকিয়ে ওঠে যুবকটি। তারপর পেছন ফিরে দোড়াতে থাকে উর্ধ্বশাস্ত্রে বোদার রাস্তা ধরে। জীবন নিয়ে দৌড় বুঝি একেই বলে।

এবার রাস্তার ওপারে টিনের ছান্দুলুক পাকা দালান ঘরটার সামনে এসে দোড়াই। টেটাই নয়াদিঘি ইউনিয়ন অফিস। নয়াদিঘি শক্ত ঘাঁটির হেড ক্রোয়ার্ট। দরোজা খোলা। ঢুকে পড়ি। ভেতরে দেখতে পাই, একটা ঘরে স্তুপ করে রাখা ছিটাইয়ের মাল। অধিকাংশই পেতলের তৈরি খালাবাসন, হাঁড়িপাতিল। এছাড়াও আরো নানা বস্তুসের জিনিসপত্র রয়েছে। সাইকেলও রয়েছে তিন-চারটা। অন্য ঘরটায় রসদ সামগ্ৰী মজুদসহ খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা। মাঝখানকার ঘরটায় অফিস। সেখানে পাতা বসাই একটা চমৎকার সেক্রেটারিয়েট টেবিল। টেবিলজোড়া কাচ লাগানো। ফুলশূন্য ছুটিদানি ও তার ওপরে একটা এ্যাশটে, তাতে সিগারেটের টুকরোর স্তুপ। এই কিছুক শোগনেও ওরা যে এখানে ছিলো, সেটা সহজে বোঝা যায়। টেবিলের পেছনে চামড়ার পুরুষ সান্তালা হাতলুকু চেয়ার, তার পেছনে শান্দা দেয়াল। দেয়ালে ঝুলছেন কায়দে আজম। কাচের ফ্রেমে বৰ্জ। ছবিটার দিকে কয়েকটা মুহূর্ত তাকিয়ে থাকলাম। তারপর টেনগামের নল উঠিয়ে ট্রিপারে আঙুলের চাপ পড়লো। শতভিত্তি হয়ে গ্রেহসূক্ষ বন্ধনিয়ে পড়ে গেলো ছবিটা। পাকিস্তানের জাতির জনক। আমরা পাকিস্তান মানি না। আমরা বাঙালি। আমরা চাই জয় বাংলা। আমরা চাই স্বাধীন বাংলাদেশ।

ইউনিয়ন অফিসের সামনে ঝুটির শীর্ষে পতপত করে ওড়া পাকিস্তানের চাঁদ-তারা খচিত পতাকাটা নামিয়ে ফেলা হয়। মতিয়ার ফিরে এসেছে এরি মধ্যে। সে-ই আগন্ত ধরিয়ে দেয় পতাকাটায়। দিতেই সেটা পুড়তে থাকে। চাঁদ মিয়া তখন তার কোমরে পেঁজে রাখা স্বাধীন বাংলার পতাকাটা বের করে ঝুটির মাথায় বাঁধে। তারপর ধরাধরি করে বাঁশের ঝুটিটা সোজা দাঁড় করিয়ে দেয়া হয়। ভেজা বাতাসের বাপটায় স্বাধীন বাংলার পতাকা পতপত করে সগর্বে উঠতে থাকে। আর তাই দেখে উল্লাসধনিতে ফেটে পড়ে উপস্থিত ছেলের দল। মুহূর্ত ‘জয় বাংলা’ শোগানে মুখর হয়ে ওঠে সমস্ত পরিবেশ। শুন্যে এলোপাতাড়ি শুলি ছুঁড়ে ছুঁড়ে পতাকার প্রতি সম্মান জানাতে থাকে সবাই। এক ফাঁকে মধুসূন্দন বাজারের দোকানটা থেকে নিয়ে আসে একটিন কেরোসিন তেল। এনেই ইউনিয়ন অফিসের ভেতর ও বাইরে ঢেলে দেয় টিন খালি করে। দায় সেই তেল। আর মুহূর্তে জুলে ওঠে আমার হাতের ম্যাচের কাঠি। চোখের পলকে আগুনের লেলিহান শিখা গ্রাস করে ফেলে শক্ত দুর্গ নয়াদিঘি ইউনিয়ন অফিস।

একরামুল তার মাইন ফিল্ড তৈরি করে ফেলেছে নির্ধারিত জায়গাগুলোয়। খলিলের নেতৃত্বে ওদিকে দোকান থেকে চলছে মাল খালাসের কাজ। পাশের বাড়িটা থেকে একটা গরু গাড়ির যোগাড় করেছে। তাতেই তারা বোঝাই করছে যতো কিছু মালপত্র। দখল করা সাইকেলগুলোর পিঠেও ঢাপানো হচ্ছে কিছু কিছু করে। আর এ সময়ই সাকোয়ার দিক থেকে তুমুল গুলিবর্ষণ শুরু হয়।

প্রায় মাইল তিনেক দূরত্বে শক্র আরেকটি ঘাঁটি সাকোয়া। তবে, ভরসা এই পাকবাহিনী এবং তাদের এদেশীয় দোসরো অথব এগিয়ে আসার সাহস পাবে না। নয়াদিঘি পতনের থবর পেয়ে সাকোয়া আক্রমণ হতে পারে, এই সম্ভাবনা আর ভয় থেকেই তাদের এই গুলিবর্ষণ। না, তবুও এখানে আর নয়। এখুনি নয়াদিঘি ছেড়ে যাওয়া উচিত। একটা ছাড়া মেটাযুটি সব কাজই শেষ।

আহিদারকে রওনা দিতে বলি মালপত্র ইত্যাদি নিয়ে। গরু গাড়িতে স্থান সঙ্কুলান হয় নি বলে ছেলেদের ঘাড়-পিঠে করেও নিতে হয়েছে অনেকগুলো বোঝা।

আহিদার রওনা দেয়। একরামুল আর খলিল দৌড়ে যায় বাজারে। কিছুক্ষণের মধ্যেই কালো বৌয়ার বিশাল এক কৃত্তী পাকিয়ে জুলে ওঠে নয়াদিঘি বাজার। বড়ে মতো সেই দোকানের মজুদ কেরোসিন দিয়েই তারা তাতে আগুন দিয়েছে। একরামুলের হাতে দেখতে পাই চমৎকার একটা দেয়াল ঘড়ি। আগুন দেয়ার আগ মুকুর্ত দোকানের দেয়াল থেকে সে তুলে নিয়ে এসেছে ওটা। এরপর বাক্সারে বসানো রেমার জোজুর সেফটি ফিউজে আগুন দেয়ার পালা। চাঁদ মিয়াকে সাথে নিয়ে আমি একটার পর একটা বাক্সারে বসানো ফিউজে আগুন দিতে থাকি। আগুন দেয়া শেষ হয়। দ্রুত জুলতে থাক্টি সেফটি ফিউজ। আমরা দৌড়ে চলি ফিরে চলা বাহিনীর দিকে। পেছন থেকে আকাশ ঝাঁকাস আর মাটি কাপিয়ে বিস্ফোরিত হতে থাকে চার্জ একটার পর একটা। ধূস হতে থাকে শক্র মজবুত বাক্সার। জুলতে থাকে শক্র ঘাঁটি নয়াদিঘি ইউনিয়ন অফিস, বাজার প্রাঞ্চির রাস্তার উপর পড়ে থাকে দু'জন শক্রের প্রাণহীন দেহ।

৩. ১০. ৭১

শবেবরাতের কাকড়াকা ভোরে আক্রান্ত মালেক

শবেবরাতের দিন কাকড়াকা ভোরে ঘোড়ামারা নদীর ওপারে যেনো আতশবাজির উৎসব শুরু হয়। সেন্ট্রি দৌড়ে আসে হস্তদণ্ড হয়ে। পাশে শায়িত আহিদার ধাঙ্কা দিয়ে আমার ঘূম ভাঙ্গায়। ফিসফিসিয়ে বলে, মাহবুব ভাই তুনছেন? উঠে বসি মাটির বিছানায়। বুবাবার চেষ্টা করি ব্যাপারটা। বোমার পর বোমা বিস্ফোরণ। যেনে বই ফুটেছে। আজ শবেবরাতের দিন। এই দিনটাকে অনেকেই পটকা মুটিয়ে আতশবাজি পুড়িয়ে অন্য আর সব ধর্মীয় অনুষ্ঠানের রূপ দিয়ে থাকে। রংপুরের বিহারি কলোনির মুসলিম পরিবারগুলোর মধ্যে এই ট্রাইডিশন ছোটবেলা থেকেই দেখে আসছি। তাই মনে কিছুটা ধন্দ লাগে। একবার ভাবি, মালেক বোধহয় বোমাটোমা ফাটিয়ে কিংবা আতশবাজি পুড়িয়ে সেই মুসলমান বিহারিদের মতো শবেবরাতের দিনটিকে স্বাগত জানাচ্ছে, নাকি অন্য কিছু অন্য কেনে ঘটনার আলাদত? আমার ভাবনার মাঝখানেই শব্দ থেমে যায়, কিছুক্ষণ পর আবার শুরু হয়ে চলতে থাকে। এবার অন্য আর একটা ভাবনা উঠিক দেয়। মালেক তার গাহিড়কে বিয়ে দিয়েছে হাইড আউট স্থাপিত বাড়ির একজন মেয়ের সাথে। সেই বিয়ের অনুষ্ঠান সে বেশ ধূমধামের সাথে করবে বলে

আনিয়েছিলো সাক্ষাতের দিন। আজ কি সেই অনুষ্ঠান শুরু করেছে ভোর থেকেই ক্ষ্যাপাটে আবদুল মালেককে কে জানে হতেও পারে। আহিদারকে বলি, নে শো। মালেক বোধহয় তার গাইডের বিয়ের অনুষ্ঠান উদ্যাপন করছে বোমাটোমা ফাটিয়ে।

কিন্তু না, বোমাবাজির শব্দ আবার বেড়ে যায়। শুলিবর্ষণের শব্দও হতে থাকে। সেই সাথে মেশিনগানের ব্রাশের শব্দও। থেকে থেকে চাইনিজ রাইফেলের সেই পরিচিত টাক্কড়ম শব্দের ধ্বনি। কান আরো খাড়া করে উঠে বসি এবার বিছানায়। আহিদারকে বলি, গতিটা সুবিধের মনে হচ্ছে না। মালেক বুঝি আঙ্গন হয়েছে পাকবাহিনীর হাতে। আহিদার অবিষ্টাসের সূরে বলে, এ কেমন করে হতে পারে? পাক আর্মিরে আসতে হবে চিলাহাটি হয়ে তাঙ্গাগঞ্জের ওপর দিয়ে। এতে দূর ভেতরে এসে ওরা মালেকের হাইড আউট আক্রমণ করবে? কী জানি কী হচ্ছে?

হচ্ছে নিচয়ই কিন্তু, তবে মালেকের গাইডের বিয়ের উৎসব এ নয়। মনের ভেতরে কেন জানি একটা বিপদের সঙ্গে ধ্বনি শুনতে পাচ্ছি। দেরি না করে এগিয়ে গিয়ে ব্যাপারটা একবার দেখা দরকার। কথাটা বলেই স্টেনগানটা কাঁধে নিয়ে দাঁড়াই। হাইড আউটের সব ছেলেই ততোক্ষণে জেগে উঠেছে। সচকিত ও সজঙ্গ অবস্থায় সবাই। একবারুলকে ঘটপট একটা দল তৈরি করে নিতে বলি। চাঁদ মিয়া, শুভ আর মধুকে নিয়ে আমি এগিয়ে যাই। কিছুটা এগিয়ে যেতেই গোলাগুলির ঝীঝাটা আরো স্পষ্ট হয়। আহিদার থেকে যায় হাইড আউট আর পড়শি উত্তরুদের নিরাপত্তা রক্ষায় আগের মতোই। একবারুলে ১০ জন ছেলেকে নিয়ে আমাদের অনুসরণ করতে থাকে পেছন থেকে। সবুজ ঘাসে ছাপা প্রায় সমতল শুক্র মাইলখানেক মাঠ প্রান্তর দ্রুত ছুটতে ছুটতে পেরিয়ে পৌছে যাই ঘোড়ামন্ত্র নদীর পাড়ে।

নদীর পাশ ঘেঁষেই খানকয়েক বাড়ি নিয়ে গুটো ছেটো বসতি। গাছগাছালি আর ঘন বাঁশের বন। তার নিচে দাঁড়িয়ে নদীর ওপরে বিশ্বীর ফাঁকা জায়গাটা দেখা যায়। বসতিটার সামনের দিকে এগিয়ে একটা উচ্চময়ে পুরুষের ওপরে দাঁড়িয়ে মালেকের হাইড আউট আর তার সামনের উচু পুরুর পাড়া কাঁজের আসে। সুর্যের আলো সবে তখন উকিলুকি মারতে শুরু করেছে। আর সেই আবচ্ছ আলোর আবরণ ভেদ করে একদল মানুষকে সারিবদ্ধভাবে পুরুরের পাড় ধরে হাইড আউটের দিকে এগিয়ে আসতে দেখা যায়। দূর থেকে লোকগুলোর চেহারা স্পষ্টভাবে দেখা না গেলেও বোৰা যায়, ওরা এফ.এফ. নয়। প্রত্যেকের পরনে ইউনিফ্রাম, মাথায় হেলমেট, হাঁটার ধরন কেমন অপরিচিত, কেমন যেনে বন্য প্রকৃতির। প্রচণ্ড ফায়ার পাওয়ার নিয়ে শুলি চালাতে চালাতে এগুচ্ছে তারা। বলতে গেলে প্রায় উঠে পড়েছে মালেকের অবস্থানের ওপর। তার মানে সত্যি সত্যি মালেক এই ভোরবেলা পাকিস্তানি বাহিনীর অতর্কিত আক্রমণের শিকার। তাদের বাধা দিতে সক্ষম হয় নি মালেকের দল কিংবা সে ফুরসতই সংবত পায় নি তারা।

চিন্তার করে কমান্ড দিই ঘোড়ামারা নদীর পাড়ে গিয়ে শুলিবর্ষণ শুরু করার। মালেককে এই মুহূর্তে কভার দেয়া একান্ত জরুরি হয়ে পড়েছে। পাকবাহিনী তার হাইড আউট পুরো দখল নিতে পারলে ম্যাসাকার কাও হয়ে যাবে। পুরো জমাদারপাড়া গ্রামটাই তারা বধ্যভূমি করে দিয়ে যাবে। তাই পাগলের মতো ছুটে গিয়ে ছেলেদের নিয়ে নদীর পাড়ে এসে পজিশন নিই। আর দেরি না করে দূর থেকে দৃশ্যামন পাকসেনাদের ওপর শুলিবর্ষণ শুরু করতে বলি। আর সাথে সাথে আমাদের ১০/১২টা হাতিয়ার গর্জে উঠে। শক্রপক্ষ এবং আমাদের মধ্যে এখন প্রায় আধ মাইলের মতো দূরত্ব। আমাদের শুলির মুখে ওদের তরফ থেকে প্রথমে

কোনোরকম পাস্টা প্রতিক্রিয়া আসে না। ৫/৭ মিনিট একনাগাড়ে গুলিবর্ষণের পর তবেই তাদের তরফ থেকে গুলিবর্ষণ শুরু হয়। টুইচুই ধৰনি তুলে মাথার বেশ ওপর দিয়ে কয়েক রাউন্ড ছুটে চলে যায়। এরপর আসতে থাকে বাঁকে বাঁকে মুৰুলধারে। এবার আর কোনো সন্দেহ থাকে না। আগন্তুক দলের পরিচিতি সহজে। এরা পাক হানাদার বাহিনী। শেষ রাতের অক্ষকারের আড়াল নিয়ে তারা ভোরের আলো ফুটবার আগেই মালেকের কোশ্চানি হেড কোয়ার্টারে আচমকা আঘাত হেনে তা দখল করার লক্ষ্য নিয়ে এই অভিযানে নেমেছে। ছেলেদের গুলিবর্ষণ চালিয়ে যেতে বলি দ্রুত নিজেদের অবস্থান পরিবর্তন করে করে। মালেককে যে করেই হোক রক্ষা করতে হবে। ওর সাথে যেদিন দেখা হয়, সেদিন সবকিছু দেখেও নেও হেড কোয়ার্টারের নিরাপত্তা ব্যবস্থা আমার কাছে মজবুত মনে হয় নি। সেখানে বড়ো ধরনের কোনো দলকেও ও রাখে নি। মালেকের ক্ষমতেশন লাইনও সেদিন দেখবার সুযোগ হয়েছিলো আমার। তার সম্পূর্ণ নির্ভরতা ছিলো ভাওলাগঞ্জ-চিলাহাটি জেলা বোর্ডের রাস্তার পাশে প্রায় আধ মাইল সমুখবর্তী, তার ভাষায়, দুর্বর্ধ ক্যান্ডার আকবরের ওপর। তাকে এই বলে আকবর আঙ্গাস দিয়েছিলো, শক্ত যে শক্তি নিয়েই আসুক না কেনো, তার দল সেটা প্রতিহত করতে সক্ষম। তাই তার দলের ওপর নির্ভর করেই গড়ে উঠেছিলো মালেকের হেড কোয়ার্টারের মূল নিরাপত্তা ব্যবস্থা। কিন্তু এখন শক্ত এসেছে সেই আকবরের অবস্থানের ওপর দিয়ে। আকবর তাহলে কী করেছে? বাধা দেয়ার কোনো ক্ষেত্রে করে নি শক্তকে? না, তাদের নিজেদেরই অস্তিত্ব মুছে গেছে এই রকম প্রশ্নের পর প্রশ্নের তোলপাড় চলতে থাকে। আবার তাকাই। না, এখন আর শক্তকে পুরুরের পাড়ে চুরাহাজী করতে দেখা যায় না। তারা সম্ভবত এখন অবস্থান নিয়েছে পুরুরপাড়ের চারদিকে মালেকের তৈরি করা বাঙ্কার আর ট্রেক্সের ভেতরে। সেখানকার নিরাপদ অঞ্চল থেকে কাঁচা এখন আক্রমণ চালাচ্ছে। একেই বুঝি বলে নিয়েতি। যে বাঙ্কার আর ট্রেক্সের মাধ্যমে মালেকের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিলো শক্তকে প্রতিহত করবে বলে, শক্ত এখন কৌশলায় অবস্থান নিয়ে তাদের অন্তরে মুখ ঘূরিয়ে দিয়েছে মুক্তিযোদ্ধাদের দিকে। ব্যাপারটি অখন বীতিমতো বুয়েরাং হয়ে দাঁড়িয়েছে মালেকের জন্য, তার দলের জন্য এবং আমাদের নিজেদের জন্যও। কয়েক রাউন্ড তিন ইঞ্জিন মৰ্টারের শেল এসে পড়ে নদীর ওপারে-এপারে। শক্ত ঠিকই চিহ্নিত করেছে আমাদের কভার বাহিনীকে। গুরা হয়তো ভাবতে পারে নি মালেকের দল ছাড়াও অন্য কোনো এফ.এফ. দল তাদের এভাবে আচমকা আক্রমণ করে বসে বাধার সৃষ্টি করবে। তাই তারা মরিয়া হয়ে উঠেছে আমাদের আটকাবার জন্য। আমাদের আটকাতে না পারলে তারা যে কাজে এসেছে, সেটা শেষ করে যেতে পারবে না। প্রচণ্ড গুলিবর্ষণের পাশাপাশি মৰ্টারের শেলও বাড়ের বেগে ছুটে ছুটে আসতে থাকে। বিক্ষেপিত হয় সেগুলো চোখের সামনে নদীর ওপারে। কয়েকটা পেছনের দিকে উড়ে নিয়ে বিক্ষেপিত হয় ফাঁকা মাঠের ওপরে।

অক্ষ জেদ- কভার দল নিয়ে এগিয়ে যাওয়া

এই রকম অবস্থায় একটা সাংঘাতিক জেদ চেপে বসে মনে। এ জাতীয় জেদ অনেক সময় বিপদের মধ্যেও নিপত্তি করে। আবার কথমো এনে দেয় অভাবিত সফলতাও। জেদ জিনিসটা খারাপ, এই প্রবচনটা বহুল প্রচলিত হলেও, যুদ্ধের মাঠে সেটা আর মানতে পারা যাচ্ছে না। এখন মনে হয়, জেদ, সাহস আর ক্রোধ— এসব ছাড়া যুদ্ধ করাই সম্ভব নয়। যাই

হোক, অক্ষ জেদের বশেই সিন্ধান্ত নিয়ে নিই, শক্র এই প্রচণ্ড গোলাগুলির বাধার মধ্যেই এগিয়ে যাবো। মালেককে রক্ষা করতেই হবে। ওপারের গ্রামবাসী মানুষজন ভীতচকিত হয়ে উঠেছে। ছুটোছুটি ছড়োহড়ি শুরু হয়েছে তাদের মধ্যে। কেউ নদীর পাড়ের দিকে ছুটে আসছে, কেউ নদীর পাড় ধরে উর্ধ্বাসে সপরিবারে ছুটে যাচ্ছে সামনের দিকে। খেয়া নৌকার মাঝি ভয়ে এপারে এসে নৌকো ভিড়িয়েছে। তারও ভেগে পড়োৱ মতলব। সবাইকে নির্দেশ দিই নদীর ওপারে যেতে। আমার নির্দেশের ব্যাপারে প্রশ্ন তোলে না কেউ।

নদীর তীর বেয়ে দ্রুত নেমে গিয়ে নৌকোয় উঠি। মাঝির মনে প্রচণ্ড ভয় চুকেছে, কিন্তু সে দ্রুত পার করে দেয় নদী। তীরে নেমেই এবার তাকে নৌকো নিয়ে ওপারে যেতে বলি। সেই সাথে নির্দেশ দিই কোনোভাবেই সে আর এ পাড়ে আসবে না। পাকবাহিনী এগিয়ে এলে সে তার নৌকো ভুবিয়ে দিয়ে ভেগে যাবে। মাথা নেড়ে মাঝি তার খেয়া নৌকো দ্রুত বেয়ে ওপারের দিকে নিয়ে যেতে থাকে। নদীর এপারে ভেড়ানো সবগুলো নৌকাই ওপারে নিয়ে গিয়ে ভুবিয়ে দেয়ার নির্দেশ দিই। এভাবে আমরা নিজেদের ফেরবার পথ নিজেরাই বন্ধ করে দিই। এখন আমাদের জন্য কেবল শক্রকবলিত সামনের পথটুকু খোলা থাকে। এই ভালো, পেছনে ফেরবার সুযোগ থাকলে পিছুটান থাকে, এখন সেটা আর থাকলো না।

ফসলের মাঠ ভেঙে দৌড়িছি। মাত্র ১৪ জনের দল আমাদের। প্রস্তুতিও তাড়াহড়োর ভেতরে তেমন করে নেয়া হয় নি। শক্রপক্ষ এসেছে ভারি প্রস্তুতি আর শক্তিশালী দল নিয়ে। প্রায় সীমান্তসংলগ্ন মুক্তিযোদ্ধাদের একটা শক্তিশালী ঘৃষ্ট দখলে নিতে আসবার অভিযানে পাকবাহিনী দল নিশ্চয়ই সব ধরনের প্রস্তুতি নিয়ে এসেছে। ব্যাপারটা বোঝা যায় তাদের মরিয়া আক্রমণধারা থেকে। তারা প্রায় দখলে নিয়ে চলেছে মালেকের অবস্থান। এখনি বাধা না দিলে, কভার ফায়ার না দিলে ভয়ানক অবস্থাশ হয়ে যাবে। তাই দৌড়ে এগিয়ে যাই ক্ষেতবাড়ির আলঞ্চেতের আড়াল নিয়ে পুরুরের উচু পাড় লক্ষ্য করে শুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে। এভাবে কিছু দূর এগিয়ে এসেছি শক্তিশালী তখনো আমাদের গোলাগুলির প্রতিউত্তর দিয়ে চলেছে বিরামহীনভাবে, ঝাড়ে প্রতিতে। পুরুর পাড়ে দখল করা বাঙ্কারের নিরাপদ অবস্থানে তারা সুবিধাজনক অবস্থানে রয়েছে। সেখান থেকেই তারা মেশিনগানের গুলি ছুঁড়ে চলেছে। সাথে অন্যান্য হাতিয়ারেরও আক্রমণ। জি-৩ রাইফেলও ব্যবহার করছে তারা। এটা একটা মারাঞ্চক ধরনের অস্ত্র। বিক্ষেপক মেনেডের গোলা উড়ে আসছে প্রচণ্ড বিঘ্নংসী ক্ষমতা নিয়ে। দ্রুত ক্ষেতবাড়ি দিয়ে এগিয়ে যাওয়া এবং ফসলের খেতের আলের আড়ালে অবস্থান নিয়ে তাদের প্রতি শুলিবর্ষণ করার যে ট্র্যাটেজি আমরা নিয়েছি, শক্রপক্ষ আমাদের সেই কৌশলটাকে যে এখনো মাল্য করতে পারছে না, সেটা বুঝতে পারা যায়। বুঝতে পারা যায় তাদের সব ধরনের আক্রমণ সোজাসুজি সামনের দিক থেকে এসে মাথার ওপর দিয়ে অনেক পেছনে চলে যাবার ব্যাপারটা থেকে। জি-৩ রাইফেলের গোলা ফাটছে তখনো প্রচণ্ড শব্দ তোলে। আর তার ভেতর দিয়ে আমরা ফসলের খেত আর ক্ষেতবাড়ির আল টপকে টপকে এগিয়ে চলেছি। কিন্তু সামনে গেলে কি হবে, শক্র আমাদের দিকে ধাওয়া করে এলে কীভাবে সামাল দেয়া যাবে, আমাদের এই ১৪ জনের স্কুল বাহিনী নিয়ে কীভাবে শক্রকে আঘাত হেনে তাদের বিভাড়ি করবো, সে সম্পর্কে কোনো ধারণা এখন আর কাজ করছে না। নিজেদের বিপদ আর ঝুঁকি সম্পর্কেও মনের ভেতর কোনো রকম সৃষ্টি-সৃষ্টি চিন্তাবন্ধনও অবকাশ পাচ্ছি না। কেবল একটাই প্রবল তাগিদ, মালেকের হাইড আউটের কাছাকাছি পৌছানো এবং সেটা

যতো দ্রুত সম্ভব।

ঠিক এই রকম অবস্থায় ঝড়ো কাকের মতো চেহারার একদল হতবিহুল এফ.এফ.-এর সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। একটা উঁচু আলের আড়াল নিয়ে তারা পলায়নপর। সংখ্যায় এক প্লাটুনের মতো হবে। তাদের প্রত্যেকের চোখে-মুখে আতঙ্কমাখা প্রচণ্ড ভয়ের ছাপ। মনে হয়, তারা যেনো সাক্ষাৎ যমদূতের থাবা বাঁচিয়ে জীবন নিয়ে পালাতে ব্যস্ত। তাদের কমাত্তার কোনজন বুঝবার উপায় নেই। তবুও তাদের থামিয়ে জিগ্যেস করি, ঘটনা কি? আসলে ঘটেছেটা কি সামলেন? মালেক, গোলাপ এরা কোথায়?

নিরাশভাবে ঘাড় নেড়ে একজন বলে, সে এসবের কিছুই জানে না। অন্য একজন বলে, পাকবাহিনী আক্রমণ করেছে।

— তোমরা পালাছে কেনো? খানদের বাধা না দিয়ে? আসো আমাদের সাথে, বলে তাদের লক্ষ্য করে নির্দেশ দিই।

আমার নির্দেশের সাথে সাথে তাদের ভেতর থেকে একজন ক্ষিণ হবে জবাব দেয়, আগবো কেমন করে? আমাদের হাতিয়ার নাই একটাও।

— কোথায় গেলো হাতিয়ার? মেজাজটা সঙ্গে চড়ে যায় হঠাত করেই। এরা নিজেদের দল ছেড়ে পালাছে বিনাযুদ্ধে, শক্রকে প্রতিহত করবার কোনো রকম চেষ্টা না নিয়ে। ব্যাপারটা সহ্যাত্মিত। কোনোভাবেই মেনে নেয়া যায় না।

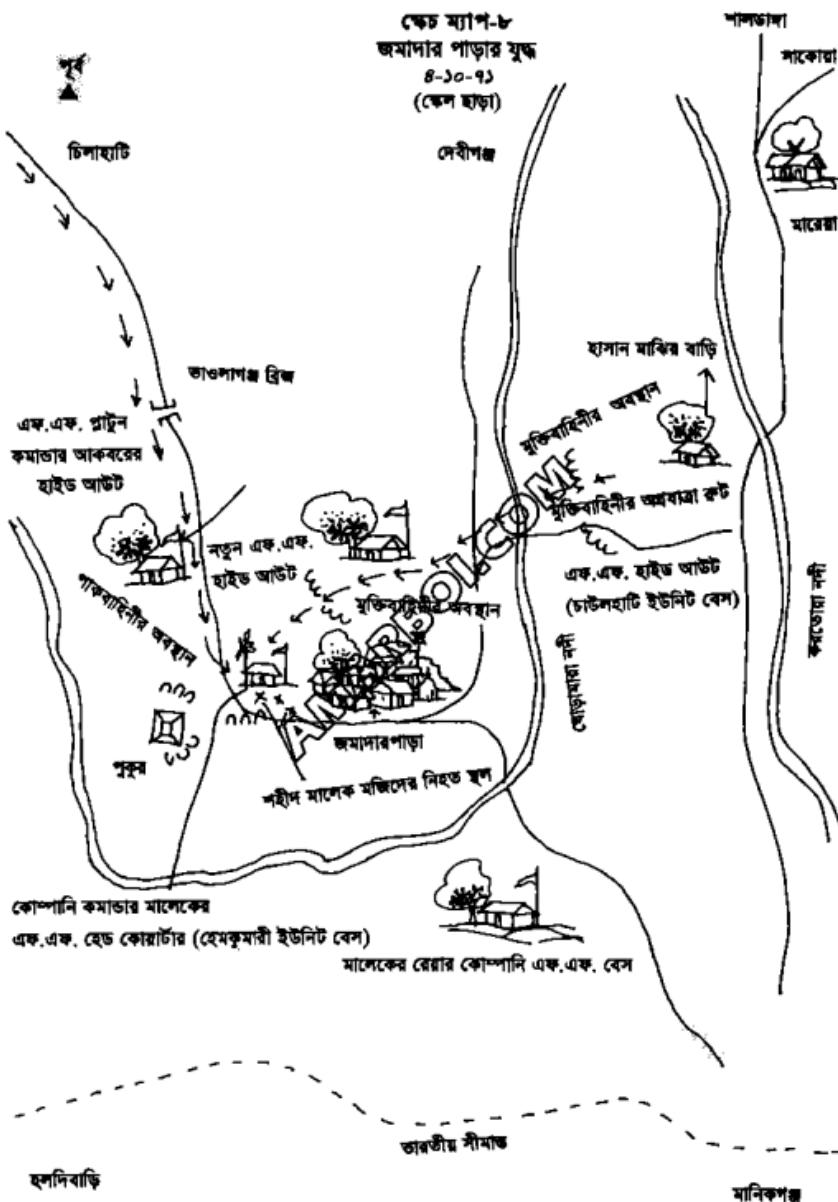
— সব হাতিয়ারতো মালেক ভাইয়ের ক্যাপ্সে। জন্মে আসে একজনের তরফ থেকে। বোৰা যায়, এ ছেলেটিই সম্ভবত দলটির কমাত্তার।

— হাতিয়ার ক্যাপ্সে, খালি হাত তোমাদের ছিলে কোথায় তোমরা? একটা অঙ্গ ক্রোধ আর বিত্তশা ভর করে মনে ছেলেগুলো কেন ছিলে। তার কাছ থেকে উভর আসে, আমরা নতুন এসেছি মাত্র ৪/৫ দিন আগে টেলিভিশনে করে। আমাদের হাতিয়ারপত্র সব ওখানে, সামনের ঘামে আমাদের হাইড আক্টিউনের জন্য পাঠানো হয়েছিলো।

এবার মনে পড়ে, মালেক যে স্থুল এফ.এফ. দলটিকে তার কোম্পানিতে অন্তর্ভুক্তের কথা বলেছিলো, এরা হচ্ছে সেই দলটিরই সদস্য। কী মারাত্মক তুল সিদ্ধান্ত যে এরা নিয়েছে, বলে শেষ করবার নয়। টেনিং সেন্টার থেকে পাওয়া নিজেদের যাবতীয় হাতিয়ারপত্র আর গোলাবারুন্দ কোম্পানি হেড কোর্টারের হেফাজতে রেখে এরা একেবারে খালি হাতে হাইড আউটের অবস্থানে কী করেছিলো? নিজেদের নিরাপত্তার স্বার্থেও তো কিছু পরিমাণ হাতিয়ার-গোলাবারুন্দ এদের প্রয়োজন ছিলো। কিন্তু এখন এই ভাবনা ভেবে লাভ কি? ছেলেগুলোকে তাই আসতে বলি আমাদের সাথে। কিন্তু ওরা আসে না। থামেও না। চোখে-মুখে রাজ্যের ভর নিয়ে ওরা পালাতে থাকে ঘোড়ামারা নদী অভিমুখে। এমন সময় সামনে থেকে কালো ধোঁয়ার কুঙ্গলী দেখা যায়। পাকসেনারা মালেকের আস্তানায় আগুন দিয়েছে।

এবার আর থামাথামি নয়, 'ফায়ার এ্যান্ড মুভ' করার ভঙ্গিতে সবাইকে সোজাসুজি এগিয়ে নিয়ে চলি। শক্রপক্ষের গোলাগুলির মাত্রা তখন কমে আসছে ধীরে ধীরে। 'প্রায় তৃপ্তি' গজের কাছাকাছি পৌছে গেছি। কালো ধোঁয়ার কুঙ্গলী পাকিয়ে পাকিয়ে উঠছে আকাশে। এক সাথে বেশ কটা ঘরে আগুন লেগেছে। শক্রপক্ষের গোলাগুলির তিহমাত্র আর নেই। তাহলে কি তারা পালিয়ে গেছে তাদের অভিযান শেষ করে, মালেকের আস্তানায় আগুন দিয়ে! দৌড়াতে দৌড়াতে পৌছে যাই বাড়িটার সামনে। একবার মুলকে পুরুর পাড়ের দিকে যেতে বলি।

ক্ষেত্র ম্যাপ-৮
জয়দার গাড়ার যুদ্ধ
৮-৩০-৭১
(বেল হাড়া)



নৰক যেন গ্রাস কৱছে সবকিছু

প্ৰধান দুটো ঘৱে আগুন জুলছে। শক্র চলে গেছে। মাত্ৰ কিছুক্ষণ আগেও ছিলো তাৰা তাদেৱ সদজ্ঞ উপস্থিতি নিয়ে। জুলতে থাকা ঘৱে দুটোৱ মাৰ দিয়ে আভিনায় চুকে পড়ি। ডান দিকেৱ টিনেৱ ঘৱটাৱ ছিলো মালেকেৱ থাকাৰ জায়গা, অন্যান্য কমান্ডাৰও সম্ভবত থাকতো এ ঘৱটাতেই। বাঁ দিকেৱ বড়ো লৰা আকৃতিৱ টিনেৱ ঘৱটায় ছিলো ‘কোত’ অৰ্থাৎ অশ্বাগৱ। বেশ কিছু ছেলেও থাকতো এখানে। ঘৱেৱ ভেতৱে কেউ আটকা পড়লে তাদেৱ বেৱ কৰা জৰুৱি। চিন্কাৰ কৱে তাই ডাকাতাকি কৱতে থাকি।

আগুনেৱ লেলিহান শিখা তখন দ্রুত গ্ৰাস কৱছে ঘৱে দুটোকে। আগুন জুলালোৱ কোনো উপকৱণ অৰ্থাৎ নাপাম জাতীয় কোনো বিক্ষেপক ব্যবহাৱ কৱে থাকবে পাকসেনারা ঘৱগুলোৱ আগুন দেয়াৰ সময়। তাই আগুনেৱ এৱকম ভয়কৱ দাউদাউ চেহাৰা।

বড়ো মতো ঘৱটাৱ পেছনদিককাৱ অংশটাৱ দাউদাউ কৱে জুলছে। তাৰ টিনেৱ ছাদেও ধৰে গেছে আগুন। বাড়িৱ আভিনায় এসে দাঁড়াতেই আগুনেৱ প্ৰবল আঁচ গায়েৱ ওপৱ আছড়ে পড়ে। বাড়িৱ ভেতৱে কাউকে পাওয়া যায় না। দ্রুত খৌজাৰ্বুজি চলে চাৰদিক জুড়ে। এমন সময় একটা ক্ষীণ আৰ্তনাদেৱ মতো শব্দ ভেসে আসে বড়ো ঘৱটাৱ ভেতৱ থেকে। সম্ভবত প্ৰজলিত ওই ঘৱেৱ ভেতৱে কেউ আটকা পড়েছে। দ্রুত উঞ্চাৰ কৱতে না পাৱলে আগুনেৱ কৱাল থাসে জীবতে জুলে-পুড়ে ঘৱেৱ অস্তিত্বে পড়া ওৱা।

একৱামূল আৱ শষুকে ঘৱেৱ ভেতৱে চুকতে বলি প্ৰাণৰ বেড়া ভেঙে। আগুনেৱ জন্য এখন সদৱ দৰোজা দিয়ে ভেতৱে চুকবাৰ কোনো উপায় নেই। ৪/৫ জন সঙ্গীৱ সহযোগিতায় ঘৱেৱ বেড়া ভেঙে ফেলে শষু-একৱামূল। চুক্তি পড়ে ঘৱেৱ ভেতৱে। আগুন দ্রুত থেকে দ্রুততর বেগে তাৰ মাত্ৰা বিস্তাৰ কৱছে ঘৱেৱ ভেতৱে। খোয়ায় খোয়ায় আচ্ছন্ন চাৰদিক। ওৱা ভেতৱে চুকে আগুনেৱ প্ৰচণ্ড তাপ অন্ধাৱাৰ অন্ধকাৱেৱ ভেতৱেই ঘৱেৱ ছেলেদেৱ লক্ষ্য কৱে এই বলে ডাকাতাকি কৱতে খুজিব। আমৱা সুভিজেফোজ, থানেৱ দল চলে গেছে। আপনাৱা কে আছেন, বাইৱে আসেন...। কাজ সেই ডাক অনেই ঘৱেৱ সিলিংয়েৱ আড়ালে লুকিয়ে থাকা চাৰজন যুবক ঝুপৰুপ কৱে ঝাপ দিয়ে নিচে নামে এবং ঘৱে থেকে বেৱ হয়ে আমাদেৱ সামনে দিয়েই ছুটে যায় বাড়িৱ পেছনে নদীটাৱ দিকে। তাদেৱ কিছু জিগ্যেস পৰ্মস্ত কৱাৱ ফুৰসত হয় না। ছেলেগুলোৱ চোখে-মুখে মৃত্যু ভয়। শ্ৰীৱ কালো হয়ে কেমন সেক থ্যাসথেসে হওয়াৰ মতো দশা। আগুন তখন ঘৱেৱ পুৱো টিনেৱ ছাদকে গ্ৰাস কৱেছে। একৱামূল ও প্ৰায় সেক হয়ে বেৱ হয়ে আসে প্ৰজলিত ঘৱেৱ ভেতৱ থেকে। সম্ভবত আটকা পড়া আৱ কেউ নেই। কিন্তু আমিমতো মালেককে খুজিব। খুজিব গোলাপকেও, খুজিব মজিদকে। ওৱা কোথায়? বাড়িৱ ভেতৱে আশপাশে কোথাও তাদেৱ হন্দিস নেই।

আগুনেৱ লেলিহান শিখা তখন ঘৱে দুটোকে পুৱোপুৱি থাস কৱেছে। আৱ সেই আগুনেৱ স্পৰ্শে ঘৱেৱ ভেতৱে মজুদ কৱে বাখা গোলাবাৰুদ, একুপ্ৰেসিভ, বোমা, শেল আৱ মাইন ইত্যাদি প্ৰচণ্ড শব্দ নিয়ে বিক্ষেপিৱত হতে শুৱ কৱে। নৱাকে পৱিণত হচ্ছে জায়গাটা দ্রুত। এই দুটো ঘৱেৱ আগুনেৱ লেলিহান শিখা আৱ অন্তৱ বিক্ষেপণেৱ শিখা এখন দ্রুত গ্ৰাস কৱেছে অন্য ঘৱগুলোকে। গোটা বাড়িটাতেই আগুনেৱ প্ৰসাৱ ঘটছে। আমৱা তাই বেৱ হয়ে আসি বাড়িৱ ভেতৱ থেকে। এ আগুন নেভানোৱ কোনো উপায় নেই। পুৱো গ্ৰামবাসীৱ সহযোগিতা পেলে হয়তো কিছুটা চেষ্টা কৰা যেতো। কিন্তু কেউ এগিয়ে আসে না। জীবন

বাচানোর তাগিদে পুরো ধ্বনির মানুষ নদী পার হয়ে নিরাপদ দূরত্বে ছুটে পালিয়েছে।

বাড়ির বাইরের চতুরে একটা উচু মতো প্রাচীন গাছের নিচে এসে দাঁড়াই। সেদিন এখানেই মালেককে সালিশ-দরবারের আসর বসাতে দেখেছিলাম। সেদিন কি রমরমা, জমজমাট অবস্থা দেখেছিলাম এখানে—কতো মানুষ, কতো আয়োজন, কতো নিয়মকানুন, কতোজনের কতো রকমের অভাব-অভিযোগ, কতো বিচারপৰ্যাপ্তি মানুষের ভিড়, কতো ধরনের সমস্যা নিয়ে এসেছিল মানুষের দল এখানে! কী প্রতাপ আর কর্তৃত্ব নিয়ে মালেককে সেদিন দেখেছিলাম সবার সমস্যার সমাধানে সাহায্য করতে। কিন্তু কোথায় এখন সেই মালেক? ওকি ধরা পড়েছে মারা গেছে না কি পালাতে পেরেছে পাকসেনাদের ঢোকে ধূলো দিয়ে? ওর ভাণ্যে কী ঘটেছে, জানবার জন্য ভেতরে ভেতরে একটা নিদারণ অঙ্গুরতা। তবে অবস্থা যা, তাতে করে কেন জানি মনে হয়, মালেক কোনো রকম প্রতিরোধই সৃষ্টি করতে পারে নি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে। মনের এই রকম অবস্থায় দু'চারজন লোককে উকিবুকি মেরে ভয়ে এগিয়ে আসতে দেখা যায়। তাদের মধ্যে আমার পরিচিত মালেকের সেই গাইডও রয়েছে, যাকে সে এ বাড়ির মেয়ের সাথে বিয়ে দিয়েছে, আমরা ভেবেছিলাম এ উপলক্ষই মালেক বুবি বোমা আর আতশবাজির উৎসব করছে। লোকটাকে কাছে ডাকি। কালো, রোগা ঢাঙ্গে মতো লোকটা ভয়ে যেনে চুপসে গেছে। কেমন হতবহুল তার মুখভঙ্গি। জিগ্যেস করতেই তার কাছ থেকে জানা যায়, খানের দলের আক্রমণের মুখে সে হিঁচাস্ক আশ্রয়ে পালিয়ে গিয়েছিলো, তারপর কী হয়েছে, সে তার কিছুই জানে না। মালেক প্রাচীপ এরা সবাই কোথায়, তাও সে জানে না। অন্য লোকগুলোর কাছ থেকে জানা যায়, পাকসেনারা সরাসরি এসে দখল করে নেয় এই ক্যাম্প। দু'জন মুক্তিযোদ্ধাকে তারা ধরে ফেলতে সক্ষম হয়েছে। ঘরের ভেতর থেকে তারা হত্যার আর গোলা-বারুদসহ অল্পমুক্তিনিঃস্পত্রণে বের করে বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে থাকা গরুগাড়িতে তুলেছে। আর সে স্তুতি যোড়ায়ারার দিক থেকে আমাদের আক্রমণ শুরু হলে, তারা তাড়াতাড়ি করে ঘরগুলোর আক্রমণকে ধরে দিয়ে চলে যায়। যাবার সময় তাদের হাতে ধরা পড়া মুক্তিযোদ্ধা কিছু জনকে গরুগাড়ির পেছনে দড়িতে বেঁধে নিয়ে যায়। ভাওলাগঞ্জের রাস্তা ধরে তারা দ্রুত পিছিয়ে গেছে। গাড়ি চালাবার মতো লোক ছিলো না তাদের। ধ্বনিসৌন্দরের ভেতর থেকে একজনকে ধরে তারা গাড়োয়ান বানিয়ে অন্ত বোকাই গাড়িটা চালিয়ে নিয়ে যায়।

লোকগুলোর কথা তনে মনে সন্দেহটা আরো দানা বাঁধে এবার, তারা মালেক আর গোলাপকে ধরে গাড়ির সাথে বেঁধে তাহলে কি তাদের সাথে নিয়ে গেছে? ওরা এখনো পথেই আছে। হেঁটে হেঁটে যাচ্ছে। আমরা দ্রুত এগিয়ে গেলে হয়তো তাদের ধরে ফেলতে পারি। মাথায় চিপ্পিটা ভর করার সাথে সাথে কিছু না ভেবেই নিজেদের দলের সীমিত শক্তি নিয়েই ধাওয়া করি পাকসেনাদের দলটির উদ্দেশ্যে। ভাওলাগঞ্জ-চিলাহাটিগামী জেলা বোর্ডের প্রশংসন রাস্তা ধরে দ্রুত অস্বসর হতে থাকি। কিছু করা যাবে কি যাবে না, এ রকম বুদ্ধি বা ভাবনা মনের ভেতর কাজ করে না। কেমন একটা ঘোরের ভেতর দিয়ে এগিয়ে যাই ভাওলাগঞ্জ ব্রিজ পর্যন্ত? না, পাকবাহিনীর টিকিটির পাস্তা পর্যন্ত নেই। তারা বেশ আশেই চলে গেছে দলবলসহ চিলাহাটির দিকে। ব্রিজের কাছে সমবেত লোকজনের কাছ থেকে জানা যায়, পাকবাহিনীর সংখ্যা ছিল প্রায় দেড়-দুশোর মতো। পরনে ছিলো কালো পোশাক, থাকি পোশাক, মাথায় ছিলো হেলয়েট আর সাথে ছিলো বড়ো বড়ো সব অন্তর্পাতি।

রাজাকার আর বেশ ক'জন বেসামরিক লোকজনও ছিলো তাদের সাথে। গঁরুগাড়ির পেছনে হাত বাঁধা অবস্থায় দু'জন মুক্তিযোদ্ধাকে তারা মারতে মারতে হাঁটিয়ে নিয়ে যেতে দেখেছে।

এখন আর আমাদের কিছু করার নেই। আরো সামনের দিকে এই সীমিত শক্তি নিয়ে এগিয়ে গিয়েও কোনো লাভ নেই। অত্যন্ত ভারাক্রান্ত হৃদয় নিয়ে তখন জমাদারপাড়ার ফেরার রাস্তা ধরি। ফ্লাট-শ্রান্ত পদে।

৫. ১০. ৭১

শহীদ আবদুল মালেক ও আবদুল মজিদ

মালেকের ক্যাম্প অর্থাৎ তার কোম্পানি হেড কোয়ার্টার তখন পুরোপুরি ভস্ত্রীভূত। কয়েকটা খুঁটিতে তখনে আগুন জ্বলছে। প্রামের একটা ধৰ্মী পরিবারের অনেকগুলো ঘর নিয়ে বিরাট বাড়ি ছিলো এটা। এখন তা নেই, চোখের সামনে থেকে বাড়িটা উধাও হয়ে গেল কিছু সময়ের ব্যবধানে। গাছের পাতাগুলো পর্যন্ত পুড়ে ছাই। দুমড়েচুড়ে পড়ে আছে পুড়ে যাওয়া টিন। চারদিকে ছাইভৃশ। কী চমৎকার একটা বাড়ি ছিলো! এখন শূন্য বাঁধা করছে। পেছনের বাঁশতলার পাশ দিয়ে চলে যাওয়া রাস্তা অবধি দেখা যাচ্ছে। এখানে, এ বাড়িটায় একদল মুক্তিযোদ্ধা আশ্বয় নিয়েছিলো। আর এ অপরাধেই বাড়িটা পুড়িয়ে দেয়া হলো। সেই সাথে শেষ হয়ে গেল দীর্ঘদিন ধরে তিল তিল করে গড়ে ছেঁজা একটা বাড়ির সমষ্ট ঐতিহ্য আর সম্পদরাঙ্গি।

বাড়ির সামনের চতুরে গোলাপকে বসে থাকতে দেখা যায়। যাক, গোলাপ তাহলে বেঁচে আছে! মনের মধ্যে গভীর একটা স্বষ্টি আর আজগাজগার আনন্দ অনুভব করি। গোলাপ আর মালেক সম্ভবত একই ঘরে থাকতো। কোম্পানি সেকেন্ড-ইন-কমান্ড গোলাপ যখন বেঁচে গেছে মালেকও নিশ্চয়ই মারা পড়েছিল অবশ্যই সে সময়মতো সরে যেতে পেরেছে নিরাপদে নদী পার হয়ে। হয়তো কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরে আসবে। ছত্রভঙ্গ ছেলেদের আবার একব্র করে সাজিয়ে নেবে তার কোম্পানি। তার সাংগঠনিক ক্ষমতা রয়েছে। অসুবিধা হবে কেন? মনের ভেতরে এই আস্তা আর বিশ্বাস জাগিয়ে রাখার চেষ্টা করি যে, মালেক বেঁচে আছে এবং সে ফিরে আসবেই গোলাপের মতো।

গোলাপের গা-মাথা ভেজা, খালি গা, একেবারে বিশ্বস্ত অবস্থা। ছেলেটা যেন বোৰা হয়ে গেছে একেবারে। কী ঘটেছিলো? কোথায় ছিলো? মালেক কোথায়? এতো সব প্রশ্নের উত্তরে সে কিছুই বলে না। জুলন্ত সিলিং থেকে উদ্ধার পাওয়া চার যুবকও ফিরে এসেছে ততোক্ষণে। তারা ছাদের নরক থেকে উদ্ধার পেয়ে কোনোদিকে না তাকিয়ে সোজাসুজি সৌড়ে গিয়ে বাঁপিয়ে পড়েছিলো নদীতে। ছেলে ক'টা যেন আগুনের তাপে সেন্দ হয়ে গেছে। শরীর কালো হয়ে গেছে, মুখ-চোখ কেমন ফোলা ফোলা। আর একটু হলেই তারা পুড়ে অঙ্গার হয়ে যেত। অগ্নিদণ্ড ভস্ত্রীভূত ঘরটার ছাদের গাদায় বিকৃত অবস্থায় পড়ে থাকতো তাদের মৃতদেহ।

কৃতজ্ঞতা কিংবা ধন্যবাদ কিছুই জানায় না তারা জীবন বাঁচানোর জন্য। এই রকম একটা অবস্থায় ব্যাপারটা হয়তো তাদের অনুভূতির সম্পূর্ণ বাইরে। এখন সেটা তাদের কাছ থেকে প্রত্যাশা করাও ঠিক নয়। কিন্তু ছেলে চারটাকে দেখে ভালো লাগে। সাক্ষাৎ মৃত্যুর দুয়ার থেকে আমরা তাদের ফিরিয়ে এনেছি। এরি মধ্যে আরো কয়েকজন ছত্রভঙ্গ হয়ে যাওয়া মুক্তিযোদ্ধা ছেলে এসে হাজির হয়। তাদেরও কাপড় ও গা-মাথা ভেজা। অর্থাৎ তারাও নদীর

পানিতে বাঁপিয়ে পড়ে ওপারের নিরাপদ আশ্রয়ে শিয়ে প্রাণ রক্ষা করতে পেরেছে।

ছাদের সিলিং থেকে বাঁচানো ছেলেগুলোর পাশে মাটির ওপর বসে পড়ি। নিজেরাও এখন অত্যন্ত ঝাউত পরিশ্রান্ত। অন্য সাব-সেন্টারের অন্য ইউনিট বেসের ভিন্ন কোম্পানির সদস্য আমরা। এদের সাহায্য করার জন্য এসেছিলাম। যতটুকু সম্ভব আপ্রাণ চেষ্টার ভেতর দিয়ে আমাদের দায়িত্ব আমরা পালন করেছি। এখন আর করণীয় কিছু নেই। এদের দায়িত্ব নেয়ার কর্তৃত আমাদের নেই। এদের কর্তৃপক্ষই এখন ঠিক করে দেবেন, কী করবে এরা এরপর? কীভাবে পুনরায় সংগঠিত হবে, থাকবেই-বা কোথায়?

এই সময় হ্রস্বদন্ত হয়ে একদল মানুষ দৌড়ে আসে। কথা বলতে চায় সবাই একসাথে। তাদের উদ্বেজিতভাবে কথা বলবার প্রয়াস থেকে এটা উদ্ধার করা যায় যে, মজিদ মারা গেছে। মজিদ মারা গেছে, কথাটা বিদ্যুৎস্পন্দিতের মতো আঘাত করে যেন। উঠে দাঢ়াই তখনি। বলি, চলেন তো দেখি কোথায়?

লোকগুলোর সাথে দলবদ্ধভাবে এগিয়ে যাই সবাই। ভূমিকৃত বাড়িটার পেছনে ঘন বাঁশবন। তার বাঁদিকে সর্বের খেত। খেতে জুড়ে কচি সবুজ সর্বের গাছ। বাঁশবনটার পেছনে তিনি-চারটা খেত পার হতেই পাওয়া যায় মজিদকে। সর্বে খেতের মধ্যেই পড়ে আছে সে উপুড় হয়ে। দুঃহাত প্রসারিত দুনিকে, মাথাটা কাত হয়ে আছে, চোখ বক্ষ করে যেন আন্তর্কান্ত দেহে নিচিস্তে নিবিড় ঘূর্মিয়ে আছে দক্ষিণ দিকে মুখ করে টেনেগানটা পড়ে আছে তার ডানে, সামান্য দূরে। তার পেছন দিককার শরীর ঝাঁঝরা হয়ে প্রাচী গুলির আঘাতে আঘাতে। রক্তে মাখামাখি শরীর। খেতবাড়ির চেলা মাটি সেই রক্তে তৈর। সময়ের ব্যবধানে এখন তকনো কালো হয়ে পেছে। মজিদের এ জায়গায় গুলিগুলি হয়ে মারা যাবার ঘটনা থেকে বোঝা যায় যে, পাকবাহিনীর হাতে হাইড আউট আক্রমণের সেটা দখলে নেয়ার পর সংস্কৰণ মজিদ তার টেনেগানটি দিয়ে বাঁশবনের দিকে পঞ্জিয়ে পিয়েছিলো। হানাদার বাহিনী যখন হাইড আউটের আঙিনায় চুকে পড়ে দাপাদাপি আর হাকডাক শুরু করেছে, তখন সে তার টেনেগানের ব্রাশফায়ারে তাদের ঠেকাতে ছিপেছিলো। পাকসেনারা অবশ্যে তার অবস্থান চিহ্নিত এবং তার দিকে তাক করে গুলিবর্ষণ শুরু করে। নিজের একক প্রতিরোধ শক্তি দিয়ে যমদৃততুল্য এই পাকসেনাদের ঠেকানে অসম্ভব ভেবে সে সরে পড়ার উদ্দেশ্যে তার অবস্থান থেকে উঠে সর্বে খেতের ভেতর দিয়ে দিয়েছিলো উর্ধ্বশাস্ত্রে ছুট। স্বাভাবিকভাবেই পাকসেনারা তখন তাকে দেখে ফেলে এবং তাকে লক্ষ্য করে ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি ঝুঁড়তে থাকে। অবশ্যে এক ঝাঁক গুলি বিন্ধ করে তাকে। টেনেগানটা ডান হাত থেকে ছিটকে পড়ে দূরে। সে উপুড় হয়ে খেতের মধ্যে পড়ে যায় আর সাথে সাথে বরণ করে মৃত্যু। এই সেই মজিদ, যে আমাদের দেখিয়েছিলো তাদের হাইড আউট ঘূরিয়ে-ফিরিয়ে কদিন আগোই। কী প্রাণবন্ত আর সজীব তরুণ! এখন প্রাণহীন নিঃসাড় পড়ে আছে সবুজ খেতবাড়িটার ওপরে। ব্যাপারটা বিশ্বাস হতে চায় না। দুঃখে জ্বালা করে ওঠে। মজিদ সংস্কৰণ এখানকার, এই এলাকারই ছেলে। অনেক লোক আসছে তাকে দেখতে। মজিদের মৃত্যুর খবরটা তাদের ইউনিট হেড কোয়ার্টার হেমকুমারীতে পাঠানোর ব্যবস্থা করে ফিল্মি পথ ধরি। একটা বিষণ্ণতা আর দৃঢ়ব্যোধ জুড়ে বসে মনের গভীরে। মালেকের এখনও খবর মেলে নি। চারদিক তল্লাত্ত করে খোজা হয়েছে, কোথাও তাকে মৃত বা আহত অবস্থায় পাওয়া যায় নি। তাই সবাই ধারণা করে নেয়, সে বেঁচে আছে এবং কিছুক্ষণের ভেতরেই এসে হাল ধরবে ভেঙে পড়া দলের। মজিদের মৃতদেহের সংকারণ

হবে তাই নেতৃত্বে ।

সঙ্কের পর খবর আসে মালেক মারা গেছে । পুরুরের পাড়ে দাঁড়ানো সেক্ট্রি পাকাবিহীনেকে এগিয়ে আসতে দেখতে পেয়েই মালেককে ঘূম থেকে জাগায় । কিন্তু মালেক প্রথমে তা বিস্মিত করে না । উড়িয়ে দিতে চায় ব্যাপারটা অসম্ভব বলে । কিন্তু তখনি ধার্মধার শব্দ তুলে শেল পড়তে থাকে হাইড আউটের চারদিকে । মালেক ব্যাপারটা বুঝবার জন্য বাইরে বেরিয়ে আসে এবং তার চোখের সামনে ভূতের মতো একদল পাকসেনাকে উদয় হতে দেখে সে । কী করবে বুঝতে না পেরে দৌড়ে আসে ভেতরে । তাড়াতাড়ি তার দুইঝিং মর্টারটা নিয়ে পুরুরের দিকে দুটো শেলবর্ফণ করে । তখন পাকসেনাদের অগ্রবর্তী দল বাড়ির অভিন্নায় ছুকে পড়েছে । কর্কশ গলায় তিঙ্কার করতে থাকে তারা, কিধার হ্যায় মালেক, কিধার হ্যায় গোলাপ? শালে মুক্তি কা বাচ্চা, বাহার আও শালে বা... । মালেক দাপাদাপিরত পাকসেনাদের সামনে থেকে দ্রুত সরে যায় মাবের ঘরটার পেছন দিয়ে বাঁশতলার কাছে । কিন্তু তখন আর সময় নেই । পাকসেনারা সমস্ত এলাকা ধিরে ফেলেছে । গোলাগুলির ফোয়ারা ছুটিয়ে চলেছে । একদল সৈনিককে বাঁশতলার দিকে ধাবিত হতে দেখে কোন্দিকে যাবে দিশে করতে না পেরে সে লাফিয়ে পড়ে মাটির কাঁচা কুয়োটার ভেতরে । কুয়োর পানিতে হাবুজুর থেকে থেতে তার দেয়াল ধরে মাথা ঝঁঁচিয়ে ভেসে থাকে । পাকসেনারা বাড়ির পুরোপুরি দখল কৰিয়ে তখন মন্ত্র দাপাদাপি আর দোড়বাপ করে বেড়াচ্ছে । মালেক ঘাপটি মেরে কুয়োর ভেতরে ভেসে থাকে তাদের চোখের সম্পূর্ণ অগোচরে । পাকবাহিনী তাদের লুটপাট আর ঘোলোবাকুদের দখল নেয়ার কাজ করতে থাকে । ঠিক আগুন লাগার মৃহূর্তে কে একজন নেচুল ওপর থেকে নিচে পানির দিকে তাকিয়ে তিঙ্কার করে ওঠে, ইখের হ্যায় এক শালে মুক্তি । কয়েকজন দৌড়ে আসে কুয়োর পাড়ে । তাকায় নিচের দিকে একজন বাংলায় বলে, এই তো মালেক কমান্ডার । ব্যাস, এতেই কাজ হয়ে যায় । মালেক দুখন কুয়োর ভেতরের ছেষ পরিসরে ডুবে-ভেসে নিজেকে লুকোবার আগ্রাম চেষ্টা করতে থাকে । ওপর থেকে দুটিনটা হাতিয়ার তাকে টার্গেট করে গর্জে ওঠে । মালেকের মাথার চাঁদি দিয়ে গুলি ভেদ করে ভেতরে চলে যায় । সাথে সাথে মারা যায় সে । কুয়োর পানি তার শরীরের রক্তে লাল হয়ে যায় । আর এসব দেখে হষ্টিচ্ছে একজন খান বলে ওঠে, শালে মর গিয়া ।

বাঁচবার জন্য মালেক কোনো উপায়ন্তর না দেখে বাঁপ দিয়েছিলো মোটামুটি গভীর সেই কুয়োর ভেতরেই । ভেবেছিলো খানেরা তাকে দেখতে পাবে না । কিন্তু শেষ মৃহূর্তে সে তাদের নজরে পড়ে যায় । ওপর থেকে চমৎকার টার্গেট হয়ে যায় পাকসেনাদের । তারপর তার প্রাণহীন দেহ ভেসে থাকে কুয়োর পানিতে মুখ নিচু করা অবস্থায় । বিকেলের দিকে তার মৃতদেহ আবিষ্কৃত হয় । সোকজন তার শরীরে দাঢ়ি বেঁধে টেনে তোলে ওপরে ।

কুমিল্লা জেলার এক সাহসী মানুষ এবং নিবেদিতপ্রাণ একজন মুক্তিযোদ্ধা নিষ্পত্ন দেহ নিয়ে পড়ে থাকে তার নিজের বাড়িঘর আর পরিবার-পরিজন থেকে বহুদূরে, জমাদারপাড়া গ্রামের বাঁশতলায় মাটি আর ঘাসের ওপর । কোম্পানি কমান্ডার মালেক এভাবে হারিয়ে যায় আমাদের ভেতর থেকে । আজই তার দেবীগঞ্জ থানা আক্রমণের কথা ছিলো । এজন্য সাকোয়া এলাকা রেকি করে এসেছিলাম আমরা তাকে কভার দেব বলে । সেটা আর হয়ে উঠলো না ।

৫.১০. ৭৫

এবার নিজ ঝাঁটি আক্রমণ

সাদা টিনের খালায় সাজানো ডালডায় ভাজা আটার পুরি। সকালবেলায় ভাজা। এখন ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। সেই পুরির সাথে কিছু চিনি। আর সাদা টিনের মধ্যে গরম ধূমায়িত চা। প্রচণ্ড স্ফুর্ধা নিয়ে হাত-মুখ পরিষ্কার না করেই মমতাজের পরিবেশিত নাস্তা নিয়ে বসে যাই ঝাঁটির ওপরেই। ঘরের ভেতরকার মেঝের ওপর নয়াদিঘি বাজারের সেই দোকান ভেঙে আনা সিগারেটের প্যাকেটের স্তুপ, দিয়াশলাইয়ের প্যাকেট, নানা ধরনের জিনিসপত্র আর শুচরো পয়সার টাল। আহিদার অত্যন্ত ব্যস্ত সেগুলোর বিলিবটন ব্যবস্থা নিয়ে। ফ্রেনেড নানা সিগারেটের এই পাহাড় দেখে ধৈ ধৈ করে রীতিমতো নাচ শুরু করে দিয়েছেন। বৃষ্টির পানিতে কিছু কিছু বিড়ি, সিগারেট আর ম্যাচের বাকসো ভিজে চুপসে গেছে। মাথায় দেয়ার তেল, সাবান আর কসমেটিক ধরনের কিছু জিনিসপত্রও রয়েছে। আটা-ময়দা আর চিনির একটা অংশ পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে মন্দুদের আস্তানায়। এক বস্তা চালও দেয়া হয়েছে। আহিদার এখন মহাসমস্যায় পড়েছে বিড়ি-সিগারেট আর ম্যাচ বাকসের এই পাহাড় নিয়ে সে কী করবে, এই ভেবে। শুচরো পয়সা অর্থাৎ আধুলি, সিকি আর পাঁচ-দশ পয়সার এই পাহাড় নিয়েই-বা কী করবে? রীতিমতো হিমশিম খাবার যোগাড় আহিদারের। ওর চেহারা আর ভাবভঙ্গি দেখে এই এখন মনে হচ্ছে, জীবনে বুঝি এতোবড়ো সমস্যার ভেতরে সে কথনে পড়ে নি।

নয়াদিঘি বাজার থেকে নিয়ে আসা সমন্ত জিনিসপত্রের বিতরণ ব্যবস্থার ভাব দিয়েছি আহিদারের ওপর। গ্রামের জোতদার ঘরের ছেলে আহিদার। মাতৰারি ফলানো আর মানুষজনকে ধরকধামক দেয়ার ব্যাপার ওর তাই ব্লকেগেলে মজ্জাগত। সামন্ত প্রথার তরুণ প্রতিভা যেনো সে। শাসন-শোষণ করে আর এজা ঠেকিয়ে জোতদারি চালিয়েছে তার পূর্বসূরিয়া। হয়তো এখনো তারা সে ধারা কঞ্চাই রেখেছে। জমিদারি উচ্চেদ হওয়ার পর জমির ওপর একচেটিয়া মালিকানা তারা হয়ে যাচ্ছে। দেশে এখন জমিদারি নেই; কিন্তু জোতদার আছে। গ্রামের বর্ধিষ্ঠ ধনী পরিবহনের লো, যাদের জায়গাজিয়ি রয়েছে প্রচুর, তারা এখন জোতদার নামেই পরিচিত। এখন আর প্রজা নেই; কিন্তু জমি আধিয়ার আর বর্গাদারদের তারা এখনো প্রজা হিসেবেই দেখে থাকে। এ এলাকায় তাই আধিয়ার প্রজা কথাটা বহুল প্রচলিত। আমাদের গ্রামীণ সমাজ ব্যবস্থা থেকে এই প্রথা উঠে যাবে না হয়তো কোনোদিনই। তো, আমাদের সেই আহিদার, জোতদারের ছেলে এখন বিড়ি-সিগারেটের স্তুপ আর শুচরো পয়সা-কড়ি পাহাড় নিয়ে হিমশিম থাচ্ছে। দখল করে আনা অন্য আর সব মালপত্রের অর্থেক পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে পেয়াদাপাড়ায়। নয়াদিঘির সফল অপারেশনে পেয়াদাপাড়া ইউনিটের একটি দল মতিয়ারের নেতৃত্বে অংশ নিয়েছিলো, তাই এইসব মালপত্রের কিছুটা দাবিদার তারাও।

নাস্তার থালাটা হাতে নিয়ে এক টুকরো পুরি কেবল মুখে দিয়েছি, এমন সময় করতোয়া নদীর ওপার থেকে চিত্কার আর শোরগোল ভেসে আসে। দৌড়ে আসে হাসান মাঝি হস্তদণ্ড হয়ে। হাঁপাতে হাঁপাতে সে বলে, খানেরা আসছে এদিকে।

— তার মানে? কোনু দিকে আসছে?

— এই দিকে, হামার গ্রামের দিক।

হাত থেকে মুহূর্তে খাবার থালা নামিয়ে রাখি। আজ আর নাস্তা খাওয়ার ব্যাপারটা কপালে নেই। পাকবাহিনী এবার আসছে ডান দিক থেকে। অর্থাৎ তারা আজ যৌথ অভিযানে নেমেছে

মুক্তিযোদ্ধাদের নির্মল করার লক্ষ্য নিয়ে। এজন্য তারা নিজেদের মধ্যে পরিকল্পনার সমর্থন করে একদল আসছে সৈয়দপুর-ভোমার-চিলাহাটি হয়ে জমাদারপাড়ায় মালেকের দলকে, অন্য দলটি আসছে ঠাকুরগাঁও-বোদা-নয়াদিঘি হয়ে আমাদের বেস আক্রমণ করে দখল করার উদ্দেশ্য নিয়ে। মনটা বিষয়ে উঠে। করতোয়া পাড়ের হাসান মাঝির বাড়িতে হাইড আউট গতে তোলার পর থেকেই শক্রবাহিনীর সাথে যুক্তে জড়িয়ে পড়তে হয়েছে। আবৃ প্রতিদিনই চলছে এই একই ব্যাপার। এখানে আসার পর থেকে সুষ্ঠির শান্তি পাওয়া গেলো না এক মুহূর্তের জন্যও। পাকবাহিনীর সকলবেলাকার অতর্কিত আক্রমণে ঘোড়ামারা নদীর ওপাশেকার এলাকায় মালেকের দল পুরোপুরি নিচিক হয়ে গেছে। এখন একই লক্ষ্য নিয়ে তারা আসছে আমাদের হাইড আউটের উদ্দেশ্যে। কিন্তু কী করে হতে দেয়া যায় সেটা? স্থির প্রতিজ্ঞা নিয়ে উঠে দাঁড়াই।

সেই ভোর থেকে স্টেলানটা কাঁধেই ঝুঁচে। নামিয়ে রাখার অবকাশ পাওয়া যায় নি। চাঁদ মিয়া অতিরিক্ত ম্যাগজিন আর গুলিভর্তি শক্ত কাগজের তৈরি প্যাকেট জামার পকেটে ছুকিয়ে দেয় দুটো ফ্রেনেসহ। একরামুল আর জমাদারপাড়ায় যাওয়া আমার সহগামী দলেরও আর নান্তা থাওয়া হয় না।

যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব ছেলেরা তৈরি হয়ে নেয়। তারপর সবাইকে নিয়ে দৌড়ে চলি নদীর দিকে। আহিদার হাইড আউটসহ লিজাদের নিরাপদ্বার দায়িত্বে থাকে আগের মতোই। তাকে বলি, অবস্থা বেগতিক দেখলে সে যেহেতু হাইড আউটের মালপত্রসহ লিজাদের সবাইকে নিয়ে নিরাপদ দূরত্বে সরে যায়। এই সাথে পেয়াদাপাড়ায় একজন রানার পাঠাতে বলি তাকে। সেখানে থেকে দ্রুত একটা দুর্দল যেনো আমাদের সহযোগিতা করার জন্য রিইনফোর্সমেন্ট হিসেবে বন্দিউজ্জামান প্রস্তুত করে দেয়।

একটু পরে হাসান মাঝি নদী পার করে প্রস্তুত আমাদের। নদীর পাড়ে সমবেত উত্তেজিত আর ভীতসন্ত্বষ্ট মানুষের দল। মাঠ দেখে উৎসুক্ষাসে নদীর দিকে ছুটে আসা হামতাঙ্গ মানুষের ঢল। এরি মধ্যে থেকে পাকবাহিনীর আসতে দেখেছে এমন একজন লোকের কাছ থেকে জানা যায় যে, শক্রপক্ষের অভিজ্ঞের দলটা অনেক বড়ো। নয়াদিঘি রাস্তা দিয়ে এসে ওরা মারেয়া গ্রামে দক্ষিণের একটা বাস্তিতে কিছুক্ষণ অবস্থান করে। তারপর সেখান থেকে সোজা রাস্তাটা ধরে এখন তারা এগছে। মারেয়া গ্রামের দক্ষিণ দিক থেকে একেবারে সোজা এ রাস্তাটা নদীর ঘাট পর্যন্ত চলে এসছে। লোকটার কথা থেকেই বোঝা যায়, সেনাদের দলটা মারেয়া গ্রামকে পাশ কাটিয়ে সরাসরি আসছে আমাদের হাইড আউটের ওপর আক্রমিক হামলা চালিয়ে সেটা দখল করে নেবার জন্য। হাসানকে তার ফেরি নৌকো ওপারে নিয়ে নিয়ে ভুবিয়ে রাখতে বলি। সামনের ধূ-ধূ মাটির বিস্তার। শক্ত মাটির বুকে পায়ে খোঁচা লাগার মতো ধারালো সবুজ ঘাস। তাই মাড়িয়ে আসছে ভীতসন্ত্বষ্ট মানুষজন তাদের পরিবার-পরিজনসহ। যেনো সাক্ষাৎ মৃত্যুদৃত ধেয়ে আসছে তাদের পেছনে পেছনে তাড়া করতে করতে। না, আর কালবিলুষ নয়। শক্রের আগমন পথ লক্ষ্য করে দৌড় শুরু করি গ্রামপথে সঙ্গীদের নিয়ে। প্রত্যেকের হাতে ধরা হত্তিয়ার লোড করা। যেনো প্রয়োজনে মুহূর্তের ভেতরে শুরু করে দেয়া যায় যুদ্ধ। শক্রকে গ্রাম এলাকার ভেতরেই আটকাতে হবে। একবার তারা গ্রাম পেরিয়ে এই আমাদের সীমানা চৌহদ্দির ভেতরে এসে পড়লে তাদের আটকানো কঠিন হয়ে পড়বে। তাই আমরা ছুটছি যতো দ্রুত সম্ভব। ওরা আসছে আমাদের দিকে থেয়ে, আর আমরা ওদের দিকে। কোথায়, কোন্ত জায়গায় সাক্ষাৎ হবে তাদের সাথে, কে জানে?

শক্রের দেখা মেলে অবশ্যে। প্রায় সোয়া মাইল সামনে রাস্তাটার ওপর। ছাড়া ছাড়াভাবে এগুচ্ছে ওরা রাস্তার পাশের বাড়িগুলোর কাছ ঘেঁষে। তাদের সংখ্যা বুঝবার উপায় নেই। তবে হেলমেট মাথায় আর ইউনিফর্ম ইত্যাদি পরে পাকসেনাদের দলটি রীতিমতো রঞ্জসাজেই এগিয়ে আসছে। গ্রামের মাঝামাঝি গাছগাছালি দেরা রাস্তাটার বাঁয়ে চূড়া খেতের ভেতরে একটা বাড়ির পেছনেই আমাদের অবস্থান। সুবিধেমতো একটা জায়গায় এল.এম.জি. বসিয়ে একবারুল আর শঙ্কুদের ডানে-বাঁয়ে রেখে বেশ জায়গা নিয়ে আমাদের প্রতিরক্ষা লাইন। মোটামুটি সুবিধেজনক অবস্থান শক্রকে আঘাত হানবার পক্ষে। শক্র আমাদের সামনে। তবে ওদের আর এগিয়ে আসতে দেয়া যায় না। ওদের সরাসরি আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলি। একটা শক্রমতো জায়গায় মর্টার বসিয়ে শক্র মোটামুটি দুর্ভুত বুঝে এ্যাসেল ঠিক করে পরপর দুটো শেল বর্ষণ করি। কালো ঘোঁয়া তুলে বিক্ষেপিত হয় সেগুলো রাস্তার পার্শ্ববর্তী সেই বাড়িগুলোর আশপাশে। এরপর আরো দুটো শেল পাঠাই একই এ্যাসেলে। বিক্ষেপিত হয় সেগুলো তেমনিভাবে। মর্টারের বোমার বিক্ষেপণ হঠাতে করে সচকিত করে তোলে এলাকাটা। ভোজবাজির মতো মিলিয়ে যায় রাস্তার ওপর থেকে এগিয়ে আসা শক্র সেনার দল। কিনুকশ চুপচাপ থাকে ওরা। ওদের গুলিবর্ষণ শুরু না হলে আমাদের কেউ শুলি শুরু করবে না এই ছিলো সব সঙ্গীর প্রতি আমার নির্দেশ। সেই অনুযায়ী সামনের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত রেখে শক্রের গতিপৃক্তি দেখতে থাকে সবাই। অবশ্য প্রত্যেকেই ব-ব-ব্যক্তিগত হওয়ার পক্ষে এবং শক্রের প্রতি হাতের হাতিয়ারগুলো তাক করে রেখেই। শক্রপক্ষ শুধু বাড়িঘরের পেছন দিকে গিয়ে নিজেদের অবস্থান নেয়। ফলে আরো দুটো মর্টার শেল ছুড়ে দিই তাদের লক্ষ্য করে। সে দুটো বিক্ষেপিত হওয়ার সাথে সাথে সজিয় হয়ে গুলি তীব্রবাহিনী। অনেকগুলো স্বয়ংক্রিয় অন্তর্গত গুলি প্রচলিত একসাথে। একবারুলকে চিত্কার করে শুধু গুলিবর্ষণ শুরু করতে। নির্দেশ পেতেই সে তার অবস্থানে থেকেই সঙ্গীদের নিয়ে এক সাথে গুলিবর্ষণ শুরু করে। আমার ঠিক সামনে এল.এম.জি. নিয়ে মধ্যের অবস্থান প্রচলিত পরে কাজে লাগাবো বলে সিদ্ধান্ত নিই। চুপচাপ শুয়ে থাকতে বলি ওকে। মর্টারের গোলাঙ্গাই চাঁদ মিয়া এবন আমার পাশে থেকে মর্টারহ্যান টু হিসেবে কাজ করছে। ওকে বাঁদিকে সামান্য দূরের অবস্থানে থাকা শঙ্কুসহ অন্য ছেলেদের এবার গুলিবর্ষণ শুরু করার নির্দেশ দিয়ে পাঠাই। চাঁদ মিয়া দৌড়ে গিয়ে সেই নির্দেশ তাদের পৌছে দিয়ে ফিরে আসে স্বাস্থানে দ্রুত। নির্দেশ পাওয়ামাত্র শঙ্কুদের দিক থেকে গুলিবর্ষণ শুরু হয় তাদের সবগুলো হাতিয়ার থেকে। মোটামুটি অর্ধচন্দ্রাকৃতির অবস্থান আমাদের। মাঝামাঝি এল.এম.জি. রেখে অন্যান্য হাতিয়ার দিয়ে ছেলেদের ফাঁকা ফাঁকাভাবে পজিশনে রাখা হয়েছে। এল.এম.জি.র পেছনে আমি মর্টারসহ, পাশে বিস্তৃত রাতদিনের সহচর চাঁদ মিয়া। মোট ২০ অনকে নিয়ে দল গড়তে হয়েছে। বাদবাকি ছেলেরা রয়েছে হাইড আউটের নিরাপত্তা রক্ষায়।

উভয় পক্ষের মধ্যে এখন চলছে শুলিবিনিয়ম। তাদের স্বয়ংক্রিয় অন্তর্গত আর ফায়ার পাওয়ার অনেক বেশি। আমাদের দলের কাছে অর্ধেক .৩০৩ রাইফেল আর অর্ধেক এস.এল.আর। তারি অন্তর্গত মধ্যে একটা এল.এম.জি.আর, ২ ইঞ্জি মর্টার। তাদের শুলি আসে বাঁকে বাঁকে। মাঝার বেশ ওপর দিয়ে সেগুলো উঠে যায় সেই পরিচিত শিশ বাজাতে বাজাতে। আমাদের রাইফেলের শুলি যায় ঠাস্টুস শব্দে, এস.এল.আর.-এর শুলি যায় সিসেল রাউন্ডে একটার পর একটা। ওদের মর্টার থেকে গোলা ছুটে এসে পেছনে বেশ কিছুটা দূরে দূরে বিক্ষেপিত হতে থাকে। সেই সাথে ওরা ওদের আক্রমণের তীব্রতা বাড়িয়ে দিয়ে রাস্তার আড়াল নিয়ে এগুচ্ছে

থাকে। মধুসূনকে তখন এল.এম.জি. চালু করতে বলি। চাঁদ মিয়াকে বলি মর্টারের খোলে বোমা ঢুকিয়ে দিতে। মধুর এল.এম.জি.ও চালু হয় আমার মর্টার ছেঁড়ার সাথে সাথে। এখন এই মুহূর্তে আমাদের পুরো দল সক্রিয়। আগুণ্যান শক্রবাহিনীও মরিয়া হয়ে ওঠে। একটা পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধ বলতে যা বোঝায়, তাই তরু হয়ে যায় উভয় পক্ষের মধ্যে। শক্র এগিয়ে আসতেই থাকে। তাদের অ্যাভিযান প্রতিহত করার প্রয়োজন থেকে দ্রুত জায়গা বদল করে সবাইকে এগিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিই। ‘ওফেনসিভ’ অর্থাৎ আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে এগিয়ে না গেলে ওদের প্রতিহত করা যাবে না, এটা বেশ বুঝতে পারি। তাই এই রকমের নির্দেশ। আর সে অন্যায়ী ছেলেরা প্রায় তিরিশ-চাহিশ গজ এগিয়ে গিয়ে আবার নিজেদের অবস্থানে চলে যায় শক্রের প্রতি সমস্ত শক্তি দিয়ে আক্রমণ চালাতে চালাতে। চাঁদ মিয়ার হাত থেকে রাইফেলটা নিয়ে মধুর পাশে অবস্থান নিই এবং আমি নিজেও শরিক হই গুলিবর্ষণে। আর সেই সাথে মধুকে নির্দেশ দিতে থাকি তার এল.এম.জি.র টার্গেট ঠিক রাখার ব্যাপারে।

যুদ্ধ চলতে থাকে। এর ভেতরেই এক পর্যায়ে শক্রপক্ষের অ্যাহাতা থেমে যায়। তারা আবার বাড়ির পেছনাদিকার অবস্থানে ফিরে গিয়ে প্রতিআক্রমণ করতে থাকে। যুদ্ধের তীব্রতা কখনো বাড়ে, কখনো কমে। দুপুর গড়িয়ে বিকেল হতে থাকে। ভৌতিক শব্দ তুলে তুলে গুলিবর্ষণ চলতে থাকে থেমে থেমে।

শবেবরাতের বরাত

আজ শবেবরাতের দিন। আজ দেশে থাকলে মেলের অবস্থা ব্রাভাবিক থাকলে কতো রকমের খাওয়াদাওয়ার আয়োজন হতো। আর সেই পবিত্র শান্তির শবেবরাতের দিনটিতে কি না কোথায় কোনু অজানা এক পাড়াগায়ের লোকদলের আশপাশে, ঘোপঘাড় আর খেতবাড়ির মধ্যে পড়ে আছি। যুদ্ধ করছি। শক্রের অভিযান ঠেকিয়ে রেখেছি সমানে প্রাণপণ শক্তি দিয়ে। মনের গভীরে লুকিয়ে রাখা দুর্ধৃতিষ্ঠিটা হঠাৎ করেই মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে একটা দীর্ঘশ্বাসের সাথে, আজ শবেবরাতের দিন কোথায় পড়ে আছি! সারাদিন না খাওয়া। বাড়িতে থাকলে কতো ধরনের খাবার জুটিতো। যে লোকটির বাড়ির পেছনে দয়ে আছি বলতে গেলে সে আমার একেবারে কাছাকাছি প্রায় গা ঘেঁষেই হাঁটু মুড়ে বসে ছিলো। এগিয়ে আসে সে শরীর বাঁকিয়ে গভীর দুঃখের সাথে উকারিত আমার কথাগুলো শনে। বিনীত ভঙ্গিতে সে বলে, আইজ শবেবরাতের দিন। হামারাও কুটি-পিঠা কিছু করিহিবার পাই নাই গে। যা যুদ্ধ চলেছে, তুমরা সারাদিন কিছু খাহেন নাই, কহেন দি কতো কষ্ট তুমারলাই। যদি কহেন, মুই দেখিবা পারো কিছু আনিবা পারো কি নাই। মানুষটার গলায় ভালোবাসা হেশানো গভীর আক্ষেপের সূর। রাইফেলের ট্রিগার দাবাতে দাবাতে বলি, পারবেন কি কিছু আনতো? দেখেন না চেষ্টা করে। হামাগড়ি দিয়ে পিছিয়ে যায় মাৰ বয়সী মানুষটা। প্রায় আধ ঘণ্টা পর একটা গামছা ভর্তি করে সে চাল ভাজা নিয়ে আসে। সাথে লবণ আৰ কাঁচা মরিচ।

যুদ্ধ চলছে এখনো। সেই অবস্থাতেই তিন চার মুষ্টি চাল ভাজা আমার পকেটে ঢুকিয়ে নিই। চাঁদ মিয়াকে লোকটার সাথে দিই, যাতে করে প্রত্যেকের অবস্থানে গিয়ে চাল ভাজাগুলো বিতরণ করতে পারে। দুচার মুষ্টি করে চাল ভাজা প্রত্যেকের ভাগে পড়লেও, এই মুহূর্তে সেটাই হবে অমৃত সমান দ্রব্য সবার কাছে।

বিকেল চারটার মতো তখন বেলা। রাইফেলের ট্রিগার টিপি আৰ চিবিয়ে চলি চাল

ভাজা। সারাদিনের ভেতরে এই প্রথম পেটে দানা পড়ে। শক্রপক্ষ তাদের অবস্থানে আগের মতোই। তবে এখন তাদের আক্রমণের ধার আগের মতো তেমন জোরালো নয়।

ঠিক এই সময় ডানদিকে বেশ কিছুটা দূরে হঠাতে করে গোলাগুলি শুরু হয়ে যায়। পেয়াদাপাড়ার দল এই এতোক্ষণে তাহলে এসে পৌছলো! একব্রাউলকে এবার ডানদিকে শিয়ে রাস্তার সোজাসুজি অবস্থান নিতে বলি। মধুসূন্দনের এল.এম.জি. দলকে তুলে নিয়ে আমিও রাস্তার ধারে চলে আসি। এবার শুরু হয়ে যায় রাস্তা বরাবর মুখোমুখি সংবর্ষ। পেয়াদাপাড়ার দল এগিয়ে আসতে থাকে।

দ্রুত বিকেল ফুরিয়ে আসছে। আর এই রকম অবস্থায় শক্রপক্ষ আমাদের আক্রমণের মুখে পিছু হটতে শুরু করেছে। শুলিবর্ষণ এবং পিছিয়ে যাওয়ার মীতি অবলম্বন করেই তারা রণে ভঙ্গ দিয়ে পালাচ্ছে, সেটা বোৰা যায়। তাই আমরা আক্রমণের তীব্রতা বাড়িয়ে দিয়ে এগতে থাকি সামনে। বিকেলের পড়ন্ত আলোয় পৌছে যাই শক্র অবস্থানে সেই বাড়িগুলোর কাছে। কিন্তু শক্র নেই। সরে গেছে। তাদের গোলাগুলিও থেমে গেছে। এখন তারা গ্রাগপণে পালাচ্ছে নয়াদিঘির উদ্দেশ্যে। আমরা বাড়িঘরগুলোর পেছনদিককার বাঁশতলার পাশ দিয়ে একটা ছেটো আকারের পুরুরের পাড় থেমে পৌছে যাই নয়াদিঘির রাস্তার মোড়ে। শক্র তখন আমাদের দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে গেছে। সেখানে অবস্থান নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে পশ্চাদপসরণরত শক্রদের লক্ষ্য করে তুমুল শুলিবর্ষণ করে চলি আমরা।

সন্ধ্যা দ্রুত ঘনিয়ে আসছে। নয়াদিঘির রাস্তা ধরে কিছুটা এগিয়ে শিয়ে আবার ফিরে আসি আমাদের পুরনো অবস্থানের কাছাকাছি। অস্তরা সেখানে পৌছুতেই একজন ফর্সা চেহারার তরুণের নেতৃত্বে দশ-বারোজনের ফর্সা দল 'জয় বাংলা' প্লোগান দিতে দিতে এগিয়ে আসে। তারা সামনে এলে চিন্তিত শারি সেই ফর্সা রঙের তরুণ ছেলেটিকে। নাগেশ্বরী কলেজের ফার্স্ট ইয়ারে পড়ুন ত্রিকুবের দলের সেই টগবগে তরুণ আর সাহসী ছেলেটা আমাদের সাহায্য করার জন্য একটা দল নিয়ে পেয়াদাপাড়া থেকে ছুটে এসেছে। ছেলেটির নাম শহীদুল ইসলাম ফর্সা। ভালো লাগে তাকে দেখে। তার কাঁধে হাত রেখে বলি, তোমরা এসেছো দেখে ওরা পালিয়ে গেছে। কিছুটা অগ্রসূত আর লাজুক ধরনের হাসি নিয়ে সে বলে, যুদ্ধ করলেন তো আপনারা, আমাদের আসতে দেরি হয়ে গেছে। ঠিক আছে চলো। খানের দল ভেগেছে। এবার ফেরা যাক বলি তাকে।

দলের সবাইকে নিয়ে ফিরছি। কাকড়াকা ভোর থেকে আজ যে যুদ্ধের শুরু হয়েছিলো, তা শেষ হলো এই এতোক্ষণে। সারাটা দিন কেটে গেছে শুধু যুদ্ধে যুদ্ধে।

রাত হয়ে এসেছে। আকাশে চাঁদের আলো। রাস্তার শেষ মাথায় বাড়িটার কাছে আসতেই বাড়ির মালিক এসে সামনে দাঁড়ান। বলেন, আজ শবেবরাতের দিন। আমি কিছু খাবার ব্যবস্থা করেছিলাম। আপনারা সারাদিন যুদ্ধ করলেন, খাওয়া হয় নাই কিছু। হামারলার সাথে তুমরা কিছু খায়ে যান।

লোকটার বলার ভঙ্গিতে আন্তরিকতা এতো বেশি যে, তাকে না করতে পারি না। হেসে বলি, কী খাওয়াবেন?

— চারটা ডাইল ভাত।

— দেখেন আমাদের খাওয়ালে আপনার কিন্তু বিপদ হতে পারে, যদি ওরা জানতে পারে।

— হইলে হবে, বাড়ির মালিকের সাফ সাফ জবাব। আল্লার ইচ্ছা, আসেন তুমরালা।

বাড়ির বাইরের চতুরে খড় বিছিয়ে জায়গা করা হয়েছে। সেখানে বসে যাই। কলাগাছের পাতা সবার সামনে। গরম ভাপ-ওষ্ঠা মোটা চালের ভাত। বলেছিলেন বটে ডাল-ভাত খাওয়াবেন কিন্তু পাতে তুলে দিলেন খাসির মাসসহযোগে রান্না করা লাউয়ের ষষ্ঠ। তীব্র ক্ষুধার মুখে খাদ্যের এই আয়োজনটাকে পৃথিবীর সব থেকে সুস্থানু খাবার বলে মনে হয়। তাই গোঘাসে খায় সবাই। একেই বুঝি বলে বরাত। আজ শবেবরাতের দিনে এখানে, এই গৃহস্থের বাড়িতেই আমরা রাতের খাবার খাবো, গত বছরের শবেবরাতে সম্ভবত এমনটাই লেখা হয়েছিলো। আজকের শবেবরাতের দিনে আগামী বছরের জন্য বরাতে কী লেখা হবে কে জানে?

৫. ১০. ৭১

এবার কোথায় যাবো আমরা

গতকালকের সারাদিনের মুক্তে গোলাগুলি খরচ হয়েছে প্রচুর। মজুদ মিলিয়ে দেখা যায় এখন হাতে রয়েছে .৩০৩ রাইফেলের গুলি ৪২৫টি, ৭.৬২ এস.এল.আর. ও এল.এম.জি.র গুলি ১০০ এবং ৯ এম.এম. অর্থাৎ টেনগানের গুলি ২৬৫ রাউণ্ড। মর্টারের শেলও প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। প্রেনেড যা রয়েছে, তাতে করে জনপ্রতি ১টা করে ব্যবহারের জন্যও দেয়া যাবে না। সার্বিক্ষণিক মুক্তে জড়িত একটা ইউনিটের জন্য বর্তমানের এই মজুদ আশঙ্কাজনকভাবে কম। মারেয়ায় এসে দিনরাত যেভাবে শক্ত মুখোয়া মুক্ত মুক্তে জড়িয়ে পড়তে হচ্ছে, তাতে করে গোলাগুলির এই মজুদ নিয়ে ঢিকে থাকা সুজাই মুশকিল। চাউলহাটি ইউনিট বেস থেকে গোলাগুলির একটা বড়ো ধরনের সরবরাহ প্রাবার জন্য ক্যাপ্টেন নন্দার উদ্দেশে একটা চাহিদাপ্ত তৈরি করি। সেই সাথে একটা ম্যাসেজও তৈরি করি এই বলে, 'সেভ ইমিডিয়েট সাপ্লাই অব এ্যাম্বেশন্স। উচ্চ অন্তর শার্ট ফল অব রাউণ্ডস। আদারওয়াইজ উই মে সাফার ব্যাডলি'।

গোলাবারিদের চাহিদাপ্ত এবং ম্যাসেজটা মালেককে দিয়ে পাঠিয়ে দিই মানিকগঞ্জ বি.ও.পি.তে। বি.ও.পি. কমান্ডারসেটা তাদের ওয়্যারলেস সেটের মাধ্যমে পাঠিয়ে দেবেন চাউলহাটিতে। আগামীকাল রিপোর্টিংয়ের তারিখ। নন্দা ম্যাসেজটা পেলে অবশ্যই গোলাগুলির সরবরাহ নিয়ে আসবেন। আজকের দিনটা যে করেই হোক চালিয়ে নিতে হবে খরচ না হওয়া মজুদ অন্তর্প্রস্তর দিয়েই।

মন্তু নেই। তিনি মানিকগঞ্জ গেছেন তাঁর পলিটিক্সের কাজে। ফলে লিজা আবার শক্তি হয়ে উঠেছে তাদের নিরাপত্তা নিয়ে। ডানে-বাঁয়ে এখন প্রতিদিনই মুক্ত। বলতে গেলে পুরোপুরি ধৰ্মসই হয়ে গেছে আমাদের বাঁ-দিককার অবস্থানে থাকা মালেকের কোম্পানি। নতুন করে আর সংগঠিত হতে পারে নি তারা আগের শক্তি নিয়ে। নদীর ওপারে প্রথম যে বেস, সেখানে এখন তারা অক্ষয় নিয়েছে। জমাদারপাড়া ভাওয়ালগঞ্জের দিকে তাদের কোনো প্রতিরোধ ব্যবস্থা নেই। অর্থাৎ পুরোপুরি উন্মুক্ত এখন বাঁদিকটা। শক্ত ইচ্ছে করলে জমাদারপাড়া হয়ে অতর্কিতে এসে হামলে পড়তে পারে আমাদের হাইড আউটে। ডানদিকে মারেয়া-নয়াদিঘি এলাকা দিয়ে শক্ত নিয়মিত আসছে। করতোয়া পাড়ের আমাদের এই হাইড আউট এখন তাদের আক্রমণের প্রধান লক্ষ্যস্থল। তারা মালেকের দলকে নির্ভূল করতে পারলেও আমাদের দলটিকে এখনো পারে নি। এ যাবৎ বেশ কটা মুক্তে আমাদের হাতে তাদের ক্ষতি হয়েছে অনেক। নয়াদিঘিতে পাকবাহিনীর ঘাঁটি স্পর্শ বিধ্বন্ত হয়ে সেখানে উড়ছে এখন 'জয় বাহ্লা'র

পতাকা। তাদের ঘনিষ্ঠ মিট্রো হয় মারা পড়েছে, নয়তো এলাকা ছেড়ে গা-চকা দিয়েছে। কিছুতেই তারা কুলিয়ে উঠতে পারছে না করতোয়া পাড়ের এ দলটির সাথে। সুতরাং তারা মরিয়া হয়ে উঠতে আমাদের এই দলটিকে নির্মূল করার জন্য। আমাদেরকে এখন থেকে সরাতে পারলেই বোদা, নয়াদিঘি, সাকোয়া আর শালভাঙ্গার বিস্তীর্ণ এলাকা তাদের জন্য আবার নির্বাধ চলাফেরার, অবাধ লুটপাটের আর নির্বিচার নির্যাতনের ক্ষেত্র হয়ে উঠবে। তখন তারা ইচ্ছেমতো কুমুরী মেয়ে কিংবা মৃত্যু বধুদের তাদের ডেরায় বা বাঙ্কারে তুলে নিয়ে গিয়ে ভোগ করার অবাধ স্বাধীনতা পাবে। কিন্তু আমরা এখানে আমাদের অস্তিত্ব নিয়ে থাকায় বোদা থানায় তাদের যে ঘাঁটি, সেখান থেকে বেরুলেই আমাদের আক্রমণের শিকার হচ্ছে, ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে। ফলে প্রায় প্রতিদিনের যুদ্ধে মার খেয়ে খেয়ে ফিরে যেতে হচ্ছে তাদের। এবার হয়তো আমরা ওদের মূল ঘাঁটি বোদা আক্রমণ করবো, এরকম কোনো সংজ্ঞানা সম্ভবত তাদের মনে ভীতির সঞ্চার করে থাকবে। তাই করতোয়াপড়ের আমাদের এই জোরদার দলটাকে তারা নিশ্চিহ্ন করবার চেষ্টা করছে। তারই অংশ হিসেবে তাদের গতকালকের চেষ্টাও বার্ষ হয়েছে। জনি, আবার তারা আসবে। এবার হয়তো তারা আরো ব্যাপক প্রস্তুতি নিয়ে কমবিং অপারেশনে নামবে আমাদের বিরুদ্ধে। গেরিলা যৌদ্ধাদের বিরুদ্ধে নিয়মিত বাহিনীর যুদ্ধের ভাষা সে কথাইতো বলে।

তাই ব্রাভাবিক কারণে, আমরাও নিজেদের স্ট্র্যাটেজি প্রক্টিকার সিদ্ধান্ত নিই। করতোয়া পাড়ের হাসান মাঝির বাড়ির এই হাইড আউট ছেড়ে দেয়া বলে ঠিক করি। এখানে অনেক হয়েছে। আর নয়। এবার আরো কোনো সুবিধেজনক নিরাপদ জায়গায় আশ্রয় নেবো। কিন্তু লিজাদের নিয়ে সমস্যা দেখা দেয়। মন্ট নেই। জাতিরা এখান থেকে সরলে ওদেরও নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নিতে হবে। আর সেই অসমিদেরকেই নিতে হবে। আমাদের অনুপস্থিতিতে ওদের এখানে অবস্থান করার ব্যাপারটা এক মুহূর্তের জন্যও নিরাপদ নয়। আহিনীদের সঙ্গে পরামর্শ করে ওদের জন্য নিরুৎসুক জায়গা বের করতে দু'জনকে রওনা করিয়ে দিই সকালবেলাতেই। নিরাপত্তাহীনচট্টার শক্তার ভাব আবার লিজাদের মনে প্রভাব ফেলে। সেই পুরাতন প্রশ্ন আবার উন্তে হয়, এবার কোথায় যাবো আমরা?

যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার ব্যাপারটা কখনোই ভালো নয়, কিন্তু বাংলাদেশে এখন যে ধরনের যুদ্ধ চলছে, তাতে জড়িয়ে না পড়ে থাকবার উপায় নেই। আমরা জনগণের মধ্যে থেকে যুদ্ধ করছি। ক্ষতিহস্ত মানুষজনের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হলে, তাদের সাথে জড়িয়ে পড়তেই হয়। অসহায়, নিঃসংশ্ল আর ছিন্মূল পরিবারদের তো আর হায়েনার পালের মুখের সামনে ঠেলে দিয়ে নিরাপদ দূরত্বে সরে যাওয়া যায় না। প্রেনেড নানার এক কথা, তারা শরণার্থী হবেন না। শরণার্থী শিবিরে যাবেন না অর্থাৎ ভারতের মাটিতে পা রাখবেন না। লিজাও অন্য মহিলাদের প্রতিনিধির ভূমিকা নিয়ে একই মতামত দিয়েছে। তাদের এই বলে সাম্রাজ্য দেয়া হয় যে, তারা এবার একটা মোটামুটি নিশ্চিদ্বন্দ্ব নিরাপদ আস্তানাতেই থাকবেন। সে ব্যবস্থাই করা হচ্ছে। ভারতের শরণার্থী শিবিরের মানবেতের জীবন আশ্রয়ে তাদের পাঠানো হবে না। তবে যথাসম্বন্ধে দ্রুত তৈরি হয়ে নিতে হবে সবাইকে। গুছিয়ে রাখতে হবে সবকিছু যে-কোনো সময় তাদের এখান থেকে সরে পড়তে হতে পারে। আমরা এখানে আর থাকছি না। আপনারাও থাকবেন না। ব্যাস্ এটাই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত।

দিনভর শক্তির অপেক্ষা

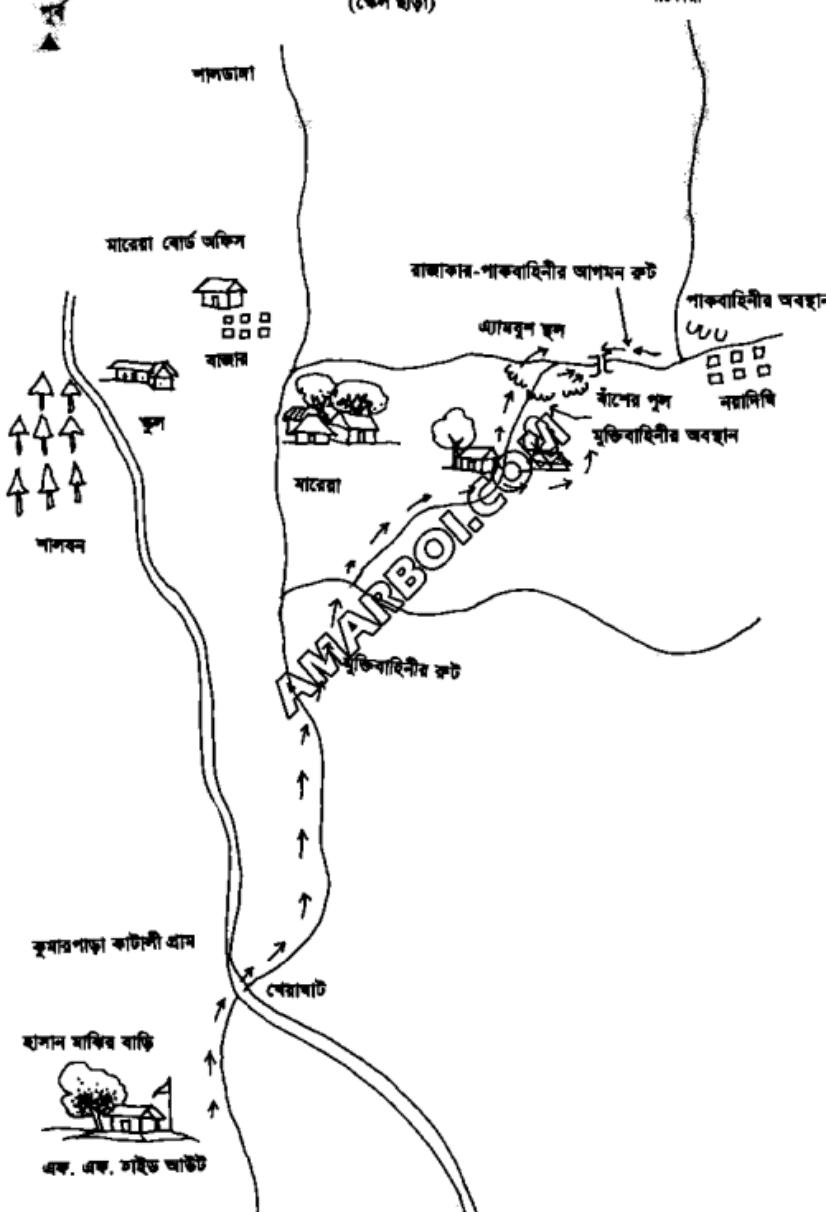
পাকবাহিনীর মুভমেন্টের খবর আসে সকালের দিকে। বোদার দিক থেকে সাইকেল হাঁকিয়ে একজন খবর নিয়ে আসে, রাজাকারসহ পাকসেনাদের একটা বড় দল নয়াদিঘির দিকে আসছে। তবে দলটার মতিগতি বোঝা যাচ্ছে না। শেষ পর্যন্ত আমার আশঙ্কা-অনুমানই সঠিক বলে প্রমাণিত হয়। গতকাল তারা এলেও মারেয়া পার হতে পারে নি। আজ হয়তো চূড়ান্তভাবে সে চেষ্টাই তারা নেবে। সুতরাং আবার রণসাজে সাজতে হয়। লিজাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে এবং গোছাছ করে তাদের নিরাপদে পিছিয়ে যাবার দায়িত্ব আহিদারকে বুঝিয়ে দিয়ে হাজির হই করতোয়া পাড়ে।

নদীর পানি হঠাতে করেই বেড়ে গেছে। খরস্ত্রোতা উত্তাল চেউসহ পাহাড় থেকে নেমে আসা চল বয়ে যাচ্ছে উত্তর থেকে দক্ষিণে। হাসান তার খেয়া নৌকোয় করে পার করে দেয় আমাদের সবাইকে। সে জেনে ফেলেছে, আমরা সহসাই চলে যাবো তার বাড়ির আন্তর্বন্ধন ছেড়ে। আর সে কারণে খুবই বিমর্শ হয়ে আছে সেই সকাল থেকেই। এখন ওকে কিছু বলে লাভ নেই। লিজাদের মতো হাসানকেও তো নিয়ে যেতে হবে, তাকে একলা ছেড়ে যাওয়া যাবে না। সেটা পরে ভাবা যাবে। এখন সামনে শক্তি, প্রথমে তাকে মোকাবেলা করার ব্যবস্থা করা দরকার। সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে, আজ শক্তিকে আ্যামবুশ করা হবে সুবিধেজনক অবস্থান থেকে। আর সেই লক্ষ্য থেকেই ছুটে চলি সমস্ত দল নিয়ে অভিযুক্ত মাঠের ওপর দিয়ে।

গতকালকের যুদ্ধ-এলাকা পার হয়ে আরো প্রায় মাঝেন্দানেক এগিয়ে যাই। সামনে পড়ে একটা খালের মতো জায়গায় প্রায় পঁচিশ-তিরিশ ফুট লম্বা একটা বাঁশের পাটাতন্ত্যুক্ত সাঁকো। ভিস্টো তার বেশ মজবুত। সাঁকোটা এমন যে ক্ষেত্রে প্রেরণে দিয়ে ছেটোখাটো আকারের মোটর গাড়ি সহজেই পার হতে পারবে। নয়াদিঘি স্থানকে আগত মারেয়ামুখী জেলা বোর্ডের এই মূল সড়কটা ধরেই পাকসেনারা বোদ থেকে আসবে। তো, বাঁশের তৈরি এই সাঁকোটাকে কেন্দ্র করেই আমরা আ্যামবুশ নেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলি। ‘কমবিং অপারেশন’ শুরু করলে পাকবাহিনী অবশ্যই যানবাহন রেজিম করবে এবং তাদের এই বাঁশের সাঁকো পার হতেই হবে। আর সেই যানবাহনের সাপোর্ট নিয়ে তাদের পদাতিক বাহিনী আসবে পায়ে হেঁটে হেঁটে। বাঁশের এই সাঁকো পার হবার সময় তারা যাতে গোড়াতেই বাধাইত্ব হয়ে ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হয়, এজন্য সাঁকোর দু'পাশে মাইন পাতার সিদ্ধান্ত নিই। ছেলেদের সামনে-পেছনে পজিশনে রেখে মাইনের ফাঁদ পাতার কাজ শুরু হয়ে যায়। সাঁকোর সামনের দিকে দুটো অ্যান্টি ট্যাঙ্ক মাইন, দু'পাশে ১২টি অ্যান্টি পারসোনাল মাইন পাতা হয়। সেই সাথে সেগুলোর সূচারূপভাবে ক্যামোফ্লেজেরও ব্যবস্থা করা হয়। আর ওইভাবে খুব দ্রুত চমৎকার একটা মাইন ফিল্ড তৈরি হয়ে যায়। এরপর প্রায় দু'শ গজ পিছিয়ে এসে কয়েকটা ছাড়া ছাড়া বাড়িঘরের আড়ালে আ্যামবুশের জন্য অবস্থান নেয়া হয়। আমাদের এখান থেকে সাঁকোটা প্রায় তিরিশ-চল্লিশ ডিম্বি কৌণিক অবস্থানে। পরিকল্পনাটা এভাবে দাঁড় করানো হয় যে, পাকসেনাদের যানবাহন যাই আসুক না কেনো, তা বাঁশের ওই সাঁকোটা পার হবার চেষ্টা করলেই প্রথম পাটাতন্ত্রে নিচে পেতে রাখা অ্যান্টি ট্যাঙ্ক মাইনের আঘাতে উড়ে যাবে নিঃসন্দেহে। আর পাকবাহিনী যদি তাদের গাড়ি সাঁকো পার করাতে না চায়, তাহলে তারা নিজেরাই সাঁকোটা পার হয়ে সামনে এগুবে; তার জন্য সাঁকোর দু'পাশে পাতা রয়েছে অ্যান্টি পারসোনাল মাইন বা এপি-১৪-র ফাঁদ। আর তখনি তারা সেই ফাঁদে পড়তে বাধ্য।

ক্ষেত ম্যাপ-১
মারেয়া-নদীদিঘি রাজার এ্যামবুশ
৫-৩০-৭৩
(কেল ছাতা)

সাকেশা



আমাদের আজকের দলের সদস্যসংখ্যা পঁচিশ। উৎসাহী আট-দশজন মুরকও রয়েছে সাথে। যাই হোক, ছেলেদের ছাড়িয়ে দিয়ে অবস্থান নেয়া হয়। সবার লক্ষ্য সাঁকোর দিকে। প্রত্যেকের হাতে উদ্বৃত্ত হাতিয়ার। সতর্ক প্রস্তুত অবস্থা সবার। নির্দেশ দেয়া আছে, সিগনাল না পাওয়া পর্যন্ত কেউ শুলি ছাঁড়া শুরু করবে না। সিগনাল দেবার দায়িত্ব মধুসূনের। তার এল.এম.জি.র ব্রাশফায়ার হবে আমাদের জন্য সেই সঙ্গে। জানি, শক্র আক্রান্ত হলে অবশ্যই মরিয়া হয়ে উঠবে। দিনের আলোয় রাস্তার পাশ বেয়ে খালের পানি পার হয়ে ফসলের খেত দিয়ে এগুবার চেষ্টা করবে। সেক্ষেত্রে কোনো অবস্থাতেই পিছু হটা যাবে না। ছাড়া যাবে না অবস্থান। মোট কথা শক্র অঘাগমন ঠেকাতে হবে যেভাবেই হোক 'ডু অর ডাই' ইংরেজি এই শপথ বাক্য অনুসরণ করে।

বেলা এপ্রোটার মতো বেজে যায় সবকিছু ঠিকঠাক করে আঘামুশের অবস্থানস্থলে যেতে। এ রাস্তাটা এক সময় অত্যন্ত ব্যস্ত ছিলো যানবাহনের চলাচল এবং মানুষজনের পদচারণায়। তখন দিনকাল ছিলো ভালো। যুদ্ধ শুরু হয় নি। যুদ্ধ শুরু হওয়ার পরও তাদের চলাচল ছিলো, তবে খুবই সীমিত সংখ্যায়। আমরা মারেয়ায় যুদ্ধ শুরু করার পর এবং শক্রবাহিনী প্রায় প্রতিদিন এ রাস্তায় চলাচলের কারণে মানুষজনের চলাচল প্রায় বন্ধই হয়ে গেছে বলা চলে। নেহায়েত জরুরি প্রয়োজন ছাড়া এ রাস্তায় এখন আর কেউ পা রাখে না। তেমনি হয়তো জরুরি প্রয়োজন নিয়ে প্রথমে একজন, তারপর আরো দু'জনকে সামনের দিক্কে থেকে এসে সাঁকোটা পার হয়ে হনহনিয়ে হেঁটে যেতে দেখা যায়। ওরা সাঁকোটার কাছাকাছি আসতেই মনে হচ্ছিলো, এই বুঝি মাইনের ওপর পা দিয়ে উড়ে যাচ্ছে তারা। কিন্তু বুঝে ভেতর একটা প্রবল শক্ষাময় চিবড়িবে তাৰ নিয়ে তাদের পরিপতি দেখবার জন্য তাকিয়ে থাকি। কিন্তু না, লোকগুলো যেনো তাদের নেহায়েত কপাল গুগেই দিব্যি মাইন ফিল্ড থাক হয়ে যায়। আর আমরা হাঁফ হেঁড়ে বেঁচে যাই। প্রায় ঘন্টাখানেক পর দেখা যায়, একটা গাড়িটাকে আসছে হেলেন্দুল। সর্ববাণি! গাড়িটা সাঁকোর ওপর উঠলেই, আর কথা নেই, সিঁড়িটো উড়ে যাবে তার আরোহীসহ মুহূর্তেই। শুটার গতিরোধ করা দরকার এখনি। ধীরমন্ত্র চার্টেল গাড়িটা প্রায় সাঁকোটার কাছাকাছি এখন। একরামুলকে তাই দৌড়াতে বলি, গাড়িটা থামিয়ে বিপরীত দিকে ফিরিয়ে দেবার নির্দেশ দিয়ে। দু'জন সঙ্গী নিয়ে ছুটে যায় একরামুল পানি-কানা আর খাল ইত্যাদি ভিত্তিয়ে। ঘটনাস্থলে পৌছেই তারা গাড়িটাকে থামায়। একরামুলদের বাধার মুখে ব্যাটা যে সাঁকোটা পেরুবার ব্যাপারে শো ধরেছে, এখন থেকেই সেটা স্পষ্ট বোৰা যায়। ফলে, গাড়োয়ানকে গাড়ি থেকে নামিয়ে তারা তাকে আচ্ছ করে উত্তমমধ্যম নিতে শুরু করে। তারপর নিজেরাই ধৰাধৰি করে গাড়িটার গতি উল্টো মুখে ঘূরিয়ে দিয়ে ওরা ফিরে আসে নিজেদের অবস্থানে।

আবার অপেক্ষা। দু'পুর গড়িয়ে গেছে তখন। আজো বুঝি কপালে খাবারদাবার নেই। এই সময়, ভাগ্য ভালো বলতে হবে, সহযোগী মানুষজন কোথা থেকে যেনো কিছু মুড়ি আর বিচিকলা নিয়ে আসে। ছেলেদের ভেতরে তাই বেটে দেয়া হয়। বেলা তিনটা-সাড়ে তিনটার দিকে দূর থেকে আট দশজনের একটা দলকে এগিয়ে আসতে দেখা যায়। বোৰা যায় না, ওরা কারা? ছেলেদের সতর্ক হতে বলি। অনেকক্ষণ ধরে অবস্থানে একঠাই বসে থাকতে থাকতে প্রত্যেকের মধ্যে একটা যিম ধৰা ভাব এসে গেছে। সবাই এবার চাঙা হয়ে ওঠে। আট-দশজনের দলটা দৃষ্টিসীমার ভেতরে আসতেই স্পষ্ট হয়, শুটা আসলে একটা রাজাকারের দল। অঘাগামী দল হিসেবে পেছনে থাকা পাকবাহিনী সম্ভবত তাদের রেকি প্রেটলে পাঠিয়েছে।

দলটা আসে, আমরা তাদের আসতে দিই। কেউ শুলি ছেঁড়ে না। ধীরে ধীরে তারা স্বাক্ষরটার কাছে আসে। তারপর নিশ্চিত মনে স্বাক্ষরটা পার হতে থাকে। তখনো সংযত, সংহত আমরা। হাত নিশ্চিপ করে, কিন্তু শুলি ছুঁড়ি না। চৃঞ্চাপ পড়ে থাকি সবাই, বলতে গেলে নিষ্কাস প্রায় বক্ষ করে। রাজাকারদের সব সদস্যই তখন স্বাক্ষরটা পেরিয়ে এগারে এসেছে। আর ঠিক তখনি সেই প্রত্যাশিত ঘটনাটা ঘটে। হঠাৎ করেই দেখি পেছন দিকের একজন রাজাকার সদস্য শূন্যে লাফ দিয়ে উঠলো প্রচণ্ড একটা বিক্ষেরণের শব্দের সঙ্গে সঙ্গে। মাইনের ওপর পা পড়েছিলো তার। আর তাতেই তার এই পরিণতি। এ ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে শুলিবর্ধণ শুরু করার নির্দেশ দিই ছেলেদের। গর্জে ওঠে আড়ালে থাকা ছেলেদের হাতে সবগুলো হাতিয়ার। পাল্টা একটা শুলিপ ছেঁড়ার অবকাশ পায় না রাজাকার বাহিনী। রাস্তার ওপাশের খেতবাড়ি আর জঙ্গল দিয়ে দৌড়তে থাকে উর্ধ্বরক্ষাস। একনাগাড়ে প্রায় বিশ মিনিট শুলি চালিয়ে থামতে বলি সবাইকে। গোলাগুলি থেমে যায়। নীরব নিষ্কর্ষ হয়ে যায় সমস্ত চরাচর। আরো কিছুক্ষণ নিজেদের অবস্থানে অপেক্ষা করি। না, কোনো অভিযোগ নেই ওদের তরফ থেকে। ভেঙেছে ওরা। এবার অবস্থান থেকে উঠে সবাইকে এগিয়ে যেতে বলি শুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে। আমিও যাই একইভাবে। স্বাক্ষরটার কাছে পৌছে দেখা যায়, রাস্তার ওপর পড়ে আছে একজন রাজাকার। নিচল নিখর তার দেহ। ডান পাখানা উড়ে গেছে, সমস্ত শরীরও ঝলসে গেছে তার। বিকৃত হয়ে গেছে মুখ। চেনা যায় না। তার বাইফেলটা একপাশে পড়ে আছে। তুলে নিই সেটা।

বিকেল হয়ে এসেছে। আজ আর পাকসেনাদলের প্রাদিকে আসবার সত্ত্ববনা নেই। যাদের জন্য অ্যান্টি ট্যাঙ্ক মাইনসহ এপি-১৪ মাছিপাতা হয়েছিলো, তারা এলো না। লাভের মধ্যে লাভ, আর একজন রাজাকারকে বন্দুক করা গেলো। একবারুল আর শুলুকে মাইনগুলো তুলে নিতে বলি সাবধানে। ক্ষেত্রে না ওগুলো ওভাবে পাতা থাকলে নিরীহ গ্রামবাসী, রাস্তায় চলাচলকারী পরিদ্রব ক্ষেত্রে যানবাহন ইত্যাদির নিশ্চিত ক্ষতি হবার সত্ত্ববনা। কাজ শেষ করতে করছে বিকেল গড়িয়ে আসে। ফিরবার সময় নয়াদিঘির দিক থেকে আসা একজনের কাছ থেকে জানা যায়, পাকবাহিনীর একটা দল নয়াদিঘিতে পাকা অবস্থান নিয়েছে। বাক্সার-ট্রেক্স এসব তৈরি করছে। আবার তাহলে ওরা নয়াদিঘি এলো। তার মানে সামনে অপেক্ষা করছে নয়াদিঘি দখলের আরেকটা লড়াই। দেখা যাক।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে। ফিরে চলি আমরা করতোয়া পাড়ের দিকে।

৬. ১০. ৭১

গগো নদী

হাসান মাঝি পাশে বসা। ঘন ঘন সে তার দাঢ়ির জঙ্গলে আঞ্জুলের চিরনি চালিয়ে চলেছে। বিষণ্ণ বদন। নিদারূপ এক বিমর্শতার ছাপ তার চোখে-মুখে। আমরা দু'জন বসে আছি করতোয়ার পাড়ে। ঘাসে ছাওয়া ঢালু খেয়া ঘাটে। দিনমান কেটেছে টেনশনে। অ্যামবুশ আর মাইন ট্যাপ দিয়ে বাঁশের স্বাক্ষর মাথায় রাজাকারের দলকে ঠেকানো আর মাইনের আঘাতে নিহত রাজাকারটার শরীরের অর্ধেকাংশ উড়ে যাওয়া বিকৃত ক্ষত-বিক্ষত দৃশ্য ভেসে ওঠে চোখের সামনে বারবার। খুবই ক্লান্ত লাগে, শরীর ভেঙে পড়তে চায় শ্বাসিতে। তাই এক সময় ঘাসের বুকে শরীর এলিয়ে দিয়ে বয়ে চলা নদীর ছন্দিত ঢেউ দেখি। উদাম গতিতে পাহাড় থেকে নেমে আসা ঘোলা পানির স্বোত বুকে বয়ে নদীটা ছুটে চলেছে উত্তর

থেকে দক্ষিণ দিকে। আকাশে উচ্চাসিত চাঁদ। চাঁদের সেই আলো প্রতিফলিত হয়ে নদীর পানি আর ওপারের বালুর চর চিকচিক করে। সেই সাথে ঝিরবিরে বাতাসে একটা মন সঙ্গীব করা আমেজ। চারিদিকে শান্ত সমাহিত অপরূপ পরিবেশ। দেশজুড়ে যে একটা ভয়াবহ যুক্ত চলছে, এই রকম পরিবেশে সে কথা বিনুমাত্র বোধহয় না।

ঠিক এই সময় খসখস শব্দ তুলে রাস্তা ধরে একজনকে আসতে দেখা যায়। প্রথমে চেনা যায় না আগস্টুক ব্যক্তিটিকে। এগিয়ে এসে হাইড আউটোর সামনে দাঢ়ানো ছেলেদের সে জিগ্যেস করে, মাহবুব ভাই কোথায়? তার গলার হরে চিনতে পারি, দুরু। নালাগঞ্জের দুরু এসেছে। বিচিত্র বোধ করি ওর এই আকর্ষিক আবির্ভাবে। যুদ্ধের মাঠে লড়াই করতে করতে একটা নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠেছে দুরুর সাথে। সেই নালাগঞ্জ থেকে এতোদূর পর্যন্ত এসেছে কষ্ট করে। কিন্তু কেনো? কেনো বিপদ-আপদ বাধিয়ে বসে নি তো? ওর উপস্থিতি মনের ভেতর একটা শুশির কারণ সৃষ্টি করার পাশাপাশি, এই রকম শঙ্কাতূর প্রশ্নেরও ডালপালা মেলে ধরে। তাই ওকে দ্রুত কাছে ডাকি, এই যে আমি এখানে, চলে আসেন বলে।

দৌড়ে আসে দুরু। উষ্ণ আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরে বলতে থাকে, আপনি বেঁচে আছেন মাহবুব ভাই! গলায় তার প্রবল উচ্ছ্঵াস আর আন্তরিকতার সূর। জিগ্যেস করি, কেনো কী হয়েছে?

— আমরা শুনেছি আপনি মারা গেছেন। খবরটা ওদিকে ছড়িয়ে পড়েছে ব্যাপকভাবে।

— না, মরি নাই। এইতো বেঁচে আছি। বসেন।

দুরুকে বসতে বলি আমাদের মতো ঘাসের ওপরেই থামে পড়ে দুরু। নিজের আবেগ আর উচ্ছ্বাস সামাল দিতে কিছুটা সময় লাগে তাই তারপর বলে, খবরটা শুনেই ছুটে এসেছি। বিশ্বাস হতে চায় নি। বুঝতে পার্নি আলেকের মৃত্যু-সংবাদ সবসময়ই অবিশ্বাস্য। খবরটার যথার্থতা যাচাই না করা পর্যন্ত কেউ তা বিশ্বাস করতে চায় না। আর সে রকম একটা সংবাদ পেয়েই দুরু ছুটে এসেছে আমার খোজে। এসে দেখে আমি বেঁচে আছি, মরি নি। আর আমার এই বেঁচে থাকিব্যাপারটা তাকে অপার আনন্দিত, সেই সাথে গভীরভাবে আবেগাপুত্র করে তোলে। মানুষের প্রতি মানুষের এই যে ভালোবাসার টান, এই যে আপনজনের ভালোবাস আর বেঁচে থাকার জন্য একজনের প্রতি অন্যজনের মনের নিবিড় আকৃতি, এই তো মানবধর্মের শাশ্বত রূপ। যুদ্ধের মাঠে, জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে দুরুর মতো একজন মানুষের সাথে গড়ে ওঠা নিবিড় বন্ধন, সেটা কোনোদিন নষ্ট হবার নয়।

প্রাথমিক আবেগ-উচ্ছ্বাসের প্রাবল্য কেটে যাবার পর সৃষ্টি হয় ভিন্নতরো এক পরিবেশের। দুরু বিবরণ দিয়ে চলে নালাগঞ্জ-ভেতরগড়-অমরখানা আর হাড়িভাসা এলাকার বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে। দুরুর দেয়া বিবরণ থেকেই জানা যায়, গনি তাই প্রায়ই আসেন সেখানে। গড়সের করব বাঁধানোর কাজ শেষ। স্থানীয়ভাবে মিলাদ ও দোয়া দরুলদ পড়ানো হয়েছে। শহীদ গড়সের আজ্ঞার শাস্তির জন্য।

খবর পেয়ে একরামুল চা-নাস্তা পাঠিয়েছে নদীর ঘাটেই দুরুর জন্য।

দুরু অস্কুটে বলতে থাকে, একটা অস্ত্র অবস্থা! কী যে করি মাহবুব ভাই।

চায়ের মগ হাতে নিয়ে উচ্চল বয়ে চলা নদীর দিকে তাকিয়ে বলি, সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে দুরু। আপনি কিছু ভাববেন না। সংসার দেখেন, পরিবারের সবার দিকে নজর রাখেন। পিন্টুর সাথে যোগাযোগ রাখেন। যে যুদ্ধে আমরা জড়িয়ে পড়েছি, এর থেকে ফিরবার আর

উপায় নেই।

দুলুকে সামনা দিছি যখন, ঠিক তখনি পেছন থেকে তারি পায়ের শব্দ ভেসে আসে। মুখ তুলেই দেখি পিন্টু। মনের গভীরে হঠাত করেই বেজে ওঠে ছন্দোময় একটা ছলছল ঝরনার গান; কিন্তু একটা প্রশ্ন এই সঙ্গে জেগে ওঠে, হঠাত করেই পিন্টুও কেনো এখানে এভাবেও ওকে দেখে উঠে দাঁড়াতেই জড়িয়ে ধরে সে। বুকের সমস্ত উষ্ণতা ঢেলে ওর বুকের সঙ্গে শক্ত করে ধরে রাখে অনেকক্ষণ। কেমন করে যেনো বলে, বেঁচে আছেন মাহবুব ভাই! কী যে পাগলের মতো ছুটে এসেছি খবরটা পেয়ে। কথাগুলো শেষ করেই ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদে পিন্টু বাক্ষা ছেলের মতো। পিন্টু এভাবে আসবে সত্যিই ভাবতে পারি নি।

মালেকের মৃত্যুর খবরটা তাহলে আমার মৃত্যুর খবর হয়ে প্রচারিত হয়েছে চারদিকে! যে কারণে পিন্টু তার ইউনিট ছেড়ে, যুদ্ধের মাঠ ছেড়ে ছুটে এসেছে এখানে। আমার তত্ত্ব-তালাশে। পিন্টুর সাথে আমি যুদ্ধের প্রথম দিন থেকেই আছি। একই শহরে দুঃজনের বসবাস। যুদ্ধের মাঠে ওর সাথে আমার আপন ভাইয়ের মতো আঘাতাতার সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। দুঃজনের এক আজ্ঞা সম্পর্ক। কেনো জানি ওর প্রতি আমার একটা অক্ষ মেছ, ভালোবাসা আর আস্থা। তেমনি ওর দিক থেকেও আমার প্রতি রয়েছে ওর অঞ্জতুল্য নির্ভেজাল শক্তি আর বিশ্বাস। আমি ছায়া হলে পিন্টু তার কায়া। এমন একটা ধারণা আর কথাবার্তা চালু রয়েছে মানুষজনের মধ্যে, এমনকি আমাদের শক্তিশালীর লোকজন্মভূততরেও এটা প্রচারিত।

যা হোক, যুদ্ধে আমার নিহত হবার খবর তাকে রেফার শাগলের মতো এখানতক ছুটিয়ে নিয়ে এসেছে, তেমনি আমার সাক্ষাৎ জীবনময় দিবসাষ্টও তাকে অপার খুশি করে তোলে। আমাকে উষ্ণ আলিঙ্গনে জড়ানো অবস্থাতেই প্রস্তাব করে আমার কাঁধের পাশ দিয়ে দৃষ্টি মেলে দিয়ে অদূরে পেছনে বসা দুলুকে আলিঙ্গন করে সে কিছু বিশ্বয়সূচক স্বরেই যেনো বলে ওঠে, দুলু এখানে কেনোঁ!

— তুমি যে জন্য এসেছো। তাত্ত্ব শক্ত আলিঙ্গন থেকে নিজেকে মুক্ত করতে করতে কথাটা বলি।

— আরে আমি তো ওকে গুরু-বৌজা খুঁজছি। তা তিনি লাপাতা!

— কী হয়েছে? এলিথিং রং

— না, এমন কিছু নয়। স্থানীয় একটা সমস্যা সমাধানের জন্য হন্তে হয়ে খুঁজছি তাকে।

— এইতো পেয়ে গেছো তাকে এখন। এসো বসা যাক। একসাথে হেঁটে এসে বসি সেই পুরনো জায়গাটায়। ঢালু খেয়াগারের সেই ঘাসের গালিচার ওপর। পিন্টুকে দেখে দুলু বলে ওঠে,

— মাহবুব ভাইয়ের খবরটা পেয়ে এখানে এসেছি।

— ঠিক আছে, বসেন। একসাথে তো আসতে পারতাম। নরোম গলায় পিন্টু বলে।

ছেলেরা ছুটে আসে পিন্টুর আসার খবর পেয়ে। পুরনো সহকর্মী সবাই। টেনিং নেয়ার পর থেকে বহ অপারেশনের সহযোগ্য। চাউলহাটি ইউনিট বেসের তিন নম্বর ব্যক্তি সে। পিন্টুকে পেয়ে তাই সবাই আনন্দে মেতে ওঠে। কোলাকুলি-জড়াজড়ি করে সবাই তাকে আন্তরিকভাবে স্বাগত জানায়। দৌড়াবাপ করে খাবারদাবার নিয়ে আসে। একটা চমৎকার আনন্দঘন পরিবেশের সৃষ্টি হয় অঞ্জক্ষণের ভেতরেই। আর এই সুযোগে পিন্টুকে বলি, একটা গান ধরো। অনেকদিন তোমার গান শুনি না।

পিন্টু তার উদার গভীর গলায় গান ধরে, ওগো নদী আপন বেগে পাগল পারা...।

আকাশে উদ্ভাসিত চাঁদ। বাকঝাকে, জ্যোৎস্নার আলোর সামনে স্নোতবিনী নদীর উদ্দাম ধারা, চকচকে বালির রাশি, বাতাসে ভালোলাগার, ভালোবাসার আমেজ। আর পিটুর দিলখোলা গান এসবই গোটা পরিপূর্ণকে মনোহর করে তোলে। দুলুও গলা মেলায় পিটুর সাথে। তাদের সুললিত গলায় গানের খনি ভেসে বেড়ায় আমাদের চারাদিকে। এই এখন সবকিছু ভালো লাগে। মনে হয়, এইভো জীবন। সামনে প্রচণ্ড যুদ্ধ। তার ভেতরে শুধু মৃত্যুর হ্যাতছানি নয়, জীবনেরও ছন্দ আছে।

আহিদার বিকেলে লিজাদের নিয়ে তুলেছে সীমান্ত এলাকার কাছাকাছি ভোলাবাবু নামের আমাদের আগের থেকে পরিচিত সন্ধিন্দয় একজন লোকের বাড়িতে। দেখতে দেখতে একবারুলের গোছগাছ করার কাজ শেষ হয়। এরই এক ফাঁকে রাতের আহারপূর্ব শেষ হয়েছে।

একসময় করতোয়া পাড়ের মধ্যরাতের আসর ভঙ্গে। আমরা ছেড়ে যাই হাসান মাঝির বাড়িকে ঘিরে গড়ে তোলা আমাদের ক'দিনকার অস্থায়ী আস্তানা। কিন্তু হাসান নিজে থেকে যায়। তার মনে হয়েছে, একা হয়ে গেলেও তার এখানে থাকা দরকার। এদিকে পাকসেনারা এলে দ্রুত সে তার খবর পৌছুতে পারবে আমাদের নতুন আস্তানায় পিয়ে। কিন্তু চাল-ডাল, দুটো গরু এবং আমাদের দখল করা বেশকিছু জিনিসপত্র তাকে দেয়া হয়। দেয়া হয় কিছু টাকা আর খুরো পয়সার বাস্তিলটা থেকে বেশ কিছু পয়সা।

হাসান মাঝি তার ছেলেসহ থেকে যায় করতোয়া পাড়ে প্রস্তুত তার বাড়ির প্রহরায়। আর আমরা এগিয়ে চলি স্কিল্প গন্তব্য অভিযুক্তে। রাস্তার পথে পরিত্যক্ত ভাঙ্গচোরা ই.পি.আর. ক্যাম্পের একটা ছাদ খোলা টিনের ঘরে ঠাসাঠাসি করে রাত কাটানোর সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

কোথায় যেনো গোলাওলি চলছে। হয়তো শক্র শেষ রাতের আক্রমণ আমাদেরই কোনো লক্ষ্যবস্তুর ওপর। কিন্তু এখন আমি সেটা আমাদের মনকে স্পর্শ করে না। জাগিয়ে তোলে না কোনো টেনশন। শক্র নিষ্পত্তি থেকে অনেক দূরে এখন আমাদের অবস্থান। তারা আমাদের ছেড়ে আসা করতোয়া পাড়ের সেই হাইড আউট আক্রমণ করতে এলেও ওখানে শুধু বাড়িঘরের ভিটেটুকু ছড়া আর কোনো কিছু দেখতে পাবে না।

৬. ১০. ৭১

মানিকগঞ্জ বিওপির নাটক

মানিকগঞ্জ বিওপিতে চমৎকার একটা নাটক মঞ্চস্থ হয়। বি.ও.পির ভেতরের চতুরে মাটিতে বসে সেটাই দেখতে থাকি চুপচাপ। তিনটা দল তাদের ক'দিনের অপারেশনাল তৎপরতার রিপোর্ট করতে এসেছে মানিকগঞ্জ বিওপিতে। যারা রিপোর্ট করতে এসেছে, তারা আলাদা আলাদাভাবে পাশাপাশি বসেছে। চাউলহাটি ইউনিট বেসের দুটো দল অর্থাৎ আহিদার ও বাদিউজ্জামানের দল একপাশে এবং আমার নিজের দল আরেকে পাশে। আমাদের ডানে বসেছে হেমকুমারী ইউনিট বেসের নিহত মালেকের ছত্রভঙ্গ দল গোলাপ-আকবরের নেতৃত্বে। আমাদের সামনে টেবিল-চেয়ার পাতা। তাতে পাশাপাশি বসেছেন মেজের সিং আর ক্যান্টেন নন্দা। মেজের সিং জাতে শিখ। উঁচা-লঘা, দোহারা গড়ন তার। লালমুখো আর রঞ্জবৰ্ণ চোখ। ভীষণ রাগি রাগি চেহারা। কালো চাপদাঢ়ি। সেই দাঢ়ি সূক্ষ্ম জাল দিয়ে অঁটসাট করে যেরা। মাথার চুলে ঝুঁটি। এই ভদ্রলোক আমাদের টেনিং-এর সময় মুরতি ক্যাম্পের ডেলটা অর্ধেৎ ভাসানী উইং-এর অফিসার ইনচার্জ ছিলেন। দেখামাত্রই তাকে

চিনতে পারি। অত্যন্ত বদরাগি মেজাজের ছিলেন বলে তিনি সময় ট্রেনিং সেটারে ‘জীবন্ত ত্রাস’ হিসেবেই পরিচিতি পেয়েছিলেন। ছেলেদের শাস্তি দেবার ব্যাপারে তাঁর ছিলো নানা ধরনের উদ্ভাবনী কৌশল। আমরা দূর থেকে প্রায়ই ট্রেনিং প্রাইভেটে বা ব্যারাকের সামনে ভাসানী উইং-এর ছেলেদের বিচিত্র সব ভঙ্গিতে শাস্তি পেতে দেখতাম। পার্যতপক্ষে অন্যান্য উইং-এর ছেলেরা তার সামনে পড়তে চাইতো না। সব সময়ই এড়িয়ে চলতাম আমরা এই বদরাগি নিষ্ঠুর স্বভাবী অফিসারটিকে। তিনিই যে বর্তমানে হেমকুমারী এফ.এফ ইউনিট বেসের অফিসার ইনচার্জ, সেটা আমাদের আগে থেকে জানা ছিলো না।

মেজর সিং রাগে গড়গড় করছেন। চিড়িয়াখানার খাচায় আবন্ধ রাগি রয়েল বেঙ্গল টাইগারের মতো লাগছে তাঁকে। এখন, এই মুহূর্তে, একনাগাড়ে গালাগালের তৃবৰ্ডি ছুটিয়ে চলেছেন তিনি তার অধীনস্থ ইউনিটের ছত্রভঙ্গ হয়ে যাওয়া দলের ছেলেদের উদ্দেশ্যে। পাশাপাশি আমাদেরও করছেন তুলোধূনো। রাগে ধৰথৰ করে কাপতে কাপতে তিনি বলে চলেছেন, ‘শালে বাস্টার্ড, কেয়া কিয়া তুম্হেনে এবাউট ত্রি হানড্রেড স্ট্রেংথ থা তুমহারা। আউর তুম লোগ কুছ কারণে নেহি সাকা? শালে লোগ নিদ যাতা থা? পাক আর্মিজ কেম ইজিলি। দে টেক ইয়োর পজিশন উইথআউট এনি রেজিস্টেস, ইয়ে ক্যায়সে হো সাক্তা? দে ক্যাপচারড অল অব ইয়োর আর্মস অ্যান্ড আয়ুনেশনস্, কিন্তু ইয়োর কোশ্পানি কমান্ডার আউর ওয়ান সেকশন কমান্ডার, বারন্ট টু এ্যাসেস ইয়ের প্রেইন হাইড আউট। হাউ ইট ক্যান বি? ক্যায়সে উও লোক আয়া হ্যায় সৈয়দপুর স্টেট ইজ এ লঙ্ঘ রুট। চিলাহাটি সে উও লোগ মার্চ কারকে আয়া হ্যায়। কিউ তুম শালে লোগকো রোখনে নেহি সাকা? শালে ডারফুক, লাড়াই করনে কে লিয়ে আয়া? ফিল্ডস্টেইটার বান হ্যায়। অভি আয়া হ্যায় খালি হাত মে। বোল্তা হ্যায় সাব হাতিয়ার প্রটোল্যা। কোই আয়ুনেশনস্ নেহি হ্যায়। ইউ বাস্টার্ড। নাউ গো এ্যান্ড ফাইট উইথ দেন্ত্রোলি হাতমে।’

তার শপাং শপাং চাবুক মারা প্রতিগালাজ চলতেই থাকে। আমি তাকাই নন্দাৰ দিকে। তিনি চুপচাপ শুনছেন সব। মেজর সিং তখনো বলে চলেছেন, কিধাৰ সে হাম অভি তুমলোগকো হাতিয়ার আউর আয়ুনেশনস্ দেগা? হাউ ক্যান আই জাটিফাই এ্যান্ড রিপ্রাই ইট টু মাই হেড কোয়ার্টাৰ? শালে বাসাল, শালে ডারফুক নেশান। তুমলোগ রিফুজি বানকাৰ আয়া হ্যায় খালি থানেকে লিয়ে, লড়নে কে লিয়ে নেহি। কুছ নেহি হোগা। তুমলোগ কাভি তুমহারা কান্ট্রি লিবাৱেট করনে নাহি সাকোগে।

সিং-এর শেষ কথাটা শুনে হাঁটাং করেই মাথায় যেনো আগুন জলে ওঠে। বারবাৰ ‘বাস্টার্ড’ ‘বাস্টার্ড’ বলে গাল দেয়াৰ পাশাপাশি সিং এখন অভিযোগ তুলছেন, আমৰা স্বাধীনতাৰ জন্য যুদ্ধ কৰছি না। বাংলাদেশ স্বাধীন হবে না। সঙ্গত কাৰণেই তাঁৰ অভিযোগ হজম কৰা সম্ভব হ্যায় না। তাই ‘এক্সকিউজ মি’ বলে উঠে দাঁড়াই। আমাৰ উঠে দাঁড়ানো দেখে সিং তার কথা থামিয়ে রাগি গলায় এবাৰ খেকিয়ে ওঠে আমাৰ দিকে তাকিয়ে, ইউ বাস্টার্ড তুম কেয়া বোলে গা! আবাৰ বাস্টার্ড! এবাৰ আমাৰ হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হবাৰ অবস্থা হ্যায়। বলি, ইউ উইথ ড্র ইয়োৰ ভোি ওয়ার্ড বাস্টার্ড।

— কেয়া বোলা! এবাৰ উঠে দাঁড়ান সিং। আমি আবাৰ বলি কথাটা, ইউ উইথড্র ইয়োৰ ওয়ার্ড। ড্র ইউ নো হোয়াট ইজ দা মিনিং অব বাস্টার্ড?

থমকে যান মেজর সিং। ক্যাস্টেন নন্দাৰ অবস্থি নিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছেন। আমি বলে চলি,

হামলোগ আপকা কান্দি যে আয়া হ্যায় ইট ইজ ফ্যাট। বাট বেড়ানে ঘুমনে কে লিয়ে নেই আয়া। হামলোক দেশ ছোড়কে আয়া হ্যায়, আপকা গভরন্মেন্ট হামকো শেষ্টার দিয়া হ্যায়, ইট ইজ দা পলিটিক্যাল ডিসিশন অব ইয়োর গবরন্মেন্ট। ইউ আর সিভিং আর্মস ট্রেনিং সাপ্লাইং আর্মস আব্দ আয়ুনেশন্স গ্রান্ট রেশন্স, ইট ইজ অলসো এ পলিটিক্যাল ডিসিশন। আওর আপলোক ইত্তিয়ান আর্মিকা অফিসার হেনেসা বাদ সে তি হেমকুমারী এফ.এফ. ইউনিট বেস্কা কমান্ডিং অফিসার বনা হ্যায় ইয়ে তি তো এক পলিটিক্যাল ডিসিশন। হামলোক জয় বাল্লা কে লিয়ে লাঢ়তা হ্যায়, আব লোক মোদাদ দেতা হ্যায় পিছে সে, ইয়োর এফ.এফ. কোম্পানি ফেইলড টু রেজিস্ট পাক আর্মিজ এ্যাটাক, ইট ইজ ইয়োর ফেইলিয়ার, বিকজ ইউ আর দেয়ার কমান্ডিং অফিসার, গালতি আভতি কিয়া আপকা এফ.এফ. ইউনিট তি কিয়া। বাট ডোন্ট কল আস বাস্টার্ড। উই আর নট বাস্টার্ড, হামারা ফাদার-মাদার হ্যায়। ডেন্ট ট্রিট আস অল এ্যাট দ্য সেম লাইন। উই আর ফাইটিং ফর আওয়ার কান্দিজ ফ্রিডম আব্দ ইট উইল বি কটিনিউ আপটু দ্য লাস্ট গোল। জয় বাল্লা হামলোগ কারেম কারেগাই।

একনাগাড়ে কথাগুলো বলে ফেলে বসে পড়ি আমার নিজের জায়গায়। মেজর সিং কিছুক্ষণ স্থির, নিচল দাঁড়িয়ে থাকেন। কিছুটা হতচকিত ভাব কী করবেন, কী বলবেন সহজে বুঝে উঠতে পারছেন না। ক্যাপ্টেন নন্দা তাঁকে বলেন, বাইঠিয়ে স্যার। নন্দার কথায় সঙ্গে ফেরে যেনো তাঁর। বসেন তিনি। ধীরে ধীরে স্থির দস্তি মালে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকেন আমার নামকে। তারপর জিগ্যেস করেন হোয়াট ইউ ইয়োর নেম? তুমহারা নাম কিয়া? আমার নাম বলি তাকে। চোখের প্রথর দৃষ্টি আব চোখের কাঠিন্য বজায় রেখে বলেন, তুম লোগ কেয়া লাড়াই কারতা হ্যায়। রাতভে ইধুন্ত দ্বারা যাতা হ্যায়, এনিমি সে দূর রাখকার ফুটফট কারতা হ্যায়, আউর দৌড়কে চলাচালা হ্যায়। আ কার হামকো রিপোর্ট দেতা হ্যায়, পাকিস্তান আর্মিকা দাঁত তোড় দিয়া উসকো গামছা ফাড় দিয়া শুলিসে।

— নেহি স্যার বলে আবার দাঁড়াই, উস দিন হামলোগ মালেককা কোম্পানিকো কভার দিয়া। পাকিস্তান আর্মিকো কাউন্টার এ্যাটাক কিয়া আউর উসকো পিছা লিয়াতো, উও লোগ ভাগতে লাগা। নেহি তো আপকো ইউনিট কো আউর ম্যাসাকার হোতা।

মেজর সিং বলেন, কাঁহা থা তুমহারা পজিশান!

— করতোয়া কি পাড়, অ্যাবাউট টু মাইলস্ ফার ফ্রন্ট মালেক। হামলোগ তো বাঁচায়া চার লাড়কাকো। নেহিত তো উও সাব জ্বালকে মার যাতা।

মেজর সিং এবার কিছুক্ষণ থম ধরে থাকেন। ক্যাপ্টেন নন্দা তখন বলেন, স্যার দোজ বয়েজ আব ডুয়িং ওয়েল। দে আব তেরি মাচ কারেজিয়াস আব্দ ফাইটিং এভরিডে উইথ পাক এনিমিজ।

সিং হাত নেড়ে বলেন, কোই এভিডেস হ্যায়, এনি ডকুমেন্ট?

— ইয়েস স্যার বলে উঠে দাঁড়াই আবার এবং একরামুলকে নিয়ে এগিয়ে যাই শক্তির কাছ থেকে দখল করা হাতিয়ার, গোলাবারুদ, ব্যাজ আব কাগজপত্র ইত্যাদিসহ। সবকিছু রাখি টেবিলের ওপৰ। শস্তুকে তার পায়ের আহত জায়গাটা দেখাতে বলি কাগড় তুলে। মেজর সিং এবার দেখেন তার সামনে রাখা শক্তির কাছ থেকে দখল করা হাতিয়ারপত্র এবং ডকুমেন্ট ইত্যাদি। তারপর বলেন, ঠিক হ্যায় বয়েজ। লেকে যাইয়ে। আই অ্যাম কলিসড, ইউ আব ডুয়িং সামথিং শুড়। ধ্যাক ইউ ক্যাপ্টেন নন্দা। ইউ আব লাকি টু হ্যাত কমান্ড অফ

এ ব্রেক ইউনিট। তারপরও তিনি আমাদের সবাইকে লক্ষ্য করে বলেন, ওকে, দেন বয়েজ, আই অ্যাম সরি অ্যান্ড উইথড্রয়িং মাই ওয়ার্ডস। তার ইউনিটের ছেলেদেরকেও লক্ষ্য করে সিং বলেন, ঠিক হ্যায়, ওয়ার মে হারজিং তো হোতাই হ্যায়। লেট আস অর্গানাইজ অ্যান্ড ট্রাই এগেইন। সিং তাঁর কথা শেষ করেই তাঁর ছেলেদের নিয়ে আলাদা ত্রিফিং-এ বসেন। আর নদা আমাদের নিয়ে। নদা অসঙ্গে খুশি। মেজের সিংকে উচিত কথা বলার জন্য তিনি ধন্যবাদ জানান আমাকে।

রিপোর্টিংশেষে রেশন আর রসদপত্র নামিয়ে নেয়ার বিরতি। ছেলেরা সব বি.ও.পি.র বাইরে আসে। হৈচে করে ঘিরে ধরে আমাকে।

— কেমন করে বললেন সিংকে এসব কথা? ওদের দলের ছেলেরাই জিগ্যেস করে আমাকে। আমি জবাবে বলি, আমাদের জারজ বলে গালাগালি করবে, সেটা কী করে সহ করা যায়। দেশটা স্বাধীন করবো আমরা, যুক্ত করবো আমরা, মরবো আমরা, আর মেজের সিং বলবেন, আমরা জয় বাংলা করতে পারবো না। এটা সহ্য হয় নি তাই বলেছি। সমস্তেরে অনেকেই বলে গুঠে, আমাদের সবার আজ ইজ্জত বাঁচিয়েছেন। শালা সিং-এর কোনো দয়ামায়া নেই, কোনো সৃষ্টি প্রোগ্রাম নাই। শালা খালি গালাগালি ঝাড়বে...।

— বাদ দাও পেছনের কথা। দেখো এখন সব ঠিক হয়ে যাবে।

মালপত্র গোলাবারুদ ইত্যাদি নামানো হয়ে গেলে, নদু প্রেরিয়ে আসেন, হাসতে হাসতে বলেন, কেয়া ইয়ার কৃত্ত চাহিয়ে?

— নেই স্যার। আভি ফিরনা চাহতা হ্যায়। ত্রায়লোগকো আজ হাইড আউট চেঞ্জ কারণে হোগা। নদু তখন কাঁধে হাত রেখে স্ট্রাকটে বলেন, ডোন্ট মাইন্ড মাই ফ্রেন্ডস, মেজের সিং এক পাগলা আদমি হ্যায়। বলতে হচ্ছে হ্যায় দ্যাট ম্যান। উই ডোন্ট লাইক হিম। ইউ গো উইথ ইয়োর ওন প্রোগ্রাম। ভুক্তিটপ, ডোন্ট গোট নার্ভাস। উই আর উইথ ইউ।

— থ্যাঙ্ক ইউ স্যার বলে তার্কে প্রিসায় দিই। এরপর কিছুক্ষণ নিজস্ব সময়। মানিকগঞ্জ বাজার, শরণারী শিবির এসব স্থানে হয় ঘুরে ঘুরে। মনুদের পার্টির আস্তানা খুঁজে বের করি কিন্তু তার পাতা পাওয়া যায় না। সে গেছে ঘুমুড়ঙ্গা তাদের ছেলেদের ট্রানজিট ক্যাম্প দেখাশোনা করার জন্য। তার পরিবারের বর্তমান অবস্থানের সংবাদ তার দলের লোকজনকে জানিয়ে এবং সে সংবাদ মন্তু ফিরলে তাকে জানাবার অনুরোধ করে ফিরতি পথ ধরি।

এবার চলা কোনো জানান হাইড আউটের উদ্দেশ্যে।

৭. ১০. ৭১

ছবির মতো গ্রাম- কালিয়াগঞ্জ হাইড আউট

করতোয়া পাড়ের পরিত্যক্ত বসতিটায় চমৎকার নতুন হাইড আউট পেয়ে যাই। জায়গাটা হাসান মাবির বসতির মতো খোলামেলা নয়। ডানে-বায়ে শক্তির পদচারণা কিংবা তাদের আক্রমণের সদাচীতির অস্তিত্ব এখানে নেই। খেয়াঘাটও নেই। সৃতরাঁ রাস্তাঘাটও নেই তেমন। কেবল একটা ছেটো হাঁটাপথ চলে গেছে নদীর তীর পর্যন্ত বসতিটার পাশ যেমে। তারপরই পথটা শেষ হয়ে গেছে। চারদিকে ঝুনো জঙ্গল, স্যাতসেক্তে পরিবেশ। পরিত্যক্ত ছন্দের ঘরগুলো একেবারেই জরাজীর্ণ। ছেলেরা এর ভেতরেই সাজিয়ে নেয় নিজেদের অস্থায়ী আস্তানা।

রাতের বেলা ভেসে আসে ঝিৰি পোকাসহ নানা ধরনের পোকামাকড়ের একটানা

ঐকতান। জঙ্গলের ভেতরে পরিবেশটাকে একেবারে ভুতুড়ে মনে হয়। সভ্যতা বিবর্জিত এই নির্জন বনভূমে ছনের ঘরের দাওয়ায় ঘোরে থেকে মনে হয়, কতোদিন, আর কতোদিন চলবে স্থান থেকে স্থানান্তরে এভাবে ছুটোছুটি? কবে শেষ হবে এই ঝালান পদচারণার? দেশে ফেলে আসা আঞ্চলিকজন আর নিকটজনেরা আজ কে কোথায়? বেঁচে আছে কি সবাই দখলদার নিষ্ঠুর পাকবাহিনীর অত্যাচারে? তাদের সর্বাসী মরণ অভিযানে? কে জানে?

পিন্টু আর দুলু সকালেই ফিরে গেছে মানিকগঞ্জ থেকে বাস ধরে নালাগঞ্জে। পিন্টু চেষ্টা করে যাচ্ছে তার সাধারণতো। কিন্তু তারপরও সে কর্তৃপক্ষকে ঠিক সন্তুষ্ট করতে পারছে না। আগের অফিসার দয়াল সিংহের মতো নদীও নাকি তার কাছে জ্যান্ত খানসেনা চেয়েছেন। পিন্টু সেই সুত্রে কথা পেরে বলে, কলতা মাহবুব ভাই মুই গ্যালা জ্যান্ত খান কোন্টে পাও। শালারা কি নদীর ভগ্নিপতি নাকি যে কইলেই সুভসুড় করিয়া আসিয়া ধরা দিবে? এটা কি করে সম্ভব যে, ওদের ডিফেন্সে রেইড করে ওদের বাস্কার থেকে জীবিত অবস্থায় ওদেরকে ধরে আনা? নদীরাই কি পারবে এ ধরনের কাজ করতে তাদের রেণ্টলার ফোর্সের সাহায্যে?

বুধাতে পারি ক্যাটেন নদী পিন্টুর উপর বেশ তালো রকমেরই চাপ সৃষ্টি করে তাকে এই অসম্ভব কাজের দায়িত্ব দিয়েছেন। আসলে তিনি পিন্টুদের আরো তৎপর আর সত্ত্বিক করতে চাচ্ছেন আর সে কারণেই এ ধরনের বলতে গেলে অসম্ভব আর অযোড়িক কাজ চাপিয়ে দিয়েছেন তাদের হাতে। পিন্টুকে তাই যাবার সময় বলে বিশ্বাস নেই, নদী যাই বলুক, এ ধরনের রিস্কের ভেতরে যাবে না। বাস্কার থেকে পাকসেনাদের ক্ষমতাবত ধরে আনা ছেলেখেলার ব্যাপার নয়। এ ধরনের খুঁকির ভেতরে গিয়ে নিজেদের মুক্তাক ডেকে আনার কোনো মানে হয় না। তুমি নর্মাল অপারেশন চালিয়ে যাও, যদি ব্যাপারের কোনো অপারেশনে জড়িয়ে পড়তেই হয়, তা হলে খবর দিও। আমি এসে তোমাকে তঙ্গে যোগ দিবো। দুলুর ব্যাপারে তাকে বলেছি, টেক কেয়ার অব হিম অ্যান্ড ইজি� ফ্যান্সে। এতোদিন তাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে এখন সেটা বাদ দেয়া যাবে না। ব্যাপারটা যাকি কর্তৃপক্ষের কাছে নালিশের আকারে গেছে, তারা হয়তো তাদের ইন্টিলিজেন্সের সাহায্যে খোঁজখবর নিচ্ছেন। এর জন্য হয়তো-বা আমাদের কোর্ট মার্শাল পর্মস্ত ফেস করতে হতে পারে। হোক, দেখা যাবে তখন।

রাতের বেলা রেকি পেট্রল পাঠানো হয় দুটো। সেন্ট্রি ডিউটি চলে হাইড আউটের মুখে, অঙ্ককারাঙ্কন জঙ্গলের রাজ্যে রাতটা কেটে যায় পোকামাকড়ের ঐকতান উনে উনে। পেট্রল থেকে ফিরে বাকি রাতটা আর ঘুমনো যায় না। বাঁকের পর বাঁক মশা বাঁপিয়ে পড়ে শরীরের উপর। বছদিন পর মানুষের রক্তের স্বাদ নিতে ‘হাউ মাউ খাও’ বলে যেনো চারদিক থেকে ছেঁকে ধরে।

সকালে আহিনীর আসে। গত দু'দিন অত্যন্ত ব্যক্তসমস্ত সময় কেটেছে তার। নিজের ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়া দলের পরিচালিত গত ক'দিনের অপারেশন সম্পর্কে জানা এবং সেগুলো সম্পর্কে রিপোর্ট করা, সেইসাথে তার লিজা মামিদের পুনবার্সনের কাজও করতে হয়েছে তাকে। মন্টুকে মানিকগঞ্জ থেকে ডেকে এনে তার পরিবারের দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে তবেই মিলেছে তার ছুটি। সেই ছুটির সুবাদেই এসেছে খোঁজ করতে করতে আমাদের হাইড আউটে। আসবার সময় সে একটা চমৎকার পরিভ্যক্ত বাড়িয়রের আন্তর্বানা দেখে এসেছে। তার ভাষায়, হাইড আউট স্থাপনের পক্ষে জায়গায়টা সুউপযোগী ও খুবই আদর্শশূন্য। এই জঙ্গলের মধ্যে থেকে লাভ নেই, ওখানে চলেন।

সকালবেলা নাস্তা সেরে আহিদারের সাথে বের হই। দেখি জায়গাটা। পছন্দ হয়ে যায়। ফলে দুপুরের মধ্যেই নতুন আস্তানায় হাইড আউট স্থাপনের কাজ সম্পূর্ণ হয়ে যায়। জায়গাটা সভিই ভালো। সেই কবির ভাষায়, ‘আমখানি ছেট মোর ছবির মতন।’ বেশ কঘর বসতবাড়ি নিয়ে মোটামুটি সম্পন্ন একটা গ্রাম। দু'চারজন মানুষ ছাড়া পুরো গ্রামটাই পরিত্যক্ত। সপরিবারে মানুষজনের সবাই চলে গেছে হলদিবাড়ি-মানিকগঞ্জ শরণার্থী শিবিরে। যে বাড়িটায় আমাদের হাইড আউট গড়ে তোলা হয়েছে, মাঝখানে প্রশংস্ত আঙিনাসহ চারটা ঘর পাওয়া গেছে তাতে। বাড়ির পেছনে বিরাট সুপারি বাগান আর নানা ধরনের গাছপালায় দেরা। একটা হেট রাস্তা চলে গেছে বাড়ির পাশ দিয়ে। করতোয়া নদীর পার থেকে এসে রাস্তাটা এগিয়ে গিয়ে দু'ভাগ হয়ে তার একটা শাখা চলে গেছে পেয়াদাপাড়ার দিকে, অন্যটা গিয়ে মিশেছে সীমান্তের কাছাকাছি মারেয়া-মানিকগঞ্জ বাস্তায়। করতোয়া পাড় কাছেই। খেয়াঘাট আছে, কিন্তু খেয়ানোকো বা মাঝি নেই। যুদ্ধের আগে হয়তো ছিলো। এখান থেকে সোজাসুজি করতোয়া পার হয়ে নয়াদিঘি-সাকোয়া-মারেয়া যাবার সুযোগ রয়েছে। নয়াদিঘির দূরত্ব এখান থেকে আরো কাছে। তবে রাস্তা দুর্দশ বলে শক্রবাহিনীর এদিকটায় আসার সম্ভাবনা একেবারেই নেই। তাছাড়া, নদীর পাড় দিয়ে হেটে গেলেই হাসান মাঝির মারেয়ার ঘাটে পৌছনো যাবে। অন্যদিকে রয়েছে কালিয়াগঞ্জের বাজার, নদীর ধার দিয়ে সেখানেও যাবার সুযোগ রয়েছে। কালিয়াগঞ্জের বাজারের দূরত্ব এখান থেকে মাইলখানেক্ষেত্রাতো। আহিদার তার নিজের দলকে বনিউজ্জামানের দলের থেকে বিচ্ছিন্ন করে কালিয়াগঞ্জ আনার পরিকল্পনা করেছে। নতুন এ জায়গায় আমাদের হাইড আউট স্থাপনের তাপ্তি আসলে এ কারণে তার জন্যই। কালিয়াগঞ্জ সে তার নিজের ছেলেদের নিয়ে স্টেট আউট করলে আমাদের নিরাপত্তামূলক সাপোর্ট তারা সহজেই পেতে পারবে। এছাড়া পেয়াদাপাড়ায় দীর্ঘদিন ধরে একই জায়গায় হাইড আউটে থাকায় সবার ভেতরেই ক্ষেত্রে একটা স্থবিরতা এসে গেছে। ভালো কিছু কাজও তারা করতে পারছে না। সে কারণে আত্মনিয়ত চাপ আসছে নদীর কাছ থেকে, জবাবদিহি করতে ইচ্ছে বারবার এটা-ওটা অঙ্গুহাত খাড়া করার ভেতর দিয়ে। এবার আহিদারকে সরতে হবে পেয়াদাপাড়া থেকে, ক্যান্টেন নদীর এই চূড়ান্ত নির্দেশ ছিলো বিপোর্টের দিনে।

আহিদার কালিয়াগঞ্জে হাইড আউট নেবে, এ নিয়ে পরামর্শ-সভা চলে অনেক রাত অবধি। করতোয়া পাড়ের কালিয়াগঞ্জ বাজার অবশ্য জমজমাট ছিলো যুদ্ধের আগে। এখন প্রায় পরিত্যক্ত অবস্থা তার। কালিয়াগঞ্জের ওপারের রাস্তা চলে গেছে মণ্ডলের হাট মাঝ আমের দিকে। নয়াদিঘি যাওয়া যায় ঘোরা পথে। নদীতে খেয়ানোকা রয়েছে। মণ্ডলের হাটের শক্র ঘাঁটি আক্রমণের লক্ষ্য থেকেই কালিয়াগঞ্জের হাইড আউট স্থাপনের মূল পরিকল্পনা দাঁড় করানো হয়। সেই সাথে ঠিক করা হয়, দু'একদিনের ভেতরেই আহিদার তার দলকে সেখানে শিফ্ট করবে।

আসলে আহিদার থাকলে পরিবেশটা জমে ওঠে। নিজেকে একা আর নিঃসঙ্গ মনে হয় না। পিন্টুর অভাব অনেকটাই পুরিয়ে দেয় সে। পিন্টুর মতোই আহিদার অত্যন্ত সজীব আর জীবন্ত। সে গান জানে না বটে পিন্টুর মতো, তবে জমাতে পারে খুব। আমের ছেলে সে। তার অধিকাংশ গজ্জেরই ভিত্তি তার গ্রামীণ চেনাজানা পরিমলে, আর এইভাবে এক প্রতিকূল আর বিপদসঙ্কুল পরিবেশে তার সঙ্গে গড়ে ওঠা আমার সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্কে এসময় ভালোবাসায় রূপ নেয়। আহিদার দারুণ ভালোবেসে ফেলে আমাকে বড়ো ভাইয়ের ভক্তি আর শুঙ্গা নিয়ে।

আমার কাছে এলে তাই সে আর সহজে ফিরতে চায় না তার নিজস্ব দলে। তার কমান্ডের ছেলেরা কি করছে কর্মক, তাতে করে তার ঘেনো বিশেষ কিছু যায় আসে না।

তরুণ আগন্তুক : সাইফুল

রাত নটার দিকে পেয়াদাপাড়ার একটা ছেলে আসে। ঘরের ভেতরে ঢুকেই সে বলে, মানিকগঞ্জের একজন খোজ করছিলো আপনার। তাকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি আমি। দেখেন তো চেনেন কি না!

— কোথায়? বলে বাইরে বেরিয়ে আসি।

রাস্তার ওপর ঠাঁদের আবছা আলো-আধারিতে একজন লম্বা ছিপচিপে তরুণকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। পরনে তার শার্ট-প্যান্ট।

— কে? জিগ্যেস করতেই তরুণটি বলে ওঠে, মামা, আমি মুন্না।

— মুন্না তুই এখানে! এতো দূরে! কোথায় থেকে এলি? কীভাবে এলি? একসাথে এতোগুলো প্রশ্ন বেরিয়ে আসে মুখ দিয়ে। আমার ভাগে মুন্না ওরফে সাইফুল এসে হাজির হয়েছে এতো রাতে প্রায় ১০ মাইল পথ হেঁটে। আসতে হয়েছে সেই মানিকগঞ্জ থেকে। মুন্নাকে দেখে ভালো লাগে। কেনো জানি একটা শক্তাও জাগে যনে। ভাবি, কোনো বিপদে পড়ে নি তো ও? কোথায় সেই পাচিম দিনাজপুরের কেন্দ্রস্থানে! সেখানে সে তার দাদার গ্রামের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছে সে সীমান্ত পেরুনোর পার। আর এখানেই এই এতোদূর তাকে আসতে হয়েছে জলপাইগুড়ি, হলদিবাড়ি আর মানিকগঞ্জ হয়ে। অনেক দূরের পথ।

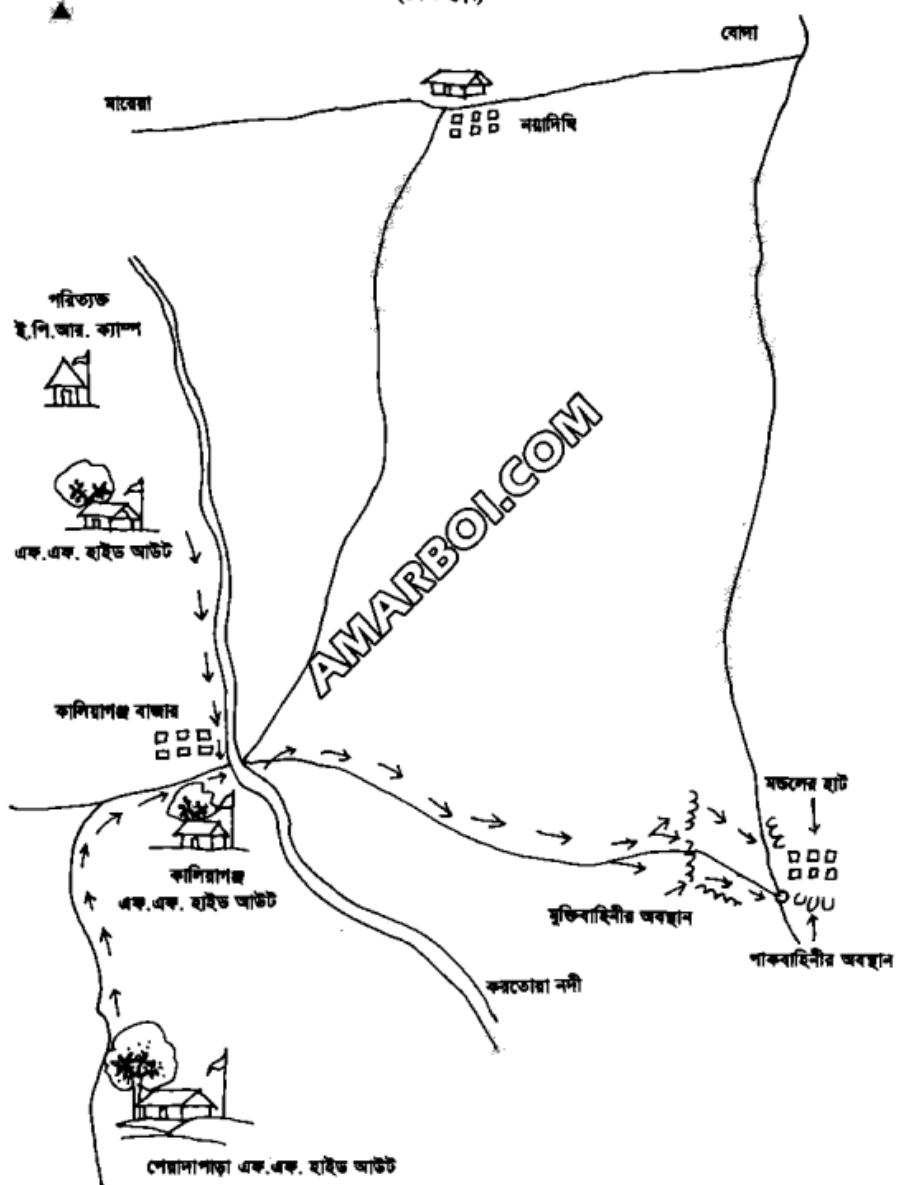
— আয় বলে হাত ধরে ভেতরে টেনে মাস্টিপকে। বিছানায় বসতে দিই। ল্যাস্পের টিমটিমে আলোয় ভালো করে ওর মুখটা দেখি। নৈর্ব্য পথথাত্রায় ক্লান্ত আর বিদ্রূপ তার চেহারা। আহিদার ভাগ্নের পরিচয় পেয়েই চিন্মাত্তিপুরুষ করে দেয় প্রাথমিক আপ্যায়নের আয়োজন করার জন্য। মুন্নার চোখে-মুখে কেমন একটি বিব্রতকর হাসি। বলে, অবশ্যে পাওয়া গেলো মামা আপনাকে! আমি তো একেবারে ভাস্তোজের ওপর ভর করে এসেছি। মনে হচ্ছিলো খুঁজ বোধহয় পাবোই না। আপনার কথা জিগ্যেস করে পরিচয় দিতেই ছেলেটা পথ দেখিয়ে নিয়ে এলো।

— ঠিক আছে, এখন হাত-মুখ ধূলু রেঁটে নে। চা-নাস্তা খেয়ে গল্প করা যাবে।

ছেলেরা তাকে এর মধ্যে মাহাবাড়ির আদরআস্তি করতে তৎপর হয়ে ওঠে। বালতি ভৱতি পানি আসে। তাতে নিজেকে পরিচ্ছন্ন করে তোলার চেষ্টা নেয় সে। সেই ছোটবেলা থেকেই মুন্না নিজেকে বেশ ঝুঁটিবান আর পরিচ্ছন্ন ছেলে হিসেবে গড়ে তুলেছে। এখন এই দীর্ঘ যাতার ধরকলে কেমন মলিন দেখাচ্ছে তাকে। চা-নাস্তা থেতে থেতে তার কাছ থেকে আসল ঘটনাটা শোনা হয়। ক্লান্ত গলায় সে বলে চলে, হলো না মামা। বাংলাদেশ আর্মির দ্বিতীয় শর্ট সার্ভিস কমিশনের জন্য বুড়িমারী সেক্টর হেড কোর্টারের আমাদের ক'জনকে ইন্টারভিউতে ডেকেছিলো। দু'দিন ধরে প্রাথমিক নির্বাচনের জন্য পরীক্ষাটরীকা নিয়ে কর্তৃপক্ষ আমাদের জানিয়ে দিলেন, হবে না। উই আর নট সিলেকটেড। পরে শুনি, মুজিবনগর থেকেই নাকি অলরেডি সিলেকশন হয়ে গেছে। আমাদের ডেকেছিলো শুধু আইওয়াশের জন্য।

— ঠিক আছে, না হয়েছে তো কি হয়েছে? আমি তাকে সাজ্জনা দিয়ে বলি, তুই ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ছাত্র। ভবিষ্যতে বড়ো ইঞ্জিনিয়ার হবি। আর্মি অফিসার না হলে কি জীবন উচ্ছেষ্ণ যাবে নাকি? আমরা তো সেই প্রথম থেকে যুদ্ধ করছি, কিন্তু আমাদের কেউ আর্মি

কেচ ম্যাপ-১০
মডেলের হাট মুক
৩০-৩০-৭৩
(কেল ঘাড়)



অফিসার নয়। হতেও চাই 'না। ক্যাটেন নকার কথা হচ্ছে, আগে দেশটা স্বাধীন করা দরকার তোমাদের। তারপর নিজের স্বাধীন দেশে কতো সুযোগ পাবে তোমরা, আমি সিভিল অফিসার হওয়ার। আসলে তার কথাই তো ঠিক। ওসব চিন্তা এখন বাদ দে। আমি তোকে সুযোগমতো নিয়ে আসবো আমার ইউনিটের যোদ্ধা হিসেবে। স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করবি তুই। আমার কথায় কাজ হয়। তাকে বেশ উৎসাহিত আর চাঙা হতে দেখা যায়। রাতে বিছানায় শয়ে ফিসফিসিয়ে সে বলে, মামা আমার কাছে কিছু টাকা-পয়সা কিছু নাই। বুড়িমারীতে সব শেষ হয়ে গেছে। অঙ্ককারে হাসি পায় ওর কুণ্ঠা জড়নো কথা বলার ভঙ্গিতে। বলি, ঘুমাতো মুন্না। এখন এটা আর তেমন কোনো সমস্যা নয়। একবার যখন এসে পড়েছিস আমার কাছে, তখন এ নিয়ে আর ভাবতে হবে না তোকে।

হামাক খালি জয়বাংলাটা করি দেন

শুব সকালে আহিদারের চিল্লাচিল্লি, রাগারাগি মেশানো হৈহল্লায় ঘূম ডেঙে যায়। কানে আসে বাড়ির সম্মুখবর্তী রাস্তায় কাকে যেনো সে ধরকে চলেছে একটানা এইসব বলে, মিয়া চেনো আমাদের? স্টেনগানের গুলিতে একেবারে মেরে করতোয়ার স্বাতে ভাসায়ে দেবো, শা....।

চোখ মুছতে মুছতে বাইরে যাই। ব্যাপারটা কি—সেটা দেখার জন্য। একজন জেলে ধরনের মানুষকে পথ আগলে আটকিয়েছে আহিদার। হাতে পাতে মানুষটার বুক বরাবর তাক করে ধরা স্টেনগান।

— কী হয়েছে? জিগ্যেস করতেই সে বলে, দেখো তো শালা রাজাকারের বাচ্চা দুটো ভাঁড় ভর্তি বড়ো বড়ো মাছ নিয়ে যাচ্ছে ইভিয়ান্থে ভাঁড়ের জন্য মাছ নিতে চাইলাম তো শালা বলছে, দেবে না। ইভিয়া ছাড়া মাছ বেচেচে না। আমাদের করতোয়ার মাছ, দেশের সম্পদ শালা ওপারে পাচার করছে। ব্যাটার ক্রেটার্মার্শাল হওয়া উচিত।

লোকটা ভয় পেয়ে যায় আস্তিনিরে রাগি চেহারা আর উদ্যুক্ত স্টেনগানটা দেখে। এবার আমি এগিয়ে গিয়ে লোকটার ভাঁড়ের ভালা তুলে দেখি সত্যিই বেশ বড়ো বড়ো সাইজের ঝুই-কাতলা মাছ। একেকটা তিন-চার সের ওজনের হবে। এবার আমি আহিদারকে জিগ্যেস করি, পয়সা দিতে চেয়েছিস, না জোর করে নিতে চাচ্ছিস মাছ?

— না, পয়সা কেনো দেবো? ব্যাটা দেশের সম্পদ পাচার করছে। আমরা যুদ্ধ করছি দেশের জন্য। মুক্তিযোদ্ধাদের দুটো মাছ সে ফ্রি দেবে না! মুক্তিযুদ্ধের জন্য সে এইটুকু ত্যাগ হীকার করবে না!

আহিদারকে সংযত করে আনার পর লোকটাকে কঢ়া মাছ নামিয়ে দিতে বলি। গ্রাণ বাঁচানোর ভাগিদে বড়ো বড়ো সাইজের চারটা মাছ নামিয়ে দেয়। পয়সা দিতে গোলে সে নেয় না। বলে, আমার ভুল হয়ে গেছে। আপনাদের কাছ থেকে কি পয়সা নেয়া যায়? আমাকে শুধু আপনারা ভারতে মাছ নিয়ে যাবার অনুমতি দেবেন। আমার পরিবার-পরিজনেরা সবাই ভারতে, শরণার্থী শিবিরে। সারারাত মাছ ধরে ভারতে নিয়ে হেনে বেঁচি। তাতে করে কিছু টাকা-পয়সা মেলে। পনেরো-বিশজন খানেঅলা। খালি রেশন দিয়ে কেমন করে বাঁচা যায় কহেন?

— ঠিক আছে বলে পরিষ্কৃত আহিদার তাকে মাফ করে দেয়। তবে শর্ত আরোপ করে এই বলে, প্রতিদিন মাছ খাওয়াতে হবে। রাজি হয়ে লোকটা মাথা কাত করে বলে, তুমহারলার যতেক মাছ লাগিবে, মুই দিম। তবু তুমরালা হামাক জয় বাংলাটা করি দেন তাড়াতাড়ি।

কথাটা বলেই লোকটা চলে যায় তার মাছের ভাঁড় নিয়ে হেলতে দুলতে দুলতে। তার চলার পথের দিকে তাকিয়ে মনে মনে বলি, এই লোকটাও আমাদের কাছে জয় বাংলা চেয়ে গেলো! সবার মতো তারও অবশ্যস্থাবীভাবে প্রয়োজন ‘জয় বাংলা’।

মঙ্গলের হাট আক্রমণ-খতম রাজাকার কমান্ডার হাতেম আলী

মঙ্গলের হাট পাক ঘাঁটি আক্রমণের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এই আক্রমণ অভিযানে অংশ নেয়ার জন্য আহিদার-বদিউজ্জামানের পূর্ব পরিকল্পনা ছিলো। কিন্তু সেটা বাস্তবায়নের জন্য তারা মনস্ত্রি করতে পারে নি। বর্তমানে তাদের কাছাকাছি আমাদের অবস্থান হওয়ায় মঙ্গলের হাট আক্রমণের সিদ্ধান্ত বলতে গেলে তুরাবিত হয়। বদিউজ্জামানের রানার আসে মেসেজ নিয়ে। সে জানায়, আজ রাতে মঙ্গলের হাট আক্রমণের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। আগন্তব্য সাহায্য চাই। রানারের মাধ্যমে হিন সিগন্যাল পাঠিয়ে দিই। সে অনুসারে তারা তৈরি হয়ে আসে শক্তিশালী দল নিয়ে কালিয়াগঞ্জ বাজারে। সক্ষ্যার পর সেখানে তাদের সাথে মিলিত হই বাছা বাছা ক'জন ছেলে নিয়ে। এ অপারেশনের মূল শক্তি বদিউজ্জামান-আহিদারের দল। সহায়ক শক্তি যত্নেটুকু প্রয়োজন, সেটা নেই আমার সাথে। করতোয়া নদীর পাড়ে একটা পরিত্যক্ত খোলা ঘরের চালার নিচে বসে পরিকল্পনা চূড়ান্ত করা হয়। ঠিক হয় রাত ১২টা আক্রমণের এবং ৯টা হচ্ছে রওয়ানা দেয়ার সময়।

রাত আটটার মতো বাজে তখন। সামনে খরস্ত্রোজু ভৌজাল করতোয়া। পানি বেড়ে গেছে প্রায় দুঁকুল ছাপিয়ে। আকাশে কুচকুচে কালো মেহের উলুটা। চাঁদ ঢাকা পড়েছে সেই মেঘের গভীরে। চারদিকে তাই নিকষ কালো অঙ্ককাণ্ড পরিব্যাখ পরিবেশে কেমন যেনো ভুঁড়ে। আবার তাকাই খরস্ত্রোজু করতোয়ার দিকে ঝটপ্লাল কলকল শব্দ তুলে বয়ে যাওয়া এই নদী পার হয়েই ওপারে শক্ত অধিকৃত এলাঙ্গুলি অপারেশন করতে যেতে হবে। কেনো জানি ভাবনাটা দয়িয়ে দিতে চায় সহস্র টাইপ, সাহস আর মনোবল। ডয় ধরিয়ে দিতে চায় ওই যৌবনবত্তি নদী। ছেলেরা চুপচাপে জ্বাসে থাকে। বিড়ি-সিগারেট টানে, নিজেদের মধ্যে ফিসফাস করে কথাবার্তা বলে। এ যেনে অপারেশনে যাওয়ার আগে প্রয়োজনীয় সাহস সঞ্চয় করে নেবারাই এক ধরনের অভিযোগ। প্রায় চলিশজন ছেলের দল নিয়ে যেতে হবে সামনের এই উন্মত্ত নদীর স্নোত ভেঙে। কিন্তু যুদ্ধশেষে সবাইকে নিয়ে ফেরা যাবে কি? চিন্তা মনটাকে কিছুটা দুর্বল করে দিতে চায়। কিন্তু না, যুদ্ধে দুর্বলতা বা পিছুটানের অবকাশ নেই। তাই হাতের সিগারেটটায় শেষ টান দিয়ে উঠে দাঁড়াই। এতো বড়ে দল, এতোগুলো অঙ্গের সম্মিলিত শক্তি, মোটামুটি মাথা খাটিয়ে বের করা একটা সুন্দর পরিকল্পনা, এর কার্যকারিতা সফল হতে বাধা।

তাই, ‘নে আহিদার ওঠ’ বলে উঠতে বলি আহিদারকে। আমার কথায় শুধু আহিদার নয়, গা-বাড়া দিয়ে ওঠে দাঁড়ায় সবাই। শুরু হয় খেয়ালোকো করে নদী পারাপারের কাজ।

নদী পার হয়ে অলংকরণের ভেতরেই শুরু হয় আমাদের এগিয়ে চলার পালা। মনে হচ্ছিলো বৃষ্টি নামবে, কিন্তু নামে না। আকাশে জমকালো জমাট বাঁধা মেঘ অঙ্ককাণ্ডকে কেবল স্থির, গঞ্জির আর অচলতা করে রাখে।

হিসেব মতো যুদ্ধটা শুরু করা যায় না। রেকি পার্টি হাঁচাং করেই সামনে থেকে শুলিবৰ্ষণ শুরু করে দেয়। শক্ত ঘাঁটি ঠিক কতোদূরে বুঝতে পারি না। রেকি পার্টি কোনো রকম বিপদের মুখে পড়েছে কি না, বোঝা যায় না। সবাইকে দ্রুত এগুতে নির্দেশ দিয়ে নিজের

সামনের দিকে দৌড় শুরু করি। কিছুদূর এগতেই রেকি পার্টিকে দৌড়ে ফিরে আসতে দেখা যায়। খলিল বলে, হামারা অঙ্ককারে চিনিবারে পারি নাই, একেবারে মণ্ডলের হাট ডিফেন্সোত যায় উঠেছিলো। খলিল আরো জানায়, শক্রবাহিনী চালেঞ্জ করায় তারা দৌড় শুরু করে। তাদের দৌড়ে পালানোর সময় শক্রপক্ষের লোকজন গুলিবর্ষণ শুরু করে এলোপাতাড়িভাবে। ওদের কথা শেষ হতেই বিডিউজ্জামানের দলকে গুলি শুরু করে এগিয়ে যেতে বলি। ছেলেরা গুলি শুরু করে। খলিল-মতিয়ারকে নিয়ে আমি রাস্তার ডান পাশের খেতবাড়িটায় নেমে পড়ি। সামনে প্রায় তিনশো গজ দূরের জমাট বাঁধা কালো গাছগাছালি যেরা জায়গাটা দেখিয়ে মতিয়ার বলে, ঐ বাড়িগুলোর ওপারেই মণ্ডলের হাট।

খলিল-মতিয়ার এদের দু'জনকে নিয়ে আমি যুদ্ধের সেই প্রথম দিকে অমরখানায় বুধন মেষারের বাড়ি অপারেশন করেছিলাম। আজো সে কায়দাতেই মোট দশজনের একটা দল নিয়ে এগিয়ে যাই অঙ্ককারের সাথে নিজেদের মিশিয়ে বাড়িগুলোর দিকে। বাঁয়ে রাস্তা বরাবর তুম্ভুল গোলাঙ্গলি চলছে। আহিদারের মর্টারের শেলও এসে পড়ছে। বসতিটার দিকে যাওয়ার একটা হাঁটা পথ। ডানে রেখে আমরা এগছি। প্রথম বাড়ির চতুরে-পা দিতেই, সামনে থেকে ভেসে আসে চালেঞ্জ, কে আসে? একেবারে গুলি করে দেম। চালেঞ্জ ছুঁড়ে দেয়া লোকটার কথা শেষ হয় না। খলিল স্থূলার্থ বাঘের ক্ষিপ্তগতি নিয়ে ঝাপিয়ে পড়ে অঙ্ককারে লোকটার উদ্দেশে। তারপরেই বলে ওঠে সে, ধরেছু গে, রাইফেল আছে শালার ঠে। খলিলের কথার সঙ্গে সঙ্গে কিছু লোককে ধূপধাপ পায়ের শব্দ তুলে পালিয়ে যেতে দেখা যায়।

— কহেক শালা তোর নাম কি? বলেই প্রচণ্ড জ্বরে একটা লাখি করে খলিল ধরাপড়া লোকটার পিঠে। কঁকিয়ে উঠে লোকটা বলে, নাম না গে মোক, কহিছ মোর নাম। মোর নাম হাতেম আলী। চমকে উঠি আমরা সবাই! এই তাহলে সেই হাতেম আলী! এ অঞ্চলের টেরের, পাকবাহিনীর ঘনিষ্ঠ দোসর! মজুমকার কমান্ডার হাতেম আলী তাহলে ধরা পড়লো তার রাইফেলসময়ে অবশ্যে! সবচেয়ে গুদকে যুদ্ধ শুরু হয়ে যাওয়ায় সে এদিকটা পাহারা দেয়ার জন্য এখানে অবস্থান নিয়েছিলো তার সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে। অঙ্ককারে এই সময়, দেখা যায় না, কার হাতের হাতিয়ার যেনে গর্জে ওঠে। মরে গেনু গে বা বলে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে মুক্তিযোদ্ধাদের অন্যতম কাঞ্জিত ব্যক্তি হাতেম আলী।

এবার শক্রপক্ষ আমাদের অবস্থান লক্ষ্য করে গুলিবর্ষণ শুরু করে। অবস্থার মুখে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে মধুকে এল.এম.জি. সেট করতে বলি। মৃত রাজাকার কমান্ডার হাতেম আলীকে পাশে রেখেই শক্র মোকাবেলা চলতে থাকে। শক্র এখন তাদের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করে গুলিবর্ষণ করে চলেছে। সামনে এগবার ঝুঁকি নেয়ার উপায় ঝুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। নিরাপদ বাস্কারগুলো থেকে এখন শক্র ত্রিমুখী আক্রমণধারা শুরু হয় আমাদের লক্ষ্য করে। তাদের অবিরাম গুলিবর্ষণের তোড়ে আমাদের তচনছ হবার দশা। ঘন্টাখানেক সময় ধরে এরকমটা চলে। তারপর থেমে যায় আমাদের বাঁদিককার দলটা। একা শুধু আমরা আরো মিনিট দশেক গুলি চালিয়ে রিট্রিট শুরু করি। আজ আর মণ্ডলের হাট দখলে নেয়া যাবে না। শক্র তাদের অবস্থান অত্যন্ত সুসংহত করে ফেলেছে। রাত তিনটার দিকে ফিরতি পথে মাঝামাঝি একটা জায়গায় দেখা হয়ে যায় অন্যদের সাথে। ঝান্ত চরণে আগুয়ান সবাই। আজ মণ্ডলের হাটের শক্র ঘাঁটি দখল করা যায় নি ঠিকই, কিন্তু তাদের ঘাঁটিতে ঢ়াও হয়ে তাদের আক্রমণ করা গেছে, এটাই ছিলো আমাদের আজকের যুদ্ধের মূল লক্ষ্য,

নেটাতো কিছু পরিমাণে হলেও পূরণ হয়েছে।

এছাড়া চরম দুশ্মন রাজাকার কম্বাতার হাতেম আলীকে শেষ করা গেছে, একটা রাইফেল দখল করা গেছে, এ একেবারে তুচ্ছ সাফল্য নয়। আজ মণ্ডলের হাট দখল করা যায় নি, আর একদিন যাবে।

শেষ রাতের ভেজা ঘাস মাড়িয়ে আমরা এগিয়ে চলি। যাই আমাদের ডেরা অভিমুখে উত্তল স্রোতবহু করতোয়া লক্ষ্য করে।

১. ১০. ৭৫.

গলেয়া আক্রমণ, দখল ও খতম দুই রাজাকার

গলেয়া পাকবাহিনীর ঘাঁটিতে আক্রমণ করা হয় রাতে। পেয়াদাপাড়ার উল্টোদিকে গলেয়াবাজারে শক্রদল ঘাঁটি গেড়েছে পানিমাছ ঘাঁটি স্থাপনের পাশাপাশি। তালমা ব্রিজ পেরিয়ে জেলা বোর্ডের উচু রাস্তার সরাসরি যোগাযোগ রয়েছে গলেয়া বাজারের সাথে। হাড়িভাসা বাজার যেমন বেরুবাড়ি শরণার্থী শিবিরের উল্টোদিকে, তেমনি সাকাতি শরণার্থী শিবিরের উল্টোদিকে অবস্থান গলেয়াবাজারের। উত্তর পাশ থেকে পঞ্চগড় গ্যারিসনের আক্রমণ ঠেকানোর জন্য পাকবাহিনী পানিমাছ এবং গলেয়া বাজারের অঘাবর্তী ঘাঁটি স্থাপন করেছে। পানিমাছ থেকে যেমন নিয়মিত পাকবাহিনী হাড়িভাসা দিকে অভিযান চালিয়ে বেরুবাড়ি শরণার্থী শিবিরের জন্য হামকির সৃষ্টি করে গোথেছে, তেমনি গলেয়া শক্র ঘাঁটি সাকাতি শরণার্থী শিবিরের জন্য প্রচও রকমের হামকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। গলেয়া ঘাঁটির রাজাকার ও পাকসেনা সদস্যদের সশ্রিত্ব ব্যাহুনি মোটামুটি শক্তভাবে গেড়ে বসেছে সেখানে এবং আশপাশের এলাকায় অভয়ন্তর চালিয়ে কায়েম করেছে তাসের রাজত্বে। পেয়াদাপাড়ার দল মূলত এদের সাথেই অঘাতে লিঙ্গ রয়েছে।

এর আগেও তারা দুর্ভিন্বার প্রক্ষেপ পাকবাহিনীর ঘাঁটিতে আঘাত হেনেছে, বিচ্ছিন্নভাবে এ ঘাঁটির সৈন্যদের সাথে সংঘর্ষেও লিঙ্গ রয়েছে। কিন্তু গলেয়াতে শক্রবাহিনী এতো শক্তভাবে ঘাঁটি গেড়ে বসেছে যে, তাদের এখনো উৎখাত করা সম্ভব হয়ে ওঠে নি। এ অঞ্চলে মুক্তিবাহিনীর তৎপরতার কারণেই তাদের এই শক্তি বৃদ্ধি। আর তাদের মদদ দিয়ে চলেছে কয়েকজন প্রভাবশালী স্থানীয় জোতদার শ্রেণীর মানুষ। যারা পাকিস্তান রক্ষার জন্য যোরিয়া হয়ে উঠেছে, রাজনৈতিকভাবে যাদের পরিচয় মুসলিম লীগার হিসেবে। তাই গলেয়া শক্র ঘাঁটিকে ঠাণ্ডা করার জন্য তাদের ওপর জোরালো আঘাত হন। জরুরি হয়ে দেখা দিয়েছে। অবশেষে তাই সিদ্ধান্ত নেয়া হয় আমাদের তিনটি স্কোয়াডের সশ্রিত শক্তির সাহায্যে গলেয়া আক্রমণ করার। আক্রমণ পরিকল্পনা রচনা করা হয় সারাদিন ধরে মাথা ঘামিয়ে। সিদ্ধান্ত হয়, রাত নটায় শুরু করা হবে গলেয়ার মুদ্র অভিযান। গতরাতের মণ্ডলের হাট আক্রমণের অনুরূপ ধারাতেই আজকের অভিযানে ঝওনা দেয়া হয় দলবলসহ। পেয়াদাপাড়ায় দলকে সমবেত করে চূড়ান্ত ব্রিফিংশেষে ঝওনা দিই। অতিক্রম করতে হয় অনেকটা দূরের পথ। আজকের সিদ্ধান্ত হচ্ছে, তিন স্কোয়াডের সশ্রিত শক্তি দিয়ে যে করেই হোক গলেয়া ঘাঁটি থেকে শক্র দলকে উৎখাত করতে হবে।

গলেয়া শক্র ঘাঁটি অভিমুখে আমরা তিন দিক দিয়ে এগিয়ে চলি। তিন দলের যুগপৎ আক্রমণে ঘায়েল করতে হবে শক্র বাহিনীকে। আমাদের গোলাগুলির মুখে প্রাথমিক বিদ্রোহ

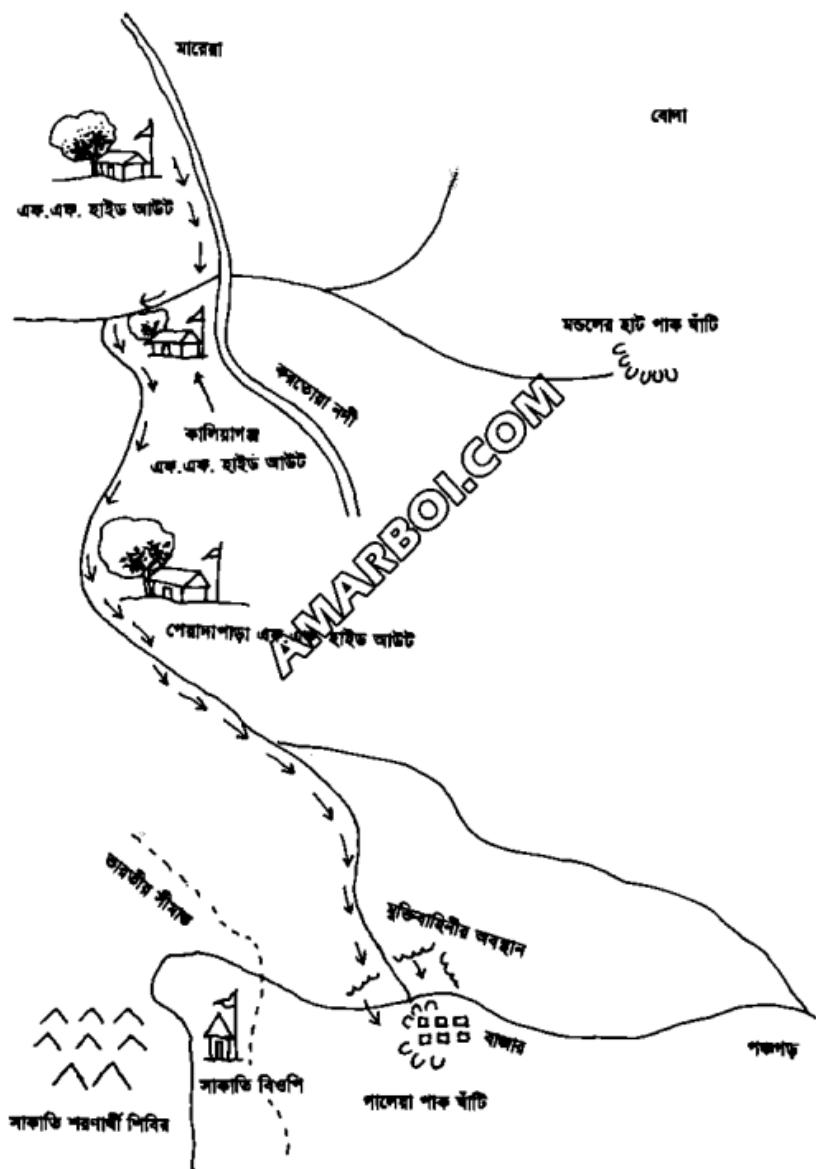
কাটিয়ে শক্র অবশ্যিই প্রতিআক্রমণ চালিয়ে যাবে তাদের নিজেদের অবস্থান থেকে। কিন্তু তার সঙ্গে পার্শ্ব দিয়ে আমাদের তরফ থেকে তাদের ওপর চাপ অব্যাহত রাখবো সম্ভাবে। সর্বাঙ্গে চেষ্টা চালানো হবে শক্রের প্রতিরক্ষা লাইনে ফাটল ধরানোর জন্য। যুদ্ধ চলা অবস্থায় শক্রের যে জায়গাটি দুর্বল প্রতিপন্থ হবে, সেদিকেই প্রচণ্ড আক্রমণ চালিয়ে শক্রের প্রতিরক্ষা লাইন ভেড়ে করতে হবে। আর এটা করতে পারলে শক্র তাদের অবস্থান ছাড়তে বাধ্য হবে। তারপরই সমিলিতভাবে ঝড়ের বেগে ঝাপিয়ে পড়ে শক্রের ঘাঁটি দখলে নিয়ে বাদবাকি কাঞ্চগুলো করতে হবে।

আমার অবস্থান আজ বাঁয়ে। মাঝখানে আহিনীর। ডানে বদিউজ্জামান। খলিল-মতিয়ারসহ পুরনো ক'জন সাধী রয়েছে আমার সাথে। শক্র ঘাঁটির পেছনের দিকে অর্থাৎ পঞ্চগড়গামী রাস্তাটা লক্ষ্য করে এগুচি আমি। উদ্দেশ্য রাস্তার দুদিক দিয়ে শক্রের পেছনে আঘাত হালা। এই সাথে রাস্তাটাকেও যাতে কভার দেয়া যায়। এ অবস্থায় পঞ্চগড় থেকে দ্রুত আগত সাহায্যকারী শক্র দলকেও ঠেকিয়ে দেয়া যাবে। পেছন থেকে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন অবস্থানে থাকা শক্র বাহিনীর মনোবল এই পরিস্থিতিতেই ভেঙে পড়তে বাধ্য। আজ তিন দলের সাথেই মৰ্টার রয়েছে। এল.এম.জি. রয়েছে মোট পাঁচটা। এস.এল.আর. আনা হয়েছে বেশি সংখ্যায়। প্রত্যেক কমান্ডারের কাছে রয়েছে টেলগান। ছেনেড দেয়া হয়েছে প্রত্যেককে দুটো করে। রেয়ার চার্জ আনা হয়েছে বাক্সারসহ অন্যান্য সংস্থাপনা উভিস্তু দেয়ার জন্য। মোট ৪৫ জন যোদ্ধা অংশগ্রহণ করছে আজকের যুদ্ধে। গাইড হিসেবে এবং গোলাবাকুদসহ অন্যান্য জিনিসপত্র বহন করার জন্য আরো ৮ থেকে ১৫ স্থায়ী লোক এসেছে। আজকের দলটা সতীই ভাবি আর শক্র। যুদ্ধের সময় প্রতিটি ক্রুয়াচের স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নেয়ার অধিকার রয়েছে। কিন্তু প্রত্যেক দলের লক্ষ্য থাকে প্রকটাই। আর সেটা হচ্ছে অপারেশনে সফলতা অর্জন। অবস্থা বেগতিক দেখলে কিন্তু সিদ্ধান্তহীনতার কারণে কোনো দলই তার পেয়ে অন্যদের ফেলে পালিয়ে যাবে না। এইজন্যে যাবার সিদ্ধান্ত নেয়া হবে যৌথভাবে। আর সেটা অপারেশন সফল বা বিফল যা-ত হোক না কেনো!

আয় তিনশো গজ দূরে থাকতেই গুলি শুরু করে দেয় মাঝখানে থাকা দলটা। আরো কিছুটা এগিয়ে যাওয়া যেতো, কিন্তু তাদের তর সহ নি। এ অবস্থায় নিজের অবস্থানের দিকে দৌড়ে এগিয়ে যাওয়া ছাড়া কোনো গত্যত্ব থাকে না। তাই দৌড়েই চলি উচু রাস্তাটা লক্ষ্য করে। ডানদিকের দল থেকেও গুলিবর্ষণ শুরু হয়ে যায় এর পরপরই, কিন্তু তাদের অবস্থান আরো পেছনে। পরিকল্পনা মাফিক ওরা আক্রমণ শুরু করে এগিয়ে না এসে স্ব-স্ব অবস্থানে থেকে গোলাগুলি চালিয়ে যাওয়া বিপদের কথাই বটে। সবকিছু ভেঙ্গে যাবে তা হলে। সে ক্ষেত্রে সমস্ত চাপটাই এসে পড়বে আমার ওপর। কিন্তু সে কেথা এখন ভাববার অবকাশ নেই। আকাশে ফিকে চাঁদের আলো মাথায় করে দৌড়ে চলি পানি-কাদয় একাকার খেতবাড়ি ভেঙে, রাস্তার ঢাল বেয়ে শক্র পক্ষের অবস্থানের শ' গজের কাছাকাছি এলাকা দিয়ে।

এই সময়ই শক্রের ঘাঁটি থেকে কানে এসে আছড়ে পড়ে সামান্য শব্দ। শোনা যায় চিন্কার করে কাউকে নির্দেশ দেয়ার কথা। মর্টারের দুটো শেল এসে পড়ে তাদের ঘাঁটির বাম দিকের ৪০ থেকে ৫০ গজের ভেতরে। আরো দুটো শেল উড়ে আসার আভাস পাওয়া যায় আকাশে সেই পরিচিত ধ্বনি তুলে। মুহূর্তের ভেতরে সে দুটো সশব্দে বিক্ষেপিত হয় শক্র ঘাঁটির কাছাকাছি। শক্র এবার মহাব্যাতিব্যন্ত হয়ে তাদের প্রতিআক্রমণ শুরু করে। গুলির স্রোত বয়ে

কেচ মাল্প-১১
গালেরার মুক
৩৩-৩০-৭৩
(কেল ছাঢ়া)



চলে সামনে গোলাতলিরত আমাদের দুটো দলের উদ্দেশ্যে। শক্র আক্রমণের মুখে তারাও জবাব দিয়ে চলে সাধ্যমতো। বাক্সা-ট্রেইনের সুরক্ষিত অবস্থান পাকবাহিনীর। তাদের বিরতিবিহীন গুলিবর্ষণ চলতে থাকে আগনের ফুলকি তুলে তুলে। আমরা শক্র ঘাঁটির মোটামুটি পেছনে এসেই পৌছেছি। আমাদের সামনেই চলতে থাকে আক্রমণ-প্রতিআক্রমণময় যুদ্ধের তাঁওবলী। আরো দুটিনটা মর্টারের শেল উড়ে আসে। কানে তালা ধরানো শব্দে। এদের ভেতর থেকে একটা বিক্ষেপিত হয় শক্র ঘাঁটির ভানদিকের গা ঘেঁষে, অন্য দুটো সামনে। দোবা যায় মর্টারের শেল শক্র ঘাঁটির মাঝামাঝি জায়গায় আঘাত করতে পারছে না। শক্র ঘাঁটিতে লক্ষ্যভোলী মর্টারের শেল ফেলতে পারলে তাদের অবস্থা সঙ্গিন করে ফেলা যেতে পারতো। এই এখন আবার আমাদের বাঁ-দিককার আকাশ দিয়ে উড়ে যায় সহযোগাদের ছেঁড়া গুলি পরিচিত সেই শিস বাজানো শব্দ তুলে। এক সঙ্গে তিনি দলেরই আক্রমণের কথা থাকলেও আমরা এখন গুলিবর্ষণ থেকে বিরত রয়েছি। আর সেটা এ কারণে যে, আমরা এখনই গুলিবর্ষণ শুরু করলে শক্র আমাদের অবস্থান বুঝে ফেলবে। ফলে তারা অলরাউন্ড ডিফেন্স কায়দায় অবস্থান নিয়ে নিজেদের প্রতিরক্ষা লাইনের মজবুত খেলসে কাছিমের মুখের মতো গুটিয়ে নেবে, যেটা ব্রেক থ্রো করা বা ভেঙে ফেলা অসম্ভব হয়ে পড়বে। আমাদের পক্ষ থেকে এই স্ট্র্যাটেজি গ্রহণ করার ফলে শক্রপক্ষের পেছনের দিকটা খোলা রয়েছে, ওরা এখন সামনের দিক নিয়েই ব্যস্ত। পেছনের দিককার এই খোলা প্রক্ষেপিত জায়গাটাই হচ্ছে এখন তাদের দুর্বলতম এষ্টি। চূড়ান্ত আঘাত হানতে হবে প্রতিক দিয়েই। সামনের আমাদের দু' ক্ষেত্রাদ গুলির মুখে তারা এগিয়ে আসার ব্যাপ্তিতে ততোটা সুবিধে করতে না পারলেও বিরতিবিহীন যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। এ ধারা যুদ্ধ এক্ষেত্রে চালিয়েই যাবে ভাবসাব দেখে মনে হয়।

শক্র, মালেক, মজিদ আর খলিলকে দিয়ে আবার একটা কমাডো দলের মতো গঠন করি। প্রত্যেকের কোমরে আরো দুটো করে প্রেসেড গুঁজে দিই। খলিল আর শক্রের হাতিয়ার নিয়ে ওদের দুটো টেনগান দিয়ে দ্রুত প্রস্তুত যেতে বলি রাস্তার ঢাল দিয়ে। শক্র ঘাঁটির ভেতরে চুকে প্রেনেড হামলা চালাবে প্রস্তুত এবং সম্বৰ হলে টেনগানের ব্রাশের সাহায্যে মেশিনগান বাসানো দুটো বাক্সারের দখল নেবে।

খলিল তার দল নিয়ে এগিয়ে যায়, অবশিষ্ট ছেলেদের নিয়ে কভার দিতে দিতে এন্টে থাকি আমি দ্রুত। প্রায় ৫০ গজের ভেতরে এসে মাটিতে বুক লাগিয়ে অবস্থান নিই একব্রামুলকে ডানে রেখে। মধুসূন তার এল.এম.জি. থেকে গুলি ছেঁড়ার প্রস্তুতি নিয়ে ফেলে। মতিয়ার সর্তক থাকে তার এস.এল.আর. নিয়ে আমার পাশ ঘেঁষে। বিশ্বস্ত চাঁদ মিয়া ঠিক আমার পেছনে। তার অবস্থানটা এরকম যে, যুদ্ধ নয়, অন্যদের কভার দেয়া নয়, তার প্রধানতম কাজ হচ্ছে একমাত্র আমাকে কভার দিয়ে শক্রের হাত থেকে বাঁচিয়ে রাখা। যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যাটম্যানদের নিজের জীবন বিসর্জন দিয়ে তাদের অফিসার বা উর্ধ্বতন কারুর জীবন রক্ষা করার অপূর্ব সব আস্তায়গের ঘটনা রয়েছে। চাঁদ মিয়ার বিশ্বস্ততা বর্তমানে সে পর্যায়েই পৌছেছে। বারবার বলা সন্তোষ সে নিজেকে আধা শোয়া অবস্থায় রেখে তার হাতিয়ার আমার মাথার ওপর দিয়ে তাক করে ধরে থাকে সামনের দিকে। দারুণ অস্থিরতা সবার মধ্যে। বুকের ভেতরে বেজে চলে সবারই ঢাকের বাদি-বাজনা। সারা শরীর যেমে চুপচুপে হয়ে যায়। ১০/১৫ মিনিটের জন্য নিষ্কাস বন্ধ করে অপেক্ষায় থাকা, তারপর সামনের দিকে নীল আর সবুজাত আলো হঠাতে করে ঝলসে ওঠে। তারপরই শুরু হয় বিক্ষেপণের পর বিক্ষেপণ। আর এর মূলে যাবতীয় কৃতিত্ব খলিলের দলের

ফেনেড হামলার। উড়ে আসে আরো দুটো মর্টারের শেল। শক্র ঘাঁটির একেবারে সামনে বিক্ষেপিত হয় সে দুটো। তীব্র আলোর বিচ্ছুরণ ঘটিয়ে গগনবিদিমী শব্দ, ধোঁয়া, বালু, কাদা ও পোড়া বারুদের গন্ধ, মাথার ওপর দিয়ে বাতাস কেটে শুলির ছোটাছুটি। সবকিছু মিলিয়ে একটা নারকীয় পরিবেশের সৃষ্টি হয়। আর এরি ভেতরে আমার মুখ থেকে বেরিয়ে আসে চা-জ্ঞ। শব্দটা উচ্চারণ করেই উঠে দাঁড়িয়ে ক্ষিপ্তভিত্তে সামনের দিকে এগিয়ে যাই। খলিলের দল তাদের পজিশন থেকে উঠে এসে যোগ দেয় আমাদের সামনে। প্রায় অক্ষের মতো এগিয়ে গিয়ে বাজারের ভেতরকার রাস্তাটার ওপর অবস্থান নিয়ে গলি চালাতে থাকি সবাই। এখন যে আমরা শক্রের ঘাঁটির ভেতরে অর্থাৎ একেবারে বাধের গুহার ভেতরে আমাদের অবস্থান, সে বোধটা কাজ করে না মনের মধ্যে। আসলে সবাইকে যেনো কেমন বোধশূন্য একটা আচ্ছন্নতা পেয়ে বসেছে। হতিয়ার সচল রেখে শুলিবর্ষণ করা ছাড়া আর কোনো অনুভূতিই কাজ করে না।

এ অবস্থাতেই প্রায় ৫/৭ মিনিট কেটে যায়। আর তারপরই হঠাত করে শক্রের শুলিবর্ষণ থেমে যায়। চিৎকার, হড়েছড়ি আর শোরগোল ভুলে পালাতে থাকে শক্রপক্ষের লোকজন বাজারের অপরদিকের খোলা মাঠের দিকে। শক্র পালিয়ে যাচ্ছে, এ ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার পরপরই ছেলেদের এগিয়ে যেতে বলি দোকানঘর ও বাজারের ভিটি, এসবের আড়াল নিয়ে। তবে আমাদের তরফ থেকে শুলিবর্ষণের চাপ অব্যাহত থাকে। জামার পকেট থেকে ফেনেড বের করে দাঁতে কাষড়ে পিন খুলে ছুঁড়ে দিই সামনের ছিটকে মতিয়ার, খলিল, শঙ্কুর হাত থেকেও ছুটে যায় সামনের দিকে একইভাবে ফেনেড প্রক্ষেপণের পর বিক্ষেপণ। এরপর সামনের দিকে ছুটে গিয়ে শুরু হয় শক্রের বাক্সে ছেলেদের পালা। বলতে গেলে শুবই স্বল্প সময়ের ব্যবধানে ঘটে যায় প্রায় অবিশ্বাস্য ঘটনাটা। আর ঘটনার পরপরই কে একজন ‘জয় বাংলা’ শ্বেতাঙ্গ দিয়ে ওঠে। অঞ্চলের ক্ষেত্রেই ‘জয় বাংলা’ শ্বেতাঙ্গে মুখর হয়ে ওঠে দখল করা শক্র ঘাঁটি গলেয়া বাজার। দূরে, সমন্বয়ের দিক থেকে শুলিবর্ষণ থামিয়ে দিয়ে মুক্তরত দু'দলের ছেলেরাও মুখর হয়ে ওঠে। ‘জয় বাংলা’ শ্বেতাঙ্গে শ্বেতাঙ্গ। দৌড়ে আসতে থাকে তারা গলেয়ার দিকে। একটা টেক্কি থেকে টেনে-হিচড়ে বের করে আনে ২ জন রাজাকারকে। প্রতিটি বাক্সার-টেক্কি চার্জেরত ছেলেরা। রাইফেলসহ ধরা পড়া দু'জন রাজাকার পালাবার ফুসরতই পায় নি। কিন্তু বলবার আগেই শুলিতে শুলিতে ঝাঁঝাড়া হয়ে যায় বাজাকার দু'জনের শরীর। মৃহূর্তে তারা লুটিয়ে পড়ে মাটিতে। ওরা এসে পড়েছে সবাই। এবার সশ্বিলিতভাবে শক্র ঘাঁটিগুলো নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার কাজ শুরু হয়। বাক্সারগুলো উড়িয়ে দেয়া হয় চার্জ লাগিয়ে লাগিয়ে। দোকানের চালানগুলোতে আগুন ধরিয়ে দেয়া হয়। একটা বড়ো ঘর, যেটা সম্ভবত তাদের মূল আশ্রয় কেন্দ্র, সেটাও চার্জ দিয়ে উড়িয়ে দেয়া হয়। বেশিক্ষণ সময় লাগে না এসব করতে। দূর থেকে অর্থাৎ তালমা-পানিয়াছ থেকে তখন শক্রের শুলিবর্ষণ শুরু হয়। সম্ভবত গলেয়া ঘাঁটিতে দক্ষযজ্ঞের ব্যাপারটা আঁচ করতে পেরেই নিজেদের ঘাঁটি রক্ষার কারণেই তারা শুরু করেছে শুলিবর্ষণের এই ঘটনাটা।

যাই হোক, সব কাজ শেষ হয়ে যায় সফলতার সঙ্গেই। একটা বিরাট বিজয় অর্জিত হয় পরিকল্পিত আক্রমণ, দৃঢ় মনোবল আর আমাদের সবার সশ্বিলিত প্রচেষ্টার কল্পনায়ে। এই সময় হঠাত মতিয়ারকে বসে পড়তে দেখা যায়। কাপড় ছিঁড়ে তার উরুর সামনের দিকের মাস্সে স্পন্দনারের আঘাত লেগেছে। লড়াইয়ের উন্নাদনায় সেটা সে বুঝতেই পারে নি। মধুও আঘাত পেয়েছে পিঠের দিকে, মজিদ মিয়ার মুখ বেয়ে রক্ত ঝরছে। ওর মাথায় আঘাত

লেগেছে। তবে কোনোটাই গুলির নয়, শেলের ও প্রেনেভের ছিটকে আসা স্প্লিটারের। আফতাবের বাঁ হাতের বেশ খানিকটা পুড়ে গেছে। বাটপট তাদের ক্ষত স্থানগুলো বেঁধে ফেলা হয় গামছা দিয়ে। গোলাগুলিসহ বেশিকিছু কাপড়চোপড় আর অন্যান্য জিনিসপত্র পাওয়া যায়। তবে মৃত রাজাকার দু'জনের রাইফেল দুটো ছাড়া আর কোনো হাতিয়ার পাওয়া যায় না। পলায়নপর শক্ত বাহিনী তাদের হাতিয়ারগুলো সব নিয়ে যেতে পেরেছে। জয় বাংলা শ্লোগান ধরে আবার একজন। এবার সমস্তের সবাই তার প্রতিধ্বনি করে। বিভিন্ন শক্ত ঘাঁটি, বাতাসে পোড়া বাকদের গুৰু, ধোয়া, দোকানের চালার দাউডাউ আঙুনের মধ্যে সমিলিত 'জয় বাংলা' শ্লোগানে মুখরিত পরিবেশ। বিজয় আর সাফল্য আনন্দের বন্যা বইয়ে দেয় সবার মধ্যে। এবার ফল ব্যাক, অর্থাৎ ফিরতি যায়। নিজেদের আন্তর্নায় ফিরতে ফিরতে আকাশ পরিষ্কার হয়ে আসে। গাছের ডালে ডালে পরিদের পাঁচমিশেলি গান শুনতে শুনতে ক্লান্ত পদবিষ্কেপে হেঁটে চলে সবাই। ভোরের নরম কোমল বাতাস স্পর্শ করে যায় শরীর, মনের গভীরে ছলছল ঝরনার গান। রাতের লড়াইয়ের সমস্ত ক্লান্তি-শ্বাসি ধূয়েমুছে যেতে থাকে।

১১. ১০. ৭১

খালেক জামান ও মধ্য অষ্টোবর্ষের ক্রন্ত

টোধুরী খালেকজামানকে খবর পাঠিয়েছিলাম আসবার জন্য। সে এসেছে।

আগের দেখায় তাকে বলেছিলাম, এভাবে কিছুই হবে না। জলপাইগুড়িতে বসে রাজনৈতিক পরিস্থিতির পর্যালোচনা, মূল্যায়ন-সভা কিংবা শরণার্থী স্থানবরে ঘুরে ঘুরে উদ্বান্ত মানুষদের ভেতরে কাজ করে কোনো লাভ নেই। কাজের অসমীয়া শক্ত হচ্ছে অধিকৃত এলাকা, সেখানকার মানুষজন। যারা শরণার্থী হয়ে সীমান্তের প্রস্থানে চলে গেছে, তাদের প্রধান চাওয়াই হচ্ছে যতো তাড়াতাড়ি সংব 'জয় বাংলা' হোক। তাঁদের কাছে নতুন করে 'জয় বাংলা' অর্থাৎ স্বাধীনতার কথা প্রচার করে লাভ নেই। অসমীয়া আসা দরকার ছ্রন্তে। ছ্রন্তের সঠিক অবস্থাটা দেখা দরকার, বোঝা দরকার যুদ্ধরত প্রক্ষেপ্যদ্বাদের বর্তমান চিন্তাচেতনা সম্পর্কে এবং তাদের গৃহীত কর্মসূচি সম্পর্কে যতোন্তর সংব অধিকৃত এলাকার মানুষজনকে অবহিত করাও দরকার, স্বাধীনতার পক্ষে তাদের সন্তুর করে তেলার জন্য তাদের মধ্যে কাজও করা দরকার। অধিকৃত এলাকার মানুষজনের মধ্যে জয় বাংলার পক্ষে প্রচারণা নেই কোনো। গোপনে কেবল স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্র শোনার ভেতর দিয়েই তারা স্বাধীনতা যুদ্ধের তৎপরতা আর অঞ্চলিত সম্পর্কে জানতে পারছে। অধিকৃত এলাকায় স্বাধীন বাংলা বেতার শোনার ব্যাপারটা পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষের কাছে দেশব্রহ্মাণ্ডে অপরাধ। এজন্য অনেককেই ধরা পড়ে জীবন দিতে হয়েছে। তাই অত্যন্ত গোপনে লুকিয়ে স্বাধীন বাংলা বেতার শুনতে হয় অধিকৃত এলাকার বিশেষত, হাম-গঞ্জের স্বাধীনতার সপক্ষের নির্বেদিতপ্রাণ মানুষজনদের। এছাড়া গ্রাম-দেশে ক'জন মানুষেরই-বা রেডিও সেট আছে? যাদের রয়েছে, তারা খোলাখুলি কেবল রেডিও পাকিস্তান ঢাকা কেন্দ্রের অনুষ্ঠান শুনতে পারে। কিন্তু ঢাকা কেন্দ্র সম্প্রচারিত প্রচারণা বর্তমানে হিটলারের প্রচারকর্তা গোয়েবলসের প্রচারণাকেও হার মানাতে বসেছে। ডা. মালেক এখন পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর। সর্বদলীয় মন্ত্রিপরিষদ গঠন করা হয়েছে তাকে মধ্যমণি করে। দেশের অবস্থা শান্ত হয়ে এসেছে, দেশের মানুষ পাকিস্তানের সংহতি রক্ষায় বদ্ধপরিকর, তারা স্বাধীন বাংলাদেশ চায় না, দেশের অবস্থা স্বাভাবিক, স্কুল-কলেজ-ইউনিভার্সিটিতে ক্লাস ইত্যাদি ঠিকঠাক মতোই চলছে, শরণার্থীরা

দলে দলে ফিরে আসছে, ভূলপথে পরিচালিত ছাত্র-তরঙ্গের দল তাদের ভূল বুঝতে পেরে ভারতের মাটি থেকে দেশে ফিরে আসছে। মুক্তিযোদ্ধা পরিচয়ে একঙ্গের ভারতীয় অনুচর কোনো কোনো সীমান্ত এলাকায় সন্ত্রাসী তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে, তারা দেশের শক্তি, ভারতের দলাল। পাকিস্তানের বীর সৈনিক আর রাজাকার ও আলবদর বাহিনী তাদের ঝুঁসে ঘার দিয়ে চলছে। মুক্তিযুদ্ধের নামে যা কিছু চলছে, সেটা ভারতীয়দের কারসাজি ছাড়া আর কিছু নয়। তারা কোনোদিনই পাকিস্তানের সংহতি চায় নি, এখন তারা তাদের এজেন্টদের যোদ্ধা সাজিয়ে মুক্তিযোদ্ধা বলে চালিয়ে দিচ্ছে, পাকিস্তান থাকবে...।

এ জাতীয় খবরই কেবল প্রচার করা হচ্ছে রেডিও পাকিস্তান ঢাকার কেন্দ্র থেকে। আর এসব খবর শুনলে অধিকৃত দেশের মানুষজনের বিভ্রান্ত হওয়াই স্বাভাবিক। তাছাড়া, মুক্তিযুদ্ধের অগ্রগতি এই মধ্যে অঞ্চলের পর্যন্ত তেমন উল্লেখযোগ্য না হলেও দিন দিন তা সুসংহত হয়ে উঠছে। ইতিমধ্যে গঠিত হয়েছে বাংলাদেশ সশ্ত্র বাহিনী। পালিয়ে আসা অফিসারদের নিয়ে সেঁটরগুলোয় পরিচালিত হচ্ছে যুদ্ধ। সেনাপতি জেনারেল শুসমানী এবং ১১টি সেঁটরের নিয়োজিত সেঁটের কমান্ডাররা তাদের দায়িত্বপ্রাপ্ত এলাকায় মুক্তিযুদ্ধকে সুসংহত রূপ দেয়ার ব্যাপারে সর্বাঙ্গিক চেষ্টায় লিপ্ত। পাকিস্তান এয়ার ফোর্স থেকে পালিয়ে আসা কিছু অফিসার গ্রাউন্ড ফোর্সের অধিনায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। আমরা পড়েছি ৬০ৎ সেঁটরের অধীনে। এর সেঁটের কমান্ডার নিযুক্ত হয়েছেন উইং কমান্ডার বাশার। প্রতিটি সেঁটেরকে প্রয়োজনানুসারে সাব-সেঁটের ভাগ করা হয়েছে। আমরা পড়েছি ৬-এ সাব-সেঁটের অধীনে। যার কমান্ডার হচ্ছেন ক্ষোয়াড়ুন লিডার সদরদিন। প্রাইট লেফটেন্যান্ট ইকবাল পেয়েছেন নীলকামারী এলাকার সাব-সেঁটের দায়িত্ব। মাঝের নওয়াজেশের দায়িত্ব পড়েছে কুড়িয়া-রংপুর-সাব সেঁটের। এয়ার ফোর্সের অস্থায়ী প্রাইভেট ফোর্সে যোগদান করায় মুক্তিযোদ্ধা ও জনগণের মধ্যে সেনাবাহিনীর কায়দার তাদের পদবিরণ পরিবর্তন হয়েছে। যেমন, উইং কমান্ডার বাশারকে ডাকা হচ্ছে ক্ষোয়াশার নামে, ক্ষোয়াড়ুন লিডার সদরদিন হয়েছেন মেজর সদরদিন নামে। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পালিয়ে আসা বেশ কয়েকজন আর্মি অফিসারও যোগ দিয়েছেন মুক্তিযুদ্ধে। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রথম কমিশন ব্যাচের তিনি মাসব্যাপী ট্রেনিং চলছে মুক্তি ক্যাম্পে, যাদের মধ্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের বেঢ়ো ছেলে শেখ কামালও রয়েছেন। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর এই কমিশন অফিসারের ব্যাচটি ট্রেনিং সমাপনাত্তে বেরিয়ে এলে, সেঁটেরগুলোতে এখন অফিসারদের যে ঘাটতি রয়েছে, তার কিছুটা প্রৱণ করা সম্ভব হবে।

বর্তমানে সেঁটের সাব-সেঁটেরগুলোতে নিয়মিত মুক্তিফৌজদের নিয়ে সরাসরি যুদ্ধ পরিচালনায় মূল ভূমিকা রাখছেন সুবেদার ও নায়েব সুবেদার পর্যায়ে জে, সি.ও.বুন্দ। এফ.এফ.দের নিয়ে গেরিলা যুদ্ধ পরিচালনার দায়িত্ব রয়ে গেছে এখন পর্যন্ত ভারতীয় সেনাবাহিনীর ডেপুটেড আর্মি অফিসারদের হাতে। অবশ্য কোনো কোনো সেঁটের এফ.এফ.রা পরিচালিত হচ্ছে সরাসরি সেঁটের কমান্ডারদের নেতৃত্বে। কিন্তু এ সেঁটের এখনও সেটা করা সম্ভব হয় নি। সেই জুন থেকে এই এখন মধ্যে অঞ্চলের পর্যন্তও আমাদের যাঁরা পরিচালনা করে আসছেন, তাদেরকেই সেটা এখনো করে যেতে হচ্ছে। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সাথে এ পর্যন্ত আমাদের যোগাযোগ ঘটে নি, না সেঁটের কমান্ডার, না সাব-সেঁটের কমান্ডার পর্যায়ে। সেখান থেকে কেউ আমাদের হোজুখবর নিতে আসেন নি, আসেন নি ফ্রন্টের অবস্থাও দেখতে। মোট কথা আমাদের সেঁটের কমান্ডার ও সাব-সেঁটের কমান্ডারদের কেবল নামই আমরা শনেছি, তাদের দেখবার বা তাদের

সাথে পরিচিত হোৱাৰ সৌভাগ্য হয় নি। তাৱা ইছে কুলেই আমাদেৱ সাথে যোগাযোগ কৰতে পাৱেন, এ যোগাযোগটা যুক্তেৰ এই সময়টাতে একাত্ম প্ৰয়োজনীয়, কিন্তু কেনো যে তাৱা এই সময়োচিত বাস্তব কাজটি কৰছেন না, সেটা একটা বিৱাট ধাঁধা বা জিজ্ঞাসা হয়েই আছে আমাদেৱ কাছে। পাশাপাশি একই সেষ্টেৰে একই ফ্ৰন্টে যুক্ত কৰছি আমৱা, কিন্তু তাদেৱ সাথে আমাদেৱ এই বাহিনীৰ কিংবা তাৱ কম্বাভাৱদেৱ সাথে কোনোই যোগাযোগ নেই। এৱ ফলে অনেক বিদ্বেষ আৱ বিভেদেৱ জন্ম দিছে মূক্তিফোঁজ আৱ এফ.এফ. বাহিনীৰ মধ্যে। তাৱা যেমন আমাদেৱ আপন ভাৱে না, তাদেৱ ব্যাপারে আমাদেৱ মনোভাৱও একই রকমেৰ। কিন্তু কিন্তু ক্ষেত্ৰে তো উভয় দলেৱ মধ্যে এই বিদ্বেষপ্ৰসূত মনোভাৱ রীতিমতো শক্রতা এবং সংঘৰ্ষেৰ পৰ্যায়ে লেৱ গেছে।

আৱেকটি মনন্তাৰ্দ্বি কাৱণও পীড়া দেয় আমাদেৱ। আৱ সেটা হলো, দেশীয় নয়, এমন অফিসাৱদেৱ কমাত্মে পৱিচালিত হওয়াৰ অৰ্থাৎ যুক্ত কৰাৰ ব্যাপারটি। মাঝে মাঝে তাদেৱ আদেশ-নিৰ্দেশ মনে জন্ম দেয় ইনশন্সন্ত্যাতাৰ। মাঝে মাঝেই মন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে তাদেৱ কথাৰ্বার্তা আৱ আচাৰ-ব্যবহাৰে; কিন্তু উপায় থাকে না কোনো। হয়তো একদিন এৱ অবসান ঘটবে। তখন আমৱা আমাদেৱ সেষ্টেৰ কম্বাভাৱ বা সাৰ-সেষ্টেৰ কম্বাভাৱদেৱ দেখতে পাৱো আমাদেৱ অফিসাৱ হিসেবে; কিন্তু সেটা কদিনে হবে, কে জানে?

খালেক যে দলেৱ সাথে জড়িত, সেই দলেৱ রাজনৈতিক উৰ্বৰ ক্ষেত্ৰে পৱিণত এখন আমাদেৱ এই ফ্ৰন্টভুক্ত এলাকাটি। বোদা থানা অৰ্থাৎ গোটাযুটি বাম রাজনৈতিৰ শক্ত ধাঁটি হিসেবেই পৱিচিত। এখানকাৱ কমিউনিস্ট পাৰ্টি আৰু মোজাফফৰ ন্যাপেৰ সংগঠন অত্যন্ত সুসংগঠিত, শক্তিশালীও। কমিউনিস্ট পাৰ্টিৰ স্বামীজীতাৰ রউফ, মনু ও ন্যাপ নেতা লুংহৰসহ অনেকেই বৰ্তমানে ধাঁটি স্থাপন কৰে নিজেসহ দলেৱ সাংগঠনিক তৎপৰতা চালিয়ে যাচ্ছেন। কমৱেডে রউফকে আমৱা মাৱেয়া ধৈৰ্যকৃতিকাৰ কৰে এনেছি, বৰ্তমানে তিনি মানিকগঞ্জে ভালোই আছেন তাৰ সংগঠন নিয়ে শোনা গেছে, কমৱেডে আলম চৌধুৱীকে ওৱা মাৱেয়া থেকে ধৰে নিয়ে গিয়ে এখন বাস্তকৰে রেখেছে ঠাকুৱগোও ই.পি.আৱ. হেড কোয়ার্টাৰ অৰ্থাৎ ঠাকুৱগোও পাকিস্তানি আৰ্মি গ্যারিসনেৰ বায়েৰ খাচায়। খাচাৰ একপাশে একটা জীৱন্ত হিস্তি বাষ, অন্যদিকে আলম চৌধুৱী, মাৰ্বাখানে লোহার শিকেৱ একটা পার্টিশন। কী সাংঘাতিক অবস্থা আলম চৌধুৱীৰ! প্ৰতিদিন নাকি তাঁকে আৱ খাচায় বন্দি সেই বাষটিকে নিয়ে আৰ্মি গ্যারিসনেৰ অফিসাৱ অন্যৱা মজা কৰে থাকে। বাষ ছেড়ে দেবে বলে ভয় দেখায় আলম চৌধুৱীকে। হয়তো একদিন সতিই ছেড়ে দেবে তাৱা বাষটাকে এবং সেটা জীৱন্ত আলম চৌধুৱীকে মুহূৰ্তেৰ ভেতৱে তাৱ নথেৰ থাবাৰ আঘাতে আঘাতে ছিন্নভিন্ন কৰে ফেলবে। ঘাড় ঘটকে পান কৰবে তাৱ রুক্ত। আৱ সেই দৃশ্য পাক আৰ্মিৰা দলবেঁধে দেখবে রীতিমতো ঘটা কৰে। কী নিষ্ঠুৰ বৰ্বৰতা! মধ্যযুগেৰ বৰ্বৰতাকেও হার মানায়। আলম চৌধুৱীৰ জীৱনেৰ ওই পৱিণতিৰ কথা ভেবে এই এখন অনুশোচনায় মন ভৱে যায়, সেই সাথে অসমৰ অপৱাধী মনে হয় নিজেদেৱ। ভাৰি, আৱ একটু এগলেই হয়তো আলম চৌধুৱীকে রক্ষা কৰা যেতো; কিন্তু কে জানতো তাৱা তখন মাৱেয়ায় আলম চৌধুৱীকে বন্দি কৰে রেখেই যুক্ত কৰছে। লিজাৱ কাছ থেকে যখন আমৱা ব্যাপারটা জানতে পাৰি, তখন অনেক দেৱি হয়ে গেছে। পলায়নপৰ শক্রবাহিনীৰ পেছনে অনেকদূৰ পৰ্যন্ত ধাওয়া কৰেও সেদিন তাদেৱ নাগাল পাওয়া যায় নি।

খালেককে পেয়ে ভালোই লাগে। বুদ্ধিমুণ্ড উজ্জ্বল চেহাৱাৰ ছেলে সে, কাৰমহইকেল

কলেজের তুখোড় আর মেধাবী শিক্ষার্থী। ছাত্র রাজনীতিতেও রয়েছে তার পরিচ্ছন্ন ভূমিকা। কী দৃশ্য আর উজ্জ্বল ছিলো খালেকের উপস্থিতি কারমাইকেল কলেজ ক্যাম্পাসে! এখন কেমন রোগাটে হয়ে গেছে। কিন্তু তার সেই অমলিন হাসি, সেই বুদ্ধিদীপ্ত স্মৃতির চেহারা, বিশ্লেষণধর্মী কথাবার্তা এখনো আগের মতোই অক্ষণ্ণ। এই ক'মাসের রাজনৈতিক পরিস্থিতি তাঁকে আরো অনেক ম্যাচুরিটি এনে দিয়েছে।

কলেজ জীবনে ছাত্র ইউনিয়ন করতো খালেক। এপারে এসে কমিউনিটি পার্টির সংশ্লিষ্টে এবং ভারতের মাটিতে পা রেখে সিপিআই নেতৃত্বদের সাথে ঝোবসা করা, রাজনৈতিক বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে তাদের সাথে আলাপ-আলোচনায় একের পর এক অংশ নেয়ার ফলে খালেকের জ্ঞানাশোনা আর চিন্তাভাবনায় গভীরতা এসেছে। মূলত তাদের পার্টির দাঙ্গরিক এবং প্রচারের দিকটাই সে দেখছে। জলপাইগুড়ি সোনাউল্লাহ হাউজে তাদের যে আস্তানা, সেখানে তাঁকে কষ্টকর জীবনযাপন করতে হয়। যেমন নিজের হাতে রান্নাবান্না করে খাওয়াদাওয়া, পার্টির পত্রিকা 'সাম্ভাবিক মুক্তিযুদ্ধ' এবং অন্যান্য প্রকাশনাসহ কাঁধে কাপড়ের ব্যাগ ঝুলিয়ে বেরিয়ে পড়া সীমান্ত অঞ্চলের শরণার্থী শিবির অভিমুখে। এমনি অবস্থায় মাসবানেক আগে পিন্টুসহ আমি তাঁকে আবিষ্কার করেছিলাম বের্মবাড়ি বাজারে। 'মুক্তিযুদ্ধ' পত্রিকা ছিল তার হাতে। পিন্টু ও খালেক ব্যক্তিগতভাবে একে অপরের অন্তরঙ্গ বন্ধু পাশাপাশি পাড়ায় বসবাস করার সুবাদে। পিন্টু হৈচে করে তাঁকে জড়িয়ে ধরে সেদিন বলেছিলো, আরে খালেক তুই এখানে কী করছিস, কবে এসেছিস দেশ ছেড়ে দোষ্ট? খালেকেরও একই প্রশ্ন আসলে আমরা যে এই সেটারে যুদ্ধ করছি, সেটা ওর জানার কথা নয়।

— কেমন আছেন মাহবুব তাই? কিছু জিজ্ঞাসা আর বিস্তৃত ভাব নিয়ে জিগ্যেস করে সে। আমি বলি, তোমার পত্রিকার দাম কত ছে?

— দশ পয়সা, উত্তর দেয় সে।

— ক'টা আছে!

— ৫০টার মতো।

— ঠিক আছে দিয়ে দাও সব, এখানে এই শরণার্থীদের পত্রিকা দিয়ে কি হবে? দেখছো না রেশন তোলা নিয়ে ওদের মধ্যে কি রকম কামড়াকামড়ি, জয় বাংলা করে হবে এই জিজ্ঞাসা আর কেন স্বীকৃতি দিল্লে না ইতিয়া, এইসব ক্ষোভ নিয়ে এদের বসবাস। এদের যে অবস্থা তাতে করে তোমাদের সংগঠনের ভিত্তি তৈরি কিংবা 'মুক্তিযুদ্ধ' পত্রিকা বিতরণ করে স্থাধীনতার প্রতি এদের উজ্জীবিত করা কোনোটাই হবে না। 'মুক্তিযুদ্ধ'র কপি তোমার কাছে যা আছে, তার সবগুলো কপিই আমি তোমার কাছ থেকে কিনে নিয়ে নিছি। আমরা অধিকৃত এলাকায় নিয়মিত অপারেশনে যাচ্ছি, সেখানে এগুলো বিতরণ করে দেবো। আসল কাজ হচ্ছে অধিকৃত এলাকার লোকজনদের মুক্তিযুক্তের পক্ষে ধরে রাখা। এজন্য সীমান্তের ওপারে অধিকৃত এলাকায় প্রচারণার কাজ জোরদার করা প্রয়োজন।

— কিন্তু আমরা ভেতরে যাবো কী করে? খালেক প্রশ্ন করে।

— কেনে আমাদের সাথে যাবে। তোমাদের কাজ হবে জনগণকে মোটিভেট করা। এ ধরনের কর্মসূচি এখন পর্যন্ত নেয়া হয় নি। তোমরা নাও। আমরা সর্বভোগী সাহায্য করবো। চলে এসো ফ্রন্টে। যুদ্ধ দেখাও হয়ে যাবে, তোমাদের কাজও হবে।

ওপরের কথাগুলো মনে ছিলো তাই খালেককে খবর পাঠিয়েছিলাম। আমাদের এ

অর্থলাটা এই এখন ওদের কাজের জন্য খুবই উপযোগী ।

আমি আর খালেক এখন নদীর পাড়ে বসা । কথা গ্রসঙ্গে খালেক বলে, মাহবুব ভাই তেমন কিছুইতো হচ্ছে না । আমাদের ছেলেরা ঢুকতেই পারছে না ভেতরে, আগরতলার দিকে একসাথে না কি আমাদের ১৩ জন ছেলেকে মেরে ফেলা হয়েছে । তাকে বলি, এ অঞ্চলে আগরতলা ফ্রন্টের মতো ঘটনা ঘটবে না । তোমার ছেলেদের রিক্রুট করো, টেনিং-এ পাঠাও । জনগণের কাছে যাও । তাদের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে রাখার রাজনীতি করো, দেশের মানুষ পাকবাহিনীর অভ্যাচারে এক অবশ্যিক দূরবহুর ভেতরে রয়েছে । আর বেশিদিন এমনটা চলতে খালেক দেশের ভেতরে আটকেপড়া মানুষজনের সাপোর্ট আমরা হারিয়ে ফেলবো । সেক্ষেত্রে দেশের সিংহভাগ মানুষ পাকিস্তানের পক্ষে চলে গেলে মুক্তিযুদ্ধের ভেতর দিয়ে দেশ স্বাধীন করাই মুশ্কিল হয়ে পড়বে । খালেক বলে, এজন্যই তো সঠিক অবস্থা কি, সেটা দেখতে আসলাম ।

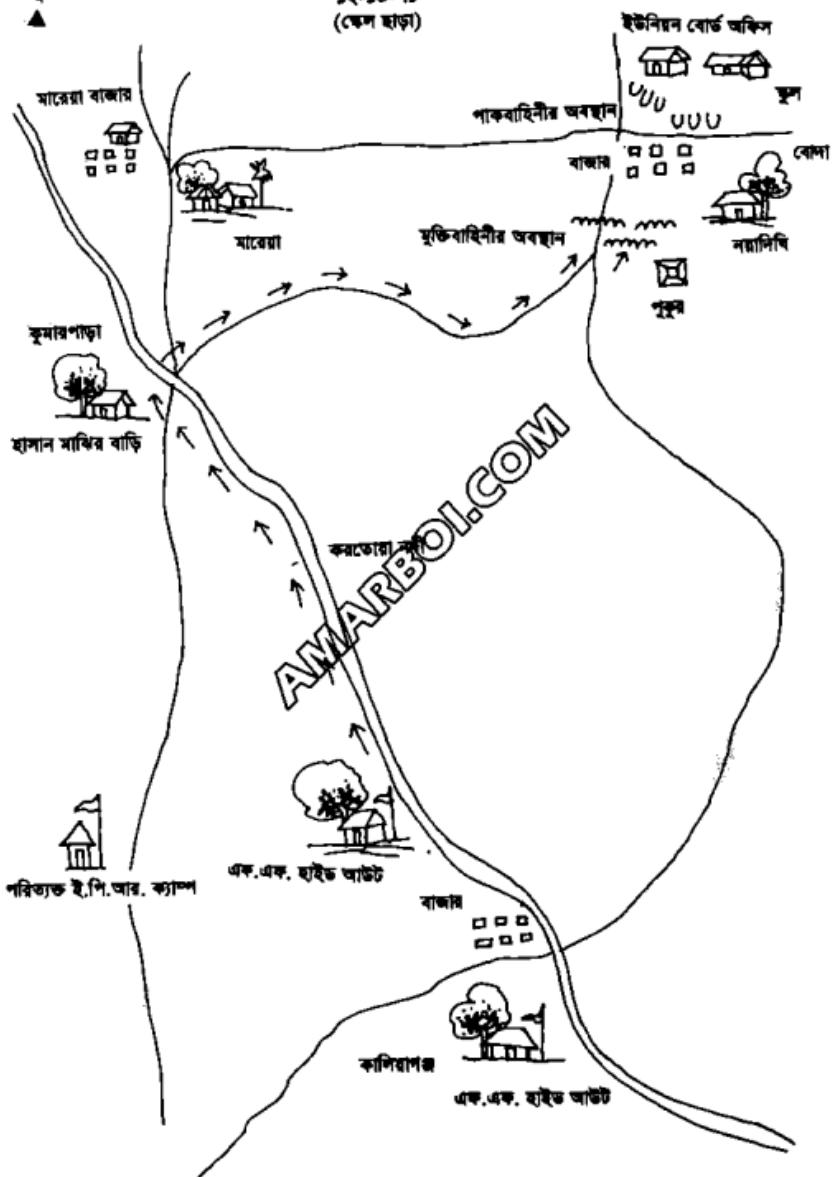
মন্তু আসে মানিকগঞ্জ থেকে । খালেক আর মন্তু নেমে পড়ে । শোধিত বধিত মানুষদের নিয়ে তাদের কাজ । সে কাজে জড়িয়ে পড়ে তারা নিবিড়ভাবে ।

আবার নয়াদিঘি অভিযান

বোদা থানা আক্রমণের সঙ্গবন্ধ নিয়ে ভাবা হচ্ছিলো । নয়াদিঘির পর বোদায় আঘাত হানা হবে, নয়াদিঘির সফল অপারেশনের পর এককমই একটা প্রিকান্ত প্রায় চূড়ান্ত করে রাখা হয়েছিলো । বোদা আক্রমণের জন্য এলাকটা মোটামুটি রুকি করাও হয়েছে । বোদা হচ্ছে থানা হেড কোয়ার্টার । পুলিশ টেশন অর্থাৎ থানাতে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে এলাকটা । ঠাকুরগাঁও-পঞ্চগড় পাকা সড়কের ধার ঘোষণা এর অবস্থান । সি.ও. অফিসসহ অন্যান্য সরকারি অফিস, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, একটা মাঝে বাজার, স্থায়ী দোকানপাট ও ব্যাকসহ থানা হেড কোয়ার্টারটি বেশ বর্ধিত জনপদ হিসেবে গড়ে উঠেছে । একটা টিনের গোড়াউনকে হলে রূপান্তরিত করে সেটা সিনেমা হল থানানো হয়েছে । বোদা কোনো শহর নয়, মোটামুটি একটা বড়ো বন্দর বা গঞ্জ জাতীয় লোকালয় । তবে ট্র্যাটেজিক কারণে বোদার অবস্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । পঞ্চগড়-ঠাকুরগাঁওয়ের মাঝামাঝি এর অবস্থান হওয়ায় সামরিক দিক থেকে এই জায়গাটি অধিকারে রাখা পাকবাহিনীর কাছে একান্তভাবে জরুরি । নয়াদিঘির দিক থেকে অভিযান চালিয়ে বোদায় তাদের অবস্থান নির্মূল করে পাকা সড়কটির দখল নিতে পারলে ঠাকুরগাঁও-পঞ্চগড়ের সড়কপথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয়া সম্ভব হবে । সেক্ষেত্রে পঞ্চগড় পাক আর্মি গ্যারিসনসহ অন্যান্য অত্যবৃত্তি ঘটির সরবরাহ ও যোগাযোগ লাইন বন্ধ হয়ে যাবে । পঞ্চগড় এলাকার পাকবাহিনীর অবস্থান সহজেই দখলে নিয়ে নেয়া যেতে পারে, যদি সে ধরনের সমন্বিত আর শক্তিশালী আক্রমণ পরিচালনা করা যায় । অবশ্য সেক্ষেত্রে বড়ো ধরনের প্রস্তুতি আর শক্তিরও দরকার । বর্তমানে আমরা যেটা করতে পারি, সেটা হচ্ছে, বোদার ওপর একটা আচমকা আঘাত গেরিলা কায়দায় হানা এবং তার সাহায্যে যতোটা সংক্ষ তাদের ক্ষতিসাধন করে নিজেদের আস্তানায় আবার ফিরে আসা ।

সকালের দিকে খবর আসে খানসেনাসহ রাজাকারের একটা দল আবার নয়াদিঘি এসেছে । তারা সেখানে পাকা বাস্কার করে পুরোনোত্তর ধাঁটি স্থাপনের পরিকল্পনা নিয়েছে । নয়াদিঘি বর্তমানে মুক্তাধ্বল, সেখানে স্বাধীন বাংলার পতাকা উড়তেন । পাকবাহিনী পুনরায় আমাদের সেই মুক্তাধ্বল দখলে নেবে সেটা হতে দেয়া যাবে না । সূতরাং আবার নয়াদিঘি অভিযানের

কেচ অ্যাপ-১২
নয়ামিডি অভিযান
১২-১০-৭৩
(কেল হাড়)



সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। খলিল-মতিয়ারকে ডেকে পাঠানো হয় পেয়াদাপাড়া থেকে। রাতেই অভিযান পরিচালনার পরিকল্পনা নেয়া হয় আর সে অন্যায়ী হাইড আউট জুড়ে চলতে থাকে প্রস্তুতি। মন্দু এবং আরো কয়েকজন রাজনৈতিক কর্মীসহ খালেক তার সাংগঠনিক কর্মপদ্ধতি নিয়ে আলোচনা বৈঠক করে, অবিকৃত এলাকার লোকালয়গুলোর যায় সে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে প্রচারমূলক কাজে। তাদের সাথে একটা সশস্ত্র প্রহরা দল দেয়া হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের পাশাপাশি এ ধরনের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড অর্থাৎ প্রচার কাজ ভালো ফল বয়ে আনবে এবং এর ভেতর দিয়ে মুক্তিযুদ্ধকে ভূরাবিত করা সম্ভব হবে বলেই আমাদের ধারণা। মানুষজন খুব তাড়াতাড়ি ‘জয় বাংলা’ পাওয়ার জন্য অস্ত্রিত হয়ে উঠেছে। অন্যান্য দেশের মতো প্রলম্বিত মুক্তিযুদ্ধ চালাতে গেলেও এ ধরনের কাজ শুরু করেছে, এটা খুবই আশার কথা। মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করা শুধু একা মুক্তিযোদ্ধাদের পক্ষেই সম্ভব নয়। জনগণের ভেতরে থেকে জনগণকে দিয়ে যুদ্ধ পরিচালনার কৌশল গ্রহণ করা রাজনৈতিক কর্মীদের পক্ষে এখন একান্তভাবে জরুরি।

রাত আটটায় অভিযান শুরু হয়। আজ আমাদের দলের সদস্যসংখ্যা ২৪। মাইল দুয়েক হেঁটে এসে কাটালি কুমারপাড়ায় হাসান মাবির ঘাটে পৌছানো যায়। আগের মতোই সে তার খেয়ালোকোয় করে করতোয়া পার করিয়ে দেয়। তারপর ঘাটে বসে থাকে আমাদের ফিরবার পথ চেয়ে। মারেয়া গ্রাম বাঁয়ে রেখে নয়াদিঘির স্বরূপসান্তার কাছ ধরে সেই পুরনো ঘোরাপথে নয়াদিঘি অভিমুখে চলতে থাকি হাঁটা পথে আয়োজন সরাই। রাত সাড়ে এগারোটা র দিকে কোনোরকম বাধা বা বিপদ ছাড়াই পৌছে আইন নয়াদিঘির সেই বড়ো পুরুরটার কাছাকাছি। এবার রেকিং প্রয়োজনে কিছুক্ষণ জোশকা। মালেক-মঙ্গলে পাঠিয়ে দেয়া হয় সামনে রেকি করার জন্য।

আকাশে ফিকে চাঁদ আর তুলোট রাস্তান ঘেঁষের ছায়া ছায়া চাঁদোয়ার নিচে বসে থাকি আমরা সর্বাঙ্গিক পজিশন নিয়ে। মাঝসর মাথায় মাথায় রাতের শিশির। বেশ শীত শীত লাগে। হিমালয়ের প্রায় পাদচত্বে আমাদের অবস্থান বলে এ অঞ্চলে অঞ্চলের থেকেই শীতের প্রকোপ শুরু হয়েছে। বৃষ্টি বাদলার দিন শেষ হয়ে এসেছে প্রায়। আর অল্প কিছুদিনের ভেতরেই ডোবা-খাল-বিল সব শুকিয়ে যাবে। তখন আর পাকবাহিনীর কেবল নির্দিষ্ট কিছু রাস্তাঘাটে চলাচল সীমাবদ্ধ থাকবে না। যত্নত যাবার সুযোগ পাবে তারা। ফলে একটা কঠিন সময়ের মোকাবেলা করতে হবে আমাদের।

ছেলেরা এই সময় বিছিন্ন বা দলগতভাবে তাদের প্রাকৃতিক কর্ম সারতে থাকে রাস্তার পাশের ঢালে গিয়ে। শহরের বিরুদ্ধে প্রতিটি অভিযানের পথ চলতে গিয়ে যখনি থামতে হয়েছে, তখন প্রতিবারই শুরু হয়ে যায় প্রাকৃতিক কর্ম সারবার কাজ। শরীরের এটা স্বাভাবিক ক্রিয়া। প্রচণ্ড অস্ত্রিতা আর মানসিক চাপ থেকেই এরকমটা হয়ে থাকে। একেত্রে কিছু করার নেই।

রেকি পার্টি ফিরে আসে। তাদের রিপোর্ট পাওয়ার পরই আঘাত হানা হয় প্রথমে মর্টারের সাহায্যে। পরপর চারটা শেল সরাসরি গিয়ে পড়ে বাজারের পেছনের দিকটায়। শেলগুলো বিস্ফোরণের পাশাপাশি দ্রুত এগিয়ে যাই এবং বাজারের প্রান্তদেশের অবস্থান নিয়ে সামনের দিকে শুলিবর্ষণ শুরু করা হয়। প্রায় ৮/১০ মিনিট চলে এধরনের আক্রমণের ধারা। তারপর ত্বরিত করে এগিয়ে যাওয়া হয় বাজারের ভিটা ধরে। মাত্র কয়েক মিনিট আগে পুড়িয়ে দেয়া ঘরগুলোর ভিটার পাশ দিয়ে এগিয়ে গিয়ে মতিয়ার, খলিল আর একব্রামুকে

গ্রেনেড চার্জ করতে বলি রাস্তার মোড় এবং জ্বালিয়ে দেয়া ইউনিয়ন বোর্ড অফিস ঘর দক্ষ্য করে। মুহূর্তখানেকের মধ্যেই সশব্দে গ্রেনেড ফাটে। মধুসূনদের এল.এম.জি.র নল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বুলেটবুষ্টি থাকতে থাকে সামনের দিকে। কিন্তু না, শক্তির তরফ থেকে কোনো রকম প্রতিরোধই আসে না। আর অঙ্গ কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের দখলে চলে আসে নয়াদিঘি।

ধৰ্মস্থান বোর্ড অফিসের পেছনে অবস্থিত স্কুল ঘরটি চার্জ করার সময় বেশ দূর থেকে ছুটে আসে শক্তিপক্ষের গোলাগুলি। পাকসেনারা বোদা রাস্তার দিকে পিছিয়ে গিয়ে সম্ভবত কোনো অবস্থান থেকে প্রতিরোধ করবার চেষ্টা করছে তাও সে প্রায় আধ মাইল দূরত্ব থেকে। মধুসূনকে রাস্তার ওপর এল.এম.জি. স্টেট করে একস্বামুলসহ দলের ক'জনকে পাকবাহিনীর অবস্থান লক্ষ্য করে শুলি চালিয়ে যুদ্ধ অব্যাহত রাখার নির্দেশ দিই। দূরে অবস্থানরat অদ্য শক্তবাহিনীর বিরুদ্ধে শুলিবিনিয়ম চলতে থাকে। তবে রাস্তা বরাবর নয়াদিঘিতে কোথাও শক্তির কোনো রকম নিশানা পাওয়া যায় না। মটর আক্রমণের সাথে সাথে তারা সবাই পাততাড়ি গুটিয়ে পালিয়েছে। আগেকার উড়িয়ে দেয়া নয়াদিঘিমুখী রাস্তার সূচনায় কেবল দুটো নতুন তৈরি বাঙ্কারের সঙ্কান পাওয়া যায়। ইট-সিমেটের তৈরি একেবারে পাকা বাঙ্কার। আজকের দিনের ভেতরেই কাজটা শেষ করেছে তারা। আর এর থেকেই বোৰা যায়, স্থায়ী ঘাটি স্থাপনের প্রস্তুতিই নিয়েছিলো পাকবাহিনী। মুক্তিযোদ্ধাদের নয়াদিঘিতে আটকে রেখে সম্ভবত তারা বোদাকে রক্ষা করার পরিকল্পনা নিয়েছে। সামনে শীক্ষণিক, শুকনো মরগুম, তার সুযোগ নিয়েই মুক্তিযোদ্ধারা যে বড়ো ধরনের আক্রমণ পরিচালনা করবে, এই ধারণা বা আশঙ্কা থেকেই সম্ভবত নয়াদিঘিকে তারা সুরক্ষিত অঞ্চল ঘাটি হিসেবে গড়ে তুলতে চাইছে। বাজারের পেছনে পুরুরের ধার যেষে বেশ বড়ো ঘৰ্টা বাড়ি। আরো বেশ ক'ঢ়ার বসত নিয়ে গ্রামটায় এখনো মানুষজন তাদের পরিবার প্রতিষ্ঠান নিয়ে বসবাস করছে। এই সময়ে এই এলাকায় যখন শক্তির প্রতিনিয়ত আগ্রহ এবং পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধাদের কলতে গেলে প্রায় নিয়মিত অভিযান চলছেই পরিস্থিতিতে, যুদ্ধের সেই তাঙ্গবের ভেতরেও এরা এখানে কী করে বসবাস করার আশঙ্কা করছে, সেটা একটা বড়ো ধরনের জিজ্ঞাসা।

অবশ্য এই জনবসতির সুলতান নামের এক সাহসী তরুণ যোগ দিয়েছে আমাদের দলে। সে-ই গাইড করছে আমাদের এই এলাকায় পরিচালিত প্রতিটি অপারেশনে। তার তাঘায়, নয়াদিঘি গ্রামে কিছু লোক আছে খুবই থারাপ। তারা নিয়মিত পাকবাহিনীর সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছে, তারাই তাদেরকে এখানে ডেকে আনছে বারবার। এসব মানুষজনের মধ্যে এ এলাকার ইউনিয়ন চেয়ারম্যানসহ বেশ ক'জন মাতবর শ্রেণীর লোকও রয়েছে। এদের নির্মূল করতে পারলে পাকবাহিনীর পক্ষে এতদৰ্থলে আর কেউই থাকবে না। তখন নয়াদিঘি গ্রামের পুরুরটার ধার যেষে যেসব বাড়িগুলির রয়েছে সেগুলো হতে পারে এফ.এফ.দের চমৎকার হাইড আউট।

খলিলের নেতৃত্বে একটা দলকে পাঠিয়ে দিই বসতিগুলোতে তল্লাশি চালিয়ে চিহ্নিত পাক সহযোগীদের ধরে আনতে। নতুন তারা এমন কিছু সেখানে করে আসবে, যাতে আর কোনোদিনই তারা নয়াদিঘি আসবাব চিন্তাও না করতে পারে। শুধু বলেই দিই, কোনো অবস্থাতেই মেয়েদের যেনো কোনোরকম ক্ষতি না হয়। খলিলরা চলে যায় নির্দিষ্ট কাজে।

ঠাস্টুস করে মধ্যরাতের শুলিবিনিয়ম চলতেই থাকে। ঠাণ্ডা মাথায় বাঙ্কার দুটো উড়িয়ে দেয়ার কাজ করতে থাকি। চার্জ লাগানো হয়। ফিউজে আঞ্চন দেয়া হয়। এরপর বেশ দূরে

গিয়ে হাতের তালু দুঁকানে চেপে ধরে শয়ে থেকে অপেক্ষার পালা। তীব্র আলোর ঝলকানি তুলে দিঙ্গত কাঁপিয়ে বিস্ফোরিত হয় ৫ পাউডের রেমার চার্জ দুটো। সেই বিস্ফোরণের সাথে সাথে সামনের দিকে ধূলো-বালি-ইট-সিমেট্রের টুকরো শৃঙ্খে উড়ে যায়। কালো ধোয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে যায় জায়গাটা, এমন কি ফিকে জোছনার আলো পর্যন্ত ঢেকে যায়। শৃঙ্খ থেকে ঝুরুুর করে ইট-সিমেট্রের টুকরো পড়তে থাকে। ইটের মোটায়ুটি বড়ো একটা টুকরো এসে পড়ে পেছনের অবস্থানে থাকা কার যেনো পিঠে। তার আর্ডেনাদ শোনা যায়, ইস্ম মইছু গে বা। আরেকটা ইটের টুকরো এসে আঘাত করে আমার নিজের মাথাতেও। তেমন জোরালো আঘাত নয়। কিন্তু মাথাটা কেমন বিমর্শিম করতে থাকে। সেটা চলে কিছুক্ষণ। হাত দিয়ে চেপে ধরি আঘাতপ্রাণ ডানদিকের জায়গাটা। মাথা ফেটে রঞ্জ পড়ছে কি না, আঁচ করবার চেষ্টা করি। না রঞ্জ নেই, ক্ষত হয় নি। তবে ইটের আঘাতে জায়গাটা সুপুরির মতো ফুলে উঠেছে এই যা। আর ওদিকে বাক্সার দুটো নিচিহ্ন হয়ে গেছে। ইট-সিমেট-বালি ছাড়িয়ে ছিটিয়ে আছে আশপাশে।

এদিকে বাক্সার ডানদিকের বিস্ফোরণের শব্দে শল্যদলের দূরবর্তী গুলিবর্ষণ এরি মধ্যেই হেমে গেছে। ভয় পেয়ে সম্ভবত পিঠাটান দিয়েছে তারা বোদার দিকে। তাই খামোকা আর গুলি খরচ না করার নির্দেশ দিই। একরামুলকে গুলিবর্ষণ থামিয়ে গুটিয়ে নিতে বলি সবকিছু।

সুশ্রীতার দীপ্তি তার সারা মুখ্যবয়বে

ঠিক এই সময় নয়াদিঘির বায় দিক থেকে বিস্ফোরণে সাইফেলের শুলি এবং সেই সাথে একটা ছেনেড বিস্ফোরণের শব্দ ভেসে আসে। খলিছুরু দল কোনোরকম বিপদ বাধিয়ে বসে নি তো? দৌড়ে চলি সদলবলে শুলির শব্দ ছেনেড করে। পুরুটার উচু পাড় ধরে ওপারে গ্রামটাতে পৌছে গিয়ে খলিলদের পাওয়া যাবে। একটা বাড়ির সামনে খুবই উৎক্ষেপিত আর তুক্ক অবস্থায়।

— কী ব্যাপার? জিগ্যেস করতেই সে বলে, এই বাড়িতে রাজাকার আর দালাল আসে লুকাইছে, যেয়ে লোকেরা হামাক তেতরে যাবার দ্যাছে না।

— ছেনেড আর শুলি ছুঁড়ছিল কেনো?

— কয়েকটা মানুষকে দৌড়ে আসিবার দেখিনো, তাদের থাইমতে কহিনো তো থামে না। দৌড়ে যাছে তো যাছেই। তখন তামাক থামাবার তাহনে ছেনেড আর শুলি ছুঁড়িনো। উমরালা এই বাড়িটার ভেতর চুকে গেলো হামরা উমাক খুঁজিবার চাহিতো এই বেটি ছওয়াগুলা বাধা দ্যাছে। কহছে এইটে কেহ নাই।

— ঠিক আছে, আর কিছু করার দরকার নেই। উচু বাঁশের বেড়া দেয়া যেরা বাড়িটা। টিনের ঘর দুঁতিনটা। বেশ ধনাত্মক পরিবারই মনে হয়। বাঁশের আগলটা ঠেলে আভিনায় চুকি। প্রশংস আভিনা। সেখানে দাঁড়ানো ৬/৭ জন বিভিন্ন বয়সের মহিলা। একজনের হাতেধরা একটা উজ্জ্বল হারিকেন। তাদের দিকে এবার আমি এগিয়ে যাই। কিন্তু কাছে গিয়েই চমকে উঠতে হয় তাদের মধ্যে একজন ধারালো চেহারার তরুণীকে দেখে। পরনে তার সালোয়ার-কমিজ। দাঁড়ানোর ভঙ্গিতে একটা বিদ্যুতী ভাব। সুশ্রীতার একটা প্রথর দীপ্তি তার সারা মুখ্যবয়বে। ছিপছিপে দেহী হলেও, তাকে নিঃসন্দেহে সুন্দরীই বলা যায়। দেখেই বোঝা যায়, শহর থেকে পালিয়ে থামে এসেছে। কলেজ কিংবা ভাসিটির ছাত্রী। উপস্থিত অন্য মহিলাদের চেহারায়ও শহরে ছাপ। ধিখা না করে আমি যেরেটাকে এবার জিগ্যেস করি, কী ব্যাপার, হয়েছে কি?

— কী আর হবে? আমরা নাকি রাজাকার লুকিয়ে রেখেছি। তাই জোর করে চুক্তে চায় ঘরের ভেতরে।

— রাজাকার কিংবা অন্য কেউ এ বাড়িতে নেই?

— না, দৃঢ়ভাবে জবাব দেয় মেয়েটি।

— ঘরের ভেতরে পুরুষ যারা আছে, তারা কারা?

— কারা আবার, আমার বাবা-ভাই-আঞ্চিয় এরা।

— তাহলে চুক্তে দিছেন না কেনো? তাদের পরিচয় দিলেই তো ঝামেলা চুক্তে যায়।

— যদি আপনারা ধরে নিয়ে যান তাদের!

এবার মেয়েটির গলার স্বর নরম হয়ে আসে। তাকে জিগ্যেস করি, আমরা কারা, সেটা বুঝতে পেরেছেন তো?

— জি, মুক্তিকৌজ?

— তাহলে তয় কিসের? আপনারা সাধীনতা চান না? চান না জয় বাংলা?

— চাইবো না কেনো? সে জন্যাইতো এতো কষ্ট করে শ্রামে এসে এভাবে লুকিয়ে থাকতে হচ্ছে। আমি নিজেই তো ছাত্র ইউনিয়ন করি।

— কে বললো আমরা আপনার বাবা-ভাইদের ধরে নিয়ে যাবো? তাছাড়া আপনারা এখানে এই বিপদের মধ্যে আছেনই-বা কেনো?

— কোথায় যাবো বাবা? আর জায়গাতো নেই, এতো হারিকেন হাতে ধরা মধ্যবয়সী মহিলা হতাশাভ্রা ক্রান্ত কর্তৃ বলে ওঠেন।

— ঠিক আছে, সাবধানে থাকবেন। পাকস্থানী এলে কোনো অবস্থাতেই তাদের সামনে পড়বেন না কিংবা জানতে দেবেন না আপনাদের এখানে অবস্থানের খবর। আর খুব বেশি বিপদ হলে, আমাদের খবর পাঠাবেন কোনো ক্ষেত্রে মারফত। করতোয়ার ওপারেই আমরা আছি।

মহিলা মাথা নেড়ে সম্মত জমিয়ে ধারালো চেহারার সেই মেয়েটির দিকে তাকিয়ে। হারিকেনের নরম আলো তার মুখের উপর পড়েছে। সে আলোতে এবার আরো সুন্দরী দেখায় মেয়েটিকে। হঠাৎ করেই একটা শক্তময় ভাবনা মনের কোণে উৎকর্ষুকি দিয়ে ওঠে, এই শক্তপূরীতে আগনের মতো এই তরঙ্গিটিকে কি তার পরিবারের সদস্যরা পাক রাক্ষসদের হাত থেকে রক্ষা করতে সক্ষম হবে? কে জানে!

সবাইকে ফল ব্যাক করতে বলি। এক এক করে বাড়ি থেকে বের হয়ে যায় সবাই। পেছন ফিরে এক ফাঁকে দেখি, নীরবে স্থাগুর মতো আঙ্গিনায় দাঁড়িয়ে আছেন আমাদের গমন পথের দিকে তাকিয়ে মহিলাদের সেই দলটি।

১২. ১০. ৭৩

লাইলি-মজনু

জবাব ভাই এসেছে চাউলহাটি থেকে। তাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন ক্যাপ্টেন নন্দা। জবাব চাউলহাটি ইউনিট বেস হেড কোয়ার্টারে ছিলো। কী একটা অপারেশনে তাকে বাঘডোগরা কস্বাইত মিলিটারি হাসপাতালে থাকতে হয়েছিলো কিছুদিন। সুহৃ হয়ে চাউলহাটি ফিরে আসার পর বস্তুত তার কোনো কাজ ছিলো না। বড়ো ভাই নুরুল হকের সহকারী হিসেবে সে ইউনিট বেসের ফ্রন্টে যুক্তরত ক্লোড চারটির পরম্পরের সাথে সমর্থ কাজের তদারকি করছিলো।

জব্বার টেনিং সেন্টার থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত একজন জুনিয়র লিভার। তার মতো একজন কমান্ডার চাউলহাটিতে বসে থাকবে, ব্যাপারটা কাজের মানুষ নদীর পছন্দ হয় নি। তাই তিনি অনেকটা ঠেলেছুলেই পাঠিয়েছেন ফ্রন্টে আমার দলের সাথে তাকে কাজ করবার নির্দেশ দিয়ে। একইভাবে তিনি পাঠিয়েছেন কমান্ডার মতিয়ারকে পেয়ানাপাড়ার বাণিজ্যামানের দলের সাথে তাকে কাজ করবার দায়িত্ব দিয়ে। সেও চাউলহাটিতে জব্বারের মতোই কাজ করছিলো।

যাই হোক, জব্বার তাই আসাতে হাইড আউটে প্রাণের সঁওগার হয়। রসিক মানুষ জব্বার জমিয়ে ফেলে হাইড আউটে এসেই। জব্বারের বাড়ি ডোমারে। সে তার বাট-বাক্স বাড়িতে রেখে পালিয়েছে। জব্বারের স্ত্রীর নাম লাইলি। গভীর প্রেমের পরিণতিতে রীতিমতো অ্যাডভেঞ্চার চালিয়ে লাইলি আর জব্বারের বিয়ে। তাদের বিয়ের ব্যাপারটা সে সময় রীতিমতো ঘুরুরোচক সংবাদ হয়ে ছড়িয়ে পড়েছিলো চারদিকে। জব্বার আর লাইলির ভালোবাসার সম্পর্ক যখন তুঙ্গে, তখন জব্বারের হাত থেকে মেয়েকে রক্ষা করার জন্য লাইলির বাবা-মা তাকে একদিন নিয়ে সটকে পড়েছিলেন ট্রেনে চেপে। লাইলির বাবা কোনোমতই চাইছিলেন না জব্বারের সাথে তার মেয়ের বিয়ে হোক। ব্যাপারটা জব্বার টের পেয়ে তার দলবলসহ রীতিমতো ‘টেক্সাস স্টাইল’ অভিযান চালিয়ে নীলফামারী টেশনে দাঁড়িয়ে থাকা টেন থেকে লাইলিকে নামিয়ে নিয়ে আসে তার বাবা-মার চেতের সামনে থেকেই। এরপর তাদের বিয়ে। এ ঘটনাকে ঘিরে মেলা হৈচে আর ঝামেলা গেছে মুক্তিলাগার পর জব্বার তাই সেই প্রেমিকা স্ত্রী আর শিশু সন্তানকে ডোমারের বাড়িতে রেখে প্রেরিতে বাধ্য হয়। এজন্য সব সময়ই তার মধ্যে একটা পিছুটাসের এবং হ্যাতাশভাব থেকেই গেছে। রঙ-রসিকতা আর হৈচে সে যতোই করুক, দেশে ফেলে আসা বৌ-সন্তানের জন্য তার মন সবসময় খারাপ হয়েই থাকে!

আমরা তাদের এই ঐতিহাসিক প্রেমের চিনাটির নামকরণ করেছিলাম ‘লাইলি-মজনু’ বিয়ে বলে। আর এখন আমাদের হাইড আউটে সেই জব্বার অর্থাৎ মজনু এসে হাজির। কিন্তু এখন ‘লাইলিকে’ না আনলে স্বামীর চলছে না। তা না হলে ‘মজনু’ জব্বার সত্ত্বিকার অর্থেই মজনু হয়ে যাবে বলে শক্তি হচ্ছে অন্তত তার ভাবগতিক দেখে। তাই সিদ্ধান্ত হয়, লাইলিকে এনে দেয়া হবে জব্বারের কাছে যে করেই হোক। মারেয়া-সাকোয়া, শালভাঙ্গ ও দেবীগঞ্জ পেরিয়ে ডোমার। অর্থাৎ আমাদের বাঁয়ে প্রায় ৩০ থেকে ৪০ মাইলের মধ্যেই বর্তমানে লাইলির বসবাস, যদিও এলাকাটা পুরোপুরি শক্রকবলিত এবং কাজটা অত্যন্ত বিপজ্জনক আর ঝুকিপূর্ণ, তবুও এটা করতেই হবে। জব্বার তার লাইলিকে পাবার জন্য একবার দারুণ ঝুকিপূর্ণ অ্যাডভেঞ্চার চালিয়েছে, এবার তার চাইতেও বহুগুণে বেশি ঝুকিপূর্ণ অ্যাডভেঞ্চার চালাতে হবে অর্থাৎ লাইলিকে তুলে আনা হবে শক্রপুরী থেকে। এজন্য পরিকল্পনা গ্রাহণ করার পর দল সাজানো হতে থাকে। একবার নিজে তার হৰু বধুকে তুলে এনেছে, এবার আমরা তার সেই প্রেমিকা বধুকে শক্রপুরী থেকে তুলে নিয়ে এনে দেবো তার হাতে। এ খবরটা জব্বারকে অত্যন্ত আনন্দিত করে তোলে, সে দ্বিতীয় উৎসাহ নিয়ে রঙ-তামাশা করে জমিয়ে তোলে হাইড আউটের পরিবেশটাকে।

রঙরুট

বোদা এলাকা থেকে একদল ছেলে আসে। মন্টুদের সংগঠন তাদের রিক্রুট করেছে একেবারে প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে। ছেলেরা সব মুক্তিবাহিনীতে যাবার উদ্দেশ্য নিয়েই এসেছে।

৬০ জনের এই দলটিকে মন্তু নিয়ে এসেছে আমাদের হাইড আউটে। তার অনুরোধ, ছেলেগুলোর প্রাথমিক ফিটনেস পরীক্ষা করে দিতে হবে। মন্তু ঘূঘুড়াঙ্গা তার দলের পরিচালিত ট্রানজিট ক্যাস্পের মাধ্যমে ছেলেদের এফ.এফ. হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করে মূরতি ক্যাস্পে ট্রেনিং-এ পাঠ্যনোব ব্যবস্থা নিয়ে রীতিমতো হিমশিম থাক্কে। তার ভাষায়, তার দলের ছেলেদের এফ.এফ. হিসেবে তেমন নেয়া হচ্ছে না। বহু চেষ্টা-চরিত্র করে সে দুটো দলকে পাঠাতে পেরেছে কিন্তু প্রাথমিক নির্বাচনে তাদের ভেতর থেকে অনেকেই বাদ পড়েছে। মন্তুর ধারণা, ইচ্ছে করেই হাতে ইউনিয়ন অর্থাৎ বাম ফ্রন্টের ছেলেদের এফ.এফ. হিসেবে না নেয়ার উদ্দেশ্য থেকে প্রাথমিক নির্বাচনেই তাদের অধিকাংশকে বাদ দিচ্ছে কর্তৃপক্ষ। অবশ্য এটা মন্তুর একান্ত নিজস্ব ভাষ্য। অস্তু ব্যাপার হলো, বর্তমানে মুক্তিযুদ্ধ একটা মোটামুটি সমবিত্ত রূপ নিয়েছে। মুক্তিবাহিনীতে নাম লেখাবার জন্য প্রথম দিকের তুলনায় এখন অনেক বেশিসংখ্যক ছেলে আসছে। তারতে আগে থেকেই অবস্থানরত দেশ থেকে প্রতিদিন আগত তরুণ-যুবকদের মুক্তিবাহিনীতে যোগ দেয়ার উৎসাহ বর্তমানে প্রচও আকার ধারণ করেছে। ফলে এফ.এফ. রিক্রুটমেন্টের ব্যাপারটা এখন আর আগের প্রাথমিক অবস্থার সহজ পর্যায়ে নেই। প্রতিটি ফ্রন্টেই মুক্তিযোদ্ধাদের চাহিদা রয়েছে; কিন্তু সে তুলনায় ট্রেনিং সুবিধা না থাকায় বহু ছেলেকে ট্রানজিট ক্যাস্পে বসে থেকে ডালভাত থেয়ে কেবল লেফ্ট রাইট শিখে সময় পার করে দিতে হচ্ছে।

যাই হোক, মন্তুর অনুরোধ ফেলা যায় না। আগত দলটির প্রাথমিক যোগ্যতা যাচাই করার জন্য রীতিমতো একটা বোর্ড গঠন করতে হয়। একজনস্বত্ত্ব সবাইকে দাঁড় করিয়ে এক এক করে ফিজিক্যাল ফিটনেস পরীক্ষা করে দেখতে প্রতিটি প্যাট-শার্ট আর মাথায় ক্যাপ লাগিয়ে জব্বার বসে যায় একটা ঘরে। আহিদার বস্তেজনারেল নলেজ অর্থাৎ আই কিউ টেক্ট এন্ডের জন্য। ব্যাপার-স্যাপার দেখে সদ্য অস্তু দলের ছেলেগুলো অসম্ভব ঘাবড়ে যায়। হাইড আউটের আমাদের দলটি অচিরক্ষণেই মধ্যেই একটা সিরিয়াস রিক্রুটমেন্ট ইউনিটে পরিণত হয়। আমি ঘুরে ঘুরে তাদের ক্লিনিচ পরীক্ষা দেখতে থাকি। মন্তু ছেলেরা রীতিমতো ভীত হয়ে পড়েছে। আমাদের সবাইকে ‘স্যার’, ‘স্যার’ বলে সঙ্গেধন করতে শুরু করেছে। একবার মুলের চেহারা হয়ে উঠেছে একজন বদরাণি কঠোর মানুষের মতো। একটা ফিতা নিয়ে সে ছেলেদের উচ্চতা মাপছে, তাদের বুকের মাপ নিছে, পা দুটো জোড় করে দেখছে, কাপড় ঝুল হাত দেখছে, শরীর দেখছে, বুকের ছাতিতে জোরে জোরে থাপড় মেরে বুকের শক্তি পরীক্ষা করে তারপর ছাড়পত্র দিচ্ছে। এরপর ছেলেরা যাচ্ছে জেনারেল নলেজ অর্থাৎ আই কিউ টেক্ট-এর জন্য আহিদারের কাছে। আহিদার তাদের নানা ধরনের প্রশ্ন করে নাস্তানাবুদ করে ছাড়ছে। সেখানকার জিজাসাবাদের পর তাদের যেতে হচ্ছে মেডিক্যাল ইউনিটে জব্বারের কাছে। আমি তাকে জিগোস করি, কী ভাঙ্গাৰ সাহেব, কীভাবে পরীক্ষা হচ্ছে?

— যেভাবে আমাদের হয়েছে সেভাবেই। বলেই সে ডাঙ্গাৰি ভাষায় তার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা ছেলেটিকে বলে, কাপড় ওঠাও। ছেলেটি বিধা করতে থাকলে সে স্বরে গাঞ্জীর্য এনে ধমকে উঠে কাপড় ঝুলে ফেলতে বলে। তারপর খুটিয়ে খুটিয়ে নেড়েচেড়ে দেখতে থাকে তার গোপনাঙ্গ। একটা রীতিমতো হৈচেয়ের ব্যাপার। শেষ পর্যন্ত পুরোনোত্তর রিক্রুটমেন্ট টিমই বনে গোলো হাইড আউটটা। বেশ কিছুক্ষণ এ ধারায় কাজ চলবার পর হঠাৎ করে জব্বার নাক টিপে ধরে বমি কুরার ভঙ্গিতে ছুটে এসে বলতে থাকে, যোৱ দ্বারা হৰাব নায়,

যুই পাইরবার নাও। তার কথা বলার ভঙ্গিতে ভয়ানক হাসি পায়। বলি, পারবেন না কেনো? — এইগুলা কি দেখা যায়? তাকে সান্তুন্ধা দেয়ার ভঙ্গিতে এবার বলি, কি আর করবেন, ডাঙ্গার যখন সেজেছেন, তখনতো দেখতেই হবে। ঘৃণা করলে চলবে কেনো। সাবান দিয়ে হাত ধূয়ে ফেললেই হবে।

— না, যুই পাইরবার নাও এতোগুলা মাইনষের ঐ জিনিস দেইখবার।

— পারবেন, যান ছেলেরা আশা করে এসেছে এবং আমাদের বিশ্বাস করেছে, তাদের এ বিশ্বাসটা ডাঙ্গা যাবে না। বিকেলের ভেতরেই রিডুটমেন্ট টেক্টের কাজ শেষ হয়ে যায়। ৬০ জনের ভেতরে ১০ জন বাদ পড়ে। নির্বাচিত ছেলেদের মধ্যে একজনকে কমান্ডার বানিয়ে তাদের রওনা করিয়ে দেয়া হয় মানিকগঞ্জ হয়ে ঘূর্ণডাঙ্গা ট্রানজিট ক্যাম্পে।

সঙ্ক্ষ্যার পর রেকি পেট্রেল পাঠানো হয় সাকোয়া আর শালভাঙ্গায়। বোদা আক্রমণের আগে সাকোয়া আর শালভাঙ্গা শক্ত ঘাঁটিতে আঘাত হানতে হবে। ও দুটো শক্ত ঘাঁটি এখন পর্যন্ত হামলার বাইরে থেকে গেছে। ঘাঁটি দুটোতে নয়াদিঘি আর গলেয়ার মতো একটুখানি নাড়া দেয়া প্রয়োজন। রেকি পেট্রেল ফিরে আসে এই খবর নিয়ে যে, ডোমার-দেবীগঞ্জ-বোদা হাইওয়েতে পাকবাহিনী এখন রাস্তার ঢালে বাক্সার ইত্যাদি তৈরি করে শক্ত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা দাঁড় করাচ্ছে।

পরদিন মানিকগঞ্জে রিপোর্টঃ। নদী ঝুঁশি হন গত ক্ষমিনের কর্মতৎপরতায়। রিপোর্ট গ্রহণের পর তিনি বক্রসূলভভাবে বলেন, কুছ চাইয়ে^{যে} একরামুল বলে, ইয়েস স্যার। হামলাগ সিলেমা দেখেগা, ‘হাতি মেরা সাথী’। জলপাইগুড়িতে রাজেশ খানা অভিনীত হিট ছবি ‘হাতি মেরা সাথী’ চলছিলো মহাসমারোহে অত্যেকের মুখে মুখে তখন একটাই গান, চল মেরা হাতি। নদী হেসে বলেন, ঠিক আছে। তাব আজ নেহি। ম্যায় গ্যারেঞ্জ কারকে তুমলোগকো বোলাকে লে যায়গা।

১৩. ১০. ৭১— ১৪. ১০. ৭১

কালিয়াগঞ্জের যুক্তি : যুক্তাত হাসান

নদীর ওপারের ঘাটে একদল রাজাকার এবং পাক সৈনিক এসে নদী পার হবার উপায় খুঁজছে। ব্যাপারটা নজরে আসে প্রথমে একজন সেন্ট্রি। সে-ই দৌড়ে এসে বাজারের পাশে স্থাপিত হাইড আউটে খবরটা পৌছে দেয়।

সকাল নটার মতো বেলা তখন। তরুণ বয়সী শহীদুল ইসলাম বাবলু দৌড়ে গিয়ে উপস্থিত হয় এপারে নদীর কিনারে। তার ধারণা, শক্রবাহিনী এসেছে সারেভার করার জন্য। ক'দিন থেকে একটা কথা শোনা যাচ্ছিলো। একদল রাজাকার অন্তসমেত মুক্তিবাহিনীর কাছে সারেভার করবে। বাবলু ধরেই নিয়েছে, নদীর ওপারের ঘাটে আগত দলটি সারেভার করার জন্যই এসেছে এবং কারণেই তারা নদী পারাপারের উপায় খুঁজছে। বাবলু তখন চিন্তকার করে তাদের উদ্দেশ্যে বলতে থাকে, আসেন ভায়েরা, আমরা আপনাদের জন্য অপেক্ষা করছি। চলে আসেন, কোনো তয় নাই। আমরা আপনাদের কোনো ক্ষতি করবো না...। কিন্তু ওপারের সমবেতে বাহিনী বাবলুর আঙ্গনে কোনো সাড়া দেয় না। সাড়া না পেয়ে বাবলু আরো জোরে জোরে চিংকার করে বলতে থাকে, ভাইসব আসেন, কোনো রকম হেজিটেট করবেন না। এ দেশটা স্বাধীন করতে হবে, জয় বাংলা করতে হবে। আর সেটা করতে হলে শুধু আমাদের

প্রচেষ্টায় হবে না, আপনাদেরও সাহায্য লাগবে। এদেশটা যেমন আমাদের, তেমনি আপনাদেরও। আমরাও বাঙালি, আপনারাও বাঙালি। আসুন সমিলিত চেষ্টায় আমরা দেশটা স্থায়ীন করি...। বাবলু ওপারের সমবেত শক্তিদলের উদ্দেশ্যে 'আসুন ভায়েরা সারেভার করুন' বলে বজ্র্ণাতার চঙে চিন্কার করলেও তারা তার এই আন্তরিক আঙুলে সাড়া দেয় এক ঝাঁক বুলেট বৃষ্টির মাধ্যমে। আচমকা এ ধরনের শুলিবর্ষণে বাবলু একেবারে হতকিত হয়ে যায়। দাঁড়িয়ে থাকে সেই অবস্থায় কিছুক্ষণ। আবার শুলি আসে তাকে লক্ষ্য করে। তবে তার গায়ে শুলি লাগে না, লক্ষ্যজ্ঞ হয়। আর তখনি তার সহিং ফিরে আসে। চিন্কার করতে করতে হাইড আউটে ফিরে আসতে সে বলতে থাকে, খান আসছে নদীর ওপারে তোমরা যে যেখানে আছো হাতিয়ার নিয়ে দোড়াও। আজ সব শালাদের খতম করা হবে।

এলোপাতাড়িভাবে দৌড়ে গিয়ে ছেলেরা নদীর এপারে পজিশন নেয় এবং নিয়েই শক্তির উদ্দেশ্যে শুলিবর্ষণ শুরু করে। ওরা নদী পার হয়ে কালিয়াগঞ্জ দখল করার জন্য এসেছে। কিন্তু নদী কোনোমতেই ওদের পার হতে দেয়া যাবে না। যে যেখানে পারে পজিশন নিয়েছে। হৈছলা, চিন্কার আর ছেটাছুটির তোড়ে সরগরম হয়ে ওঠে কালিয়াগঞ্জ বাজার। শক্তি দলের ধারণা ছিলো, নদীর এপারে মুক্তিযোদ্ধাদের কোনো অবস্থান নেই। তাই তারা অনেকটা নিশ্চিত মনেই দলবলসহ নদীর এপারে আসার উপায় খুঁজছিলো। নদী পার হতে পারলে তারা হয়তো মুক্তিযোদ্ধাদের হাইড আউট পেয়াদাপাড়ার আচমকা হামলার প্রয়োগে জয়দারপাড়ার মালকের কোম্পানির ওপর কায়দায়। সে ধরনের প্রস্তুতি নিয়েই হাতা হয়তো এসেছিলো, কিন্তু বাবলুর সরব চিন্কারে এবং তাদের প্রতি সারেভারের আহচে সেটা ভেস্টে যায়। তাদের শুলিবর্ষণের জ্বরাবের প্রতিক্রিয়া এপাশ থেকে ভিমরূলের চমৎকোচ মারার অবস্থায় নিয়ে দাঁড়াবে, সেটা তারা বুঝতে পারে নি। এ অবস্থায় বটপট মনস্তের গোপন অবস্থান থেকে তারাও প্রবলভাবে শুলিবর্ষণের প্রত্যুষ দিতে থাকে। তবু হয়ে যায় শুলি-পাস্টা শুলির প্রতিযোগিতা। নদীর এপাড়-ওপাড় জুড়ে সম্পূর্ণ এলাকা চিন্কিতক্ষণের ভেতরে একটা মুক্তিক্ষেত্রে পরিণত হয়।

মানিকগঞ্জগামী রাস্তা ধরে কিছুক্ষণে কিছুটা দূর এগিয়ে এসেছি আমরা চারজন। মানিকগঞ্জে কিছু কেনাকাটা এবং কিছুক্ষণ চুটিয়ে আড়া মেরে ফিরে আসবার উদ্দেশ্যে এ যাত্রা। সাথী হিসেবে জবাবার, আহিনীর এবং মতিয়ার রয়েছে সাথে। হাঁটা পথে মানিকগঞ্জ প্রায় ৮ থেকে ১০ মাইলের পথ। আমাদের চার যুবকের হাসি-মশকুর ভেতর দিয়ে এগিয়ে যাওয়ায় মুখের হয়ে ওঠে যাত্রাপথ। শরতের চমৎকার একটা সকাল। মনের মধ্যে একটা মূরফুরে ভালোলাগার অনুভূতি নিয়ে নির্ভর এ যাত্রার রসসভ্র হয় পেছন থেকে ভেসে আসা গোলাগুলির শব্দে। হাঁটাখচকিত হয়ে ওঠে পঞ্জেন্দ্রিয়। মুক্তা ঠিক কোথায় বেঁধেছে, ভেসে আসা শব্দের উৎস থেকে সেটা আঁচ করা যায় না সঠিকভাবে। পাকবাহিনী পেয়াদাপাড়া, না কালিয়াগঞ্জ মুক্তিবাহিনীর আস্তানা আক্রমণ করে বসেছে, সেটাও বোঝা যায় না। চলার গতি থেমে যায় আপনানাপনি। কী করবো, ঠিক বুঝতে না পেরে বিমুচ্য অবস্থায় দাঁড়িয়ে পড়ি রাস্তার মাঝপথেই। এই এখন মানিকগঞ্জ যাবো, না ফিরে যাবো, তাও ঠিক করতে পারি না। কেবল একটা সিদ্ধান্তহীনতার ঘোরের মধ্যে এক-পা দু'পা করে এগুতে থাকি সামনের দিকে। পেছনে গোলাগুলির শব্দ বাড়তে থাকে। ধার্মধার শব্দে মর্টারের গোলাবর্ষণও চলতে থাকে। বুঝতে পারি, মুক্তা ভালোভাবেই লেগেছে তা হলে!

নিজেরা ফিরবো কি না এরকম সিদ্ধান্ত নেয়ার আগেই দেখি সামনের দিক থেকে একদল

এফ.এফ. দৌড়ে আসছে। নেতা গোছের ছেলেটাকে দেখেই চিনতে পারি মালেকের দলের কম্বান্ডার আকবর। তার সঙ্গে আরো ২০ থেকে ২৫ জনের একটা দল। হড়মুড়িয়ে ওরা একেবারে আমার সামনে এসে থেমে ইঁপাতে ঝিগেস করে কী হয়েছে? একই ধরনের প্রশ্ন ওদেরকেও আমরা করি, কী হয়েছে? কিন্তু ওরা থামে না, কিন্তু বলেও না। যেমন উর্ধ্বাসে দৌড়ে আসছিলো, একইভাবে দৌড়ে সামনের গোলাগুলির উৎসের দিকে ছুটতে থাকে। আমাদের দল পাকবাহিনীর হাতে আক্রান্ত হয়েছে, এই মনে করে পার্শ্ববর্তী ইউনিটের এফ.এফ.রা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দৌড়ে আসছিলো। রাত্তার মাঝখানে আমাদের এভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ওরা প্রথমে ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেলেও, ছুটে চলে সামনের দিকেই। ওরা সেদিন যখন আক্রান্ত হয়েছিলো, আমরা ওদের সাহায্যের জন্য এগিয়ে শিয়েছিলাম। আজ হয়তো তারই খণ্ড শোধ করবার জন্য ছুটে এসেছে ওরা। আকবরের দলের ছুটে চলার দিকে তাকিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে আর সময় লাগে না। সঙ্গীদের বলি, দৌড়া! নিচ্যাই কিন্তু ঘটেছে।

আকবরের দলের পেছনে পেছনে দৌড়ে কালিয়াগঞ্জ বাজারে পৌছে যাই। এসেই দেখি একেবারে লঙ্ঘণ অবস্থা এখানকার। রাত্তার লাগোয়া হাইড আউটের বাড়িটা থেকে একদল ছেলে ইতিপাতিলসহ নানা রকমের মালপত্র সরানোর জন্য ছোটছুটি করছে। নদীর ধারে চিংকার, গোলমাল, কে কোন্দিকে দোড়াচ্ছে, কাকে কে কি বলছে, তার কোনো ঠিক-ঠিকানা নেই। মূল কম্বান্ডার আহিদার ঘটনার কোনো খেই ধরতে প্রত্যক্ষ না। আকবরের দল বাজারের বাঁ দিক দিয়ে নদীর পাড় জুড়ে পজিশন নিয়ে শুরু কর্তৃ পুরুষামার গুলিবর্ষণ। মৰ্টার দাগাতে থাকে একজন ওপার লক্ষ্য করে। একটার পর একটা পুরোপার থেকে শক্রবাহিনীর গোলাগুলি ছুটে আসছে বেগুন। গোলাগুলির এই রকম নিয়ির্মিত ভেতর দিয়ে এগুনো সতভাই মৃশিকিল। কষ্টসূচৈ তবুও এগিয়ে যাই নদীর খেয়াঘাট প্রায়। খেয়াঘাটের পাড়ে একটা ঝাঁকড়া গাছের আড়ালে বাবলু মিয়াকে পাওয়া যায়। স্মরণে তার মালকেঁচা মারা লুঙ্গি। হাতে একটা এস.এল.আর। খুবই উত্তেজিত অস্ত্র উন্নতাপ্রাপ্তির মতো চেহারা তার। জিগেস করি তাকে, কী হয়েছে? প্রশ্নের জবাবে গড়গড় করে সে এক নিষ্কাসে বলে যায় সব ঘটনা।

— আমিতো মনে করেছিলাম হারামজাদারা সারেভার করতে এসেছে। এজন্য ওদের আনার জন্য খেয়ানোকা প্রায় পাঠাচ্ছিলাম।

— ভাগিয়ে পাঠাইস নাই, আমি বলি, এখন বল দলে ওরা কতোজন? এখন অবস্থান কোথায় তাদের?

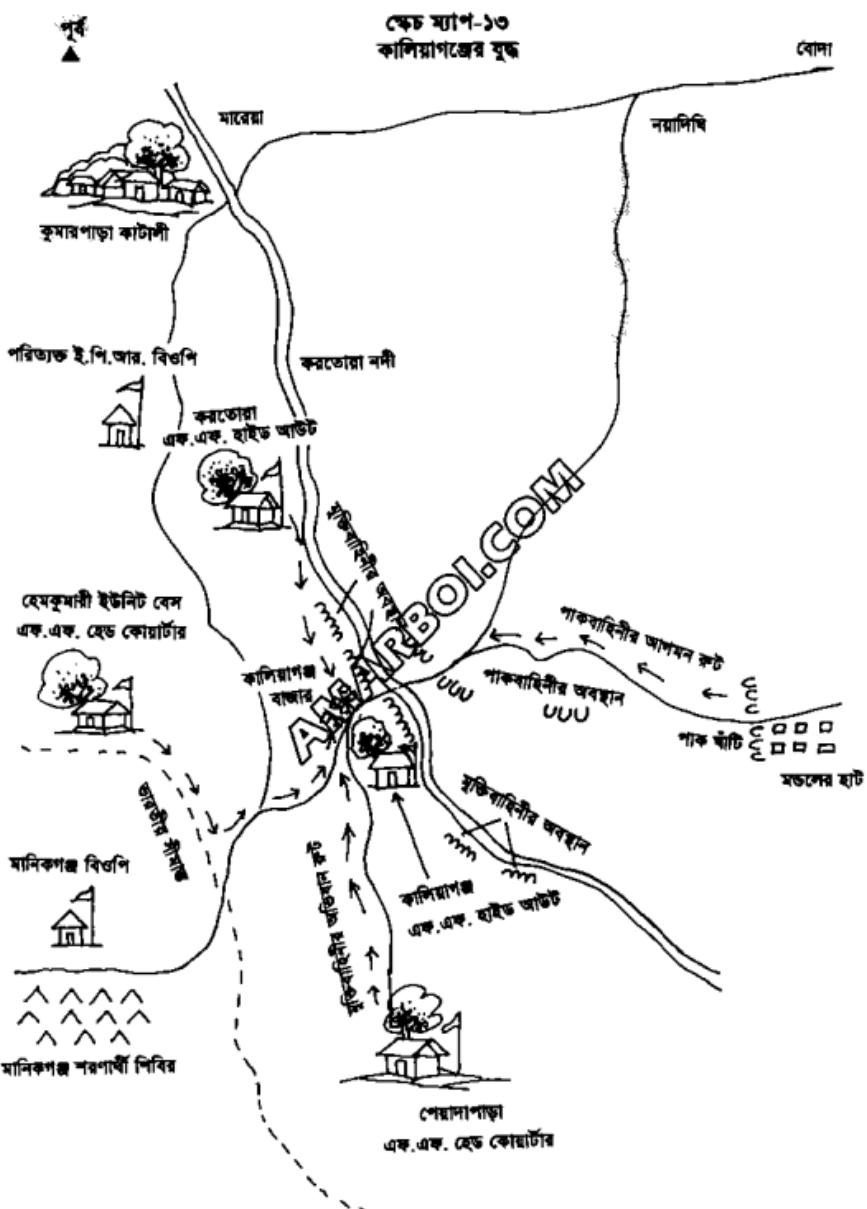
— ১৫ থেকে ২০ জনকে তো দেখছি, পেছনে আরো ছিলো, বুঝতে পারি নাই।

— রাজাকার না খান? আবার জিগেস করি তাকে।

— প্রথমে তো দেখছিলাম রাজাকার। তাই ভাবছিলাম বোধহয় ওরা সারেভার করবে। পরে তো দেখি, কালো পোশাক আর খাকি পোশাকের লম্বা লম্বা খান ওদের পেছনে।

এবার ইস্স' বলে ওকে একটা দাবাড় লাগাই, এতো বড়ো একটা সুবর্ণ সূযোগ তোরা নষ্ট করলি। নদীর ওপারকার ঘাটে পানির কিনারা পর্যন্ত এসে ওরা খেয়ানোকো খুঁজছিলো। চিংকার-হল্লা না করে চুপচাপ হাতিয়ার নিয়ে পজিশনে এসে ওদের ওপর ঝাঁকড়া গুলিবর্ষণ করলেই তো কলাগাছের মতো পড়ে যেতো সবগুলো। বাবলু এবার ইত্তুত করে বলে, বুঝতে পারি নাই।

— ঠিক আছে, কে কোথায় আছে এখন বল। জানতে চাই ছেলেদের অবস্থান সম্পর্কে।



বাবলু মোটামুটি ছেলেদের অবস্থানগুলো দেখিয়ে দেয়। তারপরই আমি সমস্ত কথাগুলি নিয়ে নিই নিজের হাতে।

ওপারের বোপবাড়ি-জঙ্গলের আড়ালে আড়ালে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পজিশন নিয়ে শুলি চালিয়ে যাচ্ছে শক্রপক্ষ। সম্ভবত তারা ক'দিন আগেকার আমাদের মণ্ডলের হাট আক্রমণের প্রতিশোধ নিতে এসেছে। বোদা গ্যারিসন থেকে রি-ইনফোর্মেন্ট নিয়ে মণ্ডলের হাটের ঘাঁটি থেকে উঠে এসেছে তারা। কিন্তু আমাদের সিদ্ধান্ত, শক্রকে নদী পার হতে দেয়া হবে না কোনো মতই। শধু তাই নয়, পেছন থেকে তাদের পালাবার পথ কেটে নিয়ে করতোয়া নদীর ওপারে তাদের অবস্থানেই চূড়ান্ত বোৰাপড়া করতে হবে। আকবরকে নির্দেশ পাঠাই, দলকে আরো ছড়িয়ে নিয়ে পজিশনে থাকতে এবং নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত শুলিবৃষ্টি চালিয়ে যেতে। আহিন্দার ও জৰুবারকে খেয়ালটা বৰাবৰ শক্রের অবস্থানের মুখোয়াবি অবস্থান নিয়ে গোলাগুলি চালিয়ে যেতে বলি। একরামুল এসেছে আগেই আমাদের দলের ছেলেদের নিয়ে। তাকে বাজারের ডানদিকে নদীর পাড় থেকে অবস্থান নিয়ে লড়াই চালিয়ে যেতে বলি। বাবলু, খলিল ও মতিয়ারসহ একটা দল নিয়ে আমি এগিয়ে যাই সামনের দিকে।

দক্ষিণ দিক থেকে নদীটা এসে কালিয়াগঞ্জ বাজারের কাছে খাড়া বাঁক নিয়ে চলে গেছে পুবদিকে। তরা নদীতে এখন উপালপাতাল পানির স্নোত। নদীর এপার-ওপার হাতিয়ারের রেঞ্জের মধ্যেই। মাথার ওপর দিয়ে শিস বাজিয়ে ছাঁকে ছাঁলে শক্রবাহিনীর বর্ষণ করা শুলিবৃষ্টির স্নোত। নদীর এ পাড়টা উচু খাড়া। ওপারে চূড়ান্ত বোপবাড়ে আকীর্ণ। হিসেব অনুযায়ী, এ ধরনের ভূমি ব্যবস্থায় আমাদের সুবিধা হওয়ার কথা। তবে যতোটুকু হওয়ার কথা, ততোটুকু সুবিধা আদায় করা যাচ্ছে না। ক্ষেত্রব্যন্তি কোনো আক্রমণধারা রচনা করার অভাবে। আক্রমণকারী যোদ্ধার দল এমনভাবে অবস্থান নিয়েছে যে, তাতে করে শক্রের ওপর সরাসরি আঘাত করার সুবিধা নেই। আবার শক্রকে আঘাত করার জন্য ঘাটের একেবারে কিনারায় অবস্থান নিলে ক্ষেত্রে তাদের টার্গেট হওয়ার মারাত্মক আশঙ্কা রয়েছে। শক্রের সুবিধা হচ্ছে, নদীর ওপারের তরাভূমি ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা অবস্থান থেকে সরাসরি এপারের খাড়া পাড় দেখতে পাচ্ছে। পাড়ের ওপর দিয়ে এখন দৃশ্যমান হওয়া মানেই যে-কোনো মুহূর্তে তাদের শুলিতে আঘাতের শিকার হওয়া। ছেলেদের তাই পাড় থেকে দূরবর্তী অবস্থানে রাখা হয়েছে। এ অবস্থায় নদীর ওপারে চরাভূমির জঙ্গল-বোপের আড়ালে লুকিয়ে থাকা আক্রমণকারী শক্রবাহিনীকে শুলি করে ঘায়েল করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে ছেলেরা। এ সময় দাঁড়িয়ে চলাক্ষেত্রে করা মানে শক্রের সরাসরি আঘাতের শিকার হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়া। কিন্তু ঝুঁকি নেয়া ছাড়া তো উপায় নেই। ফলে এক পজিশন থেকে দৌড়ে আরেক পজিশনে যেতে হয়। সবার অবস্থান এবং গোলাবারুদের যোগান দেয়ার ব্যবস্থা করে এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে আমি অন্য পজিশনে চলে যাই। এভাবে প্রায় ঘণ্টাখালেক পার হয়ে যায়। শক্র কখনো থেমে থেমে, কখনো একটানা তীব্র আক্রমণ চালিয়ে যেতে থাকে। আহিন্দারকে কালিয়াগঞ্জের বাজারের সামগ্রিক যুদ্ধের দায়িত্ব দিয়ে আমি এবার বাবলু আর মতিয়ারকে নিয়ে এগিয়ে যাই নদীর বাঁকটা পার হয়ে সোজা দক্ষিণে। শক্রকে পেছন থেকে আঘাত করতে হবে। নদী পার হয়ে শক্রকে পেছন থেকে ঘিরে ফেলার উপায় বের করতে হবে। এ ফ্রন্টে শক্র কোনোদিনই করতোয়া পাড় পর্যন্ত আসে নি বা আসবার সাহস করে নি। আজ এসেছে, যদিও নদী পার হতে পারে নি, কিন্তু অন্য আর একদিন যে তারা সত্ত্ব

সত্ত্ব নদী পার হতে পারবে না একথা তো বলা যায় না। সুতরাং আর কোনোদিনই যাতে তারা নদী পার হবার সাহস না করে, তেমন শিক্ষাই আজ তাদের দিতে হবে।

বাবলু চার-পাঁচজনের একটা দল নিয়ে দ্রুত সামনের দিকে এগুতে চায়। আবেগে-উদ্দেশ্যনায় ওর রক্ত যেন টগবগ করে ফুটছে। একটা ১৭ থেকে ১৮ বছর বয়সী তরুণ তার চোখের সামনে এতোগুলো রাজাকার আর পাকিস্তানি শক্রসেনা দেখেছে, আবেগাগুত গলায় কিছুক্ষণ আগে তাদের উদ্দেশ্যে কথা বলেছে, আর তার জবাবে তাকে লক্ষ্য করে ছুঁড়েছে গুলি, সেই শক্রপক্ষের কয়েকজনকে আহত বা নিহত করা যাবে না, এ যেনো মেনেই নিতে পারছে না সে। এখন তাকে খান হত্যার প্রবল নেশায় পেয়ে বসেছে। যতোই বলছি আস্তে যেতে, শুনছে না সে। আগে আগে দৌড়ে চলেছে এস.এল.আর.টা হাতে নিয়ে উদ্যত ভঙ্গিতে। এভাবে এগুতে থাকলে সে নিজেই যে শক্রের টার্ণেটি হয়ে যেতে পারে, সে ভাবনা এখন তার মনের মধ্যে বিন্দুমাত্র কাজ করছে না। তারুণ্যের ভয়ানক আবেগে তাড়িত বাবলু। আর একটু বয়স আর ম্যালুরিটি থাকলেই সে হয়তো আজ একটা বড়ো ধরনের সাফল্যের মুখ দেখতো। নদীর ওপারে সমবেত শক্র, বলতে গেলে চোখের সামনে। সামান্য ধৈর্য আর বুদ্ধির আশ্রয় নিলে যাদের সবগুলোকে ফেলে দেয়া যেতো।

বাবলু বেশ খানিকটা দূর এগিয়ে গেছে। আমরা নদীর বাঁ দিক লক্ষ্য করে এখন এগুচ্ছি। এদিকে শক্রের গতিবিধি আছে কি না, সেটা দেখবার চেষ্টা করছি এবং পার হওয়ার স্থান নির্বাচনের সঙ্গে স্থানটা বা দিকটা দেখছি। এপারে, খ্যালী প্রান্তের মাঝে মাঝে ঝোপঝাড়, কাঁটা-লতা। নদীর পাড়ে লোকবসতি নেই। একবারে আদিগন্ত খোলা শক্ত মাঠ। চমৎকার লাগে জায়গাটা। এ ধরনের জায়গা যুদ্ধের জন্য অন্যত্যন্ত উপযোগী। অবস্থান দেখে মনে হয়, যুদ্ধের মাঠ হিসেবে ব্যবহারের জন্যই যে এই এলাকাটির সৃষ্টি।

সুবিধায়তো জায়গা দেখতে দেখতে জামরা এগুতে থাকি। ঠিক এই সময় সামনে থেকে গোলাগুলির শব্দ ভেসে আসে। আমরা এগিয়ে যাওয়া বাবলুর দল সম্ভবত শক্রকে দেখে ফেলেছে এবং দেখামাত্রই গুলিয়ে শুরু করে দিয়েছে আমাদের অপেক্ষায় না থেকে। ভরতের শব্দে শক্রের গুলির জবাব আসছে। বাবলুর ৩ থেকে ৪ জনের ক্ষুদ্র দলটি ঠাসঠুস করে সাধ্যমতো তার জবাব দিয়ে চলেছে। এবার উর্ধ্বাসে দৌড়ে চলি বাবলুর অবস্থানের দিকে। আয় ৩ থেকে ৪শ' গজ সামনে পাওয়া যায় ওদের। আমাদের দেখেই গুলি থামিয়ে বাবলু চিৎকার করে নেচে ওঠে, এক খানকো মার দিয়া মাহবুব তাই! ওর চোখে-মুখে উদ্বাস আর আনন্দের উচ্ছ্বস। অবশ্যে সাফল্য এসেছে। একজন পাকসেনাকে সে গুলি করে ফেলে দিতে পেরেছে। ওর আনন্দ প্রকাশের ভঙ্গি আয় পাগলের রূপ নিয়েছে। ওপারে পাকসেনারা তখনো অত্যন্ত সক্রিয়। প্রবল বেগে তাদের গুলি আসছে। বাবলুকে টেনে তাইয়ে দিয়ে শক্রের সাথে যোকাবেলায় লেগে যাই। আমার হাতে একটা ৩০৩ রাইফেল। মানিকগঞ্জ যাবার সময় হাতে আমাদের কোনো অস্ত্র ছিলো না। কিন্তু কলিয়াগঞ্জ বাজারে পৌছে পুরোন্তর যুদ্ধের মাঝখানে পড়ে গিয়ে অন্য একজনের হাতে ধরা রাইফেল তুলে নিতে হয়েছে। যুদ্ধের মাঠে খালি হাতে যুদ্ধরত বাহিনীর নেতৃত্ব দেয়া যায় না। রাইফেলের ট্রিগার চাপতে চাপতে বাবলুকে বলি, খান মারলি কেমন করেং?

— ওপারে শোপাদার পাশ্প হাউসের ছাদে দাঁড়িয়ে ২/৩ জন পাকসেনা নদীর এ পারের দিকে দেখছিলো। তখন এস.এল.আর. চালিয়ে ফেলে দিয়েছি একজনকে, টগবগিয়ে জবাব

দেয় বাবলু।

— ওটা যে খান, সেটা বুঝলি কী করে? আবার জিগ্যেস করি তাকে।

— মাথায় হেলমেট, পরনে খাকি ইউনিফর্ম। একেবারে জেনুইন খান, তার নিশ্চিন্ত
ক্রু উভর। বাবলু সত্যিই তা হলে একজন পাকসেনাকে হত্যা করতে পেরেছে। সকালে
তার করা ভুলের মাসুলের কিছুটা হলেও শোধ হবে এই ঘটনার ভেতর দিয়ে।

সাফল্য আর বিফলতা পাশাপাশি চলে। তত সংবাদের পাশাপাশি দৃশ্যমানও থাকে।
এই সময় দৌড়ে আসে মালেক দুর্সংবাদটা নিয়েই। দৌড়তে দৌড়তেই সে চিন্কার করে
জানায় হাসান গুলি খাইছে। তাড়াতাড়ি চলেন।

হাসান গুলিবিদ্ধ হয়েছে। শোনায়াই মাথাটা চক্র দিয়ে ওঠে। তুরিত উঠে দাঁড়াই।
জিগ্যেস করি, কোথায় লেগেছে গুলি?

— পিঠের মধ্যে।

— বলিস কি, বলে দৌড়তে থাকি সবাইকে নিয়ে। দশম শ্রেণীতে পড়া বাঢ়া বয়সী
বোকাটো ধরনের কিন্তু অত্যন্ত সিনিয়ার ছেলে হাসান এর আগেও ক'বার বিপদ থেকে বেঁচে
গেছে। এবার তাহলে সে সত্যি সত্যিই গুলি খেলো! দুর্ঘটনা ঘটেছে বাজারের ডান দিকে নদীর
বাঁকে, যেখানটায় ছিলো একরামুলের অবস্থান। হাসান সঙ্গীত শোয়া অবস্থা থেকে উঠে
দাঁড়িয়ে ছিলো। শক্র তাকে দেখামাত্র নদীর ওপার থেকে টুকিপ্রিট করেছে। গুলি খাওয়ার আগ
যুহুর্তে সামনে-পেছনে-ঘুরে-ফিরে দেখছিলো। শক্র গুলি তাই তার পিঠের ঠিক মাঝামাঝি
বেরবদ্দের পাশ ভেদ করে ভেতরে চুকে গেছে। বুরেটো আটকে আছে ভেতরে, বের হয় নি
সামনে দিয়ে। কোথায় যে কি অবস্থায় আটকে আছে, বুঝবার উপায় নেই। গলগল করে রক্ত
বরছে তার ক্ষতস্থান বেয়ে। তার গা থেকে গুরুতর শার্টটা খুলে ফেলা হয়েছে। কোমরের
গামছাটা খুলে তুলে দিই একরামুলের হাত্তি পিঠটা ভালো করে পেঁচিয়ে বাঁধতে বলি। ছটফট
করছে হাসান মাটিতে শয়ে। অসম্ভব হচ্ছে তার বুঝতে পারি। চোখজোড়া বুজে আসছে।
দ্রুত নিষ্ঠেজ হয়ে আসছে দেহ বুঝবার আমাকে বলছে, ভাইজান, মুই বাঁচিবার নও। মুই
মরি শৈলে মোর বাড়িত খবর দ্যান। রংপুরে মহীপুর ফার্মের নাগাত মোর বাড়ি।

হাসানের মাথা কোলে নিয়ে বসি। একরামুল ব্যাডেজ বাঁধতে থাকে। বাবলু আর খলিলকে
দ্রুত একটা মই যোগাড় করতে বলি। মইকে ট্রেচার বানিয়ে তাতে হাসানকে ওইয়ে দ্রুত
মানিকগঞ্জ নিয়ে যেতে হবে। তার আগে নদাকে খবর দেয়া দরকার বি.ও.পি.র ওয়ারলেসের
মাধ্যমে। মতিয়ারকে একটা সাইকেল নিয়ে দ্রুত মানিকগঞ্জ যেতে বলি। বি.ও.পি.র
কম্যান্ডারকে বলে ক্যাপ্টেন নদাকে ম্যাসেজ পাঠাতে। হাসপাতালে পাঠিয়ে খুব জরুরি চিকিৎসা
ব্যবস্থা দিতে না পারলে হাসানকে বাঁচানো যাবে না। এজন্য নদা এবং তার গাড়ি প্রয়োজন।

হাসান সমানে প্রলাপ বকে চলে, মুই তো গেনু বাহে, তোমরা যুদ্ধ করেন। জয় বাংলা
করেন। জয় বাংলা হইলে মোর বাপ-মাক এখনা খবর দ্যান...।

হাসানকে ঘিরে একটা শোকাবহ দৃশ্যের অবতারণা হয়। আকাসের কথা মনে হয়
তখন। আকাস গুলি খেয়ে একইভাবে প্রলাপ বকেছিলো প্রচণ্ড যন্ত্রণার সঙ্গে। তাকেও
একইভাবে মইয়ের ট্রেচারে করে বেরবাড়িতে পাঠানো হয়েছিলো চিকিৎসার জন্য।
আকাসকে বাঁচানো যায় নি। পথিমধ্যেই শেষ নিষ্কাস ত্যাগ করেছিলো সে। হাসানেরও কি
সেই একই পরিণতি হবে? বুকের ভেতরটা ছ্যাঁৎ করে ওঠে। মনের গভীর থেকে প্রার্থনা!

করি, খোদা, হাসান যেনো মরে না।

মইয়ের ট্রেচারে হাসানকে শুইয়ে দিয়ে ৪ জন সেটা কাঁধে তুলে নেয়। আরো ৪ জনকে তাদের সাথে দিই। পথে তারা পরম্পর কাঁধ বদল করবে। একরামুল নিয়ে যাবে তাদের নেতৃত্ব দিয়ে। তাকে বলে দিই, যত দ্রুত সভ্ব দৌড়ে যাবি মানিকগঞ্জে। কাঁধ ঝাঁকিয়ে একরামুল ট্রেচার বাহিনী নিয়ে রওনা দেয়।

লড়াই তখন থেমে গেছে। বেলা একটার মতো সময়। নদী পার হয়ে পলায়নপর শুভবাহিনীর পিছু ধাওয়া করা হবে এই উদ্দেশ্য নিয়ে ভারি কাঠের নৌকোটা ঠেলতে ঠেলতে একটা দল ওপারে নেমে গিয়ে সোজাসুজি অবস্থান নেয়। নৌকোটা ফিরে এসে বাদবাকি ছেলেরা আবার নৌকোয় করে রওনা দেয় ওপারের উদ্দেশ্যে। প্রবল চেউয়ের সাথে লড়াই করতে করতে নৌকোটা এসিয়ে গোলেও মাঝ নদীতে গিয়ে সেটা স্রোতের তোড়ে ঘূরপাক খেতে থাকে। টালমাটাল অবস্থা তার। নৌকোতে ওঠা ছেলেদের সংখ্যা আগেরবারের চাইতে এবার অনেক বেশি এবং তাদের সাথে বহন করা অন্তর্ভুক্ত আর গোলাবারুদের পরিমাণও বেশি। ফলে ভার বহনে অক্ষম নৌকোটায় পানি উঠতে শুরু করেছে। তার অবস্থা এখন এমন যে, এগোয়ও না পিছোয়ও না, কেবল ঘূরপাক খেতে থাকে। অবস্থা দেখে ছেলেরা অস্ত্র হয়ে উঠে শুরু করে চেরাচেলি। নৌকো যখন-তখন ভুবে যেতে পারে মাঝ নদীতে তখন এই রুকম পরিস্থিতি। ঠিক এই বিপদের ভেতরেই দূর থেকে শুলিশুলিদের ভেসে আসে। পাকসেনারা প্রতিআক্রমণ শুরু করেছে, এই আশঙ্কায় ওপারে অবস্থান নেয়া ছেলেরা ভয়ে দৌড়ে এসে নদীতে বাঁপ দেয়। টালমাটাল নৌকোর ছেলেরাও আর নিজেদের সামাল দিতে পারে না। তারাও বাঁপিয়ে পড়তে থাকে নদীর পানিতে। মুন্দুর প্রবল স্রোত ঠেলে কাঁধে ভারি অস্ত্রসহই তারা আপাণ চেষ্টা করতে থাকে সাতরে একটাকে আসার ব্যাপারে। ক'জন 'বাঁচাও বাঁচাও' বলে নদীর স্রোতে প্রায় ভেসে যেতে যেতে চিকিৎসা করতে থাকে। না, আর বসে থাকা যাবে না। নদী পার হয়ে পাকসেনাদের পিছু ধাওয়া করার এই বাজে সিঙ্কল্সটা কে দিয়েছে, জানি না। মেজাজটা খিচড়ে ওঠে মুহূর্তে কিন্তু যাই হোক না কেনো, তাদের এখন সর্বাপে নদী থেকে উদ্ধার করা প্রয়োজন আর সেই প্রয়োজন থেকে নদীর এপারে দাঁড়িয়ে থাকা ছেলেদের হঁকড়াক করে নদীতে নামিয়ে দিয়ে সে কাজ করতে থাকি। ২ জন বাদে সবাই সাতরে প্রায় আধ মরা অবস্থায় এপারে এসে যায়। দু'জন প্রায় ঢুবতে বসেছে। নৌকো দিয়ে উদ্ধার করা হয় তাদের। প্রায় ঘন্টাখানেক লাগে এই উদ্ধার অভিযান চালাতে। মাথা গোলাগুলতি করে সবাইকে ঠিকঠাক মতোই পাওয়া যায়। কিন্তু পাওয়া যায় না কেবল একটা এস.এল.আর। মাঝানদীতে সেটা ভুবে গেছে একজনের কাছ থেকে। যাদের উদ্ধার করা হয়, তাদের প্রায় প্রত্যেকেই নদীর পানি খেয়ে খেয়ে পেট ফুলে ঢেল হয়ে গেছে। নদীর পাড়ে তাদেরকে টেনে টেনে তোলা হয়। আর এভাবেই শেষ হয় কালিয়াগঞ্জের যুদ্ধ।

বিকেল চারটার দিকে রওনা দিই মানিকগঞ্জ অভিযুক্তে। ক্যাটেন নদা বসে আছেন মানিকগঞ্জ বি.ও.পি.তে। যুদ্ধের সর্বশেষ খবরাখবর জানাতে হবে তাঁকে। মানিকগঞ্জ থেকে মতিয়ার ফিরে এসে খবরটা দেয় আমাকে।

সূর্য ডোবার আগেভাগেই পৌছে যাই মানিকগঞ্জে। ক্যাটেন নদা অধীর আঘাত নিয়ে বসে ছিলেন আমাদের প্রতীক্ষায়। তিনি উঠে বেরিয়ে আসেন বি.ও.পি.র বাইরে। সারাদিনের যুদ্ধের ধ্বনি, শ্রান্তকৃত আর বিক্ষণ চেহারা। কাপড়ে জামায় হাসানের দেহের

রক্তের দাগ। ক্যাপ্টেন নদা আমার এই চেহারা দেখে মুহূর্তে শক্তি হয়ে ওঠেন। আমার জামায় রক্তের দাগের দিকে তাকিয়ে তিনি উহেগমাখা স্বরে জিগ্যেস করেন, মেহবুব তুমহারা কুছ হ্যাঃ তুম কি আঘাত পেয়েছোঃ গট ইনজুরিঃ

— নো স্যার, ফ্লান্ট কষ্টে বলি তাকে। জবাব শব্দে এগিয়ে এসে কাঁধে হাত রাখেন তিনি। তারপর বলেন, আই আয়াম কন্ডিস্যুন্ড বয়েজ দ্যাট ইউ আর রিয়েলি ফাইটিং। ইউ আর ফাইটিং অ্যান্ড ডাইং। তোমাদের দেশ অবশ্যই আজাদ হবে। জয় বাংলা জরুর আয়েগা, তুম দেখলে না। হাথলোগ হ্যায় তুমহারা সাথ। বিশাদের ছায়া মেশানো এই সক্যাবেলায় ক্যাপ্টেন নদার আন্তরিক গলায় উচ্চারিত কথাগুলো মনের গভীরে দাগ কেটে যায়। জয় বাংলা অর্থাৎ স্বাধীন বাংলার জন্মের নেপথ্যে এই ভিন্নদেশী তরঙ্গ অফিসারটি দিনরাত থেকে মরছেন অন্য অনেকের মতো। জয় বাংলা হলে নদার ব্যক্তিগত লাভালাভের কিছু নেই। তারতের ইউপিতে তাঁর বাড়ি। সত্যি সত্যি যদি দেশটা একদিন স্বাধীন হয়েই যায়, মুক্তিযুদ্ধের সক্রিয় শরিক হিসেবে ভিন্নদেশী এই অফিসারটির অবদান আমাদের অবশ্যই শ্রণ করতে হবে। সেই সাথে ভোলা যাবে না অজানসংখ্যক এ ধরনের মানুষের অবদানও।

কথার মাঝখানে নদাকে জিগ্যেস করি, হাসানের খবর কি?

— তাকে বাঘড়োগুরা হাসপাতালে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। ডোক্ট অরি ফর দ্যাট ব্রেত বয়। আই আয়াম সিওর হি উইল সারভাইভ।

সক্ষ্যার ঘনিয়ে আসা অঙ্ককারে বি.ও.পি.র ভেতর তেসে চা খেতে খেতে নদাকে বলি, কাল জলপাইগুড়ি যানে চাহতা হ্যায় স্যার।

— কিউঁ? জিগ্যেস করেন তিনি।

— কুছ কাম হ্যায়।

— কেয়া কাম?

— পারসোনাল। . .

— ইজ ইট? দেন ইউ ক্যান্সো

— আহিদার ভি মেরা সাথ যায়েগা।

— ও.কে. ফ্রেন্ড, নদা সানন্দে সম্মতি দেন। নদাকে খুলে বলি না। কিন্তু আমার নিজের জলপাইগুড়ি যাওয়া প্রয়োজন ভিয়েতনাম যুদ্ধের ওপর কিছু বই কেনার জন্য। নাপাম বোমাসহ অন্যান্য মারাঘক সর্বাধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত প্রায় পাঁচ লাখ মার্কিন সৈন্যের বিরুদ্ধে ভিয়েতনামি জনগণ কীভাবে যুদ্ধ করছে, সেটা জানা দরকার। যুদ্ধটা প্রলম্বিত হলে ভিয়েতনামের মতোই প্রস্তুতি গ্রহণ করা প্রয়োজন। আর সে কারণেই ভিয়েতনামের গেরিলা যুদ্ধ সংক্রান্ত বইপত্র সম্পর্কে অভাববোধ করে আসছি অনেকদিন থেকেই। জলপাইগুড়ি শহরে যাওয়ার নেপথ্যের কারণ হচ্ছে, সেগুলো সেখানকার বইয়ের দোকান থেকে সঞ্চাহ করা। এছাড়া সোনাউল্লাহ হাউজে রয়েছে খালেকুজ্জামান। জলপাইগুড়ি গেলে অবশ্যই সোনাউল্লাহ হাউজে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে অনুরোধ করেছে সে। কমরেড সামসুদ্দোহাও সেখানে রয়েছেন। আরো অনেক বিখ্যাত কমরেডদেরও দেখা মিলবে সেখানে গেলে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত অগ্রগতি এখন কোন্ পর্যায়ে, তাঁদের সাথে আলোচনা করে সেটা জানা দরকার। দিন নেই রাত নেই শক্র বিরুদ্ধে লড়ে যাচ্ছি আমরা। বঙ্গবন্ধু ডাক দিয়েছিলেন স্বাধীনতা। তাঁর ডাকেই আজকের এই যুদ্ধ। তিনি বাস

করছেন পিতার মতো বুকের গভীরে হোন না তিনি পাকিস্তানি কারাগারে বন্দি। কিন্তু তিনি কি ফিরতে পারবেন জীবিতাবস্থায়? তার অনুপস্থিতিতে শুরু হওয়া যুক্তিযুক্তকে ঘিরে রাজনীতির অবস্থান কেমন এবং কমরেডরা কে কি ভাবছেন, সেটা জানা অত্যাবশ্যক।

নদা বিদায় নেন সক্ষার আধারে। কিছুক্ষণ মানিকগঞ্জ বাজারে উদ্দেশ্যবিহীনভাবে ঘোরাফেরা করে ফিরে চলি আবার আমাদের আস্তানা অভিযুক্তে। সকালে মানিকগঞ্জ আসতে চেয়েছিলাম, কিন্তু সেই আসাটা যে এভাবে আসতে হবে, সেটা ভাবি নি।

১৫. ১০. ৭১

নতুন অ্যাসাইনমেন্ট আবার

আবার নতুন দায়িত্ব নেবার জন্য ডাক আসে। রাতের অপারেশন শেষে ফিরে বিছানার ওপর নেট বইটা খোলা অবস্থায় দেখি। চাঁদ মিয়াকে জিগ্যেস করতেই জানা যায়, বদিউজ্জামান এসে আমাকে না পেয়ে ক্যাপ্টেন নব্বার একটা ম্যাসেজ লিখে রেখে গেছে এভাবে—

Mr. A Jabbar has been sent to Squade No. 4 and Mr. Mahbubul Alam will return to the H. Q with

1. Ekramul Haque
2. Asgar Ali
3. Zainal Abedin
4. Aftar Ali
5. Zahirol
6. Afizul Haque

No-3

1. Abu Bakar Sarker
2. Habibur Rahman
3. Tariqul Islam
4. Matiur Rahman
5. Madhusudan Barman
6. Dinesh Chandra
7. Mozammel Hossian
8. Soliman
9. Shirajul Islam.

No-2

1. Zakaria Hossain
2. Bharat Chandra
3. Shambo Ram Barman
4. Shafiqur Rahman
5. Ashyani Kumar
6. Shahidul Islam.

ম্যাজেস্টা দেখেই মেজাজটা বিচড়ে গঠে। রেগে ফেটে পড়ি সশব্দে, পেয়েছে কি এরাৎ ইয়াকি নাকি! কেবল শুনিয়ে এনেছি জয়গাটা, সবকিছু ঠিকঠাক সেট হয়ে গেছে। সামনে রয়েছে কতো কাজ। এ অবস্থায় হেড কোয়ার্টারে ডেকে পাঠানো কেনো? আমি যাবো না, এই বলে ঘোষণা দিই সবার সামনেই। এভাবে আমার অগ্নিমূর্তি দেখে সীতিমতো ভয় পেয়ে যায় ছেলেরা। আহিদারও মেনে নিতে পারে না ব্যাপারটা। জৰুৱারেরও একই মত।

সাকোয়া-শালভাঙ্গা আক্রমণ করার কথা আজ-কালের মধ্যে। এরপরই বোদার ওপর আক্রমণ। সে পরিকল্পনাও প্রায় চূড়ান্ত। এরপর হয়তো ডেমার, মীলফায়ারী, সৈয়দপুর ও ঠাকুরগাঁও পর্যন্ত গেরিলা হামলা চালানো যেতো। এখান থেকে বাংলাদেশের গভীরতম অঞ্চলে আঘাত করার পরিকল্পনার দায়িত্ব দিয়েই পাঠানো হয়েছে আমাকে ভেতরগড়-নালাগঞ্জ এলাকা থেকে ভুলে এনে। আর এখানে আসার প্রথম দিন থেকেই শব্দের সাথে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে হয়েছে বলতে গেলে সার্বক্ষণিকভাবে। যুদ্ধের ক্ষেত্রে এখানে অর্জিত সফলতাগুলো উত্তোল করবার মতো। ছেলেরাও অত্যন্ত পারদর্শী হয়ে উঠেছে। পাশাপাশি আরো দুটো কোয়াডের সাথে চমৎকার সময়-সম্পর্ক গড়ে তোলা হয়েছে। সহযোগিতার সম্পর্ক স্থাপন করা গেছে প্রতিবেণী হেমকুমারী ইউনিট বেসের দলের সাথেও। সামনে নয়াদিঘি পর্যন্ত বিরাট এলাকা মুক্তাঞ্চল হিসেবে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে আনা সভ্য হয়েছে। পাকবাহিনীর পা-চাটা দালাল শাস্তি কমিটির সদস্য ও মুসলিম লীগার এবং জামাতপন্থীর এলাকা ছেড়ে পালিয়ে গেছে। হ্রাণীয়ভাবে রাজনৈতিক ব্যক্তিদের যুদ্ধের সাথে সম্পর্ক স্থাপন গেছে। শুধু তাই নয়, জনগণের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কাজ শুরু হয়ে গেছে। ভেতরে একেক অসংখ্য তরঙ্গ-যুবক আসছে যাক বেঁধে মুক্তিযুদ্ধে শরিক হওয়ার জন্য। দিনেশ্বৰের দিন যখন আমাদের কাজের এলাকা সম্প্রসারিত হচ্ছে, সফলতা আসছে সম্ভোগজনকভাবে, তখন এভাবে হঠাৎ করে হেড কোয়ার্টারে আমাকে ডেকে পাঠানো কেন্দ্রীয় প্রয়োজন পড়ে, তবে অন্য কমান্ডারকে ডেকে নিক। আমার সাজানো বাগানের মজুর এই ফ্রন্ট ছেড়ে আমি যেতে পারবো না। গেলে সবকিছু লঙ্ঘণও হয়ে যাবে। সুতরাং ক্যাপ্টেন নন্দকে ম্যাসেজ পাঠাই। তাতে লিখি, 'আই অ্যাম নট ইন এ পজিশন টু গো ব্যাক হেড কোয়ার্টার। অল প্রোগ্রামস্ উইল সাফার। দেয়ার উইল বি সিরিয়াস সেট ব্যাক ইন দিস ফ্রন্ট ইফ আই এ্যাম টু গো। রিকোয়েস্টেড টু সিলেক্ট আদার কমান্ডার।'

ম্যাজেস্টা পেয়েই নন্দা ইউনিট বেসের উইং কমান্ডার নুরুল হককে আমার কাছে পাঠিয়ে দেন। তিনি তাঁর স্বভাবসূলভ কোমলতা নিয়ে জিশ্বেস করেন, যাবে না কেনো তুমি?

— এই ফ্রন্টের কী হবে তাহলে?

— জৰুৱাৰ তো রইলো। আহিদার-বদিউজ্জামান এৱা সব রয়েছে।

— আপনি যেতে বলেন?

— হ্যাঁ বলি।

— কেনো?

— অথরিটি একটা নতুন স্ট্র্যাটেজি নিয়েছেন। সেখানে তোমার দরকার। ইউ আর সিলেকটেড বাই দ্য অথরিটি...।

— তা হলে যেতেই হবো!

— হ্যাঁ।

— ঠিক আছে, কি আর করা। সেট মি প্রিপ্রেয়ার।

দ্রুত গোছগাছে লেগে যাই। যাদের সাথে নিয়ে আমাকে যেতে বলা হয়েছে, তাদেরকেও তৈরি হয়ে নিতে বলি দ্রুত।

বড়ো ভাই খুশি হন। হাসিমুখে বলেন, যোগ্যতা। যোগ্যতা, বিশ্বাস আর আঙ্গ। কর্তৃপক্ষ তোমাকে বাছাই করেছেন নতুন অ্যাসাইনমেন্টের কমান্ডার হিসেবে তোমার এই গুণাবলির জন্য। বড়ো ভাইয়ের কথার জবাব দিই না। লাভ নেই। যুদ্ধের মাঠ এটা। যুদ্ধের মাঠে একজন সৈনিকের নিজস্ব কোনো পছন্দ-অপছন্দের ব্যাপার নেই। কমান্ডারের আদেশ-নির্দেশই এখানে চূড়ান্ত, অবশ্য শিরোধীর্ঘ। এখানে নিজের মতামতের কোনো দাম নেই।

জবাব একা হয়ে যায়। তাকে বুঝিয়ে দিই হাইড আউটের দায়দায়িত্ব। আহিদারকে বলি তাকে সর্বতোভাবে সাপোর্ট দিতে। জবাব এর আগে কোনো একক ইউনিটের দায়িত্বে থাকে নি। এবার থাকতে হচ্ছে। স্বাভাবিকভাবেই বিচলিত দেখায় তাকে।

পরদিন সকাল ১৮ অক্টোবর ১০টায় মানিকগঞ্জ বি.ও.পি.তে হাজির হই নতুন করে দল কর্মার জন্য নির্বাচিত ২১ জন বাছাই ছেলেসহ। ক্যাটেন নব্বি নির্মল হাসি হাসেন আমাদের দেখে। বলেন, তুমি যে বলেছিলে আসবে না, এলে কেনো? বলি, আপনারা নতুন অ্যাসাইনমেন্ট ঠিক করে তার সেতৃত্ব দিয়ে আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন, হাউ ক্যান আই ডিফাই ইট?

— ইয়েস ফ্রেন্ট, ইয়েস মেরা বিসওয়্যাস থা কি তুম জ্যো জরুর আওগে। ইউ মাস্ট কাম। আমার এক্ষতিয়ারাধীন গোলাবারুদ আর হাতিয়ারের মজুদ, জবাবারকে যা বুঝিয়ে দিয়ে এসেছি, তার হিসেবে লেখা কাগজ তুলে দিই ন্যূন্যত্বাতে। এরপর সবাইকে নিয়ে নিলে উঠে বসি লরিতে। লরি চলতে থাকে। ফলোত্ত আমরা যাবো চাউলহাটি। নতুন অ্যাসাইনমেন্টের ডাক এসেছে। তবে প্রতো যে কি, এখন পর্যন্ত জানি না। হয়তো বেশ কঠিন সে দায়িত্ব। যার জন্যাই তিনি ক্লায়াডের বাছাই করা ছেলেদেরসহ আমাকে নির্বাচিত করা হয়েছে। সবগুলো দায়িত্ব ছেতা এ যাবৎ সফলভাবে পালন করেছি। নতুন পাওয়া এ দায়িত্বে সফল হওয়া যাবে তো! মনের ভেতরে আশা-নিরাশার দোলাচাল। মারেয়া-নয়াদিঘির ওপর কেমন একটা মায়া জমে পিয়েছিলো। আর কোনোদিন কি এসব জায়গায় আসা সম্ভব হবে? হবে হয়তো কোনোদিন, দেশ স্বাধীন হওয়ার আগে না হলেও, স্বাধীনতার পর হয়তো আবার আসা হবে ছেড়ে আসা বস্তুদের মাঝে। সম্ভব হলে বারবার।

হাইড অ্যাভিট (তিন)

চাউলহাটিতে আবার

আবার সেই চাউলহাটি। সেই পুরু, সারি সারি দাঁড়িয়ে থাকা তাঁবু, বিএসএফ ক্যাম্প, বাজার, লোকালয়— সেই পুরনো পরিচিত জগৎ। হাইড আউটের নিরাপত্তাহীনতা, দিনরাত শক্রুর আগমন অপেক্ষায় টানটান টেনশন, যুদ্ধ আর অন্তীম সমস্যার ভেতরে কালাতিপাত-পেছনে এইসব কিছু ফেলে রেখে হেড কোয়ার্টার চাউলহাটিতে এসে প্রথম প্রথম ভালোই লাগে। পুরুরপাড়ের কাছাকাছি এসে গাড়ি থেকে নেমেই উচু পাড়ের সেই অর্ধমৃত কঠাল গাছটার তলায় চলে যাই। অমরখানা পাকবাহিনীর ঘাঁটি এখান থেকে দেখা যায়। অমরখানা পরিত্যক্ত ইপিআর ক্যাম্পের সাদা দালানটা এখনো দাঁড়িয়ে আছে আগের যতোই আপন মহিমা নিয়ে। বিকেলের পড়ত্ত আলোয় সাদা ধূধূবে দেখায় সেটা। বিগত ক'মাসে কামান আর মর্টারের শেল দালানটি লঙ্ঘ করে অবিরাম হোঁড়া হলেও একেবারে অক্ষত অবস্থায় রয়ে গেছে সেটা। অবিশ্বাস্য লাগে দালানটির দাঁড়িয়ে থাকার ব্যাপারটি। ঐ দালানটিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে পাকবাহিনীর সর্বজনীন অমরখানা অঞ্চলীয় ঘাঁটি। দিনরাত কামানের শত শত গোলা হজম করে, সামনের অবস্থান থেকে মুক্তিফৌজদের সাথে সার্বস্বত্ত্বাত্মক প্রচণ্ড যুদ্ধে লিঙ্গ থেকে, পেছন থেকে প্রক্র.এফ. বাহিনীর গেরিলা আক্রমণের আঘাত সয়েও পাকবাহিনী তাদের ঘাঁটি ধরে নেওয়েছে দুবিনীতভাবে। তারা সেখানে আছে এবং থেকে যাবে। তারই সর্গবর্ষ প্রতিক্রিয়ায় চলেছে তারা তাদের ওপর পরিচালিত প্রতিটা আক্রমণ ঠেকিয়ে এবং নিয়মিত প্রতিআক্রমণ চালিয়ে। তারা অজ্ঞয়, তাদের ঘাঁটির কোনোদিনই পতন হবে না তার দ্বিতীয়তাকে সদাচ্ছে যেন ঘোষণা করছে অমরখানার সেই অক্ষত সাদা দালানঘরটি। যুক্তে প্রথম থেকেই চাউলহাটি পুরুরপাড়ের এই জায়গা থেকে অমরখানার সেই দালানটিকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখছি। আজও যুদ্ধের মাঠ থেকে ফিরে এসে একইভাবে দাঁড়ানো সেটি দেখছি। যাবখানে বেশ কিছুটা সময় পার হয়েছে। সাদা দালানের অস্তিত্বটা বুকের ভেতর এক গভীর অক্ষম ঈর্ষা জাগিয়ে দিয়ে চেপে বসে। মনে হয়, জুন থেকে অক্টোবর একটা দীর্ঘ সময়। এ সময়ে আমরা পাকবাহিনীকে মোটেই কাবু করতে পারি নি। বলতে গেলে কিছুই করতে পারি নি তাদের। এমনটা চলতে থাকলে কতোদিনে হবে জয় বাংলা? দেশ স্বাধীন করতে কতোদিন সময় লাগবে? আদৌ কি সেটা সম্ভব হবে? এখন এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজে কোনো লাভ নেই। আগামী অবাগত দিনগুলোর জন্য তা ঝুলিয়ে রেখে ফিরে আসি ক্যাম্পের তাঁবুর ভেতরে।

আমার প্রিয় তাঁবুর নির্দিষ্ট জায়গায় আবার বিছানা পাতি। একটা পুরো বর্ষাকাল গেছে তাঁবুগুলোর ওপর দিয়ে। হাইড আউটে যাওয়া ছেলেরা তাদের নিজস্ব ব্যবহারিক

জিনিসপত্র, অনেক কিছুই নিতে পারে নি সাথে। তাঁবুর ভেতরে উচিয়ে রেখেছে অনেকেই তাদের বিচ্ছানাপত্র, ট্রেইনিং সেন্টারে পাওয়া পোশাক এবং দেশ থেকে পলাতক অবস্থায় আনা জামাকাপড়সহ অন্যান্য ব্যবহারিক সামগ্রী। হাইড আউটের জীবনে এগুলো নেয়ার উপায় ছিলো না, এমনিতেই সেখানে প্রাত্যাহিক রেশনসামগ্রী, শোলাবারকদ আর অঙ্গশঙ্খ টানতে টানতেই অস্থির, সেখানে শুধু অতি প্রয়োজনীয় ব্যবহার্য জিনিসপত্র ছাড়া আর কিছু নেয়ার অনুমতি ছিলো না। হেড কোয়ার্টারের নিরাপদ হেফাজতে তাই সেগুলো রেখে যাওয়া হয়েছিলো। কিন্তু সেই নিরাপদ হেফাজতে রাখা ব্যক্তিগত মালসামানার বর্তমান অবস্থা দেখে দার্কণ হতাশ আর বিস্ফুর্ক হয়ে ওঠে মন। অধিকাংশ জিনিসই নষ্ট হয়ে গেছে। বর্ষার ভেজা মাটি, বৃষ্টির ছাঁট এবং স্যান্ডসেন্টে জলীয় আবহাওয়া সবকিছুকে পঢ়িয়ে দিয়েছে। হেড কোয়ার্টারে অবস্থানরত ছেলেরা জিনিসগুলো রক্ষা করতে পারতো খেয়াল করে যত্ন নিলে, ভেজা জিনিসগুলো নিয়মিত রোদে শুকিয়ে রাখলেই সবার জিনিসপত্র হয়তো ঠিক থাকতো। বড় ভাই নুরুল হক হেড কোয়ার্টার ক্যাপ্সের সার্বিক দায়িত্বে থেকেও কেনো যে ব্যাপারটির দিকে লক্ষ্য দিতে পারেন নি, বোৰা যায় না। আন্তরিক, একনিষ্ঠ আর সদাব্যাস্ত এই সরল মানুষটির তো এ জাতীয় ভুল হওয়ার কথা নয়। হাইড আউটে থাকা কোয়াডগুলোর সাথে সমন্বয় রাখা এবং উর্ধ্বতন মহলের সাথে যোগাযোগের ব্যস্ততার কারণেই সম্ভবত এ দিকটা তার নজর বা মনোযোগ এড়িয়ে গেছে, কিংবা তিনি স্মর্তভোবেছেন, তাঁবুর ভেতরে ছেলেদের জিনিসপত্রগুলো তো ঠিকভাবেই রয়েছে, অস্বিধা কি? কিন্তু এদিকে যে জিনিসপত্রে ঘুণে বা পচন ধরেছে, সেটা তিনি টের পান নি। প্রথমে টের পাওয়া গেলো বাবলুদের তাঁবু থেকে।

সে এক মহা হৈচেয়ের ব্যাপার। বৈমাত্তে বিদ্রোহ ঘোষণার শামিল হাইড আউট ফেরত ছেলেদের মধ্যে। এমনিতেই হাইড আউটের স্বাধীন এবং উদ্বাধ জীবনযাপনের বিরতি টেনে হেড কোয়ার্টারের নিয়ন্ত্রিত জীবনে সবাইকে নিয়ে আসায় তারা মনেপ্রাণে বিস্ফুর্ক, তার ওপর গাঢ়ি থেকে দেখে ফল ইন করে যে যার তাঁবুতে গিয়ে থাকবার ও শোবার জায়গা ঠিক করবার বিরতিতে রেখে যাওয়া স্ব-স্ব মালসামানার পেটলা-পুটলি ঝুঁজে বের করে দেখতে গিয়েই বেধে যায় যতো বিপন্নি। এমনকি দেখা যায়, ট্রেইনিং সেন্টার থেকে পাওয়া কাপড়ের জুতো জোড়াও পচে গিয়ে কাপড় খেস পড়েছে, রয়েছে শুধু সুকতলাটা। দেশ থেকে পালাবার সময় বয়ে আনা প্রতিটা জিনিসের প্রতি ছেলেদের রয়েছে অসম্ভব দুর্বলতা। এগুলো বাড়ির জিনিস, যার সাথে জড়িয়ে রয়েছে তাদের গভীর নষ্টালঞ্জিক পিছুটান। বাবা-মা-আজীয়-স্বজনসহ একান্ত প্রিয় কোনো জনের শৃতির ছাপ রয়ে গেছে সেগুলোর সঙ্গে। কে জানে কবে আবার দেশে নিজ বাসভূমে ফিরে যাওয়া সম্ভব হবে, আদৌ হবে কি না। কিন্তু যতোদিন বাড়ি থেকে আনা জিনিসগুলো থাকবে, ফেলে আসা আপনজনেরাও থাকবেন সেগুলোর সাথে নিবিড় মেশামেশি করে। তো, জিনিসপত্রের এই হাল দেখে ছেলেদের বিস্ফুর্ক হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু বিদ্রোহ আর চেচামেচির ব্যাপারটা তারা একটুখানি জোরেশোরেই করে ফেলে। ফলে হেড কোয়ার্টার ক্যাপ্সের নিয়ন্ত্রিত শৃঙ্খলা এর দ্বারা বিস্তৃত হয়; যেটা হওয়া উচিত নয়। বড় ভাই নুরুল হকের দৌড়াদৌড়ি, ধৰ্মকধামক শুরু হয়ে যায়। এমনকি পুরুরের অপর পাড় থেকে ক্যাপ্টেন নদাকেও ঘটনার মুখে নাক গলাবার জন্য আসতে হয়।

ফল ইন ফল ইন এভি বডি

নন্দা বলেন, কেয়া হ্যাঁ হোয়াট হ্যাপেনড? ইয়ে সাউটিং কিস কি লিয়ে? অফিসার ইনচার্জ ক্যাটেন নন্দা। ছেলেদের তাঁবু এলাকায় আসাতে ইউনিট বেসের এক নম্বরের কমান্ডার নুরুল হক যেনে আরো উৎসাহ পান। তাঁর আগেকার ক্ষ্যাপামোর ক্ষেত্রে যেনে এর ফলে আর এক ডিপ্রি মাত্রা বেশি যোগ হয়। তিনি পাগলের মতো ছেলেদের বকাবকা করতে থাকেন। তাঁর বলা কথাগুলোর ধরনধারণ অনেকটা এ রকমের যে, তোমরা ক্যাপ্সের ডিসিপ্লিন নষ্ট করছো। ট্রেইনিং সেন্টারে শেখানো ডিসিপ্লিন তোমরা ভুলে গেছো। তোমরা হচ্ছে ফোর্স। ফোর্সের ডিসিপ্লিন কিংবা শৃঙ্খলাবোধটাই হচ্ছে বড়ো কথা।

— রাখেন আপনার ডিসিপ্লিন, এদিকে আমাদের সব জিনিস নষ্ট হয়ে গেছে।

নুরুল হকের কথার মাঝখানেই ফেস করে ওঠে উদ্যত সাপের ফণার মতো বাবু ও হাবিব। নুরুল হক তখন খতমত খেয়ে যান এবং রাণের মাত্রা তার আরো বেড়ে যায়। তিনি বলতে থাকেন, তোমরা সব বেয়াদব হয়ে গেছো। নষ্ট হয়ে গেছো। হাইড আউটে গিয়ে তোমরা নিজেদের স্বাধীন ভাবছো। শৃঙ্খলা বা ডিসিপ্লিন এন্টলান আর তোমাদের মধ্যে নাই। তোমাদের জন্য আমাদের মানসম্মান কিছুই থাকবে না। অফিসারের কাছে জবাবদিহি করতে হবে...।

তো, তিনি যার কাছে জবাবদিহি করবেন, সেই ক্যাটেনসন্দাই এখন দিব্যি তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। ছেলেরা ইতস্তত জটলা পারিস্টে তাঁবুর সামনে দাঁড়িয়ে, সবাই উত্তেজিত। পড়ত বিকলের সূর্য তখন প্রায় ঢুবতে আসছে। ডানে দিগন্তপ্রসারী হিমালয়ের শরীর ঘিরে আঁধার জমে উঠেছে। দ্রুত আঁধার মুক্তিয়ে আসছে পুরুর পাড়ের ক্যাপ্সেও। নন্দা জানতে চান, কেয়া হ্যাঁ? কী হয়েছে এতে প্রারগোল কিসের?

নুরুল হক কিছু বলতে পারেন না। তাঁগে তিনি তখন রীতিমতো কাঁপছেন। নন্দা মুড ভালো। হাসিমুখে তিনি এবার অফিসারদিকে তাকিয়ে জানতে চান ব্যাপারটা সম্পর্কে। আমি সত্যি ব্যাপারটাই বলি, মার্কিনো নষ্ট হো গেয়া স্যার। মোটামুটি দৃঢ়বিত গলায় রিপোর্টহীনের ভঙ্গিতে তাঁকে ব্যবরটা পরিবেশন করি। হাইড আউটে যাবার সময় আমরা হেড কোয়ার্টারে নিজেদের যে ব্যক্তিগত মালসামানা রেখে গিয়েছিলাম সেগুলো পচে নষ্ট হয়ে গেছে। আর এ জন্যই ছেলেরা সেন্টিমেন্টাল হয়ে গেছে।

— ইয়ে ঠিক নেহি হ্যাঁ স্যার, এভি থিৎ উই লষ্ট হুইচ উই ব্রট ফ্রম আওয়ার কান্টি।

ক্যাটেন নন্দা ব্যাপারটি বুঝে ফেলেন এবং জিগ্যেস করেন নুরুল হককে গঞ্জির গলায়, মি. নুরুল হক, ইয়ে কায়সে হ্যাঁ? তুম কেয়া কিয়া? উহসব লোক হাইড আউট যায়া, ফ্রন্ট মে যায়া। আওয়ার এভি বিলোহিগ়েস্ অব দোজ বয়েজ বরবাদ হো গ্যায়া। ইট ইজ রিয়েলি সরি ফিগার মি. হক, ইউ সুড টেক কেয়ার অব দেয়ার লাগেজ। দে লেফ্ট হিয়ার আভাৱ ইয়োৱ কাটেডি। অফিসারের এ কথা শুনে নুরুল হকের কিছু বলার থাকে না। তিনি মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকেন। তখন ক্যাটেনকে আমি বলি, ঠিক হ্যায় স্যার, ম্যায় সবকো সামাল দেতা হু। আপ যাইয়ে অ্যান্ড রেষ্ট কিজিয়ে।

— ওকে বয়েজ বলে তিনি তাঁর তাঁবুর দিকে চলে যান।

সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। ফ্ল-ইন-এর সময়ে গোলমালের জন্য পার হয়ে গেছে। ক্যাপ্সের জীবন আর হাইড আউটের জীবন এক নয়। যেখানকার যা নিয়ম-শৃঙ্খলা, তা মানতেই হবে

এবং যা করণীয় তা করতেই হবে। সুতরাং সামনে দাঁড়ানো সেন্ট্রি ছেলেটির কাছ থেকে হাইসেলটা নিয়ে মুখে লাগিয়ে পুঁ-পুঁ-পুঁ-উ করে বাঁশি বাজাই আর মুখে বলি, ফল-ইন, ফল-ইন এভরিবডি। প্রতিটি যোদ্ধার কাছে বাঁশির মাহাত্ম্য অন্যভাবে কাজ করে। টেনিং সেন্টারের ওষ্ঠদের বাঁশির গমক আমাদের দেহ-মনে যেভাবে ক্রিয়া করতো, এখনো সেই বাঁশির শব্দ আমাদের মধ্যে একইভাবে কাজ করে থাকে। ওষ্ঠদের বাঁশির গমক আমাদের মনে গভীরভাবে দাগ কেটে গেছে। ফলে বাঁশি বেজে উঠলেই প্রতিটি যোদ্ধা, প্রতিটি সৈনিক তাতে সাড়া না দিয়ে পারে না। এখনেও তাই হয়। ছেলেরা বিনা বাক্য ব্যয়ে ফল-ইন-এ দাঁড়ায়। হাইড আউট ফেরত ছেলেরা একদিকে, হেড কোয়ার্টারের ছেলেরা একদিকে। পাশাপাশি। সর্বো হারানো দৃঢ়ীয় মানুষের মতো মুখ হাইড আউট ফেরত ছেলেদের। আমারও কিছুই নেই। শুধু দুটো প্যাট আর একটা শার্ট ছাড়া। সম্ভবত সেগুলো কেউ ব্যবহারের জন্য বের করেছিলো বলে তাঁবুর ভেতরে দড়িতে ঝুলত অবস্থায় ঠিকভাবে পাওয়া গেছে। আমার সাথে হাইড আউট থেকে যারা ফিরে এসেছে নতুন আয়াসাইনমেন্টের জন্য তাদের উদ্দেশ্যে বলি, যা হবার হয়ে গেছে। আর একটা কথাও নয়, মুক্তির মাঠে কে কখন কোথায় মারা যাবো, তার ঠিক নেই। এরই মধ্যে তো ক'জন চলে গেলো। সামান্য জামা-কাপড়, টুকিটাকি জিনিস নষ্ট হয়েছে, তাতে এমন কি হয়েছে ফরগেট এভরি থিং। আজ থেকে আমাদের এখানে আবার নতুন করে জীবন শুরু হলো। ক্যাম্পের নিয়মকানুন ডিসিপ্লিন মানতে হবে সবাইকে। এটা ক্যাম্প, হাইড আউট নয়। ডেক্ট ফরগেট ইট। এখানে আমাদের ওপর দেয়া দায়িত্ব আমরা পালন করে যাবো। সাথে সাথে সেন্ট্রি ডিউটি, ফল-ইন, পিটি প্যারেড এগুলোও চলবে। সেন্ট্রি বটনের দায়িত্বে থাকবে একরামল মন্ত্রী স্বারূ বকর। নাউ ডিসমিস। সবাই বড় ভাইয়ের কাছে যাবে। তার সাথে হাত মেলান্তে মাফ চেয়ে নেবে।

ফল-ইন শেষ হয়। এক এক ক্ষেত্রে ছেলেরা নিয়ে বড় ভাই নুরুল হকের সাথে হাত মেলাতে থাকে আর বলতে থাকে, কিছু মনে করবেন না বড় ভাই। তখন বড় ভাই আবার আরেকটা সিন ক্রিয়েট করে রেজেন। এক একজনকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলতে থাকেন, তোমাদের যে আমি কতো ভালোবাসি, তোমরা কতো ভালো ছেলে, কতো সাহসী, আমি গর্ব করি তোমাদের জন্য। বড় ভাই এসব কথা বলেন আর চোখ মোছেন। অঙ্ককারের ছায়া তখন গাঢ় হয় নেমে এসেছে পুরুপাড়ের ক্যাম্পে। বড় ভাইকে ঘিরে ধরার পর ছেলেদের দল ফিরে এসেছে সেই পুরনো পরিবেশে। চমৎকার একটা আনন্দঘন আবহ তখন বিরাজ করছে সমস্ত ক্যাম্প এলাকায়।

১৮. ১০. ৭৫

লাল পঞ্চের সমারোহ

বাতে বৈঠক বসে ক্যাটেন মন্দার তাঁবুতে। ক'জন সিনিয়র আর্মি অফিসার এসেছেন আলোচনার জন্য। মূল আলোচ্য বিষয় অমরখানা পাকঘাটি উচ্চেদ বা নির্মূল করা। অমরখানা পাকঘাটির ওপর হাজার হাজার পাউন্ড বোমা ছুঁড়েও কিছু করা যায় নি। মাটি কামড়ে পড়ে আছে সেখানে পাকসেনারা। পাকা রাস্তার নিচ দিয়ে পিলবক্স, টেঞ্চ আর বাক্সার এসব মজবুত করে তৈরি করে তারা সেখানে এমনভাবে বসে আছে যে, ওপর থেকে তাদের লক্ষ্য করে অজ্ঞ বোমা ফেলেও তাদের বিশেষ ক্ষতি করা যাচ্ছে না। নিয়মিত মুক্তিফৌজ বাহিনীও তেমন

কিন্তু অফেন্সিভ বা আক্রমণাত্মক অভিযান পরিচালনা করতে পারছে না, যাতে করে তাদেরকে সেখানে থেকে হটিয়ে দেয়া সম্ভব। ভজনপুর-দেবনগর এলাকায় মুক্তিফৌজ বাহিনী ট্রেঞ্জ-বাস্কারের প্রতিরক্ষা লাইন তৈরি করে নিয়মিত বাস্কার যুদ্ধ তথ্য শুলিবিনিয়ন করে চলেছে। ভারতীয় এলাকা থেকে আর্টিলারি আর মর্টারের সাপোর্ট দেয়া হচ্ছে, নিয়মিত সীমান্তের এপার-ওপার শুলিবিনিয়নও চলছে উভয় বাহিনীর মধ্যে। ভারতীয় বাহিনীর বাংলাদেশ ভূখণ্ডে প্রবেশের কোনো অনুমতি নেই। শুধু সীমান্তের এপার থেকে আর্টিলারি মর্টার সাপোর্ট এবং পাক অবস্থানের দিকে শুলিবর্ষণের নির্দেশ বর্তমানে পালন করছে ভারতীয় বিএসএফ এবং গোলন্দাজ বাহিনী। অমরখানা ঘাঁটি তাদের নিরাপত্তার জন্যও হমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

অমরখানা পাকা রাস্তার প্রায় পাশ দিয়ে ভারতীয় সীমানা। লোকজনকে সরিয়ে আনতে হয়েছে সেদিক থেকে। মানবজন যেতেও পারছে না তাদের নিজের এলাকায় চাষাবাদ কিংবা অন্য কাজের জন্য। দিন দিন পাকবাহিনী অমরখানায় শক্তি বৃদ্ধি করছে। চাউলহাটির দিকে যে-কোনো দিন তাদের মরিয়া আক্রমণ পরিচালিত হতে পারে। এ ধরনের বাটিকা আক্রমণের ভেতর দিয়ে তারা চাউলহাটির ভারতীয় অবস্থান তছন্ত করে দিতে পারে, তারা ভজনপুরের দিকে অঘসর হয়ে মুক্তিফৌজ বাহিনীকে পেছন থেকে কাট করে দিতে পারে। তাদের ওপর পেছন থেকে প্রচণ্ড আঘাত হেনে একেবারে বিলাশ করে দিতে পারে। ব্যাপারটা ভাবলে যদিও অসম্ভবই মনে হয়, কিন্তু একেবারে উড়িয়ে দেয়াও যায় না। বাস্কেসনেদারের সাথে প্যারাম্পরিক যুদ্ধে পোড়-খাওয়া ভারতীয় অফিসাররা এই সংঘবনাকে একেবারে অলীক কঢ়না বলে মনে করেন না। পাকবাহিনীর সাথে বিগত যুদ্ধের সময় তাদের এ ধরনের তিক্ত অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হতে হয়েছে। সুতৰাং তাদের অমরখানা ঘাঁটি থেকে বাস্কেসনেদার উচ্ছেদ বা বিতর্জিত করতেই হবে। আর এর জন্য প্রয়োজন একটি শক্তিশালী পেরিলা দলের। তাই হাইড আউটে থাকা ক্ষেয়াড়গুলো থেকে বাছাই করা ছেলেদের দিয়ে আসা হয়েছে।

কর্নেল সাহেবের তাঁর গোফে তাঁর নিয়ে আমাকে লক্ষ্য করে বলেন, কমান্ডার মাহবুব ইয়ে হার্ড টাঙ্ক তুমকো চালানে হোগ। তুম লোগকো রেণ্টলার কমান্ডো স্টাইলসে অপারেট করনে হোগ। গিড দেম ত্রো ফ্রম দা ব্যাক। ইনকিউ ম্যাক্রিমাম ক্যাজুয়ালটিজ অন দেম, কাট দেয়ার ক্যানিকেশন রুট, সাপ্লাই রুট, কিল দেয়ার কলাবরেটেরস, প্লাইস দেম, যেক দেয়ার লাইফ মিজারেবল, কিপ দেম অলওয়েজ বিজি, ব্রেক দেয়ার মর্যাল অ্যান্ড লেট দেম উইক এড নার্ভাস...।

কর্নেল সাহেবের গলা তাঁবুর ভেতরে গমগম করে, হারিকেনের নরম আলোয় তার মুখের পেশি শক্ত দেখায়, আমরা তার কথা শুনি এবং বুঝবার চেষ্টা করি। রাত নটার দিকে আলোচনা বৈঠক ভাণ্ডে। কর্নেল সাহেব তাঁর দলবল নিয়ে ‘জয় বাংলা’ বলে বিদায় নিয়ে চলে যান। আমাদের ওপর আরোপিত নতুন দায়িত্ব আমরা জেনে যাই।

ক্যাস্টেন নদী বলেন, মাহবুব, তুমি কাল সকালে নিজে যাও অমরখানা অবজারভেশনে পোটে। আগে সঠিকভাবে দেখে নাও অমরখানার পাকবাহিনীর অবস্থান। নতুন কাজে নামার আগে এ দেখাটা খুবই জরুরি।

খুব সকালে পুঁ-পুঁ বাঁশির শব্দে ঘূম ভাণ্ডে। ক্যাম্প জীবনের নিয়মিত রুটিন ডাক এটা। এখানে খুব ভোরে সবাইকে ঘূম থেকে উঠতে হয়। ফল-ইন আর পিটি-প্যারেড দিয়ে দিনের প্রাত্যহিক কাজ শুরু হয়। হাইড আউটে এটা ছিলো না। অনেকদিনের অন্যস্থানে

কাকড়াকা ভোরে বাঁশির এ ডাকে সাড়া দিতে ইচ্ছে করে না। যুদ্ধের মাঠে দিন-রাত খাটুনি। রাতভর অপারেশন, আর দিনের বেলা সময় পেলেই মড়া মানুষের ঘুম। বেহিসেবি সে জীবনযাপনের সাথে ধাতস্ত হয়ে যাওয়া শরীর-মন ক্যাপ্সের কৃটিনবাধা নিয়ন্ত্রিত জীবনের সাথে খাপ খায় না। সারা শরীর-মনে ব্যাপক অবসাদ। চোখের পাতা থেকে ঘুম তাড়াতে কঠ হয়। থেমে থেমে বাজে বাঁশি আর শোনা যায় বড় ভাইয়ের গলার ডাক, ফল-ইন, ফল-ইন এভরিবিডি। তিনি হাজার ফুট উচ্চ মূরতি পাহাড়ের সেই ট্রেনিং সেন্টারের অনেক কথা মনে পড়িয়ে দেয় এ বাঁশির হাইসেল। মনে পড়ে, জঙ্গি নরেন্দ্রের বাঁশি এভাবেই বেজে উঠতো প্রতিদিন ভোরবেলায় আর সেই সাথে তার কর্কশ স্বরে ধ্বনিত হতো ফল-ইন, ফল-ইন এভরিবিডি কথাগুলো। কারো কোনো উপায় ছিলো না তখন চুপচাপ ঘাপটি মেরে পড়ে থাকবার। কোনো অজ্ঞাহাতই খোপে টিকতো না নরেন্দ্র জঙ্গদের কাছে। ট্রেনিং শুরুর প্রথম দিকেই সকালে উঠবার এবং ফল-ইন-এ দাঁড়াবার সামান্য বিলম্বের জন্য যে শাস্তির নমুনা দেখা গেছে, তাতেই কাজ হয়েছিলো সাজাতিক। এমন ভীতি ঢুকে গিয়েছিলো সবার মনে যে, রাত শেষ হবার আগেই বাঁশির সেই কর্কশ ডাকে সবাই তড়াক করে শোয়া থেকে উঠে দ্রুত প্রাতঃকর্ম সেরে ছুটে এসে দাঁড়াতো ফল-ইন-এর লাইনে। পাহাড় আর সেই কাঁকড়ের রাজে স্থাপিত ট্রেনিং সেন্টারের সেই দিন এখন অতীত হয়ে গেছে, কিন্তু আজকের সকালের বাঁশির এই পুঁ-পুঁ শব্দ নরেন্দ্র জঙ্গদের সেই বাঁশির কথাকে স্মৃতি করিয়ে দিলো।

ফল-ইন-এ দাঁড়াবার পর শুরু হয় পুরুর প্রদক্ষিণ। স্টেম লাইনে সবাইকে দৌড়ে চলতে হয় পুরুরের চারধার দিয়ে একবার, দু'বার, তিনবার, চারবার। হাঁফিয়ে ওঠে ছেলেরা দারুণভাবে। বিশেষ করে হাইড আউট ফেরত জ্ঞানের। এরপর পিটি চলে আধ ঘণ্টা ধরে। পুরবিকে অমরখনার মাথার ওপর দিয়ে সোনার খালার মতো সূর্য উকি দেয়। বিরতি হয় তখন পিটি কর্মসূচির। ক্লাউ ছেলেরা হাতে পা ছড়িয়ে শয়ে পড়ে ঘাসের ওপরেই। কাউকে কাউকে বলতে শোনা যায়, এর জন্মে হাইড আউটে থেকে পাকবাহিনীর সাথে যুদ্ধ করা অনেক ভালো। এই সময় লঙ্ঘনজ্ঞানাভারের ডাক আসে, নাঞ্চা রেডি।

খালায় গরম মুচমুচে পুরি, হাতে ধোয়া-ওঠা গরম চায়ের মগ। টলটলে পানির বিস্তার সামনে রেখে পুরুরের পাড়ে বসে পড়ি ঘাসের ওপরে। পুরুরের মাঝ বরাবর জায়গাটা দেখবার মতো। সেখানে চমৎকার লাল পদ্ম ফুটে আছে দলে দলে। বিরবিবিরে বাতাস, নরম সোনালি সূর্যের আলো। সবকিছু একাকার করা অপরূপ প্রাকৃতিক শোভা আর সমারোহ সমস্ত মন-প্রাণ জুড়িয়ে দেয়। মনে হয়, জীবন মানুষকে কোথা থেকে কোথায় নিয়ে আসে। এই স্বল্প সময়ের ব্যবধানেই কতো কিছু দেখা হলো, কতো অভিজ্ঞতার সমূর্খীন হতে হলো। একটা যুদ্ধের সঙ্গে নিজেকে জড়িত করা মানে প্রতিনিয়ত জীবনকে নিয়ে বাজি খেলা। এখন, কবে যে কাকে এ খেলায় হেরে গিয়ে জীবন দিতে হবে, তার কোনো কিনারা নেই, হিসেব নেই। তবুও যুদ্ধের তাপ্তবের ভেতরে বীভৎসতা, নির্ভুতা আর হত্যা কিংবা মৃত্যুর বেষ্টনের ভেতরেও সৌন্দর্য-পিয়াসী মন হারিয়ে যায় না। সোনালি আলোয় উন্নতিসত হাস্যজ্ঞল ওই লাল পঞ্চরাশির মতো সেটা মনের গভীরে বাসা বেঁধে থাকে।

মাহমুদবীর অতি জনপ্রিয় গানের একটি কলি এই এখন, এই মুহূর্তে মনের ভেতর অনুরণিত হয়, ‘নীল পদ্ম নেবে গো, নাকি লাল লাল পদ্ম তুমি নেবে...’। কী দারুণ গান! এই পরিবেশে গানটি কী চমৎকার মানিয়ে গেছে। সাথে সাথে মনের ভেতরে গভীর শক্তি

জেগে গঠে। বেঁচে আছেন তো শিল্পী মাহমুদুল্লবী! ঢাকা ছেড়ে তিনি কি পালাতে পেরেছেন? পাক জল্লাদ বাহিনীর হাতে তিনি কি ধরা পড়েছেন? কে জানে? মনে মনে বলি, শিল্পী, আপনি তালো থাকুন, যেখানেই থাকুন।

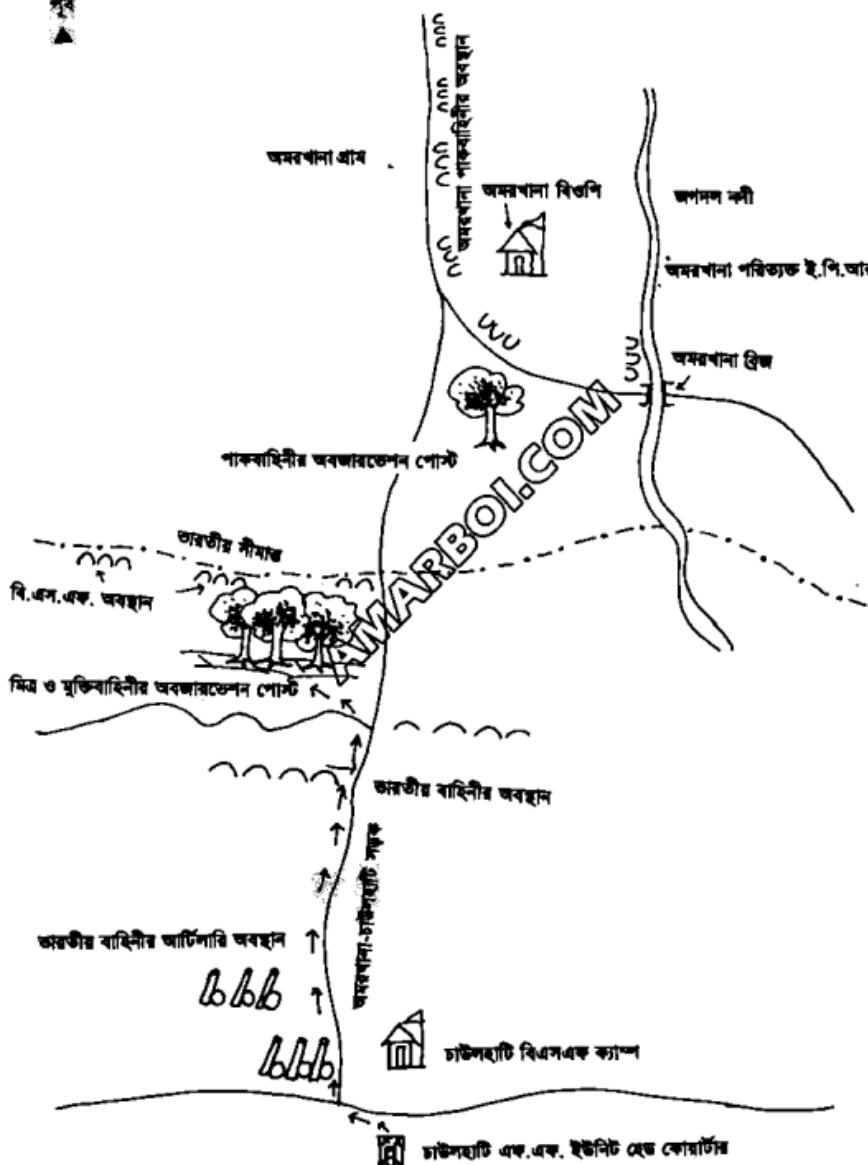
অবজারভেশন পোস্ট

নদার কাছে ত্রিফিং নিয়ে সকাল আটটার দিকে রাখনা দিই অগ্রবর্তী লাইনের অবজারভেশন পোস্টের দিকে। পুরুরের পাড় থেকে নামার সময় এক ঝালক দেখে নিই আদূরবর্তী অমরখানা ঘাঁটির সাদা দালানঘরটি। চুম্বকের মতো টানে যেনো সেটি। খুব কাছাকাছি যাওয়া হবে আজ ওর। যা কিছু আছে সেখানে, তার সবই দেখতে হবে খুটিয়ে খুটিয়ে। আজকের নিম্নুত পর্যবেক্ষণের ওপর নির্ভর করেই রচিত হবে আগামীদিনের অপারেশন, পরিকল্পনার পর পরিকল্পনা। মোট বইয়ে কেচ তৈরি করে নিতে হবে পুরো অমরখানা শঙ্খঘাঁটি। শার্টের পকেটে নোট বই। কলম নিই। এরপর পুরুরের রাস্তা ধরে উঠে যাই পাকা সড়কের ওপর। একরামুল, বাবলু আর বকরসহ ৫/৬ জন সাথে থাকে। গাইড হিসেবে থাকে দু'জন, যারা নিয়মিত সেখানে ডিউটিতে যায়। চাউলহাটি হেড কোয়ার্টারের এফ এফদের নিয়মিত সকাল-বিকেল অবজারভেশন পোস্ট ডিউটি দিতে হয়। এ কাজে এরি মধ্যে পারদর্শী হয়ে উঠেছে বেশ ক'জন। তাদের মধ্যে দু'জন টগবগে তরঙ্গ আমাদের নিয়ে চলে বিএসএফ ক্যাপ্সের পাশ দিয়ে চলে যাওয়া সোজা রাস্তা ধরে।

রাস্তা ধরে এগুলৈ চোখে পড়ে এপারের ভাবনীয়ে বাহিনীর মুক্তের সাজপোজের ব্যাপারটি। এখানে-ওখানে বাক্সার আর ট্রেইনের সারি। মাঝে ভ্রান্ত সেনাছাউলি। মাথার ওপর ক্যামোফ্লেজের জাল দিয়ে ঢাকা আর্টিলিরি আর মর্টারের সারু দেখনের সামরিক সরঞ্জাম, সামরিক বাহিনীর জোয়ানদের তোড়জোড় আর ব্যস্ততার দৃশ্য। এসবই বলে দেয় যে, এরাও বসে নেই। চিরশক্তি পাক সেনাবাহিনীর মোকাবেলা করতে এদের করণীয় সবচিহ্নই এরা করে যাচ্ছে। প্রায় মাইলখানেক হাঁটতে হয়। এরপর সোজা অমরখানাগামী রাস্তাটা ছেড়ে দিয়ে বাঁ-দিককার পথ ধরতে হয়। বিএসএফ কোম্পানির প্রতিরক্ষা লাইনের হেড কোয়ার্টার পার হয়ে সোজা আলপথ ধরে সামান্য কিছুটা এগিয়ে গিয়ে বাঁকড়া উচ্চ আমগাছ তিনটির তলায় পৌছানো যায়।

পাশের সব থেকে উচ্চ আমগাছের মগডালে পাখির বাসার মতো বানানো হয়েছে অবজারভেশন পোস্ট। গাছের গোড়ায় বাঁশের মই লাগানো, যাতে করে মোটা গুঁড়ির ওপর দিয়ে সহজে ওঠা যায় মোটা কাগুলোর মাঝে বরাবর পর্যন্ত। এরপর ছেটোখাটো কাও আর ডালপালা ধরে পাতার আড়াল নিয়ে সহজেই পৌছানো যায় অবজারভেশন পোস্টে। বাঁশ-কাঠ বিছিয়ে তার ওপর বালুর বস্তা সাজিয়ে মোটামুটি একটা মজবুত বাক্সারের আদলে হয়েছে পোস্টটা। পাকবাহিনী জেনে গেছে এই পোস্টটার কথা। অমরখানায় তাদের ঘাঁটির অবস্থান যে এই পোস্টটা থেকে রেকি করা হয়, সেটা জানবার পর এর ওপর বেশ ক'বার তারা সরাসরি হামলাও চালিয়েছে। প্রথম দিকে গাছের ওপর পাখির বাসার মতো এ ধরনের নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা নিতে হয়েছে এবং এ পোস্টটা রক্ষা করার জন্য সামনে বাক্সার আর ট্রেইনের মজবুত প্রতিরক্ষা লাইন দাঁড় করিয়েছে বি.এস.এফ. বাহিনী। অমরখানায় ভারতীয় সীমান্তে এটাই হচ্ছে সব থেকে সামনের প্রতিরক্ষা লাইন। দিনরাত এদের পাকবাহিনীর

ক্ষেত্র মাপ-১৪
অবজ্ঞারত্নেন পোস্ট
২০-১০-৭৩
(কেল হাড়)



সাথে গুলিবর্ষণের কাজে লিঙ্গ থাকতে হয়। মোটকথা পাকবাহিনীর মূল 'গ্রাস' বা ধাক্কা সামলাতে হয় এই অঞ্চলবর্তী লাইনের বিএফএফ সেনাদের। মাটি কামড়ে থেকে পাকবাহিনীর সব ধরনের আক্রমণের ধক্কল সহিতে হয় এদের।

অমরখানা ঘাঁটির সামনে প্রায় শ'খানেক গজের দূরত্বে চাউলহাটিগামী রাস্তার পাশে একটা ঢাঙা মতোন গাছ রয়েছে। সেই গাছটিকে পাকবাহিনী ব্যবহার করছে তাদের অবজারভেশন পোস্ট হিসেবে। তবে এখানকার মতো নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা তারা সেখানে নিতে পারে নি। একেবারে খোলামেলা বলে সুক্ষিয়ে-চুরিয়ে সেই গাছের মাথায় ওঠে তাদের কাজ সারতে হয়। তাও সঙ্গত তারা নিয়মিত করতে পারে না।

একটা ফিল্ড টেলিফোন সেট লাগানো হয়েছে এ পেট্টায়। সেই সাথে একটা শক্তিশালী টেলিস্কোপও দেয়া হয়েছে এখানে, যাতে তার সাহায্যে শক্ত অবস্থানের প্রতিটি চলাচল এবং কার্যক্রম দেখা যায়। পোষ্টে ডিউটির ব্যক্তিরা টেলিস্কোপের সাহায্যে শক্ত চলাচল বা মুভমেন্ট দেখতে পেলেই সঙ্গে সঙ্গে টেলিফোনে ব্যাপারটা জানিয়ে দেয় কন্ট্রুল রুমে। কন্ট্রুল রুমের নির্দেশ পেয়ে সাথে সাথে সরব হয়ে ওঠে আর্টিলারি ব্হুর। ধমাধম শেল উড়ে যায় টেলিফোনে সরবরাহ করা তথ্য মতো নির্দিষ্ট টার্গেটের দিকে অথবা সক্রিয় হয়ে ওঠে সামনের অঞ্চলবর্তী লাইন। সম্মুখবর্তী শক্রযাঁটি লক্ষ্য করে চলাতে থাকে দারুণভাবে মেশিনগানসহ অন্যান্য হ্রয়ক্রিয় অঙ্গের গুলিবর্ষণ। এন্দিক থেকেও সাড়া মেলে একচুক্তাবে। মুকুর্তখানকের ভেতরে শক্ত হয়ে যায় তুলকালাম কাও। অমরখানা ঘাঁটিতে অবস্থানত পাকবাহিনীর দিনের বেলাকার প্রতিটি ত্রিমাকাও লক্ষ্য ও মনিটর করাই হচ্ছে এই অবজারভেশন পোস্টের প্রধান দায়িত্ব। সুতরাং সামরিক দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ এই পোস্টের সাংগ্রহ ও গুরুত্ব প্রথম থেকেই অনুভূত হয়ে আসছিলো। তাই একেবারে প্রথম থেকেই পাঠক ব্যবহারও করা হচ্ছিলো সেই রংকোশালের ভিত্তিতেই। মুকুর এ পর্যায়ে এর গুরুত্ব বেশীও গেছে অনেক।

বিএসএফ-এর পেটেমোটা মৌজুখোলা হাবিলদার স্বাগত জানান আমাদের দলটিকে। থাকি হাফ প্যান্ট আর গেঞ্জ পুরুনে তার। রাত-জাগা চোখ লাল হয়ে আছে। আমাদের দিলখোলা আহ্বান জানান তিনি। বলেন, আইয়ে সাব, আইয়ে। ক্যাপ্টেন সাব খবর ভেজা থা টেলিফোনসে। আপ আয়েসে, উহ শালে লোগকো দেখেছে ওপি সে। ঠিক হ্যায়, দেখ লিজিয়ে আচ্ছা কারকে। উহ শালে বা...ইনসান নাহি, শয়তানকা বাচা হ্যায়...। হাবিলদার তার সাথে বসতে বলেন, কিছুক্ষণ আড়া মারার ইচ্ছে তার। কিন্তু আমরা বসি না। কিন্তু তাতে অশুশি হন না তিনি। দিলখোলাভাবেই বলেন, ঠিক হ্যায় সাব, আপলোগ ওপি মে উঠ ঘাইয়ে, মাগার হঁশিয়ার সে। শালে লোগ দেখ লেঙা তো বহুত গড়বড় হো জায়েগা।

টেলিলেলে পাকসেনা : ধর্ষিত বাংলাদেশ

পারদর্শী দুঁজন আগে উঠে যায় তর্বৰ করে যাই বেয়ে। তাদের পেছনে পেছনে উঠে যাই আমরা। তবে গাছের যেই মাঝামাঝি অবস্থানে পৌছানো গেছে, অমনি এক ঝাঁক গুলি সামনে থেকে ছুটে এসে ভন্ডন্ড করে পাতা ভেদ করে চলে যায়। কিছুটা ডানদিক ধেঁধে, মাথার ওপর দিয়ে। শক্ত সঙ্গত টের পেয়েছে আমরা ওপিতে উঠছি। তাই গাছসোজা তারা গুলি চালিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে কিছু দিদিক শূন্যভাবেই গাছের কাও আর ডালপালার সাথে বুক ঘেষতে ঘৈষতে কোনোমতে পৌছে যাই বালুর বস্তা ঘেরা কাঠের পাটাতন দেয়া

নিরাপদ জায়গাটিতে। সারা শরীর ঘায়ে নেয়ে গেছে উত্তেজনা, আশঙ্কা আর ওপরে উঠবার শ্রান্তিতে। পাকবাহিনীর তরফ থেকে তখন তখনি আর কোনো গুলি আসে না। কিন্তু দারুণ একটা ফাঁড়া কেটে যায় সামান্যের জন্য। আর একটুখানি হলেই হয় গাছের ডালপালার সাথে বাঁদুর খোলা হয়ে থাকতে হতো, না হয় লাশ হয়ে পাকা ফলের মতো টুপ করে পড়ে যেতে হতো নিচে। প্রাথমিক শক্টা কেটে যায় কিছুক্ষণের মধ্যে। টেলিক্ষোপটা অ্যাডজাস্ট করে এগিয়ে দেয় আমার দিকে চাউলহাটি হেড কোয়ার্টারের ওপি ডিউচিতে দক্ষ ছেলে হাবিব। বালুর বস্তা গায়ে হেলান দিয়ে টেলিক্ষোপে ঢোক রেখে সামনের দিকে তাকাই। সর্বনাশ! অমরখানা পাক ঘাঁটি যে একেবারে চোখের সামনে এসে হাজির হয়েছে! পাক রাস্তাটি সোজা এসে বাঁক খেয়ে একটা ব্রিজ পার হয়ে চলে গেছে ভজনপুরের দিকে। রাস্তার দু'পাশে বাঙারের সারি। ত্রিজের রেলিং পর্যন্ত উচু করে বালুর বস্তা দিয়ে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা করা হয়েছে। রাস্তার ওপরে অমরখানা ইপিআর-এর গাছগাছালি ঘেরা পরিত্যক্ত ক্যাম্পটি দেখা যায়, দেখা যায় সেই সাদা দালানটাও। রাস্তার ওপর দিয়ে একটা গলা সমান ক্রলিং টেক্সের রেখা দেখা যায়। রাস্তাটি যেখানে বাঁক নিয়েছে, ঠিক এপারে একটা ছোটো ঝাঁকড়া আমগাছ। তার তলায় বেশ বড় একটা মজবুত বাকার। টেলিক্ষোপ দিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে থাকি যতোদূর সম্বৰ দেখা যায়, ততদূর।

হঠাৎ টেলিসেসে ভেসে ওঠে কালো পোশাকের ৩/৪ জুঁজুসনিক। দ্রুত রাস্তা পার হচ্ছে তারা। ওদিকে সোজা রাস্তা ধরেও ৪/৫ জন সৈনিককে আসতে দেখা যায়। তাদের সামনে দু'জন লুঙ্গি আর শার্ট পরিচিত বেসামরিক লোককেও দেখা যায়। তারা আরো এগিয়ে আসে। মনে হয় মানুষ দু'জন একটা কিছু টেনে-হিচড়ে আনছে। এবার টেলিক্ষোপে যে দৃশ্যটি ভেসে ওঠে, তাতে করে গা শিউরে ওঠে। মুখ দিয়ে অনুচ্ছ আর্টিচিকার বেইছয়ে আসে, এ কী! ওরাতো একজন মেয়েলোককে ধরে আনছে! সামনের দু'জন তাকে টেনে-হিচড়ে আনছে। মেয়েলোকটির পরনের শাড়ি প্রায় খসে পড়েছে। আলুখালু তার ক্লিনিকাস। বড় বাকারটির কাছে আসতেই তিনজন কালো পোশাকধারী সৈনিক বাকারের ভেতর থেকে বের হয়ে দৌড়ে গিয়ে জড়িয়ে ধরে মেয়েটিকে। তারপর সেই অবস্থাতে তারা তাকে টেনে নিয়ে যেতে থাকে বাকারের ভেতরের দিকে।

এ দৃশ্য সহ্য করা যায় না। চিংকার করে উঠে হাবিবকে বলি টেলিফোনে কন্ট্রোল রুমকে ধরতে। বলি, এখনি আর্টিলিরি ফায়ার দিতে বল মেইন বাকারের ওপর, যাতে সব শালা উড়ে যায়। হাবিব হ্যালো হ্যালো করতে থাকে। আর আম দেখি, অসহায় সেই প্রায় বিবন্ধ মেয়েটিকে নিয়ে তারা চুকে যায় বাকারের ভেতরে। লুঙ্গি আর শার্ট পরা মানুষ দৃষ্টিসহ পেছনে পেছনে আসা সৈনিক ক'জন বাকারের সামনে দাঁড়িয়ে থাকে। না জানি কার ঘরের মেয়ে বা বউ? লুঙ্গি-শার্ট পরা দু'জন নিচ্যাই রাজাকার। কার ঘর ভেঙে তারা এ সর্বনাশ করে বসলো কে জানে? এতোদিন শুধু শনেছি, আজ দেখলাম কীভাবে মা-বোনদের আম থেকে ধরে এনে তারা বাকারে ঢোকায়।

এখান থেকে কিছু করার নেই বলে কেমন একটা অসহায় ক্রোধ গ্রাস করে আমাকে। সমস্ত হৃদয়মন থরথর করে কেঁপে ওঠে। হঠাৎ পেছন থেকে টাপটাপ শব্দে আর্টিলিরির শেল ছুটে যাবার শব্দ কানে আসে। সঙ্গে সঙ্গে টেলিক্ষোপটা একরামুল আর বকরদের জিয়ায় দিয়ে দিই। বালির বস্তায় পিঠ লাগিয়ে হ্ববিরের মতো দাঁড়িয়ে থাকি। কিছুক্ষণের মধ্যে প্রচণ্ড

শব্দ তুলে অমরখানার ওপর শেলগুলো বিস্ফোরিত হতে থাকে। পাকবাহিনীও তখন পাল্টা গুলিবর্ষণ শুরু করে। নিচের বিএসএফ দলসহ সামনের এপারের প্রতিরক্ষা লাইনও সঞ্চয় হয়ে উঠে। দুই ঘোর প্রতিপক্ষের মধ্যে মেশিনগানের শুলিবিনিময় চরমে উঠতে থাকে ক্রমশ। এক সময় পাকবাহিনীর মর্টারের কয়েকটা গোলা সামনে এসে বিস্ফোরিত হয়। এদিক থেকেও যেতে থাকে মর্টার আর আর্টিলারির গোলা। বেলা এগারোটার মতো সময় তখন। দু'পক্ষের মধ্যে শুরু হয়ে যায় তুমুল এক যুদ্ধ। আমরা আমগাছের মগডালে বালুর বস্তার বাকারে বসে থাকি। চারধার দিয়ে চলে যেতে থাকে শুলির স্ন্যাত। এখন গাছ থেকে নামবার কোনো উপায় নেই। গাছের মগডালে বন্দি হয়ে থাকি আমরা ক'জন। আর ওপারে বড় বাকারটির ডেতরে বন্দি হয়ে থাকে সেই অসহায় মেয়েটি। এই এখন মনে হয়, শুধু এই মেয়েটিকেই নয়, সারা দেশটাকেই পাকবাহিনী বন্দি করে রেখেছে ওইভাবে বাকারের পর বাকারে। এপারে বন্দি হয়ে রয়েছি আমরা। অন্য পারে ওরা। মাঝখানে ধর্ষিত হয়ে চলেছে বাংলাদেশ। কেউ কিছু করতে পারছি না।

১৯, ১০, ৭১

অমরখানায় নৈশাভিয়ান

নন্দ বলেন, শো টু নাইট, আজ রাতে যাও। ব্যাটারের পেস্ট থেকে একটা কড়া মার দিয়ে আসো। অমরখানা ঘাঁটির ক্ষেত্র ম্যাপ এবং অবজারভেশন পোস্ট থেকে দৃশ্যমান বিষয়বস্তুর ওপর বিস্তারিত আলোচনা হয়। টেনে-হিচড়ে বাকারে প্রেরণাটকে ঢোকানো ঘটনাটা নদাকেও আলোচিত করে সাংঘাতিকভাবে। দুঃখিত প্রিয়ের তিনি বলেন, ইয়ে তো নয়া নেই। অবজারভেশন পোস্ট থেকে এ ধরনের ঘটনাসম্বরণ আমরা প্রায়ই পাইছি। কিন্তু কিছু করবার নেই। কেবল সাপোর্ট ফায়ার দেয়া ছাড়া আমরাতো এখন কিছুই করতে পারছি না। তোমাদের দেশের বহু নিরীহ মেয়েকেই তারা প্রিয়ের ধরে নিয়ে আসছে তাদের বাকারে। কাউকেই উদ্ধার করা যায় নি, যাচ্ছে না। বড় অসহ্য অবস্থা তাদের। নন্দ কিছুক্ষণ থেমে বলেন, দেখো ইয়ার, ডেই আর সোলজার। সোলজারদের উচ্ছ্বস্ত জীবনযাপনের অনেক অপবাদ আছে। মেয়েমানুষ নিয়েও আমাদের অনেক ক্ষ্যাতিল, বদনাম আছে। পিস টাইমে এগুলো সোলজার বা সৈনিকদের জন্য তেমন কিছু ব্যাপার নয়। কিন্তু মাগার ওয়ার ফ্রন্টমে ইয়ে সব চলনে নেই চাহিয়ে। যুদ্ধের মাঠে মানুষের ওপর টর্চার, মেয়ে-মানুষের ওপর জোর-জবরদস্তি, তাদের ইঞ্জিন লুট করা এসব যুদ্ধরত ফ্রন্টের সৈনিকদের জন্য একেবারে হারাম। এটা ভগবানও মনে নেন না। এ জাতীয় কাজের মাধ্যমে একদিন তারা নিজেরাই নিজেদের পতন ডেকে আনবে। ডেন্ট অরি বয়েজ। এ ধারা বেশিদিন চলতে পারে না। ওদের এ ধরনের তৎপরতা দেখবার জন্যই তো তোমাদের অবজারভেশন পোস্টে পাঠানো হয়েছিলো। নিজেদের মানুষের ওপর, মা-বোনদের ওপর যে অত্যাচারের নমুনা তোমরা দেখে এলে এবং এর দ্বারা দখলদার পাকবাহিনীর প্রতি তোমাদের মনে যে ঘৃণাবোধ আর ক্ষেত্রের আঙ্গন সৃষ্টি হয়েছে, এটাকে যুদ্ধের শেষদিন পর্যন্ত জুলিয়ে রাখতে হবে, যা তোমাদের শক্তির ওপর বাঁপিয়ে পড়তে তাড়িত করবে সব সময়।

নন্দার সাথে বিস্তারিত আলোচনাটে রাতের অপারেশন পরিকল্পনা রচিত হয়। এবং সেই মোতাবেক ১৫ জন বাছাই ছেলের শক্ত দল নিয়ে রাত নটার পর শুরু হয় আমাদের যাত্রা। এভাবে, এই নৈশাভিয়ানের ডেতর দিয়েই শুরু হয় হাইড আউট থেকে তুলে আনা

ছলেদের নতুন অ্যাসাইনমেন্টের কার্যক্রম, সৌমান্তের এপার থেকে আবারো অধিকৃত দেশের অনুপ্রবেশী তৎপরতা।

অংগৰ্বর্তী লাইনের অবজারভেশন পোস্টের আমগাছ তলায় পৌছুলে সকালের সেই হাবিলদার খোশমেজাজে স্বাগত জানান। মুখ দিয়ে তার ভক্তক করে অ্যালকোহলের গন্ধ বরোয়। আমাদের অমরখানা অভিযানের কথা শনে তিনি আতঙ্কে ওঠেন। বলেন, আপ উধার যায়গাঃঃ ক্যায়সে যায়েগাঃঃ বহুত খতরনাক যায়েগা হ্যায় ইয়ারলোগ। ক্যাপ্টেন সাব আপকে উধার ভেজতা হ্যায় কিস লিয়েঃ ইয়ে আচ্ছা বাত নেহি। তারপর সামান্য চিন্তা করে তিনি বলেন, রাত এগারোটায় আমাদের একটানা অমরখানার ওপর মেশিনগানের ঢায়ার দেয়ার হকুম এসেছে। তা হলে এটা হচ্ছে তোমাদের কারণে। ঠিক আছে, আজ সারারাত হামলোগ হেভি ফ্যায়ার ডালেগা উহ শালে পাক ডিফেন্স কা উপ্পার। অ্যায়সা ফ্যায়ার ডালেগা যো উহ লোক কোই মুভমেন্ট করলে নেহি সাকেগা। সাবধানে থাকবার এবং নিজেদের রক্ষা করবার ব্যাপারে বারংবার উপদেশ দেন তালো মানুষ ভিন্দেশী হাবিলদার। লোকটাকে সকালে তালো লেগেছিলো। এখন আরো তালো লাগে। একেবারে শক্রে মুখোমুখি অবস্থানে থেকে সারারাত তাঁকে মেশিনগান চালিয়ে যেতে হবে। জয় বাংলার জন্য যুদ্ধ শুরু হলো আর এরা সে যুদ্ধে পার্শ্বচরিত্রের ভূমিকায় নিজেদের জড়িত করে দিনরাত লড়াই করে চলেছে বিপজ্জনক অবস্থান থেকে। যে-কোনো ক্ষেত্রে যুদ্ধ তার পরোয়ানা নিয়ে হাজির হতে পারে এদের সামনে। জয় বাংলা হলে এদের কানো ব্যক্তিগত লাভক্ষতি নেই। কিন্তু বর্তমানে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট ভারত-পাকিস্তান এই দুটো প্রতিবেশী দেশকে শক্ততার এমন এক পর্যায়ে নিয়ে গেছে, যার পরিণতিতে সীমান্ত এলাকায় এভাবে সৈন্য সমাবেশ এবং ফ্রন্ট লাইনের সৃষ্টি। এ জন্যই বাস্তুত ক্ষেত্রের অবস্থানে থেকে দিনরাত শক্রে সাথে অঘোষিত যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হচ্ছে এই হাবিলদারের মতো বহুজনকে।

হাবিলদারসহ অন্যান্যের কাছে বিস্তায় নিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যাই। অক্ষকারের মধ্যে হারিয়ে যায় পেছনের ফ্রন্ট অফিস। বাঁ দিক দিয়ে কিছুটা এগিয়ে একটা ভাঙা কর্দমাক কাঁচা গ্রাম্য পথ ধরা হয়। বাসারত গাইড করছে আমাদের আজকের দলটাকে। এর আগে সে অমরখানা অভিযানে এসেছে বেশ ক'বাৰ। মোটামুটি চেনা হয়ে গেছে তার অমরখানা এবং আশপাশের এলাকাগুলো। আঁকাৰাঙ্কা ঘোৱাপথে বেশ কিছুক্ষণ হেঁটে এক সময় একটা ঘনবসতি এলাকায় পৌছানো যায়। বাসারত ফিসফিসিয়ে বলে এইটাই অমরখানা গ্রাম। সারা শরীর কঁটা দিয়ে ওঠে কথাটা শনেই। এ গ্রামটার দক্ষিণ মাথায় পাকা রাস্তা যেঁৰে গড়ে উঠেছে দুর্ব পাকবাহিনীর অমরখানা ঘাঁটি। আমরা সে গ্রামের উত্তর-পশ্চিম পাস্তে এসে উঠেছি। একটা অন্যরকম অনুভূতি সমস্ত মনকে গ্রাস করে ফেলে হঠাতে করে। অমরখানার নাম যুদ্ধের শুরু থেকেই এতো বেশি শনেছি, সেই সাথে এদিককার প্রতিটি অপারেশন পরিকল্পনা প্রয়োগ ন করে আমরখানা নামটি এতোবার এসেছে যে, এখন রাতের আড়ালে অমরখানা গ্রামে নিজেদের বাস্তু উপস্থিতি কেমন যেনো অবিশ্বাস্যই মনে হয়।

গ্রামটি বেশ বড়। উত্তর-দক্ষিণ দিকে লম্বা। জনবসতিও অনেক। এ গ্রামের খুব কম লোক তাদের বাড়িঘর ছেড়ে গেছে। নিজেদের গ্রামের মাথার ওপর পাকসেনাদের ঘাঁটি করা সন্ত্রেও এরা যে কেনো সবে যায় নি ব্যাপারটি অবাক লাগে। সামান্য ক'পা এগুলেই ভারতীয় সীমান্ত। এদের জন্য সীমান্ত পার হওয়া তেমন সমস্যাই নয়। ভারতীয় সীমান্ত

এলাকার লোকজনের সাথে তাদের বনিবনা না থাকলে তারা ভেতরগড় এলাকার দিকে সরে যেতে পারতো। কিন্তু যায় নি। পাকসেনাদের ভয়াবহ উপস্থিতি থাকা সঙ্গেও এরা রয়ে গেছে। একদিকে যেমন পাকসেনাদের সকল অত্যাচার আর নির্যাতন সয়ে পুরো গ্রামবাসীকে তাদের সব ধরনের সহযোগিতা আর চাহিদার খাই মেটাতে হচ্ছে, তেমনি দিনরাত সীমান্তের ওপার থেকে আসা আর্টিলারি মর্টারের শেলের বিস্ফোরণ এবং প্রচণ্ডতর গোলাগুলির তাওর সহ্য করে যেতে হচ্ছে। এ গ্রামের অধিকাংশ মানুষই পাকবাহিনীর পক্ষে। বেশ কিছু মানুষ এ গ্রাম থেকে রাজাকার বাহিনীতে নাম লিখিয়েছে। পুরো গ্রাম কিংবা গ্রামের মানুষই পাকিস্তানি দালাল হিসেবে বিবেচিত। তাই অমরখানা ঘাঁটির শুধু পাকসেনারাই নয়, পুরো অমরখানা গ্রামটাই শক্ত-গ্রাম হিসেবে এখন চিহ্নিত হয়ে গেছে। গ্রামের মানুষজনও রাজাকার দালাল হিসেবে শক্ত-ভাসিকাচুক্ত হয়ে পড়েছে। অবশ্য বাসারতরা এরি মধ্যে ৫/৭ জনকে জয় বাঞ্ছার পক্ষে নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছে। যাদের ওপর ভরসা করেই আমরা পা রাখতে পেরেছি এ গ্রামে, যার প্রতিটা ইঞ্জিন মাটি শক্ততা আর বিশ্বাসযাতকতার বিষবাচ্চ তরা। তবুও এ গ্রামে গুটিকতক লোককে বন্ধু হিসেবে পাওয়া গেছে। এদের মাধ্যমে আজ এ গ্রামের পাদদেশে পৌছানো গেছে। একদিন হয়তো গ্রামের প্রতিটি লোককে শক্তর প্রতি বিশ্বথ করে তোলা যাবে, আর সেটা যদি সম্ভব হয়, তাহলে অমরখানা থেকে সেদিন পাকবাহিনীকে সত্যিকারভাবেই ঘাঁটি গুটিয়ে পালাতে হবে।

বাসারাত অঙ্ককারে হারিয়ে গিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যে দুঃজনকে নিয়ে হাজির করে। তাদের কাছে জানা যায়, পাকসেনারা আজ তাদের নিয়মিত প্রাইল গ্রামের এদিকে আসে নি। গ্রামের রাস্তাটা সামনে কিছুদূর এগিয়ে দু'ভাগ হয়ে গেছে। ডানদিকের রাস্তাটা সোজা গিয়ে উঠেছে অমরখানা ঘাঁটিতে। অন্যটা চলে গেছে স্কুলস; যেটা গিয়ে যোগ হয়েছে অমরখানা বোর্ড অফিস— ভেতরগামী রাস্তায়। ও রাস্তাটা আমাদের পরিচিত। ভেতরগড় দিয়ে বুধন মেষারের বাড়িতে হামলা চালানোর আগে এই রাস্তা ধরে পাকা সড়ক অবধি গিয়েছিলাম আমরা রেকি মিশনে। আমার স্মৃদনকার অন্যতম সাথী গোলাম গউস টোকাপাড়ার মুদ্দে মারা গেছে গত জুলাইয়ে। কাঁভাবে এতো বাড়-ঝঁঝার মধ্যে আমরা বেঁচে আছি! এবং একটার পর একটা বিপদসঙ্কল অপারেশন আর মুদ্দ করে যাচ্ছি! বাসারাতের আনা দুঁজনের মধ্যে একজন মুবই সাহস রাখে বুকের মধ্যে। সে বলে, চলেন তুমরা মোর সাথোত। মোক খালি দুইটা গ্রেনেড দিবেন। মুই উমার বাক্সারের ভিতর যায়ে হেনে ঘেনেড ফিলে আসিম।

চমৎকৃত হই লোকটার কথায়। বলি পারবে?

— হ পারিমানি কেনহেঁ চলেন না দেখিবেন!

কিন্তু তার কথায় সেখানে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া যায় না। এ জন্য সুস্থ মাথায় আরো ভালোভাবে পরিকল্পনা করা দরকার। তবে এর কথা যদি সত্যিকারভাবেই বিশ্বাস্য হয়, তবে অমরখানা শক্তঘাঁটির বাক্সারে ঘেনেড হামলার পরিকল্পনা পরবর্তীকালে নেয়া যেতে পারে। আজকের পরিকল্পনা ভিন্ন। লোক দুটিকে সাথে নিয়ে আমরা এগিয়ে যাই সোজা রাস্তা ধরে। অমরখানা ঘাঁটির রাস্তা থাকে ডানদিকে।

অঙ্ককার রাত। রীতিমতো গা হচ্ছম করে এই শক্তপুরীর ওপর দিয়ে পথ চলতে। গ্রামটির সীমানা ছাড়িয়ে কিছুদূর এগিয়ে আর একটা রাস্তার নাগাল পাওয়া যায়। রাস্তাটি উভয় দিক থেকে এসে যোগ হয়েছে এ রাস্তার সাথে। রাস্তাটির সংযোগস্থলে এসে কিছুক্ষণের জন্য

পথচার বিরতি ঘটানো হয়। বাসারাত জানায়, এ জায়গাতেই রাজাকার ধরে অপেক্ষা করছিলো মতিয়ার আর জহিরল। পেছন থেকে অতর্কিং হামলায় মতিয়ার এখানে মারা যায়, জহিরল সংঘাতিক আহত অবস্থায় কোনোরকমে বেঁচে যায়। মতিয়ারের মৃত্যুর জায়গাটা দেখে নিই ভালো করে। মনের মধ্যে হঠাতে করে একটা অনুরাগ এসে ডিঃ করে। মনে হয়, যদি কখনো দিন আসে, স্মৃতি আসে, তাহলে এ জায়গাটিতে মতিয়ারের মৃত্যুর জন্য দায়ী ব্যক্তিদের গণবিচার করা হবে। তার জন্য গড়ে তোলা হবে এখানে চমৎকার একটি সৃতিসৌধ।

পরিকল্পনামতো দল নিয়ে এগিয়ে যাই। রাস্তাটি ভেতরগড়ের রাস্তার সাথে মিলেছে। দু'রাস্তার সংযোগস্থলের বাড়িটি আলতাফ কেরানির বাড়ি নামে খ্যাত। আলতাফ কেরানি মুসলিম লীগ ঘৰ্ষা মানুষ হিসেবে পরিচিত। বেশ ক'বৰ বসতি নিয়ে গ্রামটির অবস্থান। আলতাফ কেরানি হয়তো সরকারি অফিসে কেরানির কাজ করতেন। সেই থেকে তার নামের শেষে কেরানি কথাটি ঘোগ হয়েছে। সরকারি চাকুরে থেকে অবসর নিয়ে তিনি গ্রামের একজন নামদারি মাতবর ব্যক্তি হিসেবে বর্তমানে অধিষ্ঠিত। এ এলাকার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের মধ্যে তিনি একজন অন্যতম ব্যক্তিত্ব। লোকটা পাকবাহিনীর সাথে সহযোগিতা করে যাচ্ছে আবার মুক্তিবাহিনীর প্রতিও তার একটা নরম হন্দয় কাজ করে। মোটকথা মুক্তিবাহিনীর প্রতি তার কাজকর্মে স্ফুরণ একজন অনিয়ন্ত্রিত প্রতিক্রিয়া এমন কিছু পাওয়া যায় নি। অমরখানা বৃন্দন মেখারের বাড়িতে পাকিস্তানি লঙ্ঘনখানায় সফল গ্রেনেড হামলার পর মোস্তফা সেপ্টেম্বর ছারিয়ে যায়। আমরা ধরেই নিয়েছিলাম, সে পাকবাহিনীর শুলিতে নিহত হয়েছে। কিন্তু দৌড়ে পিছু হটবার সময় সে আলতাফ কেরানির বাড়ির পেছন দিককার পুকুরে পুঁজি যায়। কেরানি সাহেবে তাকে উদ্ধার করে বাকি রাতটা তার আশয়ে রেখে নিজের লোক দিয়ে ভাটপাড়া ক্যাম্পে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। সেই থেকে কেরানি সাহেবের প্রতি আমাদের এমন একটা আস্ত্রার জন্ম নিয়েছে যে, তার দ্বারা মুক্তিবাহিনীর কোনো ক্ষতি হবে না। তার সাথে মুখোয়ারি সাক্ষাৎ হয় নি কখনো। অমরখানা বোর্ড অফিস থেকে সোজা রাস্তা এসে উঠেছে তার বাড়িতে। শ্বাভবিকভাবেই সেখানে পাক চৰকন্দার দলের নিয়মিত আনাগোনা রয়েছে। পাকবাহিনীর প্রতি তার তোয়াজ আর সেবায়নের অন্ত নেই। এভাবেই তিনি নিজেকে এবং তার বসতি এলাকাকে পাকবাহিনীর ঝোঁঢাল থেকে টিকিয়ে রেখেছেন। অপরদিকে মুক্তিবাহিনীর সাথে তার প্রত্যক্ষ যোগাযোগ না থাকলেও তার কার্যক্রম এখনো মুক্তিবাহিনীর বিরুদ্ধে যায় নি। অর্থাৎ কথাটি এভাবে বলা যায় যে, তিনি পাকবাহিনীর সাথেও আছেন, মুক্তিবাহিনীর সাথেও আছেন।

আলতাফ কেরানির কাছে একটি পিণ্ডল রয়েছে এবং অন্যান্য আগ্রেয়ান্ত্রণ থাকতে পারে এ ধরনের একটা খবর আমাদের কাছে আছে। পিণ্ডলটি তার কাছে থাকা নিরাপদ নয়। কেননা, অন্তো তার জিম্মায় থাকলে, সেটা পাকসেনাদের হাতে পড়তে পারে, আবার যে-কোনো সময় তা মুক্তিযোদ্ধাদের বিরুদ্ধেও ব্যবহৃত হতে পারে। আলতাফ কেরানিকে এ ব্যাপারে এখনো নাড়াচাড়া দেয়া হয় নি। এতোদিন তাকে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। আসলে দৈত চরিত্রে অভিনয়কারী লোকজনকে বিশ্বাস করা কঠিন। ঠিক করলাম তাই একদিন তার সাথে বসার ব্যাপারে এবং যেদিন বসবো একটা বোঝাপড়া হবে তার কাছে রাখিত সেই পিণ্ডল কিংবা অন্য আগ্রেয়ান্ত্রের ব্যাপারে।

তো, আলতাফ কেরানির বাড়ি পর্যন্ত পৌছানো গেলো নির্বিজ্ঞেই। রাস্তার বাঁ ধারের পুকুরপাড়ে অবস্থাটা যাচাই করে নেয়া হয় কিছুটা সময় নিয়ে। বাসারাত আর

হাবিবকে পাঠানো হয় সামনের দ্বিকটা রেকি করার জন্য। আজকের অপারেশন পরিকল্পনায় রয়েছে প্রথমে মাইনের ট্রাপ বা ফাঁদ পাতা এবং অমরখানা ঘাঁটিতে পেছন থেকে আঘাত করা। পরিকল্পনা অনুযায়ী ঠিকমতো জায়গায় পৌছে অবস্থান নেয়া গেছে। এখন অমরখানা বোর্ড অফিসগামী রাস্তার ওপর মাইন বসানোর কাজের ভেতর দিয়ে শুরু হবে অপারেশন পর্ব। প্রথম যেখানে আমাদের অবস্থান, সেখান থেকে তিন চারশ' গজের দূরত্বে অমরখানা মূল ঘাঁটি। সিদ্ধান্ত নিই এখন থেকেই আক্রমণ পরিচালনার। রাতের অঙ্ককারে যদি পাকসেনারা তাদের বাক্সার-ট্রেঞ্চ থেকে উঠে আসে, তা হলে তাদের আসতে হবে বোর্ড অফিসের রাস্তা দিয়ে আলতাফ কেরানির বাড়ি বরাবর। আমরা সে রাস্তাতেই মাইনের ফাঁদ পাতবো। তারা এলে নির্যাত মাইনের ফাঁদে তাদের পড়তেই হবে। এটা অনেকটা প্রোচনা দিয়ে আনার মতো ব্যাপার। উদ্দেশ্য, পেছন থেকে শুলিবর্ষণ করে তাদের তাতিয়ে দেয়া। তারা রাগে অক্ষ হয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের ধরার জন্য সৌড়ে আসবে এবং তাদের আসার পথে থাকবে মাইনের ফাঁদ।

বাসারাত ও হাবিব ফিরে আসে। তারা রিপোর্ট দেয়, রাস্তা ফাঁকা। কিছু নেই। একরামুলকে পুরুর পাড়ে রাখি কভার ফায়ারের জন্য। বাসারাত-বাবু-বকর ও মতিয়ারসহ সাতজনকে সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে যাই আমি। আলতাফ কেরানির বাড়ির ভেতর থেকে অনেকক্ষণ ধরে একটা কুকুর ডেকে চলেছে। মধ্যরাতে কুকুরের তারবুরে চিংকারের অর্থই হলো বাড়িতালকে এই জানান দেয়া যে, অজানা-অচেন্নানো কিছুর আবর্জা ঘটেছে তার বাড়ির আশপাশে। বাড়িতাল এতে সজাগ হয়ে উঠে। কিন্তু আলতাফ কেরানির বাড়ির ভেতর থেকে সে ধরনের কোনো সজাগতার লক্ষণ দেখা যায় না। হয়তো তারা কুকুরের এ জাতীয় ডাকে অভ্যন্ত হয়ে পড়েছে এরি মধ্যে

রাস্তা ধরে বেশ কিছুদূর এগিয়ে যাই। সন্মনেই একটা মস্তব ঘর। সেটা পার হয়ে আর শ' দেড়েক গজ হাঁটলেই পাকা সড়ক। সে জায়গাতেই নেমে যাই। আর এন্তো ঠিক হবে না, বলে উঠে মন। রাস্তার ওপরে আমার সাথে থাকে বাসারাত আর বকর। অন্যরা রাস্তার ঢালে গিয়ে কভার দেয়ার জন্য অবস্থান নেয়। কোমর থেকে বেয়নেট বের করেই হাত দ্রুত সক্রিয় হয়ে উঠে এপি-১৪ মাইনের জন্য মাটি খৌড়ার কাজে। রাস্তার ওপর সাইজমতো ছেট ছেট গর্ত করে তাতে এপি-১৪ মাইন বসিয়ে ডেটনেটেরের পাত খুলে নিয়ে মাইনগুলোকে জীবন্ত করে ফেলা হয়। এরপর আলগা মাটি চাপা দিয়ে তুকনো মাটি, খড় আর রাস্তার ওপর পড়ে থাকা জঙ্গল ইত্যাদি চাপা দিয়ে ক্যামোফ্লেজ তৈরি করা হয়, যাতে সহজে কেউ বুঝতে না পাবে মাইনের অবস্থান। ১০/১২টা মাইন সুবিধাজনক জায়গায় স্থাপন করার লক্ষ্য থেকে দ্রুত হাত চলছে। এরি মধ্যে ২ থেকে ৩টা মাইন স্থাপন করা হয়ে গেছে। আমরা যখন এই রকম কাজে ব্যস্ত, ঠিক তখনি হঠাৎ করেই ঢাক্ঢাক্ শব্দ তুলে অমরখানা ঘাঁটি থেকে মেশিনগানের শুলিবর্ষণ শুরু হয়ে যায়। পেছনে এতোটা কাছ থেকে মেশিনগানের শুলি ছুটে আসছে যে, মনে হয়, তার লক্ষ্যবস্তু আর কেউ নয়, আমরাই। আচমকা এ অবস্থায় দিশেহারা হবার যোগাড়। সোজা শয়ে পড়ি রাস্তার ওপর মাটিতে। অন্য দু'জন গড়িয়ে চলে যায় রাস্তার ঢালে। অবশ্য ভারতীয় ফ্রন্ট লাইন থেকেও পাকবাহিনীর উদ্দেশ্যে একইভাবে শুরু হয়ে যায় মেশিনগানের জবাব। সম্ভবত হাবিলদার সাহেবের দল তার কাজ শুরু করেছেন। এখন সামনাসামনি দুই ফ্রন্ট লাইনের ভেতরে শুরু হয়ে যায় বিরতিহীন মেশিনগানের শুলিবনিময়। এ পরিস্থিতি সামলে নিতে কিছুটা সময় লাগে আমাদের।

ধৈর্য আর সাহস এ দুটো জিনিস হচ্ছে গেরিলা যোদ্ধাদের মূল পুঁজি। পরিস্থিতি যাই হোক না কেনো, ধৈর্য আর সাহস মাথা ঠাণ্ডা রেখে কাজ করে যেতে পারলে তাতে সাফল্য আসে অবশ্যজ্ঞাবীভাবে। রাস্তার ঢালে চলে যাওয়া বাসারাত আর বকরকে ডাক দিই। শুটিংগুটি যেরে ওরা এগিয়ে আসে। এবার দ্রুত হাত চালিয়ে শেষ করে নিই বাদবাকি কাজ। মোট ৮টা মাইন বসানো হয়েছে। আর নয়। কভারে থাকা ছেলেদের ডেকে নিয়ে ফিরে আসি পুরুরপাড়ে একরামুলের অবস্থানে।

এবার সবাই অবস্থান নেয় ছড়ানোভাবে। আদেশ পাওয়ামাত্র সবগুলো হাতিয়ার গর্জে উঠে। পেছন থেকে সরাসরি অমরখানা ঘাঁটি অভিযুক্তি আক্রমণ শক্তকে সন্তুষ্ট প্রথমটায় কিছুটা বিভাস্ত করে ফেলে। কেননা, এদিক থেকে তাদের ওপর এ ধরনের সরাসরি আক্রমণ এই প্রথম। একনাগাড়ে চলতে থাকে আমাদের গুলিবর্ষণ। প্রায় মিনিট দশকে শক্তপক্ষ কোনোরকম সাড়া দেয় না। কিন্তু এরপর আচমকা তরু করে তারা প্রতিআক্রমণ। একসঙ্গে তাদের অনেকগুলো অন্ত গর্জে উঠে সামনে থেকে। অঙ্ককারে দেখা যায় না, তবে সামনে থেকে শক্ত প্রবল গুলিবর্ষণ। একেবারে বেসামাল করে দেয় ছেলেদের। বন্যার প্রাতের মতো গুলি উড়ে যায় মাথার ওপর দিয়ে। পুরুরের ঢালে আড়াল নিয়ে সবাইকে না থেমে গুলি চালিয়ে যেতে বলি। অস্থিরতা আর উজ্জ্বলনার চরমে উঠে ছেলেরা গুলি চালিয়ে যেতে থাকে। ১৫/২০ মিনিট এভাবে গুলিবর্ষণ চলার পর মনে হয়, ওরা এগিয়ে আসছে। আমাদের অবস্থান ঝুঁঝে নিয়ে রাতের অঙ্ককারেই ওরা গুলি ছুঁড়তে ছুঁস্তে আসছে আমাদের দিকে। ওদের গুলিবর্ষণের ধারা দেখে মনে হয়, সংখ্যায় তারা আমাদের হিশশের চাইতে কম নয়। জাত সেনিক পাকবাহিনী আমাদের এলোপাতাড়ি খুঁজিয়ে খুঁকে এগিয়ে আসছে সোজাসুজি ফসলের মাঠ প্রান্তর ভেঙে। গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে তুম্হেও এই আগুয়ান ভাব বলে দিছে, অসভ্য জেদের বশবর্তী হয়েই তারা এদিকপানে আসছে। এসেই একটা তুলকালাম কাও করে ছাড়বে। এভাবে এগিয়ে এলে শেষ পর্যন্ত তাদেরকে কথা দিয়ে আটকে রাখা যাবে না। এগিয়ে এসে একেবারে ঝাপিয়ে পড়বে। এইরকম পরিস্থিততে দ্রুত সরে পড়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। নতুন সমূহ বিপদের সংজ্ঞানা, যে বিপদ সোজা ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ে চরম সর্বনাশ ঘটিয়ে ফেলবে দলের। সুতরাং তৎক্ষণিকভাবে সিন্দ্রান্ত নিয়ে ফেলি। দ্রুত সরে পড়তে হবে এখান থেকে।

একরামুলসহ আমরা ৫ জন কভারে থাকি। অন্যদের দ্রুত সিয়ে পেছন দিককার তালমার রাস্তা ধরতে বলি। মিনিট দুয়েক গুলি চালিয়ে আমরাও পুরুরের ঢালে মাথা লুকিয়ে ডানদিকে রাস্তার ঢালে গিয়ে পৌছাই। সেখান থেকে ফসলের মাঠ ভেঙে দৌড়ে লাগাই পড়িমরি। পেছন থেকে তখনো গুলি দেয়ে আসতে থাকে, অস্পষ্ট কিছু কঠিনরও শোনা যায়। আমরা দৌড়ে চলি সোজা। দক্ষিণমুখী হয়ে। বেশ কিছুক্ষণ দৌড়ে এসে ইঙ্গিত রাস্তাটার নাগাল পাওয়া যায়। বাবলু-বকর এরা আগেই সেখানে পৌছে অবস্থান নিয়েছে। তাদের পাশে গিয়ে আমরাও শুয়ে পড়ি। এভাবে মাথা নিচু করে দৌড়াবার ক্রান্তিতে হঁ করে নাকে-মুখে নিষ্কাস নিতে হয়। বুক ঝাঁঠান্মা করে হাঁপরের মতো। মোটামুটি নিরাপদ জায়গায় পৌছে গেছি। শক্ত আর হয়তো সাহস করবে না পিছু ধাওয়া করে এতোদূর আসতে। আর এলোও অসুবিধা নেই, কেননা, ক'পা দূরে ভারতীয় সীমান্ত। আমরা সহজেই চলে যেতে পারবো ওপারে।

এভাবে পড়ে থাকি অনেকক্ষণ। শক্ত আমাদের অবস্থানে এসে দাপাদাপি করে কিছুক্ষণ এলোপাতাড়ি গুলিটুলি চালিয়ে তারপর থেমে যায়। কিন্তু অমরখানা মূল ঘাঁটি থামে না।

একনাগাড়ে ২/৩টা মেশিনগান থেকে গুলি চলতেই থাকে। ওপার থেকেও জবাব আসে তেমনিভাবে। আমরা খুব কাছ থেকে সামনের লড়াই দেখতে থাকি। এভাবে কেটে যেতে থাকে সময়। এক সময় রাত ভোর হয়ে আসে।

ভোরের প্রথম আলোয় শক্র এলাকা ছেড়ে আমরা পার হয়ে আসি সীমান্ত। অমরখনা মূল ঘাঁটিতে পেছন থেকে আঘাত হানবার কাজ এভাবেই শেষ হয় প্রথম দিন।

সকালে চাউলহাটিতে খবর আসে, মাইনের ফাঁদে পড়ে দু'জন খানসেনা ঘায়েল হয়েছে। তাঁবুর শয়ায় গভীর ঘুমে তলিয়ে যাবার মুহূর্তে দু'জন খানসেনা ঘায়েল হবার সংবাদে হঠাতে করে হল্পোড় পড়ে যাওয়ার শব্দে জেগে উঠি। বড় ভাই নুরুল হক সারা ক্যাপ্সে খবরটা ছড়িয়ে দেন গর্বের সঙ্গে। খবরটা উনে একটা তৃষ্ণি নিয়ে আবার ঘুমের অভলে হায়িয়ে যাই।

২০. ১০. ৭১

হাতি-মেরা সাথী

আহিদার বলে, গজব হয়ে গেছে মাহবুব ভাই, একেবারে কেলেঙ্কারি অবস্থা।

জলপাইগুড়ি শহরের মেইন রোডের পাশে দেখা হতেই গড়গড় করে কথা বলে ওঠে আহিদার। একদম বেসামাল বিশ্বেষণ অবস্থা তার। জিগ্যেস করি ঘটনাটা কি? যানি থিৎ রংগুলিবাবে আহিদার যা বলে তাতে করে আমরা কৌতুকেন্দ্ৰিয়া করে পারি না। সে বলে, ক্যাপ্টেন নন্দা সিমেনা হলোর ভেতর চুকে এক একজনকে কান ধরে বের করে এনেছেন। চলন্ত সিনেমা শো, হল ভৰ্তি মানুষ। এর ভেতরেই টুচ্ছ জ্বালিয়ে জ্বালিয়ে কান ধরে বের করে আনার ব্যাপারটা চিন্তা করেন। কেমন বেইজ্ঞানিক।

মজার ঘটনা সন্দেহ নেই। জিগ্যেস করি কী সিনেমা দেখছিল সব? লাজুক হাসি হেসে আহিদার বলে, হাতি মেরা সাথী।

- তা ফ্রন্ট থেকে পালিয়ে এবং সিনেমা দেখছে কেনো সব? কী হয়েছে খোলাখুলি বল, বলে বিস্তারিত ঘটনা বলার জন্য প্রশ্ন দিই তাকে।

সে বলে যায়, আমরা কি জানি নন্দা এভাবে এসে হামলা করবে? সকালবেলা তিনি মানিকগঞ্জে গিয়ে রিপোর্ট নিয়েছেন। রেশনটেশন, গোলাবারুদ বুঝিয়ে দিয়ে চলে এসেছেন। তার আসার পর ছেলেরা সব ধরেছে, জলপাইগুড়ি এসে সিনেমা দেখবে, হাতি মেরা সাথী। জানেনই তো ছবিটার নাম এমনভাবে ছড়িয়েছে যে, ছেলেরা সেটা দেখার জন্য প্রায় পাগল হয়ে ওঠে। নন্দা যাওয়ার পর ওরা এমনভাবে ধরে বসে যে, না করতে পারি নি। তাদের নিয়ে আসতে হয়েছে জলপাইগুড়ি। ওরা এসেই ম্যাটিনি শোর টিকেট কেটে চুকে গেছে হলে। আমার জন্যও টিকেট কেটেছিলো। তাই আমি চুকে পড়েছিলাম। ঢেকার পর ছবি যেই শুরু হয়েছে, কিছুক্ষণ পর দেখি কি, একজন হাতে টুচ্ছ জ্বালিয়ে সারিতে বসা সিটের লোকদের মুখ দেখছেন। আমার সিট হলোর একেবারে পেছনের সারিতে। টুচ্ছ হাতে নন্দাকে আমি দেখেই চিনতে পারি। তখন পর্দায় রাজেশ খান্না তার হাতি নিয়ে গেয়ে চলেছে, চল্ চল্ চল্ মেরা হাতি...। নন্দা সেই অবস্থায় ছেলেদের ঝুঁজে ঝুঁজে বের করছেন আর কান ধরে ধরে হল ভৰ্তি লোকের মাঝখান দিয়েই বের করে আনছেন এক একজনকে। কান টানা যাবার ভয়ে অনেকেই এমনিতে বের হয়ে আসে। তারপর হলোর সামনে আমাদের সবাইকে লাইন করে দাঁড় করিয়ে তার সে কী বেদম গালমন্দের বহুর! তিনি নির্দেশ দেন সোজা ফ্রন্টে চলে যেতে।

হেভি ক্ষেপে যান আমার ওপর এভাবে ফ্রন্ট থেকে আসায়। ব্যাপারটিকে তিনি অত্যন্ত সিরিয়াসলি নিয়েছেন। তাই কোনৰকমে মাফটাফ চেয়ে শৈষতক রক্ষা পাওয়া গেছে।

আহিদারের সরস বর্ণনায় মজা পাওয়া যায়। হো-হো করে হেসে ওঠে সবাই। হাসতে হাসতে বলি। তোরও কান ধরেছিলো নাকি?

নিজের কানে চট করে হাত দিয়ে আহিদার আস্তে বলে ওঠে, আরে না না, আমার ধরে নাই। আমি তো আগেই কেটে পড়েছি পেছনের দরোজা দিয়ে। তবে গাল থেতে হয়েছে স্বীব। তখন তাকে বলি, কিন্তু নন্দা তো আমাদের আজ সিনেমা দেখাবার জন্যই জলপাইগুড়ি নিয়ে এসেছেন। তিনি নিজেই গেছেন কন্সেশন রেটে টিকেট কাটতে। দেখবি নাকি সিনেমা?

— না না বলে আঁতকে ওঠে আহিদার। আমি ভাগি, বলে আহিদার চলে যায় তার দুঁজন সাথী নিয়ে বাসট্যান্ডের দিকে। আহিদারকে পেয়ে ভালোই লেগেছিলো। অনেক কিছু জানবার ছিলো ওর কাছ থেকে, বিশেষ করে মারেয়া ফ্রন্ট স্পর্কে। কিন্তু কিছুই জানা হয় না।

ক্যাটেন নন্দা আসেন কিছুক্ষণের মধ্যে। এসেই বলেন, আরেঞ্জমেন্ট হো গিয়া। তিনি একটা সিমেন্স হলের নাম করে বলেন, সেখানে তোমরা চলে যাও। ম্যানেজারকে বলা আছে, ম্যায় তি দেখুঙ্গা। সময় হলেই তোমরা চলে যেও। ইভেনিং শো। মোট ১০ জনের সিট রিজার্ভ থাকবে। নন্দাকে আগেই বলেছি, আমি নিজে দেখবো না। একরামুল বাবলুসহ অন্যরা দেখবো।

নন্দার কথা, তুমি তাহলে কী করবে? ইভেনিং শো জ্যো ভাঙবে সেই রাত নটার দিকে। জবাবে তাকে বলেছি, কাজ নেই তেমন। ইধারউধার সুরেগা। জলপাইগুড়ি শহর দেখেগা। আওর কুচ কেনাকাটা করেগা।

নন্দা চলে যান তার কোনো নির্দিষ্ট স্থানেয়েন্টমেটে। ছেলেরা শহরের দিকে ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু তারা বলে যায়, নন্দার পছন্দ তো সিনেমা দেখা যাবে না। আমরা ‘হাতি মেরা সাথী’ই দেখবো। আপনাকে এটা প্রমাণ করতে হবে। এদেরও দেখি ‘হাতি মেরা সাথী’র রোগে পেয়েছে। ছবিটা ক’সঞ্চয়’ধরে একনাগাড়ে চলছে জলপাইগুড়ির নামকরা সিনেমা হলটায়। রাতাঘাটে চলতে-ফিরতে মানুষের মুখে, বিশেষ করে কিশো-মুবক বা ছোকরা বয়সীদের মুখে মুখে চল মেরা হাতির গান। স্বাভাবিকভাবেই তরুণ মৃত্যুযোদ্ধা ছেলেদের মনেও সেই গান ভুলেছে আলোড়ন। ফ্রন্ট থেকে যে ছবিটা দেখবার ইচ্ছে নিয়ে তারা এসেছে, নন্দা খামোকা তাদের ইচ্ছের বিরুদ্ধে তার পছন্দমতো ছবি দেখাতে চাইছেন। ছেলেরা সেটা মানতে চাইবে কেনো? বলি, যা ইচ্ছা তাদের দেখ। কিন্তু সময়মতো হাজির হতে হবে সবাইকে নির্দিষ্ট চাউলহাটিপামী রাস্তার মোড়ে। ওরা মাথা নেড়ে সম্মতি জানায়। এরপর খালেক আর মুজিবকে নিয়ে আমি হাঁটতে থাকি জলপাইগুড়ি রাস্তা বরাবর। কিন্তু হাঁটতে হাঁটতেই একটা কথা ভেবে কিছুটা বিশ্ব জাগে মনে। ক্যাটেন নন্দা সিনেমা দেখাবার জন্য আজ আমাদের নিজে জলপাইগুড়ি নিয়ে এসেছেন। অথচ অন্যদিকে সেই একই সিনেমা দেখার অপরাধে নাজেহাল করে ছেড়ে দিলেন আহিদারদের। ওরা অনুমতি নিয়ে আসলেই তো পারতো। অসম্ভব ভদ্র, পরিচ্ছন্ন আর মেথোডিক্যাল মানুষ এই নন্দা। তাকে বুঝিয়ে বললে তিনি অবশ্যই না করতেন না। এভাবে ফ্রন্ট থেকে বিনামূলভিত্তে পালিয়ে এসে তাদের সিনেমা দেখার বুকি নেয়াটা উচিত হয় নি। আহিদার চিরদিনই বোকা এবং হজুগে। এমনিতেই দারুণ ভালো ছেলে আহিদার। কিন্তু তার বোকামোর জন্য মাঝে

মাঝে তাকে এ ধরনের বিব্রতকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়।

রাতের অমরখানা অপারেশনশেষে সকাল ন'টায় নদ্বার কাছে বিস্তারিত রিপোর্ট দাখিলের পর তিনি আজ প্রস্তাব দেন, চলো, জলপাইগড়ি যাই। যাবে? জলপাইগড়ির প্রতি সব সময় একটা প্রচলন দুর্বলতা মনের মধ্যে কাজ করে। মাথা নেড়ে সান্দে সম্ভাব্য দিলে, তিনি বলেন, চলো আজ তোমাদের সিনেমা দেখাবো। ১৫ মিনিটের মধ্যে রেডি হয়ে নাও। আমি হাইড আউটের কোয়াডগুলোর রিপোর্ট নিয়ে ফিরে এসে সিনেমা দেখার ব্যবস্থা করবো। আমার গাড়িতে করে জলপাইগড়ি নামিয়ে দেব তোমাদের। তারপর আমি মানিকগঞ্জ গড়ালবাড়ি গিয়ে আমার কাজ করবো। তোমরা ঘুরে বেড়াবে শহরে। সময়মতো এসে যাবো আমি। সে অনুসারে নদ্বা আমাদের জলপাইগড়ি নামিয়ে দিয়ে গেছেন, ১১টাৰ দিকে। জলপাইগড়িতে নেমেই মজিবকে পেয়ে যাই। তখন ছেলেদের ঘোরাঘুরির সুযোগ দিয়ে মজিবকে সঙ্গে নিয়ে চলি খালেক যেখানে রয়েছে সেই সোনাউল্লাহ হাউজে। ওর সাথে দেখা করার মানসিক তাগিদ প্রবল।

একটি অনন্য বৈঠক

সোনাউল্লাহ হাউজে নেতা-কর্মীদের একেবারে 'ঠাই নাই ঠাই নাই' জাতীয় ভিড়। খালেক অপ্রত্যাশিতভাবে আমাদের পেয়ে ঝুঁকি ঝুঁকি হয়। অন্যান্য হাসির আভায় তার চোখমুখ চকচক করে ওঠে। বলে, আজ দুপুরে খেতে হবে আমার এখানে।

— কী খাওয়াবে? হাসতে হাসতে জিগ্যেস করি।

— যা খাই তাই খাওয়াবো। রেশনের ফাল্গুণী যা জোটে তাই দিয়ে নিজে রান্না করে খাই। অসুবিধা হবে না।

বাড়িটার সিঁড়ি দিয়ে উঠে বাঁদিকে ছাইটমতো ঘরে খালেকের আস্তানা। সেখানেই সে থাকে। রান্না করে খায়দায় আর রান্নাটনের কাজকর্ম করে। মাঝখানের ঘরটা বেশ বড়ো। মেঝেতে এমাথা ওমাথা জুড়ে শুভ্রাঞ্জ পাতা। লোকজন এখানেই বসে। নেতা-কর্মীরা এখানেই আলোচনা করেন। অনেকেই এখানের রাতের ঢালা বিছানায় ঘুমোন পর্যন্ত। উত্তরাঞ্চলের বায়মপুঁজি আদেশন অর্থাৎ কমিউনিস্ট পার্টির ঘাঁটি হয়ে উঠেছে বর্তমানে সোনাউল্লাহ হাউজ। এখানে এসে আহ্বান নিয়েছেন অনেকে। খালেক পরিচয় করিয়ে দেয় একজন ছিমছাম পাতলা লাখা গড়নের উজ্জ্বল মানুষের সাথে। তিনি কমরেড শামসুদ্দোহা। ছাত্র ইউনিয়নের সাবেক সভাপতি। কমরেড দোহার বাড়ি নীলফামারী জেলায়। স্বাভাবিকভাবেই তিনি উত্তরাঞ্চলের তাঁর দলের সাংগঠনিক তৎপরতা পরিচালনার জন্য জলপাইগড়ি শহরের এই সোনাউল্লাহ হাউজকে তাঁর 'বেস' হিসেবে বেছে নিয়েছেন। ঘৃঘূড়ায় গড়ে তুলেছেন ঘুব ক্যাম্প। ছাত্র ইউনিয়নের ছেলেরা সেখানে প্রাথমিক প্রশিক্ষণশেষে মুরতি ক্যাম্পে যাছে ট্রেনিং নিতে। নীলফামারী সীমান্ত পেরুলেই ভারতীয় জেলা শহর জলপাইগড়ি। উত্তরাঞ্চলের বাম আদেশনের নেতা-কর্মীরা অনেকেই এখানে থাকেন। অনেকেই ভিন্ন ভিন্ন জায়গা থেকে এখানে নিয়মিতই এসে থাকেন। কমরেড দোহা যন্ত্র-রেউফদের মতো নেতা-কর্মীর সাহায্যে এই এলাকায় সাংগঠনিক যোরু ঝুঁকি তালোভাবে গড়ে তুলতে পেরেছেন বলেই মনে হয়। হলঘরের মেঝেতে বসা অনেক নেতা-কর্মীকেই এখানে দেখতে পাওয়া যায়। খালেক পরিচয় করিয়ে দেয়ার পর আমরাও শিয়ে বসি তাঁর কাছাকাছি। কৃশ্ণ বিনিয়নের পর তিনি ফ্রন্টের খবর জানতে চান। আমাদের যুদ্ধ এলাকায়

তাদের সংগঠনের লোকজনকে কাজ করার সুযোগ দেয়াতে তিনি ধন্যবাদ জানান। পাশাপাশি কিছুটা দৃঢ়ৰ হেঁয়ো গলায় বলেন, সব সেক্ষেত্রে, সব ফ্রন্টে যদি এ ধরনের সহযোগিতা পাওয়া যেতো, তাহলে অনেক সুবিধা হতো। এগিয়ে যাওয়া যেতো অনেকখানি। তিনি প্রসঙ্গতমে টেনে আনেন ত্রিপুরা ফ্রন্টের কথা। বলেন, সেখানে কীভাবে পার্টির ছেলেদের মাঝে হয়েছে এবং কীভাবে কাজেরক্ষে বাধা দেয়া হচ্ছে, সেইসব কথা। সমবেত সব কর্মরেডই সৃষ্টি এ বিষয়ক আলোচনায় অংশ নেন। যুবক, মাঝবয়সী, প্রীৰী ও বয়োবৃন্দ, সব বয়সী কর্মরেডের চমৎকার এক মিলনক্ষেত্র এই সোনাউল্লাহ হাউজ। সিপিআই-এর সাথে এদের যোগাযোগ। নানাভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করছেন তারা বাংলাদেশের উদ্বৃক্ত কর্মরেডদের, ঠিক যেমনটা করে ভারতীয় কংগ্রেসের সাহায্য পাছে আওয়ামী লীগ। তাসামী ন্যাপের সাথে যোগাযোগ রয়েছে সিপিএম-এর। ফরোয়ার্ড বুকও তাদের তাৎপৰ্য ও মতান্বের অনুসারী বাংলাদেশের নেতা-কর্মীদের সাহায্য-সহযোগিতা করছে।

আলোচনা এক সময় দারুণ জয়ে ওঠে। জয় বাংলা হলে অর্থাৎ স্বাধীন বাংলাদেশ হলে সেখানে শোষণহীন সমাজব্যবস্থা অর্থাৎ সমাজতন্ত্র চালু করা হবে। তাঁরা তাদের বাজনেতিক দর্শন এবং কর্মধারা সেদিকেই পরিচালিত করছেন। দেশ স্বাধীন হলে, স্বাধীন বাংলাদেশের সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ইচ্ছপূরণে নিয়েও অনেকে আলোচনা তোলেন। এ যুক্তে সোভিয়েত ইউনিয়নসহ পূর্ব ইউরোপের সবগুলো সমাজতান্ত্রিক দেশ-ফ্রন্টসরি সাহায্য দিচ্ছে। ভারতের সাথে সোভিয়েত ইউনিয়নের মিত্রতা রয়েছে। সমগ্র সমাজতান্ত্রিক দুনিয়া আমাদের স্বাধীনতার পক্ষে একমাত্র চীন ছাড়া। সমাজতান্ত্রিক ইতিহাস যখন আমাদের যুক্তিযুক্ত সরাসরি মদদ দিচ্ছে, তখন ভবিষ্যৎ বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র না হয়ে যায় না। দু'একজনের মুখ থেকে এ ধরনের পরিকার মন্তব্য ও অবশ্যরাদের কথা ও শোনা যায়। চমৎকার লাগে আলোচনার পরিবেশ ও অবস্থাটা। এখনও যারা উপস্থিত, তাঁরা সবাই খুবই পরিচ্ছন্ন মনের মানুষ। তাদের চরিত্রে রয়েছে ক্ষতিগ্রস্ত পরিশ্রম আৰ ত্যাগ স্বীকারের মহিমা। পাকিস্তানের পুরো আমলটাই বাংলাদেশের ক্ষতিগ্রস্তদের আভারগাউড রাজনীতি করতে হয়েছে। জেল-জুলুম আৰ সরকারের দমননীতিৰ শিকার হতে হয়েছে বারবাৰ। নানাভাবে নিগৃহীত হয়েছেন এৱা, কিন্তু সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পথ থেকে বিচুতি ঘটে নি তাদের। সংখ্যায় এৱা বেশি নন। কিন্তু চিন্তা-চেতনা, বিশ্বাসে আৰ বিপুলী কর্মধারার বিচারে এৱা কিংবদন্তিতুল্য নায়ক এক একজন। তাদের বিশ্বাস এবং আশা সুন্দৰ, হতোদ্যম কেউ নন। এই প্রতিকূল পরিবেশ-পরিস্থিতিতেও তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং বিশ্বাসের কথা শুনতে ভালো লাগে। মনে হয়, একটা মুক্তিযুক্ত আমরা সমশ্বরিকদার। ফ্রন্টে দিনবাত শক্তিৰ মুখোমুখি লড়ছি স্বাধীন বাংলাদেশের কাজিক্ষত স্থপ্ত বুকের গভীৰে লালন করে। সেই স্থপ্তেৰ বাংলাদেশে সমাজতন্ত্র কায়েম হবে। একটা শোষণহীন সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে। ছোট-বড়, ধনী-গরিব দেৱাভেদ থাকবে না। একটা সুবীৰ সমন্বয়শালী নতুন দেশ, নতুন জাতিৰ উদ্ভব হবে, যার জন্য স্থপ্ত দেখছে বাংলাদেশের স্বাধীনতাপ্রিয় সিংহভাগ মানুষ। ভালো লাগে ব্যাপারটা ভাবতে।

আলোচনায় টেনে নেন তাঁরা আমাদেরও। খালেক এসে বসে তার রান্নার কাজ সেৱে। এদের প্রাণবন্ত আলোচনা এবং বিশ্বাসের কথা শুনতে ভালো লাগলো, আলোচনায় অংশ নেয়াৰ ইচ্ছে আমাদের ছিলো না। কিন্তু তাঁরা ফ্রন্টের প্রকৃত অবস্থা জানতে চান, অধিকৃত এলাকার মানুষেৰ কথা শুনতে চান। জানতে চান মুক্তিযুদ্ধেৰ অঞ্চলতিৰ কথা। তাদেৰ বলি,

দেখেন, আপনাদের মতো রাজনৈতিক জ্ঞান বা তত্ত্বগত পড়াশোনা আমাদের নেই। আপনাদের মতো আমরা রাজনীতির চর্চা বা অনুশীলনও করি না। ফ্রন্টের অভিজ্ঞতা থেকে সাদামাটাভাবে কথা বলবো আমি। তার থেকেই ব্যাপারটা আপনাদের বুঝে নিতে হবে। কথাটা শোনামাত্র তারা সবাই আমারে মুখের দিকে উৎসাহভরে তাকান। তাদের সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে আমি বলি, তিনটা জিনিস নিয়ে আপনাদের ভাবতে হবে, প্রথমত, এখন পর্যন্ত আমরা গেরিলাযুদ্ধ করছি এবং সেটা সরাসরি ভারতীয় অফিসারদের অধীনে থেকে। বিভায়ত, এফ.এফ.-এর প্রায় সব ছেলেই 'নম পল' অর্ধাং ভাদের মধ্যে কোনোরকম রাজনৈতিক চিন্তাচেতনা নেই। তারা শুধু জ্ঞানে জয় বাংলা আর চেনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। তৃতীয়ত, অধিকৃত এলাকার মানুষদের মধ্যে কোনো রাজনৈতিক প্রচারণা নেই। বাংলাদেশের পক্ষে অধিকৃত এলাকার মানুষজনকে ধরে রাখবার জন্য কোনো রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নেই। মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে হতাশার সৃষ্টি হচ্ছে। হতাশ এবং হতোদয়ম হয়ে পড়ছে অধিকৃত এলাকার মানুষজনও। যুদ্ধ যদি প্রলম্বিত হয়, যদি অনেক দিন আমাদের যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হয়, তাহলে ভিয়েনাম, লাওস, কমোডিয়া এসব দেশের মতো সমগ্র মুক্তিযুদ্ধকে বিন্যাস করা প্রয়োজন। মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে রাজনীতিগত ভাবাদর্শ প্রচার করা প্রয়োজন, দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করতে চাইলে ক্যাডর সৃষ্টি করা প্রয়োজন দ্রুত। জয় বাংলা প্রতিষ্ঠার আবেগ দ্বারা পরিচালিত এফ.এফ. গেরিলা দল কিন্তু মুক্তিযোদ্ধাজোড় বাহিনী রাজনৈতিক চিন্তাচেতনা ছাড়া দিনরাত কেবল যুদ্ধই করে যাচ্ছে। এটায়ে জয় বাংলা প্রতিষ্ঠা হবে ঠিকই, কিন্তু তারপর? তারপর কী হবে? এটা একটা বিচ্ছিন্ন প্রশ্ন আমার কাছে। এছাড়া রয়েছে মুক্তিযোদ্ধাদের বিচ্ছিন্নতা ও নিঃসঙ্গতার ব্যাপারটা। সেই সাথে রয়েছে তাদের নানা ধরনের কলফিউশন। রাজনীতিবিদরা ফ্রন্টে মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে নিয়মিত কেনো যান না, এটা একটা বড় জিজ্ঞাসা তাদের সবারই। অধিকৃত মুক্তিযোদ্ধাই অশিক্ষিত বা অবশিক্ষিত। এই ফ্রন্ট জুড়ে মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে ৩/৪ জনের বেশি গ্র্যাজুয়েট ছেলে নেই। শিক্ষিত অধিকাংশ ছেলেই যুব ক্যাম্পে বসে আছে। কিন্তু এদকিগুলির ঘুরেফিরে দিন পার করছে। শিক্ষিত ছেলেদের ফ্রন্টে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে নিতে পারলে যুদ্ধটা আরো ভালোভাবে পরিচালিত করা যেতো বলে আমার ধরণ। এভাবে হবে না। আপনারা যেমন করে ভাবছেন, যেমন করে এগুচ্ছেন, তাতে করে কিছুই হবে না। ফ্রন্টে আসেন, দেখেন, উপলব্ধি করেন। মুক্তিযোদ্ধা ছেলেদের কাছে যান, সাধারণ মানুষের কাছে যান, এভাবে আলোচনা-সমালোচনা আর তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ দিয়ে আমরা যারা যুদ্ধ করছি, তাতে করে তাদের কি লাভ বলেন?

একটানা কথা বলে আমি থামি। আমার শেষের দিককার কথা বলবার সময় আবেগ এবং স্নেহ এসে ভিড় করে গলায়। সমবেত সবাই চুপ করে থাকেন কিছুক্ষণ। সম্ভবত হৃদয়ঙ্গম করতে চান আমার বলে যাওয়া কথাগুলো। কমরেড দোহা বলেন, কাজ শুরু হয়েছে। আমাদের লোকজন যাচ্ছে এবং যাবে। আপনাদের সহযোগিতা প্রয়োজন এ ব্যাপারে। আমরা তাঁকে সব ধরনের সহযোগিতা দেবার অঙ্গীকার করে আলোচনা বৈঠক থেকে উঠে পড়ি। কমরেড দোহা সময় পেলেই তাঁর এই আন্তরাল আসবার অনুরোধ জানান। এরপর শুরু হয় খালেকের মধ্যাহ্নভোজের আপ্যায়ন পর্ব। রেশনের সাদা ধৰ্বধৰে গন্ধুযুক্ত চালের ভাত, ডাল আর সেই সাথে যত্সামান্য মাছের তরকারি। খালেক নিজেই রঁধেছে। মেরেতে আসন পিড়ি হয়ে খালেকের পরিবেশনায় থেকে থেকে একটা কথা বারবার মনে হয়। অসমের বিলিয়ান্ট

ক্যারিয়ারের একজন ছাত্র ছিলো খালেক। এই যে এভাবে সে কষ্ট করেছে, ভবিষ্যৎ স্বাধীন বাংলাদেশে শোষণহীন সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য নিজেকে এখানে যে গভীর নিষ্ঠায় নিয়োজিত করেছে, বাংলাদেশ যদি সত্যিকারভাবেই একদিন স্বাধীন হয়েই যায়, তাহলে আজকের খালেকের এই কষ্ট আর ত্যাগের কথা কি সঠিকভাবে মূল্যায়িত হবে? কে জানে? হয়তো হবে। হয়তো হবে না। ভবিষ্যৎই একমাত্র জবাব দিতে পারবে।

বাঙালি শহরে সোনালি বিকেল

বিকেলের জলপাইগড়ি শহরে যেনো মেয়েদের মেলা বসেছে। সব বয়সী মেয়েদের পরনেই শাড়ি। আমাদের দেশে শহরের অবিবাহিত মেয়েরা সালোয়ার-কামিজ পরে থাকে। কিন্তু এখানে সবার পরনেই শাড়ি আর ব্লাউজ। এপারের বাঙালি কালচার আমাদের অনভ্যন্ত চোখে ধরা পড়ে। পশ্চিমবঙ্গের জলপাইগড়ি শহরকে বলতে শুনেছি 'বাঙালি শহর'। এখানকার জনসমাজের পরতে পরতে যে খাঁটি বাঙালিতু, বাঙালির ভাবধারা ও কালচার আঁট ও অঙ্কুণ, তার থথর্থতা সহজেই ঝুঁঝিয়ে দেয়। বিরাট এক দেশ এই ভারত। সরকারি চাকরি নিয়ে বাঙালিরা ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়েন। সবখানে তারা পরিবার নিতে পারেন না। আবার নিতে পারলেও অবাঙালি পরিবেশে তাদের ছেলেমেয়েদের পড়াশোনা এবং মানুষ করার অসুবিধা দেখা দেয়। তাই অধিকাংশ প্রবাসী চাকরিজীবীস্তাদের পরিবার-পরিজন রেখে যান জলপাইগড়ি শহরে। তাদের ছেলেমেয়েরা তাই অনেকটা স্বাধীনতা ভোগ করে। বিকেলে শহরের রাস্তায় ছেলেদের পাশাপাশি নানা বয়সী মেয়েদের এমন খোলামেলাভাবে নেমে আসার ঢল দেখে একটা সহজ সুন্দর এবং পরিষ্কৃত স্বাঙালি সমাজব্যবস্থার কথা শুরণ করিয়ে দেয়। এদের সামাজিক রীতিনীতি অনেক উন্নতির এবং মেয়েরা অনেক স্বাধীন। আমাদের দেশের সমাজব্যবস্থা এতোটা উদার নন্দন মেয়েরা ও তেমন স্বাধীনতা ভোগ করতে পারে না।

শহর ঘোরা হয়। মূল লক্ষ্য ছিলুকি কিছু বই কিনবো। মজিব আর খালেককে সঙ্গে নিয়ে বইয়ের দোকান খোজ করে ভিত্তিনাম যুদ্ধের ওপর ক'টা বই এবং 'আমি সুভাষ বলছি' দু'ভল্যম কিনে ফেলি। দীর্ঘমের্যাদি যুদ্ধের প্রস্তুতি হিসেবে এ ধরনের বই সহজের তাগিদ অনুভব করছি বেশ কিছুদিন থেকে। মজিব প্রতাব দেয়, চলেন একটা ছবি তুলি, কে জানে কখন কোথায় কে থাকবো। জলপাইগড়ির একটা স্থৃতি ধরে রাখি। খালেক আগস্তি করে না। তিনজনে মিলে রাস্তার পার্শ্ববর্তী একটা স্টুডিওতে চুকে পড়ি। স্টুডিওটির মালিক ও কর্মচারী অন্দরোক ফ্লাঙলাইটের উদ্ভাসিত আলোতে ক্লিক শব্দে আমাদের ছবি তোলেন। এক ঐতিহাসিক সময়ের প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে যাওয়া আমাদের তিনজনের অবসর মুহূর্তের ছবি।

স্টুডিওর কাজ শেষ হয়ে গেলে, 'হাতি মেরা সাথী' চলছে যে সিনেমা হলে, তার পার্শ্ববর্তী রেন্টরাতে গিয়ে বসি তিনজনে। উদ্দেশ্য সময় পার করা এবং চা-নাস্তা খাওয়া। রেন্টরাতে টেবিলে নতুন কেনা বইগুলো রেখে একটা বইয়ের পাতা উল্টাতে থাকি। চায়ের অপেক্ষা করি। এই সময় ফতুয়া গায়ে পরনে ধূতি শুকনো পাতলা মতো গড়নের একজন গুটিগুটি এগিয়ে এসে আমাদের টেবিলে বসেন। আমার বইগুলোর দিকে তাকিয়ে বলেন, দেখবো একটু বইগুলো! মাথা নেড়ে সায় দিলে ভদ্রলোক সাগ্রহে টেনে নেন বইগুলো। কিছুক্ষণ উল্টেপাল্টে দেখেন, তারপর চকচকে চোখে তাকিয়ে বলেন, এ ধরনের বই দরকার! আমরা তাকাই তার মুখের দিকে। তিনি বলেন, আমার নিজের লাইব্রেরিতে এ

ধরনের বেশ কিছু বইয়ের কালেকশন আছে। ইচ্ছে করলে পড়তে পারেন। কিন্তু নিয়ে
যেতে পারবেন না। কথাগুলো একদমে শেষ করেই ভদ্রলোক একটা প্রাণখোলা হাসি
হাসেন। দাদুর মতো চেহারার এই ভদ্রলোককে সত্তিই ভালো লেগে যায় বিশেষ করে তাঁর
আলাপ-আলোচনার ধরন আর দিলখোলা হাসির উচ্ছ্বাসে। তিনি বলেন, মুভিফৌজ তো!

বলি, কীভাবে বুঝলেন?

— বুঝতে পারি। বয়স তো আর কম হলো না। তো, ইয়াম্যান হবেতো জয় বাংলা? করতে পারবেন তোঁ তাঁর কথার জবাবে বলি, কী মনে হয় আপনার, পারবো নাঃ ভদ্রলোক তখন তেমনি প্রাণখোলা হাসি আর ভরাট গলায় বলেন, পারতেই হবে। তা না হলে বাংলাদেশের অস্তিত্বই তো থাকবে না। এমনিতেই তো এপারের বাঞ্জলিরা আমরা শেষ হয়ে
যেতে বসেছি। এখন শুধু বিশ্বাস আর দৃঢ় আশা নিয়ে তাকিয়ে আছি জয় বাংলা সৃষ্টির
দিকে। কথা বলতে বলতেই তিনি আমাদের সঙ্গে চা খান, কিন্তু আমরা পয়সা দিতে গেলে
বাধা দেন। সেটা তিনি নিজেই দেন। বলেন, আমার বাসায় আসবেন। ভালো লাগবে
আমার লাইব্রেরি দেখে। যে কোনেদিন, যখন সময় পাবেন।

ভদ্রলোক নিজের নাম বলেন। কোন রাস্তার পাশের তার বাড়ি, বারবার করে সেটা চিনিয়ে
দেয়ার চেষ্টা করেন। আবার দেখা হবে বলে চলে যাবার জন্য উদ্যত হলে, চঠ করে জিগ্যেস
করি, কোন পার্টি করেনঁ ভদ্রলোক হেসে গলা নাহিয়ে অনেকটা ফিসফিসিয়ে বলেন সিপিএম।
ভদ্রলোক চলে গেলে বেশ কিছুক্ষণ তার উপস্থিতি এবং জীবন্তার্থের প্রভাব মনের ওপর ছায়া
বিস্তার করে থাকে। মনে মনে সিদ্ধান্ত নিই, সময় পেলে একদিন অবশ্যই যাবো তাঁর বাসায়।

অমরবানায় চানমারী

একদল বিএসএফ এসেছে চাউলহাটিজুচ্ছচানমারীর উদ্দেশে। দলটি বাগড়োগরায় টেনিং
নিয়েছে। সেখানে তাদের টেনিং শিয়াছে আর্টিলারি মৰ্টারের ব্যবহারের ওপর। টেনিংয়ের
শেষপর্ব হচ্ছে ফায়ারিং প্রাক্টিস, যাকে যুদ্ধের ভাষায় বলা হয় চানমারী। প্রতিটি ফোর্সের
জন্যই এটি বাধ্যতামূলক। টেনিং সেটারে চানমারীর জন্য ফায়ারিং গ্রাউন্ড থাকে এবং তা রক্ষা
করা হয় বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থার ভেতর দিয়ে। সাধারণ মানুষ কিংবা প্রাণী বা জীবজন্তুর
যাতে কোনোরকম ক্ষতিসাধিত না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রেখেই টেনিং একাডেমি কর্তৃপক্ষ
অত্যন্ত সতর্ক, সেই সাথে সব ধরনের সাবধানতা অবলম্বন করে থাকেন। রাইফেল,
মেশিনগান ইত্যাদি ধরনের অন্তর্ভুক্ত জন্য ফায়ারিং প্রাক্টিস মোটাযুটি স্বল্প পরিসর জায়গাতেই
করা যায়; কিন্তু আর্টিলারি মৰ্টার জাতীয় দূরপাল্লার অন্তর্ভুক্ত জন্য ফায়ারিং গ্রাউন্ডের বিস্তার হতে
হয় অনেক বড়। আর্টিলারি টেনিং স্কুলে এ ধরনের ব্যবস্থা থাকে। সুবিধেমতো জায়গায়
আর্টিলারি ফায়ারিং গ্রাউন্ড তৈরি করে সেখানে হাতে-কলমে প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীকে আর্টিলারি
ফায়ারিং বা কামানের গোলা নিক্ষেপের মাধ্যমে লক্ষ্যবস্তুর ওপর আঘাত হানার টেনিং নিতে
হয়। ভারতীয় কর্তৃপক্ষ তাদের বি.এস.এফ.কে আর্টিলারি মৰ্টার চালানোর টেনিং দিয়ে ভারি
অন্ত পরিচালনায় পারদর্শী করে তুলছে। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সাথে সজ্জব্য সর্বাঙ্গীণ যুদ্ধে
জড়িয়ে পড়বার প্রস্তুতি হিসেবে ভারতীয় কর্তৃপক্ষ তাদের আধা সামরিক ফোর্স বি.এস.এফ.
অর্ধাং বর্জার সিকিউরিটি ফোর্সকে তৈরি করছে নিয়মিত সেনাবাহিনীর মতো যুদ্ধ করবার
পারদর্শিতা নিয়ে। শিলিঙ্গড়ির কাছে বাগড়োগড়ায় তাদের টেনিংশেষে বি.এস.এফ. দলটি

এসেছে চানমারীর জন্য এই চাউলহাটিতে। টার্গেট হচ্ছে অবরুদ্ধানা-জগদলহাট-পঞ্চগড়ের পাকবাহিনীর অবস্থান। তাদের সিঙ্গান্টটা মন্দ নয়। চানমারীর জন্য ভালো জায়গাই বেছে নিয়েছে তারা। এমনিতেই শত শত রাউণ্ড শেল খরচ করতে হবে তাদের চানমারী প্রাকটিসের জন্য। সেটা অন্য কোনো হাউন্ডে খরচ করলে বস্তুতপক্ষে কোনো কাজে আসবে না। তার চাইতে পাকবাহিনীর অবস্থান লক্ষ্য করে সেগুলো ছুঁড়লে একদিকে যেমন প্রাকটিসের কাজ হলো, অন্যদিকে তেমনি শক্রবাহিনীর ঘাঁটি তচনছ করে দেবারও ব্যবস্থা হলো।

মোসারদ পাগলা প্রথম নিয়ে আসে খবরটা। বলে, বাহে অনেকগুলান কামান নিয়া ওম্বো ক্যানে বা আসিল মোর মনোত যানি ক্যামন নাগ্নভিছে। লধা হিলহিলে গড়নের নাশেমূরীর ছেলে মোসারদ তাঁরুর ভেতর মাথাটা বকের মতো ঢুকিয়ে আনন্দিত কঠে কথাগুলো বলে। বোকা কিসিমের সাদাসিংহে ছেলে মোসারদ। চরিত্রে ওর কিছুটা ক্ষ্যাপাটে ভাবসাব রয়েছে। ঠাস্টাস্ত করে কথা বলে সে এবং যা বলে, সেটা ওর বুধামতো ন্যায্য এবং সঠিক কথাই। ক্ষ্যাপাটে ভাব এবং কথাবার্তার ধরন-ধারণ দেখে কেউ একজন বলেছিলো ‘পাগল’। আর সেই থেকে ওর নাম হয়ে গেছে ‘মোসারদ পাগলা’। ওর নামের সাথে এই অলঙ্করণ যুক্ত হওয়ায় কোনো ধরনের ওজর আপত্তি তোলে নি ও। বৰঞ্চ খুশিই হয়েছে বলা যায়। ওর কথাবার্তা আর আচার-আচরণের সাথে মোসারদ পাগলা নামটা চমৎকারভাবে ঝাপ খেয়ে গেছে।

ওকে জিগ্যেস করি, কতগুলো কামানবে? সামান্যক্ষণ তথ্য বক্ষ রেখে ভেবে নেয় ও। তারপর বলে, অনেকগুলান। দুই কুড়ি, তিন কুড়িতো হাইবেই। তার মানে ৪০ থেকে ৬০টা।

— মানুষ কতগুলারে পাগলা? আবার জিগ্যেস করি। চোখ বক্ষ করে বিড়বিড় করে হিসেব করে উভর দেয় মোসারদ, তায় তিন মাটির শও হইবে।

— তুই দেখলি কীভাবে?

— মুই তো বক্রির পাল ধৰি তেক্কেন্তু রাস্তার ধারোত্ ঘাস খিলাবার জইন্যে, তখন দেইখনু ওমরা আইসোছে আর নাহৈক্কেছ। একটা বড় শুক্র বুবিল নাগিবে বাহে!

হঠাৎ করেই চিন্তিত হয়ে পঞ্জে মোসারদ। তারপর বলে, মুই যা-ও বকরিগুলান একলায় আছে, ইতিউভি ফির চলি যাইবে।

মোসারদ চলে যায় ওর বকরির পালের দিকে। ওকে দেখে রাউফের কথা মনে পড়ে যায়। সারা দিন গাধাটা নিয়ে থাকতো সে আর সেজন্য ওর নাম হয়েছিলো গাধা কমান্ডার। হাইড আউটে যাবার আগে রাউফের সাংঘাতিক দৃশ্যস্তা ছিল, সে গেলে তার গাধাটার কী হাল হবে! কে দেখবে, খাওয়াবে কিংবা যত্ন নেবে অবোধ পন্টার? তখনকার বক্রি কমান্ডার আইযুবও গাইগুই করছিলো ফ্রন্টে যাবার হাত থেকে বাদ পড়বার জন্য। কিন্তু তারা দু'জনই এখন নালাগঞ্জ ফ্রন্টে যুদ্ধ করছে।

একপাল বকরির জন্য দু'তিনজন ছেলেকে সর্বদাই নিয়োজিত থাকতে হয়। মোসারদসহ আরো দু'জন এ কাজটা দেখছে, সেই সাথে লঙ্ঘরুদ্ধানার ফাইফরমাশ খাটছে। রাউফ যাবার পর গাধাটার যত্ন নিতে নিবেদিত্ত্বাণ আর কেউ এগিয়ে আসে নি। নিরীহ পন্টাও হয়তো এ কথাটা বুঝে গেছে যে, তাকে আর কেউ তেমনভাবে দেখাশোনা করবে না। আদুর-যত্ন করবে না। এখন সে একাকী পুরুর পাড়ে ঘাস খায় আর আপন মনে চড়ে বেড়ায়। অন্য কোথাও বিশেষ যায় না। চাউলহাটি ক্যাম্পটা এখন তার নিজের আশ্রয়স্থল এটা সে তার স্বাভাবিক চেতনাবোধ থেকে বুঝে নিয়েছে। এটাই তার থাকবার জায়গা। এখানকার

মানুষগুলোই তার আপনজন। সম্ভবত এ বুরু থেকেই নিঃসঙ্গ পশ্চিমা দিনের বেলায় ছেড়ে দেয়া অবস্থায় পুরুরের চারদিকে ঘুরে বেড়ায়। সক্ষের দিকে তাঁবুগুলোর পাশে চলে আসে আপনাআপানি। যুদ্ধের প্রথমদিকে ভেতরগড় থেকে গাধাটা ধরে আনা হয়েছিলো একটা অপারেশন করতে গিয়ে। সেই থেকে পশ্চিমা বলতে গেলে থেকেই গেলো স্থায়ীভাবে এই ক্যাম্পে। সাদা ধূধৰে পশ্চিমা যেনো এখন ক্যাম্পেরই একজন স্থায়ী সদস্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। নিজের খেয়ালসৃষ্টি আর স্থায়ী মতিগতি নিয়েই পশ্চিমা অন্তুভাবে নিজেকে মানিয়ে নিয়েছে এই ক্যাম্পজীবনের সঙ্গে। কোনোদিন চাউলহাটির এই ক্যাম্প গুটিয়ে নিতে হলে সমস্যা হবে ওটাকে নিয়ে। একটা ভালো আশ্রয়স্থল খুঁজে নিতে হবে ওর জন্য তখন।

ক্যাম্পেন নদী তাঁর গাড়ি নিয়ে বের হয়েছেন হাইড আউটে থাকা কোয়াডগুলোর রুটিন খোঝখবর নিতে। বেলা এগারোটার দিকে বকর, মতিয়ার ও বাবলুসহ ৪/৫ জনের দল নিয়ে অলস মছুর পায়ে এগিয়ে যাই চাউলহাটি রাস্তার মোড়ের দোকানগুলোর দিকে। চায়ের দোকানে কিছুক্ষণ আড়া মারা যাবে আর সেই সাথে খোঝখবর নেয়া যাবে মোসারদ পাগলার সেই দুই কুড়ি তিন কুড়ি কামান বাহিনীর উদ্দেশ্য আর লক্ষ্য ইত্যাদি সম্পর্কেও। চায়ের স্টলে দেখা হয়ে যায় বি.এস.এফ. ক্যাম্পের সুবেদারের সাথে। পরনে তাঁর খাকি হাফ প্যান্ট, গায়ে সাদা গেঞ্জি।

— ক্যায়সা হ্যায় ইয়ার লোগ বলে তিনি বেশ খোশভুজে আমাদের স্বাগত জানান। বাবলু চা আর ঝুরি-বুদ্ধিয়ার অর্ডার দেয়। কাঠের বেশিক্ষণ উপর বসে সুবেদারের সাথে জমে গঠে কিছুক্ষণের মধ্যেই আলাপচারিতা। তার কাজ থেকেই জানা যায় কামান বাহিনীর আসল ইতিবৃত্ত।

বি.এস.এফ. দলকে সম্মুখ্যকের জন্য ভালুর অন্তর্শক্তে সজ্জিত করা হচ্ছে। আর তারই অংশ হিসেবে একটা বি.এস.এফ. দল প্রিসেডাগড়ায় আর্টিলারি ট্রেনিং শেষ করে চানমারীর জন্য এসেছে এখানে। তারা চানমারী করবে অমরখানার ওপর। শত শত শেল হেঁড়া হবে শালে লোগকো শির পার, আর্টিলেল দেখেগা। শালে লোগকো কেয়ামত হো যায়গা....।

চা-ঝুরি-বুদ্ধিয়ার সাথে সুবেদার ওস্তাদের গলাবাজি দারুণ জমে উঠেছে। এমন সময় পায়ের নিচের মাটি কাঁপিয়ে পেছন থেকে দুয়-দুয়-দুয় শব্দে একসাথে অনেকগুলো আর্টিলারি গর্জে গঠে। ঘটনার আকস্মিকতায় সবাইকে চমকে উঠতে হয়। সুবেদার মুঢ়কি হেসে বলেন, শুরু হো গেয়া, আভি দেখো কেয়া হোতা হ্যায়। প্রায় ৩০ সেকেন্ডের মধ্যে অমরখানার দিক থেকে ভেসে আসে গুড়ুম গুড়ুম শব্দের প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ধ্বনি। পেছন থেকে দুয় দুয় শব্দে আবার উড়ে যায় আর্টিলারি শেল অনেকটা ত্রাশফায়ারের কায়দায়। বিস্ফোরণের ধ্বনি ভেসে আসে আগের মতোই। সুবেদার বলেন, এই কারবার আজ সারাদিন ধরে চলবে, রাতেও চলবে। মোট চার দিনের প্রোগ্রাম। এরা গেলে আর একটা দল আসবে। তারপর আরো একটা দল। মোট কথা পাকবাহিনী যতোদিন থাকবে, আমাদের চানমারী ও ততোদিন চলবে। কী বলো তোমরা চানমারীর জায়গাটা ভালো হয় নি? সুবেদার তার পেটমোটা ঝুঁড়িতে হাত বোলাতে বোলাতে সরল হাসি হাসেন। আমরা সায় দিই তার কথায়। বলি, ভালো মানে, বহুত ভালো। এবার শালার ইন্দুরের মতো লুকিয়ে থাকবে গর্তের ভেতরে।

সুবেদারকে বলি, ওস্তাদ চালিয়ে না, উহ লোগ ক্যায়সে আর্টিলারি চালাতে হ্যায়, হামলোগ দেখেগা। সান্দে সায় দেন সুবেদার। বলেন, আপলোগ দেখেগা! কোই বাত

নেছি। আইয়ে মেরা সাথি। অতঃপর চায়ের দোকান থেকে বের হয়ে সুবেদারের পিছু পিছু গিয়ে পৌছাই আর্টিলারি সারির কাছে।

কমান্ডার জিগ্যেস করেন, ইয়াংম্যান ডু ইউ লাইক টু অবজারভ আওয়ার অ্যাকশন! বিনীতভাবে বলি, ইয়েস স্যার।

লে. কর্নেল ভদ্রলোক নিজে আমাদের নিয়ে যান আর্টিলারি সারির মাঝখানে। সারিবন্ধভাবে প্রায় ২০/৩০ গজ অন্তর অন্তর বসানো হয়েছে আর্টিলারিশগলো। দু'সারিতে আগপিছু করে। সামনের সাথে পেছনের সারির ব্যবধান প্রায় ৫০ গজের মতো। প্রতিটি আর্টিলারির মাঝার ওপর সবুজ জঙ্গলে রঙের দড়ির জালের ছাউনি। মাটি কিছুটা গর্ত করে আর্টিলারিশগলো সেট করা হয়েছে। নলগুলো জালের বাইরে উচু করে অমরখানার দিকে তাক করে রাখা। প্রতিটি আর্টিলারির পাশে শেলের বাকসোও জড়ো করে রাখা আর পেছনে সার হয়ে বসে আছে অপেক্ষমাণ জোয়ানের দল। একদলের শেল ছোঁড়ার প্রাকটিস শেষ হবে, আর একদল গিয়ে তাদের জায়গা দখল করবে। ইন্স্ট্রাকটর টার্ণেটের দূরত্ব বলবে। কমান্ডার নির্দেশ দেবে। দু'জন আয়সেল ঠিক করবে। দু'জন শেল খুলবে, দু'জন শেল ভরবে আর একজন লিভার টিপবে। সবাই কান হাতচাপা দিয়ে বসে পড়বে। আগন্তনের ঘলকানি তুলে পোড়া বাকুদের গঞ্চ ছড়িয়ে বেরিয়ে যাবে শেল সোজা টার্ণেটের দিকে।

ফটফট শব্দ তুলে আকাশে উড়ছে একটা হেলিকপ্টা~~র~~ অবজারভেশনের দায়িত্ব পালন করছে ওতেই বসে থাকা অফিসার। আর্টিলারি শেলগুলো কোন্ জায়গায় বিস্ফেরিত হচ্ছে সেটা দেখে নিয়ে নিচের কমান্ড পোস্টে সঠিক নিশ্চে~~প~~ পাঠানো হচ্ছে। আর সে অনুসারেই আয়সেল ঠিক করে নিয়ে শেল ছোঁড়া হচ্ছে। পোড়া বাকুদের গঞ্চে জায়গাটাৰ বাতাস ভারি হয়ে উঠেছে। শুনিকে আকাশে প্রচণ্ড সৃষ্টি হচ্ছে। কড়া রোদের ভেতরে ইউনিফরম পরিহিত কামান চালনা প্রশিক্ষণার্থী বাহিনীৰ শক্তিশালী ঘেঁষে-নেয়ে একেবারে একাকার। আকাশে হেলিকপ্টাৰটা ঘূরে ঘূরে উড়ছে তুলখনো এক জায়গায় থিৰ দাঁড়িয়ে থাকছে। আর বিৱামবিহীন গৰ্জে উঠছে~~আর্টিলারি~~। সমৃথবৰ্তী অমরখানার দিক থেকে ভেসে আসছে বিস্ফেরণের তুলকালাম গৰ্জন। যুদ্ধ শুরু হবার পর থেকে এ ধৰনেৰ বিৱামবিহীন শেলিং-এৰ মোকাবিলা কৰতে হয় নি পাকবাহিনীকে। এদেৱ চানমারীৰ প্রস্তুতি দেখে মনে হয়, তাৰা পাকবাহিনীৰ ঘাঁটি গেড়ে থাকা অবস্থানেৰ প্রতি বৰ্গ ইঞ্জিনে এ ধৰনেৰ শেলিং চালিয়ে তাদেৱ সবকিছু গুঁড়িয়ে দেবে। অমরখানা থেকে পাকবাহিনীকে দ্রুত বিতাড়ন কৰা দৰকাৰ। ট্রাইজিক এই পয়েন্ট থেকে তাদেৱ হটাতে পাৱলে অনেক সুযোগ-সুবিধা হাতে আসবে আমাদেৱ। কমান্ডার বলেন, ইয়াংম্যান ক্যায়সা লাগা? ডু ইউ অ্যাপৱিসিয়েট আওয়াৰ অ্যাকশন! তাকে সম্মান দেখিয়ে আ্যাটেনশন হয়ে বলি, ইয়েস স্যার!

এৱপৰ তাৰ কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ফিরে চলি আমাদেৱ পুকুৰ পাড়েৱ ক্যাম্পেৰ দিকে। আকাশে হেলিকপ্টাৰটা উড়ছে ঘূৱেফিরে তখনো। আৱ পেছন থেকে গৰ্জে গৰ্জে উঠছে আর্টিলারিৰ সারি। কে জানে, শক্তিবাহিনী কীভাবে মোকাবিলা কৰছে এ ধৰনেৰ শত শত বিস্ফেরণেৰ অগ্নিবাণী তবে এ ব্যাপারটা থেকে একটা সবুজ সঙ্কেত পাওয়া যায়। মনে হয়, পাকবাহিনীৰ মতো শক্তিশালকে হটাতে হলে এ ধৰনেৰ শক্ত আঘাতই তো দৰকাৰ। এভাবে ধাৰাবাহিক আঘাত হানা হলেই ক্রমশ তাৰা দুৰ্বল হয়ে পড়তে বাধ্য।

অফিসার ইনচার্জ ক্যাপ্টেন নন্দা

পুরুরের টলটলে কালো পানি। তাতে বাঁক বাঁধা মাছের দঙ্গলের হটোগুটি। ধারে বসলেই চোখে পড়ে পানির তল দিয়ে ওদের কানকো আর ফিচে নাচিয়ে উচ্চল সাঁতের চলার চোখ-কাড়া দৃশ্য। ক্যাম্পের উচ্চিট খেয়ে খেয়ে পুরুরটাতে মাছের সংখ্যাও বেড়ে গেছে অনেক। তাদের ধরাহোয়া কিংবা মারা হবে না এটা যেনো তারা জেনে গেছে। আর তাই নিশ্চিন্ত নির্ভর তাদের মতিগতি, এমনকি সেই ভরসায় তারা পুরুরের ধার পর্যন্ত চলে আসে। ছেট ছেট ভাসমান মাছের পাশাপাশি জিওল মাছের সংখ্যাই বেশি। কিছু বড় বড় মাছ যেমন, কুই-কাতলা-বোয়াল এগলোও ধীরহিঁরভাবে পুরুরঘাটে চলে আসে। বেশ রাশভারি গোছের তাদের চলাফেরা। মাঝে মাঝে পানির ওপর মুখ ভাসিয়ে যেনো তাদের অবস্থান জানিয়ে দেয় এবং পুরুরপাড়ের তাঁবুগুলো দেখে নেয় সবকিছু ঠিকঠাক মতো আছে কি না। বলতে গেলে একেবারে পোষা প্রাণীর মতোই এই পুরুরের মৎস্যকূলের আচরণ। প্রবাদপ্রতিম মাছে-ভাতে বাঁচার জন্য বাঙালিদের স্বাধীনতা সংগ্রাম চলছে। ক্যাম্পের তাঁবুর ধার যেমনে টলটলে কালো পানিতে সাঁতারু মৎস্যকূলও যেনো তাদের আচরণ দিয়ে এটা বুঝিয়ে দিতে চায়, তোমরা যুদ্ধ করো, জয় বাংলার সংগ্রামে আমরাও আছি তোমাদের সাথে। পুরুরের মাঝে লাল পদ্মের মেলা, সাদা গাধাটা অপর পাড়ে নিবিট মনে ঘাস খেয়ে চলছে।

পুরুরের উচু পাড়ে বিচরণত গাধাটাকে অত্যন্ত একক্ষে~~ব্রহ্ম~~ নিঃসঙ্গ মনে হয়। তাঁবুর ভেতর থেকে টলটলে পুরুরের পানি। লাল পদ্মের দল আর উচু অপর পাড়ে গাধাটার নিঃসঙ্গ বিচরণ যেনো একটা অস্তুত স্থ্রিচিত্রের অবতারণা হয়েছে। তাঁবুর বাঁদিক দিয়ে তাকালেই চোখে পড়ে কালো হিমালয়ের বিশাল মহিমান্তরুণপ। ডানদিকে তাকালে নজরে আসে একাকী নিঃসঙ্গ গাধাটার অলস বিচরণ-দশ পুরুরের মাঝখানে ফুটে থাকা লাল পদ্মের দল। সব মিলিয়ে সমস্ত পরিবেশটার মধ্যে ক্ষেত্র যেনো একটা বৈপরীত্যের ভাব। একটা নাম-না-জানা অনুভূতি সমস্ত মনটাকে বিস্ময় করে তোলে। এর ভেতরেই দুড়ুম দুড়ুম চলতে থাকে কামানের একঘেয়ে গোলাবর্ষণ ফিল্টেক্সেরণের পর বিস্কেরণ বড় বেশি করে মনে করিয়ে দেয় আমরা যুদ্ধের মধ্যে বাস করছি। আমাদের চারপাশের প্রকৃতি, পরিবেশ, গাছপালা, পাহাড়-পর্বত, মানুষসহ যাবতীয় প্রাণী সবাই, সবকিছুই যেনো এই যুদ্ধের সাথে জড়িয়ে গেছে।

নন্দার ব্যাটম্যানের কাছ থেকে ক'টা ইংরেজি ম্যাগাজিন চেয়ে এনেছিলাম। পড়ুয়া মানুষ নন্দা। অবসরে পড়াশোনা করা ছাড়া তার আর কোনো নেশা নেই। না খেলেন তিনি তাস, না খান নিয়মিত মদ। নন্দার পড়াশোনার দিকে এই ঝৌকটা ঝুবই চোখে পড়বার মতো। আর্মি অফিসারদের জীবনযাপনের ধরনটা সিভিল লোকদের চেয়ে আলাদা। নিজেদের গগ্নির ভেতরকার তাদের উদ্দাম জীবনযাপন নিয়ে অনেক গল্প শোনা যায়। বিশেষ করে বর্তমান অধিকৃত বাংলাদেশের পাক আর্মি অফিসারদের যে উচ্চজ্বল আর বেপরোয়া জীবনযাপন, মদ আর সহজে পাওয়া যায় এমন নারীদের নিয়ে তাদের যে নিষ্ঠুর লাম্পট্য আর অত্যাচারের কাহিনী শোনা যাচ্ছে, তাতে নন্দার জীবনযাপনের সাথে এক বিরাট ব্যবধান ও বৈসাদৃশ্যের ছবি ফুটে ওঠে। নন্দা অনেক ভদ্র, পরিমার্জিত আর ব্যালান্সড়। একজন আদর্শ সৈনিকের জীবনযাপনের রীতিমার্ফিক তিনি নিজেকে গড়ে তুলছেন। তাঁর এই হিসেবি জীবনযাপনের রীতি, পড়াশোনা আর আন্তরিকতার সঙ্গে ওয়ার স্ট্র্যাটেজি নিয়ে ডুবে থাকবার প্রবণতা দেখে ভবিষ্যতে তার মধ্যে একজন বড় সেনানায়ক হবার শুণের ইঙ্গিত পাওয়া

যায়। মনে হয়, নদ্দা হয়তো একদিন ভারতীয় সেনাবাহিনীর মধ্যে নিজেকে উচ্চ আসনে আসীন করতে পারবেন। কিন্তু সবকিছুই নির্ভর করছে বর্তমান যুক্তির ওপর। যুক্তির মাঠের তো কোনো বিষ্ণুস নেই। এখানে জীবন বড়ই অনিশ্চিত। এই যুক্তি কাকে যে কোথায় নিয়ে যাবে, কে সেটা জানে? এই যুক্তিশেষে নদ্দা কী করবেন? আমরা? একমাত্র ভবিষ্যতের মধ্যেই নিহিত রয়েছে এর জবাব।

তো, নদ্দা বিকেলে হাজির হয়ে যান আমাদের তাঁবুতে। এসেই বলেন, কেয়া মেহবুব তুমনে মেরা ম্যাগজিন লায়া হ্যায়?

শ্রীরের প্রচও আলসেমি নিয়ে শয়ে ছিলাম। নদ্দা তাঁবুর ভেতর চুক্তেই শশব্যস্ত হয়ে উঠতে হয়। বলি, আইয়ে স্যার, বইঠিয়ে। আই আম সরি ফর ব্রিং প্রিং ইয়োর ম্যাগজিন।

— মেভার মাইক বলে নদ্দা তাঁবুর ঘেঁষের বিছানায় বসে পড়েন। বড় ভাই নদ্দাকে দেখামাত্র ছুটোছুটি শুরু করে দিয়েছেন তাঁর সহজাত অভ্যেসের বশে। সম্ভবত কিছু একটা দিয়ে তাকে আপ্যায়নের রসদ যোগাড়য়স্ত করার উদ্দেশ্যে। নদ্দা বলেন, এই তাঁবুর জীবন কেফন লাগছে? ফিলিং বোঝঃ হাইড আউটেই ভালো ছিলে তাই না?

— মাঝে মাঝে বোর লাগে না যে তা নয়, তবে ধীরে ধীরে এই জীবনে অভ্যস্ত হয়ে উঠছি। কিন্তু কী আর করা যাবে বলেন? নদ্দার কথার জবাব দিতেই প্রায় আমার কথার পিট্টেই তিনি অনেকটা উদাসভাবে বলেন, কী এক দৃঢ়সময় তোমাকে জন্ম দেবে জন্ম দেবে জন্ম দেবে। বাড়ির ছেড়ে, স্কুল-কলেজ, ইউনিভার্সিটি ছেড়ে তোমরা এখন সৈনিকের জীবনযাপন করছো। আমরা তো বৱন্ন সোলজার। ট্রেনিং ক্যাম্প, তাঁবু, ট্রেক্স, বাস্কার, যুক্তি—এই সব নিয়েই তো আমাদের জীবন। কিন্তু তোমাদের তো তা নয়। নেহায়েত বাধ্য হয়েছে তোমরা হাতে তুলে নিয়েছো হাতিয়ার। কোথায় তোমাদের বাড়িয়র, নিশ্চিত জীবনযাপন আর কোথায় এই ফ্রন্টে তাঁবুর জীবন। তবে একটা লাভ হয়েছে আর সেটা তোমাদের সাথে পরিচিত হওয়ার সুবাদেই। এই যুক্তি না লাগলে তোমাদের সাথে পরিচিত হওয়ার প্রক্রিয়াদের সংস্কৃতি আর জীবনযাপন ধারার সাথে পরিচিত হওয়ার কোনো সুযোগই হতে নাব। বাংলাদেশটাকে ভালোভাবে জানবার সুযোগও পাওয়া গোলো এর ভেতর দিয়ে। কে জানে একদিন হয়তো জয় বাংলা হলে আমরা তোমাদের রাজধানী ঢাকা দেখতে পারবো। তোমাদের বাড়িয়র ও হয়তো দেখে আসতে পারবো।

নদ্দা যেনো অনেকটা আপন মনেই একটানা বলে চলেন। এক সময় আপন মনেই থামেন। পেছন থেকে গুড়ম গুড়ম সক্রিয় কামানের বিক্ষেপণ হয়তো তাকেও আলোড়িত করে। কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে তিনি মৃদু হেসে বলেন, জেন্টেলম্যান, দিস ইজ ওয়ার আ্যান্ট ভাই আর অ্যাট ওয়ার।

বড় ভাই নুরুল হক ইতিমধ্যে চা-নাস্তা নিয়ে আসেন। তার পেছন পেছন দুটো ছেলে আসে। তাদের হাতে হাতেই ধৰা চা-নাস্তার প্রেট ইত্যাদি। এনেই সেটা পরিবেশন করেন বড় ভাই। নিজেও বসেন নদ্দার পাশে। নদ্দা পরিবেশিত চায়ের কাপখানা হাতে নিয়ে পুরুরের দিকে দৃষ্টি দিয়ে বলেন, দেখো নুরুল হক, দেখো মাহবুব হাউ রেড লোটাস আর বুর্মিং রিয়েলি ইট ইজ বিউটিফুল। ইজ নট ইট!

তাঁর কথায় সায় দিই আমরা। নদ্দা উদাস করা গলায় আবার বলেন, জানো, আমি যখনই সময় পাই, তাঁবু থেকে এই পদ্মের সমাহারের দিকে তাকিয়ে থাকি। পেছনে যুক্ত আর মৃত্যু, সামনে লাল পদ্মের এই সজীব মনোহর রূপ। অদ্ভুত লাগে। খাপ খায় না একেবারে। একটা

নীর্ঘন্তা ছাড়েন নন্দা। তাঁর ভেতরের পরিবেশটা তখন যেনো গভীর হয়ে যায়। সবাই চূপচাপ বসে থাকে। সবারই দৃষ্টি পুরুরের বুক বরাবর। সেখানে লাল রঙের মেলা বসিয়েছে পদ্মের দল। কিছুক্ষণ পর নন্দা ওঠেন। যাবার আগে রাতের যুক্তের টাঙ্ক দিয়ে যান।

জরুরসেবকের নিমজ্ঞন

ক্যাপ্টেন নন্দার ড্রাইভার সেবক কালীপুজাৰ আয়োজন করেছে তার তাঁবুতে। সকালে এসে আমাদের নিমজ্ঞন করে গেছে। বারবার সে অনুরোধ করে গেছে তার নিমজ্ঞনে শরিক হওয়ার জন্য। বলেছে, ভাইয়া, ভূলান নেহি, জরুর আনে হোগা।

লখনৌর ছেলে সেবক। তালো নাম শুরু সেবক প্রসাদ গুণ্ঠা। আমরা প্রথম থেকেই তাকে সেবকজি বলে ডেকে এসেছি। ধীরস্তি, ঠাণ্ডা প্রকৃতির মানুষ সে। অত্যন্ত বিনয়ী আৱ হৃদয়বান মানুষ বলে সবারই বড়ো প্রিয় হয়ে উঠেছে। প্রচুর কষ্ট আৱ ঝামেলা পোহাতে হয় বেচারাকে। ক্যাপ্টেন নন্দার এক টনি আৰ্দ্ধ ভ্যান নিয়ে তাকে দৌড়তে হয় দিনবাত অবিশ্রান্ত। নন্দা ফ্রন্টে অবস্থানৰত কোয়াজগুলোৱ সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রেখে তাদেৱ দিয়ে গেৱিলা যুক্ত পরিচালনাৰ কাজে ব্যাপৃত রয়েছেন। কুটিনমাফিক রিপোর্টিংয়েৱ জন্য ধৰ্য কৰা দিনে তাঁকে যেতে হয় নির্দিষ্ট সীমান্তবৰ্তী বিওপগুলোয়। এছাড়াও অনিৰ্ধাৰিত ভিজিটে তাকে যেতে হয় তাদেৱ কাছে। ইউনিট বেসেৱ স্থানীক যুক্ত পরিচালনায় রিপোর্ট তৈরি কৰে সেটা তাকে দাখিল কৰতে হয় তার হেড স্টোৰারে। এছাড়া প্রায় প্রতিদিনই তাকে হাজিৱা দিতে হয় তার নিজস্ব গার্ড ৱেজিমেন্ট ইউনিটে। নন্দাৰ ব্যস্ততাৰ সাথে তাল মিলিয়ে গাড়ি চালাতে হয় গুৰু সেবককে স্টোৰে কৰে তাকে ঝামেলা পোহাতে হয় রিপোর্টিংয়েৱ দিনগুলোতে। সেদিন তাকে অস্ট্ৰেলোবাৰুদ আৱ রেশনসামৰ্থী মাঝ বক্ৰিৱ পাল তুলে নিতে হয় তার সেই এক ফটো ভ্যানেৱ পেছনে। হিসেব কৰে সেগুলো নামিয়ে দিতে হয় নির্দিষ্ট জায়গাগুলোতে এটো শুবই ঝামেলাৰহল কাজ। কিন্তু সেবক ঠাণ্ডা মাখাৱ লোক। হাসিমুখে সে এ কাজ অস্তিত্বে দায়িত্বেৱ সাথে সম্পৰ্ক কৰে থাকে। এছাড়া রাতেৱ বেলায় চাউলহাটি হেড কোয়াটাৰ থেকে ভেতৱে অনুপ্ৰবেশকাৰী দলকে পৰ্যন্ত বহন কৰে নিয়ে নামিয়ে দিয়ে আসতে হয় বিভিন্ন পয়েন্টে। সকালে আবাৰ তাদেৱ তুলে আনতে হয় সেখান থেকে। সবচেয়ে বড় গুণ তার যখুনি দেখা হয়, মমতা মাখানো গলায় খোজ নিয়ে বলবে, সব কুছ ঠিক হ্যায় জিঃ কোই ক্যাজুয়ালিটিজতো হ্যায় নেহি?

নৱৰ আচাৰণ এবং অমলিন হাসিমাখা মুখ আৱ শুবই অস্তৱক কথাৰ্বাৰ্তা ব্যবহাৱ দিয়ে সেবক সবাৱ কাছে শুবই আপন মানুষ হয়ে উঠেছে। মোসারদ পাগলাসহ বেশ ক'জনতো ঝীতিমতো তার বন্ধুজনই হয়ে উঠেছে। অবসৱে আড়া বসে তাদেৱ শুরু সেবকেৱ তাঁবুৱ সামনে। কথা বলা শুৰু কৱলেই সে বলবে, ম্যায় লখনৌ সে আয়া হ্যায়। তার প্রতিটো কথাৱ পেছনেই লখনৌ কথা আসবেই। লখনৌৰ কুৱোলি থামে তার বাড়ি। সেখানে তার বাৰ-মা আছে আৱ আছে বিবি-বাচ্চা। লখনৌৰ আকাশ-বাতাস, পাহাড়ি-প্রান্তৰ, তার বুকজোড়া ধামেৱ মানুষজন, তাদেৱ শিল্প-সংস্কৃতি আৱ সামাজিক প্ৰথা ইত্যাদিৰ কথা সে মোহচ্ছন্দেৱ মতো বলে হ্যায়। তার প্ৰতি কথায় লখনৌৰ উদ্ভৃতি এমনভাৱে প্ৰকাশ পায় যে, ব্যাপাৰস্যাপাৰ দেখে মনে হয়, সে নিজে যেনো তার লখনৌৰ জেলাৰ প্ৰতিনিধিত্ব কৰছে। তার কাছে লখনৌৰ কথা শুনলে মনে পড়ে যায় বাসিৱ রানী লক্ষ্মী বাইয়েৱ কথা। সেই সাথে চোখেৱ সামনে ভেসে ওঠে না-

দেখা কিন্তু অতিপরিচিত ইতিহাস প্রসিদ্ধ লখনো শহরের একটা চেহারা। ঘরে ঘরে সঙ্গীতের রাগ-রাগিণীর সুরের মূর্ছনা আর সেই সাথে বাইজিদের নৃপুর নিকটের উদামত।

তো, সেই লখনোর ছেলে শুরু সেবক প্রসাদ শুণ এখন চাউলহাটি ইউনিট বেসের মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডিং অফিসারের গাড়ির চালক। আচার-আচরণে আর ভদ্রতা-ন্যূনতার দিক থেকে লখনোর প্রতিনিধিত্ব সে সঠিকভাবে করলেও হায় কোথায় উক্ত প্রদেশের লখনো আর কোথায় বাংলাদেশের অবরুদ্ধান সীমান্ত। বাংলাদেশকে স্বাধীন আর হানাদার বাহিনীযুক্ত করার জন্য যুদ্ধ চলছে আর সেই যুদ্ধে কোথাকার লখনোর ছেলে সেবক নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছে নিবিড়ভাবে। এখন ওর কাছে জয় বাংলা বা স্বাধীন বাংলাদেশের আকাঙ্ক্ষা আমাদের কারো চাইতে কম নয়, যদিও ওর সাথে তার ব্যক্তিগত কোনো স্বার্থ জড়িত নেই। চলমান এই মুক্তিযুদ্ধের সাথে ভিন্নদেশী কতো অসংখ্য শুরু সেবকের মতো মানুষ যে নিজেদের বিশ্বস্তভাবে জড়িত করেছে, তার কোনো হিসেবে নেই। এদের অবদানের কথা কী করে ভোলা যায়? এদের অবদানের পুরস্কার দেবো আমরা কী দিয়ে? দেশ যেদিন স্বাধীন হবে, শুরু সেবকদের মতো আমাদের মুক্তিযুদ্ধের অক্ষতিম বন্ধু-সহযোগীদের কথা কি শুরণে আনবো আমরা? না, ভুলে যাবো? না ভুলে যাওয়া উচিত হবে?

শুরুসেবক তার তাঁবুর ভেতরে পুজোর আয়োজন করেছে। একটা বাঁধানো ছবির সামনে শুল পাতা আর ধূপগুলো ঝুলিয়ে সে যোটাযুটি একটা পুজো পরিবেশ রক্ষা করার চেষ্টা করেছে। সে আরো ও জনকে নিমজ্জন করে এনেছে তার ইউনিট থেকে। সম্ভবত তারা তার গৌণ-গ্রাম কিংবা এলাকার মানুষ। ফৌজি ছান্নায় যাকে বলে মূলকি। আমাদের পেয়ে শুরুসেবক ছেলে মানুষের মতো শুশি হয়ে আছে। যাকে বলে উচ্ছলে-ওঠা শুশি। কালীমাতা হচ্ছেন শক্তির দেবতা। তাঁর আরাধনার সময় তরল সুধাপানের ব্যাপারস্যাপারের চল রয়েছে। এটা অনেকটা পুজোর অসংস্কৃত পরিগণিত এদের কাছে। আর্মির রেশন থেকে পাওয়া ‘রাম প্রি এক্স্-এর নেটজার’ পর বোতল উজাড় করে চলেছে সেবক আর তার বন্ধুরা। সেবক তার বন্ধুদেরসাথে পরিচয় করিয়ে দেয় আমাদের। তারপর পুজোর আয়োজন দেখায়। আর বারবার মাফ চায় আর বলে, কুছ নেই কর সাকা। ইয়ে জন্ম ময়দান মে ক্যান্সে এন্টজাম করেগো? কাঁহাছে করেগো? ইয়ে তো লখনো নেই হ্যায়। যদি লখনো হতো, আমার কুরোলি ধামের বাড়ি হতো, দেখতে কি মহা ধূমধাম লাগাতাম এই পুজোয়। তোমরা আমার এই গরিব এন্টজাম বা আয়োজন দেখে কিছু মনে করো না।

সেবক এক সময় নদীর তাঁবুতে আমাদের নিয়ে আসে। তাঁবুর মাঝখানে একটা টেবিল পাতা। টেবিলের ওপর বিভিন্ন পদের ও ছাঁদের যিষ্ঠি, ফালি করে কাটা নারকেল আর একটা পুরো রামের বোতল। টেবিলের চারদিকে পাতা চেয়ারে আমরা বসে পড়ি। নদাসহ আমাদের প্রত্যেককে থেতে অনুরোধ করে সেবক। কিন্তু খাবার শুরু করতেই মহাবিপদের মধ্যে ফেলে দেয় সে। রাম এক্স্-এর বোতল ঝুলে প্রত্যেকের জন্য গ্লাসে ঢালতে থাকে। বড় ভাই নুরুল হকসহ আমরা ৪ জন এসেছি দাওয়াতে। নদাসহ ৫টি গ্লাসে রাম ঢেলে দিয়ে সে অনেকটা হাতজোড় করার ভঙ্গিতে বলতে থাকে, লিজিয়ে, কৃপা কিজিয়ে। তখন শুরু হয় আসল বিপদ। এর আগে আমরা কেউই মদ খাই নি। এ ব্যাপারে পুরো অনভিজ্ঞ আমরা। এছাড়া মদ পান করার ব্যাপারটা ভালো নয়, এ ধারণা থেকে মদ না খাবার ব্যাপারে যে পণ বা সংস্কার রয়েছে মনে, সেটা শুরু সেবকের নিমজ্জনে এসে যে এভাবে

ডেঙে ফেলার মতো অবস্থার মুখোমুখি হতে হবে, আগে থেকে ভাবতে পারি নি।

একটা নাঞ্জুক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় তাঁবুর ভেতর। শুরু সেবক মদ পান করার ব্যাপারে অবিরাম অনুরোধ-উপরোধ আর পীড়াগীড়ি করতে থাকে। ক্যাপ্টেন নন্দন অবস্থাও অস্বস্তিজনক। তিনি না পারছেন নিজে খেতে, না বলতে পারছেন আমাদের খাবার জন্য। আমি শুরু সেবককে বলি, দেখিয়ে সেবকজি, মদ হামলোক নেহি পিতা, হামলোক মুসলিম হ্যায়। হামরা ধর্মমে ইয়ে মানা হ্যায়। বড় ভাইও আমার দেখাদেখি বলতে থাকেন, হামলোক নেহি খায়েগা। হামরা ধর্ম চলা যায়েগা। ইয়ে হারাম হ্যায়। কিন্তু সেবকজি দমবার পাত্র নয়। সে বলতে থাকে, নেহি জি, আপলোক মেরা মেহমান হ্যায়, ম্যায় গরিব আদমি হ্যাঁ। বড় এন্ডেজাম নেহি কর পায়ে। আপলোক কো পিনেই হ্যেগা।

শুরু সেবক নিজে মৌতাতের মধ্যে রয়েছে, সেই সাথে পুজোর উপচার হিসেবে রাম সে তাদের দাওয়াতি মেহমানদের খাওয়াবেই, এরকম একটা জেদ বা সরল বুঝ তার মনের ভেতর পৌঁছে গেছে। এটা না খেলে তার দেবী মাতা নাখোশ হবেন এবং তাতে তার ক্ষতি হবে এ ধরনের দোহাই দিতে থাকে সে। সুতরাং তার পীড়াগীড়ি আর অনুরোধের মাঝা বাড়তে থাকে। অবস্থা এমন দাঁড়ায় যে, হয় মদ খেতে হয়, না হলে তাঁবু থেকে দোড়ে পালাতে হয়। কিন্তু এখন দুটোর কোনোটাই করা যাচ্ছে না। কী করা যায়, কী করে পার পাওয়া যায় এ রকম পরিস্থিতির হাত থেকে যখন ভাবছি, তিনি চট্ট করে পরিস্থিতি সামাল দেয়ার মতো একটা উপায় বের হয়ে যায়। আমরা সবাই বড় ভাই নুরম্ব হককে ধরি।

— আমাদের সবার হয়ে আপনি খান বড় ভাই,

আঁতকে ওঠেন বড় ভাই। উৎকণ্ঠা জড়ানে শৈশবের তিনি বলেন, বলো কি তোমরা? আমি মদ খাবো! আমার ধর্ম চলে যাবে না? স্বাস্থ্য খাবো? ক্যাপ্টেন নন্দন বড় ভাইয়ের অবস্থা দেখে হেসে ফেলেন। বলেন, আরে ইয়েকুন পিজিয়ে। একদিন খেলে কি আর এমন হবে! খেয়ে নাও এতো করে যখন শুরুস্থাক বলছে! এটা তো যুক্তের মাঠ। এখানে হারাম-হালালের বাছবিচার নেই।

কথাগুলো বলেই নন্দা এগিয়ে এসে বড় ভাইয়ের গ্লাসের সাথে তার গ্লাস তুলে দিয়ে বলেন, চিয়ার্স, এসো, তোমাদের জয় বাংলা কামনা করে আমরা দুঁজন পান করি। বড় ভাইয়ের অবস্থা তখন দেখবার মতো হয়ে ওঠে। অতি অনিষ্ট্য সন্ত্রেও তিনি গ্লাস তুলে নেন। তারপর বাঁ হাতে নাক টিপে ধরে ঢকচক করে গলায় ঢেলে দিয়ে মুখ বিকৃত করে বসে থাকেন। শুরুসেবক আনন্দে প্রায় নেচে ওঠে। আমরা রাখ পান করার হাত থেকে বেঁচে যাই। এবং সেটা এই দোহাই দিয়ে যে, রাতে অপারেশনে যাবো আর সে কারামেই মদ খাওয়া চলবে না।

রাত আটটার দিকে অনুষ্ঠান শেষ হয়। আমরা তাঁবু থেকে বের হয়ে আসি। বড় ভাই পুকুরের উচু পাড়ে বসে পড়েন। মনের গভীর থেকে দুঃখ নিয়ে তিনি বলেন, এটা কী করলে তোমরা? আমাকে হারাম খাওয়ালে? আমার ধর্ম চলে গেলো। পেছনে অমরখানা-জগদলহাটে অবিশ্রান্তভাবে তখন মেশিনগানের যুদ্ধ চলছে। কালো ঘুটঘুটে রাত। মদ খাওয়ার অপরাধবোধ থেকে দারুণ মনোকষ্টে অস্থির বড় ভাই। পেছনে যুদ্ধ, সামনে হিমালয়ের গায়ে ঝকঝকে আলো ছাড়িয়ে গাড়ি ওঠানামা করছে। বিচ্ছিন্ন এক সময়। আমরা কোনো কথা বলি না। কেবল বিলাপরত বড় ভাইকে ঘিরে বসে থাকি সবাই।

অমরখানার বাক্সার

অমরখানার বাক্সার উড়াতে হবে, পারবে? ক্যাটেন নদা সঞ্চাব্য অপারেশন পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনার সময় কথাটা পাড়েন। তার কথার উত্তরে বলি, অমরখানায় তো একটা দুটো বাক্সার নেই, বিবাট এলাকা নিয়ে তারা তাদের প্রতিরক্ষা বৃহৎ গড়ে তুলেছে। অন্ততি বাক্সার-ট্রেঞ্চ পিলবর্জ আর ক্রলিং ট্রেঞ্চ তৈরি করেছে। তাদের ডাগ আউট বা বাক্সারের কাছাকাছি যাওয়া তো অসম্ভব ব্যাপার। বাক্সারের সামনে রয়েছে মাইন ফিল্ড। সদা সতর্ক সেন্ট্রি এবং কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা।

— তবে? একটাও কি বাক্সার ধ্রংস করা যাবে না ওদের? এটা করতে পারলে ওদের বুঝিয়ে দেয়া যেতো যে, আমরা তাদের মূল ঘাঁটিতে হাত দেয়ার ক্ষমতা রাখি। নদা কিছুটা চিন্তাবিত হয়ে কথাগুলো বলেন। তার শনোভাব বুঝতে কষ্ট হয় না। তিনি চাইছেন পাকবাহিনীর মূল ঘাঁটিতে একটা নাড়া দিতে। নদার এই রকম প্রস্তাবের মুখে চকিতে মনে পড়ে যায় জুলাইয়ের প্রথমদিকে বুধন মেঘারের বাড়িতে পাকবাহিনীর লঙ্গরখানা রেকি মিশনের কথা। গোলাম গাউসসহ সে রাতে অমরখানা বোর্ড অফিসের কাছে পাক সড়কের ধারে মাটির টিবি মনে করে পাকবাহিনীর বাক্সারে হাত দিয়ে নাড়াচাড়া করে এসেছিলাম। সেখানে ইতিমধ্যে আরো বাক্সার গজিয়েছে। সুযোগটা নেয়া যেতে পারে সেখানে। নদাকে কথাটা বলি। বলি যে অমরখানায় সোজাসুজি যাওয়া হ্রেয়াবে না। ত্রিজের দিক দিয়ে যাওয়াও সম্ভব নয়। পেছন দিক দিয়ে বোর্ড অফিসের সামনে চাপ নেয়া যেতে পারে। কিছুটা ভাবেন নদা। তারপর বলেন, ঠিক হ্যায় স্বত্ত্বে সেদিক দিয়েই অ্যাটেপ্ট নাও। তবে কাজ না করে ফিরবে না, ও কে?

— ও,কে স্যার, বলে তার কথায় সায় দেই। সে অনুসারে পরিকল্পনা করে শুরুসেবকের নিম্নলিঙ্গ থেকে ফিরে রাত দশটায় ক্রেতে দিয়েছি আমাদের টাগেট অভিযুক্তে। আজকের দলের সদস্য সংখ্যা ১৫। প্রত্যেকেই প্রয়োজনীয় সমরসংজ্ঞায় সজ্জিত। আজ কোনো গাইড সঙ্গে নেই।

দু'পক্ষের তুম্বল গোলাগুলির মধ্যেই অবজ্ঞারভেশন পোষ্টের বাঁ দিক হয়ে সোজাসুজি থেকে আর ঘরবাড়ির ভেতর দিয়ে এগিয়ে গিয়ে ডানে অমরখানা গ্রাম রেখে উঠে এসেছি আলতাফ কেরানির বাড়ির কাছে। পুরুর পাড়ে। একরামুলের নেতৃত্বে ১০ জনকে পুরুর পাড়ে কভার পার্টি হিসেবে অবস্থানে রেখে ৩ জনসহ এগিয়ে চলেছি আমি বোর্ড অফিস লক্ষ্য করে। বোর্ড অফিসগামী সড়কের ওপর দিয়ে গেলে দু'দিন আগে নিজেদের পেতে রাখা মাইনট্রাপে নিজেদেরই পড়ার সংশ্বানা রয়েছে। তাই বাস্তার বাঁ দিককার ঢাল বেয়ে এগুতে হয়। ঘুটঘুটে অঙ্ককার রাত। চারদিকে জোনাকির মেলা। সামনে প্রচণ্ড যুদ্ধ। আমরা সেই যুদ্ধের ডামাডোলের দিকেই এগিয়ে যাচ্ছি।

টিনের ছাপড়া দেয়া মন্তব্য ঘরটি পার হতেই আকাশ সোজা ছুটে ছুটে আসতে থাকে কামানের গোলা। মনে হয় মাথার ওপরেই বুঝি পড়বে সেগুলো। তাই সহজাত প্রবৃত্তি থেকেই ঝাপিয়ে পড়ি সামনে গর্তমতো একটা জায়গার ভেতরে। ভেজা মাটিতে শরীর মাখামাখি হয়ে যায়। দু'হাতে কান চেপে ধরে অপেক্ষা করি। বুকের ভেতর ঢাক বাজে। প্রতি মুহূর্তে মনে হয় এই বুঝি গোলা এসে পিঠের ওপর পড়লো। না, সামনের আকাশ দিয়ে উড়ে প্রায় ২/৩শ' গজ সামনে গিয়ে পড়েছে। প্রচণ্ড বিক্ষেপণে ধরথরিয়ে কঁপতে থাকে

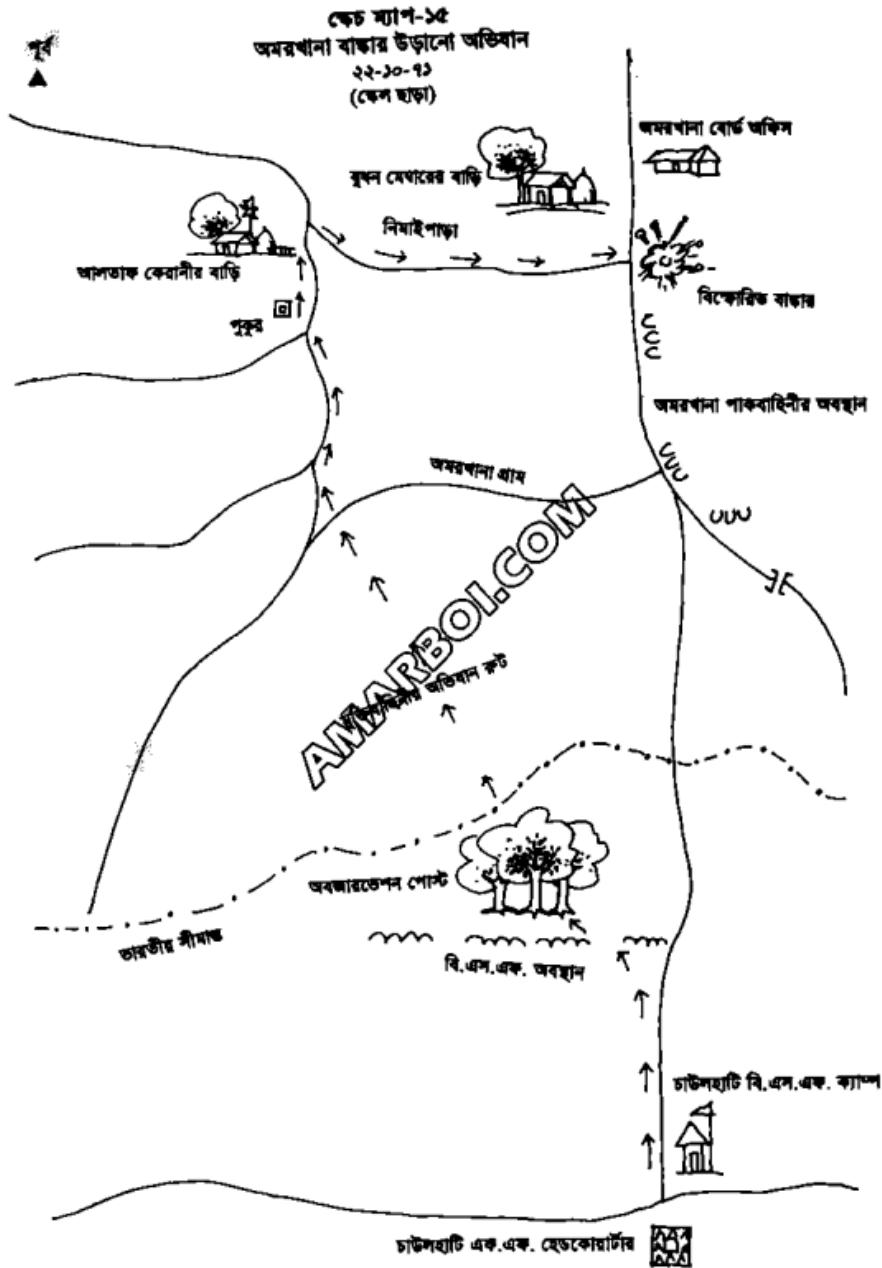
মাটি। বাতাসে বিস্ফোরণের ধাক্কা। বিষ্ণু চরাচর জুড়ে যেনো একটা ওলটপালট করা অবস্থা। কামানের গোলা বিরতিবিহীন আসতেই থাকে। আর এর মধ্যে মাটির সাথে বুক লাগিয়ে পড়ে থাকি সঙ্গীদের নিয়ে। প্রায় আধা ষষ্ঠী ধরে চলে এ ধরনের গোলাবর্ষণের খেলা। তারপর থেমে যায়। অমরখানায় মেশিনগানের যুদ্ধ তেমনিভাবে চলতেই থাকে। কিছুটা ধাতস্ত হতেই দেখি আমরা পড়ে আছি একটা বড়োসড়ো কামানের গোলার আঘাতে সৃষ্টি একটা গর্তের ভেতরে। আজ দুপুর কিংবা বিকেলের দিকেই সম্ভবত আমাদের অবস্থান এই জায়গাটাতে কামানের গোলা বিস্ফোরিত হয়েছে। আর তার ফলেই সৃষ্টি হয়েছে এই গর্তের। ভেজা নরম মাটিই এর সাক্ষ দেয়।

এরপর আবার এগিয়ে যাবার পালা। হাঁটতে হাঁটতে শক্রঘাঁটির প্রায় সীমাবন্ধের ভেতরে এসে পড়ি। অভ্যন্ত সতর্ক আর সজাগ পদচারণায় এগুতে হচ্ছে আমাদের। কোথায় কী মৃত্যু-ফাদ পাতা রয়েছে বোঝবার উপায় নেই। শরীর জুড়ে একটা শিরশিরে শীতল শিহরণ। এই বুবি আবার কামান যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। গোলা আবার না এসে পড়ে মাথার ওপর।

পাকা সড়কের একশো গজের মধ্যে এসে পৌছি একসময়। বাসারাত আর করিমকে সেখানে কভার পজিশনে রেখে দ্রুত এগিয়ে যাই মাটিতে বুক ঠেকিয়ে ত্রলিং করতে করতে। সাথে ডানে-বাঁয়ে রয়েছে দুই বিশ্বস্ত যুবক মালেক আর মঙ্গ। আমার হাতে ধরা টেলগান। তাদের দুঁজনের কাছে এস.এল.আর। ঘেনেড রয়েছে প্রত্যন্তকের কোমরে। রেমার চার্জ বানিয়ে আনা হয়েছে বাক্সার ওড়ানোর জন্য। আরো কিছুটা এগিয়ে যাবার পর থামতে হয়। ডানদিক থেকে মেশিনগানের প্রচও তোড় ভেসে অসহচৰ হোতের মতো। মাথার ওপর শুধু শন্খণ ভন্ডন শব্দ। বাতাস কেটে উড়ে চলেছে জ্বলিত অস্ত্রিকণ। এ অবস্থায় এগুনো ঠিক হবে কিনা বুঝতে পারছি না। পাশের দুঁজন ছানাসার পিঠে হাত দিই। উদ্দেজনায় অস্ত্রিতায় হেমে-নেয়ে উঠেছে ওরা। কিসফিসিয়ে বাঁচানে, আর বেশিদূর নয়, বুকে সাহস রাখ, চল।

ওদের একটা করে ঘেনেড হচ্ছে জুলে নিতে বলে নিজেও একটা ঘেনেড বাঁ হাতে তুলে নিই। এবার ডান হাতে অস্ত্র আর ক্ষণ হাতে ঘেনেড এবং সেভাবেই বুকে হেঁটে তিল তিল করে এগিয়ে চলা। অবশ্যে বুধন মেরারের বাড়ির পুবাদিকের বাঁশ খেতটার নিতে পৌছানো যায়। পাকা সড়কের ধার ঘেঁষে দুটো দাঁড়িয়ে থাকা বাক্সারের কালো অবয়ব শ্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায়। বাক্সারের ভেতরে কেউ আছে কি না বুঝবার উপায় নেই। বাক্সারের অবস্থান সরাসরি রেকি করে এসে সেগুলোর দখল নিয়ে ধীরেসুস্থে চার্জ বেসিয়ে উড়িয়ে দেয়ার মতো পরিস্থিতি নেই। উচু ঘাসের দামের ভেতর দিয়ে আরো কিছুটা এগিয়ে যাই। থামি। দেখতে পাই, সামনে ৩০/৩৫ গজের ভেতরেই বাক্সার দুটোর অবস্থান। হিসেব করে নিই মনে মনে। দুমিনিট সময় পাওয়া যাবে। এর ভেতরেই কাজ সারতে হবে। রেমার চার্জের সেকুটি ফিউজে আগুন লাগিয়ে নিয়ে ছুটে গিয়ে বাক্সারের ফোকর দিয়ে তা গলিয়ে দিয়ে আসতে হবে। এবং এটা করতে হবে ত্বরিত গতিতে শক্রকে কোনো কিছু বুঝে উঠতে দেবার অবকাশ না দিয়েই। দূরের বাক্সারগুলো থেকে খই ফেটার মতো করে মেশিনগান গর্জে যাচ্ছে। সামনের লক্ষ্য বাক্সারগুলো নীরব। পাকা সড়কের ওপর কোনোরকম টহলদারি নেই। কামানের গোলাবর্ষণের জন্য শক্র নিজেদের গুটিয়ে নিয়েছে নিরাপত্তামূলক অবস্থানে। ইলিমিট বাক্সার দুটোয় শক্র আছে বোৰা যায় না।

মালেক-মঙ্গকে কাছে টেনে এনে ব্যাপারটা বুবিয়ে দিই। মাত্র দুমিনিট সময়। এর



ফর্ধেই কাজ শেষ করে যতোদূর সম্বন্ধ দূরে সরে যেতে হবে। ফিসফিসিয়ে ওদের বুকিয়ে দিই সমস্ত ব্যাপারটা। ওরা মন দিয়ে শোনে আর অঙ্ককারে মাথা নাড়ে। সবশেষে বলি, চোখ-কান বুঝে দৌড় দিবি। বাঙ্কারের ফোকর দিয়ে চার্জ চুকিয়ে দিয়ে ছুটে আসবি। কোনো কিছু দেখবার বা বুকবার দরকার নেই। ঠিক আছে? মাথা নাড়ে ওরা।

— তাহলে বের কর চার্জ দুটো, মালেককে বলি। মালেক তার পিছে গামছায় বাঁধা রেমার চার্জ দুটো বের করে। ৪ পাউন্ড এক্সপ্রেসিভ দিয়ে প্রতিটা চার্জ বানানো। ওদের দুঁজনের হাতে চার্জ দুটো ধরিয়ে দিই। ওরা সামনে ওঁ পেতে হাঁটুর ওপর বসে। চার্জ দুটোর সেফটি ফিউজের মাথা একত্র করে হাতের তালুর আড়ালে সেফটি ম্যাচ জ্বালাই। অনুভূল ম্যাচের খলা ফিউজের মাথায় ধরতেই একসাথে ফরাত্ করে জ্বলে ওঁ ঠে ফিউজ দুটো। সেই সাথে চাপা গলায় বলে উঠি, দৌড়া মালেক, দৌড়া মঞ্জু!

অন্ত কাঁধে ঝুলিয়ে এক হাতে ফিউজের তার এবং অন্য হাতে চার্জ ধরে দৌড়ে চলে ওরা সামনের দিকে। ওদের গতি শার্দুলের মতো। ভঙ্গি একক্ষণ্যে বুনো মোষের মতো। ওদের পেছন থেকে কভারে থাকি আমি। ডান হাতে উদ্ব্যত টেনগান। ট্রিগারে আঙুল। বাঁ হাতে ঘেনেড়। বুকের মধ্যে হাতুড় পেটানোর শব্দ। গলার কাছে যেনো কিছু আটকে থাকে। দম বক্ষ হয়ে আসতে চায়। প্রতি মৃহূর্তে কী হয় না হয় জাতীয় একটা অনুভূতি সারাটা শরীর-মনে প্রবলভাবে ঘরে ধরে। দারুণ এক অস্ত্রিক অপেক্ষার স্মৃতি।

সামনের দিক থেকে দূর্দাঙ্গ শব্দে দৌড়ে আসে দুটো জালো ছায়া। একরাশ উৎকর্ষ্টা আর আতঙ্ক নিয়ে বলে ওঁ ঠে মালেক, দৌড়ান গে কমান্ডার আব সময় নাইগে, অসেন দৌড়ান!

— নে, দৌড়া বলে ওদের সাথে দৌড়ে যৌগ দিই। সামনে নিকষ কালো অঙ্ককার। পেছনে মেশিনগানে মেশিনগানে প্রচও যুক্ত মাথার ওপর দিয়ে শুলির প্রবহমান স্নোত। কিছু দেখবার বা বুকবার উপায় নেই। লক্ষ্য প্রক্রিয়া আমাদের মাত্র একটাই, দৌড় আর শুধু দৌড়। কিছুক্ষণের মধ্যে পেছন থেকে ক্রস দুটো শব্দের সাথে সাথে প্রচও ভূমিকল্পের মতো মাটি কাঁপিয়ে দুটো বিক্ষেপণেক শব্দ তেসে আসে। আর সেই শব্দ যেনো ধাক্কা মেরে ফেলে দেয় মাটিতে। ওই অবস্থাতেই উঁ ঠে আবার দৌড় লাগাই। মক্ষব ঘরের কাছে বাসারাতদের পাওয়া যায়। অপেক্ষা নয়, দৌড়াতে বলি তাদেরকেও। এই মৃত্তুপুরী থেকে পালানো দরকার যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব।

অবশেষে পৌছানো যায় একরামুলের দলের কাছে। পৌছেই পুরুর পাড়ে ভেজা ঘাসের ওপর প্রায় লাঠিয়ে পড়ার মতো উয়ে পড়ি। একরামুল মাথার কাছে ছুটে আসে। জানতে চায় অপারেশন সফল কিনা? কারো কোনো ক্ষতি হয়েছে কি না? মুখ হাঁ করে নিষ্কাস নিতে নিতে ওর পিঠে হাত রেখে বলি, সব ঠিকঠাক আছে। অপারেশন সাকসেসফুল। ওদের দুটো বাঙ্কার উড়িয়ে দিয়েছে মালেক-মঞ্জু।

‘বাহাৰলী’! বলে অঙ্ককারে একরামুল হাততালি দিয়ে ওঁ ঠে। তারপর বলে হামরা তাইলে কয়েক রাউন্ড ফুটাই!

— ঠিক আছে, বলে আমি সায় দিই।

সম্মতি পেয়ে একরামুলের দল মেতে ওঁ ঠে শুলিবর্ষণের খেলায়। প্রায় ১৫/২০ মিনিট ধরে চলে তাদের অবিজ্ঞান, থেমে থেমে শুলিবর্ষণের ছাঁটোখাটো উৎসব। আজ আর শক্তির দল কোনো জবাব দেয় না। সম্ভবত ওরা দিশে হারিয়ে ফেলেছে। কোন্ দিকের আক্রমণের

জ্বাব দেবে সেটা তারা ঠিক করতে পারছে না।

রাত প্রায় শেষ হয়ে আসে। ফিরতি পথে মালেক জিগ্যেস করে, কহেন দি কমভার
সাৰ, তুমুৱা যে মোৱ হাতোত চাৰ্জটা দিলেন, ফ্ৰ ফ্ৰ কৱে সেটাৰ ফিউজ জলেছিল, মুদিল
ঞ্টা হামুৱা বাক্সোৱ মইধে চুকাইবাৰ না পাৰিসো হয়, মুদিল ঞ্টা হাতোৱ মইধে ফাটিল
হয়, তখন কি হইল হয়?

মালেকেৰ এ কথায় হেসে উঠি। মালেক বেচাৱা একেবাৱে ছেলে মানুৰ। হাতো প্ৰকৃত
ব্যাপারটা ওৱ বোধেৰ মধ্যেই আসে নি। অনুভূতিশূন্যভাৱে কেবল একটা ভয়কৰ মাৰণাস্ত
হাতে নিয়ে দৌড়ে গিয়েছিলো সে বাক্সোৱ দিকে। তাৰ কাঁধে হাত রেখে বলি, তাহলে কি
হতো জানিস? এ বাক্সোৱ মতো তুইও ধূলোৱ মতো উড়ে যেতি। তোৱ চিহ্ন খুঁজে পাওয়া
যেতো না।

— বা—গো! শব্দটা উচ্চারণ কৱে মালেক শিউৱে উঠে এবং থমকে দাঁড়ায়। ওকে সান্তুনা
নিয়ে বলি, ওয়েল ডান বয়! বিপদতো কেটে গেছে। নে চল্।

মালেক আৱ কিছু বলে না।

এৱপৰ যুক্ত ফেৰত দলটি সীমান্ত পেৱিয়ে ইঁটতে থাকে চাউলহাটি অভিমুখী পাকা
সড়কেৰ উদ্বেশে।

২২৩০৭১

যুক্ত দৰ্শনে আগত একদল শৌখিন মহিলা এবং তাৰপৰি

মোসারদ পাগলা দৌড়ে এসে খবৰটা জানাৰ ^(১) জাতেজন্যায় বীতিমতো ছটফট কৱছে সে।
বলে, বাহে অনেকগুলাম বেটি ছাওয়া আসিবিছ। সোন্দৰ সোন্দৰ। একেলো পৰীৱ নাখান।
চকচকা কাপড়-জামা ওমাৱ পেন্দলোত্ত

ওৱ কথা থেকে ব্যাপারটা প্ৰথমে বোৱা যায় না। যুক্তেৰ মাঠে সুন্দৰ জামা-কাপড় পৱে
মহিলা আসবে কেনো? তাকে ঝুলি, কী বলছিস পাগলেৱ মতো, চোখে ধান্দা লাগছে নাকি
তোৱ?

মোসারদ দমে না। সমান উৎসাহে বলে, যিছা কথা নোয়ায়, সত্যি কওছো, দেইখবেন
আইসো।

মোসারদ পাগলার পৰিবেশিত ব্বৰৱ কখনও মিথ্যা হয় না। এৱ আগে সে কামান
বাহিনীৰ খবৱও একইভাৱে দিয়েছিলো। তাই এবাৱ তাকে বিশ্বাস না কৱি কি কৱে? বলি,
চলতো দেখি।

বকৰকে নিয়ে তাৰু থেকে বেৱ হয়ে আসি। পুকুৱেৰ পাড়ে তখন অনেকেই সোন্দৰাহে
দাঁড়িয়ে সামনেৰ দিকে দেখছে। হাঁ, মোসারদেৰ কথা সঠিক। জাঁকজমকপূৰ্ণ সাজপোশাকে
একদল মহিলা এসেছেন। বি.এস.এফ. ক্যাম্পেৰ সামনে হৈচে কৱে গাঢ়ি থেকে নামছেন
তারা। তাদেৱ বলবল মুখৰ হাসিৰ শব্দ আৱ কলঙ্গন পুকুৱ পাড় থেকেও শোনা যায়।
২/৩ জন আৰ্মি অফিসাৱ গাইড কৱছেন তাদেৱ। এটা যে যুক্তেৰ ফ্ৰন্ট তাদেৱ ভাৰতঙ্গি
দেখে সেটা বুঝবাৰ উপায় নেই। যেনো তারা পিকনিক কৱতে এসেছেন চাউলহাটিতে।
জাঁকজমকপূৰ্ণ পোশাকেৰ এইসব মহিলাকে দেখে কী মনে হয়, ছেলেৱ প্ৰায় একসঙ্গে
হাততালি দিয়ে উঠে। একজনতো গলাৰ স্বৰ উচু পৰ্দায় তুলে বলেই উঠে, বাহাৰবলী!

ব্যাপারটা দেখে বড় ভাই পেছন থেকে তেড়েমেরে ছুটে আসেন। রাগের সুরেই বলে ওঠেন তিনি, পুরুর পাড়ে দাঁড়িয়ে এতো হৈচে কিসের! পাকবাহিনীর টার্গেট বানাতে চাও নাকি তোমরা? এভাবে দাঁড়িয়ে থাকলে খানের টের পেয়ে যাবে আমাদের অবস্থান। তারপর তাদের আর্টিলারি টার্গেট হয়ে যাবে আমরা। নামো সবাই ভাগো। সবাইকে তাড়ানোর ভঙ্গিতে কথা বলতে বলতে বড় ভাই পুরুর পাড়ে এসে দাঁড়ান। জিগ্যেস করেন, কী হয়েছে মাহবুব?

সামনের দিকে ইশারা করে তাকে বলি, দেখেন, শুই যে শুই মহিলাদের।

— মহিলা! আরে তাইতো! কথাটা বলেই বড় ভাই যেনো ধমকে যান। তারপরেই চিন্তাবিত কষ্টে বলেন, ওয়ার ফ্রন্টে মহিলা কেনো? ওদের মাথা খারাপ হয়েছে নাকি?

জবাবে শুধু বলি, দেখে আসি বড় ভাই, আসলে ব্যাপারটা কি?

— ঠিক আছে যাও, কিন্তু এটা বাড়াবাড়ি বুবলে। বড় ভাই বেশ রেগে গেছেন বোধ যায়। তিনি ব্যাপারটাকে ভালোভাবে নিতে পারেন নি।

আমরা সোজা হেঁটে এসে চাউলহাটি বি.এস.এফ. ক্যাম্পের পাশে রাস্তার ওপারে চায়ের দোকানে গিয়ে বসি। বাবলু চায়ের অর্ডার দেয়। বকর ইতিউভি চেয়ে দেখার চেষ্টা করতে থাকে। ছটফট না করে ওকে চুপচাপ বসে থাকতে বলি। চায়ের দোকানের কাঠের বেঁকিতে বসে পরিষ্কার দেখা যায় বি.এস.এফ. ক্যাম্পের ভেতরভাগটা। বকবাকে চেহারার একদল মহিলা। তাদের মধ্যে বেশ ক'জন বসে আছেন ছফ্টপ্রে-ছিটিয়ে, আর কয়েকজন এদিকসেদিক ঘোরাফেরায় ব্যস্ত। সংখ্যায় তারা প্রায় $\frac{1}{2}/\frac{3}{4}$ জন। মাঝ বয়সী থেকে শুরু করে যুবতী বয়সের সবাই পোশাকে-চেহারায় অত্যন্ত সন্তুষ্ট এবং শৌখিন। তাদের কারো কারো পরনে সালোয়ার-কামিজ। কারো-বা সিলে শাড়ি আর ব্রাউজ। বোধ যায়, এরা সবাই আর্মি অফিসারদের গৃহিণী। আর কোন মেয়েসের যে দুঁচারজন তারাও হয়তোবা তাদের মেয়েটোয়ে হবে। দাকুণ সজীব আর প্রক্রিয়াজ তাদের উপস্থিতি। একবাক রঙিন প্রজাপতির মতো। তারা হাসছেন, কথা বলছেন, গায়চারি করছেন। বি.এস.এফ.-এর লোকজন অত্যন্ত ব্যস্ত এই শুরূতে তাদের আপত্তিমন। গাইড আর্মি অফিসারেরা চৌকস ভঙ্গিতে মহিলাদের আপ্যায়নের ব্যাপারসহ অন্য দিকগুলো তত্ত্বাবধান করছেন। চায়ের দোকানের এই কাঠের বেঁকিতে বসে কাচের গেলাসে পরিবেশিত গরম চায়ে চুম্বক দিতে দিতে ব্যাপারটা বুবার চেষ্টা করি। বকর, বাবলু আর মতিয়ার এদের ধরে রাখা দায়। উৎসাহ আর উন্নেজনা তাদের এমনভাবে পেয়ে বসেছে যে, পারলে তারা বি.এস.এফ. ক্যাম্পের ভেতরে ঢুকে যায় এখনি। দেখেননে আসে সবকিছু। সম্বল হলে রসিয়ে কথাও বলে আসে মহিলাদের সাথে। যুদ্ধের মাঠে এভাবে একবাক ঝকঝকে মহিলার আগমন বা উপস্থিতি যেমন অভিনব ব্যাপার, তেমনি দারুণভাবে আলোড়িত না করে পারেনি। তাদের দেখে তরুণ বাবলু আর মতিয়ারদের চিঠি চাঞ্চল্য ঘটবে, তাতে করে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। কিন্তু সমস্যাটা হচ্ছে ওদের অস্ত্রিভূত নিয়ে। এতোগুলান সুন্দরী মহিলা ক্যানে আসিল যুদ্ধের মাঠেত্ত। এই জিজ্ঞাসার সাথে মিলিত হয়েছে তাদের ঔৎসুক্য। ঔৎসুক্যটা আর কিছু নয়, মহিলাদের আরো ভালোভাবে, সোজা কথায় একেবারে কাছ থেকে দেববার সুযোগ। বয়সের ধর্ম যাবে কোথায়? মোসারদ পাগলাকে দেখা যায় ক্যাম্পের উচু মাটির দেয়ালের ওপর দিয়ে উকিখুকি মারতে। পাগলা নিজেকে সংযত রাখতে পারেন। অনাহৃত অতিথিদের দেখবার আকৃতি থেকে তার এই প্রায়স। তাকে বি.এস.এফ.-এর সবাই চেনে। তাই বাধা দেয় না।

ক্যাম্পের সুবেদার হস্তন্ত হয়ে চায়ের দোকানে আসেন। হয়তো কোনো কিছুর প্রয়োজন পড়েছে মেহমানদের জন্য তাই। তাকে বলি, কী ব্যাপার সুবেদারজি। এতো মেহমান কোথা থেকে এলো? ব্যক্তময় সুবেদার হাসেন। তেমনি হাসতে হাসতেই বলেন, পুছো মাত ইয়ারলোগ। বহুত মুশকিল যে ফাঁস গিয়া।

— মুশকিল! কিসের মুশকিল! বহুত দামি মেহমান আয়া। কে ওনারা? কেনো এসেছেন?

— ওয়ার দেখনে কি লিয়ে। উন লোগ সব অফিসার লোগকো বিবি-বাচ্চা হ্যায়। জাং দেখেগো। জাং দেখনে কি লিয়ে আয়ি হ্যায়।

সুবেদার চলে যান দোকান থেকে তার ইলিত জিনিসপত্র ইত্যাদি নিয়ে। এমন সময় পেছন থেকে শুমগুম শব্দ ধৰনি তুলে কামান বহর সরব হয়ে ওঠে। কিছুক্ষণের মধ্যে অমরখানার দিক থেকে ভেসে আসে সেগুলোর বিক্ষেপণের শব্দ। কামান বাহিনী তাদের টেনিস্ট অনুযায়ী চানমারী তুরু করেছে। এরকম অবস্থার ভেতরেই ক্যাম্প থেকে মহিলাদের বের হয়ে আসতে দেখি। সামনে-পেছনে তাদের সেই চৌকস ক'জন অফিসার। একদল সশস্ত্র স্কট মহিলাদের নিরাপত্তার জন্য নেয়া হয়েছে। আমাদের সন্তুষ্যবর্তী রাস্তা নিয়ে তারা এগিয়ে গেলেন। হাস্য-লাস্য প্রাণবন্ত শৌখিন মহিলা সব। তাদের নিয়ে যাওয়া হচ্ছে সামনে, একেবারে অগ্রবর্তী লাইনের দিকে। সেখানে বাস্তুরের নিরাপত্তায় বসে তারা বায়নোকুলার দিয়ে পাকবাহিনীর অবস্থান দেখবেন। দেখবেন বাস্তব যুদ্ধ। কীভাবে কামানের গোলা বর্ষিত হচ্ছে একটা পর একটা দেখবেন সেই দৃশ্যও। সম্ভব হলে পাকসেনাদের চাকুষও দেখবেন তারা। অফিসাররা ফ্রন্টে যুদ্ধ করছেন। তারা কীভাবে তাদের চিরশক্তি পাকবাহিনীর সাথে লড়ছেন, সেটা তাদের সেক্ষণাধীনের দেখানোর অহমিকা থেকেই সম্ভবত আজকের এই প্রোগ্রামের আয়োজন। বাস্তুর যুদ্ধ, শক্তির অবস্থান এবং শক্তিসেনাকে মহিলাদের দেখাবার পরিকল্পনাটা কীভাবে স্থানে বুঝাতে পারি না। কিন্তু মনে বলে ওঠে, এটা একটা বিরাট বিপদের ঝুঁকি নেওয়ায়েছে। মহিলাদের তুষ্টি করার জন্য এই পরিকল্পনাটি কার উর্বর মাথা থেকে কীভাবে বের হয়েছে, কে জানে? ব্যাপারটা ভালো লাগে না। মনের ভেতরে অস্ত্রিতার একটা পাগলা ঘোড়া দাপাদাপি করতে থাকে। চায়ের দোকান থেকে বের হয়ে পুরুর পাড়ের রাস্তায় ফিরে চলি। যেতে যেতে বকর হাসতে হাসতে বলে, এমাক যে যুদ্ধ দেখাবার নিয়া যাওছে, ঠিক মতো ফিরি আইনবার পাইরবে তো?

— কেনো পারবে না? নিরাসজ্ঞভাবে জানতে চাই।

— ওমার খানের গুলার যে চরিত্র, যদিল দেখে বেটি ছাওয়া আইসোছে ওমাক দেইখবার, তাইলে দৌড়ে আইসবে এলা।

মতিয়ার বলে, হয়গে মাহবুব ভাই, খানেরা এমহারলার রঙচঙ্গা জামাকাপড় আর ঢেহারা-সুরত দেখিবা পাইলে খোরের মতো দৌড়ে আসিবে। পাগলা হয়ে হেনে যাবে গে সব। ওদের কথায় আমিও হেসে ফেলি। মনে হয় ওদের কথাতো ঠিক। এমনিতে তো যুদ্ধে দিনরাত পাকসেনারা অস্ত্রিত আর অমানবিক জীবনযাপন করছে। তার ওপর মহিলাদের ফ্রন্টে নিয়ে এসে যুদ্ধ দেখানোর শৌখিনতা ওরা সহ্য করবে না। তাছাড়া, মতিয়ার ও বকর যেভাবে বলছে ওদের চরিত্রের কথা, তাতে করে মেয়ে মানুষ, বিশেষ করে শক্তিপক্ষের এই ধরনের সাজগোজ করা মহিলাদের দেখলে তারা বসে থাকবে না। মরিয়া হয়ে ওরা এগিয়ে

আসবাৰ চেষ্টা কৰবে এই মহিলাদেৱ দিকে।

বড় ভাই তাঁৰুতে শয়ে ছিলেন। আমৰা ফিরতেই উঠে বসেন তিনি। জিগ্যেস কৰেন, কি হলো, কাৰা ওৱা? কথায় গেলো?

— ওৱা সব অফিসারদেৱ বট-খি। যুদ্ধ দেখতে এসেছেন। ফ্ৰন্টলাইনে গেছেন বাস্তব যুদ্ধ আৱ পাকসেনাদেৱ দেখতে। বড় ভাইয়েৰ কথাৰ জবাবে কথাগুলো বলি আমি। প্ৰবলভাৱে মাথা নাড়েন তিনি, আৱ বলেন, না এটা ঠিক হয় নি। মহিলাদেৱ ফ্ৰন্ট লাইনে নিয়ে গিয়ে যুদ্ধ দেখবাৰ মধ্যে কিসেৰ ক্রেড়িট আছে বিপদ হতে পাৱে।

তখন অবিশ্বাসভাৱে কামানেৰ গোলা নিক্ষিণ হচ্ছে অনেকটা ত্ৰাশফায়াৰেৰ ভঙ্গিতে। অমৰখানায় চলছে বিক্ষোৱণেৰ পৰ বিক্ষোৱণ। সেই বিক্ষোৱণেৰ প্ৰচণ্ডতা আৱ ভয়াবহতাৰ ধৰকা এসে লাগছে আমাদেৱ পুকুৰ পাড়েৰ তাঁৰুতেও। প্ৰচণ্ড আটিলাৰি ফায়াৱেৰ কভাৰিং-এৰ আড়ালে শৌধিন মহিলাদেৱ তাৰা বাস্তব যুদ্ধ দেখাতে চাইছেন। ব্যাপারটাৰ মধ্যে প্ৰিল এবং অ্যাডভেঞ্চুৱিজম রয়েছে দারুণ সদেহ নেই। এটা একটা অভিনব ঘটনাও, কিন্তু তবুও মন কেমন যেনো কৰে। বড় ভাইকে ঘিৱে আমৰা তাঁৰুতে বসে থাকি, মোসাৱদ পাগলা ফেৱে নি। সে মহিলাদেৱ পিছু পিছু গেছে কি না, কে জানে?

আৱো বেশ সময় কেটে যায়। বেলা একটা দেড়টা হবে তখন। দুপুৰেৰ আহাৰ সবে শেষ হয়েছে। হঠাৎ কৰে অমৰখানার দিক থেকে প্ৰচণ্ড সেন্ট্রালিৰ শব্দ ভেসে আসে। মনে হয়, সেখানে বিৱাট একটা যুদ্ধ শুরু হয়েছে। এনিকোন্ত কামান বাহিনীও অত্যন্ত তৎপৰ হয়ে উঠেছে। মৃহূৰ্মুহূৰ্মু গোলাৰ্বণ কৰে চলেছে। বি.এস.এফ. ক্যাম্পে হৈহল্লা চলছে। ব্যাপারটা দেখবাৰ জন্য দৌড়ে যাই ক্যাম্পেৰ টেক্সেক। সাথে আমাৰ পেছন পেছন ক'জন দৌড়াতে থাকে। ক্যাম্পেৰ ভেতৱে ছুটোছুটি চিচাচিলি। দ্রুত যুদ্ধসাজে সজ্জিত হতে দেখা যায় বি.এস.এফ.দেৱ।

— কেয়া হয়া! জিগ্যেস কৰতেই ক্যাম্পেৰ ভেতৱে থেকে উত্তৰ আসে কোনো একজনেৰ, পাকবাহিনী অ্যাটাক কৰিয়া। উহ লোগ অ্যাডভান্স কৰিয়া। ইধাৰ আতি হ্যায়।

থমকে যাই এই সংবাদে। পাকবাহিনী আক্ৰমণ চালিয়ে ভাৰতীয় এলাকায় ঢুকে পড়েছে। এনিকে অঞ্চল হচ্ছে তাৰা! অনেকটা মাথা খাৰাপ কৰে দেবাৰ মতো খবৰ এটা। মহিলারা ফ্ৰন্টলাইনে। ওদেৱ রক্ষা কৰা দৰকাৰ। কীভাৱে রক্ষা পাৰে ওৱা? নিজেদেৱ ক্যাম্প রক্ষা কৰা প্ৰয়োজন। হাতে হাতিয়াৰ নেই একটাও। সবকিছু শলিয়ে যাওয়াৰ যোগাড় হয়। সঙ্গীদেৱ নিয়ে দৌড়ে আসি পুকুৰপাড়ে। সোজা নদৰ তাঁৰুতে। নদৰ তাঁৰুতে নেই। সকালে বেৱ হয়েছেন, ফেৱেন নি এখনও। বড় ভাইয়েৰ কাছে খবৱটা বলতেই তিনি অস্তিৰ হয়ে পড়েন। দ্রুত ক্যাম্প প্ৰটেকশনেৰ ব্যবস্থা গ্ৰহণেৰ জন্য ছেলেদেৱ হাঁকড়াক দিয়ে পজিশন নিতে বলেন। কিন্তু তাৰ বেয়াল নেই, ছেলেদেৱ কাছে কোনো হাতিয়াৰ নেই। হাতিয়াৰ জয়া রয়েছে সব বি.এস.এফ. ক্যাম্পে। খালি হাতে ক্যাম্প রক্ষা কৰা যাবে না। কিন্তু অন্ত দৰকাৰ। এই চিন্তা মাথায় নিয়ে আৱাৰ দৌড়াই বি.এস.এফ. ক্যাম্পেৰ দিকে। আমাদেৱ অন্ত নিতে সেখান থেকে। বকৰসহ ৫/৭ জন থাকে আমাৰ সাথে। কিন্তু অন্ত নেয়া হয় না। বি.এস.এফ.ৱা নিজেৱাই অস্তিৰ হয়ে পড়েছে তাদেৱ ক্যাম্প রক্ষাৰ জন্য। সুবেদাৱকে পাওয়া যায় না। তিনি এগিয়ে গেছেন সামনে একদল যোকা নিয়ে। ক্যাম্পেৰ সামনে অমৰখানাগামী রাস্তাৰ যোড়ে দাঁড়িয়ে ভাৱছি, এখন কী কৰা যায়, কী সিঙ্কান্ত নৰো ইত্যাদি আৱ তখনি দৃষ্টি যায় সামনেৰ দিকে।

শিউরে ওঠা একটা দৃশ্য চোখে পড়ে। দলবদ্ধ হয়ে যেসব মহিলা যুদ্ধ দেখতে নিয়েছিলেন, তারা এলোমেলো অবস্থায় প্রাণপণে দৌড়ে আসছেন। রাস্তার ওপর দিয়ে, নিচে দিয়ে, খেতবাড়ি দিয়ে। তারা উর্ধ্বশাসে দৌড়ে দৌড়ে আসছেন। সন্তুষ্ট হরিপীর মতো তাদের অবস্থা। পেছনে তাদের মৃত্যু তাড়া করে আসছে, সেই ভয়ে তারা প্রাণপণে দৌড়াচ্ছেন। হেঁচট থেয়ে পড়ছেন, উঠছেন আবার দৌড়াচ্ছেন। সেই সাথে তাদের মুখ থেকে বেরিয়ে আসছে চিকির, আর্তনাদ আর কান্দা।

রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে আমরা এই দৃশ্য দেখতে থাকি স্থবির অবস্থায়। ভীতচিকিত চাহনি আর বিষ্ফল চেহারা নিয়ে মহিলারা একে একে ক্যাম্পের কাছে দিয়ে আসেন। কারো পায়ে জুতো নেই। মাটি কাদায় তাদের শরীর মাখামাখি। অনেকেরই পরনের কাপড় ছিঁড়ে ফুড়ে গেছে। একেবারে যাচ্ছে তাই অবস্থা তাদের। তারা সে অবস্থাতেই রাস্তার পাশে পার্ক করা গাড়িতে গিয়ে তড়িঘড়ি করে ওঠেন। তাদের গাইড সেই চৌকস অফিসার ক'জনের অবস্থাও খুবই নাজুক। সব মহিলা এসে পৌছুছেন কি না সেটা খোজ নিতে ব্যতিব্যস্ত সকলে। মহিলাদের চিকির কান্দাকাটি চলতেই থাকে। গাইড অফিসাররা ভালোভাবে দেখে হিসেব করে, তাদের সাথে আনা 'বিশেষ মেহমানদের' সংখ্যা মিলিয়ে নেন। এরপর খুবই দ্রুততার সাথে গাড়িগুলো স্টার্ট দিয়ে তারা রওনা হন জলপাইগুড়ির পাকা রাস্তা ধরে।

যুদ্ধ দর্শনে আগত শৈৰিন মহিলাদের বাস্তব যুদ্ধ দর্শন একটা বেই শেষ হয়। জানা যায় একজন হাবিলদার মারা গেছে এবং দু'জন সেনিক আঘাত হয়েছে গুরুতরভাবে। এগিয়ে আসা পাকবাহিনীকে মরণপণ ঠেকাবার জন্য অভিযন্ত্র সাহসিকতার সাথে লড়তে হয়েছে তাদের। বেচারা হাবিলদার! অফিসার মহলে^{প্রতি} একটা শৈৰিন আর খেয়ালি সিঙ্কান্তের পরিণতিতে জীবন বলি দিতে হলো তাকে।

বিনয়, বাদল, দীনেশের গল্প
নন্দা বললেন, আজ রাতে জন্মদিনটা যাও। শক্রকে পেছন থেকে আঘাত করো। তাদের টেলিফোন লাইন বিচ্ছিন্ন করে আসো।

তাকে বলি, এর আগেতো আমরা ওদের টেলিফোন লাইন কেটে টেলিফোন পোস্ট চার্জ দিয়ে উড়িয়ে এসেছিলাম। আবার তারা মেরামত করে নিয়েছে দ্রুত।

— সেটা তো ওরা করবেই। তবে গেরিলা যুদ্ধে এটা হচ্ছে কনটিনিউয়াস প্রোসেস। ওরা যতোই ঠিক করবে, সারাবে, ততোই তোমরা ধূংস করবে। এভাবে বারবার আঘাত করে করে ওদের অস্ত্র করে রাখতে হবে।

— ও.কে. স্যার, বলে তার কথায় সম্মতি জানাই। তারপর অপারেশনের ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনাশেষে সন্ধার মুখে তাঁর তাঁবু থেকে বেরিয়ে আসি। বকর ও বাবলুকে ২০ জনের একটা শক্ত দল তৈরি করতে বলে বড় ভাইসহ রাতের অপারেশন প্ল্যানটা চূড়ান্তভাবে তৈরি করে ফেলি। রাতের খাওয়া শেষ হয়। জাঁকালো অঙ্ককার চেপে ধরে পুরুর পাড়ের ক্যাম্পের পরিবেশটাকে। রাত নটায় নন্দা হাতিয়ার ও গোলাবরুদ আর এক্সপ্লোসিভের জন্য বি.এস.এফ কম্যান্ডারের কাছে স্লিপ লিখে দেন। সেটা নিয়ে 'খোদা হাফেজ' আর 'জয় বাংলা' বলে আমরা নন্দা এবং বড় ভাইয়ের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে পথে নামি। আজ অমরখানা ফ্রন্ট খুবই গরম। দুপুরে মহিলা দর্শনার্থীদের নিয়ে বিরাট হাস্তামা হয়ে গেছে। তখন থেকে আক্রমণ-প্রতিআক্রমণ

চলছে উভয় দলের মধ্যে। একজন হাবিলদারের মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে মরিয়া হয়ে উঠেছে এ পক্ষ। ফ্রন্টলাইনে মেশিনগান অবিরাম থই ফুটিয়ে চলেছে। আঠিলাইরি তথা কামানবহর ছিলগ আক্রমণে গর্জে গর্জে উঠেছে। দারুণ সরগরম অবস্থা। ফ্রন্টলাইনের অবজারভেশন পোস্টের কাছ দিয়ে আজ ভেতরে চুকবার উপায় নেই। রাস্তা বদল করি আজ। জলপাইগুড়িয়ের পাকা সড়ক ধরে প্রায় আধা মাইল এগিয়ে গিয়ে ডানদিককার কাঁচা রাস্তার ওপর নেমে পড়ি। রাস্তাটা অঁকেবেঁকে চলে গেছে সীমান্তের দিকে। রাস্তাটা পরিচিত নয়। কিন্তু এটা দিয়েই সীমান্ত পেরুনো যাবে এই অনুমানের ওপর নির্ভর করে এগিয়ে চলি। প্রায় মাইল দূরেক আসবার পর একটা প্রাইমারি স্কুলের সামনে যাত্রাবিবরিত ঘটে। রাস্তার ওপর মাটিতে বসে পড়ে পুরো দল।

রোমান্টিক আর আবেগপ্রবণ ছেলে বাবলু। অঙ্ককারে শুটিসুটি মেরে এগিয়ে আসে পেছন থেকে। সামনে দাঁড়িয়ে বলে, একটা কথা মাহবুর ভাই।

— কী কথা বল? অঙ্ককারে ওর ছায়া লক্ষ্য করে জানতে চাই।

— যুক্তে যাচ্ছি, আমরা গল্প শুনতে চাই। আপনি আয়াদের এমন একটা গল্প বলেন, যাতে করে আমরা উদ্দীপনা আর সাহস পাবো মনে। স্মর্তিত বাবলু অত্যন্ত আবাদারের ভঙ্গিতে কথাগুলো বলে। তরুণ বাবলুর আগ্রহ ভালো লাগে। বলি কি গল্প শুনতে চাস?

— হিরোদের গল্প। যারা এদেশের মুক্তির জন্য নিজেদের জীবন বিসর্জন দিয়েছেন, তাদের কারো গল্প।

— হিরোদের গল্প শুনবি? তুই একা শুনতে চাস। পেছন থেকে মতিয়ার এবং অন্যরা সাড়া দেয়, আমরাও শুনবো। আপনি বলেন।

যুক্তের মাঠে চলেছি এদের নিয়ে। চলতি কিছুটা বিশ্বাসের জন্য বসতে হয়েছে। যেনো অন্তহীন যুদ্ধযাত্রা প্রতিদিন। এর প্রথমকর্তবে, কোথায়, জানা নেই। এই যুদ্ধ প্রতিয়ার ভেতরে থেকে থেকে সবার বয়স যেনেওয়ার মধ্যে বেড়ে গেছে। কিন্তু মনের ভেতর পুষ্যে রাখা আবেগ-অনুভূতিগুলো মরে যাচ্ছেন। এটা যুবরাজ ভালো লক্ষণ। গেরিলা যুক্তের জন্য প্রয়োজন সজীব-সতেজ তারপর তারই প্রতিলিপি হয়ে বাবলু আমার সামনে দাঁড়িয়ে। যুদ্ধযাত্রার আগে শুনতে চাইছে তাদের কৃতী গাথা যারা এদেশের স্বাধীনতার জন্য নিজেদের প্রাণ বিসর্জন দিয়ে চিরদিনের জন্য অমর হয়ে রয়েছেন।

ভালো লাগে বাবলুর প্রস্তাবটা শনে। ওকে বসতে বলি। তারপর স্টেনগানটা কোল থেকে টেনে নিয়ে কাঁধে ঝুলিয়ে উঠে দাঁড়াই। ওরা অঙ্ককারে চুপচাপ বসে থাকে। ‘আমি সুভাষ বলছি’ থেকে বিনয়-বাদল-দীনেশের অংশটা বেছে নিই। চট্টগ্রামের স্কুল শিক্ষক সূর্যসেন। মাটারদা সূর্যসেন নামেই তিনি পরিচিত সবার কাছে। একজন অতি নিরীহ চেহারার স্কুল শিক্ষক একদল তরুণকে অগ্নিমন্ত্রে উজ্জীবিত করেছেন। ব্রিটিশদের এদেশ থেকে তাড়াতে হবে এবং এজন্য দরকার সশস্ত্র সহ্যায়। গতানুগতিক আন্দোলন এবং গান্ধীজির অসহযোগ-অহিংস আন্দোলনের ভেতর দিয়ে ব্রিটিশদের হাত থেকে এদেশ মুক্ত করা যাবে না। এ জন্য সে সময় রক্ত শপথে দীক্ষিত কিছু তরুণ হাতে তুলে নিয়েছে অন্ত। তাদের লক্ষ্য ছিলো ব্রিটিশ রাজশাস্ত্রকে ব্যতীত করা এবং এক এক করে ত্রুয়াবয়ে তার শেকড় এদেশের মাটি থেকে উৎপাটিত করা। এই মহৎ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই বিনয়-বাদল-দীনেশ এই তিনি যুবক এসেছে কোলকাতা রাইটার্স বিস্ট্রি-এ। পকেটে তাদের শুলিভর্তি পিস্তল। বুকের ভেতর দৃশ্য শপথ, ব্রিটিশ রাজ্যের ভিত্তি তারা নাড়িয়ে দেবেই। ধরা পড়বার সংজ্ঞাবনা একশো ভাগ। আর

ধরা পড়লে ফাঁসি হবেই। তবু তাদের কঠোর পণ : হোক, তাদের ইঙ্গিত লক্ষ্য অর্জনের পর তাদের যা কিছু হয় হোক। স্বাধীনতার মন্ত্র দীক্ষিত তিনি তরুণ নির্ভীক চিত্তে এগিয়ে যায়, দুকে পড়ে রাইটার্স বিল্ডিং-এ। তারপর প্রচও গোলাগুলি। ইতিমধ্যে তারা শুলি করে ধরাশায়ি করে ফেলেছে আইজি প্রিজন কর্নেল সিপ্পসনকে। তাদের মূল লক্ষ্য হলো সেক্রেটারি, কিন্তু সেই টাগেটি ফসকে গেছে। তবে আহত হয়েছে অনেকেই। রাজশাহীর পাহারাদাররাও ঝাপিয়ে পড়েছে তাদের ওপর। প্রচও গোলাগুলি। সহস্র রাইটার্স বিল্ডিং জুড়ে তুলকালাম কাও। কিন্তু এক সময় শুলি শেষ হয়ে আসে। আঘাত্যা করে বাদল। বিনয় ও দীনেশ শুরুতর আহত অবস্থায় ধরা পড়ে। তারাও আঘাত্যা করতে চেয়েছিলো। কিন্তু সফল হয় নি।

হাসপাতালে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থাপীনৈ চিকিৎসা চলছে বিনয় আর দীনেশের। তাদের বাঁচিয়ে রাখাটা অসম্ভব জরুরি। জেরা করে বের করতে হবে এদের নেপথ্যের চালিকাশক্তি এবং তাদের নেতাদের। ইংরেজ কর্তাদের ভাষায় এরা সন্ত্রাসী। আর এসব তৎপরতার নেপথ্য সদস্য এবং মূল নায়কদের খবরাখবর পাওয়া যাবে ধৃত ও মুর্মুর তরুণ বিনয় আর দীনেশের কাছ থেকে। তথ্য পাওয়ার পরই ইংরেজ সরকারের পক্ষে সমস্ত সন্ত্রাসী গ্রঞ্জকে জাল গুটিয়ে ধরে ফেলা যাবে। সম্পূর্ণ ঝড়িয়ে দেয়া সম্ভব হবে তাদের চিরলালিত স্বাধীনতার ব্রহ্মসৌধকে। এক সময় দীনেশের জ্ঞান ফিরে আসে। হাসপাতালের বিছানায়। মুর্মুর অবস্থায় ধৃত ব্যক্তিকে টাচার চালিয়ে কথা বের করে নেয়া সহজ ব্যাপার। দীনেশের জ্ঞাবে, তার ওপর প্রচও অভ্যাচার চালিয়ে তারা কথা বের করার চেষ্টা করবেই এবং সেই অবস্থায় শারীরিক এবং মানসিক সহ্য শক্তির ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে সেও হয়তো বলে উচ্চিত পারে তার সাথীদের কথা। তখন তার মনে হয়, তাকে বেঁচে থাকা চলবে না। মরাঙ্গু হবে। মারা পড়লে তো আর কথা বের করতে পারবে না। মাথায় তার প্রচও আঘাত। ব্যাডেজ করে রাখা হয়েছে। অতিকষ্টে সেই ব্যাডেজ সে আলগা করে ফেলে এবং মাথায় ক্ষতস্থানটায় নিজের আঙুল ঢুকিয়ে দেয়। টের পেয়ে দোড়ে আসে ডাঙুর, পাহারাদারের কিন্তু দীনেশ তার কাঞ্চ শেষ করে ফেলেছে ততোক্ষণে। ডাঙুরদের আপ্তাণ চেষ্টা সত্ত্বেও তারা আর দীনেশকে বাঁচাতে পারলেন না। আহত অবস্থায় ধরা পড়েও এভাবে নিজের মৃত্যু ডেকে এনে দীনেশ বাঁচিয়ে দিয়ে গেলো আর সব স্বাধীনতার সৈনিককে। আর বিনয়? সে সুস্থ হয়ে উঠলেও ফাঁসির কাষ্টে ঝুলে প্রাণ দিতে হলো তাকে।

গল্প শেষ হয়। ছেলেরা তাদের হাতিয়ার কাঁধে বসে থাকে একেবারে চৃপচাপ। বুরাতে পারি এ গল্প তাদের মনের গভীরে নাড়া দিয়েছে। তখন সবাইকে লক্ষ্য করে বলি, জয় বাংলার জন্য আমরা সবাই এক একজন বিনয়-বাদল-দীনেশ হতে পারবো না?

— পারবো, পারবো বলে ওঠে বাবলু ও মতিয়ার। অন্যান্য তাতে সায় দেয়। পেছন থেকে এরি মধ্যে কে একজন বলে ওঠে, হামাক পারিবাই হোবে। উমহারালা পারিলে হামরা কেনহে পারিমো নি। জয় বাংলা হামাক করিবাই হোবে গে!

জগদলহাটে সফল অভিযান ও মুক্তাহত সক্রিক

উজ্জীবিত ছেলের দল নিয়ে অধিকৃত বাংলাদেশে দুকে পড়ি ঘূরপথে। সোনারবান থেকে মতিকে নেয়া হয় সাথে। রাত ১২টার দিকে পৌছানো যায় ইঙ্গিত লক্ষ্যস্থলের কাছাকাছি। সামনে অক্কারে জয়ট বেঁধে থাকা গাছগাছলি যেরা জায়গাটাই জগদলহাট। প্রায় ৪০০ গজ পেছনে কাঁচ রাস্তার ওপর এসে আমাদের যাত্রিবাতি ঘটে। তারপর দুটো দলে ভাগ করা

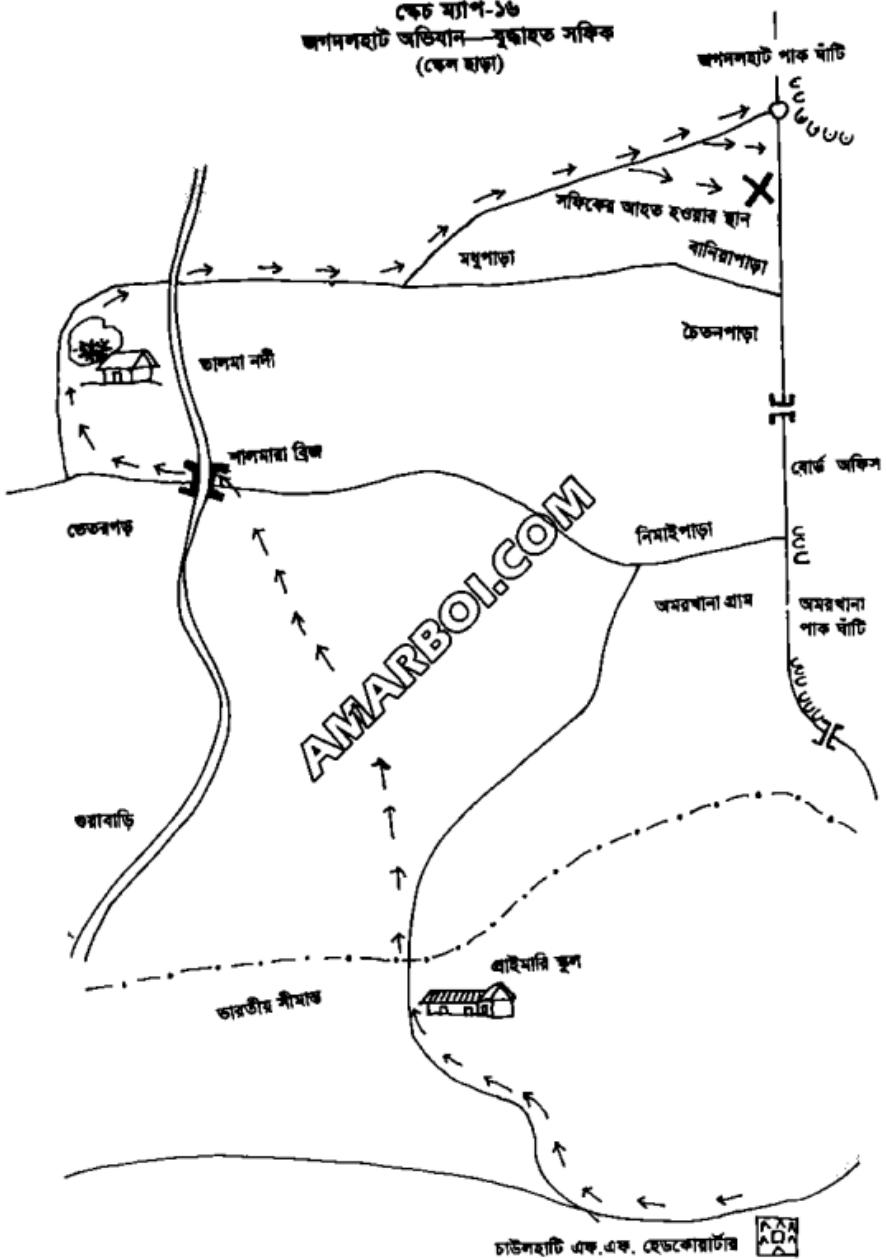
হয় ছেলেদের। আজকের মূল কাজ, টেলিফোন লাইন বিচ্ছিন্ন করা। টেলিফোনের থাম চার্জ দিয়ে উড়িয়ে দেয়া এবং সেই সাথে জগদলহাট পাক ঘাঁটির ওপর পেছন থেকে আঘাত হানা। একবার মূল যাবে ৮ জনকে নিয়ে চৈতন্পাড়া-জগদলের মাঝামাঝি জায়গায়। তাদের সাথে থাকবে বাবলু আর মতিয়ারও। আমি যাবো সোজাসুজি জগদলহাটে। মধু জয়নালসহ ১২ জন থাকবে এই দলে। দু'দলেরই কাজ হবে যতো বেশি করে সম্ভব টেলিফোনের তার কাটা এবং অস্তু দুটো করে টেলিফোনের থাম উড়িয়ে দিতে হবে বিশেষণের সাহায্যে। জগদলহাটের পাক ঘাঁটি এ তৎপরতা টের পেলে রিঃঅ্যান্ট করবেই। করুক। তাদের গোলাগুলি করে আটকে রাখার চেষ্টা করা হবে। কিন্তু তার ভেতরেই কাজ সারতে হবে। আজ অস্তু পক্ষে মণ্ডানেক তার কেটে নিয়ে শিয়ে হাতে তুল দেয়া হবে ক্যাস্টেন বন্দর। আর সেটা করা হবে আমাদের কাজের প্রমাণস্বরূপ। রিটার্ন পোস্ট হিসেবে নির্ধারণ করা হয় পেছনে বাম দিক্কার সামনের রাস্তার তিন মাথা। 'খোদা হাফেজ', 'জয় বাংলা' বলে একবার মূল রঙনা দেয় তার টাগেটিস্টলের দিকে। মূল দল নিয়ে এগিয়ে যাই আমি কাঁচা রাস্তাটা ধরে জগদলহাটের দিকে। এ রাস্তাটা আমাদের পরিচিত। তালমা পারের স্বূর্বক মতি গামছায় বাঁধা চার্জের পুট্টি আর অতিরিক্ত গোলাবারুদ কাঁধে করে চলেছে কোনো রকম দ্বিধা ছাড়াই।

কাঁচা রাস্তা ধরে ২০০ গজের মতো এসে ঢালু জমিতে নেমে পড়ি। রাস্তাকে ডান পাশের আড়াল করে বাঁদিকের খাদ দিয়ে এগিয়ে যাই অস্তু সজ্জিষ্ঠার সাথে। এর আগে এ পথে জগদল আক্রমণ করার সময় এদিকে এসেছি বেশ কয়েকবার। তাই মুক্তিযোদ্ধাদের আগমন সম্পর্কে শক্তপক্ষের এখন আর অজানা কিছু নেই এবং তার অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ফাঁদের ব্যবস্থা ও তারা করে রাখতে পারে। অবশ্য এ এলাকা দেখে আরেয়া নয়াদিয়ি এলাকায় চলে যাবার পর বেশ কিছুদিন পার হয়ে গেছে। এ পথে সর্বশেষ জগদলহাটের ওপর আঘাত হানা হয়েছিলো সেপ্টেম্বরের ১৯/২০ তারিখে। আজ সেপ্টেম্বরের ২৪ তারিখ। মাসাধিককাল এ পথে জগদলহাটে পাকবাহিনীর ওপর আক্রমণ আঘাত আসে নি। অতএব, এরকম একটা ধারণা করে নেয়া যায় যে, হয়তো পাকবাহিনী আচত্ত হয়ে গেছে এ পথে আর মুক্তিযোদ্ধাদের হামলা হবে না। আর তার ফলে তাদের একদিককার নিরাপত্তা ব্যবস্থার কড়াকড়ির ব্যাপারটা তারা হয়তো শিথিল করে ফেলেছে। অবশ্য, এটা সম্পূর্ণই একটা আন্দাজ-অনুযানের ব্যাপার। সামনে প্রকৃতপক্ষে কী আছে, সেটা জানবার সহজ উপায় আর এখন নেই। তাই সর্বোচ্চ সর্তর্কতা নিয়ে মাটির সাথে বুক লাগিয়ে ঘেঁষটে ঘেঁষটে এগিয়ে চলি। সামনে ভয়ানক শক্ত। শক্ত এলাকার শব্দ মাটি নয়, একফলি ঘাসকেও বিস্পাস নেই। বুকের ভেতরে তোলপাড়। দ্রাম দ্রাম করে বাজে ড্রাম। নার্তের ওপর ভয়ানক চাপ। গলা শুকিয়ে আসে। শরীর ঘেমে একসা হয়ে যায়।

এক সময় নিঃশব্দ আর নিরুদ্ধেগে পৌছানো যায় পাকা রাস্তার কাছাকাছি। মধুসূদন আর জয়নালকে ফিসফিসিয়ে ওদের কাজ বুঝিয়ে দিই। অন্ধকারে মাথা নেড়ে ওরা মোট সাতজন গড়িয়ে গড়িয়ে কাঁচা রাস্তাটা পার হয়ে ওপারে চলে যায়। জগদলহাট সোজাসুজি বাড়িয়রগুলোর আশপাশের ঝোপঝাড়ের ভেতরে ওরা অবস্থান নেবে। জায়গাটা মধুর পরিচিত। এর আগে ওই জায়গাটা থেকেই অতর্কিত আঘাত হানা হয়েছিলো শক্তির ওপর।

অবশ্যিট ছেলেদের নিয়ে বাঁ দিককার খেতবাড়িতে নেমে যাই। মধুসূদন তার দল নিয়ে ওত পেতে থাকবে কভারিং দল হিসেবে। শক্তির গতিবিধি সন্দেহজনক হলেই তারা গুলিবর্ষণ শুরু করে দেবে। আর সে অনুসারে অন্য দল দুটো সত্ত্বিয় হয়ে উঠবে। আন্দাজের ওপর তর

কেচ স্যাপ-১৬
জগদলহাট অভিযান—মুক্তাহত সক্রিক
(কেল রাষ্টা)





ভারতীয় ভূখণ্ডে শহীদ গোদাম গড়সের কবর পরিষ্কার করা হল ১১-এর সহযোগ্য দলিল

প্রকাশিত হওয়ার রুহনান ১২-এর কবর, উচ্চলপুর, পশ্চিমবঙ্গ

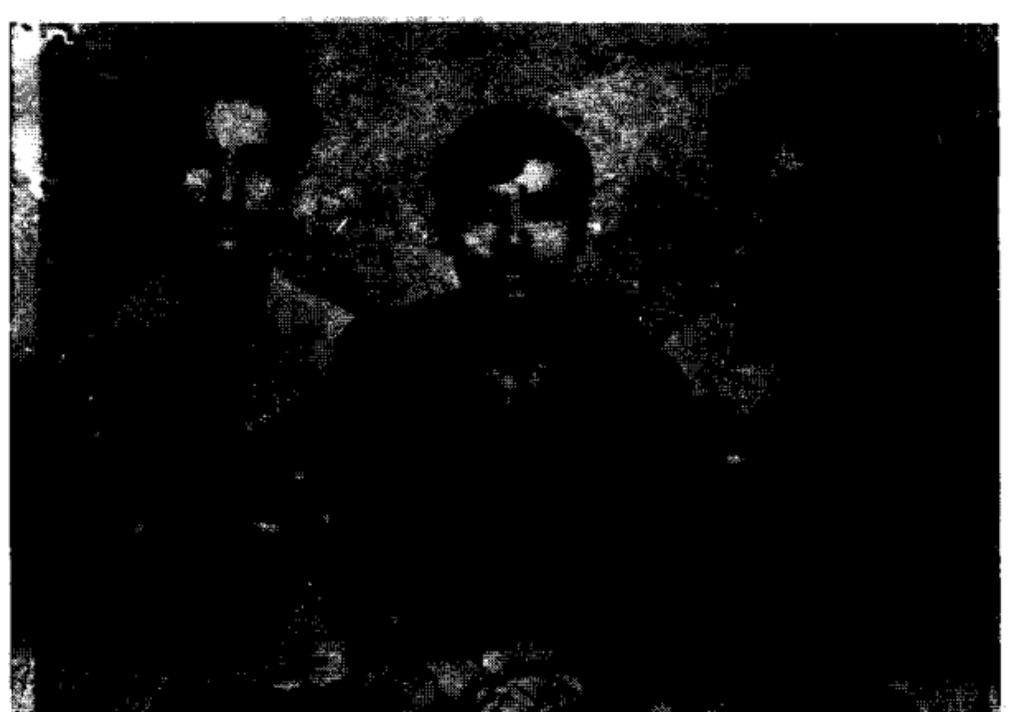


বাংলা সাহিত্য একাডেমি
পুরস্কার প্রদান করে আসছে

দুনিয়ার পাঠক এক হও ~ www.amarbo.com

বালু কেবল এইসব কিম্বা দুর্ভ

AMARBOI.COM



অক্টোবর '৭১ জলপাইজডি, (বী থেকে) মার্কিন তেহমান, সেখক ও খালেকুজ্জামান

পাকবাহিনীর বিধ্বস্ত বাহার, অমরখানা

AMARBOI



টাকের গোলায় বিধ্বস্ত পাকবাহিনীর বাহার,
ময়দানদিঘি, পঞ্চগড়

—বাংলাদেশ সরকার প্রতিষ্ঠানের বাণিজ্যিক পত্রিকা



বিষ্ণু প্রকাশ চন্দ্র মুখ্যমন্ত্রী, — পদবীটি আজোমুখ্যে প্রাপ্ত



ভারতীয় প্রজন্মের সম্বৰ্ধান প্রকল্পের বাস্তবায়িনীর ক্ষেত্রে এক অগ্রণী





তরু সেবক মাসজুদ, চাউলহাটি ইন্ডিয়া বেস-এর গাঢ়চালক

চেতনপাঠ্য মাল কুল

AMARBOI.COM



দুনিয়ার প্রথক এক হাতে ~ www.amarboi.com ~

করে কিছুটা এগিয়ে গিয়েই পাওয়া যায় টেলিফোনের খুঁটি বা থাম। চট করে পজিশন নিয়ে জায়গাটা জরিপ করে নিই। নিকব অঙ্ককার রাত। সামনে উচু পাকা সড়ক। দু'পাশের সার সার ঝাঁকড়া আমগাছের অঙ্ককারে কেমন ঠাণ্ডা মেরে পড়ে আছে। শক্রুর দখলে এখন এটা। তাই ষটকেও শক্রু বলেই মনে হয় এখন। যমদূতের মতো শক্রু উদয় হতে পারে যে-কোনো সময় এই পথের ওপর। অঙ্ককারে যতোদূর সংষ্টব দেখেননে নিতে হয় শক্রু সড়কের আশপাশে। অমরখানায় একনাগাড়ে গোলাগুলি চলছে। এনিকে জীবনের কোনো চিহ্ন নেই, কেবল বিকিমিকি জোনাকিদের ছুটাছুটি আর বিবি পোকাদের একঘেয়ে ধৰনি ছাড়।

শুরুকে ইশারা করতেই সে হাতিয়ারটা আমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে লুঙ্গি মালকোঁচা মেরে তৈরি হয়ে যায়। কোমর থেকে বের করে তার কাটাৰ বন্ধ প্লাস্টা ওৱ হাতে ধরিয়ে দিই। হাত থেকে সেটা চলে যায় ওৱ মুখে। দাঁত দিয়ে কামড়ে ধৰে প্লাস্টা। তারপৰ বাঁদরের মতো লোহার পিছল থাম বেয়ে উঠতে থাকে ওপৱে। এক সময় তৰতৰ করে উঠে গিয়ে তার আটকানো আংসেলে নিজেকে আটকে রেখে, সে কাজ শুরু করে দেয়। থামের নিচে হাঁটু গেড়ে বসে ওপৱের দিকে তাকিয়ে শুরু কাজ দেখতে থাকি। আর সামনের দিকে নজর রাখি। ৮/১০ গজ সামনে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে অন্যদের অবস্থান। পাকা সড়ক এবং জগদলহাটের দিকেই সবার লক্ষ্য। মতি আমার পাশে গুটিসুটি মেরে বসে রয়েছে। দৃষ্টি ওপৱের দিকে।

শুরু তার কাজ শুরু করে দিয়েছে। দ্রুত ঘচাং ঘচাং শুরুসে প্রথম তারটা কেটে ফেলে। আর ঝপাও শব্দ তুলে পড়ে যায় সেটা নিচে মাটিতে। পান্তে তারটাও পড়ে একইভাবে সামান্য সময়ের ব্যবধানে। সড়াও করে নেমে আসে শুরু পঞ্চ পথকে মাটিতে। ধূপ করে একটা শব্দ হয়। আর হতেই মনে হয়, শক্রু বুঁধি টেরে পেলো শোলো। শুরুকে টেনে ওইয়ে দিয়ে কিছুক্ষণ পড়ে থাকি থিৰ চুপচাপ। না, কোনো বিপন্ন ঘোলা না। দ্রুত থামের গায়ে কাটিং চার্জ লাগিয়ে ফিউজ প্রস্তুত করে ফেলি। তারপৰ মুক্তিতে পড়ে থাকা তামার তার গোটাতে গোটাতে সামনের থামের দিকে এগিয়ে যাবে। শক্রু হয়। পঞ্চগড় অভিযুক্ত লক্ষ্য করে।

এ থামটির তারও শক্রু একজুবাবে কেটে দ্রুত নামিয়ে ফেলে। নিজেও নেমে আসে। থামের গায়ে চার্জ লাগানো শেষ হয়ে আসে আমার। তখনি শুরু হয় পঞ্চগড় থেকে প্রচও কামানের গোলাবৰ্ষণ। মাথার ওপৰ দিয়ে পো'-ও শব্দধ্বনি তুলে উড়ে গিয়ে অমরখানার দিকে পড়তে থাকে শেলগুলো। দিগন্ত কাঁপানো শব্দ তুলে ফাটিতে থাকে শেল একটাৰ পৱ একটা। নিচের মাটি কেঁপে কেঁপে উঠে থৰথৰ করে। কয়েকটা শেল পড়ে কাছাকাছি। মনে হয় চৈতন্পাড়াৰ আশপাশে। জগদলহাটের শক্রুরাও তখন যেনো ফুঁসে ওঠে। হঠাৎ করেই প্রচও বেগে গোলাগুলি শুরু করে দেয় তারা। এ ধৰনের অকল্পনীয় শেল আৱ গোলাগুলি বৰ্ষণের ঘটনা সবকিছু শুলটপালট করে দেয়। তারগুলো দ্রুত বৃত্তাকার প্যাচে শুটিয়ে নিয়ে পিছিয়ে গিয়ে কাঁচা রাস্তার দিকে যেতে বলি ওদেৱ। কাজ সারতে সারতে ওৱা পিছিয়ে যেতে থাকে। শুধু হাবিব থাকে আমার সঙ্গে।

মধুসূদন ও জয়নালের দল এৰি মধ্যে শলিবৰ্ষণ শুরু করে দিয়েছে। একৰামুলেৱ দলও সক্রিয় হয়ে উঠেছে। আৱ বেশিক্ষণ সময় নেয়া যাবে না। ফিউজে দ্রুত আগুন লাগিয়ে মাথা নিচু করে দৌড়াতে থাকি প্রথম থাম লক্ষ্য করে। প্রথম থামের ফিউজে আগুন লাগাবাৰ মুহূৰ্তে বিক্ষেপিত হয় দ্বিতীয় থামেৰ চার্জ। প্রচও শব্দে কানে তালা লেগে যাবাৰ যোগাড় হয়। সে অবস্থায় প্রথম থামেৰ গায়ে লেপটে লাগানো চার্জেৰ ফিউজে আগুন দিয়ে প্ৰাণপণ

দৌড়ে ছুটে চলি পেছনে। বিজলির আলোর বিস্তুরণে পেছনের চার্জ বিস্ফোরিত হয়ে যেনো ধাক্কা মেরে ফেলে দেয় সামনের দিকে। মুখ খুবড়ে পড়ে যাই মাটিতে। এভাবেই কেটে যায় কিছুক্ষণ। একরামুলের দলের দিক থেকে ভেসে আসে পরপর দুটো চার্জের বিস্ফোরণ। ঠাঃঠাঃ শুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে মধুর দল পিছিয়ে আসতে থাকে। চারদিকে শুধু বিস্ফোরণ আর গোলাগুলি। নাকে বাকুদের গন্ধ। মাথার ওপর দিয়ে ছুটে চলে বন্যার মতো শুলি শ্রোত। একটা ভয়াল বিভীষিকাপূর্ণ পরিবেশ চারদিকে। ততীয় সেপ বলে দেয়, পালাও, না হলে বিপদ আসন্ন। সে অবস্থায় টলতে টলতে উঠে দাঁড়াই এবং রাস্তার নিচেকার খাদ দিয়ে দৌড়ে চলি সামনে ভুতুড়ে অঙ্ককারের ভেতর দিয়ে হোচ্চট খেতে খেতে।

মধুসূনের দল ফিরে এসে রাস্তার আড়াল নিতে পেরেছে। অন্যরাও পৌছে গেছে। একরামুলদের খবর নেই। মধুসূনকে সমস্ত হত্যার সচল রাখতে বলি যতোক্ষণ পর্যন্ত ফিরে না আসে ওরা। পাকবাহিনী এগিয়ে আসে না। তারা তাদের নিরাপত্তা ব্যবস্থার ভেতর থেকে একনাগাড়ে শুলি চালিয়ে যেতে থাকে। পঞ্চগড়ের দিক থেকে আরো শেল উঠে আসে। চাউলহাটির দিক থেকেও জবাব আসা শুরু হয়। শুরু হয় কামান যুদ্ধ। সামনের আকাশ দিয়ে উভয়পক্ষের শেল ছোটাছুটি করতে থাকে। বিস্ফোরণের পর বিস্ফোরণের প্রলয় ঘটে চলে উভয় পক্ষে। এর মধ্যে ট্রেক্স ও বাক্সারে আশ্রয় সৈনিকেরাও পাল্লা দিয়ে চালাতে থাকে তাদের মেশিনগান ও স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রের গোলাগুলি। এমন সময় শুলিন দিক থেকে হামাগুড়ি দিয়ে আসগার এসে খবর দেয়, শুলি লেগে সফিক আহত হয়েছে। মুমুর্ষ অবস্থা তার।

— কোথায় সে? জিগ্যেস করতেই আডুলের ইশ্বরায় আসগার সামনের দিকটা দেখিয়ে দেয়। সফিকের শুলি লেগেছে, মুমুর্ষ অবস্থা তার প্রেরণাটা মুহূর্তে তুলু তোলপাড় শুরু করে দেয় মনের ভেতরে। কোথায়, কীভাবে শুলি লেগেছে? বাঁচবে তো সফিক? এ ধরনের প্রশ্ন মনের গভীরে আদোলিত হতে থাকে। এই ক্ষেত্রজয়ই ওদেরকে শুলিবর্ষণ বন্ধ করার নির্দেশ দিয়ে সবিক্ষু শুছিয়ে নিয়ে দৌড়াতে থাকিয়ে সামনের অঙ্ককারে আবৃত গাছগাছালির ছায়া লক্ষ্য করে।

পাওয়া যায় ওদের মধুপাঞ্জাহাজীরা রাস্তাটার ওপর। ওকে ঘিরে বসে আছে একরামুলের দলের সবাই। মাটিতে শোয়া অবস্থায় সফিক ছটফট করছে। আহত সফিককে একরামুলরা কাঁধে করে দৌড়ে এসেছে এখান পর্যন্ত। এগিয়ে যাই মুমুর্ষ সফিকের কাছে। ম্যাচের কাঠি জ্বালাতে বলি। কে একজন যেনো সঙ্গে সঙ্গে সেটা জ্বালে। জ্বালতেই তার আলোয় দেখা যায় সফিকের রক্তাঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত দেহখানা। বাঁ পায়ের উরুর এক খাবলা মাংস উঠে গেছে। পিঠসহ অন্য আঘাতগুলোর গভীরতা বোঝা যায় না। শেলের আঘাত। সফিকের মাথা তুলে নিই হাঁটুর ওপর। একরামুলকে দ্রুত তার পায়ের ক্ষতস্থানটা গামছা দিয়ে বাঁধতে বলি। সফিক ছটফট করছে যন্ত্রণায়, কিন্তু জ্বান হারায় নি। যন্ত্রণাকাতের স্বরে স্পষ্ট করেই সে বলে, আমি আর বাঁচবো না। মরি গেইল তোমরা মোর বাড়িত খবর পৌছে দেন।

ওর কথায় একটা অস্ত্র আবেগ এসে গলায় আটকে থাকে। ওর ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা কাঁদতে থাকে।

— এটা কান্নার সময় না, ধমকে তাদের চুপ করতে বলি। সফিকের মাথায় মুখে হাত বোলাতে বোলাতে বলি, তুই মরবি না সফিক। এমন কিছু হয় নি তোর। আমরা তোকে ভালো করে তুলবোই। ক্ষতস্থান বাঁধাইদার কাজ শেষ হলে সফিককে কাঁধে তুলতে বলি। নির্দেশ পেতেই বটপট এগিয়ে এসে চারজন কাঁধে তুলে নেয় তাকে চ্যাং দোলার মতো

করে। সঙ্গে বাবলুসহ আরো' চারজনকে সঙ্গে নিয়ে একরামুলকে ছুটতে বলি চাউলহাটির পাকা রাস্তা বরাবর, যেখানে শুরুসেবক তার গাড়ি নিয়ে আমাদের অপেক্ষায় বসে আছে। একরামুল নির্দেশ মতো আহত সফিককে বহনকারী দলসহ দ্রুত এগিয়ে যেতে থাকে। এদিকে তিন চারজনের কাঁধে-পিঠে আবার দেড় মণের মতো তামার তারের বোঝা। তাই নিয়ে আমরা ক্লাস্ট বিশ্বাস আর ভেঙেপড়া দেহে দ্রুত ফিরতে থাকি।

রাত শেষ হয়ে এসেছে। ভোরের প্রথম আলোয় জেগে উঠেছে হিমালয়। নরম কোমল ঠাণ্ডা বাতাস শুধুবিশ্বাস ক্লাস্ট শরীর জুড়ে একটা স্লিপ সতেজ ভাব এনে দেয়। চাউলহাটির পাকা রাস্তায় পৌছুতেই সূর্য পেছন থেকে হেসে উঠে। সকালের সোনালি রোদে দেখা যায়, নদী ও বড় ভাই রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে আছেন আমাদের ফেরবার অপেক্ষা নিয়ে। অনেকটা টলতে টলতে এগিয়ে যাই তাদের দিকে। নদী এগিয়ে আসেন, ঢোকে-মুখে তাঁর স্বাগত জানাবার হাসি। এগিয়ে এসে গায়ে হাত দিতেই যেনো আঁতকে উঠে বলেন, কেয়া হ্যামাহুবুব? তুমহারা কোই প্রোবলেম? ব্লাড কিধার সে আয়া?

— মেরা ব্লাড নেই স্যার, ইয়ে সফিককা ব্লাড। কিধার হ্যায় সফিক? কাঁহা হ্যায়?

নদার কঠে উদ্বেগ আর আশ্বাসের ধৰনি। ভোট অরি ফর হিম, হি হ্যাজ সেন্ট টু বাগডোগড়া কৰ্ষাইত মিলিটারি হস্পিটাল। হি ইজ ব্যাডলি ইনজিউরড বাট হিজ লাইফ নট ইন ডেঞ্জার। উহু জলদি ছে জলদি আচ্ছা হো যায়েগা। সুরক্ষা গলায় যথেষ্ট প্রত্যয়ের ছাপ। তখন তাকে বলি, লিজিয়ে স্যার, আপকা ডকুমেন্ট সেই ইজ দ্য ডকুমেন্ট অব আওয়ার সাকসেসফুল অপারেশন।

কথাগুলো বলে আমি তামার তারের বোঝার সাথে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করি। তার বহনকারী ছেলেরা তখন তারের বালিলগুলো পাকা সম্ভবকর ওপর নদার সামনে নামিয়ে রাখে। নদা সেদিকে তাকিয়ে ঢোক বড় বড় করে বুক্স প্রাতনা টেলিফোন ওয়্যার কাটা হ্যায় তুম?

— ইয়েস স্যার। আওরতি চারজন টেলিফোন পিলার উড়া দিয়া হ্যায়।

— ইজ ইট? বিশ্বিত সেচুটন্দা আমার দিকে ভালো করে তাকান। তাকান ক্লাস্ট পরিশ্রান্ত প্রায় ভেঙেপড়া ছেলেদের মুখের দিকে। তারপর বড় ভাই নুরুল হকের দিকে। তখন তার মুখ থেকেই স্বগতোভির মতো বেরিয়ে আসে, আই অ্যাম প্রাউড অব ইউ। রিয়েলি আই অ্যাম প্রাউড অব ইউ অল। ইউ ডিড ইয়োর জব পারফেক্টলি। সফিক ইনজিউরড হ্যাম। দেখলে না, তুমহারা দেশ জলদি সে জলদি স্বাধীন হো যায়েগা। জরুর তুমকো জয় বাংলা মিলেগা।

বড় ভাই এগিয়ে আসেন। তার কষ্ট থেকেও বাবে পড়ে অপার মমতা, বলেন, সারারাত বড় কষ্ট করেছো। আহত সফিককে সেফলি আনতে পেরেছো। ওকে ক্যাটেন নদী তাড়াতাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছেন বাগডোগড়া হাসপাতালে। ওর আধাত শুরুতর। কিন্তু ভালো হয়ে যাবে সে। চলো, ক্যাম্পে চলো। বিশ্বাম নেবে, থাবে—।

ডানে হিমালয়ের বিশাল কালো শরীর। মাথায় তার বরফের মুকুট। সোনালি রোদের আলোয় চকচক করছে। দারুণ মন-কাড়া সেই দৃশ্য। সেদিকে তাকিয়ে মনের গভীরে চেপে রাখা সফিকের জন্য দৃঢ়বোধগুলো হাল্কা হয়ে যেতে থাকে। সবাই মিলে তখন ফিরতে থাকি পুকুরের দিকে।

শক্তির রিইনফোর্মেন্ট এবং আবার অভিযান

বাবলু-হাবিব দুপুরে অবজারভেশন পোষ্ট থেকে ফিরে এসে রিপোর্ট দেয়। ওদের রিপোর্ট থেকে জানা যায়, আজ পঞ্জগড় থেকে অমরখানা অবধি ২/৩টা গাড়ি এসেছে। নতুন আর্মি এসেছে গাড়িগুলোতে করে। দুদিন ধরে অমরখানায় প্রচণ্ড যুদ্ধ চলছে। বেরো যায়, অমরখানা ঘাঁটি কামড়ে পড়ে থাকা দলের শক্তি বৃদ্ধি ঘটানোর জন্যই নতুন এই সেনা সদস্যদের এনে রিইনফোর্মেন্ট অর্থাৎ শক্তি বৃদ্ধি করছে ওরা। গাড়িগুলো বোর্ড অফিসের কিছুটা কাছাকাছি এগিয়ে এসে সৈনিকদের নামিয়ে আবার পিছিয়ে নিরাপদ স্থানে চলে গেছে, অমরখানা মূল ঘাঁটি পর্যন্ত আসে নি সরাসরি টাঙ্গেটি হবার আশঙ্কায়।

বাবলুদের পেশ করা এই রিপোর্টের ওপর বিশ্বেষণমূলক আলোচনা বৈঠক বসে নদ্দার ত্ত্বাতে। অবজারভেশন পোষ্ট থেকে টেলিস্কোপ দেখা অমরখানায় শক্তিপক্ষের গাড়িবহরের আগমন এবং তাদের তৎপরতার কথা ঝুঁটিয়ে ঝুঁটিয়ে জিগ্যেস করেন নদ্দা। এরপর বিস্তারিত আলোচনা হয় শক্তির বর্তমান স্ট্র্যাটেজিক অবস্থান এবং তাদের যুদ্ধ তৎপরতা নিয়ে। অমরখানায় পাকাপোক্ত ঘাঁটি পেড়ে বসে থাকা পাকবাহিনীকে আইসোলেটেড বা বিচ্ছিন্ন করতে না পারলে, তাদের সেখান থেকে হটানো যাবে না। এজন্য প্রয়োজন তাদের একমাত্র যোগাযোগ রুট অমরখানা-পঞ্জগড় পাকা সড়কের সংযোগ সূত্র কেটে ফেলা। কিন্তু সেটা কীভাবে সম্ভব?

দেবনগরের দিক থেকে নিয়মিত মুক্তিফৌজ বাহিনী ঘাঁটি মধ্যে বেশ ক'বাৰ অভিযান চালিয়েছে। তারা জগদলহাটের কাছে পাকা সড়ক অবধি পৌছে তা দখল করেও ফেলেছিলো, কিন্তু স্থায়ীভাবে ধরে রাখতে পারেন নি। পাকা সড়ক দখল করে রাখতে পারলে, পাকবাহিনীর যোগাযোগ রুট বন্ধ করে যেত এবং এর ফলে অমরখানায় বিচ্ছিন্ন এবং অবরুদ্ধ পাকবাহিনী সারেভার করতে সক্ষম হতো, কিন্তু তাদের অমরখানা ছেড়ে যে-কোনো 'এসকেপ রুট' দিয়ে পালাতে প্রতিষ্ঠিত ছিলো। চাউলহাট ইউনিট বেসের বর্তমান শক্তি দিয়ে রাতের জন্য পাকা সড়ক দখলে কর্তৃত যেতে পারে। কিন্তু তা ধরে রাখা যাবে না। দিনের বেলায় জগদলহাট-অমরখানা ঘাঁটি ঘাঁটি থেকে উঠে আসা পাকবাহিনী পাকা সড়ক কাট করে ধরে রাখা এফ.এফ. দলকে একেবারে পিষে ফেলবে। ওদের শক্তি আর ফায়ার পাওয়ারের সামনে কিছুতেই টেকা যাবে না। এটা আমার অভিমত। ক্যাট্টেনের আলোচনার টেবিলে তিনি আমার মতামত জানতে চাইলে এমনভাবে আমি পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করি।

বড় ভাই নুরুল হক তাঁর বক্তব্যে বলেন, এই ধরনের অ্যাকশনে যাওয়া সম্ভব নয়। ইট ইজ ইলেক্ট্রনিক্স। এটা হবে সুইসাইডল ব্যাপার। এ ধরনের অপারেশনে গেলে কেউই ফিরতে পারবে না। আমরা সবাইকে হারাবো। নদ্দা নিবিষ্ট মনে শোনেন সব কথা। তারপর চিনামগ্ন থবে বলেন, তাহলে? তাহলে কি কিছুই করা যাবে না!

— একটা কাজ করা যেতে পারে। উইক্যান গো অ্যান্ড ডেমিলিশ দ্য ব্ৰিজ চৈতনপাড়া। উহ ব্ৰিজ হামনে একবাৰ ডেমোলিশ কিয়া থা, বাট দে রিপিয়ার দ্য ব্ৰিজ এগেইন। উই ক্যান টেক অ্যানাদার চাপ। নদ্দার কথার উপরে আমি এ প্ৰস্তাৱ রাখি। প্ৰস্তাৱটা নিয়ে কিছুক্ষণ আলোচনা হয়। তারপর নদ্দা তাৰ সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেন, ওকে বয়েজ, তোমোৱা আজ রাতে যাও এবং চৈতনপাড়া ব্ৰিজ উড়িয়ে দিয়ে এসো। এতে অন্তত ২/১ দিনের জন্য হলেও ওদের যোগাযোগ রুট বন্ধ থাকবে।

শুল্কসেবক রাত ন'টায় আমাদের নামিয়ে দিয়েছে পাকা রাত্তার ওপর। সীমান্ত এলাকার

ভাঙ্গচোরা হাঁটা পথে তালমা নদী পেরিয়ে গুয়াবাড়ি পৌছানো গেছে। তালমা নদী গুয়াবাড়ি গ্রামের পেছন দিয়ে উত্তরে চলে গেছে। এখানে নদীটাই উভয় দেশের সীমানা হিসেবে বিবেচিত। অর্থাৎ নদীর মাঝ বরাবর সীমানা। এপারে বাংলাদেশ, ওপারে ভারত।

আমাদের উপস্থিতি জোনাব আলীদের গ্রামে যেনে রীতিমতো উৎসব ভেকে আনে। তার বাবা আমাদের বাড়ির আঙিনায় বসবার ব্যবস্থা করেন। অন্য লোকজন ব্যস্ত হয়ে পড়েন আদর-আপ্যায়নে। মাটির ওপর বিছানো তালপাতার পাটিতে বসে পড়ি আমরা। অনেকদিন আসা হয় নি এদিকে। যুদ্ধের প্রথমদিককার বন্ধু এরা। সব ধরনের সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলো তখন এ গ্রামের মানুষজন। যুদ্ধের ধক্ক এদের ওপর দিয়ে যাচ্ছে দারুণভাবে। একেবারে সীমান্ত লাগোয়া গ্রাম বলে ওপারের নানা ধরনের উৎপাত তাদের প্রায় প্রতিনিয়ন্তই হজম করতে হচ্ছে। মুক্তিবাহিনীর তরফ থেকে সহযোগিতা দেয়ার কারণে তারা এর মধ্যে জয় বাংলার লোক হিসেবে চিহ্নিত হয়ে পড়েছে। ফলে ভেতরে যাবার উপায় নেই। আবার সীমান্তের ওপারের বি.এস.এফ.সহ অন্য মানুষজনও নানা কারণে তাদের ওপর নাখোশ থাকায় সেদিকটাতেও সহজে যাওয়া যাচ্ছে না।

জোনাব আলীর বাবা এ ধরনের কথা বলতে বলতে কেঁদে ফেলেন। তাঁর সঙ্গে ফোপাতে থাকে আরো ক'জন মুরব্বি ধরনের লোক। গামছায় শুট দিয়েও চোখ মুছতে দেখা যায় কাউকে কাউকে। বড় দুর্ঘস্থয় চলছে তাদের। মুক্তিবাহিনীর এদিকে কৃষ্ণ তৎপরতা ছিলো, তখন তারা বেশ সাহসী হয়ে উঠেছিলো। তাদের জীবনযাত্রা সহজ হয়ে উঠেছিলো। সোনা মিয়াও গেলো হয়িয়ে। জোনাব আলী আশ্রয় নিলো গিয়ে নাকগুঞ্জ মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্পে। গুয়াবাড়িসহ তাৎক্ষণ্যে এলাকা আবার হয়ে উঠলো অরাক্ষিত। মুরব্বির হয়ে উঠলো দারুণ নিরাপত্তাহীন। এ অবস্থায় আবার মুক্তিযোদ্ধা এবং সেই পুরুষদের প্রতিদ্বন্দ্বীর এভাবে হঠাতে করে তারা নিজেদের মধ্যে পেয়ে যেনো নতুন করে প্রাণ ফিরে পেয়েছে আর সেটা বোঝা যায় তাদের আবেগ-উচ্ছ্বস থেকে। প্রবল উৎসাহের আতিশয়ানিয়ে এরা কথা বলে চলেছে। নানা কথা। অনেক অভিযোগ। অন্তহীন সমস্যা আর তাদের প্রবল অভাব ইত্যাদির কথা। এতেদিন যা তাদের মনের গভীরে চাগা পড়েছিলো। সবাই এক প্রশ্ন, জয় বাহ্ন হতে আর কত দিন সময় লাগবে। এই আজার যাইবো কতোদিনে। এদের কথার জবাব দেয়া যায় না। সারাদেশের সীমান্তবর্তী জনবসতিগুলোর অবস্থা বর্তমানে কমবেশি একই রকম। গুয়াবাড়ি গ্রাম তো কেবল একা নয়, এ ধরনের শত সহস্র গুয়াবাড়ি গ্রাম হয় নিশ্চিহ্ন হয়ে গোছে যুদ্ধের থাবায়, নয়তো এ ধরনের অস্থিরতা, নিরাপত্তাহীনতা আর স্বাধীনতার প্রবল আকাঙ্ক্ষা নিয়ে দিন শুজরান করছে।

শ্যামল কোমল তার মুখ

জোনাব আলীর খোঁজ কেউ দিতে পারে না। কেবল তার বাবা বলে, ‘সে কি আর মানুষ আছে বাবা, শিয়ালের মতোন লুকাইয়া পলাইয়া বেড়াইতেছে।’ জোনাব আলীকে গাইড হিসেবে নিতে এসেছিলাম, কিন্তু বোঝা গেলো সে বাড়িতে নেই। এরি মধ্যে চালভাজা আর পাটালি শুড় গামছায় করে এনে আমাদের সামনে হাজির করেছে মাদ্রাসায় পড়া ছেলে জোনাব আলীর ছোট ভাইটি। ১৬/১৭ বছরের তরুণ। তালেব এলেম গোছের চেহারা। কিন্তু বেশ স্মরণিত এবং চটপটে।

বৃক্ষ বিনীতভাবে বলেন, নেন বাবা, অনেক দিন পর আইছেন, খালি চাউল ভাজা

খান গুড় দিয়া।

বৃক্ষের খাওয়ানোর আগ্রহকে নষ্ট করতে ইচ্ছে হয় না। পারা যায় না। এরা নিজেরাই গভীর অভাব-অন্টনের ভেতরে বসবাস করছে, তার ভেতরেই যা ঘরে ছিলো তাই দিয়ে আপ্যায়নের ব্যবস্থা করেছে। সবাইকে নিতে বলি। নিজেও নিই এক মুঠ। শক্ত মোটা চাল। মুড়মুড়ে এবং অসঙ্গ সুস্বাদু লাগে খেতে। মদ্রাসার তালের এলেম কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিসিয়ে বলে, আপনারে ছোড় ভাবি ডাকতাছে, কথা কইতে চায়।

— আমার সঙ্গে? কেনো? অনেকটা অবাক হয়ে জিগ্যেস করি তাকে। চাল ভাজা চিবুনো বৰ্ক হয়ে যায়।

— কিছু একড়া কইতে চায়, আহেন। ছেলেটার গলায় যেনো অনেক পরিচিত একজন মানুষের দাবি। এড়ানো যায় না। জোনাব আলীর দুই বউ এবং বেশ কটা বাচ্চাকান্দা ও রয়েছে এটা জানি। আর এই কারণে শুকনো দুবলা শীর্ণ চেহারার বিশ্বস্ত মানুষটা আমাদের বহু গালাগাল ও তনেছে। পিন্টুই মুখর ছিলো এ ব্যাপারে বেশি। গাইড জোনাব আলী রাতের অঙ্ককারে চলতি পথে সামান্য ভুল করলেই ধর্মক দিতো পিন্টু অনেকটা এভাবে, কি মিয়া কার চাঁদমুখ চিন্তা করতেছে, বড়জনের, না ছেটজনের? জোনাব আলী চেহারা তখন কুঁকড়ে গিয়ে সত্যি দেখবার মতো হতো। মিনিমনে গলায় কেবল বলতো সে, ভুল হয়া গেছে, ঠিক কইতা নিতাছি।

দুঁধের পাশ দিয়ে ছেলেটি আমাকে নিয়ে যেতে থাকে। তাকে অনুসরণ করে এসে পৌছই পেছনের দিকটায়। একটা ছোট ছনের ব্যানারের সামনে। চুলো জুলতে দেখা যায়। এখান থেকেই চাউল ভেজে মেহমানদের অন্তর্মুখের জন্য পাঠানো হয়েছে বোঝা যায়। ছেলেটা ঘরটার দিকে তাকিয়ে বলে, ভাবিলেন্টো আইছি কমাত্তার সাবরে।

ছেলেটির কথার সঙ্গে সঙ্গে কুপি হাতে বের হয়ে আসে একজন কম বয়সী মহিলা। গায়ের রঙ শ্যামলা। সুন্ত্রী তার পুরুষান্বয়। নাকে নোলক, মাথায় আঁচল। চোখের দৃষ্টি অবসন্ত। ল্যাঙ্গের কোমল অঙ্গের অস্তুত সুন্দর দেখায় শ্যামল এই রমণীটিকে। সামনে দাঁড়ানো এই লক্ষ্মীপ্রতিম মহিলাকে দেখে বুকের মধ্যে যেনো প্রচণ্ড ধাক্কা লাগে। মনে প্রশ্ন জাগে, জোনাব আলী একে এখানে এভাবে অরক্ষিত অবস্থায় রেখে গেছে কেনো? যে-কোনো সময় হায়েনার পাল এসে হামলে পড়ে সর্বনাশ করে দিয়ে যেতে পারে এর নির্মল জীবনের।

— কিছু বলবেন? ডেকেছেন কেনো?

ছবি হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা মহিলার নোলকটা নড়ে ওঠে। তারপর স্থির কোমল স্বরে বলে ওঠে,

— তেনার খবর আছে।

— কার, জোনাব আলীর?

— জ্ঞে।

— কী খবর? কোথায় সে?

— কাউরে বিশ্বাস নাই, লুকাইয়া লুকাইয়া বেড়ায়। আপনেরা আইলে কেবল তার ঠিকানা জানাইতে কইয়া গেছে। আর কাউরে কইতে মানা করছে।

সোনারবামের কাছাকাছি যে বাড়িতে জোনাব আলীকে আজ রাতে পাওয়া যাবে, সে ঠিকানাটা জানায় মহিলা। তারপর বলে, মানুষডার শান্তি নাই। আপনেরা তারে দেইখ্যা তইন্যা রাইখ্বেন।

যুক্তিযোক্তারা যে-কোনো সময় গুয়াবাড়ি গ্রামে আসতে পারে। তারা এলে গাইড হিসেবে জোনাব আলীর প্রয়োজন হবে। তারা এসেই যাতে তাকে সহজে খুঁজে পেতে পারে, এজন্য সে তার ছেট বউকে তৈরি করে রেখে গেছে। দারুণ ব্যাপার এটা! সমগ্র দেশবাসী আজ যুক্তে জড়িয়ে পড়েছে। দ্রুত যুদ্ধটা অঙ্গসর হচ্ছে জনযুক্তের নিকে। এ যুক্তের প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে জোনাব আলীর অস্তঃপূরবাসিনী দ্বিতীয়পক্ষের বউটিও। যোগাযোগ সেটওয়ার্কের ভেতর দিয়ে গুয়াবাড়ির এক অশিক্ষিত, অঙ্গ অস্তঃপূরবাসিনী এই বউটি যে ভূমিকা রাখলো, তা যেনো বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য, বিশেষ করে গেরিলা যুদ্ধের ক্ষেত্রে সেটা যোগ করলো এক নতুন মাত্রা। মনে মনে ভাবি, এভাবেই সম্ভব হয় একটা জাতির সৃষ্টি, তিলে তিলে আর সেটা স্বাধীনতা যুক্তে জয়লাভ করার মাধ্যমেই। যেমনটা হয়েছে কিউবায়। যেমন চলছে ভিয়েতনামে, লাওস, কর্ডোভিয়া কিংবা প্যালেস্টাইনে। অধিকৃত বাংলাদেশে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ দ্রুত চলে আসছে স্বাধীনতার পক্ষে। এ ধারা চলতে থাকলে বঙ্গবন্ধুর সেই দৃশ্য কঠের আহানে সাড়া দিয়ে প্রতিটি ঘরে ঘরে একদিন সত্যিকার অর্থে দুর্গ গড়ে উঠবে। সেদিন অধিকৃত দেশের দখলদার পক্বাহিনী যতো শক্তিধরই হোক না কেনো, তাদের পালাতে হবেই। কোনো অবস্থাতেই ধরে রাখতে পারবে না তারা এদেশকে।

কালো খোঁয়ার আড়ালে উড়ে যাওয়া ব্রিজ চৈতন্যপাড়া

জোনাব আলীকে পাওয়া যায় নির্দিষ্ট জায়গা মতো। অনেকদিন পর আজ আবার সে আমাদের সাথী হয়। সোনারবানের হজুর চা না খাল্লিয়ে ছাড়েন না। দোয়া করেন যেনো কামিয়াব হয়ে সুস্থ দেহে আমরা সবাই ফিরে পৌরি। তালমা পারের মতি যেনো তৈরি হয়েই ছিলো। সাথী হয়ে যায় সে সঙ্গে সঙ্গেই) বলে, দেন কি জিনিস বইতে হইবো।

এক্সপ্রেসিভের বোঝা কাঁধে নিয়ে হেঁজ সে আগের রাতের মতো। এরপর একনাগাড়ে হেঁটে চলা।

পরিচিত পথ। বেশ ক'বাৰ পাঞ্জি ভাঙতে হয়। অঞ্চেৰ শেষ হতে চললো। হিমালয় থেকে নেমে আসা হিমেল হাওয়ার স্পৰ্শ এর মধ্যেই শীতের আগমনী বার্তা জানিয়ে দিয়েছে। রাতে বেশ ঠাণ্ডা পড়ছে ক'দিন ধরে। কাদা-পানিতে পা ফেলতেই সারা শরীর শিউরে ওঠে। দ্রুতই শীত নামছে। পোশাক-আশাকের অবস্থা খুবই কুরুণ। খালি পায়ে লুঙ্গি শার্ট ইউনিফর্ম হিসেবে ব্যবহার করে আর বেশিদিন এভাবে অপারেশনে বেরনো যাবে না। যুক্তোপযোগী শীতবন্ধের প্রয়োজন হয়ে পড়বে অল্প ক'দিনের ভেতরেই। দেখা যাক কৃতপক্ষ এ ব্যাপারে কতোটুকু করেন? নদাকে জানানো হয়েছে। তিনি এজন্য ইনডেট তৈরি করছেন বলে জানিয়েছেন।

মধুপাড়া পেরিয়ে ডাবুরডাঙা গ্রামের রাস্তার তিন মাথার বাঁশঝাড়ের তলায় পৌছানো যায় একসময়। মতি চলে যায় তার দোষ্টের খোঁজে। সেই ফাঁকে ছেলেদের কিছুক্ষণ বিশ্রাম এবং চূড়ান্ত গুরুত্বির বিবরতি। পুরনো কমান্ডারদের ভেতরে শুধু রয়েছে একরামুল আৰ মধু। পিন্টু, মুসা, মোতালেব ও চৌধুরী আজ দলে নেই। এদিককার রাস্তাঘাট, মানুষজন ও অপারেশনের ধারা ইত্যাদি ব্যাপারে তারা যথেষ্ট অভিজ্ঞ হয়ে উঠেছিলো। আজকের অপারেশনে ওদের অভিবটা তাই আমরা বোধ করি দারুণভাবে। আজ এ ব্যাপারে নির্ভর করতে হচ্ছে একরামুল, মধু, জয়নাল, বকর, মতিয়ার ও বাবলুদের ওপর। একরামুল ও মধু ছাড়া অন্যারা সিরিয়াস ধরনের যুক্তের টেস্পারামেন্ট সম্পর্কে একেবারেই অনভিজ্ঞ। এ

অনভিজ্ঞতার জ্ঞের হিসেবেই আগের রাতে সফিককে আহত হতে হয় গুরুত্বাবে। আজকের কাজটা যেমন বিপদসঙ্কল, তেমনি কঠিন। দেখা যাক আজ রাতে কি হয়!

আজ দলে ১৮ জন। মতি আর জোনাব অলীসহ ২০ জন। ওদের সবাইকে চূড়ান্ত ব্রিফিং দিই। কার কি কাজ, সেটা বুঝিয়ে দিই ভালোভাবে বারবার করে।

এরি মধ্যে মতি ফিরে আসে। না, তার দোষ বাড়িতে নেই। কোথায় গেছে, তাও জানতে পারে নি। মতির দোষকে পাওয়া গেলে ব্রিজের শক্রপক্ষের অবস্থান সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণাটা পাওয়া যেতো। তাকে না পাওয়ায় সেটা হলো না। এখন আমাদের এন্টতে হবে সম্পূর্ণ অনুমানের ওপর নির্ভর করে। আর এ অনুসারেই শুরু হয় যাত্রা।

কিছুন্ন এগিয়ে রাস্তার মোড়টা পার হয়ে বাঁ দিককার খেতবাড়িতে নেমে পড়ি সবাইকে নিয়ে। এবার সদাগ্রস্ত সতর্কতার সঙ্গে এন্টতে হয় সোজা লাল স্কুল বলে পরিচিত প্রাইমারি স্কুলটার পাকা দালানঘর লক্ষ্য করে। ব্রিজ রক্ষাকারী দল মাঝে মাঝে এ স্কুল ঘরে বিশ্বামৈর জন্য এসে থাকে বলে জানা গেছে। সুতরাং স্কুল ঘরটা আগে দেখা দরকার। স্কুলের কাছাকাছি পৌছে সবাইকে শোয়া পজিশনে যেতে বলি। তারপর হাঁটু আর ক্লুইয়ের ওপর ভর করে সাপের মতো এগিয়ে চলা। স্কুলের নাম লাল স্কুল হলেও তার পাকা দালান ঘরটার রঙ সাদা। কেনো যে এর নাম হয়েছে লাল স্কুল, কে জানে? সাদা রঙের স্কুল ঘরখানাকে রাতের অক্ষকারে স্পষ্ট দেখা যায়। ওটা লক্ষ্য করেই এখন আমাদের ক্রমসূচি এগিয়ে যাওয়া একইভাবে। স্কুলের মাঠের পাশে পৌছানো যায় অবশ্যে। এরপর মড়ার মতো শুয়ে থাকা কিছুটা সময়। ইশারা করতেই বাবলু আর হাবিব এগিয়ে যায়। কভারে থাকি আমরা ওদের গমন পথের দিকে তাকিয়ে। স্কুলের ভেতর পাকসেনারা থাকলে প্রস্তুত্যক্তা তুলকালাম কাও বেধে যাবে। কিন্তু হয় না কিছুই। ওরা ফিরে আসে হামাগুড়ি ফুল্লার ভঙ্গিতে। এরপর দ্রুত এগিয়ে গিয়ে লাল স্কুলের পাশে অবস্থান নেয়া হয়। এবার এন্টতে হবে ব্রিজে। ওখানে শক্রপক্ষের নিরাপত্তা ব্যবস্থা কেমন দেখতে হবে। আগের বার প্রতিমিজ ওডানোর সময় রীতিমতো মুদ্দ করে ব্রিজের দখল নিতে হয়েছিলো। আজও হয়তো আই করতে হবে। দেখা যাক না, কি হয়!

স্কুল ঘরের পেছনে কাঁচা রাস্তার আড়াল নিয়ে ব্রিজমূরী হয়ে পজিশন নেয় সমস্ত দল। অমরখানা ঘাঁটি দারুণভাবে জাহাজ। প্রচণ্ড শুলিবিনিয় চলছে সেখানে। আকাশযুদ্ধ তথা কামানের গোলাবিনিয় আপাতত বক্ষ, তবে শুরু হতে পারে যেকোনো সময়। একটা অগ্নিগর্ভ যুদ্ধক্ষেত্রের দেড় দু'মাইল পেছনে পাকা সড়ক বরাবর শুয়ে আছি আমরা, যুদ্ধের দিকে মুখ করে। অদ্ভুত রোমাঞ্চ লাগে ব্যাপারটাতে। সামনে ভয়াবহ যুদ্ধের তাওবলী লাল চলছে। ঠিক তার পেছন দিকে অবস্থান নিয়ে আমরা তার জাহাজ রূপ দেখছি, উন্হি আর সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে উপলক্ষ করছি। সম্ভবত একেই বলে যুদ্ধের মধ্যে বসবাস।

একরামুলসহ অন্যদের কভারে থাকতে বলে সামনে এগিয়ে যাই। সঙ্গে থাকে বাবলু আর হাবিব। পাকা সড়কের ঢালু প্রান্ত দিয়ে অনেকটা হামাগুড়ি দেয়ার ভঙ্গিতে সন্তুষ্পণে এন্টতে থাকি। যেকোনো ধরনের পরিস্থিতির মোকাবেলা করার জন্য সমস্ত ইন্দ্রিয় থাকে সজাগ। প্রথমে সিদ্ধান্ত ছিলো একযোগে সবাইকে নিয়ে ব্রিজের ওপর হামলে পড়বো। পরে সিদ্ধান্ত পাল্টাতে হয়েছে এই ভেবে যে, এতে করে যুক্তি নেয়ার পরিমাণটা বেশি হয়ে যাবে। ব্রিজের ওপর প্রহরারত শক্রপক্ষের লোকজন রূপে দাঁড়ালে দলের সমূহ ক্ষতি হয়ে যেতে পারে।

ওদের দু'জনকে নিয়ে ব্রিজের কাছাকাছি দিল্লিত আমগাছের দিকে এগিয়ে যাই। কাঁধে

ফিতেয় বৌলানো টেনগান ডান পাজরে শক্ত করে সেঁটে ধরা, আঙুল ঢিগারে। এভাবে এগুতে কষ্ট হয়, পেছনের দুঁজনের অবস্থা দেখতে হয়। সামনের ঘনীভূত অক্কারে যতদূর সম্ভব দৃষ্টি চালিয়ে দেখতে হয় সঞ্চাব্য শক্রের উপস্থিতি। বুকের ভেতরটা কেমন শূন্য হয়ে গেছে। অনেকটা ভয়হীন শঙ্খাহীন একটা ভোঁতা অনুভূতি তখন কাজ করে।

সড়কের চালু প্রান্ত ধরে, বলতে গেলে চোখ বুবেই চলে আসি আমগাছটির তলায়। সামনে ব্রিজ। না, কেউ নেই। অন্তুল লাগে ব্যাপারটিতে। আগেরবার এই ব্রিজে অপারেশনে এসে শক্রপক্ষের বেশ তালো পাহারাদারির মুখোমুখি হতে হয়েছিলো। আজ ব্রিজ একেবারে ফাঁকা। শক্রপক্ষের কোনো পাহারা নেই। সামনে চলা অমরখানায় প্রচও যুদ্ধই এর কারণ, বুবাতে পারি। ব্রিজ নিরাপদ রাখার কাজে নিযুক্ত পাকসনাদের সবাইকে এখান থেকে তলব করে নিয়ে গেছে তারা যুদ্ধের প্রয়োজনে। বাবলু আর হাবিবকে সঙ্গে নিয়ে আমি জোর পা চালিয়ে সরাসরি ব্রিজের ওপর চলে যাই। অরক্ষিত ব্রিজ বিনা বাধায় দখলে এসে যায়। হাবিবকে পাঠিয়ে দিই দলবলসহ একরামুলকে ডেনে আনতে। ব্রিজের পাটাতনের ওপর ছায়ার মতো আমার সঙ্গে দাঁড়িয়ে থাকে বাবলু।

ঠিক এই রুকম পরিস্থিতিতে হঠাতে করে কানের পর্দায় এসে লাগে পো-ও একটা ধাক্কা। শব্দটা আসে আকাশের দিক থেকেই। অতি পরিচিত শব্দ। চাউলহাটির কামান বহর তাদের কাজ শুরু করে দিয়েছে। আকাশপথে বাতাস কেটে ছুটে আসছে কামানের গোলা। মাথার ওপর দিয়ে ছুটে যাচ্ছে অগ্নিবাণের পর অগ্নিবাণ। জয়দহা। পঞ্চগড়ের দিকে। সজাগ সতর্ক হয়ে ওঠে মুহূর্তে সমস্ত ইন্দ্রিয়। বাবলুকে টেনে নিয়ে সৈসে পড়ি ব্রিজের ওপরেই। সামনের দিকে কোথাও বিস্কেরিত হতে থাকে শেল একটির পর একটা। শুড়শুড় করে মেঝ ডাকার মতো শব্দের ধ্বনি-প্রতিধ্বনি হতে থাকে চুরাচরব্যাপী। অনুমান করতে কষ্ট হয় না, পাকবাহিনীর কামান বহর রি-অ্যাক্ট করতে কিছুক্ষণের মধ্যেই শুরু হয়ে যাবে তাদের পাল্টা এলোপাতাড়ি গোলাবর্ষণ। একদম চুরাবে তাদের টাগেটি প্র্যাকটিস, অনাদল দিয়ে যাবে তাদের জবাব। কার শেল কথম কোথায় পড়বে, তার কোনো ঠিক-ঠিকানা নেই।

একরামুল তার দলবল নিয়ে দ্রুত চলে আসে। ব্রিজের দু'পাশে কভার পার্টি হিসেবে দুটি দলকে পজিশনে নেয়া হয় বটপট। একরামুল থাকে অমরখানামূখী হয়ে তার দলসহ। আর মধুর দল থাকে জগদালমূখী হয়ে। মতি বয়ে আনে চার্জের পুটলি। জোনাব আলী আর সে কোদাল কাঁধে নিচে চলে যায় মাটির চাপ কাটার জন্য। বকর হাত লাগায় আমার সঙ্গে। ৪টি প্রেশার চার্জ। প্রতিটি ৫ পাউন্ডের। ব্রিজের পাটাতনের ওপর বসিয়ে দিয়ে সার্কিটগুলো পোছাতে থাকি। বাবলু, হাবিব আর মতিয়াররা চার্জের ওপর মাটির চাপ বসাতে থাকে দ্রুত।

ঠিক যেনে ফর্মুলায় ফেলা অক্ষ। যেমনটা ভাবা গিয়েছিলো তাই হলো। উড়ে এলো পঞ্চগড়ের দিক থেকে কামানের পরপর ক'টি শেল। মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গিয়ে ফাটে সেগুলো তিন চারশ' গজ পেছনে। থরথর করে কেঁপে ওঠে মাটি। এই রুকম মুহূর্তে স্নায়ুর ওপর সত্ত্ব সত্ত্ব প্রচও চাপ পড়ে। মাথা ঠাণ্ডা রাখা দায় হয়ে পড়ে। কিন্তু তারপরও ঠাণ্ডা রাখতে হয়। অঙ্গির হয়ে উঠেছে ছেলেরা। ওদের মাটি কামড়ে পড়ে থাকতে বলি। ছায়ার মতো চলাফেরা করছে যারা, তাদের দ্রুত হাত চালাতে বলি। চার্জগুলোর ওপর মাটির চাপ দেয়ার কাজ শেষ হয়ে যায়। একরামুলকে তার দলবলসহ উঠে আসতে বলি। মধুসূন্দরকে বলি পিছিয়ে যেতে।

বকর ও বাবলু সার্কিটগুলো ধরে থাকে। পকেট থেকে সেফ্টি ম্যাচ বের করে তাতে

কাঠি ঘষে আগুন জ্বালাই। ফিউজের মাথায় আগুন দিই। প্রথমে ধরতে চায় না আগুন। অস্থির দাপাদাপি আর প্রচণ্ড মানসিক চাপের মুহূর্তে এরকমই হয়। দুতিনবারের চেষ্টার ফলে অবশ্যে ফিউজের মাথায় আগুন জ্বলে ওঠে। ফর্কফ্ৰি করে আগুন দৌড়ে চলা শুরু করে। আর সেটা দেখায়তেই আমরা দৌড়াতে শুরু করি।

আমগাছের তলায় ভূতের মতো দাঁড়িয়ে মতি। ওকে একরকম হেঁচকা টান মেরে সঙ্গে করে নিই। এরপর রাস্তার ঢাল বেয়ে উর্ধ্বর্ষাসে সামনের দিকে দৌড়ে যেতে থাকি। কিছুদূর এভাবে এগুতেই পেছন থেকে ঢাক্ক শব্দ তুলে একটা লাল সবুজাত আলোর বালকানি ওঠে। পড়িমিরি করে মুখ খুবড়ে ওয়ে পড়ি মাটির ওপর। কানে হাতচাপা দেয়ার মুহূর্তেই পেছনে একটা বিশাল আকাশ-চেরা শব্দের ধ্বনি তুলে বিস্ফোরিত হয় চার্জগুলো। আর সেই শব্দে সব ধরনের চেতনা তখন বিবশ হবার যোগাড়। আকাশে নিষিঙ্গ ছোটো ছোটো ইট-সিমেটের টুকরো ইত্যাদি ঝুরঝুর করে পিঠের ওপর পড়তে থাকে। পোড়া বারুদের তীব্র গন্ধ ও নাকে এসে লাগে। এই অবস্থাতেই কেটে যায় কিছুক্ষণ।

গা আড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াই। বোঝা যায়, চার্জগুলো বিস্ফোরিত হয়েছে সফলভাবেই। বিজের অবস্থাটা দেখা দরকার। একরামুল এগিয়ে আসে তার দলবলসহ। রাস্তার ওপর ওদের অবস্থান নিতে বলে এগিয়ে যাই বিজের দিকে। কালো ধোঁয়ার কুঙ্গলী সমগ্র বিজ এলাকাটাকে ছেয়ে রেখেছে। এখানে-ওখানে আগুন জ্বলছে। এর ভেতর ফিউজেই বিজের কাছাকাছি পৌছানো যায়। ধোঁয়ার কুঙ্গলীর ভেতর দিয়ে দৃষ্টি গলিয়ে দেখা যায় বিজটা নেই। ধসে নেমে গেছে নিচে। শুধু কয়েকটা রড আর কংক্রিটের অংশবিশেষ শিয়ে বুলে আছে কোনোমতে। কালো ঘনীভূত ধোঁয়ার আড়ালে বিজটা কীভাবে উড়ে পিসে ভাবতে অবাক লাগে।

সামনে কাছাকাছি দুটো কাঘানের পেরুটখিসে পড়ে। বাবলু এই অবস্থায় আমার হাত ধরে ঘটকা টান দিয়ে বলে, চলেন যান। ফিউজ ওড়ানোর কাজ তো শেষ।

ওর কথা শেষ হতে না হচ্ছে আরো দুটো শেল এসে পড়ে সামনে। পিছিয়ে দিয়ে আমগাছের নিচে দাঁড়াই। কেসেস্টয়েনো মনে হয়, ধৰ্মস্থাণ বিজটা আর একবার দেখে যাই। কিন্তু বাবলু তখনো হাত ধরে টানাটানি আর তাগাদা দিয়ে চলেছে। ওর গলার স্বরে প্রচণ্ড অস্থিরতা। বলে, চলেন সরে পড়ি। পালাই!

উড়ে আসে আরো দুটো শেল। প্রথমটা পড়ে বিজের ওমাথা ঘেঁষে। বাবলু তখন আমার হাতে হেঁচকা টান মেরে দৌড়াতে শুরু করেছে। পড়িমিরি করে ১৫/২০ গজ সামনে মাত্র এগিয়েছি, এমন সময় যতীয় শেলটা এসে পড়ে বিজের এপারে। একেবারে কাছাকাছি ফাটে শেলটা। পেছনে তীব্র আগুনের বালক তুলে তার বিস্ফোরণ ঘটে। প্রচণ্ড বেগে একটা ধাক্কা লাগে শরীরে। প্রথমে হ্যাঙ্গি খেয়ে পড়ি। তারপর ডিগবাজি খাওয়ার মতো করে শরীর উল্টে যায়। ধপাস করে শিরে পড়ি একেবারে রাস্তার নিচে। মাটি-কানা, গাছের ডালপালা ইত্যাদি ছিটকে এসে পড়ে গায়ের ওপর। সে অবস্থাতেও চেতনা পুরোপুরি লোপ পায় না। মন বলে ওঠে, পালাতে হবে এখান থেকে যতো দ্রুত সম্ভব। টলতে টলতে উঠে দাঁড়াই সে অবস্থাতেই। পেছনে ফিরতেই শরীর হিম হয়ে আসে। ছোটো ঝাঁকড়া আমগাছটার অস্তিত্ব নেই। যেনে ভোজবাজির মতো মিলিয়ে গেছে গাছটা। এর নিচে মাত্র কিছুক্ষণ আগেও দাঁড়িয়ে ছিলাম। চেতনপাড়া বিজ আক্রান্ত জেনে ভালো টার্ণেট করেছে পাকিস্তানি আর্টিলিয়ারি বাহিনীর লোকজন।

আর দাঁড়াই না। দৌড়ে চলি দুঁজন সামনে। ক্ষুলের কাছে একরামুলদের পাওয়া যায়।

দেরি নয় আর। ঝটপট ওদের উঠতে বলি। নিজেদের পজিশন ছেড়ে উঠে আসে ওরা সবাই। এবার সবাইকে নিয়ে শুরু হয় দ্রুত পিছিয়ে চলা। শেল আসছেই একটাৰ পৰ
একটা। পেছনে সেগুলো ফাটছে সশন্দে তয়াবহ খণ্ডেৰ মন্ততা নিয়ে। অমৱখানায় চলছে
যুদ্ধেৰ তাওৰ একইভাবে। দুই পক্ষেৰ এই বিক্ষোৱণেৰ মাতামাতি পেছনে ৱেৰে আমৱা দ্রুত
এগিয়ে যেতে থাকি নিৱাপদ আশ্রয়েৰ দিকে।

দারুণ একটা ফাঁড়া কেটে গেছে আজ। মাত্ৰ বলু সময়েৰ ব্যবধানে কতো কিছু ঘটে
গেলো। যে গাছটাৰ নিচে আমৱা দাঁড়িয়েছিলাম, শেলটা পড়েছিলো ঠিক তাৰ ওপৰে। ছিন্ন-
বিছিন্ন হয়ে উড়ে গেছে ঝাঁকড়া ছোট আমগাছটা। ওৱ তলায় দাঁড়িয়ে থাকলৈ আমৱাও
নিশ্চিত উড়ে যেতাম কোথায়! সত্য কী অদ্ভুতভাবে বেঁচে গেলাম আমৱা আজ! আমি আৱ
বাবলু। মনে মনে ভাৰি, আমৱা দু'জন বেঁচে থাকবো বলেই বোধহয় বেঁচে গেলাম।
আপাতত এই ছিলো বোধহয় আমাদেৰ নিয়তিৰ লিখন।

২৫. ১০. ৭১

হিমালয়, মাধ্যায় তাৰ চকচকে মুকুট

দুলু আসে বেলো এগারোটাৰ দিকে। তাৰ কিছুক্ষণ পৰ এসে পৌছায় মজিব। জোনাব আলী
ৱাতেৰ অপারেশনশেষে দলেৰ সঙ্গে চলে এসেছে। নিৱাপনেৰ কাৱণেই ফিরে যায় নি তাৰ
নিজেৰ গ্রামে। এখন নালাগঞ্জেৰ দুলু, সৰ্দৱপাড়াৰ মজিব আৱ গুয়াবাড়িৰ জোনাব আলী
একযোগে সমবেত হয়েছে চাউলহাটি ক্যাম্পে। তাৰ প্রতিনিজন এসেছে তিন এলাকা থেকে।
কেউ কাৱো আসাৰ খবৰ জানতো না। কিন্তু এক অদ্ভুতভাবে একযোগে মিলিত হয়েছে
চাউলহাটিতে। ওৱা সব পৰীক্ষিত পুৱনোৰূপ। জোনাব আলী তো গতৱাত থেকে সঙ্গে
সঙ্গেই আছে। প্রথমে দুলু, পৱে মজিবক পেয়ে বেশ ভালো লাগে। উৰ্বু আলিঙ্গন আৱ
কুশল বিনিয়য়েৰ পৰ তাৰুৰ ছায়াৰ ছায়ে ওঠে তুহুল আজ্ঞা। দুলু বেৱ কৱে লেৱ, মজিবেৰ
পকেট থেকে বেৱ হয় উইল্স সিগারেট আৱ জোনাব আলীৰ কোমৱেৰ প্যাচ থেকে বেৱ হয়
মতি বিড়ি। আমাদেৰ নিজেদেৰ রেশনে প্রাণ কেঁজি সিগারেট চাৱমিনাৰ যোগ হয় এৱ
সঙ্গে। যাৱ যোটা খুশি টানতে থাকে। লক্ষ কুমারৰ সাদা এনামেলেৰ বড় মগে কৱে
প্রত্যোকেৰ হাতে হাতে চা ধৰিয়ে দিয়ে যায়। বকৰ, বাবলু, মতিয়াৰ, একৱামুলসহ তাৰুৰ
৭/৮ জন যোগ দিয়েছে এই ধূম আড়াৱ আসৱে। বড় ভাই যাৰে মাৰে এসে বসছেন।
আবাৰ কিছুক্ষণ থেকে তাৰ বৰ্তাৰ অনুযায়ী অস্ত্ৰিভাবে উঠে যাচ্ছেন। আঙুলেৰ ফাঁকে
সিগারেট নিয়ে হাত মুঠো কৱে দোয়া টানতে টানতে তিনি কখনো ছুটে যাচ্ছেন লঙ্ঘৱখানার
দিকে, কখনো অন্য তাৰুৰ কম বয়সী ছেলেদেৰ হল্লোড় থামাতে আৱ কখনো সোজা নন্দাৱ
তাৰুৰ দিকে। দুলু ও মজিবেৰ সঙ্গে বড় ভাই নুৰুল হকেৰ সাক্ষাৎ-পৱিচয় ছিলো না। তবে
তাৱা উভয় তাৰ নাম-পৱিচয় আৱ পদবি ইত্যাদি সম্পর্কে জেনেছে আগে থেকে আমাদেৰই
মাৰফত। বড় ভাইও তাদেৰ নামে চেনেন, দেখেন নি কখনো। তাৰ সঙ্গে তাদেৰ দু'জনকে
পৱিচয় কৱিয়ে দিতেই তিনি তাৰ বৰ্তাৰসূলত যিষ্ঠি ভদ্রতা নিয়ে বললেন, খুব ভালো, খুব
ভালো। আপনাৱা যখন এসেছেন, না খেয়ে যাবেন না কিন্তু।

দুলু ও মজিবেৰ কাছ থেকে পিটুৰ দলেৰ খবৰ পাওয়া যায়। গনি ভাইয়েৰ খবৰও জানা
যায়। তিনি নিয়মিত এসে খৌজখবৰ নিয়ে যাচ্ছেন পিটুৰে। এ গ্ৰন্থেৰ যোৰাদেৰ সঙ্গে

ভালোভাবেই জড়িয়ে ফেলেছেন তিনি নিজেকে। মজিব বর্তমানে পিচুদের সঙ্গে আগের মতো ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে থাকলেও দুলু মনে হয় কিছুটা দূরে দূরে থাকছে। চা-পর্ব শেষ হতেই দুলু বলে, মাহবুব ভাই, একটু ব্যক্তিগত আলোচনা হিলো। দুলু সম্ভবত এ কারণেই আমাদের ইউনিট বেস হেড কোয়ার্টার পর্যন্ত এসেছে। মজিবকে হয়তো একই কারণে আসা। আসলে এখন যে সময় চলছে, তাতে করে সমস্যাবিহীন কাউকেই খুঁজে পাওয়া মুশকিলের ব্যাপারই। মজিবকে ছেলেদের আড্ডার ভেতর বসিয়ে রেখে দুলুকে নিয়ে উঠে পড়ি। তাঁর পার হয়ে পুরুরের পাড়ে গিয়ে উঠি। তারপর অপর পাড়ের ঢালে একটা সুবিধেয়তো জায়গায় বসে পড়ি দু'জন সবুজ ঘাসের ওপর। সামনে দৃষ্টি প্রসারিত করতেই দারুণ মনোহর একটা দৃশ্য দেখে ধরা পড়ে। মনের গভীর থেকে একটা ভালো লাগার অনুভূতি উথলে উঠে সে দৃশ্যের অবলোকনে। হিমালয়! পরিষ্কার ঝকঝকে মেঘমুক্ত আকাশে তার বিশাল শরীরের সবটাই মেলে বসে আছে। মাথায় তার চকচকে বরফের মুকুট। অপরপ সেই দৃশ্যের দিকে তাকিয়ে সবুজ ঘাসের গালিচায় শরীর এলিয়ে বসে থাকি দু'জনে কিছুক্ষণ চপচাপ।

— সুন্দর না! স্বগতোক্তির মতো দুলুর উদ্দেশে বলি। মাথা নাড়ে সে। তারও চোখেমুখে মুঠতার ছাপ। আবার নিজেকে শুনিয়েই যেনো বলি, দেশ স্বাধীন হলে একবার যাবো হিমালয়ের কাছে।

— আমারও যেতে ইচ্ছে করে খুব, কিন্তু তা কি সম্ভব? যে দিনকাল চলছে, এর যে শেষ করে কোথায় হবে, কে জানে? দুলু কথাগুলো বলতে একটা বড় দীর্ঘস্থান ফেলে।

— সব দিন কি একরকম যাবে? কোথাও না কোথাও একদিন এর শেষ হবেই। দুলুর মন খারাপ করা কথার জবাবে যেনো আপনা মনেই কথাগুলো আমার মুখ থেকে বের হয়ে আসে। কিন্তু কথাগুলো শ্রেফ দুলুকে সামুদ্রে দেয়ার জন্যই বললাম, না নিজের মনের গভীর বিশ্বাস থেকে, বুঝতে পারি না। একটু ক্ষুটিন বাঁধা তাঁবুর জীবন, সীমিত শক্তি নিয়ে প্রতিরাতে মুক্তিযাত্রা। এখন পর্যন্ত প্রাকবাহিনীর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার কোথাও ফাটল ধরানো যায় নি। সীমিত শক্তি দিয়ে প্রাক্তনভাবে শুধু তাদের ওপর আঘাত হানার পালা চলছে। মুক্তিবাহিনী এখনো সুসংবিত্তভাবে গড়ে উঠতে পারে নি এবং পাকবাহিনীকে মোকাবেলা করবার মতো সমরশক্তি যোগাড় করতে পারে নি। মুক্তিযোদ্ধারা অবশ্য বিভিন্ন ট্রেনিং সেন্টার থেকে ট্রেনিং শেষ করে ফ্রন্টে আসছে দলে দলে। কিন্তু তাদের দিয়ে পাকবাহিনীর মতো সুসংগঠিত ও পেশাদার সেনাবাহিনীর সঙ্গে সম্পূর্ণযুদ্ধে তাদের পরাজিত ও বিভাড়িত করা এখন পর্যন্ত সম্ভব নয়। এর জন্য এখনো সময় ও প্রস্তুতির প্রয়োজন। আমাদের ব্যাপারে ভারতীয়দের অবস্থান এখন পর্যন্ত পরিষ্কার নয়। এদের বাহিনীর তৎপরতা কেবল আর্টিলারি মার্টারের সাপোর্ট ফায়ারিং-এর ভেতরেই সীমাবদ্ধ। স্বাধীন বাংলা সরকারকে এরা এখন পর্যন্ত বীকৃতি দেয় নি। পাকিস্তান ছলছুতো খুঁজছে। সীমান্তবিশেষের মতো ছুতো তুলে তারা যদি ভারতের সঙ্গে সর্বাত্মক যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে, সেক্ষেত্রে ‘বাংলাদেশ’ সমস্যাটা কোথায় তলিয়ে যাবে কে জানে? আমাদের অবস্থাই-বা তখন কি দাঢ়াবে? এ ধরনের একটা অস্ত্র আর সঞ্চাপন অবস্থা চলছে এখন। এর মধ্যে দুলু এসেছে, মজিব এসেছে। এসেছে জোনাব আলী তাদের নিজের সমস্যাদি নিয়ে আলোচনা করতে। এরা আমাদের যুদ্ধের গাইড, বন্ধু, আশ্রয়দাতা। এদের সমস্যার কথাতো শুনতে হবেই। যুদ্ধের মাঠের বন্ধুরা ছুটে এসেছে, ওদের ফিরিয়ে দেয়া যাবে না। সমস্যার সমাধান দিতে না পারলেও তাদের কথা,

তাদের অভাব-অভিযোগ আর দুঃখ-কষ্টের কথা আমাদের জন্ম প্রয়োজন। দুরু আনন্দনে দাঁত দিয়ে ঘাস ছিড়ে। তাকে বলি বলেন, কি যেনো বলতে চাচ্ছিলেন?

হাসে দুরু, ম্লান হাসি। প্যাকেট থেকে সিগারেট বের করে এগিয়ে দেয়। নিই। যাচ জ্বালিয়ে আঙুল ধরিয়ে দেয়। নিজের সিগারেটও জ্বালায়। তারপর তাতে লস্তা টান দিয়ে বলে, কি আর বলবো বলেন, সেই পুরাতন সমস্যা। শরণার্থী হয়ে এলাম এখন পর্যন্ত রেশন কার্ড মিললো না। সংসারে অভাব-অভিযোগ, টানাটানি লেগেই আছে। নিজের নিরাপত্তাহীনতার ব্যাপারটাও ইদানীং বড় করে দেখা দিছে। ওদিকে পিটু ভাইদের সঙ্গেও ঠিকমতো যোগাযোগ করতে পারছি না। আপনারাও চলে গেলেন আর সবকিছু যেনো এলোমেলো হয়ে গেলো। এটা কি রকম জীবন মাহবুব ভাই? দুরু থামে। গলায় তার গভীর ক্ষেত্র আর তিক্ততা। সেই অবস্থায় আরো বলতে থাকে, ওদিকে তুনছি আমাদের আশ্রয়স্থল থেকে আপনাদের নিরাপত্তা প্রহরাও তুলে নেয়া হবে। দুরু প্রায় ভেঙেপড়া গলায় বলে ওঠে। তাকে জিগ্যেস করি, কার কাছে তুলেন আপনাদের নিরাপত্তা গার্ড তুলে নেয়া হবে?

ওরাই বলাবলি করে মাঝে মাঝে, সেখান থেকেই শুনেছি। একইভাবে বলে চলে দুরু।

বুঝতে পারি দুরুর বর্তমান সমস্যা তিনটি— রেশন কার্ড, আর্থিক অসুবিধা এবং পিটুর সঙ্গে যোগাযোগসহ তাদের নিরাপত্তার জন্য নিয়োজিত ছেলেদের তুলে নেয়ার ব্যাপারটা। সমস্যাগুলো নিয়ে মনে মনে কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করে বিশ্বেষণকরে নিই। তারপর বলি, দুর! এগুলো কোনো সমস্যা হলো? সব মিটে যাবে। এ খিলাফ আর খুব বেশ একটা ভাববাব দরকার নেই। যেটা দরকার সেটা যুক্তের মাঠে আপনি মতো বাঁপিয়ে পড়া। পারবেন না? উজ্জ্বল হয়ে ওঠে তখন দুরুর চোখুখ। বলে, মাঝেমাঝে। স্বাধীনতার জন্য আমি আমার জীবন দিয়ে দিতে পারি, এটা তো আপনি জানেন মাহবুব ভাই।

— এই তো অরিজিনাল দুরুর কথা। কথাটা বলেই তার পিঠ চাপড়ে দিই। তারপর বলি, আমি পিটুকে মনে করে পাঠিয়ে দিছি, আর কোনো সমস্যা থাকবে না। আগের মতোই পিটুর সঙ্গে ক্ষমতায়ে পড়তে হবে একটার পর একটা যুক্তে। হাড়িভাসার দিকে আবার পাকবাহিনী চলাচল শুরু করেছে। ক্যাটেন নন্দাও চাইছেন পিটুর দল পুরো সজ্জিয় হোক। এ ব্যাপারে আপনার সহযোগিতা দিতে হবে। ঠিক আছে? বলে দুরুর দিকে তাকাই। ঘাড় কাত করে দুরু আমার বক্তব্যের প্রতি সম্মতি জানায়। তখন তাকে বলি, এবার একটা গান ধরেন। মারেয়ার সেই করতোয়া পাড়ের পর আর গান শোনা হয় নি।

পুরুরের পাড় বেয়ে উদ্বাম তারল্যের উজ্জলতা নিয়ে ছল্লোড় করতে করতে নেমে আসে বকর, বাবলু, মতিয়ার আর হাবিব। মোসারদ পাগলাও এসেছে ওদের পেছন পেছন। আমাদের দেরি দেখে মজিবকে তাঁবুতে রেখে চলে এসেছে ওরা। ওদের বসতে বলি। ওরা বসে সুরোধ বালকের ভঙ্গি নিয়ে। দুরুকে তখন তাগিদ দিই, নেন ধরেন!

বাবলু বলে ওঠে, গান শুনবো দুরু ভাই, বৰিস্তুসঙ্গীত আপনি নাকি ভালো করেন।

লাঞ্জুক হেসে কিছুটা ইতস্তত করে দুরু। কিন্তু পরক্ষণেই জড়তা কাটিয়ে ভরাট সুরেলা গলায় গেয়ে ওঠে, তোরা যে যা বলিস ভাই আমার সোনার হরিণ চাই...।

সামনে হিমালয়ের বিশাল বিস্তার, মাথায় শোভিত তার বরফের চকচকে মুকুট। নরম কোমল রোদ। বাতাসে ঝিঙ্কিতার পরশ। আমরা সবাই হিমালয়ের দিকে শুধু করে বসে থাকি। দুরু তার উদান গলায় আপন মনে গেয়ে চলে তার গান।

সফলতা— প্রতিটি কথাভাবের কাম্য

দুপুরের আহারের পর দুলু চলে গেছে। ওর হাতে গোপনে কিছু টাকা গুঁজে দেয়া হয়েছে। তার মুখ ছিল কৃতজ্ঞতায় মাথা, চোখ ছিল সজল। মজিব গেছে আরো পরে। মজিবের সমস্যা তেমন গভীর নয়। মুক্তিবাহিনীতে নাম লিখিয়ে ট্রেনিং নেয়ার জন্য যেতে চায় সে। সে ব্যাপারে পরামর্শের জন্যই তার আসা। জোনাব আলী যায় নি। রাতের অপারেশনের দলের সাথী হবে বলে সে থেকে গেছে। তাকে ওপারে একা ছেড়ে দেয়াটাও মুশকিলের ব্যাপার। ওকে যারা খুঁজছে, তাদের হাতে পড়লে স্ফেক মারা পড়বে সে।

ওদিকে বিকেল চারটার দিকে শুরু হয়েছে ভয়াবহ কামান আক্রমণ। এক সঙ্গে অনেকগুলো কামান থেকে শেল নিষিণ্ড হয়ে উড়ে যাচ্ছে সেগুলো অমরখালা-জগদলের দিকে। পুরুরের উচু পাড়ে বসে কামান যুক্ত দেখতে দেখতে বেলা পড়ে আসে। আর এ সময়ই ডাক আসে নদীর তৰু থেকে।

নদী ছিল ম্যাপ খুলে বসেছেন। হাইড আউটে থাকা ক্লোডগুলোর অবস্থান বড় বড় করে লাল পেন্সিলে ক্রস চিহ্ন দিয়ে গোল দাগের মধ্যে চিহ্নিত করা হয়েছে। কেমন একটা হতাশার ভাব তার চোখেমুখে। সেই অবস্থায় মাথা নেড়ে তিনি বলেন, ওরা তেমন কিছু করতে পারছে না মাহবুব, কি যে করি?

ভেতরের হাইড আউটে থাকা ক্লোড ক'টির এখনকাল তৎপরতা সম্পর্কে বর্তমানে আমাদের তেমন সঠিক ধারণা নেই। হেড কোয়ার্টারে স্ট্রাইকিং ফোর্স হিসেবে যোগ দেয়ার পর নদী প্রতিরাতে অপারেশনে পাঠাচ্ছেন আমাদের। আর তাই একেবারে বিরতিবিহীন অস্থির অবস্থা। নিজেদের অপারেশনাল কর্মকাণ্ড নিয়ে ক্লিনিকালে ব্যতিব্যস্ত থাকতে হয় যে, ভেতরের বস্তুদের বিস্তারিত খবর নেবার সময় হয়ে উঠে না। সারারাত ঝুঁকিপূর্ণ সব অপারেশনশেষে শরীর-মন এমন ক্লান্ত আর অবসাদযুক্ত হয়ে পড়ে যে, ওদের ব্যাপারে বিস্তারিত জানবার উদ্যম-আচাহ কিছুই থাকে না। বড় ভাই নুরুল্ল হক আর নদ্দাই দেখছেন এ দিকটা।

বড় ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে নদী এক সময় বলেন, হাড়িভাসার দিকে পিন্টু কয়েকটা ভালো কাজ দেখিয়েছে, পেয়াদাপাড়াওয়ালারা তেমন কিছুই করতে পারছে না। দে আর শোয়িং ভেরি পুরু পারফরমেন্স। এমনটা কেনো হচ্ছে নুরুল্ল হক? হোয়াই!

নদীর এ প্রশ্নে কী জবাব দেবেন তা নিয়ে যেন কিছুটা সমস্যায় পড়ে যান বড় ভাই। তিনি চাউলহাটি ইউনিট বেসের সব থেকে সিনিয়র কমান্ডার। এফ.এফ.দের প্রতিটি ভালোমন্দের ব্যাপারে তাকেই জবাবদিহি করতে হয়। এছাড়া, তার চরিত্রের মধ্যে রয়েছে ছেলেদের যাবতীয় দোষকৃতি, সফলতা-ব্যর্থতা ইত্যাদি ব্যাপারে সব সময় প্রোটেকশন দেয়ার মতো সহজাত গুণ। সবকিছুর দায়দায়িত্ব তিনি তার নিজের কাঁধে তুলে নেন। জানি, ক্যাটেন নদীর আক্রমণাত্মক কথার জবাবে তিনি কিছু একটা ব্যাখ্যা দাঁড় করার চেষ্টা করবেন। কিন্তু সেটা কি ধরনের হবে, তাৎক্ষণিকভাবে ব্যাপারটা সম্পর্কে ভাবতে গিয়ে তাকে যেন কিছুটা কাঁচুমাচু হতে দেখা যায়। নদী তখন আবার বলেন, লাড়কে লোগ রোজা রাখতে হ্যায়!

এ সঙ্গাহ থেকেই রোজা শুরু হয়েছে। যুদ্ধের মাঠে রোজা রাখাটা কষ্টকর। তাই অধিকাংশ ছেলেই রোজা রাখছে না, বিশেষ করে যারা নিয়মিত যুদ্ধে যাচ্ছে। হেড কোয়ার্টারে থাকা কেউ কেউ অবশ্য রোজা রাখছে। বড় ভাইও তাদের দলে। শেষ পর্যন্ত তিনি সত্যি কথাটাই বলেন, সব লাড়কাতো রোজা নেই রাখতা। রোজা রাখলেছে কষ্ট হোতা হ্যায়।

— তবে?

নন্দার এই 'তবে'-এর জিজ্ঞাসার জবাবে তিনি ঘাঁপরে পড়ে যান। তবুও তিনি তাঁর স্টাইলে বলেন, কোসেস তো করতা হ্যায়। আগতো জান্তা হ্যায়, দে আরট্রাইং দেয়ার বেষ্ট।

— নেহি সুরক্ষল হক। নন্দা তাকে থামিয়ে দিয়ে বলেন, দে আর নট ডুইং ওয়েল। দেয়ার পারফরমেন্স নট আপ টু দ্য মার্ক। উই এসপেক্ট্ মোর ফ্রম দেম। লাইক দ্য হেড কোয়ার্টার ফোর্ম। ইউ ডু সাম থিং সো দ্যাট দে ক্যান আর্ব্ল সাম রিমকেবল প্রোগ্রেস...।

— ওকে স্যার! আই শ্যাল সেন্ট ম্যাসেজ টু দেম।

— ইয়েস, ইউ টেল দেম টু বি মোর আ্যগ্ৰেসিভ। আৱে ইয়াৱ তোম লোগ্কো জয় বাল্লা চাহিয়ে। ইয়ে লিয়ে ভূমকো সিৱিয়াসলি লড়নে হোগা। লড়াই ছাড়া কি জয় বাল্লা হবে? তোমাদেৱ বাল্লাদেশ হবে? আৱ তা ছাড়া আমৱা আৱ ক'দিন তোমাদেৱ সঙ্গে থাকবো? হয়তো শিগপিৰই তোমাদেৱ দায়িত্ব তোমাদেৱই নিতে হবে। উই উইল গো ব্যাক টু আওয়াৱ ওন ইউনিট।

বড় ভাই আৱ কিছু বলেন না। নন্দা নিবিষ্ট মনে তাৱ ফিল্ড ম্যাপ দেখতে থাকেন। যুদ্ধেৱ অঘৃণ্ণি নিয়ে এ ধৰনেৱ আলাপচাৰিতা আৱ হাইড আউটে থাকা ক্ষোয়াড়গুলোৱ কাৰ্যকৰ্ত্ত্ব সম্পর্কে নন্দাৰ ব্যক্ত কৰা হতাশা থেকে একটা জিনিস আমৱা কাছে পৰিষ্কাৰ হয়ে ওঠে যে, নন্দা আমাদেৱ হেড কোয়ার্টাৱে নিয়ে এসে স্ট্ৰাইকিং ফেস্টিভিসেৱে প্ৰতিৱাতে অপাৱেশনে পাঠিয়ে অন্য ক্ষোয়াড়গুলোৱ ব্যৰ্থতা যেনো এৱং দ্বাৱা স্ট্ৰাইক প্ৰয়াস পাচ্ছেন। তাকে এই ইউনিট বেসেৱ প্ৰতিদিনকাৰ কৰ্মতৎপৰতাৰ ওপৰ হেড কোয়ার্টাৱে রিপোর্ট কৰতে হয়। প্ৰতিটি কমান্ডারই চাইবেন তাৱ অধীনস্থ ফেস্টিভিতাৱে কাজ কৰছে এবং এৱং এৱং দ্বাৱা প্ৰাণ সংৰক্ষণ কৰাৰ কৰতে হয়ে আৰু সফলতা আৰু সফলতা এবং প্ৰশংসা প্ৰত্যেক মানুষেৱই কাম্য। নন্দা একজন পেশাদাৰ সৈনিক। তিনি আৱ ব্যতিক্ৰম হবেন কেনো?

আঘাত, মূলশক্তি ঘাঁটি অমৱৰ্খাসাৰ ওপৰ

নন্দা বলেন, আজ রাতে তোমৱা অমৱৰ্খাসাৰ শক্তি ঘাঁটিৰ পেটে আঘাত কৰবে। অপাৱেশনেৱ সময় রাত ১২টা থেকে ১টা। সে সময় প্ৰচুৰ আৰ্টিলেৰি সাপোর্ট থাকবে। দে উইল বি বিজি উইথ দেয়াৱ হাইডিং। ইউ গো আ্যান্ড গিল্ট স্ট্ৰাইং গ্ৰা আ্যাট দেয়াৱ স্টোমাক।

ফিল্ড ম্যাপে লাল-সুৰজ পেসিলেৱ অংকিবুকি তৌৰিচৰ্ছ এগুলো দিয়ে নন্দা বাতেৱ অপাৱেশন সংৰক্ষে বিস্তাৱিত বুঝিয়ে দেন। তাৱ কাছে ব্ৰিফিং নিয়ে চলে আসি তাঁবুতে। পশ্চিম আকাশে বাঁকা চাঁদ। বাতাস বহিছে মন্দুমন্দ। শীতেৱ বাতাস। দল সাজাতে বলি একৰামুলকে। তাঁবুতে হারিকেনেৱ টিমটিমে আলো। তাঁবুৱ কাপড়েৱ বাপ ফেলে রাখা। আলো বাইৱে বেৰুতে না দেবাৱ জন্য এ সতৰ্কতা।

ৰাতেৱ খাওয়া হয়ে যায়। ছেলেৱা তৈৰি হয়ে নেয়। নন্দা হাতিয়াৱ আৱ গোলাবাৰুদেৱ লিপ ইস্যু কৱেন। রাত ১০টায় আমৱা রওনা হই। আজ রাতে নন্দার কথামতো অমৱৰ্খাসাৰ ঘাঁটিতে শক্তিৰ প্ৰতিৱক্ষণ ব্যবস্থাৰ মাথি বৰাবৰ আঘাত হানতে হবে, এটাকেই তিনি বলতে চেয়েছেন শক্তিৰ পেটে আঘাত কৰা। বিদায়েৱ সময় বড় ভাই বলেছেন, সাৰধানে থাকবা। তাৱ গলায় অতি আপনজনেৱ উদ্বেগ মেশানো আকুলতা।

— জয় বাংলা, খোনা হাফেজ বলে আমরা তার কাছ থেকে বিদায় নিয়েছি। গুরুসেবক তার গাড়িতে পাকা রাস্তা ধরে আমাদের নামিয়ে দিয়ে গেছে নির্দিষ্ট জায়গায়। সকালে এ জায়গাটৈই সে সবাইকে সৃষ্ট দেহে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য অপেক্ষায় থাকবে, একথা বলে, সবার জন্য শুভ কামনা করে সে ফিরে গেছে। আমরা পরিচিত সেই কাঁচা রাস্তা ধরে চলেছি। আজকের রাতে আমাদের দলের সদস্যসংখ্যা ১৮ জন। জোনাব আলী সঙ্গে এসেছে গাইড হিসেবে। ওকে বুঝিয়ে বলতেই, সে জানিয়েছে, অমরখানা গ্রামের প্রায় মাইলখানেক সামনে দিয়ে সে আমাদের ভেতরে নিয়ে যেতে পারবে। আলতাফ কেরানির বাড়ির সামনেকার পুরুর পাড় পর্যন্ত আমরা নির্বিঘ্নে পৌছাতে চাইছি। এ অঞ্চলের পথঘাট জোনাব আলীর নবদর্পণে। খুতনির দাঙ্গিতে হাত বুলিয়ে সহজ হাসি দিয়ে সে জানিয়েছে, কোনো অসুবিধা নাই। কাকপক্ষীও টের পাইবো না।

রাতের বেলা কাকপক্ষীর এমনিতেও টের পাওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। আর টের পেলেও কোনো অসুবিধা বা ভয় নেই। ভয় হচ্ছে মানুষকে নিয়ে। শক্ত এলাকায় বিশেষ করে শক্ত ঘাটির কাছাকাছি প্রতিটা অচেনা মানুষই শক্ত অনুচর পর্যায়ভূক্ত। কাউকেই বিশ্বাস নেই। এছাড়া রাজাকার ও পাকসেনাদের পাতানো ফাঁদ বা অ্যাম্বুশ থাকতে পারে পথিমধ্যে। সামনাসামনি পড়ে যেতে হতে পারে তাদের রণ-পাহারা বা প্রেটেল পার্টির মুখোমুখি। এ ধরনের ব্যাপার যদি ঘটেই যায়, তাহলে তা হবে এক মহাম্বায়েলার ব্যাপার। বেধে যাবে শক্তির সঙ্গে হঠাত করে খণ্ডিত। এবং তারপর কোনো ক্ষক্তি ক্যাজুয়েলটিজ ছাড়াই যদি শক্তিকে ঠেকানোও যায়, আসল টাগেটি অবধি প্রেক্ষনের কোনো উপায় বা শক্তি তখন অবশিষ্ট থাকবে না। সুতরাং সব ধরনের অস্বিম্বিত সংজ্ঞাবনা তাই পাশ কাটিয়ে যেতে হবে।

জোনাব আলী সেভাবেই নিয়ে যাচ্ছে। ক্ষটা-লতা আর ঝোপঝাড় দিয়ে সীমান্ত পেরিয়ে ফসলের খেতে নামতে হয়েছে। এরপর ক্ষটা ভাঙ্গচোরা আলপথ ধরে এগুতে হয়েছে বেশ কিছুক্ষণ। কখনো ডানে, কখনো বাম পাশ দিয়ে। অমরখানাগামী কাঁচা রাস্তাটা পাওয়া গেছে অবশেষে। কিন্তু অত্যন্ত ক্ষেত্রজনক পথ হিসেবে বিবেচিত হওয়ায় রাস্তাটা পার হয়ে আবার নামতে হয়েছে ফসলের খেতে। আমন ধানের চারা বেশ বড় হয়ে উঠেছে। খেতের পানি প্রায় শুকিয়ে এসেছে। পায়ের কন্টই পর্যন্ত দুবে যায় নরম কাদার ভেতর। এটেল যুক্ত কাদা মাটি পায়ে লেগে থাকে। ভারি হয়ে যাব পা। টানতে শক্তি ক্ষয় হয়, কষ্ট লাগে।

এভাবে জোনাব আলী বেশ কিছুক্ষণ হাঁটিয়ে এনে একটা বড় আলপথ ধরে। এ পথ ধরেই প্রায় আধঘন্টা হেঁটে পৌছানো গেলো আলতাফ কেরানির বাড়ির পেছন দিয়ে পুরুর পাড় অবধি। এ জায়গাটা আমাদের চেনা। যাত্রাবিভিত্তি হয় পুরুর পাড়ে রাস্তার ওপর এসে।

এখান থেকে বাঁ দিক দিয়ে কিছুটা এগিয়ে মোড় নিয়ে সোজা পশ্চিমের রাস্তাটি চলে গেছে বোর্ড অফিসের পাকা সড়ক পর্যন্ত। ওপথে গিয়ে আজকের অপারেশন করা যাবে না। আজ শক্তির পেটে আঘাত করতে হলে ডানদিকের অমরখানা গ্রামের পাশ দিয়ে এগুতে হবে। রাস্তা ধরে যাওয়া যাবে না। এগুতে হবে ফসলের খেত ধরে।

পুরুর পাড়ের আড়ালে বসে বিড়ি-সিগারেট টানতে থাকে সবাই। হালকা প্রাকৃতিক কর্মও সেরে নেয় কেউ কেউ। প্রত্যেকটা অপারেশনে যাবার সময় দেখা গেছে, কোথা ও যাত্রাবিভিত্তির ফাঁকে হালকা প্রাকৃতিক ডাকের চাপ ঘন ঘন অনুভূত হয় এবং সামান্য বিরতি পেলেই সবাইকে আগে এ কাজটা সেরে নিতে হয়। আসলে নার্তের ওপর পড়া চাপ থেকেই

শরীরের এই বায়োলজিক্যাল ব্যাপারটা ঘটে থাকে। স্বাভাবিক জীবনে পরীক্ষার হলে যাবার সময় অথবা কোনো ইন্টারভিউতে অংশ নেয়ার সময় মানুষের এই ব্যাপারটা দেখা দেয়। যুদ্ধের মাঠে এটার বেগ অনেক বেশি থাকে। ব্যাপারটার মধ্যে অস্বাভাবিকতা তেমন কিছু নেই। কারণ, এখানে প্রত্যেকে জানে তারা কোথায় যাচ্ছে। জীবন-মৃত্যুর বাজি ধরার মাঝখানে একজনের শরীরের বায়োলজিক্যাল রিঃ-অ্যাকশনগুলো দ্রুত কাজ করে, যার থেকেই ঘন ঘন প্রাকৃতিক ডাকের এই ডাড়া। ধূমপানের ব্যাপারটাও এক্ষেত্রে অন্যরকমভাবে কাজ করে থাকে। এর ভেতর দিয়ে যতোটা না নেশার নিবারণ করা যায় তার চাইতে বেশি কাজ করে নিজেকে স্থির রাখা এবং সাহস ধরে রাখার ব্যাপারটা। আগুন জ্বালিয়ে সিগারেট বিড়ি হাতে ধরে ঘন ঘন টানলে সাহস আর উদ্দমটা যেনো ফিণ্ড হয়ে ফিরে আসে।

রাত ১২টা বেজে গেছে। অমরখানা ঘাঁটির ওপর প্রচণ্ড বেগে শেল বর্ষণ কর হয়েছে। বাল্কে বাল্কে উঠছে বিস্ফোরণের আগুন। একেবারে সামনে ৪/৫শ' গজের ভেতরে। বিস্ফোরণের তাঙ্গে প্রকশ্পিত করে চলছে আশপাশের আকাশ-বাতাস-মাটি। ধূংসের এক ভয়ঙ্কর মাতামাতি চলছে যেনো সামনে। একনাগাড়ে সেই সঙ্গে চলছে মেশিনগানের গুলিবর্ষণ। গীতিমতো এক যুদ্ধক্ষেত্র, আর সেই যুদ্ধক্ষেত্রেই যেতে হবে আমাদের।

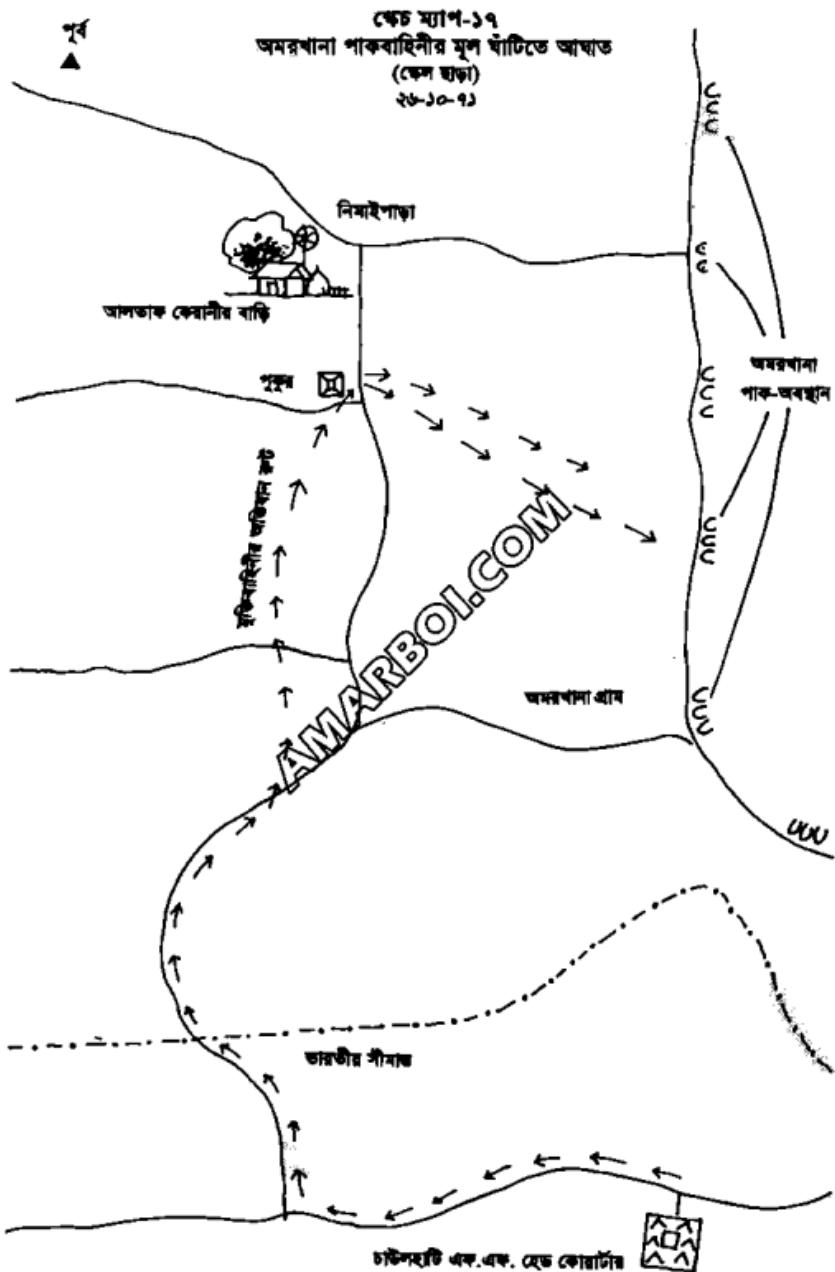
ব্যাপারটা নিয়ে নিজে ভেবে নিই কিছুক্ষণ। এরপর একরামুলসহ অন্যদের সঙ্গে আলোচনা করি। সামনে গোলাগুলি বর্ষণের দিকে তারিখে সবাই কেমন চুপসে গেছে, ধমকে গেছে। একরামুল বিচলিতভাবে বলে, অটে যাওয়া যাইবে বাহে!

গুটিসুটি মেরে বাবলু আমার গা যেমে বসে রয়েছে। দৃষ্টি তার সম্মুখবর্তী ফ্রন্টের দিকে। বক্বক্ব করে কথা বলে যাওয়া ছেলে বাবলু প্রশ্নাকেবারে নির্বাক হয়ে গেছে। মনে হয়, আমার শরীর যেমে বসে থেকে সে জীবনের উজ্জ্বলতা আর হারিয়ে যাওয়া সাহস খুঁজে ফিরছে।

বকর বলে, ক্যাক করি ওদিক যাকে হাস্তারা, যু দিল ঘারোত হামার বোম পড়ে?

যেতে যখন হবেই, তখন কর্তৃপক্ষের লাভ নেই। কামনের শেলগুলো সব পড়ছে রাস্তার ওপারে। আমরা রাস্তার প্রশ্নারে আঘাত হানবো। ঝুঁকি থাকবেই। ঝুঁকি এড়িয়ে যাবার উপায় কই? সবাইকে তৈরি হয়ে নিতে বলি। গোটা দল দু'ভাগে ভাগ করে নিই। একরামুল থাকবে একটা দল নিয়ে কভারে। সে কিছুটা বাঁ দিক দিয়ে ৪০/৫০ গজ পেছনে এগুবে মূল দলের সঙ্গে। মূল দলে আমার সঙ্গে থাকবে বকর, বাবলু, হাবিব, মতিয়ার, শম্ভু ও সফিজউদ্দিনসহ ১০ জন। সবাইকে প্রেনেডগুলো প্রস্তুত রাখতে বলি। হাতিয়ারের ম্যাগজিন চেক করে ট্রিগার অন করতে বলি। যতোদূর কাছাকাছি যাওয়া সম্ভব আমরা যাবো। প্রথমে প্রেনেড চার্জ, তারপর সবগুলো হাতিয়ার থেকে গুলিবর্ষণ। সবাইকে ভালোভাবে বুঝিয়ে দিই আক্রমণের পরিকল্পনাটা। এরপর রাস্তা পেরিয়ে ফসলের খেতে নেমে পড়ি সবাইকে নিয়ে।

ফসলের খেতে কোমর বাঁকিয়ে এগিয়ে যাই প্রায় একশ' দেড়শ' গজের মতো। এরপর ফসলের মধ্যে শরীর ভুঁবিয়ে মাটিতে শুয়ে পড়তে বলি সবাইকে। ঘন কালো রাত। আবছা আলোয় শুধু একে অপরের শরীরের অবয়ব দেখা যায়। হাঁটু আর কনুইয়ের ওপর ভর করে এগিয়ে যাই আরো 'শ' গজের মতো। সামনে তুলকালাম গোলাগুলির মাতামাতি। দু'পাশে গাছগাছালির ফাঁকে পাকা সড়ক দেখা যায় আবছাভাবে। বোর্ড অফিস থেকে অমরখানা ব্রিজ অবধি পাকবাহিনীর প্রতিরক্ষা লাইন। আমরা প্রায় তার মাঝামাঝি জায়গায় পৌছেছি। ফসলের মাঠ শেষ হয়, এরপর কাঁটাইয়ে বোপবাড় আর তকনো ডাঙা জমি। পাকা রাস্তার



ওপার দিয়ে শক্তির মূল বাস্কার আর ট্রেইনের সারি। পাকা সড়কের প্রায় ২৫/৩০ গজের মধ্যে পৌছানো যায়। কিন্তু আর সফিজকে টেনে নিই কাছে। ওদের প্রেনেডগুলো হাতে নিতে বলি। দু'জনের কাছে ৪টা প্রেনেড। ফিসফিসিয়ে শব্দের বলি, সোজা গিয়ে রাত্তার এপার থেকে প্রেনেডগুলো ছাঁড়ে দিয়ে ফিরে আসবি। আর দুটা রেমার চার্জ দিয়ে সামনের বাস্কার দুটা উড়িয়ে দিবি। ওরা কালবিলিশ না করে এগিয়ে যায় সাপের মতো একেবেঁকে। বুকে হাতুড়ির বাড়ি নিয়ে আমরা তাদের কভারে থাকি। মাত্র ৫/৭ মিনিটের মধ্যে ওরা দু'জন ছাঁটে আসে এবং তারপরই বিক্ষেপিত হয় প্রেনেড আর রেমার চার্জগুলো প্রচণ্ড শব্দগুলি আর তীব্র আলোর ঝলকানি দিয়ে। কিন্তু বুঝাবার অবকাশ না দিয়ে ফায়ার উপেন করে দিই। সবগুলো হাতিয়ার থেকে গুলিবর্ষণ শুরু হয়। পেছনে বাঁ থেকে একরামুলও গুলিবর্ষণ শুরু করে।

শক্তির একনাগাড়ে গুলিবর্ষণ যেনো হঠাতে করে থমকে যায়। তারপর সামনের দিকে আবার শুরু হয় যেমন চলছিলো ঠিক তেমনিভাবে। কিন্তু হঠাতে করেই শক্তির দুটো মেশিনগানের নলের মুখ আমাদের দিকে ঘুরে যায় এবং শুরু হয় এলোপাতাড়ি গুলিবর্ষণ। স্নাতের মতো গুলি উড়ে যেতে থাকে আমাদের মাথার ওপর দিয়ে। দাঁত কামড়ে পড়ে থেকে আরো প্রায় ৫/৭ মিনিট গুলিবর্ষণ চালিয়ে ছেলেদের উঠতে বলি। এবার পেছাবার পালা। দ্রুত ফসলের মাঠে গিয়ে ধানখেতের আড়ালে শরীর লুকোতে হবে। মাথা না তুলে যে যার মতো এসে ধানখেতে চুকে পড়ে। এরপর হামাগুড়ি দিয়ে দ্রুত পাচান্দুর্ধেরূপ। একরামুলের দলও বিপদ বুঝতে পেরে গুলি ধারিয়ে পিছু কিছিছে। পেছন থেকে যেয়ে আসে গুলি। মনে হয়, একদল সৈনিক তাদের পাকা বাস্কার-ট্রেণ ছেড়ে উঠে পড়েছে। হয়ঃক্রিয় অঙ্গ দ্বারা দিহিদিক জ্ঞানশূন্যভাবে গুলিবর্ষণ করে চলেছে। খেয়ে মালিহ তারা। মাথার ওপর দিয়ে বয়ে চলেছে শত সহস্র মৃত্যুবাণ। ভিমরুলের খাঁচায় ছিঁড়ি দিলে যেভাবে ভিমরুলের দল বের হয়ে আসে, খানসেনারাও আসছে সেভাবে খেয়ে। প্রচুর দুশ্শো গজ পেছনে তারা। অক্ষকারে ঠাহর করতে পারছে না, মুক্তিফৌজের দল কোনোভাবে দিয়ে এসে কোনোদিক গেছে। অস্থির মন্তব্য নিয়ে তারা চারদিকে গুলির বল্যা ছুটিয়ে চলেছে। মনে মনে বলি, দ্রুত আরো দ্রুত পালাতে হবে। পেছনে যমদূতের মতো খানসেনার দল। মাথা তুললেই তাদের গুলির আঘাতে ধরাশায়ী হবার সংভাবনা। এমতাবস্থায়, হামাগুড়ি দিয়ে চারপেয়ে প্রাণীর মতো দ্রুত এগুনো ছাড়া কোনো উপায় নেই। সবাইকে নিয়ে সেভাবেই এগতে থাকি। মনের ভেতর তখন একটাই ভাবনা কাজ করে চলেছে, পালাও, যতো দ্রুত পারো পালিয়ে যাও।

আলতো করে ছুঁয়ে যাওয়া মৃত্যুবাণ

পুরুরের আড়ালে পৌছে যেতে পেরেছে সবাই। হাঁপিয়ে উঠেছে ছেলেরা দাকুণভাবে। যেভাবে বন্যপত্র মতো চার হাত-পায়ে ছুটে আসতে হয়েছে, এ শুধু পেছনে মৃত্যুভয় তাড়িত করেছে বলেই সম্ভব হয়েছে। নতুনা স্বাভাবিক অবস্থায় এভাবে পানি-কানা ভেঙে ধানখেতের ভেতর দিয়ে পাড়ি দেয়া কিছুতেই সম্ভবপর হতো না।

খেয়ে আসছে খানসেনারা। ফসলের খেত মাড়িয়ে সোজাসুজি এগিয়ে আসছে ওরা দ্রুত। রাতের অক্ষকারে এভাবে শক্তির দিকে এগিয়ে আসাটা বিপজ্জনক ব্যাপার। কিন্তু মরিয়া হয়ে উঠেছে তারা। মুক্তিফৌজদের সঙ্গে তারা আজ একটা চূড়ান্ত বোঝাপড়া করবেই— তাদের হবভাব থেকে এ ব্যাপারটাই সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কিন্তু আগুয়ান খানসেনাদের থামাতে হবে।

আর তাদের আগ বাড়তে দেয়া যায় না। তা না হলে সমূহ বিপদ। চারদিকে গোলাওলির ছেটাঙ্গুটি পরিবেশটাকে একেবারে নরকে পরিণত করেছে। এ অবস্থায় মাথা ঠাণ্ডা রাখা সত্যিই মুশকিল। সঠিক সিদ্ধান্ত নেয়াটাও কষ্টকর। তবুও সিদ্ধান্ত নিতে হয়। একরামুলকে ডেকে বলি, ওদের থামাতে হবে যে করেই হোক। সবাইকে কুইক পজিশন নিতে বলি। পুরুর পাড়ের দুদিকে দুটো এল.এম.জি. বসে যায়। মাঝখানে এস.এল.আর. এবং রাইফেল বাহিনী।

— ফায়ার!

অর্ডার দেয়ার সঙ্গে চালু হয়ে যায় সবগুলো আগ্নেয়ান্ত্র। মধুসূনের এল.এম.জি. পার্টির সঙ্গেই আমার প্রায় গা ঘেঁষাঘেঁষি অবস্থান। এল.এম.জি.র নল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তাকে নন-স্টপ গুলি চালিয়ে যেতে বলছি। গর্জে গর্জে ওঠে আমাদের সবগুলো হাতিয়ার। তরু হয়ে যায় পুরুর পাড়ে তুলকালাম কাও। এতে করে কাজ হয়। ফসল খেত ধরে খেয়ে আসা পাকসেনার দল ধর্মকে যায়। কিছুক্ষণ তাদের গুলিবর্ষণ বন্ধ থাকে। কিন্তু তারপরই আবার তরু করে তারা পূর্ণেদ্যমে। তবে মনে হয়, এখন তারা পিছু হচ্ছে গেছে কিছুটা। আমি চিংকার করে সবাইকে আগের মতোই গুলি চালিয়ে যাবার নির্দেশ নিতে থাকি। এই সময় নিজেকে অনেকটা বিকারহস্ত মনে হয়। তবে একটা ব্যাপার বোধের ভেতরে কাজ করে যে, পাকসেনাদের আটকাতে হবে যে করেই হোক, নয়তো ভয়াবহ একটা অবশ্যজীবী ম্যাসাকারের সম্মুখীন হতে হবে।

সবাই গুলি চালিয়ে যায় বিরতিহীনভাবে। শক্ত অস্তিত্বের পজিশন লোকেট করে ফেলেছে। ফলে পানির দ্রোতের মতো গুলি ধরে অস্তিত্ব থাকে তাদের। পুরুর পাড়ের আড়াল নিয়ে সবার অবস্থান। মাথা তুলবার উপায় নেই কারো। শুধু হাতিয়ারের নল উঠিয়ে রেখে প্রাণপন্থে গুলিবর্ষণ করে চলেছে সবাই। কিছুক্ষণে কালো অঙ্ককার। বাতাসে বারুদের গাঢ়। চারদিকে শুধু তৎপুর বুলেটের ছোটগুটি। এ এক মরণপণ লড়াই, অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখবার যুদ্ধ। রাতের যুক্তে সাহস করে ত্রুটি দাঁড়ানোটাই হচ্ছে বড় কথা। এতে শক্ত যতো শক্তিশালী হোক তাকে থামতে যাবে না। ভালোভাবে ভেবেচিষ্টে তবে তাকে এন্ততে হবে। এক্ষেত্রে ঘটেছেও তাই। শক্ত অস্তিত্ব থেমেছে, কিন্তু তাদের চাপ ক্রমাগত বাড়ছেই। মনে হয়, আরো কিছু সৈন্য শুঠে এসেছে তাদের বাস্তার ও ট্রেক্স থেকে।

প্রায় ১৫/২০ মিনিট ধরে চলে এধরনের গুলিবিনিয়ম। কেউ কাউকে দেখে না; কিন্তু গুলির উৎস লক্ষ্য করে গুলিবিনিয়ম চলে তুমুলভাবে। একরামুল আসে হামাগুড়ি দিয়ে। ফিসফিসিয়ে বলে গুলির টেক প্রায় শ্যায়, আর বেশিক্ষণ টেকা যাবে না।

— কতোক্ষণ চলবে? পাঁচ মিনিট?

একরামুলের খবরটা যথেষ্ট উদ্বেগজনক। যুক্তের এই রকম পর্যায়ে গুলি ঘুরিয়ে যাওয়া মানে নিদর্শণ বিপদের ফাঁদে পড়া। পাঁচ মিনিটের মতো যুদ্ধ চালাবার মতো গুলি মজুদ আছে কি না জানতে চাই। গুলি হাতে থাকতেই একটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌছতে হবে। একরামুল অঙ্ককারে মাথা নাড়ে। যুখে বলে, পাঁচ মিনিট হয়তো চলবে।

— তাহলে আর নয়, বিট্টিট করো।

আমার সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিই তাকে। মধুসূন কভার ফায়ারে থাকবে, তুই জলদি উইথড্র কর সবাইকে নিয়ে। পুরুর পাড় দিয়ে সোজা পেছনের ধানখেতে ধরে। ও.কে.? গো, কুইক।

একরামুল দ্রুত চলে যায়। মধুর পাশে গিয়ে তাকে তার গুলিবর্ষণের গতি ঠিক রাখতে বলি। দাঁত কামড়ে ধরে মধুসূন থেমে থেমে টিপারে চাপ দেয় এল.এম.জি.র। আগন্তের ফুলকি দিয়ে

বেরিয়ে যায় শুলির ত্রাশ। পেছন দিয়ে একরামুল সবাইকে নিয়ে সরে পড়তে থাকে।

ওদের সবার সরে পড়া শেষ হয় এক সময়। এল.এম.জি. ম্যান-টুসহ আমরা চারজন তখনো পজিশন ধরে রেখেছি।

— শেষ ব্রাষ্টা দিয়ে নে, মধুসূনকে ফিসফিসিয়ে কথাটা বলতেই সে ট্রিগারে চাপ দিয়ে একভাবে হাতের অঙ্গুষ্ঠা ধরে থাকে। এক চাপেই খালি হয়ে যায় ম্যাগজিন। আর শেষ হতেই ওকে বলি, রিট্রিট! এল.এম.জি.র পা উঠিয়ে নিয়ে উল্টোদিকে ঝাঁপ দেয় মধু তার সেকেন্ডম্যানসহ। বাবলুর হাত আঁকড়ে ধরে সেভাবেই মুহূর্তকালের ভেতরে চলে আসি পুরুর পাড়ের নিচে। এরপর পানির কিনার ধরে দৌড় লাগাই সামনের দিকে মুখ করে।

শুক্রিয়োদাদের শুলি থেমে যাওয়াতে পচাহাতী খান বাহিনী যেনো উৎসাহিত হয়ে উঠে। শুলির বেগও বেড়ে যায় তাদের। শুলির তুবড়ি ফোটাতে থাকে তারা। এই অবস্থার মুখে আমরা পুরুরগাড় হয়ে ধানখেতে পৌছে যাই। তারপর দৌড়ে চলি কর্মাঙ্ক ধানখেতে মাড়িয়ে। বেশ কিছুক্ষণ এভাবে ছুটতে হয়। পাকবাহিনীও তাদের গোলাগুলি থামিয়ে দিয়েছে। তবে তারা আমাদের ছেড়ে আসা অবস্থানের দিকে চুপিসারে এগিয়ে আসছে কি না, সেটা বোৰা যায় না।

প্রায় তিনশ' গজের মতো পিছিয়ে বায়ে কাঁচা রাস্তাটার নাগাল পাওয়া যায়।

এখানে এই রাস্তাটার মোড়ে বেশ বড় একটা ঝাঁকড়া পাতাময় ছাতিয়ান গাছ। বাবলুকে নিয়ে ছাতিয়ান গাছের মোটা ঝুঁড়িটার কাছে এগিয়ে যাই। ঝুঁড়িথেকে হামাগুড়ি দিয়ে উঠে যাই গাছের ঝুঁড়িটা পর্যন্ত। এরপর পচাহাতী শক্রদের অবঙ্গস্তু আঁচ করার জন্য উঠে দাঁড়াতে যাই। হঠাৎ করে তখন সামনের দিক থেকেই একেকজন শুলি এসে যেনো আমার মাথার চুলে আলতো করে পরশ বুলিয়ে ছাতিয়ান গাছের ঝুঁড়িটুকু দিয়ে সশেড়। ঠিক তখন তখনি বাবলু আমার শার্টের কেনা খামচে ধরে প্রবল ক্ষেপণ দেয়, অনেকটা হৃদড়ি খাওয়ার মতো করে আমি ক্ষিপ্রগতিতে পড়ে যাই সামনে। আজকে কভু এলোপাতাড়ি শুলি ছুটে আসে ছাতিয়ান গাছ লক্ষ্য করে। পাকসেনারা আমাদের ছেড়ে আসা পুরুর পাড় অবধি যে পৌছে গেছে, ব্যাপারটা শ্পষ্ট বোৰা যায়। সেখান থেকেই শুরু আমাদের লক্ষ্য করে এভাবে আচমকা শুলি ছুঁড়েছে।

ছাতিয়ান গাছটার ঝুঁড়ির দিকে পেছন ফিরে তাকাতেই শরীর কাঁটা দিয়ে উঠে। এক ঝাঁক বুলেটের আঘাত গাছটার দেহ ক্ষতবিশিষ্ট করে ছাল-বাকল তুলে ফেলেছে। যে জায়গায় আমি দাঁড়াতে যাইলাম, ঠিক তার পেছনেই ঘটেছে এই ভয়াবহ কাও। তার মানে, আমি সোজা হয়ে দাঁড়ালেই মাথা-মুখ আর বুক সব ঝাঁকরা হয়ে যেতো। মাত্র কটা মুহূর্ত। সামান্য সময়ের ব্যবধান। আর তার ব্যবধানেই আমি বেঁচে গেলাম! মাথার চুলে তখনো বুলেটের স্পর্শ বোধ। অবশ হয়ে আসা শরীর। সে অবস্থায় বাবলুর পিঠ স্পর্শ করি। সে স্পর্শের মধ্যে থাকে পরম নির্ভরশীলতা, বিশ্বাস আর আহ্বা। ওকে বলি, থ্যাক্ষ ইউ বাবলু। তুই ঠিকমতো টান না দিলে এখনই তো জানটা গিয়েছিলো। আর নয়, নে চল।

বাবলু কিছু বলে না। দুঁজনে গড়িয়ে রাস্তার নিচে ধানখেতে নেমে আসি। এরপর আর থামাথামি নয়। সোজা এগিয়ে যাওয়া। শক্রপক্ষের গোলাগুলিও থেমে গেছে তখন। এ অবস্থায় ফিরতে ফিরতে একটা ভাবনা বারবার মনের গভীরে ঘুরেফিরে আসে। সেটা হচ্ছে জীবন মানে কি? জীবন মানে তো বেঁচে থাকা। এই যে বেঁচে আছি, নিশ্বাস নিচ্ছি, ধানখেতের কাদাপানি দিয়ে দ্রুত পদচারণা করছি, এই যে বুকের খাঁচায় হৎপিণ ধুকপুকিয়ে চলছে, এর নামই তো জীবন। আসলে যুদ্ধেক্ষেত্রে বেঁচে থাকাটাই একটা অনন্য ঘটনা,

একটা আকসিডেন্ট। মারা যাওয়াই এখানে অতি স্বাভাবিক ব্যাপার।

প্রায় মাইলখানেক পেছনে এসে পাওয়া যায় দলের সবাইকে। রাস্তার ওপর শরীর এলিয়ে বসেছে যুদ্ধক্রান্ত ছেলেরা। জোনাব আলীকে ফেরবার রাস্তা সম্পর্কে জিগ্যেস করতেই সে বলে উঠে, এই পথ ধরে সোজা উভের গেলে ইভিয়ার বর্জার।

অন্ধকারে কিছুই ঠাহর করা যায় না। একবার সীমান্ত পার হতে পারলেই আর বিপদের ভয় মেই। শক্র এখনো পেছনে। তাই সবাইকে উঠে বলি। এরপর জোনাব আলীর নির্দেশিত পথ ধরে উভরম্ভু হয়ে পিছু চলা। প্রায় মাইলখানেক হাঁটার পর সামনে একটা খাল পাওয়া যায়। খালের ওপর কাঠের পাটাতন দেয়া একটা পুরাতন লোহার বিজ। বিজটা পার হতে পারলেই ইভিয়া, এটা জোনাব আলী জানিয়ে দেয়।

বিজটার ওপর দিয়ে পার হওয়া যাবে কি না এটা নিয়ে ধিধারিত হয়ে উঠে সকলে। তখন বিজের ওপর উঠে অন্যদের বলি, চলে আয় সবাই আমার পেছনে পেছনে। মরলে আমি আগে মরবো।

প্রায় ৪০/৫০ ফুটের মতো লো বিজ। মাঝপথ বরাবর পারও হওয়া যায় নির্বিশে। কিন্তু তারপরই বিপত্তি। হঠাৎ করেই মনে হয় শূন্যে ভাসছি। কিছু ভাববার আশেই ২০/২৫ হাত নিচের দিকে নিজেকে পড়তে দেখি। একটা গোত্ত করে শব্দ তুলে হাঁটু আর কনুই সামনের দিকে রেখে মুখ বরাবর গোথে যাই দেখতে দেখতে নরম কর্তৃত মধ্যে। স্টেনগানটা সেঁটে যায় পেট আর পাঁজর বরাবর। একটা তীব্র ব্যাথার অনুভূতি ক্ষেত্রমূল্যে কিছুটা সময়। ওপর থেকে সমন্বয়ে চিকার ও উৎকর্ষিত ডাক ভেসে আসে, যাইত্বে ভাই আপনি কোথায়? কী হলো...!

নিচের নরম কাদায় প্রায় গোথে যাওয়া অন্তর্ভুক্ত ধাতস্ত হয়ে নিজেকে আবিষ্কার করি। ওপরের ছেলেদের উদ্দেশে বলি, মরি নাইস্ট বেচে আছি। ওপর দিয়ে আসতে পারবি না, নিচে দিয়ে আয়।

ওরা তখন বিজের পেছন দিয়ে আসে প্রায় শুকিয়ে যাওয়া খালের মধ্যে। টালমাটাল অবস্থায় আমি তখন উঠে দাঢ়িয়েছি। ছেলেরা কাছে এলে বলি, চল, ওপরে উঠ। কিছু হয় নি আমার।

খাড়া পাড় বেয়ে খালের ওপর উঠে আসি। এরপর রাস্তা। রাস্তার বাঁক নিয়ে একটা বি.এস.এফ. ক্যাম্পের পাশ দিয়ে সেই পরিচিত কাঁচা রাস্তার দেখা মেলে, যেটা স্কুল ঘরটার পাশ দিয়ে আমাদের নিয়ে যাবে চাউলহাটির পাকা সড়কে।

রাত প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। ক্লাস্ট বিপ্রস্তু দলের সব সদস্যই কেমন নেতৃত্বে পড়েছে। সে অবস্থায় হাঁটতে বাবলুর গলা শোনা যায় পাশ থেকে। উহু কি য্যান্ গোক্কার!

— হ-হ ক্যাঙ্কা যানি গু-গু গক্ষ, মাইনবের। একরামুলও বাবলুর সঙ্গে গলা মেলায়।

— মোরও গাওত্ত কিসের-বা গোক্ষ বাহে, বকর বলে উঠে।

আসলে শরীর থেকে একটা বাজে গক্ষ আমার নাকেও আসছিলো বেশ কিছুক্ষণ থেকে। শার্টের হাতা নাকের কাছে নিয়ে এবার ব্যাপারটা সম্পর্কে স্বচ্ছ হওয়া যায়। মনুষ্য বিষ্ঠার গক্ষ এ। আলতাফ কেরানির পুরুর পাড়ে যেখানে আমাদের পজিশন ছিলো, সেটা আসলে ছিলো মানুষের মল ত্যাগের জাগাগা। যুদ্ধের তাওবের ভেতরে পুরুর পাড়ে পজিশন নিতে গিয়ে সবার গা-গতর মনুষ্য বিষ্ঠায় ল্যাণ্টালেন্ট হয়ে গেছে। যুদ্ধের ভেতরে তখন টের পাওয়া যায় নি, পেছনে ধাবমান শক্র আর গোলাগুলির ভেতরে পশ্চাদপসরণের সময়ও কিছু

বোধা যায় নি । এখন নিরাপদ লোকায় এসে সবাই এটা টের পাচ্ছে যে, তাদের শরীরে লেগে আছে মানুষের বিষ্টা ।

— একেবারে নাশ হয়া গেইছে বাহে সারা গাও । একরামুল দাকুণ বিরক্তি-মাঝা গলায় কথাগুলো বলে । তাকে বিড়বিড় করে আরো বলতে শোনা যায়, শালারা আর কাম পান নাই, ওটে গেইছেন ঝাড়া ফিরবার ?

ওর কথায় হেসে ফেলি । হালকা গলায় তাকে সামনা দেয়ার মতো করে বলি, এখন আর কি করা যাবে বল । ক্যাম্পে চল্ সবাই মিলে লাজু সাবান দিয়ে পুরুরে গোসল করে নেবো । একরামুল বিড়বিড় করে তার বিরক্তি প্রকাশ করতেই থাকে । অঙ্ককার ফিকে হয়ে আসে । পাকা সড়কের দেখা মেলে অবশ্যে । সেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে আমাদের গাড়ি । গুরুসেবককে দেখা যায় গাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে । সামনে হিমালয় জেগে উঠছে ধীরে ধীরে । অপর একটা যুদ্ধক্রান্ত রাতের শেষ হয় । নরম মিঞ্চ আর পবিত্র প্রভৃতি সূচনা করে একটা নতুন দিনের ।

২৬. ১০. ৭১

কোয়াড্রন লিডার সদরুন্দিন

বিম-ধরা দুপুর । আহারের পর সবাই তাবুর ভেতর বিশ্রামরত । শরীর জুড়ে রাতের অপারেশনের ধকল । চোখের পাতা জুড়ে রাজ্যের ঘুমের ঘুড়িমা । এমন সময় মোসারদ পাগলা এসে জানায়, পাকা রাস্তায় যেতে হবে, বড় ভাইসেখানে দাঁড়িয়ে আছেন ।

বড় ভাই সকালে গিয়েছিলেন ভজনপুরে যুক্তিবিহীনার সাব- সেক্টর হেড কোয়ার্টারে । সাব- সেক্টর কমান্ডার জরুরি খবর পাঠিয়েছিলেন বড় ভাইসহ আমাদের ক'জনকে সেখানে যেতে । কিন্তু সারারাতের লড়াইয়ের ঝুঁতুক শরীর এমনভাবে বিশ্বস্ত হয়ে এসেছিলো যে, আমাদের আর যাওয়া হয় নি । বড় ভাইসহ দুজনকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন । এখন তিনি ফিরে এসে পাকা সড়কে যাবার জন্য সমন পাঠিয়েছেন । নিচয়ই তিনি জরুরি কোনো খবর বয়ে এনেছেন এটা ভেক্ষণে একরামুল ও বকরসহ অন্য কমান্ডারদের শয়া থেকে তুলে তাদের সঙ্গে করে নিয়ে এগোই পাকা রাস্তার দিকে ।

ঠিক পুরুষুরী কাঁচা রাস্তাটির মাথায় একটা হৃত খোলা জিপ দাঁড়ানো । জিপের পাশে একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে হাত নাড়িয়ে নাড়িয়ে কথা বলছেন বড় ভাই । কাছে যেতেই তিনি পরিচয় করিয়ে দেন তাঁর সঙ্গে, ইনি হচ্ছেন মেজর সদরুন্দিন, আমাদের সাব-সেক্টর কমান্ডার ।

— হ্যালো বলে ভদ্রলোক এগিয়ে এসে হাত মেলান সবার সঙ্গে । তারপর নিজের পরিচয় দেন এইভাবে, আই অ্যাম কোয়াড্রন লিডার সদরুন্দিন, কমান্ডার অব দিস সাব-সেক্টর । কেমন আছেন আপনারা ?

— ও,কে. স্যার, ফাইন বলে তাঁর কথার জবাব দিই । সুঠামদেহী মাঝারি গড়নের মানুষ সদরুন্দিন । দেখেই মনে হয় একজন পরিষ্কার ভদ্রলোক । ফালতু অহংকার নেই মানুষটির মধ্যে । ঠাণ্ডা মেজাজ, ভদ্র ব্যবহার এবং শুবই পরিমার্জিত ব্যভাবের অধিকারী তিনি । প্রথম সাক্ষাতেই তালো লাগে আমাদের সাব-সেক্টর কমান্ডারকে । বিমান বাহিনীর একজন ক্ষেয়াড্রন লিডার হলেও এখন তিনি মেজর সদরুন্দিন নামে সবার কাছে পরিচিত ।

হেড কোয়ার্টারে কথাবার্তা সেরে তিনি বড় ভাইকে চাউলহাটিতে নামিয়ে দিয়ে যেতে এসেছেন । আর এই সুযোগেই তাঁর সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়ে যায় । বড় ভাই তাঁকে

অনুরোধ করেন ক্যাম্পে এসে ছেলেদের সঙ্গে চা খেতে। কিন্তু কাজের তাড়া থাকায় স্থিত হেসে তিনি বলেন, আজ নয়, অন্য দিন হবে।

বড় ভাইয়ের সঙ্গে আরো কিছু কথাবার্তা বলেন তিনি। তারপর আমাদের উদ্দেশে বলেন, সো ইয়াং ম্যান, ইউ আর গোয়িং টু জয়েন আস টুমোৱা। কাল আপনারা আমাদের ‘সিঙ্গ-এ’ সাব-সেক্টরে জয়েন করবেন। তৈরি থাকবেন সবাই। সকাল ৮টার দিকে গাড়ি আসবে আপনাদের জন্য। ও, কে? আপনারা বুঝতে পেরেছেন? ইয়েস স্যার বলে অ্যাটেনশন হয়ে তার কথার জবাব দিই। এরপর মন্দ হেসে সবাইকে শুভ বাই জানান এবং ‘জয় বাংলা’ বলে গাড়িতে উঠে গাড়ি ঘুরিয়ে চলে যান ভজনপুরের দিকে।

বিদায়ের সুর বাজে

পুরুরপাড়ে ফিরে এসে বড় ভাইয়ের তাঁবুতে বসি আমরা। এরি মধ্যে কথাটা প্রচার হয়ে গেছে সারা ক্যাম্পে যে, চাউলহাটির জীবন শেষ। এখান থেকে আমাদের চলে যেতে হবে। এতেদিন ধরে গড়ে তোলা একটা নিজৰ পরিমণ্ডল, অভ্যন্তর জীবনের একটা ধারা, জয়গা আর মানুষজন সব ছেড়ে চলে যেতে হবে কাল। এ ভাবনাটা ক্যাম্পের সবার মধ্যেই নিদরশন একটা প্রভাব ফেলে। মন খারাপ হয়ে যায় সবার। বড় ভাই বলেন, বুঝলা মাহবুব এখানেই বুঝি ভালো ছিলাম আমরা, ওদের ভাবসাব যেন কেমন কেমন!

বড় ভাই সাব- সেক্টর হেড কোয়ার্টার থেকে সবকিছু দেখেন এসেছেন। তার মুখে এ ধরনের কথা ওনে কিছুটা হতোদয় হয়ে জিগ্যেস করল, কেমন কেমন মানে? কি মনে হলো আপনার?

— কেমন আর কি! ওখানে সব ইলেক্ট্রো-এর নায়েক হাবিলিদার আর সুবেদারের রাজত্ব। কেনো যেনো মনে হচ্ছে কম্প্যুটাশন করে ঢিকে থাকতে হবে আমাদের। কেমন যেনো পরপর ভাব দেখলাম তাদের পৃষ্ঠায়। এখানকার পরিবেশ সেখানে নেই।

— দেখা যাবে বড় ভাই। ক্ষেত্ৰাকবে ওদের মতো, আমরা থাকবো আমাদের মতো। বড় ভাই সামনের দিনগুলোৰ কথা ভেবে বেশ অস্ত্রি হয়ে পড়েছেন। তাকে কিছুটা সুস্থির করার জন্য এ কথাগুলো বলি। বড় ভাই কিছুক্ষণ চুপ থেকে আবার কথা বলেন, ঠিকই বলেছো তুমি। থাকতে হবে আমাদের আলাদা পরিচিতি নিয়েই— চাউলহাটি ইউনিট বেসের পরিচিতি।

তখন তাকে বলি, আমাদের বর্তমান অবস্থান কি ঠিক থাকবে, না সবাইকে উঠিয়ে নিয়ে মিলিয়ে দেবে মুক্তিফৌজদের সঙ্গে? পিন্টু আহিদারসহ হাইড আউটে থাকা ক্ষোয়াডগুলোৱ অবস্থাই-বা কী হবে?

বড় ভাই বলেন, এ ব্যাপারটা বিত্তারিতভাবে আলোচনা হয়েছে। সদরদিন সাহেব তো বর্তমান অবস্থায় রাখতে চান, মিলাতে চান না ওদের সঙ্গে। তবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত কিছু হয় নি। কাল বোধা যাবে। এছাড়া নদীর কাছ থেকে জানা যাবে এ ব্যাপারে।

নদী সকাল থেকে বাইরে। তিনি ক্ষোয়াড কম্বারদের সঙ্গে দেখা করে তাদের কাছে সর্বশেষ রিপোর্ট আর মজুদের হিসেব বুঝে নেবেন। তারপর যাবেন তার হেড কোয়ার্টারে এবং সেই সঙ্গে সাব-সেক্টর হেড কোয়ার্টারে গিয়ে সদরদিন সাহেবের সঙ্গে চূড়ান্ত কথা বলে আসবেন। হেড কোয়ার্টারসহ হাইড আউটে থাকা সমস্ত এফ.এফ.-এর হিসেব-নিকেশ অন্ত, গোলাবারুদ ও রেশনের মজুদসহ অন্য সব মালপত্রের সমূদয় হিসেব-নিকেশ, চূড়ান্ত

করে মুক্তিবাহিনীর সা-ব-সেটের কমাত্তারের কাছে এতেনিটের ধার রাখা চাউলহাটি ইউনিট বেসকে হস্তান্তরিত করতে হবে। এ কাজে মহাব্যস্ত আজ ক্যাপ্টেন নন্দা। তার ফিরতে হয়তো সন্ধ্যা হয়ে যাবে।

ক্যাপ্ট জুড়ে যেনো বিদায়ের সুর বেজে ওঠে।

এই পুরুর পাড়ে সার সার দাঁড়িয়ে থাকা তাঁবু, পুকুরের টলটলে কাকচকুর মতো পানি, তার বুক জুড়ে থাকা লাল পঞ্জের দল, পেছনে দেয়ালের মতো দাঁড়িয়ে থাকা সার্বক্ষণিক ছায়াসঙ্গী হিমালয় পাহাড়ের বিস্তার, এই পরিচিত পরিবেশ ও দৃশ্যের সমাহারসম্পূর্ণ আপন ভূবন ছেড়ে চলে যেতে হবে। চাউলহাটি বাজার, বি.এস.এফ ক্যাপ্ট, কামানের নিয়মিত গর্জন, দিবারাত্রি মেশিনগানের গোলাগুলি, এমনকি শক্রঘাঁটি অমরখানা— পুকুর পাড়ে দাঁড়লেই ঢোকে পড়ে যা, সেটিও যেনো কেমন আপন হয়ে গিয়েছিলো। এগুলো সব ছেড়ে যেতে হবে তাবতে মন খারাপ হয়ে যায়।

এই এখন মনে পড়ে যায় একা নিঃসঙ্গ চড়ে ফিরে বেড়ানো গাধাটির কথা। তাকেও ছেড়ে যেতে হবে আমাদের! বেচারা অবোধ প্রাণী কাল থেকে একলা হয়ে যাবে। তবে ক্যাপ্ট গুটিয়ে নেয়ার সময় তার একটা আনন্দার ব্যবস্থা কোনো-না-কোনোভাবে করে যেতে হবে।

ছেলো বিমর্শ আর বিদাদমাখা মুখে পুকুর পাড়ে এলোমেলো ঘুরে বেড়ায়। বেলা গড়িয়ে আসে। পদ্ধতি বিকলের মৃদুমূল্য বাতাসে বেলাশেষের পর্যন্ত যেনো ভেসে বেড়ায় তাঁবুতে তাঁবুতে। পুকুরের চারপাশ ঘিরে।

বিদায় চাউলহাটি, আলবিদা ক্যাপ্টেন নন্দা। সকাল হতেই ক্যাপ্ট গোটানোর কাজ শুরু হয়ে যায়। একদল ভাঙতে থাকে তাঁবু। আরেকদল যায় বি.এস.এফ. ক্যাপ্ট থেকে অন্তর্শন্ত্র আর গোলাগুলি সংগ্রহ করতে। নিরাপত্তান্বিত কারণে ইউনিট প্রিসের হাতিয়ার পত্র ও গোলাবারুদের সমৃদ্ধ মজুদ বি.এস.এফ. ক্যাপ্টে রাখা হয়েছিলো। নন্দার তাঁবু গুটিয়ে নেয়ার কাজ চলতে থাকে। অত্যন্ত বিমর্শ আর দৃঢ়বিত দেখায় নন্দাকে। পুকুরপাড়ে দাঁড়িয়ে শেষ কথাবার্তা চলতে থাকে তার সঙ্গে। নন্দা বারবার করে বলেন, ইউ আর গোয়িং। ফ্রম টু ডে আই হ্যান্ড মো কমাড, মো এফ.এফ.সি, মো অপারেশন্স...।

গত রাতে নন্দার তাঁবুতে দীর্ঘকণ ধরে আলোচনা বৈঠক বসেছিলো। নন্দাকে অফিসিয়াল চাউলহাটি ইউনিট বেসকে মুক্তিবাহিনীর সা-ব-সেটের কমাত্তারের কাছে হস্তান্তর করতে হবে। এজন্য ইউনিট বেসের সমস্ত এফ.এফ.-এর তালিকা তৈরি করে দেয়া হয়েছে। ক্ষোয়াড়গুলোর হাতে অন্তর্পাতি- গোলাবারুদের তালিকাসহ হেড কোয়ার্টারে মজুদ অন্তর্শন্ত্র ও গোলাবারুদের হিসেব মিলিয়ে দীর্ঘ তালিকা প্রস্তুত করতে হয়েছে। রেশনসহ অন্যান্য মালপত্রের হিসেব মাঝে তাঁবুর খুঁটিগুলোর পর্যন্ত মেলাতে হয়েছে হিসেব। সব শেষ হয়ে গেলে বড় ভাই একটা অনানুষ্ঠানিক বিদায়ী সভার আয়োজন করেছেন। শেষ দিনের মতো চাউলহাটি পুকুর পাড়ে ছেলেদের ফল-ইন-এ দাঁড় করিয়ে তিনি নন্দার উদ্দেশে একটা বিদায়ী ভাষণ দিয়েছেন। সবার পক্ষ থেকে তিনি তাঁকে জানিয়েছেন গভীর কৃতজ্ঞতা। তাঁর অবদান সবাই মনে রাখবে চিরদিন, এটা তিনি বলেছেন বারবার। দেশ স্বাধীন হলে তিনি নন্দাকে স্বাধীন বাংলাদেশ দেখতে যাওয়ার আমন্ত্রণও জানিয়েছেন।

নন্দা তার বক্তব্য দিতে গিয়ে আবেগপ্রবণ হয়ে গিয়েছিলেন। সংক্ষিপ্ত কথায় তিনি বলেছেন, তোমরা আমার আপনজন হয়ে গিয়েছিলে, আজ আমি নিজের ভাইদের হারানোর ব্যাথা অনুভব করছি। তোমাদের জয় বাংলা পাওয়ার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করে যেতে হবে। একমাত্র যুদ্ধ ছাড়া জয় বাংলা হবে না, বাংলাদেশ হবে না, এটা মনে রেখেই তোমরা পরবর্তী দিনগুলোয় যুদ্ধ চালিয়ে যাবে। সবাই তালো থাকো। জয় বাংলা হলে অবশ্যই তোমাদের দেশে আমাদের মোলাকাত হবে...।

গভীর রাত পর্যন্ত সবাই মিলে বসেছিলাম পুরুরের উঁচু পাঢ়ে। অমরখানার দিকে মুখ করে। প্রচও যুদ্ধ আর গোলাগুলি চলছিলো। সেখানে নিতাদিনের মতোই। অমরখানাকে কেন্দ্র করে চলমান এ ধরনের যুদ্ধের সঙ্গে কেমন যেনো একটা সম্পর্ক দানা বেঁধেছিলো। যুদ্ধের কাছাকাছি ছিলাম আমরা, এখন চলে যেতে হবে দূরে কোথাও। একটা নিয়মিত ঝুঁটিন, দৈনন্দিন জীবনযাপনে অভ্যন্ত হয়ে ওঠা, পরিচিত একটা জগৎ ছেড়ে চলে যেতে সবারই খারাপ লাগে। গভীর বিষাদে ভরে ওঠে মন। তেমনি একটা বিষাদঘন পরিবেশে এবং ভারাক্রস্ত হৃদয় নিয়ে বসেছিলো সবাই অনেক রাত অবধি।

মোসারদ পাগলাসহ দু'তিনজন ইতিমধ্যে পুরুরের পেছনকার গ্রামের একজনে সঙ্গে কথাবার্তা বলেকয়ে আমাদের সেই গাধাটোর একটা আশ্রয়ের বন্দোবস্ত করে এসেছে। ভদ্রলোককে আমরা চিনি। তিনি সানন্দে গাধাটিকে নিতে স্বীকৃত হয়েছেন। পশ্চিম তার নতুন মালিকের বাড়িতে হয়তো তালোই থাকবে।

সকাল আটটার দিকে সদরুন্দিন সাহেবের এসে আসছিলেন। এসেই সমস্ত ইউনিট বেসের দায়দায়িত্ব বুঝে নিয়েছেন। তার পরিকল্পনা অন্তিমী বড় ভাই বুরুল হক কয়েকজনকে নিয়ে ভজনপূর হেড কোয়ার্টারে থাকবেন এবং এফ.এফ.ডের পরিচালনার ব্যাপারটা সমন্বয় করবেন। হাইড আউটে থাকা ৪টি ক্লাউচেট এখনকার এই অবস্থাতে থেকেই গেরিলা যুদ্ধ চালিয়ে যাবে। হেড কোয়ার্টারের ক্লাউচিং ফোর্সসহ অন্যদের নিয়ে আমরা আপাতত যাবো তেলুলিয়া। যুদ্ধক্ষাত ছেলেদের সদরুন্দিন সাহেবে ক'দিনের জন্য 'রেস্ট' মঙ্গুর করেছেন। অর্থাৎ অবসর আর ছুটি। এই ক'টা দিন আমরা আমাদের নিজেদের মতো করে সময় কাটাবো সেখানে। তারপর তিনি কাজ দেবেন আমাদের।

চাউলহাটি ক্যাম্প শুভিয়ে কোথায় যাবো এরকম একটা অনিচ্ছিত সম্ভব্যের জন্য আমরা যখন দুশ্চিন্তায় প্রায় বিভোর, তখনি সদরুন্দিন সাহেবের এই উদার ব্যবস্থাপনা খুবই ভালো লাগে। প্রতিদিন যুদ্ধ আর যুদ্ধ। একটা ক্লাউচিকর ব্যাপার। একটা বন্দি আর বক্ষ্যা জীবন। এই জীবন থেকে ছুটি নিয়ে ক'দিনের অবসরে যাবার জন্য মনের সংগোপনে সত্যি সত্যি ছিলো এক নিদারণ আকুলতা। সদরুন্দিন সাহেব সেটা আজ পূরণ করে দিলেন। তাই প্রথম দিনই তার ওপর কৃতজ্ঞতায় ভরে ওঠে মন।

ন'টার দিকে ট্রাক আসে। ৭ টানি বেডফোর্ড ট্রাক। ট্রাকের গায়ে বড় বড় ইঁহরেজি হুরফে লেখা টি.এস.এম. লি. অর্থাৎ ঠাকুরগাঁও সুগার মিলের ট্রাক। যুদ্ধের শুরুতে এই ট্রাক প্রতিরোধ যুদ্ধে অংশ নেয় এবং পরে চলে আসে এপারে প্রতিরোধ যোদ্ধাদের নিয়ে। এখন ঠাকুরগাঁও ও পঞ্চগড় সুগার মিলসহ বেশ ক'টা সংস্কার ট্রাক এবং অন্যান্য যানবাহন মুক্তিবাহিনীর যোগাযোগ আর সরবরাহ কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে।

ট্রাকে মাল তোলা হয়। ক্যাম্পেন নন্দাও তাঁর ক্যাম্প শুভিয়ে নিয়েছেন গাড়িতে। বড় ভাই

তার মিনি হেড কোয়ার্টার নিয়ে উজনপুর হেড কোয়ার্টারের যাবেন অন্য গাড়িতে। নন্দার ড্রাইভার গুরুসেবক এই অবস্থায় প্রায় কেন্দে ফেলে। তারপর তার একটা ছবি বের করে ছবির অপর পিঠে তার নাম-ধার্ম ইত্যাদি এবং লখনৌয়ের তার বাড়ির ঠিকানা লিখে আমাকে দিয়ে বলে, ভাইয়া মাত ভুল না। জয় বাংলা হোনেকা বাদ জরুর আইয়ে গা যেরা ঘর...। তার কথার জবাবে কিছু বলা যায় না। বলতে পারি না। কেমন একটা চাপা আবেগ তর করে হৃদয় জুড়ে। কেবল স্বাতে তার দেয়া ছবিখানা গুঁজে নিই বুক পকেটে। আর মনে মনে বলি, গুরুসেবক, যুদ্ধের মাঠে তো কিছু বলা যায় না। যদি বেঁচে থাকি, যদি বেঁচে যাই, তবে চেষ্টা করবো তোমার প্রিয় লখনৌতে একবার যেতে।

বেলা এগারোটার দিকে শুটিয়ে নেয়ার সব কাজ শেষ হয়। বিদায়ের সময় ঘনিয়ে আসে। নন্দাকে স্যালুট করে তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিই। নন্দার চোখজোড়া তখন ছলছলে। মুখে বিদায়ের ব্যাথাতুর হাসি। শুধু বলেন, ও.কে. ফ্রেন্স, গুড বাই। ক্রম টু - ডে আই হ্যাত নো কমান্ড, নো এফ.এফ.স...।

গাড়ি ছেড়ে দেয়। পুরুর পাড় ছেড়ে, পরিচিত চাউলহাটি ছেড়ে আমরা এগিয়ে চলি জলপাইগড়ির দিকে। নন্দা তাঁর গাড়ি নিয়ে বেশ কিছুদূর পর্যন্ত আমাদের টাকের সামনে থাকেন। তারপর হারিয়ে যায় এক সময় তাঁর গাড়ি। মনের গভীরে তখন বারবার কেবল এই কথাগুলো অনুরূপন ভূলে বাজতে থাকে, বিদায় চাউলহাটি, সুমিত্রিদা ক্যাস্টেন নন্দা।

২৭. ১০. ৭১

ফ্যাডম আইছে, ফ্যাডম

তেঁতুলিয়ায় আমাদের অভ্যর্থনা ভালো হয়েছে। একজন নায়েক বলে ওঠে, ফ্যাডম আইছে, ফ্যাডম আইছে...।

প্রথমে ব্যাপারটা বুঝতে পারি নি। সদরুন্দিন সাহেবের ব্যবস্থাপনা অনুযায়ী তেঁতুলিয়ায় অবস্থানরত মুক্তিফৌজ বাহিনীক কমান্ডারের কাছে আমাদের রিপোর্ট করতে হবে। ই.পি.আর.-এর একজন সুবেদারের নেতৃত্বে রিয়ার হেড কোয়ার্টার হিসেবে তেঁতুলিয়ায় মুক্তিবাহিনীর বেস প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এই বেসের সঙ্গে মিলেমিশে থাকতে হবে আমাদের অবসরযাপন বা ছুটির কঠো দিন।

চাউলহাটি থেকে আমাদের বহনকারী ট্রাক জলপাইগড়ি-শিলিগড়ি হাইওয়ে ঘুরে বাংলাবাঙ্কা দিয়ে চুকেছে বাংলাদেশে। সেখান থেকে সরাসরি এসে থেমেছে তেঁতুলিয়া হাইকুলের লম্বা টিন শেড দেয়া ভবনের সামনের মাঠে।

— এখানেই আপনাদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। একটু আগে কথাটা জানিয়েছেন ঠাকুরগাঁও সুগার মিলের বেটেখাটো ভালো মানুষ ড্রাইভারটি। ট্রাক থেকে নেমে ছেলেদের ফল-ইন্-এ যখন দাঢ় করানো হয়েছে, ঠিক তখনি ৪/৫ জন সৈনিক পরিবেষ্টিত অবস্থায় একজন হাবিলদার এগিয়ে আসে রাত্তার দিক থেকে। হাবিলদারটির চেহারা গতানুগতিক, হাবিলদারদের চেহারা যেমনটা হয়, ঠিক তেমনি। প্রায় ঢাউসমতো উদর, নাদুসন্দুস গড়নের। গায়ের রঙ কালো হলেও মূখখানা যোটামুটি পূর্ণিমার চাঁদের মতো গোল। পেছনে তার উচু লম্বা গড়নের একজন নায়েক। লোকটির চেহারাই বলে দেয় অতিশয় ধূর্ত আর চতুর মানুষ সে। তার মুখ থেকেই কথাগুলো বেরিয়ে আসে, ফ্যাডম আইছে, ফ্যাডম...।

প্রথমে কথটার মানে বুঝতে পারি না। কিন্তু হাবিলদার এসে কোনো সমাজণ বা কুশল বিনিয় ছাড়াই যখন সরাসরি আদেশ-নির্দেশ দিতে থাকে, তখন বুঝতে পারি ফ্যাডম বলতে এরা কী বোঝাতে চাইছে। এফ.এফ. বা 'ফ্রিডম ফাইটার' শব্দ দুটির উচ্চারণ বিভ্রাট বা বিকৃতি ঘটিয়ে এরা তাদের নামকরণ করেছে 'ফ্যাডম'। বোঝা যায়, ব্যাপারটা তালো চিন্তা থেকে আসে নি। কেনো যে তারা এই বিকৃতি ঘটিয়েছে, কে জানে?

হাবিলদার বলে, ফ্যাডম সাব্রা আইছেন, দাঁড়ায়ে পড়েন, মাথা শুন্তি নিতে হইবো। জলন্দি জলন্দি।

তার ভাষার ব্যবহার পরিমার্জিত নয়। কর্কশ নীরস আর অসহনীয়। নায়েকের চোখে-মুখে ধূর্ত হাসি। যেনো রসিকতা করছে এই রকম ভাব নিয়ে হাবিলদারের কথার পিছে সে কথা বলে ওঠে, ফ্যাডম সাব্রা যুদ্ধ থন ফিইরছে। ইয়ানো তানেরা ক্লান্ত হই পইরছে। মেজর সাবে তানেগো রেস্ট্ৰ কইরতো পাঠাইছেন, ইয়ানো এইহামে থাইকতে হইলে এই হানের ডিসিপ্লিন মাইনতে হইবো...। হাবিলদার তখন বলে তার সেই আগের ভঙ্গিতেই, জলন্দি করেন, জলন্দি করেন, মাথা শুন্তি কইরতে হইবো। একটা কথা সকলে মনে রাখবেন এইখানে আপনেরা আমাগো আভাবে থাকবেন, আমাগো হকুমহাকাম মাইন্যা চলতে হইবো।

হাবিলদারের কর্কশ ফৌজি ব্যবহার এবং নায়েকের ধূর্তামিতৰা গা-জুলা ধৰানো কথাবার্তা শুনে পরিবেশটাকে কেমন যেনো বৈরী বৈরী মুক্তি হয়। মনটা তেতো হয়ে ওঠে এদের প্রাথমিক আচার-ব্যবহারে। দলের তরুণ এবং প্রিমিয়া ছেলেরা এ ধরনের প্রাথমিক অভ্যর্থনার ব্যাপারটাকে তালোভাবে নিতে পারে না। রেগেমেগে ফেটে পড়বার যোগাড় হয় তাদের। যেনো এখনি বিদ্রোহে ফেটে পড়বে তামাপ ইশারায় তাদের চুপ থাকতে বলে ফ্ল-ইন-এর কাজ শেষ করি। একরামুল ছেলেমুল সংখ্যার হিসেব পেশ করে।

হাবিলদারকে বলি, এখনে আমরা মেট ৩৭ জন। হেড কোয়ার্টারে কমান্ডার নুরুল্ল হকের সঙ্গে রয়েছে ৫ জন। এই মোট ৪২জন।

হাবিলদার তখন সমবাদার স্যুটির মতো মাথা নেড়ে বলে, ঠিক হ্যায়। এখন লিষ্ট দেন আপনাগো সবার নামের।

তার কথার জবাবে বলি, লিষ্ট তো দেয়া যাবে না এখন, তৈরি করে পরে দেয়া হবে।

হাবিলদার অসহিষ্ণুভাবে বলে, এটা ঠিক না। লিষ্ট দিতে হইবো, সুবেদার সাবের অর্জর, লিষ্ট নিতে কইছেন তিনি।

হাবিলদারের এই উক্তিতে আমার নিজের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়। সুব কঠে নিজেকে সংযত রেখে গলার স্বরে কাঠিন্য এনে বলি, বলছি তো লিষ্ট পাবেন, তৈরি করে আজ সক্ষ্যায় দেয়া হবে, এখন আমাদের সব গোছগাছ করে নিতে দেন, কোত কোথায় বলেন? হাতিয়ার-গোলাবারুদ নামাতে হবে। পরে আপনার সুবেদার সাহেবের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা হবে।

হাবিলদার তখন আমার মুখের দিকে তাকায়। কিছুটা ধমকে যায় যেনো আমার এ ধরনের প্রত্যয়ভরা কথাতে। তারপর বলে, নায়েক সাব কোতের চার্জে রইছে। তিনি হাতিয়ার-গোলাবারুদের বুঝ নিবেন। আপনাগো খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা আমাগো সঙ্গে হইবো, রেশনপত্রের সব বুঝ দিবেন কোয়ার্টার মাস্টারে। আমি হইতাছি এইখানের হাবিলদার মেজর, এইটা মনে রাইবেন।

এতোক্ষণে হাবিলদার নিজের পদবির পরিচয় দিয়ে তার প্রচন্ড কর্তৃত ফলাবার ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিতে চায়। আমি তাকে বলি, ঠিক আছে, দেখা যাবে পরে, এখন কোত দেখান, হাতিয়ারপত্র রাখতে দেন আর আমাদের খাওয়াদাওয়া নিয়ে আপনাদের ভাবতে হবে না। আমাদের নিজস্ব রেশন যখন আমরা সঙ্গে এনেছি, তখন সুবিধামতো লঙ্গরখানা বানিয়ে নিয়ে রান্নাবাটা করে খাওয়ার ব্যবস্থা করে নেবো।

— ঠিক আছে দেখা যাইবো বলে হাবিলদার মেজর গজরাতে গজরাতে চলে যান। কিন্তু কি দেখা যাবে, বুঝতে পারি না। গমনোদ্যুত নায়েক হাতের আঙুলের ইশারায় রাস্তার ওপশের একটা সাদা দালানবাড়ি দেখিয়ে বলেন, এইটা আমাগো কোত, ইয়ানো আপনেরা হাতিয়ার-গোলাবারুন্দ সব ছানে লইয়া আছেন, আমারে সব হিসাব করি বুবা নিতে হইবো।

রেশনসহ ছেলেদের ব্যক্তিগত মালসামানা নামিয়ে নিয়ে ড্রাইভারকে রাস্তার ওপারে সাদা সিড ষ্টোর দালানটির দিকে যেতে বলি। একরামুল, বাবলু ও মতিয়ারসহ ৬/৭ জন যায় হাতিয়ার-গোলাবারুন্দ ইত্যাদি ট্রাক থেকে নামিয়ে ‘কোতে’ জমা রাখার কাজে। বকর স্কুলঘরে ছেলেদের থাকার ও শোবার ব্যবস্থা করতে লেগে যায়। স্কুল ঘরের বাঁ দিকে শামসুন্দিনের নেতৃত্বে ক’জন লেগে পড়ে লঙ্গরখানার উন্মুক্ত বানিয়ে দুপুরের আহার তৈরির আয়োজনে।

এমন সময় রাস্তার ওপারে যেখানে হাতিয়ার-গোলাবারুন্দ নামানো হচ্ছিলো, সেদিক থেকে একটা হৈচৈ, হটগোলের শব্দ শোনা যায়। দুটিনটা প্রস্তুতি গলার চিংকার শোনা যায়। কেনো রকম অঘটন ঘটলো না তো, এইরকম এটা শোঝায়া মনে বকরকে সঙ্গে নিয়ে দ্রুত ছুটে যাই ঘটনাস্থলের দিকে। আমাদের দেখে রাগে ফেটে-পড়া ভাব নিয়ে এগিয়ে আসে বাবলু-মতিয়ারসহ অন্যরা। কিছু জিঞ্চাপি করবার আগেই বাবলু উত্তেজিতভাবে চিংকার করে বলতে থাকে, এরা পেয়েছেন এক? এই রকম দুর্ঘ্যবহার করবে কেনো এরা? এতোক্ষণ ফ্যাডম বলেছে কিছু বলি নেই, কিন্তু টিচ্কারি দিয়ে কথা বলবে কেনো এরা? আমরা কি তাদের আভাবের সেপুষ্ট জীবিক। এখানে বসে বসে রেশন খাবে, যুক্ত করার নাম নাই, আর আমাদের সঙ্গে ইয়াকি থলে কি না...।

কি বলে, তা না শনে ওকে হাত দিয়ে যাকি মেরে থামিয়ে দিই। বলি, আয় দেবি কি হয়েছে।

নায়েকের দেখা পাওয়া যায়, মোটামুটি হতভুব চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে। তার সঙ্গী সৈনিকেরাও কেমন অপ্রস্তুত হয়ে গেছে এই ঘটনার মুখে। তবে হাবিলদার মেজরকে আশপাশে দেখা যায় না। সম্ভবত চলে গেছে সে তার আস্তানায়। নায়েককে জিগ্যেস করি, কি হয়েছে? এনি প্রোবলেম!

নায়েক মুখ স্কুলবার আগেই তাতানো গলায় বাবলু বলে ওঠে, কি আর হবে? উনি ইয়াকি মারেন আর বলেন, আমরা নাকি শয়ে শয়ে খান মারছি, খান বাহিনীর ট্যাঙ্ক মারছি রাইফেল দিয়া, খানের গুটি সাফ করি দিয়া আসছি, এই জন্য নাকি আমরা ক্লান্স হয়্যা পড়ছি আর মেজর সদকুন্দিন সেই জন্য আমাদের রেষ্ট দিছেন, ছুটি দিছেন, কনতো এই ধরনের গা জ্বালানো কথা কি সহ্য হয়?

ঘটনা তা হলে এই! কোত ইনচার্জ নায়েক বাবলুদের কাছ থেকে হাতিয়ার রিসিভ করতে করতে হল ফোটানো কথায় মশকরা করতে গিয়ে এই বিপন্নিটা ঘটিয়েছে। ব্যাপারটা আরো খারাপের দিকে গড়তে পারতো। যুদ্ধের মাঠ থেকে সদ্য ফেরত এই টগবগে শিক্ষিত তরুণ ও যুবকদের সেন্টিমেন্টে ঘা দিয়ে এইরকম স্কুল রসিকতা করাটা ঠিক

হয় নি। এরকমের অবস্থার মুখে ছেলেরা ক্রোধ বা রাগের মাধ্যম হাতে অন্ত পর্যন্ত ভুলে নিতে পারে। এবং সেটা যে খুব একটা অশ্঵াভাবিক ব্যাপার হবে মনে হয় না। এই রকম তিক্ত উপঙ্গ মুহূর্তে নিজেদের মধ্যে গোলাগুলি বেধে গিয়ে যে একটা অনভিষ্ঠেত ঘটনার অবতারণা হবে না, এমন গ্যারান্টি কে দিতে পারে? তাই ব্যাপারটার একটা স্থায়ী সুরাহা এখানে এবং এখনি হওয়া উচিত বলে মনে করি।

নায়েকের উদ্দেশে বলি, নায়েক সাহেব, এ ধরনের কথাবার্তা আর বলবেন না। একটা কথা শুধু মনে রাখবেন, আমরা কেউই ই.পি.আর.-আনসার বা মুজাহিদ নই। সবাই স্কুল-কলেজ-ইউনিভার্সিটির ছাত্র। আমরা সবাই যুদ্ধের ফ্রন্ট থেকেই এখানে এসেছি। যুদ্ধ যুদ্ধই। তাকে নিয়ে ইয়ার্কিং করবেন না। আমরা তা হলে বাধ্য হবো মেজর সাহেবকে এসব কথা জানাতে। এয়নিতে এখানে ভালো আছেন, কাল চলে যেতে পারেন অমরখানা ফ্রন্টে। মেজর সাহেবকে বলে আমরা সে ব্যবস্থা করে ফেলবো।

গড়গড় করে কথাগুলো বলে যাই। আর তাতে সত্যি সত্যি কাজ হয়। নায়েককে কিছুটা ভীত দেখায়। নিজেকে সামলে নেয় সে কোনোমতে। সম্ভবত বুঝতে পারে তার ভুলের ব্যাপারটা। আমাদের সঙ্গে এতোক্ষণ ধরে যে আচরণ করেছে, সেটা যে ঠিক হয় নি, হয়তো এ বোঝটা তার মধ্যে জেগে ওঠে। হয়তো এ উপলক্ষ্মি তার হয়ে থাকবে যে, এফ.এফ.ডের ওপর ডেমিনেট করা যাবে না। আনসার, মুজাহিদ এবং তার নিজের বাহিনী ই.পি.আর. সৈনিকদের মতো ব্যবহারও করা যাবে ~~না~~ আমাদের সঙ্গে। তাই সে মাফ চাওয়ার ভঙ্গিতেই বলে, ইয়ানো আমার ভুল হইছে নহুন? আফনেরা কিছু মনে কইরতোন ন।

এরপর আর কিছু ঘটে না। আমি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে হাতিয়ার-গোলাবারুদ জমা রাখার কাজ তদাক করে যাই। কিছুক্ষণের ভেলেটেই শেষ হয়ে যায় এ পর্যায়ের কাজ। নায়েক সাহেব 'দাদু' বলে সঙ্গেধন করার ফলে তার মধ্যে আমাদের সবার রাগ বা ক্রোধের ভাবটা পড়ে গেছে।

ফিরতি পথে বাবলুকে রীতিমতো হাঁচিতে দেখায়। ছেলেমানুষ গলায় সে বলে, কনতো কি নাম দিছে হামার ফ্যাডম! এইটা কোনো নাম হইলো? তার কথার ভঙ্গিতে সবাই হেসে উঠি আমরা।

মহানন্দা

মহানন্দার পাড়ে দাঁড়িয়ে শক্তরের 'এপার বাংলা ওপার বাংলা'র কথাটা খুব বেশি করে মনে পড়ে। মহানন্দার এপারে বাংলাদেশ, ওপারে পশ্চিমবঙ্গ। ভারত ও বাংলাদেশের সীমানা ঠিক নদীর মাঝে দিয়ে। এপারে বাংলাদেশের মানুষ নদীতে গোসল করেছে, কাপড়চোপড় কাচছে, ইচ্ছেমতো ব্যবহার করেছে নদীর পানি, ঠিক একইভাবে ওপারের অর্ণাং পশ্চিমবঙ্গের মানুষজনও ব্যবহার করছে নদীকে। এপারেও বাংলা, ওপারেও বাংলা— মাঝখানে নদী। এখানে দাঁড়িয়ে বঙ্গ বিভাগের আসল রূপ চোখের সামনে দিব্য ফুটে ওঠে। মনে হয়, এখানে দাঁড়িয়েই যেন কথাশিল্পী শক্তর তাঁর অমর সৃষ্টি 'এপার বাংলা ওপার বাংলা' বইটির নামকরণের যথার্থতা খুঁজে পেয়েছিলেন। উচ্ছব অবস্থাতা নদী মহানন্দা। পরিষ্কার টলটলে আয়নার মতো শুচ্ছ পানি। চিনির মোটা দানার মতো সাদা বালু শুচ্ছ ওই পানির নিচে। ছেট ছেট নৃড়িপাথর। হিমালয় থেকে নেমে এসেছে নদীটি শিলিঙ্গড়ি শহরকে দু'ভাগ

করে। বাংলাদেশ সীমান্তে তেঁতুলিয়ার পাশ ঘোষে নদী বাঁক নিয়ে আবার ঢুকেছে ভারতীয় এলাকায়। আবার এই একই নদী গিয়ে হাজির হয়েছে বাংলাদেশের চাঁপাইনবাবগঞ্জে। এটিই আবার গিয়ে মিশেছে রাজশাহীর কাছে পদ্মাৰ সঙ্গে।

নদীৰ পাড়ে দাঁড়িয়ে ওপারেৰ বিষ্টীৰ্ণ ভাৱতীয় এলাকা চোখে পড়ে। বাগড়োগড়া এয়াৱাপোর্ট থেকে একটা বিমানকে দেখা যায় আকাশে উড়াল দিতে। আৱো দূৰে আসাম-বেঙ্গল হাইওয়ে, ৱেলপথ। একটা মালবাহী টেনেৰ ইঞ্জিনকে কালো ধোঁয়া ছেড়ে তাৰ বিৱাট দেহ নিয়ে ধূকতে ধূকতে এগিয়ে যেতে দেখা যায়। পেছনে উত্তুল হিমালয়েৰ কালো শৰীৰ। তাৰ শৰীৱেৰ বাঁজে বাঁজে গড়ে উঠেছে ব্ৰিটিশ রাজেৰ শীতকালীন আবাসস্থল দার্জিলিং। এখন সেটা ভাৱতেৰ অন্যতম প্ৰধান পৰ্যটন কেন্দ্ৰ বা শহৱৰ। পাহাড় কেটে কেটে তৈৰি কৰা হয়েছে ৱেলপথ, মোটৱ চলাচলেৰ পথ। স্বপ্নবিলাসী মানুষজনেৰ ভিড় লেগে থাকে সেখানে গৱম কালটা জুড়ে। মনে মনে বলি, দেশ স্বাধীন হোক, আমৱাও একদিন তাদেৱ মতো ঠিক এসে হাজিৱ হৰো হিমালয়েৰ কাছে, স্বপ্নৰ শহৱ দার্জিলিং-এ।

ছেলোৰ সব উৎসাহ ভাৱে ততোক্ষণে নেমে পড়েছে নদীতে। বাঁধ ভাঙা জোয়াৱেৰ মতো উচ্ছল তাৰুণ্য সবাৱাই মধ্যে। হৈচৈ কৰতে কৰতে একটা তোলপাড় শুৱ কৰে দিয়েছে নদীৰ পানিতে। বাবলু আৱ মতিয়াৱসহ অতি উৎসাহী কয়েকজন চলে গৈছে নদীৰ ওপারেৰ জলসীমান্য। ওপারেও স্থানৱত নাৰী-পুৰুষেৰ এক বিৱাটেুচ্ছল, বিভিন্ন বয়সেৰ যেয়েদেৰ সংখ্যাই বেশি। অত্যন্ত সহজ সৱল আচৱণ তাদেৱে ত্ৰোষ্টাক আৱ অহেতুক লাজলজ্জাৰ বিড়বলা তাদেৱে নেই। একদল কম বয়সী তুলুণীৰ সঙ্গে বাবলুৱা দিব্য ভাব জয়িয়ে বসে এই স্বল্প সময়েৰ ব্যবধানেই। হাঁঠৎ কৰেই সে স্বল্প বাকাটিৰ কথা মনে হয়, বয়স মানে না দেশ, মানে না সীমানা...।

মহানন্দা তাৰ ঝুকমকে শৰীৰ নিছেন্তে নেচে চলে। তাৰ শৰীৱেৰ পাহাড় ধোঁয়া পানিতে অবগাহন কৱাৰ জন্য প্ৰচন্ড সাহান। তাতে সাড়া না দিয়ে যেনো থাকা যায় না। তাই বকৰকে নিয়ে আমিও দেক্কে গড়ি। ক্ষটিক স্বচ্ছ শীতল পানিৰ ধাৱায় সমস্ত শৰীৰ জুড়িয়ে যায়। মহানন্দা নেচে চলে পৰমানন্দে তাৰ নিজস্ব ভঙ্গিৰ তালে। মনেৰ গভীৰে অনুভব কৱি তাৰ ব্যঙ্গনা।

সেই তেঁতুলিয়া

বাংলাদেশেৰ মানচিত্ৰে মাথায় পাখিৰ ঠোটেৰ মতো জায়গাটিৰ নাম তেঁতুলিয়া। মিছিলেৰ জঙ্গ শ্ৰোগানে, তেজবী বজাৰ বক্তৃতায় ‘তেঁতুলিয়া থেকে টেকনাফ’ কথাটি কতোবাৱ কতোভাৱে যে শুনেছি, তাৰ ইয়ত্বা নেই। বাংলাদেশেৰ সৰ্বউত্তৰে তেঁতুলিয়া আৱ সৰ্ব দক্ষিণে টেকনাফ। আমাদেৱ বৰ্তমান অবস্থান সেই ঐতিহাসিক তেঁতুলিয়াতেই।

তেঁতুলিয়া থানা বৰ্তমানে নানা কাৰণে অত্যন্ত শুল্কপূৰ্ণ জায়গায় পৱিণ্ঠ হয়েছে। এটি বৰ্তমানে মুক্তাধ্বল। বাংলাদেশেৰ মোট ৪৩টি মুক্তাধ্বল থানাৰ মধ্যে এটি অন্যতম। এৱে রায়েছে নৃড়ি বিছানো প্ৰশংসন সড়কময় চমৰকাৰ যোগাযোগ ব্যবস্থা। বাংলাবাঙ্কাৰ সীমান্ত পাৱ হলেই আসাম বেঙ্গল হাইওয়ে। সেখান থেকে শিলিঙ্গড়ি শহৱেৰ দূৰত্ব মাত্ৰ ৫/৭ মাইলৰ মধ্যে।

মুক্তাধ্বল তেঁতুলিয়া যুদ্ধেৰ প্ৰথম থেকেই স্বাধীন রায়ে গৈছে। ঘৱে ঘৱে স্বাধীন বাংলাৰ যে পতাকা তোলা হয়েছিলো ২৫ মাৰ্চেৰ পৱ তা আৱ নামাতে হয় নি। পাকবাহিনীকে প্ৰতিৱোধ

করা হয়েছে অমরখানায়। তারা ভজনপুর পর্যন্ত এসে তেঁতুলিয়া দখলের চেষ্টা নিয়েছিলো প্রথমদিকে, কিন্তু ভজনপুরের বিজ তেজে দিয়ে মুক্তিবাহিনী সর্বাঞ্চক প্রচেষ্টায় প্রতিহত করেছে তাদের। পাকবাহিনী অবশ্যে অমরখানাতেই তাদের শেষ অচলবর্তী ঘাঁটি গেড়ে বসেছে আর সেই থেকে মুক্তিবাহিনী তাদের মরণপথ ঠেকিয়ে চলেছে তাদের মজবুত প্রতিরক্ষা ঘাঁটি থেকে। তেঁতুলিয়া থেকে অমরখানা ফ্রন্ট পর্যন্ত চলে গেছে পাকা সড়ক। সেই সড়ক দিয়ে দিন-রাত চলছে ফ্রন্ট অভিযুক্ত সামরিক কল্পনার পর কল্পন। পাঠানো হচ্ছে সামরিক সরঞ্জাম আর রেশনসামগ্রী। ফ্রন্টের বিভিন্নিক এখানকার মানুষজনকে স্পর্শ করতে পারে নি। এখানকার ভবসাব দেখে মনে হয়, স্বাধীন বাংলাদেশের রাজধানীতে বসবাস করছি আমরা।

প্রায় জনবিরল আর অবহেলিত তেঁতুলিয়া থানা সদর বর্তমানে অত্যন্ত ব্যস্তসমস্ত হয়ে উঠেছে। এর গুরুত্ব আর মর্যাদা বেড়ে গেছে বহুগুণে। মুক্তিবাহিনীর পাশাপাশি ভারতীয় সেনাহাউনি গড়ে উঠেছে এর বিভিন্ন জাহাঙ্গীয়। পি.টি. প্যারেড, সামরিক মহড়া আর সামরিক যনবাহনের অনবরত ছোটাছুটি এটাকে ছোটোখাটো সামরিক শহরে পরিণত করেছে।

তেঁতুলিয়ার নিজস্ব জনসংখ্যা বেশি নয়। কিন্তু এখন তা বেড়ে গেছে বহুগুণে। এখানে আশ্রয় নিয়েছে দিনাজপুর ও ঠাকুরগাঁও থেকে পালিয়ে আসা ই.পি.আর.দের পরিবারবর্গ। অবশ্য যারা পালিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছে, কেবল তারাই। সেই সঙ্গে হাজার হাজার উঠান্তুও এখানে এসে নানাভাবে তাদের মাথা উঁজবার ঠাই করে দিয়েছে। রাজনীতিবিদরা এখানে তাদের কর্মীবাহিনী নিয়ে আস্তানা পেতেছেন। যুব কাণ্ড চাপাপত হয়েছে। তেঁতুলিয়া বাজার হয়ে উঠেছে জাঁকজমকপূর্ণ আর তাতেই যতো প্রাপ্তির সাড়া। বিভিন্ন ধরনের যানবাহনের মাধ্যমে যোগাযোগ ব্যবস্থাও গড়ে উঠেছে। শুশ্রাব মানুষজন বাঁচার তাগিদে বিভিন্ন পেশায় হয়েছেন নিয়োজিত। অনেকে ছোটোখাটো স্বারমা আর দোকানদারিও শুরু করেছেন।

জীবন এখানে বাধাইন, মুক্ত। স্বাধীন এখানকার মানুষ। জীবন এখানে সহজ সরল আর গতিময়। আর তাই এখানকার স্বত্ত্বাত্মক ও মুক্ত পরিবেশে বসবাসরত মানুষজনের মধ্যে এই আত্মপ্রত্যয় জাগরুক যে, তেঁতুলিয়া যখন মুক্ত রয়েছে, সমস্ত বাংলাদেশ একদিন না একদিন অবশ্যই মুক্ত ও স্বাধীন হয়ে যাবে।

স্বাধীন বাংলাদেশের মডেল হয়ে দাঁড়িয়েছে বর্তমান তেঁতুলিয়া থানা। বিদেশীরা এখানে পা রাখছেন অহরহ, স্বাধীন বাংলাদেশের অবস্থা সরেজমিনে দেখতে। দেশী-বিদেশী সাংবাদিকদের ভিড় লেগে রয়েছে দিন-রাত। আসছেন বিবিসি, ভয়েস অব আমেরিকা আর আকাশবাণীসহ পৃষ্ঠবীর বিভিন্ন দেশের প্রচার মাধ্যমে লোকজন। তারা ই-টারিভিউ নিষ্ঠেন মুক্তিযোদ্ধাদের, উঠান্তু শরণার্থীদের, মুক্তাঞ্চলের মানুষজনের। স্বাধীন বাংলা সরকারের প্রতিনিধিরা তাদের সঙ্গে নিয়ে আসছেন বিদেশী ডেলিগেটদের, আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিনিধিদের। আসছেন পদস্থ সামরিক ও বেসামরিক লোকজন। অবহেলিত এই জনপদ তেঁতুলিয়া তাই হাঁটাঁ করে স্বাধীন বাংলার প্রতিনিধিত্ব করবার সুযোগ পেয়ে যেন কুলীন হয়ে উঠেছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে এর ভূমিকা যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি পৌরবোজ্জ্বল আর ঐতিহাসিক। স্বাধীন বাংলাদেশ কায়েম করবার আশা-আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন, প্রত্যয় আর বিশ্বাস সলতের মতো মিটমিটিয়ে জুলিয়ে রেখেছে তেঁতুলিয়া এখানকার সবার মধ্যে। হয়তো এখান থেকেই একদিন জয় বাংলার চূড়ান্ত জয়বাত্রা শুরু হবে।

তেঁতুলিয়া থানাতে মুক্তিবাহিনীর রেয়ার হেড কোয়ার্টার। ডাকবাংলোসহ আশপাশের

এলাকায় ভারতীয় বাহিনীর সেনাছাউনি। সার্কেল অফিসারের বাসভবনে এমপি সিরাজুল্লাহ ইসলামের আস্তানা। সি.ও. অফিসে স্থাপিত হয়েছে মুক্তিবাহিনীর ফিল্ড হাসপাতাল। তেঁতুলিয়া বাজারে যুব ক্যাম্প, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ আর মুক্তিবাহিনীর আস্তানা। সবার সংযোগে তাই স্বাভাবিক কারণে সদাব্যস্ত, কর্মসূর্য আর সরগরম অবস্থা বর্তমান তেঁতুলিয়া বন্দরের। এখানেই ছুটি কাটানোর অবসরে এসে থাকতে হলো ছুটি দিন। অঞ্চলের ২৭ তারিখ থেকে নভেম্বরের ১ তারিখ পর্যন্ত। চমৎকার মনে রাখবার মতো এ কঠা দিন। প্রথমদিন সক্ষ্যার মুখে সদরদিন সাহেব এসে আমাদের খোজখবর নিয়ে বলে গেছেন, নিজের মতো করে থাকতে। কিন্তু বিপন্নি বাধায় ই.পি.আর.-এর সদস্যরা। তারা যেনো ঘরিয়া হয়ে উঠেছে। তাদের অধীনে রেখে অবসরে আসা এফ.এফ. দলটিকে তারা দলিতমথিত করে দেবে। সকালবেলা তাদের পি.টি. মাস্টার এসে ছাইসেল বাজাতে শুরু করে। ব্যাপার কি? তার সঙ্গে যেতে হবে পি.টি.তে। ছেলেরা যাবে না, আর সেও ছাড়বে না। শেষেমশ সবাইকে রাজি করিয়ে থানার মাঠে, পি.টি. শাউডে নিয়ে আসি। পি.টি. মাস্টার ই.পি.আর. বাহিনীর একজন বিখ্যাত আঘাতে। তিনি পি.টির মাধ্যমে রগড়ে চলেন আমাদের। কিছুক্ষণের মধ্যেই তার পি.টির বহরে প্রায় দম বের হয়ে যাবার যোগাড় হয় সকলের। মনে হয়, অদ্বুতে বহুদিন পর তার ইচ্ছেয়তো কোনো দলকে পি.টি. করাবার সুযোগ পেয়ে তাঁর পেটের সমস্ত বিদ্যুবুদ্ধি ঝালিয়ে নিছে। পি.টি. শেষে সিন্ধান্ত নিই, আর নয়, এভাবে তার অধীনে পি.টি. নয়। এখানেই পি.টি. পর্বের ইতি ঘটাতে হবে।

দালালের বিচার চাই

দিতীয় দিন বিকেলে ই.পি.আর. হাবিলদার দেওয়ারের সঙ্গে দারুণ একচোট ঝগড়াঝাটি হয়ে যায়। ঝগড়া লাগে ভদ্রলোকের মুখ ফকুক চৰায়ে আসা এই কথাটা শনে, আপনাদের ছাত্রদের জন্যই এ অবস্থা। জয় বাংলার প্রেরণাদিয়ে আপনারা যুদ্ধ বাধাইলেন, যতো নষ্টের গোড়া এই ছাত্ররা। পাকিস্তান থাকলে আমাজন্টকতো সুবিধা ছিলো। আপনেরাই পাকিস্তানভাবে ভাঙলেন। এখন বৌ-বাঙ্গা-পরিবার ছাইড়া-হুইড়া এইহানে পইড়া থাকতে হইতাছে...।

তার কথা শনে অবাক হবার পালা। বলে কিরে লোকটা! এমনিতেই কথবার্তায় কর্কশ ভাষা প্রয়োগের বহর, অনবরত রূক্ষ ব্যবহারের বাড়াবাড়ি, তার ব্যাপারে আমাদের সবারই মন ত্যক্তবিরক্ত আর বীত্তান্ত হয়ে উঠেছিলো। তার ওপর বাংলাদেশের স্বাধীনতা নিয়ে তার এই উদ্ভৃত্যপূর্ণ মন্তব্য সবাইকে রাগে-ক্ষেত্রে প্রায় দিশেহারা করে তোলে। তার সামনে দাঁড়িয়ে পড়ে উচ্চবরে বলি, কী বললেন? জয় বাংলা শুধু আমরা চাই! দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ আমরা চাই! আর আপনারা তাহলে কি? আপনি আপনারা পাকিস্তান রাখতে চান? পাকিস্তানের দালাল আপনি...। আপনি রাজাকার...পাকিস্তানি শ্পাই...।

উপস্থিত ছেলেরাও উত্তেজিত হয়ে ধিরে ধরে তাকে। কেউ বলে, ধর শালা পাকিস্তানি শ্পাইকে। হাবিলদার মেজের তার সঙ্গী দু'জনকে নিয়ে ছেলেদের বৃন্দের মাঝে ঘেরাও হয়ে যান। আর এই অবস্থায় বাবলু শ্লোগান দিয়ে ওঠে, পাকিস্তানি শ্পাইয়ের বিচার চাই।

অন্যরাও তার সঙ্গে গলা মেলায়, বিচার চাই।

— দালালের বিচার চাই।

— বিচার চাই।

— রাজ্ঞিকারের বিচার চাই ।

— বিচার চাই ।

হৈ-হল্লা শব্দে রাস্তায় লোকজন জমে যায় । হাবিলদার মেজর এ অবস্থায় হতভয় হয়ে পড়েন । কিছু বলতে গিয়ে তিনি যেনে তোতলাতে থাকেন । তখন তাকে কঠিন গলায় বলি, আপনি পাকিস্তানের পক্ষে কথা বলছেন, জয় বাংলা চান না । দাঢ়ান আজ মেজর সাহেবে আসুক, আপনার বিরুদ্ধে নালিশ করবো । আপনাকে কোর্ট মার্শাল করবো... ।

হাবিলদার মেজর তখন একেবারেই ভেঙে পড়েন । হাউটাউ করে কেবে ফেলেন আর বলতে থাকেন, আমি এইডা কই নাই... আমি এইডা কই নাই... ।

যা হোক ব্যাপারটা আপাতত এখানেই কুকেবুকে যায় । কিন্তু হাবিলদার মেজর দাক্ষণ্য তয় পেয়ে যান । তিনি তার কথা উইথড্র করেন । মাফ চেয়ে নেন তার কৃক্ষ ব্যবহারের জন্য । বলেন, দাদু আমারে ভুল বুইজেন না । আপনেরা আমার নাতির মতোন ।

আমরা আর কিছু বলি না । তিনি চলে যান । কিন্তু ব্যাপারটার ইতি এখানেই ঘটে না । রাতে সুবেদার আসেন হাবিলদারকে সঙ্গে নিয়ে । বয়োবৃক্ত তালো মানুষ সুবেদার আমাদের সঙ্গে দাদু-নাতি সম্পর্ক পাতিয়ে ফেলেন । হাবিলদারকে ভর্সনা করেন তিনি । কথা দেন যে, আমাদের থাকবার স্বাধীনতায় তারা আর হস্তক্ষেপ করবেন না । পি.টি. করাও মাফ । সেই সাথে জানান, তার আস্তানায় তিনি আমাদের সশ্বানে বড় খুচরের আয়োজন করেছেন । তাতে আমাদের সবার নিমজ্জন, একথা জানিয়ে তিনি ফিরে চলে যান ।

অবশ্য ধীরে ধীরে তাদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক সহজ হয়ে ওঠে । সুবেদার আর হাবিলদার সাহেবের সঙ্গে সবার সম্পর্ক দাদু-নাতির মতোই সুমধুর হয়ে ওঠে । আমরা সদরবন্দিন সাহেবকে এ ব্যাপারে আর কিছু অস্বীকার করি না ।

স্কুলের মাঠের রাস্তা ধৈঁয়ে বেশ কিছু জনুষ খোলা আকাশের নিচে ঝুচরো ঝিনিসপত্রের দোকান দিয়ে বসেছেন । নানা ধরনের সন্তোষজনক জিনিসের পাশাপাশি বিড়ি-সিগারেটও রয়েছে সেখানে । একজন ভদ্রলোককেও ত্রৈথা গেলো চেয়ার-টেবিলে এ ধরনের কিছু ঝিনিস সাজিয়ে দোকানদারি করতে । দেখেই মনে হয় উজ্জ্বল চেহারার এই ভদ্রলোক একজন স্কুল শিক্ষক । ঘটনাটা আসলেও তাই । ভদ্রলোক নিজেই তার পরিচয় দিয়ে জানান যে, তিনি অধিকৃত বাংলাদেশের একটি হাইস্কুলের বি.এসসি শিক্ষক । এখানে শরণার্থী হয়ে এসে কিছু করতে না পেরে এই বিড়ি-সিগারেটের দোকান দিয়ে বসেছেন । ভদ্রলোক অবসর পেলেই চলে আসেন আমাদের কাছে । আমাদের ভূমিক্ষয়ার পাশে বসে তিনি তাঁর দুর্ব্বকচ্ছের কথা বলে যান ।

যুব ক্যাম্প থেকে আবাস নামে পঞ্জগড়ের একজন তরুণ মুখ-চোখে লাজুক হাসি ঝুটিয়ে তার ৩/৪ জন সঙ্গী-সাথীসহ আমাদের ক্যাম্পে আসে, মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে পরিচিত হতে । গল্পটুঁক করে যাবার সময় সে তাদের আস্তানায় যাবার জন্য অনুরোধ করে যায় । আমরা সময় করে আবাসদের যুব ক্যাম্প দেখে আসি । প্রায় ৪০/৫০ জন সমবয়সী যুবক সেখানে অবস্থান করছে । আপাতত কোনো কাজ নেই রেশন খাওয়া, বসে থাকা আর অপেক্ষা করা ছাড়া । কেনো তারা এভাবে বসে আছে, আমার কৌতুহল জাগা এই প্রশ্নের উত্তরে তারা জানায়, তাদের দুটো জায়গায় যাওয়ার কথা রয়েছে । এক, বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে অফিসার পদে অথবা দেরাদুনে মুজিব বাহিনীর টেনিং-এ । এখানে আমরা ‘মুজিব বাহিনী’ নামে একটা নতুন বাহিনী গড়ে উঠার নাম শনি । কিন্তু এ ব্যাপারে বিস্তারিত কিছু জানা যায় না ।

ছেলেরা আমাদের পেয়ে খুবই আনন্দিত হয়। যুক্তের গল্প শুনবার দারকণ আগ্রহ সবার মধ্যে। তাদের আন্তরিক আপ্যায়ন ভালো লাগে খুব। ফিরবার সময় তাদেরকে বলি, আমাদের সবাই তাড়াতাড়ি যুদ্ধে যাওয়া প্রয়োজন। যে যেখানে যেভাবেই সুযোগ পাক না কেনো, তাড়াতাড়ি ট্রেনিং নিয়ে ছুটে যাওয়া প্রয়োজন।

ছেলেরা আমার কথা শুনে খুবই খুশি হয়। তাদের ভেতর থেকে একজন বলে গঠে, আর বসে থাকা যায় না। আর কিছু না হলে আপনাদের মতো এফ.এফ. বা মুক্তিফৌজেই যোগ দিয়ে বসবো।

৩-এ মধুপাড়া কোম্পানি

এখানে অবাধ স্বাধীনতা। কেবল সেন্ট্রি ডিউটি ছাড়া অন্য কোনো ধরাবাঁধা ডিউটি নেই। খাওয়াদাওয়া, বিছানায় শয়ে-বসে থাকা আর ইচ্ছেমতো টো-টো করে ঘুরে বেড়ানো। দুপুরে মহানন্দার পানিতে উদ্দাম মাতামাতি। শ্বানরত যেয়ে-মহিলাদের সঙ্গে নির্দোষ আলাপচারিতা, রঙ-তামাশা করা আর প্রাণ খুলে হাসাহসি। বিকেলে তেঁতুলিয়া বাজারে চায়ের দোকানে অলস আড়া, হাত খুলে ছোটোখাটো প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কেনাকাটা। সক্ষ্যায় ফল-ইন-এর পর রাতের আহার সারা। তারপর সামনের মাঠে রাত ১১টা/১২টা পর্যন্ত নাচ-গানের আসর বসানো। জারি, ভাটিয়ালি ও যান্ত্ৰিকনের আসর, মধুসূনের শাড়ি পরে যাত্রা গানের আসরে সধির নাচ, সুকাস্ত কিংবা নজরসূসের বিপুলবী কবিতা থেকে বাবলুর আবৃত্তি। সবকিছু মিলিয়ে দারুণ জয়জয়াট এক একটি রাতের অনুষ্ঠান। যুদ্ধের মাঠ থেকে ছুটি পাওয়া তারুণ্যে ভরপুর হৃদয়গুলোর সজ্জিত্বা বাহ্যিকাশ। এ যেনো জীবন-মৃত্যুর সেই ভয়বহু রাজ্য থেকে পালিয়ে আসা অবস্থাঙ্ক নিষ্কাসের শপথন। আবার কবে সেখানে ফিরে যেতে হবে। তার তো কেবল ঠিক-ঠিকানা নেই। তাই প্রত্যেকে যেনো অপ্রত্যাশিতভাবে পাওয়া ছুটির অভিযান দিনের প্রতিটি মুহূর্তের আনন্দকে নিঞ্জড়ে নিতে উন্মুখ। উদ্দাম তারুণ্য নিয়ে যেকোনো গঠে সবাই নিজেদের মতো করে।

সফিজউদ্দিনের বাড়ি তেঁতুলিয়াতেই। সদর থেকে মাইল দূরে কোনো এক থামে। এখানে আসবার সুযোগ পেয়ে তাই তার আনন্দের সীমাপরিসীমা নেই। দুদিনের ছুটি নিয়ে যায় সে তার মা-বাবা, আঢ়ীয়-হজনের সঙ্গে দেখা করতে। সফিজউদ্দিনের গায়ের রঙ কালো কিন্তু মনটি তার পরিষ্কার আয়নার মতো। বুকের ভেতরেও তার অদম্য সাহসের ঝলক। দুদিন পর সেই সফিজউদ্দিন তার বৃক্ষ বাপ-চাচাকে নিয়ে হাজির হয় আমাদের কুলঘরের এই অস্থায়ী ক্যাম্পে। সফিজউদ্দিন তাদের নিয়ে এসেছে তার মুক্তিযোদ্ধা বৃক্ষ-সহকর্মী আর তার কমান্ডারকে দেখাতে। একটি পেতলের ঘড়ায় ভর্তি দুধ, দুটি বড় বড় পুটলিতে ভর্তি চিঠ্ঠে আর মুড়ি। খালি হাতে কেমন করে আসেন সফিজউদ্দিনের বাবা-চাচা তার ছেলের সঙ্গী-সাথীদের দেখতে। দারকণ ব্যাপার! সফিজউদ্দিনের বৃক্ষ বাবা গ্রামের একেবারে সাদাসিধে সরলপ্রাণ মানুষ। সফিজউদ্দিনের অক্ষরজ্ঞান একেবারেই নেই। তার বাবা-চাচাদের অবস্থাও তাই। তাদের বৃক্ষ একটাই, সফিজউদ্দিন যাদের সঙ্গে থেকে যুদ্ধ করে, তারা সবাই তার আপনজন। প্রচণ্ড আন্তরিকতা নিয়ে এসেছেন বৃক্ষ আমাদের কাছে। তার বিনয়োঙ্কুল মুখ আমাদের ভালো লাগে। তাঁকে বলি, চাচা এতোগুলো খাবার এনেছেন? এ্যাতো দুধ খাবে কে?

বৃক্ষ বলেন, খাবেন বা তুমহারা লা, যুদ্ধের মাঠেও তুমহারালা কুলঠে যে কি খান, কতো

কষ্ট করছিবা হচ্ছে গো তুমহার লাক...।

বৃক্ষের ভালোবাসার দান আমরা অত্যন্ত আন্তরিকভাবে গ্রহণ করি। তাকে এবং তার সঙ্গীদের দুপুরে আমাদের লঙ্ঘনখনার খাবার দিয়ে আপ্যায়ন করা হয়। খাবার সময় তিনি গামছার খুটে চেথ মুছতে মুছতে বলেন আমাকে, মোর ব্যাটি, সফিজউদ্দিনেক তুমহারা দেখেন গো বা। ছইলডাক মুই তুমার হাতোত তুলহে দিনু। দেখেননে রাখিবেন ছইলডাক মোর...।

বৃক্ষ চলে যান। সফিজউদ্দিন এগিয়ে দিতে যায় তাদের। মুক্কে শিয়ে ছেলেটি হারিয়ে শিয়েছিলো। হঠাতে করে আবার ফিরে এসেছে। আবার তাকে যেতে হবে ফ্রন্টে। পিতার মন মানে না। অত্যন্ত বিমর্শ আর ব্যথাদীর্ঘ মন নিয়ে ফিরে যান বৃক্ষ বাড়ির দিকে। আবার তিনি অপেক্ষা নিয়ে বসে থাকবেন তাঁর ছেলের ফিরবার পথ চেয়ে। কে জানে যুক্ত চলবার সময় কার কি হবে? সফিজউদ্দিন আবার ফিরতে পারবে কি না তার প্রতীক্ষাকাতর বাবা-মা আর আশ্চৰ্যপরিজনের কাছে নিশ্চয় করে সে কথা কি বলা যাবে? একথা শুধু ভবিষ্যতই বলতে পারবে। তবে বৃক্ষের এভাবে চলে যাওয়ার ঘটনায় ক্যাম্প জুড়ে ছেলেদের মধ্যে কিছুক্ষণের জন্য হলেও কেমন একটা থমথমে নীরবতা নেমে আসে। কেমন একটা বিমর্শতার ছাপ ফুটে ওঠে সবার অবয়বে।

তেঁতুলিয়া ফিল্ড হাসপাতালের ব্যবস্থাপনা ততো উন্নত নয়, কিন্তু সীমিত অবস্থার ভেতরেই আন্তরিকভাবে চিকিৎসা চলছে ফ্রন্টে আহত মৃত্যুদের। এটা আমাদের নিজস্ব হাসপাতাল, একথা ভাবতেই কেমন একটা গর্বের ভাব জুড়ে ওঠে মনে।

সময় গড়িয়ে চলে। গড়াতে গড়াতে তেঁতুলিয়ার ছুটি ফুরিয়ে আসে। ফ্রন্টে যাওয়ার ভাক আসে আবার। সদরদিন সাহেব নভেম্বরের ভাইরিবের বিকেলে তাঁর হড়বোলা জিপগাড়ির পেছনে বসিয়ে নিয়ে আসেন তাঁর ব্রাক্ষণপ্রাঞ্জলি হেড কোয়ার্টারে। বকর ও একরামূল থাকে আমার সঙ্গে। বড় ভাইসহ সদরদিন স্মৃতিতে আমাদের ফ্রন্টে যাবার পরিকল্পনা নিয়ে বসেন। একটা নতুন কোম্পানি দাঁড় করবার ছিলু ছিলু। তিনি এই কোম্পানির নাম দেন ‘৩-এ মধুপাড়া কোম্পানি।’ কোম্পানির কাজ হবে অমরখানা-জগদলহাট-পঞ্চগড় এলাকায় গেরিলা অপারেশন পরিচালনা করা। আমাদের আবার হাইড আউটে যেতে হবে। খোলা ফিল্ড ম্যাপে সদরদিন সাহেব লাল পেসিল দিয়ে যে এলাকাগুলো চিহ্নিত করে দেন অপারেশনাল এলাকা হিসেবে সেগুলো আমাদের বহুল পরিচিত। হাইড আউটে অবস্থান, অপারেশনের ধারা এবং রিপোর্ট হবে আগের মতো করেই। এফ.এফ.দের লিয়াজোঁ অফিসার বড় ভাই নুরুল হক ব্যাপারটিতে খুশি হন। আমি নিজেও অসম্ভব উৎসাহবোধ করি পরিচিত সেই জায়গাগুলোয় যাবার সুযোগ পেয়ে।

সক্ষ্যার মুখে ফিরে আসি তেঁতুলিয়ায় নতুন কোম্পানি-৩-এ মধুপাড়ার দায়িত্ব নিয়ে। রাতে সুবেদার খাবারদাবারের বেশ বড়োসড়ো একটা আয়োজন করেন আমাদের বিদায় উপলক্ষে।

পরদিন দুপুরে গাড়ি আসে। ছেলেরা তৈরি হয়ে মালপত্র নিয়ে গাড়িতে উঠে বসে। সেই টাক। পরিচিত সেই হাসিমাখা মুখের রহমান ছুইভার।

ই.পি.আর.-এর সুবেদার হাবিলদার দাদুরা বিদায় জানাতে এসে বলেন, ভালো থাইকেন। মইরেন না। আল্লাহ আপনাগো বাঁচাইয়া রাখুন ইত্যাদি। এধরনের কথাবার্তা বলে তারা বিদায় দেন।

বিদায় বেলায় বয়োবৃক্ষ এই জে.সি.ও/এন.সি.ও.দের খুবই আপন মনে হয়। তাদের

ব্যবহারে আঞ্চিক বন্ধনের উষ্ণতা। মনে হয় যেনো গাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে বিদেশে গমনোদ্যুত নাতিদের জন্য সরলপ্রাণের বিষণ্ণ বন্ধনের এই দানুরা উপস্থিত হয়েছেন। আসলে মানুষের সম্পর্কটা কতো বিচ্ছিন্ন! মাত্র ক'দিনের পরিচয়। এর মধ্যেই কতো অপনজন হয়ে গেছেন এরা!

ড্রাইভার গাড়ি ছেড়ে দেয় নুড়ি বিছানো পথ দিয়ে। পেছনে পড়ে থাকে তেঁতুলিয়া। আর মনের গভীরে তার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে ক'দিনের অনাবিল ছুটি কাটানোর স্মৃতি।

শিলিঙ্গড়ি-কন্যা

তাকে দেখে জীবনানন্দ দাশের সেই বিখ্যাত উপমাটি মনে পড়ে যায়, ‘মুখে তার শ্রাবণ্তী’র কারুকার্য, অতিদূর সমুদ্রের হাল ভেঙে যে নাবিক হারিয়েছে দিশা...’।

ভদ্রমহিলার নাম শাহিদা বেগম। ডাক নাম বেগুনি। বেগুনি ভাবি নামেই তিনি সবার কাছে সমধিক পরিচিত। তিনি আমাদের আফজাল সাহেবের ভাবি। চমৎকার দেহচুরী, দুখে আলতা গায়ের রঙ, একজন প্রকৃত সুন্দরী রমণী বলতে যা বোঝায়, প্রকৃতপক্ষে তাই। তাঁর নাম যে কেনো বেগুনি দেয়া হয়েছিলো সে বুঝি এক রহস্যময় ব্যাপার। নামের সঙ্গে চেহারার দারুণ বৈপরীত্য ভদ্রমহিলার।

শিলিঙ্গড়ির মেয়ে তিনি। দেশে থাকতে বছবার তিনি এই পরিচয়ে নিজের গর্বের প্রকাশ ঘটিয়েছেন। তাঁর মুখ থেকে শিলিঙ্গড়ির বর্ণনা শনে হিমালয়ের পাদদেশে ছবির মতো একটা সুন্দর ছিমছান প্রাকৃতিক শোভামণ্ডিত অপরূপ এক পুরুরের কল্পিত চির মনের গভীরে হায়ীভাবে চিহ্নিত হয়ে গিয়েছিলো। শিলিঙ্গড়ি হচ্ছে পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব ভারতের সঙ্গে পচিমবঙ্গে তথা সমগ্র ভারতে প্রবেশের প্রধান সংযোগস্থল। শিলিঙ্গড়ি দিয়ে দাঙ্জিলিং-এ উঠতে হয়। এখন থেকে যেতে হয় ভূটান, সিকিম ও অসম, মেঘালয়, ত্রিপুরা, নাগাল্যান্ড ও মিজোরাম নামের বিভিন্ন রাজ্য। নেপালের অবচ্ছিন্ন কাছাকাছি। '৪৭-এ দেশ ভাগের পর শিলিঙ্গড়ি ভারতের একটি অন্যতম জংশন স্থানের মর্যাদা লাভ করে এবং এর উন্নত্বও বেড়ে যায় বহুগুণে। এখন বলা হয়, 'শিলিঙ্গড়ি ইজ দ্য পেটওয়ে অব আসাম অ্যান্ড ইস্টার্ন ইণ্ডিয়া'।

দেখা করতে এসেছিলাম আফজাল সাহেবের সঙ্গে। তিনি নেই। কিন্তু অভিবিতভাবে দেখা হয়ে যায় তাঁর বেগুনি ভাবি অর্থাৎ আমাদের সেই পরিচিত শিলিঙ্গড়ি-কন্যার সঙ্গে। বাংলাদেশ থেকে পালিয়ে আসতে হয়েছে তাঁকেও অসমৰ ঝুঁকি নিয়ে। নবজাতক শিশু ও বাচ্চা ছেলেমেয়েদের সঙ্গে নিয়ে, রংপুর শহরের কাছাকাছি চন্দনপাট আমে থাকা কোনোক্ষমেই আর সম্ভব হয় নি তাঁর পক্ষে। অধিকৃত রংপুর এখন এক বিভীষিকাময় রাজ্য। সেখানে নিদানুল্ল অভ্যাস আর পাইকারি গৃহত্যায় মেতে উঠেছে দখলদার পাকবাহিনী। রংপুর ক্যাটলমেটের কাছাকাছি বিরাট পারিবারিক সম্পত্তির দেখভালের কাজে রয়ে গেছেন আমিনুর রহমান তাঁর নিজের জীবনের উপর ঝুঁকি নিয়ে। শিলিঙ্গড়ি-কন্যা তাঁর স্ত্রী ও পরিবারের অন্য সদস্যদের পার করে দিয়েছেন সীমান্ত প্রগতিশীল বাম আন্দোলনের সঙ্গে সম্পৃক্ষ মানুষ আমিনুর রহমান। উন্নোব্বলের বাম আন্দোলনের মানুষদের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠজন এবং আশ্রয়দাতা তিনি। পরিবারের সবাইকে নিরাপত্তার মধ্যে পাঠিয়ে দিয়ে জীবনের ঝুঁকি তিনি একাই নিয়েছেন। কে জানে কি হবে? কবে দেশ স্বাধীন হবে? কবে ফিরবেন এরা দেশে, নিজ বাসভূমে? দারুণ এক অনিচ্ছিত ভবিষ্যৎ সামনে। চোখে-মুখে ধূসর ঝুঁতির ছাপ নিয়ে সামনে দাঁড়িয়ে সেই মহিলা। পেছনে গাড়ির লোকজন। বাচ্চা-শিশু-কিশোর, ছেলেমেয়েদের উকিঝুকি মারতে দেখা যায়। তারা বেশ

ওঁসুক্ত নিয়ে মুক্তিফৌজ দেখে। আমার নিজের চেহারা-সূরত এখন উশকোখুশকো। পরনে
লুঙ্গি। গায়ে চার পকেটঅলা কালো শার্ট। কাঁধে স্টেনগান। সঙ্গী একরামুল, বাবুলু আর
মতিয়ারের অবস্থাও একই ধরনের।

চরম দৃঢ়সময় এখন সবার জন্যই। পরদেশে হীনশৰ্ম্মাতায় তরা উদ্ধার্জ জীবনযাপনে
দেশের পরিচিত কাউকে হঠাৎ করে পেলে স্বাভাবিকভাবেই খুশি হওয়ার কথা। অদ্যমহিলাও
খুশি হয়েছেন খুব। তাঁর এই খুশির বহির্প্রকাশ ঘটতে থাকে তাঁর কথাবার্তা আর আচার-
আচরণ থেকে। তিনি ব্যক্তিমত্ত হয়ে ওঠেন আমাদের আপ্যায়নের জন্য।

শিলিঙ্গড়ির উপকঠে আমাইদিঘির এই বাড়িটির প্রতি আমার ব্যক্তিগত দুর্বলতা রয়ে
গেছে। এ বাড়ির মানুষগুলোর প্রতিও রয়েছে গভীর কৃতজ্ঞতাবোধ। ক্যাক ডাউনের পর
রংপুর শহর ছেড়ে পালানোর সময় শরণার্থী কাফেলাৰ ভিড়ে ভাসতে ভাসতে এই
বাড়িটিতেই অবশেষে জুটেছিলো ঠাই। মুক্তিবাহিনীতে যোগ দেয়াৰ আগে এখানকাৰ আশ্রয়ে
থাকতে হয়েছিলো ৩/৪ দিন। কী অস্ত্রি আৱ অনিশ্চিত অবস্থা তখন। অথচ আজ? এখন?
এই নভেম্বৰের সূচনায় আমি আবাৰ কিছিছি ফুটে। তেঁতুলিয়ায় ক'দিন ছুটি কাটিয়ে নতুন
দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে ফুটে যাবাৰ সময় মহাসড়কেৰ পাশে গাড়ি থামিয়ে এ বাড়িটায় না এসে
পাৰা গোলো না। মহাসড়কেৰ পাশে ড্রাইভাৰকে ট্রাক থামাতে বলে ছেলেদেৱ ক্ষণিক
যাত্ৰাবিৰতি দিয়ে সোজা আসি বাড়িৰ সামনে। উদ্দেশ্য অফিস্কাল সাহেবেৰ সঙ্গে দেখা কৰা
এবং সেই সঙ্গে কৃতজ্ঞতাৰ বাঁধনে বাঁধা এ বাড়িৰ মানুষজনোৱ খৌজখৰ নেয়া।

আফজাল সাহেব নেই। কিন্তু খবৰ পেয়ে ছুটে একদল বেগুনি ভাৰি বাড়িৰ ভেতৰ থেকে।
চোখে-মুখে তাৰ ক্লান্তি আৱ বিষণ্ণতাৰ ছায়া কেন্দ্ৰে অভাবিতভাৱে আমাদেৱ সামনে পেয়ে
হাসি আৱ আনন্দে ঝলমলিয়ে ওঠে তাৰ মুখ্যমান। তাৰ কিশোৰ বয়সী ছেলে বাবুল লাজুক
হেসে পাশে এসে দাঁড়ায়। হাসিখুশি মেলান্তাল চমৎকাৰ সপ্রতিত ছেলে সে। কাছে টেনে নিই
তাকে। মাথায় সন্মেহে হাত বুলিয়ে স্মৃতি দিতে জিগ্যেস কৰি, বলতো বাবুল আমোৰ কে?

- মুক্তিফৌজ, বাবুলেৱ তাঁক্ষণ্যক উন্নৰ।
- তুই মুক্তিবাহিনী হবি? আমাদেৱ মতো মুক্ত কৰবি?
- হই কৰবো। বড় হইলৈ।

বাবুলেৱ মাত্ৰ ১২/১৩ বছৰ। এই বয়সেই মনেৱ গভীৱে তাৰ দৃঢ় বিশ্বাসেৱ ভিত : বড়
হলে সে মুক্তিবাহিনী হবে।

বাবুলোৱা আমাদেৱ পৱেৱ কাতাৱেৱই প্ৰজন্ম। জয় বাংলা অৰ্থাৎ বাংলাদেশেৱ স্বাধীনতা
যুদ্ধে আমোৰা ব্যৰ্থ হলে কিংবা যুদ্ধে শেষ হয়ে গোলে, এৱা একদিন এসে আমাদেৱ
জায়গা দখল কৰে নেবে। হাতে তুলে নেবে শানিত অস্ত। ওৱা যদি না পাৱে তাহলে আসবে
ওদেৱ পৱেৱ প্ৰজন্ম। বাজলি জাতিৰ মুক্তি যতোদিন না আসবে, ততোদিন চলতে থাকবে
মুক্তি সংগ্ৰামেৱ এই ধাৰা।

এই রকম সাতগৰ্চ দ্রুত ভাবতে ভাবতে হঠাৎ কি হয়, আমি আমার কাঁধ থেকে
স্টেনগানটা নামিয়ে বাবুলেৱ গলায় ঝূলিয়ে দিই। তাৰপৰ বলি, এই তো চমৎকাৰ লাগছে
আমাদেৱ বাবুল মিয়াকে, আমাদেৱ ভবিষ্যতেৰ মুক্তিফৌজকে।

উপস্থিতি সবাই হেসে ওঠে। বাবুল প্ৰথমে কিছুটা হকচকিয়ে গোলেও পৱক্ষণেই সে
তাৰটা তাৰ কেটে যায়। একজন স্কুল সৈনিকেৰ মতো দৃঢ় প্ৰত্যয়ে শক্ত হাতে চেপে ধৰে

থাকে টেনগানের ধাতব শরীর।

বাড়ির লোকজনের সঙ্গে কুশল বিনিময় হয়। বেগুনি ভাবিব আপ্যায়ন গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। একদিকে সময় কম, অন্যদিকে রাস্তায় অপেক্ষক্ষমাণ সহযোগ্যার দল। তাই আর একদিন অবসর নিয়ে আসা যাবে, এই কথা দিয়ে বিদায় নিতে হয় আপনজনকুল্য মানুষগুলোর কাছ থেকে। শিলিঙ্গড়ি-কল্যা রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে থাকেন ছবির মতো করে। আর চোখে-মুখে গভীর প্রত্যাশার ছাপ। এ প্রত্যাশা হয়তো আমাদের ঘিরেই। আমরা মুক্তিফৌজ। যুদ্ধে যাচ্ছি। হয়তো আমরাই একদিন পারবো তার কাঞ্জিত প্রত্যাশাকে পূরণ করতে, আর সেটা পূরণ হবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে আমাদের চূড়ান্ত বিজয়ের ভেতর দিয়ে।

দানু আপ আয়া

পড়ুন্ত বিকেলে ট্রাক এসে থামে গড়ালবাড়ি বি.ও.পি.র সামনে। আমাদের যাত্রা শেষ হয়। এখান থেকেই আমাদের আবার হাইড আউটে যেতে হবে। সময় কীভাবে বারবার ঘুরেফিরে আসে! একদিন এখান থেকেই আমরা এক বিষণ্ণ সন্ধ্যায় জানা হাইড আউটের খোঁজে প্রথম যাত্রা শুরু করেছিলাম। মেদিন ছিলো জুলাইয়ের ২৪ তারিখ। বৃষ্টিভজা কর্দমাক্ত দুর্ঘট পথ ভেঙে ভেঙে অত্যন্ত ঝাঁকিকর বিপদসঙ্কল যাত্রাশেষে আমরা অবশেষে হাইড আউট নিয়েছিলাম বদলুপাড়ুয়া সজিমউদ্দিনের বাড়িতে। এরপর সজুলক্ষণগুলো দিন পার হয়েছে। সময় আর ঘটনাপ্রবাহ আমাদের নিয়ে গেছে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায়। এক ফ্রন্ট থেকে আরেক ফ্রন্টে। বয়স বেড়েছে। অভিজ্ঞতা বেড়েছে। যুদ্ধের বাস্তবতা শিখিয়েছে আমাদের বহু কিছু। আমাদের কমান্ড বদল হয়েছে, বদল হয়েছে অফিসারেরও। এখন আর আমাদের হেড কোয়ার্টার চাউলহাটিতে নয়, কমান্ডিং অফিসারও ভারতীয় সেনাবাহিনীর নন। সাব-সেক্টর কমান্ডার সদরবাদিনের কমান্ডে আমরা প্রথম। আমাদের পরিচালিত হতে হবে এখন থেকে সরাসরি স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের স্বাধীনে থেকে। কারো কাছে নয়, আমাদের যাবতীয় তৎপরতার জন্য জোবাবদিহি করতেইবে নিজের কাছে। আগের চেয়ে দায়িত্ব তাই এখন বেশি এবং সেই দায়িত্বের ভার মনের উপরেই যে বেশি করে চেপে বসেছে, সেটা বুঝতে পারি।

আজ ১৯৭১ সালের ২ নভেম্বর। যুদ্ধের নতুন কমান্ড আর কৌশল নিয়ে আজ আবার অধিকৃত বাংলাদেশে চুক্তে হবে শেরিলা যুদ্ধের প্রয়োজনে। খুঁজে নিতে হবে নতুন করে হাইড আউট। শুরু হবে আবার হাইড আউটের জীবন। সামনে যুদ্ধের এ অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি ঘটবে কীভাবে, কে জানে?

গাড়ি থেকে নেমেই পিন্টুর সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে ছিলো সে। তার সঙ্গে খালেকুজ্জামান এবং আরো ৩/৪ জন পরিচিত মুখ।

পিন্টুকে এখানে এভাবে পেয়ে যাবো, সেটা আশা করি নি। পিন্টুর জন্যও ব্যাপারটা একেবারে অভাবিত। গাড়ি থেকে আমাকে এভাবে নামতে দেখবে, প্রথমটায় ও বোধহয় ব্যাপারটা ভাবতেই পারে নি। একটা ঘোরে পাওয়া অবস্থা হয় তার। তারপর যখন ধাতস্ত হয় তখন চোখমুখে ওর ফুটে ওঠে একটা খুশির ঝিলিক। দৌড়ে এসে উষ্ণ আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরে বুকে। একটা আবেগঘন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। ঝরঝরিয়ে কেঁদে ফেলে সে। তার চোখের পানিতে আমার কাঁধ ভিজে যায়। মুখে সে বলতে থাকে, আমার বড় বিপদ মাহবুব তাই, আপনি এসে গেছেন, কী যে করবো ঠিক করেও উঠতে পারছিলাম না।

আপনি ঠিক সময়ে এসে গেছেন। বড় বিপদ...!

পিন্টুর বিপদ। ব্যাপারটা তখনই যেনে বুকের ভেতরে একটা ধাক্কা খেয়ে যাই। ওকে মুখের সামনে ধরে ঝাঁকানি দিয়ে জিগ্যেস করি, বিপদ? কিসের বিপদ? হয়েছে কি?

শার্টের হাতা দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে পিন্টু বলে, এই বি.এস.এফ.রা আমাকে বিপদে ফেলার চেষ্টা করছে।

ঠিক এই রকম অবস্থায় ‘আরে দাদু আপ আয়া’ বলে বৃক্ষ নেপালি সুবেদার বি.ও.পি.র ভেতর থেকে বের হয়ে আসেন।

বি.ও.পি ক্যাম্প কমান্ডার নেপালি সুবেদার এখনো রয়ে গেছেন। তার ভাঁজগড়া মুখ এবং কুঁতকুঁতে চোখে হাসির ঝিলিক। পিন্টুকে ছেড়ে এগিয়ে যাই তার দিকে। আমাদের চৰম দুঃসময়ের অভ্যন্তর কাছের মানুষ তিনি। তাকে জড়িয়ে ধরি বুকে। পিঠ চাপড়ে তিনি আপন সুহাদের মতো জিগ্যেস করেন, দাদু আচ্ছা তো হ্যায়? কোই মুসিবত মে তো নেই?

— নেই দাদু বলে তার কথার জবাব দিই। তারপর জিগ্যেস করি, আপ আচ্ছা হ্যায় তো? ঘরওয়ালি কা খবর আচ্ছা হ্যায়? আপনা মূলুক শিয়া থা?

— ছুটি নেই মিলা। আপনা মূলুক নেই যা সাক্ষা। ঘরকা খবর ঠিক হ্যায়, খত্ত মিলা।

এরপর বৃক্ষ আমার আলিঙ্গন মুক্ত হন এবং তাঁর সেই আপন করা মুখের হাসি বজায় রেখে বলেন, আপ আয়া তো বহুত আচ্ছা হ্যায়, হামালোগ বহুত আচ্ছাহ্য। আই এ্যাম তেরি হ্যাপি।

তার কথার জবাবে বলি, ইয়ে ফ্রন্ট হায় নেই হোক্সে দাদু। ইস লিয়ে ফির আমে পড়া।

— ঠিক হ্যায়। আভি সব ঠিক হো যায়েগা।

— কেয়া হ্যায় দাদু এ্যানি থিং রং পিন্টুর স্বীকৃত কুচ হ্যায়?

— এ্যায়সা কুচ নেই, হামারা হাবিলিউন্স কা সাথ কোই প্রোবলেম হ্যায়।

এরপর বৃক্ষ চায়ের বাবস্থা করে আবেদন ভেতরে চলে যান। একরামুল বকরকে সবকিছু মালপত্র নামাতে বলে পিন্টুদের দিকে এগিয়ে যাই। খালেকসহ অন্যদের সঙ্গে কুশল বিনিয়য় হয়। খালেক জানায়, সে ৩/৪ দিন হয় এসেছে এ এলাকায় পার্টির কাজ নিয়ে। স্বত্বাবসূলভ পরিমিত হাসি তার চোখে-মুখে। অন্যরা স্বত্বাবসূলভাবে এগিয়ে গিয়ে একরামুলদের ট্রাক থেকে মালপত্র ইত্যাদি খালাস করার কাজে হাত দেয়।

শীতের সক্ষ্যায় যাত্রা, পুরনো পথে

পাকা রাস্তার পাশে পিন্টুকে নিয়ে বসি। মনের মধ্যে প্রচণ্ড জিজ্ঞাসা, এমনকি ঘটনা ঘটেছে, যার জন্য সে বিপদের মধ্যে রয়েছে। নিজেকে সামলে নিয়েছে ততোক্ষণে পিন্টু। একটুক্ষণ চূপচাপ থেকে সে ঘটনার যে বিবরণ পেশ করে, সেটা এরকমের : কিছু কাঠের চোরাকারবারি শালবাগান থেকে চুরি করে কাঠ কেটে ২/৩টা গুরুর গাঢ়িতে সেগুলো চাপিয়ে পাচার করবার চেষ্টা করছিলো পঞ্চগড়ের দিকে। খবর পেয়ে কাঠগুলো তারা আটক করে। চোরাকারবারিদের ধরা যায় নি। পরে সে সেই পরিয়ন্ত কাঠগুলো একজন ব্যবসায়ীর কাছে বেচে দেয়ার ব্যবস্থা করে। উদ্দেশ্য কিছু নগদ অর্ধের ব্যবস্থা করা, যাতে হাইড অউটের আনুষঙ্গিক খরচাদি মেটানো যায়। সীমান্ত পার করবার সময় এই বি.ও.পি.র হাবিলিদার সেগুলো আটক করবার চেষ্টা করে। তার উদ্দেশ্য ছিলো ব্যবস্থা নেয়া। এই নিয়ে তার সঙ্গে তাদের লাগালাগি। হাবিলিদার বলে, সে ভারতীয় এলাকায় কাঠ চুক্তে দেবে না। তাহলে সে সিজ করবে সমস্ত

কাঠ। পিন্টুদের নামে চোরাচালানের মামলা দেবে, রিপোর্ট করে দেবে তাদের সেন্টার কম্বারের কাছে। সেই সঙ্গে মুক্তিবাহিনীর হেড কোয়ার্টারেও থবর দেবে।

কাঠ আর এপারে আসে না। সীমান্তের ওপারেই সেগুলো রাখা আছে। এদিকে হাবিলদার বি.এস.এফ.-এর সেন্টার কম্বার লেফটেন্যান্ট কর্নেল সুব্রত কাছে ব্যাপারটা রিপোর্ট করে দিয়েছে। সুব্রত সাহেবের এজন্য আজ তাদের ডেকে পাঠিয়েছিলেন। তিনি ব্যাপারটা বুঝতে কিংবা শুনতে চান নি। বরং হাবিলদারের পক্ষ নিয়ে দু'চারটা মন্দ কথা শনিয়েছেন। যাবার সময় বলে গেছেন, তিনি এই ব্যাপারটা সদরদপ্তরে সাহেবের কাছে নিয়ে নালিশ করবেন এবং পিন্টুর শাস্তি বিধানের ব্যবস্থা করবেন।

কর্নেল সুব্রত যাবার পর পিন্টু দিশেহারা হয়ে বি.ও.পি.র সামনে দাঁড়িয়েছিলো তার দলবলসহ। এই এখন কি তার করণীয়, সেটা বুঝে উঠতে পারছিলো না সে। ঠিক তখনি আমাদের ট্রাক এসে দাঁড়ায় বি.ও.পি.র সামনে। ট্রাক থেকে নামতে দেখে সে আমাকে। প্রথমটায় বিশ্বাসই হতে চায় নি যে, এভাবে এখানে আমার আকশিক আগমন ঘটবে। তাই আমাকে পেয়ে ওর মনের ভেতরটা যেনে উখলে উঠে।

গলগল করে বলতে থাকে, কি করিব, কোথায় যাই এরকম একটা দারুণ দুষ্পিত্তার মধ্যে বারবার আপনাকে মনে করছিলাম মাহবুব তাই। আর কি অবাক ব্যাপার! ট্রাক থেকে ঠিক তখনি আপনাকে নামতে দেখলাম। মনে হইল বয়ং সন্তুষ্ট বুঝি পাঠে দিল আপনাকে। কন্তো য্যালা মুই কি করো?

— কিছু করতে হবে না। ব্যাপারটা আমার জুগান হেডে দাও। একথা বলে আমাদের পিন্টুকে তার নিজের স্বত্বাবের মধ্যে ফিরিয়ে দিন্ত চাই। আমার আশ্বাসে উজ্জ্বল হয়ে উঠে ওর মুখ। বলে, আপনি আসি গেছেন আরুজুবিনা নাই, মুই বাঁচি গেনু...। শালার হাবিলদার কেমন বিপদে ফেলছিলো। শালা ভাগ করে, হিস্যা! হামার দ্যাশের কাঠ হাম্ৰা ধইৱনো, ওই শালাক ক্যানে ফির হিস্যা দেয়ো কুঁচিতো!

— ঠিকই তো। এ নিয়ে ভেবে আর কাজ নেই। চলো মালপত্র নামিয়ে নিই। হাইড আউট ঠিক করি। সায় দিয়ে উঠে দাঁড়ায় পিন্টু আমার সঙ্গে।

বি.ও.পি.র সামনে দেখা যায় বৃক্ষ সুবেদার। পেছনে একজন জোয়ানের হাতে চাহের ট্রে। চা পর্ব সারা হয়। ট্রাক থেকে যাবতীয় মালপত্র নামানো শেষ হয়। ঠাকুর্গাঁও সুগার মিলের অমায়িক ব্যবহারের ড্রাইভার বিদায় নিয়ে ট্রাক ঘুরিয়ে নিয়ে চলে যায়। এবার হাইড আউট ঠিক করার পালা। একটা সিঙ্কান্ত নেয়া দরকার, এ যাত্রায় প্রথমে কোথায় গিয়ে উঠা যায়? পিন্টুকে এখানে পেয়ে ভালোই হয়েছে। একসঙ্গেই তো থাকতে হবে, সুতৰাং তার সঙ্গে আলোচনা করে সিঙ্কান্ত নেয়াই ভালো। ছেলেরা সব রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে। নিজের হাতিয়ার কাঁধে তুলে নিয়েছে সবাই।

নভেম্বরের বিকেল দ্রুত ফুরিয়ে গেছে। বাতাসে শীতের আগমনী বার্তা। শরীরে তার হিমেল পরশ বুলিয়ে জানান দিয়ে যায়। ছেলেরা এরকম আবহাওয়ায় যেনে কিছুটা কুঁকড়ে-মুকড়ে গেছে। শীতবন্ধ নেই কারোর গায়ে। যেভাবে ঝাঁপিয়ে শীত নামছে, কীভাবে তার মোকাবেলা করা যাবে কে জানে? সবকিছুই তো অনিচ্ছিত। ২/৪ দিনের ভেতরেই শীত কাপড়ের চালান না এলে রাতের বেলা অপারেশন চালানোই দৃঃসাধ্য হয়ে দাঁড়াবে। পিন্টুকে জিগ্যেস করি, নালাগঞ্জের বাড়িটা ঠিক আছে?

- আছে। মাথা নাড়ে পিন্টু।
- তোমরা কোথায় আছো?
- ভেতরগড়।
- তাহলে নালাগঞ্জেই চলো। ওখানেই হবে এবারের প্রথম হাইড আউট।
- ও.কে. বস। পিন্টু তার সম্মতি জানায়।

সুবেদারের কাছ থেকে বিদায় নেয়া হয়। প্রথম রাতের মতোই তিনি সবার মঙ্গল কামনা করেন আমাদের এ যাত্রায়।

এরপর সবাই মালপত্রগুলো ভাগভাগি করে যার ঘাড়েপিঠে তুলে নেয়। একরামুল রিপোর্ট দেয় সবকিছু ঠিকঠাক মতোই আছে।

— দেন স্টার্ট, বলেই সবাইকে চলার নির্দেশ দিই।

পিন্টু আর আমি সামনে। সঙ্গে খালেক। পেছনে লটবহরসহ অনুগামী সহযোগীর দল। এরা অধিকাংশই এই ফ্রন্টে নতুন।

সক্ষ্য ঘনিয়ে আসে। আকাশে ধ্বনি সাদা চাঁদ। তরা বর্ষার এক সক্ষ্যায় আমরা এমনিভাবে প্রথম হাইড আউটের উদ্দেশে রওনা দিয়েছিলাম। শীতের সূচনালগ্নে তেমনি আরেক সক্ষ্যায় আমরা আবার চুকচি বাংলাদেশে। মন বলে ওঠে, এভাবে কতবার আর চুকতে হবে বৃদ্ধেশে পরবাসীর মতো, কে জানে!

২. ১১. ৭১

নালাগঞ্জ, আবার যুদ্ধে ফিরে আসা

আবার নালাগঞ্জ। পরিচিত সেই পুরনো লাল ছান্ডির টিনের বাড়ি। বেশ কিছুদিন হয় পিন্টুরা এই বাড়ির আস্তানা ছেড়ে দিয়েছে। পরিজ্ঞান বাড়িটা আমাদের উপস্থিতিতে আবার যেনো কথা কয়ে ওঠে। সরগরম হয়ে ওঠে ভুত্ত কয়েকের ভেতরেই। এখানে পৌছেই ছেলেদের 'ফল-ইন' করিয়ে সব বুঝিয়ে দেয়ে হয়েছে। এবারে দলে রয়েছে গোজানো ছেলে আবু বকর। একরামুলও এরি মধ্যে ঘটে যোগ্য হয়ে উঠেছে। ওদের দুঁজনের নেতৃত্বে ছেলেরা তাদের থাকবার আস্তানা গুছিয়ে নিতে থাকে। লঙ্গুর কমান্ডার ঠিকঠাক করে তার সঙ্গে মোসারদ পাগলাসহ আরো ২/৩ জনকে লাগিয়ে দেয়া হয় রাতের আহারের ব্যবস্থা করার কাজে। পুরনো স্টোরে রেশনসামগ্রী গুছিয়ে রাখা হয়। ছেলেরা তাদের নিজের নিজের হাতিয়ার তাদের বিছানার পাশে দাঁড় করিয়ে কিংবা ওইয়ে রাখে।

অধিকৃত এলাকায় হাইড আউটের জীবনে হাতিয়ারগুলো প্রতিটি যোদ্ধার পরম সঙ্গী। এর সঙ্গে দিন-রাত বসবাস করতে করতে প্রত্যেকেই তার নিজস্ব হাতিয়ার ব্যবহারে এমন অভ্যন্ত হয়ে ওঠে যে, সেটা তার শরীরের একটা অবিচ্ছেদ্য অংশেই যেনো পরিণত হয়ে যায়। দিনের অবসরে প্রত্যেকে তার নিজস্ব হাতিয়ারে পরম যত্নে তেল মাখে, পরিষ্কার অথবা ঘষামাজা করে ঝকঝকে তক্তকে করে তোলে। রাতের বিছানায় হাতিয়ারটাকে কোলের আশ্রয়ে নিয়ে পরম নিশ্চিন্তে সবাই ঘুমুতেও যায়। হাতিয়ার আর যোদ্ধা এখন যেনো একাকার হয়ে গেছে। কেউ কাউকে বিচ্ছিন্ন ভাবতে পারে না। আসলে যুদ্ধের মাঠে একজন সৈনিকের পক্ষে এরকমটাই স্বাভাবিক। এ হাতিয়ার যেমন শক্তকে নিখনের কাজে ব্যবহৃত হয়, তেমনি নিজেকে শক্ত হাত থেকে বাঁচিয়ে রাখবার কাজেও সেটা সম্ভাবে ব্যবহৃত হয়। হাতিয়ারের ধাতব স্পর্শে শরীর জেগে ওঠে। নিজের সাহস হিংগ হয়ে যায়।

তাই প্রত্যেকেই তার সর্বোচ্চ সতর্কতা নিয়ে নিজের নামে ইন্সু করা হতিয়ারটির প্রতি যত্নবান হয়, স্বাভাবিক কারণেই পরম মমতা নিয়ে।

ছেলেরা তাদের কাজ করতে থাকে : পিটুসহ আমরা বাইরের চতুরে এসে বসি। শীত আছে, কিন্তু তার দাপটের প্রাবল্য নেই। কি হয়, ব্রতাববশতই সভ্যত চোখের দৃষ্টি চলে যায় সামনে। প্রতিদিনের অভ্যন্ত চোখ তীব্র আকাঙ্ক্ষা নিয়ে ঝুঁজে বেড়ায় হিমালয়ের পি঱িশ্রেণীকে। আমরা যেখানেই যাই না কেন, হিমালয় দাঁড়িয়ে থাকে পাশে তার বিশাল প্রশান্ত শরীর নিয়ে। এই রকম অবলোকনের ব্যাপারটা একটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। চোখ মেললেই হিমালয়। যেখানেই যাই, যেভাবেই থাকি, হিমালয় তার স্মরহিমা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে পাশেই চোখের দৃষ্টি জুড়ে। হিমালয় আমাদের নিত্যদিনের সাথী হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখন তাকে দেখতে না পাওয়ার কথা ভাবাই যায় না।

নালাগঞ্জের হাইড আউটের সামনেকার চতুরে বসার পরপরই অভ্যন্ত চোখ চলে যায় হিমালয়ের উত্তুন্ত শীর্ষচূড়ার দিকে। জোনাকির মতো আলো জুলিয়ে গাড়ি উঠেছে-নামছে দার্জিলিংয়ের দিকটায়। পাহাড়ের গায়ে জুলজুল করছে আলোকমালা। চোখ জুড়ানো এ দৃশ্যের দিকে তাকিয়ে মনের গভীরে অভাবনীয় ভালো লাগার এক অনুভূতি উখলে ওঠে। এ মুহূর্তে আপন মনে হয় সবাইকে, সবকিছুকে।

রাউফ মিয়া খবর পেয়ে ছুটে এসেছে। সে এখন ক্রেস্টসার শরণার্থী শিবিরে আশ্রিত পরিবারবর্ণের নিরাপত্তা প্রহরী। তাকে জিগ্যেস করি, কী খবর রাউফ মিয়া?

- খবর ভালো নোয়ায়। তুকনো গলায় তার উত্তুন্ত।
- কেনরেং কী হয়েছে উত্তিপ্প হয়ে জানতে চাই।
- ওমারগুলার সকলের বেরাম। বড় প্লাট কাঁয়াও সুস্থ নাই।
- ডাক্তার দেখায় নাই? ওবুধপুর আর না?
- ক্যাঙ্ক করি দেখাইবে? হাজুরিন্ত নাই ওমার পাইসা কড়ি।
- বলিস কিরে! খুব অসুস্থ!
- হ খুবেই! কথাটা বলেই রাউফ হাঁটু গেড়ে সামনে বসে।

বেলতলার সেই শরণার্থী পরিবারের দুঃসংবাদ

রাউফের দেয়া খবরটা বেশ চিন্তিত করে তোলে সবাইকে। হাইড আউটের জীবনে যুদ্ধের পাশাপাশি সবসময় নানাবিধ সমস্যার আবর্তে থাকতে হয়। এখানে হাইড আউট নেবার পরপরই রাউফ বহন করে নিয়ে এসেছে এমন এক দুঃসংবাদ, যাকে এড়িয়ে যাওয়া চলে না কেনো মতেই। তার ব্যাকুলতাই বলে দিছে, সে এর সমাধানের আশাতেই সোজা ছুটে এসেছে আমার কাছে।

ব্যাপারটা সম্পূর্ণ মানবিক। মনে মনে ভাবি, এতোদিন যে শরণার্থী পরিবারগুলোকে নিরাপত্তামূলক প্রহরার ব্যবস্থা দিয়ে বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে, তাদের এ প্রচণ্ড দুঃসময়ে সাহায্যের হাত বাড়ানো একান্ত প্রয়োজন। ব্যাপারটা নিয়ে পিটুসহ নিজেদের মধ্যে আলোচনা করি। তারপর বাবু ও মতিয়ারকে ডেকে আনি ভেতর থেকে।

তাদের বলি, তোরা রাউফের সঙ্গে যাবি, দেখবি সঠিক পরিস্থিতি কী ধরনের। রাউফের কথা যদি ঠিক হয় এবং কারো অসুবৰ্ষের প্রাবল্য দেখলে, রাতেই জলপাইগুড়ি থেকে ডাক্তার

এনে দেখাবি। প্রয়োজনীয় শুধুপথ্য কিনে দিবি। রাতটা ওখানেই থাকবি। সকালে এসে রিপোর্ট করবি পরিস্থিতি সম্পর্কে। ঠিক আছে?

ওরা দু'জন মাথা নাড়ে।

— তাহলে যা, তাড়াতাড়ি রেডি হয়ে নে।

এ ধরনের একটা সেবামূলক কাজের দায়িত্ব পেয়ে বাবলু আর মতিয়ার বেশ খুশি হয়। ছেলে দুটোর বুকজোড়া যেনো মানুষের জন্য পরম মমতার আধার। কিছুক্ষণের ভেতরে তৈরি হয়ে আসে ওরা। প্রয়োজনীয় টাকা-পয়সা হাতে ধরিয়ে দিয়ে ওদের রওনা করিয়ে দিই।

যুদ্ধের বাইরে এ যেনো আরেক যুদ্ধ। জনযুদ্ধে এ ধরনের বাইরের যুদ্ধের মোকাবেলা আমাদের করতেই হবে হরহামেশা। এর থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবার কোনো অবকাশ নেই।

বাইরে চা নিয়ে আসে মোসারদ পাগলা। পিন্টুর হাতে ধরা ম্যাচ জুলে ওঠে। সে আগুনে প্রত্যেকেই সিগারেট ধরিয়ে নেয়। তেঁভুলিয়া থেকে আনা সিগারেট চলাবে হয়তো ২/৪ দিন। এরপর আবার সেই মতি বিড়ি, না হয় উড়োজাহাজ মার্ক বিড়ির ধোয়া বুক ভরে নিতে হবে আগের মতোই।

দুর্দলু আসে কিছুক্ষণ পর রীতিমতো কোঁকাতে কোঁকাতে। গায়ে চাদর জড়িয়ে জনুখুব অবস্থা তার। সে অবস্থাতেই তার অদমিত উচ্চস্থানকে সে তার নিজস্ব স্টাইলে প্রকাশ করে বসে।

— মাহবুব ভাই, আপনি আবার এসেছেন শুনে ছুটেছিলেন এলাম। কী কাণ্ড! আপনারা আবার নালাগঞ্জে আসবেন এটা ভাবতেই পারি নাই।

তার গলায় রীতিমতো আবেগ আর খুশির উজ্জ্বল। এভাবে আমাদের তার এলাকায় আবার পেয়ে সে যে ভীষণ খুশি আর আনন্দিত ঝোঙচ, সেটা শ্পষ্ট বোৰা যায়।

তাকে বসতে বলি। সে বসে পড়ে ঘাসের উপর বিছানো পাটির ধার হেঁসে। পিন্টু তার দিকে সিগারেট এগিয়ে দেয়।

জিগ্যেস করি, শরীর কেমন? কীভাবে থবর কি?

— শরীর তো খুব খারাপ হয়েছিলো। জুর খুব। তবে আপনাদের দেখে মনে হচ্ছে জুর পালান দিছে।

— আর বাড়ির থবর?

— কে জানে? দু'দিন থেকে ওদিক যাই নাই। বোধহয় ভালো না।

চমকে উঠি তার কথার ধরনে। রাউফের মারফত তার পরিবারের সদস্যদের যে থবর কিছুক্ষণ আগে পাওয়া গোলো, সে ব্যাপারে এতো দেখছি কিছুই জানে না। যাক, বাবলু ও মতিয়ার রওনা হয়ে গেছে। সঙ্গে রয়েছে ওদের প্রয়োজনীয় অর্থকড়ি। করিতকর্মা ছেলে দু'জনেই। খারাপ কিছু হলে অবশ্যই সামাল দিয়ে উঠতে পারবে ওরা। দুলুকে অহেতুক অস্তির মধ্যে ফেলে লাভ নেই।

তারপর শুরু হয় ধূম আড়ডা। রাত বাড়তে থাকে আপন গতিতে। অমরখানা রণাঞ্জন থেকে গোলাগুলির সেই পূরনো শব্দ ভেসে আসে। তখন মনে হয়, বেশ কদিন এ যুদ্ধের বাইরে ছিলাম আমরা। আবার ফিরে এসেছি সেই ফেলে-যাওয়া যুদ্ধের ডামাডোলের ভেতরে। যুদ্ধই তো এখন আমাদের নিয়ন্ত্রণ সঙ্গী। এর থেকে বেশিদিন দূরে থাকবার উপায় কি আছে? নেই।

২. ১১. ৭১

দলের নতুন বিন্যাস, নতুন কৌশল

পিন্টুর দলকে একীভূত করা হয় আমাদের সাথে। ৩-এ মধুপাড়া কোম্পানির একক কমান্ড আনা হয় সমস্ত যোদ্ধাকে। কোম্পানির শক্তি দাঢ়ায় একশ'র ওপরে। নতুনভাবে কোম্পানির শক্তিকে বিন্যাস করা হয়।

নালাগঞ্জকে স্থায়ী বেস তথা কোম্পানি হেড কোয়ার্টার হিসেবে গড়ে তুলবার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। আপাতত ঠিক হয় কোম্পানিকে ঢটা প্লাটনে বিভক্ত করবার। নালাগঞ্জে বকরের নেতৃত্বে থাকবে হেড কোয়ার্টার প্লাটন। বাঁয়ে মধুপাড়ায় শামসুল চৌধুরীর নেতৃত্বে থাকবে এক প্লাটন। একরামুল তার নেতৃত্বে এক প্লাটন নিয়ে যাবে গুয়াবাড়ি। সমস্ত কোম্পানির অপারেশন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হবে হেড কোয়ার্টার থেকে। যেদিন যে এলাকায় অপারেশন থাকবে, সেদিন সে এলাকার দলকে দিয়ে অপারেশন পরিচালনা করা হবে। চৌধুরীর দল কভার করবে হাড়িভাসা এলাকা। হেড কোয়ার্টার দল পানিমাছ-তালমা এলাকা। আর গুয়াবাড়ির দল অপারেট করবে অমরখানা-জগদল-পঞ্চগড় এলাকা। প্রতিটি দলের সাথে রানারের মাধ্যমে নিয়মিত যোগাযোগ রাখা হবে। প্রয়োজনে তাৎক্ষণিকভাবে একদল অন্য দলের সাহায্যে এগিয়ে যাবে।

হেড কোয়ার্টার দল এছাড়াও স্ট্রাইকিং ফোর্স হিসেবে কাজ করবে। দ্রুত সাহায্যের জন্য রিইনফর্স করা হবে হেড কোয়ার্টার থেকে। পরবর্তী~~ক্ষণে~~ এই দল বিন্যাসের কাজটি আরো বিস্তৃত করা হবে। ছোটো ছোটো ৮/১০টি দল তৈরি করে অপারেশন এলাকার বিস্তার ঘটানো হবে। প্রতিটি অপারেশন পরিচালিত হবে স্ট্রাইকার আমার তত্ত্বাবধানে। পিন্টু থাকবে আমার সাথে সেকেন্ড ইন কমান্ড হিসেবে। প্রয়োজন প্ল্যান ঠিক করে যাব যে এলাকা, তাদের নিয়ে অপারেশন পরিচালনা করবে আমরা। মোটামুটি এভাবেই দল বিন্যাস এবং কৌশল ঠিক করে নেয়া হয়। ব্যাপারটি কমান্ডারদের ডেকে বুঝিয়ে দেয়া হয়।

আজ রাতে মূল করবে তিনি একটি দল প্রথম বেস গড়ে তোলার জন্য। গুয়াবাড়িকে এ দলের হাইড আউট হিসেবে নির্বাচন করা হয়। জোনাব আলীর বাড়িতে। একরামুলকে তৈরি হয়ে নিতে বলা হয় সক্ষ্যার পর যাত্রা করার জন্য। চৌধুরীকে নির্দেশ দেয়া হয় তার বর্তমান অবস্থান থেকে সরে গিয়ে মধুপাড়া বসির মেথারের বাড়িতে হাইড আউট নেয়ার জন্য।

রাতে খবর পেয়ে সকালে পিন্টুর দলের ছেলেরা সবাই উপস্থিত হয়েছে নালাগঞ্জ। আগের মতো নালাগঞ্জ হাইড আউট আবার সরগরম হয়ে উঠেছে। বহুদিন পর ছেলেদের পরস্পরের মধ্যে এই মিলনকে কেন্দ্র করে হাইড আউটে স্থান হয়েছে এক প্রাণ মাতানো দৃশ্যের। পুরনো বস্তুদের মধ্যে দেখা-সাক্ষাৎ, কৃশল বিনিয়য়, হাসি-মক্ররা আর হল্লোড় সমস্ত পরিবেশটিকে আবার সজীব আর প্রাণবন্ত করে তুলেছে।

পুরনো কোয়ার্টার মাস্টার মিনহাজ আবার তার দায়িত্ব তুলে নিয়েছে নিজের কাঁধে। মমতাজ ও ইব্রাহিম পুরনো দিনের মতোই বুঝে নিয়েছে তাদের লঙ্ঘনখানা। রাতে চৌধুরী আর একরামুল স্ব-স্ব দল নিয়ে মুভ করবে। সারাটা দিন আজ ছেলেদের রেষ্ট। একরামুলের সাথে যাবো আমি আর পিন্টু। গুয়াবাড়িতে বেস গড়ে তুলে অপারেশন শুরু করে দিতে হবে আগামীকাল থেকে।

সকাল নটার দিকে দল বিন্যাস এবং পর্যায়ের গেরিলা যুদ্ধের কৌশল নিয়ে কমান্ডারদের সাথে আলোচনা বৈঠক শেষ হয়েছে। এরপর ছুটি। ছুটি পেয়ে ছেলেরা যাব যাব মতো মেতে গেছে নিজেদের নিয়ে। রাতেই বলে রেখেছিলো কথাটা পিন্টু। সকালে তাগিদ দিয়েছে

কয়েকবার। সব কাজ শেষ হয়ে পোলে সে বলে, চলেন তা হইলে লাইলিকে দেখি আসি।

লাইলি মানে আমাদের জব্বার ভাইয়ের স্ত্রী। তাকে এর মধ্যে একদল সাহসী ছেলে নিয়ে ডোমার থেকে উদ্ধার করে এনেছে। কলিয়াগঞ্জের হাইড আউটের কাছেই জব্বার ভাই তার লাইলিকে নিয়ে অস্থায়ী সংসার পেতেছে। পিন্টুর ষষ্ঠঃস্কৃত তাগিদ, জব্বার ভাইয়ের সংসার দেখতে হবে মাঝবুর ভাই!

তার ঔৎসুক্য আর তাগিদ থেকেই সিঙ্কান্ত নিয়ে ফেলি, যাবো আমরা। ফেলে আসা মারেয়া ফ্রন্টের বন্দুদের খৌজখবর নেয়া হবে এবং সেই সাথে দেখে আসা হবে জব্বারের সংসার। যুদ্ধের মাঠে তারা সংসার পেতেছে, এটা একটা দারুণ দেখার ব্যাপার বৈকি!

ছদ্যে তার বাংলাদেশ

গনি ভাই এসে হাজির হয়েছেন নালাগঞ্জে। কুচবিহার থেকে ট্যাক্সি নিয়ে এসেছেন তিনি। গড়ালবাড়ি এসেই পেয়েছেন আমার আসার সংবাদ। নালাগঞ্জে আমরা আবার ‘হাইড আউট’ নিয়েছি জেনে তিনি সরাসরি ট্যাক্সি নিয়ে হাজির হয়েছেন দুপুরের পর। ট্যাক্সি ভর্তি তার বিভিন্ন মালপত্র।

ছুটে যাই তাঁর ট্যাক্সির কাছে। দরজা খুলে নেমেই তিনি জড়িয়ে ধরেন আমাকে। তার সেই গভীর আলিঙ্গনে পরম আর্থীয়তাৰ উষ্ণতাৰ স্পৰ্শ। মুক্তেকে দিন পৱ গনি ভাইয়ের সাথে দেখা। আপনাআপনি চোখে পানি এসে যায়। একটা শুকু আবেগ এসে চেপে বসে বুকের গভীৱে। গনি ভাইকে আমরা পেয়েছি আপন বড় মুক্তিহুৰ মতো করেই। এদেশে আমাদের কেউ নেই। তিনি গোলাম গড়েসের ভাই। গোলাম সিউস আজ নেই, মারা গেছে। কিন্তু গনি ভাই তার হারানো ভাইয়ের জায়গায় (আমাক) পিন্টুকে আর হাইড আউটের আর সবাইকে তার (আপন ভাই) করে ফেলেছেন। এক ভাইয়ের পরিবর্তে আমরা এ ফ্রন্টের সব মুক্তিযোদ্ধাই তার ভাই বনে গেছি।

~~মুক্তিযোদ্ধার প্রতি ভাইয়ের বদলে~~

তিনি অনেক ভাই পেয়ে গেছেন।

সময় পেলেই তিনি কুচবিহার থেকে ছুটে চলে আসেন এই ফ্রন্টে। আর যখনই আসেন, সঙ্গে করে নিয়ে আসেন ছেলেদের জন্য নানা জিনিসপত্র। এগুলো তিনি বিভিন্ন সাহায্য সংস্থার কাছ থেকে চেয়েচিত্তে ভিক্ষা মেঘে যোগাড় করে আনেন। এ ব্যাপারে তাঁর মনোভাবটা এ রকমের যে, আমার ভায়েরা যুদ্ধ করছে। কীভাবে যুদ্ধ করছে, সেটা আমি নিজের চোখে দেখে এসেছি। তাদের জামাকাপড় নাই, ঠিকমতো খাবার নাই, ওষুধপত্র নাই, তারা যুদ্ধ করছে, মরছে দেশের জন্য, তাদেরকে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র দিতে হবে...। এ ধরনের কথা বলে তিনি বিভিন্ন সংগঠন, সংস্থার কাছে ধরনা দিয়ে যখন যা পান, তাই নিয়ে ছুটে আসেন এ ফ্রন্টে। তার ভাবসাব দেখে মনে হয়, তার এক ভাই গেছে, যাক কিন্তু তার অন্য ভাইদের তিনি যে করেই হোক বাঁচিয়ে রাখবেনই।

তিনি এ ফ্রন্টের মুক্তিযোদ্ধাদের সরেজমিনে দেখে গিয়ে সেটা লেতাদের জানিয়েছেন। মুক্তিবন্গর সরকারের কাছে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রকৃত অবস্থা তুলে ধরবার জন্য ছুটে গিয়েছেন। এমনকি তিনি দেখা পর্যন্ত করেছেন প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীনের সঙ্গে। তুলে ধরেছেন তাঁর কাছে এই ফ্রন্টের প্রকৃত চিত্ত। অন্যান্য নেতার সাথেও দেখা করে তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের চাহিদা ইত্যাদি সম্পর্কেও জানবার চেষ্টা করেছেন। তাজউদ্দীন সাহেব বৈর্য ধরে তাঁর কথা শনেছেন। আর তারই ফলে তিনি মৌখিকভাবে তাকেই দায়িত্ব দিয়েছেন এ ফ্রন্টের মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে

বাংলাদেশ সরকার এবং আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে যোগাযোগ রক্ষা করার জন্য।

অনেকের মতো গনি ভাইও হয়তো তাসমান অবস্থায় থেকে তার নিজের রাজনৈতিক সংগঠন আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিয়ে মেতে থাকতে পারতেন। পারতেন রংগাঙ্গন থেকে অনেক দূরে থাকতে। কিন্তু সেই যে হারানো ভাই গোলাম গড়সকে খুঁজতে এসে তিনি জড়িয়ে গোলেন আমাদের সঙ্গে, আজো সে সম্পর্ক আটুট। তারপর থেকে তিনি নিজেকে এতো গভীরভাবে এই ফ্রন্টের যুদ্ধের সঙ্গে জড়িয়ে ফেলেছেন যে, তাঁকে, বলতে গেলে, আমাদের কাছ থেকে এখন আর আলাদাই তাবা যায় না।

প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে গনি ভাই হচ্ছেন একমাত্র রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, যিনি নিয়মিত আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন, তন্ত্র-তালাশ করছেন ছেলেদের। নানা ধরনের জিনিসপত্র তাদের হাতে তুলে দিয়ে সাহায্য করছেন যুদ্ধরত ছেলেদের। হঠাৎ হঠাৎ করেই এসে হাজির হন তিনি। খোজখবর নেন। যুদ্ধের অহঙ্গতি সম্পর্কে জানবার চেষ্টা করেন। আর যাবার সময় বলেন, ভাবেন না তোমরা কিছু মুই আছো তোমার সাথোত।

ভাই হারানোর শোকে প্রথম প্রথম পাগলের মতো হয়ে গিয়েছিলেন। সেই ভাবটা এখন তিনি কাটিয়ে উঠেছেন। তার কথাবার্তাতেও এখন আর প্রথম দিককার সেই আবেগ-উচ্চাসেরও প্রাবল্য নেই। এখন তিনি একজন দায়িত্বশীল রাজনৈতিক মেতা। একজন জেদি আর সাহসী মানুষ। তার চেহারা আর কথাবার্তায় এখন একজন বলিষ্ঠ মানুষের প্রতিচ্ছবি। বুক জুড়ে যেনো রয়েছে আমাদের সবার জন্য গভীর যুদ্ধ। আর ভালোবাসা।

গনি ভাই বলেন, মাহবুব অনেকদিন পর তোকে দেবলাম। কেমন আছিস ভাইয়া? ঢোকের পানি মুছতে মুছতে বলি, ভালো। আপনি?

— আরে তুই কান্দেছিস ক্যান? তোমারগুলোর সাথে দেখা হবার সময় মুই কালিছিনু গোলাম গড়সের জইন্যে। তোমরা তত্ত্বজ্ঞান সান্ত্বনা দেছেন। বুবাইছেন। গোলা তোমরা কান্দেন ক্যান? মোর কান্দেন তেমন্তোর গেইছে। এখন আমাদের জয় বাংলা করতে হবে। একটাই আমাদের লক্ষ্য আর উচ্চত্ব...।

তাঁকে ঘিরে ছেলেরা এসে দাঢ়ায়। সবাইকে লক্ষ্য করে তিনি বলেন, ভাইয়ারা তোমরা ভালো আছেন। তোমারগুলার জইন্যে মোর চিঞ্চার শ্যাম নাই। এবার তোমারগুলার জইন্যে লুঙ্গি, শোঁজি, শার্ট আর ওন্দুখ নিয়া আসছি। আর কি কি লাগবে যাবার সময় মোক কল তোমরা। সে রাতে কী দারুণ তয় পেয়েছিলাম, পিন্টু তার সাক্ষী। তাই নারে পিন্টু!

পিন্টু মাথা নাড়ে। তার মুখে সকোতুক হাসি।

হাউড আউটটা ভালো মতো এখনো গোছানো হয় নি। এর মধ্যেই শ্রান্ত ক্লান্ত গনি ভাই গোসল-টোসল সেরে আমাদের সাথে থেতে বসেন। আহারপর্ব শেষে তিনি বলেন, পার্টির জরুরি মিটিং আছে, আমাকে যেতে হবে আজই।

তাঁকে নিয়ে পুরু পাড়ের আমগাছের ছায়ায় এসে বসি আমরা। বসার পর দুলু বলে, গনি ভাই আমাদের বেলতলায় যাবেন না?

আজতো খুব তাড়া। শুল্লাম তোমাদের বাড়ির সবার নাকি অসুখ। ঠিক আছে যাবার

সময় দেখে যাবো তোমাদের আন্তর্না !

এরপর যুদ্ধ, রাজনীতি, বিশ্বব্যাপী বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া এসব নিয়ে আলোচনা বেশ জমে ওঠে। অনেকখনি বদলে গেছেন এই মানুষটি, এই স্বল্প সময়ের ব্যবধানেই। চিন্তায় কথাবার্তায় এসেছে তার একটা পরিশীলিত ভাব।

এরি মধ্যে মিনহাজ চা নিয়ে আসে মোসারদসহ। চায়ের মগ হাতে নিয়ে হঠাতে করেই গনি ভাই বলে ওঠেন, মাহবুব তোমরা আমাকে যুদ্ধের ট্রেনিং দেবে?

চমকে যাই তার এই প্রত্যবে। বলি, কেনো গনি ভাই?

— যুদ্ধ তোমারগুলার সাথে থাকিয়া যুদ্ধ করিম। যুদ্ধ ছাড়া এদেশ স্বাধীন করা যাবে না। কুচবিহারে বসে শুধু রাজনীতি নিয়ে মন ভরে না ভাই। মনে হয় তোদের মতো দিন-রাত রাইফেল হাতে শালা পাকবাহিনীর সাথে যুদ্ধ করি। দেশটা তাড়াতাড়ি স্বাধীন না করতে পারলে ভীষণ বিপদ বৃঞ্চিলি! কতো যে ঝামেলা, তোদের ঠিক বোঝানো যাবে না।

পিন্টু বলে, আপনি কেনো ট্রেনিং নেবেন?

এবার একটা জেনি ভাব ফুটে ওঠে গনি ভাইয়ের গলায়, না, মোক নিবারই লাগবে। রাজনীতি আর মোক ভালো লাগে না। যুদ্ধই এখন হামার রাজনীতি। জয় বাংলা করাটাই এখন সব রাজনীতির মূল লক্ষ্য। তোমরা মোক শিখি দেন রাইফেল চালাবার লাগে কেমন করি।

— এটা কোনো ব্যাপারই না, একদিনেই শিখে যাবেন পিন্টু তাকে বলে।

আমি অত্যন্ত থির গলায় যুক্তি দেখিয়ে তাকে বলি, জেনি ভাই, যুদ্ধের প্রয়োজনে আপনি অবশ্যই ফ্রন্টে এসে হাতিয়ার ধরবেন একদিন। কিন্তু সেদিন এখনো আসে নি। আপনাদের মতো কিছু মানুষের এখন আমাদের ভীষণ দরকার থাকিয়ে থাকা পেছন থেকে আমাদের সব ধরনের সাহায্য-সহযোগিতা করে যাবেন। যুদ্ধ কর্তৃপক্ষ সাময়িক এখন বাংলাদেশ যুক্তিবাহিনীর হাতে। নতুন কৌশল আর পরিকল্পনা নিয়ে আর্টিলেরি আবার ফ্রন্টে এসেছি। বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে আপনি শুধু আমাদের প্রিয়ে যোগাযোগ রেখে যাবেন, তাতেই চলবে। আমরা তো ফ্রন্টে রয়েছিই। রাজনৈতিক ফ্রন্টে বড় দরকার আপনাদের মতো মানুষের।

গনি ভাই তখন ব্রগতেক্ষিত মতো করে বলেন, তাজউদ্দীন সাহেবও আমাকে একথা বলেছেন। ঠিক আছে, তোমরা চালিয়ে যাও যুদ্ধ। আমরা আছি। বাংলাদেশ সরকার আছে তোমাদের সাথে।

এরপর ওঠেন গনি ভাই। যাবার সময় আমাকে বুকে টেনে নিয়ে বলেন, ভালো থাকেন ভাইয়েরা, মুই শিগগির ফির আসিম।

তাঁর ট্যাঙ্কি চলে যায়। সেদিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকি আমরা। মনে মনে ভাবি, গনি ভাইয়েরা আছেন বলেই হয়তো আমরা একদিন সত্যিকারভাবেই দেশটাকে স্বাধীন করে ফেলতে পারবো। কিন্তু স্বাধীন দেশে এই মানুষটির যথাযথ মূল্যায়ন হবে কি? কে জানে?

কেনো কাঁদে ও এভাবে

বেলতলায় পৌছুতেই বাবলু আর মতিয়ার রিপোর্ট পেশ করে, খবর খারাপ। ছোট বড় সবার অসুখ। একজনের ডবল নিউমিনিয়া। একটা তিন বছরের বাচ্চা ছেলে। বাবা-মা থাকে তার ইংল্যন্ডে। সেই ছেলেটি অসুস্থ খুব।

— ডাক্তার এনেছিলি? ওধূধপত্রের ব্যবস্থা?

— ট্যাক্সিতে করে ডাক্তার আনা হয়েছিলো। তিনি দেখে গেছেন। তার প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী ওষুধপত্র আনা হয়েছে বেরুবাড়ি থেকে। ডাক্তার ঠিকমতো চিকিৎসা করতে বলেছেন। তা না হলে বিপদ হতে পারে।

— ঠিক আছে, তোরা সারাটা দিন এখানে থাক। চিকিৎসা যখন শুরু হয়েছে, তখন আর ভয় নেই।

ওরা দু'জন সম্মতি দেয়। গোলজার সাহেবের সাথে অনেক দিন পর দেখা। খুশি হন তিনি আমদের পেয়ে। কুশলাদি জিগ্যেস করেন আগের মতো আন্তরিকতা নিয়েই। তবে তাঁকে কিছুটা চিন্তিত আর বিষণ্ণ দেখায়। মনে হয়, ভদ্রলোক সবদিক সামাল দিতে গিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। বেশ কিছুটা অঙ্গের আর উদ্ভ্রান্তের মতো দেখাচ্ছিলো তাকে। আমদের তৎপরতার ফলে তিনি যে কিছুটা আশঙ্কা হয়েছেন আর সেই সাথে যথেষ্ট ক্লজ্জ, সেটা তাঁর আচরণ আর কথাবার্তা থেকেই বোৰা যায়। বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমানায় মুক্তিযুদ্ধ চললেও তার ধকল এই ভদ্রলোককে কম সহিতে হচ্ছে না। তিনি এদেশের নাগরিক। মনেপোধে তিনি একজন ভারতীয়। বাংলাদেশ স্বাধীন হলে তাঁর কিছুই আসবে যাবে না। কিন্তু তারপরও বাংলাদেশের এই স্বাধীনতা যুদ্ধ ঠাণ্ডা প্রকৃতির এই মানুষটিকে আলোড়িত করেছে গভীরভাবে। যুদ্ধের ধকল তাঁকেও প্রায় বেসামাল করে তুলেছে।

এক সময় তিনি বলেন, আপনারা যখন এসে গেছেন, ক্ষেত্রে আর বিপদ নেই। ডাক্তার দেখে গেছে, চিকিৎসা শুরু হয়েছে। আমি তো ভয়টা পেয়ে গিয়েছিলাম, রোগীদের কাউকে হয়তো জলপাইকুড়ি হাসপাতালে নিয়ে যেতে হতে পারে...।

— মনে হয় আর হাসপাতালে নিতে হলুণ্ডা, দেখেন কি হয়। আপনাকে ঝামেলা পোহাতে হচ্ছে অনেক।

— কি আর করা যাবে, যে সময় জাতীয়দুর্দিন যাচ্ছে মানুষের। দীর্ঘশ্বাস ফেলতে ফেলতে কথাশুল্ক বলেন গোলজার সাহেবেন্দি।

হঠাতে করে বিদায়ের সময় ভেঙ্গে থেকে একটি মেয়ের ঢুকরে ওঠা কান্নার রোল ভেসে আসে। আকুল সে কান্নার ধৰ্ম। তাঁর এই করুণ কান্নার বিলাপ মুহূর্তে মরমে বিধে যায়।

থমকে দাঢ়ি আমরা সবাই। মনে প্রশ্নের তোলপাড়। কেনে কাঁদছে মেয়েটা এভাবে? যুদ্ধের সময় এটা। এ সময় তো সবকিছু ঠিকঠাক মতো চলবার কথা নয়। এখন চারদিকে বিপদ-বালাইয়ের প্রাবল্য। সবার জন্য চৱম দুর্দিন আর দুর্দশার জাল বিছানো চারদিকে। দেশ জুড়ে এখন অসহায় মা-বোনদের কান্নার আকুল আকৃতি। এ প্রক্রিয়ার বাইরে এখনকার এই পরিবারগুলোর সদস্যরা অবশ্যই নয়। এখনকার আকাশে-বাতাসে এই যে এই মেয়েটির হাহাকারদীর্ঘ উচ্চনাদী কান্নার রোল, এ যেনো সমস্ত দেশের অসহায় মা-বোনদেরই কান্নার প্রতিচ্ছবি। তবুও প্রশ্ন জাগে মনে, কেনে কাঁদে মেয়েটা এভাবে?

মুজিব বাহিনী

বেরুবাড়িতে আবার বেশ কিছুদিন পর। শরণার্থী শিবিরটি এবার যেনো বেশ কিছুটা স্থায়ী রূপ নিয়েছে। আগের মতো অগোছালো আর এলোমেলো ভাব আর নেই। রাত্তার ধারে, গাছের তলায় এদিকওদিক ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা শরণার্থী পরিবারগুলোর জটলা লেগে পড়ে থাকবার পরিচিত দৃশ্য তেমন চোখে পড়ে না। তবে বেশন বিতরণের সময় তাঁরুর সম্মুখভাগে দীর্ঘ

লাইন আর হাসপাতালের সামনে মানুষের ভিড়বাটা লেগে আছে আগের মতোই। শরণার্থী মানুষজনকে দেখে মনে হয়, তারা আরো শীৰ্ণ-ক্লিষ্ট হয়ে গেছে। সেই সাথে চর্মরোগ আর ভাইরাসজনিত চোখের অসুব মহামারীর আকার নিয়েছে। মানুষজন কেমন যেনো নেতৃত্বে পড়েছে। কেমন একটা অসহায় আর মুকদশা সবারই। তাদের চোখ-মুখের আগেকার সেই দীপ্তি কোথায় যেনো হারিয়ে গেছে। নিজ বাসভূম ছেড়ে এসে এদের যাপন করতে হচ্ছে প্রতিদিন এক মানবের জীবন। কবে যে এর শেষ বা সমাপ্তি, কবে যে তারা ফিরে যাবে নিজের প্রিয় মাতৃভূমির কোলে, এরা কেউ সেটা জানে না। জানি কি আমরা নিজেরাই!

ঢাকাইয়া নুরু আগের মতোই আছেন। হৈচে করতে করতে তিনি অভ্যর্থনা জানান আমাদের। তাঁর দোকানে বসিয়ে আপ্যায়নের ব্যবস্থা করেন। গড়গড় করে বলে যান তিনি সর্বশেষ রাজনৈতিক ঘটনাপ্রাবাহ ইত্যাদি সম্পর্কে।

খালেক বিদায় নেয় এখান থেকেই। সে চলে যাবে জলপাইগড়িতে সোনাউল্লাহ হাউসে তার নির্দিষ্ট আশ্রয়ে। বেরবাড়ি আসার সময় সে তার পার্টির বর্তমান তৎপরতা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছে। এ ফ্রন্টে মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য-সহায়তায় রাজনৈতিক কাজ করার জন্য ২/৩ জন কর্মীকে তারা মুক্তাখ্লেশলোতে সেট করার ব্যবস্থা করেছে। বোদার পার্টি কর্মী সামসুজ্জোহাকে সে এ যাত্রায় রেখে এসেছে পিটুদের কাছে। পিটুদের হাইড আউটে অবস্থান নিয়ে সে নিজের মতো করে অধিক্ষেত্রেলাকার মানুষজনের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা উজ্জীবিত রাখবার কাজ করবে।

খালেক জানায়, দুঁচারদিনের ভেতরেই সে নিজে যাবে মারেয়া অঞ্চলে।

খালেক চলে গেলে আমরা আরো কিছুক্ষণ সেস ঢাকাইয়া নুরুর দোকানে। ঠিক এই সময় ৫/৭ জন তরঙ্গের একটা দল ঢেকে সেখানে। উজ্জ্বল নীলবর্ণের ইউনিফর্ম জাতীয় পোশাক তাদের পরনে। ছেলেদের অঙ্গুষ্ঠি আর কথাবার্তা কেমন যেনো অন্যরকম লাগে। নুরু ভাই পরিচয় করিয়ে দেয় এবং সাথে। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণের চৌকস তরুণ এদের দলনেতা। নিজের পরিচয় দেখে তো এভাবে, আমার নাম নাজিম। পঞ্চগড়ে বাড়ি আমার। আমরা 'মুজিব বাহিনী'র সদস্য।

হাত মেলাই তাদের সাথে। আর মনে মনে বলি তাহলে নতুন আরো একটা বাহিনী গড়ে তোলা হচ্ছে এফ.এফ. আর মুক্তিফৌজের পাশাপাশি! এই তিনি নম্বর বাহিনীটিই তাহলে 'মুজিব বাহিনী'?

অজস্র কৌতুহল মনের গহনে। বক্সবক্স শেখ মুজিবের নামে একটা নতুন বাহিনী গঠিত হয়েছে। কিন্তু কেনো এই বাহিনী? এদের কাজ কী হবে? কারা এরা? তখন তেওলিয়া যুব ক্যাম্পের আবাস নামের যুবা বয়সী সেই ছেলেটির কথা মনে হয়। সেও বলেছিলো নতুন একটা বাহিনী গঠনের কথা, সেখানে যোগ দেবে বলে অধীর অপেক্ষা নিয়ে তারা বসে আছে। নাজিমকে বলি, তোমাদের ট্রেনিং হয়েছে কোথায়? কী ধরনের ট্রেনিং?

— দেরাদুনে। তার কথায় প্রচন্দ গর্বের আভাস। তারপর সে বলে, আমাদের কাজ মূলত পলিটিক্যাল। আমরা দেশের লোকদের পলিটিক্যালি মোটিভেট করবো।

— আর যুদ্ধ? তাকে প্রশ্নটা না করে পারি না।

— প্রয়োজন হলে যুদ্ধও করবো, তবে সেটা হবে আস্তরক্ষার জন্য যতোটুকু প্রয়োজন ঠিক ততোটুকু। সংগ্রিহিতভাবে নাজিম তার কথা শেষ করে। তার এই সংক্ষিপ্ত

বক্তব্যের ভেতর দিয়েই সে তাদের এই বাহিনীর আদর্শ-উদ্দেশ্য সম্পর্কে ধারণা দেবার চেষ্টা করে।

তার কথা শেষ হতেই আমি বলি, তোমাদের কমান্ড করবে কে? সেন্টার, সাব-সেন্টার কমান্ডারের সাথে তোমাদের সম্পর্কটা কী রকমের, মুক্তিফৌজদের সাথেই-বা তোমাদের যোগাযোগ থাকবে কতোদূর? এদিকটার সমর্থন কীভাবে হবে?

নিজাম যেনো কিছু না ভেবেই এবার তৎক্ষণিক জবাব দেয়, কোনো সম্পর্ক নেই। আমাদের কমান্ড আর যুদ্ধ কৌশল আলাদা। আমরা সেন্টার কমান্ডারদের আভারে নেই। মোটামুটি স্বাধীনভাবে পরিচালিত হবে এই বাহিনী।

— কিন্তু অপারেশন এলাকা তো এক। একই জায়গায় আমরা তোমরা কাজ করবো। দুটো দলের মধ্যে যোগাযোগ না থাকলে তুল বোঝাবুঝি হতে পারে, নিজেদের মধ্যে ঢোকাঠুকি লেগে যেতে পারে।

বেশ ভেবেচিষ্টেই আমি নাজিমকে কথাগুলো বলি।

জবাবে নাজিম কিছুটা অধৈর্য ভাব দেখিয়ে বলে, সেটা দেখা যাবে। আপনারা আপনাদের কাজ করবেন, আমরা করবো আমাদের কাজ।

এরপর ওরা চলে যায়। ওদের গণিত পদচারণার দিকে তাকিয়ে পিন্টুকে বলি, কিছু বুঝলা পিন্টু!

— নাঃ। কী যে হচ্ছে মাহবুব ভাই, মাথায় কিছুই চল্লাই না।

ঢাকাইয়া নুরুলকে জিগ্যেস করি, নুরু ভাই এরা কান্ডাই কী করবে এরা?

হাতের পাতা নড়িয়ে নুরু প্রথমে একটা স্বত্ত্বালক মূদা তৈরি করে। তারপর বলে, এরা মুজিব বাহিনী। ছাত্রলীগের ডেডিকেটেড ক্ষমতারদের নিয়ে এই বাহিনী গঠন করা হয়েছে। ক্ষনতাছি তো এ্যাগো কাজ হইবে পলিটিক্যাল মোটিভেশন। কিন্তু কী ধরনের মোটিভেশন এ্যাগো কইবে বুঝবারতো পারতেছেন। একটা ধার্মাকার মইধ্যে রইছি।

পিন্টু রেগে গেছে বেশ। তারপর গোপনীয় থেকে এক রাশ রোম খাবে পড়ে। সে বলে, আসলে ওরা বোধহয় আমাদের বিশ্বাস করতে পারতেছে না। পলিটিক্যাল-টেলিটিক্যাল ওসব কিছু না। আমরা যুদ্ধ করে দেশটা স্বাধীন করলে এমরা ক্ষমতা দখল করবে, সে জন্য তৈরি করছে এদের।

আসলে পিন্টুর কথাই হয়তো ঠিক। মনটা বিদ্রোহী হয়ে উঠতে চায়। যুদ্ধের প্রথম থেকে আমরা যুদ্ধের মাঠে মাঠে রয়েছি। গেরিলা যুদ্ধ অনেকটা সুবিন্যস্ত আকার ধারণ করেছে। নিয়মিত মুক্তিবাহিনীও অনেকটা সুস্থিত শক্তিশালী আর যুদ্ধের মাঠে পারস্পর হয়ে উঠেছে। আর তখনি রাজনৈতিক ক্যাডারের নামে সৃষ্টি করা হচ্ছে আরেকটা বাহিনী। অথচ এদের সাথে আমাদের কোনো যোগাযোগ থাকবে না যুদ্ধের ফ্রন্টে, অধিকৃত কিংবা মুক্তাধ্বলে, সে কেমন করে হয়? সেন্টার কমান্ডারোও এদের ওপর কমান্ড খাটাতে পারবেন না, এদের তৎপরতা সম্পর্কে কোনো রকম তত্ত্ব তালাশ করতে পারবে না এসব কথা ভাবতে গিয়ে মনের ভেতরে কেমন একটা ধন্দ লাগে।

ঠিক এই সময় নুরুর গলা শোনা যায়, আরেক কাপ চা খাইবা?

— না, নুরু ভাই বলে আমরা উঠি। বেশ দূরের পথ যেতে হবে আমাদের।

সাইকেলিং বন্ডিউল আলম

বেরুবাড়ি থেকে হলদিবাড়ি স্টেট বাসে। এরপর রিকশায় চেপে মানিকগঞ্জ। মানিকগঞ্জে ঘন্টদের পার্টি অফিসের দেখা হয় এক সপ্তিত যুবকের সাথে। মুখভর্তি তার কালো দাঢ়ি-গোফের আড়ালে অমায়িক হাসি নিয়ে যুবকটি পরিচয় দেয় এইভাবে, আমার নাম বন্ডিউল আলম। সাইকেলিং। গতবার রংপুর একজিবিশনে সাইকেল জাম্প, মোটর সাইকেল জাম্প, মউতকা গোলা এইসব খেলা দেখাইছি।

এইবার চিনতে পারি যুবকটিকে। এই সেই বিখ্যাত সাইকেলিং, যে বিরতিবিহীন ৪৮ ঘণ্টার সাইকেল চালানোর প্রদর্শনী করেছিলো রংপুর কালেক্টরেটে মাঠে বছর চার-পাঁচেক আগে। রংপুর একজিবিশনে সে মোটর সাইকেল জাম্প এবং কুয়োর ভেতরে মোটর সাইকেল চালিয়ে খুবই সুনাম কৃতিয়েছিল। সেই দুষ্টসাহসিক যুবক, একজন বিখ্যাত ‘শো-ম্যান’ হিসেবে যার এতো নামজডাক তাকে এখানে এভাবে দেখতে পাবো, সেটা আশা করি নি।

মুক্ত আমাদের বসতে বলে। তারপর আমাদের পরিচয় পেতেই বলে, আপনাদের কথা উনেছি অনেক, আপনাদের ফ্রন্টে যাবার ইচ্ছে ছিলো খুব। তার এই কথার মুখে তাকে জিগেস না করে পারি না, আপনাকেও আসতে হয়েছে দেশ ছেড়ে?

— আসতে হবে না? কহেন কি? কলেজে ছাত্র ইউনিয়ন করেছি। সংগ্রাম পরিষদ, মিছিল-মিটিং আন্দোলন করেছি। প্রতিরোধ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে আসেন গুরুরগাঁও মুক্ত রাখিছেনো প্রায় মাসখানেক। উমাহারালা ঠাকুরগাঁও-এর বন্ডিউলকে প্রতিজ্ঞা ছাড়েছে কথা কহিল হয়, কহেন?

ঠিকই তো, পাকবাহিনী ঠাকুরগাঁওয়ের এই স্থানীয় সাহসী আর প্রগতিবাদী যুবক বন্ডিউলকে হাতের নাগালে পেলে অবশ্যই ছাড়ে না। তবুও বলি, আপনি একজন বিখ্যাত সাইকেলিং।

— আরে রাখেন আপনার সাইকেলিং! ধরা পড়িলে আমি যে একজন সাইকেলিং সেইটা কহিবার সময় দিলাহে কেও কেনেছি আমার বাড়ি হামলা করে সবকিছু লুটপাট করে হেনে নিয়া গেছে। বাড়ির সব জিলায় দিছে। মা-ভাই-বোন কুন্ঠে আছে কহিবা পারি না।

বন্ডিউল এরপর কথায় বিরাত দিয়ে চায়ের অর্ডার দিতে বাইরে যায়। কিছুক্ষণের মধ্যে ফিরে এসে উত্তেজিতভাবে বলে, দেশ স্বাধীন হইলে মোক একটা সুযোগ দিবাই হবে।

— কী সেটা?

— তমিজউদ্দিন মাওলানার ওপর প্রতিশোধ। এ শালা জামাতের বাঢ়া, দালাল আমার বাড়ি ঘর জ্বালায়-গোড়ায় ছাবরখার করে দিছে। একটা সুযোগ, বুঝিলেন মাহবুব ভাই, দেশটা স্বাধীন হলে, খালি একটা সুযোগ মোক দিবাই হবে।

মনের গভীরে জমিয়ে রাখা পুঁজীতৃত ক্ষোভ আর ঘৃণা ফেটে বের হয় তুক্ত আক্রোশ নিয়ে বন্ডিউলের মুখ থেকে। রীতিমতো একটা ক্ষাপাটে ভাব ফুঠে ওঠে তার চোখে-মুখে। আমরা কিছু বলি না। চা আসে। চা নিই। চায়ে চমুক দেয়ার ফাঁকে ফাঁকে বন্ডিউলের মনমেজাজ আবার ঠাণ্ডা হয়ে আসে আগের মতো।

তখন তাকে বলি, এখানে কী করছেন?

— পার্টির কাজ। এই অফিসে থাকি। দফতরের কাজটাজ দেখি। আর সুযোগ পেলেই সাইকেল নিয়ে শো করে বেড়াই।

— বাঃ চমৎকার! এখানে এসেও তাহলে সাইকেল ছাড়েন নাই?

— কী করে ছাড়ি কহেন? এদিকের যা হাতাকার অবস্থা। ‘জয় বাংলার সাইকেলিং’ এই সাইনবোর্ড লাগিয়ে হলদিবাড়ি-জলপাইগুড়ির বিভিন্ন স্কুলে শো করি। এতে করে বেশ আয়টায় হয়। তাই দিয়েই তো চালাঞ্চি নিজের খরচা, পার্টির খরচা, মানুষকে সাহায্যও করছি এই পয়সা থেকেই। বসে থাকিলে তো আর পেট চলিবে নাই। আপনারা যুদ্ধ করছেন ফ্রন্টে। আমি তো যুদ্ধে যাইতে পারি নাই। আমার তো হাতিয়ার নাই। সাইকেলটাই আমার সহল। কিছু-না-কিছু করে বাঁচিবাতো হবে, মানুষদের বাঁচাতে হবে।

চমৎকৃত হবার দশা হয় বিদিউলের কথা মনে। এপারে এসেও তার নিজের সাইকেল চালানোর বিদ্যার কলাকৌশল দেখিয়ে পরোক্ষভাবে হলো মুক্তিযুদ্ধে তার অমূল্য অবদান রেখে যাচ্ছে। এটাকে অঙ্গীকার বা খাটো করে দেখবার কোনো অবকাশ নেই। মনে মনে তাই বলি, বিদিউল, আপনার মুক্তিযুদ্ধে যাওয়ার দরকার নেই। এখন সামনে-পেছনে সব দিকেই আমাদের যুদ্ধের ফ্রন্ট। আপনি পেছনের ফ্রন্টে যুদ্ধ করছেন। চালিয়ে যান এই যুদ্ধ। আমরা রয়েছি সামনের ফ্রন্টে। তবে দেশ মুক্ত হলে দালাল তমিজউদ্দিন মওলানার হোঁজে আমরাও থাকবো আপনার সাথে, যদি সেদিন বেঁচে থাকি।

কমরেড রউফ আর ন্যাপের লুৎফুর এসে জোটেন অফিসে। রউফ যেনে আরো বিমর্শ হয়ে পড়েছেন। লুৎফুর রয়েছেন আগের মতোই। নানা ধরনের সীমাহীন সব সমস্যার কথা বলে চলেন তিনি একনাগাড়ে। তাঁকে দেখে মনে পড়ে শীঘ্ৰ কালিয়াগঞ্জের যুদ্ধের কথা। শুক্রপক্ষের সাথে প্রচণ্ড গুলি বিনিময়ের ভেতরে লুৎফুর গ্রামে যাচ্ছেন নদীর তীরের দিকে। হাতে তাঁর গামছায় বাঁধা ঘেনেডের পুটিলি। দুর্কণ্ঠ উত্তেজিত গলায় তিনি একনাগাড়ে ঢিঁকাকার করে যাচ্ছেন ছেলেদের গুলি ছেঁড়ার সন্ধিশাপনা দিয়ে।

তাদের দু'জনের সাথে কুশল বিনিয়ম সহ্য। অনেকদিন পর একসাথে হয়েছি আমরা। ব্যাপারটা অনেকখানি অভাবিত তাদের সাহে। তারা যে আমাদের পেয়ে ঝুশি হয়েছেন, সেটা প্রকাশে কোনোরকম কার্পেক্ট ক্রতিম আচরণের আশ্রয় নেন না তাঁরা। দেশকালের পরিস্থিতি, রাজনৈতিক অবস্থা স্থিতিক্রন্তে যুদ্ধের অগ্রগতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা চলে।

এরি মধ্যে দেখা যায় পিন্টু আর বিদিউল দু'জন দু'জনার অন্তরঙ্গ বন্ধু বনে গেছে। মনে হয় ক্ষেত্রটা যেনে আগে থেকেই প্রস্তুত হয়েই ছিলো। কেবল দু'জনার সাথে দু'জনার দেখা হয় নি এই যা। দেখা হতেই সময়না দু'জনই পৌছে গেছে একজন আরেকজনের হসয়ের নৈকট্যে। আসলে বহুতা বুঝি এরকমভাবেই হয়। কিছুক্ষণ আগেও পিন্টু আর বিদিউল কেউ কাউকে চিনতো না। অথচ এই এখন, সামান্যক্ষণের আলাপেই দুই উজ্জ্বল ঝকঝকে যুবক একেবাবে অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়ে গেছে।

খোলো খোলো ধার

বিদিউল আর রউফের কাছ থেকে বিদ্যায় নিই একসময়। লুৎফুর থাকেন আমাদের সাথে। তিনি গাইড করে নিয়ে যাবেন আমাদের মন্টুদের আস্তানায়। মন্টু এখনও সেখানেই আছে।

প্রায় ঘণ্টাখানেক হাঁটতে হয়। বাংলাদেশের সীমানায় ভোলাবাবু নামে সেই ভদ্রলোকের বাড়িতে মন্টুদের অস্থায়ী আস্তানার খোজ মেলে। অবাক ব্যাপার, জব্বার ভাইও সংসাৱ পেতেছে এখানে। আহিদারকেও এখানে উপস্থিত পাওয়া যায়। জব্বার ভাই রীতিমতো হৈ-চৈ শুরু করে দেন আমাদের পেয়ে। এতোটুকু অদলবদল হয় নি তাঁর আচার-আচরণে।

আমাদের সেই একই আদি ও অক্তিম জবাব ভাই আগের মতোই আছেন। আমাদের দুঃজনকে হাত ধরে টেনে নিয়ে যান তাঁর স্ত্রী লাইলির কাছে। তাকে শুনিয়ে শুনিয়ে তিনি বলতে থাকেন, এই দ্যাখো কারা আইসছে। মাহবুব, পিটু। মোর কথা তোমার বিশ্বাস হয় নাই, কইহিনু না খবর পাইলে ওমরা না আইসি পাইবার নয়।

তাঁর স্ত্রী লাইলি বান্না করছিলেন। মুখে কিছুটা লাজুক হাসি টেনে তিনি শাড়ির আঁচলে হাত মুছতে মুছতে বাইরে বেরিয়ে আসেন। আমাদের জবাব ভাইয়ের লাইলিকে দেখবার সুযোগ হয় তখন। টানা টানা চোখের দীপ্তিময় কমনীয় অবস্থারে অধিকারিণী তিনি। তাঁর বাকমকে সুঠাম শরীরও চোখে পড়বার মতো। গায়ের শ্যামলা রং শারীরিক গঠন কাঠামোর সঙ্গে মানিয়ে গেছে চমৎকারভাবে।

জবাব আশ্রয় নিয়েছে একটা গোয়ালঘরে। তবে সেটা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করেই। একটা বড় টিনের ছাপড়ায় মটুর পরিবারের আস্তানা।

লিজা দেখামাত্রই বলে ওঠে, এতেদিনে সময় হলো? সেই যে এখানে রেখে চলে গেলেন, আর খোঝ নেবার কথা মনে হলো না! গলায় ফুটে ওঠে তাঁর বীতিমতো অভিযোগ।

— সময় পাই নি, একথা বলা ছাড়া লিজার এ অভিযোগের আর কোনো যৌক্তিক জবাব মুখে যোগায় না আপাতত। যেনেড নানা পেছনে থেকে বলে ওঠেন, কিহে নাতি মোর সিগারেট আনিছিস? এতেদিনে বুঝি সময় হইল তুমহার হৃষ্টাঙ্গ নানাক্ষণ্ড দেখিবা আসিবার!

বৃংজ তেমনি আছেন। সদাই হাসিমুখি দিলখোলা ব্রহ্মকৃতায় টাইটস্মুর মানুষ। পাকবাহিনী তাঁর সমস্ত বাড়িঘর জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে তাঁকে একেবারে নিঃশ্ব আর কর্পুরকশূন্য করে ফেলে দিলেও তাঁর এই হাসিমুখ আর প্রাণখোলা ক্লিনিক মনটি এখনো তিনি কীভাবে অক্ষণ্ম রেখেছেন, সেটা একটা দারুণ বিশ্বাসকর রহস্য।

মন্তু সংস্কৃত কাছেপিঠেই ছিল। হৃষ্টাঙ্গ হয়ে আসেন তিনি। এসেই গলা জড়াজড়ি, কুশল বিনিয়ম। মুহূর্তের ভেতরে এক পিটুর আবেগঘন পরিবেশ সৃষ্টি করে ফেললেন তিনি। হঁকড়াক করে বসার আয়োজন করে খাওয়ার এন্তেজাম ইত্যাদি নিয়ে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েন কমরেড মন্তু।

আহিদার এখানেও সবার তত্ত্ব-তালাশে ব্যস্তসমস্ত। মনে মনে বলি, যার যেটা স্বত্বাব। আহিদারের স্বত্বাব মরলেও যাবে না।

এর কিছুক্ষণ পর ঘরের মেঝের ওপর মাদুর পেতে চমৎকার একটা আসর বসে যায়। লিজা বলে, আমরা পিটু মামার গান শনবো। প্রস্তাবটা কানে যেতেই সপ্রতিভ পিটু যেনে কিছুটা লজ্জারাঙ্গা হয়ে যায়। কিন্তু যা ওর স্বত্বাবে নেই সেটা ধরে রাখতে পারবে কেনো ও? স্বত্বাবতই কিছুক্ষণের মধ্যে স্বরপে ফিরে আসে সে।

তারপর বলে, আমি তো রাস্তার গায়ক। খোলা আকাশের নিচ ছাড়া তো আমার গান গলা থেকে বেরোয় না। কী গান গাইবো বলেন?

— গান, যা আপনার খুশি।

পিটু তখন আমার দিকে তাকিয়ে গলা নিচু করে বলে, মনু, মাহবুব ভাই, এলা এ্যামাক কি গান শনাও কনতো?

— ধরে ফেলো তোমার যা খুশি বলে পিটুকে উঞ্চে দিই। উৎসাহ পেয়ে ও তখন গান ধরে, ‘খোলো খোলো দ্বার...’।

পিন্টুর দরাজ গলার গান ভেসে বেড়ায় বাংলাদেশের সীমান্ত সংলগ্ন এই নিভৃত পল্লীর আকাশ-বাতাস জুড়ে। রণক্ষেত্র এখান থেকে অনেক দূরে। সবকিছু হারিয়ে দেশ থেকে পালিয়ে আসা একদল ভেঙেপাড়া মানুষের অন্তরঙ্গ সান্নিধ্যে বসে পিন্টু গান শেয়ে চলে তার নিজস্ব গায়কি ভঙিতে। সবাই বসে থাকে নীরবে। তন্ময় হয়ে শোনে তার গান। সামান্যক্ষণের জন্য হলেও সবাই ভুলে যায় তাদের সমস্ত অভাব-অন্টন, দৃঢ়-দৈন্য আর সবকিছু হারানোর বেদনাকে।

৩. ১১. ৭১

সেই পুরাতন পথ, পুরাতন মানুষ

নালাগঞ্জ ফিরতে রাত ঘটা হয়ে যায়। ছেলেরা সব তৈরি হয়েই ছিলো। চৌধুরীকে ত্রিফিং দিয়ে রওনা করিয়ে দিই বসির মেঘারের বাড়ি মধুপাড়ার দিকে। নিজেরা তৈরি হয়ে রওনা দিই শুয়াবাড়ির উদ্দেশ্যে রাত নটার দিকে। সেখানে হাইড আউট স্থাপনের জন্য ছেলেদের রেশন আর গোলাবারুদ আলাদাভাবে শুষিয়ে নিয়েছে একরামুল। বকরও যাবে এ যাত্রায় আমাদের সাথে। হেড কোয়ার্টারের দায়িত্বে থাকবে মিনহাজ। বকরকে নালাগঞ্জ হেড কোয়ার্টার দলের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে, কিন্তু এলাকাটা তার সম্পূর্ণ অচেনা। তাই এলাকাটা সম্পর্কে সম্যক ধারণা দেয়ার জন্য বকরকেও সঙ্গে নেয়া হয়েছে। পিন্টু সেজ্জেছে। সে এখন অনেক নির্ভর আর দায়িত্বমুক্ত। সেই প্রথম দিনগুলোয় পিন্টু যেনো কিছু প্রোগ্রামে তার নিজের মধ্যে।

আকাশে বড় চাঁদ। চারদিকে ফুটফুটে আলো। একেবারে কাক জ্যোত্রা যাকে বলে, তাই। শীতের আমেজ বর্তমান, তবে তার অন্তর্ভুক্ত ততো তীব্র নয়। পায়ের নিচে শিশির ভেজা ঘাস। এই রকম পরিবেশ এগিয়ে ছেলেটাও জনের একটা দল।

ভেতরগড়ের সেই পুরনো রাস্তা, গোকাপাড়ার গড়ে এসে কিছুক্ষণের বিরতি। ডানে গড়ের নিচে গোলাম গড়সের কমুকুল গান ভাই নিজে দাঁড়িয়ে থেকে কবরটা বাঁধিয়েছেন। গড়সের বাঁধানো কবরের ধারে ঘুঁঝে হয় নি। এবার হয়তো হবে।

এখানে এলেই গাটা কেমন শিরশিরিয়ে ওঠে। গড়স্টা কীভাবে মরে গেলো! হারিয়ে গেলো আমাদের ভেতর থেকে। এখন ওর পাকা কবরটাই শুধু শৃতি হয়ে রয়েছে আমাদের সামনে। নতুন ছেলেদের অনেকেই দেখে নি গড়সকে। কিন্তু তার গল্প শনেছে বহুবার বহুভাবে। গড়স মরে গিয়ে আজ বীরের র্যাদায় আসীন সবারই মনের মধ্যে। নতুনেরা যৌক তোলে তারা গড়সের কবরটা একবার দেখে বলে। একরামুল নিয়ে চলে তাদের গড়ের ওপর থেকে অবস্থান্তা সেখানোর জন্য।

ওরা দল বেঁধে যায়। পিন্টুসহ আমরা ক'জন বসে থাকি লো মাথা তোলা ঘাসের পাশে। ঘাস থেকে লেবু পাতার গন্ধ ম-ম করে ভেসে বেড়ায় আমাদের চারপাশ জুড়ে। বাঁ দিকে পরিত্যক্ত ধৰ্মস্থানে চোকাপাড়া ক্যাম্প। গাছগাছালির অক্ষকার কেমন ভুতুড়ে একটা পরিবেশ সেখানকার। চারদিকে নীরব সুনসান। চাঁদের আলোয় সমুখবর্তী গাছপালা কেমন চকচকে দেখায়।

এখানে এলেই সবাই যেনো আপনা থেকে কেমন চৃপ্তাপ হয়ে যায়। কথা বলতে চায় না কেউই। মনে হয় কথা বললেই সেই বিষণ্ণ সন্ধ্যাটির আবির্জন ঘটবে আবার। সেই হাহাকারদীর্ঘ দিনটি যেনো চলে আসবে সামনে। জীবনন্দ দাশের 'কে হায় হৃদয় খুঁড়ে

বেদনা জাগাতে ভালোবাসে'-এই উক্তির কথা ক'টি মনে রেখে কেউ আর যেনো সেই বেদনবিধুর দিনটির কথা মনে তুলতে চায় না। চায় না স্বরণে আনতে গোলাম গড়সের সেই ট্রাঙ্জিক মৃত্যুর কথা।

ছেলেরা ফিরে এলে উঠতে হয়। এবার ভেতরগড় মতিনের বাড়ি। শীতিমতো হৈচে কাও বাঁধিয়ে ফেলে মতিন আর তার বাপ-চাচারা। এভাবে আমাদের পুনরাবৰ্জিব তাদের বাড়ির সামনে, এটা তাদের কাছে এক আনন্দজনক বিষয়। মতিনের মা তার নোলক দুলিয়ে ছুটে আসেন মৃত্যুমৌলি মায়ের এক প্রকৃত রংপ নিয়ে। শরীরে হাতের পরশ বুলিয়ে তিনি যেনো পরশ করে নিতে চান আমরা সুস্থ দেহে রয়েছি কি না। ছেলেরা বাইরে থাকে। মতিন নিয়ে যায় আমাকে আর পিন্টুকে ভেতরে। বকর বাবুসহ আরো ক'জন আসে আমাদের পিছু পিছু। মতিনের বউয়ের মুখে হসির বিলিক। এ হসি যেনো চাঁদের হাসিকেও হার মানায়। কম বয়সী উজ্জ্বল বউটি ব্যক্তসমষ্ট ছোটছুটি করে অতিথিদের আপ্যায়নের যোগাড়যন্ত্রের কাজে।

মতিনের ঘরে বসে পিন্টু ডায়লগ ঝাড়তে থাকে, শালা এই ঘরোত্তম থাকিয়া হামরা একদিন ধরা পইড়বাব ধইরছিলো। শাড়ি পরিয়া পলেয়া বাঁচছি সেদিন।

তার কথার ভঙ্গিতে হেসে ফেলে বলি, মনে আছে তোমার সেদিনকার ঘটনা?

— থাকবে না মানে! আপনা বাঁচলে বলে বাপের নাম। যেমের মতো ঘিরি ধইরছিলো খানেরা ঘরবাড়ির চাইরপাশে। মতিনের মা আর বউ পার কুকুর না দিলেতো কেহু ফতে হয়া গেইছিলো সেদিন।

মতিন একবার বাইরে যায়, একবার ভেতরে আসে। তার দিকে তাকিয়ে পিন্টু বলে, গ্যাই মতিন ভূতি দে!

মতিন কিছুটা হতচকিত হয়ে দাঁড়ায়। এক্ষেত্রে তখন ধমকে ওঠে, শালা ভূতি ভুলি গেইছো; মতি বিড়ি আন, মতি বিড়ি। যুৎ করি ক্ষণে দম দেই।

মতিন বিছানা ওলোটপালোট ক্ষেত্রে তখন বিড়ির প্যাকেট বের করে এনে দেয়। এরপর চলতে থাকে প্রত্যেকের ধূম উন্মুক্তিশীলের পালা।

আধা ঘণ্টার মধ্যে ৫০ জন ছেলের জন্য নাস্তা তৈরি করে ফেলে এরা। চিড়া ভাজা, মুড়ি আর গুড়। সেই সাথে জেজপাতা মেশানো গুড়ের চাও পরিবেশিত হয়। মধ্যরাতে এ আতিথেয়তার তুলনা সত্ত্বাই বিরল। সামান্য আপ্যায়নের ব্যবস্থা। কিন্তু আন্তরিকতা আর মহত্বার ছোয়ায় সেটা যেনো অমৃত সমান হয়ে ওঠে।

মতিন রিপোর্ট দেয় এখানকার সর্বশেষ পরিস্থিতির ওপর। পাকসেনারা অনেকদিন আর আসে নি এদিকে। আর আসবার সাহসও হয়তো ওদের নেই। ধরা যায় সমস্ত ভেতরগড়টাই এখন মুক্তাধ্বল। এখন স্বাধীনতার বিরোধী একটা লোকও ঝুঁজে পাওয়া ভার এন্দিকাটয়। লোকজন অনেক নিরাপদ আর নির্ভয় এখন। মাঝে মাঝে ডাকাতির উপদ্রব হয়, কিন্তু এখন আর হবে না, যেহেতু আপনারা আসি গেছেন। এভাবেই মতিন তার মতামত জানায়।

মতিনদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে হাজির হই মকতু মিয়াদের গ্রামে। বৃক্ষ হাজি সাহেব আগের মতোই স্বাগত জানান। ওখানকার খবরাখবর পরিবেশন করেন বিশ্বারিতভাবে। মকতু মিয়া সঙ্গ নেয় আমাদের।

ডানে মহারাজী দিয়ি। মহারাজ হাট পেছনে ফেলে এগিয়ে যাই আমরা সুপরিচিত রাস্তা ধরে। ভেতরগড় ল্লাকায় সবকিছুই এখন বলতে গেলে আমাদের নথদপ্রণে। এর রাস্তাধাট,

অলিগলি মায় রাস্তার বাঁক পর্যন্ত, চোখ বন্ধ করেই এখন বলে দিতে পারি কোথায় কি রয়েছে। কোথায় রাস্তা বাঁক নিয়েছে, আলপথ নেমে গেছে কোথা দিয়ে। পরিয়ক্ত ফুলবাড়ি বি.ও.পিটা পাওয়া যায় রাস্তার ডানে। আর সামান্য এগুলৈই গড়। গড়টা পার হলেই ওপারে এক মাইলের মধ্যে ভাটপাড়া ক্যাম্প, জলুরি বাজার রাখালদার বাড়ি। প্রথম দিন ভাটপাড়া থেকে এই পথে ভেতরগড় অনুপবেশের ঘটনাবহুল রাতটার কথা মনে পড়ে। কি একটা অজ্ঞান অস্ত্র রাত ছিলো সেটা। এই বি.ও.পির সামনে এসেই মনে হয়েছিল পেছন থেকে শক্ত সেনার গাড়ি এসে ঝাপিয়ে পড়লো বুঝি গায়ের ওপর। সে এক বেসামাল অবস্থা সবার।

প্রথম রাতটা আজকের মতো নির্ভর আর নিরুদ্ধেগ ছিলো না। সে রাতে পদে পদে ছিলো অজ্ঞান আশঙ্কায় ভরা, ছিলো শক্তির ভয়, মানুষের ভয়, ছিলো প্রত্যেকের মনের গভীর চাপ আর মৃত্যুর ভয়। সেদিনগুলো কীভাবে পার হয়ে গেলো! জুলাই থেকে নভেম্বর। অনেকগুলো দিন। এর মধ্যে কীভাবে একটু একটু করে এগিয়ে আমরা এ এলাকার সমস্ত মানুষজনকে জয় করে ফেললাম, কীভাবে সমস্ত এলাকার রাস্তাখাট আর বসতিগুলোর নাম-নিশানা মুখস্থ করে ফেললাম, ভাবতেই অবাক লাগে। এ এলাকাটা একেবারেই মুকুটগুল হয়ে গেলো। এখন চলতিপথগুলো যেমন নিরুদ্ধেগ এবং নিষ্ঠাটিক, তেমনি প্রতিটি বসতিই যেনো এখানকার আপন বাড়িঘর হয়ে গেছে। মুক্তিযুদ্ধের এই সহয়টায় আমরা এগিয়েছি অনেক দূর, সদ্বেষ নেই। এটাকে ধরে রেখে হয়তো আমরা আরো এগিয়ে যেতে পারবো। আজাদের ইঙ্গিত স্বাধীনতার কাছে।

গুয়াবাড়ি পৌছুতে মধ্যরাত পার হয়ে যায়। জেলাটি আলীর বাড়িতে থাকবার কথা নয়। কিন্তু তাকে পাওয়া যাব বাড়িতেই। আজাদের ক্ষেত্রে পেয়ে সে অরোর কান্নায় ভেড়ে পড়ে। তার বাপ-ভাইয়েরাও অংশ নেয় কান্নাকাম্পিতে। গভীর হতাশা থেকে উত্তরণের পথ খুঁজে পাবার জন্যই যেনো তাদের এই আনন্দ জীব হস্তির কান্না।

বাইরের একটা এবং ভেতরের পুঁতী ঘর ছেড়ে দেয় তারা। বকর আর একরামুল মিলে সবকিছু গোছগাছ করতে থাকেন। বাইরের খোলা চতুরে মাটির ওপর পাতা মাদুরে গঁজেসঁজে কাটিয়ে দিই আমরা বাকি রাতটা।

৪. ৩১: ৭৩

অতিথি পাখি

সকালের ভেতরেই হাইড আউট গুচ্ছিয়ে নেয়া হয়। একরামুল জোনাব আলীর স্তীর সাথে তাবি সম্পর্ক পাতিয়ে নিয়েছে এরি মধ্যে। তার এবং অন্য মহিলাদের সাহায্যে ভেতরবাড়িতে লঙ্গরখানার ব্যবস্থা করে ফেলেছে চমৎকারভাবে। এ বাড়ির লোকজন আর বউ-বিবা সবাই অতিপরিচিত পরম আস্থায়ের মতো। নিজেদের বাড়িঘর বলে সহজস্বচ্ছদ্যের একটা ছাপ সর্বত্র বিবাজমান। বাড়ির লাগোয়া উত্তর পাশে একটা বড়ো ধরনের বিল জাতীয় জলাশয়। সেখানে শীতকালীন অতিথি পাখিদের ভিড়। তাদের ওড়াউড়ি আর কলকাকলি সমগ্র পরিবেশটাকেই কেমন নির্ভেজাল শান্তিময় করে রেখেছে। হাজার হাজার মাইল পাড়ি দিয়ে সম্ভবত এই বিচিত্র সব বর্ণের পাখির দল এখানে এসেছে। এদেশে এখন তয়াবহ যুদ্ধ চলছে, কিন্তু তাতে প্রতিবছরের মতো অতিথি পাখিদের আগমন জোয়ার আটকে থাকে নি। যুদ্ধ মানুষকে হত্যা করতে পারে। দেশের সীমানা মানুষের স্বাভাবিক যাতায়াত বা পারাপারকে

বাধ্যাত্মক করতে পারে কিন্তু প্রকৃতির উদার নীলিমায় যাদের বসবাস, যারা প্রতিবার আসে নিজেদের ডানায় ভর করে দূর দেশ থেকে, পাহাড়-পর্বত ডিঙিয়ে, বনভূমির ওপর দিয়ে, আকাশের বুক বেয়ে, তাদের কাছে যুদ্ধই-বা কি আর দেশকালের সীমানার বাধনই-বা কি? প্রকৃতির সৃষ্টি এরা, নিজেদের মতো করেই আসে প্রতিবার, তাদের চিহ্নিত সেইসব জায়গায়, যেখানে রয়েছে তাদের জন্য অফুরান খাদ্য ভাণ্ডার। এখানে এভাবে নানা বর্ণের অতিথি পাখির ঝাঁক দেখা যাবে, তা ধারণায় ছিলো না। সকালের সোনালি আলোতে প্রকৃতির শোভার মতো পাখিদের ঝাঁক দেখে চমৎকৃত হয়ে যেতে হয়। পিন্টুর শিল্পী মন। সে বলে ওঠে, বাঃ চমৎকার! কোথা থেকে এসেছে এরা?

— সম্ভবত সাইবেরিয়া। মুঝ কঠের উত্তর আমার।

— ওরে বাইস এ্যাতোফ্লান পাখি, বন্দুকটা ধরি আইসো! এক ফায়ারে অনেকগুলান পইড়বে এ্যালা। পেছন থেকে শাজাহানের টগবগে উত্তেজিত গলা ভেসে আসে।

আমের অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে শাজাহান। আগে থেকেই ঘরোয়া বন্দুক দিয়ে পাখি শিকারের অভোস রয়েছে তার। সে প্রায় দৌড়েই ছুটে যেতে চায় বন্দুক নিয়ে বিলের ধারে। বলা যায় ধর্মক দিয়েই নিরও করতে হয় তাকে। বলি, কেনো যাবি ওদের মারতে? ওদের বিরুদ্ধে তো আমাদের যুদ্ধ নয়। বাহানুরীটা তুলে রাখ তাদের জন্য, যাদের বিরুদ্ধে আমাদের যুদ্ধ।

কথাটা শুনে শাজাহান চুপসে যায় একেবারে। পঞ্জি শিকারের উৎসাহ তার আর থাকে না।

একরামুল বকরের হাতে হাইড আউটের হাল ছেঁটে দিয়ে বাবলু মতিয়ারকে সাথে করে হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে যাই সোনারবানের পিল্টো জোনাব আলী থাকে তার বিষ্ণুত ভঙ্গ নিয়ে। পথ চলতে গিয়ে তার বলে যাওয়া প্রক্রিয়া বকর বকর তনতে হয়। জোনাব আলী এখন অনেক সাহসী মানুষ। উৎসাহ-উদ্বৃক্ষার দীপ্যমান। টগবগ করে ফুটছে যেনো তার উৎসাহের আতিশয়। আজ একে প্রথকে লাভ নেই। থামানো যাবে না। এই যুদ্ধটা নানাভাবে লঙ্ঘণ করে দিয়েছে ওদের সুখ আর শান্তিময় জীবনের ধারা। জীবন নিয়ে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াতে হয়েছে ওকে এতোদিন। ওর দুঃখকষ্টের গঁজের শেষ নেই। চলার পথে ওর বলে যাওয়া কথা আমাদের শুনতেই হয়।

সোনারবানের সেই বন্দুরা

সোনারবানের বন্দুরা রয়েছে আগের মতোই। তাদের এলাকায় স্থায়ীভাবে মুক্তিবাহিনীর থাকবার ব্যাপারটিতে তারা দারুণ উৎসাহী হয়ে ওঠে। তাদের গলায় ঝীতিমতো মিনতি, সোনারবানে হাইড আউট করতে হবে মুক্তিবাহিনীকে। জয় বাংলার জন্য এখন তৈরি সবাই। এবার আর কষ্ট হবে না আগের মতো। প্রয়োজনে গ্রামবাসী নিজেরাই এবার লড়ে যাবে খানসেনাদের সাথে। শুধু মুক্তিবাহিনী তাদের সাথে থাকলেই হবে।

অবস্থা দেখে মনে হয়, সোনারবানের মানুষ এখন চূড়ান্তভাবে তৈরি যুদ্ধের জন্য। সামান্য হতিয়ার চালানো বিদ্যা শিখিয়ে দিলেই এদের সবাইকে অন্তত যুবক, তরুণ ও যাক বয়সীদের যুদ্ধের প্রয়োজনে ব্যবহার করা যাবে। মনে মনে বলি, এই আপসহীন স্বাধীনতাপ্রেমী মানুষগুলোকে অবশ্যই কাজে লাগাতে হবে সময়মতো।

হজুরের সাথে আলোচনা হয় বিস্তারিতভাবে। তিনি এই এলাকার মানুষজনকে আগলে

ରେଖେଛେ ବୁକ ଦିଯେ । ତାର ସାହସର ଓ ପର ତର କରେ ଟିକେ ଆହେ ଏହି ଏଲାକାର ମାନୁଷଙ୍ଗୋ । ହଜୁର ଯେଣେ ସବାର ମଧ୍ୟେ ଏକଟା ପ୍ରବଳ ଉଦ୍ଦିପକ ଶକ୍ତି ହିସେବେ କାଜ କରେ ଚଲେଛେ । ଡରାଟ ହାତ୍ୟା, ବୁକ ସମାନ ଦାଡ଼ି, ମାଥାଯି ଗୋଲ ସାଦା ଟୁପି, ସୌମ୍ୟ ଦର୍ଶନ ସର୍ବତ୍ୟାଗୀ ଦରବେଶ ଧରନେର ଏହି ମାନୁଷଟିର ମଧ୍ୟେ ଏମନ ଏକଟା କିଛୁ ରଯେଛେ, ଯା ଦିଯେ ତିନି ସବାଇକେ ଆକର୍ଷଣ କରେନ ।

ମାଲେକ ଦିଯେ ମତିକେ ଡେକେ ଆନେ । ତାଲମା ପାଡ଼େର ଅସୀମ ସାହସୀ ଯୁବକ ମତି ଗଡ଼ଗଡ଼ କରେ ବଲେ ଯାଯ ଜଗଦଲହାଟ-ଅମରଖାନ-ଗନ୍ଧଗଡ଼ ଏଲାକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିର ବିବରଣ । ମେ ତାର ବିବରଣେ ଏଓ ଜାନାଯ ଦେଓୟାନହାଟେ ରାଜାକାରଦେର ଏକଟି ଘାଟି ଗଢ଼େ ତୋଳାର ଚେଟା କରା ହଛେ । ତବେ ତାରା ଏଥେଣେ ମଜବୁତ ହୁୟେ ବସନ୍ତେ ପାରେ ନି । ସଂଖ୍ୟାୟ ତାରା ୧୫/୨୦ ଜନେର ମତୋ ହବେ ।

ଦେଓୟାନହାଟେ ରାଜାକାରର ଦଲ ଘାଟି ଗାଡ଼ବାର ବ୍ୟବହାର କରିଛେ, ଏ ଖବରଟା ଚିନ୍ତା ଫେଲେ ଦେଯ । ମତିକେ ଡେକେ ଆର କିଛୁକଣ ଏ ବ୍ୟାପାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତ ବଲେ ବିଦାଯ ନିହି । ଫିରିତି ପଥେ ବାରବାର ଘୁରେ ଘୁରେ ଆସେ ଦେଓୟାନହାଟେ ରାଜାକାରଦେର ଆସାର ବ୍ୟାପାରଟା । ଜାହଗାଟା କୌଶଳଗତ ଦିକ ଦିଯେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକର୍ତ୍ତପୂର୍ଣ୍ଣ । ଓଟାର ଓପର ଦିଯେ ରାତା ଧରେ ପୌଛେ ଯାଓୟା ଯାଯ ଶିଙ୍ଗପାଡ଼ା । ଆର ଶିଙ୍ଗପାଡ଼ା ପୌଛୁତେ ପାରଲେ ସୋଜାସୁଜି ୨/୩ ମାଇଲେର ମଧ୍ୟେ ପଞ୍ଚଗଡ଼ ସି.ଓ. ଅଫିସ । ଅନ୍ଦ୍ର ଭବିଷ୍ୟତେ ପଞ୍ଚଗଡ଼େର ଓପର ଆଘାତ ହାନତେ ହଲେ ଏ ପଥଟାଇ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତେ ହବେ । ସୁତରାଂ ଓଟାକେ ନିଷ୍ଠକ ରାଖିତେଇ ହବେ ସେ-କୋନୋ ଉପାୟେଇ ହୋକ ।

ଧୃତ ରାଜାକାର ଏବଂ ଜେଣେ ଝଟା ମାନୁଷ

ପିନ୍ଟିର ସାଥେ ଆଲୋଚନା କରେ ଚଲତି ପଥେଇ ସିନ୍ଧୁର ଦେଇ ଫେଲି, ଆଜ ରାତର ଅପାରେଶନ ଦେଓୟାନହାଟେ । ସନ୍ଧ୍ୟାର ମଧ୍ୟେ ଦଲ ସାଜିଯେ ଦେଖି ହେଁ । ୨୦ ଜନେର ଦଲ । ସବାଇକେ ବାଇରେ ଚଢ଼ିରେ ଦାଢ଼ କରିଯେ ବ୍ରିଫିଂ ଦେଯା ହୁଁ । ଆଜି ପ୍ରକାମବାରେ ମତୋ ମୁଖୋମୁଖୀ ହବୋ ଆମରା ଏକକ ରାଜାକାର ଦଲେର ସାଥେ । ଜାହଗାଟା ଶକ୍ତ ପ୍ରକାର ଅନେକ ଗଭିରେ । ପଞ୍ଚଗଡ଼େର କାହାକାହି ଥାଯ । ରାଜାକାରରା ଅବସ୍ଥାଇ ଶକ୍ତ ବାଧାର ପ୍ରକାଶିଦାଢ଼ କରାବେ । କିନ୍ତୁ ସୋଟା ଛିନ୍ନ କରନ୍ତେ ହବେ ଆମାଦେର । ରାଜାକାର ପାକସେନା ନଥ । ଏକଳକୁଟୁମ୍ବୋଗ ସଙ୍କାଳୀ ଏଦେଶୀୟ ଲୋଭୀ ମାନୁଷ ତାରା । ଯାଦେର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟାଇ ହଛେ ମାନୁଷଜନକେ ଭୟ-ଭୀତିର ମଧ୍ୟେ ରାଖା, ତାଦେର ସହାୟ-ସମ୍ପତ୍ତି ଲୁଟପାଟ କରା ଆର ଗ୍ରାମେର ମା-ବୋନଦେର ଇଞ୍ଜରେ ଓପର ହାମଲା କରା । ରାଜାକାରରା ସତ୍ୟକାରଭାବେ ସେଥାନେ ଘାଟି ଦେଡ଼େ ବସେ ଥାକଲେ, ସରାସରି ଚଢ଼ାଓ ହୁୟେ ତାଦେର ସମ୍ମୁଲେ ବିନାଶ କରାଇ ହଛେ ଆମାଦେର ଆଜକେର ରାତର ଅପାରେଶନରେ ପ୍ରଧାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ । ପ୍ରତ୍ୟୋକକେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣି ଆର ହେନେନ୍ତ ନିତେ ବଲା ହୁଁ ।

ରାତ ବାରୋଟାର ହାମଲାୟ ସମୟ ନିର୍ଧାରଣ କରେ ୯୮୮ ଦିକେ ଗୁର୍ବାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ସଦଲବଲେ ।

ସୋନାରବାନେ ହଜୁରେ ବୈଠକଘରେ କିଛୁକଣେର ଜନ୍ୟ ବିରାତି । ହଜୁର ସେଇ ପୁରନୋ ପ୍ରଥାୟ କେରୋସିନ କୁକାର ଜୁଲିଯେ ଚା ତୈରି କରେ ପରିବେଶନ କରେନ । ବିଦାଯ ବେଲାର ସବାର ଜନ୍ୟ ମନ ଶୁଲେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରେନ ତିନି ।

ତାଲମା ନଦୀତେ ଏବଂ ହାଁଟୁର ଓପରେ ପାନି । ଚାଦେର ଆଲୋ ନଦୀର ତଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖା ଯାଇ । ମେଥାନେ ଚକଚକ କରିଛେ ଇଲିଶେର ଶରୀରେ ମତୋ ବାଲୁର ଆନ୍ତରଣ । ନଦୀର ପାନି ବେଶ ଗରମ । ଲୁଙ୍ଗଟୁଙ୍ଗି ଭିଜେ ଯାଯ ନଦୀ ପାର ହତେ ଶିଯେ ।

ମତିକେ ଓର ବାଡ଼ି ଥେକେ ଡେକେ ନେବ୍ଯା ହୁୟେଛେ । ମତିର ମତୋ ଯୁବକଦେର ଜନ୍ୟ ଗୃହକୋଣ ମାନ୍ୟନା । ଏରା ସବ ସମୟ ଉଦ୍ୟମୀ-ସାହସୀ, କାଜେ ଝାପିଯେ ପଡ଼ାର ଜନ୍ୟ ଯେଣେ ତୈରିଇ ଥାକେ । ମନେ ହୁଁ, ଏରାଇ ଆସିଲେ ଯୋନ୍ଧା । ଯୁଦ୍ଧର ଜନ୍ୟାଇ ଏଦେର ଜନ୍ୟ । ମତିକେ ବୁବିଯେ ବଲତେଇ ମେ ତାର ନିଜେର

মতো করে দলটিকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে থাকে আমাদের লক্ষ্য দেওয়ানহাটের দিকে।

নির্জন-নিরবিলি সুনসান রাত। আকাশে প্রায় পূর্ণ চাঁদের নরম আলোয় আমাদের চলার পথ পরিষ্কার দেখা যায়। দূর ও কাছের জনবসতিগুলো যেনো বিভোর সুমে। জ্যোৎস্নার আলোতে চারদিককার পরিবেশ ঘকঘকে মায়াময়। বাতাসে শীতের মধু পরশ থাকলেও দ্রুত পথ চলায় এবং নার্তের উপর অপারেশনের চাপ থাকায় শরীর এর মধ্যে গরম হয়ে উঠেছে। শরীরে শীতের কামড় লাগবার অবকাশ পায় না। অমরখানা ঘাঁটিও এখন ঘুষ্ট। তবে জেগে উঠবে রাতের যে-কোনো সময়। রাতের গৃন্থিমাফিক যুদ্ধ শুরু হবে সেখানে। এ কৃটিন ভাঙ্গে নি একটি দিনের জন্যও। আজও ভঙ্গবে না।

চাঁদের আলোয় আমাদের চলমান ছায়াগুলো যে কোনো সময় শক্তর লক্ষ্যবস্তুর শিকার হতে পারে। সে সজ্ঞাবনা একেবারেই উড়িয়ে দেয়া যায় না। শক্ত কোথায় ঘাপটি মেরে পড়ে আছে বুঝবার উপায় নেই।

কেবল দুটো জায়গায় বিরতি ছাড়া একনাগাড়ে হাঁটতে হয়েছে আমাদের। পেছনে ফেলে এসেছি মধুপাড়া গ্রাম। ডানদিকে জগদলহাট গ্রামও ছাড়িয়ে আসা হয়েছে। ইউনিয়ন বোর্ডের ছেট একটা কাঁচা রাস্তা ধরে হাঁটছি আমরা। মতি এ পথে নানা আঁকাৰাকা ঘূরিয়ে অবশেষে এক জায়গায় আমাদের নিয়ে এসে থামে। সামনে ইশারা করে দেখায় আবছায়া ঘরগুলোর অবস্থানের দিকে। আর মুখে বলে, ওটাই দেখুনভুট। দূরত্ব হবে প্রায় চারশো গজ। সামনে ধূ-ধূ খোলা প্রান্তির। ওখানে যেতে হলে এই খোলা জায়গা দিয়েই যেতে হবে।

পরামর্শের জন্য বসে পড়ি আমরা রাস্তার ধূপরেই। ছেলেরা রাস্তার দু'পাশে মুখ করে পজিশন নেয়। মতিকে জিগ্যেস করি, জায়গাটুনি অশ্পাশে বাড়িঘর আছে কি না?

সে জানায়, আছে। বাজারের পেছনেই লম্বায়া বেশ বড়ো একটা বসতি আছে।

— লোকজন কেমন? পক্ষে না রিপোর্ট? জিগ্যেস করি আবার মতিকে।

মাথা নাড়ে সে। অর্থাৎ জানে না।

মনে মনে হিসেব করে নিতু প্রশ্নার। তারপর পিন্টুকে বলি, একটা রিস্ক নিতেই হবে পিন্টু। একেবারে সরাসরি আঘাত। তুমি কিছুটা পেছনে থাকবে ৫ জনকে নিয়ে। কভার দেবে।

— ঠিক আছে বলে পিন্টু সম্মতি জানায়। একবারুল ও অন্যদের ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিই। বলি, সরাসরি রাস্তা ধরে বাজারের কাছাকাছি গিয়ে একেবারে নন্টপ ফায়ার উপেন করতে হবে। তারপর চার্জ। মাথা নেড়ে জানায়, ব্যাপারটা তারা বুবেছে। সবাইকে নিজেদের হাতিয়ারগুলো চেক করে নিতে বলি। সেফ্টি কেস অন-এ রাখতে বলি। এরপর চূড়ান্ত নির্দেশ দিয়ে বলি, অ্যাডভাস, কুইক!

একরকম দৌড়ে রাস্তাটা পার হয়ে বাজারের কাছাকাছি এসে পজিশন নিয়েই নির্দেশ দিই সবাইকে।

— ফায়ার!

একসঙ্গে ৫টা হাতিয়ার গর্জে ওঠে বাজারটা লক্ষ্য করে। আমার হাতে ধরা স্টেলগান থেকে পুরো এক ম্যাগজিন গুলি উজাড় করে দিই টানা ত্রাশ দিয়ে। ছড়ানো-ছিটানো অবস্থান থেকে ছেলেরা হাতিয়ার থেকে অনর্গল গুলিবর্ষণ চালিয়ে যেতে থাকে। বাজারের ওপার থেকে ফটাস-ফুটস করে ৩/৪ রাউন্ড রাইফেলের গুলি বর্ষিত হয়েই থেমে যায়। আর শব্দ আসে না। মনে হয়, আচিহিতে এভাবে আক্রমণের মুখে রাজাকারের দল পিছটান দিয়ে

'ভাগোয়াট' হয়েছে। প্রায় ১০ মিনিট শুলিবর্ষণের পর ছেলেদের উঠতে বলি এবং 'চার্জ'-এর নির্দেশ দিয়ে ওদের নিয়ে শুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে একদম বাজার এলাকায় ঢুকে পড়ি।

আমাদের দখলে এসে যায় বাজার। রাজাকারদের টিকিটিও সঙ্কান মেলে না। ভেগেছে। খুঁজেও তাদের কোনোরকম বাঙ্কার-টাঙ্কার পাওয়া যায় না। তবে কয়েকটা উন্মুক্ত ট্রেইন দেখা যায় বাজারের দু'পাশে। অর্থাৎ রাজাকার দলটির এখানে কোনো স্থায়ী ঘাঁটি নেই। তারা সম্ভবত তাদের মূল ঘাঁটি থেকে রাতের বেলা এখানে এসে থাকে। তাদের অস্থায়ী ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহৃত হয় এই জায়গাটা।

তন্মতন্ম করে খুঁজেও রাজাকার দলের কোনো হন্দিস পাওয়া যায় না। ঠিক এই রকম অবস্থার মুখে হঠাৎ করেই বাজার লাগোয়া বসতিটা থেকে একটা চিংকার আর শোরগোলের শব্দ ভেসে আসে। পরিষ্কার শোনা যায় একজনের গলার আওয়াজ, ধরেক ধরেক শালা পালাল গে ...।

তার মানে কেউ পালাছে এবং লোকজন তাকে ধরার চেষ্টা করছে। এগিয়ে যাই সবাইকে নিয়ে শব্দের উৎস লক্ষ্য করে। বাজারের সামান্য পেছনে রাস্তার ওপর দেখা যায় একদল মানুষের ঝটলা। কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই লোকজন হৈচে করে কথা বলতে গিয়ে সবকিছু কেমন এলোমেলো করে ফেলে। বোঝা যায় না কিছুই। তবে উত্তেজিত ক'জনকে একটা লোককে টেনে-হিচড়ে আনতে দেখা যায়। লোকগুলোকে থামতে বলি। রীতিমতো ধরকেই উঠতে হয় তাদেরকে থামাতে। জিগ্যেস করি, কী করছেন আপনারা? কাজ হয় ধরকে। ভড়কে যায় প্রথমে। তারপর একজনে বলে ওঠে, এই শালা রাজাকার পালাছিল গে, হামরা তাক ধরে ফেলাছি।

আমার বিশ্বিত হবার পালা। বলে কি নিজেরাই ধরে ফেলেছে রাজাকার! মুক্তিবাহিনীর অতর্কিত আক্রমণে দিশেছেন্ত হয়ে যখন রাজাকাররা পালাচ্ছিলো, তখন গ্রামবাসী সজবদ্ধ হয়ে তাদের একজনকে ধরে ফেলতে সমর্থ হয়েছে। মনে মনে বলি, শাবাশ! জেগে উঠছে অধিকৃত একজনের মানুষ। এরা যেনো তৈরি হয়েই ছিলো মনে-পাণে। কেবল মুক্তিবাহিনীর আগমনের অপেক্ষায় ছিলো তারা। দখলদার পাকবাহিনী আর রাজাকারদের নির্মম অত্যাচারে জরুরিত হয়ে এরা আজ মরিয়া হয়ে রূপে দাঁড়িয়েছে।

এগিয়ে গিয়ে চুল ধরে তুলি রাজাকারটাকে। টেনগানের নল দিয়ে তার পেটে উঁতো মারি। আর সেই আঘাতে কঁকিয়ে উঠে বসে পড়ে সে। তখন শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে মারি তাকে। গড়িয়ে পড়ে সে। পিন্টু এবার পেছন থেকে ছুটে এসে মাটি থেকে তুলে দাঁড় করায় রাজাকারটাকে। মারে। পড়ে যায় সে আবার। আবার তাকে তোলে। মারে। মারের মুখে আবার সে একই আচরণ করতে থাকে যন্ত্রচালিতের মতো যতোক্ষণ না তার রাগ ঠাণ্ডা হয়।

একরামুল দু'জনের সহযোগিতায় রাজাকারটার হাত পিছমোড়া করে বেঁধে ফেলে এবার। হঠাৎ এই অবস্থায় টের পাই এখনকার গোলাশুলির শব্দে জগদলহাট জেগে উঠেছে। অবরুদ্ধানাও যেনো ফুসে উঠেছে তার শক্তিমত্তা নিয়ে। লোকগুলোকে অভিনন্দিত করে বলি, খুব ভালো লাগলো আপনাদের কাজ। সাবধানে থাকবেন। সামনে এ ধরনের আরো অনেক কাজ করতে হবে। লোকগুলো আমার বক্তব্যে উৎসাহিত হয়। তাদের ভেতর থেকে একজন বলে ওঠে, তুমহারলা আসেন। আর পারিল যায় না, সহ্য হয় না ইমহারলার অত্যাচার। জয় বাংলা হামাক করিবারই হবে।

এরপর ফিরতি পথ। আমাদের সামনে খুড়িয়ে খুড়িয়ে হাঁটছে রাজাকারটা আর কঁকিয়ে

কঁকিয়ে বলছে, মোক ছাড়ে দেন গে বাপজানেরা মোর। মুই আর রাজাকারের দলোত
থাকিম নি। মুই তুমারলার সাথোত থাকিম গে ...।

— চুপ ব্যাটা! কথা বলবি তো শুলিতে শেষ করে দেবো। পিন্টু তাকে রাম ধরক দিয়ে
ওঠে। রাজাকার আর কিছু বলে না।

আজ জনগণ দাবড়ে রাজাকারটাকে ধরেছে। ধরে তুলে দিয়েছে আমাদের হাতে। যদিও
তার হাতিয়ারটা পাওয়া যায় নি। কিন্তু জ্যান রাজাকার তো পাওয়া গেছে! মনে মনে ভাবি,
জনগণ জাগছে। অধিকৃত দেশবাসী তৈরি হয়ে উঠেছে। আজ তারা নিজেদের উদ্যোগে
রাজাকার ধরেছে, কাল হয়তো একইভাবে ধরবে পাকসেনাদের। আর এ ধারা যদি তরু
হয়ে যায়, তবে কোথায় যাবে দখলদার পাকবাহিনী? এ অবস্থায় একদিন তাদের অবশ্যই
পালাতে হবে এদেশ ছেড়ে। সেদিন হয়তো আর বেশি দূরে নয়।

৪. ১১. ৭১

দিনমান বসে থাকা কিন্তু আসে না ওরা

মধুপাড়া গ্রামের অবস্থান জগদলহাটের কাছাকাছি। এ গ্রামটির নামানুসারে ‘৩-এ মধুপাড়া
কোম্পানি’ হিসেবে আমাদের কোম্পানিটির নামকরণ করা হয়েছে। কোম্পানি কর্মসূচির আমি
আর পিন্টু কোম্পানি টেয়াইসি অর্থাৎ সহকারী কোম্পানি কর্মসূচির আমি
সদরদান্ডিন সাহেবে আমাদের কাজকর্মে যথেষ্ট স্বাধীনতা দিয়েছেন। অপারেশনাল কাজে কোনো বাধ্যবাধকতা
নেই। নিয়মিত ধরাৰ্থাদা অপারেশনাল টাক্সও তিনি নিয়ন্ত্রণ করে দেন নি। তাঁর সংক্ষিপ্ত ত্রিফিং
ছিলো এরকমের যে, ইন্ট্রিঙ্গ এনিমি পজিশন প্রোজ ফার গ্র্যাজ পসিবল, ডিস্টার্ব দেম,
কিপ দেম অলওয়েজ বিজি ফ্রম দ্য বিহারুঁ অর্থাৎ শক্র এলাকার যতদূর সম্ভব গভীরে ঢুকে
তাদের আঘাত করতে হবে, তাদের স্মার্ট মাট করতে হবে এবং পেছন থেকে আঘাত করে
তাদের সব সময় ব্যস্ত রাখতে হবে।

সদরদান্ডিন সাহেবের এ রকমজো ত্রিফিং মাথায় রেখে এ পর্যায়ের গেরিলা যুদ্ধের কৌশল
ও পরিকল্পনা প্রয়োগে আমাদের মনোনিবেশ করতে হয়েছে। এ ধরনের যুদ্ধ পরিকল্পনায়
দায়দায়িত্ব অনেক বেশি। ওপর থেকে কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই, আদেশ-নির্দেশ নেই,
কোনোরকম বাধানিষেধও নেই। নিজেদের স্বাধীন যুদ্ধ পরিকল্পনায় ভুলক্ষ্টি ভালোমন্দের
দায়ভাগ সব এসে বর্তেছে আমাদের ওপর। অন্যদিকে বেশকিছু অসুবিধা ও দেখা দিয়েছে।
এখন আমাদের হেড কোয়ার্টার ভজনপুরের ত্রাক্ষণপাড়ায়। চাউলহাটিতে হেড কোয়ার্টার
ছিলো হাতের কাছে। যোগযোগের সুবিধে ছিলো, রেশন-গোলাবারুদ সরবরাহ পাবার
সুবিধা ছিলো অনেক সহজতর। এছাড়া ছিলো প্রয়োজনে জরুরি ইনফোর্মেট-এর
সুবিধা। বর্তমান হেড কোয়ার্টার থেকে এ সুবিধা পাওয়ার সম্ভাবনা কম। এ পর্যায়ের
অপারেশনে নিজেদের শক্তির ওপর নির্ভর করেই প্রোগুরি টিকে থাকতে হবে। এজন্য
যুদ্ধের পরিকল্পনা করার সময় এ দিকটাও ভেবে দেখতে হচ্ছে অত্যন্ত ভালোভাবে।

যে গ্রামটার নামে আমাদের কোম্পানির নামকরণ, সেটা আমাদের দেখা দরকার
ভালোভাবে। গ্রামটি আমাদের আগে থেকেই পরিচিত। এ গ্রামের ওপর দিয়ে যেতে-আসতে
হয়েছে অসংখ্যবার। সামনের দিনগুলোয় আরো বহুবার সেখানে আমাদের আস্তানা গাড়তে
হবে। শক্রের একেবারে নাগালের কাছে অসম্ভব বিপজ্জনক জায়গায় অবস্থান গ্রামটার।

সেখানেই হাইড আউট নেয়ার আগে গ্রামের অবস্থান এবং আশপাশের জায়গাগুলো সম্পর্কে ভালোভাবে জেনে নেয়া দরকার। সেই সাথে গ্রামের মানুষজনকে আরেকবার ভালোভাবে বাজিয়ে নেয়াও প্রয়োজন।

এমন উদ্দেশ্যাই সামনে রেখে গতকাল দিনের বেলা একটা ছোট দল নিয়ে মধুপাড়া নিয়েছিলাম। দেখা মিলেছিলো সেই বৃক্ষ মানুষটির সাথে। গ্রামের পরিচিত মানুষ এবং মুক্ত-ভুক্তের দলও হাজির ছিলো পুরুর পাড়ের ঝাঁকড়া আমগাছের তলায় পাতা মাচার চারপাশে। পাকবাহিনীর অত্যাচার আর আঘাত সইতে হয়েছে এ গ্রামের মানুষদের বারবার। নিয়মিত এদের বেগার খাটিতে হয় পাকবাহিনীর প্রতিরক্ষা ঘাটি নির্মাণ ও সেসবের মেরামতি কাজে। ফোর্সড লেবার হিসেবেও এ গ্রামের লোকজনকে নিয়ে শিয়ে তারা বাস্কার-ট্রেক্স তৈরি করতে বাধ্য করে। সন্দেহভাজন এ গ্রামের অনেককেই খানসেনারা ধরে নিয়ে গেছে। তাদের কেউ ফিরেছে, কেউ ফেরে নি। গেলো সেক্ষেত্রের মধ্যভাগে তালমা পাড়ের মুক্তের পর এই বৃক্ষকেও ধরে নিয়ে শিয়েছিলো তারা। পরে অবশ্য ছেড়ে দিয়েছে তার ওপর যথেষ্ট অত্যাচার চালিয়ে।

পাকবাহিনীর অত্যাচারে জর্জরিত হবার কাহিনী সমবেত মানুষজন বলে যায় বিচ্ছিন্নভাবে। এই বলে যাওয়ার ভেতর থেকে ফুটে বেরোয় পাকসেনাদের প্রতি তাদের চরম বিভূতি আর ঘৃণার ব্যাপারটি। তাদের কাছ থেকে এটা জানা যায়, পাকসেনারা সঙ্গে ৩/৪ দিন আসে এ গ্রামের দিকে। রাতে প্রচও মুক্ত আর কাম্ফেন্স গোলাবর্ষণে তাদের ঘাঁটির ক্ষয়ক্ষতি হয়। আর সেই সব ক্ষতিগ্রস্ত বাস্কার-ট্রেক্স সেবামতের প্রয়োজনে পাকসেনারা আসে গ্রামের লোকদের ধরে নিয়ে যেতে। তাদের প্রেরণের ঘাঁটি দেখা দিলেই তারা চলে আসে ছোট ছোট দলে এ এলাকায়। মাঠে নিচ্ছিপৰত গরু-ছাগল নিয়ে যায়, এমনকি তা খুঁটে বাঁধা থাকলে, তা উপড়ে হলেও, দাক্ষ দাবড়ে ধরে বাড়ির আডিনা থেকে হাঁস-মুরগি পর্যন্ত। এছাড়া বাধ্যতামূলকভাবে তাঙ্গে চাহিদামতো সরবরাহ করতে হয় হাঁস-মুরগির ডিম। দিতে হয় চাল-ডাল-তেল অর্থাৎ, যখন যেমনটা তারা চায়।

এ কাজে তাদের গাইড ছিলো বেরোয়ে কাজ করে রাজাকার আর চিহ্নিত দালালেরা। পাকবাহিনীর চাইতে এই বাঞ্চালি রাজাকার আর দালালদেরই মানুষ ভয় পায় বেশি। যে-কোনো সময় এদের ইশারায় কোনো হতভাগার জীবন চলে যেতে পারে অথবা মুক্তিযোদ্ধার অনুচূর বা জয় বাংলার লোক সন্দেহে তাদের পাঠিয়ে দিতে পারে বন্দি শিবিরে।

পাকবাহিনী নিয়মিত এ গ্রামে আসে, কখনো এ গ্রাম ছাড়িয়ে এগিয়ে যায় সামনের গ্রাম জনপদগুলোর দিকে। কখনো তারা দলে থাকে ৭ জন, কখনো ১০ কিংবা ১৫ জন।

বেলা তখন প্রায় ১১টা। উজ্জ্বল ফুটফুটে দিন। আমরা দলে ৮ জন। প্রত্যেকে হালকা অন্তে সজ্জিত। দিনের বেলায় সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধাদের দেখতে এ গ্রামের লোকজন অভ্যন্ত নয়। তাই তারা নিজেদের মধ্যে কথা বলে আর বারবার আমাদের কাঁধে ঝোলানো অঙ্গুলোর দিকে তাকায়। তাদের চোখে-মুখে রীতিমতো শক্তার ছায়া। আমাদের সশস্ত্র উপস্থিতি তাদেরকে একদিকে যেমন উৎসাহী করে তুলেছে, তেমনি তারা ভীত সমভাবে। যে কোনো সময় পাকবাহিনীর একটা দল একদিকে এসে পড়তে পারে। আর তারা এসে গেলেই শুরু হয়ে যেতে পারে একটা দক্ষযজ্ঞ কাও। চরম বিপদ ভেসে আসবে তখন এদের সবার জীবনে। তাই গ্রামের পাশ ঘুঁষে চলে যাওয়া রাস্তাটির দিকে দৃষ্টি মেলে দিয়ে সবাই ঘন ঘন তাকায়।

বৃক্ষ এগিয়ে এসে ফিসফিসিয়ে একসময় বলেন, উমহারালা আসিবা পারে যখন-তখন,

এইঠে তুমহারার ধাকা ঠিক নহে।

তার কথায় বুকের ভেতরটায় কিছুটা ধাকা থাই। সেটা সামলে নিয়ে বাঁশের মাচার ওপর পা দুলিয়ে বসা অবস্থা থেকে নেমে আসি। এর মধ্যে মনে মনে একটা সিন্দ্রান্ত নিয়ে ফেলেছি এভাবে যে, পাকবাহিনীর আগমন পথের ধারে আমরা ওৎ পেতে থাকবো। এ জন্য রাস্তার লাগোয়া একটা ঘরের আস্তানা দরকার। সেটার অবস্থান এমন হওয়া চাই, যাতে রাস্তা ধরে চলমান শক্ত সেনারা আমাদের একেবারে নাগালের মধ্যে থাকে। ক্রোজ শ্ট্ৰি অর্থাৎ একেবারে কাছাকাছি অবস্থান থেকে যাতে তাদের ওপর ঝাড়া শুলি চালিয়ে ওদের সবাইকে সম্মূলে বিলাশ করা যায়।

বৃক্ষের সাথে এ নিয়ে পৰামৰ্শ কৰি কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে। পরিকল্পনাটা শুনে বৃক্ষের চোখ-মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠে। তিনি আপন মনে বলেন, পাইরল্ যাবে! পাইরল্ যাবে!

তিনি এ গ্রামের সবার মূরব্বিৰ। তার কথায় সবাই উঠে বসে, শুক্রা দেখিয়েই, কেননা মনে মনে তাকে সবাই একবাক্যে মানে। তিনি ইশারায় সমবেত লোকজনকে সরে গিয়ে নিজের নিজের কাজে যোগ দিতে বলেন। এরপর তিনি তার ভেতরবাড়ির মধ্য দিয়ে আমাদের নিয়ে যান বাড়িটার পেছনদিককার বাগিচার ভেতর। তারপর কিছুটা এগিয়ে গিয়ে ঠিক রাস্তার পাশে একটা ছনের ঘরে নিয়ে গিয়ে তোলেন। তখনো কাঠখড় রাখার জন্য ব্যবহৃত হয় এই ঘর। কথনো-স্থনো গুরু-ছাগল রাখার আস্তানা হিসেবেও ব্যবহৃত হয় এটা। ঘরটার সামনের দিক খোলা, অন্য তিনিদিকে বাঁশের ঢাটাইয়ের বেড়া। বেড়ায় ভজ্জ্ব ফাঁকফোকৰ। ঘরটার পেছনেই রাস্তা। বেড়ার ফুটোগুলো দিয়ে রাস্তায় চলমান যে কাউকে দেখা সম্ভব অথচ রাস্তা থেকে ঘরের ভেতরে কেউ আছে কি না, সেটা বুবৰার উপায় দেখি।

জায়গাটা চমৎকার সন্দেহ নেই। কিন্তু এখনও এসেই গা শিরশিৰ করে উঠে। দলের সবার মধ্যেই কিছুটা বিচলিত ভাব। কিন্তু দেখে আমাতে হয়। দেখাই যাক না একটা সুযোগ নিয়ে, এই ভেবে একটা বড়ো ধরনের বুনিয়ন্ত্রণ ঘরের ভেতরে সবাইকে নিয়ে সুবিধেমতো পজিশনে চলে যাই। বৃক্ষকে বলি, আমাদের প্রথানকার অবস্থানটা তিনি যেনো আর কাউকে না জানান। পাকসেনাদের দূরে থেকে আসতে দেখলে তিনি যেনো আমাদের আগাম ঝুঁশিয়ারি দেন এবং গ্রামের সবাই যেনো তখন সরে থাকেন। বৃক্ষের গলায় চিঞ্চার সুর। বলেন, তুমহারালা এইঠে কৃতক্ষণ থাকিবেন?

— দেখি না যতোটা সময় পারি। তার কথার উন্তরে বলি।

— দুপোরত তো তুমহারা কুছু থাবেন?

— পারলে কিছু দিয়েন, বলে বৃক্ষকে বিদায় করে দিই। তিনি চলে যান ঝালিত পায়ে। দারুণ চিন্তাযুক্ত দেখায় তাকে। হয়তো তিনি ভাবেন, এ কোন্ বিপদের মধ্যে রেখে যাচ্ছেন ছেলেদের? এ ভাবনা আমাদেরও যে আলোড়িত করে না, তা নয়। কিন্তু ওই যে ছট করে সিন্দ্রান্তটা নেয়া, দেখা যাক না, লেট আস হ্যাত এ চাপ। মরি-বাঁচি একটা কিছু তো হবে।

ছনের কুঁড়েঘৰটির ভেতরে তখন আমরা খড়ের গাদায় হেলান দিয়ে বসেছি। জীৱশীৰ্ষ খড়-কাঠের এক ধরনের পচা-ভ্যাপসা গদ্দ। নানা ধরনের ছোটো ছোটো পোকামাকড় ইচ্ছেমতো পায়ের ওপর দিয়ে ঘুৰে বেড়ায়। শৰীরের ভেতরে চুকে পড়ে তারা। এটা শিরশিৰে স্থিতিহান অনুভূতি। সবার হাতে বাগিয়ে ধৰা হাতিয়ার। সেফটি কেইস, ‘অন’ করে হাতের আঙুল ট্রিগারের ওপর আলতো করে বসানো। সবার শক্ত হয়ে যাওয়া সুখের পেশি। চোখে খড়খড়ে

দৃষ্টি । স্ব-স্ব অবস্থানে অটল নিশ্চল দেহে বসে থাকে সবাই । কথা বলে না কেউই ।

এভাবে প্রায় এক ঘণ্টার মতো সময় অতিবাহিত হয় । হঠাতে সামনে দূর থেকে একটা শোরগোলের মতো শোনা যায় । বৃক্ষ দৌড়ে ছুটে আসেন । অস্ত্রিভাবে বলতে থাকেন, বানিয়াপাড়াত খান আসিছে, এই দিক আসিবা পারে ।

তখন নিজেদের হৃৎপিণ্ডের মধ্যে হাতুড়ি পেটার শব্দ শুরু হয় । শরীর ঘামতে থাকে দরদর করে । শ্বাস-প্রশ্বাসের বেগ বেড়ে যায় । নিজের বুকের মধ্যে একটা অস্ত্রির পাগলা ঘোড়ার দাপাদাপি শুনতে পাই । গলা শুকিয়ে আসতে চায় । এ অবস্থায় মাথা ঠাণ্ডা রেখে ঝুকের সাহস ধরে রাখা প্রয়োজন । সঙ্গব্য শক্রের উপস্থিতির সময় সামান্যতম ভুলক্ষণটি দলের সবার মৃত্যুর কারণ হয়ে দেখা দিতে পারে । সবাইকে অনুচ্ছবের তাই সাবধান হতে বলি এই বলে, কেউ সাহস হারাবে না । শুলির অর্ডার না দিলে কেউ শুলি ছুঁড়বে না । শক্র বেড়ার ওপারের রাস্তায় একেবার সামনাসামনি এলে একযোগে সবাই শুলি ছুঁড়বে ।

কথা বলে না কেউ । মৌন সম্মতি সবার চোখে-মুখে নির্দেশ তামিলের । শক্র আসছে, শক্র আসছে এরকম একটা সম্ভাবনা নিয়ে দুর্গঞ্জময় খড়ের গাদায় অস্ত্রির অপেক্ষা নিয়ে বসে থাকি আমরা ক'জন যুবক । দুপুর গড়িয়ে যায় । না, শক্র সেনার দলটি সামনের পথ ধরে এগিয়ে আসে না । বৃক্ষ এরি মধ্যে এক গামলা ভাজা চিঢ়ে-কেড়ে আর বদনা ভর্তি পানি রেখে গেছেন । নিজেদের জামার কোঁচড়ে চিঢ়ে ভাজা আর শুক্র কিয়ে মুড়মুড় শব্দে তা চিবিয়ে চলি আর পালাক্ষণ্যে বদনার নলে মুখ লাগিয়ে পানি খাই ।

এভাবে বিকেল নেমে আসে । পাকসেনারা ঝাঁকেনি না । পিন্টুকে তখন জিগ্যেস করি, কি খবর পিটুঁ?

— মনে হয় শালারা আর আসবে নাই আমে নেয়ে ওঠা পিন্টুর হালকা গলায় উত্তর । ওর কাঁধে মৃদু চাপড় মেরে জিগ্যেস করি তা হলে যুবক, এখন কি করবে?

এই কথায় হেসে ফেলে পিন্টুঁ অন্যরাও হেসে ওঠে । পাকসেনা দলের না আসবার ব্যাপারটা সবার মধ্যে স্বত্তি অনে দেয় । পিন্টু বলে, দূর! বেকার গেলো দিনটা । এটাটে এতোক্ষণ ধরি বসি থাকি খালি ভ্যারেণ্ড ভাজা হইল । আইসেন বিড়ি খাই ।

সবার ঠোঁটে ঠোঁটে ধরা বিড়ি জুলে ওঠে । স্বুর কাছ থেকে পাকসেনাদের ওপর হামলা করার একটা ভালো সুযোগ নিয়ে দিনমান কাটানো গেলো । কিন্তু ফক্সে গেলো সুযোগটা । ওরা এলোই না ।

বিকেলের সোনালি রোদে বেরিয়ে আসি ঘর থেকে । সামনের রাস্তাটা কিছুদূর এগিয়ে একেবারে 'এল'-এর আকারে বাঁক নিয়ে সামনের বাড়িগুলোর দিকে এগিয়ে গেছে । সেখান থেকে আবার সোজা ভানে বাঁক নিয়ে চলে গেছে বানিয়াপাড়ার দিকে । 'এল'-এর নিচের দিককার মাথাটার অন্তর্বর্তী বাড়ি ক'টাৰ সামনেকার বুনো ঘাস আৰ ছোটো ছোটো বোপবাড় যুক্ত জায়গাটার দিকে দৃষ্টি যায় বারবার । পিন্টুকে জায়গাটা দেখতে বলি ভালো করে । মনে মনে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলি । আজ সারাদিন ওঁ পেতে থেকেও শিকার ফাঁদে ফেলা গেলো না । আজ ওরা এলো না । কিন্তু কাল তো আসতে পারে । কাল আবার অ্যামবুশের ফাঁদ পাতা হবে । আজ বৃথা গেলো সারা দিনের টেনশন আৰ কষ্ট, কাল বৃথা নাও যেতে পারে ।

বৃক্ষের কাছ থেকে বিদায় নিই । তারপর ফেরার পথ ধরি শুয়াবাড়ির উদ্দেশে ।

গুয়াবাড়ী মানুষের আশা-হতাশার কথা

ফর্সা টুকটুকে সুন্দর ছেলে শামসুল। সক্ষ্যার মুখে সে আসে বেলতলা থেকে। এসেই জানায়, বেলতলায় রোগীদের অবস্থা ভালো। রোগীরা সুস্থ হয়ে উঠছে দ্রুত। এ খবরটা উচ্চিত করে তোলে বাবলু ও মতিয়ারকে। এ ব্যাপারে ওদের দু'জনের অবদান অতুলনীয়। যুদ্ধের মাঠে থেকেও এর বাইরে কোথাও কোনোখানে মহৎ কাজ করার মধ্যে যে তৃণি আর আনন্দ রয়েছে, সেটা আলোড়িত করে বাবলু আর মতিয়ারকে। এই দু'যুবক বর্তমানে অন্তরঙ্গ বঙ্গ হিসেবে একেবারে মানিকজোড় হয়ে উঠেছে। ওদের আনন্দ-উচ্ছ্বাস দেখে ভালো লাগে। মনে হয়, এমনটাই হওয়া উচিত। যুদ্ধের ভেতরে বসবাস করে গোলাবাবুদ নিয়ে নাড়াচাড়া করা, হত্যা আর নিষ্ঠুরতার ভেতরে কেবল যান্ত্রিক এক জীবনে নিজেদের অভ্যন্ত করে তোলা নয়, যুদ্ধের পাশাপাশি সাধারণ বা বেসামরিক মানুষজনকেও সেবা করার এক গৌরবময় দিক রয়েছে। দেশের জন্য যুদ্ধ নিবেদিতপ্রাণ এই যুবকরা মানবসেবার যে দীক্ষা আজ পাচ্ছে, দেশ যদি একদিন সত্যিই স্বাধীন হয়ে যায়, তাহলে সেই স্বাধীন দেশের পুনর্গঠনে এরা অংশগ্রহণ করতে পারবে আজকের মতো একইভাবে। একই মন-মানস নিয়ে।

মধুপাড়া গ্রামে আ্যামবুশ পাতার সিদ্ধান্তটা বিকেলেই নেয়া হয়েছিলো। একরামুল ও বকরকে সে মতে ২০ জনের একটা দল তৈরি করতে বলি। পিন্টু ব্যাপারটা তদারকি করে ভেতর থেকে বাইরে বেরিয়ে আসে। বাড়ির বাইরে চতুরে জঙ্গল রাখা একটা গাছের ঝঁড়তে ঠেস দিয়ে জোনাব আলী আর তার বাবার সাথে তাদের সাংসারিক সমস্যাদির কথা উচ্ছিলাম। কুমিল্লা জেলার লোক এরা। জীবিকার জন্মস্থানের ভাসতে ভাসতে এসে এক সময় তাদের ঠাঁই মিলেছে এই শুয়াবাড়িতে। জনমন্তব্য জঙ্গলে ভরা এ জায়গাটা সাফসুতরো করে বসত গেড়েছে এরা। তিল তিল ঝরে গড়ে তুলেছে বাড়ির, জমি-জিরেত। দারুণ প্রতিকূল আর কষ্টের দিনগুলো পার করে দিয়ে এরা যখন কিছুটা থিতু হয়ে বসেছে, তখনই দেশজুড়ে লেগেছে যুদ্ধ। যুদ্ধের অভিযোগে এদের আঘাত হেনেছে দারুণভাবে। ফলে কঠোর পরিশ্রমে গড়ে তোলা প্রয়ের সংসার তচনছ হয়ে যাবার উপক্রম হয়েছে। জোনাব আলীর বাবা একথাণ্ডো শোনান একটা গভীর হতাশা আর হাহাকার-হেঁয়া গলায়। তাকে অভাস বিমর্শ আর দৃঢ়ী মানুষের মতো দেখায়।

কিন্তু এই জোনাব আলীর ওপর বি.এস.এফ-এর এতো রাগ কেনো? কেনোই-বা তারা তাকে ধরবার জন্য তাড়া করে ফিরছে? আমার প্রশ্নের জবাব পাওয়া যায়।

ফুলবাড়ি ই.পি.আর-দের বি.ও.পি.-তে নানা কাজে জোনাব আলীর ডাক আসে। ই.পি.আর-দের ডাক এলে না শিয়ে পারা যায় না। সীমান্ত এলাকায় ই.পি.আর-দের দারুণ দাপট। তাদের আনুকূল্য না পেলে সীমান্ত এলাকায় বসত করা বন্তুতপক্ষে মানুষজনের পক্ষে প্রায় অসম্ভব। জোনাব আলীকে নিয়মিত ই.পি.আর ক্যাম্পে হাজিরা দিতে হয়েছে। হয়েছে তাদের বিভিন্ন কাজে সহযোগিতা করতে। ফাইফরমাশ খাটতে হয়েছে তাদের যখন-তখন। ফলে ই.পি.আর-দের মানুষ হিসেবে চিহ্নিত হয়ে পড়েছে ওপারে। ই.পি.আর-দের সাথে বি.এস.এফ-দের সম্পর্ক সব সময় ভালো থাকে না। ই.পি.আর-দের চর হিসেবে চিহ্নিত জোনাব আলী হয়তো তেমন কোনো কারণেই ওপারের মানুষজনের শক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে। ই.পি.আর ক্যাম্প যতোদিন ছিলো, ততোদিন তার কোনো অসুবিধে হয় নি। কিন্তু যুদ্ধের সূচনায় তারা বিদ্রোহী হয়ে বাংলাদেশের পক্ষে যুক্তিযুক্তে যোগ দিলে ফুলবাড়ি ক্যাম্প

পরিত্যক্ত হয়ে যায়। তখন জোনাব আলীর নিরাপত্তার নিশ্চয়তা আর থাকে না। এছাঁ
সোনারবানের সোনা মিয়ার ডান হাত হিসেবে তার যাবতীয় অন্তরঙ্গ অনুগামী ছিলো সে
সোনা মিয়ার আকস্মিক ও রহস্যময় অন্তর্ধান জোনাব আলীর ভাগ্যকে চূড়ান্ত অনিষ্টয়তা
দিকে ঠেলে দেয়। এখন তার প্রাণ বাঁচানোই বিরাট এক দায় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

যাহোক, মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয়ে থেকে জোনাব আলী এখন পর্যন্ত নিজেকে বাঁচিয়ে
রাখতে পেরেছে। মুক্তিবাহিনী এখন তার বাড়িতে ক্যাম্প করেছে। এর ফলে সে নিজে
এবং তার পরিবারের নিরাপত্তার খুজে পেয়েছে। এজন্য তার পরিবারের প্রত্যেক
সদস্যসহ সে নিজে এবং এ গ্রামের দুর্দশাপ্রতি মানুষ মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞ।
কৃতজ্ঞতা জোনাব আলী, তার বাবা আর অন্যরা নানাভাবে প্রকাশ করছে অকৃত্তিয়ে
হৃদয়ের সমস্ত উন্নাপ দিয়ে। জোনাব আলীর মাদ্রাসায় পড়া তালেব এলেম ছোট ভাইটি বে
চালাক-চতুর এবং নিষ্ঠাবান ছেলে। হাইড আউটের বিভিন্ন কাজকর্মে অফুরন্ত প্রাণশৰি
দিয়ে খেটে চলেছে সে। অন্ত আর পরিমার্জিত এই ছেলেটিকে দেখে মনে হয়, সুযোগ পে
জীবনে একদিন সে হয়তো বেশ উন্নতি করতে পারবে।

যাহোক, হতাশা আর আশার কথাবার্তা শেষ হয়। কাঠের ঠাঁড়ির ওপর বসা আলোচনা
বৈঠক এক সময় শেষ হয়। এর মধ্যে পিন্টু বেশ ক'বুল'ভেতরে গেছে, বাইরে এসেছে
এসে ছেলেদের তাগিদ দিয়েছে দ্রুত তৈরি হয়ে নেয়ার জন্য। একরামুল আর বকর এ
রিপোর্ট করে যুক্তের সাজে সবাই তৈরি।

মধুপাড়ায় সকল অ্যামবুশ

রাত নটায় দলটি নিয়ে গুয়াবাড়ি তাৎক্ষণ্যে। রাত ১১টার মধ্যে মধুপাড়া সড়কের ইংরো
'এল' হরফের বাঁকের চিহ্নিত জাহাঙ্গীর ছেলেদের দিয়ে অ্যামবুশ পাতা হয়ে যায়। ঠিকঠা
করে দেয়া হয় তাদের অবস্থা কৃতিক্রমে শামসুন্দিনের কাছে আজ এল.এম.জি। অ্যামবুশে থাক
দলের কাছে এল.এম.জির ভূমিকা শুবই তুরত্তপূর্ণ। সুতরাং তাকে কেন্দ্র করে অর্ধবৃত্তাকার
তাদের অবস্থান সাজিয়ে দেয়া হয়। পাকসেনাদের দল সামনের রাস্তা ধরে একেবারে
টার্ণেটের ভেতরে আসামাত্র তাদের লক্ষ্য করে আচমকা ফায়ার ওপেন করতে হবে। আ
সেটা করতে হবে অব্যর্থ নিশানার সাহায্যেই। এ ব্যাপারটি সবাইকে বুঝিয়ে দেয়া হ
বারবার। ওরা সারারাত থাকবে এই একই পজিশনে। প্রয়োজনে কাল দুপুর পর্যন্ত। ওদে
প্রত্যেকের সাথে সকালের নস্তা হিসেবে কুটি আর চিনি বিধে দেয়া হয়েছে।

একরামুল আর বকর থাকবে অ্যামবুশ দল পরিচালনার দায়িত্বে, পিন্টু আর আমি থাকব
না। আজ রাতেই আমাদের দু'জনকে চলে যেতে হবে নালাগঞ্জে। সেখান থেকে গড়ালবাড়ী
কাঠের ব্যাপারটা নিয়ে বি.এস.এফ-এর সাথে পিন্টুর তিক্ত সম্পর্কটা ক্ষতের মতো হ
য়ে রয়েছে। ওটাকে জরুরি ভিত্তিতে সারানো দরকার। একরামুল আর বকরের ওপর
অপারেশনের দায়িত্বটা দিয়ে যেতে হচ্ছে। ওদের সাহসিকতা আর পারদর্শিতা সম্পর্কে কো
রকম সন্দেহ নেই। এছাড়াও রয়েছে নির্ভরযোগ্য ছেলে বাবুলু, মতিয়ার, শামসুন্দি
বাসারাত, জয়নাল আর শঙ্কু ও মধুর মতো ছেলেরা। তবুও ওদের অবস্থানে রেখে বিদ
নেবার সময় মনের ভেতর একটা অস্বত্তির কাঁটা খচখচ করতেই থাকে। কাল সকাল
পাকসেনাদের কোনো দল যদি সত্যি সত্যি ওদের এই অ্যামবুশের ফাঁদে পড়েই যায়, তাহ

ব্যাপারটি ওরা সামাল দিতে পারবে তো? মনে মনে বলি, দেখা যাক না কি হয়।

গড়ালবাড়ীর কাজ সেরে দুপুরের দিকে ভেতরগড়ে আসতেই লোকমুখে শোনা যায় মধুপাড়ায় আজ সকালে মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে দারুণ একচোট যুদ্ধ হয়েছে। তাতে মারা গেছে একজন খানসেনা এবং আহত হয়েছে তাদেরই একজন। মুক্তিযোদ্ধাদের কোনো ক্ষতি হয়েছে কি না, সে সম্পর্কে তারা কিছু বলতে পারে না। ও এলাকায় যুদ্ধ লাগবার পর পালিয়ে আসা মানুষদের কাছ থেকে এ ব্যবর পেয়েছে ভেতরগড়ের মানুষ।

সংবাদটা শোনামাত্রই বুকের ভেতর তোলপাঢ় শুরু হয়ে যায়। পিটুকে দ্রুত পা চালাতে বলে, বলতে গেলে, একরকম দৌড়ে চলতে থাকি আমরা সোনারবান্দের দিকে। পথ চলতি লোকজনের কাছ থেকে জানা যায়, মুক্তিযোদ্ধারা ফিরে এসেছে গুয়াবাড়িতে।

এরপর দ্রুত পৌছে যাই গুয়াবাড়ি। আয়মবুশ-ফেরত ছেলেদের ক্রান্তি বিধৰণ্ত অবস্থায় বাড়ির বাইরেকার চতুরে গাছতলায় মাটির ওপর ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বসে থাকতে দেখা যায়। দেখেই বোৰা যায়, সারা রাত তাদের না ঘুমিয়ে কাটাতে হয়েছে, ছিলো অসীম টেনশনে। সঙ্গৰত পাকসেনাদের মোকাবিলায় প্রত্যেকেরে ওপর দিয়ে বয়ে গেছে উদ্দেশে আর উৎকর্ষের প্রবল ঝড়।

আমাদের দেখেই একরামুল আর বকর উঠে দাঁড়ায় বিরস বদনে। ওদের অবস্থা দেখে হঠাৎ করেই কেনো জানি খটকা জাগে মনের মধ্যে। তাহলে কি আয়মবুশ সফল হয় নি?

জিগ্যেস করি ওদের, কিরে কী হয়েছে অপারেশন সার্কুলেশন ফ্লুল হয় নাই?

একরামুলই জবাব দেয়। তেতো গলায় বলে, শালা^{তেকা} এম.জি আর এস.এল.আর বিট্টে করছে। ৭ জন খানসেনাক হামরা একেবারে ৫০/৫০ শজের মধ্যেই পাইছনো। এমন সুযোগ! কিন্তুক একটা ত্রাশের পর শামসুন্দিনের এল.এন.জি.আর ফুটিলেই না। এস.এল.আর, ডুটাৰ মধ্যে গুটার অবস্থাও একই রকম। শালাৰ^{প্রাক্কলে} হাতের নাগালে আসিয়া ফসকি গেলো। এল.এম.জি.টা ঠিক থাইকলে ওমাক কুঁজো ফিরি যাবার নাগিল না হয়।

অবস্থা তাহলে এই? ওরা প্রক্রসেনাদের একটা দলকে আয়মবুশের ফাঁদে সত্যি সত্যি ফেলতে পেরেছিলো। কিন্তু হাত্তিয়ার বিট্টে করায় তাদের সবাইকে ধৰাশায়ী করতে পারে নি। এ ব্যর্থতায় তারা খুবই বিষর্ষ। আমার কাছে রিপোর্ট করার সময় এর জন্য জবাবদিহি করতে হবে ভেবে মানসিকভাবে তারা অস্থির আর দুর্বল হয়ে রয়েছে। ওদের সবাই বিপর্যস্ত চেহারা, রক্তজবার মতো লাল চোখ, ক্রান্তি নেতিয়ে পড়া শরীর বলে দেয়, দায়িত্ব পালনে ওরা কতোটুকু কষ্ট করেছে। ভর্সেনা করার সময় এটা নয়। ওদের কষ্টের স্বীকৃতি দেয়া প্রয়োজন।

কথাটা মনে মনে ভেবে ওদের দুঃজনার কাঁধে হাত রেখে বলি, তোরা খুব ভালো কাজ করেছিস, একজন খানকে মারতে পেরেছিস, একজনকে আহত করেছিস, এটাতো একটা বিরাট অ্যাচিভমেন্ট! এটা একটা বড়ো ধরনের সাক্সেন। সদরুন্দিন সাহেব জানতে পারলে দারুণ খুশি হবেন।

একথায় উৎসাহী হয়ে উঠে ওরা। চোখ-মুখ চকচক করে উঠে সবার। বাবু দৌড়ে গিয়ে ভেতর থেকে পাকসেনাদের কাছ থেকে দখল করে আনা চাইনিজ বুলেটগুলো নিয়ে আসে। সাগহে সেগুলো হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করে দেখি। চাইনিজ এল.এম.জির একটা গুলির মালা। সেখানে গোটা পঞ্চাশেক তাজা বুলেট। আক্রান্ত পাকসেনারা ফেলে পালিয়েছে এটা। এই সাফল্যে আন্তরিকভাবে বাহবা দিই ওদের।

পিটু শুলির মালাটা হাতে নিয়ে বিস্ময়ভরা গলায় বলে, তোরা তো কামাল করি

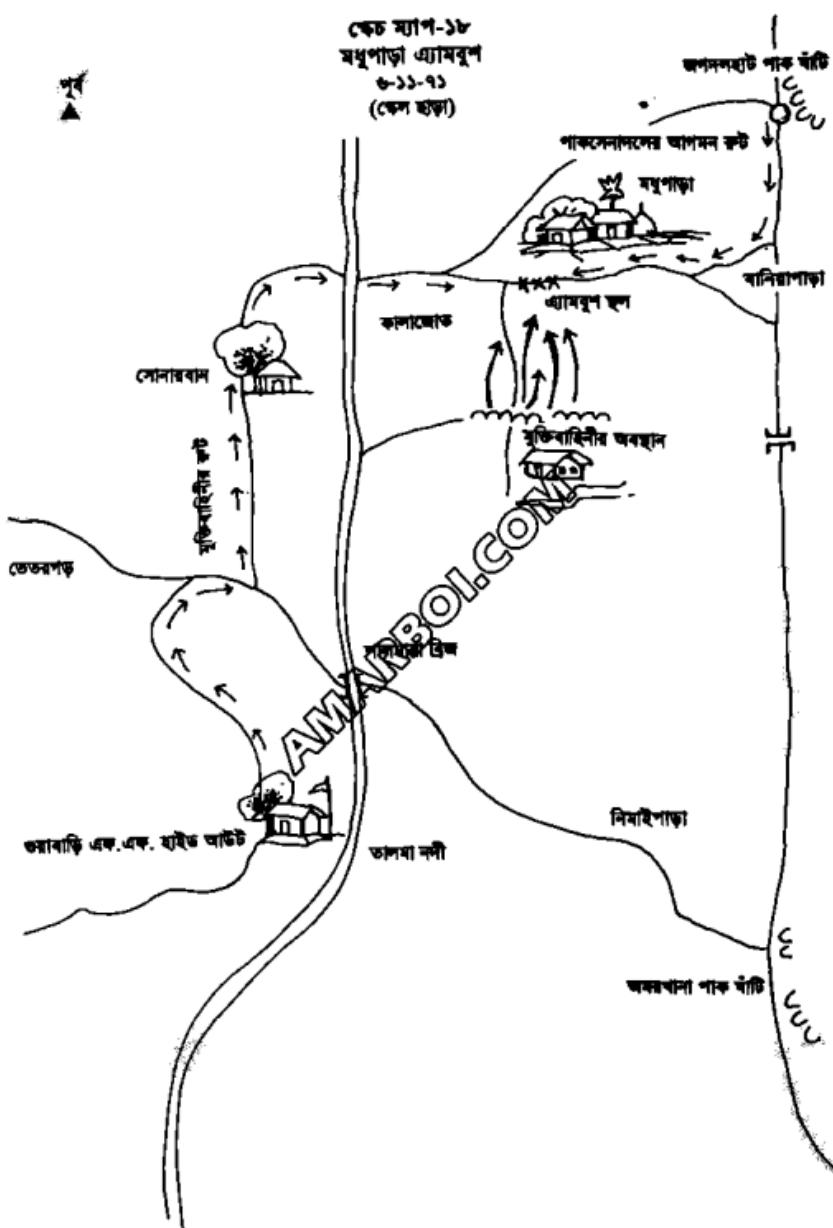
ফ্যালাইছিস একেবারে!

এরপর ওদের কাছ থেকে পুরো আয়মবুশের ঘটনাটা বিস্তারিতভাবে শোনা হয়। ওদের বিবরণ অনুযায়ী আয়মবুশের ঘটনাটা ঘটেছে ঠিক এভাবে : সারারাত ভিজে ঘাস আর মাটির মধ্যে ঘোর থেকে কেটেছে ওদের। মশা আর চিনে ঝঁক আক্রমণ করেছে ঘোরে। চোখের ওপর দিয়ে কষ্টকর রাতটা কেটেছে। সকাল হয়েছে। সূর্য উঠেছে। খুকনো ঝুঁটি চিবিয়ে খাবার পর সে অবস্থাতেই ওরা তৈরি হয়ে বসেছে শক্রুর জন্য। সকাল ন'টার দিকে সত্যিকারভাবেই ৭ জন পাকসেনার একটা দলকে ওরা আসতে দেখে। পাকসেনাগুলো মধুপাড়া গ্রামের ক্ষেত্রে যে বাড়িগুলো, সেগুলোতে ওরা চুকে একটা ছাগল আর কয়েকটা মুরগি ধরে। তারপর হেলেন্দুলে এগিয়ে আসতে থাকে সামনের দিকে। মুক্তিযোদ্ধারা রাতে অবস্থান নেয়ার কারণে গ্রামবাসীদের কাকপক্ষীও জানতে পারে নি তাদের উপস্থিতির কথা। তবে খানদের দেখে গ্রামের লোকজন পালাতে থাকে প্রাণভয়ে। খানসেনারা তাদের নিজস্ব কায়দায় হেঁটে এগিয়ে আসতে থাকে মধুপাড়া গ্রামের রাস্তার মোড়ের দিকে। তাদের একজনের হাতে বক্রির দড়ি। বক্রিটা প্রাণভয়ে তখন তারাথরে চিকির করে চলেছে। হাঁটতে অনিচ্ছুক বক্রিটাকে রীতিমতো টেনে টেনে আসছে দড়ি ধরে থাকা সেনাটা। অপর তিনি পাকসেনার হাতে ৮/১০টার মতো মুরগি। আর তাই হাতে বুলিয়ে এবং বুকে জড়িয়ে ধরে আছে তারা। অন্যদের হাত খালি। কাঁধে ঘোলানো হাতিয়ার। একদম নিরুৎসেবে এবং হাঁটা-বুক্সি তাদের আলস আর মস্তর। তাদের সামনে কোনো বিপদ ওত পেতে আছে, সেটা তারা জোটেই আঁচ করতে পারে নি।

শামসুন্দিন তার এল.এম.জির টাগেটি ঠিক করে দিয়ে। অন্যরাও হাতিয়ার রেডি করে টিগারে আঙুল রেখে অপেক্ষায় থাকে। দারণ স্টোনেন প্রায় ফেটে পড়বার উপক্রম সকলের। এতো কাছে পাকসেনা! একেবারে চোখের পেছনা! সবারই প্রায় বাকবক্স হবার দশা। অস্ত্রিতা আর উত্তেজনায় ঘেমে-নেয়ে ওঠে স্বর্ণস্তোর একরামুল পোড়-খাওয়া ছেলে। অনেক যুক্তের অভিজ্ঞতা ওর ঘোলাতে। এ পরিস্থিতিতে ও মাথা ঠাণ্ডা রাখে। সবাইকে ইশারায় চুপ থাকতে বলে। তারপর যখন ওরা প্রায় ছেটে গজের মতো নাগালের মধ্যে, তখন ও সবাইকে ফায়ারের নির্দেশ দেয়। একযোগে সবগুলো হাতিয়ার গর্জে ওঠে পাকসেনাদের দলটিকে লক্ষ্য করে। কিন্তু একটা ব্রাশের পরই এল.এম.জিটা আর চলে না। তিনটা এস.এল.আরও কয়েক রাউন্ড গুলিবর্ষণের পরপরই থেমে যায়। অন্য হাতিয়ারগুলো অবশ্য সচল থাকে।

প্রথম আঘাতে ওদের দু'জন ঘায়েল হলেও এল.এম.জি থেমে যাওয়ায় পাকসেনারা নিজেদের সামলে নিয়ে দ্রুত অবস্থানে চলে যায়। এবং রাস্তার ওপারকার আড়াল থেকে শুলির জবাব দিতে থাকে। এদিকে ছাড়া পাওয়া বক্রিটা ম্যা-ম্যা করতে করতে খেতবাড়িতে নেমে যায়। মুরগিগুলোও ছোটাছুটি করে দৌড়ে পালায়। শামসুন্দিনের এল.এম.জি, আর সচল হয় না। পাকসেনারা তাদের প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে দারুণভাবে গোলাগুলি চালাতে থাকে। এভাবে প্রায় আধা ঘণ্টাখানেক ধরে চলে গুলিবিনিময়। পাকসেনারা তাদের আহত সাথীদের নিয়ে রাস্তার নিচ দিয়ে ধীরে ধীরে পিছিয়ে যেতে থাকে। গোলাগুলির টান পড়ায় তাৎক্ষণিকভাবে ওরা তাদের পিছু ধাওয়া করতে পারে না। বেলা এগারোটার দিকে পাকসেনা দলটির গোলাগুলি থেমে যায়। বোধ যায় তারা সরে পড়তে পেরেছে। আরো কিছুক্ষণ অবস্থানে থেকে তারা উঠে দাঢ়ায় এবং পাকসেনাদের অবস্থানের দিকে এগিয়ে যায়।

তাদের আশা ছিলো তারা আহত সেনা দু'জনকে ধরতে পারবে। কিন্তু সেখানে পিয়ে



তাদের পাওয়া যায় না। রাস্তার ওপর এবং নিচেকার খাদের মাটিতে পাশে জয়টি বাঁধা রক্ত বলে দেয় পাকসেনাদের কারো আহত হবার কথা। রাস্তার আড়ালে যে খাদ, তার ভেতর দিয়েই তারা টান-হ্যাচড়া করে নিয়ে গেছে তাদের আহত সহযোগীদের। ঘাস ও মাটির ওপর এবড়োখেবড়ো রঙের দাগ দেখতে পায় তারা। তাদের ফেলে যাওয়া ৫০ রাউন্ডের একটা গুলির চকচকে মালা পড়ে থাকতে দেখে, সেটা সঙ্গে সঙ্গে তুলে নেয়। সেই সাথে সঙ্কান চলে হাতিয়ারের। কিন্তু আতিপাতি করে ঝুঁজেও কোনো হাতিয়ার পাওয়া যায় না।

মধুপাড়ার লুকিয়ে থাকা কিছু লোক তখন বেরিয়ে আসে। তাদের কাছ থেকে তারা জানতে পারে, আহত একজন খানসেনা মারা গেছে সঙ্গে সঙ্গে। অন্যজন আহত হয়েছে গুরুতরভাবে। শুধু তাই নয়, আহতদের কাঁধে বহন করে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমের ৫/৬ জনকেও খানসেনারা ধরে নিয়ে গেছে। পাকসেনাদের ওই দলটির মাঝে খাবার ঘটনা জানা মাত্র স্বাভাবিক কারণেই জগদলহাট ঘাঁটি থেকে তাদের অন্য আর সব সহযোগী ঘাঁটি বেঁধে ছুটে আসবে পাগলা কুকুরের মতো তাদের প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্য। তাই একরামুল ও বকর আর কালঙ্কে করে বিপদের ঝুঁকি নিতে চায় নি। তারা আমের মানুষের সাবধানে সরে থাকতে বলে ফিরে এসেছে সোনারবান হয়ে গুয়াবাড়িতে। মোটামুটি এই হচ্ছে তাদের মধুপাড়ায় পরিচালিত আ্যামবুশের সফল্য ও ব্যর্থতার খতিয়ান।

একরামুল তার বিবরণ শেষ করে বলে, এল.এম.জিটি.এমি বিট্টে না করিল হয়, তাইলে ওমার সোগণ্ডাক পাখির মতো ফ্যালা যাইতো। ইস এ্যাপ্টা বড়ো একটা সুযোগ হাতছাড়া হয়ে গেলো মাহবুব ভাই!

একরামুলের হতাশা কাটে না। জানি, আ্যামবুশে অংশগ্রহণকারী ছেলেদের মন থেকে এটা সহজে মুছবার নয়। তবুও মনের মধ্যে একটা অপরাধবোধ এসে ভর করে। ওদের ওপর সম্পূর্ণ আস্তা রেখে পিটু ও আক্ষয় সালাগজ যাওয়া ঠিক হয় নি। একরামুল ও বকর এরা যেভাবেই বলুক, তাদের জন্মনিষ্ঠাই যতো গ্রহণযোগ্যই হোক না কেনো, সঠিক নেতৃত্ব দিতে পারে নি ওদের দলকেন্দ্রে না হলে এতোগুলো হাতিয়ার সচল থাকা অবস্থায় পাকসেনাদের দলটি পালাতে পারতো না তাদের একজন মৃত এবং একজন আধামৃত সাথীর বোৰা বহন করে। আসলেও একটা বড়ো ধরনের সুযোগ হারিয়ে গেলো। এরপর এ ধরনের বড়ো সুযোগ আর নাও পাওয়া যেতে পারে।

যাহোক, এখন এটা ভেবে আর লাভ নেই। যা হবার তা হয়ে গেছে। এরা নিজেরা যা করে এসেছে, এতেটুকুই এদের কাছ থেকে কেবল আশা করা যায়। এর চেয়ে বেশি নয়। শক্তি নিখনের সংখ্যা যাই হোক না কেনো, মধুপাড়ার আ্যামবুশ তো সফল হয়েছে। আ্যামবুশের শিক্ষা আমাদের সামনের দিনগুলোয় আরো বড়ো ধরনের যুদ্ধের জন্য তৈরি হতে সাহায্য করবে।

ভাবনার রেশ মন থেকে মুছে ফেলে হতাশায় তখনো ম্লান একরামুলকে বলি সাহস দেবার জন্যই, ওয়েল ডান একরামুল। তোরা খুব ভালো কাজ করেছিস। যা এখন গোসলটোসল করে খেয়েদেয়ে রেষ্ট নে।

ওরা ওদের বিধ্বস্ত দেহগুলো নিয়ে তখন উঠে দাঁড়ায়। শরীর টেনে টেনে বাড়ির ভেতরে চলে যায়। পিটুর হাতে তখন একটা ম্যাচের কাঠি খস্ক করে জুলে ওঠে। কৌতুকের হাসি রিয়ে সে বলে, আইসেন বিড়ি ধরাই মৃত খান সাহেবের অনাবে। শালার একটাতো কমলো।

পিটুর কথার রেশ ধরে তখন ভাবি, আসলেও তো কথাটি ঠিক। কম করে হলেও

একজন পাকসেনাতো কমলো । সারা বাংলাদেশের ফ্রন্টগুলোতে এরকম একটা একটা করেও যদি পাকসেনা করতে থাকে, তাহলে নিচিতভাবেই ওরা একদিন শেষ হয়ে যাবে এবং এ ধারা যদি চলতে থাকে, তাহলে খুব বেশিদিন কি লাগবে দেশটাকে স্বাধীন করতে? মনে মনে বলি, কে জানে? হয়তো লাগবে, হয়তো লাগবে না । আগামী দিনগুলোতেই পাওয়া যাবে এর সঠিক জবাব ।

৬. ৩৩. ৭১

শীত নামছে জাঁকিয়ে

মধুপাড়ায় সফল অ্যামবুশ পরিচালনার পর গতরাতে কোনো অপারেশন রাখা হয় নি । ছেলেদের পুরো বেল্ট দেয়েছে । রাতের বেলায় একটা ছোটো দল পেট্রল ডিউটির কাজ এবং সেন্ট্রিয়া তাদের কৃষ্ণন ডিউটি পালন করেছে মাত্র । ত্রাক্ষণপাড়া সাব-সেন্ট্রির হেড কোয়ার্টারে যেতে হবে সদরবন্দিনের কাছে রিপোর্টিংয়ের জন্য । অনেক রাত পর্যন্ত বসে রিপোর্ট তৈরি করতে হয়েছে । গোলাঞ্চলির বর্তমান মজুদ এবং রেশনের অবস্থার হিসেব-নিকেশ করে চাহিদাপত্র তৈরি করতে হয়েছে ।

শীত নামছে জাঁকিয়ে । বর্তমান অবস্থায় যুক্ত করাটা কষ্টকর হয়ে উঠেছে । গরম জামা-কাপড়ের সাথে যেটা জরুরি প্রয়োজন হয়ে দেখা দিয়েছে, নেম্বিছেছে, পায়ের জুতোর সরবরাহ পাওয়া । খালি পায়ে শিশির ভেজা ঘাস, মাটি আর বুনে জেল মাড়িয়ে অপারেশন করা যাচ্ছে না । বিশেষ করে শেষ রাতের দিকে পায়ের পাতায় প্রশংসন লাগতে শুরু করেছে খুব । এরই মধ্যে ক'জন অসুস্থ হয়ে পড়েছে । ভালো ডাঙ্গার স্থানে তাদের অনতিবিলম্বে চিকিৎসা করা প্রয়োজন । 'ফার্স্ট এইড' বরে এখন মজুদ আহ ওধু সালফার ডায়জিন ট্যাবলেট । এ দিয়ে ঠাণ্ডাজনিত অসুস্থ ভালো হবার নয় । ক্লিনিকাড় মডেল হাট থেকে 'ডিসপিরিন' ট্যাবলেট এনে অসুস্থ হয়ে পড়া ছেলেদের থেকে প্রয়োজন হয়েছে । কিন্তু এতে করে তেমন কাজ হচ্ছে না । সম্ভবত জলপাইগুড়ি নিতে হবে শতদের । এসব সমস্যার কথা সাব-সেন্ট্রির কমান্ডার আর বড় ভাই নূরুল হকের সাথে আলোচনা করতে হবে । সকালবেলা রওয়ানা দেবো আমি আর পিটু । বেশ দূরের পথ ত্রাক্ষণপাড়া । গুয়াবাড়ি থেকে চাউলহাটি-জনপুর দিয়ে গেলে ১৪/১৫ মাইল তো হবেই । এ রাস্তা পাড়ি দেয়ার জন্য দুটো সাইকেল নেয়া হয়েছে ।

মাইনের ফাঁদে ঘায়েল দুই সৈনিক

সকাল ৮টার দিকে রওনা দেবার মুখে খবরটা আসে । প্রথমে জোনাব আলীই আনে খবরটা । এরপর আলতাফ কেরানির গ্রাম নিমাইপাড়া থেকে আসে ওমর আলী । এই সেই ওমর আলী বুন্ধন যেখারের বাড়িতে গ্রেনেড হ্যামলার সময় যে আমাদের গাইড হিসেবে কাজ করেছিলো । তার রিপোর্ট অবিশ্বাস করা যায় না । তাদের পরিবেশিত খবরে জানা যায় যে, আজ সকালে আমাদের পুঁতে রাখা এপি-১৪ মাইনে নিমাইপাড়ায় অমরখানা বোর্ড অফিসিগামী রাস্তায় একজন পাকসেনা মারা গেছে এবং একজন আহত হয়েছে । পাকবাহিনীর একটি টহলদারি দল ওই পথে অমরখানা থেকে তখন আসছিলো । রাস্তার ওপরে পাতা মাইনের ফাঁদের ব্যাপারটা তারা কোনোমতেই টের পায় নি । ফলে এই বিপন্নি ঘটেছে ।

সকালের এই দুর্ঘটনার মুখে ক্ষিণ হয়ে উঠেছে পাকবাহিনী । অমরখানা থেকে উঠে

এসেছে একটা বড়ো দল। তারা আশপাশের গ্লোকাণ্ডলো মাড়িয়ে বেড়াচ্ছে মন্ত হাতির মতো। গ্রামের মানুষজনকে ধরছে, মারছে বেধড়ক। মুক্তিবাহিনীর খৌজ তাদের চাই-ই চাই। এজন্য সীমাহীন অত্যাচার চলিয়ে যাচ্ছে অসহায় আর হতভাগ্য মানুষগুলোর ওপর। এটা তারা করবে, তাদের ধর্ষণ এই। এর প্রতিবিধান বর্তমানে আমাদের হাতে নেই।

মাইনের ফাঁদে দুই খানসেনা ঘায়েল হবার সংবাদটা সমস্ত হাইড আউট জুড়ে যেনে শুশির বান ডেনে আনে। ছল্লাঙ্গ করে ওঠে ছেলেরা।

পিন্টু শিশ বাজিয়ে দুই পাক ঘুরে নেয় নাচের ভঙ্গিতে। তারপর বলে, কি হচ্ছে বলেন দেখি, কাইল দুই খান, আইজ দুই খান, ওমারগুলার কি মড়ক নাগিল নাকি?

যুদ্ধের জগৎ একটা অন্য রকমের জগৎ। এই জগতের সঙ্গে যারা জড়িত, তাদের একদল সব সময় অন্য দলের মৃত্যু কামনাই করে থাকে। যুদ্ধ মানেই শক্তি নির্ধন। শক্তি যতো বেশি করে মরবে ততোই আনন্দ-উদ্ঘাস করবে অন্য পক্ষ। কিন্তু শক্তিরাও তো মানুষ। আমাদের মতোই তাদের চোখ-মুখ আর দেহের আকার। তাদের চাওয়া-পাওয়া, আনন্দ-বেদনা, দুঃখকষ্ট আর ভালো লাগা, ভালোবাসা সবকিছু আমাদেরই মতো। আমাদের মতোই আঞ্চল্য-পরিজন আর বাড়িয়ার ফেলে তারা এসেছে রণাঙ্গনে। যুদ্ধ কোনোকালে কোনো কিছু সৃষ্টি করে না। করে শুধু ধূংস আর বয়ে আনে বীভৎস মৃত্যু অনেক অযুল্য প্রাণের। তাই যুদ্ধকে কামনা করে না কেউই। বিবেকবান মানুষমাত্রেই প্রতিজ্ঞন করে থাকেন যুদ্ধ-বিরোধী ভূমিকা। ভিয়েতনাম যুদ্ধকে নিয়ে বার্টাউন রাসেলের মতো প্রশংসনীয় গভীরভাবে ব্যবিত হন, হন পীড়িত। সেই যুদ্ধের বিরুদ্ধে পৃথিবীব্যাপী তাই তিনি গড়ে তুলতে সদা সচেষ্ট আমেরিকার বিরুদ্ধে বিষ্ণের শান্তিকামী মানুষের এক অভিন্নতা পরিশাল ফোরাম। আমাদের বাংলাদেশের যুদ্ধ এবং নারকীয় হত্যাযজ্ঞ নিয়েও সারা বিশ্বের বিবেকবান মানুষের এক প্রবল জনসমর্থন গড়ে উঠছে, যা পাক দখলদার বাহিনীর জুলাও সৃষ্টি করেছে এক অস্তিত্বকর পরিস্থিতির।

সকালে মাইনের আঘাতে দু'জন খানসেনার হতাহতের সংবাদে কেনো যে যুদ্ধের দর্শন নিয়ে একথাণ্ডলো মনের পর্দায় ঝেঁকে ওঠে বলতে পারি না। হয়তো অবচেতনে যুদ্ধ-বিরোধী মানসিকতা লালন করায় এমনটা ঘটে থাকবে। কিন্তু সেটা বেশিক্ষণ স্থায়ী হবার সুযোগ পায় না। ছেলেদের হৈচৈ, আনন্দ-ফুর্তি এ ভাবনায় ছেন টেনে দেয়। তখন পকেট থেকে নেট বই বের করে ৭ নভেম্বর ১৯৭১ সালের তারিখের বিবরণীতে এই কথাণ্ডলো লিখি, ‘ওয়ান পাক আর্মি ইজ কিল্ড অ্যান্ড ওয়ান ইজ সিরিয়াস্লি ইনজিউর্ড বাই আওয়ার মাইন এপি-১৪ অ্যাট নিমাইপাড়া বিহাইন্ড বোর্ড অফিস...।’

একরাত্মুল ও বকরকে হাইড আউটের দায়িত্বে রেখে পিন্টুসহ দু'জন সাইকেলযোগে রওনা দিই ত্রাক্ষণপাড়ার উদ্দেশে।

জলপাই রঞ্জ পোশাকের সৈনিক এবং ডাক্তি কার্ড সমস্যা

পাকা সড়ক ধরে এগুতে এগুতে চাউলহাটি আসি। আমাদের সেই পরিচিত পুকুর, দীর্ঘদিনের আস্তানা। পুকুরের তেতরে দেখা যায় সার সার তাঁবুর ছাউনি। হয়তো নতুন কোনো ভারতীয় ইউনিট এখন সেখানে তাঁবু ফেলেছে। সোজা সান্ত্বনা ধরে ভজনপুরের পাকা রাস্তায় এসে উঠি অবশেষে। কিন্তু সামান্য এগুতেই বাধা আসে একজন ভারতীয় সেনার তরফ থেকে। রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে সেন্ট্রির দায়িত্ব পালন করছিলো।

জলপাই রঙের পোশাক গায়ে সৈনিকটির মাথায় কাপড়ের টুপি। কাঁধে এস. এল. আর ঝুলিয়ে সৈনিকটি কঠিন মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে। আমাদের দু'জনের কাঁধেই টেনগান বোলানো। সাথে রয়েছে শক্রের কাছ থেকে দখল করা একটা রাইফেল, দালালদের বাড়ি থেকে সিজ করা দুটো সিভিল গান। গতকালকের যুদ্ধে পাকবাহিনীর কাছ থেকে দখল করা চাইনিজ রাইফেলের চকচকে শুলির সেই বেল্টটি।

সৈনিকটি আমাদের গভর্নোর করে পিটপিটে ঢোকে তাকায় আমাদের অন্তর্গতলোর দিকে। এবং ফিরে ফিরেই তার ঢোক দিয়ে পড়ে চকচকে চাইনিজ শুলির মালাটির দিকে। তার ঢোকে-মুখে রীতিমতো সন্দেহের ছাপ। সে বলে, কাহারে আতা হ্যায়! কিধার যায় গাঃ কৌন হ্যায় তুম লোগ?

তার জিজ্ঞাসার মুখে তাকে বলি, হাম লোগ এফ.এফ. হ্যায়। মুক্তিফৌজ। হাম দোনো কমান্ডার হ্যায়। রিপোর্ট করনে কি লিয়ে হেড কোয়ার্টার যাতা হ্যায়।

— নেহি হোগা, জানে নেহি সাকে গা। ইধারহে কোই আদমি কো জানেকা পারমিশন নেহি হ্যায়।

কী বিপদের মধ্যে পড়া গেলো! পুরো ভজনপুর এলাকাতেই দেখছি তারতীয় বাহিনী তার প্রতিরক্ষা জাল বিস্তার করে বসে আছে। আর এই প্রতিরক্ষা সীমানার ভেতরে যাতে কেউ চুক্তে না পারে, তার জন্যই নিয়োগ করা হয়েছে এই সেন্ট্রি ব্যাটারকে। কী আর করা, তাকে নানাভাবে বোঝানোর চেষ্টা করি হিন্দি-বাংলা আর ইংরেজি মিশিয়ে। কিন্তু বিরস মুখে সৈনিকটি কিছুতেই পথ ছাড়তে রাজি নয়। সে জানতে চায়, সাইকেলের ক্যারিয়ারে বাঁধা চাইনিজ রাইফেলের শুলির মালা এবং বন্দুক-রাইফেল প্রসব আমরা কোথা থেকে পেয়েছি? তাকে জানাই যে এগুলো আমরা পাকসেনাদের সাথে যুদ্ধ করে দখল করেছি। তখন সে বড়ে বড়ে ঢোক করে কিছুটা অবিশ্বাস অন্তর্সন্দেহ প্রকাশ করে মাথা নাড়তে থাকে। আর এই রকম অবস্থায় একটা জেদ চেপে রাখেননে।

তাকে মোটামুটি কঠিন সূরেই কল্পনা দেখিয়ে জি, হাম দোনো মুক্তিফৌজকা কমান্ডার হ্যায়। রিপোর্ট দেনে কি লিয়ে হাম লেকে সাতা হ্যায় হামরা মেজের সাব কা পাশ। মেজের সন্দর্ভে ইয়ে সেন্ট্রের কমান্ডার হ্যায়। আপ হামকো যানে নেহি দেগা তো বহুত খারাপ হ্যে যায়েগা। আপকা বিপদ হোগা। হামলোগ রিপোর্ট নাহি করেঙ্গে তো হামরা মেজের সাব নারাজ হোগা।

শেষের কথাগুলো উচ্চারণ করতেই কাজ হয়। বিরস মুখের সেন্ট্রি নরম হয় কিছুটা। তখন সে বলে, ঠিক হ্যায় ডান্ডি কার্ড দেখাও।

এই এক সমস্যা পেশাদার সৈনিকদের নিয়ে। কথায় কথায় তারা ডান্ডি কার্ড তথা আইডেন্টিটি কার্ড দেখতে চায়। পিন্টু তখন তার বাংলা জবানিতে বলে, শালা অ্যাটেও ডান্ডি কার্ড। ভেতরেও পাকখানেরা ডান্ডি কার্ড চায়, এপারের খানেরাও ডান্ডি কার্ড দেইখবার চায়, য্যালা হামরা কোটে পাই ডান্ডি কার্ড!

সেন্ট্রি একজন জাত পেশাদার সৈনিক। সেনাবাহিনীর কঠিন শৃঙ্খলাবোধের নিগড়ে সে আবন্ধ। তাকে বলা হয়েছে এ রাস্তা দিয়ে কোনো অপরিচিতকে না যেতে দিতে এবং যদি কাউকে যেতে দিতেই হয় তবে, তার আইডেন্টিটি কার্ড বা পরিচয়পত্র তাকে পরীক্ষা করে দেখতে হবে তালোভাবে, এজন্য যে আগস্তুক শক্তি, না মিত্রপক্ষের লোক, সেটা যাচাই করে দেখবার জন্য।

আমাদের পরনে কালো শার্ট আর লুঙ্গি। সিভিলিয়ানের পোশাকে দু'জন সশস্ত্র যুবক তার সামনে দাঁড়িয়ে। তাদের সাইকেলে বোলানো রাইফেল, সিভিল গান আর চকচকে চাইনিজ

ରାଇଫେଲେର ଏକଟା ବଡ଼ୋସଡ଼ୋ ଶୁଳିର ବେଳେ । ଚାଇନିଜ୍ ଅଞ୍ଚଳ ଆର ଗୋଲାବାରଙ୍ଗଦ, ଯା ବ୍ୟବହାର କରେ ଥାକେ ଶକ୍ତି ପାକ୍ସେନାରୀ । ତାର ସନ୍ଦେହଭାବୀ ଦୃଷ୍ଟି ସେବିକେ । ପିନ୍ଟୁର ମୋଟାସୋଟୀ ଆସ୍ଥାବାନ ଭାବି ଶରୀରକେଣେ ତାର ସନ୍ଦେହ । ଏଟାଇ ଶାଭବିକ । ସେନ୍ଟ୍ରି ସେନାଟିକେ ଠିକ୍ ଦୋଷ ଦେଯା ଯାଇ ନା । ସାମନେ, ଠିକ୍ ହାତେର କାହେଇ ତାର ଅମରଖାନା ଫ୍ରୁଟ । ଦିନରାତ ଶକ୍ରବାହିନୀର ସାଥେ ଯୁଦ୍ଧ ଚଲାଇ । ଏଇକମ ଅବସ୍ଥା ସେବିକ ଥେବେଇ ଆଗତ ଅପରିଚିତ ଦୁଇ ଶଶ୍ରୀ ଯୁବକକେ ସେ ସନ୍ଦେହ କରାତେଇ ପାରେ ।

କିନ୍ତୁ ଆମାଦେର ତୋ ଆଇଡେନ୍ଟିଟି କାର୍ଡ ଦେଯା ହୁଏ ନି । ଏ ଫ୍ରୁଟେର କୋଣେ ଏଫ୍.ୱ୍ୱେ. -ଏରେ ଆଇଡେନ୍ଟିଟି କାର୍ଡ ନେଇ । ଛେଲେର ଛୁଟିଛାଟାତେ ବା କୋଣେ କାଜେ ଗେଲେ ତାର ନାମ, ଏଫ୍.ୱ୍ୱେ. ନେବର ଲିଖେ ଦିଯେ ଏକଟା ପ୍ରତ୍ୟଯନ୍ତର ଦେଯା ହୁଏ ଶାଦା କାଗଜେ କିଂବା ଇଉନିଟ ବେସେର ଛାପାନୋ ପାଇଁ । ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମାଦେର ପରିଚିତି ନିଯେ କଥନେ କୋଣେ ରକମ ବୁଟ୍ଟାମେଲା ହୁଏ ନି । କିଂବା ହତେ ହୁଏ ନି କୋଥାଓ କୋଣୋରକମ ଚ୍ୟାଲେଜେର । ଆଇଡେନ୍ଟିଟି କାର୍ଡ ଯେ ରାଖା ଦରକାର, ସେଟା ଏ ଯାଏ ମନେଇ ହୁଏ ନି ।

କିନ୍ତୁ ଏଥିନ ତୋ ପରିଚିତି ସାମାଲ ଦିତେ ହେବ । ଆର ତାଇ ହଠାତ୍ କରେଇ ଯାଥାଯ ଏକଟା ବୁଦ୍ଧି ଖେଲେ ଯାଇ । ଚଟ କରେ ପକେଟେ ହାତ ଢୁକିଯେ ଆମାର ଛାପାନେ ଭାଁଜ କରା ଲେଟାର ହେଡ ପ୍ଯାଇ୍ ବେର କରେ ଆନି, ଯାର ଓପରେ ଲେଖା ଆହେ ଆମାଦେର ଚାହିଦାଗୁଲୋ । ଆର ଯେଟା ସଙ୍ଗେ କରେ ଯାଚିଛି ହେଡ କୋଯାର୍ଟାରେ, ସେଟା ଏଗିଯେ ଦିଇ ସେନ୍ଟ୍ରିର ଦିକେ । ଇନ୍ଦ୍ରିଜି ହରଫେ ଆମାର ନାମ ଏବଂ ପରିଚିତି ଛାପାନୋ ରସେହେ ପ୍ଯାଡେର ମାଥାଯ । ସେଟା ଭାବେ କେବେ ନେଡେଚେଡେ ଚୋଥ ବୁଲିଯେ ଦେଖେ ମେ । ତବେ ପଡ଼େ ବା ଦେଖେ କିନ୍ତୁ ବୁଝିତେ ପାରେ କି ନୁ ବୈବାଧୀ ଯାଇ ନା । କିନ୍ତୁ ଏତେ କରେ ମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଏ । ଯାଥା ନାଡିଯେ ସମ୍ବିତ୍ସୂଚକ ସୁରେ ମେ ଯାଇଲେ, ଠିକ୍ ହ୍ୟାଯ ଆପ ଯା ସାକ୍ତା ।

କିନ୍ତୁ ପିନ୍ଟୁ! ଓରତୋ ଲେଟାର ହେଡ ପ୍ଯାଇ୍ ହେଇ । ଆମାର ମୁଖେର ଦିକେ ତାର ଜିଙ୍ଗାସୁ ଦୃଷ୍ଟି । ତାର ମାନେ ତାକେଓ କି ଡାଙ୍କି କାର୍ଡ ଦେଖାଇଛେବେ?

ତାକେ ତଥନ ବାଲ୍ମୀୟ ବଲି, ଶ୍ରୀମତୀ ନୋଟ ବିହିଟା ବେର କରେ ଦେଖାଓ । ମନେ ହୁଏ, ବ୍ୟାଟା ଲେଖାପଡ଼ା ଜାନେ ନା । ପିନ୍ଟୁ ତାଇ କରିବ । ବୁକ୍ ପକେଟ ଥେବେ ତାର କାଳୋ ରଙ୍ଗେ ନୋଟ ବିହିଟା ବେର କରେ ତାର ନାମ ଓ ପରିଚିତି ଲେଖା ପ୍ରଥମ ପାତାଟା ବେର କରେ ସେନ୍ଟ୍ରିର ସାମନେ ମେଲେ ଧରେ ଏବଂ ବେଶ ଶାର୍ଟ ଗଲାଯ ବଲେ, ଏହି ତୋ ମେରା ଡାଙ୍କି କାର୍ଡ । ଲିଜିଯେ ଦେଖିଯେ । ସେନ୍ଟ୍ରି ସେଟା ହାତେ ନିଯେ ଦେଖେ ଏବଂ ବୁଝିବାର ଚେଟା କରେ । ତାରପର ତାତେଇ ମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁୟେ ବଲେ,

— ଠିକ୍ ହ୍ୟାଯ, ଆବତି ଯା ସାକ୍ତା ।

ଆମରା ଦୁଇଜନ ହେସ ଉଠି । ଆମାଦେର ହାସି ଦେଖେ ବିରସ ମୂର୍ଖ ସେନ୍ଟ୍ରିର ମୁଖେର ହାସି କୋଟେ । ତାକେ ବଲି, ଓଞ୍ଚାଦ ଦୋଯା କିଜିଯେ ଗା । ଏତେ ଖୁଶି ହୁଏ ମେ । ହାତ ତୁଳେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରାର ଭଙ୍ଗିତେ ବିଦାୟ ଜାନାଯ । ସେନ୍ଟ୍ରିକେ ବୋକା ବାନାତେ ପେରେ ପିନ୍ଟୁ ଭୟାନକ ଖୁଶି ।

ମେ ବଲେ ଓଠେ, ବ୍ୟାଟା ବୁଦ୍ଧ କି ବୁଝାଲେ କନତୋ? ଆପନାର ତୋ ପ୍ଯାଡ ଆର ଆମାର ନୋଟ ବିହିଟା, ଉଯାତେଇ ଖୁଶି ହ୍ୟାଯା ଗେଲେ ବ୍ୟାଟା । ଟ୍ରେନିଂ-ଏର ସମୟ ଏମାର ମାଥାତ ବୁଦ୍ଧି ର୍ୟାଦା ମାରିଯା ବ୍ରେନ ସମାନ କରି ଦେଇ... ।

ଏର କଥାର ଭଙ୍ଗିତେ ହାସି ପାଇ । ତାଇ ବଲି, ବାଦ ଦାଓ ତୋ, ବେଚାରା ହେବେ ତୋ ନିଯେହେ ଅବଶେଷେ! ନାଓ, ଏବାର ଚଲୋ ।

ଏରପର ଦୁଇ ଯୁବକ ପାକା ରାତା ଧରେ ସାଇକେଲ ଚାଲିଯେ ଏଗିଯେ ଯାଇ ଆମାଦେର ହେଡ କୋଯାର୍ଟାର ଅଭିମୁଖେ ।

ব্রাহ্মণপাড়া সাব-সেন্টার হেড কোয়ার্টার

বড় ভাই নুরুল হক সাব-সেন্টার হেড কোয়ার্টারে নিজেকে বেশ গুছিয়ে নিয়েছেন। আমাদের দুজনকে স্বাগত জানান তিনি তাঁর মনের সবচুক্ত আন্তরিকতা দিয়ে।

মহা হৈচে অবস্থা এখানকার। পাকা রাস্তার ডান ধারে একটা গৃহস্থ বাড়িকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে সাব-সেন্টার হেড কোয়ার্টার। জায়গাটার নাম ব্রাহ্মণপাড়া। ভজনপুর থেকে ৪/৫ মাইল পিছিয়ে তেঁতুলিয়ার দিকে যেতে এর অবস্থান। বাড়ির সামনেকার প্রশস্ত চতুর এবং আশপাশের শুকানো ডাঙা জমিতে গড়ে তোলা হয়েছে এই হেড কোয়ার্টার। একচালা টিনের ছাউনির লম্বা লম্বা ব্যারাক, তাঁবুর সারি এবং পরিত্যক্ত ঘরবাড়িতে হেড কোয়ার্টারের লোকজনের থাকবার জায়গা করা হয়েছে।

এখানে কর্মসূল মানুষজনের অধিকাংশই ই.পি.আর. বাহিনীর সদস্য। কিছু আনসার মুজাহিদের লোক রয়েছে আর রয়েছে বড় ভাইয়ের সাথে কয়েকজন এফ.এফ. সদস্য। মূলত ই.পি.আর. বাহিনীর লোকদের নিয়ে পরিচালিত এই হেড কোয়ার্টার একটা বড়ো ধরনের ই.পি. আর ক্যাম্প বলে প্রথম দৃষ্টিতেই এর বৈশিষ্ট্যটি চোখে ধরা পড়ে। সুবেদার মেজর কাজেমউদ্দিন সামগ্রিকভাবে ই.পি.আর.-দের দিকটা দেখছেন। এছাড়াও রয়েছেন সুবেদার, নায়েব সুবেদার পর্যায়ের জি. সি. ও, হাবিলদার মেজর, হাবিলদার, নায়েক, ল্যাঙ্ক নায়েক পর্যায়ে বেশ ক'জন এন.সি.ও। জি.সি.ও.দের ক্ষেত্রে যায় নানা কাজে শৃঙ্খলাত্ত্ব। তাদের চালচলন কথাবার্তায় বিরক্তির ভাব।

কঠিন মুখে হস্তিষ্ঠি আর তর্জনগর্জন করছেন তারা আর ফাইফরমাশ খাটাচ্ছেন জোয়ানদের।

পেছনের দিকটায় টিনের চালা দিয়ে কেলেক্ট করা বেশ বড়ো একটা লঙ্গরখানা। অনবরত চুলা জুলছে সেখানে। লঙ্গর কমান্ডারের তত্ত্বে বেশ ক'জন সেখানে রান্নাবান্না করার কাজে তৎপর। একটা তাঁবুর মধ্যে প্রেস্টেকল ইউনিট। ই.পি.আর.-এর একজন বয়োবৃদ্ধ মেডিকেল এসিস্টেন্টের নেতৃত্বে চলছে এই ইউনিটের কাজ। বেশ ক'জন খাটাচ্ছেন 'মেডিকেলম্যান' হিসেবে সেখানে।

লঙ্গরখানা আর মূল বাড়িটির মাঝামাঝি একটা জায়গায় দেখা যায় মাটি খুঁড়ে গভীর প্রশস্ত একটা কুয়োর মতো গর্ত বানানো হয়েছে। সেটা দেখিয়ে বড় ভাই বলেন, ওটা বন্দিদের রাখার জায়গা। ফ্রন্ট থেকে ধরে আনা রাঁজাকার, শান্তি কমিটির দালাল এ জাতীয় লোকজনকে কুয়োর মধ্যে রাখা হয়। এমনিতে তাদের জন্য কোনো হাজত ঘর নেই, বন্দিরা যাতে পালিয়ে না যায় সে জন্য তাদের এই কুয়োর ভেতরে রাখা হয়। ব্যাপারটা অন্তুত লাগে। ভাই কুয়োর পাশে গিয়ে নিচের দিকে তাকাই। প্রায় ১৫/২০ ফুট হবে গভীরতা। নিচে বড় বিছানো। ও থেকে ৪ জন বন্দি এখনো রয়েছে কুয়োর নিচে। আমাদের সাড়া পেয়ে তারা উন্মুখ দৃষ্টিতে ওপরের দিকে তাকায়। তাদের দৃষ্টিতে গভীর আকুলতা। মুক্তি আর জীবন ভিক্ষা চায় এমন ধারা আকুলতা যেনো ফুটে ওঠে তাদের গভীর দৃষ্টিতে।

হেড কোয়ার্টারে প্রবেশমুখে আমাদের জিজ্ঞাসাবাদের সম্মুখীন হতে হয়েছে সশস্ত্র সেন্ট্রি। তারপর সাইকেলে হ্যাডেল ধরে ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে সামনে পড়তে হয়েছে অনেক উৎসুক দৃষ্টির। টিকা-টিক্কনী জাতীয় কথাও কিছু কিছু ভেসে আসে এদিকওদিক থেকে। সমস্ত পরিবেশটাকে কেমন যেনো অপরিচিত মনে হতে থাকে। কেমন যেনো

পরপর আর বৃংখি অনাহৃত আগস্তুকের একটা অনুভূতি মনের ভেতরে সঞ্চারিত হতে থাকে।

মনের ঠিক এই রকম অবস্থা যখন, তখন বড় ভাই খবর পেয়ে ছুটে এসে তার প্রাণচালা আন্তরিকতা দিয়ে আমাদের অভর্থনা জিনিয়ে সাদরে বরণ করে নেন।

শক্রের কাছ থেকে দখল করা সাইকেলের সঙ্গে বাধা অঙ্গ আর গোলাবাকদের দিকে সুবেদার-হাবিলদারসহ অন্য সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে রীতিমতো গর্বিত গলায় শুনিয়ে জোরে জোরে বলতে থাকেন, দেখছেন আমাদের ছেলেরা কি করছে? তারা যুদ্ধ করছে রীতিমতো। আর তার প্রমাণ দেখেন পাকবাহিনীর কাছ থেকে দখল করা অস্ত্র আর চাইনিজ গুলি। এখানে সবাই তো বসে আছেন, যুদ্ধ কী জিনিস তাতো বোঝেন না।

বড় ভাইয়ের এ ধরনের আকর্ষিক মন্তব্য তবে শক্তিত হয়ে উঠতে হয়। মনে হয়, এই বৃংখি তাদের সাথে একটা বড়ো ধরনের ঝাগড়া লেগে গেলো। কিন্তু কিছুই হয় না। তারা বড়ো ভাইয়ের এই আক্রমণাত্মক কথায় কিছু বলেন না। বরং ক'জন এগিয়ে এসে সাইকেলের পাশে ডিড় জমিয়ে পাকসেনাদের সেই চাইনিজ গুলির চকচকে মালাটা দেখতে থাকেন। ব্যাপারটা দেখে মনে হয়, এই প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে থেকেও বড় ভাই তার স্বভাবজাত শুণপনা দিয়ে এখানে নিজের একটা শক্ত অবস্থান করে নিয়েছেন। ফলে সবার ওপরেই ভালো রকমের একটা প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছেন। এখানে তিনি সমস্ত এফ.এফ. দলের প্রধান সময়সূচী। এ কাজে তার একনিষ্ঠ প্রারদর্শী ভূমিকা এখনও তাকে একটা স্বকীয় মর্যাদার আসনে বসিয়েছে। সাব-সেন্টার কমান্ডারের প্রিয়ভাঙ্গন ঘৰে উঠেছেন তিনি, তা না হলে এখানেই ই.পি.আর-দের সাম্রাজ্যে এভাবে গুটিকৃত একটি এফ.কে নিয়ে টিকতে পারতেন না।

২৫ মার্চের ত্র্যাকড়উনের পর সব থেকে বড়ু পুলের আঘাত আসে ই.পি.আর-দের ওপর। নিজেদের ঘোরলেস সেটে তারা ধরে ফেলে পুরুষের স্বাধীনতার ঘোষণা। পিলখানা ই.পি.আর হেড কোয়ার্টারের ম্যাসাকারের সংবাদ ছাপে। উন্নত হয়ে উঠেন সেন্টার আর ব্যাটেলিয়ান হেড কোয়ার্টারের বাজলি ই.পি.আর সম্পর্কস্থল। বঙবন্ধুর পক্ষে মেজর জিয়ার ডাক আসে চৰ্ত্তাম রেডিও মারফত। দেশের অন্যান্য অঞ্চলের মতো দিনাজপুর আর ঠাকুরগাঁও সেন্টার ও ব্যাটেলিয়ান হেড কোয়ার্টারের বাজলি ই.পি.আর সদস্যরাও বিদ্রোহ ঘোষণা করে বসে। অবঙ্গিনী অফিসার আর জোয়ানদের দ্বারা বাজলি ই.পি.আর-দের নিরস্ত্র করবার প্রচেষ্টা নস্যাং করে দিয়ে তারা তাদের বন্দি ও নিরস্ত্র করে ফেলে। সীমান্তবর্তী বি.ও.পিশ্বলো থেকে ই.পি.আর-দের ক্লোজ করে নিয়ে গিয়ে তাদের শক্তি বৃদ্ধি করে। দিনাজপুর-ঠাকুরগাঁও ও পঞ্চগড়ের সমস্ত এলাকা মুক্তাখ্যল হিসেবে ঘোষিত হয়। ঘরে ঘরে স্বাধীন বাংলার পতাকা উড়তে থাকে।

দিনাজপুরের দশ মাইল এলাকায় তারা গড়ে তোলে বিরাট প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা। তারা এপিল মাসের পুরোটাই এ অঞ্চলকে স্বাধীন ও মুক্ত রাখতে সক্ষম হয়। পরবর্তীকালে পাকিস্তানি ব্যাপক অগ্রাত্মানের মুখে তাদের পিছিয়ে আসতে হয়। দিনাজপুর-ঠাকুরগাঁও-পঞ্চগড় পাকবাহিনী দখলে নিলে প্রতিরোধ বাহিনী ভজনপুরে এসে জানপ্রাণ লড়াই করে পাকবাহিনীকে অমরখানায় আটকে রেখে তেতুলিয়া থানাকে মুক্ত রাখতে সক্ষম হয়। পিছিয়ে আসা এই বাহিনীর সদস্যদের নিয়েই গড়ে উঠেছে বর্তমান ৬-এ সাব-সেন্টার। একজন মেজর ও ক্যাপ্টেন নজরবল এইসব প্রতিরোধ যুদ্ধে সাহসী নেতৃত্ব দেন। কিন্তু সব থেকে বেশি অবদান রেখে যিনি বর্তমানে মানুষের মুখে মুখে কিংবদন্তির নায়কে পরিণত হয়েছেন, তিনি হচ্ছেন সুবেদার মেজর কাজেমউদ্দিন। এ অঞ্চলের ই.পি.আর-দের বিদ্রোহ এবং মুক্তিযুদ্ধের প্রাথমিক সংগঠনের

সিংহভাগ কৃতিত্ব এই দেশপ্রেমিক সাহসী মানুষটির। তাঁর পাশাপাশি অসীম সাহসিকতা নিয়ে
বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখেন কয়েকজন সুবেদার ও নায়েব সুবেদার।

বর্তমানে এ সাব-সেক্টরে অফিসার দু'জন। ঢাকা থেকে পালিয়ে আসা পাকিস্তান এয়ার
ফোর্সের অফিসার ক্ষেয়াত্রন লিভার সদরদপ্তর। গ্রাউন্ড ফোর্সের অফিসার না থাকায় বিমান
বাহিনীর আকাশচারী পাইলট সদরদপ্তরকে এই সাব-সেক্টর পরিচালনার দায়িত্ব নিতে
হয়েছে। তিনি বর্তমানে হয়ে গেছেন মেজর সদরদপ্তর। পাকসেনাবাহিনীর অফিসার ক্যাটেগ
শাহরিয়ার। তিনি জীবনের ঝুঁকি নিয়ে পঞ্চিম পাকিস্তান থেকে পালিয়ে এসেছেন ভারতের
ওপর দিয়ে। তিনি এ সাব-সেক্টরে মেজর সদরদপ্তরের সহকারী হিসেবে যোগ দিয়েছেন।
সদরদপ্তর, শাহরিয়ার ও কাজিমউদ্দিনই এখন এই সাব-সেক্টরের মূল চালিকাশক্তি।

সদরদপ্তর সামরিকভাবে সাব-সেক্টর পরিচালনা করছেন। যোগাযোগ রাখছেন সেক্টর
কমান্ডার গ্রুপ ক্যাটেগ বাশারের সাথে। বাশার সাহেবও এরি মধ্যে কর্নেল বাশার নামে
পরিচিত হয়ে উঠেছেন। সদরদপ্তর সাহেব লিয়াজোঁ রক্ষা করছেন বাংলাদেশ সরকারের
সাথে, ভারতীয় কর্তৃপক্ষের সাথে। এছাড়াও তিনি সরাসরি কমান্ড করছেন এফ.এফদের।
পরিচালনা করছেন গেরিলা যুদ্ধ। শাহরিয়ার ভজনপুর দেবনগর প্রতিরক্ষা লাইন থেকে
সম্মিলিত মুক্তিফৌজ বাহিনীর সাহায্যে অমরখানা-জগদলহাটে পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে সরাসরি
যুদ্ধ পরিচালনা করছেন। এরি মধ্যে দুর্ঘট যোদ্ধা হিসেবে তিনি ক্রটে নাম কুড়িয়ে
ফেলেছেন। কাজিমউদ্দিন হেড কোয়ার্টারে থেকে ই.পি.আর.দের দিকটা দেখছেন, সেই
সাথে সামরিক যুদ্ধ পরিচালনায় তিনি সদরদপ্তরকে সাহায্য করছেন। মোটামুটি এই হচ্ছে
নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে ৬-এ সাব-সেক্টরের মেটিংসম্পর্ক। শাহরিয়ার ক্রটে, কাজিমউদ্দিন হেড
কোয়ার্টারে এবং সদরদপ্তর সামরিকভাবে সাব-সেক্টর পরিচালনায়। আর এই সেটআপ
দিয়েই সুন্দর ও সুশ্রূতভাবেই পরিচালিত হচ্ছে আমাদের সাব-সেক্টর।

৭. ৩১. ৭১

আকাশচারী বৈমানিক নেমে এসেছেন মাটিতে

আকাশচারী বৈমানিক তিনি। তাঁর তো যুদ্ধ করবার কথা আকাশে। শক্ত বিমানের সাথে আকাশ
যুদ্ধে অর্থাৎ ডগ ফাইটে নিয়োজিত থাকবেন তিনি পরম সাহসিকতা নিয়ে। কিন্বা অব্যর্থ লক্ষ্য
নিয়ে চিলের মতো ছেঁ মেরে মেরে তিনি শক্তির অবস্থানসমূহ তচ্ছন্দ করে দেবেন। পাহাড়া
দেবেন আকাশ থেকে তিনি নিজের দলকে। নিজেদের পদাতিক বাহিনীকে নিরাপদ অ্যাথাত্বায়
সহায়তা করার জন্য আকাশসীমা সব সময় রাখবেন যুদ্ধ। তিনি মূলত যুদ্ধ বিমান চালক। এটা
তার পেশা। কিন্তু এখন তার বিমান নেই। তাঁকে নেমে আসতে হয়েছে মাটিতে। তাই
প্রয়োজনে তাঁকে দায়িত্ব নিতে হয়েছে গ্রাউন্ড ফোর্স তথা পদাতিক বাহিনী। পদাতিক বাহিনী
পরিচালনা ও যুদ্ধের কলাকৌশল আয়ত্ত করতে হয়েছে পরম ধৈর্যের সাথে। যে বাহিনীর সাথে
তার পরিচিতি ছিলো না ভালোভাবে, সে বাহিনীকেই আজ কমান্ড ও পরিচালনা করতে হচ্ছে
তাকে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে। তাঁর নিজের ক্ষেয়াত্রন লিভার পদবির নামনিশানা কোথায় হারিয়ে
গেছে। এখন এখানে তিনি একজন মেজর। মেজর সদরদপ্তর হিসেবেই পরিচিত সবার কাছে।
এখানে অনেকেই জানে না মূলত তিনি একজন যুদ্ধ বিমানের দক্ষ পাইলট।

আমরা অপেক্ষা করছিলাম তার জন্য। কোনো কাজে তিনি শিলিঙ্গড়ি গিয়েছিলেন।

এখানে তিনি সবার কাছে বলে রেখেছিলেন আমরা এমে যেনো তাঁর ফিরে আসার জন্য অপেক্ষা করি। বিকেলে ফিরে এসেছেন তিনি। এসেই ডাক দিয়েছেন আমাদের।

মূল বাড়ির সামনেকার একটা ছোট ছনের ঘরে সদরদিন সাহেব তাঁর থাথা গোজার ঠাই করে নিয়েছেন। ঘরটি সম্ভবত এ বাড়ির গোয়াল ঘর কিংবা কাঠবড়ি রাখবার ঘর হিসেবে ব্যবহৃত হতো। সেটিকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে তাঁর থাকবার আস্তানা করা হয়েছে। পাটবড়ি দিয়ে ঘরটির বেড়া দেয়া। ভিট্টা মাটির।

ঘরের সামনে দাঢ়ানো ব্যাটম্যান আমাদের ভেতরে নিয়ে যায়। একটি কাঠের চৌকির ওপর পাতানো সাধারণ বিছানায় শয়ে ছিলেন সাব-সেন্টর কমান্ডার। আমাদের সাড়া পেয়ে উঠে বসেন। মুখে তার আন্তরিক ও আপনজনের হাসি। নীরের হাসি দিয়েই তিনি অভ্যর্থনা জানান আমাদের বসতে বলে। একটা টেবিলের ওপর ছড়ানো-ছিটানো কাগজপত্র, ফিল্ড ম্যাপ, লেখার সরঙ্গাম ও শুলি ম্যাগজিন। টেনগানটি ঝুলছে পাটবড়ির দেয়ালে। গুটিকতক চেয়ারও রয়েছে। আমরা তাতে বসি।

বড় ভাই পিন্টুকে পরিচয় করিয়ে দেন তাঁর সাথে। পিন্টুর দিকে ভালোভাবে তাকিয়ে দেখেন তিনি। মনে হয়, পিন্টুকে যেনো বেশ পছন্দ হয়েছে তাঁর। তিনি ব্যাটম্যানকে চা দিতে বলেন। চা আসে বৈকালিক নাশতাসহ। আমরা তাঁর কাছে বিগত কদিনের রিপোর্ট পেশ করি। মন দিয়ে রিপোর্টগুলো শোনেন তিনি। টুকু মেন কাগজে। কমিশনারে মুদ্দে দখল করা অনুশন্ত আর চাইনিজ বুলেটের বেল্ট ইত্যাদি দেখে তাঁর চোখখণ্ড ডেক্সেল হয়ে উঠে। নেড়েচেড়ে দেখেন সেগুলো। শক্ত হতাহতের রিপোর্ট সম্পর্কে স্কুটিয়ে স্কুটিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। এরপর তাকে আমাদের রেশন, গোলাবারুদ ও ঔষধপত্রসহ শৈল্পীগুলির পোশাক এবং জুতোর রিকুইজিশনপত্র দাখিল করি। সাথে সাথে তিনি বড় ভাই নুরুল ইকবকে রেশন ও গোলাবারুদ সরবরাহের নির্দেশ দেন। মেডিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্টকে জরুরি জরুরি কিছু ওষুধপত্রও দিতে বলেন। তবে শীতকালের পোশাক আর জুতো সরবরাহের প্রশ্নে তাকে কিছুটা চিন্তিত দেখায়।

কিছুক্ষণ ভেবে নিয়ে তিনি ছলেন, ঠিক আছে পেয়ে যাবেন কিছু শীতের পোশাক। কাপড়ের জুতো হলে চলবে?

মাথা নেড়ে জানাই চলবে। তিনি বড় ভাই নুরুল হককে এফ.এফ.-দের জন্য মুল হাতা, হাফ হাতা সোয়েটার, কফল আর জুতোর জরুরি সরবরাহের জন্য চাহিদাপত্র তৈরি করার নির্দেশ দেন। সেই সাথে বলেন, ছেলেরা সুস্থি, শার্ট আর খালি গায়ে এই শীতের মধ্যে মুদ্দ করবে, এটা হয় না। যেখান থেকে পারি আমি নিয়ে আসবো। আর দু'চার দিন কষ্ট করতে হবে, পারবেন না?

তাঁর সহজ আন্তরিকতাপূর্ণ ব্যবহার, হাইড আউটে থাকা ছেলেদের জন্য তার এই সহানুভূতি আর সহমর্মিতা আমাদের প্রায় অভিভূত করে ফেলে। সদরদিন সাহেব একজন ভালো মানুষ, এটা জানি, কিন্তু এতোটা যে ভালো, সেটা জানা ছিলো না। আমাদের প্রতিটি সমস্যার তিনি অত্যন্ত দ্রুত সমাধান দিয়ে যাচ্ছেন। এফ.এফ. ছেলেদের সম্পর্কে তাঁর ধারণা খুবই উঁচু। আর এই ধারণার ব্যাপারটা ফুটে উঠছে তাঁর আচার-ব্যবহার এবং কাজের ভেতর দিয়ে। আলোচনার এক ফাঁকেই তিনি হাবিলদার মেজরকে ডেকে আমাদের রাতে থাকবার ব্যবস্থা আর খাওয়াদাওয়ার দিকে বিশেষ মনোযোগ দেয়ার জন্য নির্দেশ দিলেন।

এক সময় তরু হলো বর্তমান যুদ্ধ পরিকল্পনা আর কৌশল নিয়ে আলোচনা। আগামী

দিনগুলোতে আমাদের সঙ্গাব্য অপারেশনগুলো সম্পর্কে তাঁকে ধারণা দিই। প্রায় ঘণ্টা দেড়কের ওপর চলে আলোচনা বৈঠক। পিন্টু শেষের দিকে বারবার ইশারা দিতে থাকে তার চোরাই কাঠ ধরা নিয়ে বি.এস.এফ.-দের সাথে উজ্জ্বল সমস্যাটার কথা পাড়বার জন্য। আলোচনার শেষের দিকে বিষয়টির অবতারণা করি।

তাকে বলি, চোরাই কাঠ ধরছিলো অধিকৃত পক্ষগুড় এলাকায়। পিন্টু সেগুলো ধরে ফেলে। মুঞ্জের সময় এই আটক করা শালকাঠের স্তপ দিয়ে কী হবে? হাইড আউটের আনুষঙ্গিক খরচ এবং ছেলেদের চিকিৎসা করাবে বলে সে কঠগুলো বেচে দিয়েছে। আর এ নিয়ে বি.এস.এফ.-রা গোলমাল বাধিয়েছে। তারা হয়তো ব্যাপারটা আপনার কাছে নালিশ আকারে জানাবে...।

সদরঢিন সাহেব আমাকে কথা শেষ করতে না দিয়েই বলে ওঠেন, পিন্টু ঠিকই তো করেছে। আমাদের কাঠ আমরা বেচবো, তাতে ওদের কি? ঠিক আছে, কোনো অসুবিধে নেই। এ ধরনের কাজ আরো করতে হবে। ভবিষ্যতে যেনো আমাদের কোনো জিনিসই অকুপায়েড এলাকায় না যায়।

অতএব পিন্টুর সমস্যা শেষ।

সাব-সেক্টর কমান্ডারকে অ্যাটেনশন হয়ে স্থান জানিয়ে আমরা বেরিয়ে আসি। তাঁর সাথে আলোচনা বৈঠকে মন্টা সত্যিই ভরে যায়। দীর্ঘদিনের পুষে রাখা একটা যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাওয়া যায় অবশ্যে। সেটা হচ্ছে আমাদের নিষ্ঠাত্বের মানুষের সাথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্নতার যন্ত্রণা। সদরঢিন সাহেব আমাদের এই স্টোরিদিনের পুষে রাখা মনোবেদনার ব্যাপারটা পুশিয়ে দিয়েছেন ঘোলআনা। পিন্টুর মুখ অব্যুক্ত আকাশের মতো নির্মল হয়ে যায়। বেশ ক’দিন একটা চাপা ভীতি তাকে প্রাণ করে রেখেছিলো। সেটা থেকে মুক্ত হয়ে আবার হাসিখুশিতে তার চরিত্রের মূলে ফিরে আসে।

আয়েশ করে একটা সিগারেট ধরিয়ে সলে শা... বি.এস.এফ. য্যালা কোনঠে যাইমেন? পিন্টুর পুশি হওয়ার ভাবটা বড় ভয়ঙ্গিমা আমাদেরও প্রভাবিত করে।

ইতিমধ্যে দেখা হয়েছে ক্যাপ্টেন শাহরিয়ার ও কাজেমউদ্দিন সাহেবের সাথে। কৃশ্ণলাল জিগ্যেস করেছেন তারা। বলেছেন, সময় করে তারা আসবেন আমাদের হাইড আউটগুলোয়।

লঙ্ঘনখনার সামনে আসতেই একজন সালাম দেয় পায়ে হাত দিয়ে। তারপর মুখে হাসি টেনে বলে, যোক চিনিবার পারহিছেন স্যার? চিনতে পারি না তাকে। তার দিকে জিজাসু দৃষ্টিতে তাকাই। তখন সে তার পরিচয় দিয়ে বলে, মুই রাজাকার দেলোয়ার হোসেন। মারেয়ার মুঞ্জে যোক তুমহারালা ধরিছিলেন।

আরে তাই তো! একেবারে চিনিবার উপায় নেই সেদিনের সেই ধৃত রাজাকার দেলোয়ারকে। তাকে বলি, শালা, তুই বাঁচি আছিস? এখানে কেনো তুইঁ!

— যোক ধরে আনে এ কুয়াত রাখিছিলু। মুই কাঁদে হেনে মেজের সাহেবের ঠে মাপ চাহিনু। মেজের সাহেব যোক মাপ করে দিছে। মারে নাই। আঞ্চাহ উমার ভালো করিবে।

— কিন্তু তুই তো শালা রাজাকার। তোর বিশ্বাস কিরে?

— না-হায়। মুই য্যালা আর রাজাকার নহো। মুই মুক্তিফৌজ হয়া গেছু য্যালা। জয় বাংলার জইন্যে মুই এলহা তুমহার মতোন মুক্তিফৌজ। জান গেইলেও আর রাজাকারোত যাম নাহি...।

ব্যাপারটা একেবারে অবিশ্বাস্য : কোথায় হাত-পা-চোখ বাঁধা অবস্থায় প্রচণ্ড এক সমৃদ্ধযুক্ত

ধৃত এই রাজাকার দেলোয়ারকে ক্যাপ্টেন নদার গাড়িতে তুলে দিয়েছিলাম। সেদিন ধরেই নিয়েছিলাম নির্বাত তার মৃত্যুদণ্ড হবে। কিন্তু সদরুন্দিন সাহেবের ক্ষমার মহৎগুণে সে বেঁচে গেছে এবং নিজেকে পুরোপুরি একজন দেশপ্রেমিক শুক্রিফৌজ বানিয়ে ফেলে এই হেড কোয়ার্টারে দৌড়্যাপ করে কাজ করছে। ঘটনাটার মধ্যে অবশ্যই একটা বড় রকমের শিক্ষণীয় আর অনুকরণীয় দিক রয়েছে। মনে মনে ভাবি, এভাবে যদি রাজাকারেরা পাকিস্তানের পক্ষ ত্যাগ করে দলে দলে আমাদের পক্ষে চলে আসতো, তাহলে এই দেলোয়ারের মতো হয়তো তাদেরকেও পূর্ণবাসিত করে মুক্তিযুদ্ধে শরিক করানো যেতো। হয়তো তারা আসবে সেদিনই, যেদিন তারা তাদের কৃতকর্মের জন্য অনুত্পন্ন হবে এবং দেশের স্বাধীনতার ডাক তাদের মনের গভীরে প্রবল আলোড়ন তুলবে।

সঙ্ক্ষার মুখে রাস্তার গাড়ি রেখে কর্নেল সুব্রাকে দু'তিনজন অফিসারসহ হেড কোয়ার্টারে ঢুকতে দেখে প্রায় আঁতকে উঠতে হয়। পিন্টু এতে ডয় পেয়ে যায়। সুব্রা যখন এসেছেন, তখন নিচ্ছয়াই চোরাই কাঠের ঘটনাটা তিনি সদরুন্দিন সাহেবের কাছে না তুলে ছাড়বেন না।

ক্যাপ্টেন শাহরিয়ার তাদের বসিয়েছেন প্রবেশমুখের খোলা চতুরে বড়ে গাছটির নিচে। মাঝখানে টেবিল রেখে গোল হয়ে বসেছেন তারা পাতানো চেয়ারে। বেঁটেখাটো চৌকস অফিসার শাহরিয়ার। মুখভর্তি কালো দাঢ়ি। ইউনিফ্রেমের মতো চার পকেটওয়ালা কালো শার্ট আর প্যান্ট। ফ্রন্টের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা জরুরীভূত তারা। পা-পা করে এগিয়ে যাই আমরা তাদের আলোচনা বৈঠকের কাছাকাছি উদ্দেশ্য কাছাকাছি থেকে তাদের আলাপচারিতা শোনা।

আমাদের অনুমানই সঠিক প্রমাণিত হয়। কর্নেল সুব্রা শাহরিয়ারের কাছে চোরাই কাঠের ব্যাপারটি পেড়ে বসেন এবং রীতিমতো নালিশ করে ফেলেন পিন্টুর বিরুদ্ধে। তার নালিশ শেষ হয় এভাবে, এই আগলিং-এন্সেসে কমাত্তার পিন্টু জড়িত। হয়তো এ জাতীয় আরো কিছু শাগলিং কাজও করছে তারা। ক্যাপ্টেন শাহরিয়ার মুখ গম্ভীর করে কথাগুলো শোনেন। কিন্তু না বলে তাকান আমাদের দিকে। চোখে-মুখে তার বেশ কাঠিন্যের ভাব। কর্নেল সুব্রাও দেখেন আমাদের। কিন্তু তার চোখে-মুখে অপরিচিত মানুষের অভিব্যক্তি।

কিছুক্ষণ পর সদরুন্দিন সাহেব বের হয়ে আসেন তার ঘর থেকে। তিনি সুব্রাকে স্বাগত জানিয়ে তাঁর আগমনের হেতু জানতে চান। সুব্রা এটাওটা কথা সেরে শেষে পিন্টুর কথা পাড়েন। সদরুন্দিনকে কোনোরকম প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে শোনা যায় না।

মুখে শুধু বলেন, ইয়েস, আই নো দা ইনসিডেন্ট। আই নো মাই এফ.এফ-'স অলসো। দে আর ফাইটিং ফর লিবারেশন। দে ক্যাননট ডু এ্যানি রং, এ্যানি মিসটেইক। হইচ দে ডিড, রাইটলি দে ডিড ইট।

কর্নেল সুব্রা এ কথায় কিছুটা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যান। কিছু বলতে চান তিনি। কিন্তু সদরুন্দিন তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বলেন, লেট্স ড্রপ ইট। টেল সামথিং আবাউট আওয়ার ফ্রন্ট।

আমরা আর সেখানে থাকি না। দ্রুত চলে আসি বড় ভাইয়ের ঢিনের ঘরে। সদরুন্দিন সাহেবের এফ.এফ.-দের প্রতি অঙ্গবিশ্বাস আর পিন্টুর কাজের সমর্থনে তার এই ধরনের বলিষ্ঠ সাপোর্টের ব্যাপারটি মন একেবারে ভরিয়ে তোলে। পিন্টুর মুখও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। বড় ভাইও অত্যন্ত খুশি এ ঘটনার মুখে। মনে মনে বলি যুদ্ধের মাঠের কমাত্তার হতে হলে এ ধরনেরই হতে হয়, যাঁর থাকবে অধস্তন যোদ্ধাদের প্রতি গভীর আস্থা, বিশ্বাস, ভালোবাস।

আর তাদের সব ধরনের কাজের প্রতি সমর্থন, একমাত্র তাদের অন্যায় কোনো কাজ ছাড়া।

রাতে হাবিলদার মেজর আসেন গল্প করতে। কথায় কথায় তিনি বলেন, দাদুরা ঠিক করেছেন। 'কুল যখন খাবেন, তখন অন্যের মাথায় লবণ রেখে খাবেন। কখনোই নিজের মাথায় লবণ রাখবেন না।'

বুঝতে পারি, তিনি সদরুচিন সাহেবকে আগাম পিন্টুর ঘটনা জানিয়ে রাখবার ব্যাপারটির প্রতি ইঙ্গিত করছেন। তবে হাবিলদার মেজরের অন্যের মাথায় লবণ রেখে কুল খাবার উপমাটা ভালো লাগে। একটা দারুণ শিক্ষণীয় ব্যাপার রয়েছে এর মধ্যে। সারা জীবন মনে থাকবে এই উপমাট।

রাতটা কেটে যায় কথাবার্তা বলে আর ঘুমে-জাগরণে। সকাল ৮টার দিকে সদরুচিন সাহেবের কাছে বিদায় নিতে যাই।

তিনি বলেন, ইয়েস বয়েজ। ভালোভাবে থাকবেন। বেশি রিস্ক নেবার দরকার নেই। অহেতুক মারা যাবার দরকার নেই।

কথাগুলো তিনি এভাবে কেনে বলেন বুঝতে পারি না। কোনো প্রশ্নও করি না। তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে একসময় রাস্তায় উঠি। বড় ভাই রাস্তা পর্যন্ত এগিয়ে দেন আমাদের। এরপর সাইকেল চালিয়ে দিই আমরা। বড় ভাই রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে থাকেন। পেছনে পড়ে থাকে ত্রাঙ্গণপাড়া সাব-সেক্টর হেড কোয়ার্টার। আমরা দূরে থেকে পাকা রাস্তা ধরে এগিয়ে চলি ভজনপুরের দিকে।

১.১১. ৭৫

দেখা হবে যুদ্ধের পর যদি বেঁচে থাকি

ভজনপুর ব্রিজ পার হয়ে সামনে কিছুক্ষণ এগলেই রাস্তার ডান পাশে চমৎকার একটি লাল রঙের টিনের বাংলো টাইপের বাড়ি। বাড়িটির সামনে মাহত্বের সাহেবের হ্যাঙ্লা পাতলা হাফ প্যান্ট পরা কিশোর ছেলেটিকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। তাকে দেখে সাইকেল থামাই। দৌড়ে আসে ছেলেটা। এভাবে সে আমাদের দেখবে, সেটা ছিলো তার ধারণার পুরোপুরি বাইরে। তাকে একদিকে রীতিমতো উত্তেজিত দেখায়। চোখ-মুখও তার সেই সাথে আনন্দে উত্সুসিত। ছেলেটির নাম আবদুল হাই, ডাকনাম আবু। তাকে জিগ্যেস করি, এখানে তুই কী করছিসেরে আবু?

— খালৰ বাড়িতে আসছিলাম, এইটা তো আমার খালার বাড়ি, কিন্তু ওনারা নাই।

— কেনে নেই? প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় বাড়িটির দিকে তাকানো মাত্রই। মিলিটারিয়া ক্যাম্প করেছে সেখানে। বাড়ির সামনে-পেছনে কামান-মৰ্টাৰ এগলো বসানো হয়েছে। ভাৰতীয় সেনাবাহিনী এলাকাজুড়ে যুদ্ধ পরিচালনা কৰার মতো করে প্রস্তুতিমূলক অবস্থান নিয়েছে।

আবুকে জিগ্যেস করি, তোদের খবর কিৱে? আছিস কেমন তোৱা?

— এ রকমই। সপ্তিতি ছেলেটি চট করে উত্তর দেয়। তারপর বলে, আমাদের দেশে ফেরার কথা হচ্ছে।

— দেশে ফেরার কথা হচ্ছে মানে? এ সময় দেশে ফেরা কিৱে?

— আমি ঠিক জানি না, বাড়িতে আলোচনা শুনছি, তাই বললাম।

ছেলেটির কথায় রীতিমতো থমকে যেতে হয়। পাকিস্তান কৰ্তৃপক্ষ আন্তর্জাতিক চাপের

মুখে বেশ একটা চাল চেলেছে এখন। তারা শরণার্থী ফেরত নিতে চায় এই মর্মে জোরেশোরে প্রোপাগাণ্ডা চালাচ্ছে। তারতে চলে আসা বাংলাদেশের শরণার্থীদের দেশে ফিরবার জন্য আহ্বান জানাচ্ছে, তাই নিয়মিত তাদের প্রচার মাধ্যমগুলোর সাহায্যে। সীমান্ত এলাকায় তারা শরণার্থীদের জন্য অভ্যর্থনা শিবির তৈরি করেছে। তাদের প্রতি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করা হয়েছে এই মর্মেও প্রচারণা চালাচ্ছে। তবুও এদেশে পালিয়ে আসা মানুষদের মনে পাকিস্তানি সামরিক জাত্তার এই প্রচারণা মোটেই সাড়া জাগাতে পারে নি। বাংলাদেশ মুক্ত না হলে ফিরবে না তারা। তবে হাতেগোনা ক'জন, যারা তাদের প্ররোচনায় প্রভাবিত হয়ে ফিরে গিয়েছিলো, তাদেরকে যে চরম মূল্য দিতে হয়েছে, এ ধরনের খবরাখবরও পাওয়া গেছে অধিকৃত পঞ্চগড় এলাকায়। এ অবস্থায় তাদের ফেরার কথা ভাবার ব্যাপারটি আলোড়িত করে মনকে। তখন মনে ভেসে উঠে সেই মুখ।

সেবার কোর্টগোছ থেকে ফিরবার সময় সকালের সোনাখরা রোদে ও বাড়ির পেছনে দাঁড়িয়েছিলো গাছের সাথে শরীর ঠেকিয়ে একলা-একা এক বিষণ্ণ প্রতিমার মতো। তার জন্যই তো মধ্যাবিষ্ঠ চাকুরে অরাজনৈতিক ভদ্রলোকটির সপরিবারে এ পারে আসা। তাহলে তারা ফিরবার কথা ভাবছেন কেনো? একটা অজ্ঞানা শক্ত মনের গভীরে কাঁটার মতো বিধিতে থাকে। চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকি এ অবস্থায় কিছুক্ষণ।

তখন কিশোর ছেলে, সেই আবু, সাইকেলে হ্যান্ডেল ধরে টানাটানি করতে থাকে। সাথে তার বিনীত অনুরোধ, চলেন না আমাদের ওখানে। ক্ষেত্র দূর না। নদী পার হয়ে সাইকেলে এক ঘন্টার মতো লাগবে।

পিন্টুর দিকে তাকাই। ওর মুখে প্রবল ঝঁঝঁক্য। অফুরান জীবনী শক্তিতে ভরপূর সঙ্গীব ছেলে পিন্টু। কোনো কিছুতেই ওর না ক্ষেত্র বলে সে, চলেন না যাই, দেখে আসি ব্যাপারটা।

অতঃপর আর কথা হয় না। অফুরান যায় সোজা উঠে পড়ে পিন্টুর সাইকেলের সামনের রাজে। আমরা আমাদের গতিপথ স্লেটে রওনা দিই কোর্টগোছমুখী হয়ে।

প্রায় ঘণ্টা দেড়েক লাগে গত্বাহ্নলে পৌছুতে। বাড়ির সামনে পুরুষটার ধারে আমরা সাইকেল থেকে নামার সঙ্গে সঙ্গেই ভেতর বাড়িতে আমাদের উপস্থিতির খবর পৌছে যায়। মাহতাব সাহেবসহ বাড়ির লোকজন বেরিয়ে আসেন। উক্ষেত্র চুল, কুকু চেহারা, কাঁধে টেনগান বোলানো দুই যুবককে দেখে তারা প্রথমে থমকে যান। মাহতাব সাহেব খুব আনন্দিত হয়েছেন আমাদের দেখে। এগিয়ে এসে তিনি আন্তরিকভাবে অভ্যর্থনা জানান।

বাইরের ঘরে বসার ব্যবস্থা হয়। দেয়ালে সাইকেল ঠেকিয়ে আমরা সেখানে বসি। কাঁধ থেকে টেনগানটা নামিয়ে রাখি তক্ষপোশের ওপর। বাড়ির মুরব্বিসহ ছেলেছেকরারা ছেঁকে ধরে থাকে আমাদের। বেলা সাড়ে এগারোটা-বারোটার মতো সময় তখন। অনেকদূর সাইকেল চালিয়ে আসতে হচ্ছে। ক্লান্তি এসে ভর করে শরীরে। কিন্তু সমবেত উৎসুক সবার পশ্চের শেষ নেই। নানা কথা জানতে চান তারা। পিন্টুই বেশির ভাগ কথার জবাব দিয়ে চলে।

মাহতাব সাহেব কিছুক্ষণের মধ্যে ভেতরবাড়ি থেকে চা-নাস্তা নিয়ে আসেন। অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত দেখায় ভদ্রলোককে। রমজান মাস চলছে। ওরা হতো রোজা রেখেছেন। রোজার মধ্যে এই ছেকেধরা মানুষজনের মধ্যে কিছু মুখে তুলতে কেমন যেনো অবস্থি লাগে। তিনি বলেন, দুপুর হয়ে গেছে ভাত না খেয়ে কিন্তু যেতে পারবে না, যা হয় চারটা খেয়ে যেতে হবে।

না বললেও এখন যাবার উপায় নেই। তাই তার প্রস্তাবে সায় দিতেই হয়। তিনি চলে যান আবার ভেতরবাড়িতে। ঠিক এই সময় তরুণ বয়সী সফিটল অর্থাৎ মুন্না লাজুক হাসি হেসে এগিয়ে আসে। জিগ্যেস করে, মামা কেমন আছেন?

আপন বোনের ছেলে মুন্না। রাজশাহী ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের মেধাবী ছাত্র। এই পরিবারগুলোর সাথেই বাস করছে সে দেশ থেকে আসার পর থেকে। সেই মারেয়া এলাকায় কালিয়াগঙ্গের হাইড আউটে এক অক্ষকার রাতে বিধ্বস্ত অবস্থায় হাজির হয়েছিলো সে গত সেকেন্ডে। বৃক্ষিমারী থেকে ফিরেছিলো সে কমিশন্ড অফিসারের জন্য পরীক্ষা দিয়ে। সেই ছিলো তার সাথে শেষ দেখা।

পিন্টুকে ঘরের লোকজনের সাথে বসিয়ে রেখে মুন্নাকে নিয়ে বাইরে চলে আসি। ছেলেটা এর মধ্যে বেশ কিছি আর কেমন উদ্বৃত্তের মতো হয়ে গেছে। বাড়ির সামনেকার পূরনো আম গাছটার ছায়ায় দাঁড়িয়ে ওর দিকে তাকাই ভালো করে। কিছু একটা ঘটেছে যেনো, কেমন একটা অস্ত্র অস্ত্র ভাব চোখে-মুখে, দেহের পরতে পরতে। জিগ্যেস করি, কী হয়েছে রে মুন্না?

— ভীষণ বিপদ মামা! হতাশা জড়ানো গলায় উত্তর দেয় সে।

— বিপদ? কীসের বিপদ? জানতে চাই উৎকঠিত হৰে।

— বি.এস.এফ ক্যাম্প থেকে খবর পাঠিয়েছে। না গেলে ধরে নিয়ে যাবে।

— মানে?

এরপর সে যা বলে, তার সার কথা এই রকমের। এ বাড়িতে শরণার্থী হয়ে আসা পরিবারগুলোর ভেতরে ১০/১২ জন তরুণ-যুবক ছেলে রয়েছে। এরা মুক্তিবাহিনীতে যায়নি, এটা বি.এস.এফ-এর নজরে পড়েছে। ফলে তাদের কমাত্তার তাদের ধরে নিয়ে যাবার জন্য নির্দেশ পাঠিয়েছেন। মনে মনে ভাবি প্ল্যাপারটা হয়তো বি.এস.এফ কমাত্তারের কাছে যুক্তিযুক্তই মনে হয়েছে। কিন্তু আসলেও এটা এখন এদের মাথার ওপর ভাবি বিপদ বয়ে এনেছে। বুবই সংজ্ঞান আর ফুল্লুচ্ছ ছেলে মুন্না। বি.এস.এফ-এর হাতে পড়ে ছেলেটার হেনস্তা হবে, এটা মেনে নেয়া প্রয়োচনী।

তখন চট করে সিন্ধান্তটা নিয়ে ফেলে তাকে বলি, আমার সাথে চল তুই। মুক্তিযুদ্ধ করতে হলে আমার সাথে থেকে করবি তুই। যাবি!

যেনো তৈরি হয়েই ছিলো সে। কিছু না ভেবেই ঘটপট সে বলে শুঠে, যাবো মামা।

— ঠিক আছে, তৈরি হয়ে নে তা হলে। মাথা ঝাঁকিয়ে অত্যন্ত শুশি মনে চলে যায় মুন্না যুদ্ধযাত্রার সাহায্যকারী গোছগাছ করার জন্য।

বাড়ির ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে তখন মেয়েটি। অবিন্যস্তভাবে হেঁটে একেবারে আমার সামনে এসে দাঁড়ায়। মাটির দিকে চোখ লাগিয়ে বলে মা ভেতরে ডেকেছে।

এই সেই মেয়েটি যার চোখে-মুখে ছিলো নানা রঙের স্বপ্নের ভিড়। ছন্দোময় পদবিক্ষেপে সে ঘুরে বেড়াতো, পরীর মতো উড়ে যেতো হড় তোলা রিকশায় চেপে। কোথায় গেছে আজ তার সেই দিনগুলো? সময় তাকে কোথা থেকে কোথায় নিয়ে এসেছে। শরীর তার কিছু শীর্ণ হলেও মুখের সেই লাবণ্য হারিয়ে যায় নি এতেটুকু। সময় আর পরিবেশ তাকে অন্য এক রূপে পরিবর্তিত করেছে।

জিগ্যেস করি, আছো কেমন?

— ভালো, উত্তর দেয় সে চোখ নামিয়েই। তারপর চট করে মুখ তুলে চোখের ওপর

চোখ রেখে এবার সে বলে, আপনার মারা যাবার খবর পেয়ে যা খারাপ লেগেছিলো!

— আমার মরার খবর?

— না, ঠিক আপনার না, আপনাদের ফ্রন্টে একজন কোম্পানি কমান্ডার মারা গেলো না, তখন আমরা খবর পেয়েছিলাম আপনি মারা গেছেন...। আমতা আমতা করে কথাগুলো বলে সে। মনের ঔৎসুক্য দমন করতে পারি না। তাই বলি, তারপর?

— তারপর আবার কি? আক্রা-মার মন খুব খারাপ। অন্যদেরও। আমি সারারাত কেঁদেছি...।

বলে কি মেয়েটা! যুদ্ধে আমি মারা গেছি আর সেই শোকে-দুঃখে সে সারারাত ধরে কেঁদেছে! এবার সামনে নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকা মেয়েটির দিকে তাকাই। মনের গভীর প্রদেশ দিয়ে একটা ঝিল্প ঝর্ণাধারা আপন গভিতে বয়ে চলে। মন থেকে নিজেকে শোনালোর মতো করে এই কথাগুলো বলতে শনি, না, এই জীবনপণ যুদ্ধ, মৃত্যু, নিষ্ঠুরতা আর বীভৎসতার ভেতরে বনে-জঙ্গলে, শীত-শৈঘ্ৰে, ঝাড়-বৃষ্টি আৰ নানা প্রতিকূল অবস্থার ভেতরে আমার বা আমাদের যে প্রতিনিয়ত বসবাস, সেখানে আমি একা নই। রয়েছে কেউ একজন আমাকে নিয়ে ভাববার। রয়েছে তার ভালোবাসার পিছুটান। সামনে দাঁড়িয়ে থাকা স্বপ্নের সেই মেয়েটির দিকে তখন আরো ভালো করে তাকাই। দেখি তার লাবণ্যমাখা মুখখানি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে।

জলি আর লাবু নামের বাঞ্চা ছেলেমেয়ে দুটি আসে আপনাদের বাড়ির ভেতরে যাবার তাড়া নিয়ে। নতুন একটা উপলক্ষ্মিতে সারা মন অমৃত ভরে রয়েছে। আর সে অবস্থায় পিন্টুকে ডেকে নিয়ে ভেতরবাড়ির দিকে যাই। মেয়েটির দিকে আড় চোখে তাকিয়ে পিন্টু দু'বার হেঁচেট খায়, ঘরের নিচু বারান্দার টিনের সৌন্দর্ধ ধড়াম করে মাথায় বাঢ়ি খায়। যুদ্ধের মাঠের সাহসী কমান্ডার এভাবে একজনকে দেখে প্রায় বেসামাল হয়ে যাবে, সেটা ধারণাতে ছিলো না। কেমন বোকার মতো হাসচ্ছে সেখা যায় তাকে।

মেঝেতে পাটি বিছিয়ে থাবার ভাঙ্গাজন। ধৰধৰে সাদা রেশনের চালের ভাত। সাথে ডাল-মাছ আর কিছু ভাজিটাকি। আন্তরিকভাবে পরিবেশন করেন মাহত্বাব সাহেবের স্ত্রী। বারবার বলেন, এখন আমরা শরণার্থী। তেমন কিছুই যোগাড় করতে পারি নি। তাঁরা রোজা রেখেছেন। হয়তো-বা মেয়েটিও। তাদের সামনে রেখে খাওয়ার পাতে হাত দিতে হয়। খেতে খেতেই চলতে থাকে আলোচনা। প্রসঙ্গ টেনে এনে আমি মাহত্বাব সাহেবকে তাদের ফিরে যাবার ব্যাপারটি সম্পর্কে জানতে চাই। প্রশ্নের মুখে তিনি যেনেো খানিকটা অবস্তির ভেতরে পড়ে যান। তাই বলেন, এই অনিশ্চিত জীবনে আর কতেদিন থাকা যাবেং কবে যে দেশ স্বাধীন হবে ... তাই ভাবছিলাম ফিরে যাবো নাকি?

— না, যাবেন না। কথাটা বলি অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে। কঠিন ঠাণ্ডা গলায়। এভাবে কথা বলায় যেনো চমকে ওঠে ঘরের সবাই। পাশে বসে খাবার পরিবেশনরত মেয়েটিও বড়ো চোখে তাকায় আমার দিকে। তার সে চোখের দিকে তাকিয়েই আমি বলি, আপনাদের যাওয়া হবে না। ওপারের অবস্থা জানেন? গেলে বাঁচতে পারবেন? এদের বাঁচাতে পারবেন?

মাহত্বাব সাহেব যেনো কিছুটা অসহায় বোধ করেন এ কথায়। তারপর কিছুটা থতমত খাওয়া গলায় বলেন, না, যাবো বলে তো ঠিক করি নাই। এমনিতেই আলোচনা হচ্ছিল শুধু।

তার কথায় হেসে ফেলে বলি, আপনারা যেতে চাইলেও আমরা আটকে দেবো। এই ফ্রন্টের মুক্তিযোদ্ধাদের খবর দিয়ে রাখবো, যাতে যেতে দেখলেই তারা আপাদের আটকে দেয়।

— না বাবা লাগবে না। আমরা গেলে তো? তড়িঘড়ি করে বলেন, মাহতাব সাহেবের স্ত্রী। এদিককার মুক্তিফৌজদের বলার দরকার নেই, তা হলে তারা দিন-রাত এসে খোঁজ নিতে শুরু করবে। এমনিতেই তো যখন-তখন এসে তারা আস্বার করে, এটা দেন, ওটা দেন। মেয়েটারও যাথায় চুকে গেছে মুক্তিযুদ্ধ। ছেলেরা এলৈ তাদের সাথে তার যুদ্ধের গল্প শুরু হয়ে যায়। কোথায় যুদ্ধ হলো, কীভাবে হলো, আহত হলো কি না কেউ, কার কি অভাব, কে কোনদিন ক্যাপ্সে শাস্তি পেলো, কার অসুখ করেছে, কার জামাকাপড় লাগবে, এসব ঝুটিয়ে ঝুটিয়ে তার জানা চাই। আর সেই সাথে তাদের সমস্যা যেটানোর জন্য দোড়োপ। কয়েকজন ছেলেমেয়ে সে ঝুটিয়েছে তার সাথে এ কাজে। টাকা-পয়সা ও অসুখপত্র দেয়া, কখনো কখনো খাবার ইত্যাদি দেয়া। এখানে তো সবাই শরণার্থী। সবার কাছ থেকে চেয়েচিন্ত যা পায় তাই দিয়ে ছেলেদের সাহায্য করে। কিন্তু সবারই তো অভাব, কতোটুকুই-বা সাহায্য আর করা যায় ছেলেদের বলো?

কথাগুলো বলে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে থামেন ভদ্রমহিলা। তার বলা কথার ভেতরে এমন কিছু ছিলো যা মনকে ছাঁয়ে যায়। নিজেদের ফ্রন্টের কথা মনে পড়ে। মনে মনে বলি, আপনার মতো এতো প্রেহবৎসল কোনো মহিলাকে আমাদের এলাকার শরণার্থী শিবিরের বসবাসী কোনো পরিবারের মধ্যে ঝুঁজে পাই নি আমরা। যুদ্ধের জন্য নিবেদিতপ্রাণ তার মেয়ের মতো কোনো তরুণীকেও দেখি নি। মাঝের পাশে লজ্জাবন্ত মূখে বসে ফের্ন মেয়েটি হাসে মিটিমিটি।

মন বলে ওঠে, এই যুদ্ধে সবাইকে যোগ দিতে হচ্ছে ফ্রন্টে মুক্তিযোদ্ধারা যুদ্ধ করছে। সবার পক্ষে তো আর যুদ্ধে যাওয়া সভ্ব নয়। তবে আবুদের জন্য যে যতোটুকু কাজ করবে, তা যতো সামান্যই হোক না তার অবদান স্মরণীয় যুদ্ধের সাথে বিবেচিত হবে। এই মেয়েটি তার স্বল্প চেষ্টায় মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য আজ যা করছে, তা একদিন অবশ্যই মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে লেখা হবে, মুক্তিসাত্ত্বিক লিখিবার মতো দিন আসে, দেশ যদি সত্যিকারভাবে একদিন স্বাধীন হয়ে উঠে।

পড়ত বিকেলে এখানকার প্রজার হস্তয়াবান মানুষজনের কাছ থেকে বিদায় নিতে হয়। মুন্না তৈরি হয়েই ছিলো তার স্বল্প কাপড়চোপড় আর টুকিটাকি জিনিসপত্র নিয়ে। এখানে শরণার্থী শিবিরের মানবেতের জীবনযাপনের মধ্যে বসবাসরত ছিলো সজীব তাজা প্রাণের ছেলেটি। সে এখন যাচ্ছে ফ্রন্টে। তাকে এ অবস্থায় অনেকটা বীরের মতো দেখায়। সবার কাছ থেকে বিদায় নেয় সে।

মাহতাব সাহেব আর তার স্ত্রী বলেন, ভালোভাবে থেকো। দোয়া করি যেনো বিপদআপদ না হয়। বাড়ির ভেতর থেকে বের হবার সময় মেয়েটির মুখোযুবি হতে হয় আবার। ও-ই এসে জিগ্যেস করে, আর আসবেন না?

— দেখি।

— আর দেখা হবে না!

— হবে, দেশ স্বাধীন হলে যদি বেঁচে থাকি। ওর কোমল চোখের পাতা জোড়া কাঁপছিলো। চোখে টলে শিশির বিন্দুর মতো পানি। কিন্তু আমি সেদিকে চাইতেই মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছিলো সে। ভালো করে আর দেখা হয় নি।

আমরা তিন যুবক তখন সাইকেলে চেপে এগিয়ে চলেছি আমাদের ফ্রন্টের দিকে। বারবার মনের আয়নায় ভেসে ওঠে সেই স্বপ্নল মুখখানা। কানের পর্দায় বারবার আছড়ে পড়তে থাকে

সেই প্রশ্ন, আর দেখা হবে না? উর্ধ্বস্থাসে সাইকেল চালাতে চালাতে নিজের মনকেই বলতে শুনি, হয়তো হবে। হয়তো হবে না। সামনের দিনগুলোর যুদ্ধই এর প্রকৃত জবাব দিতে পারবে।

মুক্তিযোৰ্ধ্ব বেশে সফিউল ও অ্যাম্বুশের ফাঁদ

গুয়াবাড়ি হাইড আউটে মুন্ডা সেট হয়ে যায় সহজেই। বাবলু, মতিয়ার ও বকর তাকে যেনো লুকে নেয়। সবার কমন ‘ভাণ্ডে’ বনে যায় সে। এ ধরনের উৎক অভ্যর্থনা আর আপন-করা সহজ পরিবেশ এখানে তার জন্য অপেক্ষা করে আছে, এটা হয়তো ছেলেটার ভাবনাতে ছিলো না। খুবই স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে সে। আমার নিজেরও ভালো লাগে ব্যাপারটা। এখানে বিপদের ঝুঁকি আছে, কিন্তু বি.এস.এফ বা অন্য কোনো সংস্থার তরফ থেকে হেনস্টা করবার কেউ নেই।

কিন্তু শপথবাকের মতো একজনকে কথা দেয়ার ব্যাপারটি যেনে অঙ্গস্তিকর কাঁটার মতো বুকের কোথাও বিধে থাকে। দেশত্যাগ করার মুহূর্তে সেই দৃশ্যটা তেসে ওঠে ঢোকের সামনে।

মে মাসের প্রথম দিককার এক সকাল। বিভীষিকাময় অবরুদ্ধ রংপুর শহর। প্রতিরাতেই পাকসেনা বাহিনী হত্যাকাণ্ড চালাছে ঠাণ্ডা মাথায়, শহরের চারপাশের বধ্যভূমিগুলোতে ধরে নিয়ে যাওয়া মানবজনকে হত্যা করে। আর সেই অবস্থায় সীমাত্ত পাড়ি দেবার সিদ্ধান্তে শহর ছাড়ছি আমরা অত্যন্ত সংগোপনে সতর্কতার সাথে। কৃষি বিভাগের অফিসার জসিমউদ্দিন সাহেব এসেছেন আমাদের বিদায় জানাতে তেতুলতলামুড়ে। মুন্ডার বাবা তিনি। বাভাবিকভাবেই তিনি তার প্রিয়তম পুত্রকে এক অজ্ঞান অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে পাঠানোর এই সময়টায় ভয়ানক আবেগাপুতু অন্ধার হাত জড়িয়ে ধরে তিনি বলেন, ছেলেটাকে তোমার হাতে তুলে দিলাম, ওকে বাচ্চার জন্যই পাঠাই, দেখো ও যেনো মারা না যায়। যুদ্ধের পর ওকে আবার ফেরত দাবিপ্রাপ্তি তোমার কাছ থেকে...।

জসিম সাহেব, আমার বড় ভগী পাত্র সেদিন তাঁর ছেলেকে বাঁচিয়ে রাখবার নিশ্চয়তা আদায় করার জন্য আমাকে শপথ করিয়েছিলেন। সেই ছেলেটিকেই আমি নিয়ে এসেছি ফ্রন্টে। যুদ্ধের মাঠে কী হবে না হবে, সে ব্যাপারে আগাম তো কিছু বলা যায় না। তবু মনে মনে বলি, অনেকটা প্রতিজ্ঞার মতো করেই, যে করেই হোক ওকে বাঁচিয়ে রাখবোই আমরা। একরামুল আর বকরকে ডেকে ছেলেটার নিরাপত্তার ব্যবস্থা সম্পর্কে বলে দিয়েছি। বাবলু আর মতিয়ারকে বলে দিয়েছি ওকে হাইড আউটের ভেতরে হাতিয়ার চালাবার প্রশিক্ষণ দেবার জন্য। খুশি মনে এ ব্যাপারে সায় দিয়েছে ওরা দুজন।

রাতের অপারেশন তালিমায়। শক্ত যোগাযোগ পথের ওপর রাতভর অ্যাম্বুশের ফাঁদ পেতে বসে থাকার দায়িত্ব। শক্ত ফাঁদের মধ্যে পা দেয়া মাত্র ওদের বিনাশ করা এই অপারেশনের উদ্দেশ্য। হাইড আউটে বেশ ক'জন ছেলে রোজা রাখছে। রোজাদার পার্টির নেতা হচ্ছে শামসুদ্দিন। মুখে কালো দাঢ়ির জঙ্গল। মাথায় শাদা টুপি। এ বেশে তাকে কেমন হজুর হজুর লাগে। গুয়াবাড়ি হাইড আউটে থিতু হয়ে বসবার পর ছেলেদের ভেতরে রোজা রাখবার প্রবণতা বাঢ়ছে। জোনাব আলীর বাবার সঙ্গে বাড়ির স্বৃথবর্তী পাঞ্জেগানা মসজিদে তারাবির জামাতে শরিক হতেও দেখা যাচ্ছে তাদের। জন্য থেকে বয়ে নিয়ে আসা ধর্মীয় অনুভূতি আর বিশ্বাস ইত্যাদি কি আর ঝাট করে থেড়ে ফেলে দেয়া যায়ঃ মুক্তিযুদ্ধ বা জয় বাংলার জন্য যে সংগ্রাম, তাতো আর ধর্মহীন হবার বা তার বিরুদ্ধে যাবার মতো কোনো ব্যাপার নয়। যার যা ধর্ম, সে সেটা পালন করুক। ছেলেদের ধর্মীয় বিশ্বাস বা

অনুচ্ছিতি আমাদের যুক্তে বা সংখ্যামে কোনোই বিনপ প্রভাব ফেলছে না।

তাই যারা রোজা রাখে তাদের নিয়ে অপারেশনে যাবার ব্যাপারটা কেমন অমানবিক লাগে। পিন্টুর সাথে আমার নিজের সে সিদ্ধান্ত হয়েছে, সেটা হচ্ছে, যেদিন কোনো অপারেশন থাকবে না, সেদিন রোজা রাখতে হবে। রমজান মাসে ছোটবেলা থেকে রোজা রাখবার সংস্কার মাঝে মাঝে মনের মধ্যে চেপে ধরে। কিন্তু পারা যায় না দিনমান এই অস্ত্র খাটাখাটুনির এক অনিচ্ছিত জীবনে।

তালমা অপারেশনের জন্য ২০ জনের দল সাজিয়ে নিয়ে রাত নটায় রওনা দিই। এখন আর গাইড লাগে না। পথঘাট সব চেনা হয়ে গেছে আমাদের।

রাত এগারোটায় পৌছানো যায় ইঙ্গিত গন্তব্যে। সমস্ত তালমা এলাকা ঘূরিয়ে আছে। আকাশের চাঁদে অমাবস্যার ছায়াপাত। তালমা ব্রিজ থেকে নেমে আসা পথের ধারে ভেজা ঘাস আর বুনো জঙ্গলের মধ্যে বুক পেতে শুয়ে থাকি আমরা আধো জোছনা, আধো অক্ষকারের আলো-আঁধারিতে।

না, ওরা আসে না। অপেক্ষার ক্লান্তি নিয়ে রাতটা কেটে যায়। শেষ রাতে আকাশ ফর্মা হবার মুহূর্তে অ্যামবুশের ফাঁদ ফুটিয়ে নিয়ে ফিরে চলি আমরা গুয়াবাড়ির দিকে।

সোনালি ফসল ঘরে তুলবে তারা

৯ তারিখ রাতে জগদলহাট এসেছি আবার। উদ্দেশ্য খাল সাহেবদের গায়ে আলতো করে হাত বুলিয়ে দেয়া। এটা অনেকটা সেই ভিমরূপের চাকে হাতে দেবার মতোই ব্যাপার। তাদের গায়ে হাত তোলা অর্থাৎ পেছন থেকে তাদের ঘাঁটি স্পষ্ট করে গোলাগুলি তুক করলেই দলে দলে ওরা বেরিয়ে আসবে, ঠিকই ভীমরূপেরা কাজবে বেরিয়ে আসে তাদের চাক থেকে। তারা রাতের অদেখি আক্রমণকারীর উদ্দেশ্যে প্রতিটির তুবড়ি ফুটিয়ে চলবে সারারাত। তাদের আহার-নিদ্রা আর বিশ্বামীর ঘটবে ব্যাঘাত, অপচয় হবে তাদের রাশি রাশি গোলাগুলির। তাদের ব্যতিব্যন্ত করে রাখা, তাদের প্রত্যেক ক্ষয় করে দুর্বল করে ফেলা, এটাই এখন আমাদের মূল কাজ। আমরা সেই কাজটাই করতে এসেছি। আজকের দলে রয়েছে ২৫ জনের বাছাই করা শক্ত-সমর্থ ছেলে। রাত ৮টায় রওনা দিয়ে সোনারবানে কিছুক্ষণ জুরুরে ওখানে সময় কাটিয়ে রাত সাড়ে এগারোটা নাগাদ এসে পৌছেছি টার্গেটের কাছাকাছি।

শীত চেকাবার জন্য যে যে রকমভাবে পারে গায়ে চাদরের মতো কিছু একটা জড়িয়ে নিয়েছে। কেউ লুঙ্গি, কেউ বিছানার চাদর, কেউ দেশ থেকে নিয়ে আসা শীতের চাদর। পায়ের হিম শীতল ভাবটা কাটানোর জন্য স্পঞ্জের স্যান্ডেল পরতে হয়েছে। জানি, পায়ে স্পঞ্জের স্যান্ডেল নিয়ে যুক্তে আসাটা ঠিক নয়। কিন্তু বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে এ ছাড়া উপায় তো কিছু নেই। যুক্তের মাঠে এসে যুক্ত তো চালিয়ে যেতে হবেই।

জগদলহাট ঘাঁটি একদম চুপচাপ। অমরখানা ঘাঁটি কেবল সরব হয়ে উঠছে মাঝে মধ্যে। পাকা সড়ক থেকে প্রায় চারশ' গজের মতো দূরত্বে ফসলের খেতের আলের আড়ালে অবস্থান আমাদের। এবারের ঘন বর্ষায় ভালো ধানের ফসল হয়েছে। এই বিপদের মধ্যেও মানুষজন ফসলের মাঠ ফেলে রাখে নি। ধানের বাড়ত ফলনে তাজা গাছগুলো শয়ে পড়তে চায়। ক'দিনের মধ্যেই ধান পাকতে তুক করবে। ক'চা সোনা রঙে ছেয়ে যাবে মাঠের পর মাঠ। কৃষককুলের মধ্যে ভাবনার অন্ত নেই। তারা সোনালি ফসল ঘরে তুলতে পারবে কি

না, তাদের কাছে এখন সেটাই প্রধান ভাবনার বিষয় ।

মধুপাড়া, বানিয়াপাড়ার ক'জন কৃষক আজ গিয়েছিলো দিনের বেলা গুয়াবাড়ি হাইড আউটে । তাদের একটাই আরজি, ধান কাটার সময় তো এসে গেলো, কী করে তারা ধান তুলবে এই বর্ষের বাহিনীর সশস্ত্র থাবার আওতার ভেতরে থেকে? তাদের সবাইকে আশ্বাস দিতে হয়েছে এই বলে, ধান কাটাবার ব্যবস্থা করে দেয়া হবে । তবে কথাটা তখন বললেও কীভাবে সেই ব্যবস্থাটা করা যাবে, সে ব্যাপারে কোনো স্থির সিদ্ধান্তে এখনো পৌছানো যায় নি ।

এখন ধানখেতের আড়ালে শৰীর ডুবিয়ে রেখে সেই ভাবনাটা আবার সবকিছু ছাপিয়ে হানা দেয় মনে । ভাবতে থাকি, এ ধান যারা লাগিয়েছে, তাদের ঘরে তা পৌছানোর মতো একটা ব্যবস্থা করতেই হবে । সোনালি ফসল খেতে নষ্ট হয়ে যাবে চোবের সামনে, সেটা হতে দেয়া যাবে না । হয়তো এর জন্য দিনে-রাতে তুমুল লড়াই করতে হবে শক্র সাথে । হোক । তবে সে লড়াই হবে কৃষকের ফসল ঘরে তোলার জন্য ।

৮. ১১. ৭১

অঙ্গকারে দুই ছায়াসূর্তি

রাত ১২টার দিকে আক্রমণ শুরু করতে বলি মধুকে তার এল.এম.জি দিয়ে । দুটি সেকশনে বেশ ছড়ানো জায়গা নিয়ে আমাদের আজকের অবস্থান মুক্তিমাবধানে । ডানে একরামুল । বায়ে বকর । পিন্টু ২ ইঞ্জিং মর্টার নিয়ে কিছুটা পেছনে ।

মধুর এল.এম.জি সরব হয়ে ওঠে । ছুটে যেতে থাক্কেন্ট্রোশ থেমে থেমে সামনের গাছগাছালি দেরা কালো মতো জায়গাটায় শক্র অবস্থানের দিকে এস.এল.আর পার্টিকে ফায়ার ওপেন করতে বলি । সাথে সাথে গর্জে ওঠে ৮টি এস.এল.আর । সিঙ্গেল রাউণ্ড অটোমেটিক দিয়ে ঠাসঠাস শব্দ তুলে শুলি ছুটে যেতে থাকে সামনের দিকে পিন্টুর ২ ইঞ্জিং মর্টারও পেছন থেকে সাড়া দেয় । মাথার ওপর দিয়ে বাতাস কেটে দ্রুত স্ট্রাইর কেটে উড়ে যায় শোলা । বিস্ফোরণের শব্দখনি ভেসে আসে সামনে থেকে । এবার রাইফেল বাহিনীকে সরব করে তুলি । নিজের স্টেনগান থেকে ত্রাশ চালিয়ে খালি করে ফেলি ম্যাগজিন । আমাদের সবঙ্গে হাতিয়ার এখন সরব । একলাগাড়ে শুলি ছুটে যায় সামনের দিকে আগনের মুলকি তুলে । বাতাস ভরে যায় বারুদের গন্ধে ।

কিছুক্ষণের মধ্যে জগদলহাট ঘাঁটি সজাগ হয়ে ওঠে । তুমুল বেগে সাড়া দিতে থাকে তারা তাদের প্রচণ্ড ফায়ার পাওয়ার দিয়ে । পুরোপুরি যুদ্ধ শুরু হয়ে যায় দু'পক্ষেই । এখন আর মাথা তুলবার উপায় নেই ।

কিন্তু এ অবস্থা বেশিক্ষণ থাকে না । হাঁটাৎ দেবনগর কামাতের দিক থেকে জগদলহাটকে লক্ষ্য করে প্রচণ্ড আক্রমণ শুরু হয়ে যায় । বোৰা যায়, ক্যাটেন শাহরিয়ার মুক্তিফৌজের একটা ভালো শক্তিশালী দল নিয়েই আঘাত হেনেছেন শক্রঘাঁটি জগদলের ওপর । এখন শক্র সামনে-পেছনে আক্রমণ । কিছুটা ভ্যাবাচ্যাক থাবার দশা । আমাদের দিক থেকে তাদের শুলিবর্ষণের চাপ কমে যায় । তার মানে তারা আগন্যান মুক্তিফৌজ বাহিনীকে সামলাতে ব্যত হয়ে পড়েছে ।

এ অবস্থায় আমাদের শুলিবর্ষণের মাত্রা কমিয়ে আনি । মধুর এল.এম.জি এবং ৫/৭টি এস.এল.আর, রাইফেল সচল থাকে । পিন্টুকে আরো ক'টা মর্টার বোম ফেলবার নির্দেশ দিয়ে করিমকে পেছনে পাঠিয়ে দিই ।

মুক্তিফৌজ বাহিনীর চাপ ক্রমাগত বাড়তে থাকে । এ অবস্থায় পাকবাহিনী তাদের সমস্ত

ফায়ার পাওয়ার সেন্টিকে নিয়ে যায়। আমাদের অবস্থানের ওপর তাদের আর কোনো গুলি আসে না। শক্র চাপ মুক্ত হয়ে যাই আমরা। এবার আমাদের তরফ থেকে শুধু আঘাতের পালা।

মুক্তিফৌজ বাহিনী আজ যেনো মরণ কামড় দিয়েছে। সব ধরনের হাতিয়ার থেকে গুলিবর্ষণ করতে করতে ফায়ার আ্যান্ড মুভ পজিশনে তারা এগিয়ে আসছে। রীতিমতো অস্ত্র অবস্থা শক্র বাহিনীর। তারা মাটি কামড়ে পড়ে থেকে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে।

ঠিক এই রকম অবস্থায় ডান দিক থেকে দুটো ছায়ামূর্তিকে ফসলের মাঠ ধরে দ্রুত এগিয়ে আসতে দেখা যায়। তারা চিরকার করে বলছে, আমরা মুক্তিফৌজ, গুলি করবেন না।

গুলি থামিয়ে তাদের এগিয়ে আসতে দিই। তবে সামনের দিকে হাতিয়ার বাগিয়ে ধরে সর্তক অবস্থায় থাকি। ওরা সামনে আসে। একজন অপেক্ষাকৃত তরুণ। অন্যজন কিছুটা ব্যক্ত।

রীতিমতো হাঁফাতে হাঁফাতে তরুণটি বলে উঠে, আমরা জগদলহাট আক্রমণ করেছি। এগিয়ে এসে পাকা সড়ক পর্যন্ত পৌছে গেছি। সড়কটি দখলে রাখা প্রয়োজন। আমরা সড়ক দখলে রেখে জগদলের ওপর আক্রমণ চালিয়ে যাবো। সম্ভব হলে জগদলহাট আজ রাতেই দখল করা হবে। কমান্ডার আমাদের পাঠিয়েছেন আপনাদের সাথে যোগাযোগ করে এ খবরটা দিতে। আপনারা এদিক থেকে শক্র ওপর আক্রমণ চালিয়ে যাবেন... আমরা যাই খোদা হাফেজ, জয় বাংলা।

দখলে আসে কিন্তু ধরে রাখা যায় না

ছায়ামূর্তির মতো ওরা যেভাবে এসেছিলো, সেভাবেই চলে যায়। ওপার থেকে ওরা আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে জগদলের ওপর। এপার থেকে আমরা। এটা একটা কাকতালীয় যোগাযোগ। আমরা কেউই কারো পরিকল্পনা সম্পর্কে জাণে না। কিন্তু আমাদের দিক থেকে আক্রমণের ধারা টের পেয়ে সড়ক দ্রুতভাবে যুদ্ধে নিয়োজিত কমান্ডার সূযোগটা হাতছাড়া করতে চান নি। এই তুম্বল গোলার ভেতরেও এবং বিপদের ঝুঁকি থাকা সত্ত্বেও তিনি দুঁজন রানার পাঠিয়ে আমাদের সাথে যোগাযোগ করে সাপোর্ট ফায়ার চেয়েছেন। যুদ্ধের মধ্যে এক ইউনিট আর এক ইউনিটের সাহায্য-সহযোগিতা চাইবে, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু এ ঘটনার ভেতর দিয়ে যুদ্ধের একটা নতুন মাত্রা যোগ হওয়ার ইঙ্গিত লক্ষ্য করা যায়। মুক্তিবাহিনী একক শক্তি হিসেবে এখন অনেকখানি ক্ষমতার অধিকারী। এখন মুক্তিবাহিনী শুধু দূর থেকে শক্রবাহিনীর ওপর আঘাতই নয়, শক্রবাহিনীর ঘাঁটি দখলের মতো শক্তি ও অর্জন করেছে। আজকের আক্রমণের ঘটনা থেকে এটাই সুস্পষ্ট হতে চলেছে।

নিজেদের কিছুটা এগিয়ে নিয়ে আরো সুবিধেজনক জায়গায় অবস্থান নিই। বক্সুদের এখন সাপোর্ট ফায়ার দরকার। এদিক থেকে শক্র ওপর চাপ থাকলে সেটা তাদের জন্য অনেক সুবিধের হয়। সবাইকে এল. এম. জিসহ অন্যান্য হাতিয়ার থেকে থেমে থেমে গুলি চালিয়ে যাবার নির্দেশ দিই। হামাগুড়ি দিয়ে পিন্টু পেছন থেকে এসে হাজির হয়। ফিসফিসিয়ে জিগ্যেস করে,

— ব্যাপার কি মাহবুব তাই?

— মুক্তিফৌজ বাহিনী ওপার থেকে জগদলহাট আক্রমণ করেছে। পাকা সড়ক দখলের যুদ্ধ চলছে। দখলও করে নিয়েছে সম্ভবত। আজ রাতে জগদলহাট ফল করতে পারে। অপেক্ষায় থাকতে হবে আমাদের।

এরপর পিন্টু আমি হাঁটুর ওপর ভর দিয়ে সামনের দিকে চেয়ে থাকি অদ্বৰ্বত্তি শক্রঘাঁটি জগদলের দিকে তাকিয়ে। তুমুল যুক্ত চলছে সেখানে। দু'পক্ষেরই গোলা এসে পড়ছে। বিশ্বেরিত হচ্ছে মাটি কঁপিয়ে। মাথার ওপর দিয়ে তৎসীসার ছোটাছুটি চলে। মোটামুটি একটা নিরাপদ দ্রুত হেকেই আমরা সামনের দুই দলেরই মরিয়া যুদ্ধের তাঙ্গবলীলা দেখি। পচিম আকাশে ক্ষয়ে যাওয়া চাঁদ জ্বলজ্বল করে তাকিয়ে থাকে। হালকা শীতের চাদরের মতো কুয়াশার আন্তরণ। ধান গাছের শরীর ভিজে উঠছে শিশিরে। নিচে শিশির ভেজা স্যাংতসেতে মাটি। বাতাসে হিম ঠাণ্ডার স্পর্শ। বাবদের পোড়া গুঁক নাকে এসে লাগে। এর ভেতরেই আমরা অপেক্ষা করে থাকি। মনের ভেতরে একটা বড়ো আশাৰ নাচন চলে, এই বৃক্ষি জগদলহাট ঘাঁটির পতন ঘটলো! ভেসে আসলো এই বৃক্ষি মুক্তিফৌজ বাহিনীৰ বিজয়ী যোগান, 'জয় বাহ্নি'।

রাত শেষ হয়ে আসে। কিন্তু জগদলহাট শক্রঘাঁটি আৱ দখল হয় না। পাকসেনারা ঘাঁটি ধৰেই রাখে তাদেৱ শেষ চেষ্টা দিয়ে। মুক্তিফৌজ বাহিনী তখন হাল ছেড়ে দেয়। ধীৱে ধীৱে পিছিয়ে যেতে থাকে তারা। তাদেৱ গোলাগুলি কমে আসে, দ্রুবৰ্ত্তি হতে থাকে তাৱ শব্দ। কিছুক্ষণের মধ্যেই তোৱেৱ আকাশ ফিকে হয়ে আসবে। আৱ এভাৱে শক্রপুৰীৰ কাছাকাছি থাকা চলে না। পিন্টুকে তখন বলি, আজ হলো না পিন্টু, লেট আস রিট্ৰিট।

— ও.কে. বস বলে পিন্টু সম্মতি জানিয়ে সবাইকে রিট্ৰিট কৱাৱ নিৰ্দেশ পাঠায়। এৱপৰ দ্রুত সৰকিছু গুছিয়ে নিয়ে ফিৰে চলা। মনে মনে বলি, আজ হলো না, তবে, আগমাতে নিশ্চয়ই জগদলহাট আমাদেৱ দখলে আসবে।

৯. ১১. ৭১

মেঘ-ছোয়া উচু পাহাড়ৰ দেশেৱ মানুষজন সদৰুদ্দিন সাহেব বেশন, গোলাবাবুন্দিৱ শীতবন্ধৰ চালান পাঠিয়েছেন ট্ৰাকযোগে। গতৰাতে এ চালান প্ৰেৱেৱ কথা পিন্টু ভাই ত্ৰাক্ষণগাড়া হেড কোয়ার্টাৱ থেকে রানায়োগে জানিয়েছেন। সকাল ন'টায় প্ৰজাপাতিতে এসেছি প্ৰেৱিত মালামাল রিসিভ কৱতে। মুসা আৱ চৌধুৱীকে খৰৱ দেয়া ছিলো, ওৱাও এসেছে। মাল বোৰাই ট্ৰাক আসে যথাসময়ে। হেড কোয়ার্টাৱ থেকে মালামাল নিয়ে আসা বড় ভাই নুৰুল হকেৱ প্ৰতিনিধি এগিয়ে দেয় মালপত্ৰেৱ ফৰ্দ। সেটা হাতে নিয়ে চোখ বুলোতেই খুশি হয়ে ওঠে মন। পিন্টু-মুসাকে বলি, দাকুণ খৰৱ, শীতেৱ কাপড় পাঠিয়েছেন সদৰুদ্দিন সাহেব।

এ খৰৱে আনন্দে যোনো নেচে ওঠে সবাই। মুসা বলে, মেজৱ সদৰুদ্দিন আসলেই ভালো লোক। আমাদেৱ সুখ-দুঃখ তিনি সব বোৱেন।

পিন্টু তাৱ কথা লুকে নিয়ে বলে, বাবা হবে না, এয়াৱ ফোৰ্সেৱ লোক। আকাশেৱ মতো দিল তাৱ। আকাশে উড়তে উড়তে এই দিলেৱ পয়না হইছে।

পিন্টু সদৰুদ্দিনেৱ তাৱিফ কৱতেই পাৱে, কেননা, তিনি এক কথায় তাৱ চোৱাই কঠ সমস্যাটাৱ সমাধান কৱে দিয়ে বাঁচিয়েছেন তাকে। বেঁচে গেছে এ এলাকার এফ, এফদেৱ মান-সশান ইঞ্জিন। যা গড়ে তুলতে হয়েছে যুদ্ধেৱ প্ৰথম দিন থেকে তিল তিল কৱে, অসম্ভব কঠকৱ প্ৰক্ৰিয়াৱ ভেতৱ দিয়ে।

এজন্য নয়। সদৰুদ্দিন বলেছিলেন যেভাবেই হোক ছেলেদেৱ জন্য গৱম কাপড় যোগাড় কৱে পাঠাবেনই। এন্তোলো তাৱ মজুদ ভাণ্ডারে ছিলো না। এজন্য তাকে যথেষ্ট ছুটাছুটি কৱতে হয়েছে।

অবশ্যই। কোথা থেকে কীভাবে তিনি শীতের কাপড়চোপড় ঘোগাড় করেছেন সেটা তিনিই জানেন। আমাদের সমস্যাটা তিনি গুরুত্বের সাথে অনুধাবন করেছিলেন বলেই তিনি দিনের ভেতরেই তার সমাধান করে ফেলেছেন। আর তারই ফলে তিনি শীতবন্ধের প্রথম চালানটা পাঠিয়ে দিয়েছেন। সাথে রয়েছে বড় ভাইয়ের একটা চিরকুট। তাতে বলা হয়েছে, আপাতত এই প্রেরিত কাপড় দিয়ে চালিয়ে নিতে হবে: পরবর্তী সরবরাহ পাঠানো হচ্ছে শীতই...।'

কৃতজ্ঞতায় ভরে ওঠে বুক। যুদ্ধের মাঠের যুদ্ধরত যৌন্দাদের সমস্যাবলি দলপতি বা কমান্ডারকে উপলক্ষ্মি করতে হয় ভালোভাবে। অনেকে ব্যাপারটিকে অবহেলা করেন। আর এই অবহেলার দরুণ অনেক ক্ষেত্রে বড় ধরনের খেসারাত দিতে হয় ফ্রন্টের যুদ্ধরত সৈনিকদের। কিন্তু আমাদের সাব-সেন্ট্রের কমান্ডার সদরদপ্তর যে একজন সফল কমান্ডার, এতে কোনো সন্দেহ নেই।

মুসার নেতৃত্বে ছেলেরা মাল খালাস করতে থাকে। বি.ও.পির ভেতর থেকে তার সেই বিখ্যাত হসিমুখ নিয়ে নেপালি সুবেদার তখন বেরিয়ে আসেন। জিগ্যেস করেন আগের সেই উষ্ণ আন্তরিকতা নিয়ে, কেয়া দাদু আচ্ছা হ্যায়? কোই প্রোবলেম তো নেই?

— নেই দাদু, বলি তাকে। তারপর জিগ্যেস করি, আপ ক্যায়সা হ্যায় দাদু?

যেভাবেই থাকুন না কেনো, এই বুড়ো মানুষটির মধ্যে সবসময় এক চির সবুজ পরমানন্দ মানুষ বাস করে। কোনো দুঃখ-কষ্টের ক্রেশই যেনো তাঁকে প্রশংসন করে না। নিজের আনন্দ নিয়ে নিজেই মশগুল এই মানুষটি সবসময় নিজের জগতের ভেতরে থেকে তার দেশোয়ালি গান গেয়ে যান শুন্শুন করে আর আপন মনে যথে সোলান। তাকে বলি, দাদু একটো ঘর লাগেগা মালসামান রাখবে কো লিয়ে।

ছেলেরা এখন বিভিন্ন হাইড আউটে ছাড়িয়ে রয়েছে। এক সাথে সবারই কাছে মালপত্র পৌছানো সম্ভব নয়। এজন্য গড়ালবন্ধু বি.ও.পিতে একটা অস্থায়ী মজুদগার হিসেবে ঘর দরকার। এখানে মালপত্র মজুদ কর্তৃত আবার সেগুলো চাহিদা অন্যায়ী পাঠাতে হবে বিভিন্ন হাইড আউটে। নালাগঞ্জ হেচ-কোয়ার্টার এবং তার তত্ত্বাবধানে থাকবে এই মজুদ। একজনকে স্থায়ী হিসেবে রাখা হবে এখানে স্টোরকিপার হিসেবে। এ ধরনের সিদ্ধান্ত নিয়ে সুবেদারকে ঘরের কথাটা বলি।

সুবেদার শিশ বাজিয়ে সাথে সাথে সম্মতি দিয়ে বলেন, জরুর, জরুর। হামারা বি.ও.পি মে একটো স্পেয়ার ঘর হ্যায়। কোই প্রোবলেম নেই। আপ ইউজ কর সাক্তা উহু ঘর। চলিয়ে দেবেশে।

সুবেদার সাহেব আমাকে সাথে করে নিয়ে গিয়ে ঘরটি দেখান এবং সাথে সাথেই ঘরের পজিশন দিয়ে দেন। বি.ও.পির মূল ঘরের সামনে এদের পাকঘরের পাশে একচালা একটা ছেট মতো বাঁশের বেড়া দেয়া ঘর। ঘরের ভেতরে একটা ছেট কাঠের চৌকিও রয়েছে। ঘরটা পচন্দ হয়ে যায় এবং সাথে সাথে সেটা দখল পাওয়ায় আরো ভালো লাগে। সুবেদারকে কৃতজ্ঞচিত্তে ধন্যবাদ জানিয়ে বলি, থ্যাঙ্ক ইউ দাদু, আপকো বহুত ধন্যবাদ। হামারা বোহত উপকার হ্যায়।

সুবেদার তেমনি তার চিরাচরিত আনন্দ-মশগুল মেজাজে বলেন, ঠিক হ্যায় ইয়াংম্যান। কোই ধন্যবাদ নেই লাগেগা। ইয়ে কাম তুমহারা হামারা দোনোকা হ্যায়। হামকো জয় বাংলা করনে চাহিয়ে জলদি ছে জলদি। ইয়ে দেরি নেই হোনা চাহিয়ে।

শেষের কথাগুলো তিনি বলেন উভয় হিমালয়ের দিকে দৃষ্টি মেলে দিয়ে। তার দৃষ্টির সাথে দৃষ্টি রেখে আমরাও তাকাই হিমালয়ের খাজকাটা বিশাল শরীরের দিকে। সুবেদার হয়তো তার নিজের জন্মভূমিকে ঝোজন সেখানে। ওখানকারই অধিবাসী তিনি। জাতে নেপালি। হিমালয়েরই কোনো পাহাড়ের কোনো অংশে মেঘচ্ছেঁয়া শীর্ষে হয়তো রয়েছে তার ফেলে আসা ঘৰবাড়ি আৰ আঞ্চীয়পৰিজন। জয় বাংলার মুক্তের জন্য তিনি এখানে আটকে পড়েছেন। যেতে পারছেন না। নিজের ঘৰবাড়িতে আঞ্চীয়-পৰিজনদের কাছে। সুতোং আমাদের মতো তারও কাছে জয় বাংলা দ্রুত কার্যে হওয়ার প্রশ়িট জরুরি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

পিন্টু এই সময় বলে, দাদু, জয় বাংলা হোনেকি বাদ হামলোগ নেপাল যায়গা, আপকা ঘৰ দেবেগা।

এ কথায় বড় আহাদিত বোধ করেন বৃক্ষ। বলেন, জৰুৰ যায়েগা, জৰুৰ। আই আ্যাম ইনভাইটিং ইউ টু ভিজিট মাই সুইট হোম।

তার বাড়িতে বেড়াতে যাবার নিম্নলিখিতের জবাবে আমিও তাকে নিম্নলিখিত করে বসি, দাদু, আপভি যায়গা হামারা ঘৰ, পিঞ্জ টেক আওয়ার ইনভাইটেশন...।

বৃক্ষ মাথা দুলিয়ে সম উৎসাহের সাথে বলেন, ইয়েস, ইয়েস জৰুৰ যায়গা, মগার জয় বাংলা হোনেকি বাদ।

‘জয় বাংলা হোনেকি বাদ’ এই কথাগুলো যেনো বুকের পঞ্জীয়ে ধাক্কা দেয়। কথাটা আমাদের সেই কঠিন বাস্তবতার মুখোমুখি দাঢ় করিয়ে দেয়। যদে তুই, আমাদের নিজেদেরই তো এখন দেশ নেই। কবে ‘জয় বাংলা’ হবে আৱ কবে দেশে বিস্তৰো, আদৌ ফিরতে পাৰবো কি না, তাৱ কিছুই ঠিক নেই। আৱ এই যায়ে আমারা সুবেদাৰত্বপূৰ্ণতা কৰিব আৰহি আমাদের বাড়িতে বেড়াতে যাবার জন্য। সুবেদার পারেন তাৱ পাহাড়ে পাহাড়ে নেপালি শামে আমাদের যাবার জন্য নিম্নলিখিত কৰতে। এটা তিনি পারেন, কেলনা, কেলনে যাওয়া যে-কোনো সময়ই সম্ভব তাৱ পক্ষে। সেখানে যেতে কোনো বাধা নেই: কিন্তু আমারা কি পাৰিয় জয় বাংলা অৰ্থাৎ দেশ স্বাধীন না হলে যেখানে আমরাই কোনোদিন দেশে বিস্তৰণ আশা কৰতে পাৰি না, সেখানে এ অবস্থায় কোনো মেহমানকে নিজেদের বাড়িতে দাওয়াত কৰবার ব্যাপারটা কেমন যেনো হাস্যকৰ ঠেকে। সুবেদার তাই সঠিকভাৱেই কথাটা তাৱ পক্ষ থেকে বলেছেন, জয় বাংলা হোনেকি বাদ। আসলে জয় বাংলার জন্য কতো আশা-আকাঙ্ক্ষা যে বাস্তব রূপ পাৰব অপেক্ষায় আছে, তাৱ শেষ নেই।

এক লেড়ুকি আয়ি থি

পেছন থেকে কখন পিন্টুৰ রাইভাল হাবিদারটিকে আসতে দেখা যায়। পৱনে তাৱ থাকি হাফপ্যান্ট আৱ স্যান্ডো গেঞ্জি। তাকে দেখে পিন্টুৰ চোয়াল শক হয়ে যায়। কিন্তু হাবিলদারের মুড় ভালো। গলায় তাৱ দেৱতালি সুৱ। বিহারেৰ লোক। ভালোই বাংলা বলতে পাৱে। পিন্টুৰ কাঁধে হাত দিয়ে সে বলে, ইয়াৱ পিন্টু সাব, আসেন আমৰা মিটমাট কোৱে লেই।

প্ৰস্তাৱে পিন্টুৰ রাগ কমে না। এই লোকটা অহেতুক তাকে জ্বালিয়েছে। বিপাকে ফেলবাৱ চেষ্টা কৰেছে। তাকে আগলাৰ বলেছে। পিন্টুৰ রাগ এতো সহজে পড়বাৰ মতো নয়। ব্যাপারটি এৱা সদৰমদিনেৰ কাছে পৰ্যন্ত নিয়ে গিয়েছিলো। ভদ্ৰলোক কলসিডারেট না হলে, এই অপৱাপ্তি হয়তো পিন্টুকে সামৰিক শাস্তিৰ মুখোমুখি হতে হতো। পিন্টু মুখ শুরিয়ে রাখে।

— হামারা কসুৱ হৈ গ্যায়া। হামি বুঝিতে পাৰি নাই। কিছু মনে লিবেন না পিন্টু সাব।

আপনার কাঠ আপনি ছাড়িয়া দিবেন, কিন্তু অসুবিধা হোবে না।

পিন্টুর এ ব্যাপারটিতে সাব-সেক্টর কমান্ডারের যে অনুমোদন রয়েছে, সে কথা কর্ণেল সুব্রাহ্মণ্যমে নিচয়ই এখানে, এই বি.ও.পি.-তে এসে পৌছেছে। তিনি নিচয়ই হাবিলদারকে বলে দিয়েছেন, এ নিয়ে আর বাড়াবাঢ়ি না করে মিটমাট করে নেয়াই ভালো। হাবিলদারের গলায় তাই আপসের সুর। এদের সহযোগিতা ছাড়া আমাদের পক্ষে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া কষ্টকর ব্যাপার। তাই ক্যাশ্পের হাবিলদারের সাথে গোলমাল বজায় রাখাটা এ সময় অবশ্যই ঠিক নয়। তাই সমস্যাটির সমাধানের ঘর্ষণ্টায় আমি নিজেকে জড়িয়ে ফেলি। বলি, হাবিলদার সাহেব আর কোনো গোলমাল নাই তো?

— নেহি জি।

— কাঠগুলো পিন্টু যাকে বেচতে চেয়েছিলো, সে এখন তা নিতে পারবে তো?

— জরুর।

— বর্ডারে আপনারা আটকাবেন না তো?

— কী যে বোলেন! কথাটা বলেই এবার হাবিলদার তার দাঁতে জিব কাটে। তখন পিন্টুকে বলি, ঠিক আছে পিন্টু। সবকিছু তো মিটেই গেছে। নাও এবার হাবিলদার সাহেবের সাথে হাত মেলাও।

ফিক করে হেসে ফেলে পিন্টু। ঘূরে দাঁড়িয়ে হাবিলদারের সাথে শুধু হাত নয়, দেখা যায় দু'জন দু'জনকে জড়িয়ে ধরে কোলাকুলি করছে। স্টেসার এ দৃশ্য দেখে শিস বাজিয়ে হাসেন। আমার দিকে তাকিয়ে চোখ টিপ দিয়ে বলেন দোনো মে মহৱত হো গিয়া।

এরপর চায়ের টেবিলে। হাবিলদার নিজেকে স্পোড়াপ করে চা-বিস্কুট নিয়ে আসেন। আমাদের জন্য বরাদ্দ ঘরাটি মুসাকে বৃক্ষজঙ্গ দেয়ার জন্য বাইরে চলে যান। তার এখনকার এই আচরণ দেখে মনে হয়, একজন মানুষের কবলোই অন্য একজন মানুষের চিরস্ময়ী শক্তি নয়। মানুষে মানুষে সম্পর্কের ক্ষমতাটি আসলেও বড় বিচিত্র। পরিবেশ আর পরিস্থিতি একজন মানুষকে অন্যজনের শক্তিকরে তোলে। সময় এক্ষেত্রে একটা বড়ো ফ্যান্টের। সময়ই সবকিছু ভুলিয়ে দেয়। সময় আর অনুকূল পরিবেশ আবার একজন শক্তিকে অন্যজনের কাছে পরম মিত্র হিসেবে উপস্থিত করে।

এই বি.ও.পিতে উপস্থিত হবার পর পিন্টুর মনে যে অস্তির কাঁটা খচখচ করছিলো, সেটা আর থাকে না। চা-নাস্তা খেতে খেতে সে বলে, হাবিলদার ব্যাটা এ্যাকেবারে খারাপ লোয়ায় কি কুন মাহবুব ভাই! আমি ইশারায় বলি, চেপে যাও।

পিন্টু সে অনুসারে প্রসঙ্গটা চেপে যায়। ঠিক এই সময় বৃক্ষ সুবেদারের হঠাতে করেই বলে ওঠে, দাদু এক লেড়কি আয়ি থি ঘরছে ভাগকে। এক সুটকেস ভি থা উস্কি হাত মে। উহ আয়ি থি মেরা পাস।

চমকে উঠতে হয় সুবেদারের কথায়। একজন লেড়কি অর্থাৎ একটা মেয়ে সুটকেস হাতে বাড়ি থেকে ভেগে এসেছিলো বৃক্ষ সুবেদারের কাছে! কে সে? কেনো এসেছিলো? মনের ভেতরে তুমুল আলোড়ন এসব প্রশ্নে। তাই জিজ্ঞেস করি, কে সে দাদু? কেনো এসেছিলো?

— ম্যায় তো প্যাহচানা নেই ছাকা। তব উহ বোলতে থি, ইধার কি কোই গৌণ সে আয়ি হ্যায়। কি ধৰ যায়েগা নেই মালুম। কভি বোলতা থি জলপাইগুড়ি যায়গা, কভি শিলিঙ্গড়ি, কভি কুচবিহার।

— উস্কা বাদ কিয়া হয়া?

— উহ ইয়াং গার্ল ঘরছে ভাগকি আয়ি হ্যায়। তুমহারা জয় বাংলা কি শরণার্থী। শি ওয়াজ
এ ওয়েল ড্রেস্ড স্টার্ট গার্ল, এডুকেটেড তি। ঘরমে কুচ গাড়বাড় হ্যায়, ইস লিয়ে ভাগা থা।

ক'দিন আগেকার সেই সকালের দৃশ্যটা মনে পড়ে। শরণার্থী পরিবারগুলোর অসুস্থ
সদস্যদের চিকিৎসার ভার নিয়ে বাবলু ও মতিয়ার ছোটাছুটি করছিলো। মারেয়া ফ্রন্টে যাবার
পথে আমরা অবস্থাটা দেখবার জন্য নিয়েছিলাম কিছুক্ষণের জন্য। সে সময় বাড়ির ভেতর
থেকে একজন যুবতীর আকুল আকুতিভরা কান্না ভেসে এসেছিলো। কে জানে, সেই মেয়ে
কি না, আকুল হয়ে যে সেদিন কাঁদছিলো। কেনো যে কাঁদছিলো সেদিন, সেটা জানা হয়
নি। তবে কি সে তার কোনো অসহনীয় বিনিদশা থেকে পালাতে চাইছিলো? আর পালাতে
না পেরে সে কাঁদছিলো ওই রকম অবোরে? কে জানে!

বৃন্দকে তখন বলি, দাদু তারপর কী হলো? গেলো কোথায় মেয়েটা?

বৃন্দ তার হত্তাবজ কৌতুক মেশানো গলায় মুখে হাসি টেনে বলেন, উস্কি বাত ম্যায়
লেড়কিকো বহুত সমবায়া। সমবায়ার বোলা, বেটি ইয়ে সময় আচ্ছা নেহি। রাত্তাঘাট
আচ্ছা নেহি, মানুষ তি আচ্ছা নেহি, তুম ঘর ফিরকে যাও। গোস্যা সামাল দিজিয়ে। তুম
জোয়ান লেড়কি হো, ম্যায় তুমকো একেলে নেহি ছোড় সাক্তা। এরপর বৃন্দ থামেন।
মিটিমিটি হাসেন কিছুক্ষণ। তারপর বলেন, লেড়কি মেরুভূত মান লিয়া। আওর ম্যায়
মেরা সাত লেকার উসকো ফ্যামিলি কা পাস ওয়াপস দেস্ক আয়া।

বৃন্দ সুবেদারের গঞ্জের শেষটা ভালো লাগে। একজন শরণার্থী মেয়ে কোনো কারণে তার
আশ্রয়স্থল থেকে এসেছিলো এই বি. ও. পিসি সামনে। বৃন্দ বুঝিয়েস্বুঝিয়ে তাকে আবার
রেখে এসেছেন। পথে নামতে দেন নি তাকে। পথে নামলে এরপর তাকে আর খুঁজে পাওয়া
যেতো না। এখন বড়ো দুঃসময় সবার জন্ম। এর ভেতরেও পথেঘাটে হায়েনার পালের অন্ত
নেই। একটি যুবতী মেয়েকে বাসে পেলে, তারা তাকে খাবলেখুবলে খেতো। এই ভিন্নদেশি
নেপালি বৃন্দ তার মানবিক শুণ্যবিজ্ঞান চরিত্রে চালিত হয়ে একজনকে হলেও রক্ষা করেছেন,
এ কম বড় কথা নয়। তাই তার প্রতি কৃতজ্ঞতায় ভরে যায় মনটা।

তাকে বলি, আপ আচ্ছা কাম কিয়া দাদু, ধ্যাক্ষ ইউ।

বৃন্দ এবার জবাব দেন না। মুখে হাসি টেনে আস্তে আস্তে মাথা দোলান আর নিজের মনে
তার দেহাতি গান শেয়ে চলেন শুনগুন করে।

ভাক্তার নন্দী

ট্রাক থেকে মালপত্র নামাবার পর তার গোছগাছ করার কাজ শেষ হয়ে যায়। হাদীকে রাখা
হয় এখানকার স্টোরের দায়িত্বে। মুসা, একরামুল আর চৌধুরী নিজেদের মালপত্র বুঝে
নেয়। আপাতত প্রত্যেক ছেলের জন্য একটা ফুলহাতা সোয়েটার এবং একটা কম্বল ইস্যু
করা হয়। জুতো-মোজা পরের চালানে পাওয়া যাবে। আপাতত যা পাওয়া গেছে, তা দিয়ে
শীতের প্রাথমিক ধাক্কা সামলে নেয়া যাবে।

ওরা গোলাবারুন্দ, রেশনসামুহী, শীতবন্ত ইত্যাদি নিয়ে যে যার হাইড আউটের দিকে
রওনা দেয়। তখন অসুস্থ ৪ জনকে বি.ও.পির সামনে রাত্তার পাশে বসে রোদে পিঠ দিয়ে
ব্যারামি মুরগির মতো খিমুতে দেখা যায়। ওরা আমাদের সাথে এসেছে। অ্যাসপিন-

ডিসপিরিন ট্যাবলেটের চিকিৎসায় ওরা সুস্থ হয়ে ওঠে নি। তাই উদের চিকিৎসার জন্য নিতে হবে জলপাইগুড়ি। সুবেদার দানুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে অসুস্থ ছেলেদের সাথে করে পিটুসহ রওনা দিই জলপাইগুড়ির উদ্দেশ্যে।

খালেককে সোনাউল্যাহ হাউজে পাওয়া যায়। অসুস্থ ছেলেদের চিকিৎসার কথা শনে সে বলে ওঠে, কোনো সমস্যা নেই। আমাদের ডা. নন্দী আছেন। চলেন তার কাছে। তিনি আমাদের জন্য বিনা পয়সায় চিকিৎসা করে থাকেন।

ডা. নন্দী নামটা পরিচিত পরিচিত লাগে। ঠিক ধরতে পারি না। খালেককে জিগ্যেস করতেই সে বলে, ইনি তো আমাদের ঢাকার সেই বিখ্যাত ডাক্তার নন্দী। সিরুটি ফাইভের ওয়ারের পর চলে এসেছেন এপারে। জলপাইগুড়ি শহরে চেষ্টার করেছেন। আমাদের পার্টির লোকজনের কাছে চিকিৎসার জন্য পয়সা নেন না।

এরপর খালেকের সাথে সোজা ডাক্তার নন্দীর চেষ্টারে। জলপাইগুড়ি শহরের প্রাণকেন্দ্রে একটা একতলা দালানবাড়িতে ডাক্তার নন্দীর বর্তমান নিবাস। বাড়ির বাইরের ঘরটিতে তিনি রোগী দেখার চেষ্টার গড়ে তুলেছেন।

রোগীদের বসার জায়গায় সামান্য সময় অপেক্ষা করতে হয়। অঙ্গুষ্ঠণের ভেতরেই দরাজ গলার অধিকারী একজন রাশভারি-ভারিকি চালের মানুষ ভেতর ঘরের পর্দা টেলে বাইরে আসেন। খালেককে জিগ্যেস করেন, কি ব্ববর?

ইনি ডাক্তার নন্দী সেটা তার চেহারাই বলে দেন। খালেকের সাথে সাথে পিটু আর আমিও উঠে দাঁড়িয়ে সালাম দিই তাঁকে। খালেক আঙ্গুলের পরিচয় দিয়ে বলে, ফ্রন্ট থেকে এসেছেন এনারা, এই ছেলে ক'জনের অসুস্থ দেখে দিতে হবে।

— অবশ্য, অবশ্যই। বাংলাদেশের মুক্তিবাজ, এদের তো দেখতেই হবে। ঠিক আছে, এক এক করে আসুন আপনারা। দরাজ কর্তৃর প্রবীণ ডাক্তার তাঁর আত্মরিকতা মেশানো গলায় অসুস্থ রোগীদের তাঁর চেষ্টারে আসছেন করেন। ওরা এক এক করে ভেতরে যায়। আমরা তিনজন বসে থাকি বাইরে। পিটু আর খালেক দু'জন দু'জনার ছেলেবেলার বক্স। এটাওটা নিয়ে ওরা দু'জন গালগঞ্জে মেতে ওঠে। দেশ থেকে বহু দূরে এই ভিন্নদেশে, ভিন্পরিবেশে আমি ছেলেবেলাকার এই দুই বুকুর উচ্চল মুখরতা খুবই কৌতুহলের সঙ্গে উপভোগ করতে থাকি।

রোগীদের দেখা হয়ে গেলে, ডাক্তার নন্দী বাইরে এসে নিজেই আমাদের ভেকে নিয়ে যান ভেতরে। এতো বড়ো ডাক্তার তিনি, কিন্তু তাঁকে সাহায্যকারী লোকের সংখ্যা মাত্র একজন। তিনি নিজেই বাইরে এসে রোগীদের একজন একজন করে ভেতরে নিয়ে যান। তাঁকে পরীক্ষা করেন। প্রেসক্রিপশন দেন। সাহায্যকারী লোকটি অন্যান্য কাজকর্ম দেখেন। চালচলন আর আচার-ব্যবহার একেবারে সাদাসিধে, এই মহৎপ্রাণ চিকিৎসক মানুষটির চেষ্টাটিও একেবারেই সাদামাটা। রোগী দেখার একটা ধৰ্মবে বিছানা, একটা টেবিল, দু'তিনটা চেয়ার আছে। ডাক্তার নন্দী আমাদের বসতে বলে, নিজে টেবিলের ওপারে তাঁর চেয়ারে বসেন। তারপর আমাদের দিকে প্রেসক্রিপশন চারটা এগিয়ে দিয়ে বলেন, তেমন কিছু হয় নি। লিখে দিয়েছি। ওযুধগুলো খেলেই ভালো হয়ে যাবে। আরে মুক্তিফৌজের প্রাণ অতো ছেট নাকি! ঠিক হয়ে যাবে। কথাগুলো বলেই তিনি হা-হা করে হেসে ওঠেন।

তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বলেন, কি ইয়াখ্যান, জয় বাংলা হবে? করতে পারবেন না জয় বাংলা?

মাথা আনত করে জবাব দিই, পারবো।

— পারতেই হবে। জয় বাংলা না করে কি উপায় আছে? এতোগুলো মানুষ যাবে কোথায়? শুব জোর ফাইট দিতে হবে ইয়াংম্যান। জয় বাংলা দরকার শুব তাড়াতড়ি...।

হাসিমুর্খে তাকে বলি, জয় বাংলা হলে দেশে ফিরবেন না! এতো বড়ো পসার রেখে চলে এলেন আপনি!

— যাবো। একবারের জন্য হলেও ঢাকায় যাবো, যদি জয় বাংলা হয়। আমার ছেলেটা কার আকসিডেন্টে মারা গেলো। সে জন্যই তো চলে আসা। তাই বলে কি দেশের কথা ভোলা যায়? কতো পরিচয়, কতো মানুষ, নিজের দেশ। নাহ, কিছুই ভুলবার নয়।

প্রবীণ ডাঙ্কারকে যেনো স্মৃতিমেদুরতা বা নষ্টালজিয়ায় গেয়ে বসে। কিছুক্ষণ তিনি সামনের দেয়ালের দিকে উদাসভাবে তাকিয়ে থাকেন। তারপর আবার নিজের মধ্যে ফিরে এসে বলেন, ঠিক আছে কোনো অসুবিধা নেই। জয় বাংলার মুক্তিফৌজদের চিকিৎসার জন্য আমার চেষ্টার সব সময় খোলা। কেউ অসুস্থ হলেই একটা স্লিপ দিয়ে পাঠিয়ে দেবেন। তাছাড়া খালেক তো রইলোই।

আমরা উঠি। বিদায়ের সময় কাঁধে হাত রেখে তিনি বলেন, আমি তো নিজে যুক্তে যেতে পারছি না। কিন্তু বাংলাদেশের স্বাধীনতা জন্য, জয় বাংলার জন্য সব সময় মনের ভেতর আকুলি-বিকুলি করে। তাই এ ধরনের ফ্রি প্রাকটিসের ভেঙ্গে দিয়ে কিছু একটা করার চেষ্টা করছি। তুমুল যুদ্ধ চাই ইয়াংম্যান। যুদ্ধ ছাড়া দেশ সংস্থান হবে না। আমরা সবাই এজন্য তাকিয়ে রয়েছি আপনাদের দিকে...।

ডা. নন্দীর চেষ্টার থেকে বেরিয়ে পথে নম্ন কিছুদূর এগিয়ে ওঝুধের দোকানে দেখা হয়ে যায় শিল্পী রথুদা অর্থাৎ অজিত রামের সাথে। রিকশায় বসে সামনে থেকে আসছেন তিনি। সুদৈহী পুরুষ, নায়কোচিত চেহারা তাকে দেখেই মনে পড়ে যায় জহির বায়হানের ‘জীবন থেকে নেয়া’ ছবির সেই স্টোরিলাম্য দেশাঘৰোধক গানগুলোর কথা। যার একটি, ‘আমার সোনার বাংলা আমি প্রজায় ভালোবাসি...’। আর ওই গানটিই স্বাধীন বাংলা বেতারে জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে বাজানো হচ্ছে। নজরুলের বিদ্রোহী কবিতা, ‘বলবীর বল উন্মত ময় শির’-এর তিনি চমৎকার সুর করেছেন। গানটি তিনি যখন টেজে গান, মনে হয় হয়ং বিদ্রোহী কবিই গাইছেন। রথুদা মুখে সেই পরিচিত হাসিটুকু ফুটিয়ে পাশ কাটিয়ে চলে যান। কথা হয় না তাঁর সাথে।

হঠাতে করে জলপাইগুড়ির রাত্তায় রথুদাকে এভাবে দেখে ভালো লাগে দারুণ। মনে হয়, যাক রথুদাও তাহলে শেষ পর্হস্ত আসতে পেরেছেন। দেশে আটকা পড়লে তাকে বাঁচিয়ে রাখতো না পাকবাহিনী। খালেক হাঁটতে হাঁটতে বলে, আফজাল ভাইয়ের কথা শনেছেন তো?

— কোন্ আফজাল ভাই।

— আমাদের আফজাল ভাই, ন্যাপের।

— শনেছিলাম তার কুকে ট্রাবল হয়েছিলো। কোলকাতায় নেয়া হয়েছে চিকিৎসার জন্য।

— হ্যাঁ, তিনি এখন বেশ সুস্থ হয়ে উঠেছেন।

এটা একটা ভালো খবর। কিছুদিন আগে তাঁর অসুস্থ হবার খবরটা দিয়েছিলেন গনি ভাই। তখন মনেপ্রাণে আমরা কামনা করেছিলাম, প্রগতিশীল রাজনীতিতে বিশ্বাসী দেশ আর মানুষের মুক্তির জন্য আত্মনির্বেদিত এই মহৎপ্রাণ মানুষটির যেনো কোনো ক্ষতি না

হয়। খালেকের কাছে তাঁর রোগমুক্তির খবরটা পাওয়ায় মনটা বেশ হাল্কা হয়ে যায়।

খালেক বিদায় নেয় বাসস্ট্যান্ড থেকে। এবার আমাদের ফিরে যাবার পালা ফ্রন্টে। পিঠের ওপর ডা. নন্দীর উষ্ণ করন্পর্শ এখনো লেগে রয়েছে। সেই স্পর্শে রয়েছে ভালোবাসা, উদ্দিপনা আর সাহসের প্রেরণা। আর একজনের কথা মনে পড়ে। তিনিও এই জলপাইগড়ি শহরেরই একজন ডাক্তার। ডাক্তার নন্দীর মতো তিনিও বলেছিলেন, জয় বাংলা করতে হবে ইয়াহ্ম্যান। আর সেটা করতে হবে খুব তাড়াতাড়ি।

ইয়ে হামারা দেশ হ্যায়

বিকেলে শুয়াবাড়ি পৌছে যে খবরটা পাওয়া যায়, তাতে রীতিমতো পিলে চমকানোর মতো অবস্থা হয়। বি.এস.এফ.-এর সাথে বাবলু, বকর আর মতিয়ার মহা-হাঙ্গামা বাধিয়ে বসেছে। একরামুল ঘটনাটা বিভারিতভাবে পরিবেশন করে। সেটা এরকম, ভাটপাড়ায় একটা বি.এস.এফ. আরম্ভ- ব্যাটেলিয়ন ছাউনি ফেলেছে ক'দিন আগে। তাদের একটা প্লাট্টুন আজ সকালের দিকে সীমান্ত পেরিয়ে বাংলাদেশে ঢোকে। তারা রেকি মিশনে এসেছিলো। দলটি শুয়াবাড়ি উপকণ্ঠ পর্যন্ত আসার পরই গোলমালটা বেধে যায়। ডিউটিরিত সেন্ট্রি তাদের দেখতে পেয়েই দৌড়ে গিয়ে খবরটা দেয় তেতরে। আর সেটা তনেই বাবলু তার স্টেনগান নিয়ে হাজির হয় শুয়াবাড়ির সুস্থৰ্বর্তী রাস্তায়। বি.এস.এফ.-এর দল জানতো না এখানে মুক্তিযোদ্ধাদের হাইড আউট রয়েছে। বাবলুকে এভাবে স্টেনগান নিয়ে দৌড়ে আসতে দেখে ওরা কিছুটা ভরকে গিয়ে পজিশন নিয়ে নেয়। তাদের এগিয়ে আসা কমান্ডারের সাথে বাবলুর তুম্হল কথা কটাকাটি শুরু হয়। বাবলু~~বি.এস.এফ.~~ এর কমান্ডারের চার্জ করে,

— তুম কোন হো?

— দেখতা নেই হাম মুক্তিফৌজ হ্যায়? কিস লিয়ে আপলোগ আয়া হ্যায় ইধার? বাবলু ঝাঁঝালো গলায় জানতে চায়।

— তেরা কেয়া? বি.এস.এফ.কমান্ডার বাবলুকে একথা বলে যেনো তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিতে চায়।

— তেরা কেয়া মানে? কয় কি শালারা? হামার দ্যাশোত্তুরিক্য ফির হামাক কয় তেরা কেয়া? তোমরা আইসোতো সকলে, এমাক দেখে দেই হামরা কারা!

বাবলু, উত্তেজিত চিন্কারে হাইড আউটের ভেতরে সারা পড়ে যায়। দলে দলে ছেলেরা বের হয়ে বাড়ির বাইরের চতুরে পজিশন নেয়। বাবলুর পাশে গিয়ে দাঁড়ায় বকর ও মতিয়ার উদ্যত হাতিয়ার হাতে। এভাবে অজান্তে বি.এস.এফ.-দের চুক্তে দেখে বকরও ক্ষেপে গিয়ে বি.এস.এফ.-দের উদ্দেশে বলে ওঠে, কেনো চুক্তেছেন আপনারা আমাদের দেশে? কে দিয়েছে আপনাদের পারমিশন?

— পারমিশন লাগে গা কেউ? হামলোগ ডিউটি মে আয়া হ্যায়। বি.এস.এফ. দলের কমান্ডার তেজের সাথে উত্তর দেয়।

ক্ষিণ হয়ে ওঠে বাবলু। তার তারঞ্জের জোশ গলা দিয়ে ফেটে বেরোয়। সে বলে, অবকোর্স পারমিশন লাগেগা। ইয়ে মুক্তাখল হ্যায়। ইয়ে হামারা দেশ হ্যায়। আমাদের দেশে আসতে অবশ্যই হামারা পারমিশন লাগেগা।

বি.এস.এফ. কমান্ডারও থামেন না। সমানে সমান সেও বলে ওঠে, পারমিশন নেই লেগা

তো কেয়া করে গা?

— শুলি করে গা। ফাইট দেগা। হামারা মাতৃভূমি রক্ষার জন্য হামলোগ ফাইট করতা হ্যায়, আপলোগ সে ভি ফাইট করেগা।

উদ্বেজনা বেড়েই চলে। পজিশনে থাকা ছেলের দলও উদ্বেজিত হয়ে ওঠে। ঘটাখট হাতিয়ার লোড করতে শুরু করে তারা। বি.এস.এফ.-এর সদস্যরাও তাদের হাতিয়ার নিয়ে তৈরি হয়ে যায়। উভয়পক্ষের মধ্যে উদ্বেজনা তখন চরমে। যুদ্ধ লাগে লাগে ভাব।

বি.এস.এফ কমান্ডার একজন বয়ক সুবেদার। একজন পোড়-খাওয়া সৈনিক সে। ঘটনা কী ঘটতে যাচ্ছে, সেটা সে আন্দাজ করে নিয়ে নিজেকে সংযত করে। তখন সে বলে, হামলোগ বি.এস.এফ হ্যায়, রেকি করনে কে লিয়ে আয়াথা। আপলোগ ইধার হ্যায়, হামতো জানতা নেহি। ইয়ে জান্মে সে জরুর ব্যবর ভেজতা। বকর বলে,

— ইয়ে এলাকা হামলোগ নিয়ন্ত্রণ করতা হ্যায়। আপনারা এভাবে কেনো এসেছেন? আপনারা শক্ত না মিত, বুঝবো কি করে? শক্তির দল যদি আপনাদের পোশাক পরে আমাদের ধোকা দেয়ার জন্য আসে, তখন?

— পাক আর্মি ইধার আ সাক্তা?

— আ সাক্তা মানে, কতোবার আসলো। যান আপনারা চলে যান। নেহি তো খারাপ হোগা। ফির কাতি নাহি আয়েগা চূপি চূপি, বোৰা হ্যায়?

বি.এস.এফ কমান্ডার এই কথায় কিছুক্ষণ বিম মেরেন্টাড়িয়ে থাকে। তারপর বলে, ঠিক হ্যায়, হামলোগ ওয়াপাস যাতা হ্যায়। এরপর সে তাদের জিগ্যেস করে, আপকা নাম কেয়া হ্যায়?

— মেরা নাম বাবলু, আর ইয়ে বকর স্মৃতি, আবু বকর। বাবলু তেজের সাথে তার আর বকরের নাম বলে দেয়। মতিয়ার ও প্রক্রিয়ালের নাম তার বলা হয় না।

— আচ্ছা হামলোগ যাতা হ্যায়, আপির ইয়ে বাত হাম ইয়াদ রাখে গা।

— জরুর রাখে গা। সুবেন্দিয়েক লক্ষ্য করে বলে বকর। বি.এস.এফ-এর দলটি তাদের পজিশন থেকে উঠে ফিরে যায় সীমান্তের দিকে। বাবলুরা ফিরে আসে বীরের মতো হাইড আউটের সামনে। ছেলেরা হৈচৈ করে ওঠে। কে একজন বলে ওঠে, দেইখছেন বাহে শালারা ক্যাংকা ল্যাজ গুটিয়া শিয়ালের নাখান পালে গ্যালো।

এই হচ্ছে ঘটনা। বি.এস.এফ দলটি তো ফিরে গেছে, কিন্তু একটা অশনিসক্ষেত রেখে গেছে হাইড আউটের জন্য। তারা চূড়ান্ত অপমানিত হয়ে ফিরে গেছে এবং এর বাল মেটোবার জন্য তারা আবার আসতে পারে। সে ক্ষেত্রে তারা গোলাগুলি করে মুক্তিযোদ্ধাদের ম্যাসাকার করে দেয়ার সুযোগ নিতে পারে। এ সময় এ ধরনের ঘটনা ঘটলে, বাইরে এর কালার দেবার সুবিধে রয়েছে। ঘটনা কে ঘটালো, এটা বুঝবার উপায় যেহেতু নেই, সেহেতু এটা সহজেই বলা যাবে, পাকবাহিনী এসে মুক্তিযোদ্ধাদের এই ম্যাসাকার করে গেছে।

সারাদিনই গুয়াবাড়ি হাইড আউটে এ নিয়ে উদ্বেজনা বিরাজ করেছে। ছেলেরা উন্মুখ হয়ে অপেক্ষা করেছে পিন্টু আর আমার ফিরবার। হাতিয়ার বাগিয়ে বসে থেকেছে দিনভর।

আমরা ফেরা মাত্রই বাবলু তার বাহাদুরি দেখিয়ে বি.এস.এফ-এর দলটিকে বিভাড়িত করার ব্যাপারটি বলে যায়। একরামুল বলে বিশদ ঘটনা ঠাণ্ডা মাথায়। ঘটনা তন্মুক্ত পর বেশ হতাশ লাগে। বি.এস.এফ-দের সাথে শুবই রুক্ষ ব্যবহার করে ফেলেছে এরা। ব্যাপারটাকে

সুন্দরভাবে সামাল দেয়া হেত। কিন্তু এখন আর কি করা যাবে? যা হবার তা হয়ে গেছে। কিন্তু ঘটনাটার পর ওরা কীভাবে রিভ্যাক্ট করে, সেটা দেখবার জন্য অপেক্ষায় থাকতে হবে।

পিন্টু গোটা ব্যাপারটা শুনছিলো কোনো কথা না বলে। এবার হাসি-মুখে সে বলে, বাবলু মিয়া তো ভালোই কাজ করছে কি কল মাহবুব ভাই!

সামনে দাঢ়ানো বাবলুকে বেশ খুশি হতে দেখা যায়। আকর্ণ হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে তার মুখমণ্ডল। তার সেদিকে তাকিয়ে পিন্টুর কথার জবাব দিই, ভালোই তো পিন্টু। মুকুটকল রক্ষা করার কাজটা তো আসলেও কঠিন। আজ বি.এস.এফ.-রা এসেছে, কাল হয়তো অন্য কেউ আসতে চাইবে। দেশ মুক্ত করার কাজটি কঠিকর। কিন্তু তার চাইতেও কঠিকর দেশকে ধরে রাখা। তবে আজকের ঘটনার জের সামাল দিতে হবে, তৈরি থেকো।

লালমুখো মেজর

সন্ধ্যার পর ভাট্টাচার্যাঙ্গের হাবিলদার সুনীল এসে হাজির হয় স্থানীয় দু'জন গাইডকে সঙ্গে করে। হাবিলদার আমাদের পরিচিত। জাতিতে বাঙালি না হলেও দীর্ঘদিন বাংলাদেশের সীমান্ত এলাকায় চাকরির সুবাদে সে নিজেকে পুরোপুরি বাঙালি বানিয়ে ফেলেছে।

হাইড আউটে চায়ের আসর শেষ হয়েছে তখন। হাবিলদার সুনীলকে এভাবে আসতে দেখে মনের ভেতর অস্বস্তি জেগে ওঠে। এটা যে সকালের ঘটনার জের, বেশ বুবাতে পারি। মনের ভাব গোপন রেখে তাকে জিগ্যেস করি, কি ব্যাপারে হাবিলদার সাহেবে, এরকম অসময়ে যে? বসেন, চা খান। এগিয়ে দেয়া আসনটিতে তিনি বসেন। প্রায় মাইল তিনেক পথ হাঁটতে হয়েছে তাকে। হাঁটার ক্রস্তিতে মোটাসোটা শৰীরের হাবিলদার রীতিমতো হাঁপাতে থাকেন। আর সেভাবেই বলেন, মেজর সাহেব আপনাদের ডেকেছেন।

বুকের ভেতরে হঠাৎ করে যেনেই একটা ঘা পড়ে। ছলাখ করে কেঁপে ওঠে শরীর। বুবাতে পারি সকালের ঘটনা। জরুর সাহির জন্য মেজর সাহেবের তলব। তবুও না জানার ভান করে জিগ্যেস করি, কেনেই মেজর সাহেব ডেকেছেন কেনো? আমাদের আবার কোন্ দরকার পড়লো?

— তাতো বলতে পারবো না ইয়ার। সকালে তাদের আরম্ভ ব্যাটেলিয়নের একটা দল এসেছিলো ভেতরে। একটা কিছু হয়ে থাকবে আপনাদের ছেলেদের সাথে। আমি সঠিক জানি না।

— কী বললেন মেজর সাহেব?

— তিনি বিকেলে আমাকে ডেকে আপনাদের দু'জনের নাম নিয়ে বললেন, জরুরি খবর দিতে, যেনো আপনারা তাঁর সাথে গিয়ে দেখা করেন।

— যেতেই হবে? না গেলে কি হয় না?

— তাতো আমি বলতে পারবো না। তিনি আমাকে ডেকে বললেন, আপনাদের আমি চিনি কি না। বলেছি, চিনি। তখন তিনি বললেন, ঠিক হ্যায় হাবিলদার সাব যাইয়ে আওর উন্ত দু' কমান্ডারকে বোলাকে লাইয়ে। আমি ব্বরটা দিতে এসেছি, যাওয়া-না-যাওয়ার ব্যাপারটা আপনাদের ওপর।

হাবিলদারের কথাটা নিয়ে কিছুক্ষণ মনের ভেতর নাড়াচাড়া করি। তারপর তাকে চা দিতে বলে পিন্টুসহ ভেতরে এসে অন্যদের নিয়ে পরামর্শে বসি। সকালের ঘটনায় বি.এস.এফ দল

অবশ্যই ফিরে গিয়ে তাদের মেজরকে নালিশ করেছে। আর এর ফলে মেজর যে এর জবাবদিহি করার জন্য ডাকছেন, এটা নিশ্চিত। কিন্তু আমরা যাবো কি যাবো না, এরকম একটা দোদুল্যামান মনোভাব সবার মধ্যেই। মনে মনে ভাবি, সকালে একটা গোলমাল হয়েছে ওদের সাথে, এটার জের জিইয়ে রাখা ঠিক না। মেজর আর কি করবেন? দেখাই যাক না সামনাসামনি হয়ে। তখন ওদের বলি, যাবো আমরা। লেট আস ফেস দ্য সিচুয়েশান।

পিন্টু বলে, মেজর যদি কিছু করে বসে?

— কী আর করবে? খেয়ে তো ফেলবে না। দেখাই যাক না সামনাসামনি হয়ে। তারপর বলি, বকর যাবে আমাদের সাথে, কেননা ঘটনার সময় সে উপস্থিত ছিলো। বাবলুর যাওয়া ঠিক হবে না। ওরই ওপর সষ্ঠবত ক্ষেপে আছে ওরা বেশি। একরামুল হাইড আউটের কড়া সিকিউরিটি নিয়ে থাকবে আমরা ফিরে না আসা পর্যন্ত।

এর ১৫ মিনিট পর আমরা পথে নামি। আমি বকর আর পিন্টু। আমরা যাচ্ছি দেখে হাবিলদার খুশি হয়ে ওঠে। বলা যায়, তার সাফল্য যে, সে আমাদের নিতে পারছে মেজর সাহেবের কাছে।

ভাটপাড়ায় আমগাছগুলোর নিচে আমাদের প্রথম ক্যাম্পের জায়গায় বি.এস.এফ দলের বিরাট ছাউলি গড়ে উঠেছে। পাশাপাশি সার বাঁধা তাঁবু, লোকজন কাজকর্ম করছে ব্যস্তসমস্ত হয়ে। সরগরম অবস্থা বলতে যা বোঝায়, একেবারে নাইট। আমাদের অতিপরিচিত জায়গাটার ভোলটোল পাল্টে গেছে একেবারে। হাবিলদার আমাদের নিয়ে সরাসরি মেজরের তাঁবুতে ঢেকে এবং সিভিল পোশাকে টেবিলের মাঝনে বসা মেজরের উদ্দেশে পা টুকে স্যালট দিয়ে বলে ওঠে, মুক্তিফৌজকা কমান্ডার ক্লাশ আয়া হ্যায় সাব।

এ সংবাদ যেনো মেজরের শরীরে ইলেক্ট্রোকের শকের মতো কাজ করে। তুরিত গতিতে উঠে দাঁড়ান তিনি। দাঁড়িয়েই আমার দিকে তাকিয়ে ‘ইউ ম্যান’ বলে প্রচণ্ড রেগে হঞ্চার দিয়ে ওঠেন।

তাঁবুর ভেতরে হ্যাজাক লাইটেজের উজ্জ্বল আলো। সে আলোতে দেখা যায় মেজরের লাল টকটকে মুখ। লম্বা-চওড়া। ঠিক বুলডগের মতো। শরীরের গড়নও বেশ লম্বা-চওড়া। রাগি রাগি চোখ। তবে চেহারায় কেমন একটা ফ্যাকাশে ভাব। রীতিমতো কাঁপছেন তিনি। আর এ অবস্থাতেই তার গলা থেকে আবার হক্কার শোনা যায়, ইউ ম্যান... ইউ ম্যান... ইউ অ্যাটাক্ড মাই পিপ্ল।

মেজরের এ ধরনের আচরণে কিছুটা ভ্যাবাচ্যাকা খেলেও মনের ভেতরে সাবধানতা অবলম্বন করি। মনে মনেই বলি, শক্ত মনোবল দেখাতে হবে এর সামনে। এখানে সময় আর পরিবেশ আমাদের অনুকূলে নয়। এখানে নরম আর দুর্বল হয়ে পড়লেই পরাজয় নিশ্চিত। দৃঢ়ভাবে তখন মেজরের কথার প্রতিবাদ করি,

—নো স্যার, ইট ওয়াজ নট অ্যাটাক।

— ইয়েস, আই সে ইট ওয়াজ অ্যাটাক।

— নো স্যার।

মেজর যেনো থমকে যান। আমার দিকে তার প্রথর দৃষ্টি রেখে বলেন, দেন হোয়াট ইট ওয়াজ? ইয়োর বয়েজ বিহেড রাফ উইথ মাই মেন, দে থ্রেটেন দেম, দে অর্ডার্ড দেম টু গো ব্যাক, দে ওয়ার এবাউট টু ওপেন ফ্যায়ার অন দেম ... হোয়াই?

— নো স্যার ইট ইজ নট ফ্যাট্ট ! ইট আৱ মিস রিপোর্টেড বাই ইয়োৱ ম্যান ।

— নো ইমপসিবল ! ইট ক্যানলট বি ... ।

— প্ৰিজ কল ইয়োৱ কমাভাৱ অ্যাভ লেট হিম টক অ্যাবাউট দ্য হ্যাপেনিংস ।

মেজৱ তখন গলা উচু কৰে তাৱ ব্যাটম্যানকে বলেন সুবেদাৰকে ডাকাৰ জন্য । সুবেদাৰ
সম্ভবত বাইৱে তৈৱিহ ছিলেন । সঙ্গে সঙ্গেই ঢোকেন ভেতৱে । মেজৱ তাকে দেখেই ধমকে
ওঠেন, সুবেদাৰ সাৰ ইন লোগ বোলতা হ্যায কুছ নেহি হ্যা । আপ ঝুট বোলা ... ।

— নেহি সাৰ বলে সুবেদাৰ আমাদেৱ মুখেৰ দিকে তাকান । তাকে আমি জিগোস কৰি,
সুবেদাৰ সাহেব আমাদেৱ ছেলেৱা কি আপনাকে আক্ৰমণ কৰেছিলো, বলেন? আপনাৱা
ওভাৱে গেছেন না জানিয়ে, তাই ওৱা বলেছিলো এভাৱে এলে তুল বোৰাৰুঘি হতে পাৱে,
নিজেদেৱ মধ্যে গোলাগুলি হতে পাৱে । অহেতুক খামেলা বাধতে পাৱে, ঠিক কি না বলেন?

এই কথায় সুবেদাৱেৱ যেনো সব ওলিয়ে যায় । কিন্তু একটা কথা বলবাৰ উপক্ৰম কৰতে
আবাৰ আমি বলি,

—আপনি তাদেৱ নাম বলতে পাৱবেন?

— হ্যা, জি, বকৰ আউৱ বাবলু ।

সৰ্বনাশ! বকৱতো আমাৱ সাথেই রয়েছে । বকৱ নিজেৱ নাম শনতেই স্যুট কৰে দাঁড়ায়
পিন্টুৰ পেছনে গিয়ে । পৰিস্থিতি বুঝে পিন্টু তাকে মেজৱেৱ আড়াল কৰে ধৰে । আমি
সুবেদাৱকে জেৱাৰ মতো কৰে বলি, তাৱ কি আপনায়েন্তে তাল কৰতে ধৰেছিলো?

— নেহি ।

— তাৱ কী বলেছিলো আপনাকে?

— ওয়াপাস আনে কি লিয়ে বোলা থাকতো?

তখন মেজৱেৱ দিকে তাকিয়ে বলি তাৱ আপতো শন লিয়া, ইট ওয়াজ দা ফ্যাট্ট ।

মেজৱ এৱপৱ কিছুক্ষণ থমকে দাঁড়িয়ে থাকেন । প্ৰথৱ দৃষ্টিতে দেখেন আমাদেৱ দিকে ।
তাৱপৱ হঠাৎ কৱেই তাৱ চেহাৰাসৈদলে যায়, মুখেৱ রাগি ভাৱ পাল্টে গিয়ে সেখানে হাসিৱ
বিলিক দেখা যায় । তিনি বলেন, ও.কে বয়েজ, ইট ওয়াজ এ মিস আভাৱটানড়িং । ফৱগেট
ইট, প্ৰিজ সিট ডাউন ।

এৱপৱ তাৰুৱ ভেতৱকাৰ থমথমে পৱিবেশেৱ পৱিবৰ্তন ঘটে । বদমেজাজি লালমুখো
মেজৱেৱ ভেতৱ থেকে একজন ভালো মানুষ বেৱিয়ে আসে । তিনি বলেন, টি অৱ কফি?

— যে-কোনো একটা বলি তাকে । মেজৱ তাৱ ব্যাটম্যানকে কফি দিতে বলেন । কফি আসে ।
তাৱ সাথে পাকিস্তানেৱ রাজনীতি এবং বৰ্তমান যুদ্ধ পৱিস্থিতি নিয়ে তুমুল আলোচনা জমে ওঠে ।

ৱাত ১০টাৱ দিকে শেষ হয় আমাদেৱ আলোচনা বৈঠক । আমৱা উঠি । মেজৱ ‘জয়
বাংলা’ বলে প্ৰত্যেকেৱ সাথে উষ্ণ কৱৰ্মদন কৰে বিদায় জানান । এৱপৱ ক্যাশ্পেৱ সীমানা
ছাড়িয়ে আমৱা রাস্তায় নামি । পেছনে থাকে ভাটপাড়া । সামনে মুকুটক্ষেত্ৰ ভেতৱগড় । আমৱা
তিনি যুবক দ্রুত পদবিক্ষেপে এগিয়ে চলি আমাদেৱ মুকুটক্ষেত্ৰেৱ দিকে ।

আমাৱ সকল দৃঃখ্যেৱ প্ৰদীপ

পিন্টু গান গাইছে ‘আমাৱ সকল দৃঃখ্যেৱ প্ৰদীপ, জ্বলে দিবস...’ দৃঃখ্য-জাগানিয়া এ গান
পিন্টু গাইছে হৃদয়েৱ গভীৱ থেকে । মাৰো-মধ্যেই ও এমন এককী আৱ নিঃসঙ্গ হয়ে যায় যে,

মনে হয়, ফেলে আসা কোনো দৃঢ়খ্বোধ বুঝি ওকে ভাড়িয়ে ফিরছে।

এগারোটার মতো বেলা তখন। পিন্টু বাইরের মাচায় চিত হয়ে শয়ে গান গেয়ে চলেছে। তার দরদভরা গানের সুর চারদিকের পরিবেশে কেমন একটা মোহ জাল সৃষ্টি করে। তার পাশে বসে থাকি আমি। গান শুনি। তার গভীর তন্ত্রজ্ঞতাকে ভেঙে দিতে ইচ্ছে করে না।

একরামুল আর বকব বের হয়ে আসে ভেতর থেকে। অদূরে বাবলু ও মতিয়ার মুরাকে টেনগান চালানো প্রশিক্ষণ দিতে দেখা যায়। শীতের সকালের ভালোলাগার আমেজ হাইড আউটের সমষ্টি জুড়ে বিদ্যমান। বর্ষা চলে গেছে। কাদাপানির দিন শেষ। কেমন তকনো খটখটে হয়ে উঠেছে সমস্ত পথঘাট মাঠপ্রান্তর। রাস্তা ছেড়ে অপথ অর্ধাৎ মাঠপ্রান্তর কিংবা ফসলের খেত এসবের ওপর দিয়ে চলাফেরা করা সুবিধেজনক হয়ে উঠেছে। অবশ্য এটাও ঠিক, এ সুবিধে শুধু আমাদের জন্য এককভাবে আসে নি। শক্তর জন্যও এসেছে। আমাদের মতোই শুকনো মাঠঘাট প্রান্তর মাড়িয়ে চলাফেরা করা তাদের জন্যও সুযোগ সৃষ্টি করেছে। বর্ষার কল্যাণে তাদের চলাচল শুধু নির্দিষ্ট রাস্তার ওপর দিয়েই সীমিত ছিলো। কিন্তু এখন তা থাকবে না। শক্ত এখন যেকোনো দিক দিয়ে আসতে পারে। মৌসুম বদলে সাথে সাথে যুদ্ধের কৌশল আর তার গতি-প্রকৃতি ও বদলে যাচ্ছে। শুকনো মৌসুমে শক্তর সাথে মোকাবেলা করবার দিকটি ভাবতে হচ্ছে আমাদের নতুনভাবে।

পিন্টুর গান শেষ হলে অপারেশন নিয়ে কথাবার্তা শুরু হচ্ছে। পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী আজ বিকেলে দেওয়ানহাটে হামলা চালানো হবে। টাগেট পাক সৈনিক অথবা রাজাকার—যাদেরকেই পাওয়া যায়। এ অপারেশন পরিচালিত হবে ঠাকুরপাড়া হাটের স্টাইলে। এ ধরনের অপারেশনে পারদর্শী হয়ে ওঠা যুক্ত একটি ক্ষেত্রের আর মালেককে আনা হয়েছে নালগঞ্জ থেকে। ইতিমধ্যে একাববর গ্রামের দেহজিমানুষ সেজে হাটবারে দেওয়ানহাট রেকি করে এসেছে। ক’দিন আগে রাজাকার ঘাঁটি প্রকাশের উদ্দেশ্যে রাতের বেলা দেওয়ানহাট আক্রমণ করা হয়েছিলো। ফলে জায়গাটা ফেলে হয়ে গেছে আমাদের। তবে আজকের অপারেশন পরিচালনা করা হবে বিকেলে। প্রকাশ্য দিবালোকে, হাটভর্তি মানুষের ভেতরে।

দেওয়ানহাটের অবস্থান শক্ত এলাকার বেশ গভীরে। যুদ্ধের কারণে অধিকৃত এলাকায় জগদলহাট ও পঞ্জগড়হাটসহ অনেক প্রতিষ্ঠিত হাট-বাজার বন্ধ হয়ে গেছে। ফলে জমে উঠেছে দেওয়ানহাট। ভীষণ জমজমাট ভাব তার। শক্তসন্তা ও রাজাকার বাহিনীর নিয়মিত টহলদারিও রয়েছে সেখানে। তবে রাজাকার বাহিনীর ঘাঁটি গড়ে তোলার চেষ্টা সেখানে নস্যাত করে দেয়া হয়েছে এর আগে। ধরেও আনা হয়েছে তাদের একজন জীবিত সদস্যকে। আর এ ঘটনাই ক্ষেপিয়ে তুলেছে পাকবাহিনীকে আরো। ফলে ওখানকার লোকজনদের ধরা-বাধা, মারধোর আর ভয়ভীতি প্রদর্শন ও লুটপাট করাসহ নানা রকমের অত্যাচারের মাত্রা বেড়ে গেছে। এই রকম পরিস্থিতিতে পাকবাহিনী ও তাদের এদেশীয় দোসরদের আরেকটা আঘাত দেয়ার উদ্দেশ্যেই আজকের এই যুদ্ধযাত্রার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। প্রকাশ্য দিবালোকে জমজমাট মানুষের ভিড়ে এই সাহসী অপারেশনের ভেতর দিয়ে আমরা তাদের এটা বুঝিয়ে দিতে চাইছি যে, তারা আর মোটেও নিরাপদ নয় কোনোথানেই। এখন তাদের গতিবিধি সংঘত করার সময় এসেছে।

ঘট্টাখানেক আলোচনার পর পরিকল্পনা চূড়ান্ত হয়। ও ভাগে মোট ১২ জনের দল যাবে আজকের অপারেশনে। পিন্টুর নেতৃত্বে তারি অন্ত্র নিয়ে তিনজনের একটি দল তালমার তীর

যেমে এগিয়ে গিয়ে হাটের কাছাকাছি কোনো সুবিধেজনক জায়গায় ওঁৎ পেতে থাকবে। একাব্বর, মালেক আর জয়নাল এই তিনজন গ্রামীণ মানুষের সাথে যিশে অহুবর্তী দল হিসেবে বাজারে গিয়ে চুকবে। তাদের মূল কাজ হবে শক্রসেনা আর রাজাকারদের লোক গিজগিজ হাটের ভেতর থেকে ঝুঁজ বের করা। একাব্বর আর মালেকের কাছে থাকবে কেবল ছেনেড। দুটো করে। জয়নালের সাথে থাকবে টেনগান। সে তার কাঁধের স্টেলগানটি গায়ে জড়নো চাদরের নিচে লুকিয়ে রাখবে। তিন থেকে চারশ' গজ পেছনে থেকে আমরা চারজন অনুসরণ করবো তাদের। আমাদের প্রত্যেকের কাছে থাকবে ২টা করে একটো ম্যাগজিনসহ টেনগান। ছেনেড তো থাকবেই। প্রত্যেকে গায়ে চাদর জড়িয়ে কাঁধে ঝোলানো টেনগান লুকিয়ে রাখবে। আজকের অপারেশনে জোনাব আলী আর মতি থাকবে গাইড। তবে তারা থাকবে আমাদের পেছনে, কারণ লোকজন তাদের চিনে ফেলতে পারে। একাব্বরের অহুবর্তী দল শক্র সেনা বা রাজাকারদের অবস্থান চিহ্নিত করার ফাঁকে আমরা পৌছে যাবো হাটের উপকণ্ঠে। এরপর ওরা মিলিত হবে আমাদের সাথে। আমরা তাদের নিদেশিত জায়গায় সরাসরি পৌছে গিয়ে ২ থেকে তৃটা ক্রগে বিভক্ত হয়ে শক্র ওপর সরাসরি গুলিবর্ষণ করে তাদের ধরাশায়ী করে ফেলবো। সুযোগ পেলে তাদের কাউকে জীবিত অবস্থায় ধরে ফেলে সাথে নিয়ে আসবো হত্তিয়ারসহ।

আজকের অপারেশনের এই ছক বা পরিকল্পনা মনে গেঁথে নিয়ে আমাদের কাজ শুরু হয়। বাছা বাছা ছেলেদের নিয়ে পিন্টুকে দল গঠন করতে হচ্ছিল। পিন্টু কাজে লেগে যাব।

মিশন দেওয়ানহাট

দুপুরের খাওয়াদাওয়া শেষ করে বেলা দুটোয় দ্বিতীয় পর্ক হয়। আজকের দলের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে আমাদের সবার গায়েই চাদর জড়নো। যন্ত্যুচ্চ শীতকাল। মানুষের শরীরে চাদর জড়নো থাকতেই পারে। তাই এ ব্যাপারটাকে অভিভাবিক মনে হয় না।

ছাড়া ছাড়াভাবে দলটি এগিয়ে চলত থাকে। প্রত্যেকের হাঁটার ভঙ্গিতে কেমন একটা নিরাসক ভঙ্গি। আমাদের অভিযন্তনের কথা স্বত্বাবতী রাস্তায় কাউকে জানানো হবে না। পরিচিত এলাকা। মানুষজনের মধ্যে আমাদের ব্যাপারে আগ্রহী অনেকেই। পথিমধ্যেই অনেকে সালাম দেয়, কুশল বিনিময় করে। কেউ কেউ তাদের সমস্যা নিয়ে কথা বলতে চায়। মোটামুটি স্বত্বাবতী তাদের এড়িয়ে এক সময় সোনারবানে পৌছে যাই আমরা। হজুরের সাথে দেখা হয় না। তিনি ভেতরগড়ের দিকে কোথাও গেছেন। মতিকে নেয়া হয় তার বাড়ি থেকে।

তালমা নদী এখন হাজারাজার শিকার। নদীতে কোথাও হাঁটু সমান, কোথাও উরু সমান স্বচ্ছ টলটলে পানি। বালুর চড়া পড়েছে নদীর বুক জুড়ে।

নদী পার হয়ে কিছুক্ষণের বিরতি। ঝোপজঙ্গলে ঘেরা একটা উচুমতো ডাঙা জমিতে মানুষের দৃষ্টির আড়ালে সবাইকে নিয়ে বসি। এখান থেকে পিন্টু আলাদা হয়ে যাবে। নদীর পাড় যেমে ঝোপঝাড়ের মধ্য দিয়ে ওরা এগিয়ে যাবে। মতি গাইড করবে তাদের। তাকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলতেই সে সামান্য ভেবে নিয়ে জানায় যে, দেওয়ানহাট থেকে একটা পথ এসে ঠেকেছে তালমা পাড়ে। নদী পার হয়ে সেটা চলে গেছে সর্দারপাড়ার দিকে। ভেতরগড়— তালমার রাস্তার সঙ্গে মিশেছে সেটা। নদীর পাড় দিয়ে ওই রাস্তাটার কাছাকাছি পৌছুতে কোনো অসুবিধে নেই। মানুষজনও টের পাবে না। সেখানে জঙ্গলের ভেতরে কয়েকটা বাড়িয়র আছে। মতির পরিচিত তারা। হাটের কাছেই জায়গাটা। আধা

বেঁয়ে এগিয়ে গিয়ে হাটের কাছাকাছি কোনো সুবিধেজনক জায়গায় ওঁ পেতে থাকবে। একাবর, মালেক আর জয়নাল এই তিনজন গ্রামীণ মানুষের সাথে যিশে অহৰ্বর্তী দল হিসেবে বাজারে গিয়ে চুকবে। তাদের মূল কাজ হবে শক্রসেনা আর রাজাকারদের লোক গিজগিজ হাটের ভেতর থেকে খুঁজ বের করা। একাবর আর মালেকের কাছে থাকবে কেবল হেনেড। দুটো করে। জয়নালের সাথে থাকবে টেনগান। সে তার কাঁধের টেনগানটি গায়ে জড়নো চাদরের নিচে লুকিয়ে রাখবে। তিন থেকে চারশ' গজ পেছনে থেকে আমরা চারজন অনুসরণ করবো তাদের। আমাদের প্রত্যেকের কাছে থাকবে ২টা করে একটো ম্যাগজিনসহ টেনগান। হেনেড তো থাকবেই। প্রত্যেকে গায়ে চাদর জড়িয়ে কাঁধে ঝোলানো টেনগান লুকিয়ে রাখবে। আজকের অপারেশনে জোনাব আলী আর মতি থাকবে গাইড। তবে তারা থাকবে আমাদের পেছনে, কারণ লোকজন তাদের চিনে ফেলতে পারে। একাবরের অহৰ্বর্তী দল শক্র সেনা বা রাজাকারদের অবস্থান চিহ্নিত করার ফাঁকে আমরা পৌছে যাবো হাটের উপকঠে। এরপর ওরা মিলিত হবে আমাদের সাথে। আমরা তাদের নির্দেশিত জায়গায় সরাসরি পৌছে গিয়ে ২ থেকে তৃটা গ্রন্তি বিভক্ত হয়ে শক্র ওপর সরাসরি গুলিবর্ষণ করে তাদের ধরাশায়ী করে ফেলবো। সুযোগ পেলে তাদের কাউকে জীবিত অবস্থায় ধরে ফেলে সাথে নিয়ে আসবো হাতিয়ারসহ।

আজকের অপারেশনের এই ছক বা পরিকল্পনা মনে গেথে নিয়ে আমাদের কাজ শুরু হয়। বাছা বাছা ছেলেদের নিয়ে পিটুকে দল গঠন করতে ব্যবস্থা পিটু কাজে লেগে যায়।

মিশন দেওয়ানহাট

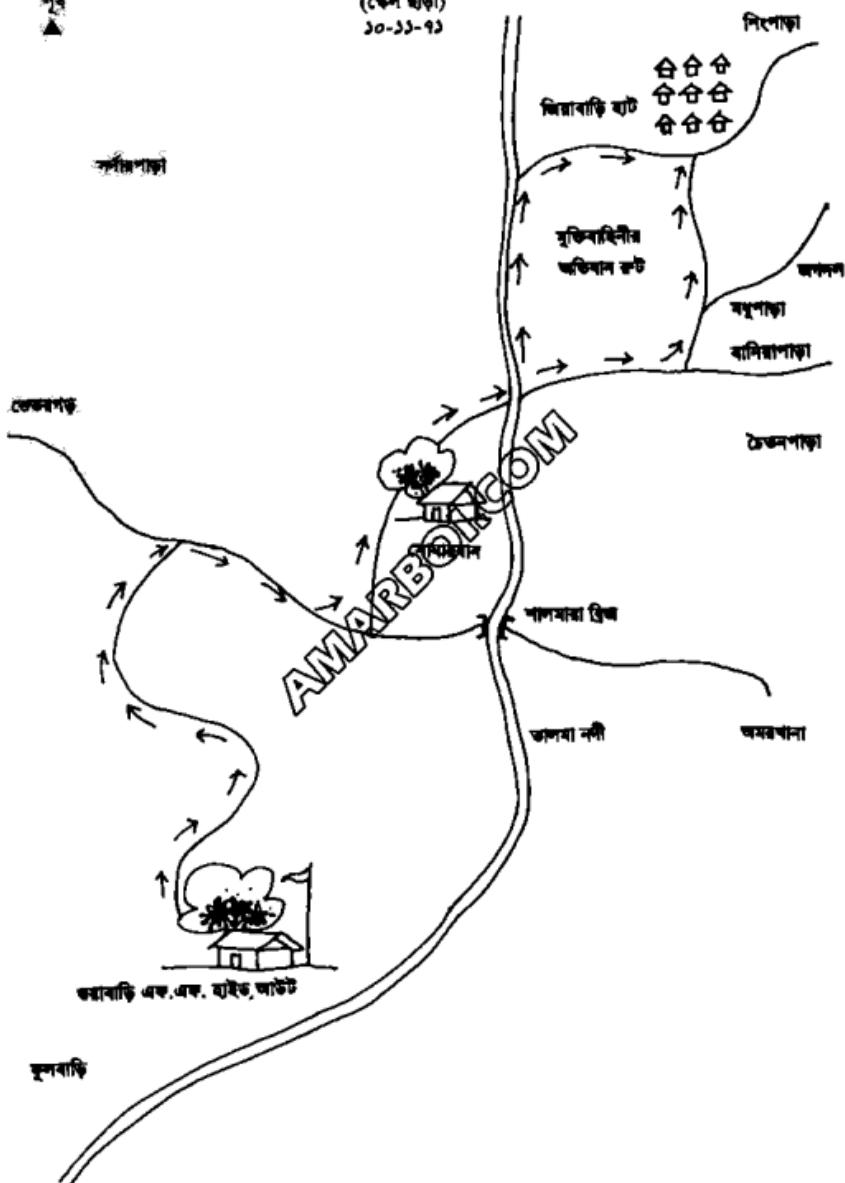
দুপুরের খাওয়াদাওয়া শেষ করে বেলা দুটোয় মন্ত্রিসভার হয়। আজকের দলের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে আমাদের সবার গায়েই চাদর জড়নো। যত্যন্ত শীতকাল। মানুষের শরীরে চাদর জড়নো থাকতেই পারে। তাই এ ব্যাপারটাকে অস্তিত্বাবিক মনে হয় না।

ছাড়া ছাড়াভাবে দলটি এগিয়ে যাচ্ছে থাকে। প্রত্যেকের হাঁটার ভঙ্গিতে কেমন একটা নিরাসক ভঙ্গি। আমাদের অভিযন্তারের কথা ব্যাপারতই রাস্তায় কাউকে জানানো হবে না। পরিচিত এলাকা। মানুষজনের মধ্যে আমাদের ব্যাপারে আগ্রহী অনেকেই। পথিমধ্যেই অনেকে সালাম দেয়, কুশল বিনিয়ন করে। কেউ কেউ তাদের সমস্যা নিয়ে কথা বলতে চায়। মোটামুটি ভদ্রভাবে তাদের এড়িয়ে এক সময় সোনারবানে পৌছে যাই আমরা। হজুরের সাথে দেখা হয় না। তিনি ভেতরগড়ের দিকে কোথাও গেছেন। মতিকে নেয়া হয় তার বাড়ি থেকে।

তালমা নদী এখন হাজারামাজার শিকার। নদীতে কোথাও হাঁটু সমান, কোথাও উরু সমান স্বচ্ছ টলটলে পানি। বালুর চড়া পড়েছে নদীর বুক জুড়ে।

নদী পার হয়ে কিছুক্ষণের বিরতি। ঝোপঝালে ঘেরা একটা উচুমতো ডাঙা জমিতে মানুষের দৃষ্টির আড়ালে সবাইকে নিয়ে বসি। এখান থেকে পিটু আলাদা হয়ে যাবে। নদীর পাড় ঘেঁষে ঝোপঝাড়ের মধ্য দিয়ে ওরা এগিয়ে যাবে। মতি গাইড করবে তাদের। তাকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলতেই সে সামান্য ভেবে নিয়ে জানায় যে, দেওয়ানহাট থেকে একটা পথ এসে ঠেকেছে তালমা পাড়ে। নদী পার হয়ে সেটা চলে গেছে সর্দারপাড়ার দিকে। ভেতরগড়— তালমার রাস্তার সঙ্গে যিশেছে সেটা। নদীর পাড় দিয়ে ওই রাস্তাটার কাছাকাছি পৌছুতে কোনো অসুবিধে নেই। মানুষজনও টের পাবে না। সেখানে জঙ্গলের ভেতরে কয়েকটা বাড়িয়র আছে। মতির পরিচিত তারা। হাটের কাছেই জায়গাটা। আধা

কেচ ম্যাপ-১৯
মিশন—জিয়াবাড়ি হাট
(কেল ঘাড়ি)
১০-৩৩-৭৩



তাকে বলি, ঠিক আছে, তোর ভাবিদের জন্য তুই সওদা করবি। কিন্তু আজ তো পারবি নারে। আজ তো হাটে যাচ্ছি অন্য কাজে। সেখানে কী অবস্থা দাঁড়াবে, কে জানে? আজকের অপারেশন শেষ হলে তুই যাইস বেরুবাড়ি।

একরামুল মাথা নাড়িয়ে বলে, সেইটাই তো ভাবোছোম্।

তাকে আমি বলি, ঠিক আছে, আজ অপারেশন শেষ হোক ভালোয় ভালোয়, তারপর কাইল যাইস বেরুবাড়ি।

পিন্টু আমাদের কথোপকথন শুনছিলো চুপচাপ। এবার সে হঠাতে মুখ খোলে। বলে, দেওরা সাইজছেন বাপধন! ঐ গানটা শুনছিসতো, সাধের দেওরারে, গাছেত চড়িয়া দুটা জলপাই পাড়িয়া দে ...।

দেওর-ভাবিকে নিয়ে বিখ্যাত ভাষ্যাইয়া গানটির কয়েকটা কলি পিন্টু সুর করে গাইতে থাকে। ফলে, একরামুলের মুখ মুহূর্তে লজ্জারাঙ্গা হয়ে ওঠে।

তারপর আবার যাত্রা শুরু। পিন্টুরা 'খোদা হাফেজ' বলে তালমার তীর ঘেঁষে বনজঙ্গলের ভেতরে হারিয়ে যায়। পিন্টুকে যাবার সময় আরো একবার ঝুঁঝিয়ে দিই ওর করণীয় কাজ সম্বন্ধে। তার অবস্থান যেখানেই থাক দেওয়ানহাটে গোলাগুলি শুরু হলেই সে ছুটে যাবে সেদিকে তার দলসহ। প্রয়োজন মনে করলে হাতিয়ার থেকে শুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তেই এগুবে তারা।

আমরা আমাদের নিদিষ্ট পথে এগিয়ে যাই। মধুপাদ্মাঞ্জস পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী দলকে সাজিয়ে নেয়া হয়। সামনে একাকবর, তার পিঞ্জান মালেক এবং তাদের দু'জনের পেছন পেছন জয়নাল এগিয়ে যায়। প্রায় ১৫/২০ ঘজ আগপিচু করে হাটতে থাকে তারা। ওদের পেছন থেকে কভার দিয়ে এগিয়ে চলি স্কার্পো ৪ জন। প্রথমে আমি। তারপর বকর। বকরের পেছনে বাবলু। সবশেষে একবারুদ। জোনাব আলী হাটে, বেশ কিছুটা পেছনে থেকে। ছাড়া ছাড়াভাবে। তার সঙ্গে জয়নালের ব্যবধান বা দূরত্ব মাত্র ১০ থেকে ১৫ গজের।

মধুপাদা পার হয়ে হাটুরে সেক্সিজনের দেখা মেলে। হাটমুখী হয়ে হাটছে মানুষজন। হাট-ফেরতা লোকজনদেরও দেখুঁট যায়। অনেকেই জিজ্ঞাসুনেতে তাকায় আমাদের দিকে। ঘাড় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখে আমাদের। আমরা তাদের অপরিচিত বলেই তারা এভাবে আমাদের দেখছে। এটাই স্বাভাবিক। তবে এরকম পরিস্থিতিতেও আমরা আমাদের মুখমণ্ডলে নিরাসস্ত ভাবটা বজায় রাখি। দেহাব্রত চাদরের নিচে কাঁধে ঝোলানো টেনগানের ট্রিপারে ডান হাতের তজনি আলতোভাবে বসানো। ফুকফুক করে বিড়ি টেনে চলি। চেষ্টা করি হাটুরে লোকজনের কৌতৃহলী দৃষ্টির সামনে নিজেদেরকে তাদের মতোই হাটগামী হিসেবে প্রমাণ করতে। কাছাকাছি কারো সাথেই চোখের দৃষ্টি বিনিয় করি না।

জগদলহাট ডানে পেছনে পড়ে থাকে। আমরা এগিয়ে যাই আমাদের ঈলিত পথ ধরে। আরো খানিকটা পথ হাটতে হয়। তারপর হাটের কোলাহল শ্পষ্ট থেকে শ্পষ্টতর হয়। গ্রামের হাটবাজারের এই একটা বৈশিষ্ট্য। নিদিষ্ট একটা জায়গায় যেনো কিলবিল মানুষের বিরাট সমাবেশ। ছোটবড় বিক্রেতারা তাদের পসরা সাজিয়ে বসে আছে। ক্রেতারা তাদের পছন্দসই জিনিসপত্র কেনাকাটায় ব্যস্ত। দরদাম হাঁকাহাঁকি করে। আসলে বাজার মানে বাজারই। বাজার মানেই হৈ-হঠগোলে এক বিচিত্র ও বিপুল সমাহার। এর একটা বৈশিষ্ট্য, রূপ আর নিজস্বতা আছে। আর আমরা যতোই এগোতে থাকি, ততোই এই বৈশিষ্ট্যময় শোরগোলের ভেতর দিয়ে শ্পষ্ট থেকে শ্পষ্টতর হয়ে ওঠে— সামনেই যে হাটবাজার।

হ্যাঁ, আমরা হাটের কাছাকাছি পৌছে গেছি। ওই তো সেই হাট। আর হাট দেখামাত্র পঞ্জইন্দিয় সজাগ হয়ে ওঠে। হস্তপন্দন বেড়ে যায় দ্রুত। আরেকটা বাঁক পেঁকুতেই সামনের দিকে হাটটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অজন্ম মানুষের ডিডাক্সন্ট সরগরম জমাট জিয়াবাড়িহাট আমাদের কাছ থেকে আর যাত্র কোয়ার্টার মাইল দূরে।

আর ভাবনার কিছু নেই। পেছনে ফিরবার আর প্রশ্নই ওঠে না। যা ঘটবার আরেকটু পরে ঘটবে। আর এই ভাবনাকে মনের ভেতরে টান টান রেখে এবার শুধু সামনে এগিয়ে চলা। একাব্বররা এক এক করে হাটের ভেতরে চুক্ত হারিয়ে যায়। পেছনে ফিরে আবার অনগ্রামীদের দেখে নিই শেষবারের মতো। এরপর নার্ত টান টান করে ডান পাঁজরের সাথে সেটো থাকা প্রিয় ধাতব অঙ্গথানার অঞ্চিত অনুভব করি। বাঁ হাত দিয়ে পকেটে রাখা ঝেনেজগুলো নেড়েচেড়ে দেখি।

চারটার মতো বেলা তখন। হাটের মুখে প্রায় পৌছে গেছি। আর ঠিক এ সময়ই হাটের ডান দিক থেকে শুলির আওয়াজ ভেসে আসে। বুকের ভেতরটা ছাঁৎ করে ওঠে আসন্ন একটা আশঙ্কায়। দু'জন দু'জন করে দু'দলে ভাগ হয়ে ভিড় ঠেলে ঠেলে এগুতে থাকি শুলির শব্দের উৎস লক্ষ্য করে। এরি যাবে আরো কটা শুলির শব্দ হয়। ফলে মুহূর্তে আতঙ্ক ছাঁড়িয়ে পড়ে হাটুরে মানুষজনের ভেতরে। শুরু হয়ে যায় তাদের হড়োছড়ি, ঠেলাঠেলি, এরপর গায়ে উল্টে পড়া আর এলোপাতাড়ি দৌড়ের প্রতিযোগিতা।

একাব্বরের রাজাকার ধরা এবং ভালোবাসার জীবন
আমরাও শুরু করি দৌড়। দোকানের পাশ দিয়ে মাটিপ্রতি বিছানো খোলা দোকানের ওপর দিয়ে
দৌড়তে দৌড়তে শিয়ে হাজির হই ঘটনাহলে পৌছেই দেখতে পাই একটা অভাবনীয় দৃশ্য।

একজন রাজাকারের সাথে একাব্বরের আত্মতো ধন্তাধন্তি করছে। রাজাকারের রাইফেলটি একাব্বর দু'হাতে দৃঢ়ভাবে ধরে আছে। রাজাকারটি সেটা ছাঁড়িয়ে নেবার জন্য অপ্রাণ ধন্তাধন্তি করছে। পাশে দাঁড়িয়ে আর একটা রাজাকার তার রাইফেলের কুঁদো দিয়ে
জোরেশোরে বাড়ি মারছে একাব্বরের বুকে।

বাট করে চাদর সরিয়ে আকাশের দিকে মুখ নিয়ে টেনগানের ত্রাশফয়ার করে দিই। হিতীয়
রাজাকারটি এতে ভয় পেয়ে দ্রুত পালিয়ে যায় পেছনের দিকে। কিন্তু এই রকম জমজমাট
বাজারের ভেতরে তাকে টার্ণেট করার উপায় নেই। সেটা যদি করি, তাহলে নিচিতভাবেই
অনেক মানুষকে জখম করেই করতে হবে। তাই বিকল্প পথ বের করে দুই লাফে চলে যাই
একাব্বরের কাছে। টেনগানের বাঁট দিয়ে রাজাকারটির পাঁচাদেশে প্রচণ্ড জোরে আঘাত করে
বসি। আর তাতে করে রাজাকারটি 'বাগে' বলে ভারসাম্য হারিয়ে রাইফেল ছেড়ে দিয়ে বসে
যায়। এবার আমি গায়ের সমস্ত শক্তি দিয়ে লাখি মারি তাকে। আমার সেই লাখির আঘাতে চিত
হয়ে উল্টে পড়ে যায় সে। এই ফাঁকে একরামুল দৌড়ে এসে তার বুকে টেনগান তাক করে
ধরে। আমি চিংকার করে বলি, শুলি করিস না একরামুল, শালাকে জ্যান্ত ধরে নিয়ে যেতে হবে।

একাব্বরের হাতে রাজাকারের রাইফেল। তার চোখে-মুখে ঠিক সময়মতো আমাদের
পৌছানোর জন্য কৃতজ্ঞতার হাসি। কিন্তু তার হাসি যেনো ক্লিষ্ট হয়ে আসে, সে বুকে হাত
রেখে ধীরে ধীরে বসে পড়ে হাঁটু ভেঙে। তারপর সটান চিত হয়ে তয়ে পড়ে।

একাব্বরের এ অবস্থা দেখে মাথায় আঙুল জুলে ওঠে মুহূর্তে। আকাশের দিকে টেনগানের
মুখ তুলে ধরে পাগলের মতো ত্রাশ করে চলি ম্যাগজিন শেষ না হওয়া পর্যন্ত। জয়নালকে দেখা

যায় দৌড়ে আসতে। সেও আমারি মতো করে টেনগানের ঘই ফেটাতে থাকে। মালেক কাছাকাছি কোথাও থেকে ছুটে আসে। একাবরের এই হাল দেখে সে খির থাকতে পারে না। পলায়নপর মানুষের দিকে ধমাধম দুটো হেনেড ঝুঁড়ে দেয়। ফলে হাতুরে মানুষজনের হৈচে, আর্ত চিকিৎসার আর ছুটাছুটির মাঝে মুহূর্হূর বেড়ে যায়। আতঙ্কগত হয়ে তারা উন্মাদের মতো দিদিকি জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়ে। হাটের বাঁ দিক থেকে বাবলুর হাতের টেনগানও গর্জে গর্জে ওঠে। ওরাও দৌড়ে আসে আমাদের কাছাকাছি।

ওদের বলি, দ্যাখ্ শালা রাজাকারের বাচ্চারা কোন্দিকে গেলো। আজ কাউকেই ছাড়া হবে না। জয়নালসহ ওরা ছুটে যায় হাতছাড়া হয়ে যাওয়া রাজাকারদের সঙ্কানে। একাবরের মাথার কাছে বসে তার মাথাটি কোলে তুলে নিয়ে বলি, কী হয়েছে রে একাবর? কোথায় লেগেছে কাত্তাতে কাত্তাতে একাবর জবাৰ দেয়, বুকে। শুব ব্যাথা। পানি খাইয়।

মালেককে পানি দেয়ার জন্য বলি। দৌড়ে গিয়ে মালেক আমাদের সামনে থালি হয়ে যাওয়া চায়ের দোকান থেকে পানির জগ নিয়ে আসে। একাবরের মুখে পানি ঢেলে দিই। ওর মাথায় পানি দিয়ে চাপড় মারি। মালেককে বলি, ওর বুক মালিশ কৰার জন্য। মালেক নির্দেশমতো দ্রুত দায়িত্ব পালনে লেগে যায়।

জমজমাট হাটটা পুরোপুরি জনশূন্য। যে যেদিকে পেরেছে, পালিয়ে গোছে, সারা বাজারের সঙ্গতও অবস্থা। দোকানের মালপত্র ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে ছাইয়েছিটিয়ে রয়েছে বাজারময়।

বকর আর বাবলু ফিরে আসে। রাজাকারদের পাওয়া যায় নি। এই পলায়নপর মানুষের ভিড়ে ওদের পাওয়া আসলে সম্ভব নয়। কিন্তু এখামে আকা আর ঠিক হবে না। শক্রুর তরফ থেকে পাল্টা হামলা হতে পারে যে-কোনো স্বত্ত্বাল তাই দ্রুত একাবরকে দাঁড় করাই। ও কোঁকাতে কোঁকাতে আমাদের শরীরের ওপর তাঁকে দিয়ে দাঁড়ায়। তার রাইফেল আর গুলির মালাটা মালেক নিজের ঘাড়ে ঝুলিয়ে দেয়। একরামুল তখন রাজাকারটিকে তুলোধূনে কৰার মতো পেটাতে থাকে। চুক্তে প্রস্তা ধরে দাঁড় করায় আর মারে। মার খায় আর ঘোঁ ঘোঁ শব্দ তুলে ধৃত রাজাকারটা পড়ে যায়। একরামুল আবার তাকে একইভাবে তোলে। আবার মারে। আর এ অবস্থায় ব্যাটা রাজাকার আহি চিকিৎসারে সঙ্গে কান্না জুড়ে দিয়ে চাইতে থাকে প্রাণভিক্ষা।

না, এখনে আর দেরি নয়। এবার ধৃত রাজাকারটিকে বাঁধতে বলি। মালেক তার কোমর থেকে গামছা খুলে নিয়ে রাজাকার ব্যাটাকে পিছমোড়া করে বেঁধে ফেলে। এরপর একাবরকে জড়িয়ে ধরে হাঁটতে হাঁটতে সবাই মিলে বাজারের বাইরে চলে আসি।

ঠিক এই সময় পিন্টু আর মতিয়ারদের উর্ধ্বশাসে দৌড়ে আসতে দেখা যায়। সেই অবস্থায় কয়েক রাউণ্ড শুলি ছোঁড়ে তারা। একসময় ওরা আমাদের সামনে এসে দাঁড়ায়। আমাদের সম্পিলিত শক্তি বেড়ে যায়। তবে শিংপাড়ার দিক থেকে শক্রুর সংজ্ঞায় কোনো ধরনের আক্রমণ প্রতিহত কৰার জন্য পেছনে থেকে কভার দিয়ে দিয়ে আসতে বলি ওদের। একাবরকে বলি, জোরে হাঁটতে পারবি?

— পারবো। বুকে হাত রেখে এক রকমের কষ্টের হাসি হাসে একাবর।

— নে, তাহলে জোরে পা চালা সবাই। নির্দেশ দিই, দ্রুত এগুবার।

রাজাকারটিকে গামছা দিয়ে পিছমোড়া করে বেঁধে নিয়ে এগিয়ে চলেছে মালেক। ওদেরকে বৃত্তাকারে যিরে ধরে আমরা প্রায় দৌড়তে দৌড়তে পিছিয়ে চলি মধুপাড়ার দিকে।

ঠিক সঙ্গের মুখে মধুপাড়া পার হয়ে তালমার কাছে নিমাইপাড়ার উন্ন মাঠটায় পৌছে যাই আমরা । এখানে এসে ক্লান্তি জুড়তে বিশ্বামের জন্য যাত্রাবিরতি করি । শক্ত এলাকা থেকে নিরাপদ দূরত্ব বা এলাকায় মোটামুটি ভালোভাবেই এসে যাই আমরা । সবাই অসম্ভব পরিশ্রান্ত । তাই মুহূর্তে ঘাসের ওপর শরীর এলিয়ে দেয় সবাই । মালেক শুধু রাজাকারটির বাঁধন শক্ত করে ধরে বসে থাকে ।

মুখ দেখেই বোৰা যায়, একাবরের কষ্ট হয়েছে সবার চাইতে বেশি । বুকের আঘাত নিয়েও অসম্ভব কষ্টসহিষ্ণু একাবর অনেকটা পথ আমাদের সঙ্গে পাঞ্চা দিয়েই দোড়ে এসেছে । এ কম বড়ো কথা নয় । ওর পাশে বসতে বসতে জিগ্যেস করি, কী অবস্থা তোর?

— মনে হয় বুক্টা বুঁবিল্ ভাঙ্গি পৌছিছে মোর ।

ওর বুকে এবার আমি নিজে হাত বুলিয়ে দিতে থাকি । হারামজাদা রাজাকারটা যেতাবে রাইফেলের কুণ্ডো দিয়ে ওকে আঘাত করছিলো, আমরা আর অল্পক্ষণ পরে গেলে ওকে ধরাশায়ী করে হয়তো মেরেই ফেলতো । ধৃত রাজাকারটির সঙ্গে সে ধ্বনাধ্বনিরত থাকায় তার অপর সঙ্গীটি গুলি করার মতো পাঞ্চিলো না । একাবরকে কায়দা মতো আলগা করতে পারলেই হয়তো ওরা তাকে সঙ্গে সঙ্গে গুলি করে মারতো । আমরা ঠিক সময়মতো পৌছুতে পেরেছিলাম বলেই এ যাত্রা বেঁচে গেলো একাবর ।

ওকে ধীরে-সুস্থে আবার জিগ্যেস করি, রাজাকারটির ক্ষয়ে তোর লাগলো কি করে? একাবর বলে, ঐ শালাক এ্যাক্লা পায়া মুই উয়ায়ার রাইফেলটা কাঢ়ি নিনু । শালা মোক বাপি আসি ধরিল । সেই সময় অন্য রাজাকারটা ক্ষেত্রে থাকি আসিয়া প্রথমে একটা গুলি করিল আকাশের দিকে । উয়ায়ার পর শালা যেকোনো ক্ষেত্রে দিয়া ভাস্তবার নাগিল... ।

আসলে একাবরের ওপর এ দায়িত্ব ছিলো না । ওদের দায়িত্ব ছিলো শুধু বাজারটা রেকি করা । মূল অপারেশন অর্থাৎ রাজাকারদের কাছ থেকে টার্গেট করে গুলি চালিয়ে হত্যা করা কিংবা ওদের জীবিত ধরে ক্ষেত্রের ভার ছিলো আমাদের ওপর । কিন্তু ঢিলেচালাভাবে হাতে রাইফেল ধরা রাজাকারটিকে সামনে দেখেই সাহসী একাবর নিজেকে সামনে রাখতে পারে নি । রাজাকারের হাত থেকে আকস্মিকভাবে রাইফেল কেড়ে নিয়ে সেটা দিয়েই সে ঘায়েল করতে চেয়েছিলো তাকে । তার কাজ সে সেরেও ফেলেছিলো । কিন্তু যতো গোল বাধালো ধৃত রাজাকারের অন্য সঙ্গীটি এসে ।

যাই হোক । এতো কিছুর পরও যে একটা জীবন্ত রাজাকার ধরা গেছে এ কম বড়ো সাম্ভূতি নয় । সঙ্গে একটা রাইফেলও পাওয়া গেছে । মালেককে জিগ্যেস করি, গুলি কতো রাউন্ড পাওয়া গেছেরে মালেক?

— ২০ রাউন্ড কমান্ডার ছাহেব । মালেকের কৌতুক মেশানো জবাবে যেনো বিজয়ী ধীরের ঘোষণা । মনে মনে বলি, ভালোইতো, একেবারে খারাপ না । এক জীবন্ত রাজাকার, এক রাইফেল আর ২০ রাউন্ড গুলি ।

এবার একাবরের দিকে ফিরি । আবার তার বুকে হাত বুলোতে বুলোতে বলি, না, ভাঙ্গে নাই । যেতে পারবি তো? কালই তোকে বেরুবাড়ি পাঠাবো চিকিৎসার জন্য ।

— ঠিক আছে । শাস্তি জবাব একাবরের ।

ততোক্ষণে সঙ্গে ঘনিয়ে এসেছে । সবাইকে নিয়ে আবার হাঁটতে থাকি । তালমা নদী পার হওয়ার সময় পিন্টু বলে ওঠে, এ্যাই একরামুল তোর টোপলাত্ত কি রে?

— নোয়ায় কিছু। একরামুল এড়িয়ে যেতে চায় প্রসঙ্গটা।
— এ্যাই শালা বল। পিন্টুর গলায় ধমকের সূর।
— শাড়ি। একরামুল কাঁচমাচু হয়ে জবাব দেয়। তারপর নিজেকে রক্ষা করার জন্য সে বলে, হাটের রাস্তার ওপর পড়ি আছলো, মুই তুলি নেছো।
— তালোই করছিস্ শা....। এ্যালা যায়া তোমার ভাবিধনোক শাড়ি পেন্দান.....।

পিন্টু ও একরামুলের কথা শুনতে শুনতে তালমা নদী পার হয়ে আসি। একরামুলের শাড়ি সঞ্চাহের ব্যাপারটা আসলেও একটা চমকপ্রদ ঘটনা। এরকম জীবনমরণ ঘটনার ডামাডোলের ভেতরেও সে বেচারা সামনে পড়ে থাকা শাড়ি তুলে নেয়ার লোভ সামলে রাখতে পারে নি। তার ভাবিদের শাড়ি দিতে চেয়েছিলো সে। দেওয়ানহাট থেকে সেটা সঞ্চাহ করতে সে তাই ভুল করে নি।

একাক্ষর মরতে মরতে বেঁচে এলো। একরামুল এতো কিছুর ভেতরেও তার ভাবিদের জন্য ঠিক ঠিকই শাড়ি যোগাড় করে আনলো। আসলে যুক্তের ভেতরেও যে ভালোবাসার জীবনকে ঝুঁজছি আমরা, মনে মনে বলি, এটাই তো সেই জীবন।

১০. ১১. ৭১

ঠিল দিয়ে তৈরি মুক্তিযোৱার বুকের ঝাঁচা

রাতে একাক্ষর বেশ অসুস্থ হয়ে পড়ে। বুকের বাহ্যিকটা তার বেড়ে যাওয়ায় কাতরাতে থাকে। এইভাবে চলে তার সারারাত। ব্যাথা উপস্থিতির ট্যাবলেট খাইয়েও কিছু হয় না। তাই সকালবেলা ওকে নিয়ে রওনা হই বেরবুক্তি অভিমুখে। সাথে থাকে বকর আর পিন্টু। মুসাও সঙ্গী হয় ভেতরগড় থেকে। সারঝাঁশথ একাক্ষরকে প্রায় ধরে ধরে নিতে হয়। বেচারা সত্যিই কাহিল হয়ে পড়েছে বুকের ঝাঁচা।

বেরবুক্তি শরণার্থী শিবিরের জাতীয় একাক্ষরকে যত্নের সঙ্গে দেখে বলেন, না, তেমন কিছু হয় নি।

— বুকের হাড়টার ভাঙে নিতোঁ জিগ্যেস করি উৎকষ্টা নিয়ে।

— না, ভাঙে নি খিত হেসে জবাব দেন ডাক্তার। একাক্ষরের আঘাত পাবার ঘটনাটি মন দিয়ে শোনেন তিনি। পিন্টু সবিস্তারে গতকালকের অপারেশনের ঘটনা ওর মতো করে পরিবেশন করে যায়। ডাক্তার সাহেব সবকিছু অনেটুনে চোখ বড়ো বড়ো করেন সবিশয়ে।

তারপর একাক্ষরকে লক্ষ্য করে বলেন, আপনি তো রীতিমতো হিরো। কী সাজ্জাতিক ব্যাপার! এটা তো গর্ব করে সবাইকে বলবার মতো ঘটনা।

একাক্ষর এ কথায় কিছুটা লাজুক হাসি হাসে। তবে তারই ভেতরে নিজের সাহসিকতা আর কাজের প্রশংসাসূচক স্বীকৃতি পেয়ে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে তার চোখমুখ মুহূর্তে। ডাক্তার আবার বলেন, বাক্সা, মুক্তিযোৱার বুকের ঠিল দিয়ে তৈরি। এতো সহজে কী তা ভাঙ্গতে পারে? কথা শেষে হাতে তুলে দেন তিনি সামান্য ওষুধপত্র। এখানে ওষুধপত্রের সরবরাহ সীমাবদ্ধতার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে এই সাথে তিনি বাইরে থেকে একটা ক্যাপসুল আর ইনজেকশন কিনে নেবার অনুরোধ জানান।

— ঘাবড়াবার কোনো কারণ নেই। রেটে থাকলেই ভালো হয়ে যাবেন, বলেন ডাক্তার।

রোগী দেখা হয়ে গেলে, আমরা তার কাছে শরণার্থী শিবিরের বর্তমান অবস্থা জানতে

চাই। তিনি বলেন, সমস্যার তো অন্ত নেই। সবারই ম্যালনিউট্রেশন। আর ম্যালনিউট্রেশন থেকেই নানা ধরনের অসুখ। ঠিকমতো খাবার নেই মানুষের, ম্যালনিউট্রেশন তো হবেই। এছাড়া প্রত্যেকের কমন অসুখ চূলকানি আর চোখের ভাইরাস লেগেই আছে।

— কলেরা-ডায়ারিয়ার খবর কি?

— কিছুটা কমেছে। মানুষ মরছে। তবে আগের চাইতে কম। কিন্তু এতো মানুষ! সামাল দেয়াটা সভিয়ই কঠিকর ব্যাপার।

ডাক্তারের তাঁবুর বাইরে রোগীদের জটলা। আমরা উঠি। ডাক্তার বলেন, আবার আসবেন। দু'চারজন মৃত্তিফোজের চিকিৎসা করতে পারলে তবুও মনে হবে, জয় বাংলার জন্য কিছু করছি।

— মাঝ বয়সী ডাক্তারের কথা শুনে সভিয়ই ভালো লাগে। এখন সময়টা এমন যে, এদেশের সব মানুষই জয় বাংলার জন্য একটা কিছু করতে চান। আমাদের স্বাধীনতা যুক্তে যে এটা একটা জোরদার সমর্থন, এতে কোনো সন্দেহ নেই।

এরপর সোজা বের্মবাড়ি বাজার। এখানে এসেই চলে যাই ঢাকাইয়া নুরুর দোকানে। আগের মতোই আছেন নুরু ভাই। আমাদের দেখেই কলম্বে হৈচৈ করে ওঠেন। তিনি বলেন, আরে আসো, আসো, বসো। কাল যে একখান ফাইট দিলা দেওয়ানহাটে। জ্যাতা রাজাকার নাকি ধইরা ফ্লাইছো?

নুরু ভাইয়ের কথা শুনে অবাক না হয়ে পারি না। অপ্রত্যক্ষে হয়েছে গতকাল সঙ্ক্ষয়। কোথায় সেই দেওয়ানহাট! সে প্রায় পঞ্চাশড়ের কাছে খবরটা ঠিক এসে পৌছে গেছে বের্মবাড়িতে। তাই জিগ্যেস করি, খবর পেলেন কি করে নুরু ভাই?

— আরে কও কি তোমরা! খবরতো বুজ্জে ভাইসা আসে। ভেতরের সব খবরই আমরা রাখি, বুঝলা!

কাচের গ্লাসে চা এনে দেন নুরু ভাই। তা খাই আর তার কাছে রাজনৈতিক অবস্থার গল্প শনি। তিনি জানান, ইন্ডিয়া স্বীকৃতিপ্রাপ্ত দিতে পারে আমাদের। ইন্দিরা গান্ধী বিদেশ থেকে ফিরে এসে কেমন শক্ত শক্ত কঁজা বলছেন, রাশিয়ার সাথে কী একটা প্যাঞ্চ হয়েছে, সে কথাও উল্লেখ করেন তিনি। তারপর বলেন, ব্যাপারটা য্যান্ কেমুন কেমুন ঠেকতাছে। নুরু ভাইয়ের কথা শেষ হতেই তাকে জিগ্যেস করি, সেটা কেমন?

— ঠিকমতো বুঝতে পারতেছি না। কহনও খুব হতাশ লাগে, কহনও মনে হয় দুঃখের দিন বুঝি আর বেশি দিন নাই। এদিকে শরণার্থীদের ভেতরেও প্রচণ্ড অস্ত্রির ভাব। এভাবে মানুষ কতোদিন থাকতে পারে, তুমিই কও?

নুরু ভাইয়ের এ প্রশ্নের জবাব আমাদের জানা নেই। একাব্বরকে দোকানে বসিয়ে রেখে আমরা উঠে পড়ি। বকর ও মুসা চলে যায় একাব্বরের শুধু যোগাড়ে। তাকে এখান থেকে ইনজেকশনের প্রথম ডোজ দিতে হবে। ভেতরগড় এলাকায় ইনজেকশন দেয়ার মতো গ্রাম্য কোনো ডাক্তার সভ্যত পাওয়া যেতে পারে। বাদবাকি ইনজেকশন তাকে দিয়েই দেয়াতে হবে।

যেখানেই থেকে ভালো থেকে

পিন্টু আর আমার একটা কাজ রয়েছে। ছেট্ট কাজ। আর সেটা হলো একজনকে ঝুঁজে বের করা। দু'জনে হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে যাই গড়ালবাড়ি থেকে যে সড়কটি এসে বের্মবাড়ি চুকবার মুখে মোড় নিয়েছে যেখানে সেদিক পানে। রাস্তার ডান দিকে দু'তিনটা বাড়ি। টিনের

ছান্দল। উচু মাটির তৈরি বারান্দা। ঘুন্দের মাঝামাঝি সময়কার একদিনের ঘটনা। ভেতরগড় থেকে বেরস্বাড়ি আসবার সময় রাত্তার ডানপাশ যেঁষা বাড়িটার রাত্তামুখী ঘরটার উচু বারান্দায় দেখা মিলেছিলো সেদিন অপর্ণপ এক ঘুথের। গভীর মনোনিবেশ সহকারে মেয়েটি পা ছড়িয়ে দিয়ে কিছু একটা সেলাই করছিলো। আমার পরিচিত আরো একটা ঘুথের হ্বহ্ব প্রতিক্রিপ যেনো মেয়েটি। তাই তাকে দেবেই চমকে উঠেছিলাম। মনের অভিলে তখন গভীর একটা জিজ্ঞাসা আর আলোড়নের উথালপাতাল ঢেউ। ও কেনো এখানেও স্পন্দের রাজ্যে ডানা মেলে ফেরা সেই মেয়ের তো থাকবার কথা পক্ষিম দিলাজপুরের কোর্টগোছ। এখনে আসবে ও কেমন করে!

পিন্টু লক্ষ্য করে ব্যাপারটা। আসলে নিজের অমন রূপের পসরা সাজিয়ে বসে থাকা মেয়েটির দিকে নজর না তুলে থাকা যায় না। তাই বাড়িটা পার হয়ে দাঁড়াই কিছুক্ষণ।

পিন্টু জিগ্যেস করে, চেনেন নাকি মাহবুব তাই।

— ঠিক বুঝতে পারছি না। তবে কেনো জানি চেনা লাগছে খুব। আসোতো ব্যাপারটা চেক করে দেবি।

কথাটা বলে দু'জনে আবার বাড়িটার সামনে এসে দাঁড়াই। মেয়েটির এবার কাপড় সেলাই কাজের ধ্যানমঝুতা কাটে। বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে থাকা দু'জন যুবককে তার গভীর কালো চোখের দৃষ্টি মেলে দিয়ে কিছুক্ষণ দেবে। তার ওই চাউনিতেও যেনো অনেক জিজ্ঞাসা। হঠাৎ কী হয়, মেয়েটি এগিয়ে আসতে থাকে আমাদের দিকে। পরনে তার শালোয়ার-কামিজ। শরণার্থীর জীবনের এই অনিচ্ছাতা আর সীমাহীন কষ্টের ভেতরে তার পোশাকে মলিনতা থাকলেও, তার ঘুথের আদলে ফুটপ্রস্তে নরম কোমল এক স্বিন্ধতা।

না, কোনো জড়তা নেই। সাবলীল ভঙ্গিমায়েটি এগিয়ে আসে আমাদের সামনে। সামান্য দূরত্ব রেখে। কাছে এলে স্পষ্টতই পুরু পড়ে, এ মেয়ে সে মেয়ে নয়। আদল যদিও অনেকটা একই রকমের। এ রকম অন্যতে জলখানোটা আসলেই ঠিক হয় নি মনে মনে ভাবি। কিন্তু এখন আর করার কিছু নেই।

আমরা দু'জন তখনো দাঁড়িয়ে মেয়েটি আমাদের মুখোমুখি। কেমন একটা অস্পষ্টিকর অবস্থা। কিন্তু মেয়েটিই সেই অস্পষ্টির পাথর নড়াবার জন্যই বোধহয় জিগ্যেস করে, কাউকে খুঁজছেন আপনারা?

— জি-না। এরকম পরিস্থিতিতে এছাড়া ঘুথে আর অন্য কোনো জবাব যোগায় না।

— তাহলে?

প্রথর জিজ্ঞাসু দৃষ্টি তার। আর সেই দৃষ্টি দিয়েই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সে দেখতে থাকে তার সামনে দাঁড়ানো এই আমাদের অপরিচিত দু'জন যুবককে।

আমাদের অস্পষ্টি আরো বাড়তে থাকে। একজন অপরূপ তরুণী সামনে দাঁড়িয়ে। তাকে কী করে বলা যায় এই সত্য কথাটা যে, আমরা তোমাকেই দেখে থমকে দাঁড়িয়েছি! সময়টা এমনিতেই তালো নয়। কতো মানুষ কতো রকমের অস্ত উদ্দেশ্য নিয়ে যে ঘোরাফেরা করছে শরণার্থী শিবিরের আশপাশে, তার গোনাঞ্জনতি নেই। আর এই রকম পরিবেশ-পরিস্থিতিতে আমাদের মতোন দু'জন যুবক উকি-বুকি ঘেরে বাড়ির ভেতরে মেয়েদের দেখছে, ব্যাপারটা শুধু বিসদৃশ্যই নয়, সন্দেহজনকও বটে। যে কেউ ব্যাপারটা দেখে অন্য রকম ভাবনা ও ভাবতে পারে। মেয়েটি এরি মধ্যে এ রকম একটা কিছু ভেবেও নিয়েছে সন্তুষ্ট। আর তাই এরকম কিছু আঁচ করতে পেরে পরিস্থিতি সামাল দিতে শিয়ে সপ্রতিত পিন্টু বলে ওঠে, না,

এমনি। আপনাকে দেখে পরিচিত লাগছিলো তাই...। মেয়েটির মুখ জড়ে ঘূর্হতে বিষণ্ণ হাসির রেখা ফুটে ওঠে বলে, আমাদের কি চিনবেন? দিনাজপুর শহরে আমাদের বাড়ি ছিলো। যুক্ত লাগলে ওরা আমার বাবাকে মেরে ফেলে। মা আর দুই ভাইবোনসহ অনেক কষ্ট করে আমরা পালিয়ে এখানে এসেছি। দিনাজপুর কলেজে পড়তাম আমি। ফার্স্ট ইয়ারে।

— সাথে কেউ নেই? গার্জিয়ান? জিগ্যেস করি তাকে।

— আপন কেউ নেই। পরিচিত কেউ কেউ আছেন। তারাই এখানে থাকাটাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। শরণার্থী শিবিরে থাকা তো খুবই কষ্টকর।

— চলছে কী করে?

— এই আর কি, শরণার্থী কার্ড যা পাওয়া যায়, তাই দিয়ে। এভাবে কতোদিন যে থাকতে হবে, কে জানে?

মেয়েটির চোখে-মুখে গভীর হতাশা ফুটে ওঠে। সামনে তাদের এখন এক জাজনা ধূসর ভবিষ্যৎ। কঠিন সহয় এদের কোথা থেকে কোথায় নিয়ে এসেছে। আসন্ন অনাগত দিনগুলোর ঝড়কাপটা এদের কোথায় কোন্তানে তাসিয়ে নিয়ে যাবে, কে জানে! লক্ষ কোটি শরণার্থী মানুষের সামনে এখন এই একই ধরনের অজানা ভবিষ্যৎ। নিজের বাড়িঘর ভালোবাসায় মেশায়েশি আপন ভুবন কোথা দিয়ে কীভাবে তচ্ছন্দ হয়ে গেলো। নিজ বাসভূম ছেড়ে আজ তারা নিরন্তর পরবাসী। শরণার্থী হয়ে কুসুমসহ মানবের জীবনযাপন! এদের স্বার্থেই দ্রুত জয় বাংলা দরকার। বাংলাদেশ স্বাত্ত্বাম না হলে এরা আর কোনোদিনই ফিরতে পারবে না নিজ বাসভূমে।

যুক্তের ভেতর সংবেদনশীল কোনো ঘটনার সুষ্ঠু হৃদয় জড়তে নেই। তাতে মন দুর্বল হয়। সৃষ্টি হয় সমস্যার। কিন্তু ঘটনাচক্রে মাঝে মেয়েটির সামনাসামনি হয়েছি, কিন্তু না বলেও থাকতে পারা যায় না। তাই কিন্তু আমরা মুক্তিকোজ। সামনের ক্রন্তৈই যুক্ত করছি। যদি কখনো প্রয়োজন মনে করেন, কিন্তু দেবেন।

যুক্তিকোজ কথাটা উচ্চারণশক্তির সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটির চোখ-মুখ এক উজ্জ্বল আলোয় মেলো উজ্জ্বাসিত হয়ে ওঠে। চোখে ফোটে একটা নতুন দৃষ্টির আভা। আরো ভালোভাবে দেখে সে আমাদের দুঁজনকে। মুখে কিছু বলে না।

— আসি তাহলে, মেয়েটিকে বলি। কিছু না বলে মাথা নাড়ে সে।

এরপর দুঁজন, আমি আর পিটু সড়কে উঠে বেরবাড়ির দিকে হাঁটতে থাকি। রাস্তার মোড় ঘূরবার আগ পর্যন্তও দেখা যায়, মেয়েটি তখনো সেখানে দাঁড়িয়ে আছে একইভাবে।

এ ছিলো মধ্য আগস্টের ঘটনা। তারপর থেকে বহুবার বেরবাড়ি আসা হয়েছে। কিন্তু মেয়েটি আর তার পরিবারের অন্য সদস্যদের খৌজখবর নেয়া হয় নি। মনের গভীরে একটা অপরাধবোধ তাই থেকেই মাথাঢ়া দিয়ে ওঠে। আর সেই অপরাধবোধ থেকেই আজ এতোদিন পর তাদের খৌজখবর নিতে আসা।

রাস্তার পার্শ্ববর্তী সেই বাড়িটার সামনে এসে দাঁড়াই। কিন্তু আজ আর দাওয়ায় বসা সেই মেয়েটিকে দেখা যায় না। আমাদের সাড়া পেয়ে বাড়ির ভেতর থেকে একজন বেরিয়ে আসেন। পরনে তার খাটো ধূতি আর গায়ে ফুতুয়া। আমরা তাঁকে আমাদের পরিচয় দিয়ে দিনাজপুরের সেই মা-মেয়ের পরিবারটির কথা জিগ্যেস করি। তিনি জানান, তারা নেই। মাস দুয়েক আগে তারা তাদের কোনো এক আঞ্চায়ের সাথে চলে গেছে। সম্ভবত তারা

পঞ্চিম দিনাজপুরের কোনো শরণার্থী শিবিরে জায়গা পেয়েছে। আমাদের মুখে আর কোনো কথা জোগায় না। ভদ্রলোককে কেবল ধন্যবাদ দিয়ে চলে আসি।

না, দেখা হলো না তার সাথে। মনের ভেতর একটা অপরাধবোধ নিয়ে ফিরতে হলো আবার। তার অবসান ঘটালো গেলো না।

বেরুবাড়ির কাজ শেষ এখন। তাই নুরু ভাইয়ের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ফিরে চলি আমাদের বর্তমান গন্তব্য অভিযুক্তে। বাঁয়ে বেরুবাড়ির বিশাল শরণার্থী শিবির। সম্ভবত এরকমই কোনো একটা শরণার্থী শিবিরে এখন সেই মেয়েটি আর তার মাসহ তাদের অসহায় পরিবারটির বসবাস। লক্ষ লক্ষ মানুষের ভিড়ে চিরদিনের মতোই তারা হারিয়ে গেছে। আমরা কিছু একটা করতে চেয়েছিলাম তাদের জন্য। করা হয় নি। তবুও মনের গভীরে এই রকম একটা কামনা জেগে থাকে, তারা যেখানেই থাক, ভালো থাকে যেনো। এই দৃঢ়সময় আর দূর্দিনের কঠোরতা তাদের যেনো বাঁচিয়ে রাখে। অস্তত অমঙ্গলের কোনো থাবা তাদের যেনো স্পর্শ না করে।

জ্ঞানের ইফতার পার্টি এবং জঙ্গল অভিযান

পাকবাহিনীর নিয়মিত টহলদার দল আসছে মধুপাড়া এবং পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলোয়। ইদানীং তাদের অবস্থা হয়েছে ক্ষ্যাপা কুকুরের মতো। গ্রামে সেই তাদের সেই চিরাচরিত অভ্যাসের বশে দাবি করতে শুরু করেছে, এটা দাও, এটা দাও। তাদের থাই মেটাতে গিয়ে মানুষজনের প্রাণান্তর অবস্থা। শুধু তাই নয়, তাদের আশপাশেই যে মুক্তিবাহিনীর ঘাঁটি রয়েছে, তার পাস্তা লাগাতেও পাকবাহিনী ঘাঁটি হয়ে উঠেছে। ধরপাকড়, মারধর আর সীমাহীন অভ্যাচার চলছে গ্রামের মানুষজনের ওপর। এছাড়া ফোর্সড লেবার হিসেবে প্রতিদিনই তারা গ্রামের লোকজনদের ঘাঁটি নিয়ে গিয়ে ট্রেঞ্চ-বাক্সার, ডিফেন্স লাইন তৈরি এবং মেরামত করা— এইসব ঘৃঙ্খলার খাটাছে। বিনা অপরাধে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হতে হচ্ছে অনেককে। আর বড়ো অঞ্চলের এ অঞ্চলের মানুষজন।

মধুপাড়ার সফল অ্যামবুশের পর তখন ধারণা করা হয়েছিলো, শক্রবাহিনী হয়তো তাদের গতিবিধি সীমিত করবে। কিন্তু বাতিবে তা হয় নি। আসলে সার্বক্ষণিক যুক্তে আটকে থাকা পাকবাহিনীকে তাদের দৈনন্দিন প্রয়োজন মেটানোর জন্যই এখন বের হতে হচ্ছে গ্রামের দিকে। রেশনের ঘাঁটি পূরণ, তাদের প্রতিরক্ষা ঘাঁটি তৈরির জন্য মালপত্র এবং শ্রমিক সংগ্রহ— এগুলোর জন্য তাদের বের হতেই হয়। মুক্তিবাহিনীর অবস্থান খুঁজে বের করাও তাদের অন্যতম লক্ষ্য।

তাদের আটকানো দরকার। এভাবে গ্রামের মানুষজন অভ্যাচারিত হতে থাকলে তারা বাধ্য হয়ে সব পালাবে। এর ফলে গ্রামকে গ্রাম তারা জুলিয়ে-পুড়িয়ে ছারখার করে দেবে। এমনিতে তারা নিরাপত্তার কারণ দেখিয়ে পাকা সড়কের দু'পাশের বসতিবাড়ি পুড়িয়ে দিয়েছে। পঞ্জগড়-অমরখানা পাকা সড়কের দু'পাশে এখন আর কোনো মানুষের বসত নেই। এখন ভেতরের জনবসতিগুলোর যদি এই হাল হয়ে দাঁড়ায়, তাহলে মানুষজনের দুর্ভীতির সীমা থাকবে না। তারা যাবে কোথায়?

বিকেলে সিঙ্কান্ত নেয়া হয় পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে আরেকটা অভিযানের। এতে মধুপাড়ার রাস্তা, বর্তমানে যা পাকবাহিনীর গ্রামে আসবার একমাত্র রুট হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে,

তার ওপর ব্যাপকভাবে মাইনের ফাঁদ বসানো ও সেই সাথে তাদের ওপর অ্যাম্বুশের পরিকল্পনা করা হয়। পরিকল্পনার শুটিনাটি বিষয় চূড়ান্ত হওয়ার পর দল গঠনের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে একরামুলের ওপর।

বকর আর শামসুন্দিনের নেতৃত্বে ২০ জনের একটি দল নতুন হাইড আউট নেবে সোনারবানের আশপাশে। তাদের জন্য অত্যন্ত নিরাপত্তামূলক জায়গা চাই। এ দলটি সেখান থেকে তালমা নদীর ওপারের এলাকাগুলো নিয়ন্ত্রণ করবে। প্রয়োজনে দ্রুত তৈরি হয়ে তারা শক্তিকে মোকাবেলা করবে। মধুপাড়া ও তার আশপাশের এলাকাগুলোয় পাকবাহিনীর নিয়মিত আগমন ঠেকাতে এ দলটি কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারবে। তাদের আগমন সংবাদ পেয়ে নিরাপদ দ্রুতে থেকে যদি এরা গোলাগুলি চালায়, তাহলে তাতে করেও কাজ হবে। পাকবাহিনীর নেতৃত্ব বল ভেঙে পড়বে। এখনকার মতো তারা আর যখন-তখন গ্রামে আসবার সাহস করবে না।

এ কৌশল কাজে লাগিয়েই চৌধুরী আর মুসাকে দিয়ে হাড়িভাসা পানিমাছ আর তালমা এলাকার শক্তি ঘাটিকে কেঁপেঠাসা করে রাখা হয়েছে। শুধিকার গ্রাম এলাকায় পাকসেনাদের টহল আর নেই বললেই চলে। ভেতরগড়, সর্দারপাড়া আর হাড়িভাসার বিস্তীর্ণ এলাকা এখন পুরোপুর মুক্তাধ্যন্তে নিয়ন্ত্রণের জন্যও একই ধারায় এই নতুন দলটি বিন্যাসের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

এ দলটি নিয়ে পিটুসহ বিকেলে রওনা কিন্তু সোনারবানের উদ্দেশে। রাতের অপারেশনের দল নিয়ে রাত দশটায় সোনারপাটি ইজির হবে একরামুল। সেখানে আমরা অপেক্ষা করবো ওদের জন্য।

সোনারবান পৌছে যাই সক্ষ্যার মুখ্যঝোবের নামাজের সময়, রোজার ইফতারের সময় তখন। হজুর ইফতার নিয়ে বসেন্তে আমাদের দেখেই তিনি উঠে দাঢ়ান এবং ইফতার যোগাড়যন্তর করার জন্য ব্যক্তিগত হয়ে পড়েন। হজুরকে বলি, ৪/৫ জন ছাড়া কেউই রোজা নেই। তিনি বলেন, তাতে কি হয়েছে, রোজার দিনে ইফতার করা তো সওয়াবের কাজ। এরপর তার ঘরের সামনে লাশ করে মাদুর বিছিয়ে তিনি সবার আয়োজন করেন। সবার জন্য ইফতারের প্রেট আসে। মুড়ি-চিড়া-গুড় সহযোগে সামান্য আয়োজন। কিন্তু তার মধ্যে রয়েছে গভীর আন্তরিকতার ছোঁয়া।

মসজিদে আজান হয়। হজুর বলেন, নেন বিসমিল্লাহ করেন।

আমরা সবাই হাত লাগাই প্রেটে। রমজান মাসের দিনশেষের এই শান্ত সম্মাহিত ক্ষণ একটা পরম পবিত্র লগ্ন হিসেবেই সবার কাছে ধরা দেয়।

নামাজশেষে হজুরের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে উঠে পড়ি আমরা। এরপর শুরু হয় জঙ্গল অভিযান। মতি আর মালেক থাকে গাইড হিসেবে। ওদের কাছ থেকে জানা গেছে গড় পেরিয়ে গহিন জঙ্গলের ভেতর কটা পরিত্যক্ত বাড়িঘর আছে। ওখানেই চমৎকার একটা হাইড আউট হতে পারে। পাকসেনারা পাবে না সেই গোপন আন্তরালার সঙ্কান। জায়গাটা বকরের দলের জন্য উপযুক্ত বিবেচনা করে সেখানে যাবার সিদ্ধান্ত নিই। সে অনুসারে তালমার পাড় দিয়েই আমাদের যাত্রা শুরু হয়।

অঙ্ককার কালো রাত। ভুতুড়ে জঙ্গল। পথ বলতে কিছু নেই। উচু-নিচু জায়গা দিয়ে পা

ফেলতে হয়। প্রত্যেকের কাঁধে-পিঠে রান্নার সরঞ্জাম, রেশনসামঘী, গোলাবাকুদ আর হাতিয়ার। এই লটবহর নিয়ে জঙ্গল আর বৌপূরাড় ঠেলে ঠেলে এগোয় আমাদের কষ্টকর পদ্বয়াত্র। সাথে কোনো আলো নেই। একমাত্র সহায় পকেটের ম্যাচ। মাঝে মাঝে ম্যাচের কাঠি জ্বালিয়ে নিজেদের অবস্থান বুঝবার চেষ্টা চলে। কিন্তু গভীর জঙ্গলের ভেতরে কোনো দিকটিক ঠাহর করা যায় না। পথ চলতে গিয়ে লতাগুলু জড়িয়ে ধরে পা, কাঁটালতার গাছগাছড়ার ঘষায় শরীরের চামড়া ছিঁড়ে যায়। প্রতিটি পদক্ষেপ অবিচ্ছিন্ত। সামনে কোনো খানাখন রয়েছে কি না বুঝবার উপায় নেই। এরি ভেতর দিয়ে বোপূরাড় ডালপাতা সরিয়ে সরিয়ে এগুতে হয় যতোটা সম্ভব সতর্ক হয়ে।

তারবাই ছেলেরা ক্রান্ত হয়ে পড়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই। কিন্তু এই জঙ্গল, উচু টিলার মতো ভূমি পার না হওয়া পর্যন্ত বিশ্রাম করার কোনো উপায় নেই। কোনদিকে যাচ্ছি তাও বুঝবার উপায় নেই। একমাত্র গাইড মতি আর মালেকই ভরসা। তারাই পারে আমাদের নির্দিষ্ট জায়গায় নিয়ে যেতে। ওরা দিক ভূল করলেই বিপদ। তাহলে সারারাত হয়তো এই জঙ্গল ভায়গায় ঘূরে বেড়াতে হবে। ওরা দু'জন দু'হাতে জঙ্গল ঠেলে ঠেলে সামনে এগোয়। আন্দাজে সামনের জায়গা বুঝে নেয় আর পেছনে ফিরে বলে, আসেন, এই দিক দিয়া যাওন যাইবো। অসুবিধা নাই কোনো। অঙ্ককারে তাদের ভূতুড়ে ছায়া লক্ষ্য করে আমরা এগোই। ডানে-বাঁয়ে সর সর শব্দে শেয়াল বা অন্য কোনো প্রাণী ছেটেছুটে যায়। রাতে এতোগুলো মানুষের জঙ্গলে এভাবে প্রবেশের ফলে তাদের শান্তি ছেটাই বিস্মিত হয়। এ জন্যই তাদের অস্থির ছোটাছুটি।

প্রায় ঘন্টা দেড়েক এভাবে কষ্টকর পথ চলাতে পার টিলার মতো উচু গড়টা অবশেষে পার হওয়া যায়। গড়ের নিচেই একটা খোলামাটো জায়গা। কটা ছনের ঘর। সংক্ষারবিহীন ভগ্নদশা একেবারে। এখানেই থাকতে হবে আমাদের। তবে তার আগে দেখে নিতে হবে তালো করে ঘরের ভিটেগুলো। সমস্থোপের আস্তানায় এগুলো পরিণত হয়েছে, সেটা একটুখালি দেখা দরকার।

বিধ্বস্ত, ক্রান্ত ছেলেরা কাঁধ থেকে মালসামানা নামিয়ে রেখে সোজা বসে পড়ে। মতি ঘরের শুকনো খড় পাকিয়ে আগুন জ্বালবার ভূতি তৈরি করে। এরকম দুর্তিনটা ভূতিতে আগুন জ্বালিয়ে আশপাশের এলাকাসহ ঘরগুলো দেখে নেয়া হয়। একটা বেড়াবিহীন ঘর পচন্দ হয়ে যায় আমাদের। পিন্টুকে বলি, এখানেই থাকবে এরা। ব্যবস্থা করে দাও।

পিন্টু সে অনুসারে বকর ও শামসুন্দিনকে নিয়ে তাদের হাইড আউট শুছিয়ে দিতে থাকে। আপাতত পানির উৎস হিসেবে কাজ করবে পাশের তালমা নদী। হাইড আউটের জন্য পানি সমস্যা একটা প্রধান সমস্যা। একটা আদর্শ হাইড আউটে পানির ব্যবস্থা থাকতেই হয়। তা নাহলে সেখানে অবস্থান করা অসম্ভব হয়ে দাঢ়ায়।

ওরা কিছুটা শুছিয়ে নিলে বকর ও শামসুন্দিনকে আবারো তাদের কাজ সম্পর্কে ব্রিফিং দিয়ে আমরা বিদায় নিই। মালেক থাকে তাদের সাথে। মতিকে নিয়ে ফিরবো আমরা। আজ রাতের অপারেশনে ওকে দরকার হবে। বিদায়ের সময় বকর আর শামসুন্দিনসহ অন্য ছেলেরা কেমন বিষণ্ণ হয়ে যায়। এই ভূতুড়ে গা শিরশির করা পরিবেশে স্বত্বাবতই ছেলেদের কিছুটা ভীত হয়ে পড়া স্বাভাবিক। বকর বলে, আপনাদের কালকেই আসতে হবে মাহবুব তাই।

— ঠিক আছে, দেখা যাবে। সাহস হারাইস না। সবার জিম্মাদার এখন তোরা দু'জন।

সময়মতো কাছে পাবি আমাদের।

কথাগুলো শেষ করে খোদা হাফেজ বলে আমরা জঙ্গলে টিলায় উঠতে থাকি। পেছনে অঙ্ককারের সাথে একাকার হয়ে দাঢ়িয়ে থাকে ওরা ২০ জন। ফিরতি পথে এবার তিনজন আমরা। পিন্টু, আমি আর মতি। মতি সামনে। হাতড়ে হাতড়ে পথের হিস বের করে চলে। আর আমরা ওকেই অনুসরণ করে চলি।

১১. ১১. ৭১

হতাহত তিন শঙ্কু সৈনিক : মাইন এপি-১৬ এর ধ্রংসাঞ্চক ক্ষমতা

সোনারবান হজুরের ঘরে একরামুলদের পাওয়া যায়। ওরা তৈরি হয়ে এসেছে। হজুর আগের মতোই নিজের হাতে চা তৈরি করে খাওয়ান। কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে রাত ১১টায় আবার যাহা শুরু হয় মধুপাড়ার উদ্দেশে। বিনা বাধায় পৌছে যাই আমরা ঠিকানায়। মধুপাড়ায় কাঁচা রাস্তাটা ভালো করে ঝরিপ করে নিয়ে সুবিধেমতো একটা জায়গা ঠিক করে নিই। জায়গাটার বাঁদিকে দুটো খেত পার হলেই ২/৩টা বসতবাড়ি। এ বাড়িগুলোকে কাজে লাগানোর জন্য জায়গাটা বেছে নেয়া হয়।

কিছুদিন হলো আমাদের হাতে এপি-১৬ নামে নতুন ধরনের পার্সোনাল মাইন এসেছে। এ মাইনগুলোর শক্তি এপি-১৪'র চাইতে অনেক বেশি। এগুলো চেহারা উপরের দিকে অনেকটা ডিস্কার্ডি। কালো সোহার পাতে শোড়া। প্রায় ৬ ইঞ্চির মাত্রে উচু, গোলাকৃতি। নিচের দিকের ব্যাস প্রায় ৩ ইঞ্চির মতো। এ ধরনের মাইনের ব্যবহৃতের ধরনও আলাদা। এপি-১৪ মাইন মাটির নিচে বসিয়ে রাখলেই চলে। উপর থেকে শায়ের চাপ পড়লেই তা বিস্ফোরিত হয়। কিন্তু এপি-১৬ মাইনের ওপর দিকে লিভারেক্স সাথে শক্ত সুতো বা তার বেঁধে নিয়ে তা টানা দিয়ে রাখতে হয়। এই সুতো বা তানে রাখার সময় পা পড়ে টান লাগলেই লিভার আলগা হয়ে ডেটোনেটের আঘাত এবং মাইনটি পুঁতে রাখা মাইনকে প্রচঙ্গভাবে বিস্ফোরিত করে। এছাড়াও লিভারের গায়ে সুতে লাগিয়ে লম্বা সুতোর মাথা ধরে দূরে কেউ অপেক্ষা করতে পারে। সুযোগমতো শঙ্কু কাছাকাছি এলে সুতোর মাথায় হ্যাঁচকা টান দিলেই মাইনের লিভার আলগা হয়ে যায় এবং প্রচণ্ড বিস্ফোরণের মাধ্যমে মাইন তার ধ্রংসাঞ্চক কাজ সমাধা করে।

প্রথমবারের মতো আমরা এপি-১৬ মাইন ব্যবহার করবো এপি-১৪ মাইনের সাথে। রাস্তার পার্শ্ববর্তী বাড়ি কঠাকে এজন্য কাজে লাগাতে হবে। দুটো এপি-১৬ এবং আটটা এপি-১৪ নিয়ে কাজে লেগে পড়ি। মতিকে নিয়ে পিন্টু যায় বাড়িগুলোর দিকে। একরামুল, বাবলু আর মতিয়ার বেয়নেট দিয়ে রাস্তার ওপর মাটি খুড়ে সাইজমতো গর্ত করতে থাকে। এপি-১৬ মাইনের জন্য আমি রাস্তার বাঁ পাশের ঢালের দিকে বড়ো বড়ো তৃণাঙ্গনিত জায়গা বেছে নিই আর প্রায় ৮/১০ হাত দূরত্ব বজায় রেখে মাইন দুটো বসানোর কাজ শুরু করি।

পিন্টু আর মতি ফিরে আসে প্রায় ২০ মিনিট পর। আসে সঙ্গে একজন লোককে নিয়ে। পাতলা গড়নের বেঁটেখাটো চেহারা লোকটার। মুখে পাতলা দাঢ়ি। তার সাথে আলোচনা করে মনে হয়, সে জয় বাংলার জন্য নিজের জীবন বিসর্জন দিতে এই মুহূর্তেই প্রস্তুত।

আসলে এ ধরনের লোকেরই আমাদের প্রয়োজন। তাকে বুঝিয়ে দিই কী কাজ করতে হবে। রাস্তার পাশে দুটো মাইনে সুতো লাগিয়ে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে ধানবেতের ভেতর দিয়ে তার বাড়ি পর্যন্ত। এ সুতো ধরে সকাল থেকে বসে থাকতে হবে। খানসেনারা যখন এ

জায়গায় হাঁটতে হাঁটতে আসবে, তখন সুতোর হেঁচকা টান দিতে হবে। আর তখনি বিক্ষেপিত হবে মাইন। ফলে খানসেনারা আহত বা নিহত হবে। তবে, মাইন বিক্ষেপণের পর তাকে দ্রুত সরে যেতে হবে বাড়ি ছেড়ে। লোকটা যে অসম্ভব সাহসী সেটা বোঝা যায় যখন সে দিব্য মাথা নাড়িয়ে বলে, পারিম গে, কুনো অসুবিধা হবে নাই।

এরপর আধিঘটার মধ্যে কাজ শেষ হয়ে যায়। এপি-১৪ মাইনগুলো মাটি চাপা দিয়ে ভালোভাবে ক্যামোচেল করে দেয়া হয়। এপি-১৬ দুটো ভালোভাবে ঢেকেছুকে দেয়া হয়। সুতোর দুটো প্রাণ ধরে ধানখেতের ভেতর দিয়ে এমনভাবে নেয়া হয়, যাতে সহজেই কারো চোখে না পড়ে। লোকটির সাথে গিয়ে তার ঘরের পেছনে বসার জায়গা ঠিক করে দিই। সেই সাথে ভাবি, সকালের দিকে পাকসেনাদের দেখে লোকটার ভরকে যাওয়া বিচিত্র কিছু নয়। তাই মতিকেও রেখে দিই তার সাথে। ওদের দুঁজনকে রেখে আমরা পিছিয়ে আসি। মধুপাড়া গ্রাম ছাড়িয়ে মাইন স্থাপনের জায়গা থেকে প্রায় আধা মাইল দূরে একটা পরিচিত বাড়িতে গিয়ে ওঠ। একরামুল ও বাবলুরা তাদের ১৫ জনের দল নিয়ে রাস্তার পাশে বাকি রাতটার জন্য অ্যামবুল পেতে অবস্থান নেয়। পিন্টুকে নিয়ে আমি বাড়িটার বাইরের ঘরে পাতা চোকির ওপর ওয়ে পড়ি। ক্রান্ত পরিশ্রান্ত শরীর কিছুটা বিশ্রাম চায়। চোখের পাতা ঘুমে জড়িয়ে আসে অলঞ্ছপের ভেতরেই।

সকাল সাতটার দিকে প্রচঙ্গ হৈচে আর গোলাগুলির ধান্দে ঘূম ভাঙে। টেনগান হাতে বুলিয়ে পিন্টুসহ দৌড়ে যাই রাস্তার ধারে। একরামুল ব্যায়শ উৎক্ষেপিতভাবে বলে ওঠে, তিন চাইরটা মাইনের শব্দ হইছে। খানেরা বোধহ্য আসছে। গ্রামের লোকজনের মধ্যে দোড়াদোড়ি পড়ি গেইছে।

তখন সামনের দিক থেকে এলোপাঞ্চটি শুলি ভেসে আসে। তুমুল সে শুলির শব্দ। রাস্তার পাশে পজিশন নিয়ে সঙ্গীদের মৃত্যুক তাদের প্রতিটি হাতিয়ার থেকে শুলি চালিয়ে যেতে বলি। মধু ওর এল.এম.জি.ফিল্ড অনবরত শুলিবর্ধণ শুরু করে। অন্য হাতিয়ারগুলোও সচল হয়ে ওঠে। এখন এগিয়ে মাটওয়ার উপায় নেই। পরিস্থিতিটা কি, সেটা এখান থেকেই ঠাহর করতে হবে।

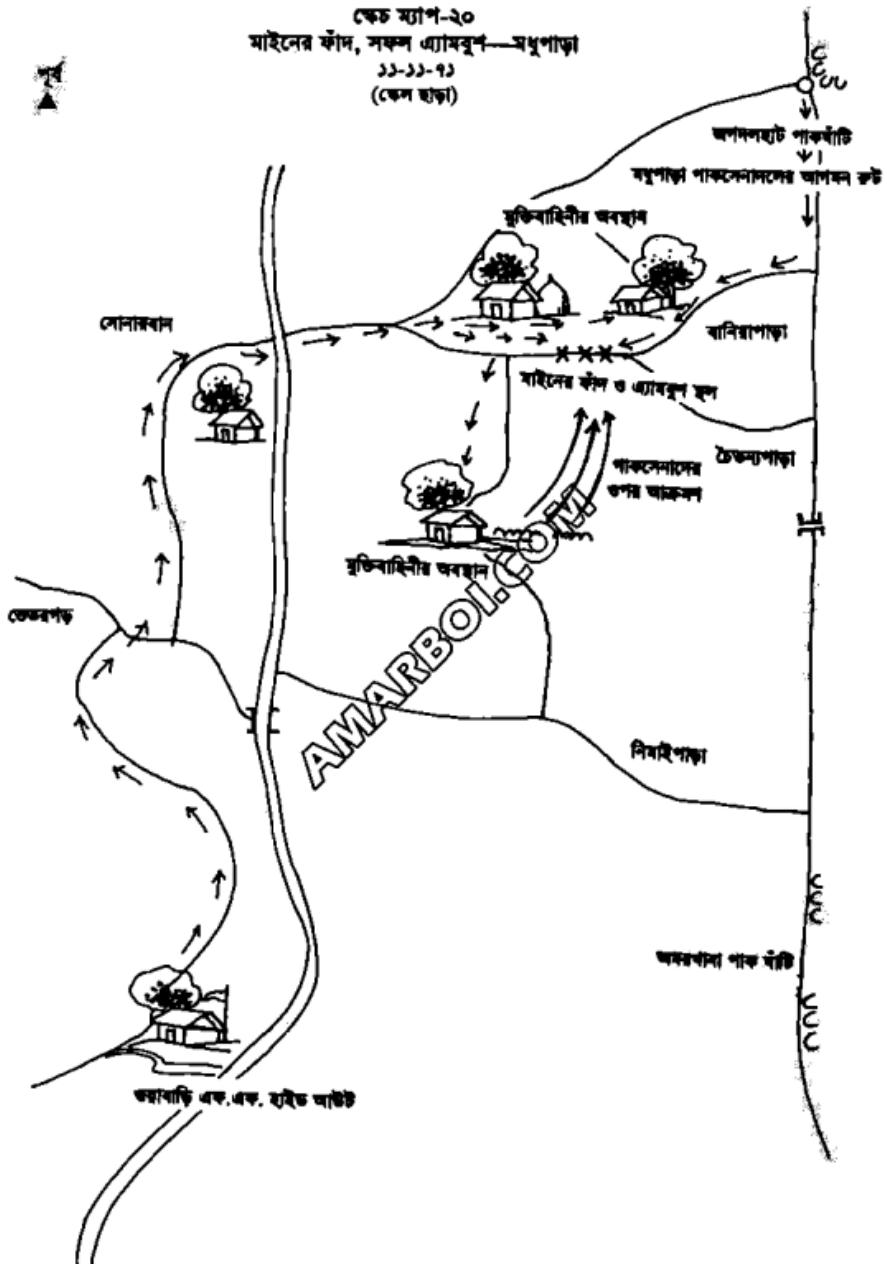
প্রায় আধিঘটা পর সামনের দিককার গোলাগুলি থেমে যায়। থেমে যাওয়ার কিছুক্ষণ পরই মতি দৌড়ে আসে উদ্ভৱান্তের মতো। হাঁপাতে হাঁপাতে বড়ো বড়ো লাল চোখে সে বলে, সকালে ১০/১২ জন খানসেনা আসতেছিলো। মাইনের কাছাকাছি ওরা আসতেই তারা দুঁজন সুতোয় টান দেয়। দুটো মাইনই বার্ট হয় বিরাট শব্দ তুলে। সাথে সাথে পড়ে যায় দুঁজন খানসেনা। তারপর তাদের মধ্যে হড়েছড়ি পড়ে যায়। তখন পেছন দিককার আর একটা মাইন বার্ট হলে আর একজন খানসেনা পড়ে যায়। অন্য খানেরা রাস্তার নিচে নেমে খুব গোলাগুলি চালাতে থাকে। তারপর আহত খানসেনাদের নিয়ে ওরা চলে যায়। ওদের তিনজনের ভেতরে একজনের ছিন্নভিন্ন অবস্থা। মরে গেছে। অন্য দুজনের অবস্থাও খারাপ।

— ওরা ফিরে গেছে?

— হ্যা।

— তুই দেখেছিস?

— হ। দেখিয়াই তো দোড়াইয়া আইলাম।



ফির মারিমো উমহাক, কি কহেন

তাহলে ঘটনাস্থলে যাওয়া দরকার। চট করে সিন্ধান্তে এসে সবাইকে নিয়ে দৌড়ে চলি ঘটনাস্থলের দিকে। সেখানে পৌছে থমকে যেতে হয়। এপি-১৬ মাইন এতো শক্তিশালী আমার ধারণা ছিলো না। রাস্তার পাশে বেশ খানিকটা জায়গা বিস্ফোরণে গর্ত হয়ে গেছে। রাস্তার ওপর আহত শক্রসেনাদের চাপ চাপ রাস্ত। ছেলেদের রাস্তার ওপর থেকে নেমে যেতে বলি। কেননা, এখনো তাজা মাইন লুকিয়ে রয়েছে রাস্তার মাটির নিচে। রাতের বেলা পোতা মাইন। দিনের আলোতে তাদের সঠিক অবস্থান চিহ্নিত করা মুশকিল।

একরামুল বাঁদিকের ধানথেত থেকে চিৎকার দিয়ে ওঠে। একটা চাইনিজ রাইফেল পেয়েছে সে। তার মানে ছিটকে যাওয়া আহত সৈনিকদের অন্ত এদিক-সেদিক পড়ে আছে। তাড়াহড়ো করে ফিরে যাওয়া পাকসেনাদের দলটি সেগুলো ঝুঁজে নেয়ার সময় পায় নি। পিন্টুকে বলি রাস্তার দু'পাশে জায়গাজমি ভালোভাবে ঝুঁজে দেখতে।

ঝুঁজতে ঝুঁজতে শেষে আরো একটা রাইফেল পাওয়া যায়। ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা গুলি পাওয়া যায় ১০০ রাউন্ডের বেশি। সেগুলো কুড়িয়ে নিয়ে তাড়াতাড়ি ফেরার পথ ধরি। রাতের বেলাকার সেই ঝোগা পাতলা দৃশ্যমান মানুষটার দেখা মেলে। দাঁড়িয়ে আছে রাস্তার ওপরে। চোখে-মুখে তার আনন্দের ছটা। দাঁত বের করে সে কী তার হাসি! সকালের সোনালি রোদের শামিয়ানার নিচে তাকে অন্য রকম দেখায়। আমাকে দেখেই হাসি প্রতিয়ে অনেকটা হিসহিসিয়ে বলে, গ্রাতাংদিন উমহারালা হামাক মারিছে, আইজ উমহাক মারিসে, শালার খান...!

আমরা তার সাহসের তারিফ করি। ধন্যবাদ জনন্ত! এই অপারেশনে সাহায্য করার জন্য। সাবধানে থাকতে বলি তাকে। সে আবার হাস্তে সে হাসির ছটায় ফুটে ওঠে তার নির্ভীক আর দৃঢ় প্রত্যয়শীল মনের ছবি। সে বলে যাকে কি তুমহারালা একলাই করিবেন? হামারালাও তো আছি তুমহার সাথ। জয় বাংলা হাস্তে লাগিবে নাই? কি করিবে শালারঘর? ফির যদির উমহারা আসিবা চাহে, ফির মারিমুন্ড উমহাক, কি কহেন?

লোকটার কথা শুনে আশঙ্কে মন উঠলে ওঠে। ভেতরে ভেতরে মানুষজন কী ভয়ানকভাবে তৈরি হয়ে উঠেছে। এখন শুধু চূড়ান্ত আঘাত হানার পালা। বিষ্঵াস জন্মায়, অধিকাংশ মানুষই তখন আমাদের পাশে এসে দাঁড়াবে।

লোকটার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ফিরে চলি। সফল অপারেশন শেষে ফিরে চলার পথে দেহ-মনে কোনো রকম ক্রান্তি স্পর্শ অনুভব করি না। সমস্ত মন জুড়ে বিরাজ করে ভালো লাগা। আনন্দ আর আনন্দ।

১১. ১১. ৭১

মানুষের ভেতরে থেকে মানুষকে নিয়ে যুদ্ধ

শীতের চমৎকার রোদেলা দুপুর। শরীর জুড়ে রাজ্যের আলস্য নিয়ে বসে থাকি বাঁশের মাচানের ওপর। পাশে শুয়ে পিন্টু শনশুন করে আপন মনে গান শেয়ে চলে। সম্মুখবর্তী বিলের মধ্যে নানা বর্ণের অতিথি পাখির ঝাঁক। সেদিকে দৃষ্টি মেলে দিয়ে তাদের ডাকাডাকি শুনি। ওদের ডড়াউড়ি শিল্পীজনোচিত ভঙ্গির পর ভঙ্গির বিল্যাস দেখি।

একরামুল ভেতর থেকে বাইরে আসে। পিন্টু গান থামিয়ে তাকে কাছে ডাকে। সে কাছে গেলে তাকে জিগ্যেস করি, ভবির জইন্যে যে শাড়ি আনলু পছন্দ হইছে?

প্রশ্নটা শুনে একরামুল হাসে। সারা মুখে হাসির চেট খেলিয়ে বলে, কেমন জানি ক্যাটক্যাট রঙ। বাছি নিলে হইল হয়। সময় পাওয়া গেল না।

— ওরে শালা... ওটে মাইন্স্যের বলে জান নিয়া পালাপালি ওর মধ্যে তুমি শাড়ি বাছার কথা চিন্তা করো তখন ?

পিন্টুর উত্তর শুনে একরামুলের মুখের হাসি হাসি ভাব কিছুটা মিলিয়ে যায়। কিন্তু উৎসাহ হারায় না। একইভাবে বলে, না, সে কথা নোয়ায়, সময় পাইলে বাছি নেওয়া গেল হয়, এইটা কবার চাষে মুই।

ওদের দুঁজনের কথোপকথন শুনতে মজা লাগে। আমি তখন একরামুলকে বলি, ভাবির পছন্দ হইছে:

— হয়, বলে মাথা কাত করে সে।

— পরেছে;

— হয়, পিন্ডিছে।

— বাহ ফার্স্ট ক্লাস। যা তাহলে তুই ভাবির সাথে মিলে আমাদের চা বানিয়ে নিয়ে আয়। বিড়িও আনিস।

কাজটা পেয়ে ঝুশিমনে একরামুল তার লম্বা লম্বা পা ফেলে বাড়ির ভেতরে চলে যায়। তার গম্ফন পথের দিকে তাকিয়ে মনে হয়, ভালোই তো হাঁচে সবাই। মুক্তের মধ্যে বসবাস করে মানুষের সাথে কতো সহজ-সরল সম্পর্ক পাইয়াছে তুলেছে যে যার মতো করে। জনমুক্তের প্রকৃত রূপ বুঝি এটাই। জনমুক্তে মানুষের ভেতর থেকে মানুষকে নিয়ে যখন যুদ্ধ, তখন এ ধরনের পরিত্র আর সুন্দর সম্পর্ক তে ঘোষণে মানুষে গড়ে উঠবেই।

জনিয়ে গেলাম, আমরা আছি

রাতের অপারেশন চৈতন্পাড়ায়, সেখানে পাকবাহিনী ঘাঁটি গাড়বার একটা পায়তারা করছে বলে খবর পাওয়া গেছে। এর জুগাড় তারা সেখানে ঘাঁটি গাড়বার চেষ্টা করেছিলো। কিন্তু সে চেষ্টা ওদের ভুল করে দিয়েছি আমরা। চৈতন্পাড়া বিজ দু'বৰ্বার উড়িয়ে দেয়া হয়েছে এক্সপ্লোসিভ দিয়ে। বিজটা আবার সেরামত করে তারা চলাচল উপযোগী করে নিয়েছে। তা নিক কিন্তু পাকবাহিনীকে কোনোভাবেই সেখানে নতুন করে ঘাঁটি গাড়তে দেয়া হবে না। অতএব সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে, আজ রাতেই সেখানে হামলা করা হবে। রানার মারফত সোনারবানের গড়ের ওপারের জঙ্গলে হাইট আউটে থাকা বক্র আর শামসুন্দিনকে নির্দেশ পাঠানো হয়েছে, তারা যেনো দল নিয়ে জগদলহাটের দিকে যায় এবং নিরাপদ দূরত্ব থেকে শক্রঘাঁটির ওপর গোলাগুলি চালিয়ে তাদের শাস্তিতে ব্যাঘাত ঘটিয়ে আসে।

রাত নটায় যাত্রা শুরু হয়। আজ অন্য কুটে যাত্রা। মধুপাড়ায় সকালের আ্যামবুশের ঘটনার পর আমরা শুই এলাকাটা এড়িয়ে যেতে চাইছি। শালমারা ভাঙা বিজের তলা দিয়ে হাঁটু সমান তালমার পানি পার হয়ে সামনের রাস্তাটা দিয়ে কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে নেমে পড়ি ঝাঁদিকের হাঁটাপথে। জোনাব আলী পথ চিনিয়ে চিনিয়ে অনেক ঘোরাঘুরির পর রাত ১২টার দিকে আমাদের নিয়ে তোলে চৈতন্পাড়া লাল স্কুলের মোড়ের রাস্তায়। এখান থেকে প্রায় কোয়ার্টার মাইল দূরে লাল স্কুল আর পাকা সড়ক পথটা।

ডান দিকের অমরখানা ঘাঁটি কেমন যেনো নিজীব হয়ে আছে। মাঝে মাঝে টুস্টাস

গুলিবর্ষণ ছাড়া আজ আর তাদের গোলাগুলির তেমন মাত্র নেই।

সবার পরনেই লুঙ্গি, শার্ট, সোয়েটার আর চাদর। জুতো পাওয়া যায় নি এখনও। তাই শ্পঞ্জের স্যাভেল পরতে হয়েছে। রাতে এখন বেশ শীত লাগে। হিমালয়ের কাছাকাছি এলাকায় শীতের প্রকোপ বরাবরই বেশি। নভেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহের শীতের দাপট বুঝিয়ে দেয় ডিসেম্বর-জানুয়ারির শীতের কামড় কতোখানি শক্ত আর জোরালো হতে পারে। কুয়াশাঙ্গে ঘাসের ওপর দিয়ে স্যাভেল পরে হাঁটতে গিয়ে পানিতে-মাটিতে মেশামেশি হয়ে পায়ের তলা কেমন পিছল পিছল হয়ে যায়। দ্রুত হাঁটবার বা দৌড়াবার সময় অসুবিধা হয় এতে। কিন্তু এ অবস্থা মেনে নেয়া ছাড়া আপাতত অন্য আর কোনো উপায় নেই।

যুদ্ধের ব্যাকরণ মেনে অর্থাৎ ক্ষেত্র দিয়ে রেকি করতে করতে এগুবো না সরাসরি গুলি ছুড়তে ছুড়তে এগুবো, এই ভাবনায় এখন আমরা তোলপাড়। পিটুর সাথে কথা বলছি এ নিয়ে। যুদ্ধে যুদ্ধে এখন আমরা ধাতস্ত হয়ে গেছি। এখন আর ট্রেনিং সেটারে শেখানো সেই যুদ্ধের ব্যাকরণ মেনে চলতে ইচ্ছে করে না। এখন আমরা নিজস্ব স্টাইলে যখন যেভাবে প্রয়োজন সেভাবেই যুদ্ধ করে যাচ্ছি।

আজকের অগারেশনের ব্যাপারস্যাপার নিয়ে যখন একটা সিক্ষান্তে পৌছুবার চেষ্টা করছি, ঠিক তখনি জগদলহাটের পেছন থেকে গোলাগুলি বর্ষণ শুরু হয়ে যায়। বুবাতে পারি এ কাজ বকর ও শামসুন্দিনের দলের। ওরা ঠিক সফরিমতো এসে গেছে। এসেই নির্দেশমতো শুরু করে দিয়েছে তাদের কাজ।

ওদের গুলিগালা শুরু হবার পরপরই চট করে সিস্টেমটা নিয়ে ফেলি, না রেকি করে নয়, সরাসরি এগিয়ে যাবো। পিটুকে তার ২ ইঞ্জিনের থেকে দুটো শেল ছাড়তে বলি। পিটু ত্বরিত মটর বসিয়ে ধমাধম দুটো শেল প্রাণিয়ে দেয় পাকবাহিনীর আঞ্চানার উদ্দেশে। ১৫ জনের দলকে নিয়ে তখন আমি দ্রুত এগিয়ে যাই চৈতনপাড়ার সেই লাল স্কুলের দিকে। কোমর বাঁকিয়ে গুলি হেঁড়া শুরু করিসবাই সামনের দিকে এগিয়ে চলে।

মিনিট দশকের মধ্যেই পার্কসেডকে পৌছে যাই আমরা। কোনোরকম বাধা আসে না। ফলে চৈতনপাড়া ব্রিজ পর্যন্ত এগিয়ে যাই। না, নেই, পাকবাহিনীর টিকিটি পর্যন্ত নেই এখানে। সব ফাঁকা, শূন্য।

অমরখানা ঘাঁটি জেগে উঠেছে। পেছনদিককার জগদলহাটও। পাকা সড়কের ওপর আমাদের দলকে এবার দুই শক্ত-ঘাঁটির দিকে মুখ করিয়ে মিনিট ১৫ ফাঁকা গুলি চালিয়ে যাই। তারপর সবাইকে খামিয়ে দিয়ে রিট্রিটের নির্দেশ দিই।

আজ শক্তির সাথে সরাসরি কোনো সংঘাত হলো না। শক্তি এলাকার পেটের মধ্যে ঢুকে আমরা সাড়বরে আমাদের শক্তির মহড়া প্রদর্শন করে গেলাম। ওদের জানিয়ে গেলাম, আমরা আছি।

১২. ১১. ৭১

সবার আকৃতি, এক সাথে থাকি আগের মতো

চৌধুরী আর মুসার অবস্থান এবং তাদের তৎপরতা দেখবার জন্য ভেতরগড়-নালাগঞ্জ-মধুপাড়া-হাড়িভাসা এলাকায় যেতে হয়েছিলো। পিটু ও আমাকে ওদের হাইড আউটে পেয়ে ছেলেদের মধ্যে যেনো খুশির বান ডাকে। সবাই ব্যস্ত হয়ে পড়ে আমাদের খাতিরআন্তি করার

জন্য। ছেলেদের এই অমলিন ব্যবহার আর ভালোবাসার উত্তাপ হ্রদয় দিয়ে অনুভব করা যায়।

মোতালেব বলে, মোক তুমরা ধরছে যান, এই দিক আর তেমুন কাজ নাইগে, যুৎ লাগে না থাকিবা। কাজের ছেলে মোতালেব। প্রতি মুহূর্তে সে দুঃসাহসিক অভিযানের জন্য মুখিয়ে আছে। যুদ্ধের প্রচণ্ডতা আর বিভীষিকার ভেতরেই সে খুঁজে পায় চরম রোমাঞ্চ। তাই প্রতিদিন যুদ্ধের ভেতর না থাকলে তার হতাশ হবারই কথা। মুসা বলে,

— এখানে একা একা ভালো লাগে না মাহবুব ভাই! চলেন আবার আমরা এক সাথে থাকি আগের মতো।

মুসা সব সময়ই নির্ভর করতে চায় আমাদের ওপর। একক কমান্ড দিয়ে অপারেশন পরিচালনায় সে সবসময় অস্বস্তিবোধ করে। এছাড়া অনেকদিন এক সাথে জুটি বেঁধে সুশে-দুঃখে বসবাসের অভ্যেস আর একটা পারস্পরিক নির্ভরতা গড়ে উঠেছে, মুসা আন্তরিকভাবে সে অবস্থায় ফিরে যেতে চায়।

অসম্ভব স্বাধীনচেতা ছেলে শামসুল চৌধুরী। সেও বলে, মাহবুব ভাই, এদিক তো কাজ নেই তেমন। হাড়িভাসার দিকটা দেখছে মোখলেস আর হাকিমের দল। আমাকে নিয়ে চলেন আপনাদের সাথে। এখন তো যুদ্ধ ওদিকেই। আপনার আর পিটু ভাইয়ের সাথে থেকে আগের মতো যুদ্ধ চালাই ওদিকে।

চৌধুরী স্বাধীনচেতা ছেলে হলেও এককভাবে বড়ো ফ্রিলেনের অপারেশনের জন্য রিস্ক নেবার মতো মানসিকভাবে তৈরি হতে পারে নি। এছাড়া দলের নেতৃত্ব নিয়েও তার মধ্যে কিছুটা দুর্বলতা রয়েছে। সে স্বাভাবিকভাবেই চাইছে পিটু আর আমার আওতায় থেকে আগের মতোই দিনবাত যুদ্ধের কাজে লিপ্ত হয়ে আসতে।

মিনহাজ, আমাদের কোয়ার্টার মাস্টার ঘোড় বলছে, এইখানে আর ভালো লাগে না। যুদ্ধও তেমন নাই, লঙ্ঘরের কাজও নাই তেমন। যুদ্ধ যখন ওদিকেই, তখন সোনারবানে হেড কোয়ার্টার করে আগের স্বাই সবাই মিলে এক সাথে থাকি। মোক যাবা হবে তুমহারালার সাথে।

মিনহাজ একজন সফল কোয়ার্টার মাস্টার। পেরিয়ে যাওয়া দিনগুলোয় তাকে কতো রকমের প্রতিকূলতার মোকাবেলা করতে হয়েছে, তার শেষ নেই। কিন্তু কোনো দিনই সে ছেলেদের একবেলাও না থাইয়ে উপোস রাখে নি। কোয়ার্টার মাস্টার হিসেবে এখন তার কাজ হয়ে পড়েছে সীমিত। এখন তাকে অপারেশনের দিকটা দেখতে হচ্ছে বেশি বেশি করে তার মূল দায়িত্বের পাশাপাশি।

আগে আমরা দলবদ্ধ হয়ে একসাথে থাকতাম। আজ এ হাইড আউট, কাল ও হাইড আউট করে দিন কেটেছে। এখন যুদ্ধের গতিধারা বদলেছে। অপারেশন এলাকা সম্প্রসারিত হয়েছে। মুক্ত হয়েছে বিস্তীর্ণ এলাকা। মুক্তিযোদ্ধাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। এখন প্রায় দেড়শ' সশস্ত্র যোদ্ধা রয়েছে ৩-এ মধুপাড়া কোম্পানিতে। এখন আর সবাইকে নিয়ে একই হাইড আউটে আগের মতো থাকাও সম্ভব নয়।

ওদের সবাইকে বুঝিয়ে বলি ব্যাপারটা। বলি যে, পিটুসহ আমি এসে এলাকায় সাত দিন থেকে তোদের নিয়ে আগের মতো অপারেশন চালিয়ে যাবো। এবার মূল টাগেট হবে পানিমাছ শক্রঘাট। মোখলেস-হাকিমের সহযোগিতায় আমাদের সঞ্চিলিত শক্তি দিয়ে

পানিমাছ শক্রঘাঁটি দখল নেবার পর তাদের তাড়িয়ে দেবো তালমা পর্যন্ত। এর ফলে এলাকার সবটাই মুক্ত হয়ে যাবে। তখন এদিককার দলগুলো যাবে সোনারবান-গুয়াবাড়ির দিকে, ওরা আসবে এদিকে। আপাতত এটাই সর্বশেষ সিদ্ধান্ত। এভাবেই সবাইকে এখন থাকতে হবে এবং মুক্তাবলকে ধরে রাখার পাশাপাশি শক্র ওপর হামলা চালিয়ে যেতে হবে।

এরপর মুসা আর চৌধুরীকে নিয়ে যাই হাড়িভাসার কাছাকাছি মোখলেস-হাকিমের দলের কাছে। ওরা আপন আঁচীয়ের মতো গ্রহণ করে আমাদের। ‘জয় বাংলা’ বাজারের কাছাকাছি মোখলেস-হাকিম স্থায়ী ঘাঁটি করে একেবারে জমিয়ে বসেছে। অনেকদিন পর দেখা ওদের সাথে। ছাড়তে চায় না সহজে। আগামী দিনের মুক্ত পরিকল্পনা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা শেষে বিদায় নিই আমরা। মুসা আর চৌধুরীসহ একটা পেট্রল পার্টি আমাদের এগিয়ে দেয় ভেতরগড় পর্যন্ত।

অস্তঃপুরের মেয়ে

মতিনের বাড়িতে এসে বসতে হয় কিছুক্ষণ। এলাকাটা মুক্ত হ্বার পর মতিনের প্রভাব বেড়েছে এলাকায়। লোকজন আসছে তার কাছে নানা ধরনের সালিশ-বিচার নিয়ে। মতিনের এ অবস্থাত্ত্বে ভালো লাগে। তাকে বলি, দেশ বাধীন হলে আমরা তোকে ভেতরগড়ের চেয়ারম্যান বানাবো। দাঁত বের করে হাসে মতিন। খবর-স্মৃতিয়ে মকতু মিয়াও ছুটে আসে। অঙ্ককারে বিগলিত হাসিতে তার সাদা দাঁতের সারি আশেপাশে মতো ঝিলিক দিয়ে উঠে।

মতিন তার ঘরে নিয়ে যায়। চায়ের সাথে চিজু ভাজা নিয়ে আসে তার লক্ষ্মীপ্রতিম বউটি। ঘোমটার আড়াল থেকে সে বলে, রাইভেল মহিয়া যাওন লাগবো।

খেয়ে যাবার উপায় নেই। একথাটা জরুরি তাকে। এবার ঘোমটার কাপড় সরিয়ে নেয় বউটি। হারিকেনের মৃদু কোমল আনন্দের দেখা যায় চিরন্তন বাংলার সেই পরিচিত শ্যামল নরীর মূখ। আনন্দে সেই নরী জুন্ডাড়ির আঁচল আঙুলে পেঁচিয়ে নাড়াচাড়া করে। কিছুটা দ্বিধাত্বিত হ্বরে সে বলে, ওনারে অফিনেরা আর ডাকেন না ক্যান? চমকে উঠতে হয় তার কথায়।

— ওনারে মানে, মতিনকে!

মাথা নাড়ে সে।

কী বলবো এই মেয়েটিকে? তার স্বামী মতিনকে আমরা আগের মতো অপারেশনে নিই না কেনো, এর কারণ জানতে চাইছে মেয়েটি। পিন্টুর দিকে তাকাই তখন। ওর চোখে-মুখে হাসির ঝিলিক।

সে বলে, আমরা ওকে রেঞ্চে রাখছি। কয়দিন খেয়েদেয়ে মোটাসোটা হোক, তারপর আবার নেবো।

মুখ দেখে বোঝা যায়, তার কথায় মেয়েটা সন্তুষ্ট হলো না।

অনেকটা জেনি গলায় সে বলে, জয় বাংলা কি হইছে? এহনও হয় নাই। তয় উনি যুদ্ধের কাজে লাগবো না ক্যান?

চমকে উঠবার মতো কথা। একদিন এই মেয়েটির মুখ দিয়ে কথা বেঙ্গলতো না। সামনে আসতো না পর্যন্ত আমদের। এক চৰম বিপদের মুহূর্তে পাকবাহিনী তাদের বাড়ি ধিরে ফেলে পিন্টুদের ধরতে চেয়েছিলো। সেই তখন এই মেয়েটি তার শান্তিপুর সাহায্যে পিন্টু আর মতিনকে শাড়ি জড়িয়ে বাড়ির পেছন দিক দিয়ে বের করে দিতে সাহায্য করেছিলো।

সাজ্জাতিক ঝুঁকি নিতে হয়েছিলো তাকে সেই রাতে। সম্ভবত সেদিন থেকেই কুল ফাইনাল পর্যন্ত পড়া এই মেয়েটির ভেতরে পরিবর্তন এসেছে। যার পরিপূর্ণ বহির্প্রকাশ ঘটেছে আমারা কাছে তার স্বামী সম্পর্কে আর্জি পেশের ঘটনার ভেতর দিয়ে।

কবিগুরুর ভাষায় এরা অন্তঃপুরের মেয়ে। কিন্তু আজ গ্রামের এই অন্তঃপুরের মেয়েরাই যেভাবে সচেতন হয়ে উঠেছে, জয় বাংলার জন্য যে আকৃতি নিয়ে এরা কিছু একটা করতে চাইছে, সেটা আমাদের এই মুক্তিযুক্তে নিশ্চন্দেহে এগিয়ে দিবে বহুদ্রুণ।

মতিনকে কাজে লাগানো হবে সঠিক সময়ে, এই আশ্বাস দিয়ে আমরা বিদায় নিই মেয়েটির কাছ থেকে।

রাত গভীর হয়ে এসেছে। কুয়াশা তার চাদর বিছিয়ে দিয়েছে। চারদিকে। শীত নেমেছে জাঁকিয়ে। আর তাই শরীর গরম রাখার জন্য আমরা দুই সৈনিক দ্রুত পা চালাই গুয়াবাড়ি অভিযুক্তে।

অটুট থাকবে চিরদিন ভালোবাসার বক্তন

অমরখানা ঘাটি আক্রমণ করেছি বোর্ড অফিসের দিক থেকে। রাত বারোটার মতো সময় তখন। বোর্ড অফিসের কাছাকাছি পর্যন্ত ১৪ জনের দলকে নিয়ে আসতে খুব একটা অসুবিধা হয় নি। অমরখানা ঘাটি দাঙুণভাবে ব্যস্ত রয়েছেন্নসামনে থেকে আসা আক্রমণ ঠেকাতে। সেই ফাঁকে আমরা চলে এসেছি শুধের প্রায় পেছন দিকে। পিন্টু কভার পার্টির ৭ জনকে নিয়ে অপেক্ষা করছে আলতাফ কেরানির রাঙ্গুলি সম্মুখবর্তী তিনি রাস্তার মোড়ে।

সবঙ্গলো হাতিয়ার থেকে শুলি ছেঁড়া শুলি ছেঁড়ে একই সাথে। টেনগানটা হাতে নিয়ে শুয়ে আছি আমি রাস্তার পাশে মধুসূন্দরের প্রাণ ধেঁয়ে। মধু এল.এম.জি চালানোয় দাঙুণ পারদর্শী হয়ে উঠেছে। সে এল.এম.জির প্রাণ ডান কাঁধে ঠেকিয়ে গাল দিয়ে তা ঠেসে ধরে একান্ত মনোযোগের সাথে দ্রিগকালীন পেছন দিয়ে শুলির ঘই ফুটিয়ে চলেছে। এল.এম.জির ব্যারেল ডানে-বাঁয়ে ঘুরিয়ে প্রতিমহীন শুলি ছুঁড়ে চলেছে সে ঠাণ্ডা মাথায়। অন্যদের এস.এল.আর এবং রাইফেলগুলোও একইভাবে পাল্লা দিয়ে ছুঁড়ে চলেছে অগ্নিবাণ।

অমরখানা ঘাটির পাকসেনারা ব্যাপারটা প্রথমে বুঝে উঠতে পারে না। সামনের দিকে তাদের প্রচণ্ড চাপ। মরিয়া হয়ে লড়ছে তারা। গোলাগুলির প্রচণ্ড তোড় বইছে সামনে। এমন সময় এভাবে পেছন থেকে আক্রমণ তাদের কিছুটা বিধারিত করে তুলেছে। কী করবে, কোনদিক সামাল দিবে বুঝে উঠতে পারছে না যেনো। তবুও জাত সৈনিক তারা। এটা এতো দিনে বুঝে গেছে যে, একমাত্র একাধারে প্রচণ্ড শুলিবর্ষণ করে যাবার ভেতর দিয়েই তারা টিকে থাকতে পারে এবং বেঁচে থাকতে পারে কেবল এভাবেই।

প্রায় মিনিট পনেরো পর তারা আমাদের উপস্থিতির ব্যাপারে সজাগ হয়ে ওঠে এবং সঙ্গে সঙ্গে তাদের কটা হাতিয়ার আমাদের দিকে মুখ ঘুরে দাঁড়ায়। আর তারপরই তাদের প্রচণ্ড ফায়ার পাওয়ারের সম্মুখীন হতে হয় আমাদের। না থেমে উন্নাদন্তের মতো শুলি ছুঁড়ে চলে তারা। মাথার ওপর দিয়ে ভেসে যায় শুলির স্নোত। মধুর এল.এম.জি জায়গা বদল করে নেয় দ্রুত। ২০ গজের মতো ডানে চলে আসে। অন্য ছেলেরাও তাদের জায়গা বদল করে নেয় দ্রুত।

কিন্তু ঘেটার ভয় করেছিলাম সে ব্যাপারটিই শুরু হয়ে যায়। পঞ্চগড়ের দিক থেকে ধ্বনিধম কামানের গোলা ছুটে আসতে থাকে। আর সেগুলো পড়তে থাকে কাছাকাছি

আমাদের সামনেই। ভয়াবহ বিক্ষোরণ-শক্তি নিয়ে ফাটতে থাকে সেগুলো। এ অবস্থায় এখানে থাকা মুশকিল। ছেলেদের দ্রুত রাস্তার নিচ দিয়ে ডানে সরে যাওয়ার নির্দেশ দিই। মধু তার এল.এম.জি নিয়ে সরে যেতে থাকে ডানদিকে।

এই অবস্থায় আমি আমার অবস্থান থেকে উঠে দাঁয়িয়েছি কেবল আর ঠিক তখনি একটা বড়ো সাইজের শেল এসে পড়ে আমার অবস্থানের বাঁ দিকের ১৫/২০ হাতের মধ্যে। আগন্তনের একটা প্রচণ্ড ঝলক যেনো আমার চোখ জোড়া ঝলসে দেবার যোগাড় করে। স্বাভাবিক নিরাপত্তা ভাবনা থেকে মাটিতে ধপ করে বসে যাই দ্রুত। কিন্তু কিছু বুঝে উঠবার আগেই প্রচণ্ড এক বিক্ষোরণ কানে তালা লাগিয়ে দেয়। আর সেই বিক্ষোরণে উখালপাতাল মাটির কাঁপন আমাকে ছিটকে নিয়ে পিয়ে ফেলে দেয় পেছনের দিকে। পা ওপরে তুলে ডিগবার্জি খাবার মতো করে আমি যেনো নরম মাটির ভেতরে বসে যাই। মুহূর্তে খিম মেরে যায় সারা শরীর। কিছুক্ষণ চেতন থাকে না বুঝি। এরপর চেতন-অবচেতনের ভেতরে থেকেও বুঝতে পারি, উঠতে হবে এবং পালাতে হবে এখান থেকে যতো দ্রুত সঙ্গে।

কিন্তু উঠতে গিয়ে মনে হয়, বাম পাটা ভারি হয়ে গেছে। তাই নিজেকে টেনে-হিচড়ে উঠে দাঁড়াই। আর তখনি দেখি, মধু আর শশু হাতড়াতে হাতড়াতে আসছে। তারা জোরে জোরে মাহবুব ভাই মাহবুব ভাই বলে ডাকছে। তাদের ডাকে সাড়া দিই আমি। দোড়ে কাছে আসে দু'জন। আমি ওদের দু'জনের কাঁধে হাত রেখে ক্ষমদিয়ে উঠে দাঁড়াই। দাঁড়াতেই কাছাকাছি আরো দুটো শেল বিক্ষেপিত হয়। ওদের টিসাফিসিয়ে বলি, তাড়াতাড়ি চল, এখানে আর এক মুহূর্ত থাকা যাবে না।

রাস্তা থেকে বেশ কিছুটা পিছিয়ে এসে তান্ত্রির আবার রাস্তায় উঠি। হাঁটুর নিচ থেকে পায়ের পাতার দিকে একটা গরম ধারা হেলে যাওয়ার অনুভূতি হয়। মাথা নিচু করে হাত দিয়ে দেখি চটচটে লাগে। লাগতেই ক্ষমদিয়ে উঠে দাঁড়া সেখানে। ম্যাচ জ্বালাতে বলি শুনুকে। ম্যাচের জ্বালানো কাঠির আলোতে দেখি হাঁটুর নিচে বেশ খালিকটা জায়গার চামড়া ছড়ে গেছে। লাল রক্ত আর ভেজা বালিতে মাখামাখি হয়ে গেছে। নিজের শরীরের রক্ত দেখে মাথাটা আবার খিম মেরে ওঠে। তবে সামলে নেবার চেষ্টা করি। শুনুকে আমার কোমর থেকে গামছা ঝুলে আহত জায়গাটা বাঁধতে বলি। মাটির ওপর শরীর এলিয়ে দিয়ে শুয়ে থাকি আমি।

মধু ম্যাচের কাঠি জ্বালায়। শুনু পায়ের মাটি পরিষ্কার করে বটপট রক্ত বন্ধ করার জন্য আহত জায়গাটা পেঁচিয়ে বাঁধে। এরপর ওদের কাঁধে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াই। বাম পায়ের উরুতে এবং হাঁটুর নিচে পিন্টারের আঘাত লেগেছে। পাটা ভারি ভারি লাগলেও হাঁটা যাচ্ছে। তখন ওদের দ্রুত হাঁটতে বলি। নিজেও পা টেনে টেনে ওদের পদযাত্রার সাথে তাল মেলাই।

আলতাফ কেরানির বাড়ির কাছে আসতেই ছেলেরা হাউমাউ করে ওঠে। গলা উঠিয়ে কাঁদতে থাকে কয়েকজন। আমি ব্যাপারটা দেখে ধমকে ওঠে তাদের বলি, কাঁদিস কেনো তোরা। চুপ! কিছু হয় নি আমার। শুনু আর মধু ঘটনার বিবরণ দিতে থাকে কীভাবে তারা উদ্ধার করে এনেছে আমাকে।

পিন্টু এসে জড়িয়ে ধরে। আমার বুকে মাথা রেখে বাক্তা শিশুর মতো ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে। আর বলতে থাকে, মাহবুব ভাই, আপনার কিছু হলে আমি বাঁচবো না...!

রাস্তার তিন মাথায় আমাকে ধিরে বসে থাকে ওরা সবাই। সামনে তখনো যুক্ত চলছে ধুমুমার। শেলটা আর ২/৪ হাত এদিকে পড়লে হয়তো এতোক্ষণে ছিন্নভিন্ন হয়ে প্রাণহীন দেহে

পড়ে থাকতে হতো ।

যুদ্ধক্ষেত্রে মারা পড়াটা যেমন সহজ ব্যাপার, বাঁচাবাঁচিটাও তেমনি অলৌকিক । বাঁপায়ের আঘাত নিয়ে এই যে আমি দিব্যি বেঁচে আছি, ছেলেরা আমাকে ঘিরে তাদের শোক প্রকাশ করছে, আপন আঞ্চিয়ের মতো কাঁদছে, এবি নাম বোধহয় কমরেডশিপ । এটা শুধু যুদ্ধের মাঝে, জীবনমৃত্যুর মাঝেই গড়ে ওঠে, অন্য কোনোভাবে নয় । আর একটা জিনিস মনে হয়, আমি শুধু এদের কমান্ডার নই, এদের সবার ভাই, আপন রক্তের বক্সনের মতো যে বক্সন । শুধু কমান্ডার হয়ে থাকলে হয়তো এরা এভাবে শোকের মাত্তম করতো না । ছেলেদের আকুল কান্না বুকের গভীরে তাই একটা আলোড়ন তোলে । মনে মনে বলি, দেশ কবে দ্বাধীন হবে জানি না, কিন্তু আমরা চিরকাল একে অন্যকে এভাবেই ভালোবেসে চলবো : সারাজীবন আমি তাদের অন্য কিছু নয়, কেবল ভাই হয়ে থাকবো ।

এক সময় সবারই ভাবাবেগ কিছুটা ঠাণ্ডা হয়ে আসে । তারপর উঠি । কাঁধের টেনগান্টার কথা এতোক্ষণে মনে হয় । কী অবাক ব্যাপার ! এতো কিছুর ভেতরেও প্রিয় টেনগান্টা আমার কাঁধ আর শরীরের সাথে আলিঙ্গনের ভঙ্গিতে এখনো ঠিক লেন্টে আছে । এতো তুলকালাম কান্দকারখানার ভেতরেও শক্ত-নিধক হাতিয়ারটা আমাকে ছেড়ে যায় নি । তাই পরম বিস্মাস আর মমতায় ধাতব হাতিয়ারটার শরীরে হাত বুলোই ।

হাঁটতে পারছি, তবে গতি মন্ত্রৰ । ধীর পায়ে ঝুঁড়িয়ে ঝুঁড়িয়ে, পিন্টু পাশে পাশে । অন্য সবাই পেছনে পেছনে, কেউ কোনো কথা বলছে না । শুষ্টির রাতের হিমেল ঠাণ্ডার ভেতর দিয়ে একদল শ্রান্ত-ক্রান্ত আর বিদ্রূপ যুবক ফিরে চলেছে তাদের নিজেদের আন্তর্নায় ।

১৩. ১১. ৭১

আহত, বিশ্বামের অবকাশ

পায়ে তীব্র ব্যথা । প্রচও জুরের ঘেৰে চেতন-অবচেতনের ভেতরে শয়ে আছি নালাগঞ্জ হাইড আউটে । পিন্টু অস্থিরভাবে ছেঁটাছুট করছে । মুখে শক্তার ছায়া নিয়ে এসে বসছে শিয়ারে । ছুটে এসেছে মুসা । দুলুও খবর পেয়ে দৌড়ে চলে এসেছে ।

ডাক্তার প্রয়োজন । প্রয়োজন দ্রুত চিকিৎসা । আশপাশে ডাক্তারের খোজে বের হয়েছে ছেলেরা । পিন্টু দুঁজনকে পাঠিয়েছে বেরুবাড়ি । সেখানে না হলে জলপাইগুড়ি থেকে ডাক্তার নিয়ে আসবে তারা ট্যাক্সি ভাড়া করে ।

মুসা জয় বাংলার বাজার থেকে একজন গ্রাম্য ডাক্তার ধরে আনে । ডাক্তারটি তার সাধ্যমতো চেষ্টা করেন । দুটো ইনজেকশন আর শুধু লিখে দেন । দুঁজনকে পিন্টু সাইকেল নিয়ে পাঠায় দ্রুত শুধু আনার জন্য ।

বিকেলে জলপাইগুড়ি থেকে একজন পাস করা ডাক্তার এসে পৌছান । গ্রাম্য ডাক্তারও থাকে তার সাথে । পরাক্ষিটরীক্ষা করে ডাক্তার সাহেব বলেন, না, পা ভাঙে নি । চেট লেগেছে মাত্র । থাই-এর মাস্ল-এ । হাঁটুর নিচেকার আঘাতটাও তেমন জটিল নয়, সেরে যাবে । তবে পুরো রেষ্ট ৭ দিনের ।

গ্রাম্য ডাক্তারের চিকিৎসায় এখন অনেকটা ভালো বোধ করছি । ডাক্তারকে বলি, এ সময় ৭ দিনের রেষ্ট মানে শয়ে থাকা । যুদ্ধের এ সময়টায় শয়ে থাকাটা তো অসম্ভব ব্যাপার ।

মাবাবয়সী ডাক্তার স্থিত হেসে বলেন, এটা ভালো না ! যুদ্ধের ভেতরে রেষ্ট পাওয়া তো

ভাগ্যের কথা । শয়ে থাকেন ক'দিন । সেরে যাবে ।

পিন্টু তখন বলেন, হসপিটালে নিতে হবে নাকি? এখানে থেকে কি ট্রিটমেন্ট হবে?

— হসপিটালে গেলে তো ভালো হতো । আপনাদের জন্য তো বাগড়োগড়া সি.এম.এইচে তালো ব্যবস্থা রয়েছে । কিন্তু আমি তা মনে করছি না ।

এ ভয়টাই করছিলাম । পিন্টুকে বলেছিলাম সাব-সেক্টর হেড কোয়ার্টারে খবর না দিতে । সদরদিন সাহেব বা বড় ভাইয়ের কাছে খবরটা গেলে তারা তৎক্ষণিকভাবে আমাকে বাগড়োগড়া পাঠানোর ব্যবস্থা করবেন । অথচ আমি এই হাইড আউটেই থাকতে চাই শব্দের সাথে মিলেমিশে । পা যখন ভাঙে নি, আঘাতও যখন গুরুতর নয়, তখন অহেতুক এদের ছেড়ে, এই ফ্রন্ট ছেড়ে হাসপাতালে গিয়ে লাভ কি?

কিন্তু বাঁ পায়ে প্রচণ্ড ব্যথা থেকেই যায় । পা নড়ানোও যায় না, পাতাও যায় না । তাই ডাক্তারকে বলি, পা যে নড়তে পারি না, দারুণ ব্যথা । ডাক্তার সহজে কপালে হাত ঝুলোতে ঝুলোতে বলেন, ঠিক হয়ে যাবে । ঘাবড়াবেন না ।

ডাক্তার বিদায় নেবার সময় পিন্টু তাকে ফিস দিতে চায় । তিনি নেন না । বলেন, একজন মুক্তিযোদ্ধার ট্রিটমেন্টের জন্য ফিস নেবো, বলেন কি? জয় বাংলা হোক না তখন বেড়াতে যাবো । খাতির করবেন তখন । ডাক্তারের কথাগুলো মনের গভীর প্রদেশ ছুঁয়ে যায় । আসলে সবাই, প্রতিটি মানুষ, জয় বাংলার জন্য কীভাবে ব্যগ্র হয়ে প্রকাশিছে!

ছেলেরা সব দল বেঁধে দেখা করতে আসে । সম্ভবই মুখে উৎকর্ষার ছায়া । অনেকে আবেগাপুত হয়ে ঢোক মোছে । ভালোবাসার বক্সনটা পড়ে কঠিন । আর সেই ভালোবাসার বক্সনেই কী গভীরভাবে জড়িয়ে পড়েছি আমরা স্টোর্চেই ।

দুলু থেকেই যায় । মতিন, মকতু আবেগাপুতার আলীও ছুটে আসে । ওরাও থেকে যায় । আমার এ অবস্থা দেখে নড়তে চায় ন হোকই ।

মুসা তার দল নিয়ে নালাগঞ্জে ছেলেজাসে । চৌধুরীও আসে তার দল নিয়ে । আগের মতোই নালাগঞ্জে আবার সরগরম হয়ে প্রেটে আমার অসুস্থতা আবার সবাইকে টেনে আনে নালাগঞ্জে । সবাই থাকতে চায় আমার পাশাপাশি । পিন্টু অপারেশনের সার্বিক দিক তত্ত্ববধান করে চলে । চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য আমার কাছে বসে । শয়ে শয়ে আমরা আলোচনা করি । পরামর্শ করি । পরিকল্পনা চূড়ান্ত করি । আর সে অনুসারেই পরিচালিত হয় অপারেশন ।

এরি মধ্যে হাড়িভাসায় একদিন ছোটোখাটো একটা যুদ্ধ হয় । খানসেনারা সুবিধে করতে না পেরে সে যুক্তে পিঠাটান দেয় ।

চৌধুরী-মুসা একরাতে পানিমাছে আক্রমণ চালিয়ে আসে । পাকসেনারা যেনো নিষ্ঠেজ হয়ে আসছে দিন দিন ।

তালমা ব্রিজের কাছাকাছি হাফিজাবাদ গ্রাম থেকে মুসা আর মোতালেব অভিযান চালিয়ে একজন রাজাকার কমান্ডারকে ধরে আনে । তালমা ব্রিজের পাহারারত রাজাকার দলের কমান্ডার হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলো সে ।

হাইড আউটের আভিনায় বাঁশের খুঁটির সাথে পিছমোড়া করে বেঁধে রাখা হয়েছে তাকে । আর সে অবস্থায় তাকে সবাই মিলে জেরার পর জেরা করতে থাকে । মোতালেবের অবস্থা এমন যে, পারলে তখনি যেনো তাকে মেরে ফেলে ।

রাজাকারটির ভাষ্য, সে সারেভার করার জন্যই আসছিলো । তালমা ব্রিজের সব

রাজাকারই সারেভার করতে চায়। তাকে একটা সুযোগ দেয়ার জন্য সে কানুভিমিনতি জানায়। তাকে ছেড়ে দিলেই সে অন্য রাজাকার, যদের সংখ্যা ১৫ থেকে ২০ জনের মতো, তাদের সবাইকে সে হাতিয়ারসহ স্যারেভার করাতে নিয়ে আসবে। তারা তালমা ব্রিজের পাক ঘাঁটিও ধ্বংস করে দেবার জন্য সব ধরনের ঝুঁকি দেবে।

কিন্তু তার কথা এ মুহূর্তে বিশ্বাস করা যায় না। দু'চারদিন না গেলে এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়া যাবে না।

হাইড আউট আবার ভরতরাট হয়ে উঠেছে। ছেলেরা দল বেঁধে উজ্জ্বল হেসেখেলে হৈ-হশ্বোড় করে বেড়ায়। কোয়ার্টার মাস্টার মিনহাজ তার কমান্ড নিয়ে আগের মতোই লঙ্গরখানার কাজ সুচারুভাবে সম্পাদন করে চলে।

দিনের বেলা লোকজন নানা রকমের সমস্যা নিয়ে আসে। পিন্টু তাদের নিয়ে ব্যস্ত থাকে। আমি শয়ে থাকি বিছানায়। একটা চৌকি যোগাড় করে এনেছে ওরা কোথা থেকে যেনো। সেই চৌকির ওপর পাতা বিছানায় শয়ে আমি অলস দুপুরে ঘুমুর ডেকে যাওয়া গান শুনি। ভালো লাগে এই দিন, এই পরিবেশ। ভালো লাগে সবাইকে, এই মুহূর্তের সব কিছুকে। মনের মধ্যে দারুণ প্রশান্তি নিয়ে উন্মুখ হয়ে থাকা ছেলেদের সেবাযত্তে ভালো হয়ে উঠতে থাকি আমি দ্রুত।

এই সময়সীমার ভেতরে কেবল একটা ছোটোখাটো দুর্ঘটনা ঘটে। নুরবদ্দিন না জয়নাল তার রাইফেলে শুলি ভরতে গেলে হাঁটাং করে সশস্দে শুলি ক্রেতে হয়ে যায়। ফলে হৈচৈ পড়ে যায় ছেলেদের মধ্যে। একটা দুর্ঘটনা ঘটতে পারতো কিন্তু ঘটে না। রাইফেলের ব্যারেল খাড়া করা ছিলো। তাই শুলি বেরিয়ে যায় ওপরের টিপ্পের ছাদ ফুটো করে।

রমজান মাস শেষ হয়ে আসে। সুন্দুল ফিল্ড এসে যায়। যুদ্ধের ভেতর দিয়েই একটা রোজার মাস পার হয়ে গেলো। ছেলেরা মাঠে মাঠে ইদ উৎসব পালনে ব্যস্ত হয়ে ওঠে। আমি লাঠিতে ভর দিয়ে পিন্টুর সাথে পীরীর ধীরে হেঁটে বেড়াই সামনের চতুরে। শীতের রৌদ্রে শরীর এলিয়ে বসে থাকি মৃত্যুর গালিচায়।

ঝকঝকে সুন্দর দিন। ফসলের খেতে নুয়েপড়া সোনালি ধানের পাকা শীষ যেনো আগনে রঙ ছড়ায়। ভেসে আসে জমি থেকে পাকা ধানের গন্ধ।

মনে পড়ে পাকা সড়কের পার্শ্ববর্তী লোকজনের আকুতিভরা কথা। তারা যেনো ধান কাটতে পারে, কঠোর শয়ে ফলানো সোনালি ফসল তারা তাদের ঘরে তুলতে পারে, সে ব্যাপারে তারা আমাদের সাহায্য চেয়েছিলো। সেই ফসল কাটার সময় তো প্রায় এসে গেলো। তাদের আমরা কথা দিয়েছি। ফসল কাটার কাজ ঠিকঠাক মতোই শেষ হবে। দখলদার পাকবাহিনী আমাদের সে চেষ্টা কৃত্বতে পারবে না যতো কিছুই করবক।

সুন্দুল ফিল্ড

ইদ এসে গেলো।

ছেলেরা ইদ উৎসব পালনের জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছে।

একটা গুজব ছড়িয়ে পড়েছে এরকমের যে, ঈদের দিন পাক আর্মি ব্যাপকভাবে হামলা করবে সীমান্ত এলাকাগুলো জুড়ে। গুজবটা যেভাবেই ছড়াক, যথেষ্ট বিচলিত করে তোলে আয়াদের। মুক্তিযোদ্ধারা যখন ঈদের নামাজের জন্য জামাতে দাঁড়াবে ঠিক সে সময়ই নাকি

করা হবে এই হামলা ।

যুক্তের মাঠে শক্রবাহিনীর সঞ্চাব্য কোনো তৎপরতাকেই অবিশ্বাস করা যায় না । ঈদের দিন মুক্তিবাহিনীর দল যখন ঈদ উৎসবে মেতে থাকবে, তারা নামাজ পড়তে দলবদ্ধভাবে কোথাও সমবেত হবে, তখনি সুযোগ বুবে তারা হামলে পড়বে অপ্রতুত মুক্তিযোদ্ধাদের ওপর । খবর যখন রটেছে, এ ধরনের হামলা তখন পাকবাহিনীর তরফ থেকে হওয়াটা বিচ্ছিন্ন কিছু নয় । তাই শুব স্বাভাবিক কারণেই পাকবাহিনীর তরফ থেকে এ ধরনের সঞ্চাব্য হামলাকে সামনে রেখে আমরা ঈদুল ফিতর উৎসব উদ্যাপনের সিদ্ধান্ত নিই । ঈদ মুসলমানদের জন্য প্রধান উৎসবের দিন । জন্ম থেকেই সবাই এই উৎসব পালন করে এসেছে যার যেমন সঙ্গতি, সে অনুযায়ীই । এখানেও যুক্তের মাঠে ছেলেরা ঈদ উৎসব পালনের জন্য মেতে উঠেছে । ঈদের নামাজ পড়া হবে না, ঈদের উৎসব হবে না, তালো খাওয়াদাওয়া হবে না, ঈদের দিন সবাই হাতে শক্রের অপেক্ষায় ওঁৎ পেতে বসে থাকবে, এরকম একটা কিছু কেউই যেনে মন থেকে মেনে নিতে পারছে না ।

যুক্তের মাঠে, দিনবাত ক্রান্তিহীন যুদ্ধ প্রতিয়ার ভেতরে ছেলেদের রিভিয়েশান বলতে কিছু নেই । দীর্ঘদিন ধরে একই ধরনের একয়েমে কাজ । অপারেশন আর যুদ্ধ । এ হাইড আউট থেকে অন্য হাইড আউট । গোলাবারুন্ড আর হাতিয়ার বয়ে বেড়ানো । ছুটি নেই, আরাম নেই, বিশ্বাম নেই । বড়ো একয়েমে আর বিরক্তিক্রমীবন্দ সবার । এর মধ্যে ঈদের উৎসব একটা খুশির আবহ নিয়ে এসেছে । ছেলেদের এই খুশির ভাগ থেকে বাস্তিত করতে ইচ্ছে করে না । পিন্টুসহ বসে তাই সিদ্ধান্ত নিই । আজ প্রেস্টা এ রকমের : ঈদের দিন নামাজ হবে, বড়ো খানার আয়োজন করা হবে । মোদ্দুল ইব্রাহিম, ঈদ উৎসব পালন করা হবে যথাসাধ্য তালোভাবেই । সে অনুযায়ী পরিকল্পনাও ছক্ক ছফলে সবাই একসঙ্গে বসে ।

সিদ্ধান্ত হয়, ঈদের আগের দিন মুসলিম দল দুঃভাগে ভাগ হবে এবং সমবেত হবে দুঃজ্যাগায় । নালাগঞ্জ আর গুয়াবুদ্ধিতে । ছেলেরা তাদের নিজেদের মতো করেই ঈদ উৎসব পালন করবে ।

তবে নামাজ পড়বে একেবারে সীমান্তের ধার ঘেঁষে । গুয়াবাড়িতে সমবেত ছেলেরা তারতীয় সীমান্তে উচু গড়ের পাদদেশে গিয়ে জামাত পড়বে । নালাগঞ্জে জামাত হবে আমগাছ তলায় পুকুরের পাড়ে ।

মুসলমান ছেলেরা যখন ঈদের জামাতে দাঁড়াবে, তখন হিন্দু ছেলেরা কাছাকাছি অবস্থান নিয়ে হাতিয়ার হাতে সর্তক প্রহরায় থাকবে । হিন্দু সহযোদ্ধাদের দেয়া নিরাপত্তা ব্যবস্থার মধ্যে মুসলমান ছেলেরা নামাজ পড়বে ।

এ সিদ্ধান্ত জনিয়ে দেয়া হয় গুয়াবাড়িতে একরামুলের কাছে । সোনারবানে বকর ও শামসুন্দিরের কাছে । নালাগঞ্জে মুসা আর চৌধুরীও সেভাবেই তৈরি হয় ।

হিন্দু ছেলের তাদের মুসলমান ভাইদের নামাজের সময় পাহারা দেবার দায়িত্ব পেয়ে যাবপরনাই খুশি হয়ে ওঠে । ধর্মীয় সঙ্কীর্ণতার উর্ধ্বে এই যুক্তের মাঠে জীবনমরণের মাঝখানেই সবার বসবাস । এক ধর্মের মানুষ ধর্মীয় আচরণ পালন করবে, আর তাদের নিরাপদ রাখার জন্য ভিন্ন ধর্মের মানুষ হাতিয়ার হাতে পাহারা দেবে, আমার কাছে এ অভাবনীয় আর মহান মানবিক ঘটনা বলে মনে হয় । হিন্দু ছেলেদের সংখ্যা বেশি না হলেও ঈদের জামাতের সময় তাদের স্বল্পসংখ্যক সদস্য দিয়েই তারা তাদের মুসলমান ভাইদের

কীভাবে নিরাপত্তা বিধান করবে, তার পরিকল্পনায় মেতে ওঠে ।

সৈদের বড়ো খানার আয়োজনের বাজেট নিয়ে বসে মিনহাজ । সকালে রান্না হবে সেমাই । দুপুরে কোর্মা-পোলাও ইত্যাদি । আর সে অনুসারেই হিসেব-নিকেশ করে লও একটা ফর্দ তৈরি করে ফেলে সে । হিন্দু ছেলেরা রয়েছে, সেহেতু গরু চলবে না । গ্রামের বন্ধুরা তাদের উভচ্ছুলুগ পাঠিয়ে দেয় ৪টা খাসি । এর মধ্যে দুটো পাঠিয়ে দেয়া হয় গুয়াবাড়িতে সেখানকার ছেলেদের জন্য ।

মুন্না এসেছে গুয়াবাড়ি থেকে । আমার অসুস্থতার খবর পেয়ে বেশ বিচলিত সে । তাকে বলি, মন খারাপ করছিস কেনো? ভালো তো হয়ে উঠছি ।

আমার শিয়ারে বসে থাকে সে অধিকাংশ সময় । আপন রক্ত, ডেকে কথা বলে । থেকে থেকেই সে জিগ্যেস করে, কষ্ট হচ্ছে মাঝা?

আমি ওর জিজ্ঞাসার সরাসরি উত্তর না দিয়ে বলি, সৈদ এসে গেলো, কাপড়চোপড় তো তোর নেই । জলপাইগুড়ি শিয়ে নতুন কাপড়চোপড় বানিয়ে নে ।

ও আপনি করে । বলে এতোগুলো ছেলে, কারোরই তো নতুন কাপড়জামা হলো না মাঝা!

— তাতে কি হয়েছে! আমাদের যা আছে, তা দিয়েই চলে যাবে, তুই বানিয়ে নে । এরা কেউ এতে কিছু মনে করবে না । এদের সবারই তুই পিয় ক্ষমতা নেই ।

মুসা সৈদের ফর্দ আর টাকাকড়ি নিয়ে জলপাইগুড়ি মাঝে সাথে দুঁজন নিয়ে । মুন্নাকেও মুসার সাথে দিয়ে দিই । যাবার সময় বলি, জলপাইগুড়িত কাপড়চোপড় কিনে সে যেনো কোটগোছ চলে যায় তার আগেকার আঙ্গানায় । সেখানে সন্তুষ্যসাথে সৈদ করাও হবে, তাদের খোঝখবর নেয়াও হবে । সেখানকার পরিচিত মাহতাব হাইবের শরণার্থী পরিবারটির ছেলেমেয়েদের জন্য কাপড়চোপড় কেনার জন্য তাকে অভিজ্ঞ করু অর্থ ধরিয়ে দিই ।

মুন্নের মাঠ থেকে তাদের জলপাইগুড়িটা উপহারসমূহী প্রেরণের জন্য মনের গভীর থেকে একটা তাগিদ অনুভব করি । মুন্নার মনে পড়ে বন্ধুময় একটা মুখ । নিদারুণ নিঃসঙ্গ আর একাকিন্তের জ্ঞান সেই মুখ । গভীর এক প্রত্যাশার ছায়া তার সেই চোখেমুখে । হয়তো কেবলই ভাবনা, কবে শেষ হবে এই যুদ্ধ ।

মুন্নাকে নিয়ে মুসা তার কেনাকাটা করার জন্য দলবলসহ চলে যায় জলপাইগুড়ির দিকে । মোতালেব তার একদল উৎসাহী সহযোগী নিয়ে পুরুষ পাড়ের সৈদগাহ পরিকার-পরিচ্ছন্ন করার কাজে মেতে ওঠে । কাল সৈদ । সমস্ত হাইড আউট মেতে ওঠে আনন্দে । একজন ঘোলবী পাওয়া যায় স্থানীয়ভাবে । তিনি পড়াবেন নামাজ ।

সন্ধ্যার পর ফিরে আসে মুসা । হতাশ মুখে জানায় সারা জলপাইগুড়ি বাজার খুজে সেমাই পাওয়া যায় নি ।

কথাটা শনে মনে প্রথমে কেমন ধাক্কা লাগে । বলে কি! সেমাই পাওয়া যায় নি মানে? তারপরই মনে হয়, জলপাইগুড়ি তো আর আমাদের বাংলাদেশের শহর নয়, ইতিয়ার । সেখানে মুসলমান খাবার হিসেবে বিবেচিত সেমাই না পাওয়ার ব্যাপারটাই তো স্বাভাবিক । ঠিক আছে সেমাই যখন নেই, তখন চাল-দুখ দিয়ে পায়েস করেই সৈদের সকালের যিন্তির কাজ চলিয়ে নেয়া যাবে । মিনহাজকে সেইভাবেই মেনু করতে বলি ।

সৈদের দিনের সকাল । উৎসবযুখর পরিবেশ । সবাই আনন্দে উচ্ছল । পাশাপাশি চরম

উত্তেজনা পাকবাহিনীর সঙ্গাব্য আক্রমণ হতে পারে। ভরতের মেত্তে ৮/১০ জন হিন্দু ছেলে এগিয়ে খালের পাড়ে শিরে অবস্থান নেয়।

সকাল নটায় সৈদের জামাত শুরু হয় পুকুর পাড়ে। আমি নিজে দাঁড়াতে এবং লাঠি ধরে চলাফেরা করতে পারলেও নামাজ পড়তে পারি না। ওরা সবাই ইনগাহের মতো জায়গায় পরম পবিত্র মনে নামাজে দাঁড়ায়। আমিও লাঠিতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকি জামাতের কাছাকাছি অবস্থানে।

যাহোক, যুদ্ধের মাঠেও তাহলে আমরা নামাজ পড়তে পারছি! গভীর এক প্রশান্তিতে তরে ওঠে মন। সত্যও দৃষ্টি নিয়ে আমি তাকিয়ে থাকি সৈদের জামাতের দিকে। না, শক্তির হামলা হয় না। তাই হৈচে করে, উৎসবের খাওয়াদাওয়া নিয়ে আনন্দে আনন্দে গড়িয়ে যায় দিনটি।

অমরখানার পতন

অমরখানা পাকবাহিনী ঘাঁটির পতন হয়েছে। বৰৱটা নিয়ে এসেছে মতিয়ার। একেবারে দৌড়াতে দৌড়াতে এসে হাজির। উদ্ভাস্তের মতো চেহারা এখন শুন। নালাগঞ্জে এসেই সে চিৎকার করে করে বলতে থাকে, অমরখানা ঘাঁটির পতন হয়েছে, খানেরা সব ভাগি গেইছে।

প্রথমে বিশ্বাস হতে চায় না ব্যাপারটা। তাকে জিগোস করুন, তুই জানলি কী করে?

— আমি তো গেছিলাম অরমখানা। অমরখানা তেরা সৈদের দিন ঘাঁটি ছাড়ে হেনে পালায়। প্রচণ্ড আক্রমণ চালানো হয়েছিলো ওদের প্রশংসন সৈদের দিন। শালারা সব ভাগিছে। এখন অমরখানা আমাদের দখলে, মুক্তিবাহিনী প্রাপ্তিয়া যায় ডিফেন্স নিছে।

তবুও অবিশ্বাস্য ঠেকে ব্যাপারটা। মাঝেয়ারকে তাই বলি, ঠিক বলছিস তো?

— সত্যি, খোদার কসম বলে মন্তব্য প্রমাণস্বরূপ ভাঙ্গচোরা হেলমেট, শেলের খোল এবং পাকসেনাদের কিছু কাগজপত্র কেড়ে কেড়ে ইত্যাদি বের করে দেখায়।

সত্যি সত্যি তাহলে অমরখানাঘাঁটির পতন হলো!

এতো বড়ো সুবৰ্বর যে হজম করা সত্যিই কষ্টকর। মনের মধ্যে কেবল বারবার এ কথাটাই বাজতে থাকে, অমরখানা ফল করলো, অথচ আমি শুয়ে আছি। অমরখানা দখলের এই বিজয় মুহূর্তে আমি শরিরিক হতে পারলাম না!

বিগত ছাঁটি মাস এই অমরখানা অপরাজয় ঘাঁটি হিসেবে দাঁড়িয়েছিলো। মনে হতো, ওটা বুঝি সত্যিই অমর, অলভ্য। কোনোদিনই দখলে আন যাবে না বুঝি তাকে। গত ছাঁটি মাস মাটি কামড়ে পড়ে থেকে কীভাবে দিনরাত মরণপণ লড়াই করে গেছে পাকসেনারা। মনে হতো অনন্তকাল অবধি হয়তো তারা ধরে রাখবে অমরখানা ঘাঁটি। মনে হতো কতো শক্তিধর আর অজেয় তারা। অথচ সেই ঘাঁটি ছেড়ে তারা পালিয়ে গেছে। মুক্তিবাহিনী দখলে নিয়েছে অমরখানা। অবিশ্বাস্য হলেও এ আজ ঝুঁড় বাস্তব।

হাইড আউটের ছেলেদের ভেতরে এ খবরে খুশির ধূম পড়ে যায়। অমরখানা পতনে মনে হয়, বাংলাদেশের স্বাধীনতার অর্ধেকটাই বুঝি হাসিল হয়ে গেছে।

পিটু দারুণ খুশি। সে জড়িয়ে ধরে আমাকে। গলায় তার বীতিমতো আবেগ। সে অবস্থায় সে বলে, অমরখানার পতন হয়েছে, হতে পারে, আমার বিশ্বাস হয় না মাহবুব ভাই!

— বিশ্বাস আমারও হয় না। কিন্তু আসলেও পতন হয়েছে অমরখানার...।

টেকা কমান্ডার ব্বৰ নিয়ে আসে পানিমাছ থেকেও পাকবাহিনী চলে যাচ্ছে। বলে কি! পিন্টুকে ডেকে বলি, দ্রুত মুসা আৱ চৌধুরীকে দিয়ে দল পাঠাও। দেখে আসুক ওৱা আসলে ব্যাপারটা কি!

পিন্টু পাঠিয়ে দেয় মুসা আৱ চৌধুরীৰ নেতৃত্বে ২০ জনেৱ দল। হাইড আউটোৱ বাকি ছেলেৱা বিজয় উল্লাসে মেতে থাকে।

দুপুৱেৱ পৰ ফিরে আসে মুসা আৱ চৌধুরীৰ দল। রিপোর্ট দেয় তাৱা, পানিমাছ ফাঁকা। পালিয়ে গেছে পাকবাহিনী তাদেৱ ঘাঁটি ফেলে। তাৱা দখলে নিয়েছে সেই ঘাঁটি।

আমৱা এককভাৱে যুদ্ধেৱ প্ৰথম দিনগুলো থেকে মোকাবিলা কৱে এসেছি পানিমাছ ঘাঁটিকে। তাৱা ছিলো আমাদেৱ পৰিচিত শক্তি। বহুবাৰ বহুভাৱে মোকাবিলা কৱতে হয়েছে তাদেৱ। একক টার্গেট ছিলো তাৱা আমাদেৱ। তাৱা পালিয়ে গেলো, তাৱা আমাদেৱ ভয়ে। পানিমাছ দখলেৱ পুৱো কৃতিত্ব তাই আমাদেৱ। যদিও এৱ জন্য আমাদেৱ আৱ কোনো রকম যুদ্ধ কৱতেই হলো না।

সামনেৱ শক্তি ঘাঁটি পানিমাছেৱ পতন হয়েছে। অমৱাৰখানা দখল হয়েছে গতকাল। কোনোখানেই আমি যেতে পাৱলাম না। পিন্টুও গেলো না আমাকে ছেড়ে। সাৱাদিন হাইড আউট জুড়ে ছেলেদেৱ উল্লাস মাতম চলে। এ দুটো ঘাঁটিৰ পতন মানে, শক্তিৱা পিছিয়ে যাচ্ছে, অধিকৃত বাংলাদেশ দখলে আসছে আমাদেৱ। জন্মস্বাক্ষৰ প্ৰতিক্রিয়া শুরু হয়েছে, এতো যে ঘটনা, এ যেনো বিশ্বাস হতে চায় না সহজে। কেউই এটাকে সহজভাৱে নিতে পাৱে না। তাই আনন্দে সবাই যেনো পাগলপাৱা।

বাইৱেৱ চতুৰে কম্বল গায়ে দিয়ে বসে আছিব। গত নেমেছে জাঁকিয়ে। কুয়াশা তাৱ চাদৰ বিছিয়েছে সক্ষেৱ আঁধাৰ না ঘনাতেই। তিমস্কষ্ট ঢেকে গেছে কুয়াশাৰ আৱৱণে।

গৱেষ চা হাতে পিন্টু আৱ আমি কৃতি থাকি দুঃজনে। চৃপচাপ। অনেকক্ষণ পৰ মুখ খোলে পিন্টু, মাহবুব ভাই এবাৱ কিম্বা

পিন্টুৰ একথাৰ চট কৱে জৰুৰি দিতে পাৱি না। এবাৱ আমাদেৱ সামনে যে কী কাজ ঠিক বুৰাতে পাৱছি না। সাৱ-সেন্টৱ হেড কোয়ার্টাৰ বহুদূৰে। সহজে যোগাযোগ ও কৱা যাচ্ছে না। তবে মন বলছে, একটা কিছু ব্বৰ তো আসবেই, সদৰুদ্ধিন সাহেবে অবশ্যই বলবেন এবাৱ কি কাজ কৱতে হবে আমাদেৱ। পিন্টুকে বলি, দেখা যাক না, কী দায়িত্ব আসে! লেট আস ওয়েট।

এতোদিন সামনে পানিমাছ শক্তি ছিলো, অমৱাৰখানায় ছিলো। ছিলো তাদেৱ জান্তব উপস্থিতি। দিনৱাত গোলাগুলিৰ তাওৰ আৱ কামানেৱ গৰ্জন মেঘেৱ অবিৱাম শুরুগঞ্জীৰ ভাকেৱ মতোই ছিলো। এসবই আমাদেৱ গত ক'মাসেৱ দিনৱাতেৱ সঙ্গী হয়ে গিয়েছিলো। দাঁড়িয়ে গিয়েছিলো একটা অভ্যাসে। আজ তাৱা নেই। কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগে সবকিছু। কেবল প্ৰশ্ৰ, এৱপৰ কি? শূন্য একটা অনুভূতি নিয়ে শীতেৱ মধ্যে কম্বল জড়িয়ে বসে থাকি দুই সৈনিক।

২০. ১১. ৭৩

AMARBOI.COM
সমুদ্রসূক্ষ

ফ্রন্টে যাবার ডাক

রাত আটটার দিকেই লাল মিয়া সদরবন্দিন সাহেবের ম্যাসেজটি নিয়ে আসে। সাব-সেক্টর হেড কোয়ার্টার থেকে বড় ভাই খুবই জরুরিভাবে পাঠিয়েছেন সেটা। তালমার দিকে একটা দল যাবে। পানিমাছের পতনের পর শক্রন্তা তালমাঝ শক্তিশালী অবস্থান নিয়ে ঘাঁটি গেড়েছে। সেখানকার সঠিক অবস্থাটা যাচাই করে আসা প্রয়োজন। এ জন্য মুসার নেতৃত্বে একটি দলকে সাজানো হচ্ছে। তারা সবাই তৈরি। বাইরের চতুরে ফ্ল-ইন-এ দাঁড়িয়েছে। তাদের যাত্রাকালে চূড়ান্ত ত্রিফিং দিছি আমি। পাশে দাঁড়ানো পিটু। এমন সময় বিধ্বণি কপ নিয়ে বার্তাবাহক লাল মিয়া এসে হাজির হয়।

ছেলেরা বাইরে দাঁড়িয়ে থাকে। পিটুসহ লাল মিয়াকে নিয়ে ভেতরে যাই। লাল মিয়া তার পকেট হাতড়ে ম্যাসেজটা বের করে দেয়। ঘরের মধ্যে একটা নিতু নিতু কেরোসিনের ল্যাঙ্ক। তার আলোতে ম্যাসেজটা পড়ি। পিটু মাথা ঝুকিয়ে উদ্ধীরণ দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে থাকে ম্যাসেজের লেখাগুলোর দিকে। ছেট ম্যাসেজ কুর্সিজিতে লেখা। তাতে বলা হয়েছে, ‘ক্রোজ ইয়োর কোম্পানি অ্যাট চাউলহাটি ডেইন্স ইয়োর অল আর্মস অ্যামুনেশন্স অ্যান্ড রেশান্স টু-নাইট পজিটিভলি।’

ম্যাসেজটি বারবার পড়ি। পড়াশেষে পিটুর দৃষ্টিকে এগিয়ে দিই। সেও মন দিয়ে পড়ে। টিমটিমে বাতিটি ঘরের অঙ্ককার তাড়াবার প্রাণ্যাগ চেষ্টা করে যাচ্ছে। সেদিকে তাকিয়ে ম্যাসেজের কথাগুলো বুঝবার চেষ্টা কর্তৃ। পিটু ম্যাসেজটি হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে চূচাপ। বলে না কিছু। মনের গুরুত্বপূর্ণ উপলক্ষ করি, ডাক এসেছে ফ্রন্টে যাবার। আর এটা বুঝে উঠবার সাথে সাথে একটি সাতল শিরশিরে অনুভূতি যেনো পিঠের শিরদাঁড়া বেয়ে নেমে যেতে থাকে। পিটুকে তখন বলি, গুছিয়ে নাও পিটু, আমাদের যেতে হবে।

— ঠিক আছে। একটা ঘোরের মধ্যে থেকে অনেকটা আচ্ছান্নের মতো যেনো জবাব দেয় পিটু।

বাইরে ছেলেরা অপারেশনে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ওদের আর যাওয়া হবে না। এখন যেতে হবে অন্য কোথাও, অন্য কোনোখানে। ওদের এটা জানানো দরকার। সামনে বছ কাজ। পিটুকে নিয়ে বেরিয়ে আসি বাইরে।

গেরিলা যুদ্ধ শেষ, এবার ফ্রন্টে যাওয়ার প্রস্তুতি

ফ্ল-ইন-এ দাঁড়ানো ছেলেদেরকে খবরটা জানানো হয়। প্রথমে ব্যাপারটা বুঝতে পারে না ওরা। ওদের বলি, আমাদের গেরিলা যুদ্ধ শেষ। এখন যেতে হবে ফ্রন্টে, সম্মুখ্যুক্তে।

সবাইকে বটপট তৈরি হয়ে নিতে হবে ।

এ সংবাদে ছেলেদের চোখে-মুখে একটা শীতল ছায়া নেমে আসে । একটা ভয় মিশ্রিত অনুভূতি কাজ করে তাদের মনে । অস্পষ্ট গুঞ্জন ওঠে একটা । অনেকেই হয়তো প্রশ্ন করতে চায়, কিছু বলতেও চায় । তখন বলে ওঠি, আজকের অপারেশন হচ্ছে না । আমাদের আজ রাতেই চাউলহাটি যেতে হবে । সুতরাং, তৈরি হয়ে নাও সবাই আধ ঘণ্টার মধ্যেই ।

ফল-ইন-এ দাঁড়ানো ছেলেদের ডিসমিস করে দিই । তারা নিজেদের মধ্যে কথা বলতে বলতে ভেতরে চলে যায় । মিনহাজকে ডেকে সবাইকে তাড়াতাড়ি খাবার নিতে বলি । হাইড আউটের জীবনের শেষ আহার আজ । এরপর পিটু আর মুসাকে নিয়ে বসে যাই হিসেব মেলাতে । অনেক কিছুই হিসেব মেলাতে হবে এখন ।

নতুনভাবে দল বিনাসের দরকন ছেলেরা বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে । গুয়াবাঢ়ি, সোনারবান, তেতরগড় ও মধুপাড়া এসব হাইড আউট থেকে ছেলেদের ক্লোজ করে এনে রাতের মধ্যে রঙনা দেয়া সম্ভব হবে না কিন্তুও তাই । প্রায় ১৫ থেকে ১৮ জন ছেলে রয়েছে ছুটিতে । তাদের পাওয়াও যাবে না । বেলতলা শরণার্থী পরিবারদের নিরাপত্তা প্রহরা কাজে নিযুক্ত শামসুলসহ অন্য দু'জনের ব্যাপারেও সিদ্ধান্ত নিতে হবে । কোম্পানির সমস্ত ছেলের তালিকা তৈরি, অক্ষেত্রে আর গোলাবারুন্দের মজুদের হিসেবনিকেশ এবং রেশনসহ তাবৎ আনুষঙ্গিক অন্য সব মালপত্রের হিসেব-নিকেশ তৃতীয় কর্মসূচি গড়ালবাঢ়ি বি.ও.পির টেরে হাসির জিঞ্চায় যেসব মালসামান ও গোলাবারুন্দ রয়েছে তা স্বত্ত্ব হিসেব-নিকেশ করা প্রয়োজন । প্রচুর কাজ করতে হবে । সবকিছুর হিসেব মেলাতে হস্তপিণ্ড পিণ্ড ও মুসাকে নিয়ে বসে যাই আমি সেই হিসেব মেলানোর কাজে । তৎক্ষণিকভাবে স্টোরিং নিয়ে নিই, চৌধুরীকে মধুপাড়া থেকে তার দলবলসহ আসতে হবে । একজনকে প্রতি থবর দিয়ে পাঠানো হয় মধুপাড়ায় শামসুল চৌধুরীর কাছে, যেনো সে চলে আসে তার জল আর সমস্ত জিনিসপত্রসহ ।

বেলতলার নিরাপত্তা প্রহরীদের ক্ষেত্রে সেখানে প্রক্রিয়া ও সিদ্ধান্ত নিয়ে নিই । ফ্রন্টে গেলে হাতিয়ার এবং যোদ্ধাদের দরকার হবে । শামসুল প্রক্রিয়ার দিকে নালাগঞ্জে এসেছে । তাকে নির্দেশ দিয়ে দিই সেখানকার হাতিয়ার ও গোলাবারুন্দসহ নিরাপত্তা ব্যবস্থা তুলে আনার জন্য । শরণার্থী পরিবারগুলো এতে ভীত হয়ে পড়বে । কিন্তু এ অবস্থায় করারও কিছু নেই । চার মাসেরও বেশি সময় তাদের নিরাপত্তা প্রহরা দেয়া হয়েছে । যুদ্ধের জন্য পাঠানো ছেলেদের সেখানে নিযুক্ত রাখা হয়েছে যুদ্ধের বাইরে রেখে । রাখা হয়েছে সেখানে যুদ্ধাত্মক, যা যুদ্ধের ফ্রন্টের জন্য অসম্ভব প্রয়োজনীয় এবং মূল্যবান । এখন প্রয়োজনে তাদের নিয়ে আসা হচ্ছে । তারা অবশ্য এর জন্য নিরাপত্তাহীনতায় ভুগবে । কিন্তু সেখানে দীর্ঘদিন সশস্ত্র অবস্থায় নিরাপত্তা প্রহরী থাকার ফলে যে ইমপ্যাট সৃষ্টি হয়েছে, তার ফলে আর কোনোরকম বিপদ তাদের হবে বলে মনে হয় না ।

রাতের মধ্যেই যখন সদরদিন চাউলহাটি যাবার নির্দেশ দিয়েছেন, নিচয়ই তাঁর পেছনে গুরুতর কিছু কারণ রয়েছে । অন্যথায় এই জরুরি তলব আসতো না । যাবার নির্দেশ যখন এসেছে, তখন যেতে হবেই । এর অন্যথা হবে না । বিভিন্ন জায়গায় ছাড়ানো হাইড আউটের ছেলেদের এই সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে ক্লোজ করানো যাবে না । তাই সিদ্ধান্ত নিতে হয় তাদের ছাড়াই যেতে হবে । তাদের সবাইকে ব্যাপারটি জানিয়ে রানারের মাধ্যমে ম্যাসেজ পাঠানো হয় এই মর্মে যে, যে যেখানেই থাক, তারা সবাই যেনো তাদের সমস্ত মালপত্র

নিয়ে হাজির হয় কাল চাউলহাটিতে। চৌধুরী হয়তো এসে যাবে কিছুক্ষণের মধ্যে। ও এলে হেড কোয়ার্টারের ছেলেদের নিয়ে রওনা দেয়া হবে।

মিনহাজ রেশনসামগ্রীসহ অন্যান্য মালপত্রের যে হিসেব দেয়, তাতে করে বোঝা যায় বেশকিছু মালপত্র এখানে রেখে যেতে হবে। এছাড়া ছেলেদের ব্যক্তিগত লাগেজ রায়ে গেছে এখানে। সেগুলোসহ হাতিয়ারপত্র ও গোলাবারুদ সবকিছু নিতে হবে। ব্যক্তিগত জিনিস প্রত্যেকে নেবে স্বল্প পরিমাণে এবং সেগুলোই, যেগুলো অতি প্রয়োজনীয় হিসেবে বিবেচিত। সেই সাথে সঙ্গে নিতে হবে একদিনের জন্য শুকনো রেশনসামগ্রী। গরম কাপড়চোপড় ফেলে যাবে না কেউ। সবাই আবশ্যিকভাবে তার কবল সাথে নেবে। হাইড আউটের দীর্ঘ ক' মাসের জীবনের পরিসমাপ্তি লগ্নে মোটায়ুটি এরকমেরই সিদ্ধান্ত নিতে হয় বেশ দ্রুততার সাথেই।

এরপর পিন্টুসহ হেড কোয়ার্টারে বর্তমান রাস্কিত হাতিয়ার-গোলাবারুদের সংখ্যা ও মজুদের হিসেব মেলাতে বসি। হাতিয়ার ছাড়াও প্রায় ১৫/২০টি সিভিল গান এবং প্রায় তিনশ' গুলির কার্তুজ রয়েছে। এগুলো ক্রটে নেয়া যাবে না। সম্মুখ্যেন্দ্রিয়ে সিভিল গান তথা বন্দুকের কোনো ব্যবহার নেই। ছেলেদের নিজস্ব হাতিয়ার ছাড়া হেড কোয়ার্টারে বর্তমান হিসেবে রিজার্ভ হাতিয়ারের সংখ্যা নিম্নরূপ :

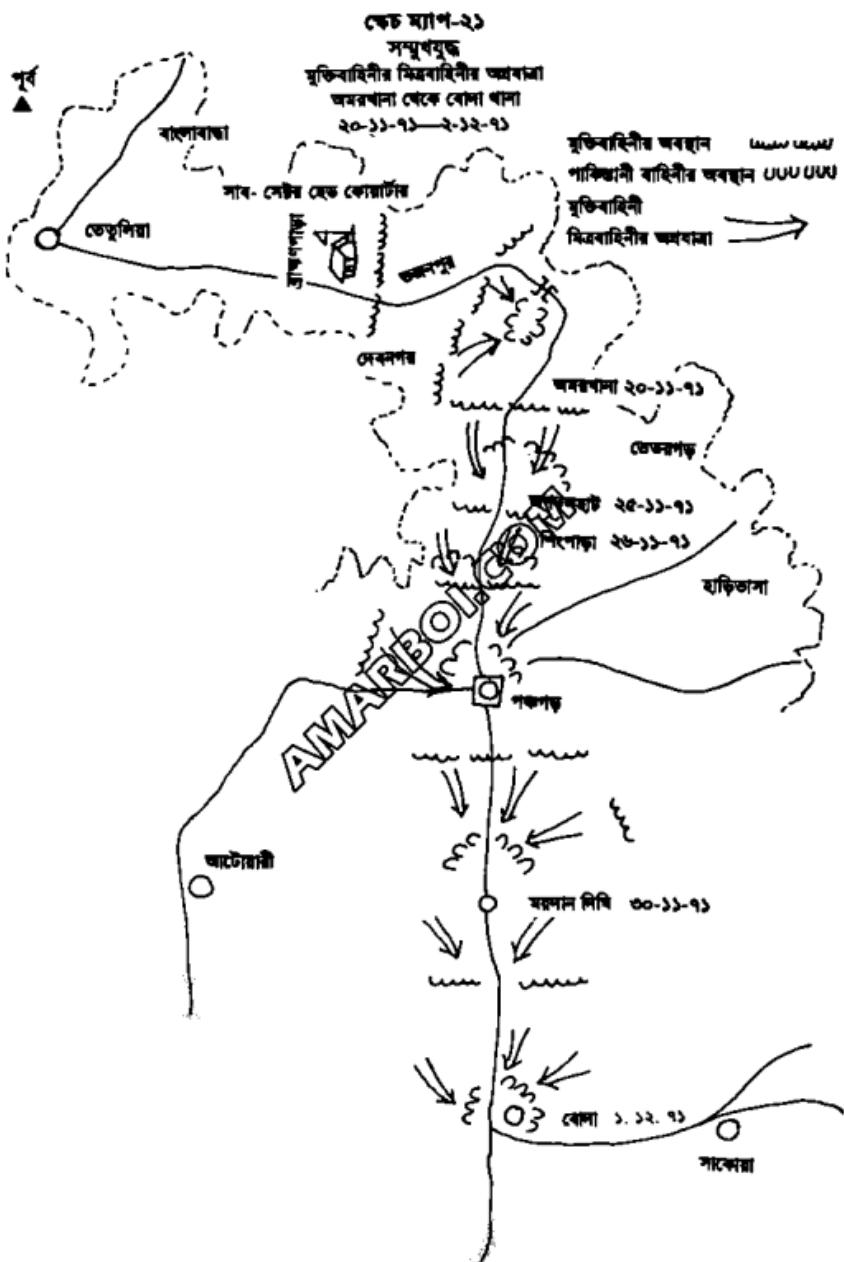
রাইফেল .৩০৩-২৩

এস.এল.আর - ৫

এস.এম.জি - ৫

রেডিওতে ঢাকা সুরে স্বাধীন বাহ্লা বেতার কেন্দ্র ছাঁচু করে দিয়েছে ছেলেরা। এখন বাজছে তাতে সেই প্রাণ জাগানিয়া গান, মোরা একটি মৃশকে বাঁচাবো বলে যুদ্ধ করি�...। গানটা শুনলেই গভীর আবেগ উঠলে ওঠে বুকের প্রতিতরে। আমরা একটি ফুলের জন্যই তো যুদ্ধ করছি। যুদ্ধ করছি একটি মুখের হাতিয়ার জন্য, একটা দেশের জন্য। শিল্পীর দরদভরা গলায় গাওয়া এ গান সমস্ত হৃদয়কে আকৃত্তিত করে। এ মুহূর্তে সেই সিংহহন্দয় পুরুষ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে গভীরভাবে শ্রদ্ধে আবক্ষ। ৭ মার্টের রেসকোর্সের ময়দানে তাঁর সেই স্বাধীনতার ডাক, 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তি সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম...' থেকে থেকেই কানে বেজে ওঠে। তিনি আজ আমাদের এই মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্বে সশরীরে সত্ত্বিভাবে উপস্থিত নেই ঠিকই কিন্তু প্রত্যেকের মনের গভীরে তিনি ধ্রুব নক্ষত্রের মতো জুলজুলে। অনিবার্য তার উপস্থিতি। তিনি নেই, কিন্তু সার্বিক মুক্তিযুদ্ধ চলছে তাঁরই নামে। এতো বড়োমাপের মানুষ বাঞ্জলি জাতির জীবনে আর কেউ আসে নি। সমগ্র জাতিকে এক ডাকে ঐক্যবন্ধ করার ক্ষমতা নিয়ে এই ক্ষণজন্মা মানুষটি যেনে পুরো বাঞ্জলি জাতিকে তাঁর সঞ্চারী ব্যক্তিত্বের জাদুক্ষি বলে সম্মোহিত করে ফেলেছেন; তিনি আমাদের মধ্যে নেই। তারপরও প্রবলভাবে তিনি অস্তিত্বান্বান আমাদের বুকের গভীরে সমাসীন পিতার মতো গভীর শুক্রা আর ভালোবাসায় মহিমামত্তি হয়ে।

পাকিস্তানিরা তাঁকে ধরে নিয়ে গেছে আমাদের কাছ থেকে। বিচার চলছে তাঁর এখন। তারা তাঁকে হয়তো মেরে ফেলবারই চেষ্টা করবে। মনের গভীরে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে চলে এই এখন তুমুল তোলপাড়। ইয়াহিয়া খানের একটি হঠকারী সিদ্ধান্তের কারণে যদি তাকে মৃত্যুবরণ করতেই হয়, তাহলে? এরকম একটা সম্ভাবনার কথা মনে উদয় হতেই নিজেকে কেমন শূন্য আর নিঃসাড় লাগে। বঙ্গবন্ধু নেই। শেখ মুজিব নেই— এরকম ভাবনা কঁজনাতেও আনা যায়



না। পাকিস্তানের গরম মাথার জেনারেলরা যদি এ ধরনের একটা কাজ করেই ফেলে, তাহলে কী হবে? আমার ধারণা, তাহলে জুলে উঠবে সারা দেশ। এমনকি সারা বিশ্বের মুক্তি ও শান্তিকামী মানুষও। জুলে উঠবে আরো বিশুণ প্রতিটি বাঙালি ক্ষণের দেহ। 'একটি মুজিবের কঠপ্রবরের ধৰনি থেকে লক্ষ মুজিবের কঠপ্রবরের ধৰনি...'। স্বাধীন বাংলা বেতারের এই গানই আগাম বলে দেয় সে কথা।

আরো একজন মানুষের কথাও মনে হয় এই মুহূর্তে। তিনি ড. কামাল হোসেন। সৌম্যকাঞ্জি প্রখর বৃক্ষদীপ এই মানুষটি বঙ্গবন্ধুর খৃবই প্রিয়জন। তিনিও দিন শুনছেন বঙ্গবন্ধুর পাশাপাশি থেকে জীবনের অন্তিম ক্ষণের। একজন প্রখ্যাত আইনবিশারদ, আগরতলা ব্যবস্থা মামলার সেই তুরোড় আইনজীবী, যিনি অন্যদের সাথে নিয়ে বঙ্গবন্ধু ও তাঁর সহযোগী অভিযুক্তদের মুক্তির জন্য লড়ে পেছেন অত্যন্ত দক্ষতার সাথে। কামাল হোসেন, আমাদের সেই প্রিয় মানুষটি মৃত্যু সেলে বসে আছেন বঙ্গবন্ধুর সাথে একই নিয়তি বরণ করে নেয়ার জন্য। মনে হয়, এরা কী করে পারেন? মহামানব না হলেও কত বড় মাপের মানুষ তাঁরা! না হলে মৃত্যু অতি সন্তুষ্টকর্তা জেনেও এ ধরনের অনড় আর একগুচ্ছে জেন নিয়ে কীভাবে দিব্য বসে থাকেন এরাঃ বাংলাদেশের স্বাধীনতা আসুক আর না আসুক, এন্দের মতো মানুষকে বাঙালি জাতি চিরকাল তাদের ইতিহাস সংশোচিতে শ্বরণ করবে।

প্রায় ঘন্টাখানেক কেটে যায় হিসেব-নিকেশ মেলার পাশাপাশি নানা এলোমেলো চিন্তাভাবনা নিয়ে। মিনহাজ তার রেশন বাঁধাইন্দা করার আগে এক প্রস্তু চা পরিবেশন করে। এই শেষ চা হাইড আউটের জীবনে। এরপর যে কোষ্ট্রী কখন কীভাবে চা মিলবে, কে জানে?

মিনহাজ তার বাঁধাইন্দা শেষ করে ফেলে স্টেশন নেতৃত্বে হেড কোয়ার্টারের ছেলেরাও গুছিয়ে নেয় নিজেদের। চৌধুরীর দল এখন যায়। নালাগঞ্জ হেড কোয়ার্টারে প্রচুর জিনিসপত্র থেকে যাচ্ছে। রেখে যেতে হচ্ছে কাউকে এসবের জিম্মায়। দলের ছেলেদের মধ্যে যোগ্য হিসেবে তবিবরকে বেছে নিয়ে হয় এজন। তার সঙ্গী হিসেবে নির্বাচন করা হয় দুজনকে। মোট এই তিনজনকে নালাগঞ্জ হেড কোয়ার্টারে রেখে যাওয়া হয় সমুদয় মালপত্রের হেফাজতের দায়িত্ব দিয়ে। তাদের সবকিছু বুঝিয়ে দেয়া হয় ভালোভাবে। বলি, কোনো মাল যেনো নষ্ট না হয়, খোয়া না যায়, আমার কিংবা পিন্টুর নির্দেশ ছাড়া যেনো কোনো কিছুই কাউকে বিলি-বন্টন করা না হয়।

সপ্রতিত ছেলে তবিবর। সে বাটপট বুঝে নেয় তার দায়িত্ব। কিন্তু আমাদের সাথে যেতে পারবে না বলে গভীর বিষণ্ণতার ছাপ পড়ে তার মুখে। কেমন হ্যান, বিষণ্ণ দেখায় তাকে।

সব কাজ শেষ হয়ে যায়। এবার আমাদের নালাগঞ্জ ছাড়ার পালা। দুলু ছুটে আসে কোথা থেকে হস্তদণ্ড হয়ে। মুখে-চোখে তার গভীর শক্তার ছাপ। সে বলতে থাকে, আপনারা চলে যাচ্ছেন মাহবুব ভাই!

তার কাঁধে হাত রাখি। এই দীর্ঘ সময় জুড়ে তার সাথে একটা গভীর পারম্পরিক বস্তু আর আর্দ্ধায়তার সম্পর্ক গড়ে উঠেছিলো। বড়ো আপন মনে হয় দুলুকে এবং তাকে ছেড়ে যেতে খারাপ লাগে। তাই তাকে বলি, যাচ্ছি। জরুরি ম্যাসেজ এসেছে।

— আপনাদের তো বুঝি ক্রটে যেতে হবে। কিন্তু আপনার শরীর তো এখনও ভালো হয় নি। পা ঠিক হয় নি। এ অবস্থায় আপনি যাবেন...! দুলুর গলায় গভীর উৎকর্ষ আর আন্তরিকতার সুর।

তার কথার মুখে তাই তাকে বলি, হাঁটতে তো পারছি। ঠিক হয়ে যাবে সব। ভালো থাকেন আপনারা। তবিবর রইলো। মালসামান রইলো। এগুলো দেখবেন।

— আজ্ঞা বলে দুরু মাথা নাড়ে। কিন্তু তাকে দেখায় একজন বিধম্বন্ত আর দুঃখী মানুষের মতো।

— রওনা দেবার সময় পিন্টু বলে, অনেক দূর হাঁটতে হবে আমাদের। পারবেন মাহবুব ভাইঃ

— চলো তো, পারতেই হবে বলে পিন্টুকে পা ফেলবার ইঙ্গিত দিই। রাত ন টাই মতো তখন।

বাইরে ঘন অঙ্ককার। কলকনে হিমেল শীত। চারদিকে ঘন কুয়াশার চাদর। আমরা এগিয়ে যাই এই ভেতর দিয়ে। পেছনে পড়ে থাকে নালাগঞ্জ। বড় মায়া লাগে জায়গাটার জন্য। বহুদিন সে আমাদের আশ্রয় দিয়েছে নিজের বাড়িয়ের মতো করে। মনে মনে বলি, যুদ্ধশ্রেষ্ঠ যদি বেঁচে থাকি, একবারের জন্য হলোও আসবো এই নালাগঞ্জে। একা নই। পিন্টুসহ অন্যদের সঙ্গে করে।

২২. ১১. ৭৩

শীতের মধ্যরাতে চাউলহাটি

পথিমধ্যে বেলতলার নিরাপত্তা দলের তিন সদস্য যোগ দেয়। শামসূল বলে, আমরা আসবার সময় শরণার্থী পরিবারগুলো তত পেয়ে হোচ্ছে। ছাড়তে চাছিলো না আমাদের।

এটাই স্বাভাবিক। সব ঠিক হয়ে যাবে। তাক্ষণ্যে তো রইলোই নালাগঞ্জে। প্রয়োজনে সে তাদের সাহায্য করতে পারবে। তবিবরকে থ্যাট্র ব্রফ করে আসা হয়েছে। শামসূলকে কিছুটা মনমরা দেখায়, তাকে বলি, তোরও মন খারাপ?

— এখনো খারাপ তো নাগোজে। প্রাতিদিন থাইকনো ওমার ওটে.....।

আমি আর কিছু বলি না। মন্তব্য ছিলে শামসূল। কিছুদিন পরিবারিক পরিবেশে থেকে মায়া বসে পেছে তার। আসলে এই দুনিয়া মায়া-মমতায় ভরা একটা জায়গা। একটুক্ষণ কোথাও থাকলেই মায়া-মমতায় জড়িয়ে যেতে হয় সেখানে। যুদ্ধের এ সময়টায় কতো জায়গায় গেলাম, থাকলাম, আবার চলে এলাম, তার কোনো ঠিক নেই। সামনের দিনগুলোয় এমনি আরো কতো জায়গায় থাকতে হবে, আবার তাদের একইভাবে হয়তো ছেড়ে যেতে হবে। যুদ্ধের মাঠের এটাই নিয়ম আর বাস্তবতা। যুদ্ধে চিরভাস্তু হয়ে থাকবার কোনো উপায় নেই।

গড়ালবাড়ির স্টোরকিপার হানি জানায়, গনি ভাই আরো কিছু কাপড়চোপড় এবং খাবার প্যাকেট পাঠিয়েছেন। তার প্রেরিত জিনিসগুলোর দিকে তাকিয়ে গনি ভাইকে মনে পড়ে যায় ভীষণভাবে। তিনি নিজের একক প্রচেষ্টায় বিভিন্ন জায়গায় ধরনা দিয়ে যা যোগাড় করতে পারছেন, তাই পাঠিয়ে দিচ্ছেন। এগুলো বিরাট সাহায্য হিসেবে বিশেষ আমাদের জন্য। এ ফ্রন্টের ছেলের যুদ্ধের এই চরম সময়ে গনি ভাইয়ের এই একক প্রচেষ্টায় বলতে গেলে বিভিন্নভাবে পাওয়া সাহায্য-সহযোগিতার কথা মনে রাখবে চিরদিন।

হাদির স্টোর থেকে প্রত্যেক ছেলেকে একটা করে সোয়েটার, কশ্ম, ঝুঁটি, শার্ট আর শেঞ্জি দেয়া হয়। যাদের পায়ে কেড়স ছিলো না তাদের সেটা দেয়া হয়। গোলাবারুদের মজুদ বা টকের যা কিছু, তার সবটাই নেয়া হয়। তারপরও হাদির স্টকে থেকে যায় রেশনসামগ্ৰীসহ

অনেক কিছু : সুতরাং হানিকে এখানেই থাকতে হবে এই টোরের জিম্বাদার হয়ে, এই সিঙ্কলটা ওকে জানিয়ে দিই। হানির কোনো অসুবিধা নেই। সদা উৎফুল্ল হলে সে। এখানে বি. এস. এফদের পরিবেশে সে নিজেকে মানিয়ে নিয়েছে চমৎকারভাবে। ফ্রন্টে না গিয়ে এখানে থাকতে পারায় সে খুশিতেই আছে।

ছেলেদের মধ্যে মালপত্র বিতরণশেষে পিন্টু তাদের বি. ও. পির সামনে ‘ফ্ল-ইন’ করিয়ে ফাইনাল চেক করতে থাকে। নেপালি সুবেদার ঘরের ভেতরে ছিলেন। সঙ্গত ঘুমোছিলেন। আমাদের সাড়া পেয়ে বেরিয়ে আসেন। তাকে বলি, দাদু হামলোগ যাতে হ্যায়। দোয়া কিভিয়ে গা।

— কাঁহা যাতে হোঃ জিগ্যেস করেন তিনি।

— ফ্রন্ট মে, বলি তাকে।

— শুইয়েস ইয়েস বলে তিনি তার নিজস্ব কায়দায় মাথা নাড়েন। তারপর বলেন, অমরখানা ধাটি তো ফ্ল কিয়া। শালে লোগ ভাগ গিয়া। আওর পিছে মে ডিফেল কিয়া। আভি তো ফ্রন্ট ফাইট মেই লড়না হোগা। ঠিক হ্যায় যাও, শালে লোগকো জোর মার দেনা। বহুত অত্যাচার কিয়া হ্যায় শালে লোগ।

এরপর তার সাথে হাত মিলিয়ে, বুক মিলিয়ে বিদায় চাই। তিনি হাসিমুখে বলেন, মাত ভুল না। জয় বাঞ্চা হোনে কি বাত জরুর নেপাল, হামরা ফ্লাইয়েগা তো ঠিক? ভুল না নেই।

পিন্টুকে লক্ষ্য করে তিনি বলেন, কেয়া সিঙ্গার সাব, তোহাইয়েগা তো ঠিক? ভুল না নেই।

— নেই দাদু, কাভি নেই, বলে পিন্টু তাকে উৎস্থ আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরে।

এরপর পাকা সড়কের ওপর পা রেখে ঝুঁক হয় আমাদের যাত্রা। বৃক্ষ সৈনিক একটা স্যালুট ঠুকে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকেন। আমরা তাঁকে ছেড়ে, গড়ালবাড়ি বি. ও. পি. ফেলে, কালো পিচের রাস্তার ওপর পাত্রে থায়ে তাল মিলিয়ে হাঁটতে থাকি। অনেক দূর যেতে হবে। প্রায় ১৩/১৪ মাইল দূরত্বে ফ্লাইয়ে যাবো, সেখানে আমাদের জন্য কী অপেক্ষা করছে, জানি না। কমান্ডারের নির্দেশ, ভুক্তিযাচ্ছি। যুক্তে কমান্ডারের নির্দেশ যে শিরোধার্য।

মাঝখানে দুঁজায়গায় বিরতি দিয়ে পাকা সড়ক ধরে কেবল হেঁটে চলেছি। হিম ঠাণ্ডা রাত। কিন্তু ঠাণ্ডার কামড় ততটো অনুভূত হয় না। পদযাত্রায় শরীর গরম হয়ে উঠেছে। দীর্ঘ যাত্রায় নিজের পায়ের ব্যাটাও কোথায় যেনো হারিয়ে গেছে। হাবভাব থেকে বুরতে পারি, ফ্রন্টে যাওয়ার একটা ভীতি মেশানো অনুভূতি যেনো সবাইকে অধিকার করে বসেছে। কেউই কোনো কথা বলছে না। কেবল হেঁটেই চলেছে ভাবলেশ শূন্যভাবে। এমনকি পিন্টুর মতো ছেলের মুখে কোনো কথা নেই। আমার পাশাপাশি থেকে একমনে হেঁটে চলেছে সে।

রাত ১টার দিকে চাউলহাটি পৌছানো যায়। সামনে থেকে প্রচণ্ড গোলাগুলির শব্দ ভেসে আসে। আর সেই শব্দ সবাইকে যেনো নাড়া দিয়ে যায়। এতো রাতে কে কোথায় আছে, খুঁজে পাওয়া যায় না। রাস্তার পাশে একটা ছোট ছনের ঘর। চারদিকে খোলা। ছেলেদের সেখানেই রাতটা থাকার ব্যবস্থা করি। দীর্ঘ যাত্রার ক্লান্তিতে ছেলেদের একেবারে ভেঙে পড়বার দশা। মধ্যরাতে হিম ঠাণ্ডা বাতাস জঁকিয়ে নেমেছে। শরীরের হাড়ে পর্যন্ত প্রবেশ করে সেই ঠাণ্ডা শরীরকে অচল স্থিতি করে দিতে চায়। শোবার উপায় নেই। কম্বল গায়ে জড়িয়ে কেবল শীতাত্ত্ব আর কষ্টকর রাতের অবসানে তোর হবার অপেক্ষায় বসে থাকে সবাই ভেজা মাটির ওপর। সামনে চলতে থাকে তুমুল যুক্তের তাউবলীলা।

বড় ভাই নুরুল হক এবং খুলে যাওয়া অমরখানা পথ
সামনে ত্যাবহ যুদ্ধের তাস্তি নিয়ে কষ্টকর শীতের রাতটা অবশ্যে শেষ হয়। ভোরের
আলোয় আমাদের পরিচিত চাউলহাটি জেগে ওঠে। কিন্তু এ ক'দিনে যেনো বিস্তর পরিবর্তন
ঘটেছে জায়গাটার। এখন চারদিকে শুধু সামরিক স্থাপনা, যানবাহনের ছোটাছুটি, আর
অবিরাম ব্যস্ততা জায়গাটাকে পুরোপুরি একটা রণক্ষেত্রে পরিণত করেছে। বি. ও. পির পথ
নিয়ে অমরখানাগামী রাস্তাটি এখন উন্মুখ হয়ে গেছে। প্রচুর ব্যস্ততাসহ সে পথ দিয়ে এখন
সামরিক যানবাহন আসছে আর যাচ্ছে। বাপারটা দেখে সত্যই অবাক লাগে ভাবতে।
দু'দিন আগেও, এ পথ দিয়ে বিনা বাধায় অমরখানা যাওয়া যাবে, এটা ছিলো একটা
অকল্পনীয় বা অচিন্তনীয় ব্যাপার। অমরখানা দখল হয়েছে, সেখানে যাবার সোজা পথটি
খুলে গেছে, একথা ভাবাই যায় না, বিস্তাসও করতে কষ্ট হয়।

এক সময় অমরখানার দিক থেকে সোনারঙা গোল থালার মতো সূর্য ওঠে। একান্ত কাম্য
ছিলো এই সূর্য, সূর্যের আলো। সারা রাত ছেলেদের বিশ্বাম হয় নি। ঘুমও হয় নি। শীতের
প্রচণ্ড কামড় এবং সামনে যুদ্ধের ত্যাবহতার আশঙ্কা, এইসব তাদের সবাইকে জাগিয়ে
রেখেছে। সবাই তাই ঘৃম-কাতুরে লাল চোখ, চেহারা বিধৰণ। ঠাণ্ডায় শরীরের রক্ত জমে
যাওয়ার যোগাড়। এই হিম ঠাণ্ডায় আমাদের জন্য এখন সূর্যের উত্তাপ খুবই জরুরি।
প্রত্যেকের অসাড় হয়ে যাওয়া শরীরে তাপ সঞ্চারিত হলেই আবার প্রাণের স্পন্দন জাগবে।
পুর থেকে হেসে ওঠা সূর্যকে তাই সবাই স্বাগত জানায় এবং প্রাণভরে তার উত্তাপকে সবাই
নিজের নিজের শরীরে যেনো শেষ নিতে থাকে।

সাত সকালেই বড় ভাই নুরুল হক এসে যাবাই হন। তাকে দেখে ভালো লাগে। আগের
মতোই ছটফটে ভঙ্গিতে তিনি সবার খোজন্তের নেন। আর সবার বিধৰণ রূপ দেখে তিনি
বলেন, ইস্ক কষ্ট হয়েছে তোমাদের খুর। এই ঠাণ্ডার রাতে এভাবে থাকতে হয়েছে...!

তাকে বলি, রাতের মধ্যেই জাউলহাটি আসার ম্যাসেজ দিলেন। ছুটে এলাম সেটা
পেয়ে। রাতে কোন্ দিকে যাই রেজিস্টার? সামনে তো যুক্ত চলছে!

বড় ভাই আমার কথায় সচিকিৎ হয়ে দ্রুত সামনের দিকে— অমরখানার দিকে দৃষ্টি
মেলে দেন। তারপর স্বগতেজির মতো করে বলেন, ওখানেই তো যেতে হবে তোমাদের।
সে জন্যই তো জরুরি তলব দিয়ে ডেকে আন।

তাকে জিগ্যেস করি, এখন যাবো কোথায়? রিপোর্ট করবো কার কাছে? কাজ কি হবে
আমাদের?

— এ ব্যাপারে তোমাদের সদরদিন সাহেব এসে বলবেন। তিনি পৌছে যাবেন
কিছুক্ষণের মধ্যেই।

এরপর বড় ভাই আমাদের সাথেই রাস্তার পাশ ঘেঁষে বসেন ঘাসের ওপরেই। পকেট
হাতড়ে সিগারেট বের করে আনেন। ম্যাচ জুলিয়ে ধরান। সিগারেট ধরাবার সময় তাঁর হাত
কেঁপে ওঠে রীতিমতো। তার মানে, তিনি এখন ভীষণভাবে চিন্তা ভারাক্রান্ত এবং উত্তেজিতও।
একেবারে আপন আঝায়ের বক্সে আমরা জড়িয়ে পড়েছি পরম্পর। নিবড় ভালোবাসার
সম্পর্ক গড়ে উঠেছে সবার সাথে সবার। নুরুল হককে আমরা প্রথম দিন থেকেই বড় ভাই বলে
ডাকছি। দিনে দিনে তিনি আমাদের সত্যিকারের বড় ভাই হয়ে উঠেছেন সকলের। সবার বড়
ভাই আর সে মর্যাদায় সমাসীন থেকেই তিনি আমাদের সবাইকে ছোট ভাইয়ের অপত্য শেহ

দিয়ে আসছেন। মুক্রত ছেলেদের ঝুঁটিনাটি সব বিষয়ে তাঁর মনোযোগ খুবই সজাগ। তিনি সবার চাহিদা পূর্ণে সদাব্যস্ত সীমিত সুযোগ আর সময়ের ভেতরেই।

এখানে এখন আমাদের ভাসমান অবস্থা। তাই নাস্তা খাবার সমস্যা দেখা দেয়। এখানে মিনহাজের পক্ষে নাস্তা বানাবার প্রশ্নই আসে না। তবুও সকালে ছেলেদের নাস্তা খাওয়া হবে না এটা যেনো সফল কোয়ার্টার মাস্টার মিনহাজ মেনে নিতে পারে না। গড়ালবাড়ি থেকে আসবাব সময় গনি ভাইয়ের পাঠানো বিস্কুটের কিছু প্যাকেট সে সাথে করে এনেছিল। তাই ভেঙে ভেঙে সে প্রত্যেকের হাতে ২/৫টি করে বিস্কুট ধরিয়ে দেয়। বেশ বড়ো সাইজের চৌকোনা সংযোগটি বিস্কুট। কিছুটা লবণের স্বাদযুক্ত। খেতে বেশ ভালোই লাগে।

— চা হলে ভালো হতো।

হঠাৎ করে পিন্টুর গলা শোনা যায়। ঠাণ্ডা হিম শরীরে গরম গরম চা কার না কাম। সবার মনের কথাই উচ্চারণ করে পিন্টু। মিনহাজের মনে কথাটা ধরে। সকালের নাস্তা সে চাবিহীন রাখতে রাজি নয়। তাই সঙ্গে করে বেঁধে আনা চা-চিনি আর দুধসহ সে দুজন সঙ্গীকে নিয়ে চলে যায় রাস্তার পার্শ্ববর্তী চা দোকান অভিযুক্তে। কিছুক্ষণের ভেতরেই একটা বড় কেতলি ভর্তি ধূমায়িত চা নিয়ে হাসতে হাসতে ফিরে আসে। চা পরিবেশনের মাত্র ৪/৫টি মগ সাথে করে আনতে পেরেছিল, তাড়াহড়োর জন্য প্রত্যেকের আলাদা আলাদা মগ আনা সম্ভব হয় নি। পালাক্রমে তাই সীমিতসংখ্যক মধ্যে ক্ষেত্রেই সবাইকে সে চা দিতে থাকে। শীতের সকালে অপূর্ব লাগে সেই চা। মনে হয় আর কিছু না হোক, মিনহাজকে এই চায়ের জন্য সারা জীবন আমাদের মনে রাখতে হবে।

আমরা বসে থাকি। সূর্য ধীরে ধীরে তার ক্ষেত্রের মাত্রা বাড়িয়ে ওপর থেকে ওপরে উঠতে থাকে। তার ছাড়ানো তাপে আমাদের সবার শরীরে গরম হয়ে উঠতে থাকে। আর আমরা অপেক্ষা করতে থাকি সদরদিন সাহেবের জন্য।

বড় ভাই বলেন, এ রাতের আন্দোলনের রাতে পাকবাহিনীর কাউটার অ্যাটাকে আমাদের ক্ষতি হয়েছে খুব। ক্যাঞ্জেলজিভের সংখ্যা ১৭ জন। এজন্যই সদরদিন সাহেব তোমাদের জরুরি ভিত্তিতে তলব করে এনেছেন।

আমরা চূপচাপ করে শুনি তার কথা। দেখা যায়, বড় ভাই নিজেই অসম্ভব শক্তি হয়ে পড়েছেন। তার প্রিয় সাথীদের যেতে হবে ফ্রন্টে মরণপণ সরাসরি যুদ্ধের ভেতরে এবার। এটা যে কতোখানি ভয়াবহ ব্যাপার, সেটা স্পষ্ট বুঝতে পেরেছেন তিনি। হাবভাবে বোঝা যায়, বড় ভাই অন্তর দিয়েই যেনো চাচ্ছেন না, গেরিলা যুদ্ধের জন্য যাদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে তারা সরাসরি যুদ্ধে লিঙ্গ হোক। কিন্তু উপায় কি? করার তো কিছু নেই। যুদ্ধের প্রয়োজন মেটাতে আমাদের যেতেই হবে সম্ভব্যুদ্ধে। এই বাস্তবতার উপলক্ষ্মি নিজেকে কেমন যেনো একটা ভাবলেশশূন্য অবস্থার গহবরে নিষ্কেপ করে।

আমার পাশে বসে আছে পিন্টু। তারও অনেকটা নিষ্পত্ত অবস্থা। সামনে সোজাসুজি বাংলাদেশের ভূখণ্ডের দিকে উদাসভাবে দৃষ্টি মেলে দিয়ে সে যেনো কিছু একটা খোজার চেষ্টা করছে। তাকে সরাসরি জিগ্যেস করি, তব যেয়েছো পিন্টু?

— ভয়! পিন্টু যেনো চমকে উঠে সঙ্কিৎ ফিরে পায়। কিন্তু বলবার আগেই আবার ওকে জিগ্যেস করি, তব লাগছে?

— নাঃ। তবে মনে হয়, আমার এই নাদুসনদুস শরীরটা আর ফিরবে না মাহবুব ভাই।

কথাটা শেষ করেই পিন্টু হাসে ।

আমি বলি, দূর পাগল ! এতোদিন যখন বেঁচে আছি, এর মধ্যেও ঠিক আমরা বেঁচে থাকবো, দেখো !

— দেখা যাক, আগ্রাহ ভরসা ! কথাটা বলেই পিন্টু দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে । বুকের গভীর থেকে আমারও একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে ; তবে কি পিন্টুর মতো আমিও তয় পেয়েছি ? ভয়তো একটা সংক্রামক ব্যাধির মতো । সামনে যে মরণপণ লড়াই চলছে, সেখানে গিয়ে ঝাপিয়ে পড়বার ব্যাপারে তয় না পাওয়াটা অস্থাভাবিক ব্যাপার ।

যাত্রা, সম্মুখ সমরে

সকাল নটার দিকে এলেন সদরুন্দিন সাহেব । একটা খোলা জিপে চড়ে । চোখ লাল, অবিন্যস্ত অগোছালো চেহারা । কাঁধে টেনগান । বোঝাই যায় সারারাত শুমোন নি তিনি । ফ্রন্ট আর রেয়ার সম্বত এই নিময়েই দোড়াদৌড়ি করে কেটেছে তাঁর সারারাত ।

তাকে দেখে আমরা সবাই ‘ফ্ল-ইন’-এ দাঁড়ালাম । তিনি গাড়ি থেকে নেমে এলেন সোজা আমাদের কাছে । এসেই জিগ্যেস করলেন, আমরা পৌছেছি কখন ? রাতারাতিই পৌছেছি শুনে তিনি খুশি হলেন । সেই সাথে বললেন, এটা জানলে তো রাতেই তিনি আমাদের ফ্রন্টে পাঠানোর ব্যবস্থা করতেন । তিনি ছেক্ষণের সংখ্যা এবং হাতিয়ার ও গোলাবারুদের খৌজখবরও নিলেন । তাঁকে জানালাম, মুলাশঙ্গ হেড কোয়ার্টারের ছেলেদের শুধু আনা হয়েছে । মোট ৪৭ জন । অন্য সবাই আঞ্চলিক দিনের মধ্যে সরাসরি ফ্রন্টে যোগ দেবে ।

— ঠিক আছে, বলে তিনি কিছুক্ষণ চমচম্পা কী যেনে ভাবেন । তারপর বলেন, আজকে আপনাদের এই মধুপাড়া কোম্পানি সহজেই ফ্রন্টে যাবে । জগদলহাটে পাকবাহিনী বর্তমানে তাদের অবস্থান থেকে অসম্ভব চার্জ স্টেট করেছে । চৈতনপাড়ায় আমাদের প্রতিরক্ষা লাইন । একেবারে ওদের সামনাসামনি ৩/৪ শ' গজের মধ্যে । সেখানে গোলো দুরাতে ওদের কাউন্টার ওফেনসিভে আমাদের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে প্রচুর । ক্যাজুয়েলটিজও হয়েছে অনেক । আপনারা যাবেন রিঃইনফোর্সমেন্ট হিসেবে ।

এরপর তিনি থামেন কিছুক্ষণ । ভালো করে যেনে দেখে নেন আমাদের আর একবার । তারপর বলেন, আপনারা এখন মার্চ করে সোজা চলে যাবেন চৈতনপাড়া । সেখানে ক্যাটেন শাহরিয়ারকে পাবেন । হি উইল রিসিভ ইউ অ্যান্ড অ্যারেঞ্জ ইয়োর ডিপ্লয়মেন্ট । আমি আপনাদের সাথে দুপুরে দেখা করবো ।

তারপর বললেন, অ্যানি কোশ্চেনঃ

মনের মধ্যে অজ্ঞ প্রশ্ন আকুলিবিকুলি করতে থাকলেও কোনো প্রশ্ন করি না । চৃপচাপ দাঁড়িয়ে থাকি ।

তখন তিনি আবার বলেন, আপনাদের এই মধুপাড়া কোম্পানি এতোদিন যে সাহসিকতা দেখিয়েছে, আমি চাই ফ্রন্টেও সেটা বজায় থাকবে । আমাদের ডিফেন্স ছাড়া যাবে না । অন্যরা ডিফেন্স ছাড়লেও আমার এই মধুপাড়া কোম্পানি ডিফেন্স ছাড়বে না । অ্যান্ড আই ডু বিলিভ ইউ উইল টেক হোভ ইয়োর পজিশন অ্যান্ড নেভার রিট্রিট । ও.কেঃ

— ইয়েস স্যার বলে তার কথায় সায় দিই ।

— আই উইশ ইওর সাকসেস বয়েজ। কথাগুলো শেষে উষ্ণ করমদ্দন করে তিনি বিদায় নেন। বড় ভাইও যান তাঁর সাথে। যাবার সময় আমাদের লক্ষ্য করে বলা তাঁর ফিসফিসানো এই কথাগুলো কানের পর্দায় আছড়ে পড়ে, ভালো থেকে মাহবুব, দোয়া করি ভালো থেকো।

এরপর আমরা রাত্না দিই। মনের ভেতর তখন একটা কথাই বারবার বাজতে থাকে, ডিফেন্স ছাড়বে না, অন্যরা ছাড়লেও তোমরা ছাড়বে না।

আমরা হাঁটতে থাকি জীবনবাজি যুদ্ধের মাঠ লক্ষ্য করে। গোলাগুলির ঝড়বৃষ্টির দিকে। মৃত্যুর সঙ্গে কঠিন পাঞ্চা লড়তে। সামনে সম্মুখ সমর। আমরা যোগ দিতে যাচ্ছি সেই সমরে।

২৩. ১১. ৭১

পদানন্ত অমরখানা

চারদিকে বাঙ্কার-ট্রেক্স। গুলুলতা আর গাছের ডালপালা দিয়ে ক্যামোফ্লেজ করা আর্টিলারি আর মর্টারের অবস্থান। মিলিটারি লরির দৌড়াদৌড়ি, ছেটাছুটি। সৈনিকদের প্রতিরক্ষা লাইন গড়ে তোলার ব্যস্ততা। মিত্র বাহিনীর এ ধরনের বড় যুদ্ধ প্রত্তুতির ভেতর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আমরা এগিয়ে চলি অমরখানার দিকে।

এই রকমভাবে হাঁটতে হাঁটতে একসময় অমরখানা^{এসে} যায়। আমরা পাকা রাস্তায় গিয়ে উঠি। এই সেই অমরখানা। পাকবাহিনী প্রায় দশাস ধরে অধিকার করে রেখেছিলো জায়গাটা। অনেকটা সুইসাইড স্কোয়াডের প্রতিষ্ঠা মাটি কামড়ে তারা পড়েছিলো এ জায়গাটায়। আক্রমণ-প্রতিআক্রমণে মুখ্য প্রত্যাশা জায়গাটা রাতদিন। বিচ্ছিন্নভাবে বহুবার আক্রমণ করা হয়েছিলো এখানে অবস্থানেয়া পাকবাহিনীর ওপর। কিন্তু তাদের সরানো যায় নি এ ঘাঁটি থেকে। কখনো ক্ষমতায় এখান থেকে উন্মুক্ত হাতির মতো একরোখা ভঙ্গিতে পাকবাহিনী এগিয়ে গেছে ভজ্জবস্তু দেবনগর মুক্তিকৌজের অবস্থানের দিকে, কখনো এগিয়ে গেছে অমরখানায় ভারতীয় অবস্থানের দিকে। এর আকাশে নিয়মিত উড়তে দেখা গেছে হেলিকপ্টার। আকাশ থেকে রিকোনাইসিস-এর কাজ চালিয়েছে হেলিকপ্টারে বসা কম্বার। শত সহস্র কামান-মর্টারের গোলা চাউলহাটির দিক থেকে এসে বর্ষিত হয়েছে এর ওপর; কিন্তু এর মধ্যেও ঢিকে ছিলো ওরা। শুধু টিকেই ছিলো না, আশপাশের এলাকা জুড়ে তারা চালিয়ে গেছে পাশবিক অত্যাচার। গ্রামকে গ্রাম তারা জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে উজাড় করে দিয়েছে। লুটপাট আর ধ্রংয়জ চালিয়েছে নির্বিচারে। প্রচণ্ড গোলাগুলির তাওবের ভেতরেও তারা তাদের জৈবিক লালসা চরিতার্থ করার জন্য ধরে এনেছে অসংখ্য মা-বোনকে, যাদের অনেকেই হয়তো আর ফিরে যেতে পারে নি। এখানে এই দীর্ঘ সময়ের অবস্থানে তাদের অনেকেই যেমন হতাহত হয়েছে, তেমনি আবার নাম-না-জানা অসংখ্য বাঙালিকেও ধরে এনে তারা মৃৎস অত্যাচার চালিয়ে হত্যা করতে ছাড়ে নি।

অমরখানার পাকা সড়কের বাঁকের ওপর এখন দাঁড়িয়ে আছি আমি। আর ভাবছি এসব কথা। তবে যতোই ভাবছি, অবিশ্বাস্য অলীক ঘটনার মতো মনে হচ্ছে সবকিছু। অমরখানা আজ পদানন্ত। দু'দিন আগে দুদের দিনটিতেই তারা পালিয়ে গেছে তাদের এ জায়গার দখল ছেড়ে দিয়ে। মুক্তিবাহিনীর প্রচণ্ড আক্রমণের তোড় আর মিত্রবাহিনীর জোরদার

সাপোর্ট কায়ার এরা সামাল দিয়ে উঠতে পারে নি। ফলে চিকতে পারে নি। দীর্ঘদিনের হার-না-মানা বাহিনীকে হার শীকার করে পালিয়ে যেতে হয়েছে তড়িঘড়ি করে। এখান থেকে পচাদশসরণ করে তারা এখন জগন্মহাটে অলরাউন্ড ডিফেন্স গেড়ে বসেছে শক্তভাবে। মুক্তিবাহিনী পিছু ধাওয়া করে গেছে তাদের সেখান পর্যন্ত।

এই সেই অমরখানা। রাস্তার মোড়ে পাকা বড়ো বাক্সারটির পাশে এখন দাঁড়িয়ে আছি। বিষ্ণুন্ত হয়ে গেছে বাক্সারটি। চাউলহাটি পুরুরের উচু পাড়ে দাঁড়িয়ে আমরা দূর থেকে নিয়ামিত অমরখানাকে দেখতাম। একটা বিভীষিকার জগৎ বলেই মনে হতো জয়গাটাকে। এখান থেকে আরো দেখা যেতো পরিত্যক্ত ই.পি.আর. ক্যাম্পের সাদা দালানটিকেও। শত শত কামনের গোলা ছুঁড়েও যেটাকে টার্গেট করা যায় নি। আর তারই দাঁড়িয়ে থাকা উদ্ভিত ভঙ্গ দেখে অমরখানার অমরত্বের কথা মনে হতো। মন খারাপ হয়ে যেতো সত্তি সত্তি। কিন্তু এখন দেখতে পাচ্ছি, পরিত্যক্ত বি.ও.পিটি পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে গেছে। সাদা দালানের টিনের ঘরটিও শেলের আঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে ধসে পড়েছে। শুধু দাঁড়িয়ে আছে সেই সাদা দালান বাড়িটার একাংশ।

এই সেই অমরখানা

অমরখানা বি.এস.এফ প্রতিরক্ষা লাইনের সেই বিশাল উচুজ্বলম্বণাছের অবজারভেশন পোস্ট থেকে টেলিস্কোপ দিয়ে একদিন দেখেছিলাম এই অসহায়নাকে। এখন বিষ্ণুন্ত যে বড়ো বাক্সারটির পাশে দাঁড়িয়ে আছি, এটাই ছিলো তাঙ্গের মূল বাক্সার তথা ক্যাম্প পোস্ট। সামনের দিক থেকে ক'জন সৈনিক টানতে টানতে আনছিলো সেদিন একজন ধামের কোনো মেয়েকে। এই বাক্সার থেকেই তাকে সরাসরি সোল্টাসে নারী মাংসভূত রাক্ষসের মতো বেরিয়ে এসেছিলো ক'জন সৈনিক। সেগুলোহে মেয়েটিকে জড়িয়ে ধরে তারা টেনে-হিচড়ে নিয়ে চুকিয়েছিলো এই বাক্সারে এক ঘণ্টা ব্যতুক দৃশ্য সেদিন আমগাছের মগডালে বসে টেলিলেপের ভেতর দিয়ে দেখে শুনে উঠেছিলো সারাটা শরীর-মন। অসহায় সেই মেয়েটির জন্য সেদিন মনের ভেতরে ছিলো কী অস্ত্র দাপাদাপি। বড় অসহায় লেগেছিলো সেদিন। তাকে উদ্ধারের কোনো উপায় ছিলো না।

পরবর্তীকালে মেয়েটির ভাগ্যে কী ঘটেছিলো, এখানকার মাটিই কেবল তার সাক্ষী দিতে পারে, আর কেউ নয়। তার মতো এমনি কতো অসহায় ললনাকে যে এখানে মানসম্মত হারাতে হয়েছে সে এক অকথিত ইতিহাস। ছিঁড়েখুঁড়ে খাওয়া হয়েছে তাদের কোমল নিষ্পাপ শরীর। আর এসব করেছে পাকিস্তানি হায়েনার পাল পাকিস্তান আর ইসলাম রক্ষার নামে। বাঙালি মানেই ‘কাফের’— এই ধূয়া তুলে। আর এরি ফলে পাকসেনাদের হাতে নাম-না-জানা অসংখ্য যুবতী, কিশোরী কি কুলবধুও হয়েছে তাদের বর্ষৱ লালসার শিকার। তাদের অসহায় কান্না, আর্তচন্দ্রকার কিংবা পাশবিক অত্যাচার দীর্ঘ হাহাকার ছড়িয়ে আছে এখানকার আকাশে-বাতাসে, মাটিতে কিংবা পুড়ে ছারখার হওয়া গাছগাছালিতে। যাদের এখানে আনা হয়েছিলো কোনো গৃহকোণ থেকে, তাদের কতোজন এই মৃত্যু-গহৰ সন্দৃশ কারাগার থেকে ফিরতে পেরেছে, কোনোদিন কি তার কোনো হিসেব মিলবে? আর যে হায়েনার পাল আমাদের মা-বোনদের লজ্জা হরণ করেছে তাদের পাশবিক লালসা চরিতার্থ করার জন্য তাদের নাম-ধার কিংবা পরিচয় কি উদ্ধার করা যাবে কোনোদিন? হবে কি

তাদের বিচার? মন বলে, অবশ্যই আমরা তাদের পিছু ধাওয়া করে একদিন ধরে ফেলতে সক্ষম হবো। তারপর গণবিচারের ভেতর দিয়ে তাদের শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে এক এক করে।

বিধিষ্ঠ এই বড়ো বাক্সারের ভেতরে চুক্কেছিলো জয়নাল, শুভ্র আর মধুসূদন। তারা একসময় বেরিয়ে আসে সেখান থেকে। তবে উত্তেজিত চেহারা নিয়ে। তাদের হাতে ধরা ভাঙ্গ অনেকগুলো রঙিন ছড়ি। মধু তাই দেখিয়ে আমাকে লক্ষ্য করে বলে, শালারা এইটে বেটিছাওয়া ধরি আনিছিল, এই যে তার চেহ। আসলেও তাই। উকি দিয়ে দৃষ্টি মেলে দিই বাক্সারের ভেতরপানে। বড়ো কংক্রিটের তৈরি মজবুত বাক্সার। এখন খৎসপ্রাণ। ভেতরে সবকিছু লপ্তভূত। এর ভেতরেও দেখা যায় মেয়ে মানুষের ব্যবহৃত রঙিন শাড়ি আর ব্লাউজের কয়েকটা ছিন্নিটুকরো। যেনে বাক্সারের খৎসন্ত্বের ভেতর থেকে উকি দিয়ে তারা বলে দেয়, দেখে যাও তোমাদের মা-বোনদের মান-সন্ত্রম হরণের কিছু নির্দর্শন চিহ্ন।

বাক্সারে মাইন থাকতে পারে, ববি ট্র্যাপ থাকতে পারে, এ শক্তায় ছেলেদের বাক্সারে চুক্কতে নিষেধ করি। ছেলেরা আমার সে নিষেধ মানতে চায় না। দখল করার পর বাক্সারগুলোর প্রতিটির ওপর মুক্তিফৌজের দল চার্জ করেছে। খৎস করে দিয়েছে সেগুলো। তাই কোনো বাক্সারেই ছাদ নেই। অক্ষত অবস্থায় কোনো বাক্সারই দাঁড়িয়ে নেই। তবুও ছেলেদের উৎসাহ কোনো বাধা মানে না। তারা আশপাশে প্রতিটি বাক্সারে চার্জ করতে থাকে। ভেতরে ঢেকে আর এটাওটা বের করে আনতে থাকে সোল্যাসে। বড়ো বাক্সারের পাশে দাঁড়িয়ে আমি আর পিটু ছেলেদের এই পাগলামো আর বিজয়োল্লাস দেখি। হসহাস করে মিলিটারি গাড়ি পাশ কাটিয়ে চলে যাব। অমরখানা ঘাটি এখন আমাদের দখলে। পদানত সে। তবুও তাকে সহজে ছেড়ে দেতে ইচ্ছে করে না। বিগত ছ' ছটা মাস অমরখানা আমাদের অধিকার করে ছিল প্রতিটি দিন ও রাতের অধিকাংশ সময়। তাকে ধিরেই ছিলো আমাদের যতোস্বচ্ছ অপারেশন। আমাদের সমস্ত চেতনায় অমরখানা এমনভাবে পৌঁছে ছিলো যে, এই এখন তার বুকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তার সবকিছু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেবার একটা প্রবল ইচ্ছে পেয়ে বসে। মনের পর্দায় ভেসে ওঠে নান ঘটনা একের পর এক।

সাহসী বাসারাত তার দলবল নিয়ে এসে একদিন এই মূল বাক্সারের সামনে দাঁড়ানো সেন্ট্রিকে হত্যা করে গিয়েছিলো। এই সেই বাক্সার, যাকে খৎস করার পরিকল্পনাসহ বি.এস.এফ.-এর ক্যাপ্টেন নারায়ণ সিং আমাদের পাঠানোর পরিকল্পনা করেছিলেন। এখান থেকে গিয়েই অমরখানা গ্রামের ওপারের রাস্তায় পাকবাহিনী আচমকা আক্রমণ করে আমাদের অকুতোভয় সহযোগ্য মতিয়ারকে হত্যা এবং জহিলকে আহত করেছিলো গুরুতরভাবে। অমরখানা ঘাটিকে বিভিন্ন সময়ে আমরা আঘাত করেছি। কখনো পাশ থেকে, কখনো পেছন থেকে। রাতের অঙ্ককারে। তাকে বিপর্যস্ত করতে চেয়েছি চোরাগোঁড়া হামলার ভেতর দিয়ে। যুদ্ধের সূচনায় বুধন মেঘারের বাড়িতে স্থাপিত পাকবাহিনীর লঙ্ঘরখানায় গ্রেনেড হামলা চালিয়ে হতাহত করেছি এদের অনেককে। এছাড়া এদের এখানে প্রতিদিন যেসব গাড়িবহর আসতো, তার চলাচল বন্ধ করার জন্য পেছনে ওঁ পেতে থেকে উড়িয়ে দিয়েছি সেগুলো। চেতনপাড়া ব্রিজ খৎস করেছি। টেলিফোনের তার কেটেছি, উড়িয়ে দিয়েছি টেলিফোনের থাম। রাতের অঙ্ককারে বহুবার আসতে হয়েছে অমরখানায়।

ভয়াবহ বিপদ আর জীবনের ঝুঁকি মাথায় নিয়ে। নিজেও মরতে মরতে বেঁচে গিয়েছি ক'বার
সামান্যর জন্য। এখনো বাঁ পায়ে আঘাত বয়ে বেড়াচ্ছি। মাত্র ক'দিন আগে এক আক্রমণ
অভিযানে এখানে এসে। আহত হয়েছে আরো অনেকেই। এদের মধ্যে শুরুতর আহত
সফিক এখনো শয়ে আছে বাষ্পডোগড়া কৃষ্ণাঙ্গ মিলিটারি হাসপাতালে।

সেই বিভীষিকা আর ভীতির রাজ্য অমরখানা এখন মুক্ত। শক্ত নেই। পলাতক। কিন্তু
তাদের পরিত্যক্ত বাস্তারের ধূসংস্থাণ সারি দগদগে ঘায়ের মতো জেগে আছে। অসংখ্য
উন্মুক্ত ট্রেক্স, রাস্তার নিচ দিয়ে অঞ্চলীকা সর্পিল বুক সমান ক্রলিং ট্রেক্স, সবকিছুই যেনো হঁ
করে আছে। চারদিকে দীঘিদিনের যুদ্ধের ক্ষতচিহ্ন। মাটি ফেটেফুটে চৌচির, রাস্তার পাশে
বেড়ে-ওঠা ঘাসসহ বুনো লতাগুলু পর্যন্ত পুড়ে লাল হয়ে গেছে। শত শত গর্তের সৃষ্টি
হয়েছে মর্টার আর কামানের গোলার আঘাতে। কী প্রচণ্ড যুদ্ধের ভার বইতে হয়েছে
অমরখানার এই যুদ্ধের ক্ষত মুছে যেতে বেশ সময় লাগবে।

বাতাসে কেমন একটা পচা গুৰু। পাশপাশে কোথাও হয়তো কারো গলিত লাশ পড়ে
আছে। মাত্র দু'দিন আগে জায়গাটা ছেড়ে গেছে পাকবাহিনী। রেখে গেছে তারা তাদের
অত্যাচার আর নৃশংসতার টাটকা স্মৃতি। আমরা একটা পরিত্যক্ত যুদ্ধক্ষেত্র, একটা পুরোপুরি
ধূসংস্থুল, পোড়া মাটি, প্রজ্বলিত ঘাস আর গাছপালার ভেতরে দাঁড়িয়ে আছি। পাকবাহিনীর
এই সেই গর্বিত ঘাঁটি, এখন যা পদানত। আমরা সেই স্থানে অমরখানার বুকে দাঁড়িয়ে
আছি।

ক্ষেত্র

ক্ষেত্রে এসে পৌছতে প্রায় সাড়ে দশটা একশতাচাহিনো বেজে যায়। তবে ক্ষেত্রের রিসিপশনটা
ভালো হয় না। চৈতন্যপাড়া বিজের ক্ষেত্রে পৌছতেই পাকবাহিনীর কামান আর মর্টার
আক্রমণের মুখোমুখি হতে হয়। ক্ষেত্রের গোলা আসতে থাকে এবং সেগুলো সশব্দে ফাটতে
থাকে আমাদের আশপাশে। ক্ষেত্রে, আত্মরক্ষার সহজাত প্রবৃত্তি থেকে দ্রুত রাস্তার পার্শ্ববর্তী
বোপজঙ্গলে গিয়ে অবস্থান নিতে হয়। কামান-মর্টারের গোলা উড়ে আসছে তখনো,
বিক্ষেপিত হচ্ছে মাটি কঁপিয়ে প্রচণ্ড শব্দ তুলে। দু'কানে হাতের তালু ঢেকে মাটিতে বুক
লাগিয়ে শয়ে থাকি। হৃৎপদ্মনের দ্রিমি দ্রিমি ড্রাম বেজে চলে দ্রুত তালে। মৃত্যুবাণের মতো
ছুটে আসা শেলগুলো যেনো এই বুঝি মাথার ওপরে এসে পড়লো। পড়লো গায়ের ওপরে।
আশপাশে সেগুলো তখনে সমানে ফেটে চলেছে। বাতাস প্রকশ্পিত করে। জায়গাটা নরকে
পরিণত হয় কিছুক্ষণের ব্যবধানেই। পোড়া বারুদের গুৰু আর ধোয়ায় বাতাস ভারি হয়ে
ওঠে। প্রায় আধা ঘণ্টা ধরে চলে পাকবাহিনীর এ ধরনের গোলন্দাজ আক্রমণ। তারপর
থেমে যায়। বিপদের আশঙ্কা আপাতত কেটে যায়। স্বত্ত্ব ফিরে আসে মনে।

যুদ্ধের মাঠে মৃত্যু স্বরূপ ডাল-ভাতের মতোই ব্যাপার। কিন্তু কপালে যদি মৃত্যু না থাকে,
তবে যুদ্ধের তাওবালীর ভেতরেও দিব্য বেঁচে থাকা যায়। আমরা এখানে পৌছনো মাত্র
পাকবাহিনীর কামান আক্রমণ শুরু হয়। আমরা রাস্তার নিচে যে যেখানে পারি শয়ে থাকি
ছড়িয়ে-ছিটিয়ে। আশপাশে, সামনে-পেছনে বৃষ্টির মতো গোলা এসে পড়ে, ফাটে, কিন্তু
আমাদের কামৰই কিছু হয় না। কামান ও মর্টারের গোলা সম্পর্কে যুদ্ধের মাঠে চলতি
কথাটা এ রকমের, 'তোমার পিঠের ওপর যদি গোলা এসে না পড়ে, তাহলে তুমি বেঁচে

যাবে আর তোমার যদি কপাল নেহায়েত মন্দ হয়, তাহলে গোলা এসে ঠিক তোমার পিঠে
পড়বেই।'

যাক, কামান-যুদ্ধ শেষ হলে আমরা হাঁফ ছেড়ে বাঁচি। কুকনো জায়গা থেকে বেরিয়ে
সোজা চলে আসি আবার ফাঁকা রাস্তায়। এই রাস্তার সোজাসুজি প্রায় মাইলখানেকের
ভেতরেই জগদলহাটে পাকবাহিনীর বর্তমান ডিফেন্স লাইন। আমাদের ফ্রন্ট লাইন সামনে।
সেটা যে কোথায়, বোৰা যাচ্ছে না।

বিজের এপারে রাস্তার ঢালে আমরা ছাড়িয়ে-ছিটিয়ে বসি। ঠিক এই সময় একজন
ই.পি.আর-এর নায়েব সুবেদার হস্তদণ্ড হয়ে কোথা থেকে ছুটে এসে আমাদের সামনে
দাঁড়িয়ে পড়েন। বয়স্ক মানুষ। যেনো ক্ষেপে আছেন। তার গলার ব্র বৃক্ষ। ব্যবহার
নিরুত্তাপ। কোনোরকম সংঘাষণ ছাড়াই তিনি বলতে থাকেন, ইয়ানো আফনেরা কথজন
আইছেন, নম্বর কল কুইক?

জিগ্যেস করি, নম্বর দিয়ে কী করবেন?

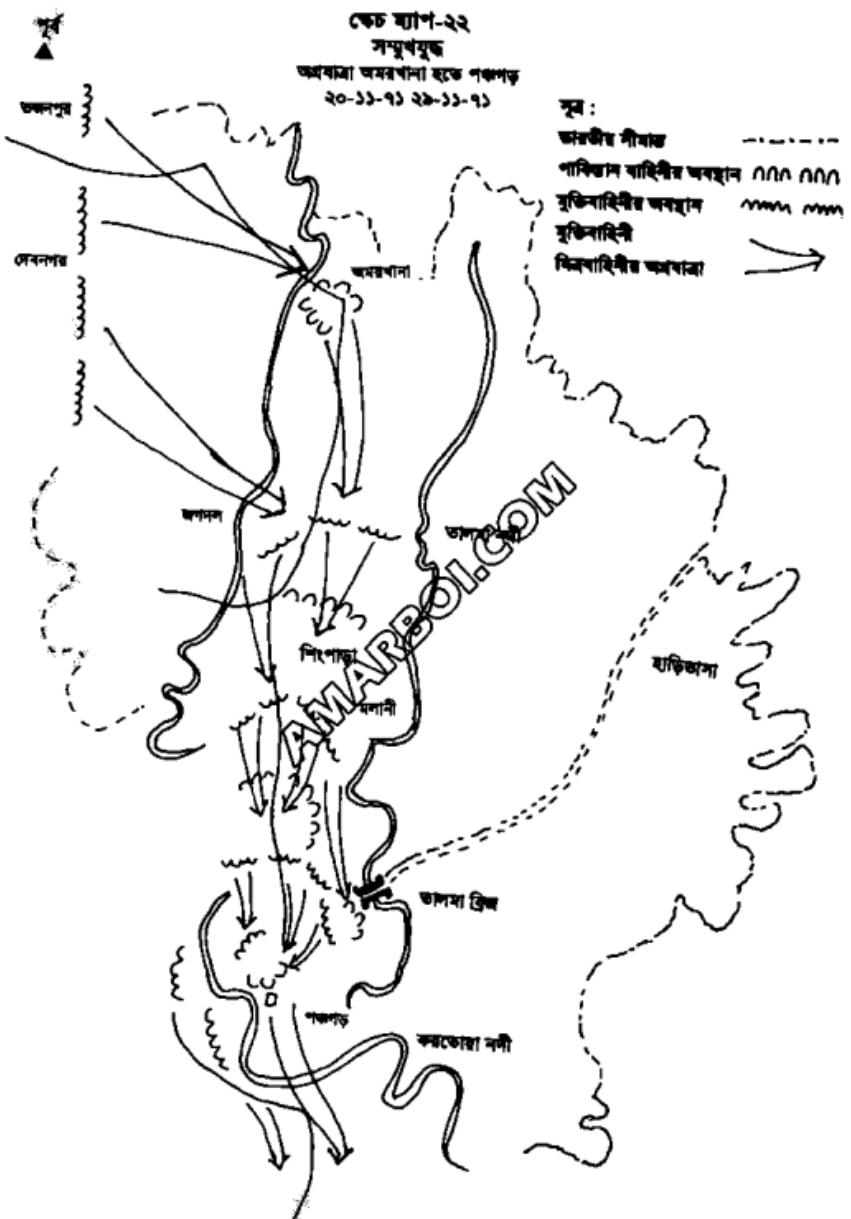
অঙ্গুলোক এ কথায় যেনো রেগে যান। চোখ দুটো লাল করে বলেন, আফনেরা নতুন
আইছেন, লঙ্গুলখানায় হিসাব দিতে হইবো। এখন আফনেরা নাও খাইতন নঃ কল, যুদ্ধি
নম্বর কল!

তাঁকে আমাদের মোটসংখ্যা জানিয়ে দিই। তিনি ছিলেন চলে যান পেছন দিকে।
কিছুক্ষণের মধ্যেই দুঁজনকে হাতে ডালা ও টিন বুলিয়ে আসতে দেখা যায়। তারা আমাদের
প্রত্যেকের হাতে দুটো করে ঝুঁটি ধরিয়ে দেয়। ঝুঁটির সঙ্গে দেয় ঘন করে রাঁধা বুটের
ডালও। নিজের নিজের জায়গায় বসে মিটি মেটি শৰীর মেলে ধরে আমরা সেই ঝুঁটি আর
ডাল পেটে চালান করতে থাকি।

আমাদের রিপোর্ট করার কথা ভৱিষ্যতে শাহরিয়ারের কাছে। এখানে ফ্রন্ট লাইনের
পেছনে নানা কাজে সবাই ব্যস্ত রয়েছে তখন। কেউই ঠিক ঠিক করে বলতে পারে না
ক্যাটেনের অবস্থান কোথায়। ফ্রন্টের সবাইকে মুসার তত্ত্বাবধানে বসিয়ে রেখে পিন্টুকে
নিয়ে আমি সামনের দিকে এগোই। উদ্দেশ্য, ক্যাটেনকে খুঁজে বের করে এটা তাকে
জানানো যে, আমরা এসেছি।

চৈতনপাড়া ব্রিজ পেরিয়ে সেই লাল স্কুলের কাছাকাছি আসতেই জানা যায়, ক্যাটেনের
ডাগ আউট হচ্ছে স্কুলের দালান ঘরের আড়াল ঘেঁষে মাটিতে ছাউনি দেয়া একটা গর্তের
ভেতরে। কিন্তু ক্যাটেনকে পাওয়া যায় না সেখানে। ডাগআউট পাহারারত তাঁর ব্যাটম্যান
জানায়, তিনি গেছেন ফ্রন্ট লাইন দেখতে। দেরি হবে তার আসতে। কী করিঃ সময়
কাটানো দরকার। আমরা দুঁজন মহুর আর অলস পা ফেলে লাল স্কুলের বারান্দায় এসে
বসি। বসি ঘাসের ওপর পা রেখে।

এই সেই চৈতনপাড়া লাল স্কুল। এর কাছাকাছি আসতে পারাটা ছিলো এক সময়
কতোখানি বিপজ্জনক। রাতের অক্ষকারে এক সময় কী ভয়ানক ঝুঁকি নিয়ে আসতে হয়েছে
আমাদের এই এখানে বারবার। অথচ এখন পিন্টু আর আমি দুই যোদ্ধা পাশাপাশি কী দিব্য
সুরী মানুষের মতো এর বারান্দায় পা ছাড়িয়ে বসে আছি। এ হচ্ছে সময়ের ফলাফল।
প্রবহমান সময় ঘটনাধারাকে কীভাবে দ্রুত পরিবর্তিত করে ভেবে অবাক হই!



শহীদ হাবিলদার সকিমউদ্দিন

কিন্তু যুদ্ধের ফলে নিরবেগ সময় কাটানোর অবসর কখনোই দীর্ঘস্থায়ী হবার সুযোগ থাকে না। এবারও তার ব্যক্তিগত হলো না। হঠাৎ করেই সমৃদ্ধবর্তী ফুট যেনে গর্জে উঠলো। প্রচণ্ড গোলাগুলি শুরু হয় জগদলহাটের দিকে। খবর আসে, অনেকটা বাতাসের বেগেই, সামনে এগিয়ে যাওয়া মুক্তিবাহিনীর একটা ফ্লিপের দলনেতা হাবিলদার সকিমউদ্দিন শক্তর সরাসরি গুলির আঘাতে মারা গেছে। হাবিলদার সকিমউদ্দিন। দুর্ধর্ষ সাহসী মানুষ। মুক্তিবাহিনীর সবার মধ্যে তার জনপ্রিয়তা ছিলো অসম্ভব কর্মের। তার মৃত্যুর খবরটা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে ফুট জুড়ে এবং পেছনের দিকেও। পেছনবর্তী লোকজনের ভেতরে শোকের ছায়া নেমে আসে। সকিমউদ্দিনের জন্য আহাজারি করতে থাকে সবাই।

মুক্তিবাহিনী আর মিত্রবাহিনীর যৌথ একটা দল এগিয়ে গেছে পাকা সড়কের পাশ দিয়ে। পাকবাহিনীর সাথে যুক্তে আটকেপড়া মুক্তিবাহিনীর দলটার সাপোর্ট হিসেবেই এগিয়ে গেছে এই যৌথ বাহিনীটি। তাদের লক্ষ্য সকিমউদ্দিনের লাশটি উদ্ধার করে নিয়ে আসা। পাশাপাশি পাকবাহিনীর ওপর প্রতিশোধমূলক আক্রমণ চালিয়ে তাদের একটা উচিত শিক্ষা দিয়ে আসা। এই নিয়ে জগদলহাটে ঘোরতর যুদ্ধ চলছে। স্কুলঘরের ওপর দিয়ে গুলির দ্রোত বাতাস কেটে কেটে যায়। আমরা এর মধ্যেই বসে থাকি স্কুলের বারান্দায়। বসে বসে কোথায় ফুট লাইন, তার অস্তিত্ব খুঁজে বের করবার চেষ্টা করি। কিন্তু শুধু জগদলহাটের কাছাকাছি রাস্তা ছাড়া আর কোথাও গোলাগুলি চলে না। সেস্বত্ত্ব ফুট চুপচাপ থাকে।

এই রকম অবস্থায় হঠাৎ করেই পাকা সড়কের ওপর দিয়ে দৌড়াদৌড়ি, হোটাচুটি শুরু হয়ে যায়। মিত্রবাহিনীর একটা দল পাকা সড়কের পাশে দিয়ে ফুলের মাঠ বরাবর। তাদেরকে দুটো ট্রেচার দ্রুত বহু করে নিয়ে আসতে দেখা যায়। ট্রেচার দুটোয় দু'জন আহত সৈনিক। তারা সামনে এসে দেখা যায়, ট্রেচারে নিজীব হয়ে ওয়ে আছে গুলিবিদ্ধ হয়ে গুরুতর আহত আরু মৃত্যুপ্রাপ্ত দু'জন সৈনিক। রক্তে রক্তে ভেসে যাচ্ছে তাদের শরীর। ট্রেচারের নিচ দিয়ে প্রেক্ষণ রক্ত চুইয়ে চুইয়ে পড়ছে মাটিতে। ট্রেচার বহনকারী সৈনিকেরাও ধর্মান্তর কলেবরে দ্রুত হাঁটছে। তাদের চোখে-মুখে গভীর উদ্গের ছাপ।

রক্ত আৰ মৃত্যুৰ রাজ্য

সামনে দিয়ে দু'জন মৃত প্রায় গুলিবিদ্ধ সৈনিককে বহন করে নিয়ে যাওয়া আৰ তাদের তাজা লাল রক্ত ট্রেচারের কাপড় ভেদ করে মাটিতে চুইয়ে পড়ার এই দৃশ্যটা চোখেপড়া মাত্র জ্ঞেয়াবার উপকৰণ হয়। চোখে আঙুল দিয়ে যেনে দেখিয়ে দেয়, চলমান যুদ্ধের কঠিন-কঠোর বাস্তবতার অনুরূপটাকে।

একসময় জলপাই রঙের ইউনিফরমধারী মিত্রবাহিনীর সৈনিকেরা তাদের আহত সাথীদের নিয়ে দ্রুত চলে যায় পেছনের দিকে। জগদলহাটে যুদ্ধের গোলাগুলি তখনে চলছে সমান গতিতে। খণ্ডের ধর্মই এই। একবার শক্তর সাথে যুক্তে আটকে গেলে তার থেকে সরে আসা সত্যিই মৃশকিলের ব্যাপার। মিত্রবাহিনীর দলটি গিয়েছিলো মুক্তিবাহিনীকে সহযোগিতা কৰার জন্য। গিয়েছিলো উভয় ফ্লেটের মাঝাখানে পড়ে থাকা হাবিলদার সকিমউদ্দিনের মৃতদেহ আৰ তার হাতিয়ারটা উদ্ধার করে আনবার জন্য। সেই সাথে পাকবাহিনীকে একটা প্রচণ্ড প্রত্যাঘাত কৰার পরিকল্পনাও ছিলো। কিন্তু সকিমউদ্দিনের মৃতদেহ তারা উদ্ধার করে আনতে পারলো

না । পরিবর্তে মিত্রবাহিনীর দুঁজন সদস্য গুলিবিদ্ধ হয়ে শুরূতর আহতাবস্থায় ট্রেচারে মৃত্যু
শয়ে ফিরে এলো । চোখের সামনে ঘটে যাওয়া এসব দৃশ্য সহ্য করা কঠিন । ট্রেচার চুয়ে
মাটিতে পড়ে ভাজা লাল রক্ত, এ দৃশ্যটা পেঁপে যায় মুহূর্তে বুকের গহন গভীরে । মনে হয়,
সত্যিকার অর্থে আমরা যুদ্ধক্ষেত্রে এসে পড়েছি । এসে পড়েছি রক্ত আর মৃত্যুর রাজ্যে ।

শরীর একেবারে খিম মেরে ছিলো । না, এখানে ইহতাবে এরকম খোলামেলা জায়গায় বসে
থাকা ঠিক না । তা ছাড়া, আর বসতেও ইচ্ছে করছে না, অন্তত দুই সৈনিকের ভূতে আহত
হওয়ার দৃশ্যটা দেখার পর থেকে । পিন্টুর অবস্থাও অনেকটা আমারই মতো । ও যেনো বোবা
বনে গেছে । ওর গায়ে একটুখানি ঝাঁকুনি দিয়ে তাই উঠতে বলি । তারপর দুঁজন হাঁটতে
হাঁটতে ফিরে আসি আগের জায়গায়, মুসা আর অন্য ছেলেরা যেখানে অবস্থান নিয়ে আছে ।

মুসার পাশে ঘাসের ওপর কেবল বসেছি, আর তখনি শুরু হয় নতুন করে কামান
আক্রমণ । এবারকার আক্রমণের প্রচণ্ডতা অত্যন্ত ভয়াবহ । পরিস্থিতির মুখে তাই দ্রুত
ছেলেদের নিয়ে রাস্তার পাশে বোপজঙ্গলের ভেতরকার একটা খাদেগার্তে আশ্রয় নিলাম ।
এই সময় বিকট শব্দে পেছনে একটা গোলা ফাটলো । মাথা তুলে যে দৃশ্য দেখা গেলো,
সেটা অবগন্নীয় । চারজন পেছন দিককার লঙ্গরখানা থেকে কাঁধে ভার বুলিয়ে তৈরি খাবার
নিয়ে যাচ্ছিলো ফ্রন্ট লাইনে অবস্থানে থাকা যোদ্ধাদের জন্য । শেলটা দিয়ে পড়ে ঠিক তাদের
মাথার ওপর । মুহূর্তে শেলের সেই বিক্ষেপণের সাথে ছিন্নিছে হয়ে গেছে মানুষ চারজন ।
চারদিকে ছাড়িয়ে পড়েছে ভাত-তরকারি । খুলোবালি শুরু মাটিতে সবকিছু একাকার হয়ে
যায় । অসহ, অসহ্য একটা দৃশ্য ।

সম্মুখ্যদের প্রথম অভিজ্ঞতা দারুণভাবে অসম্ভাব্য করে, কাঁপিয়ে তোলে মনের
ভেতরে পুষ্পে রাখা সাহসটাকে । তখনো পুষ্পে ধৰনি তুলে শেল আসছে তো আসছেই ।
প্রচণ্ড শব্দ তুলে ফাটছে সেগুলো সামনে পেছনে চারদিকে । বুকের নিচেকার মাটি কেঁপে
কেঁপে উঠছে । কানে তালা লাগবাবু যেগাড় । ধোয়া, কাদা-মাটি আর বারুদের গন্ধ, সবকিছু
মিলিয়ে যেনো চেতনাকে লোপ করে দেয় । এক একটা বোমা ছুটে আসে আর মনে হয়, এই
বুঝি পড়লো সেটা মাথার ওপর । পেটের ভেতরটা কেমন কুঁকড়ে ওঠে, বুকের ভেতরটা
ফাঁকা হয়ে যায়, গলার কাছে উঠে আসতে চায় যেনো একটা কিছু । নিখাস বৰ্ক হয়ে
আসতে চায় । পিঠের শিরদাঙ্গায় একটা শিরশিরে অনুভূতি । একটা বোমা কাছে-পিছে কিংবা
দূরে কোথাও বিক্ষেপিত হয় । মনে স্বন্তি জাগে, যাক বাঁচা গেলো । কিন্তু পর মুহূর্তেই আর
একটা বোমা ধেয়ে আসে । আবার সেই অনুভূতি । শরীরের নার্ভগুলো টানটান হয়ে যায় ।
হার্টবিট বেড়ে যায় বহুগুণে ।

আমাদের অবস্থান বিপজ্জনক হয়ে উঠে । এখানে থাকলে বোমার হাত থেকে রেহাই নেই ।
এমন বৃষ্টির মতো আসছে বোম একের পর এক । ছেলেদের দ্রুত আরো ডান দিকে
বোপজঙ্গলের গভীরে যাবার নির্দেশ দিই । রাস্তার ডান দিকে প্রায় চারশো গজের মতো দূরত্বে
পৌছে সবাইকে অবস্থান নিতে বলি খানাখন্দের ভেতর । একটা পচা গঙ্কযুক্ত ঝেঁদো গর্তের
ভেতরে অবস্থান নিই । পিন্টু আর আমি পাশাপাশি । চারদিকে বড়ো বড়ো জঙ্গুলে গাহগাছালি ।
ঘন লতাপাতায় ছাড়া অঙ্ককারাছন্ন জায়গাটা । গর্তের ভেতরে সামান্য শ্যাঙ্গলাযুক্ত পানি ।
পানির কিনার ঘেঁষে পা ছাড়িয়ে ওপরের দিকে মুখ করে উঠে থাকি । আর উদিকে নানা ধরনের
পোকামাকড় কিলবিল করে করে চলে যায় শরীরের ওপর দিয়ে । মশার ঝাঁক ছেকে ধরে ভলভল

শব্দ তুলে। বুকের নিচে স্যাতসেতে ভেজা মাটি। একেবারে অস্থান্তর গা ঘিন ঘিন পরিবেশ। হোক, তবুও তো বোমার হাত থেকে দূরে সরে আসা গেছে। আগের ছেড়ে আসা জায়গা বরাবর বোমার তাওকলী চলছে সেভাবেই। এদিকটায় বোমা পড়ছে না। নিরাপদ। কিন্তু কতোক্ষণ নিরাপদ থাকবে বোমা মুশকিল। আপাতত এখানেই ভেজা মাটিতে বুক লাগিয়ে পড়ে থাকি। ছেলেরা সব পেছনে। যার ধার মতো সবাই তাদের নিরাপদ অঞ্চল বেছে নিয়েছে।

ভাইয়া ইয়ে জঙ্গ কিছকা লিয়ে

পেছন থেকে একটা খসখস শব্দ ডেসে আসে এই সময়। মনে হয় শুকনো বারাপাতা মাড়িয়ে কেউ যেনো এদিকে আসছে। পিন্টুকে ঝোঁচ দিয়ে সতর্ক হয়ে উঠি। টেনগান্টা হাতে নিয়ে তাক করে ধরে ট্রিগারে আঙুল বসিয়ে অপেক্ষা করি আগত শক্তির জন্য। না, শক্ত নয়। সরীসূপের মতো বুকে হেঁটে মিন্দাবাহিনীর দুই সৈনিক এসে গুটিসুটি মেরে অবস্থান নেয় পিন্টু আর আমার দু'পাশে। বোমার হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য তারাও চলে এসেছে এই ঝোপঝাড় জঙ্গলের গভীরে আমাদের মতো। ওরাও আমাদের মতো নিরাপদ জায়গায় মাটির সাথে মিশে গিয়ে বোমার নাগালের বাইরে থাকতে চাচ্ছে।

সৈনিক দু'জন আমাদের পাশে অবস্থান নিতে পেরে যেনো কিছুটা ব্রষ্টি পেয়েছে। মুখে তাদের বিন্দু হাসি। পকেট থেকে একজন চারমিনার স্ট্রিপ্পেট বের করে। এগিয়ে দেয় আমাদের দিকে। তাদের আঞ্চলিক টানে দুর্ভেদ্য হিন্দিতে আলাপ জমানোর চেষ্টা করে।

একজন ফিসফিসিয়ে জানতে চায়, ভাইয়া ইয়ে জঙ্গ কিছকা লিয়ে? প্রথমে বুঝতে পারি না কি বলছে সৈনিকটি। ভাই জিগ্যেস করি, ~~কেন্দ্ৰী~~ বোলতা হ্যায়?

— ইয়ে জঙ্গ কিছকা লিয়ে ভাইয়া?

আমি পিন্টুর দিকে তাকাই। পিন্টু আমাকে দেখে। হেসে ফেলি দু'জনই।

আর সে অবস্থাতেই পিন্টু বলে ঝামড়ায় কয় কি মাহবুর ভাই? যুদ্ধ কইবাবার আসি ফির জাইনবাবার চায় ইয়ে জঙ্গ কিস্মত হ্যায়? কোটে থাকি আসিল এমরা?

আমারও অবাক লাগে ব্যাপারটাতে। ওরা যুদ্ধ করতে এসেছে ক্রটে। কিন্তু কিসের জন্য এই যুদ্ধ, সামান্য এই জ্বানটুকু এদের নেই। মনে মনে ভাবি ভারতীয় সৈনিক এরা। এদের শুধু যুদ্ধ করতেই তৈরি করা হয়, যুদ্ধ কৌশল শেখানো হয়। কিন্তু কোনো রাজনীতি শেখে না এরা। শেখানো হয় না। রাজনীতির কোনো চৰ্চা নেই ভারতীয় সেনাবাহিনীতে। রাজনীতি নিয়ে এরা মাথাও ঘায়ায় না। মাতৃস্বীকৃত রক্ষা করার জন্য শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই, এটাই এদের মূলমূল হিসেবে শেখানো হয়। ভারতীয় সেনাবাহিনী দেশের রাজনীতি থেকে দূরে থাকে। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করে না কখনো। অথচ পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর পাশাপাশি তুলনা করলে দেখা যায়, পাকবাহিনীর মধ্যে রাজনীতি চৰ্চা কি মারাত্মকভাবে চুকে গেছে। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করে এরা দেশের রাজনীতি নিয়ে কী দারুণ খেলাটাই না খেলছে। সেই '৫৮ সালে আইয়ুব খান মার্শাল ল' জারি করে পাকিস্তানের রাজনীতিতে সেনাবাহিনীকে নিয়ে এলেন, সেই থেকে কী ন্যাক্তারজনকভাবে তারা ক্ষমতাকে আঁকড়ে ধরে আছে। আইয়ুব গেলো, ইয়াহিয়া গেলো। নির্বিচিত সংখ্যাগরিষ্ঠ দল আওয়ামী লীগকে ক্ষমতা না দিয়ে সারাদেশে টিকা থানকে দিয়ে নিষ্ঠুর হত্যাক্ষেত্র চালিয়ে আজকের এই যুদ্ধের অবতারণা করলো। এখন পাকিস্তান রক্ষার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে উদ্দিপনা জেনারেলুরা। কিন্তু তারা কি আর পারবে? অসম্ভব।

সৈনিক দুটির এ যুদ্ধ সম্পর্কে নিরীহ প্রশ্ন এটাই প্রমাণ করে, তাদের সেনাহাউনি থেকে সরাসরি এনে এই যুদ্ধে নিয়োগ করা হয়েছে। যুদ্ধ তাদের চিরশক্ত পাকবাহিনীর সাথে, কেবল এইটুকু তারা জানে। কিন্তু কেনো এই যুদ্ধ, এ কথাটা তাদের জানানো হয় নি। আর তাই তো, যুদ্ধের মাঠে, বোমার ড্যাবহ বিস্ফোরণের অধ্যে এরা নিজেদের সন্তুষ্টির জন্য জানতে চায়, এ যুদ্ধটা যে লেগেছে, সেটা কীসের জন্য।

কী জবাব দেবো এর? সেতো অনেক কথা। পেছন থেকে শুরু করে আজকের যুদ্ধের এই মূহূর্ত পর্যন্ত অনেক শোষণ, বঞ্চনা, অত্যাচার আর একনায়কী ব্রেচ্ছাচারী শাসনের লম্বা কাহিনী বলতে হয়। বলতে হয় বাঙালি জাতির স্বাধিকার আন্দোলনের সংখ্যামূল্যের কাহিনী। ঠিক এখন এই মূহূর্তে এভো সব কথা বলা যাবে না।

পিন্টুকে তাই উক্তে দিয়ে বলি, পিন্টু তুমিই বুঝিয়ে দাও এদের, কেনো এই যুদ্ধ।

আমার কথা শুনে পিন্টু তার হাতে ধরা সিগারেটে কষে লস্বা একটা টান দিয়ে তার নিজস্ব স্টাইলে বলতে থাকে, পাকিস্তান হ্যায়, বাঙালিকা শোষণ করতা হ্যায়, অত্যাচারী ইয়াহিয়া খান হ্যায়, হারামি পাকবাহিনী হ্যায়, শেখ মুজিব বঙ্গবন্ধু হামারা নেতৃ হ্যায়। উন লোগ স্বাধীনতার ডাক দিয়া, জয় বাংলার ডাক দিয়া, হামলোগ জয় বাংলা করে গা, বাংলাদেশ স্বাধীন করে গা....।

পিন্টুর হিন্দি-বাংলায় মেশানো অবর্গল বলে যাওয়া শিল্পিক মার্কা বর্ণনা সৈনিক দুঁজন চোখ বড়ো বড়ো করে শোনে। কী বোঝে, কতোদূর বেঢ়ে তারাই জানে। তবে কথা বলার সময় তারা বোঝার মতোই বলে, আচ্ছা! আচ্ছা! ইচ্ছ তৈয়ে ইয়ে জঙ্গ!

সৈনিক দুঁজন যে খুবই নিরীহ আর সোজা স্টীল মানুষ, সেটা সহজেই বোঝা যায়। এন্দে ডোবার পার্শ্ববর্তী এই জঙ্গলাকীর্ণ পরিবেশে স্থায়োদ্ধা হিসেবে আমাদের পাশাপাশি অবস্থানে তাদেরকে পেয়ে ভালোই লাগে। ৭-মার্কিন রেজিমেন্টের সৈনিক এরা। মিত্রবাহিনীর সৈনিকরা এখন পেছন পেছন আসছে মুক্তিবাহিনী। এখন পর্যন্ত মুক্তিবাহিনী রয়েছে সম্মুখসমরে। তাদের পেছনে মিত্রবাহিনী। পিন্টু লাইনে পুরো যুদ্ধই চালিয়ে যাচ্ছে মুক্তিবাহিনী ভিনটি ই.পি.আর. কোম্পানির সমর্থন নিয়ে পাকবাহিনীর একেবারে সামনাসামনি অবস্থানে থেকে। এ ফ্রন্টের মুক্তিবাহিনীর একমাত্র মৰ্টার ইউনিট মুজিব ব্যাটারি পেছন থেকে সাপোর্ট দিয়ে যাচ্ছে। মিত্রবাহিনী তাদের আর্টিলারি সাপোর্ট দিয়ে যাচ্ছে কার্যকরভাবে। এখনো এরা সরাসরি যুদ্ধে নামে নি। আসন্ন দিনগুলোয় নামবে কি না, কে জানে?

অঘৰ্ষণী লাইন

দুপুরের পর পাকবাহিনীর গোলন্দাজ হামলা পুরোপুরি থেমে যায়। শান্ত হয়ে যায় ফ্রন্ট। আমরা ধীরে ধীরে আবার ফিরে আসি পাকা রাস্তার কাছে। মারাঠা সৈনিক দুঁজন বিদায় নিয়ে চলে যায় পেছনে তাদের অবস্থানের দিকে। এখনো ফ্রন্ট লাইনের খৌজ পাওয়া গেলো না, ওখানে পৌছে ক্যাটেনের কাছে রিপোর্ট করা গেলো না বলে মনের ভেতর একটা অস্ত্রিতা দাপাদাপি করতে থাকে। পাকবাহিনীর কামানের গোলার হাত থেকে বাঁচাবার জন্য সকাল থেকে কেবল ছেটাছুটি করেই ফিরছি। সদরদিন সাহেবেরও এখন পর্যন্ত কেনো পাস্তা নেই। কী করবো, কোথায় যাবো ছেলেদের নিয়ে, এই দুর্চিন্তা কেবলই হানা দিয়ে ফেরে দ্রুত অপস্থান দিনের সাথে সাথে। ফ্রন্টের পুরো ব্যাপারটা না বুঝে কোথাও যাওয়া

ঠিক না, এ সিদ্ধান্ত নিয়ে রাস্তার পাশে ঘাসের ওপর পড়ত সূর্যের রোদে শরীর মেলে দিয়ে বসে থাকি অধীরে অপেক্ষা নিয়ে। এখন অপেক্ষা করে থাকা ছাড়া কোনো উপায় নেই। এখানে যথন এসে পৌছেছি, তখন ডাক আসবেই ফ্রন্টে যাবার।

ভারবাহী চারজনের গোলার আঘাতে ছিঁড়িয়ে হয়ে যাবার দৃশ্যটা মনে পড়ে বাববার। কী বীভৎস সেই মৃত্যু! কিন্তু সেই সাথে পাশাপাশি আর একটা চিন্তা এসে মনের ভেতরে হানা দিতে থাকে। খাদ্যবাহী লোক চারটি তো নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলো, এখন ফ্রন্ট লাইনের খাদ্য সরবরাহের কি হবে? ওরা মারা যাওয়ার ফলে ফ্রন্ট লাইনে আজ খাদ্য পৌছুতে পারে নি। তাই ফ্রন্ট জুড়ে সবাই আজ দুপুরে না খেয়ে রয়েছে। কী অঙ্গুত ব্যাপার! খাদ্য সরবরাহ না হওয়ায় সারা ফ্রন্টই অঙ্গুত। এখন রাতে ছাড়া খাদ্য পৌছুবে না তাদের কারুরই কাছে। তাদের এভাবে না খেয়ে থাকার ব্যাপারটা সহজে মেনে নেয়া যায় না। কিন্তু এছাড়া এখন করণীয়ই-বা কী?

ফ্রন্টে খাবার পৌছানো একটা ঝুঁকিপূর্ণ আর কষ্টকর কাজ। এ কাজটা করতে হচ্ছে ফ্রন্টের পেছনে পেছনে এগিয়ে আসা চলমান লঙ্ঘনবানাকে। আর যে খাবার যুক্তের মাঠে দেয়া হয়, সেটা যোদ্ধাদের উপযুক্ত খাবার নয়। ভাত-মাংস কিংবা ডাল-কুটি নিয়মিত খাদ্য। ফ্রন্টে এই খাদ্য পৌছানোর কায়দাটাও অভিনব। কয়েকটা ভারবাহী মানুষের কাঁধে ভাতের ডালা আর কেরোসিনের টিনে করে তরল তরকারি যোদ্ধাদের খাদ্য হিসেবে পাঠানো হয়। এই পাঠানোর কায়দাটাও একেবারে সন্তানী। গ্রাম্যভূমির সাধারণ শাস্তিপূর্ণ দিনে কোনো গৃহস্থ তার জমিতে কর্মরত কামলাদের জন্ম প্রিভাবে ডালায় করে ভাত আর বালতিতে করে তরকারি-ডাল এসব পাঠায়, ঠিক ভেটানিভাবেই ফ্রন্টে খাদ্য সরবরাহ করা হয়ে থাকে। আসলে এছাড়া অন্য কোনো পদ্ধতি নেই। মুক্তিবাহিনী তো এমন সচল ধৰ্মী কোনো দেশের নিয়মিত সেনাবাহিনী নয় যে, দিনেরাতে যুক্ত নিয়োজিত সৈনিকদের জন্য শুকনো সমৃদ্ধ খাদ্যভর্তি প্যাকেট ক্ষেত্রে প্রচলিতজাত করা খাবার সরবরাহ করা হবে। দেশ আর মাটি আমাদের। যুদ্ধটাও আমাদের। এখানে এই যুদ্ধের মাঠে নিজেদের সামর্থ্য অনুযায়ী খাদ্য খেয়েই আমাদের জ্যেষ্ঠন বেঁচে থাকতে হবে, তেমনি দেশকে স্বাধীন করার জন্যও যুদ্ধ করতে হবে। এটাই এখনকার বাস্তবতা।

বিকেলে সদরবাহিনি আসেন তাঁর সেই খোলা জিপ গাড়িতে করে। আমরা গাড়ির কাছে গিয়ে অ্যাটেনশন হয়ে তাঁকে সশ্বান দেখাই। মৃদু হেসে তিনি বলেন, কেমন লাগছে ফ্রন্ট?

তাঁর কথার জবাব দেয়া হয় না। ফ্রন্টে এসে যে ভয়াবহ অভিজ্ঞতা এরি মধ্যে হয়েছে, সহজ করে সেসব বলবার উপায় নেই। তাই চূঁপ করেই থাকি। তিনি আবার তাই জিগ্যেস করেন, ক্যাটেন শাহরিয়ারের সাথে দেখা হয়েছেঁ।

বলি, হয় নি, তিনি ছিলেন না।

— ঠিক আছে আসেন আমার সাথে, তাকে এখন পাওয়া যাবে। এই বলে তিনি সামনের দিকে এগোন। পিন্টু আর আমি তাঁর সাথে সাথে যাই। সাব-সেক্টর কমান্ডারকে দারকণ চিন্তাযুক্ত দেখায়।

বরাদ্দ হলো লেফ্ট ফ্ল্যাঙ্ক : ডোক্ট গিল অব পজিশন

ক্যাটেন শাহরিয়ার কুলঘরের দেয়াল ঘেঁষে মাটির তৈরি তার কমান্ড পোস্টে মহাব্যস্ত। ওয়ারলেসের মাধ্যমে তিনি ফ্রন্টের কমান্ডারদের সাথে একনাগাড়ে কথা বলে চলেছেন, দিয়ে

চলেছেন আদেশ-নির্দেশ। সাব-সেক্টর কমান্ডারকে দেখে তিনি তার 'ডাগ আউট' থেকে বের হয়ে এসে স্যালুট দেন। সদরবন্দিন তাঁর সাথে আমাদের পরিচয় করিয়ে দেন। হাত মেলান ক্যাপ্টেন আমাদের সাথে। তাঁর মুখে ঝাপ্পির হাসি।

সদরবন্দিন তাকে বলেন, দে আর ব্রেত ফাইটার্স। আই ব্রেট দেম ফ্রম ব্যাক। আই থিক দে উইল বি অ্যাবল টু সার্ভ আওয়ার পারপাস অ্যান্ড কভার আওয়ার ড্যামেজ। কালো ইউনিফর্মের মতো একটা শার্ট তাঁর গায়ে। মুখ দাঢ়ি-গৌফে আঙ্গুলিত। জাগরণ, মাত্রাতিরিক্ত পরিশ্রম আর যুদ্ধ পরিচালনার টেনশনে একেবারে বিশ্বস্ত অবস্থা ক্যাপ্টেনের। নিদারণ দৃষ্টিক্ষমতা আর অস্ত্রিগুণ দেখায় তাকে।

তিনি বলেন, আমাদের লেফ্ট ফ্লাইক নিয়েই সমস্যা। ড্যামেজ হয়েছে ওখানেই বেশি। ওদের কাউন্টার অ্যাটাক ওদিকে দিয়েই হতে পারে।

সদরবন্দিন বলেন, ওকে ইউ গিভ দেম লেফ্ট ফ্লাইক। ইমিডিয়েট পাঠান এদের সেখানে। লেট দেম হোল্ড দ্য পজিশন।

— ওকে স্যার, বলে ক্যাপ্টেন তার কথায় সায় দেন এবং তার ওয়াকিটকি সেটে ডেকে পাঠান বি কোম্পানি অধিনায়ক সুবেদার খালেককে।

ক্যাপ্টেনের সাথে আরো কিছুক্ষণ যুদ্ধ সংক্রান্ত ব্যাপারে কথাবার্তা বলে সদরবন্দিন আমাদের নিয়ে রাস্তায় উঠে আসেন। সামনে ফ্রন্টের দিকে তিনি কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকেন। তারপর হাত রাখেন আমার কাঁধে। তাঁর শ্বশের মধ্যে শুনুন্তব করি একটা গভীর আস্থা আর বিশ্বাসের উষ্ণতা। বিমান বাহিনীর পাইলট তিনি। কিন্তু এখন একটা পুরো ফ্রন্ট পরিচালনা করতে হচ্ছে তাঁকে ইনফেন্ট্রি অফিসার হিসেবে।

ঘূম নেই, এক মুহূর্ত বিশ্রাম নেই, একটি শক্তিধর পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে লড়তে হচ্ছে তাঁকে বিভিন্ন গ্রহের মুক্তিযোদ্ধা সমূহকে গড়ে ওঠা মুক্তিবাহিনীর সাহায্যে। এই বাহিনীর অধিকার্ণেই অপেশাদার সৈনিক দ্বারা একই একই কমান্ডের অধীনে নিয়ে এসে সুবিন্যস্ত এবং সংগঠিত করে যুদ্ধ পরিচালনা করতে গিয়ে তাঁকে গলদণ্ড হতে হচ্ছে। ফ্রন্ট লাইনে গোলাবারুদ ও অন্তর্শন্ত্র সরবরাহ অঙ্কুশ রাখা, খাদ্য ও অন্যান্য সরবরাহ নিয়মিত পাঠানো, পেছনে ফিল্ড হাসপাতাল পরিচালনা করা, স্ট্রোব্রেস সংরক্ষণ, লঙ্ঘরখনা পরিচালনা, কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহ যোগাড় করে নিয়ে আসার মতো হাজারটা সমস্যার সমাধান করতে হচ্ছে তাঁকে। এছাড়াও রয়েছে পেছন পেছন এগিয়ে আসা মিত্রবাহিনীর ইউনিটগুলোর সাথে সমর্থন বজায় রাখা। এ ধরনের সমস্যাবহুল সব কাজই করতে হচ্ছে বিমানবাহিনীর পাইলট সদরবন্দিনকে অত্যন্ত প্রারম্ভিক সঙ্গে।

আমার কাঁধে হাত রেখে ঝাপ্পি পাইলট বলেন, মাহবুব, আমাদের ওপর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি হয়েছে। গত রাতের যুদ্ধে ক্যান্ডায়েলটিজের সংখ্যা অনেক বেশি। সব থেকে বেশি শক্তিশালী হয়েছে আমাদের লেফ্ট ফ্লাইক। সুবেদার খালেকের কোম্পানির তুন্ড প্রাইন বিশ্বস্ত হয়ে গেছে প্রায়। দুর্বল এ জায়গা দিয়ে হয়তো এনিমি আজ রাতে আমাদের ফ্রন্ট লাইন 'ব্রেক ফ্রি' করার চেষ্টা করতে পারে এবং এটা করতে পারলে তারা আমাদের পেছনে এসে ফ্রন্ট লাইনকে ম্যাসাকর করে দেবে একেবারে। এটা হতে দেয়া যাবে না। আমার হাতে রিজার্ভ সৈন্য নেই সেখানে পাঠানোর মতো। তাই তোমাদের পাঠাচ্ছি। তোমাদের ওপর আমার আস্থা আছে। ডোন্ট গিভ আপ পজিশন। হোল্ড অন ইট অ্যাট আনি কষ্ট ইভেন ইফ ইট আর টু ডাই...।

— ইয়েস স্যার বলে সম্মতি জানাই প্রিয় কমান্ডারের নির্দেশের প্রতি ।

— শুভ লাক বয়েজ বলে তিনি তাঁর নিজের গাড়িতে গিয়ে উঠেন । দৌড়ে চলে তার গাড়ি পেছনদিককার দখল করা পাকা রাস্তার ওপর দিয়ে অমরখানা অভিযুক্ত । সেদিকে দৃষ্টি মেলে দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকি আমরা । শীতের বিকেল তখন দ্রুত ফুরিয়ে আসছে ।

সঙ্ক্ষ্যার অঙ্ককার ঘনিয়ে আসবার আগেই সমস্ত ফ্রন্ট লাইন জেগে উঠে । শুরু হয়ে যায় সামনাসামনি অবস্থানে থাকা দুই চৰম প্রতিপক্ষের মধ্যে প্রচণ্ড শুলিবিনিময় । রাস্তার আড়াল নিয়ে নিজেদের অবস্থানে চূপচাপ পড়ে থাকি আমরা । সঙ্ক্ষ্যার পর ডাক আসে হঠাতে করেই ক্যাপ্টেনের ডাগ আউট থেকে । সেখানে সুবেদার খালেক অপেক্ষা করছিলেন । ক্যাপ্টেন সুবেদারকে বুঝিয়ে দেন আমাদের অবস্থান কোথায় হবে এবং কী দায়িত্ব পালন করতে হবে ইত্যাদি । সেই সাথে তিনি সাব-সেন্টার কমান্ডারের নির্দেশও তাকে জানিয়ে দেন । এরপর তিনি ‘শুলাক’ বলে অয়ারলেস সেট নিয়ে তাঁর ফ্রন্টে নির্দেশ পাঠানোর কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েন । সুবেদারসহ তখন বেরিয়ে আসি আমরা মাটির গর্ত থেকে ।

তুলঘরের দালানের পেছনে কাঁচা রাস্তার লাগোয়া একটা বড়ো বাস্তারে ঢোকেন সুবেদার আমাদের নিয়ে । টিমটিমে একটা হারিকেন ঝুলছে বাকারটায় । গোলাগুলি আর অন্তর্পাতির একটা ভাণ্ডার এই বাস্তার । ৩/৪ জন সৈনিক অত্যন্ত ব্যস্ত এখানে গোলাগুলির মজুদ আর ফ্রন্টে সরবরাহ পাঠানোর কাজ নিয়ে ।

সুবেদার খালেক : অনভিপ্রেত পরিস্থিতি

আমাদের সাথে নিজস্থ হাতিয়ার এবং কিছু পেন্সিলস্টিল রয়েছে । ফ্রন্টের জন্য যা যথেষ্ট নয় । সুবেদার তাই হৃকুম দেন প্রত্যেককে শুলির প্রাঞ্চ মাথায় করে নিতে এবং এই নির্দেশ দিতে পিয়ে তাঁর অধস্তুত সৈনিকদের যেভাবে স্ট্রাচার দিয়ে থাকেন, এখানেও প্রয়োগ করেন সেই ভাষা । আর এতেই তুল করে বক্সেন সুবেদার । ছেলেরা কেউ আর তার নির্দেশমতো শুলির বাঞ্চ মাথায় তোলে না । দাঁড়িয়ে থাকে চূপচাপ । ব্যাপারটা দেখে সুবেদার এবার যেনো খেকিয়ে উঠেন, ইয়ানো আফনেরা কথা বুঝতন ন? কইতেছি শুলির বাঞ্চ মাথায় লইবার লাই নেন না কিয়ারে? ছেলেরা তেমনি চূপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে । তাকায় একবার আমার দিকে, একবার পিলুর দিকে । আমি হারিকেনের আলোয় সুবেদারকে দেখি । পঞ্চাশোৰ্ব বয়স । পরনে লুঙ্গি, থাকি শার্ট আর গরম সোয়েটার । গলায় মাফলার । চেহারার মধ্যে ভারিকি ভাব । মুখে কোমলতার বিদ্যুমাত্র ছাপ নেই । মানুষটা কেনো যে অতিমাত্রায় বিরক্ত, সেটা বুঝতে পারি না ।

তাঁর শেষ দিকে বলা কথাগুলো তনে নিজেকে আর সংয়ত রাখতে পারি না । ঠাণ্ডা নিরুত্তাপ গলায় তাকে শুধু বলি । আপনি আমাদের গোলাবারুদ আর রসদ বহনের কাজে লাগাতে চান নাকি? কিন্তু এর জন্য তো আমাদের ফ্রন্টে আনা হয় নি ।

আমার পিঠাপিঠি পিটুও বলে, আপনি কি আমাদের সিপাই ভেবেছেন নাকি যে ফ্রন্টে মাল টানার কাজে লাগাতে চান?

সুবেদার খমকে যান আমাদের কথায় । চোখ বড়োসড়ো করে তাকান । কর্মরত অন্য আর সৈনিকাও তাদের কাজ ফেলে দাঁড়িয়ে দেখতে থাকে ব্যাপারটা । সুবেদার এসব দেখে এবার যেনো তেলে-বেগুনে ঝুলে উঠেন, ফ্রন্টে যাইতে অইলে আঁৰ কথা শুনতে হইবো । জানেন আমি বি কোম্পানির কমান্ডার! ফ্রন্টে যাবার লগে আঁই বেয়াদপি সহ্য কইরতায় ন ।

তার কথা শনে আমি তখন বলি, সুবেদার সাহেবের আপনি কি জানেন আমি এই মধুপাড়া কোম্পানির কমান্ডার! ফ্রন্টে আপনার কথা শনতেই হবে একথা কে বললো? ঠিক আছে আপনাকে লাগবে না। আমরা সদরদফ্ন সাহেবের সাথে যোগাযোগ করে আমাদের পরিজনে চলে যাবো। আপনি যান নিজের কোম্পানি সামলান।

সুবেদার খালেক এবার যেনো একেবারে ঠাণ্ডা মেরে যান। কিছুক্ষণ বিম মেরে থাকেন। অভিজ্ঞতার পর অভিজ্ঞতায় পোড়-খাওয়া সৈনিক তিনি। মৃহূর্তে বুঝে ফেলেন তিনি পরিস্থিতিটা। তাই সামলে নেন নিজেকে। তারপর অনেকটা কমপ্লেক্সাইজের ভঙ্গিতে বলেন, ফ্রন্টে গোলাবারুদের ঘাটতি দেখা দিছে। আমরা এ্যাতোগুলান মানুষ যাইতাছি, অনেকগুলান গুলির বাক্স নেওন যাইতো। ইয়ানো কথাড়া ইয়ারলাই কইছি আমনেগোর। কলেজ ইউনিভার্সিটির ছাত্র আমনেরা অন্যভাবে নিয়েন না ব্যাপারড়।

— তাই বলেন, ভদ্রভাবে বলেন। রাগছেন কেনো আপনি?

— আঁর মাতা ঠিক নাই দাদু। মনে কিছু নিয়েন না। সুবেদার এবার কথা বলতে বলতে হেসে ওঠেন।

ছেলেদের তখন বলি, নাও তোলো, গুলির বাক্স যে যতোটা পারো। ফ্রন্টে গুলি তো আমাদেরও লাগবে।

গোলমালটা মিটে যায়। কিন্তু সুবেদারের রাগ পড়ে কিস্টিক বুঝতে পারি না। ছেলেরা যে যতোটা পারে গোলাগুলির ছোটো বড়ো টিনের বস্তু হাতে ঝুলিয়ে কিংবা কাঁধে তুলে নেয়। আমিও ৮/১০টা গুলির বিন্দি কস করে বুকের দৃশ্যাশে ঝুলিয়ে নিই। পিন্টু একইভাবে গুলির মালা ঝুলিয়ে নেয় বুকে। তারপর রঙলা পেটের পালা।

ক্রলিং ট্রেক্স ঘোরতর এবং ফ্যাডম কেন্দ্রগুলি

অঙ্ককারে লাল স্কুলটার সামনের স্টোর পার হয়ে পাকা সড়কের ধারে ঘন বাঁশ ঘোপের অঙ্ককারে বুক সমান পাকা ধান্তের ভেতরে নেমে যাই। সুবেদার সামনে দিয়ে ইন্দুরের গর্তের মতো একটা জায়গায় নেমে যান। আমরা তাকে অনুসরণ করি। গর্তটা আসলে ক্রলিং ট্রেক্স। বুক সমান উচু। স্বচ্ছন্দে হাঁটা যায়। শক্রুর নজরকে ফাঁকি দিয়ে প্রতিরক্ষা লাইনের পেছন দিয়ে যোগাযোগ ও সরবরাহের জন্য সর্পিল আকারের বাঁকাবাঁকা এই ট্রেক্স তৈরি করা হয়। যুক্তের ট্র্যাটেজিতে ক্রলিং ট্রেক্সের প্রয়োজনীয়তা অত্যাবশ্যকীয়।

সামনে ঘোরতর যুদ্ধ চলছে। আমরা ফ্রন্ট লাইনের কাছাকাছি চলে এসেছি। সুবেদার চিবিয়ে চিবিয়ে বলেন, হালারপো হালারা আইজও কাউন্টার অ্যাট্রিক করছে। কেয়ামত নামাই ফেলাইছে একেবারে। আমাদের তিনি মাথা নিচু করে সতর্ক অবস্থায় এগুতে বলেন। আমরা সেভাবে এগোই। প্রচও শেলিং-এর সাথে তুমুল বেগে গোলাগুলি চালাচ্ছে পাকবাহিনী। মাথার ওপর দিয়ে চুঁ-ই চুঁ-ই শব্দে গুলি ছুটে যায়। উড়ে আসে শেলের পর শেল। আমাদের ফ্রন্ট লাইনও যই ফোটার মতো করে শক্রুর আক্রমণের জবাব দিয়ে যায়।

একেবারে ফ্রন্ট লাইনের কাছে এসে গোলাগুলির প্রচণ্ডতায় শরীর কেঁপে ওঠে। সুবেদার থামেন। ট্রেক্সের মধ্যে বসে ফিসফিসিয়ে বসতে বলেন আমাদেরও। সামনে নারকীয় গোলাগুলির তাওবতা রেখে আমাদের মধ্যে পরামর্শ চলে ফ্রন্ট নিয়ে। তিনি আমাকে বলেন,

— দাদু আপনারে লেফ্ট ফ্রাঙ্কে যেতে হবে। এই দিকে ডাইনের অবস্থাও ভালো না।

মেশিনগান পোস্টের পাশে লোক লাগবে। ডাইনের রাস্তার দিকেও লাগবে। এখন আপনি আমারে ভাগ-বাটোয়ারা করি দেন, কারে কোন মুই দিবেন।

সুবেদারের এ প্রত্যাব একেবারে অভাবনীয়। আমি আমার কোম্পানি নিয়ে যাবো বাঁয়ের দিকে। সেদিকটি রক্ষার শুরুদায়িত্ব পড়েছে আমার ওপর। এদিকে সমস্ত ফ্রন্টের অবস্থাই নাজুক। সুবেদার আমাদের লোকবল দিয়ে তার পুরো ফ্রন্টই সাজিয়ে নিতে চাইছেন। দুদিনের মুক্তে অনেক পোস্টেই লোক হতাহত হয়ে পিছে চলে গেছে। খালি হয়ে গেছে পেটগুলো। সেগুলো খালি রাখা উচিত নয় কোনোমতেই। বর্তমান ফ্রন্ট লাইনের অংশীদার আমরাও। অবশ্যই ফ্রন্টের সামগ্রিক অবস্থার ভালোমন্দ দেখতে হবে আমাদেরও।

গোলাগুলির প্রচলনা এবং শেল বিক্ষেপণের কান ফাটা শব্দে নিজেদের কথা শোনা যায় না ভালো করে। পিন্টুর সাথে এর মধ্যে পরামর্শ করে ওকে ফ্রন্ট লাইনের মাঝে এবং ডানে ছেলেদের পজিশনে রাখার জন্য ১৭ জনকে দিয়ে দেই ওর সাথে। সুবেদারকে বলি পিন্টু যাবে আপনার সাথে। তার সাথে থাকবে ১৭ জন। তাদের ভালোভাবে অবস্থান নেয়ার ব্যাপারটি যেনো তিনি দেখেন। সুবেদার এতে যেনো স্বত্ত্ব পান কিছুটা। তাকে আরোও জানাই আমি নিয়ে যাবো বামে ৩০ জন। সঠিক লাইন সুজে নেয়ার জন্য একজন গাইড প্রয়োজন হবে। সুবেদার মাথা বৌকিয়ে সামনে এগুতে থাকেন। আমরা আরো এগিয়ে যাই কিছুটা।

ক্রলিং টেক্সটা একেবারে মেশিনগান পোস্টের পেছনে~~মেশিনগান~~ চলছে একনাগাড়ে ঢাকাঢাক শব্দ তুলে। একটা শক্তমতো বাক্সারে মেশিনগানের পোষ্ট। এখানে এসেই ক্রলিং টেক্সটা ভাগ হয়ে গেছে দু'ভাগে। ডানে ও বামে। প্রজ্ঞাবে পাকা সড়কের এ পাশে ওপাশে তিনটি মুদ্রণত কোম্পানির সাথেই যুক্ত করেছে এই ট্রেক্স ঘারা। আমরা এসে হলাম এখন ৪টি কোম্পানি। এখান থেকে পিন্টুদের দল দ্বিতীয় সুবেদার যাবেন ডান দিকে। আমরা বামে। মেশিনগান কমান্ডার হাবিলিদার বারেকের পাছ থেকে সুবেদার একজন সৈনিক চান।

মেশিনগান চালনায় বিরতি দিয়ে হাবিলিদার বারেক জিগ্যেস করেন, কী দরকার? সুবেদার বলেন, নতুন কোম্পানি আসছে। তাদের পজিশন দেখাইতে লোক লাগবে। বারেক জিগ্যেস করেন, কারা এরা? সুবেদার উত্তর দেন, নতুন কোম্পানি। সব কলেজ ইউনিভার্সিটির ছাত্র। এতে বারেকের ব্যঙ্গাত্মক কথা শোনা যায়, ও ফ্যাডম আইছে ফ্যাডম কোম্পানি!

সুবেদার জানান, আমাদের অনেক লোক ক্ষতি হইছে, তাই সাব সেন্টের কমান্ডার সাব পাঠাইছেন এনাদের। ক্ষতি পোষাইবারলাই।

এ কথায় হাবিলিদারের গলায় রোষ ঝরে পড়ে। ক্ষ্যাপানো গলায় তাকে বলতে শোনা যায়, আমাদের ফ্যাডম দিয়া কি হইব, মানুষ দিয়া আর কী হইব? আর্টিলারি সাপোর্ট দিতে কল সেন্টের কমান্ডারের। শালারা একেবারে ফানা ফানা কাইরা ফালাইতেছে। জলদি জলদি আর্টিলারি সাপোর্ট না পাইলে ডিফেন্স ধীরা রাখা যাইবো না...।

গগনবিদারী শব্দে কাছাকাছি শেল বিক্ষেপিত হয়। হাবিলিদার বারেকের কথা আর শোনা যায় না। সে যেয়ে আবার মেশিনগান পোস্টে বসে। ডানে-বায়ে যে যার দিকে আমরা এগিয়ে যাই ক্রলিং টেক্সের মধ্যে শরীর লুকিয়ে নিয়ে।

‘গ্রায় দেড়শ’ গজ দূরত্বে এসে পাওয়া যায় আমাদের পোষ্ট। গাইড সৈনিকটা পোষ্ট দেখিয়ে দিয়ে ফিরে যায়। কোন জায়গায় পৌছেছি প্রথমে ঠাহর করতে পারি না। ডানের একটা খোলা ট্রেক্সের পোষ্ট থেকে তিনজন সৈনিক সামনে রাইফেল উঁচিয়ে ধরে একনাগাড়ে

গুলি চালনায় ব্যস্ত। আমাদের সারা পেয়ে একজন নিজেকে নায়েক বলে পরিচয় দেয়। তারপর বলে, বাঁয়ের দিকটা ফাঁকা। জলদি পজিশন লন, আর ফায়ার ওপেন করেন। তাকে জিগেস করি, বাঁয়ের দিকে কেউ নেই! আছে নায়েব সুবেদার সফির প্লাটুন। ছায়টা ট্রেক্সে কোনো লোক নাই। জলদি পজিশন নেন, আর শুরু করেন। শালারা খুব চাপ দিছে আজ।

ত্রিলিং ট্রেক্স থেকে হামাগুড়ি দিয়ে উঠে শোয়া অবস্থায় নেমে পড়ি নায়েকের বাঁয়ের ট্রেক্সটিতে। দু'জনকে সাথে আসতে বলি আমার ট্রেক্সে। মুসাকে সামনে এগিয়ে প্রতিটি ট্রেক্সে দু'জন তিনজন করে পজিশন নিয়ে শুলিবর্ষণ শুরু করে নিতে বলি। ওরা এগিয়ে যায় সামনে। দু'জন আমার ট্রেক্সে লাফিয়ে নামে। একজন বাসারাত অন্যজন মোসারদ পাগলা। এর দু'মিনিটের মধ্যে ট্রেক্সের সামনে হাতিয়ার রেখে, মাথা আড়াল করে শুরু হয় তিন নতুন ট্রেক্সবাসী সৈনিকের শুলিবর্ষণ, সামনে অদৃশ্য শহুর উদ্দেশ্যে। শুরু হয় ট্রেক্সের জীবন। সম্মুখ্যমুদ্র।

ট্রেক্স যুদ্ধ

ট্রেক্সটা তাড়াহড়ো করে তৈরি করা হয়েছে। গত পরও দিন মুভিবাহিনী তাদের ফ্রন্ট এগিয়ে এনে এখানে অগ্রবর্তী লাইন গড়ে তুলেছে। সামনে শক্রপক্ষের প্রতিরক্ষা লাইন। অঙ্ককারে ছাপিসারে এখানে এসে তাড়াহড়ো করে কোনো মতে মুক্তিযুদ্ধে মুভিবাহিনীর জোয়ানরা এখানে পজিশন নিয়েছে। শক্রপক্ষ এটা জানবার পর থেকেই তারা খাপা কুকুরের মতো আক্রমণের পর আক্রমণ চালিয়েছে। এর মধ্যে ভজমপুর-কামাত ও দেবনগর প্রতিরক্ষা লাইনের ট্রেক্স যুদ্ধে অভিজ্ঞ সাবেক ই.পি.আর.সৈন্যরা তাদের আশ্রয়ে টিকে থাকবার জন্য মাটি খোঁড়া জায়গায় লঘালাস্বি করে ৪/৫ ফুট এবং চওড়ায় ২/৩ ফুট সাইজের ট্রেক্সের অবয়ব দেয়ার চেষ্টা করছে। কোমর ব্যান গর্ত। সামনের দিকটা মাটি দিয়ে উচু করে কিছুটা আড়াল করার চেষ্টা নেয়া হচ্ছে। পাকবাহিনীর প্রতি আক্রমণ ঠেকানোর পাশাপাশি এ কাজটা করতে হয়েছে ট্রেক্সবাসী যোদ্ধাদের।

আমাদের গর্তটাকে সঠিক ট্রেক্স বলা যাবে না। মাটি খোঁড়া একটা ট্রেক্সের অবয়ব মাত্র। সঙ্গবত পুরোপুরি ট্রেক্স গড়ে তুলবার পূর্বেই এই পোস্টের যোদ্ধারা এটা ছেড়ে চলে গেছে।

ট্রেক্সের নিচে নরম ভেজা মাটি। তার দেয়ালও এবড়োবেবড়ো। সামনের আড়ালটিও মজবুত নয়। ট্রেক্স যুদ্ধের অভিজ্ঞতা আমাদের নেই। তবে তা খোঁড়ার অভিজ্ঞতা আছে। শাস্তিপূর্ণ সময়ে বিপদের ঝুঁকির বাইরে থেকে ঠাণ্ডা মাথায় মেথোডিক্যালভাবে ট্রেক্স খোঁড়া এক কথা, আর এই ভয়াবহ যুদ্ধক্ষেত্রে ট্রেক্স খোঁড়া অন্য কথা। সম্মুখ্যমুদ্রে প্রত্যেকে চায় শক্র শুলিবৃষ্টির হাত থেকে বাঁচবার জন্য দ্রুত নিজেকে মাটির নিচে ঢুকিয়ে ফেলতে। একক ব্যক্তি যখন এ কাজটি করে তখন সেটির নাম হয় 'ফর্স হোল'। একাধিক ব্যক্তির জন্য ট্রেক্স। আমাদের এ ফ্রন্ট লাইন শুধু মেশিনগান পোস্ট ছাড়া সবগুলোই খোলা ট্রেক্স। মাথার ওপর আচ্ছাদনহীন। মেশিনগান পোস্ট উপরে মজবুত আচ্ছাদন দিয়ে বাক্সার হিসেবে তৈরি করা হয়। এর কারণ হচ্ছে শক্র শেলের আঘাত কিংবা বিমান আক্রমণ হতে মেশিনগান পোস্টকে রক্ষা করা। ফ্রন্টে সব সময়েই মেশিনগান পোস্ট শক্রপক্ষের মূল টার্গেট স্থল হয়ে থাকে। মেশিনগানের শুলিবর্ষণের ক্ষমতা, ভয়াবহতা এবং এর নল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সামনে বিস্তীর্ণ এলাকা কভার করার ব্যাপক ক্ষমতা রয়েছে। মেশিনগান থেকে অনবরত

গুলিবর্ষিত হতে থাকলে, সামনে থেকে অপরপক্ষের এগুনো অভ্যন্ত কষ্টকর এবং ক্ষতিসাধক ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। এজন্যই মেশিনগান পোষ্টটি অপর পক্ষের ফুল টাগেটি হয়ে থাকে এবং সেটা খৎস করার জন্য তারা তৎপর হয়ে ওঠে।

আমরা ট্রেক্সে চুকেই যুদ্ধ শুরু করে দিয়েছি। ট্রেক্সের অবস্থা বুঝে উঠবার সুযোগ বা সময় কোনোটাই ছিলো না। একমাত্র কাজ শুরু শক্তির উদ্দেশ্যে শুলি ছুঁড়ে যাওয়া। তাদের সঙ্গে আগমনকে এভাবে ঠেকিয়ে দেয়া।

হাবিলদার বারেকের মেশিনগান থেমে গেছে বেশ কিছুক্ষণ হয়। অন্যান্য হাতিয়ার থেকে পোলাঙ্গলি চলছে। আমার ডানপাশের ট্রেক্সবাসী নায়েকের সাথে এর মধ্যে পরিচয়পর্ব শেষ হয়েছে। আমার পরিচয় জানবার পর থেকেই তিনি আমাকে কমান্ডার সাহেব বলে সরোধন করছেন। নায়েক লোকটি ভালো। দিলখোলা প্রাণবন্ত এবং সাহসী। দুদিনের সম্মুখ্যে থেকেও তার সাহস এবং প্রাণের স্ফূরণ অচূট রয়েছে। তার ট্রেক্স থেকে তিনি বলে ওঠেন, কমান্ডার সাহেব আপনার ট্রেক্স ঠিক করে নেন। শুলি চালাতে চালাতে ঠিক করতে হবে উপায় নেই। তাকে বলি,

— ট্রেক্স খোড়ার যন্ত্র নাই তো।

— এই নেন, বলে তিনি একটি ছোট কোদাল এগিয়ে দেন।

তিনজনে পাশাপাশি দাঁড়ানোর পর আর বেশি জায়গায় থাকে না। এর মধ্যেই কাজ করতে হয়। যাচি খুঁড়ে অন্তত বুক সমান গর্ত করা দরকার। পালাক্রমে কাজ শুরু করে দেই। নিচের মাটি উপরে তুলে সামনের দিকটা শুরু আলের মতো বাঁধতে থাকি। এতে দু'জনকে হাত লাগাতে হয়। একজন হাতিয়ারি নিয়ে শুলি ছেঁড়ার কাজ চালিয়ে যেতে থাকে। কখনও আমি হাত লাগাই মোসারদ পাগলাসহ, বাসারত রাইফেল নিয়ে থাকে। কখনও আমার হাতে রাইফেল, ওরা দুর্ভাগ্য কাজ করে। প্রায় ২০/২৫ মিনিট কাজ করার পর ট্রেক্সটা মোটামুটি সাইজে আঞ্চলিক

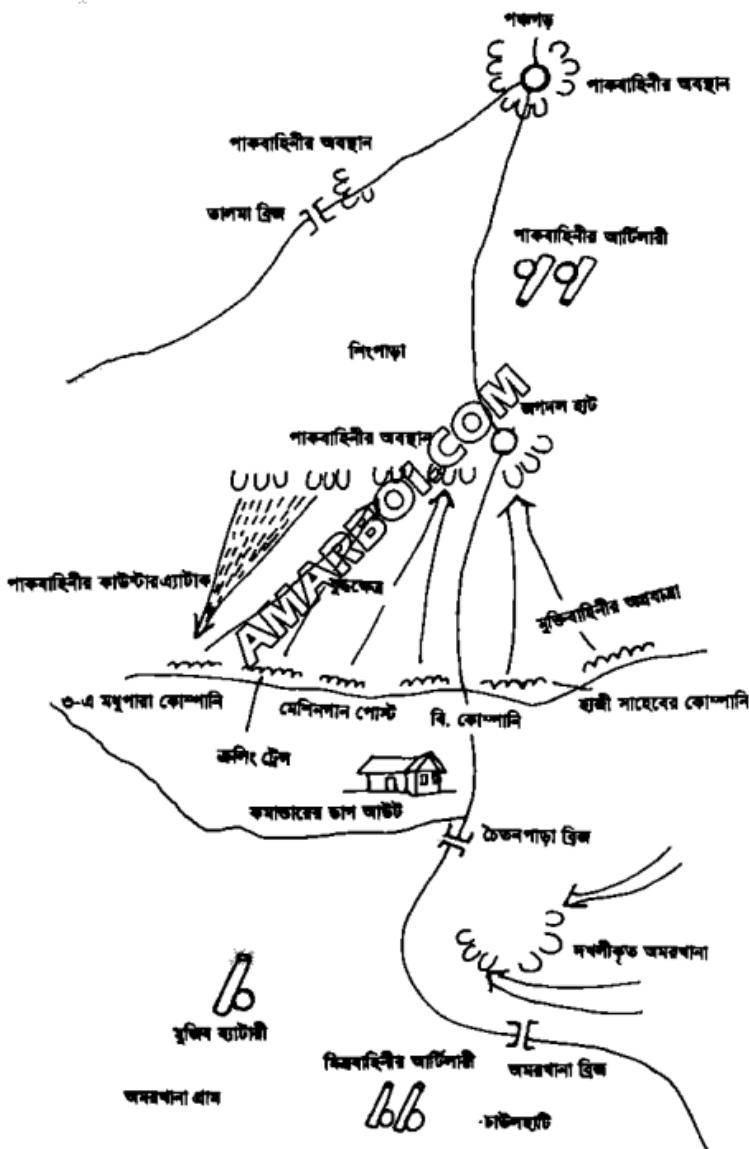
প্রচণ্ড শীতের রাত। নিচে ভেজুড়ি মাটি। মাটির দেয়াল ঠাণ্ডা হয়ে আছে। সামনের রাইফেল রাখবার জায়গাও ঠাণ্ডা। তিনজনের গায়ে একটা করে ফুল সোয়েটার শুধু। আমার পায়ে কেডস এবং পরনে প্যান্ট। ওদের দু'জনেরই পরনে লুঙ্গি। মোসারদ পাগলার পায়ে জুতাও নেই। তিনজনের জন্য একটা মাত্র পাতলা কম্বল। তাড়াহড়োর মধ্যে কম্বল আনা যায় নি ট্রেক্স পর্যন্ত। এখন আর উপায় নেই। আজকের রাতটা কাটাতে হবে এভাবে, অবশ্য যদি কাটে।

এর মধ্যে প্রায় দু'ঘণ্টা গড়িয়ে গেছে। ক্রলিং ট্রেক্স দিয়ে হামাঙ্গড়ি দিয়ে এসে রাতের বাদ্য হিসেবে পৌছে দিয়ে গেছে রুটি আর মাংস। খাদ্য নেয়ার কোনো ভাগ নেই। কোমর থেকে গামছা ঝুলে মেলে ধরেছে মোসারদ। সেখানেই রুটি-মাংস ঢেলে দিয়ে গেছে খাদ্যবাহী দল। মোসারদ তার গামছা পেতে দাঁড়িয়ে থাকে। মাংসের বোল পড়ে যেখেতে। সে অবস্থায় মাংস দিয়ে তকনো রুটি খেতে থাকি। খাওয়া তো নয়। শুধু গলাধকরণ। খাওয়ার পর মাটিতে হাত মুছে নিতে হয় এবং শুরু হয় শুলিবর্ষণ।

— তিয়াস লাগি গেল বাহে, পানি খাওয়ার নাশিল হয়। মোসারদ পাগলার এই উভিতে নিজেরও পানি পিপাসা লেগে যায়; কিন্তু উপায় নেই কোনো। এই জুলন্ত ফ্রন্টে পানির উৎস কোথায় তা খুঁজে পাওয়া মুশকিল। কষ্ট করে রাতটা পার করতেই হবে।

মোসারদকে বলি,

কেচ স্যার-২৩
জগন্মল হাটের মুক
২০-১১-৭১- ২৫-১১-৭১



—পানি পাওয়া যাবে না, রাতটা এভাবেই কাটাতে হবে। মে গুলি চালা। মোসারদ আ কিছু না বলে তার জায়গায় যেয়ে হাতিয়ার সচল করে। আমার হাতিয়ারটা গরম হচ্ছে। সেটাকে কিছুক্ষণ বিশ্রাম দেয়ার জন্য উইয়ে রাখি সামনে আলতো করে। ফ্রন্ট লাইনের অবস্থাটা বুঝতে চেষ্টা করি।

এতোক্ষণে অনেকটা ধাতঙ্গ হয়ে এসেছে ট্রেঞ্চ জীবন। ফ্রন্ট লাইনটাও বোৰা যাচ্ছে চিনতে পারি জায়গাটা। উত্তর-দক্ষিণে লোৱা কাঁচা রাস্তাটি সরাসরি যেয়ে ঠেকেছে দক্ষিণ তথা আমাদের ডানে পাকা সড়কে। এটা সেই রাস্তা। সোনারবান হাইড আউট থেকে রেং মিশনে এসেছিলাম বানিয়াপাড়ায় পাটের খরিদার সেজে তালমা পাড়ের শুবক মতিসহ বাঁদিকের ধারাটাই তাহলে বানিয়াপাড়া। এ রাস্তা দিয়েই সেদিন চটকা জাল দিয়ে বরষা মাছ ধরা দেখতে দেখতে পাকা সড়কে যেয়ে উঠেছিলাম। মাত্র ক'মাসের ব্যবধান। আবা এসেছি সেই রাস্তায়। এবার রাস্তাকেই বেছে নেয়া হয়েছে ফ্রন্ট লাইন হিসেবে। ট্রেঞ্চ খোঁড়া হয়েছে এর উপরেই। রাস্তার পেছন দিয়ে ধান খেতের ভেতর দিয়ে চলে গেছে ক্রিট ট্রেঞ্চ। যোগাযোগ আর সরবরাহ আসছে তা দিয়েই।

গুলি চালান, শক্র আসছে

যুদ্ধ চলছে একইভাবে। শক্রের চাপ বেড়েছে অসম্ভব। ফ্রন্টের গুলির তোড় যেনো ভাসি নিয়ে যাবে। মনে হয় শক্রের কিছুটা এগিয়ে এসেছে তাদের অবস্থান থেকে। নায়েক সময় চেঁচিয়ে উঠেন,

— গুলি চালান কমান্ডার সাহেব, শক্র আসাইতেছে। লাফিয়ে পড়ি সামনে। রাইফেলে বাট আঁকড়ে ধরে শক্রের দিকে গুলি ছেড়ে দেখি থাকি না থেমে। এখন শুধু চেতনার মধ্যে র্দ্বা ছোঁড়া ছাড়া অন্য কিছু কাজ করেন না।

নায়েক আবার চিৎকার করে উঠেন, বুঝলেন কমান্ডার সাহেব আর কিছুক্ষণের মধ্যে ওদের কামান আক্রমণ শুরু হবে। আমাদের এখন সাপোর্ট দরকার আর্টিলারি। কিন্তু শা. নায়েক খিপ্পি করে চলেন পেছনে থাকা সাপোর্ট বাহিনীর উদ্দেশ্যে।

নিজেও বুঝি, পাকবাহিনীর এই প্রবলতর আক্রমণ ঠেকাতে হলে ব্যাপক আর্টিলারি মৰ্টারের সাপোর্ট প্রয়োজন। কিন্তু তা আসছে কই? সামনে ঘন মিশকালো অঙ্কুরার। শব্দেশি দূরে নয়। ২/৩শ' গজের মধ্যে। দারুণ অস্থির লাগে নিজেকে। ফ্রন্টের অবস্থা পেছে থাকা লোকজন বুঝতে পারে না। কী দারুণ সময় অতিক্রান্ত করতে হচ্ছে! বুনো প্রয়োরে মতো শক্র একগুচ্ছে মনোভাব নিয়ে এগিয়ে আসতে পারে। তাদের ঠেকানো কি যাবে?

রাত বাড়ার সাথে শক্রের চাপ আরো বাড়তে থাকে। রাত ১০টার পর তা ভয়াব আকার ধারণ করে। হাবিলদার বাবেক তার মেশিনগানের ফায়ার ওপেন করেন। কিছু বিমিয়ে এসেছিল ফ্রন্ট। পেছন থেকে কমান্ডারের নির্দেশ আসে সমস্ত ফ্রন্ট সক্রিয় হয়। আক্রমণকারী পাকবাহিনীকে ঠেকিয়ে রাখবার জন্য সকল ধরনের অন্ত সচল করবার। ৮ অনুযায়ী গর্জে ওঠে সমস্ত ফ্রন্ট লাইন। ট্রেঞ্চবাসী সকল যোদ্ধার হাতিয়ার থেকে বৃষ্টির মধ্যে গুলি যেতে থাকে শক্রের দিকে।

শক্রপক্ষ তাদের গোলন্দাজ আক্রমণ শুরু করে দিয়েছে। শেল উড়ে এসে ফাটছে ধী ধাম শব্দে। মাথার ওপর দিয়ে পাশ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে শক্রের মেশিনগানের, রাইফেলে

বুলেট। শত সহস্র। তয়াবহ অবস্থা! মাথা তুলবার উপায় নেই। দু'পক্ষই মরিয়া হয়ে উঠেছে। একদল আক্রমণে। একদল তাদের ঠেকাতে। পাকবাহিনী আক্রমণ চালিয়ে আমাদের ফ্রন্ট দখল করতে চাইছে। ঠেকিয়ে চলেছি আমরা তাদের।

আমাদের একমাত্র মর্টার ইউনিট মজিব ব্যাটারি সত্ত্বিং হয়ে উঠেছে। তাদের পাশাপাশি মিত্রবাহিনীর আর্টিলারি ইউনিটগুলোও সাপোর্ট ফ্যায়ার দেব করেছে। এখন সামনাসামনি দুই প্রতিরক্ষা লাইনে চলছে ঘোরতর যুদ্ধ। সকল ধরনের হাতিয়ারের গুলি বিনিয়নের তাওবলী চলছে গ্রাউন্ড ফোর্সের মধ্যে। আর মাথার উপর দিয়ে ছোটাছুটি চলছে কামান মর্টারের গোলা।

হঠাতে করে সামনের দিক থেকে আকাশে উড়লো ফ্রেয়ারের আলো। সমস্ত যুদ্ধক্ষেত্রটা আলোকিত হয়ে উঠলো দিনের মতো। চোখ ধারিয়ে যায় এ আলোতে। শক্রপক্ষ খুঁজে নিতে চায় মুক্তিবাহিনীর সঠিক অবস্থান। সমস্ত ফ্রন্ট লাইন যেনো এতে থমকে যায় কিছুটা। ট্রেক্সের ভেতরে মাথা লুকিয়ে আলো থেকে বাঁচতে চায় সকলে। আকাশ থেকে আলোটা ধীরে ধীরে নেমে এসে নিতে যায় এক সময়। কালো ঘুটঘুটে অঙ্ককার নেমে আসে আবার যুদ্ধক্ষেত্রে। ফ্রন্ট আবার গর্জে উঠে পূর্বের মতো। শক্রপক্ষের অবস্থান নিঙ্গপণের উদ্দেশ্যে এবার ফ্রেয়ার ছাড়া হয় আমাদের দিক থেকে। সামনের দিকটা আলোকিত হয়ে ওঠে। সে আলোতে আওয়ান কোনো শক্রদলকে দেখা যায় না। দু'পক্ষ থেকেই এরপর ফ্রেয়ার উঠতে থাকে ঘন ঘন।

তয়াবহ কামান আক্রমণ, কবর হয়ে যাওয়া নাইটক্রিস্ট ট্রেক্স
শক্রবাহিনীর আর্টিলারি আক্রমণ অত্যন্ত স্থৱর্ষিত হয়ে ওঠে। প্রথমে একটা ছোট শব্দ হয় টাপ। এরপর পো'-পো' শব্দ। মানে আবহাসপথে আসছে মৃত্যুবাণরগ্নি শেল। তারপর শব্দ 'বুম'। প্রচণ্ড বিক্ষেরণ। তীব্র আলো। ঘলকানি। বিকট শব্দ। ধরথর করে কেঁপে কেঁপে ওঠে মাটি। কানে তালা লাগিয়ে পড়ে। চেতনা লোপ পাওয়ার যোগাড় হয়। শিশিরসিঙ্গ মাটি ছিটকে ছিটকে আসে। ছোয়া-বারুদের গঁকে বাতাস ছেয়ে যায়। একটা ফাটে। তারপর একটা আসে। তারপর আসতেই থাকে। প্রতিটি 'টাপ' শব্দের উৎপত্তিতেই মনে হয় পো'-পো' শব্দ দিয়ে যে বিক্ষেরকযুক্ত মৃত্যুবাণটি ছুটে আসছে তা বুঝি পড়বে আমার ওপর। পিঠের শিরদাঁড়ায় শিরশিরে অনুভূতি, বুকের ভেতরটা যেনো ফাঁকা হয়ে আসে। পেটের নাড়িভুঁড়ি পাক দিয়ে উঠতে চায়। সে অবস্থায় ট্রেক্সের ভেতর মাটির সাথে লেপটে থেকে গুলি চালিয়ে যেতে হয় ক্লান্তিহীন।

প্রিয় সাথী স্টেনগানটা ট্রেক্সের কোনায় উঠে আছে। অগ্রবর্তী লাইনের আক্রমণাত্মক কিংবা ডিফেন্সিভ যুদ্ধে রাইফেল অত্যন্ত কার্যকরী হাতিয়ার হিসেবে বিবেচিত এবং স্বীকৃত। এ হাতিয়ারটা কখনও বিট্টে করে না যদিও মজার্ন ওয়ার ফ্রেয়ারে এটার মডেল পুরাতন হয়ে গেছে।

পেছনে ক্রলিং দিয়ে কারা যেনো আসে ডানদিক থেকে। কাছাকাছি আসতেই ক'জন মানুষের কাতরানির শব্দ পাওয়া যায়। তার মানে আহতদের বয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে এদিক দিয়ে পেছনে। চলে যায় আহতদের বয়ে নিয়ে যাওয়া দলটি। এর সামান্য পরই আসে আরেকটি আহতবাহী দল। যোসারদ পেছনে উঁকি দিয়ে দেখতে পেয়েই আর্তবরে চিৎকার করে উঠে এভাবে,

— বাহে নাড়িভুঁড়ি বাইর হয়্যা গৈছে একেবারে, ইস্রে— !

ওর কথায় আমিও পেছনে উকি দেই। জিগ্যেস করি কী হয়েছে। আহতদের বহনকারী দলটি থামে দম নেয়ার জন্য। একজন তার হাতের টর্চাইটের আলো ফেলে আহতদের শরীরের ওপর। কী সাজাতিক অবস্থা! একজর দেখেই চোখ বন্ধ করে ফেলি। দু'জন মানুষ রক্তাঙ্ক ক্ষত-বিক্ষত। কাদায় মাটিতে শাখামাখি। একজনের পেট ফেড়ে বেরিয়ে এসেছে নাড়িভুঁড়ি। অন্যজনের অবস্থা একই রকম। এ দৃশ্য দেখা যায় না। মাথা খিমখিম করে ওঠে। আহতবাহী লোকগুলো কষ্টকরভাবে ত্রলিং ট্রেক্সের ভেতর দিয়ে বয়ে নিতে থাকে তাদের।

হাবিলার বাবেকের মেশিনগান পোষ্ট শক্ত টার্পেট হয়ে গেছে। শক্তির শেল ছুটে আসছে মেশিনগান পোষ্ট লক্ষ্য করে। তারা চাইছে বাবেকের মেশিনগান স্তুক করে দিতে। আমাদের অবস্থান মেশিনগান পোষ্ট থেকে দূরে নয়। এ কারণে টার্পেট হয়ে যাই আমরাও।

একটা শেল এসে পড়ে আমাদের ১০ গজ পেছনে। আরেকটা একটু দূরে। এরপর সামনে ঝাঁঁয়ে পেছনে সব দিকে। নারকীয় অবস্থা সৃষ্টি হয়ে যায় আমাদের চারপাশে। বিকট শব্দ, ঘোঁয়া, বারুদ, মাটি কাদা, পোড়া গন্ধ, চোখ ধাঁধানো আলোর বলকানি, ট্রেক্সের ভেতর প্রবল ভূমিকম্প সব মিলিয়ে সমস্ত চেতনাকেই লোপ পাইয়ে দেয়ার উপক্রম হয়। মোসারাদ পাগলা হাউমাউ করে কেঁদে ওঠে। বাসারাত পাগলের মতো হাত দ্রুতভাবে পাচড়ে মাটি ঝুঁড়ে আরো গভীরে ঢোকার চেষ্টা করতে থাকে।

না চেতনা হারানো যাবে না। এখানে টিকে থাকতে হবে। আর টিকে থাকতে না পারলে মৃত্যু অনিবার্য। মনের গভীর থেকে এ চিন্তা দূরে যেনো ধাক্কা মেরে চেতনার মধ্যে ফিরিয়ে আনে আমাকে। বাসারাতকে টেনে তুলে ঘুষি রাইফেল ধরিয়ে দেই। মোসারাদকে প্রচও ধরক দিয়ে থামিয়ে দিয়ে গুলি ছোঁড়ার কাজ লাগিয়ে দেই। চারদিকে যেনো ঝলসে ঝলসে উঠছে আগুন। খাবলে খাবলে উঠে উঠে। একটা নরকের মধ্যে রয়েছি এখন।

আমার ট্রেক্সের ঠিক সামনে একটা শেল পড়লো। মনে হলো যেনো আকাশ ভেঙে পড়ে সব একাকার হয়ে গেছে। সমস্ত শরীর চেকে গেলো মাটি কাদায়। ডান পাশের ট্রেক্সের মুখে পড়লো পরের শেলটা। সঙ্গে সঙ্গে ট্রেক্সটা ভেঙে যেনো মিশে গেলো। নায়েকসহ তিনজন মাটির নিচে চাপা পড়ে গেলো। যেনো জীবন্ত কবর হয়ে গেলো তিনজনের। পরে শেলটা যেয়ে পড়লো পেছনে।

চেতনা হারাবার পরিস্থিতি একেবারে। আমরা তিনজন বসে গেছি ট্রেক্সের ভেতরে। শরীরের ওপর আলগা মাটির আন্তরণ। ট্রেক্সের ভেতর ঘোঁয়া আর বারুদের গক্ষে নিষ্পাস প্রায় বন্ধ হয়ে আসছে। উঠে দাঁড়াই সে পরিস্থিতিতে। ডানে তাকাতেই নায়েকসহ তিনজনের কবর হয়ে যাওয়া ট্রেক্সটার দিকে তাকিয়ে কেঁপে ওঠে বুক। কোনো কিছু না ভেবেই লোক তিনটিকে ঝাঁঁচাবার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ি গুঁড়িয়ে যাওয়া ট্রেক্সটার ওপর। পাগলের মতো চিক্কার করে ডাকি মোসারাদ-বাসারাতকে। ওরাও লাফিয়ে এসে হাত লাগায়। তিনজনের হাত দিয়ে মাটির আন্তরণ সরাতে থাকি এবং বের করে আনি মাটিতে চাপা পড়া নায়েকসহ তিনজনকে। বেঁচে আছে তারা। প্রায় অচেতন অবস্থায়। কী পরিমাণে আহত হয়েছে তরা বোঝা যায় না। দ্রুত তাদের সরিয়ে নেয়ার তাগিদে পেছনের ত্রলিং ট্রেক্সে নামিয়ে আনি। মোসারাদ থাকে ওদের সাথে। একটু সুস্থ হলৈই সে তাদের পেছনে দিয়ে আসবে।

আগুয়ান শক্র : নায়েব সুবেদার সফির পোষ্ট ছেড়ে যাওয়া

গড়িয়ে চলে আসি আবার আমার ট্রেক্সে বাসারাতসহ। শেল আসছে তখনও একইভাবে। তবে পড়ছে কিছু দূর দিয়ে। মধ্যরাতের পর শক্রবাহিনীর চাপ যেনো হঠাতে করে আরো বেড়ে গেছে। বারবার ফ্রেয়ার উড়ছে আকাশে। শত সহস্র জ্বলন্ত সীসা উড়ে যাচ্ছে মাথার উপর দিয়ে। আমি আবার রাইফেল তুলে নিই। পাশে বাসারাত। রাইফেলের ব্যারেল গরম হয়ে গেছে আগুনের মতো।

মে অবস্থাতেও ভাবতে চেষ্টা করি ছেলেদের অবস্থা। কেমন আছে ওরা সব? পিটু তো হাবিলদার বারেকের ডান দিকে। বারেকের মেশিনগান অবিশ্বাস্তভাবে গুলি ঝুঁড়েই চলেছে এ অবস্থার ভেতরেও। সামনে শক্রের চাপ বৃদ্ধি শৃঙ্খলাতেই বুঝিয়ে দেয় ওরা এগিয়ে আসছে। এমন সময় হঠাতেই বাঁয়ের দিকটা চুপচাপ হয়ে যায়। কোনো গুলিগুলা শোনা যায় না সেদিক থেকে। নায়েব সুবেদার সফির প্লাটুনের অবস্থান সেদিকে। কোনো সাড়া-শব্দ নেই তাদের। বুকের ভেতরটা যেনো জমে যায়। শক্র এগিয়ে আসছে। এ অবস্থায় সফি কি তার অবস্থান ছেড়ে দিয়েছে? বাসারাতকে নির্দেশ দেই দ্রুত দেখতে ব্যাপারটা। ক্রলিং ট্রেক্স দিয়ে বাসারাত এগিয়ে যায় সেদিকে এবং ফিরে আসে সামান্য ক্ষণের মধ্যে। হাঁপাতে হাঁপাতে রিপোর্ট দেয় মে, না ওরা নেই। তার মানে ডিফেন্স ছেড়ে দিয়েছে ওরা। সদরদিনের আশঙ্কাই অবশ্যে সত্য বলে প্রমাণিত হয়। ওরা কিছু না জানিয়ে পোষ্ট ছেড়ে চলে স্টেজ, আমার বাঁ পাশ এখন সম্পূর্ণ ফাঁকা। শক্র এগিয়ে আসছে। সদরদিনের নির্দেশ মনে পোড়ে, ওরা পোষ্ট ছেড়ে দিতে পারে, কিন্তু তোমরা ছাড়বে না। মাটি কামড়ে পড়ে থাকবে। ভাস্তা হলে সর্বনাশ হয়ে যাবে আমাদের। এখন সম্ভাব্য সর্বনাশ ঠেকানোর পুরো দায়িত্ব ক্লিপড়েছে আমাদের ওপর। বাঁ পাশের পুরো দায়িত্ব এখন আমার। সামনে যাই ঘৃটক সামান্য দেয়ার চেষ্টা করতে হবে সেটা।

পেছনের ক্রলিং ট্রেক্স দিয়ে আবেক্ষণ্যজন আহতকে বয়ে নিয়ে যায়। সময় কম। মাথা ঠাণ্ডা রেখে ক'মুহূর্ত ভেবে সিন্দ্রার প্রতি নিই এবং এরপর লেগে যাই লেফ্ট ফ্লাঙ্কে ডিফেন্স নেয়ার কাজে। শক্রের প্রচণ্ড গোলাঞ্জালুর মুখে ঝুকিবহুল অবস্থায় এ কাজ করতে হয়।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা ছেলেদের যতোটা সম্ভব আনা গেল। সকলের খৌজ পাওয়া যায় না। ২৭ জনকে পাওয়া যায় মোট। নায়েক ও তার সাথীরা সুস্থ হয়ে উঠায় পেছনে তাদের রেখে ফিরে এসেছে মোসারদ। এবার দ্রুত দল বিন্যাস করে ফেলি। নায়েব সুবেদার সফির ছেড়ে যাওয়া ট্রেক্সে আমি পজিশন নিই। সাথে থাকে মোসারদ। ডানে-বাঁয়ের ফাঁকা ট্রেক্সগুলোতে রাখি দু'জন দু'জন করে। এভাবে ২৭ জন ছেলে নিয়ে সফির ছেড়ে যাওয়া অবস্থানের দায়িত্ব নিলাম আমি। এদের ট্রেক্সগুলো বেশ মজবুত এবং আরামদায়ক। নিচে নরম শুকনো খড়। উপরে খড়ের আচ্ছাদন। সময় পেয়েছিল ওরা, তাই তাদের অবস্থানকে কিছুটা আরামদায়ক করার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু ঢিকতে পারে নি। অগ্নিগর্ত ফ্রন্ট লাইনে শক্রের প্রচণ্ড চাপের দরুল পিছিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছে।

শক্রের শেলের তাওব কিছুটা কমেছে। তবুও আসছে। ফাটছে সেগুলো নিরাপদ দূরত্বে। এবার শুরু হবে ইনফেন্ট্রির কাজ। সম্মুখ্যক্ষেত্রের কৌশল এটাই। প্রথমে প্রবল গোলন্দাজ আক্রমণ দিয়ে সামনের অবস্থানে থাকা শক্র বাহিনীকে তচ্ছন্দ করে দেয়া হয়। এরপর ইনফেন্ট্রি দল এগিয়ে আসে চার্জের ভঙ্গিতে শক্রের ভেঙেপড়া অবস্থান দখলে নেয়ার জন্য। এখানেও ঘটছে তাই। শক্র পাকবাহিনী তাদের চাপ অব্যাহত রেখে এগিয়ে আসছে ধীরে

ধীরে। ওরা যে এগিয়ে আসছে এটা নিশ্চিত। আমরা ২৭ জন লেফ্ট ফ্লাকে তাদের মুখোযুবি হবার জন্য তৈরি হয়ে রয়েছি। রাইফেলে ব্যারেল সামনে রেখে শুলি করাছি, সকলকে নির্দেশ দিছি অব্যাহতভাবে শুলি চালিয়ে যাবার জন্য। ম্যাগজিন খালি হচ্ছে, আবার ভরাছি। মনের ভেতর তখন একটাই চেতনা কাজ করে, ঠেকাতে হবে ওদের। ঠেকাতে হবে জীবনপণ করে হলেও। বাঁচাতে হবে পুরো ফ্রন্টকে।

শীতাত্ত রাত। কনকনে ঠাণ্ডা। আকাশ থেকে হিম ঝরে পড়ছে। আশপাশে চারদিকে প্রচও যুদ্ধ। জীবন-মৃত্যুর যাবামাবি এক ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুরতা আর বীভৎসতা নিয়েই যেনো সমস্ত ফ্রন্ট জুলছে। এরি ভেতরে আমরা কয়েকজন। আমাদের সাথে রয়েছে ফ্রন্টের সব ক'জন যোদ্ধা। সবারই এক লক্ষ শক্তকে ঠেকাতে হবে। সময়টা যেনো স্থির। এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। মনে হচ্ছে আজকের রাতটা অনেক দীর্ঘ।

যুদ্ধ চলতেই থাকে এভাবে। শক্তির আগমনকে বাধা দেয়ার জন্য আমরাও লড়াই করে যেতে থাকি সমস্ত ফ্রন্টের সাথে। নিদাহীন ক্লান্তিহীন বিপ্রস্ত শারীরিক অবস্থা নিয়ে সমগ্র যুদ্ধের প্রক্রিয়ার সাথে নিজেদের জড়িয়ে রাখি রাতভর।

২৩. ১১. ৭১

বিধ্বস্ত ফ্রন্ট লাইন : বেঁচে থাকার আনন্দ

অবশেষে রাত শেষ হলো। পুবের আকাশ ফুরসা হয়ে আসতে লাগলো। গোলাগুলি বন্ধ হলো। খেমে গেলো যুদ্ধ। ওরা আর এলো না। আমরা দফতের টিকিয়ে দিলাম।

একটু পরে কুয়াশার চাদর ভেদ করে সূর্য উঠলো। তার আলোতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো সমস্ত ফ্রন্ট লাইন। একেবারে তছনছ অবস্থাপ্রাপ্ত বিধ্বস্ত ট্রেক্ষবাসী মানুষগুলোর মধ্যে স্বত্ত্ব ফিরে এলো। হাঁকডাক করে খোঁজ নিত্য সাগলো একে অপরের। রাতে অনেকেই হতাহত হয়ে ফিরে গেছে পেছনে। কে থক্কাশী, কে গেলো, তারই খোঁজখবর নেয়ার জন্যে উদ্ধীব সবাই। দৃঢ়স্বপ্নের মতো আর একটু রাত অতিক্রান্ত করলো ট্রেক্ষবাসী যোদ্ধা মানুষগুলো।

সূর্য ওঠার সাথে সাথেই লক্ষ্যখনার ক্রমান্বার ফ্রন্ট লাইনের জন্য নাস্তা পাঠিয়েছে। ভারবাহী ক'জন মানুষ সেই সন্তানী কায়দায় নাস্তা নিয়ে এসেছে। বাঁশের ডালায়। ডালডায় ভাজা আটার পুরি আর কেরোসিনের টিনে গরম গরম চা। ট্রেঞ্চে ট্রেঞ্চে পোছে দেয় তারা সকালের এই নাস্তা পেছনকার ত্বলিং ট্রেঞ্চ দিয়ে এসে। আমাদের ট্রেঞ্চে আসে তারা। মোসারদ গামছা পেতে তার মধ্যে পুরি তুলে নেয়। সম্ভবত শেষ রাতে বানানো হয়েছে আটার এই পুরি। ঠাণ্ডায় জমে গিয়ে সেগুলো কুঁকড়েমুকড়ে একটা কিন্তু আকার নিয়েছে। তার ওপর সাদা ডালডায় আবার জমে রয়েছে সেগুলোর গায়ে। চা দিতে চায় টিনবাহী লোকটি। বলে, কোথায় নেবেন? তাই তো, তরল চা কোথায় নেবো ঠিক বুথে উঠতে পারি না। কাপ-ডিশের প্রশংশি ওঠে না। মগও আনা হয় নি সঙ্গে। এমন কোনো ভাবও নেই, যাতে করেও চা নেয়া যেতে পারে। সারারাত খোলা ট্রেঞ্চে হিমেল ঠাণ্ডায় প্রায় জমে গেছে হাত-পা। গরম চা শরীরের জন্য জরুরিভাবে প্রয়োজন। মোসারদকে বলি এস.এল.আর-এর গুলির বাক্সটা খালি করতে। নির্দেশ মতো সে উপুড় করে সমস্ত বুলেট ট্রেঞ্চের মেঝেতে ঢেলে বাক্সটা খালি করে ফেলে। বুলেটশূন্য টিনের বাক্সটায় কেমন একটা ধাতব ধাতব গুঁক। এগিয়ে দিই সেটা চায়ের টিন বহনকারী লোকটার দিকে। সে বিশ্বাস্যভরা দৃষ্টিতে

কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে সদ্য খালি করা শুলির বাস্তুর দিকে। তারপর বলে, ওটার ভেতরেই নেবেন?

— কোনো উপায় নেই, আমি বলি। এটাতেই ভর্তি করে ঢালেন চা। লোকটি তাই করে। এরপর ট্রেক্সের মেথেতে বসে দুমড়ানো-মুচড়ানো প্রায় কাঠ হয়ে যাওয়া পুরি চিবুতে থাকি। শুলির বাস্তে চুমুকে চুমুকে চা খাই তিন সঙ্গী পালা করে। ক্লান্তিকর রাত জাগরণের পর লঙ্ঘর কমাভাবের পাঠানো এই চা একেবারে অমৃতসম মনে হয়।

বেলা কিছুটা বাড়তেই ক্রলিং ট্রেক্স দিয়ে পিন্টু চলে আসে। ট্রেক্সের ভেতর লাফিয়ে নেমে জড়িয়ে ধরে সে বলে, বেঁচে আছি মাহবুব ভাই!

রাত জেগেছে বলে তারও বিধ্বণি অবস্থা। কিন্তু মুখের হাসিটি তার তেমনি অমলিন। এসেই রাতের ভয়াবহ অবস্থার বর্ণনা দেয় সে। বারেকের মেশিনগানের পোষ্টের পাশেই পিন্টুর অবস্থান। রাতের যুদ্ধে শত্রুবাহিনীর মূল টার্গেট ছিলো মেশিনগান পোষ্ট। সুতরাং কী ধরনের বাড় বয়ে গেছে পিন্টু আর তার সঙ্গীদের ওপর দিয়ে সেটা সহজেই অনুমান করতে পারি। পিন্টু বেঁচে আছে, অক্ষত আছে দেখে ভালো লাগে। ফ্রন্টের যুদ্ধের এই ডামাজড়োলের মধ্যে কখন কার কী হবে, বলা মুশ্কিল। তবুও অনুজপ্রতিম পিন্টুকে বলি সাবধানে থাকতে। বলি কোনো অবস্থাতেই ট্রেক্স থেকে সে যেনো বের না হয়। অন্যদেরকেও তাই বলে দেয় যেনো সে, এই মতো উপদেশ দিই তাকে।

মাথা নেড়ে সংক্ষিপ্ত জালায় পিন্টু, তাই করবে বলে। ক্লান্ত বলে, রাতটা কোনো রকমে কাটলো, আইজ রাইতে যে কী কেয়ামত ঘটে, কে জানে! তার গলায় রীতিমতো উৎকর্ষ। সেভাবেই সে বলে, একসাথে থাকতে পারলে ভালো হতো মাহবুব ভাই। মরলে একসাথে হরতাম।

তাকে অভয় দিয়ে বলি, কিছু হবে না সবে নিও। মনে শুধু সাহস রাখবে।

দু'জনে যখন কথা বলছি, তখন কাল আটটা সাড়ে আটটা। সুবেদার খালেক আসেন পিন্টুর মতোই ক্রলিং ট্রেক্স দিয়ে একদম পরিবর্তিত মানুষ তিনি এখন। কাল রাতের সেই কুক্ষ বদমেজাজি ভাবটা নেই। দিলখোলা গলায় তিনি বলেন, ইয়ানো দাদু আনেরা তো কামাল করি হালাইছেন। সদরদিন সাবে আপনাগেরে ধন্যবাদ দিছেন ওয়ারলেসে। আঁরে কইছেন ধইন্যবাদ আপনাগোরে পৌছাই দিবারলাই।

তাকে জিগ্যেস করি, তিনি ব্যবর নিয়েছেন আমাদের?

— নিতো না, ইয়ানো কি কল? ব্যাকের খৈজ লইছেন। পিন্টু দাদু তো দেখছি রইছেন এইহানে। কেমুন লাগতাহে ফ্রন্ট? কল?

বলি, দারুণ দাদু! আসল যুদ্ধ এটাই। যুদ্ধের ভেতরে থেকে যুদ্ধ দেখছি, যুদ্ধ করছি। বুঝছি যুদ্ধ কাকে বলে!

অভিজ্ঞ সৈনিক বলেন, যুদ্ধটা কোনোদিনই ভালো নয় দাদু। জীবন-মরণ প্রশ্ন এখানে। জীবন দিতে চায় কে কল?

তবুও যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে জীবন দিতে হয়, দিতে হয় বিসর্জন অনেক অমৃত্যু প্রাপ্ত। যুদ্ধকে মানুষ তাই ঘৃণা করে চরমভাবে। তারপরও যুদ্ধকে এড়ানো যায় না কোনোভাবেই। সুবেদার তখন বলেন, অহন কন চাই দাদু আমার নায়েক আর দুই সোলজারের বাঁচাইলেন ক্যামেন!

তাকে বলি, রাতে শেলের আঘাতে প্রায় কবরে পরিষ্ঠত হওয়া ট্রেক্স থেকে নায়েকসহ

তার সঙ্গীদের টেনে-হিচড়ে বের করে তাদের বাঁচানোর বিবরণ। সব শব্দে সুবেদার বলেন, ‘শাবাশ’।

চলে যান সুবেদার এরপর। রাতে যে জোর ফাইট দিতে হবে; যাবার সময় জানান দিয়ে যান সে কথা। হাবিলদার বাবেক আসেন এরপর লম্বা চুলের বাবির দুলিয়ে। দীর্ঘদেহী বলিষ্ঠ গড়নের মানুষটি সারারাত মেশিনগান চালিয়েছেন একটা একরোখা জেদের বশে। ক্লান্তিহীন, বিরতিবিহীন। দারুণ হাসিখুশি মানুষ বাবেক। হৈচে করতে করতে আসেন। মানুষটির সাহস অতুলনীয়। তার চেহারা আব কথাবার্তার মধ্যে রয়েছে সবকিছু ভেঙেছে সামনে এগিয়ে যাবার একটা অদম্য ভাব। রাতের মানুষটির ব্যবহার কেমন রূপক ছিলো। ফ্রন্টে আমাদের আসার ব্যাপারটা তখন তার মনোপূর্ণ হয় নি। অথচ এখন তার হাসিখুশি উৎফুল্ল ভাবসাব দেখে মনে হয়, মাত্র একটা রাতের ব্যবধানে সবকিছুই কতোখানি পরিবর্তন ঘটেছে। ফ্রন্টের বেঁচে থাকা, ঢিকে থাকা সব মানুষই যেনো নিবিড় বদ্ধনে আবক্ষ হয়ে গেছে। ফ্রন্টে এটাই হচ্ছে কর্মরেডশিপ। জীবন-মৃত্যুর যাবাখানে বেঁচে থাকা মানুষগুলো সব বাধ্য হয়েই একে অপরের কাছাকাছি এসে যায়। হাবিলদার বাবেকেরও একই প্রশ্ন। নায়েক ও তার সঙ্গীদের বাঁচিয়েছি কেমন করে। বলি তাকে সে ঘটনা। সব শনেটুনে উদার হাসি হেসে বাবেক বলেন, ব্যাটোরা বাঁচ গেছে, হায়াত ছিলো। তারপর আমাদের দিকে তাকিয়ে ট্রেক্স ইত্যাদি ঠিকঠাক করে নিয়ে রাতের জন্য তৈরি থাকতে বলেই বিদ্রোহী কবির মতো বাবকিছিলিয়ে চলে যান বাবেক।

পিন্টুর সাথে আমাদের কোম্পানির ছেলেদের দল প্রিয়াস নিয়ে আলোচনা করি। বিভিন্ন জায়গায় ছাড়িয়ে থাকা ছেলেদের গুটিয়ে আনা দরকার। ফ্রন্টে ঢিকে থাকতে হলে কোম্পানির পুরো শক্তিকে একত্র করে শক্তি-শক্তির মোকাবেনা করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করি দুঃজনই। আমাদের কোম্পানির মূল শক্তি এল.এম.জিএম. মোতালেব, মধুসূদন, শঙ্খ আর শামসুন্দিনকে প্রয়োজন। প্রয়োজন দুর্ধর্ষ সাহসী ছেলে হাতিয়ার, বাবলু, বকর, মালেক, মঙ্গ আর দীর্ঘদিনের সাথী একরামুলকে। ভেতরগত, সেন্ট্রালান ও তয়াবাড়ি থেকে ওদের ডেকে আনার প্রয়োজনে তিনজন রানার ঠিক করে পাঠিয়ে দেই। ভাগ্নে মন্ত্রা রয়েছে বাবলু আর মতিয়ারের সাথে। সে একা গেছনে থাকবে কী জন্য? বাবলু আর মতিয়ার ওকে হাতিয়ার ট্রেনিং দিয়ে বীতিমতো মৃত্যিযোদ্ধা বানিয়ে ফেলেছে। আসুক সেও। ফ্রন্ট দেখুক। সম্মুখ্যমুক্তের মরণপণ অভিজ্ঞতা আগামীদিনে হয়তো তাকে একটা জেদি আর অদম্য সাহসী মানুষে রূপান্তরিত করবে। মৃত্যিযুক্ত শরিক হওয়ার মহান দাবিদার হওয়ার পাশাপাশি নিজের জীবনেও সে গড়েপিটে নেবার স্মূরণ পাবে যুক্তক্ষেত্রে জীবনবাজি অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করে।

রানাররা চলে যায় ওদের আনতে। পিন্টু চলে যায় তার বাক্সারে। যাবার সময় সে বলে, দোয়া করবেন। আমিও তাকে বলি, ভালো থেকো।

দৃশ্যমান শক্তির বাক্সারের সারি

ক্যাপ্টেন আসেন এর কিছুক্ষণ পর। খৌজখবর নেন আমাদের। তারপর রাতের যুক্তের জন্য কী কী করতে হবে বুঝিয়ে দিয়ে যান। এরপর আসেন সদ্য মূরতি মুজিব ক্যাম্প থেকে বেরিয়ে আসা দু'অফিসার, সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট মাসুদ ও মতিন চৌধুরী। মুক্তিবাহিনীর প্রথম ব্যাচের কমিশন্ড অফিসার তারা। সদ্য ট্রেনিং শেষ করে যোগ দিয়েছেন এ ফ্রন্টে। লে. মতিন চৌধুরী চলে যান রাঙ্গার ডান পার্শ্বে। মাসুদ আমাদের অংশে খৌজ-খবর নিতে

থাকেন। তার গায়ে এখনও ট্রেনিং একাডেমির গুচ্ছ। পুরো ফ্রন্টটাকে এখনো ঝুঁকে উঠতে পারেন নি। সহজ হতে পারছেন না যেনো। তবুও হল্ল কথাবার্তার ভেতর দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করেন আমাদের করণীয় কাজ সমস্কে।

বেলা বাড়তে থাকে। যিষ্ট রোদ শরীরে যেনো ভালোবাসাসিঙ্গ উত্তাপ সঞ্চারে সাহায্য করে। সামনের দিকে তাকাতেই পাকবাহিনীর ডিফেন্স লাইনের বাক্সারগুলো স্পষ্ট ঢোকে পড়ে। চৃপচাপ পড়ে রয়েছে সেগুলো। এখান থেকে সেগুলো দেখায় এক একটা মাথা খাড়া করে থাকা মাটির তিবির মতো। ৩/৪শ' গজের ভেতরে। বাক্সারগুলোর দিকে তাকিয়ে কেমন অবিশ্বাস্য মনে হয় ব্যাপারটাকে। বিজাতীয় একটা অনুভূতিতে গা রিঁ-রি করে ওঠে। একদম চৃপচাপ শক্রপক্ষের ডিফেন্স লাইন। তারাও হয়তো আমাদের মতোই তাদের ডিফেন্স লাইন ঠিকঠাক করছে, আর বিশ্বাম নিয়ে রাতের জন্য হচ্ছে তৈরি। তবুও বিশ্বাস নেই শক্রকে। দিনের বেলা কখন তারা কী করে বসে তার কোনো ঠিক-ঠিকানা নেই।

একটা হেলিকপ্টার ওড়ে মাথার ওপর দিয়ে ঘুরে ঘুরে। কখনো উড়ে গিয়ে সমুদ্বৰ্তী শক্রের অবস্থানের দিকে চলে যায় অনেক ওপর দিয়ে। কখনো ধির হয়ে থাকে মাথার ওপর সোজা। সামনের শক্রদের অবস্থান রেকি করে চলে আকাশে ওড়াউড়ি করে ঘুরে বেড়ানো হেলিকপ্টারটা। আমাদের ফ্রন্ট লাইনের পেছনে কয়েকটা বসতবাড়ি। একটা পাতকুয়ো রয়েছে প্রথম বাড়িটার বাইরের চতুরে। ট্রেক্স থেকে উচ্চতানকেই গিয়ে ভিড় করেছে সেখানে। পানির উৎস পাতকুয়োটা ওদের অন্যতম আস্তরণ। নিরাপত্তার কারণে সেখানে যাওয়া বারণ করা হয়েছে সবাইকে। তারপরও অনেকেই সেখানে যাওয়ার ব্যাপারটাকে আটকানো যাচ্ছে না। ২/৩ দিন ধরে একটানা ট্রেক্স ট্রেক্স-বাক্সারে থাকতে থাকতে অনেকেই পানির স্পর্শ পেতে চাইছে।

বিপদের যা আশঙ্কা করা গিয়েছিল, তাই হলো। পাকবাহিনীর স্মাইপারের গুলি এসে একজনের মাথা ভেদ করে যায়। পাইডানোড়ি-হেটাচুটি পড়ে যায় তাকে নিয়ে। ফ্রন্টের লোকজন দ্রুত সজাগ হয়ে ওঠে। পেছনের বাড়িগুলোর দিকে যাতায়াতের ব্যাপারটা এই ঘটনার পর থেকে একেবারেই নিষিদ্ধ করে দেয়া হয়।

ছেলেরা নির্দেশ অনুযায়ী তাদের নিরাপত্তাবৃত্তি বিধন্ত প্রায় ট্রেক্সগুলো মেরামত করতে থাকে। ট্রেক্সের কোনায় মাটির দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসি। পকেট থেকে নেটবইয়ের মতো দেখতে প্রিয় ডায়োরিটা বের করি। ফ্রন্টে এর মধ্যে যে অভিজ্ঞতা হয়েছে, তা-ই লিখে রাখবার আকৃতি মনের ভেতর প্রবলভাবে সঞ্চয় হয়ে ওঠে। তাই নেটবইয়ের পাতা খুলে লিখি এভাবে :

২৪. ১১. ৭১

"কি লিখি, চারদিকে বোমার যে তাঁবেলীলা চলছে। সামনে পড়ছে, পেছনে ডানে বাঁয়ে সবখানে। একটা খোলা ট্রেক্সের মধ্যে পড়ে আছি আমরা ক'জন। হিলাম গেরিলা ফাইটার। রাতের অক্ষকারে চুপিসারে কাজ সেরেছি এতোদিন। আর আজ আমরা *Front Fighter*, সামনাসামনি যুদ্ধে। আপনি নেই এতে। আমার বরং ভালোই লাগছে। দেশ স্বাধীন ...!"

কলমের কালি শেখ হয়ে যায়। লেখা সম্পূর্ণ হয় না। এরপর কিছুক্ষণ বিম মেরে বসে

থেকে ছেলেদের সাথে লেগে পড়ি কাজেকথে। রাতের শীতের কথা মনে করে বাসারাতকে পাঠিয়ে দিই গড়ালবাড়ি-নালাগঞ্জে। ওখান থেকে নিয়ে আসবে কবল এবং অন্যান্য জিনিসপত্র, ট্রেইন্সবাসী এই আমাদের জন্য যা একান্তভাবে প্রয়োজন।

সারাটি দিন কেটে যায় ট্রেইন ঠিক করে, হাতিয়ার পরিষ্কার করে। পেছন থেকে গোলাগুলির সরবরাহ নিয়ে আসা হয়। ঘেনেডগুলো পরীক্ষা করে নেয়া হয়। দুপুরের খাবার আসে, ভাত আর মাংস, সেই একই কায়দায়। রাতের যুক্তের জন্য সদরগুদ্দিনের নির্দেশ আসে বারবার।

দুপুর গড়িয়ে বিকেল আসে। দ্রুত ফুরিয়ে যায় শীতের বিকেল। সক্ষ্যার আঁধার নামতে থাকে। আর একটা কাল রাত নেমে আসে আমাদের জন্য।

বাবলু, মতিয়ার আর বকরের দল এসে গেছে বিকেলের দিকে। তাদের বাঁ দিককার অবস্থানে দিয়ে ফ্রন্ট লাইন আরো বিস্তৃত করা হয়। এবার রাতের জন্য প্রস্তুতির পালা। আজ রাতে কী ঘটে কপালে তার জন্য এখন আমাদের অপেক্ষা।

গর্জে উঠে পুরো ডিফেন্স লাইন

কড়া নির্দেশ, সক্ষ্যার পর সমস্ত ফ্রন্ট চূপচাপ থাকবে। কমান্ড পোর্ট থেকে ক্যাটেনের নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত কেউই ফায়ার ওপেন করবে না। আজকের রাতের এটাই ট্র্যাটোজি। ফায়ার ওপেন করলেই সমস্ত ফ্রন্ট লাইন শক্তিশালীভাবে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। চিহ্নিত হয়ে যায় ফ্রন্ট লাইনের প্রতিটি পোর্টের অবস্থা। তাই সবাইকে চূপচাপ থাকতে বলা হয়েছে। শক্তকে দ্বিধাদণ্ড এবং ধাঁধায় ফেলেও কৌশল এটা। তারা ফায়ার ওপেন করলেও চূপচাপ থাকতে হবে। নিজেদের সংগৃহীত স্বীকৃত হয়ে আসছে প্রতিরকম নীরবতার ভেতর দিয়ে শক্তকে ধাঁধায় ফেলা যাবে সন্দেহাতীতভাবে। আগুনের প্রতিরকম আজড়াপ্রসর বাহিনীর জন্য এ ধরনের কৌশল সত্যিই মন্ত্রের মতো কাজ দেয়। সদরগুদ্দিন সাহেবের কাছ থেকেও এসেছে এ ধরনের ম্যাসেজ। প্রতিটি কোম্পানির প্রত্যেকে দেয়া হয়েছে একটি করে ওয়ার্কিটকি সেট। এর সাহায্যেই পেছন থেকে শাহরিয়ার এবং সদরগুদ্দিনের আদেশ-নির্দেশ ভেসে আসছে কিছুক্ষণ পরপর। আর সে অনুসরে ফ্রন্ট লাইন কাজ করে চলেছে যদ্রে মতো।

সঙ্কের পরপরই জাঁকিয়ে শীত নেমেছে। আকাশে চতুর্থী কিংবা পঞ্চমীর চাঁদ। হালকা কুঁয়াশার চাদর ভেদ করে চাঁদের আলো কেমন ফ্যাকাশে আর মরামরা দেখায়। সমস্ত ফ্রন্ট লাইন শক্তহীন চূপচাপ। সামনে হাতিয়ারটা শুইয়ে রেখে তার বাঁটে গাল লাগিয়ে সন্তর্পণে ট্রেইনের ওপরে মাথা তুলে কেবল সামনের দিকে তাকিয়ে থাকাই এখন কাজ।

আমাদের ছেলেদের মাথা থালি। হেলমেট নেই। অন্য নিয়মিত কোম্পানির যোদ্ধাদের মাথায় হেলমেট রয়েছে। দীর্ঘদিন প্রতিরক্ষা যুক্তে লিঙ্গ থাকার কারণে তাদেরকে হেলমেট সরবরাহ করা হয়েছে। বিদ্রোহী ই.পি.আর সদস্যরা মুক্তিবাহিনীতে যোগ দেয়ার সময় তাদের সাজপোশাকসহ এসেছে। মূলত এসব পরেই তারা যুদ্ধ করে যাচ্ছে। তাদের সঙ্গে আনা হেলমেট তারা ব্যবহার করতে পারছে। আবার যাদের ছিলো না, তাদেরকেও তা সরবরাহ করা হয়েছে। আমাদের ডান পাশের তিনটি কোম্পানি ই.পি.আর দ্বারা সজ্জিত বলে তারা মোটামুটি সম্মুখ্যযুদ্ধের সাজ-পোশাকেই রয়েছে। কিন্তু আমাদের এফ.এফ কোম্পানি যুক্তের সাজপোশাকে সজ্জিত নয় বললেই চলে। হাইড আউট থেকে ডেকে এনে

গেরিলা থেকে সমুখ্যকে লাগিয়ে দেয়া হয়েছে আমাদের। গেরিলা যুক্তে হেলমেট বা যুক্তের অন্যান্য সাজপোশাকের তেমন কোনো বালাই ছিলো না। কিন্তু সমুখ্যকের জীবত্ত ফ্রন্টে এসে শক্র গোলাগুলির হাত থেকে মাথা রক্ষা করার জন্য হেলমেটের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করি আমরা দারণভাবে। রাইফেল কাঁধে ট্রেক্সের সামনে বুক লাগিয়ে সমুখ্বর্তী শক্র দিকে ঢেয়ে থাকতে থাকতে মাথার ভেতরে কেমন একটা শিরশিরে অনুভূতি হয়। মনে হয়, এই বৃখি শক্র নিষিঙ্গ মরণ গুলি এসে মাথা ভেদ করে চলে গেলো।

হেলমেট নেই, কখন পাওয়া যাবে, আদৌ পাওয়া যাবে কি না, কোনো নিষ্ক্রিয়তা নেই। শীতের কনকনে ঠাণ্ডা আর কুয়াশার চাদরের নিচে তাই আমাদের দাঁড়িয়ে থাকতে হয় ট্রেক্সের স্যান্টসেন্টে ভেজা মাটিতে। সামনে ফ্যাকাশে আলোয় ছাওয়া ফসলের মাঠজোড়া প্রস্তর। আর আমরা, শক্র তাদের অবস্থান ছেড়ে আকস্মিক হামলার জন্য দল বেঁধে কিংবা বিচ্ছিন্নভাবে এগিয়ে আসে কি না সেটা দেখার জন্য নিশাচর শ্বাপনের তীব্র তাঙ্গ দৃষ্টি মেলে সামনে তাকিয়ে থাকি একাধিতা নিয়ে। সমস্ত ফ্রন্টের একই অবস্থা নিঃশব্দ সাড়া-শব্দহীন।

রাত দশটা সাড়ে দশটা পর্যন্ত সবকিছু ঠিকঠাক নির্দেশ মতোই চলে। ফ্রন্ট কমান্ডারের নির্দেশ অনুযায়ীই ফ্রন্ট লাইন থাকে একেবারে চুপচাপ। কিন্তু তারপরই আকস্মিকভাবে ভেঙে যায় এই নীরবতা। খালেকের বি কোম্পানির ডান পাশে সুবদার হাজি সাহেবের কোম্পানির অবস্থান। সেখান থেকেই কে একজন অভিজ্ঞাসাহীর হাতিয়ার হঠাতে করেই গর্জে ওঠে। আর সেই সাথে গর্জে ওঠে আরো ক'জনের স্মার্তয়ার। সাথে সাথে আরো বেশ ক'জনের। স্বাভাবিকভাবেই তখন জেগে ওঠে সমস্ত ফ্রন্ট লাইন। শুরু হয়ে যায় গুলির ফুলবুরি। চুপচাপ ছিলাম আমরা। তখনে কন্ট্রুলার সদরদিন কিংবা শাহরিয়ারের নির্দেশ আসে নি। হঠাতে করে এভাবে শক্র উদ্বেগে ফ্রন্ট জুড়ে গুলিবর্ষণের ফলে শক্রও বসে থাকে না। প্রচণ্ড দাপটে শুরু করে তারা প্রতিজ্ঞাক্রমণ। গুলির স্রোত বয়ে যেতে থাকে মাথার ওপর দিয়ে। না, আর চুপচাপ থেকে যায় না। আমার কোম্পানির ছেলেদেরকেও নির্দেশ দিলাম কাজ শুরু করার। স্মিন্টয় হয়ে উঠলো ঠাণ্ডায় জমে যাওয়া হাতিয়ার হাতে অপেক্ষামাণ ছেলের দল। পুরো ফ্রন্টের সাথে আমাদের বাঁ পাশের ফ্লাঙ্কও যোগ দিলো। অনবরত গুলিবর্ষণে মুখরিত হয়ে উঠলো সমস্ত ফ্রন্ট। কিন্তু শুণের ভেতরেই শুরু হয়ে যায় শক্রপক্ষের আর্টিলারি আক্রমণ। পেছন থেকে তার প্রতিউত্তর দিতে থাকে আমাদের মুজিব ব্যাটারি আর মিত্রবাহিনীর কামান বহর। যুক্ত শুরু হয়ে যায় পুরোদস্তুর মতো। মহাদক্ষযজ্ঞ বেঁধে যায় অলঙ্কণের ব্যবধানেই দু'পাশের প্রতিরক্ষা লাইন এবং মধ্যবর্তী '৩/৪শ' গজের 'নো ম্যান্স ল্যান্ড' জুড়ে। গতরাতের ভয়াবহ যুক্তের পুনরাবৃত্তি শুরু হয়ে যায়।

শক্র এগিয়ে আসছে, ঠেকাও তাদের 'ডু অর ডাই'

রাত ১২টার পর শক্র পক্ষের চাপ বেড়ে যায় বহুগণে। সেই সাথে মুহূর্হূর ছুট আসতে থাকে তাদের বর্ষিত কামান ও মর্টারের গোলা। গতকালের রাতের মতোই তছনছ করে দিতে থাকে সেই গোলার আঘাতে সবকিছু। থরথর করে কাঁপতে থাকে মাটি। উড়ে আসতে থাকে মৃত্যুবাণ একটার পর একটা তাদের প্রচণ্ড ধূসাম্মক শক্তি নিয়ে। যারা আহত হলো, তারা কাতরাতে কাতরাতে তাদের সহযোগিদের ঘাড়ে-কাঁধে ভর দিয়ে চলে যেতে লাগলো কলিং ট্রেক্স দিয়ে চিকিৎসা সাহায্যের জন্য নিরাপদ দূরত্বে।

এই রকম লড়াইয়ের ভেতরেই একসময় বোৰা গেলো, শক্রপক্ষ এগিয়ে আসছে। তাদের উপস্থিতি সম্বন্ধে আমাদের অবস্থানের প্রায় সামনাসামনি। অনুমান করি, ওরা আমাদের থেকে পক্ষগুলি কিংবা একশ' গজের ব্যবধানে। শক্র একদম বলতে গেলে, নাকের ডগায়। এই রকম পরিস্থিতিতে মাথা ঠাণ্ডা রাখা একেবারেই অসম্ভব। তাই শরীর জুড়ে একটা অস্ত্রিতার প্রচণ্ড দাপাদাপি। শরীর ঘামে নেয়ে যাবার যোগাড়। গলা শক্রিয়ে আসছে। কিন্তু এর ভেতরেই কাজ করে যেতে হয়। নিজের বিবেচনা খাটিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হয়। স্থির আটল থাকতে হয় শক্রকে মোকাবেলা করার জন্য।

অবস্থায় নির্দেশ দিই ছেলেদের প্রত্যেকের রাইফেলের মাথায় বেয়নেট লাগিয়ে নেয়ার জন্য। যাদের কাছে বেয়নেট ছিলো তারা বটপট তাদের রাইফেল ও এস.এল.আর.-এর মাথায় তা লাগিয়ে নেয়।

আমার নিজেরও পিয় স্টেনগানটা ট্রেক্সের গায়ে হেলান দেয়া ছিলো। তুলে নিই সেটা হাতে। সবাইকে ওনেড নিতেও বলি।

অনুমান করতে কষ্ট করতে হয় না যে, শক্রপক্ষ এসেই সোজা ঝাপিয়ে পড়ে আমাদের ঘাড়ের ওপর। শুরু হবে হাতাহাতি লড়াই। রাইফেল তখন হয়ে যাবে লাঠি। শক্রের তীক্ষ্ণ চকচকে বেয়নেট গিয়ে ঢুকবে আমার বুকে যদি না তার আগেই আমি সেটা তার বুকে বিন্দ করতে পারি। শক্র এগিয়ে আসছে। তাদের শুলির ক্ষেত্রে যেনে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে আমাদের। মনে হয়, এই বুর্বুরি এলো তারা। এসে ঝাপিয়ে পড়লো আমাদের ট্রেক্সে। না, আমাদের মরিয়া শুলিবর্ষণও তোয়াক্ত করছে না তারা। এগিয়ে আসছে বাধাহীন বুনো পয়োরের মতো।

হঠাৎ মাথায় রক্ত উঠে যায়। আর হেঁজ হয় নিশ্চিত মৃত্যুর কথা ভেবে। শক্রপক্ষকে ঠেকাতেই হবে। তাই নির্দেশ পাওয়া যাবে ওনেডের পর ওনেডে ছুটে যেতে থাকে সামনে আর তীব্র ঝলকানি তুলে সেগুলুকে বিক্ষেপিত হতে থাকে। অবিশ্বাস্য শুলিবর্ষণ আর পাশাপাশি ওনেডে ছোড়ার কাছে সামনে চলতে থাকে। নারকীয় তাওর চলছে আমাদের সামনে এখন। সেই তাওর-দৃশ্য অবশ্যনীয়। কী অবাক ব্যাপার! সমস্ত ভয়-ভীতি মন থেকে এখন উৎপাদিত এবং হালকা হয়ে গেছে শরীর-মন। মারা পড়তে পারি যে-কোনো মৃত্যুর্তে কিংবা এখনই, এ অনুভূতি এখন আর নেই। মনের গভীরে এখন একটাই অনুভূতি কাজ করে চলে গুধ। আর সেটা হলো, যে যেভাবেই হোক শক্রের অগ্রগমন ঠেকাতে হবে। অন্য সবারও অনুভূতি আর চেষ্টা—শক্র ঠেকাও। মৃত্যুর বিনিময়ে হলেও।

ঠেকিয়ে দেয়া হলো শক্রদের

এরকম অবস্থায় ট্রেক্সের মেঝেয় একসময় বসে পড়ি আর ওয়াকিটকি সেটে কমান্ডারের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা চালাতে থাকি।

— টু ফোর ওয়ান, টু ফোর ওয়ান ডু ইউ হিয়ার মি? ওভার। দু'বার ডাকতেই পেছন থেকে কমান্ডারের সাড়া মেলে।

— ওয়ান ফোর টু, ওয়ান ফোর টু, লাউড আ্যান্ড ক্রিয়ার। ওভার।

— জেকলস্ আর কামিং। দে ক্যান জাপ্প আপন আস আ্যানি মোমেন্ট। ওভার।

— হাউ ফাৰ দে! ওভার।

— ফোরটি টু ফিফটি ইয়ার্ডস্ ইনফ্রন্ট অব আস। ওভার।
— স্টপ দেম বাই এনি মিন্স। ডেন্ট আলাও বাটারডস্ ওভার রান ইয়োর পজিশন।
স্টপ দেয়ার ফারদার অ্যাডভাস। ওভার।
— ওকে স্যার, উই আর ট্রাইং। আই হ্যাত টু ক্যাঞ্জুয়েলটিজ। অ্যারেঞ্জ দেয়ার
রেসিকিউ। উই নিউ পটেটোস (এ্যামুনেশন্স) ইমিডিয়েটলি। ওভার।
— ও.কে। ইউ উইল গেট সাপ্লাই সুন। ওভার।
— হ্যালো টু ফোর ওয়ান। প্রিজ কনট্রো। দোস টু হাইলস্ ফায়ার ব্রিগেড। আস্ক
কুইক স্প্রেইং ফায়ার (আর্টিলারি সাপোর্ট)। উই নিউ ইট ব্যাডলি। ওভার।
— ও.কে গেটিং ইট উইদ ইন মোমেন্ট ওভার।
— প্রে ফর আস। জয় বাংলা। ওভার।
— উইশ ইউ সাকসেস। জয় বাংলা। ওভার।

পাঁচ মিনিটের ভেতরেই কমাত্তারের প্রতিক্রিতি আর্টিলারি সাপোর্ট এলো। পড়তে লাগলো
সেগুলো ৫০/৬০ গজ সামনে। দিগন্ত কাঁপানো বিস্কোরণ ধ্বনি তুলে ফাটতে লাগলো
সেগুলো।

পেছনে গোলাবারুদ নিয়ে এলো একটা ছেট গ্রাপ। একেজনের হাত রক্ষে ভিজে গেছে।
আসবার সময় গুলিটা লেগেছে তার। তবু সে এসেছে অঙ্গীর সময় আহত দু'জন ছেলেকে
সাথে নিয়ে যায় তারা।

রাত তিনটির পর থেমে গেলো শক্র বাহিনীর গোলাগুলি। বোৰা গেলো, তারা পিছিয়ে
গেছে। প্রবল আক্রমণ রচনার পর ধীরে ধীরে কমতে কমতে একসময় একেবারেই থেমে
যায় তাদের গোলাগুলি। আরো কিছুক্ষণ একাধারে গুলি চালিয়ে আমাদের ফ্রন্টও থেমে
যায়। দু'পাশের গোলাগুলি তাওবাহীরা থেমে যাওয়ায় সমস্ত মুদ্রাক্ষেত্রে নেমে আসে মৃত্যুর
একটা হিম নীরবতা।

কিন্তু একটুক্ষণ পরই ওদেরদিক থেকে শুনতে পাই কিছু চিক্কার ধ্বনি গোলমালের শব্দ,
মুখে হাত দিয়ে লা-লা ধরনের শঁঝনধ্বনি। ডান দিকে বেশ কিছুটা সামনে এসে তাদের
একটা দল বলতে থাকে, শালে মুক্তিকা বাচা, শালে ইন্ডিয়া কা দালাল, শালে বা...। শালে
ইন্দিরা কা দালাল... ইত্যাদি। ইত্যাদি। বেশ কিছুক্ষণ ধরে অশ্রু ভাষায় এ ধরনের আরো
গালাগালি, মুখ দিয়ে লা-লা ধ্বনি আর চিক্কার দিয়েতিয়ে চুপ মেরে যায় তারা। কিন্তু তাদের
এ ধরনের চিক্কার আর গালিগালজ কেনো? তারা যুদ্ধ-ই-বা থামিয়ে দেয় কেনো? সে
ব্যাপারটাও বুঝতে পারি না; কিন্তু শক্র পাকবাহিনীর এ ধরনের ইতরামোর কোনো জবাবে
গুলিবর্ষণ করা হয় না। সমস্ত ফ্রন্ট নীরব হয়ে গেছে। নীরবই থাকে।

কিন্তু আমার জিজাসু মনে কেবল একটাই প্রশ্ন এবন, তারা এভাবে হঠাত করে চুপ মেরে
গেলো কেনো? থেমে গেলো কেনো ওদের গোলাগুলি? মনের ভেতরে সন্দেহ দানা বাঁধে।
তবে কি ওরা চুপিসারে আসছে অঙ্ককারে গা ঢাকা দিয়ে? উড়িয়ে দেয়া যায় না। বিশ্বাস নেই
শক্র পাকবাহিনীকে। সুতরাং আবার অপেক্ষা। রাইফেলের মাথায় বেয়েন্ট লাগিয়ে।
গ্রেনেডের পিনে হাত দিয়ে আগের মতোই শক্রদের অভ্যর্থনা জানানোর জন্য আবার
অপেক্ষা করতে থাকি শিশির ভেজা ট্রেঞ্চে বুক ঠেকিয়ে।

জগদলহাট দখলে এলো, সামনে পঞ্চগাঢ়

রাত সাড়ে চারটায় ওয়াকিটকি সেট কথা বলে উঠলো, ওয়ান ফোর টু, ওয়ান ফোর টু কলিং
টু ফোর ওয়ান। ড্রু ইউ হিয়ার মি? ওভার।

কমান্ডার সদরবাদিন ডাকছেন সেটে। জবাব দিই দ্রুত, টু ফোর ওয়ান, টু ফোর ওয়ান।
লাউড অ্যান্ড ক্লিয়ার। ওভার।

— রেডি টু মুভ ওভার জগদলহাট। ড্রু ইউ হিয়ার মি? ওভার। কমান্ডার জগদল শক্ত
ঘাঁটিতে যাবার নির্দেশ দিচ্ছেন। ফ্রন্ট ছিলো একটা জাহাত আগ্রেডাগিরির মতো। কিছুক্ষণ
হলো যুক্ত বক্ষ হয়েছে। শক্তিরা এখন চুপচাপ। ওদের মতিগতি বোঝা যাচ্ছে না। এর মধ্যে
কমান্ডারের কাছ থেকে নির্দেশ আসে জগদলহাট যাবার। ভয়াবহ একটা বুকি রয়েছে এর
মধ্যে। বুকের ভেতর হাঁটাঁ করেই যেনো একটা ধাক্কা লাগে। নিজেকে সামলে নিয়ে
জিগ্যেস করি, ইজ ইট নাউ? হোয়াট উড বি দ্য নাস্বার? ওভার।

— হাউ মেনি বয়েজ ইউ হ্যাত? ওভার।

— ইন লেফ্ট ফ্লাক উই আর এবাউট সিক্রাটি নাস্বারস্ ওভার।

— ও,কে মেক রেডি নাইন বয়েজ। দে উইল বি ওয়েল ইকুইপ্ড। মেক দেম রেডি
উইদেইন টেন মিনিটস্। রিমেব্রা দিস ইজ অলমোট আ সুইসাইড ক্লোড। ওভার।

— ও,কে স্যার, দে উইল বি রেডি ইন টাইম। ওভার।

— হ লিডস দ্য এপ? ওভার।

— ইট ইজ বাবলু। শহিদুল ইসলাম বাবলু স্যাহস্রভভার।

— ক্যান ইউ রিলাই অন হিম? ওভার।

— ইয়েস স্যার। হ্যান্ডেট পারসেন্ট। ওভার।

— দেন লেট দেম স্টার্ট অ্যাট ফাইভ সাচ্চ ফিফটিন। ওভার।

— ও,কে দে উইল স্টার্ট ইন ফিফটিন। লেট মি ক্লিয়ার হোয়াট দে উইল ড্রু? হোয়াট ইজ
দেয়ার টাক্ষ? ওভার।

— দে উইল মুভ, রেকি, গেট অন দেয়ার পজিশন, চার্জ বাক্সারস, অকুপাই দেম। জাট
দে উইল সি হোয়েদার এনিমি স্টিল হোল্ডিং দ্য পজিশন অর দে রিট্রিটেড। ইফ দে ফাইভ
অল ক্লিয়ার দেয়ার সিগনাল উইল বি জয় বাংলা। ওভার।

— ও,কে স্যার, দে উইল ড্রু দেয়ার জব। ওভার।

— টেল দেম মাই দোয়া অ্যান্ড উইশেস গুডলাক। জয় বাংলা। ওভার।

— জয় বাংলা। ওভার।

পাঁচটা পানেরো মিনিটে ওরা রওনা দেয়। ওরা ন'জন। সাহসী আবেগচক্ষল আর
রোমান্টিক ছেলে বাবলু। রংপুরের নাগেশ্বরীতে বাড়ি। কলেজের প্রথমবর্ষের ছাত্র। টগবগে
তাজা প্রাণের একেবারেই তরুণ ছেলে সে। আজ সুইসাইড ক্লোডারে নেতৃত্ব তার ওপর।
ডিফেন্স লাইনের পেছনে কুয়াশা মোড়ানো হিমেল রাতশেষের অন্ধকারে এক চিলতে ফাঁকা
মতো জায়গায় ওদের ফল-ইন করা হয়। ত্রিফ করি ওদের করণীয় সম্পর্কে। জগদলহাট
দখলে এলে সিগনাল হবে 'জয় বাংলা' এটাও জানিয়ে দিই ওদের। এরপর ফ্রন্ট লাইনের
সামনে দিয়ে সিঙ্গেল ফাইলে এগুতে লাগলো ওরা শক্ত ঘাঁটির দিকে।

আমরা অপেক্ষায় থাকলাম। অত্যন্ত অস্থির সে অপেক্ষার কাল। সমস্ত ফ্রন্ট লাইন

চূপচাপ শব্দহীন। তোরের আলো চিরে চিরে অঙ্ককারকে তাড়িয়ে দিছে। একেবারে পিন-পতন নীরবতা নিয়ে সমস্ত ফ্রন্ট অপেক্ষ্যমাণ। ফ্রন্টের সমস্ত পোস্টে জানিয়ে দেয়া হয়েছে বাবলুদের এই বিগজ্জনক অভিযানে যাওয়ার কথা। যে-কোনো পরিস্থিতি মোকাবেল করবার জন্য পুরো ফ্রন্ট সতর্ক অবস্থায় তৈরি হয়ে আছে।

দারণ অস্থিরতা আর অনিয়ন্ত্রিত আমাকে ছটফটিয়ে মারছে। বারবার ট্রেইনের উপর মাথা তুলে দেখবার চেষ্টা করছি সামনের দিকে, যেখানে অঙ্ককার শীতের কুয়াশার চাদরের সাথে মাধ্যামিক হয়ে আছে। প্রায় ‘পাঁচশ’ গজ সামনে পাকা সড়কের ধারে পাকবাহিনীর মুক্ত জগদলহাট ঘাঁটি। রাত তিনিটে পর্যন্ত ওরা তুমুল গোলাগুলি চালিয়ে বজায় রেখেছিলে আমাদের উপর ওদের আক্রমণধারা।

শেষ পর্যন্ত ওরা নয়জন গোলো সেখানে। বাবলু ওদের কমান্ডার। মতিয়ার, হাবিব ও বকরের মতো উজ্জ্বল ছেলেরা রয়েছে তার সাথে। মুরাও ভিড়ে গেছে এই দলের সাথে। ওকে আটবে রাখা যায় নি। ওদের নেজনের সুইসাইড ক্লোডের দল। ওরা কি পৌছুতে পারবে তাদের উদ্দিষ্ট লক্ষ্য? ওরা কি ফিরে আসতে পারবে আবারও আমার প্রিয় ছেলেদের আমি পাঠিয়েছি। গত সাত মাসের সহ্যাত্মী ওরা আমার। বড় অস্থির লাগছে। এই নিঃসাড় অপেক্ষা যেনো অনন্তকালের।

হঠাৎ একটা শব্দ হয়। অস্পষ্ট। তারপর আবার। এবার আরো জোরে। গভীর মনোযোগ দিয়ে শব্দটার মানে বুঝবার চেষ্টা করতেই সমস্ত শরীরে ঝড়দে শিউরে ওঠে। জয় বাংলা ধ্বনির সিগনাল পাঠাচ্ছে ওরা। তার মানে জগদলহাট দখলে এসেছে ওদের। তাহলে খানেক দল চম্পট দিয়েছে তাদের ডিফেন্স ছেড়ে।

আহ, জয় বাংলা স্লোগানের ধ্বনি কানে পড়ে অবশ্যে। সমস্ত শরীর যেনো অবশ্য হয়ে আসে। স্বত্ত্ব! স্বত্ত্ব! একটা অবদমিত মানবসংক্রান্ত চাপ থেকে মুক্ত হয়ে নিজীবের মতো বসে পড়ি ট্রেইনের মেবেতে। মুহূর্তে সমস্ত ফ্রন্ট ফ্রন্টইন জেগে ওঠে। মুহূর্ত ‘জয় বাংলা’ ধ্বনি তোরের আকাশ-বাতাস মুখ্যরিত করে তোমে। সমস্ত ফ্রন্টে বয়ে যেতে থাকে আনন্দের বন্যা।

ততোক্ষণে সূর্যের রাতিম আতা পুবের আকাশকে সোনালি রঙে রাঙিয়ে তুলেছে জগদলহাট শক্রঘাটি তাহলে দখলে এলো আমাদের! ব্যাপারটা কেমন অবিশ্বাস্য লাগে কিন্তু এটাই এখন বাস্তব। চারাদিন ঘোরতর যুদ্ধের পর পাকবাহিনী তাদের ডিফেন্স ছেড়ে দিয়ে পিছু হটেছে। আমার কোশ্পানির কঞ্জন দৃঢ়সাহসী তরুণ সূর্যোদয়ের সাথে সাথে সেটি দখল করার কাজ সম্পন্ন করেছে। নির্মল এক আনন্দে ভরে ওঠে হনুয়। আপন মনেই বলি কমান্ডার নিচয়ই খুশি হয়েছেন। তাঁর আস্থা আর বিশ্বাসের মূল্য আমরা দিতে পেরেছি।

ওয়াকিটকি সেটে কমান্ডারের গলা আবার ভেসে আসে। তিনি ধন্যবাদ জানান। আনন্দ আনন্দিকাতার সাথে এ-কাজের সফলতার জন্য।

জগদলহাট অবশ্যে মুক্তিবাহিনীর দখলে এলো। আর সেই দখলের জন্য তৃত্বান্বিত অপারেশনটি করতে হলো আমাদের। এবার সামনে পঞ্চগড়।

২৫.৩৩.৭:

গড়া হবে শৃঙ্খলসৌধ, রচিত হবে বীরতৃণাধা

সকাল সাড়ে সাতটার দিকে অ্যাডভাপ্স করার নির্দেশ আসে। সদরবন্দিন সাহেব ওয়ারলেসে মাধ্যমে প্রত্যেক কমান্ডারকে তাদের দল নিয়ে দ্রুত পেছনে পাকা সড়কের পাশে জমায়ে

হতে বলেন।

অমরখানা পতনের পর মুক্তিবাহিনী এগিয়ে এসে চৈতনপাড়া এলাকার এ জায়গায় ফ্রন্ট গেড়ে বসেছিলো গেলো ২০ তারিখে। সুইচের দিনেই। আজ নভেম্বরের ২৫ তারিখ। গত কটা দিন ধুক্কার মুক্তের ভেতর দিয়ে কাটাতে হয়েছে ফ্রন্টবাসী ঘোষাদের। যুক্তে যুক্তে এককার হয়ে শিয়েছিলো এ ক'দিনের প্রতিটি পল, অনুপল। সে ছিলো এক বিভীষিকাপূর্ণ সময়। বিশেষ করে রাতগুলো ছিলো এক একটা দিব্য দৃঢ়স্বপ্নের মতো। এই সময়ের ভেতরে ঝরে পড়েছে অনেকগুলো মূল্যবান জীবন। আহত অবস্থায় চলে গেছে অনেকে পেছনদিককার ফিল্ড হাসপাতালে। কিন্তু বেঁচে রয়েছি আমরা অনেকে। আর এই বেঁচে থাকার সুবাদে আমাদের আবার ডাক এসেছে সামনে এগিয়ে শিয়ে শক্তকে মোকাবেলা করবার।

শুরু জগদলহাট থেকে পালিয়ে যাবার পর থেকে পুরো ফ্রন্টে হচ্ছোড় আর মাতামাতি চলছে। সকালের সোনালি সূর্যের আলোয় ট্রেঞ্চবাসী সবাই উঠে এসেছে। চলছে কুশল আর আনন্দ বিনিময়ের পালা। পিন্টু ছুটে এসেছে তার ট্রেঞ্চ থেকে। সেই সজীব প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপূর যুবক। রঙ-তামাশায় ফিরে এসেছে তার আসল ফর্মে।

সে বলে, কেমন ল্যাজ তুলি ভাগিল খান সাহেবেরা দেইখলেন মাহবুব তাই?

আমিও মশকুরা করার জন্য বলি, ভাগছে তো ঠিক, কিন্তু যাবার সময় কী বলে গেছে কও তো?

— শালারা গাইল দিয়া গেল!

— কী গাইল কও তো? হাসিতে ফেটে পড়ে পিন্টু বলে, শালারা হামাক কয়া গেল, মুক্তিকা বাচ্চা, ইন্দিরা গান্ধী কা দালাল...। কন্তে কেমন বেইজ্যতি?

— তাদের গলা চিনে রেখেছো তো?

— কেনো? প্রশ্ন শনে এবার থমকে থাকে পিন্টু।

— তাদের ধরতে হবে না? এন্দেশ দিবড়ে নিয়ে শিয়ে ধরে ফেলবো আমরা। কাউকে না কাউকে তো পাওয়া যাবেই, কিন্তু...

— ধরতেই হবে মাহবুব তাই। যাবার আগে তাদের গাল, শালে মুক্তিকা বাচ্চা, শালে ইন্দিরা কা দালাল-এর বিচার করতেই হবে।

সব ছেলে দল বেঁধে কথা শোনে। নিজেদের মধ্যেও কথা বলে। জগদলহাট পতন মানে এখানকার যুক্ত শেষ। এ ক'দিনের যুক্ত বিভীষিকা সবার বয়স বাড়িয়ে দিয়েছে যেনো। চরম দৃঢ়স্বপ্নের দিনরাত শেষ হয়েছে আপাতত। এতেই সবার ইষ্টি। এতেই সবার আনন্দ। তাই সবাই প্রাণ খুলে হাসে। কথাও বলে প্রাণ উজাড় করে। তারা যাবার সময় গাল দিয়ে আমাদের ফ্রন্টকে অপমান করে গেছে, পিন্টুর এই রসিকতা ভরা অভিযোগ নিয়ে আলোচনা যখন জমজমাট, তখনি কমান্ডারের গলা ভেসে আসে সেটে। তিনি পেছনে শিয়ে রাস্তার পাশে সমবেত হওয়ার নির্দেশ দিচ্ছেন যতো তাড়াতাড়ি সভ্ব।

সমস্ত ফ্রন্টে গোছগাছ শুরু হয়ে যায়। পিন্টু চলে যায় তার অবস্থানের দিকে। যাবার আগে বলে যায়, মরি-বাঁচি এবার কিন্তু আমরা একসাথে থাকবো।

মাথা নেড়ে সম্মতি দিয়ে তাকে দ্রুত পেছনে নির্দিষ্ট স্থানে আসার জন্য বলে দিই। পিন্টু যায় ওর নিজের মতো করে। ট্রেঞ্চবাসীদের সাথে কুশল বিনিময় করতে করতে। এবার সে যায় ট্রেঞ্চ-বাক্সারের সামনে দিয়ে, পেছনদিককার ত্রিলিং ট্রেঞ্চ দিয়ে নয়।

ফ্রন্টে আসবার প্রথম রাতে শক্রপক্ষের তুমুল গোলাগুলি বর্ষণের ভেতরে নিজেকে মাটির তলায় লুকিয়ে রাখবার একটা প্রাণপণ তাগিদ ছিলো । দুদিন আগেকার ট্রেক্স যা এখন বিহুষ্ট প্রায়, ছাড়েন্টে কষ্ট হচ্ছিলো । এই রকম একটা বোধ সক্রিয় হয়ে উঠেছিলো মনের গহনে যে, মানুষ মরে গেলে এমনি একটি গর্তে তাকে সমাহিত করা হয় । সেখান থেকে তার আর কোনোদিন উঠা হয় না । আমরা জীবিত অবস্থায় দুদিন আগে ঠিক এমনি একটা গর্তে চুকেছিলাম । তারপরও জীবিত অবস্থায় সেখান থেকে উঠে এসেছি আজ । কী রকম আচর্য লাগে । অথচ অনেকেই সেটা পারলো না । এই গর্তগুলিতে হারিয়ে গেল চিরদিনের জন্য ।

ভাগ্য বিশ্বাসীদের মতো বলতে হয়, আমরা নিচ্যাই ভাগ্যবান । হতভাগ্যরাই কেবল হারিয়ে গেলো । মনে মনে আরো ভাবি, এই ফ্রন্ট, এই বাঙার-ট্রেক্স আমরা অবিকৃতভাবে রেখে দেবো যুগ যুগ ধরে । চিরকালের মতো হারিয়ে যাওয়া এই সব শহীদের নাম-ঠিকানা ঝুঁজে বের করে তাদের শ্মরণে গড়ে তুলবো একদিন আমরা বিরাট বিরাট সব শৃতিসৌধ । আমাদের বংশধররা আসবে এখানে, দেখবে তারা '৭১-এর স্বাধীনতা যুদ্ধের একটা জীবন্ত ফ্রন্টের রূপ ছিল কী ধরনের! তারা শুন্ধা জানাবে এখানকার শহীদের প্রতি । তাদের নিয়ে বীরত্বগুরু রচিত হবে, আলোচিত হবে তাদের অবদানের কথা মুখে মুখে । মনের ভেতরে শপথের মতো এটা আলোড়িত হতে থাকে, আমরা এখানে বারবার আসবো । যেদিন আমাদের সেই দুদিন আসবে, দেশটা যেদিন হানাদারূমুক্ত করে স্বাধীন করতে পারবে আমরা ।

ইঠাং ভাবনায় ছেদ পড়ে মোসারদ পাগলার কথায় যে জানায়, সবাই রেডি । একরামুল ও মুসাসহ দলের সবাই উঠে এসেছে ।

ট্রেক্সটার জন্য আমার সভ্য সভ্য কেমন শুক্ষ্ম মায়া জন্মে গিয়েছিলো । স্বল্প সময়ের জন্য থাকবার সুযোগ হয়েছে এখানে । কিন্তু কেমন বুক দিয়ে রক্ষা করেছে আমাকে এবং আমার সঙ্গী দুজনকে ।

ওয়ারলেন্সে আবার ডাক আসে, এখানে আর নয় । এবার এখান থেকে যেতে হবে । সামনে রয়েছে আরো কঠিন যুক্তি এমনি হয়তো অনেক ট্রেক্স-বাস সামনে রয়েছে । তবুও শেষবারের মতো ট্রেক্সের গভীরে তাকিয়ে দৃঢ়তে ভর দিয়ে বেরিয়ে আসি সেখান থেকে । তারপর এগিয়ে চলি সবাইকে নিয়ে পাকা রাস্তার পাশে নির্দেশিত জয়মায়েত স্থলের দিকে ।

জয়মায়েত

চৈতনপাড়া পাকা সড়কের পাশে ভেঙেপড়া ঢিনের ছাপরা দেয়া মক্কবের সম্মুখবর্তী মাঠে আমরা সবাই সমবেতে হলাম । নিয়মিত মুভিফৌজ আর আমাদের এফ.এফ কোম্পানিসহ মোট ৪টি দল । বর্তমানে এই ফ্রন্টের শক্তি দাঁড়িয়েছে পুরো একটা ব্যাটেলিয়নের সমান । নিয়মিত অফিসার এখন চার চারজন । কোয়ার্ট্রন লিডার সদরদিন, ক্যাপ্টেন শাহরিয়ার আর সদ্য পাসিং আউট হয়ে আসা নবীন দুই অফিসার লেফটেন্যান্ট মাসুদ এবং লেফটেন্যান্ট মতিন চৌধুরী ।

সুবেদার খালেক, মোসাদেক ও হাজি সাহেবে এরা সবাই তাদের কোম্পানি নিয়ে ব্যস্ত । পিন্টু, মুসা, একরামুল ও আমাদের কোম্পানির ছেলেদের 'ফল-ইন' করিয়ে ফেলেছে এরি মধ্যে । ঠিক এই সময় দূর থেকে একটা খোলা জিপ আসতে দেখা যায় । ওটা আসছে সদ্য দখল করা এলাকা জগদলহাটের দিক থেকে ।

জিপটা এগিয়ে এসে থামে পাকা সড়কে । আর থামতেই কাঁধে স্টেনগান ও মুখভর্তি

দাঢ়ি-পৌষ্টির জঙ্গল নিয়ে অবিন্যস্ত বেশবাসে নামলেন তার থেকে সা-ব-সেষ্টের কমান্ডার সদরুন্দিন। যুদ্ধজয়ের আনন্দে উজ্জ্বল তার চোখমুখ। ক্যাপ্টেন শাহরিয়ার ও লেফটেন্যান্ট মাসুদ আর মতিন চৌধুরীকেও দেখা গেলো জিপ থেকে নেমে তার পেছন পেছন আসতে। সুবেদার মেজর কাঞ্জিমাট্টিনও পেছন থেকে এসে গেছেন ততোক্ষণে। তিনি সমবেত সব ক'টি দলকে 'ফ্ল-ইন' করিয়ে তাদের অ্যাডভাল করার জন্য তৈরি করে ফেলেছেন এরি মধ্যে। অপেক্ষা করা হচ্ছিলো সা-ব-সেষ্টের কমান্ডারের জন্য। তিনি চূড়ান্ত ব্রিফিং দিয়ে অ্যাডভালের নির্দেশ দেবেন। তিনিও এসে পৌছেছেন ক্রন্টের অফিসারদের নিয়ে। সমবেতভাবে তাঁকে সশ্রান্ত জানানো হয়। সুবেদার মেজর তাঁর কাছে রিপোর্ট পেশ করেন সবগুলো দলের সংখ্যা আর শক্তি সম্পর্কে। আমরা দাঢ়িয়ে আছি স্ব-স্ব কোম্পানির সামনে।

সদরুন্দিন সাহেব সবাইকে লক্ষ্য করে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখলেন। ধন্যবাদ জানালেন সবাইকে এ বিজয়ের জন্য। তারপর তিনি শত্রুর বর্তমান অবস্থানের দিকে এগিয়ে যাওয়ার কৌশল সম্পর্কে ব্রিফ দিলেন। তার পেছনে দাঁড়ানো তিনি অফিসার। সফল যুদ্ধ পরিচালনাকারী হিসেবে এ বিজয় তাদের জন্যও বিরাট গৌরব বয়ে এনেছে। সোনালি ঝোদের আলোয় আনন্দ ঝলমলে মুখে দাঢ়িয়ে থাকেন তারা কমান্ডারের পেছনে এবং সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন সামনে দাঁড়ানো ক্রন্ট যুদ্ধের ফ্ল শক্তি সারবক্ষ সহকর্মী যোদ্ধাদের প্রতি।

হঠাৎ কী হয়, সদরুন্দিন সোজা এগিয়ে আসেন আমার স্বার্থসামনে। এসে হাত রাখলেন আমার কাঁধে। মুখে তার পরিচিত আপন মানুষের হাত। তিনি বললেন, ইয়েস বয়, ইউ ডিড দ্য ওয়ার্ডারফ্ল জব। ধন্যবাদ তোমাকে আমার স্বার্থস্বার পক্ষ থেকে।

সা-ব-সেষ্টের কমান্ডার সমবেত সবার সম্মতি আমাকে এভাবে প্রাণ খুলে ধন্যবাদ জানাবেন তার জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিল মুশ্টি। আমি। এ অবস্থায় একটা অভাবিত আবেগ যেনো ভর করে আমার ওপর। বুকের প্রতি থেকে গলা ঠেলে বের হয়ে আসতে চায় একটা কিছু। চোখে পানি এসে যায় স্বর্ণকুণ্ড। সে অবস্থায় অ্যাটেনশনের ভঙ্গিতে তার উদ্দেশে কেবল বলতে পারি, থ্যাক ইউ স্যার, থ্যাক ইউ।

কঠিন একটা যুদ্ধের বিজয়ের পর একজন সৈনিকের সবচাইতে বড়ো প্রাণি হচ্ছে কমান্ডারের কাছ থেকে তার কাজের প্রশংসা বা স্বীকৃতি। কমান্ডার আমাকে যে কাজ দিয়েছিলেন, সেটা আমি পালন করেছি আমার দল নিয়ে সফলভাবেই। স্বভাবতই কমান্ডার তাতে খুশি হয়েছেন। এর ফলেই তার সেই ধন্যবাদ এবং স্বীকৃতি জ্ঞাপন। গৌরবে-গর্বে তাই তারে ওঠে মন আনন্দের জোয়ারে। একফাঁকে হাতের তালু দিয়ে মুছে ফেলি সেই পানি।

এরপরই আসে সেই নির্দেশ। নির্দেশ আগ বাঢ়বার। পাকা সড়কে উঠে যাত্রা শুরু করি আমরা সামনের দিকে।

মুভমেন্ট অর্ডার

এবারের আক্রমণ-লক্ষ্য পঞ্চগড়। এখান থেকে প্রায় ৭/৮ মাইল দূরের পথ। পঞ্চগড় শহরের দু'-আড়াই মাইল সামনে জগদলহাট থেকে পিছিয়ে-যাওয়া পাকবাহিনী আবার সংঘবন্ধ হয়ে আস্তানা গেড়েছে। জোরদার সে আস্তানা। পঞ্চগড় শহরের চারদিকে বৃত্তাকারে তারা অল রাউন্ড ডিফেন্স নিয়েছে। আমাদের সামনে রয়েছে তাদের শিংপাড় ডিফেন্স। ওটাকেই ভাঙ্গতে হবে সবার আগে। এরপর আঘাত করতে হবে পঞ্চগড় শহর রক্ষাকারী

মূল ডিফেন্স রিং-এর ওপর। অতএব সামনে আমাদের কঠিন লড়াই।

আমরা এগুলি শুন্ক করেছি পাকা সড়কের ওপর দিয়ে। দুসারিতে। পেছনে ওরাও আসছে। মিত্রাহিনী। এখনও সরাসরি খুঁজে লিখে হয় নি তারা। হয়তো হবে। সময় এলৈছে।

এগুচি আমরা। বড়ো ধরনের একটা যুদ্ধে জয়লাভের পর ছেলেদের মনোবল বেড়ে গেছে বহুগুণে। সবার চোরার ভঙ্গিতে কেমন একটা উচ্ছল গতি আর ছন্দোময় উদ্বাধার। সবাই হাঁটছে। বলা যায়, হাঁটছে না, যেনো উড়ে উড়ে চলেছে। দীর্ঘদিন থেকে বনবাদারে, পরিত্যক্ত কোনো পোড়া বাঢ়ির বা প্রান্তরে কাটিয়েছি আমরা সবাই। ঝড় বাদলে, গ্রীষ্মের দাবদাই কিংবা হিমশীতের দাঁত-বসানো কামড়ে রুক্ষ হয়ে গেছে আমাদের সবার সজীব তরতাজা চেহারা। বদলে গেছে সবার মন। বেড়েছে বয়স। যুদ্ধের প্রক্রিয়া যেনো ঢেলে সাজিয়েছে সবাইকে একবারে নতুন করে। ফলে পরিবর্তিত মানুষে পরিগত হয়েছে সবাই। জয় বাংলার জন্য সবাইকে আকুল আকুল। একসময় বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দোলায় অস্ত্র ছিলো সবার মন। জয় বাংলা হবে, যুদ্ধের ভেতরে থেকেও তেমন বিশ্বাস হতে চাইতো না। অথব এ ক'দিনের ভেতরেই আমাদের মনের মোড় ঘুরে গেছে। আর সেটা হয়েছে যুদ্ধের পরিবর্তিত রূপের বদৌলতে। এখন ভাবতেও অবাক লাগে, আমরা বাংলাদেশে চুকছি। চুকছি পাকবাহিনীকে পদানত করতে করতে। ক'দিন আগেও ব্যাপারটা ছিলো পুরো অকল্পনীয়। নিজের দেশে চুক্বির আনন্দ সবাইকে এমনভাবে উদ্বেলিত করেছে যে, একটা বাঁধ ভাঙ্গ জোয়ারের মতো ছুটে চলবার গতি পেয়ে বাস্তুচ সবাইকে। আর এ গতি সামাল দিতে বেশ বেগ পোহাতে হচ্ছে সেকশন ক্যাভারদের।

আগুন জ্বালো, আগুন জ্বালো

শীতের মনোরম সকাল। মিষ্টি রোদের হাঁটাপ শরীর থেকে দেহ আর মনে। একটা চমৎকার ভালোলাগা পরিবেশ চারিদিকে। প্রকাশস্তুক ধরে আমরা ভেতরে চুকছি। সেই কবে এখিলে আমরা শেষ হেঁটেছিলাম এরকম স্তুক ধরে। আজ নভেম্বরের এই ২৫ তারিখে আবার সেই পাকা সড়ক ধরে এগিয়ে চলা। নিজেদের দেশ। এতোদিন সে পদানত ছিলো ভিন্দেশী এক নরঘাতক নিউর বাহিনীর হাতে। আমরা চুকছি আমাদের সেই প্রিয় দেশে, নিজ বাসভূমে, দখলদার সেই পশুশক্তিতুল্য খুনে বাহিনীকে তাড়িয়ে পিছু হটতে বাধ্য করে করে। অমিত শক্তিধর সেই বাহিনী এখন পিঠটান দিয়ে পালাচ্ছে। আমরা ধাওয়া করছি তাদের টেটাই এখনকার বাস্তবতা, টেটাই এখনকার সত্য। আর যতোই এই সত্য মনের গভীরে আদেশিত হয়, ততোবারই একটা অদম্য আবেগ গলার কাছাকাছি চলে আসে। আর সঙ্গে সঙ্গে জ্বালা করে উঠে দুটো চোখ।

সম্ভবত একটা ঘোরলাগা অবস্থায় হাঁটছিলাম। আর সেই অবস্থা থেকে হঠাতে করেই চমকে উঠতে হয়। হাঁটছিলাম প্রিয় স্টেনগান, তার শরীরে পরম নির্ভরতায় হাত রেখে। ঠিক তখুনি চমকে উঠতে হয় পেছন থেকে ভেসেআসা পরিচিত সেই সুলিলিত গলার গানের সুরে। পেছনে ফিরে দেখি পিন্টু। দলের পেছন দিকে ছিলো সে। কখন এগিয়ে এসেছে কাছাকাছি বুঝতে পারি নি। সহিং ফিরে পেয়ে তাকাতেই দেখি, স্টেনগানটা গিটারের ভঙ্গিতে ধরে পিন্টু গাইছে। গাইছে সেই পরিচিত গান, আগুন জ্বালো, আগুন জ্বালো, ব্যর্থ রাতের আবর্জনা পুড়িয়ে ফেলে আগুন জ্বালো...। সত্যি বলতে কি, এই গানটা ওর গলায়

অসমৰ ভালো খোলো! যুক্তের প্ৰথম দিন থেকেই পিণ্ডি রয়েছে আমাৰ বিশ্বস্ত সঙ্গী হিসেবে। ফেরিলা যুক্তেৰ দিনগুলোয় অপাৱেশনশেষে ফিৰবাৰ সহয় কিংবা কোনো অবসৱে নিৰ্জন পৰিবেশে কিংবা খোলা মাঠে উদাহৰ আকাশেৰ নিচে বসে এ গানটা বনেছি বছবাৰ ওৱ গলা থেকে। আজকেৰ এই পৰিবেশেও গাইছে সেই গানটা আগেৰ মতোই উদাহৰ গলায়। ওৱ গানেৰ সাথে সঙ্গতি রেখেই যেনো আশপাশেৰ সমস্ত পৰিবেশ জুড়ে আনন্দ জুলছে।

পাকবাহিনী ফিৰবাৰ সহয় জগদলহাটেৰ আশপাশেৰ বাড়িবৰ আৱ দোকানপাট সব জুলিয়ে-পুড়িয়ে একাকাৰ কৱে দিয়ে গৈছে। এখনও জুলছে সেই আণন্দ। নেভাবাৰ কেউ নেই।

দূৰ থেকে ভেসে আসছে কামানেৰ গৰ্জন মেঘেৰ শুমগুম গৰ্জনেৰ মতো। পঞ্চগড়েৰ দিক থেকে পাকবাহিনী অনবৱত শেল বৰ্ষণ কৱছে কামান আৱ মৰ্টাৱেৰ। আমাদেৱ অহ্যাতা বোধ কৱাৰ জন্য তাদেৱ এই বেপোৱায়া আক্ৰমণাভিযান। অবশ্য এই শেল বৰ্ষণেৰ আওতা থেকে আমৰা এখনো বেশ দূৱে। চাৰদিকে জুলছে। আমৰা একটা জুলস্ত পৰিবেশেৰ ভেতৱ দিয়ে এগিয়ে চলেছি। যুক্তেৰ ভয়াবহ ক্ষত এদিকেসেদিকে ছিটানো।

ঠিক এই সহয় একটা পচা দুৰ্দেকৰ ধাক্কা এসে লাগে নাকে। বুৰাতে পাৱি মুছুতেই। মানুষেৰ গলিত লাশেৱই দুৰ্দক্ষ। সম্বৱত ত্ৰসফায়াৱেৰ শিকাৰ। গলিত লাশ হয়তো কোনো পাকসেনার, কিংবা কোনো মুক্তিফৌজেৰ। নয়তো দু'পক্ষেৰ গোলাগুলিৰ ফাঁদে আটকে পড়া হতভাগ্য কোনো সাধাৱণ মানুষেৰ। হামেৰ কৃষক কিংবা শৰ্ষৱ। কে সে? কাৰা? কতোজন সংখ্যায় তাৰা? প্ৰশ্ৰে উত্তৱ মেলে না। নাকে লাগে দেবলো গোলিত লাশেৰ গক্কেৰ ঝাপটা।

পদানত সেই জগদল

জগদলহাট পৌছুতেই ওৱা উল্লাসধৰনি দিয়ে প্ৰশংসিয়ে আসে। আমাদেৱ পৌছানোৰ অপেক্ষায় ছিলো ওৱা। আনন্দে-উচ্ছলতায় যেনে উৎসৱ কৱে ফুটছে ওৱা। বাবলু ঝোগান দিয়ে ওঠে 'জয় বাংলা'। সেই ঝোগানে সাড়ে দু'পক্ষে সবাই। পুৱো পৰিবেশটা মুখৰিত হয়ে ওঠে ঝোগানে ঝোগানে। ওৱা উষ্ণ আলিঙ্গনে জুড়িয়ে ধৰে এক এক কৱে। মুন্দাকে দেৰি ষ্টেলগান কাঁধে সামান্য দূৱে দাঁড়িয়ে থাকতে। আজকেৰ ভোৱেৰ সুইসাইড মিশনে সে ভিড়ে গিয়েছিলো দেছায়। প্যান্ট-শার্ট ভঙ্গ চকচকে উচ্ছাসিত মুখ। আজকেৰ বিজয়ে সেও অন্যতম শাৱিকদাৰ। ইশাৱায় কাছে ডাকি তাকে।

এগিয়ে আসে সে। ও বেঁচে আছে, এ বাস্তব ঘটনাই কেন জানি তাৰ প্ৰতি আমাৰ অক্ষ শ্ৰেজড়ানো আবেগটাকে উক্ষে দেয়। তাই ওকে জিগ্যেস কৱি, কিৱে কেমন লাগলো?

- দাকুণ মামা।
- ভয় পাসনিতো?
- না, ওৱা তো ছিলো।

— ঠিক আছে, পুৱোদন্তুৰ মুক্তিফৌজ তো বনেই গেছিস। এখন অ্যাডভাস কৱাৰি আমাদেৱ সাথে একজন নিয়ামিত এফ.এফ. হিসেবে। ও, কে?

— ও, কে বলে সহ্যতি মুন্দাৰ। শুশিতে বলমলিয়ে ওঠে তাৰ মুখ। একজন শিক্ষিত যুবক চলে এসেছে দেশ ছেড়ে। সে শুধু শৱণার্থীৰ জীবনযাপন কৱাৰে কেনো? দেশেৰ এই ত্ৰাস্তিলগ্নে তাৰ কাৰ্য্যকৰ অংশগ্রহণ আমাদেৱ একান্তভাৱে প্ৰয়োজন। আমি নিয়ে এসেছি ওকে দেশ থেকে। আমিই ওকে ফ্ৰন্টে এনে ট্ৰোনিং দিয়ে পুৱোদন্তুৰ মুক্তিফৌজে পৱিণ্ট

করে নিজের দলভুক্ত করে নিয়েছি। এখন থেকে এ হবে আমার দলের অন্যদের মতোই একজন সক্রিয় যোদ্ধা। জীবনমরণ সেতো ভবিষ্যতের হাতে। যুদ্ধের মাঠে এর কোনো নিচ্ছয়তা নেই। দেখা যাক না কি হয়!

ওদের সবার—— বাবু, মতিয়ার, বকর, হাবিব ও মধুসূন্দরসহ জগদলহাট দখল করতে আসা সবার উষ্ণ আলিঙ্গনে নিবিড় ভালোবাসার হোয়া। ওরা সবাই অক্ষত রয়েছে এটা জেনে মনের গভীরে একটা স্পষ্টি আর প্রশংসনির চেউ বয়ে যায়। ওদেরকে অপারেশনে পাঠানোয় মনের ভেতর বারবার একটা শক্ত উঁকি দিয়ে ফিরেছে। ভেবেছি, ওদের ভেতর থেকে কেউ কেউ হয়তো হারিয়ে যাবে। কিন্তু না, যায় নি। ভালোবাসার মুখগুলো ঠিক তেমনি আগের মতোই আছে। নির্মল আনন্দ-ভৱা, স্পষ্ট সুবেহের উল্লাসে কাঁপা সব সাহসী মুবকের দল। বাছাই করা আমার প্রিয় ছেলে সব। এদের দেখায়াত্ত কী যে ভালো লাগে! কতো বড়ো একটা কাজ করে বসেছে এরা, সেটা হয়তো এদের ধারণাতেই নেই। এরা না এল, পুরো ফ্রন্টই হয়তো এখনো বসে থাকতো এই ভেবে, জগদলহাটে অক্ষত রয়ে গেছে শক্র সেই কংক্রিট-শক্ত প্রতিরোধ।

এই সেই জগদলহাট। মহাপরাক্রমশালী শক্রবাহিনী যাকে দ্বিতীয় অগ্রবর্তী ঘাঁটি হিসেবে দুর্ভেদ্য করে গড়ে তুলেছিলো। এ ঘাঁটিতে আঘাত হানার জন্য কতোভাবে যে এসেছি তার শেষ নেই। দূর থেকে গুলি ছুঁড়ে শক্রকে তাতিয়ে দিয়ে ফিরে আবার নিজেদের আঙ্গানায় পেছি। এখানে আসার ব্যাপরটি ছিলো কল্পনাতীত। এ স্মার্টিজ শক্র অবস্থানের রেকি-চিত্র করা রয়েছে আমার নোট বইয়ে। রাতের বেলা স্মার্ট থেকে এটাকে কতো ভয়াল ও বিভীষিকাময় মনে হতো। অথচ সময়ের কী নিপুণকাজ! আমরা এখন দাঁড়িয়ে আছি সদ্যমুক্ত সেই শক্রঘাঁটির ওপর। পদানত জগদলহাটের ওপর। চারদিকে সবকিছু জলছে এখন। বাতাসে পোড়ার গন্ধ, ধোয়ায় ধোয়ায় বাতাস ভারি। একটা সুতীক্র আকাঙ্ক্ষা নিয়ে দেখতে থাকি পদানত জগদলের বক্রমুক্ত রূপকে। অমরখানা আর জগদলহাটকে নিয়ে যুদ্ধের পরিকল্পনা করতে আমারকে ‘ছ’ ছাঁটি মাস কেটেছে। অমরখানা পদানত হয়েছে আগেই। আজ হলো জগদলহাটের পিন্টুর চোখ-মুখের ভাব দেখে স্পষ্ট বুঝতে পারি, সেও খুঁজে ফিরে আমাদের সেই চিরশক্ত পাকবাহিনীর ঘাঁটি জগদলহাটকে। কিন্তু শক্রমুক্ত পদানত জগদলহাটের সেই আগের রূপ কি এখনো রয়েছে? যে রূপ আমরা দীর্ঘ ক'মাস মনের ভেতরে লালন করে চলেছি? নেই। এখন চারদিকে তখন পরিত্যক্ত বাক্সার আর ট্রেইনের সারি। আর পুড়ে ছারখার হয়ে যাওয়া পরিপার্শ্ব-প্রকৃতি।

ক্র্যাত সেই বাক্সার

বাবু আর মতিয়ার আমাকে নিয়ে যায় শক্র পরিত্যক্ত মূল বাক্সারটিতে। পাকা সড়কের ডানে বাজারের মুখে ঝাঁকড়া আমগাছটির নিচে বাক্সারটির অবস্থান। এই বাক্সারটি আমাদের খুবই পরিচিত। পরিচিত মানে এটির কথা শুনেছি আমরা বারবার। রেকি করার ভেতর দিয়ে তৈরি করা ক্ষেত্র ম্যাপে এর অবস্থান চিহ্নিত করা হয়েছে। সোনারবান হাইড আউটের প্রথম দিকে আজিজ মাট্টার আমাদের হজুরের ঘরে বসে জগদলহাট শক্র ঘাঁটির বিবরণ দিতে একজন মেজর থাকে ওই বাক্সারটিতে।

আমরা যাই সেই বাক্সারটিতে। কংক্রিটের তৈরি একটি সুদৃঢ় ও সুরক্ষিত অবস্থান হিসেবে

এটি তৈরি করা হয়েছিলো । এই সেট্টরের পাকবাহিনীর কমান্ড পোস্ট ছিলো এটি । তাদের মেজর এখন থেকেই জগদলহাট-অমরখানার ডিফেন্স পরিচালনা করে এসেছিলেন এতোদিন । এই বাঙ্কার থেকেই তার নির্দেশে পরিচালিত হয়েছে ভয়ঙ্কর আর নিষ্ঠুর সব অভিযান আশপাশের নিরীহ মানুষজনের উপর । পাশবিক নৃশংসতার শিকার হয়ে কতো মানুষ মরেছে, আগুন লাগিয়ে ছারখার করে দিয়েছে কতো ঘামের পর ঘাম, কতো বস্তবাড়ি । লুটপাট করে নিয়ে এসেছে কতো সহায়সম্পদ, তার শেষ নেই । শুধু তাই নয় । কতো অসহায় মা-বোন তথা কুলবধূকে তারা তুলে নিয়ে এসেছে এখানেই, যাদের মান-স্ত্রীম সবকিছু লুটে নেয়া হয়েছে চিরকালের মতো, যাদের অধিকাংশই আর ফিরতে পারে নি আপনাপন ঘরে । কতো হতভাগ্য মানুষের আহাজারি, কতো অসহায় নারীর আকৃতিভরা কান্না শুরে ফিরেছে এখানে, এই বাঙ্কারটিকে ঘিরেই । গতরাতেও মুখর সজ্জিয় ছিলো এটি । আজ পরিত্যক্ত । ইট-পাথর আর সিমেন্টের তৈরি মাটির নিচে একটা ঘর বৈ আর কিছু নয় । বর্বর ও নৃশংসতম অত্যাচারের নীরব সাক্ষী হিসেবেই এর অস্তিত্ব এখন বিদ্যমান । তাই বাঙ্কারটিতে চুক্ববার সময় একটা তিক্ত মিশ্রিত মনোভাব নিয়ে তাকাই তার দিকে । মনের ভেতর পুষ্পে রাখা রাগ-ঘৃণা আর প্রতিশোধ স্পৃহা সবকিছু ফুসে উঠতে চায় হঠাতে করেই । কিন্তু মৃত শক্তির বিরলক্ষে প্রতিশোধ চরিতার্থ করার যেমন উপায় নেই, এই পরিত্যক্ত বাঙ্কারের বেলায়ও আমার অবস্থা এখন একই রকম । শক্তি প্রাক্কৃতির পালিয়েছে, যাদের উপর দীর্ঘদিনের ঘৃণা আর প্রতিশোধ প্রাহ্লের আগুন বুকের শাক্তিরে জুলছে ধিকিধিকি । মনে মনে তাই শক্তির উদ্দেশ্যে বলি, আজ এখন থেকে পালিয়েছো, কিন্তু কাল পালাবে কোথায়? ধরা তোমাকে পড়তেই হবে মানবতার জয়ন্ত্য দুশ্মন প্রেরণ! অত্যাচার-লুঠন-বুন-ধর্ষণসহ অনেক কিছুর হিসেব-নিকেশ করার রয়েছে তোমার প্রেরণ!

বাঙ্কারটির সামনে দাঁড়িয়ে মনের ঘৃণা দ্রুত খেলে যায় একের পর এক এ ধরনের ভাবনা । অসম্ভব তড়িঢ়ি করেই শাক্তি হয়েছে যে সেটা সহজেই বোঝা যায় । চারদিকে আরো যতো বাঙ্কার আর ট্রেক্সেসারি, সবই পরিত্যক্ত । ইতস্তত ছড়ানো-ছিটানো । এছাড়া ফেলে গেছে তারা প্রচুর পরিমাণ গোলাবারুদ, হেলমেট আর মাঝাপথে থেমে যাওয়া মশলাপাতি মেশানো রান্নার জিনিসপত্রসহ হাঁড়িপাতিল ও নানা রকমের আহারসামগ্রীও । ছেঁড়া ফিল্ড টেলিফোন লাইনও চোখে পড়ে ।

পরিত্যক্ত বাঙ্কার আর ফেলে যাওয়া গোলাবারুদ ও অন্য সরঞ্জামাদির সাথে ববি ট্র্যাপ লাগানো থাকতে পারে । এছাড়া রয়েছে শক্তি পক্ষের মাইন ফিল্ড । এজন্য পাকা সড়ক থেকে কাউকে নামতে দেয়া হচ্ছে না । বাঙ্কার-ট্রেক্সে যাতে কেউ না নামে এবং তাদের পরিত্যক্ত জিনিসপত্রে হাত না দেয়, সে জন্য সেন্ট্রি লাগানো হয়েছে । কিন্তু আমি বাবলু আর বকরদের সঙ্গে করে সেই বড়ো বাঙ্কার বা কমান্ড পোস্টটার ভেতরে ঢুকে পড়ি ।

মাটির নিচে ছেঁট কামরার মতো কংক্রিটের তৈরি একটা সুরক্ষিত ঘর । একপাশে ছোটো চমৎকার একটা বিছানা পাতা । দামি চাদর-বালিশ তাতে । সেইসাথে আরো অনেক সৌখিন জিনিসপত্র । এসবই যে লুট করে আলা হয়েছে বোঝা যায় । একটা কালো রঙের টেলিফোন সেটও রয়েছে । একটা ছেঁট মতোন টেবিল, দুটো চেয়ারও । টেবিলের উপর রাখা একটা হেলমেট । হেলমেটটা হাতে নিয়ে বাবলু সেটা তৎক্ষণাৎ পরিয়ে দেয় আমার মাথায় । সৈনিকের এই জীবনে প্রথম হেলমেট পরলাম মাথায় । তাও আবার শক্তির দখল

করা দাঁটিতে। তাদেরই কম্বারের হেলমেট সেট। অনেকটা জার্মান এস.এস. বাহিনীর হেলমেটের মতো দেখতে। পাকবাহিনীর কম্বারকে এতো দ্রুত রিট্রিট করতে হয়েছে যে, বেচারা তার নিজের হেলমেটটি পর্যন্ত নেবার মতো সময় কিংবা সুযোগ পায় নি।

জগদলহাট পাকবাহিনীর পরিত্যক্ত ডিফেন্সে অনেক কিছুই ছিলো নেবার মতো। ছেলেদের শুধু হেলমেট নেয়ার অনুমতি দেয়া হলো। আর কোনো কিছু নয়। হাবিবের খুব শখ ছিলো বিছানার চাদরটা নেয়ার। নিষেধ করা হলে সে আর সেটা নেয় না। মনে মনে বলি, কী হবে এসব নিয়ে? সামনের দিনগুলোয় হয়তো এমনি অনেক কিছুই দরখলে আসবে আমাদের এবং সেগুলো ফেলেই যেতে হবে।

যুদ্ধ জয়ের সাথে সাথে স্বাভাবিকভাবেই বিজয়ী সৈন্যদের ভেতরে একটা লুটপাটের উন্নাদন পেয়ে বসে। যুদ্ধের নিয়মই এটা। বিজয়ী পক্ষ সবসময়ই বিজেতাদের ওপর লুটপাট চালিয়েছে। যুদ্ধের এই নিয়ম বা রীতি চলে আসছে মানব সভ্যতার একেবারে উষালগ্ন থেকেই, মানুষ যখন থেকে শুরু করেছে যুদ্ধ-বিহু পরম্পরের সঙ্গে।

ভাবি, আমরাতো লুটের সৈনিক নই। আমরা আদর্শবন্ধ সৈনিক। যুদ্ধজয়ের পর সৈনিকদের লুটপাটে উৎসাহিত করলে তাদের ভেতরে আর শৃঙ্খলা বলতে কিছু থাকে না। তাদের নিয়ে যুদ্ধ পরিচালনা করা পরবর্তীকালে ভয়ানক কষ্টকর ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। কে জানে সামনে কি আছে? কোথায় কে পড়ে থাকবে কোন অস্তরণ-অচেনা প্রাণের প্রাণহীন দেহ নিয়ে, তাই-বা কে জানে? তখন কোথায় থাকবে তার বিজেতার জিনিসপত্র আর কোথায় থাকবে লুট করা ধন! এমনিতেই তো বইতে হচ্ছে আমাদের পর্বতপ্রামণ বোৰা। কাঁধে হাতিয়ার, ঝুকে ও কোমরের সঙ্গে জড়িয়ে গুলির মাল তুলেনেও, হাতে গুলির বাক্স, পিঠে কম্বলসহ পরিধেয় কাপড়চোপড় আর অন্যান্য নিতান্ত ঘৃণ্যমান টুকিটাকি জিনিসপত্র।

ছেলেদের বলে দিই স্পষ্ট। কেউ কিছুই নেবে না। ছেঁবে না পর্যন্ত। ছেলেরা মন দিয়ে শোনে। নিজেদের সংবরণ করে উঠতো ভাবে, দেশ স্বাধীন হলে তাদের কোনো কিছুরই অভাব থাকবে না। কী হবে স্ট্রোন্য লুটের মাল নিয়ে? সুবেদার মেজর কাজিমউদ্দিন পরিত্যক্ত সব জিনিসপত্রের দায়িত্বে নিয়োজিত। এটা রেয়ার ইউনিটের কাজ। এখানকার সবকিছুই শুচিয়ে ছিয়ে নিয়ে হিসেবে রেখে জমা করা হবে রেয়ার ইউনিটের ভাগারে।

অ্যাডভাল : ওস্তাদ আপ ক্যাম্পস হ্যায়

জগদলহাট পার হয়ে আমরা এগুতে থাকি। কিছুদূর সামনে এগিয়ে যেতেই এক সময় পাশাপাশি অস্বস্রমান মিত্রবাহিনীর বি.এস.এফ দলের এক সদস্যের সাথে দেখা হয়ে যায়। যুরতি ট্রেনিং সেন্টারের ইস্ট্রাইট ছিলেন তিনি আমাদের সময়ে। সম্ভবত ডেলটা উইং তথা ভাসানী উইং-এর ইস্ট্রাইট হিসেবে তখন ছেলেদের ট্রেনিং দিয়েছেন। নেপালি সৈনিক। গোলগাল ফর্মা চেহারার চমৎকার মানুষ হিসেবে তিনি ছেলেদের ভেতরে জনপ্রিয় ছিলেন খুব। ট্রেনিং সেন্টারে বিশ্বেরক ব্যবহারের যে প্রদর্শনী বা ডেমোনেস্ট্রেশন হতো, তাদের প্রায় সব কঢ়িতেই আমাদের সঙ্গে থাকতেন তিনি। এখন তাঁর পরনে পুরোদস্তুর যুদ্ধের পোশাক বা ইউনিফর্ম ও হেলমেট। সাথে হাতিয়ার। পেছনে লটকানো পানির ফ্লাক্স, পিঠে হ্যাভারস্যাক, একটি ছোট মাটি খোড়ার বেলচা। পুরোদস্তুর সম্মুখ্যাদের জন্য তৈরি হয়ে এগুচ্ছে এরা। ছেলেরা নেপালি এই ইস্ট্রাইটকে চিনতে পেরেই হৈচে করে ওঠে।

জিগ্যেস করে, ওস্তাদ আপ ক্যামসা হ্যায়?

ওস্তাদ এবং শিখ্যরা আজ একই যুদ্ধযাত্রায় শামিল। ব্যাপারটা কেমন অস্তুত লাগে। যে মানুষটি ক'মাস আগে আমাদের ট্রেনিং দিয়েছিলেন, শিখিয়েছিলেন হাতেকলমে অন্ত ধরা ও চালনা, তিনিও আজ আমাদের সাথে চলেছেন রঞ্জসাজে সেজে একই যুদ্ধযাত্রায়।

ওস্তাদকে ছেলেরা উল্লাস ধরনি দিয়ে ব্রাগত জানাতেই তার সারা মুখমণ্ডল হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। বড়ো নির্মল আর ভালোলাগার সে হাসি। তিনি বলেন, আচ্ছা হ্যায়, তুম সব ঠিক হ্যায় না!

— হ্যায় মাগার হামারা ইউনিটকা তিনি লারকা মর গিয়া।

— আপসোস কি বাত! নেপালি ওস্তাদের গলা থেকে দুখ ঝরে পড়ে। তারপর আমার দিকে লক্ষ্য করে বলেন, ডেমোলেশন কম্বান্ডার, ক্যাম্পসা লাগতা হ্যায়! তুমহারা জয় বাংলা হো যায় গা, হাম বোলা থা না! মনে পড়ছে ট্রেনিং সেন্টারের সেই বিষণ্ণ দিনগুলোয় প্রতিটি 'মক' (নকল) অপারেশনের প্রদর্শনী শেষে ভদ্রলোক বলতেন, ঘাবড়াও মাত ইয়ার, তুমহারা দেশ স্বাধীন হোগা, জরুর জয় বাংলা হোগা। ইসকে লিয়ে জোরদার ট্রেইনিং লেনে চাহিয়ে....।

আমি তাকে বলি, ইয়াদ হ্যায় ওস্তাদ। আওর আব্বি সাথমে হ্যায়। আভিতো শালে লোগ ভাগনে শুরু কিয়া। উই আর ইন অ্যাডভানসিং পজিশন। ফিউচার বোল্নে সাকেগা কেয়া হোগা।

— ঠিক হ্যায়, ট্রেনিং সেন্টারমে জো শিখায়া উই ট্রেইন রাখ্না। আপকো বাঁচকে চল্না। গড ব্রেস ইউ।

কথা শেষ করে এগিয়ে যান মুরতি ক্যাম্পেন্ট ইন্স্ট্রাক্টর, বর্তমানে মিত্র বাহিনী অ্যাডভাস ফোর্মের একজন হাবিলিদার। যাচ্ছেন তিনি। ছেলেরা হাত নেড়ে তাঁকে বিদায় জানায়। আমরাও চলতে থাকি। ওস্তাদের নামটি মনে পড়ে যাব সেটা জিগ্যেস করে আর জানাও হ্য না।

জগদলহাট পেছনে রেখে আর্ম্মেচিলটক এগুতেই আমরা শক্রপক্ষের শেলের আওতায় পড়ে যাই। শেল আসছে। ফার্মেচুলসেগুলো ধাম ধাম শব্দ তুলে। আমাদের তিন চারশ' গজ সামনে। প্রচণ্ড বিক্ষেপণের সঙ্গে সঙ্গে নরম কাদা মাটি ছিটকে উঠে ফসলের মাঠে-ঘাটে গভীর গর্তের সৃষ্টি করছে। কালো ধোঁয়া কুঙ্গলী পাকিয়ে উঠছে ওপরের দিকে। ঠিক এই সময় ওয়ারলেসে কম্বান্ডারের নির্দেশ আসে। পাকা রাস্তা ছেড়ে এবার ডান-বাঁয়ের ফসলের মাঠ-প্রান্তের দিয়ে এগুতে হবে। সুবেদার খালেক এবং আমার কোম্পানিকে নিযুক্ত করা হ্য না। পাকা সড়কের বাঁ দিকে। হাজি সাহেবসহ অন্যদের করা হ্য সড়কের ডান দিকে।

রাস্তার বাঁ দিকে নেমে গেলাম আমরা। ফসলের মাঠের ডেতর দিয়ে প্রায় ৩/৪ শ' গজ দূরে এসে আবার অ্যাডভাস করার ভঙ্গিতে এগোনোর কাজ শুরু হ্য। উদ্যত অন্ত হাতে ছড়ানো ভঙ্গিতে এগিয়ে চলে দুটো কোম্পানির যোদ্ধারা। সামনে বিক্ষেপণ চলছে তখনো সম্মানে। আমরা সেগুলো এড়িয়ে আমাদের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখি। দিগন্ত জোড়া পাকা সোনালি ধানের মাঠ। কোথাও কোথাও ছোট ছোট গর্ত, নালা, খাল আর হাঁটু সমান কাদা-পানি ত্রয় প্রান্তে। ছোটোখাটো বাধা পড়ে চলার পথে। তবু সবকিছু ডিঙিয়ে এগিয়ে যেতে থাকি আমরা। উদ্দেশ্য, শক্রপক্ষের পঞ্চগড়ের পূর্বদিকের শেষ প্রতিরোধ লাইন লোকেট করা। যতোদূর সংষ্ঠ এগিয়ে গিয়ে তাদের মুখোমুখি অবস্থানে ফ্রেটে লাইন খুলে বসা।

সোনালি ধান, পিন্টুর গান ও পেছনে দাঁড়িয়ে পাকা মহিমাবিত্তি হিমালয়
 রৌদ্রকরোজ্জ্বল সোনালি দিন। চমৎকার শীতের আমেজ। সোনা-রংগ এলিয়ে পড়া ধানের শীষ
 ভেঙে ভেঙে এগুচ্ছি আমরা। মাঠের পর মাঠ শুধু ধান আর ধান। পাকা ধানের সেই পরিচিত
 নেশাধরা গুৰু। এর ভেতর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে মনে পড়ে যায় পেছনে ফেলে আসা
 অমরখানা, চৈতনপাড়া ও জগদলহাটের পাকা সড়ক পার্শ্ববর্তী মানুষজনের কথা। তারা তাদের
 খেতের পাকা ফসল ঘরে তুলতে পারবে কি না, এ নিয়ে চিন্তার অন্ত ছিলো না। দল বেঁধে
 তারা এসেছিলো আমাদের গুয়াবাড়ি হাইট আউটে। তাদের ছিলো প্রচণ্ড আকৃতি। ধান পাকার
 সময় হয়ে এলো। সে ধান কেটে এখন ঘরে তোলার মতো নিশ্চয়তার ব্যবস্থা করে দিতে হবে
 তাদের। তখন ক্ষমতা ছিলো অত্যন্ত সীমিত। পাকা সড়কের অবস্থান নেয়া শক্ত ছিলো খুবই
 পরাগ্রস্ত। তবুও তাদের আমরা কথা দিয়েছিলাম এই বলে, যে করেই হোক, আমরা এ ব্যবস্থা
 করে দেবো তাদের। আজ এই এখন এই মুহূর্তে কাঁচা সোনা-রংগ পাকা ধানের খেতের পর
 খেত মাড়িয়ে যেতে যেতে সেদিন গুয়াবাড়িতে কৃষকদের দেয়া সেই ওয়াদার কথা মনে পড়তে
 থাকে বারবার। সেই সাথে মনের গহনে একটা গভীর সন্তুষ্টির স্তুতি অনুভব করি আর
 ভালোলাগারও একটা গুঞ্জন তৈরতে পাই, আমরা সফল হয়েছি। কথা দিয়েছিলাম তোমাদের
 খেতের ফসল আমরা কাটবার আর তা নিজেদের গোলায় তুলবার ব্যবস্থা করে দেবো, আমরা
 তা পূরণ করতে পেরেছি। শক্রমুক্ত এলাকায় তোমরা এখন নিজের নিজের ফসল ঘরে তুলবে
 নির্ভয়, স্বাধীনভাবে। স্বাধীনতার মানেই তো এই, আমি ধাকবো আমার মতো করে, কথা
 বলবো নিজের মতো করে, নিজের খেতের ফসল তুলবো স্বাধীনভাবে।

সত্যিই মনের ভেতর এখন অফুরন্ত ভাবেন্টি শর অনুভূতি। শীতকালের নরম রোদের
 আমেজ গায়ে মেঝে এগিয়ে চলি আমরা। চাঁচাদকের এই ঝলমলে অপরূপ সৌন্দর্যমণ্ডিত
 পরিবেশে পিন্টুকে বিমোহিত করে তোক্তি আশিত করে তাকে উদার গলায় গান শেয়ে উঠতে।
 আর তাই সে উদান গলায় শেয়ে উঠ, আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে কখন আপনি এই
 অপরূপ ঝরণে বাহির হলে জনৈক পেছন থেকে গাইছে পিন্টু এ গান তার সমস্ত ভালোলাগা
 দিয়ে সুলভিত গলায়। ওর দিকে পেছন ফিরে তাকাতেই হঠাৎ করেই যেনো ঝলসে ওঠে
 চোখজোড়া। দেখতে পাই হিমালয় তার বিশাল বিস্তৃত শরীর উন্মুক্ত করে এক অপরূপ ঝরণের
 পসরা সাজিয়ে বসেছে। মাথায় চকচকে বরফের টুপি। সবকিছু মিলিয়ে তার এক মহিমাবিত্তি
 ঝরণ। আর তাই নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে আকাশের দিকে মুখ করে। এতোনিন হিমালয় ছিলো
 যেনো মাথার ওপরে। দিন কি রাতে তার অতিভুত এমনভাবে অনুভব করতাম যে, মনে হতো,
 সেটা আমাদের জীবনেরই একটি অংশ। আমরা আছি, আমাদের মাথার ওপরে আছে হিমালয়।
 তাকে বাদ দিয়ে জীবন কঢ়না করা যায় নি। মনে হতো, হিমালয় তার অপার বিশালতা আর
 উদারতা নিয়ে দেখছে নিরংত আমাদের, তার সুবিশাল শরীর দিয়ে পাহারা দিয়ে চলেছে
 আমাদের, যেনো রক্ষা করতে চাইছে আমাদের সহস্ত বিপদআপদ থেকে। তার ভাবগঞ্জীর
 উদারতা নিয়ে ভুলিয়ে দিতে চাইছে আমাদের সকল দুঃখকষ্ট আর হতাশাক্রিট মানসিকতাকে।
 আজও হিমালয়ের এই মূর্তি দেখে মনে হচ্ছে, আকাশের গায়ে হেলান দিয়ে যেনো সে
 একভাবে দেখছে আমাদের অঞ্চলিকার দৃশ্য। তার আজকের এই ঝলমলে ঝরণের উজ্জ্বল্য দিয়ে
 সে যেনো বলতে চাইছে আমাদের লক্ষ্য করে, খুশি আমি, খুড়ব খুশি আমি। তোমরা এগিয়ে
 যাও তোমাদের জয় বাংলার জন্য। আমি রয়েছি তোমাদের পেছনে, আগের মতোই।

হিমালয় তার অপার মহিয়া নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। তাকে পেছনে ফেলে আমরা ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছি! কী গভীর একটা ভালোলাগার সম্পর্ক হয়ে গিয়েছিলো প্রবল অস্তিত্বামন হিমালয়ের সঙ্গে। এখন তাকে ছেড়ে দূরে চলে যাচ্ছি। কেমন একটা ভাষাইন কষ্ট আর শুণ্যতাবোধ জড়িয়ে ধরে মনকে। কেবলি ভাবি, যতোদিন বাঁচবো কিবা যদি বেঁচে থাকি এই যুদ্ধের ভেতরেও তাহলে বাকি জীবন মাথার কাছে নিয়েতই খুঁজে ফিরবো হিমালয়কে।

ইয়ানো এহন গান কিয়ারে

আমাদের অঘাতারা চলতে থাকে। পিন্টু গান গেয়ে চলে মাতোয়ারা হয়ে। দূর থেকে সুবেদার খালেক বেঁকিয়ে ওঠেন, ইয়ানো এহন গান কিয়ারে? এহন কি গান গাওয়ানের সময় নি...?

পোড়-খাওয়া সৈনিক সুবেদার খালেক। যুদ্ধকে তিনি যুদ্ধ হিসেবেই দেখেন। যুদ্ধের মাঠে বিপজ্জনক শক্তির দিকে এগিয়ে যাবার সময় সৈনিকদের মধ্যে যে প্রগাঢ় শৃঙ্খলাবোধ থাকবে, এটা আশা করা নিশ্চয়ই কোনো অন্যায় প্রত্যাশা নয়। বরং এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু পিন্টুর এসবের কোনোদিকে বিন্দুয়াত্র খেয়াল নেই। নিজেকে নিয়ে নিজে মেতে থেকে পিন্টু একঘটিতে গেয়েই চলে গান।

আমরা এখন এমনভাবে এগিচ্ছি যে, আমাদের সবাই নিঃসন্দেহে শক্তিপক্ষের দৃষ্টির সামনে উন্মুক্ত। পিপড়ের সারির মতো আগুয়ান আমাদের বাহ্যিক্যে-কোনো সময় শক্তিপক্ষের নিশানার আওতায় এসে যেতে পারি আমরা। সহসা ছাঁচ আসতে পারে শত সহস্র মৃত্যুবাণ। গোলার ঝাঁক এসে পড়তে পারে মাথার ওপর। লুটিয়ে পড়তে পারি আমরা যে কেউ কিছু বুঝে উঠেবার আশেই। এরকম সঞ্চাবনা মনে গোথে সঞ্চাবন চোখ মেলে পথ চলতে থাকি। দৃষ্টি রাখি জেলে। বোধবুদ্ধিকে আরো সতর্ক সাবধানের করে। এরই ভেতরে লক্ষ্য করার চেষ্টা করি শক্তিপক্ষের কোনোরকম মুভমেন্ট লক্ষ্য করা যায় কি না। অবশ্য এর আগে শাহীরিয়ার প্রোটেকটিভ পেট্রুল পাঠিয়েছেন শক্তিপক্ষের অবস্থান লোকেট করার জন্য। তারা পাকা সড়ক ধরে এগিয়ে গেছে বেশ সামনে। তাদেরকাছেই ধরা পড়ার কথা শক্তির সঠিক বর্তমান অবস্থান।

ঠিক এই রকম অবস্থায়, বলা যায়, হঠাৎ করেই কানের পর্দায় আছড়ে পড়ে গোলাগুলির শব্দ। শক্তির। আর সঙ্গে সঙ্গে হতচকিত হয়ে ওঠে পুরো অ্যাডভান্স লাইন। সহজাত চেতনায় ব্যক্তিব্যন্ত হয়ে আমরা সবাই নিজেদের লুকিয়ে ফেলি ধানখেতের আড়ালে। বুক মাথা মাটির সাথে মিশে থাকে, মাটির সাথে শোয়া অবস্থানে। ওপর দিয়ে পো-পো শব্দে উড়োল দিয়ে আসছে শক্তিপক্ষের শেল একটার পর একটা। বিরামহীন। ফাটছে সেগুলো আমাদের থেকে একশো-দুশো গজের ব্যবধানে, সামনের দিকে। তার মানে শক্তিরা আমাদের অ্যাডভান্সিং পজিশন লোকেট করে ফেলেছে।

বেলা এগারোটাৰ মতো সময়। ধানখেতের ভেতরে স্যাঁতসেঁতে মাটি আৱ শিশিৰ ভেজা ঘাস আৱ গুছেৰ আগাছাৰ ওপৰ বুক চেপে ধৰে আমরা উৰু হয়ে উয়ে আছি। পাকা ধানেৰ সেই অপূৰ্ব পৰিচিত গন্ধ। এই তো আমাদেৰ নিজেৰ দেশেৰ মাটি আৱ ধানখেত। আমাদেৰ নিজেদেৰ উৎপাদিত ফসল। নতুন ধান ঘৰে উঠলৈই শুৰু হবে নবান্নেৰ উৎসব। কী যায়াময় আৱ ভালোলাগা সব অনুভূতি! শক্তিৰ প্ৰচণ্ড গোলাগুলিৰ ভেতৰেও এই অনুভূতি মনেৰ গভীৰে বাৰবাৰ কড়া নেড়ে যায়। অলৱক্ষণেৰ ভেতৰেই সক্রিয় হয়ে ওঠে শিক্ষাহিনীৰ কামানেৰ সারি। পাশাপাশি গৰ্জে ওঠে আমাদেৰ মৰ্টাৰ ইউনিট মজিব ব্যাটারি। এবাৰ উভয়পক্ষেৰ শেলেৰ

আনাগোনা শুক্র হয় আমাদের মাথার ওপর দিয়ে। আমরা মাঝখানে ধানখেতে নিজেদের লুকিয়ে রেখে অপেক্ষা করতে থাকি। অপেক্ষা করতে থাকি পরবর্তী আদেশের জন্য।

সর্বাঙ্গিক যুক্তের ভেতরে অগ্রাহিয়ান

মাথার বেশ ওপর দিয়ে আকাশে একটা হেলিকপ্টারকে চক্র দিতে দেখা যায়। মিত্রবাহিনীর এই আকাশযানটি শূন্য থেকে সম্মুখবর্তী শক্তির অবস্থান তথা ডিফেন্স লাইন চিহ্নিত করার চেষ্টা করছে। আর তাই বারবার চক্র দিয়ে উড়ছে কিংবা কখনো কখনো কোনো জায়গায় থির হয়ে থাকছে। পাকবাহিনী ওটাকে ঘায়েল করে ভৃত্যাত্ত করতে পারছে না। বোৰা যায় তাদের কাছে বিমান বিশ্বস্তী অস্ত্রশস্ত্র নেই। অথচ তাদের বিপরীতে উন্নত সমরাত্ম, সমর বিজ্ঞানের সর্বশেষ টেকনিক, আর সেই সাথে প্রাচুর জনবল বহু নিয়ে মিত্রবাহিনী ক্রমশ এগছে। ওরা এখনো পেছনে। সামনে আমরা। যুদ্ধের পুরো ধার্কটাই যাচ্ছে এখন পর্যন্ত আমাদের ওপর দিয়ে। পরে হয়তো সময়-সুযোগ বুঝে ওরা যোগ দেবে আমাদের সাথে। পাকবাহিনী পৃথিবীর অন্যতম দুর্বল যোদ্ধাবাহিনী হিসেবে পরিচিত। তাদের এ খ্যাতি কিংবদন্তির গল্পের মতো শুনে আসছি ছোটবেলা থেকেই। তারা কি পারবে তাদের সেই দুর্বৰ্ষতা দিয়ে আমাদের সশিলিত বাহিনীকে ঝুঁতভে? দেখা যাক! সামনের ফ্রন্টগুলোই বলে দেবে এর উত্তর।

প্রায় এক ঘণ্টার ওপর ধরে চলে দু'পাশের কামান-যুক্ত আকাশপথে শেলের অবিরাম ছুটাছুটি। প্রচও বিস্ফোরণের শব্দ কানে তালা লাগিয়ে যাব। থরথর করে কেঁপে কেঁপে ঝঠা মাটির সাথে বুক লাগিয়ে আছি। মনের ভেতরে কেবল এই রকম একটা আকুলতা কাজ করে, উড়ে আসা শেলটি আমার ওপর কিংবা আমাদের কানে ওপর যেনো না পড়ে। সম্মুখবর্তী আর পেছনবর্তী আকাশ জুড়ে শুধু কালো ধোঁয়ার ঝঙ্গি। পোড়া বারফদের গুঁক বাতাসে।

এ এক দারুণ সময়! অবগন্নীয় এই প্রতিজ্ঞতা। একটা শুধু তাদেরই উপলক্ষিতে আসবে যারা যুদ্ধ করেছেন প্রকৃত যুক্তক্ষেত্রে। যুক্ত দেখে, কিংবা কেবল যুক্তের গল্প তনে ব্যাপারটা একজনের উপলক্ষিতে আসবে না। তাইতো একজন যোদ্ধা যুক্তশেষে যদি বেঁচে থাকেন এবং ফিরে যান তার স্বগতে, তখন বারবার তার চেতনায় আঘাত হালে যুক্তদিনের সেইসব ভয়াবহ যুক্তির পর মৃহৃত। তার স্মৃতির মিছিলে বারবার ফিরে ফিরে আসে সেই জীবন-মৃত্যুর চরম দিনগুলো। প্রচও নষ্টালজিয়ার ঘোর তাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চায় সেই দিনগুলোতে, তার সহযোগিদের সাথে সেইসব অজানা অচেনা মাঠ-প্রান্তরে, যেখানে তিনি হাতের মুঠায় অন্য নিয়ে অপেক্ষা করেছেন শক্তির, আঘাত হেনেছেন শক্তির ওপর কিংবা শক্তির আঘাত করেছেন প্রতিহত। সহযোগা অনেকেই হয়তো চলে পড়েছে, তিনি এগিয়ে গেছেন অন্যদের সাথে। আর সেটা কেবল একটা লক্ষ্য সামনে রেখেই, শক্তিকে চিরদিনের জন্য নির্মূল করতে হবে এবং সেই সাথে নিজেকে হবে বাঁচাতে। সে এক প্রচও উন্নাদন। চেতন-অবচেতনের মাঝ বরাবর সে এক নেশা বা যোহন্ত মানুষের মতো যোরলাগা অবস্থা। দিনক্ষণের হিসেব নেই। ক্রান্তিহীন-শুভিহীন কেবলই এগিয়ে যাওয়া। শক্তিকে ব্যতী করে কাঞ্চিত বিজয়কে ছিনিয়ে আনার লক্ষ্য কেবলই সামনে এগিয়ে যাওয়া। এইরকম সর্বাঙ্গিক যুক্তের ভেতরে একজন প্রকৃত সৈনিক আর নিজের মধ্যে থাকেন না। চেতনার সব কোমল বৃত্তিগুলো তিনি হারিয়ে ফেলেন। গোলাগুলির তাঁওকলীলার ভেতরে তিনি এগিয়ে যান ঝোবটের মতো। নিজের সব ধরনের ভয়-ভীতির উর্ধ্বে তিনি চলে যান তখন।

ଆର ତାଇ ଯୁଦ୍ଧଶୈଖେ ଏକଜନ କ୍ରାନ୍ତ ସୈନିକ ଯଥନ ଘରେ ଫେରେନ, ତଥନ ତିନି ପ୍ରାୟ ନିଚିତଭାବେଇ ବଲା ଯାଇ, ଥାକେନ ଅନେକଟା ଘୋରେର ମଧ୍ୟେ । ତାର ମାନସିକତାର କ୍ଷେତ୍ରେ ଦେଖା ଦେଇ ପରିବର୍ତ୍ତନ । ଅନେକେ ହେଁ ଯେ ପଡ଼େନ ବିକାରହତ୍ତ । ଆସଲେ, ଯୁଦ୍ଧର ପର ଏକଜନ ଘରେ ଫେରା ସୈନିକ ଆର ତାର ସାବେକ ଜୀବନେର ଅଭ୍ୟାସ-ଆଚରଣେ ଆର ଫିରେ ଯେତେ ପାରେନ ନା । ତିନି ଆର ହତେ ପାରେନ ନା ଏକଜନ ସାଧାରଣ ମାନୁଷ । ନିଜେର ଆଶ୍ୱାୟ ପରିମାଣରେ ଭେତରେ ବାସ କରେବ ହେଁ ଯେ ପଡ଼େନ ଏକାକୀ ନିଃସଙ୍ଗ୍ରହ । ଅବସରେ, ତାର ଏହି ଏକକ ନିଃସଙ୍ଗ୍ରହ ବାରବାର ତାକେ ଫିରିଯେ ନିଯେ ଯାଇ ମେଇ ସବ ରୋହର୍ମୀ ବିଭିନ୍ନକାମୟ ଦିନଗୁଲେର ପ୍ରାକ୍ତରେ । ତିନି ହେଁ ପଡ଼େନ ବିଚିନ୍ନ ଏକା ଏକଜନ ଶୃତି ଭାରାତ୍ରାନ୍ତ ମାନୁଷ ।

ସାମନେ-ପେଛେନେ ପ୍ରଚୂର ବୋମାବାଜିର ଭେତରେ ଧାନଖେତେର ଭେତର ମାଟିତେ ବୁକ ଲାଗିଯେ ଅଲସ ଅବଳାର ଏସବ କଥା ଭେବେ ଚଲି । ସମୟ ଗଡ଼ିଯେ ଯାଇ ଏବ ମଧ୍ୟେ ଅନେକ । ଦୁଧରେର ପର ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୁ'ପକ୍ଷେର କାମାନ୍ୟୁଦ୍ଧ ଥେମେ ଆସେ । ବିକ୍ଷିତଭାବେ ଗୋଲାଗୁଲିର ଶଦ୍ଵୀ ଆର ପାଓୟା ଯାଇ ନା ସାମନେର ଦିକ ଥେକେ ।

ଓୟାକିଟାକିତେ ଭେସ ଆସେ କମାଭାରେର ଗଲା । ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥାକେ ତାତେ ସବାର ଜନ୍ମଇ । ଯେତାବେ ସବଗୁଲେ ଦଲ ଏଣ୍ଟଛେ, ସତର୍କତାର ସାଥେ ସେଭାବେଇ ଆମାଦେରେ ସାମନେ ଏଣ୍ଟତେ ହବେ । ଶକ୍ତର ଅବଶ୍ଵାନ ଚିହ୍ନିତ କରା ଗେଛେ । ଏବାନ ଥେକେ ମାଇଲଖାନେକ ସାମନେ ଏକଟା କାଁଚା ରାତ୍ତା ଗେହେ ତାଲମା ନଦୀର ଦିକେ । ସେଖାନେଇ ହବେ ଆମାଦେର ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ରୁଟ ଲାଇସ୍‌ଟ୍ ବିକେଲେର ଭେତରେଇ ସେଖାନେ ଅବଶ୍ଵାନ ନିତେ ହବେ । ରାତ ନାମବାର ଆଗେଭାଗେଇ ସମ୍ପାଦନ କରାଇ ହବେ ଟ୍ରେକ୍-ବାଙ୍କାର ତୈରିର କାଜ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଲ-ବିଲ୍ସ୍‌ସାଇ ଠିକ ଥାକବେ । ଏଣ୍ଟତେ ହବେ ଏକଟ ଜ୍ଞାତେ ଏକଟ ସାଥେ ସବାଇକେ ।

କମାଭାରେର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନ୍ୟାୟୀ ଯାତ୍ରା ଶୁରୁ ହୁଏଇବାର । ଛେଲେର ଆଧ୍ୟେ ହେଁ ପଡ଼େ ଛିଲ ଏହି କ୍ରାନ୍ତିକର ଅପେକ୍ଷାୟ । ଅପେକ୍ଷା ସତିଇ କ୍ରୁଟ୍‌ଲ୍ସହନୀୟ ଏକଟା ବ୍ୟାପାର । ଆବାର ଭାଲୋଓ । ଅପେକ୍ଷାତେ ମୋକ୍ଷଲାଭ କରତେ ପାରିଲେ ଯୁଦ୍ଧର ଅପେକ୍ଷାର କ୍ରାନ୍ତି ତୁଳେ ଯାଇ । ଅପେକ୍ଷାର କଥା ତଥନ ତାର ମନେଇ ଥାକେ ନା । ଅର୍ଥାତ୍ ନାନା ଧରନେର ହତେ ପାରେ । ଏକଜନ ପ୍ରେମିକାର ଜନ୍ୟ ପ୍ରେମିକ ଯୁବକେର ଅପେକ୍ଷା । ଏକଜନ ବେକାର ଯୁବକେର ଚାକରି ପାଓୟାର ଅପେକ୍ଷା, ଏକଜନ କୃଷକେର ଘରେ ଫୁଲ ତୁଳବାର ଅପେକ୍ଷା ଆର ଏକଜନ ସୈନିକେର ହଜ୍ଜେ ଘରେ ଫେରାର ଅପେକ୍ଷା ଅର୍ଥାତ୍ ଏମନି ହଜାରୋ ଧରନେର ଅପେକ୍ଷା । ଆମରା ଏଥିନ ଅପେକ୍ଷା କରାଇ ମୁଭ୍ୟେଟ ଅର୍ଡାରେ । ଅବଶ୍ଵେଷେ ମେଇ ଅର୍ଡାର ଏସହେ । ସୁତରାଂ ଆବାର ଶୁରୁ ହେଁବେ ଅନ୍ୟାୟା ।

ଯୁଦ୍ଧର ଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟେ ଆମାଦେର କଥନୋ ଏଗିଯେ ଯେତେ ହଜ୍ଜେ ଦ୍ରୁତ, କଥନୋ ଚୁପଚାପ ପଡ଼େ ଥାକତେ ହଜ୍ଜେ କୋଣୋ ନିର୍ଜନ ଜନବିରଲ ଗ୍ରାମେ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଘରବାଡିର ପାଶେ । କଥନୋ ଦିଗନ୍ତ ଜୋଡ଼ା ଫସଲେର ମାଠେ, ଶକ୍ତର ଫେଲେ ଯାଓୟା ଟ୍ରେକ୍‌ର ସାରିତେ କମାନ ମର୍ଟାରେର ଶେଲେର ବିକ୍ଷେରଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟ ଛୋଟେ ବଜ୍ରୋ ଗର୍ତ୍ତ ବା ଗହରରେ ମାଥିଥାନେ । ପ୍ରାୟଇ ଅର୍ଡାର ଆସେ 'ହଲ୍ଟ', 'ଟେକ ପଜିଶନ' । ଏରପର ସବ ଚୁପଚାପ । କଥନୋ ସାମନେ ଥେକେ ଯୁଦ୍ଧର ଗୋଲାଗୁଲିର ଶଦ୍ଵାରାଜି ଭେସେ ଆସେ । କଥନୋ ନିର୍ଦ୍ଦର୍ଶତାଯ ଛେଯ ଯାଇ ସମ୍ମତ ପରିବେଶ । ଥାମତେ ବଲଲେ ଥାମତେ ହୁଏ । ଏଣ୍ଟତେ ବଲଲେ ହୁଏ ଏଣ୍ଟତେ । ଆବାର ଥାମତେ ହୁଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଦେଶେର ଅପେକ୍ଷାୟ ।

ନାମ-ନା-ଜାନା ଏଲାକାଯ ଦିଗନ୍ତ ଜୋଡ଼ା ସୋନାଲି ଧାନଖେତେର ସ୍ୟାତସେତେ ମାଟିର ସାଥେ ବୁକ ଲାଗିଯେ ପଡ଼େ ଥାକାର କ୍ରାନ୍ତିକର ଏକଘେଯେ ଅପେକ୍ଷାର ଅବସାନ ଘଟେ ଅବଶ୍ଵେଷେ । ଆବାର ଏଗିଯେ ଚଲାର ପାଲା । ସବ ସମ୍ଯାୟଇ ଓୟାକିଟାକି ସେଟେର ମାଧ୍ୟମେ କମାଭାରେର ସାଥେ ଯୋଗାଯୋଗ ରାଖତେ ହଜ୍ଜେ । ଏବାର ବେଶ କିନ୍ତୁ ଏଗିଯେ ଯାବାର ପର ତିନି ଥାମାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେନ । ସାମନେ କିନ୍ତୁ ଏକଟା

ঘটছে । কী হচ্ছে ওখানে, উদিকে, সঠিক বোৰা যাচ্ছে না । তবে হচ্ছে একটা কিছু । যাইহোক, এইরকম একবার থামা আৰ একবার এগিয়ে চলতে চলতে এক সময় দুপুর গড়িয়ে বিকেল চলে এলো ।

এখনো খাবারদাবারের পাস্তা নেই । আসলে মুভমেন্টের এ পর্যায়ে পেছন থেকে খাবার পাঠানোৰ ব্যাপারটাও কষ্টকর । কোথাও থিৰ হয়ে বসতে পাৱলে এতোক্ষণে ঠিকই চলে আসতো খাবাৰ । লঙ্গু কমান্ডাৰ নায়েৰ সুবেদাৰ সুলোক এ ব্যাপারে অত্যন্ত বিশ্বস্ত । সমুখবর্তী ফ্রন্টে যোদ্ধাদেৱ জন্য খাবাৰ পাঠানোৰ দায়িত্বটা তিনি অসমৰ প্রতিকূল অবস্থাৰ ভেতৱেও পালন কৱে যাচ্ছেন যথাযথভাবে । তিনি হয়তো অয়গামী ফ্রন্টকে ধৰতে পাৱছেন না ঠিকমতো । পাৱলে ঠিকই আসতো তাৰ খাবাৰ । সেই সন্তান ভঙ্গিতে ক'জন মানুষেৰ ক'মে ভাৱ । ভাৱেৱ দু'পাশে ডালা । কলাপাতা দিয়ে ঢাকা ভাত । দু'পাশে কেৱোসিনেৰ টিনে তৱকৰি । মাঃস কিংবা ডাল । খাবাৰ আসে নি । আৱ এ নিয়ে কাৰুৰই তেমন একটা মাথাব্যথাও নেই । সবাৱই এখন একটাই লক্ষ্য, পৌছতে হবে গন্তব্যস্থলে, শক্রু অবস্থানেৰ কাছাকাছি ।

শীতে বিকেলে নতুন ডিফেন্স লাইন

অঞ্চল্যাত্তাৰ অবসান ঘটতৈ পাকা সড়ক থেকে নেমে আসা উত্তৰমুখী কাঁচা সড়কটাৰ আড়াল নিয়ে অবস্থান নেয় আমাদেৱ পুৱো ফ্রন্ট লাইন । এটাকে ছিকুজ্জব্বান বলা যাবে না, ছড়িয়ে-ছিটিয়ে যে যাৰ মাফিক বসে পড়বাৰ মতো ব্যাপার । একটাৰ জীবন্ত রংকেত্তে শক্রু আক্ৰমণ আশঙ্কাকে প্ৰতিমুহূৰ্তৰ সঙ্গী কৱে দীৰ্ঘ মাঠ প্ৰাৱুৰ প্ৰাড় দিয়ে আসতো হয়েছে । অধিকাংশ সময় হাঁটতে হয়েছে ধানখেতেৰ ভেতৱে দিয়ে ঝুঁকু লটবহৰসহ হাতিয়াৰ হাতে সদা সতৰ্ক অবস্থায় এগুতে হয়েছে । প্ৰায়ই শুয়ে পড়া হৰ্ষ হয়েছে ধানগাছেৰ আড়ালে-আশ্রয়ে । নিচে ভেজা নৰম মাটি । প্ৰতিটি পদক্ষেপ ভেজা মাটিতে পা দাবিয়ে দিতে চায় । ধানগাছেৰ আঁচড় শৰীৱেৰ চামড়ায়, গায়ে-মুখে-গলায় । অ্যাঙ্গজীবন কৱাৰ সময় নাৰ্তে টানটান উজ্জেজনাকৰ অবস্থায় কিছু বোৰা যায় নি । কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, কাঁচা সোনা রঙ মাথায় নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা ধান গাছেৰ সাবি তাদেৱ স্বেহ-ভালোবাসাৰ পৱশ বুলিয়ে দিয়েছে শৰীৱময় । তাৰি ফলে শৰীৱৰ জুড়ে তুলকানি আৱ একটা অস্বত্ত্বকৰ জুলা ধৰানো অনুভূতি । সবাৱই এক অবস্থা । সারা শৰীৱ মেৰে রয়েছে ধানখেতেৰ পৱিচিত গন্ধ, ধানেৰ পৱিচিত গন্ধ ।

সামনেই পাকবাহিনীৰ অবস্থান । তবে কতোদূৰে, সেটা আন্দাজ কৱা যায় না । তাৱা একেবাৱে চূপচাপ । হয়তো হতে পাৱে শক্রুপক্ষেৰ এটা একটা কৌশল । তাৱা হয়তো দেখতে চাইছে মুক্তিবাহিনী কতোদূৰ পৰ্যন্ত এগিয়ে আসে, সেটা । কিংবা এমনও হতে পাৱে, তাৱা নিজেৰাও ব্যস্ত তাদেৱ নতুন ডিফেন্স লাইন নিয়ে । মুক্তিবাহিনীৰ অঞ্চল্যাত্তাৰ রোধ কৱতে হলে একটা শক্ত ডিফেন্স লাইন তাদেৱ গড়ে তুলতে হবে আৱ সেটা কৱতে হবে অসমৰ দ্রুততাৰ সঙ্গেই ।

শীতেৰ বিকেল দ্রুত ফুৰিয়ে আসছে । কাঁচা রাস্তা বৰাবৰ ফ্রন্ট লাইন গড়ে তুলবাৰ নিৰ্দেশ দিয়েছেন কমান্ডাৰ । সে অনুযায়ী ট্ৰেকিং খৌড়াৰ কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে ফ্রন্টেৰ সহযোৱাবা । আমাদেৱ অবস্থান বাঁ দিকে । অনেকগুলো বাড়িবহৰসহ পুৱো শিংপাড়া গ্ৰামটা দাঁড়িয়ে আমাদেৱ সামনে । রাস্তার উটোদিকেই লঘুলাই এই গ্ৰাম । এখানকাৰ মানুষজন কিছু কিছু রয়েছে, তবে পালিয়েছে অধিকাংশই । ভয়ে । নাৰী ও শিশুদেৱ কেউ আছে বলে মনে হয় না ।

সামনে একটা পুরো আম আর বাড়িঘর রেখে রাস্তার ওপর অন্যদের মতো ফ্রন্ট লাইন গড়ে তোলা সম্ভব নয়। গ্রামের আড়ালে অর্থাৎ উল্টোদিকের অবস্থানে থেকে শক্তির সাথে মোকাবেলা করা যাবে না। আমদের অবস্থান নিতে হলে গ্রামের বাড়িঘরগুলোর ওপারে যেতে হবে। সুবেদার খালেকের কোম্পানি অবস্থান নিতে শিয়ে কিছুটা বেকায়দায় পড়েছে। তার কোম্পানির অর্ধেক অংশ রাস্তা বরাবর অবস্থান নিতে পেরেছে। বাকি অংশের অবস্থান নিতে হলে তাকেও যেতে হবে গ্রামের ওপারে। সামনের দিকে। এ ক্ষেত্রে ফ্রন্ট লাইনের সোজাসুজি রাস্তা বরাবর ধাকবে না। বাঁ দিকের ফ্রন্ট এগিয়ে যাবে গ্রামের সামনের দিকে। সুতরাং তাই যদি করতে হয়, তবে সেটা করতে হবে মূল ফ্রন্ট লাইনের সাথে সামনে এগিয়ে থাকা বাম ফ্লাঙ্কের সংযোগ বিধান করেই। সমস্ত ফ্রন্ট লাইনকে জানতে হবে এ অবস্থাটা। এজন্য খালেকের সাথে আলোচনা করেই সিফাউন দেয়া প্রয়োজন। তাই গ্রামের ভেতর দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাই ক্লান্ত ছেলেদের। খালেক গ্রামের মাঝামাঝি জায়গায় রয়েছেন। এগিয়ে যাই সেদিক পানে।

কুঁচবরণ কন্যারে তার মেঘবরণ কেশ

একটা দৃশ্য চোবে পড়ে। একজন যুবতী মেয়ে কাঁপছে। ঠাণ্ডা এবং ভয়ে। গামের রং শ্যামলা ধাচের, সুষ্ঠাম সুন্দৰী মহিলার শরীরে এলোমেলোভাবে জড়ানো একটা ছাপা শাড়ি। ড্রাইজ আর পেটিকোট ছাড়াই শরীরে তার পেঁচিয়ে জড়ানো সেই শৃঙ্খল। খালি পা। সবে সন্ধ্যার প্রস্তুত তখন। জাঁকিয়ে নামছে হিমেল ঠাণ্ডা। কেবল শাড়ি ড্রাইজে খালি পায়ে ভিজে ঠাণ্ডা মাটিতে দাঁড়িয়ে থাকায় যুবতী মেয়েটির জমে যাবার যোগসূত্র। সবার কোতুহলী দৃষ্টির সামনে দাঁড়িয়ে আছে সে নিঃসঙ্গ একাকী। বন্দিমী সে। তার কিছু পূর্বে একজনকে হাত-পা বেঁধে বসিয়ে রাখা হয়েছে। ভয়ে যেনো মরেই গেছে সে, এমনি একটা ভাব তার সারা চোখেমুখে।

পেছনে একটা বাঁশবাড়ি। সামনে ইঞ্জিনেজ 'ইউ' আকৃতির বেশ কিছুটা ফাঁকা জায়গা। ডাঙ্গা জমি। সভবত আমনের বৈজ্ঞানিক ছিলো এটি। একপাশে লাইন করে হলুদের গাছ লাগানো হয়েছে। আর এখানকারই ফাঁকা জায়গাটিতে এসে জমায়েত হয়েছে সুবেদার খালেকের কোম্পানির একটা অংশ। খালেকও আছেন এখানে তার প্লাটিন কমান্ডারদের নিয়ে। চারদিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে গা এলানো অথবা তয়ে-বসা থাকা ক্লান্ত যোদ্ধারা। সবার দৃষ্টি বন্দিমী ওই যুবতীটির দিকে।

ছেলেদের এদিকে বসতে বলে পিন্টুসহ এগিয়ে যাই সুবেদারের দিকে। দাঁড়িয়ে থাকা মেয়েটিকে দেখতে দেখতে এগিয়ে যাই। সন্ধ্যার মুখে কলে দেখা আলোতে মেয়েটির মুখের দিকে তাকিয়ে চট করে উপমাটির কথা মনে হয়, 'কুঁচবরণ কন্যারে তার মেঘবরণ কেশ...'। মেয়েটির চেহারায় রয়েছে অনুপম সুশ্রীতার ছাপ। কিন্তু ভীতা হরিণীর অবস্থা হয়েছে তার। কাঁপছে সে থরথরিয়ে।

এগিয়ে শিয়ে সুবেদারকে জিগ্যেস করি, দানু মেয়েটি কে?

— বুধন মেঘারের বউ।

— বুধন মেঘারের বউ! বলেন কি! চমকে উঠি সুবেদারের কথায়। সুবেদারের গলার একটা আত্মপ্রসাদের সুর। বলে, হ, ইহানে পাকড়াও করা হইছে বেড়িরে। অমরখানা থন ভাইগ্য এই গেরামে হলাই আছিল।

তাহলে বুধন মেঘার কই? অমরখানার সেই কুখ্যাত বুধন মেঘার! পাকাহিনীর এক নম্বর

পদলেই দালাল। যার বাড়িতে ছিলো পাকবাহিনীর লঙ্ঘনখনা আর প্রমোদ ঘাঁটি। ছ' ছ'চি
মাস এই বুধন মেঘার একনিষ্ঠভাবে পাকবাহিনীর সেবা করে গেছে। তাদের সব ধরনের
অপকর্মের সহায়তা করেছে। চরম নিষ্ঠুরতা আর বর্বরতম কাজে সঙ্গী থেকেছে। কতো
মানুষের সর্বনাশ করেছে সে, তার জন্য কতো মানুষ হারিয়ে গেছে নির্ভয় মৃত্যুর রাজ্যে,
কতো নারী আর মা-বোনকে থাম থেকে ধরে এনে সে তুলে দিয়েছে অমরখনা ঘাঁটির
পাকসেনাদের বর্বর কামলালসা মেটাতে, তার শেষ নেই। আজ, এখন, এই মুহূর্তে সেই
বুধন মেঘারের স্তু আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে। কিন্তু সেই পিশাচটা কোথায়?

সুবেদারকে আবার জিজ্ঞেস করি, বুধন মেঘারকে ধরা যায় নিঃ সে কোথায়?

আমার জিজ্ঞাসার মুখে সুবেদারের মেজাজ যেনো খিচড়ে ওঠে। বলে, হেই হালারে তো
পাওয়া যাইতেছে না। ইয়াল্যাইতো বেটিরে ইনটোরোগেট করতাছি। তো এই বেড়ি
মোডেও মুখ খোলে না। ধোলাই লাগবো বুইজ্জেন নিঃ সুবেদার বলেই চলে, এইডা হেতার
৪ নম্বর বউ। হালা ভাইগা আইছিলো এতিমে লই। ম্যালা গরমও হাউন গেছে। কিন্তু হালা
বুধনরে ধরা যায় ন। ভাগছে। ভাগবো কই হালা? ধরা হেতার হড়ন লাইগ্ বো...।

সুবেদার খামলে তার পাশে বসা হাবিলদারটি বলে ওঠে, মোট ৬০টা গুরু পাওয়া গেছে।
এই বউটার সাথে ঐ লোকটাকেও পাওয়া গেছে। কিন্তু বুধনের ব্যব এরা দিতে চায় না।

আমি বলি, বুধনের চার বউ ছিলো নাকি?

— ছিলো মানে? বউটাই তো স্বীকার যাইতেছে, সোঁ নম্বর স্তু। শালা এদের দিয়াই
তো খান বাবাজিদের সাপ্লাই ব্যবসা করতো। এটোরক্ষণই কতো বউ আছে শালার কে জানে?
হাবিলদার কথা বলে চলে গড়গড় করে অনেকন্তে ঝুঁক কঠে।

তার কথা শেষ হতেই আমি সুবেদারকে দেখল, দাদু ঠিক তো, এই মেয়েটি বুধনের স্তু?
কেনো যেনো ব্যাপারটা বিশ্বাস হতে চাবলো। তাই সুবেদারকে কথাটা না বলে পারি না।

সুবেদার তার নিরস গলায় বুরুশুক্যামনে কইতাম দাদু। বেড়ি তো স্বীকার যাইতেছে।
কয়, এই গ্রামে তারে ও লোকজে আর গরুগুলান রাইখ্যা ভাইগ্যা গেছে হালা কুত্তার বাঢ়া
বুধন।

এ সময় স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে একজন এগিয়ে গিয়ে প্রচও একটা ধরক দেয় বউটিকে, বুধন
কোথায় বল, তা নইলে তোকে ছাড়া হবে না...।

প্রচও ঝাকুনি দিয়ে কেন্দে ওঠে মেয়েটি। তারপর মাটিতে বসে যেনো লুটিয়ে পড়ে।
সুবেদার খালেকসহ পিন্টুকে নিয়ে এগিয়ে যাই আমরা তার দিকে। আমাদের দিকে তাকিয়ে
আকুতিভৱা গলায় সে বলতে থাকে, মোক তুমরা ছাড়ে দ্যান্ গে। মুই কুচু করো নাই। ও
মোক জোর কোরে হেনে বেহা করিছে...।

সক্ষ্যার ঘনায়মান অঙ্ককারে এদিকেওদিকে জমে থাকা পাতলা কুয়াশার আবরণ। প্রচও
শীত নেমেছে। চারদিকে শ্রান্ত সৈনিকেরা তাদের শরীরের সাথে হাতিয়ার লাগিয়ে
অলসভঙ্গিতে বসে আছে। এ অঞ্চলের সর্বশ্রেষ্ঠ দালাল বুধনকে পাওয়া যায় নি। কিন্তু তার
বন্দি যুবতী স্তু কাঁদছে আকুল হয়ে মাটিতে শরীর এলিয়ে দিয়ে। একটা কিছু করা দরকার।
মনের মধ্যে যে ভাবনাটা আসে, সেটা হচ্ছে এই বকমের, আসলে মেয়েটির অপরাধ কি?
বুধন তাকে জোর করে তুলে এনেছে হয়তো কোনো গৃহস্থ ঘর থেকে। তাকে বিয়ের নাম
করে ধরে রাখলেও, তাকে পাকসেনাদের হাতে ভেট হিসেবে তুলে দিয়েছে যখন-তখন।

এই মেয়েটি বুধনের মতো দালালের স্তৰী, এটা ঠিক। কিন্তু তারপরও কথা থেকে যায়। চলমান যুদ্ধের একটা অমানুষিক ধক্কল গেছে এর ওপর দিয়ে। নিজের সমস্ত লাজলজ্জা আর সম্মুখ চিরদিনের জন্য হারিয়ে ফেলেছে এই মেয়েটি যুদ্ধের বলি হিসেবে। মনে পড়ে অবজারভেশন পেস্ট থেকে দেখা সেই দৃশ্যটি। পাকসেনারা কি তাহলে একেই টেনে নিয়ে যাচ্ছিলো সেদিনঃ কে জানে? হয়তো এ। অথবা এরি মতো অন্য কেউ।

সুবেদারকে বলি, দাদু একটা কিছু করেন। এই ঠাণ্ডায় তো মরে যাবে মেয়েটি।

— করনতো লাগবোই। ভাবতাই ইয়ানো করি কি? কই হাড়াই, কই রাখি...।

— এই গ্রামেই কোনো বাড়িতে রেখে দেন। সেন্ট্রি দিয়ে রাখলেই হবে। কাল সিদ্ধান্ত নেয়া যাবে, কী করা যাবে না যাবে মেয়েটিকে নিয়ে। সুবেদার রাজি হন এতে। গ্রামের একজন প্রবীণ লোককে ডাকেন। দূরে তার বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন তিনি। আমি কুঁকে পড়ে জিগ্যেস করি মেয়েটিকে, বুধন তোমাকে জোর করে বিয়ে করেছিলো?

— হয়, ফেঁপাতে ফেঁপাতে জবাব দেয় সে।

— কতোদিন আগে?

— চাইর-পাচ মাস।

— এখন কোথায় যাবে তুমি? যদি ছেড়ে দেয়া হয়।

— মোর বাপের বাড়ি যাম। তুমরা মোক ছাড়ে দেন্ত্রিয়ারেন না। মোর কুনো দোষ নাই গে...।

এই হচ্ছে ধর্ষিত বাংলাদেশ! পাকবাহিনীর পিছু শুষ্যয়া করে যেতে যেতে আরো কতো অসহায় মানব-মানবীর কানার মূখোমূখি দেন্ত্রিয়াদের হতে হবে, কে জানে? সুবেদার খালেক প্রবীণ ব্যক্তিটির হাতে মেয়েটিকে উৎসুক দেন। রাতের মতো ধূত ব্যক্তিটিকেও তার সাথে দিয়ে দেন। মেয়েটি যেনো কিঞ্চিতও থাকে আর তাকে যেনো গরম কাপড়চোগড় দেয়া হয়, একথা বলে দেন বারবার সুবেদার সেই প্রবীণ ব্যক্তিকে। তারা চলে গেলে তিনি বুধন মেষারের ৬০টি ধরে আন্তর্ভুক্ত পেছনের লঙ্ঘনখানায় পাঠিয়ে দিতে বলেন কোয়ার্টার মাস্টারকে। আমাদের দু'জনের দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে বলেন, লঙ্ঘনখানার জন্য বালা সাপ্তাই হাওন গেলো, কি কম দাদু?

আমরা হাসি তার কথায়। একজন রাগি আর কঠোর শৃঙ্খলাবোধের অধিকারী সৈনিকের হন্দয়ের গভীরে লুকিয়ে থাকা কোমল মানবিক দিকটি হঠাতে করেই যেনো উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে আমাদের সামনে। বাঁশ ঝাড়ের ছায়াধন অঙ্ককারে দাঁড়িয়ে দেবি নতুন করে সহযোগী প্রবীণ সৈনিক সুবেদার খালেককে। আসলেও বাঁহরে থেকে মানুষ চেনা কষ্টকর। প্রথম দর্শনেই আমরা ভেবেছিলাম, বদরাগি আর রূক্ষ মেজাজের অধিকারী মানুষ বুঝি লোকটা। লেগেও গিয়েছিলো তার সাথে আমাদের বড়ো ধরনের ঝগড়া। এরপর থেকে যতোই সময় পার হচ্ছে, সুবেদার খালেক ততোই আমাদের কাছাকাছি চলে আসছেন। আমরা তাকে ডাকছি দাদু বলে। তিনি উল্টো দাদু বলছেন আমাদের। এমনিভাবেই বুঝি মানুষ মানুষকে চেনে। কাছাকাছি আসে। গড়ে ওঠে সম্পর্কের গাঢ়তা। একজন হয়ে যায় অন্যজনের আঝার আঝায়।

এরপর কিছুক্ষণ পরামর্শ। নিজেদের অবস্থান চিহ্নিত করে নিয়ে আমরা বাঁশ ঝাড়ের পাশ দিয়ে এগিয়ে যাই সামনে। অনেক কাজ পড়ে রয়েছে। দ্রুত সারতে হবে সেগুলো।

ক্রট- মলানী শিংপাড়া

আমের সামনে একটা সুবিধেমতো জায়গায় নিজেদের অবস্থান নেয়ার সিদ্ধান্ত নিই। সে অনুসারে ছেলেরা তাদের মালসামান নামিয়ে ট্রেঞ্চ খোড়ার কাজে লেগে পড়ে। সামনে একটা উচু আল। সেটাকে আড়াল করে পাশাপাশি ৪/৫ হাত পরপর ট্রেঞ্চের জন্য জায়গা নির্ধারিত করে দেয়া হয়। ডাঙা ধরনের জমি। আলু, বেগুন খেতবাড়ি। নরম আলগা ধরনের মাটি। ট্রেঞ্চ খুঁড়তে বেগ পেতে হয় না।

এরি মধ্যে ছেলেরা বেশ অভিজ্ঞ হয়ে উঠেছে। তাদের কিছু বলতে হয় না। ঘন্টাখালেকের মধ্যে তৈরি হয়ে যায় পুরো ট্রেঞ্চ লাইন।

কোম্পানি হেড কোয়ার্টারের ট্রেঞ্চ মাঝখানে রেখে দু'পাশে সমান্তরালভাবে তৈরি হয় ট্রেঞ্চের সারি। আমাদের ডান দিকের শেষ ট্রেঞ্চ শেষ হয়েছে সুবেদার খালেকের বাম দিকের প্রথম ট্রেঞ্চের সাথে। এভাবে উভয় কোম্পানির প্রতিরক্ষা লাইনের মধ্যে সংযোগ স্থাপিত হয়েছে। জগদলহাটের মতো শক্তির অবস্থান একেবারে মুখোমুখি নয়। এজন্য পেছনে ক্রলিং ট্রেঞ্চ তৈরির প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয় না।

কোম্পানি হেড কোয়ার্টার ট্রেঞ্চ তৈরির দায়িত্ব নিয়েছে আবু বকর। অভাস যত্নের সাথে সে ট্রেঞ্চটি তৈরি করেছে এবং পেছন দিককার বাড়িগুলো থেকে শুকনো খড় এনে মেঝেতে বিছিয়ে মোটামুটি আরামদায়ক করার চেষ্টা করছে। অনন্দস্বর ট্রেঞ্চের ছেলেরাও শুকনো খড় এনে তাদের ট্রেঞ্চের মেঝেতে বিছিয়েছে। ট্রেঞ্চের কাজ শেষ হলে বকর ডাক দেয়। আমার আর পিন্টুর সাথে সেও কোম্পানি হেড কোয়ার্টারের সামন্দা হয়ে যায়।

খাবার আসে সক্ষার পরপরই। না খেয়ে উঠেছে সারাটি দিন। ভারবাহী লোকদের দেখে ছেলেরা উল্লিখিত হয়ে উঠে। সারাদিন মন্তের টেনশানে খিদের কথা মনেই ছিলো না। এখন খাদ্য বহনকারী দলটিকে দেখে মন্তের ভাতের মোচড় দিয়ে উঠে। খাদ্য দরকার। ভয়ানক কৃধূর্ত সবাই। প্রতিটি ট্রেঞ্চে খাবার দিতে দিতে ওরা এগিয়ে আসে। আমাদের ট্রেঞ্চের কাছে এসে থামে গোলগুলো। কাঁধে একটা শক্ত প্রমাণ সাইজ বাঁশ। দু'পাশে বৌলানো বাঁশের ডালায় ভাত, টিনের মধ্যে তরকারি। গরুর মাংসের খোল। নেয়া যায় কোথায়? বকর চটপট ম্যানেজ করে ফেলে। তার হাতে ধূরা থালায় সে তিনজনের ভাত নিয়ে নেয় আর হেলমেটটা উল্টে তাতে ভরে নেয় মাংসের তরকারি। একেবারে তুরিত সিদ্ধান্ত। আমি বলি, হেলমেটের মধ্যে যে মাংসের তরকারি নিলি, মাথায় দিবি কেমন করে ওটা!

— ধূয়ে নিলেই হবে, অম্বান বদনে কাজ করতে করতে উন্তুর দেয় বকর।

তো, এই হচ্ছে যুদ্ধের মাঠের জীবন। খাবার কখনো গুলির বাজ্র খালি করে নিতে হচ্ছে, কখনো হেলমেটের গর্তে।

শীতাত্ত ঠাণ্ডা রাত। হিম ঝরে পড়ছে মাথার ওপর আকাশ থেকে। অজানা অচেলা এক জায়গা। জীবনে হয়তো আর কোনোদিন এখানে আসাও হবে না। এ জায়গায় আজ আমরা ঘাঁটি গোড়ে বসেছি। সারাদিন পর খাবার এসেছে। যার যার মতো করে ছেলেরা খাবার নিয়েছে। ভাত-মাংস তো আর মাটিতে রাখা যায় না। কেউ কেউ বাড়িগুলোর কলাগাছ থেকে পাতা কেটে এনেছে। ট্রেঞ্চের কাজ বক রেখে আমরা তিন সৈনিক থেতে বসে যাই। ভাতের ভাও থাকে সামনে। সেখানে থেকে ভাত নিই, হেলমেট থেকে তরকারি নিই। ভিজে

নরম মাটিতে গোল হয়ে বসে এভাবে আমরা খেতে থাকি। মনে হয় এতো চমৎকার খাবার
বুঝি জীবনে কখনো আর থাই নি।

বড় ধরনের প্রস্তুতি : দল বিন্যাস

ট্রেইনের গোছগাছ হয়ে গোলে রিপোর্টিং করতে যাই পেছনে। সক্ষ্যায় যেখানে বুধন মেধারের
দ্রীকে ধরে আনা হয়েছিলো, সেই বাঁশবাগানের ছায়ার নিচে লেফটেন্যান্ট মাসুদের বাক্সার তৈরি
করা হয়েছে। সুবেদার খালেকের আঙ্গনাও এখানে। ফ্রন্ট শোটানোর সময়ই নবনিযুক্ত দুই
লেফটেন্যান্টকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। লে. মাসুদ দায়িত্ব পেয়েছেন সুবেদার খালেকের 'বি'
কোম্পানি এবং আমার এফ.এফ কোম্পানিকে পরিচালিত করবার। মুক্তিবাহিনীর ফ্রন্ট লাইন
কিছুটা সুবিন্যস্ত হয়ে এসেছে। এখন পুরো ব্যাটেলিয়ন পর্যায়ের শক্তি ফ্রন্ট লাইনের। পদাতিক
একটা ব্যাটেলিয়নকে এগিয়ে নিতে হলে যেভাবে করা প্রয়োজন, সদরবাদিন সাহেব তার সমষ্ট
ফ্রন্টকে বিন্যাস করেছেন সেভাবেই। লে. মাসুদ দু'কোম্পানি, মতিন চৌধুরী অন্য দু'কোম্পানির
দায়িত্বে। অফিসার হিসেবে তারা সরাসরি তাদের দায়িত্বে কোম্পানিগুলো এখন পরিচালনা
করবেন। ক্যাপ্টেন শাহরিয়ার সরাসরি এ দু'জন অফিসারের সাহায্যে যুক্ত পরিচালনা করবেন।
সদরবাদিন রয়েছেন সর্বাঙ্গীণ দায়িত্বে। ফ্রন্টে পরিচালনায় তার আদেশ-নির্দেশই চূড়ান্ত। ফ্রন্টের
পেছনে পেছনে এগিয়ে আসছে রেয়ার ইউনিট, যাদের উপর নির্মিত অপৃত হয়েছে সরবরাহ ও
যোগাযোগের, সেই সাথে লঙ্ঘনখনার জন্য খাদ্য সরবরাহও। ফিল্ড হাসপাতাল দায়িত্বে
রয়েছে আহত অসুস্থ রোগীদের চিকিৎসার। যুক্তবিত্ত ফ্রন্টের পাশাপাশি সদরবাদিন সাহেবকে
মোটামুটি বড়ো ধরনের প্রস্তুতি নিয়ে এগতে স্টাইল। সব মিলিয়ে এ ফ্রন্টের জনবল এখন
হাজারের নিচে নয়।

লে. মাসুদকে রিপোর্ট দিই। ফ্রন্টে ছেলেরা ট্রেইন তৈরি করে অবস্থান নেয়ার কাজ সম্পন্ন
করেছে এরি মধ্যে। হালকা-পাত্র আফসার মাসুদ। চোখে চশমা। যুক্তেক্ষেত্রে আমরা
অনেকদিন ধরে আছি। তিনি এঙ্গেছেন নতুন। এসেই তাঁকে ধূরূপার যুক্তে জড়িয়ে পড়তে
হয়েছে। আলাপ-পরিচয় হয় নি তেমন। তাই তিনিও সহজ হতে পারেন না। আমরাও পারি
না। তার পেছনে বসা একজন স্বাস্থ্যবান ছেলের পিঠে একটা ওয়্যারলেস সেট। সেটা
অনবরত কথা বলে চলেছে। পেছন থেকে কমাভারের আদেশ-নির্দেশ ভেসে আসছে। খৌজ
নিচেন তিনি ফ্রন্টের সব যোদ্ধা 'ডিগ ইন' অর্থাৎ ট্রেইনের গর্তে অবস্থান নিতে পেরেছে কি না।
ওয়্যারলেসেই নির্দেশ পাওয়া যায়, পুরো ফ্রন্ট থাকবে চূপচাপ। কেউ ফায়ার অপেন করবে না।
প্রতিটি ট্রেইনের ছেলে সদা প্রস্তুত আর সতর্ক থাকবে। সেন্ট্রি ডিউটি চলবে কড়াভাবে। প্রতিটি
কোম্পানি তাদের অবস্থানের চারপাশে পেট্রল পার্টির সাহায্যে ডিউটি চালাবে। পাকবাহিনী যদি
এগিয়ে আসে, তবে সবাই নিজ নিজ দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে তাদের প্রতিহত করবে যেভাবেই
হোক। পুরো ফ্রন্ট তখন সক্রিয় হয়ে উঠবে। এ ধরনের অনেকগুলো নির্দেশ ভেসে আসে
কমাভারের। সদরবাদিন সাহেব এখন কোথায় আছেন জানি না। তবে ওয়্যারলেসে ভেসে আসা
তার বলিষ্ঠ কষ্ট বলে দেয় তিনি আছেন, আমাদের আশপাশেই।

সামনে পুরো একটা রাত। আর আমাদের শক্তি অতি ভয়ঙ্কর এবং হিংস। কখন তারা
এগিয়ে আসে, তার ঠিক-ঠিকানা নেই। শক্ত চূপিসারে এগিয়ে এসে বাঁপিয়ে পড়লেই
বিপদ। শক্ত সরাসরি তাদের ডিফেন্স লাইন থেকে আক্রমণ না করলে ফ্রন্টের কেউই গুলি

ছুঁড়বে না, এ নির্দেশ পাওয়া গেছে। ছুপিসারেই শক্রপক্ষের এগিয়ে আসবার সভাবনা সিংহভাগ। এজন্য সতর্ক পাহারা দিতে হবে সমুখবর্তী বিস্তীর্ণ প্রান্তরকে। পিন্টুসহ সমন্ত ট্রেকে রাউন্ড আপ তথ্য ঘূরে আসি। প্রতিটি ট্রেকে তিনজন করে ছেলে। তিনজনের মধ্যে পালা করে প্রত্যেকেই ট্রেকে দাঁড়িয়ে সামনে সতর্ক দৃষ্টি রাখবে উদ্যত হাতিয়ার হাতে। যে যখন পাহারায় থাকবে, তাকে তৈরি থাকতে হবে পুরোপুরি। শক্রের ছায়া দেখতে পাওয়ামাত্র গুলি ছুঁড়তে হবে তাকে সঙ্গে সঙ্গে। এতে সতর্ক হয়ে যাবে অন্যরা। পুরো ফ্রন্টেরই তখন সক্রিয় হতে সময় লাগবে না। ট্রেকের সহযোগী অন্য দু'জন থাকবে বিশ্রামে। গত চারটি দিন কখনোই ছেলেরা দিনেরাতে বিশ্রাম পায় নি মোটেই। পালাত্বমে সেন্ট্রি ডিউটি করলে বিশ্রাম পাবে সবাই। এটা এখন একান্তভাবে দরকার। মোতালের এবং মধুসূনের নেতৃত্বে দুটো পেট্রল পার্টি তৈরি করা হয়। দু'দল ভাগাভাগি করে সারারাত পেট্রল ডিউটি করবে আমাদের অবস্থানের চারপাশে। ছেলেরা বিড়ি-সিগারেট টানে। তাদেরকে এই বলে কড়া নির্দেশ দেয়া হয়েছে, ট্রেকের ওপর মুখ তুলে কেউ বিড়ি-সিগারেট টানবে না। যদি খেতেই হয়, তাহলে খাবে ট্রেকের মেবেতে বসে। ট্রেকের ওপর বিড়ি-সিগারেটের আলো সহজেই শক্রের টার্পেট হয়ে যাবে। একজন ওস্তাদ স্লাইপারের গুলি এসে জুলত বিড়ি সিগারেটকে আঘাত করে মুখের ভেতর দিয়ে বেরিয়ে যেতে পারে। গুঁড়িয়ে দিতে পারে সবকিছু। যুদ্ধের মাঠে এমন অঘটন ঘটেছে বহুবার। এখানেও সেরকম কিছুটাই বিচিত্র ব্যাপার নয়।

মনার গলা ও রাতভর ঘূম তাড়িয়ে বেড়ানো

শীতের কুয়ায়া চাদর বিছিয়ে চলেছে ওপর ফেলে। হিমঘরা রাত বাড়তে থাকে। সামনে শক্রপক্ষের কোনো গোলাগুলি শোনা যায় না। স্টোরা ফ্রন্টে বিরাজ করে নিবিড় নিতুরতা। বকর, পিন্টু ও আমি, আমরা একই ট্রেকের প্রতিনিধি তিনজন। আমাদের পোষ্ট পাহারা দিতে হবে আমাদেরই। এজন্য নিজেরাই ভাষ্য করে নিই নিজেদের সেন্ট্রি ডিউটি। জেগে থেকে পরপর প্রত্যেককেই পালন করতে হবে প্রত্যেক দায়িত্ব। আর সে অনুসারেই প্রথম সেন্ট্রি হিসেবে রাইফেল হাতে দাঁড়িয়ে যাই আমি। পিন্টু ও বকরকে বিশ্রাম নিতে বলি। কিন্তু কোথায় ওদের বিশ্রাম? বকর পিন্টুকে শোনাতে থাকে তার মনার গল্প। মনা মানে মনোয়ারা। ওর স্তুরির নাম। কোলের একটা বাচ্চাসহ স্তুরি সে তার নাগেশ্বরীর বাড়িতে রেখে এসেছে। বকর তার সেই ফেলে আসা স্তুরি নানা গল্প শোনায়। মনোয়োগী শ্রোতার মতো পিন্টু সিগারেট টানে আর সেই গল্প শোনে। মাঝে মাঝে এটাওটা বলে তার হ্বভাবসূন্দর রসিকতা দিয়ে ফেঁড়েন কাটে। গায়ে একটা পাতলা কক্ষ জড়িয়ে হিমেল ঠাণ্ডা জমে যাওয়া অবস্থায় হাতিয়ার হাতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমি আনমনে ওদের গালগল আর রসিকতা ইত্যাদি ঘনে যাই। রাইফেলের ধাতব ব্যারেল বরফ শীতল হয়ে এসেছে। এক সময় সেটা সামনের যাচিতে শুয়ে রেখে কাঠের বাঁটে গাল লাগিয়ে নির্নিয়ে নেত্রে তাকিয়ে থাকি সামনে। ডান হাতের তজলী অলসভঙ্গিতে বসে থাকে ট্রিগারের ওপর।

বেশ কিছুক্ষণ, প্রায় ঘণ্টাখানেক ট্রেকগুলো সরগরম থাকে ছেলেদের গালগল আর নিচু ঘরের হাসাহাসিতে। কিন্তু তারপরই কেমন যেনো বিমিয়ে যেতে থাকে সবকিছু। রাত ১১টার দিকে সবকিছু নীরব নির্ধর হয়ে যায়। ডান দিকের ট্রেকের প্রহরীকে ডাকি, কিন্তু সাড়া দেয় না। মোসারদ পাগলা ছিলো হাতিয়ার হাতে দাঁড়িয়ে। ঘূমিয়ে পড়লো নাকি? বামদিককার ট্রেকে ডিউটিরত সফিজউদ্দিনকে ডাকি। সেও সাড়া দেয় না। তার মানে

ঘূমিয়ে পড়েছে দু'জনেই। ট্রেক্সের ওপর উঠে পড়ি। ডান-বামের দু'টেক্সই পরীক্ষা করি। হাঁ ঘূমিয়ে পড়েছে। বুকের ভেতরটা আঁতকে ওঠে। সর্বনাশ! সারা ট্রেক্সে সবাই কি তালে ঘূমিয়ে পড়েছে? তালে তো মহাবিপদ! শক্ত টের পেলে এগিয়ে এসে একেবারে ম্যাসাকার করে দেবে। না, পেট্রল পার্টিরও খৌজ পাওয়া যায় না। ওরাও বোধহয় ঘূমিয়ে পড়েছে।

পিন্টুকে তুলে আনি ট্রেক্স থেকে। ব্যাপারটা দেখা দরকার। এ অবস্থা চলতে দেয়া যায় না। বকর দাঁড়িয়ে যায় তার হাতিয়ার নিয়ে। পিন্টুসহ আমি সমস্ত ট্রেক্সের পেট্টেগুলো এমাথা থেকে ওমাথা পর্যন্ত পরীক্ষা করতে থাকি। দেখি, অধিকাংশ ট্রেক্সই ছেলেরা ঢলে পড়েছে গভীর নিদ্রায়। কী সুন্দরভাবে হাতিয়ারের বাঁটে গাল ঢেকিয়ে দাঁড়িয়ে ঘূমুচ্ছে পোষ্ট-রক্ষী সেন্ট্রির দল! ওরা সবাই শ্রান্ত-ক্লুণ্ড আর বিধ্বন্ত! গত ৪ দিনে ওদের রেট নেয়া হয় নি, ঘূমপাড়া হয় নি একদণ্ড। সময় মেলে নি বলেই। ঠিক আছে সব। কিন্তু ঘূঁঁদের মাঠে শক্তকে সামনে বেঁধে এ রিক তো নেয়া যায় না। ঘুমোবার অবসর বেঁচে থাকলে জীবনে অনেক মিলবে। কিন্তু জীবন্ত ফ্রন্টে শক্তের সামনে কাউকে ঘুমোতে দেয়া যাবে না, ব্যাপারটা যতো অমানবিকই হোক না কেনো। সেকশন কমান্ডার, প্লাটুন কমান্ডারকে তাদের অধীনস্থ ছেলেরা যাতে না ঘুমুতে পারে, এজন্য কড়া ধর্মক্ষম নির্দেশ দিই। তারা ছেলেদের জাপিয়ে রাখবার চেষ্টা করতে থাকে। পিন্টু আর আমার রেট হয় না। কিন্তু ক্ষণ পরপরই আমরা পর্যবেক্ষণে বের হই। ঘূমন্ত সেন্ট্রির চূল ধরে ঝাঁকানি দিয়ে ঘূম ভাঙ্গে দ্রুত। কারো গালে ঠাসঠাস করে ঢড় কষতে হয়, পিন্টু কোনো কোনো ট্রেক্স নেমে শিয়ে ঘূমন্ত সেন্ট্রির পশ্চাদ্দেশে লাধি কষেও ঘূম ভাঙ্গয়। এভাবে সারারাত প্রচণ্ড শীতের ভেতরে দু'টি দাঁড়িয়ে বেড়াতে থাকি আমরা দুই সৈনিক। রাতটা কেটে যায় এক সময়, কোনো ট্রেক্স অফটন ছাড়াই।

২৫. ১১. ৭১

জিটারিং পার্টি ও গুলিবিহু নামের প্রক্ষেপণ

রাত শেষ হয়। প্রগাঢ় কুয়াশার চেকে থাকে সমস্ত ফ্রন্ট এলাকা। সূর্য উঠার সাথে সাথে কুয়াশার আবরণও সরে যেতে থাকে। এক সময় রোদ হেসে ওঠে। মিটি রোদের তাপে নিজেদের প্রায় জমে যাওয়া শরীর উষ্ণ করার জন্য ছেলেরা ট্রেক্সের গর্ত থেকে বেরিয়ে আসে। রাতটা পার হলো কোনো ঘটনা ছাড়াই। পাকসেনাদের মতিগতি বোঝা যাচ্ছে না। সামনে বেশ দূরে তাদের অবস্থান। সারারাত তারা কোনো সাড়াশব্দ করে নি। সঙ্গবত পঞ্চগড় রক্ষার শেষ চেষ্টা হিসেবে তারা তাদের প্রতিরক্ষা লাইন শক্ত করে তৈরি করছে। স্ব-স্ব অবস্থানে বসে থাকা ছাড়া আমাদের ওপর আর কোনো নির্দেশ নেই।

ছেলেরা নিজেদের হাতিয়ার ইত্যাদি পরিষ্কার করার কাজ নিয়ে বসেছে। পিন্টু বকরকে নিয়ে গেছে তাদের তত্ত্ব-তালাশে। ট্রেক্সের সামনে দিয়ে যাওয়া উচুমতো মাটির আলের সাথে শরীর এলিয়ে বসি। শীতের সকালের রোদে মিটিমধুর উষ্ণতা। আরামদায়ক এবং উপভোগ্য। এ অবস্থায় পকেট থেকে নোট বই বের করে আনি। গতকাল অয়স্যাত্মার জন্য কিছু লেখার অবকাশ পাওয়া যায় নি।

আজ ২৬ নভেম্বর। ডায়েরিতে লিখি এভাবে, '২৬-১১-৭১। কাল ADVANCE করে এসেছি পাঁচ মাইল। পচাগড় থেকে দু'মাইল দূরে ঘাঁটি গেড়ে বসেছি আমরা। কাল সারাক্ষণ ট্রেক্স ঠিক করেছি, ট্রেক্স তৈরি করেছি...।'

লেখা শেষ করতে পারি না। সকাল নটার দিকে নায়েক তফসিল এসে হাজির হন কমান্ডারের ম্যাসেজ নিয়ে। জিটারিং-এ যেতে হবে সমুখবর্তী শক্তির অবস্থানের দিকে। ৭ জনের একটি ছোট দল নিয়ে এসেছেন তিনি তার সাথে। কমান্ডারের নির্দেশ, তফসিলের দলের সাথে আমাদেরও এগিয়ে যেতে হবে। দলটিকে পরিচালনা দায়িত্ব থাকবে আমার ওপর।

‘জিটারিং’ হচ্ছে যুদ্ধের ভাষা। এটা এক ধরনের পেট্রল। দু’পক্ষের প্রতিরোধ লাইনের ভেতর দিয়ে এগিয়ে যায় এই দলটি অত্যন্ত সতর্কতার সাথে। উদ্দেশ্য, শক্তির সঠিক অবস্থান এবং তাদের সমরসংজ্ঞা সম্পর্কে অবহিত হওয়া। সেই সাথে শক্তি লাইনের কাছাকাছি পৌছে সুবিধেজনক জায়গা থেকে শক্তির ওপর অতিরিক্ত গুলিবর্ষণ করে তাকে উকে বা তাতিয়ে দেয়া। এতে আক্রান্ত শক্তি একদিকে ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হয়, অন্যদিকে আক্রান্ত হওয়ার সাথে সাথেই তারা রি-অ্যাস্ট করে গুলিবর্ষণ শুরু করে। সক্রিয় হয়ে ওঠে তাদের সমন্ত ডিফেন্স লাইন। আর এভাবেই তাদের সৃষ্টি ডিফেন্স লাইন উন্নাসিত হয়ে ওঠে এ পক্ষের ফ্রন্ট লাইনের কাছে। শক্তির সঠিক অবস্থান চিহ্নিত হয়ে যায়। আর তারপরই তাদের ওপরে শুরু করা হয় বাড়ো আক্রমণ। অবশেষে তাদের দিকে বেপরোয়াভাবে অগ্রসর হয়ে তাদের বিনাশ করে ঘাটি দখল করে নেয়া হয়। দু’পাশের ঘাপটি মেরে পড়ে থাকা প্রতিরক্ষা লাইনের মধ্যে যুদ্ধ বাধার এটা একটা কোশল। তাদের ডিফেন্স লাইনে বসে থাকা শক্তি যাতে যুদ্ধকে প্রলম্বিত করতে না পারে সে জন্যই এ ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হয়ে থাকে। শক্তিকে তাড়াতাড়ি যেখানে পরাজিত করা প্রয়োজন এবং তাদের নতুন ঘাপটি তারা যাতে জোরদারভাবে বসতে না পারে এজন্য তাদের নাড়া দিয়ে দিয়ে তাতিয়ে দিতে হয়। এ কাজের নামই হচ্ছে জিটারিং। আর এ কাজে যে দল যায়, তাদের মন্ত্রী হয়ে জিটারিং পার্টি বা জিটারিং পেট্রল।

প্রাক্তন ই.পি.আর. সদস্য নায়েক তফসিলের বয়স হয়েছে। লোহা আকৃতির হালকা পাতলা কিন্তু পাকানো শরীর তার। প্রতিরোধ সুষ্ক্রিয় শুরু থেকেই তিনি যুক্তিযুক্ত সক্রিয়ভাবে জড়িত রয়েছেন। প্রায় ৬ মাস অমরবাহীন ক্ষেত্রদলহাটের উল্টোদিকে ভজনপুর-দেবনগর প্রতিরক্ষা লাইনে থেকে তিনি পাকবাহীক সাথে প্রতিনিয়ত যুদ্ধ করে এসেছেন। সুবেদার খালেকের বি কোম্পানিতে তিনি একজন সাহসী সৈনিক হিসেবে এরি মধ্যে প্রচুর সুনাম কুড়িয়েছেন।

জিটারিং পার্টির জন্য প্রয়োজন সাহসী আর দক্ষ যোদ্ধার। সুবেদার খালেক এ জন্য বাছাই করেছেন বানু সৈনিক নায়েক তফসিলকে। ৭ জনের দল পাঠিয়েছেন তিনি। এরা সবাই প্রাক্তন ই.পি.আর সদস্য। তফসিল এসেই ম্যাসেজটা দিয়ে বলেন, তাড়াতাড়ি করেন দানু জিটারিং-এ যেতে হবে। আপনে নেবেন ১০ জন। কমান্ডারও হইবেন আপনি।

তাকে বসতে বলি ট্রেক্সের পাশে। তার দলবল নিয়ে তিনি বসেন। অ্যাডভাসের সময় এক সাথে এগিয়েছি। দেখেছি তাকে। কিন্তু আলাপ হয় নি। বুক পর্যন্ত তার কাঁচাপাকা লোহা দাঢ়ি, চেহারায় তার বেশ ধার্মিক ধার্মিক ভাব রয়েছে। কথাবার্তায় ভদ্র, ভালোই লাগে তফসিলকে।

নায়েক তফসিল এগিয়ে দেন ম্যাসেজটা। তাতে লেখা, “সকাল নটা থেকে ১০টার মধ্যে জিটারিং পার্টি নিয়ে তুমি রওনা হবে। সমন্ত ফ্রন্ট লাইন এসময় সতর্ক থাকবে। ফেরার সময় দুপুর বারোটা থেকে একটাৰ মধ্যে।” জিটারিং-এর ব্যাপারটা জানা থাকলেও, সম্যক অভিজ্ঞতা নেই। তবে নির্দেশ যখন এসেছে, তখন যেতেই হবে।

বাট্টপাট তৈরি হয়ে নিই। ট্রেক্সগুলো থেকে তুলে আনি বেছে বেছে সব সাহসী ছেলে, শুষ্ক, মিনহাজ, জয়নাল, একরামুল, শামসুল, মোতালেব ও হাফেজসহ ৯ জনকে। আমিসহ ১০ জন

এফ.এফ আর ৭ জন ই.পি.আর নায়েক তফসিলসহ। সামান্য ত্রিফিং দিই পুরো দলটিকে ট্রেইনিং সারিয়ে পেছনে ফাঁকা জায়গাটিতে সবাইকে ফ্ল-ইন করিয়ে। এরপর সবাইকে কাঁধে ওঠে হাতিয়ার এবং গুলি। রঙেন দিই আমরা ফ্রন্ট লাইনের সামনে দিয়ে আলপথ ধরে। পিন্টু, বকর আর মুসা থাকে ফ্রন্টের দায়িত্বে। প্রয়োজনে তারা এগিয়ে যাবে আমাদের সাহায্যের জন্য।

প্রায় তিনশো গজ এগুনোর পর আমরা সতর্ক হয়ে যাই। সং্যত করে ফেলি আমাদের চলার গতি। সামনে একটা বাঁশ ঝাড়। কয়েকটা বাড়িঘর। কিছু একটা যেনো নড়াচড়া করার আভাস পাওয়া যায় প্রায় শ'খানেক গজ সামনেকার সেই বাঁশ ঝাড়ের তলায়। মুহূর্তে সচকিত হয়ে ওঠে সকল ইন্দ্রিয়। বুকের ওপর শয়ে পড়ি সবাইকে নিয়ে। ডাঙা ধরনের জমি। পাতলা ধানের আবাদ। তার ভেতরে হারিয়ে যায় সবার শরীর। নায়েক তফসিল আমার পাশে। বেশ কিছুক্ষণ চূপচাপ কেটে যায়। সামনের দিক থেকে কোনো সাড়াশব্দ মেলে না। শুধু আর জয়নালকে সামনে এগিয়ে যেতে বলি, বাঁশ ঝাড়ের তলাটা রেকি করার জন্য। ওরা এগিয়ে যায়। আমরা শয়ে থাকি আমাদের অবস্থানে।

নায়েক তফসিল কেবলই উঠতে চান। আর বলেন, ও কিছু না দাদু, আপনারা শুধু শুধু ভয় পাচ্ছেন।

আমি আজকের দলের কম্যান্ডার। নায়েককে ধমক মেরে চুপ করিয়ে দিয়ে বলি, ডোক্টর মেক এনি সাউন্ট। সময় হলে আমি অর্জন দেবো।

প্রবীণ সৈনিক চুপ মেরে যান। কিছুটা যেনো মনোমুক্ত হয়ে মুখ বেজার করে থাকেন।

প্রায় আধশৃঙ্খল পর শুধু আর জয়নাল ফিরে আসে। রিপোর্ট দেয় তারা, না, বাঁশ ঝাড় পর্যন্ত পরিষ্কার। তবে তার পঞ্চাশ গজ পেছনভাবে বাড়িগুলোয় লোকজন আছে কি না, সেটা তারা বুঝতে পারে নি।

বাঁশবাড় পর্যন্ত এগিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত সহি। বেজারমুখো নায়েক তার লোক দাঢ়িতে হাত বুলিয়ে যেনো চাঙা হয়ে ওঠেন। বেজার উচ্চজিত দেখায় তাকে। তিনি জোর গলায় বলেন, চলেন দাদু, আজ দুই চারটা লাশ না নিয়ে ফিরবো না। চকিতে তাকাই প্রবীণ সৈনিকের দিকে। তার চোখে-মুখে প্রচণ্ড সাহসের দীপ্তি। গলায় উচ্চারিত শপথ, শক্রের লাশ না নিয়ে ফিরবো না আজ।

শুধু আর জয়নাল আগে, পেছনে আমরা। সে এক কষ্টকর ত্রলিং। তাই করে এগুতে হয় সবাইকে ছড়ানো অবস্থায়। যুদ্ধমান দুই শক্ত ফ্রন্টের মাঝখানে আমরা। কখন কি ঘটে যায়, বলা মুশকিল। ওয়্যারলেস কিংবা ওয়াকিটকি সেট আনলে যোগাযোগ রাখা যেতো আমাদের ফ্রন্টের সঙ্গে। আনা হয় নি। এ একেবারে অনিশ্চিত একটা পরিস্থিতি। আমি এই দলের কম্যান্ডার। এদের সবার দায়দায়িত্ব আমার ওপর অর্পিত। এমনও হতে পারে, এই মিশনে আসা আমাদের ১৭ জনের দলটির সবাই হারিয়ে যেতে পারি। ধরা পড়ে যেতে পারি বৰ্বর পাকবাহিনীর হাতে। ওরা কতোদূরে আছে তা-ও জানি না।

এমন পরিস্থিতিতে চোখ-কান খোলা রেখে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে এগুচ্ছি আমরা। এগুতে গিয়ে ঘন ঘন স্থান পরিবর্তন করতে হচ্ছে। আর এটা করতে গিয়ে কখনো কোমর বাঁকিয়ে মাথা নিচু করে হাঁটতে হচ্ছে, কখনো মাটিতে বসে হামাগুড়ি দিয়ে, কখনো-বা মাটির ওপর শয়ে পড়ে, নয়তো হাতের কলুইয়ের ওপর ভর দিয়ে বুকে হেঁটে ত্রলিং করে এগুতে হচ্ছে।

অবশ্যে বাঁশবাড়টার নাগাল পাওয়া গেলো। ছেটো কয়েকটা বাঁশের ঝোপ। পাতলা বাঁশের সারি। একপাশে নালার মতো টানা লোক গর্ত। এখানে পৌছেই দ্রুত অবস্থান নিয়ে

নিই সবাই । বাঁশবাড়ের সামনে একটা সবুজ ধানের খেত । তখনো ধানশীমে পাক ধরে নি । ধানের জমিখানা কিছুটা ডাঙ্গামতো । এরপরই বেশ কিছুটা নিচু হয়ে জমিগুলো সমতল আকারে গিয়ে মিশেছে বাড়িগুলো পর্যন্ত । সেগুলোও ধানখেত । সোনালি ফসল মাথা নুইয়ে আছে খেতের পর খেত জড়ে । সামনে আর কোনো আড়াল নেই ।

মাথা তুলে দেখার চেষ্টা করছি, বাড়িগুলোয় কোনো মানুষজন আছে কি নাঃ অন্তত একটি প্রাণীর মড়াচড়ার ভঙ্গি । কিংবা হেলমেট পরা একটি মাথা । নয়তো একজন লম্বা-চতুর্ভু মানুষ, যাকে দেখলেই বুঝে নিতে পারা যাবে, এ আমাদের সেই প্রতিপক্ষ দলের মানুষ, যারা বিগত ৮টি মাস ধরে আমাদের প্রাণপ্রিয় দেশকে দখলে রেখে প্রায় শুশান করে ছেড়েছে ।

এখন, এই মুহূর্তে গভীর একাহাতার সঙ্গে একটা সিন্ধান্তে পৌছানোর চেষ্টা করছি । কী করবো, বুঝে উঠতে পারছি না, তবে একটা কিছু যে করতে হবে, সে ব্যাপারটা মনের ভেতরে প্রচণ্ডভাবে কাজ করে চলে এবং তারই রেশ ধরে একটা সিন্ধান্তে উপনীত হতে যাবার মতো অবস্থায় যখন পৌছেছি, ঠিক সে সময়ই চরম একটা ভুল করে বসলেন প্রবীণ সৈনিক ।

হঠাৎ করেই নায়েক তফসির চিত্কার দিয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন । আর দাঁড়িয়েই বলতে লাগলেন, পাওয়া গেছে দানু, শালারা আছে... আজ শালাদের যাইতে দেওয়া হবে না... আসেন আপনারা... ।

তফসির চিত্কার করে কথা বলতে আর সেই সাথে শুলি শুলি শুলাম্ব করে কাঁধের হতিয়ার বাপিয়ে ধরে শুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে এগিয়ে যেতে থাকলেন ধানখেতের ওপর দিয়ে প্রকাশ্য আলোতেই কোনোরকম আড়াল না নিয়ে সোজাসজ্ঞ এগিয়ে যান তিনি । তার দেখাদেবি স্থ-স্থ অবস্থান থেকে লাফিয়ে ওঠে অন্য আর স্থানেই এবং পাগলের মতো শুলি ছেঁড়া শুরু করে । সেই সাথে এগিয়ে যেতে থাকে বাজেটিলোর দিকে আক্রমণের ভঙ্গিতে । এ অবস্থায় খুব স্বাভাবিকভাবেই কমান্ডার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন । আমারও অবস্থা হলো তাই । কিন্তু দলে অবস্থাকে নিয়ন্ত্রণে আনার জন্যে এগিয়ে যাই সামনে তফসিরের কাছে । নিজের রাইফেল থেকে শুলি ছুঁড়ছি অভিষ্ঠ । আমার উদ্দেশ্য তফসিরকে থামানো । এভাবে প্রকাশ্য দিবালোকে একেবারে খোলামেলা অবস্থায় শক্তির দিকে কোনোরকম প্রোটেকশনবিহীন এগিয়ে যাবার মধ্যে রয়েছে বিপদের সমূহ সংজ্ঞাবনা ।

কিন্তু থামানো যায় না । অস্ত্রির আর উন্নত হয়ে গেছে লোকটি । দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুলি ছুঁড়ছেন আর এগিয়ে যাচ্ছেন সবার আগে আগে । সেই সাথে তার মুখ দিয়ে বের হচ্ছে অদ্যশ্য শক্তির উদ্দেশ্যে অশ্রূব্য চিত্কার আর গালাগালি ।

সামনেই শক্তি ওঁ পেতে ছিলো । তফসিরের অভিষ্ঠ চোখে শক্তির দলটি ধরা পড়েছিলো ঠিকই । প্রচণ্ড সাহস আর দুর্ঘর্ষ সৈনিক নায়েক তফসির শক্তিকে দেখতে পেয়েই নিজেকে আর স্থির রাখতে পারেন নি । তিনি দৌড়ে গিয়ে শক্তির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের ধরে ফেলতে চেয়েছিলেন । কিন্তু ওঁ পেতে থাকে শক্তি সেনারা এ সুযোগ দেবে কেনোঁ হঠাৎ করে আমাদের আগুয়ান দলটিকে লক্ষ্য করে তারা শুরু করে শুলিবর্ষণ । থাকে থাকে শুলি ছুটে আসতে থাকে সামনের দিক থেকে ।

ঠিক চার গজ সামনে লুটিয়ে পড়েন নায়েক তফসির । আমার প্রায় শরীর ঘেঁষে বাঁ দিক দিয়ে চলে যায় এক ঝাঁক ঝুলান্ত বুলেট । বাঁচবার সহজাত তাড়নার মুহূর্তে শোয়া পজিশনে চলে যাই । চিত্কার করে সবাইকে বলি শুয়ে পড়তে এবং তাদের শোয়া অবস্থা থেকে

অনবরত গুলি চালিয়ে যাবার নির্দেশ দিতে থাকি। নির্দেশ পেয়ে যে যেখানে ছিলো সেখানেই ঘয়ে পড়ে সামনের বাড়িগুলোর দিকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ে চলে।

দ্রুত এগিয়ে যাই বুকের ওপর ভর দিয়ে নায়েকের কাছে। গুলি খেয়েছেন তিনি। হাঁটু দুমড়ে কাত হয়ে পড়ে আছেন। গলগল করে রক্ত ঝরছে তাঁর গুলিবিন্দ ক্ষতস্থান থেকে। থাকি পোশাক রক্তে ভিজে গেছে। ছটফট করছেন তিনি তীব্র যন্ত্রণায়। গোঁজাছেন আর পানি খেতে চাইছেন। কিন্তু কোথায় তার গুলি লেগেছে সেটা বোৰা যাচ্ছে না। শরু ও মিনহাজকে ডাকি গলা তুলে। দ্রুত অসতে বলি কাছে। ওরা আসে। উদের সাহায্যে নায়েকের কোমরের বেষ্ট খুলে ফেলা হয়। শরু তাঁর কোমরে শৌজা বেয়নেট টেনে নিয়ে দ্রুত ছিঁড়ে ফেলে নায়েকের দু'পায়ের খাকি প্যাটের অংশ। এবার শনাক্ত করা যায় তফসিরের ক্ষতস্থানটা। কোমরের নিচে দু' উরুতেই গুলি লেগেছে তার। এফোড়-ওফোড় হয়ে বেরিয়ে গেছে গুলি। প্রবীণ মুক্তিযোদ্ধা ঘামছেন আর পানি চাইছেন।

আমি তার মাথা কোলে নিয়ে বসি। শরু মিনহাজকে নির্দেশ দিই তাড়াতাড়ি করে তাদের কোমরের গামছা খুলে তাই দিয়ে তার আহত জায়গা বেঁধে ফেলতে। বক্ষস্ক্রণ বক্ষ করা প্রয়োজন। শরু আর মিনহাজ নির্দেশমতো কাজে হাত লাগায়। জয়নালকে চিক্কার করে বলি, তোরা গুলি চালিয়ে যা জয়নাল, থামবি না কেউ।

প্রতিটি মুহূর্তে মনে হচ্ছে শক্রের দলটি এই বুরি এসে বৰ্ষায়ে পড়লো আমাদের ওপর। সম্ভবত শুরাও এসেছে আমাদের মতোই জিটারিং-এর ভোদশ্যে। দুই জিটারিং পার্টি এখন মুখোমুখি। দুই ফ্রন্ট লাইনের মধ্যবর্তী জায়গায় অঙ্গুই নো ম্যানস্ ল্যান্ড-এ। এ অবস্থায় পেছন থেকে কারো তৎক্ষণিক সাহায্য পাবার স্কেলনা নেই। এখানে যে দল ঢিকে থাকতে পারবে, বেঁচে থাকবে তার সদস্যরাই। বাট মেরার এই পরিস্থিতিতে তুমুল গুলিবিনিময় চলতে থাকে উভয়পক্ষের মধ্যে। শক্রের গুলি বর্ষিত হচ্ছে বাড়িগুলোর দিক থেকে বৃষ্টির মতো। ধানখেতের ভেতরে আমাদের আবস্থান। মাথা তুলবার উপায় নেই। আমাদের দলের অন্যতম যোদ্ধা, সব থেকে বক্ষের মানুষটি আহত। তাকে বাঁচাতেই হবে যে করে হোক। এজন্য প্রয়োজন শক্রদলকে ঠেকিয়ে রাখা। ওরা সবাই সে চেষ্টাই করছে প্রাণপণে।

শরুর হাফ প্যাটের পকেট থেকে তুলোর গজ আর ব্যান্ডেজ বের হয়। ও কোনখান থেকে যেনো এগুলো যোগাড় করে পকেটে মজুদ রেখেছিলো। এফোড়-ওফোড় হয়ে যাওয়া জায়গাগুলোয় তুলোর গজ ঠেলে দিয়ে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে ব্যান্ডেজ বাঁধতে থাকে দু'জন। আমি নায়েকের মাথা কোলে তুলে নিয়ে বসে থাকি গভীর মহতায়, জিগ্যেস করি, কষ্ট হচ্ছে দাদুঁ?

কথার জবাবে বয়োবৃক্ত মানুষটি কেবলই কাঁদেন। ছটফট করেন। বাড়িতে ফেলে আসা বট-বালবাচার কথা বলেন। বাঁচার জন্য তার আকুল আকুতি, আমাকে আপনারা ফেলে যাবেন না দাদুঁ। আমাকে তাড়াতাড়ি নিয়ে চলেন, তা নইলে মরে যাবো।

মৃত্যুর মুখে সবাই যেমন কামনা, তেমনি তারও। বাঁচতে চাইছেন তিনি। আমারও তাকে বাঁচাবার আপ্তাগ চেষ্টা করছি। তাকে উদ্ধার করে নিরাপদে নিয়ে যেতে চাইছি। মাথার ওপর দিয়ে স্নোতের মতো বয়ে যাওয়া গুলির বাঁকের ভেতরেও ধির বিশ্বাসে আটল থেকে শপথ বাকের মতো উচ্চারণ করে চলেছি, আপনি বাঁচবেন, আপনাকে আমরা বাঁচাবোই দাদুঁ, ঘাবড়াবেন না ...।

শুঙ্গি রাইফেলের ট্রেচার ও প্রাণিকর পশ্চাদপসরণ
ঠিক এই রকমই মুহূর্তে বিপদ বা সঙ্কটের মাঝা আরো বেড়ে যায়। আমাদের পেছনের ফ্রন্ট
লাইন যেনো ফুসে ওঠে এক সাথে। অন্দুরবর্তী পাক ডিফেন্স লাইনও গর্জে ওঠে সামান পাহা
দিয়ে। আমাদের ঘর্টার ব্যাটারিও সক্রিয় হয়ে ওঠে এ সময়। শেল উড়ে আসতে থাকে
আমাদের দিকে। কপাল ভালো টার্গেট হই না আমরা। ফাটতে থাকে সেগুলো আমাদের
অবস্থান থেকে দেড়শো-দুশো গজ দূরত্বে। বিফোরণের পর বিফোরণ। দুর্মন্টের ভেতরে
তুমুল শুলিবিনিময়। মাথার ওপর দিয়ে বাঁক বেঁধে গোলাগুলির আসা-যাওয়া। একটা জীবন্ত
যুদ্ধক্ষেত্রের ভেতরে নিজেদের এখন এই মুহূর্তে শুবই অসহায় লাগে। দুর্তিনটা শেল এসে
পড়ে একেবারে কাছাকাছি। নিচের সমতল ধানবেতটার আওতায়। ছিটকে ছিটকে আসে নরম
কাদা মাটি। কালো ঝোঁয়া-বারুদের গন্ধ। বিফোরণের শব্দের ধাক্কা ছেলেদের প্রায় দিশেহরা
করে তোলে। নায়েক তফসির এ অবস্থায় অস্থির হয়ে ওঠেন। বিকৃত গলায় তিনি কেবল
বলতে থাকেন, আমি আর বাঁচবো না ...। এ পরিস্থিতিতে একজন কমান্ডারের সব থেকে
সঠিক সিদ্ধান্ত হচ্ছে রিট্রিট অর্থাৎ পশ্চাদপসরণ করা। আমাকে সে সিদ্ধান্তই নিতে হয়।

শুরুক ওর পরনের লুঙ্গি খুলতে বলি। ও তাই করে। ওর লুঙ্গির ভেতর দিয়ে দুটো রাইফেল
চুকিয়ে দিয়ে তৈরি করা হয় একটা ট্রেচার। তফসিরকে তোলা হয় তার ওপর। এক হাতে
মাটিতে ওর দিয়ে দিয়ে লুঙ্গির তৈরি ট্রেচারের রাইফেলের ন্যূনত্বের বাঁট হাতের ওপর ধরে ধীরে
ধীরে সরে আসতে লাগলাম আমরা পেছনে— যেখানে জোখন আছে। যেখানে যেতে পারলে
নায়েক তফসিরকে বাঁচানো যাবে। কিন্তু এতে গিয়ে কিছুক্ষণ পরপর ট্রেচারবাহী ছেলেরা
হাঁফিয়ে উঠছে, ফলে হাত বদল করতে হচ্ছে ভৌতিক ঘন ঘন। আর পেছনের ছেলেরা গুলি
করতে করতে পিছু হটছে। ট্রেচারের সামনে আমার প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে এগুছি।

সে এক প্রাণান্তর পশ্চাদপসরণ, ট্রেচার বহনকারী ছেলে চারজনের হাঁপিয়ে ওঠা তখন
চৰমে। নায়েকের সাথে আসা তার দিকে যোকারা তাদের ওজনের এই অবস্থা দেখে হতবিহুল
হয়ে পড়েছে। কেউ কেউ কান্দিয়ে থাকে। চোখজোড়া মুছতে থাকে কেউ। কে একজন কেন্দে
উঠেছিলো ভুকরে, তাকে ধরক দিয়ে থামাতে হয়েছে। ট্রেচারবাহী দলটি হাঁপাচ্ছে। বড়ো বড়ো
শ্বাস-গ্রন্থাস নিছে মুখ হ্যাঁ করে। গতি তাদের শ্বাস হয়ে আসছে। আমি সামনে থেকে তাদের
বারবার তাগাদা দিয়ে চলেছি, মুভ! মুভ ফার্ট! শুন, মিনহাজ জোরে, আরো জোরে!

দিনের যেমন অবসান আছে, জীবনের যেমন পরিসমাপ্তি আছে, তেমনি যাবতীয়
দুর্ঘকষ্টেরও একটা সমাপ্তি আছে। প্রকৃতির এটাই নিয়ম। এ নিয়ম ধরেই যেনো আমরা
নিরাপদ জায়গায় শক্তির গুলির নিশানার বাইরে এসে পৌছুন। একটা পরিয়ত্যক্ত বাড়ির
সামনে এসে সবাইকে থামতে বললাম। একজন ই.পি.আর. সদস্য দৌড়ে গিয়ে পানি নিয়ে
এলো পুরুরের মতো একটা ডোবা থেকে, বাড়ির ভেতরে পাওয়া একটা গাম্লার মতো
ভাবে করে। তারপর কিছুক্ষণ বিশ্রাম। এরপর ট্রেচারবাহী দল আবার সক্রিয় হলো। এবার
তারা সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং তুলে নিয়েছে ট্রেচার কাঁধে। ফলে আহত নায়েককে বহন
করার ব্যাপারটা অনেক সহজ হয়ে যায়। এখন ওরা দ্রুত হাঁটতে পারছে। নায়েক তফসির
ট্রেচারবাহীদের প্রতিটি পদক্ষেপে কঁকিয়ে উঠছেন। ট্রেচারের বাইরে তার পা দুটো নড়বড়
করে ঝুলছে। এক সময় আমরা এসে পৌছুই আমাদের লাইনে।

আমার সারা শরীর রকে মাথামাথি। এ অবস্থা দেখে পিন্টু ও বকর ছুটে আসে

উদ্ভাস্তের মতো। ট্রেঞ্চ থেকে চিৎকার করে করে ছুটে আসতে থাকে আমার আর সব প্রিয় ছেলে, প্রিয় সহযোদ্ধারা। মোসারদ পাগলাসহ কয়েকজন কেঁদেই ফেলে। শান্তির শেষ সীমান্য তখন আমরা। একেবারে বিধ্বস্ত ভেঙে পড়া চেছারা। জায়গা মতো পৌছেই ধপাস করে ট্রেঞ্চের পাশে বসে পড়েই পিন্টুকে শুধু বলি, পিন্টু, তুমি আহত নায়েক তফসিরকে লে। মাসুদ আর সুবেদার খালেকের কাছে নিয়ে যাও। সেখান থেকে ফিল্ড হাসপাতালে ডা. শামসুদ্দিনের কাছে পৌছানোর ব্যবস্থা করো। নায়েককে বাঁচাও। সেভ হিজ লাইফ।

পিন্টু আদেশ পালনে তৎপর হলো। নিয়ে গেলো নায়ককে দ্রুত পেছনে। আমি আমার ট্রেঞ্চে চুকে শয়ে পড়লাম। মাথার কাছে বকর বসে। ওর ঢেখে পানি। কাঁদছে সে। বকরের এই কান্নার মধ্যে রয়েছে শ্রীতির একটা গভীর যোগসূত্র। আঘিক বন্ধনের একটা টান। মন বলে উঠে সেই পুরাতন বিশ্বাসের কথা, কে বলেছে, যুদ্ধের ভেতরে আছে কেবলি হত্যা নিষ্ঠৃতা নৃশংসতা আর বিভীষিকা! কে বলে যুদ্ধের ভেতরে রয়েছে কেবল অমানবিকতা আর জিয়াংসার উজ্জ্বাস? যুদ্ধে সবকিছু আছে। একদিকে যেমন রয়েছে মানুষকে হত্যা করবার দুর্বার এক প্রচেষ্টা, রয়েছে মানুষের প্রতি মানুষের ঘৃণা আর শক্তির চরম বহির্বকাশ, পাশাপাশি তেমনি রয়েছে সহযোগিতা, সহর্মিতা আর পরম আঘিক বন্ধনও। আছে মায়া-মমতা, মেহ-প্রেম-ভালোবাসা আর ভালোবাসার দুর্বল আনন্দঘন কোমল অনুভূতি। তা না হলে আমার মাথার কাছে বসে বকর কাঁদছে কেনো? ছেলেরাই-বা কাঁদবে কেনো? কেনো আমরা একতা কষ্ট করে যুদ্ধাহত নায়েক তফসিরকে শক্তির মুখ থেকে উদ্ধার করে নিয়ে এলাম? সামনে যুদ্ধে রয়েছে সবকিছুই।

ফিল্ড হাসপাতাল ও ডা. শামসুদ্দিন

নায়েক তফসিরকে ফিল্ড হাসপাতালে পিল্টাক মতোই পৌছানো হয়েছে, এ খবরটা ঘণ্টাখালেকের মধ্যে ফিরে এসে দেয়। সে নিজেই গিয়েছিলো সেখানে তাকে নিয়ে। আমাদের অ্যারুলেস নেই। একটি অল্প জিপে করে নিয়ে গেছে তারা তফসিরকে। ডা. শামসুদ্দিন তার চিকিৎসার দায়িত্ব স্থানে হাতে যখন পড়েছেন নায়েক তফসির, তখন আর বিপদের সঙ্গবনা নেই। বিশ্বাস জন্মায়, ডাক্তার তাকে সুস্থ করে তুলবেনই যেভাবে হোক। ডা. শামসুদ্দিন ইতিমধ্যে প্রচুর আস্থা আর বিশ্বাস অর্জন করে ফেলেছেন আমাদের।

সুবেদার খালেক ধন্যবাদ দিতে আসেন আমার ট্রেঞ্চে। তিনি কিছুক্ষণ হায় আফসোস করেন এভাবে, কিন্তাই আই হাস্তাইচুলাম নায়েক তফসিরে...। আঁনেরা না থাইকলে দাদু তারে আনোন যাইতো ন...।

সুবেদার খালেকের একজন ঘনিষ্ঠ সহযোদ্ধা নায়েক তফসির। জিটারিং-এ গিয়ে তার আহত হওয়ার ঘটনা এবং তাকে লুঙ্গি ও রাইফেল দিয়ে তৈরি ট্রেচারে করে বহন করার বিস্তারিত বিবরণ তিনি মন দিয়ে শোনেন। তারপর তিনি উচ্ছ্বসিত প্রশংসা আর তাঁর নিঃসংকোচ ধন্যবাদ জানান মনের গভীর থেকে। যাবার সময় তিনি বলেন, আনাগো আল্লা মঙ্গল করবো।

পিন্টুসহ অন্য ক'জন ফিল্ড হাসপাতাল দেখে এসেছে। জগদলহাটে একটি পরিত্যক্ত স্কুল ঘরের ভেতরে স্থাপন করা হয়েছে এই ফিল্ড হাসপাতাল। ডা. শামসুদ্দিন আর তার স্ত্রী দিনরাত পরিশুম করে যাচ্ছেন হাসপাতাল পরিচালনার কাজে। তাঁদের কাছ থেকে জানা যায় ফিল্ড হাসপাতালের বিস্তারিত বিবরণ। মধুসূদন বলে, ওমরা স্বামী-স্ত্রী নিজেরাই চৌকি ধরে

টানাটানি করেছে গে। ডাক্তারের বউটা খুব সুন্দর দেইখতে। আর মায়া খুব তার। রোগীলার
খুব সেবা করেছে নিজের হাতোত।

ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের ফাইনাল ইয়ারের ছাত্র শামসুদ্দিন। যুদ্ধের ক্ষেত্রে দেশ থেকে
পালিয়ে এসেছেন। একই কলেজের ভূলিয়ার ছাত্রী ছিলেন বর্তমান মিসেস শামসুদ্দিন। তিনিও
একইভাবে পালিয়ে এসেছেন দেশ ছেড়ে। দুঃজনে এপারে এসে বিয়ে করেছেন। সম্ভবত তাদের
মধ্যে আগে থেকেই সম্পর্ক ছিলো। এই ফ্রন্টের জন্য সদরদফিনকে ফিল্ড হাসপাতাল চালু করতে
হয়েছে। কিন্তু খুলে কী হবে, পাস করা ডাক্তার পাবেন কোথায় তিনি? এ ঘটাতি পূর্ণে এগিয়ে
এসেছেন বেঙ্গাপ্রণোদিত হয়ে এই ডাক্তার জুটি, ডা. শামসুদ্দিন ও তার স্ত্রী ডালিয়া। তারা যোগ
দেয়াতে কমাত্তার সদরদফিনকে তার ফিল্ড হাসপাতাল নিয়ে আর বিশেষ ভাবতে হয় নি।

এই ডাক্তার জুটি একেবারে নতুন করে ঢেলে সজিয়েছেন আমাদের ফ্রন্ট লাইনের পেছন
দিককার ফিল্ড হাসপাতালটি। স্বামী-স্ত্রী দুঃজনে মিলে তারা রাত-দিন পরিশ্রম করছেন। প্রচুর
অস্থিবিধি, অন্তর্হীন সমস্যা এবং প্রতিকূল পরিস্থিতির সাথে প্রতিনিয়ত লড়াইয়ের সমস্যা।
এছাড়া ওশুধপত্র আর সরঞ্জামাদির একটা ঘাটাতি তো রয়েছে। এসব সঙ্গেও তারা ফিল্ড
হাসপাতালটিকে চমৎকার অবয়ব দিতে পেরেছেন। দুঃজনে নিজের হাতে কাজ করে এতোদূর
পর্যন্ত এসেছেন। শুধু তাই নয়, অন্যান্য চিকিৎসা সহযোগীদের নিয়ে চমৎকার একটা চিমও
গড়ে তুলেছেন। আর এই চিম স্পিরিট নিয়ে কাজ করার প্রস্তুত তারা তাদের সব ধরনের
সীমাবদ্ধতা প্রায় কাটিয়ে উঠতে বসেছেন। আকারে হাসপাতালটা ছেট হলেও চিকিৎসার
পরিবেশ চমৎকার ও পরিপার্টি। বিশেষ করে মিসেস শামসুদ্দিনের রোগীদের প্রতি সেবার যে
মনোভাব, তার তুলনা মেলা ভার। শুরু ভাস্কুল কিং কহিয়ে, ডাক্তারিন্ডা যেমন দেইখতে
সোন্দর, তেমন তার বুক ভরতি মায়া। সব রোগীলাই বেটিছওয়াড়াক মা-মা করে ডাকছে।
নিজের হাতে সেবা করছে বউটা, দিন রাত কুকুর কুকুর নাইগে তার, মা নচ্চীগে একেবারে...।

ফ্রন্ট লাইন থেকে যুদ্ধাত সৈকিংকুর্স যাচ্ছে ফিল্ড হাসপাতালে। সেখানে স্বামী-স্ত্রী মিলে
আপ্রাণ চিকিৎসা আর সেবা দিচ্ছেন ভালো করার চেষ্টা করছেন। নিজেদের চিকিৎসা ক্ষমতা
দিয়ে ভালো করা সংবর নয়, এমন রোগীদের তারা পাঠানোর ব্যবস্থা করছেন বাগড়োগড়াস্থ
মিত্রবাহীর সমর্পিত সামরিক হাসপাতালে।

শামসুদ্দিন প্রায় প্রায়ই চলে আসেন ফ্রন্ট লাইনে। তার সাথে থাকে ওশুধপত্রসহ মেডিকেল
এসিস্টেন্ট। ট্রেক্সে ট্রেক্সে গিয়ে তিনি খোঁজ নেন যোকাদের। ফার্স্ট এইড বক্স থেকে ওশুধ দেন
প্রয়োজনমতো। এরি মধ্যে তিনি সবারই প্রিয়পুত্র হয়ে উঠেছেন। তো, সেন্দিনই বিকেলে ডা.
শামসুদ্দিন ফ্রন্ট পরিদর্শনে এসে হাজির হন আমাদের ট্রেক্সে। তাকে এর আগে দু'একবার দূর
থেকে দেখেছি মাত্র। আলাপ-পরিচয়ের তেমন সুযোগ হয় নি। আজ সেটা হয়। একজন
উচ্চল প্রাণবন্ত যুবক। লম্বা ছিমছাম গড়ন। দাঢ়িগোফে ঢাকা মুখ। মুখ-চোখ দেখেই বোঝা
যায় অত্যন্ত মেধাবী আর সূজনশীল এই যুবক। চৌক্স তো বটেই।

তাকে কাছে পেয়ে ভালো লাগে খুব। ট্রেক্সে নেমেই তিনি বসে পড়েন আমাদের সঙ্গে
ভেতরে পাতা খড়ের বিছানায়। নায়েক ভালো হয়ে যাবে, তার পা কাটতে হবে না, এ তথ্যও
জানা যায় তার কাছ থেকে। ফ্রন্টের বর্তমান অবস্থান নিয়ে অল্পক্ষণের ভেতরেই তার সঙ্গে জমে
ওঠে নিরিডি আলাপ। সবকিছু শোনার পর তার ভেতরে লক্ষ্য করি কেমন একটা অস্থিরতা।

আক্ষেপের সুর ফুটে ওঠে তার গলায়, আপনারা সরাসরি যুক্ত করছেন, আমি সেটা পারছি না।
আমি তার কথার জবাব দিই সঙ্গে সঙ্গে, কিন্তু আপনিতো আমাদের সঙ্গেই আছেন।

সবারই তো আর যুক্ত করার কথা নয়। আপনারা না থাকলে আমাদের বাঁচিয়ে রাখবে কে?

— হ্যাং সেটাতো ঠিকই, তবুও একটা দৃঢ়ত্ব থেকে শেলো জানেন, যুক্তক্ষেত্রে থাকলাম
কিন্তু অস্ত্র হাতে নিয়ে যুক্ত করলাম না। ওদের একটাকেও খতম করলাম না।

একটা প্রবল ঘৃণা আর আক্রমণ বাবে পড়ে ডাক্তার শামসুন্দিনের কষ্ট থেকে। পাকবাহিনীর
প্রতি তাঁর ঘৃণার বহির্প্রকাশ দেখে মনে হয়, এটাই তো স্বাভাবিক। তাই হাসিমুথে তাঁকে বলি,
করছেন তো যুক্ত। আপনি আর আপনার মিসেস অনেকটা খালি হাতেই। দ্রুত থেকে আমরা
আহত অবস্থায় যাদের পাঠাইছি আপনাদের ওখানে তাদের বাঁচানোর জন্য আপনাদের দুঁজলকে
তো যুক্ত করতে হচ্ছে। আমাদের চাইতে আপনার অবদান কম নয় ডাক্তার।

তাঁর চোখের দৃষ্টি তখন উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। তিনি নিজের পকেট হাতড়ে কিছু ট্যাবলেট
বের করে তুলে দেন আমাদের হাতে। তারপর ওঠেন। উঠবার সময় বলেন, একবার
আসেন না আমার হাসপাতালে।

ডাক্তারের কথায় কৌতুক করে বলি, যুক্তাহত হয়ে? হেসে ফেলেন ডাক্তার! বলেন,
আরে দূর! আমি সে কথা বলেছি নাকি? বেড়াতে আসবেন।

ডি. শামসুন্দিন চলে যান। শীত বিকেলের পচিমে পড়া সূর্যের বিপরীতে তাঁর
ছায়াটি প্রলম্বিত হয়ে তাঁর সাথে সাথে হেঁটে যায়। সেবিহে তাকিয়ে মনে মনে বলি, ডাক্তার
শামসুন্দিন আপনি যেখানেই থাকুন না কেনো, আজকের এই ফ্রন্টের যোদ্ধারা কোনোদিন
ভুলবে না আপনাকে, আর আপনার স্ত্রীকে।

শুয়্যারলেসে ভেসে আসা নির্দেশ

হেলেরা গো ধরে বসে বলে, মাহুবুল রাইকে কমান্ডার না বানালে আমরা যাবো না। একটা
অবস্থিতির পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়ে রাস্তাড়ের সম্মুখবর্তী খোলা চতুরটিতে। ই.পি.আর. সদস্য
আর এফ.এফ. মিলে সশিলিত দল যাবে আজকের রাতের অপারেশনে। একজন বয়স্ক
জে.সি.ও.-কে দলের কমান্ডার নিযুক্ত করার কারণেই এই বিপত্তির সৃষ্টি। কিছুক্ষণ আগে
মাসুদের বাস্কারের সামনে বাঁশবাড়ের দুঃপ্রাপ্ত জুড়ে বসে থাকা যোদ্ধাদের একজন একটা
অঘটন ঘটিয়ে বসেছে। ই.পি.আর বাহিনীর সদস্য সে। তার দুঃহাঁটুর মাঝখানে নিজে চাইনিজ
রাইফেলখানা ধরা ছিলো। আনন্দনাভাবে ট্রিগারে হাত দিয়ে নাড়াড়া করতেই ফায়ার হয়ে
যায়। রাইফেলের ব্যারেলটা আকাশের দিকে মুখ করে থাকায় কোনোরকম অঘটন ঘটে নি।
না হলে ঘটে যাওয়াটা বিচির কিছু ছিলো না। সেও আজকের রাতের যুক্তিযানের একজন
অংশীদার। এমনিতেই অন্য দলের ভেতর থেকে আজকের কমান্ডার নির্বাচিত করায় হেলেদের
মনে ক্ষোভ সঞ্চারিত হয়েছে। তার ওপর তাদেরই একজন সদস্যের হাতের চাইনিজ রাইফেল
থেকে মিস ফায়ার হওয়ায় ঘটনায় হেলেরা ক্ষিণ হয়ে ওঠে এবং তার স্পষ্ট বহির্প্রকাশ ঘটিয়ে
গো ধরে বসে আজকের যুদ্ধের দলনেতা হিসেবে তাদের মাহবুব ভাইকে চাই।

আজকের তালিমা যুদ্ধে আমার নিজের যাবার কথা ছিলো না। আমার কোম্পানি থেকে শুধু
কয়েকজন ছেলে বাছাই করে পাঠানোর নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সে অনুযায়ী ২০ জন ছেলেকে
পাঠিয়ে দিয়ে ট্রেনের ভেতর প্রয়োচিলাম। দিনের বেলায় জিটারিং পার্টি নিয়ে অপারেশন করতে

নিয়ে শরীরের ওপর দিয়ে দারকণ ধকল গেছে। স্টেই এখন কিছুটা পুরিয়ে নেবার চেষ্টা। ফ্রন্টে
একেবারে নিশাড়। নিখুম। পাকবাহিনী তাদের অবস্থানে শক্তভাবে বসে আছে। দুর্ঘন্টের দূরত্ব
আধা মাইলের ওপর। এর ফলে সম্মুখ্যানে সুবিধে হচ্ছে না। হচ্ছে না অহঙ্করি।

দূর থেকে ঘর-ঘর আওয়াজ শোনা যায়। মনে হয়, একটা কিছুর প্রস্তুতি চলছে। পঞ্জগড়,
পাকবাহিনীর সর্বউত্তর দিকের একটা শক্তিশালী ঘাঁটি। এর চারদিকে বৃত্তাকারে পাকবাহিনী
তৈরি করেছে শক্তিশালী প্রথম ও দ্বিতীয় ডিফেন্স লাইন। তালমা ব্রিজ থেকে শুরু করে
পঞ্জগড় সি.ও. অফিস এবং উদিকে মীরগড় হয়ে আটোয়ারী-কর্হিয়া রাস্তার ওপর নিয়ে
পঞ্জগড় সুগার মিলের পেছন দিয়ে এসে শেষ হয়েছে সেই বৃন্ত। পিছিয়ে আসা সব সৈনিক
ই.পি. ক্যাপ রাজাকার, আলবদর ও আল শাম্স বাহিনীর সব সদস্যকে সমবেত করে ফার্স্ট
লাইন এবং সেকেন্ড লাইন ডিফেন্স তৈরি করেছে তারা। তাদের সেই ডিফেন্স লাইন ব্রেক ফ্র্যাং
বা ভাঙ্গার পরিকল্পনা করা হচ্ছে এখন। মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনীর কমান্ডাররা এ নিয়ে
মিটিং-এর পর মিটিং করছেন। পেছনে সরবরাহ আসছে। ভারি যান চলাচলের ঘর-ঘর শব্দ।
তাহলে কি? ট্যাঙ্ক আসছে? পঞ্জগড়ে পাকবাহিনী তাদের ডিফেন্স রক্ষা করার জন্য ট্যাঙ্ক
মোতামেন করেছে কি? এটা যদি সত্য হয়, তাহলে আমাদের সামনে অপেক্ষা করছে আরো
একটা চমকপ্রদ অভিজ্ঞতা: ট্যাঙ্ক যুদ্ধ! দেখা যাক শেষ পর্যন্ত কী হয়!

সন্ধ্যার কিছু পরেই ডাক আসে মাসুদের বাস্কার খেক্ক। এই ঘর্মে যে, ক্যাপ্টেন কথা
বলবেন সেটে। তড়িঘড়ি করে পিন্টুসহ ছুটে যাই। মাসুদ ওয়্যারলেনে কথা বলছিলেন।
আমরা পৌছুতেই তিনি ‘ওভার টু কমান্ডার মাহবুব স্যার’ বলে স্পিকারটি আমার হাতে
ধরিয়ে দেন। ক্যাপ্টেন শাহরিয়ারের গলা ভেসে পাসে, মাহবুব ক্যান ইউ হিয়ার মি? ওভার।

জবাব দিই, ইয়েস স্যার, লাউড অ্যারেলিয়ার। ওভার।

— টু নাইট ইউ আর গোয়িং টেক্সটেল বি.এস.এফ আপ টু তালমা। ইউ টেক থারটি
বয়েজ ফ্রম ইয়োর কোম্পানি। অভিজ্ঞ ফিফটিন ই.পি.আরস ফ্রম সুবেদার খালেক্স
কোম্পানি। আভারট্যান্ড? ওভার।

— ইয়েস স্যার। ওভার।

— ইউ উইল কমান্ড আওয়ার ট্রুপস্। ইউ উইল রিপোর্ট টু মেজর শর্মা অব বি.এস.এফ
সাম হয়ার বিহাইভ ইয়োর পজিশন। মাসুদ উইল গিভ ইউ এ ম্যাসেজ। ইট ইজ টপ
সিক্রেট। ইউ হ্যান্ড ওভার দ্য ম্যাসেজ টু মেজর শর্মা ইন মাই নেম। ও.কে? ওভার।

— ও.কে স্যার ওভার। হোয়াট উড বি আওয়ার টাস্ক দেয়ার? ওভার।

— ইউ জান্ট রিপোর্ট হিম। হ্যান্ড কনসালটেশন। গাইড দেম আপ টু তালমা ব্রিজ।
অ্যানগেজ ইয়োর সেলফ ইন ফাইটিং উইথ দেম ফর ক্যাপচারিং এনিমি ডিফেন্স তালমা।
ইটেন্স তেরি ভাইটাল এনগেজমেন্ট উইথ এনিমি দেয়ার। সো ডু অভরিথিং কেয়ারফুলি।
আভারট্যান্ড? ওভার।

— ইয়েস স্যার। আভারট্যান্ড। ওভার।

— টেক অল সর্টস্ অব আর্মস, সাফিসিয়েন্ট অ্যামুনেশন্স। রিপোর্ট টু মেজর উইদইন
নাইন শার্প। আই হ্যান্ড এভরি কনফিডেন্স অন ইউ। লেট মি হোপ ইয়োর সেইফ রিটার্ন।
খোদা হাফেজ। গুড লাক এভ্রিবডি। জয় বাংলা। ওভার।

— ও.কে স্যার। গুড লাক। জয় বাংলা। ওভার।

ওয়্যারলেস সেট নীরব হয়ে যায়। মাসুদের দিকে তাকাই আমি। তার মুখে মৃদু হাসি।
বলেন তিনি, তন্মেন তো সব। তৈরি হয়ে আসেন তাহলে। ছেলেরা আপনাকে ছাড়া যাবে
না। ব্যাপারটা আমিই জানিয়েছিলাম ক্যাটেনকে। তিনি আপনাকেই কমান্ডারের দায়িত্ব
দিতে বলছিলেন। এ জন্য কথা বললেন নিজেই।

তালমা দখলের ফুরু আজ রাতে। দায়িত্বটা অনেক বড়ো। বাক্সারের বাইরে আসতেই হৈচে
করে ওঠে ছেলের। তাদের দাবি পূরণ হয়েছে বলে তারা খুব খুশি। অনেক কাজ সারতে হবে।
হাতে সময় কম। সবাইকে নিয়ে ফিরে আসি ট্রেক্স লাইনে। শুরু হয়ে যায় যুদ্ধবাটার প্রস্তুতি।

তালমা পাড়ে বৌধ অভিযান

রাত সাড়ে আটটার দিকে লেফটেন্যান্ট মাসুদের কাছে রিপোর্ট করা গেলো। তিনি
ই.পি.আর সদস্যদের সাথে আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন। সবাই দাঁড়িয়েছে ফল-ইন-এ।
এক পাশে ই.পি.আর অন্য পাশে এফ.এফ। আকাশে ফুটফুটে জ্যোৎস্না। কিন্তু ঘন
বাঁশবাড়ে ছাওয়া এ জায়গাটিতে আলো-আঁধারির খেলা। দু'তিনটি হারিকেন ঝুলছে
চিমটিমিয়ে। ফল-ইন-এ দাঁড়ানো যোদ্ধাদের উদ্দেশে মাসুদ সংক্ষিপ্ত ত্রিফিং দেন। এরপর
আমার হাতে ধরিয়ে দেন সেই গোপন বার্তাটি একটা মুখ বক্ষ করা খামে, যেটা পৌছে দিতে
হবে বি.এস.এফ কমান্ডার মেজর শৰ্মাকে। ফল-ইন-এ দাঁড়ানো সব যোদ্ধাকে আমি পরীক্ষা
করে নিই শেষবারের মতো। তারপর নির্দেশ দিই সিঙ্গল সাইনে মুভ করার জন্য। মাসুদের
কাছ থেকে বিদায় নিই খোদা হাফেজ, জয় বাংলা বাল্মী

ক্যাটেন বলেছিলেন আমাদের পেছনে কেন্দ্রিক বি.এস.এফ.দের পাওয়া যাবে। একজন
হ্রান্তীয় গাইড আমাদের দেখিয়ে নিয়ে যাবে(ক)। কখনো কাঁচা রাস্তার ওপর দিয়ে, কখনো
ফসলের মাঠ, কখনো আলপথ ধরে। কখনো সোজা, কখনো ঘূরপথে। গ্রামের অলিগলি আর
কারো বাড়ির ভেতর দিয়ে হাঁটিয়ে বিস্তৃত যাজ্ঞে সে আমাদের দলটিকে বিরতিহীনভাবে।

কনকনে ঠাণ্ডা রাত। এফ.এফ.ছেলেদের প্রত্যেকের গায়ে একটা করে মাত্র সোয়েটার।
ই.পি.আরদের পরনে মোটামুটি তাদের নিজস্ব বুট, ইউনিফর্ম, মোটা সোয়েটার আর
হেলমেট ইত্যাদি। এফ.এফদের এসব নেই। আমার নিজেরই গায়ে মাত্র একটা ফুলহাতা
সোয়েটার, পরনে জীর্ণশীর্ণ একটা প্যান্ট। পায়ে লাল রঙের ক্যাথিসের জুতো। অন্যদের
অবস্থা প্রায় একই রকম। মাত্র দু'তিনজনের পরনে ফুল প্যান্ট। পিন্টুসহ আর সবার পরনে
লুঙ্গি, শার্ট আর ফুলহাতা সোয়েটার। পায়ে একই ধরনের জুতো। প্রত্যেকের কাঁধে
খোলানো হাতিয়ার। সবগুলো চেবার ভর্তি। এছাড়াও রয়েছে শুলির বিস্তি, কোমরের সাথে
শক্ত করে বাঁধা। হ্যান্ড গ্রেনেডও রয়েছে প্রত্যেকের কাছে ২/৩টি করে। সেগুলোও গামছায়
পেঁচিয়ে একইভাবে কোমরের সাথে বাঁধা। নীরবে হাঁটছে সবাই। হাঁটার একটা ছন্দোময়
শব্দ উঠছে থপ থপ ছপ ছপ। এমনিতে শীতের রাত তার ওপর যুদ্ধের ফ্রন্ট। গ্রামের
বসতিগুলো কেমন নিয়ুম হয়ে গেছে।

হিমালয় থেকে নেমে আসা প্রচণ্ড শীত শরীরের মাংস ভেদ করে হাড়ে পর্যন্ত হানা দিতে
চায়। কুয়াশার চাদর আকাশের চাঁদের আলোকে ঝান করে দিয়ে একটা আলো-আঁধারি
পরিবেশের সৃষ্টি করেছে। সামনে গাইড। তার পেছনে আমি, পাশে পিন্টু। নায়ের সুবেদার
সফি আমাদের পেছনে। পুরো দল কখনো এক সারিতে, কখনো দু'সারিতে হাঁটছে। এখন

আর ই.পি.আর এবং এফ.এফ.-এ কোনো পার্থক্য নেই। সবার লক্ষ্য আর উদ্দেশ্য এক ও অভিন্ন। এখন একমাত্র কমান্ডারের কথাই সবার জন্য শিরোধৰ্ম। আমি তাদের কমান্ডার। তারা দ্রুত অনুসরণ করছে আমাকে।

আজকে আমার সঙ্গে এফ.এফ হিসেবে যারা এসেছে, তারা সবাই বাছাই করা পরীক্ষিত ছেলে। যুদ্ধের প্রথম দিকে তাদের ভেতরে তারক্কণ্ডীগু উচ্ছলতা ছিলো, আজ আর তা নেই। তারা যুদ্ধ দেখেছে, এখনো দেখছে। যুদ্ধ করেছে, এখনো করছে— যুদ্ধের সেই ডয়াবহতা আর নৃশংসতা তাদের সবারই বয়স বাড়িয়ে দিয়েছে। তারা হয়ে উঠেছে অভিজ্ঞ, কঠোর আর ঝুক্ষ স্বভাবী। পিটুসহ রয়েছে মুসা, একরামুল, বকর, মতিয়ার, বাবলু, হাবিব, জয়নাল, শফুর, মধু, মোতালেব, মালেক আর মুসুহ উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতো সব ছেলে। আর আছে মুনা। আমি পাছে নিষেধ করি, এজন্য পিটু ও বাবলু এদের ম্যানেজ করে দলের শেষে দাঁড়িয়েছিলো, যাতে আমার নজরে সে না পড়ে। ফাঁকি দেবার চেষ্টা করলেও নজরে ঠিকই পড়েছিলো সে। কিন্তু বাধা দিই নি। এখন সে একজন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত রীতিমতো স্বীকৃত যোদ্ধা। যুদ্ধের মাঠে একজন ঝৃতচূর্ণ যোদ্ধাকে বাধা দিয়ে লাভ নেই। যুদ্ধের জন্য উন্মুখ যোদ্ধা কোনো না কোনোভাবে নিজেকে যুদ্ধের দিকে এগিয়ে নেবেই। মুনারও সেই একই হাল। তবে তাকে আসবার সময় বলেছি, যুদ্ধ বাধার মুহূর্তে সে যেনো আমার কাছাড়া না হয়। সে হাঁটছে পেছনে বাবলুদের সাথে।

মেজর শর্মা আপেক্ষা করছিলেন। আমরা পৌছুতেও তিনি তার মাটির নিচকার কমান্ড পোস্ট থেকে বের হয়ে এলেন। তাকে পরিচয় দিলাম স্যার্জেন্ট ছাকে, দিস ইং মি, কমান্ডার মাহবুব, স্যার। মুখে তার আপনজনের মতো প্রসন্ন হাসি প্রলেন, ওয়েলকাম বয়েজ। এনি ম্যাসেজ? — ইয়েস স্যার বলে গোপন বার্তাটি করে করে তাঁর হাতে দিই।

টর্চ জ্বালিয়ে তিনি পড়েন বার্তাটি। কর্তৃপক্ষ বলেন, হাউ মেনি চ্যাপস্ ইউ হ্যাত?

সংখ্যাটি বলি। তিনি তখন জানিয়ে চান, তুম মুখকো লেকে তালমা তক যা সাকো গো? ইউ ইট পসিবল টু গো আপটু জাজমা?

মাথা নাড়িয়ে বলি, ইয়েস ইট জি পসিবল। মেজর তখন কী যেনো ভাবেন চুপচাপ। তারপর বলেন, দেন লেট মি রেডি উইথ মাই ট্রুপস্।

মিত্র বাহিনীর ডিফেন্স লাইন

আমরা তখন ভিজে ঘাসের ওপর বসে পড়ি। বেশ সময় নিয়ে তৈরি হতে থাকেন তারা। মেজর তার দুই সহযোগী অফিসারকে ডেকে পাঠান। তাদের একজন ক্যাপ্টেন, অন্যজন লেফটেন্যান্ট। আমাদেরকেও ডাকেন তিনি। পিটুসহ আমি তার ডাগ আউটে চুকি। আজ রাতের যুদ্ধযাত্রার পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা বৈঠক বসে। মাটির তলায় স্থল পরিসর জায়গা নিয়ে বাস্কারে একটা টিমাটিমে হারিকেনের অনুজ্জ্বল আলোতে আমাদের ৫ জনের আলোচনা বৈঠক শেষ হয় চূড়ান্ত পরিকল্পনা গ্রহণ করার ভেতর দিয়ে। গ্রহণ করা এই পরিকল্পনায় থাকে তালমা নদীর দু'পার দিয়ে আমাদের এগিয়ে যাওয়া, যতোন্তর সম্ভব পাকবাহিনীর অবস্থানের কাছাকাছি পৌছানো। সব ধরনের হাতিয়ারে সজ্জিত থাকবে বি.এস.এফ. ট্রুপস্। আর থাকবে আর্টিলারি সাপোর্ট। প্রথমে প্রচুর আর্টিলারি শেল বর্ষণের মধ্যেমে পাকবাহিনীর পজিশন তচ্ছচ করে দেয়া হবে। রাত বারোটা পর্যন্ত চলবে এ কাজ। এরপর তত্ত্ব হবে শুরু ওপর স্থল

আক্রমণ। সব ধরনের হাতিয়ারের সাহায্যে শক্তির ওপর চলবে এই প্রচণ্ড আক্রমণধারা। রাত দুটো হচ্ছে ডি-টাইম। সে সময় তালমার উভয় পাশ দিয়ে গিয়ে গিয়ে তাদের পজিশনের ওপর চার্জ করা হবে। দখল করে নেয়া হবে তাদের দীর্ঘদিন থেকে ধরে রাখা শক্তি ডিফেন্স লাইন। রাত দশটার সময় স্ক্রু হবে যাত্রা। এগারোটার ভেতরে শিয়ে পৌছুত হবে আমাদের অভীষ্ট লক্ষ্যবস্তুর কাছাকাছি অর্থাৎ শক্তিবাহিনী অবস্থানের ২/৩' গজের মধ্যে। আলোচনা শেষ হলে মেজর শর্মা জিগ্যেস করেন, তুম সাকোগে না কমান্ডার মেহরব!

— ইয়েস স্যার। কিছু না ভেবেই তাৎক্ষণিক জবাব দিই। তিনি এবার জানতে চান, ইয়ে এরিয়াকে তুম জান্তা হ্যায় না? পিন্টু ফস করে মুখ ঝুলে বলে বসে, ইয়েস স্যার, জান্তা হ্যায়। হামলোগতো ইয়ে এরিয়ামে লাস্ট সিক্স মান্থসে গেরিলা যুদ্ধ কিয়া, ইয়ে জায়গা সব মুৰুৰ হো গিয়া। সব এরিয়া জান্তা হ্যায়, চিন্তা হ্যায় স্যার।

পিন্টুর জবাবে মেজর খুশি হন বলে মনে হয়। তিনি বলেন, ও.কে। দেন টেক টি।

মেজর শর্মারা তৈরি হতে থাকেন। আমরা সেই ফাঁকে মাটির তলা থেকে বাইরে এসে বসি খোলা মাঠে। আমাদের অপেক্ষমান প্রত্যেক যোদ্ধার হাতে ধূমায়িত গরম চায়ের মগ ধরিয়ে দেয়া হয়। শীতের রাতে মিরবাহিনীর গরম চা সহযোগে এই অভিথেয়তা ভালোই লাগে। কিন্তু মনের ভেতরে একটা অস্তিত্ব কাঁটা খচ্ছ করতে থাকে। সত্যি বলতে কি, এ জায়গাটা আমাদের পরিচিত নয়। এদিকটায় আসা হয় নি কখনো স্মামনে কোথাও তালমা নদী। কতোদূর তাও জানি না। নদী পর্যন্ত যেতে পারলে নদীর প্রসারে কাছাকাছি কোথাও ভেতরগড়-তালমা জেলা বোর্ডের কাঁচা রাস্তাটি পাবার কথা। সেইস্তু ধরে বহুবার আমরা ভেতরগড় ও নালাগঞ্জ থেকে তালমার দিকে এসেছি। কিন্তু জুন্ডপুরও যদি কুট্টা হারিয়ে ফেলিঃ যদি নদী পার হয়ে পরিচিত সেই রাস্তাটি চিনতে না পারিঃ তাহলেই তো হবে মহাবিপদ! মনের ভেতর এ চিন্তাই পাক খেতে থাকে। পিন্টুর এদিকে ক্ষেপণ্য খেয়াল নেই। পরমহংসের মতো শীতের মধ্যে চা খেয়ে চলে আর বলে, জবর শীতে সড়ছে আইজ মাহবুব তাই! এমার চা খায়া শীরীর গরম করা গেলো। পিন্টুর কথার জবর আ দিয়ে নিজের ভাবনার মধ্যে ভুবে থেকে মনে মনে কেবল বলি, না রাস্তাটা পাবোই। নদীটা পার হতে পারলে রাস্তা পাওয়া যাবেই।

বি.এস.এফ তৈরি হয়েছে দু'প্লাটুন। এক প্লাটুন নেতৃত্ব দেবেন তাদের ক্যাটেন। অন্যটির মেজর নিজে। মেজর শর্মা নদী পার হবেন। ক্যাটেন এগুবেন এ ধার দিয়ে। দুটো পার্টি যখন লক্ষ্যবস্তুর কাছাকাছি পৌছুবে, তখন সিগানাল দেয়া হবে রাইফেলের দু' রাউণ্ড ফাঁকা ফায়ারের মাধ্যমে। একদলের সিগানাল পেয়ে অন্য দলও সেভাবেই জবাব দিবে। এরপর ওয়্যারলেস সেটে জানিয়ে দেয়া হবে আর্টিলারি আর মার্টর ফায়ার ওপেন করার জন্য।

মেজর বলেন, মেহরুব তুম মেরা সাথ যাওগে। ইউ উইল গাইড আ্যান্ড আ্যাকোম্প্যানি মি, ও.কে।

— ও.কে. স্যার বলে তার কথায় সায় দিই। তখনো অনিচ্ছ্যতা আর অস্থিরতা কাজ করছে মনের মধ্যে। মেজর শর্মা নিচ্ছ্যতা চাইছেন তার নিজের জন্য, তার পুরো দলটির জন্য। বিরাট এক দায়িত্ব এটা। মন তখনো বলছে, নদী পার হলে রাস্তা পাবোই এবং নিয়ে যেতে পারবো মেজরকে টার্গেটের কাছাকাছি।

ঘাসে ছাওয়া একটা উচুনিচু বিরান মাঠ। ওখানেই অল রাউণ্ড ডিফেন্স নিয়েছে বি.এস.এফ-এর অঞ্চলগামী ইউনিটটা। ওই মাঠেরই খোলা জায়গায় সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ায়

তাদের প্লাটুন দুটো। তবে আমাদের দলটাকে দু'ভাগে ভাগ করতে হয়। একবারামূল আর নায়ের সুবিদার শফিসহ ২০ জন মুক্তিযোদ্ধা থাকে ক্যাপ্টেনের প্লাটুনটাকে গাইড করে নিয়ে যাবার জন্য। পিন্টু আর মুসাসহ বাকি ছেলেরা আমার সাথে। আমরা যাবো মেজরের প্লাটুন নিয়ে। সিঙ্কান্ত হয়, আমরা শুধু লক্ষ্যবস্তুর কাছাকাছি নিয়ে যাবো তাদের। মূল যুদ্ধটা করবেন তারা তাদের সেনা সদস্যদের নিয়ে। আমরা আলাদাভাবে নিজেদের দল নিয়ে থাকবো এবং করবো নিজেদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা।

নিম্নুম ঘাঠ। হিমবরা শীতের রাত। আকাশে জ্যোৎস্নার নরম আলো। এ রকম পরিবেশেই এক সময় মেজর শর্মা ফল-ইন-এ দাঁড়িয়ে থাকা যোদ্ধাদের লক্ষ্য করে সংক্ষিণ ত্রিফিং দেন। ত্রিফিং শেষে নির্দেশ দেন মুভ করার জন্য। তালমা যুদ্ধের জন্য তৈরি দুটো দল দু'দিক থেকে তাদের গন্তব্যস্থলের দিকে রওনা দেয় রাত ঠিক দশটায়। ক্যাপ্টেনের দলটি যায় পুরবদিকে, আমরা উত্তরে।

ঝাঁকড়া মাখার ছাতিয়ান গাছ

মাইলখানেকের মতো পথ হেঁটে এসেছি। কিন্তু তালমা নদীর দেখা নেই। কোথায় গেলো সেই পরিচিত নদী, যার আশপাশে আমরা গত ক'টি মাস কাটিয়েছি হাইড আউটের পর হাইড আউট পরিবর্তন করে করে? এই নদীরই ওপরকান্ত তলমারা ব্রিজ উঠিয়ে দিয়েছি। তালমা ব্রিজ পর্যন্ত এসেছি বিভিন্ন অপারেশনে। তাই ভজীয় সেঙ্গ বলছে, সোজাসুজি এভাবে এগুলে নদীর একটা ঝাঁকড়া মাখার ছাতিয়ান গাছ। গাছটা ছাড়িয়ে ঝাঁকড়ানি এগিয়ে গেলেই ভেতরগড়-তালমার প্রশংসন কাঁচা রাস্তা। যুদ্ধের প্রথম দিকে যান্ত্রিক আর গোলাম গুস্কে নিয়ে আমি তালমা ব্রিজ রেকি মিশনে গিয়েছিলাম এ ঝাঁকড়ায়েই। সে রাতে গাইড ছিলো মকতু মিয়া। তালমা পারের সমস্ত এলাকা ছিলো যান্ত্রিক মনদণ্ডে। বুকে ছিলো তার অমিত সাহস। রাতের অন্ধকারে তার দৃষ্টি ছিলো শান্তিকৃত মতো প্রখর।

কিন্তু সেই মকতু মিয়াও সে রাতে পথ হারিয়ে ফেলেছিলো। আমরা বসেছিলাম সেই বিরাট ঝাঁকড়া মাখার ছাতিয়ান গাছের তলায় ভুত্তড়ে অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে। মকতু মিয়া বিড়বিড় করে কীসব দোয়া-দুর্দল উচ্চারণ করছিলো আর বলছিলো, পথ হারাই ফালাইছি, ভুলা লাগছে... ঠিক এ ধরনেরই কিছু কথা। তারপর এদিকওদিক ছুটোছুটি করে এক সময় হে-হে করে হাসতে হাসতে বলেছিলো, পাইছি, এইতো কাছেই রাস্তা, লন ওঠেন। অন্ধকারে তার ধৰ্বধৰে সাদা দাঁতগুলো চকচক করে উঠেছিলো সেই তখন। সেদিনকার ঘটনাটা মনে হতেই আকেপে ভরে যায় মন, মকতু মিয়া যদি থাকতো আজ সাথে, তাহলে কতো ভালো হতো। ওর ওপর নির্ভর করে হাঁটা যেতো নিশ্চিন্ত মনে। আসলে তালমা নদীর এপারের এই এলাকাগুলোয় আমাদের কখনোই আসা হয় নি। আসি নি কেনো, সেই আফসোসে মন ভরে ওঠে আজ, এখন, এই মুহূর্তে।

মনের সময় একগুরুত্ব দিয়ে কিছু চাইলে নাকি সেটা পাওয়া যায়। আমিও পেলাম। হঠাৎ করেই দিব্য দেখলাম তালমা নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে আছি। ঝাঁকড়া নদীর পাড় এধারে, ওধারে বালির চরা ভূমি। চিক্কিটি করছে চাঁদের আলোয়। আন্তর্য! অবাক হয়ে যাই নিজেই। ছাতিয়ান গাছটি দেখতে পাচ্ছি। ঠিক তেমনি ঝাঁকড়া মাখাটি নিয়ে যেনো আমাদের অভ্যর্থনা

জ্ঞানাতে আর দিক নির্দেশ দেয়ার জন্য ঠায় দাঢ়িয়ে আছে। না, কুট ভুল হয় নি। মনের উদ্বিগ্ন ভাবখনা কেটে যায়। মেজের শর্মা সর্বক্ষণ আমার পাশাপাশি হাঁটছিলেন। খুবই উদ্বেগ আর অস্বত্তি ভরা কষ্টে বারবার বলছিলেন, মেহরুব তৃতীয় সাকোগে তো? হামলোগ রাইট ডিরেকশন যে চলতা হ্যায় কি নেই? কুট তো ভুল নেই হ্যাঃ!

এতোক্ষণ তার কথার জবাব দিতে পারি নি তালোভাবে সঠিক লক্ষ্য ঝুঁজে না পাবার জন্য। নিজের অনিচ্ছ্যতার কারণে। নদীর পাড়ে এসে ওপারের ঘোকড়া ছাতিয়ান গাছটি দেখতে পেয়ে মনের সব অনিচ্ছ্যতা কেটে যায়। না, পথ ভুল হয় নি। দিক ভুল হয় নি। একেবারে আন্দাজের ওপর ভর করে পুরো দলটিকে নিয়ে আসতে পেরেছি সঠিক জায়গায়। তাই ভারযুক্ত গলায় আমি মেজরের কথার জবাব দিতে পারি। বলি, মো স্যার, হামলোগ কুট ভুল নেই কিয়া। উই আর ইন রাইট ডিরেকশন।

দেশ আমাদের, যুক্তিও

নদীতে নামতে বলি সবাইকে। কিন্তু নামে না কেউ। নামবে কি না এমন একটা ইতস্তত তাব সবার মধ্যে। অথচ সময় গড়িয়ে চলেছে। প্রথম কলাম এরি মধ্যে সংজ্ঞবত এগিয়ে গেছে অনেকদূর। তাদের নদী পার হতে হবে না। পথে কোনো প্রাকৃতিক বাধাও নেই। তারা দ্রুত এগিয়ে যাবে লক্ষ্যস্থলের দিকে। তাই কিন্তু প্রতিক্রিয়া মেশানো গলায় মেজরকে, বলি, প্রিজ অর্ডার ইউর ট্রুপস্‌ টু কাম ডাউন। উই মার্ট প্রেস দ্য রিভার। তবু তাঁর ইতস্তত-কাটে না। শেষে বলেন তিনি, পহলে তৃতীয়।

যে বিষয়টা এর আগে বহুবার মনে হয়েছে সেটা আবার মনে মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। সেটা হচ্ছে, দেশ আমাদের। যুক্তিও আমাদের। দেশ স্বাধীন হলে, সেটা হবে আমাদের। সুতরাং নদীতে প্রথম নামতে হলে তে নামতে হবে আমাদেরই।

— ঠিক হ্যায়, বলি আমি হেলিপুরের নদীতে আমার নির্দেশ দিই। আমই প্রথমে নামি। অনেকটা খাড়া পাড় বেয়ে হেঁচে জামার মতো করে নেমে পড়ি সরাসরি একেবারে পানিতে। সাথে সাথে পিন্টুও নামে একইভাবে। পালাজ্বমে অন্যরাও নামতে থাকে আমাদের দেখাদেখি।

ধারণা ছিলো পানি কম হবে। কিন্তু নদীতে নেমেই সে ধারণা পাল্টে যায়। প্রথমেই কোমর সমান পানি। আর একটু এগভেই বুক পর্যন্ত ভিজে যায়। নদীর পানি একেবারে ঠাণ্ডা হিম শীতল নয়। তবুও মনে হয়, ঠাণ্ডায় শরীরের জ্বে যাবে। হাতিয়ারগুলো হাতের ওপর নিয়ে কোমর-বুক, কখনো হাঁটু সমান পানি ভেঙে ভেঙে খুব দ্রুত ওপারে পৌছেই বালুর ঢাড়ায় পজিশন নিয়ে নিই। ভেজা শরীরের সাথে বালু আর কাদা লেপটালেপটি হয়ে যায়।

তালমা শক্ত ঘাঁটি থেকে শুলি আসছে তখন অবিরাম। পাকসেনারা এভাবে কেনো যে শুলি ছাড়ে চলেছে, বোৰা যায় না। তাই বালুর ঢাড়ায় এসে আমরা তাদের শুলির মুখে পড়ে যাই। তবে, তাদের শুলি যায় অনেক ওপর দিয়ে। বাতাসে সেই পরিচিত শিস বাজিয়ে। বোৰা যায়, শক্ত অনেক দূরে আছে। অসুবিধে নেই কোনো। আমরা তাদের শুলির আওতার ভেতরে নেই।

পেছন থেকে পানি ভাজার শব্দ আসে। মেজর এগিয়ে আসছেন। সঙ্গে তাঁর ট্রুপস্ব। এলেন মেজর। এসেই আমার পাশে শুয়ে পড়লেন বালুর ওপর। মোটা দানার বালু। খসখস করে শরীরের সাথে লেগে। মেজর ফিসফিসিয়ে বলেন, ইধার কোই খাত্রা নেইত তো কমান্ডার! জবাব দিই, নেই।

- হামলোগ যা সাকেগে না?
- জি হ্যাঁ।
- এনিমিকো কোই আমবুশ তো নেহি হ্যায়?
- কোন্ জানে? তাৰ মালুম হোতা হ্যায় নেহি হ্যায়।
- ইয়ে এরিয়া তুম পাছানতা হ্যায় না?
- জি হ্যাঁ।

মেজৱেৰ কেমন একটা সাৰধান-সতক মনোভাব। আৱ সেই মনোভাব থেকে একেৱ
পৰ এক এ ধৰনেৰ প্ৰশ্ন কৱেই চলেন। আমৱা শক্ত এলাকায় এসে গৈছি। পেছনে নদী।
সহজে পিছোবাৰ উপায় নেই। মিত্ৰবাহিনীৰ সদস্য হিসেবে মেজৱ ভিন্নদেশে এসেছেন
আমাদেৱ সাহায্য কৱতে। যুদ্ধটা তাদেৱ নিজেৰ দেশেৰ জন্য নয়। তাৰ মনে তাই এ
অবস্থায় নানা ধৰনেৰ প্ৰশ্নেৰ উকিবুকি দেখা দেয়াৰ ব্যাপারটা স্বাভাৱিক।

সব ট্ৰুপস্ এক সময় নদী পাৱ হয়ে আসে। আৱ এসেই কালবিলুষ্ঠ না কৱে বালুৰ ওপৰ
ওয়ে অবস্থান নিয়ে নেয়। একেবাৰে যুদ্ধ বাধাৰ প্ৰস্তুতি তাদেৱ। মেজৱকে অপেক্ষা কৱতে
বলে পিন্টু আৱ মতিয়াৱসহ এগিয়ে যাই। কিন্তু মনেৰ ভেতৱ তথনো সেই দৃষ্টিভাটা থেকে
থেকে বলকে ওঠে, ভেতৱগড়েৰ রাস্তাটা সে জায়গায় আছে তো! রাস্তাটা চিনবাৰ জন্য
মতিয়াৱেৰ সাহায্য প্ৰয়োজন হতে পাৱে। যুদ্ধ শুৰু হবাৰ প্ৰস্তুতি দিকে এ জায়গায় এসে পথ
ভুল কৱা এবং সেই ঘনকালো রাতে মকতু মিয়াৰ পথ প্ৰস্তুতি বেৱে কৱাৰ অভিযানে মতিয়াৱও
ছিলো আমাৱ বিষ্ণুত সঙ্গী। ওকে তাই ফিসফিসিয়ে বলিবলি কৱে মতিয়াৱ, রাস্তাটা পাৰো তো?

— পামো গো, মতিয়াৱেৰ গলায় আৰুবিষ্ণুত দৃঢ় সুৰ। সেই রাস্তাটা পেতেই হবে
আমাদেৱ। বিৱাট একটা বাহিনী পুৱোপুৱি অন্ধকৃত রয়েছে আমাদেৱ মুখেৰ দিকে।

হ্যাঁ, রাস্তাটা আছে। আগেৰ মতোই ফিৰে এসে মেজৱকে বলি, ঝুঁট মিল গিয়া স্যার।
আভি হায় সব অ্যাডভাঞ্চ কৱ সাৰুজ হ্যায়। উই ক্যান মুণ্ড নাউ।

মেজৱ অপেক্ষা কৱেন আৰু কচুক্ষণ। নিজেৰ অধৃতন কমান্ডাৰদেৱ সঙ্গে আলাদাভাবে
কথা বলেন। তাৰপৰ ফিৰে আসেন আবাৰ আগেৰ জায়গায়। এবাৰ তিনি বলেন, তুম সাৰ
লোগ আগে যাওগে। মাই ইউনিট উইল ফলো ইউ। কথা না বাড়িয়ে সম্মতি জানাই, ঠিক
আছে। তাৰপৰ বলি তাকে, ওকে স্যার, দেন লেটস্ স্টার্ট। মালেক আৱ শক্তুকে আগে দিই।
ওৱা রেকি কৱে কৱে এগুবে আগুপিছু কৱে। সামনেৰ পথ পৰিকাৰ থাকলে ওৱা ইশাৱায়
আমাদেৱ জানাবে। পেছন থেকে এগুবে আমৱা। আমাদেৱ পেছনে পেছনে আসবে মেজৱ
শৰ্মাৰ বাহিনী।

এভাৱে শয়ে-বসে থেমে থেমে এগুতে এগুতে আমৱা সেই বিশ্বাসঘাতক সাইকেল
মেকাৱেৰ বাড়ি পৰ্যন্ত পৌছে যাই বিনা বাধায়। কিন্তু একি! বাড়িটাৰ কোনো চিহ্নই নেই। শুধু
রয়েছে তাৰ ঘৰেৰ উচু ভিত্তিগুলো। ক'মস আগে তালমা অপাৱেশনেৰ দিন পিন্টু-দুৰূৱা
সাইকেল মেকাৱকে ধৰে ফেলেছিলো। নদীৰ ধাৰ পৰ্যন্ত সে ছিল পিন্টুদেৱ হাতে বন্দি। কিন্তু
তালমা ব্ৰিজে শক্তুক সাথে গোলাগুলি চালানোৰ ব্যৱস্থাৰ ফাঁকে মেকাৱ নদীতে বালিয়ে পড়ে
তাৰ প্ৰাণ বাঁচিয়েছিলো কোনো রকমে। এৱপৰ তাৰ পক্ষে এ এলাকায় থাকবাৰ আৱ সাহসে
কুলোয় নি। বাড়িৰ উঠিয়ে নিয়েই সে পালিয়ে গৈছে এখান থেকে। রয়ে গৈছে কেবল তাৰ
শূন্য ভিটে। মনে পড়ে, এখানে, এ বাড়িতেই জুলাইয়েৰ প্ৰথম দিকে আমৱা রাতেৰ জন্য

আশ্রয় চেয়েছিলাম। আশ্রয় দেবার আশ্বাস দিয়ে মেকার ডেকে এনেছিলো ত্রিজ রক্ষাকারী পাকবাহিনীকে। আমাদের ধরিয়ে দিতে চেয়েছিলো সে সেই রাতে শক্র হাতে। অন্তের জন্য আমরা তিনজন— আমি, মতিয়ার, গোলাম গডস আর গাইড মকতু মিয়া পাণে বেঁচে গিয়েছিলাম সে যাত্রা। আজ সেই বাড়িটার চিহ্ন পর্যন্ত নেই। সাইকেল মেকার সপরিবারে ভেগেছে কোথায়। গোলাম গডসও নেই। সেও মারা গেছে টোকাপাড়ার যুক্তে। মতিয়ার রয়েছে আজ আমার সাথে। ক'মাস পর আমরা আবার এসেছি এখানে, সেই বাঁশবাড়ে যেরা নিচিহ্ন উঁচু ঢিবির আড়ালে পজিশন নিয়েছি সবাই।

পেছনে একটা ভূটা খেত। দলের সবাইকে পজিশনে রেখে পিন্টুসহ ভূটা খেতের ভেতর দিয়ে পেছনে মেজর শর্মার অবস্থানে চলে যাই তার সঙ্গে কথা বলার জন্য। মেজর ফিসফিসিয়ে জিগ্যেস করেন, হামলোগ আ গ্যায়া মেহবুব!

— ইয়েস স্যার। আপলোক পাক আর্মিকা ডিফেন্স দেখেছে?

— দেখা যায়গা?

— ইয়েস স্যার। চালিয়ে।

তিনি তখন তার ওয়্যারলেস সেটে ক্যাপ্টেন পরিচালিত অন্য দলটির সাথে কন্ট্রাক্ট স্থাপন করতে বলে এন্ডুনের জন্য প্রস্তুত হন একটা ছোটোখাটো দল নিয়ে। মুখে বলেন, ইয়েস কমান্ডার, চালিয়ে।

আরে ইয়ে তুমনে কেয়া কিয়া

আমরা এগুলে থাকি। জাত সৈনিক মেজর শর্মা^১রে গেছেন এ এলাকাটা শক্রমুক্ত। সে জন্য অনেকটা নিরুদ্ধিগ্রস্ত তিনি এখন। কিন্তু তার ভাবটা থাকে না বেশিক্ষণ। তাকে নিয়ে সাইকেল মেকারের শূন্য ভিটি সংলগ্ন বাঁশবাড়ের তলায় যে রাস্তা, সেখানে আমরা আসি আমাদের পজিশনে। মেজর জিপ্রেস করেন, ইহা হে কেতনা দূর হ্যায় এনিমিকা পজিশন?

ঠাঁদের আলোয় সামনের তালমা ত্রিজ অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছিলো। আমি হাত তুলে ইশারায় সামনে পুব-দক্ষিণ দিকে ত্রিজটির অবস্থান দেখিয়ে তাকে বলি, সামনে দেখিয়ে স্যার। উহু যো ত্রিজ দেখতা হ্যায় আপ, ওহি হ্যায় তালমা ত্রিজ। এনিমিকা ডিফেন্স হ্যায় ত্রিজকা দু' সাইড মে। ইহা হে কারিব একশ' গজ দেড় শ' গজ হোগা।

চমকে ওঠেন মেজর ভয়ানকভাবে। উৎকর্ষার সাথে বলেন, হানড্রেড ইয়ার্ডস্ অনলি?

— ইয়েস স্যার।

— আরে ইয়ে তুমনে কেয়া কিয়া? এত্তা পাস কিউ লেকে আয়া! বলতে বলতে রাস্তার উপর বসে পড়েন মেজর শর্মা। এরপর স্টোন শোয়া অবস্থানে চলে যান। আমিও তার পাশে উয়ে থাকি। হতবিহুল ভাবটা কাটিতে কিছুটা সময় লাগে। তার সাথে আসা দলটা পেছন থেকে কভার দেয়। মেজর ধাতস্তু হবার পর পরবর্তী অ্যাকশনের প্ল্যান দেন ফিসফিসিয়ে। আর সেটা হলো, আমাদের পজিশন থাকবে এখানেই। মেজর পিছিয়ে দিয়ে রাস্তার ডান পাশ দিয়ে নদীর ধার পর্যন্ত তার দল নিয়ে আক্রমণাত্মক পজিশন নেবেন। ডি-টাইমে উভয় দল অ্যাডভাস করবে এক সাথে এবং পাকবাহিনীর ডিফেন্স লাইনে চার্জ করবেন তারা। এর সিগনাল হবে দুটো 'ফ্রেয়ার' বা 'প্যারা বোম'। রিট্রিটেরও সিগনাল হবে একটা প্যারা বোম। সিদ্ধান্ত দ্রুতই নেয়া হয়। মেজর সে অনুমারে পেছনে চলে যান তার ট্রুপস্-এর অবস্থানের দিকে। তাকে তার

অবস্থান পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আমি ঝুঁটা খেত মাড়িয়ে আমাদের পজিশনে চলে আসি। পিটু আগেই ফিরে এসে সবার অবস্থান ঠিকঠাক করে দিয়েছে। আমি সবাইকে নির্দেশ দিই সংব্য যুদ্ধে করণীয় ইত্যাদি সম্পর্কে। মুন্দাকে রাবি বাঁপাশে। পিটু ডানে। মুন্দার বাঁয়ে বালু। মুন্দার জন্য অঙ্গীর লাগে। এই ভয়ানক আর ঝুঁকিপূর্ণ যুদ্ধের ভেতরে ওকে না আনলেই হতো।

রাত বাড়ছে। বুয়াশার ঢানের এখানে নেই। নবমী-দশমী কি একাদশীর রাত সম্ভবত আজ। আকাশে ফুটফুটে চাঁদ। তার আলোয় উদ্ধাসিত চারদিক। বুকের নিচে ভেজা মাটি ঘাস। ওপর থেকে নেমে আসা হিম ঝরানো কলকনে শীত। ভেজা পোশাক ক্ষেত্রে ঠাণ্ডা শরীরের ভেতরে ঢুকে কাঁপন ধরিয়ে দেয়। দাঁতে দাঁতে বাড়ি খেয়ে হিঁহি করে কাঁপতে থাকে কেউ কেউ। প্রিয় ধাতব অস্ত্রগুলোর শরীরও এই হিমশীতলতার স্পর্শে বরফ ঠাণ্ডা। আমরা পজিশনে আছি। হাতিয়ারের বাঁট ডান গালের সাথে ঠেকিয়ে, কাঁধে বসিয়ে, শক্ত হতে চেপে ধরে ট্রিপারে আঙুল রেখে, একেবারে তৈরি অবস্থায় অপেক্ষা করছি। অপেক্ষা করছি মেজরের প্রথম সিগনালের জন্য। একটা গুলি হবে প্রথমে। আর তার সঙ্গে সঙ্গে ফায়ার ওপেন করবে সকল জোয়ান।

কিন্তু সেই কঙ্গিত সিগনাল আর এলো না। এলো অন্যভাবে। অন্য ধরনের সিগনাল।

তালমার লড়াই

হাঁটাঁ করেই তালমার ডান পাশের ক্যাট্টেনের টুপ্স থেকে ঝুঁক হয়ে যায় গোলাগুলি। আর এই গুলিবর্ষণের ঘটনা সঙ্গে সঙ্গে প্রভাবিত করে এ শাস্তির অবস্থানে থাকা সৈনিকদেরও। মেজর শর্মার দল থেকেও শুরু হয় গোলাগুলি একইভাবে। তালমা ব্রিজের উভয় পাড়ে পজিশনে থাকা পাকসেনারাও যেনো প্রতুত ঝুঁক ছিলো। তৎক্ষণিকভাবে জবাব দিতে লাগলো তারা সমান পাত্রা দিয়ে। সম্ভবত তাদের মেশিনগানের পোষ্ট আছে দুটো। সেখান থেকেই বিরতিবিহীনভাবে গুলি আসতে শুরু কৃত ঢা-ঢা-ঢা শব্দের বক্সার তুলে।

না, আর অপেক্ষা করা নয়। গুলিবর্ষণ শুরু করার নির্দেশ দিই এবার ছেলেদের। অবস্থানে থাকা প্রতিটি ছেলেক হাতিয়ার গর্জে গর্জে ওঠে। এল.এম.জি.ম্যান মোতালেব একদিকে, অন্যদিকে মধুসূন্দন ঠিকঠাক মতোই স্টেট করে নিয়েছে তাদের এল.এম.জি. দুটো। বিরতিবিহীনভাবে গুলি চালিয়ে তারা শেষ করছে ম্যাগজিনের পর ম্যাগজিন। মুন্দাও যোদ্ধা হিসেবে জীবনে প্রথম গুলিবর্ষণের সুযোগ পেয়েছে আজ। উচ্চেজনায় রীতিমতো কাপলেও গুলিবর্ষণ করে চলেছে সে তার হাতিয়ার থেকে একটার পর একটা। ওর পিঠে হাত দিয়ে ফিসফিসিয়ে বলি, মাথা ঠাণ্ডা রাখ মুন্দা।

— ও.কে. মায়া।

তার গলায় রীতিমতো উচ্চেজনা।

মেজর শর্মার বি.এস.এফ দল সব ধরনের যুদ্ধাত্মে সঞ্চিত। তাদের সাথে রয়েছে ঢ ইঞ্জিন ও ২ ইঞ্জিন মটর। মেশিনগান, এস.এল.আর, প্রেনেড প্রোয়েইং রাইফেল, একটা রকেট লঞ্চারসহ বিভিন্ন ধরনের অস্ত্র। তালমার অপর পারের প্লাটুনটার সমরসজ্জা ও ফায়ার পাওয়ারও একই ধরনের। এছাড়াও উভয় প্লাটুনের কাছেই রয়েছে ওয়ারলেস স্টেট। দু'পাশ থেকেই গর্জে গর্জে উঠছে সব ধরনের হাতিয়ার। আগন্তনের ফুল্কি তুলে গুলির স্তোত ছুটে যায় পাক প্রতিরক্ষা লাইনের দিকে। মটরের শেল আর জি-৩ রাইফেলের প্রেনেড ছুটে যাচ্ছে অবিরাম। ফাটছে সেগুলো আমাদের দেড়-দুশো গজ সামনে। পাকবাহিনীও যুদ্ধ করছে মরিয়া

হয়ে। এদিক থেকে পঞ্জগড় শহর রক্ষা করার পাকবাহিনীর এটাই শেষ প্রতিরক্ষা লাইন। কৌশলগত কারণে তালমা প্রতিরক্ষা লাইনের গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি। এদিকে তাদের শেষ অবস্থানটি যদি তারা হারিয়ে ফেলে, তাহলে পঞ্জগড়ের পতন হতে বেশি সময় লাগবে না। হৃত্ত্ব করে মুক্তি আর পিত্রবাহিনী ঢুকে যাবে এদিক দিয়েই পঞ্জগড়ে। তালমার অবস্থান অর্থাৎ তার প্রতিরক্ষা লাইন তেমন সুস্থ নয়। এজন্য সোজাসুজি পঞ্জগড়ে আঘাত না করে আমাদের যৌথ কমান্ড তালমার দিক থেকেই ব্রেক ফ্র করতে চাইছে। পাকবাহিনী সম্ভবত ব্যাপারটা ভালো করেই বুঝতে পেরেছে। আর সে কারণেই মরিয়া হয়ে, যাতে কোনোভাবেই তাদের এই ধাঁটিটির পতন না হয়, তার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। দুর্দান্ত ফায়ার পাওয়ার নিয়ে তারা তাদের নিরাপদ ট্রেইন আর বাস্কারগুলো থেকে বাড়ের বেগে গুলি চালিয়ে যাচ্ছে আক্রমণকারী এই আমাদের ওপর। যৌক বাঁক গুলি আসে, আসতে থাকে নির্মম মৃত্যুবাণের মতো। উড়ে যায় সেই পরিচিত গুঁজন তুলে ওপর দিয়ে। মাথা তুলবার উপায় নেই। সামান্য অসতর্ক হলেই সম্মত বিপদ। বারবার সাবধান করছি মুলাকে, অন্য সকলকে বলছি, গ্রায় চিকিৎসাক করেই, মাথা তুলিস না কেউ, পজিশন চেঙ্গ কর দ্বয়ে দ্বয়ে, গুলি চালাতে থাক, ত্যব পাওয়ার কোনো কারণ নেই, আজ তালমা আমাদের দখলে আসবেই ইত্যাদি।

বি.এস.এফ. বাহিনীর ২ ইঞ্জিন, ৩ ইঞ্জিন মর্টারের গোলা ফাটছে সামনে। ভয়ানক শব্দে ফাটছে সেগুলো আলোর ঝলকানি তুলে। খুব কাছেই শক্তি। আর সেই চিরচেনা শক্তিবাহিনীর আশ্রয়েস্ত্রের পাল্টা আঘাত ছেলেদের আঙুলে করে তুলেছে। এখানে আমার সাথে যুদ্ধরত তথ্য এফ.এফ. সহযোগ্যারা। একজনই হাবিলদারের নেতৃত্বে ই.পি.আর সদস্যদের রেখেছি মেজরের বাহিনীর সাথে তাদের সাথে থেকে একইভাবে যুদ্ধ করে চলেছেন ই.পি.আর-এর সাহসী যোদ্ধারাঙ্গাসলে এ ফ্রন্টে মুক্তিবাহিনীর মূল শক্তি তো তারাই। এ ফ্রন্টে সেনাবাহিনীর নিয়ন্ত্রিত স্থানস্য থাকলেও তারা মাত্র হাতেগোনা ক'জন।

পাকবাহিনীর প্রতি অবিরাম প্রতিক্রিয়া আর তাদের তীব্র আক্রমণের প্রভুত্বের দিতে দিতে ছেলেদের তখন সত্যি সত্যিই প্রয়োগ বেহাল আর দিঘিদিক জ্ঞানশূন্য অবস্থা। যুদ্ধের এই তীব্রতা তাদের কাছে ছিলো অকল্পনীয়। অবিরাম গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে হাতিয়ারগুলোও সব গরম হয়ে উঠেছে। প্রত্যেকের কাঁধের ওপর চাপগ পড়ছে প্রচন্ডভাবে। প্রতি যুদ্ধতে মনে হয়, এই বুঝি সঙ্গে আসে মেজর শর্মার কাছ থেকে ‘গ্যাসল্ট’ অর্থাৎ শক্তির বাস্কার দখলের জন্য এগিয়ে যাও। তখন আর কোনো দ্বিক্ষণি না করে সোজা দাঁড়িয়ে পড়তে হবে। আর শক্তির বংশালীন গুলিবর্ষণের ভেতরেই এগিয়ে গিয়ে দখল করতে হবে তাদের বাস্কার। দখল নিতে হবে তাদের সম্পূর্ণ ডিফেন্স লাইন। আর এভাবে যদি এগুলোই হয়, সেটা হবে নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও শক্তির শত সহস্র মৃত্যুবাণের দিকে এগিয়ে যাওয়া। সম্ভব হবে কি শক্তির বাস্কার পর্যন্ত পৌছনো? দেখা যাক কী হয় শেষ পর্যন্ত। মনে মনে ভাবি একথা। আজকের যুদ্ধ ক'জনকে যে হারাতে হবে, কে জানে।

বেরুবাড়ি, সাকাতি, ভেতরগড়, জগদলহাট, অমরখানা আর চাউলহাটি এলাকায় যেসব আর্টিলারি ও মর্টার বেস রয়েছে, মেজর শর্মা তাদের প্রত্যেকের কাছ থেকে ওয়্যারলেস মারফত সম্ভবত ‘সাপোর্ট’ বা ‘কভার ফায়ার’ চেয়েছেন। পূর্ব সিকান্ড এ ধরনেরই ছিলো। ফলে অল্পক্ষণের ভেতরেই এক সাথে সবগুলো আর্টিলারি ও মর্টার পোস্ট থেকে সাপোর্ট আসতে শুরু করে। পো-পো শব্দ তুলে শ্লেষের বাঁক উড়ে আসছে। গ্রিড রিফারেন্স (ম্যাপের চিহ্নিত

সঙ্গেত) অনুযায়ী তারা শক্র-পজিশন তালমার ওপর শেলের পর শেল বর্ষণ করে চলেছে। বান্দিক থেকে আসছে, পেছন দিক থেকে আসছে, ডানদিক থেকে আসছে। আসছে সাপোর্ট উভর, পশ্চিম, দক্ষিণ আর মাথার ওপর দিয়ে, আকাশ বেয়ে। উড়ে এসে সেগুলো পড়ছে সামনে, একেবারে চোখের সামনে। পড়ছে আর ফাটছে সমানে। চোখ ধোয়ানো তীব্র আলোর ঝলকানি তুলে বিক্ষেপিত হচ্ছে সেগুলো। প্রচও শব্দের বিক্ষেপণ। লাগাতার। কালো ধোয়ায় ধোয়ায় চারদিক একাকার। বাতাসে পোড়া বারুদের তীব্র গন্ধ। শেল ফাটার সঙ্গে সঙ্গে কেঁপে উঠছে মাটি থরথরিয়ে। মনে হচ্ছে, বুকের নিচেকার নরম-ভেজা মাটি মেঠে চৌচির হয়ে যাবে যেকোনো মুহূর্তে। আর মাটির সেই সব ফাটল গিলে খাবে আমাদের নিমিষেই।

সিল্ব পাউডার। টুয়েনটিফাইভ পাউডার, এইটি ওয়ান মার্টার, ৩ ইঞ্জি মার্টার, ২ ইঞ্জি মার্টার, রকেট লঞ্চার, জি-৩ রাইফেল, হ্যান্ড হেনেন্ড— এসবেই বিক্ষেপণ ঘটছে মুহূর্মুহ একই সঙ্গে, একই সময়ে। যেনো গোলাগুলির অবিরাম এই ফুটছে উপালপাতাল হয়ে যাচ্ছে সামনের জায়গাগুলো। অবিরাম কান-ফাটানো প্রচও শব্দ আর তার শক ওয়েভের ধাক্কা ক্ষণে ক্ষণে যেনো আমাদের অবস্থান থেকে স্থানচূর্ণ করে উল্টোপাল্টে ফেলে দিতে চায়। তরঙ্গায়িত গুড়গুড় ভয়াল ও বিকট শব্দের সাথে সাথেই মাটি ধাকানো ভূমিকম্প কান বধির করে দিচ্ছে। সেই সাথে বিক্ষেপকের ধোয়া দু'চোখে ধরিয়ে দিচ্ছে তীব্র জ্বালা। বিভীষিকাময় সাক্ষাৎ একটা নরকের সৃষ্টি হয়েছে। আমরা সেই নরকের ভেতরে থেকে শ্রজ্জন্ম করছি আর অপেক্ষা করছি চূড়ান্ত সেই নির্দেশের। সেটা আসা মাত্রাই আমাদের যেতে যাবে শক্রঘাটির দিকে। দখল করতে হবে তাদের ধাঁটি। চার্জ করতে হবে তাদের বাস্তুর আরু ট্রেকগুলো। আর সেটা করতে হবে এই ভয়াবহ তাঙ্গবলীলার ভেতরেই। এরি মধ্যে প্রাক্ত হয়েছে আমার দলের দুঁজন সদস্য। শেলের টুকরো উড়ে এসে লেগেছে তাদের প্রোত্তাৱে। পিন্টু তাদের তুঁটা থেতের ভেতর দিয়ে পেছনে সরিয়ে নেয়ার ব্যবস্থা করেছে।

ঘড়িতে রাত দুটোর ওপর সময় বিক্ষেপিত শেল আর গোলার সৃষ্টি কালো ধোয়ার কুকুলী উর্ধ্মগুরী হয়ে সমগ্র এলাকাটিকেই গ্রাস করে নিয়েছে। ঢেকে দিয়েছে আকাশ। চাঁদের আলোকেও আড়াল করে ফেলেছে সেই ধোয়ার আন্তরণ। সামান্য ফিকে আলো। একটা গা ছমছম করা ভৌতিক পরিবেশ। সমস্ত অনুভূতি এবই মধ্যে ভোংতা হয়ে গেছে। আমরা আর আমাদের মধ্যে নেই। কেবল একটা অনুভূতি শূন্য শরীরে আমরা যেনো একবার ওপরের দিকে ভাসছি, একবার নামছি নিচে। চেতন-অবচেতনের এমন এক অবস্থায় আমি নিজের পুরো ইচ্ছেশক্তিকে পরম একাধাতা দিয়ে আয়তে রাখবার চেষ্টা করছি। ভীষণ কঠকর ব্যাপার। ছেলেদের একেবারে বেসামাল ছিন্নভিন্ন অবস্থা। কিন্তু আমাদের অবস্থান ধরে রাখতে হবে যে-কোনোভাবেই হোক। যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে আর এ জন্য মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হবে। এটারই এখন সব থেকে বেশি প্রয়োজন। আমি সে চেষ্টাই করছি।

রাত তিনটোর দিকে ধীরে ধীরে থেমে আসে যুদ্ধের এই তাঙ্গবলীলা। এক সময় একেবারেই থেমে যায় সেটা। শান্ত হয়ে আসে হঠাৎ করেই সবকিছু। চারদিকে নেমে আসে গভীর নিম্নোম নীরবতা। এবার সেই নিষ্ঠকৃতাই চারদিক থেকে এসে ধিরে ধরে আমাদের। প্রলয়করী আর ধূংসাঞ্চক এক রণক্ষেত্রে গোলাগুলির প্রচণ্ডতর শব্দরাশি হঠাৎ করে থেমে যাওয়ায় কেমন যেনো বেমানান লাগে। তয়াবহ একটা যুদ্ধশ্যে এরকমের শান্ত সমাহিত অবস্থা যেনো সহ্য করা কঠিন ও কঠকর হয়ে দাঁড়ায়।

আকাশে এখন ঠাঁদ নেই। অঙ্ককারের ঘন কালো ছায়া অস্পষ্ট করে দিয়েছে সবকিছু। কেটে যাচ্ছে সময়। বুঝতে পারছি না কী করবো! আমরা কি এগিয়ে যাবো শুরু ঘাঁটি দখলের উদ্দেশ্যে? বুকের ভেতর অস্ত্রিতা, হৃৎপিণ্ড লাফিয়ে লাফিয়ে ওঠে। তারি হয়ে আসে শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি। এই বুঝি এবার শক্রঘাঁটির দিকে এগিয়ে যেতে হবে। এরকম একটা ভাব ও ভাবনা আচ্ছন্নের মতো ঘিরে রাখে সমস্ত মনকে। সামনে এগিয়ে যাবার জন্য হাতে হাতিয়ার ধরে ছেলেরাও প্রস্তুত। কেবল নির্দেশের অপেক্ষা। কিন্তু মেজর শর্মা কেনো দিচ্ছেন না সেই নির্দেশ!

ঠিক এ সময়, হঠাৎ আমাদের অবস্থানের বাঁদিক থেকে এক ঝাঁক বুলেট ছুটে আসে। আমাদের অতিক্রম করে ছুটে যায় সেগুলো সামান্য ওপর দিয়ে পেছন দিকে। এরপর একভাবে শুলি আসতে থাকে অনবরত। ঝাঁকে ঝাঁকে। এগুলো আসছে খুব কাছ থেকে। ৫০/৬০ গজের মতো দূরত্বে রয়েছে ওরা। তাদের অস্পষ্ট ভেসে আসা কথাও শোনা যায়। একজনের গলায় শোনা যায়, শালে লোগ ইধার কোই হ্যায়। তার মানে পাকবাহিনী! ধড়াস্ক করে কেঁপে ওঠে বুকের ভেতর। বোঝা যায় পুরো ব্যাপার। আমাদের সচিলিত বাহিনীর, বিশেষত গোলন্দাজ বাহিনীর প্রচণ্ড আক্রমণের মুখে তারা তাদের ডিফেন্স লাইনের ট্রেক্স-বাক্সের এগুলো ছেড়ে এসে তালমা-বেরুবাড়ি সড়কের ওপারে ঠিক আমাদের সামনাসামনি অবস্থান নিয়েছে। তারা এ কৌশল নিয়েছে বোম শেলের ক্ষেত্রে থেকে বাঁচার জন্য। বেরুবাড়ি সড়কের কাছে নিরাপদ জায়গায় এসে তারা ঘাপটি মেঝে এসে ছিলো এতোক্ষণ। আমাদের আক্রমণ থেমে যাওয়ায় পাল্টা আক্রমণ চালাতে চালী এখন মরিয়া হয়ে এগিয়ে আসছে ‘ফায়ার অ্যান্ড মুভ’ ভঙ্গিতে। এ অবস্থায় যে ক্ষেত্রে দিশেহারা হয়ে যাবার কথা। আমাদের এখনকার অবস্থাও হয়ে দাঁড়ায় অনেকটা যে ক্ষেত্রে রকমই। মনের ভেতর থেকে জোর তাগিদ ভেসে আসে, আটকাতে হবে শক্ত প্রক্রিয়াজনকে। আটকাতে হবে যে করেই হোক তাদের অঞ্চলিয়ানকে, তা না হলে সমুহ বিপ্লব।

এদিকে আমাদের গোলাবাক্সেট কমে এসেছে। এ পাশের অবস্থানে শুধু আমরা ক'জন। সবাই ক্লান্ত বিপ্লব অবস্থা। এরকম পরিস্থিতিতে বেপরোয়া পাকসেনা দলটিকে বেশিক্ষণ আটকে রাখা সম্ভব হবে না। মনে প্রশ্ন জেগে বসে, মেজর শর্মা কোথায়? কী করছেন তিনি? তাঁর সাথে দ্রুত যোগাযোগ করা দরকার। সময় নেই। যোতালেব আর মধুসূনকে তাদের এল.এম.জির ফায়ার ওপেন করতে বলি। অন্যদেরকেও বলি তাদের হাতিয়ারগুলো সচল করতে। পিন্টুকে বলি, ওদের আটকাতে হবে পিন্টু। তৃতীয় অবস্থান ধরে রেখে শুলি চালিয়ে যাও লাস্ট রাউন্ড পর্যন্ত।

এই নির্দেশ দিয়ে আমি দ্রুত ছুটে চলি ভূট্টা খেতের ভেতর দিয়ে পেছন দিকে। মেজর শর্মাকে আমার চাই। মাথা সমান উচু ভূট্টার গাছ ঠেলে ঠেলে পাগলের মতো আমি ছুটে চলি শর্মার উদ্দেশ্যে।

ওরা চলে গেছে

খেটটা পার হতেই রাস্তার দেখা মেলে। দেৰি, রাস্তার ওপর অঙ্ককারে বসে আছেন আমাদের দলের একজন ই.পি.আর সদস্য। একেবারে ভেঙে পড়া অবস্থায়, মুখে কাতরানির শব্দ তার। তাঁকে সোজা জিগ্যেস করি, কে আপনি? কী হয়েছে আপনার? মেজর শর্মা

কোথায়! বি.এস.এফ বাহিনী কোথায়?

প্রবীণ সৈনিক তেমনি কাতরে কাতরে কাঁদছেন, সেই সাথে কাঁপছেনও। আর সে অবস্থাতেই তিনি জবাব দেন, আমি আপনাদেরই দলের লোক। গুলি লেগেছে আমার পায়ে। ওরা চলে গেছে।

— চলে গেছে মানে? কখন? ব্যাপারটা মাথায় ঢুকতে চায় না। প্রবীণ সৈনিক কী বলছেন? তিনি আবার বলেন, আধ ঘণ্টা আগে তারা চলে গেছে।

সর্বনাশ! বলে কী! তাহলে তো আমাদের এখানে আর এক মুহূর্ত থাকবার উপায় নেই। রিট্রিট করতে হবে, যতো তাড়াতাড়ি সংভব। দ্রুত এই সিদ্ধান্ত নিয়ে আহত প্রবীণ সৈনিকটিকে বলি, ঠিক আছে, আমরা না আসা পর্যন্ত আপনি এখানেই থাকবেন।

তার প্রতিউত্তরের অপেক্ষা না করেই দ্রুত চুকে পড়ি আবার ভূট্টা খেতে। উর্ধ্বাসে দৌড়ে চলি পিটুদের অবস্থান অভিযুক্তে। মাথার ওপর তখনো অবিরাম গুলি চলছে। ভূট্টা গাছের মাথা ভেঙে ভেঙে পড়ছে তাদের আঘাতে। কোমর বাঁকিয়ে দৌড়াতে দৌড়াতে ফিরে আসি ছেলেদের কাছে। এক নিষ্ঠাসে পিটুকে পরিস্থিতিটা জানিয়ে তাদের সবাইকে রিট্রিটের নির্দেশ দিই। শুধু মোতালেবকে রাখি তার এল.এম.জিসহ কভারে। তাকে বলি, তুই এল.এম.জি দিয়ে আটকে রাখবি ওদের। আমরা রাস্তায় পৌঁছুবার পর তোকে খবর দেবো। তখন তুই রিট্রিট করবি।

নির্দেশমতো মোতালেব তার কভার ফায়ার শুরু করেন্তার আমি সব ছেলেকে নিয়ে মাথা নিচু করে কোমর বাঁকিয়ে ভূট্টা খেতে পেরিয়ে আস্তু শক্ত হাতে এ সময় মুলাকে ধরে রাখি। মনে হয়, সাক্ষাৎ যমের হাত থেকে ছিনিয়ে আলাই ছেলেটিকে।

রাস্তায় প্রবীণ ই.পি.আর বসেছিলেন তেমনি স্ট্রোব দায়িত্ব নিলো পিটু। বাবলুকে ঠেলা মেরে পাঠালাম মোতালেবকে তুলে আনতে। কিন্তু পুরুষ মধ্যে বাবলু ফিরে আসে মোতালেবসহ। এরপর আহত বৃক্ষ ই.পি.আর সদস্যকে ক্ষেত্রে নয়ে দ্রুত এবং ক্লাসিকর পশ্চাদপসরণ।

এক সময় নদীর কাছাকাছি পৌঁছে যাই আমরা। ঝাঁকড়া ছাতিয়ান গাছের নিচে ছেলেদের বসতে বলি। তারা শুধু বসেই না, শুশাস শব্দ তুলে মাটিতে স্টোন শয়ে পড়ে। এবং মুখ হ্যাঁ করে শ্বাস ফেলতে থাকে। আমরা শহরের নাগালের বাইরে চলে এসেছি। এখন অনেকটা নিরাপদ।

মনটা বিস্বাদে ভরে রয়েছে। গিয়েছিলাম শক্রের ঘাঁটি তালমা দখল করতে। প্রচও আক্রমণ, ব্যাপক গোলাগুলি, আর এসবের ভেতর দিয়েই হয়ে গেলো বড় ধরনের একটা যুদ্ধ। শক্র তাদের ঘাঁটিও ছেড়ে দিয়েছিলো। শুধু একটুখানি এগিয়ে গেলেই দখলে নেয়া যেতো তাদের ঘাঁটি। কিন্তু হাতের নাগালে থাকা সঙ্গেও সেটা করা গেলো না। আমাদের মূল নির্ভরতা ছিলেন মেজর শৰ্মা আর তার দলবল। কিন্তু তিনি চূড়ান্ত অ্যাকশনে না গিয়ে ফিরে এলেন। কেনো যে এমনটা করলেন, বোঝা যাচ্ছে না। এটা এখন মনে হচ্ছে ফুটবলে হায়ার খেলোয়াড়ের মতো। হায়ার করা খেলোয়াড়রা খেলবে ঠিকই কিন্তু ঝুঁকি নেবে না।

ঝাঁকড়া ছাতিয়ান গাছের তলায় শয়ে, নিজের দেশের মাটিতে গা স্পর্শ করে উপলক্ষ্টি আবারো এলো, যুদ্ধটা আমাদের এবং সেটা করতে হবে আমাদেরই। যেমনটা করলাম আমরা আজকে। তবুও এরকমভাবে সাম্রাজ্য বুজি, মেজর শৰ্মা যখন রিট্রিট করে চলে এসেছেন, নিশ্চয়ই তার পেছনে কোনো-না-কোনো কারণে। আজকের দলের কমান্ডার হিসেবে তার উচিত ছিলো, আমাদের তুলে আনা। কেমন করে তিনি এমনটা পারলেন,

এখনো তা সত্যিই মাথায় চুকছে না কোনোভাবেই।

আজ আমাদের যুদ্ধাহত তিনজন। তবে শুরুতর আহত বলতে যা বোধায়, তেমন কেউ নয়। ছেলেরা কিছুটা দম ফিরে পেলে সবাইকে উঠতে বলি। আহতদের পালাত্বে বহন করে নেয়ার ব্যবস্থা করা হয়।

তালমা পার হবার সময় আবার কাপড়-জামা ভিজে যায়, কনকনে হিমেল ঠাণ্ডা আবার জঁকিয়ে ধরে আমাদের। একসময় আমরা বি. এস. এফ.-এর অবস্থানে এসে পৌঁছাই। রাত প্রায় শেষ হয়ে আসছে। মেজেরে পরনে তখনো যুক্তের পোশাক। যুক্তে যান নি। তাই সোজাসুজি তাঁর বাক্সারে চুকে পড়ি। গিয়ে দেখি উদ্বিধ বদনে মেজের শর্মা আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন। আমাদের ফিরে আসায় তিনি আশ্চর্ষ হয়েছেন বোধ যায়। উদ্বিধ ভাবটা কেটে যায় তার চোখমুখ থেকে। তিনি বলেন, মেহবুব তুম আয়া হ্যায়! তুমহারা লিয়ে বোহাঙ্গৈ চিনতা যে থা।

তার কথা শেষ হতেই আমি এবার তাকে সোজাসুজি জিগ্যেস করি, আপনে ফল ব্যাক কিয়া, ঠিক হ্যায়। মাগার হামলোগ কো সিগ্নাল কিউ নেহি দিয়া? উই অয়ার ইন সিরিয়াস ডেঙ্গার। ইয়ে ক্যায়সা হ্যায় স্যার?

— মেহবুব ডোন্ট মাইন্ড প্রিজ। হামারা দো জাওয়ানকো শুলি লাগা। সিরিয়াস ঘায়েল হ্যায়। আওয়ার কমান্ড পোস্ট সে রিট্রিট করলে ভি বোলা। দো পাক আর্মি খতাম হ্যায়। হামারা ওয়্যারলেস ম্যান ইন্টারসেন্ট কিয়া এনিমি কা ইয়ে ক্ষেজেলিটিজ ক্যা খবর।

— হামারা তিন আদমি সিরিয়াসলি উনডেড হ্যায়। উই এব্রাপেকটেড ইয়োর সিগনাল।

— সরি ইয়ার। ডোন্ট মাইন্ড প্রিজ।

— ও.কে স্যার, থ্যাক ইউ। হাম ওয়াপাস ক্রান্তে চাহতে হ্যায়।

— ইয়েস বয়েজ। ইউ ক্যান গো লাইব ইউ ফট টুডে লাইক ফ্রেট ফাইটারস। আই উইল টক টু ইয়োর কমান্ডার রিগার্ডিং নেক ফাইটিং। গিড মাই সালাম টু ইয়োর ক্যাপ্টেন।

— থ্যাক ইউ স্যার। শুড বাই স্যার বাংলা।

— শুড বাই। জয়বাংলা।

আমরা রওনা দিই। মেজের তাঁর বাক্সার থেকে বাইরে বেরিয়ে আসেন। রাতশেষের আকাশ ফর্সা হয়ে আসতে থাকে। এনিকসেদিক ঝুলে থাকা শান্ত কুয়াশার চাদর। মেজের দাঁড়িয়েই থাকেন আমরা যতোক্ষণ না রাস্তার বাঁকটার আড়ালে হারিয়ে যাই। এক পলক পেছনে ফিরে লক্ষ্য করি ব্যাপারটা।

মুক্ত বাধীন জগদলে সুবী জীবনের ছবি

সকাল নটার দিকে বকর এসে ঘূম ভাঙ্গয়। খুব সকালে আমাদের ফ্রন্ট লাইনে ফিরে এসে আহতদের ফিল্ড হাসপাতালে পাঠাবার ব্যবস্থা করে ট্রেক্সে এসে থেয়ে পড়তেই একেবারে মৃত মানুষের মতো ঘূম। তালমাৰ রাতের যুদ্ধ জীবনীশক্তিৰ অনেকখানিই নিঙড়ে নিয়েছিলো। বকরের ডাকে ঘূম ভাঙ্গে। ব্যাপার কি? লেফটেন্যান্ট মাসুদ তাঁর বাক্সারে ডেকেছেন। বৰ্তমানে মাসুদের বাক্সার ধিৱে একটা অস্থায়ী সদৰ দফতর গড়ে উঠেছে। রিপোর্ট-চিপোর্ট যা কিছু তার সবই করতে হয় ওখানেই।

কিন্তু যাই কী করে? তালমা পার হওয়ার সময় প্যান্টের তলদেশের সুতো ছিঁড়ে গেছে। সেটা মেরামত করা দরকার। কোমরে প্যান্টের উপর গামছা জড়িয়ে ট্রেক্সে শয়েছিলাম।

মাসুদের কাছে যেতে হলে এ অবস্থায় যাওয়া মুশকিল। আর বিভীষণ কোনো প্যান্টও নেই। লুঙ্গি-কাপড়চোপড় সব নালাগঞ্জে। এক কাপড়ে সেই যে ফ্রন্টে এসেছি এ-নিয়েই হয়তো চালিয়ে যেতে হবে শেষতক। সুই সৃতো কিছু একটা পাওয়া যায় কি না কোথাও বকরকে দেখতে বলি। বকর এখানে-সেখানে শিয়েও পায় না। কিছুক্ষণ পর ফিরে আসে পেছনদিককার বাড়িগুলোর বেড়া থেকে একটুকরো গুণা খুলে তাই হাতে করে নিয়ে। কী আর করা, সেই পূরনো শুণা দিয়েই ছেড়া প্যাটের তলদেশ রিপেয়ের করে মাসুদের কাছে যাই এবং রাতের যুদ্ধের বিবরণ দিয়ে রিপোর্ট পেশ করি। ঠিক এই সময় জগদলহাট থেকে একজন ম্যাসেঞ্জার আসে। এসেই জানায় ঠাকুরগাঁও এলাকার এমপি ফজলুল করিম সাহেব এসেছেন সেখানে। তিনি দেখা করতে চান আমার সাথে।

একজন বড় রাজনীতিবিদ ডেকে পাঠিয়েছেন। তাঁর সেই ডাক উপেক্ষা করার উপায় নেই। এছাড়া ট্রেনের জীবন থেকে কিছুক্ষণের জন্য হলেও বাইরের মুক্ত বাতাস বুক ভরে নেয়া যাবে। আর এই উদ্দেশ্য নিয়েই রওনা দিই জগদলহাটের দিকে। সাথে দু'জন সঙ্গী। হাফেজ আর জয়নাল।

পাকা তিন মাইল পথ হাঁটতে হয়। মাত্র ক'দিন আগেও জগদলহাট ছিলো পাকবাহিনীর দখলে। শক্ত ঘাঁটি ছিলো এটা তাদের। আর ছিলো নৃশংসতা আর বিভীষিকার এক ভয়াল ভগৎ। এখন এটা মুক্ত এলাকা। মুক্ত জগদলহাট এলাকা যেনো এ ক'দিনেই ভোল পাটে ফেলেছে। চেনাই যায় না প্রথম দিনের পদানত জগদলহাটে আর। স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ফিরে আসছে। অস্থায়ী দোকানপাটা খুলছে। রাস্তার পাশে বিসে গেছে সওদা বেচাকেনার হাট। সবখানে উড়েছে স্বাধীন বাংলার পতাকা। হরদুর পতাকা সড়কের ওপর দিয়ে যানবাহন চলাচল করছে। রিকশা, সাইকেল, ভ্যান ও গরজাপাটি ইত্যাদির পাশাপাশি মিলিটারি জিপ-লরি ও ভ্যানের ব্যস্তসমস্ত ছুটোছুটির অন্ত নেটে ছেঁকে বেসামরিক গাড়িও দেখা যায়। অর্থাৎ দুর্চিন্তামুক্ত স্বাধীন মানুষজন। তাদের স্বাভাবিক সুসজ্ঞকর্ম করে চলেছে। চারদিকে এক অনাবিল আনন্দ আর সুখী জীবনের ছবি। এক ঝুঁধে জলেপুড়ে যাওয়া ঘাসপাতা। ডৰ্ম্মত বাড়িঘর ও দোকানপাটের ছাইতে, পাকসেনাদের বিধুত বাঙ্কারগুলো দগদগে ঘায়ের মতো ছড়িয়ে রয়েছে চারপাশে। এগুলো মনে পড়িয়ে দেয় বিগত দুর্দিনের কথা। মনে পড়িয়ে দেয় চার চারটা দিন আর রাতের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের তাপ্তলীলার কথা। সময় কীভাবে দ্রুত পরিবেশ-পরিস্থিতিকে পরিবর্তিত করে, এসবকিছুই তার উজ্জ্বল নির্দর্শন। মানুষের মুখ দেখে এখন আর বুঝবার উপায় নেই কী দৃঢ়সহ কঠ করতে হয়েছে এ জায়গাটা মুক্ত করার জন্য আমাদের। হাবিলদার সকিমউদ্দিনসহ কতোজনের রক্ত ঝরেছে, কতো অম্ল্য প্রাণ হারিয়ে গেছে, তার ইয়স্তা নেই।

সীমান্তের ওপার থেকে অনেকেই আসছেন। তবে ফ্রন্টের কাছাকাছি এ জায়গা পর্যন্ত আসতেই তাদের থামিয়ে দেয়া হচ্ছে। এ কাজটি করছে আমারই কোম্পানির ছেট একটা দল। এ দলটির নেতা মতিন। সীমান্তের ওপার থেকে আসা মানুষের চোখে-মুখে নানা ক্ষেত্রে। প্রচুর জিজ্ঞাসা। কেউ আসছেন তাদের পরিত্যক্ত বাড়িঘরে ফিরে যাবার জন্য। কেউ আসছেন ভালো করে এই খোজখবর নিতে যে, তাদের কেলে যাওয়া বাড়িয়র মুক্ত হতে আর দেরি হবে কতোদিন সেটা জানতে। কেউ আসছেন তাদের আঞ্চলিকসম্মেলনের খোজ নিতে, কেউ আসছেন শ্রেফ ফ্রন্ট দেখতে। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা, রেডিও, টিভি, সংবাদ সংস্থার লোকজনও এসেছেন যুদ্ধের অংশগতির খবরাখবর নেবার জন্য, ফ্রন্টের সর্বশেষ ডেভেলপমেন্ট

জানতে। এদের মধ্যে রয়েছে বেশ ক'জন বিদেশী মানুষজনও। কাঁধে ঝোলানো তাদের ক্যামেরা, কারো টেপেরেকর্ডার। ঘোথ কমান্ড থেকে অবশ্যই নিয়মিত প্রেস ত্রিফিং দেয়া হচ্ছে। তারপরও সাংবাদিকরা চাইছেন আরো খবর, খবরের তথ্য পর্যন্ত জানতে। যুদ্ধের বাস্তব চিত্র সম্পর্কে অবহিত হতে। এর পাশাপাশি রয়েছে রাজনৈতিক নেতা ও তাদের দলীয় কর্মীবাহিনীর আনাগোনা। এ এলাকার নেতৃস্থানীয় রাজনীতিবিদরা আসছেন। তারাও যুদ্ধের খোজখবর নিচ্ছেন, ফিরে যাচ্ছেন। স্বাধীন বাংলা সরকারের প্রতিনিধি হয়েও আসছেন আনেকে এবং ফ্রন্টে লাইনের অবস্থা সরেজমিনে যাচাই করে তারা অস্থায়ী মুভিবনগর সরকারকে তা অবহিত করছেন। এর পাশাপাশি পাঠাচ্ছেন তারা ফ্রন্টের বিভিন্ন চাহিদা সম্পর্কেও বার্তা।

একেবারে জমজমাট অবস্থা জগদলহাটের। এর মধ্যে রাতের যুদ্ধের বিষয়ে চেহারা আর কাঁধে দোলানো হাতিয়ার নিয়ে ক্লাউট পদবিক্ষেপে হেঁটে আসতে দেখে আমাদের তিনজনকে জগদলের মানুষজন। সবার চোখে-মুখে কৌতুহল। শুন্দি আর ভালোবাসার মাখামাখি বিন্দু নীরের আপ্যায়ন।

হঠাতে সামনে থেকে সাদা চামড়ার উঁচু ঢাঙা মতোন একজন মানুষ এগিয়ে আসেন, 'হালো ইয়াংম্যান,' 'হালো সোলজার' বলতে বলতে। কিন্তু মতিন তাকে নো নো বাধা দেয়। ঢাঙা বিদেশী মানুষটি সে অবস্থাতেই তার ক্যামেরা দিয়ে ক্লিক ক্লিক ছবি তোলেন আমাদের। তার কোনো প্রশ্ন শোনা হয় না। জবাবও দেন্তে নেয় না। মতিন তাদের তাঁবুতে নিয়ে ঢেকায় আমদের।

হঠাতে করে এভাবে আমাদের পেয়ে ছেলেরা আশঙ্কে হৈচে করে ওঠে। ফ্রন্ট অভিযুক্তে এগুনোর সাথে সাথে বিজ্ঞিন হয়ে পড়ছে নেপুলন্সের ছেলেরা। বিভিন্ন প্রয়োজনে ফ্রন্টের পেছনে তাদের কাজে লাগানো হচ্ছে। সবক্ষেত্রে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করাই কঠিকর হয়ে উঠেছে। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে ক্ষমতার পেছনে থেকে বললেন, মাহুব তোমার কোম্পানির একটি সেকশন অস্থুক্ষেত্রে পাঠাও, তাদের প্রয়োজন, আর আমি একটা দলকে পাঠিয়ে দিলাম কমান্ডারের লিটেশন অনুযায়ী। এভাবেই মতিনদের পাঠাতে হয়েছে জগদলহাটের দায়িত্বে। তারা অনেকটা মিলিটারি পুলিশের দায়িত্ব পালন করছে এখানে।

অনেকদিন একসাথে ছিলাম আমরা। কতো বন-বাদাড়ে রাত-বিরাতে ঘুরে বেড়িয়েছি আমি এদের নিয়ে। সবাই আপন আর পিয় মুখ। এভাবে তাদের কাছে হঠাতে করে আসায় তারা কী যে খুশি হয়েছে, ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না। কী করবে, কী খাওয়াবে, কীভাবে আপ্যায়ন করবে। এসব নিয়ে ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠেছে সবাই একযোগে। দৌড়ে গিয়ে নিয়ে আসে একজন লেক্স আর পানামা সিগারেটের কয়েকটা প্যাকেট।

— সিগারেট পাবেন কুঠে সে তুমরালা যুদ্ধের সময়। লে যান, দেন হামার বন্ধুলাক....। ফ্রন্টের ছেলেদের জন্য ভালোবাসার উৎস উপহার তার কয়েক প্যাকেট সিগারেট। আবার দৌড়ে গিয়ে একজন কলা নিয়ে আসে। একজন বিস্তুট। দৌড়ায় কেউ চা-পানি আনতে। এই রকম অবস্থায় মতিনকে বলি, একটা সুই আর সুতো যোগাড় করে আনতে।

— কেনহে গে? মতিনের অবাক প্রশ্ন।

— দেখছিস না অবস্থা বলে মতিনকে প্যাকেটের তলদেশের অবস্থা দেখাই। হেসে ফেলে মতিন অবস্থাটা দেখে। বলে, সেলাই না করহিলে তো মাইনবে ইজ্জত দেখিবে গে। কথাটা বলে একটা লুঙ্গ এগিয়ে দেয় মতিন। তারপর একটা সুই আর সুতো যোগাড় করে আনে।

তাঁবুর মেঝেতে বসেছি। ছেলেরা ধিরে বসেছে আমাকে। ফ্রন্ট সমষ্টি নানা প্রশ্ন এদের। এরা যুক্তির মাঠে এসেও এখন যুক্ত করছে না'। পেছনে এরা নিয়োজিত অন্য কাজে। যুক্তির এবং যুক্তির বাইরের অন্য কাজে নিয়োজিত সৈন্যদের মধ্যে বিস্তর ফারাক। এটাই স্বাভাবিক। এদের সবার কথা তুমি। টুকটাক উত্তর দিই আর প্যান্টের ছেঁড়া ফাটল জোড়া দেবার জন্য সেলাইয়ের কাজ চালিয়ে যাই সুই-সুতো দিয়ে।

স্বাধীন বাংলা সরকারের প্রতিনিধি ফজলুল করিম

এ সময় এমপি ফজলুল করিম সাহেব আসেন সদলবলে। ভাবছিলাম প্যান্ট সেলাই শেষে সেটা পরেই তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাবো। কিন্তু তিনি নিজেই চলে এসেছেন আমাদের কাছে। আমরা যে এসেছি, খবর আশেই পৌছে গিয়েছিলো তাঁর কাছে। ফজলুল করিম সাহেব ঠাকুরগাঁও-এর একজন অন্যতম ব্যক্তিত্ব। উজ্জ্বল গৌরবর্ণের স্বাস্থ্যবান চেহারার মানুষ। এভাবে তাঁর আমাদের তাঁবুর ক্যাপ্সে আসার ফলে সত্যিই কিছুটা অপ্রস্তুত অবস্থার ভেতরে পড়তে হয়। উঠে দাঁড়াই সে অবস্থাতেই। হাসিমুরে এগিয়ে এসে তিনি হাত মেলান। জিগ্যেস করেন, কী করছেন?

— জি প্যান্ট সেলাই করছি।

— কেনো? জবাবে বেশ অবাকই হন তিনি। আর শ্বাস তার কেনোর জবাবে বলি, গতরাতের তালমা নদী পেঞ্চবার সময় ছিড়ে গেছে।

— আর প্যান্ট নেই?

— জি না।

কথাটা শুনে থমকে যান যেনো তিনি। কাহ কিছুক্ষণ নিরস্তর থাকেন আমাদের জাতীয় সংসদ সদস্য। তারপর হেসে তাঁবুর মেঝেতে বসতে বসতে বলেন, তাহলে তো মুশকিল খুব!

— না, কী আর এমন মুশকিল! তবে এ জন্যই দেরি হচ্ছিলো আপনার সাথে দেখা করতে যেতে। আপনি ডেকে পিঠেয়েছেন ফ্রন্ট থেকে। তাই জরুরিভাবে আসতে হয়েছে।

— জি হ্যাঁ, ফ্রন্টের প্রকৃত অবস্থা সমষ্টি জানা প্রয়োজন। মুজিবনগর সরকারের প্রতিনিধি হয়ে এসেছি আমি ফ্রন্টের প্রকৃত অবস্থা, মুক্তিযোদ্ধাদের অভাব-অভিযোগ আর অন্তর্পাতি সরবরাহের অবস্থা ইত্যাদি সম্পর্কে জানবার জন্য।

বিন্দু ব্রহ্মাবের মিষ্টিভাষী ফজলুল করিম সাহেবকে ভালো লেগে যায়। স্বাধীন বাংলা সরকারের প্রতিনিধি হয়ে তিনি এসেছেন আমাদের অভাব-অভিযোগ সম্পর্কে জানতে। ব্যাপারটা গভীরভাবে আন্দোলিত করে মনকে। মনে হয় যুক্তে শুধু আমরা একা নই, প্রবাসী সরকারের সবাই রয়েছেন আমাদের সাথে।

মতিন ছোটাছুটি করে এরি মধ্যে চা-নাস্তা যোগাড় করে ফেলে। করিম সাহেবের সাথে চা খেতে খেতে বর্তমান যুক্তির অঙ্গতি এবং ফ্রন্টের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। মন দিয়ে তিনি সব শোনেন। তার পাশে বসা একজন যুবক নেট বুকে টুকে নেয় আমাদের বলে যাওয়া সমস্যাদির কথা। সমস্যাতো আর একটা দুটো নয়। ভূরি ভূরি। স্বাধীন বাংলা সরকার এগুলোর কতোটুকু মেটাতে পারবে, জানি না। তবে মনে হয় কিছুটা হলেও মিটবার সংজ্ঞবন্দি নাকচ করে দেয়া যায় না। ফ্রন্টে সরাসরি গিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের কাছ থেকে অভাব-অভিযোগ শুনবার-জানবার এই যে উদ্দেশ্য, এই যে প্রয়াস, তার থেকেই মনে হয় কাজ হবে

অনেক। আলোচনার এক পর্যায়ে তিনি বলেন, আপনার কথা শুনেছি আমরা। আপনার কোম্পানি ফ্রন্টে খুব ভালো কাজ করছে। আপনাদের কম্বান্ডারও উচু ধারণা পোষণ করেন আপনার এবং আপনাদের কোম্পানি সমস্কে। এজন্যই আলোচনার জন্য ডেকে পাঠিয়েছি আপনাকে। সারাবাত যুক্ত করেছেন, তারপর এতোদূর হেঁটে এসেছেন নিচ্যাই কষ্ট হয়েছে খুব।

তিনি স্বীকৃতি দেন আমাদের ফ্রন্টের কাজের। যুক্তের মাঠে একজন সৈনিকের স্বীকৃতি ছাড়া আর পাবার কিছুই থাকে না। স্বভাবতই করিম সাহেবের কথায় মন ভরে ওঠে। তিনি আবার বলেন, আপনারা যুক্ত করছেন। কষ্ট করছেন। যুক্ততো সোজা ব্যাপার নয়! আপনাদের এই হিরোয়িক অবদানের কথা আমি অবশ্যই জানাবো আমাদের মুজিবনগর সরকারকে।

আমি কিছু বলি না। শুধু শুনে যাই তাঁর কথা। তিনি এরপর বলেন, এখন কী করতে পারি আমি? সব থেকে কী প্রয়োজন এখন আপনাদের?

মুখ ফসকে একবার তার প্রশ্নের জবাবে বলেই ফেলি, সুই আর সুতো। হেসে ফেলেন তিনি। উদার সে হাসি। তাঁবুর সবাই যোগ দেয় সেই হাসিতে। একটা নির্মল ভালোলাগার পরিবেশ বিরাজ করে তাঁবুর ভেতর।

— প্রয়োজন তো অনেক কিছু, হাসিটা যিতু হয়ে আসতেই আমি এবার বলি। তবে আপাতত গরম কাপড়চোপড় প্রয়োজন সব থেকে বেশি ফ্রন্টের ছেলেদের জন্য।

তিনি বলেন, সঙ্গে তেমন কিছু তো নেই। এগুলো আপনার জন্য রাখেন। আমি পরে অন্যান্য জিনিস পাঠানোর ব্যবস্থা করবো।

কথা সেরে ফজলুল করিম সাহেব পকেট হাততে কিছু টাকা বের করে হাতে ধরিয়ে দেন। ২/৩ জন কর্মী তাঁর গাড়ি থেকে নিয়ে আসে কিছু গরম কাপড়চোপড় আর কশুল। সেই সাথে কয়েকটা বিক্রুটের টিন। এগুলো তিনি এনেছেন আমাদের জন্য। সরকারের এই দান গ্রহণ করতে আমাদের ভালোবাসে জাগে। গর্বে ভরে যায় বুক। মনে হয়, না সরকার রয়েছেন আমাদের সাথে, সরকার রয়েছেন আমাদের জন্য। সীমিত সম্পদের মধ্যেও সরকার পাঠিয়েছেন যুক্তরত স্বাক্ষরাকাদের জন্যও স্বত্তেছ উপহার। প্রয়োজনের তুলনায় যদিও এগুলো অতি নগণ্য। তবু আমাদের কাছে তা অমূল্য উপহার বলেই মনে হয়।

করিম সাহেব একসময় বিদায় চান। উষ্ণ করমদনে তাঁর পরম আন্তরিকতা প্রকাশ পায়। যাবার সময় তিনি বলেন, লড়ে যান আপনারা। স্বাধীন হতে আমাদের আর দেরি নেই। দেখা হবে আবার। খোদা হাফেজ, জয় বাংলা।

— খোদা হাফেজ, জয় বাংলা বলে আমিসহ উপস্থিত আর সবাই তাঁকে বিদায় জানাই।

তার চলে যাবার পরও তাঁবুর ভেতর ভালোলাগার রেশটি বজায় থাকে। দুপুরে মতিন তাদের সাথে না থাইয়ে ছাড়ে না।

তারপর আবার ফিরে চলা ফ্রন্টের গন্তব্য অভিমুখে।

লে. মাসুদের সাথে বেকি মিশন

বিকেলে আবার ডাক আসে মাসুদের বাক্সার থেকে। গিয়ে দেখি তিনি একটি ছোটো দল নিয়ে প্রস্তুত হয়ে আছেন যুক্তের সাজে। আমাকে বলেন তিনি, মাহবুব আপনিও চলেন।

— কোথায়?

হালকা নির্ভর গলায় তিনি বলেন, চলেন না দেখে আসি এনিমির পজিশনটা। ব্যাটারা

দু'দিন থেকে আটকে রেখেছে এখানে। ফ্রন্টের এগুনো প্রয়োজন। তাদের একজাটি পজিশনটা লোকেট করতে হবে।

তার কথার জবাবে বলি, ওরাও তো কিছু করছে না। চৃপচাপ একেবারে।

— এটাই তো সমস্যা। একটা কিছু করা দরকার। চলেন দেখে আসি।

— একা যাবো, না ছেলে নেবো ক'জন।

— একাই চলেন। আমরা তো শুধু রেকি করেই চলে আসবো। এছাড়া ১০ জন তো নিয়েছিই সঙ্গে। ওয়্যারলেস সেট থাকছে। প্রয়োজন পড়লে সহায় চাওয়া যাবে।

এর কিছুক্ষণ পর রওনা দিই আমরা। ফ্রন্টের বাঁ দিক দিয়ে সামনে এগিয়ে যাই। অনেকটা ঘূরপথে প্রায় মাইল দেড়েক পথ মাড়িয়ে পাকবাহিনীর ডিফেন্স লাইনের দিক বরাবর সোজা এগতে থাকি। শীতের গড়নো বিকেল। নরম সোলালি রোদ। গ্রামের একটি মেঠোপথ দিয়ে এগিয়ে যাই। গ্রামের বসতগুলো চৃপচাপ, নিঃসোড়। দু'ফ্রন্টের মাঝখানে অর্ধাং যুক্তক্ষেত্রের মাঝখানে অবস্থান এ গ্রামগুলোর। যুদ্ধের সরাসরি ধার্কা এড়াবার জন্য হয়তো অনেকেই সরে গেছে দূরে নিরাপদ আশ্রয়ে। তবে একেবারেই জনবিবর নয় বসতগুলো। কিছু কিছু মানুষ রয়েই গেছে, তাদের সহায়-স্পন্দন পাহারা দেয়ার জন্য। বড়ো খুঁকি নিয়ে তারা আছে। বলা যায়, জীবনবাজি রেখেই। এমনি একজন লোকের সাথে দেখা হয়ে যায় আমাদের। পরনে লুঙ্গি, খালি গা, মুখে কুকুচ দাঢ়ি, বাবরি চুল মাথায়। লোকটিকে জিগ্যেস করতেই জানায়, শক্র অবস্থান সেই দেখিয়ে দিতে পারবে। সামনে শতিনেক গজ দূরে কয়েকটি বাড়ি নিয়ে ছোটো ফ্রন্ট দেখিয়ে সে বলে, ওইটে গেইলেই দেখিবা পারিহিমেন উমহার লাক। বাক্সার কবুল্লি উমহারালা বড়ো বড়ো।

লোকটিকে সন্দেহ করার কোনো কারণ নেই। তাকেই স্কট বানিয়ে সামনে এগতে বলে সন্তুষ্ণে তার পিছু পিছু হেঁটে চলি আকস্মাৎ।

গ্রামটির কাছে পৌছেই রাস্তার পুরুশ একটা মাঝারি গোছের পুরুর পাওয়া যায়। পুরুর পাড়ের আড়াল নিয়ে ছড়নো অবস্থায় এগতে থাকি। মাসুদের পেছনে ছায়ার মতো অনন্মসরণ করছে তরুণ বয়সী এক ওয়্যারলেসম্যান। পেশাদার সৈনিক নয় সে। মুক্তিবাহিনীতে যোগ দেয়ার পর তাকে ওয়্যারলেস অপারেটিং শেখানো হয়েছে। অত্যন্ত বিষ্ণু আর চালাক-চতুর ছেলেটি। মাসুদের নির্দেশে সে সেট অন করে হেড কোয়ার্টারের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছে।

রাস্তার বাঁ দিকে পুরুর। পুরুরপাড়ের ঢাল সংলগ্ন পথ ধরে এগিয়ে গিয়ে আমরা এক সময় গ্রামের একেবারে প্রান্তদেশে এসে পৌছাই। সামনে কিছুটা খোলামতো উচু ডাঙা জমি। বায়ে গ্রামবসতির শুরু। ডাঙা জমিটা পার হলেই বিস্তীর্ণ ফসলের মাঠ। শুধু ধান আর ধান। বিকেলের রোদে কাঁচা সোনা রঙ যেনো চিক্কিট করে। পুরুরের পাড় থেকে উঠে সামনের ডাঙা জমিটায় পা বাখতেই বাবরি চুলো লোকটি সামনে আঙুল তুলে ইশারা করে আমাদের। হ্যাঁ দেখা যায়। দুটো বাক্সার, পাকবাহিনীর। এখান থেকে কতোটা দূর হবে? প্রায় কোয়ার্টার মাইলের মতো দূরত্বে।

বাক্সারগুলোর অবস্থান উকিবুকি মেরে ভালো করে দেখার চেষ্টা করতেই ধী করে হঠাত এক বাঁক বুলেট ছুটে আসে আমাদের দিকে। উড়ে যায় সেগুলো মাথার ওপর দিয়ে আমগাছের এক রাশ পাতা ঝিরিয়ে। দ্রুত পেছনে এসে পুরুরের পাড়ে আড়াল নিয়ে অবস্থান নিই আমরা

দুর্জন। অঙ্গের জন্য বেঁচে যাই। শক্রপক্ষ নিচয়ই দেখে ফেলেছিলো আমাদের। টাগেটি ফেলেছিলো। কিন্তু দূরত্বের কারণেই সম্ভবত তাদের সেই টাগেটি লক্ষ্যভূষ্ট হলো।

এ ঘটনায় রীতিমতো উত্তেজিত হয়ে ওঠেন নায়েক। আমাদের সঙ্গী কট বাহি কমান্ডার। যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়ে তিনি তার সদস্যদের নিয়ে শক্রঘাটি আক্রমণের প্রস্তুতি ফুলি ছুঁড়বার উপকরণ করেন। জিটারিং পার্টিতে নায়েক তফসিলের ঘটনা মনে পড়িয়ে। তাদের এই প্রস্তুতির কথা। মাসুদকে তাই বলি, নিষেধ করেন ওদের। কেউ যেনো শুনি ছেড়ে। তাহলে এখান থেকে ফেরা মুশকিল হয়ে দাঁড়াবে।

মাসুদ পরিস্থিতি সহজেই হনুমঙ্গল করতে পারেন। তাই নিষেধ করেন নায়েক বা সঙ্গীদের শুলিগালা না ঢালাবার জন্য। চুপচাপ তায়ে থাকতে বলেন তাদের।

আমি মাসুদের পাশাপাশি তায়ে পড়ি যাসের ওপর। পেছন থেকে এগিয়ে অওয়ারলেসম্যান। তার কাছ থেকে স্পিকার নিয়ে মাসুদ হেড কোয়ার্টারে শক্র অবসম্পর্কে বার্তা পাঠাতে থাকেন। চোখে চশমা, হালকা-পাতলা গড়নের যুবক লে। মাঝ যুদ্ধের আগে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.এ পড়তেন। অর্থনীতিতে শেষ বর্ষের ছাত্র ছিলে এখন এই মুহূর্তে সেনাবাহিনীর একজন জুনিয়র অফিসার হিসেবে তিনি বার্তা পাঠাচ্ছেন। কোয়ার্টারে ক্যাপ্টেনের কাছে।

এগিয়ে গেল ফ্রন্ট

শীতের বিকেল দ্রুত ফুরিয়ে আসে। এন্দিক ভুমকে ঝুলে থাকে সাদা কুয়াশার আস্ত দ্রুত ফিরে আসি আমরা আমাদের ফ্রন্ট লাইনে। কিন্তু ফিরে এসে দেখা যায় ফ্রন্ট ল একেবারেই ফাঁকা। শুধু মাসুদের ছেজ কোয়ার্টারের সদস্যরা রয়েছে। তারা জানায়, এ এগিয়ে গেছে সামনে আধ মাইলটক ওপরে। আমরা রওনা দেয়ার অন্তিকাল পা কমান্ডারের নির্দেশে এগিয়ে ছিটাখাওয়া হয় ফ্রন্ট। কিন্তু ওয়্যারলেসে সেটা জানালো হয় আমাদের। শক্রপক্ষ আমাদের ওয়্যারলেসের বার্তা ইটারাসেপ্ট করতে পারে এই থেকেই সেটা চেপে যাওয়া হয়েছিলো, তা না হলে লে। মাসুদ সামনে, আমি সাম আমাদের দল এগিয়ে গেল, আর আমরা সেটা জানবো না কেনো?

মাসুদ ঘটপট তার হেড কোয়ার্টার শুটিয়ে নেন। আমরা এগিয়ে যাই সামনের লাইনের উদ্দেশে। রাতের অক্রকারের সাথে কুয়াশার ঘন চাদর নেমে এসেছে। আকা উজ্জ্বল চাঁদের আলো কেমন জ্বান হয়ে গেছে। আমরা ক'জন তার ভেতর দিয়ে অনুমতি ওপর নির্ভর করে এগিয়ে যেতে থাকি সামনে, আমাদের বক্স, সহযোগাদের উদ্দেশে।

প্রায় আধ ঘন্টার মতো হাঁটবার পর ফ্রন্টের দেখা মেলে। জায়গাটার নাম মলানী-শিংপা পুর-পচিমে ধনুকের মতো বাঁকানো একটা কাঁচা রাস্তাকে আড়াল হিসেবে ব্যবহার করে। তোলা হয়েছে দীর্ঘ ফ্রন্ট লাইন। এরি মধ্যে অবশ্য ট্রেক্স ও বাঙ্কার খোড়াপুড়ি করে সৈনিক অবস্থান নেয়ার কাজ সম্পন্ন হয়েছে। লম্বা এই ফ্রন্ট লাইনে আমাদের ছেলেদের অবস্থান ট করা একটা মুশকিলের ব্যাপারই। সুবেদার খালেক মাসুদের হেড কোয়ার্টারের জিথা নিয়ে তে আমি একটির পর একটি ট্রেক্স পার হই আর অনুচ্ছ স্বরে পিন্টু, বকর, মুসা এবং একবারু নাম ডেকে চলি। না, কোথায় ওরা, আর কোথায় ওদের সাড়া! অবশ্যে সেই সাড়া মেলে। লাইনের প্রায় মাঝামাঝি জায়গা পার হয়ে আসবার পর। এখানেই দেখা মেলে ছেলেদের

এখান থেকে পেছন দিককার বসতি পর্যন্ত জয়গা বরাদ্দ করা হয়েছে আমাদের দলের জন্য। প্রতিটা ট্রেঞ্চে ছেলেদের খৌজ নিতে নিতে এগিয়ে যাই। না, কোনো অসুবিধে নেই। অলোভাবেই তারা ট্রেঞ্চ তৈরি করে অবস্থান নিতে পেরেছে। সবাইকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিই। বারবার করে বলি, মাথা গরম করবে না কেউ। নির্দেশ ছাড়া ফায়ার অপেন করবে না কেউই।

লাইনের শেষ মাথায় বকরের দেখা যালে। ফিসফিসিয়ে সে জানায়, চমৎকার একটা রেডিমেড বাস্কার পাওয়া গেছে। একটা পরিত্যক্ত বাড়ির সামনের চতুরে বাস্কারটা। টিনের ঘরটা দেখেটোকে বোৰা যায় বাড়ির মালিক বেশ অবস্থাপন্ন লোক। যুক্তের এই গোলাওলির ডামাডোলের হাত থেকে বাঁচবার জন্য বাড়ির সামনে মাটির নিতে বেশ বড়োসড়ো এই বাস্কারটি তৈরি করেছিলেন তিনি। বাস্কারের ছাদ মোটা শক্ত কাঠ, বাঁশ, টিন আর উপরটায় পুরু মাটির আস্তরণ দিয়ে তৈরি। বাস্কারে চুক্বার মুখটাও বেশ বড়ো। মেরেটা পুরু খড়বিচালি বিছিয়ে নরম আর আরামদায়ক করা হয়েছে। বাস্কারে চুকেই মুখ দিয়ে আপনাআপনি বেরিয়ে আসে, বাহ ফাস ক্লাস!

পিন্টু বলে, হবে না, আমাদের বকর মিয়ার আবিকার। তারপর সে মুখ দিয়ে মনো-ম্যা এ ধরনের একটি অস্তুত শব্দ করে।

পিন্টুর রসিকতার মানেটা বোৰা যায় না। ওর দিকে চেয়ে হাসি মুখে জিগ্যেস করি, এটা আবার কি পিন্টু? পিন্টুর সেই স্বভাবসূলভ কৌতুক রসে ভুক্তবাব, আর কন না। সারা দিন শুধু ভ্যাজর ভ্যাজর। খালি মনোয়ারা আর মনো। আর জ্যো ছেলের গল্প। আর থাকি থাকি ম্যা, আবৰা, এই সব কথা বলে ছাড়ে দীর্ঘশ্বাস। কুম অসলাপালা হয়ে গোলো মাহবুব ভাই।

বুৰাতে পারি সারাদিন ফাঁক পেলেই বকস্তুচিয়া তার বউ-বাস্তা আর মা-বাপের গল্প শনিয়েছে পিন্টুকে ভালো শ্রোতা মনে করে। পিন্টুর এখানেই ভূল করেছে বকর। এখন পিন্টু তাকে মনো মনো বলে যে জালিয়ে থাকবে তার কথা নিশ্চিত করেই বলা যায়।

একটা হারিকেন জলছে বাস্কার করকর এটাকেও যোগাড় করেছে কোথাও থেকে। সেই হারিকেনের আলোতে বকর শিয়ালি অপ্রস্তুত মুখ দেখা যায়। পিন্টু আবার ডেকে ওঠে মনো মনো বলে। আমি তাকে থামিয়ে দিই। বকর লাজুক হেসে বাস্কার গোছগাছ করতে লেগে যায়। পিন্টুকে বলি তৈরি থাকতে। বলা যায় না আজ রাতেই হয়তো মুভমেন্টের অর্ডার আসতে পারে।

কিছুক্ষণ পরপর ট্রেঞ্চ লাইন পরীক্ষা করে আসতে হয়। ছেলেরা যাতে ঘুমিয়ে না পড়ে সে জন্য সবাইকে সাবধান করে দিতে হয় বারবার। প্রচণ্ড শীত পড়েছে আজ রাতে। খোলা ট্রেঞ্চে বসে হহ করে কাঁপতে কাঁপতে ছেলেরা জেগে থাকে। সামনে, একেবারে সামনেই শক্র অবস্থান। কখন বেধে যায় তুলকালাম যুদ্ধ, তার ঠিক নেই।

শক্রঘাট তালমাৰ পতন

ওয়াকিটকি সেটো ক্যাটেন আজ রাতেও একটা দল চেয়ে পাঠান। বাছাই করা শক্ত-সমর্থ ছেলেদের নিয়ে ১৫ জনের একটা দল পাঠাতে হবে আবার মেজর শৰ্মাৰ কাছে। আজ রাতে তার বি.এস.এফ বাহিনী তালমা দখলে চূড়ান্ত চেষ্টা করবে।

মতিয়ার আর বাবলুসহ বাছাই করে ১৫ জনকে তুলে আনি ট্রেঞ্চ থেকে। তাদের ব্রিফিং দিই খুবই সংক্ষেপে। গতরাতের মতোই আজ রাতেও বি.এস.এফদের নিয়ে যেতে হবে

তালমা। তালমা দখলের চূড়ান্ত যুদ্ধ হতে পারে আজ রাতে। বি.এস.এফ. বাহিনীর সাথে সামানভাবে লড়ে যেতে হবে এ যুদ্ধ। মতিয়ারকে দলটির কমান্ডার বানিয়ে তাদের রওনা করিয়ে দিই রাত ১০টার দিকে। গত রাতে পরিচিত রাস্তা ধরে ওরা ঠিক ঠিক চলে যেতে পারবে। এ বিশ্বাস আমার আছে। ক্যাটেন সেটে আবার জানতে চান দলটা গেছে কি না। জানিয়ে দিই তাকে তারা গেছে বলে। তিনি রাতের যে-কোনো পরিস্থিতির জন্য সবাইকে সর্বক্ষণ থাকতে বলেন। বলেন সেটা বারবার করেই।

রাত ১২টার পর শুরু হয় তালমার যুদ্ধ। গোলাগুলির ড্যাবহ তাখবতা ভেসে আসে। ডান দিক থেকেও গোলাগুলি ভেসে আসে। দূরে, সম্ভবত পঞ্জগড়-রহিয়া লাইনের দিকেও সংঘর্ষ চলছে। গোলাগুলির প্রচণ্ড শব্দ ভেসে আসছে সেদিক থেকেও। তবে আমাদের ফ্রন্ট লাইন অঙ্গুষ্ঠভাবে চূপচাপ। সম্ভবত ডানে-বায়ে প্রবল চাপ সৃষ্টি করার ভেতর দিয়ে শক্তির ডিফেন্স লাইনে ফাটল ধরানোর চেষ্টা চলছে। সেটা হয়ে গেলেই পঞ্জগড়ের সামনাসামনি আমাদের মূল ফ্রন্ট লাইনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে চূড়ান্ত আক্রমণের জন্য। মূল আক্রমণকারী দল হিসেবে পাকবাহিনীর শেষ প্রতিরোধের ওপর চূড়ান্ত আঘাত হেনে দখলে নিতে হবে আমাদের পঞ্জগড়।

সারাটা রাত কেটে যায় যুদ্ধের প্রচণ্ড শব্দের মধ্যে। সামনে এগুবার নির্দেশ আসে না শেষ পর্যন্ত। তবে খুব সকালেই খবর আসে তালমা দখল হয়ে গেছে। সকাল আটটার দিকে ফিরে আসে মতিয়ার তার দলবল নিয়ে। আনন্দে ঝুঁক্স-বন্যা বয়ে যায় ফ্রেঞ্জুড়ে। তালমা দখলের লড়াইয়ে বিজয়ীর বেশে ফেরা দলটাকে সেমাই উষ্ণ অভ্যর্থনা জানায়।

আজ নভেম্বরের ২৮ তারিখ। পকেট থেকে মোচ-ইটা বের করে বাড়ির সামনের বড়ো আমগাছটার গুড়িতে হেলান দিয়ে বসি সূর্যের স্ক্রিনের দিকে মুখ করে। আর ডায়ারিতে লিখি এই কথাগুলো :

২৮শে নভেম্বর '৭১

মলানী শিংপাড়া।

“কাল রাতে ডিফেন্স এগিয়ে এসেছে আরো এক মাইলের মতো। *Special Guerilla Party* হিসেবে আমাদের কিছু ছেলেকে নিয়ে আলাদা group করা হয়েছে। যে-কোনো ধরনের *Operation*-এর জন্য engage রাখা হয়েছে আমাদের। সবাই নাম করছে groupটার। কাল তালমা অপারেশনের জন্য আমাদের ছেলেরা গিয়েছিলো। মতিয়ার *Lead* করেছে সমস্ত *Party*। Successfully *Operation* করেছে ওরা। তালমা দখল করেছে ওরা।”

সুবেদার খালেক- শুভলাপরায়ণ বানু সৈনিক

সারাদিন তেমন কোনো কাজ থাকে না। শুয়ে-বসে-ঘুমিয়ে কেটে যায় দিন। এর ভেতরেই ছেলেরা নিজেদের ট্রেক্স ঠিকঠাক, মজবুত করে আর হাতিয়ারগুলো পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে। সুবেদার খালেক আসেন দুপুর ১২টার দিকে। টেনগানটা পিঠের দিকে কিছুটা বাঁকিয়ে, বাঁকাধে ঝুলিয়ে, গায়ে খাকি শার্ট, পরনের লুঙ্গিটা বাঁ হাতে উঁচু করে ধরা অবস্থায়, তাঁর নিজস্ব টাইলে হনহনিয়ে আসেন ভদ্রলোক। মুখে সেই পরিচিত আপন হাসি।

সুবেদার খালেকের সাথে এরি মধ্যে দারকণ খাতির হয়ে গেছে। একেবারে দাদু-নাতির

সম্পর্ক। এ বয়সেও অফুরন্ত কর্মশক্তি লোকটার। বুকজোড় তার অতুলনীয় সাহস। একজন ঝানু সৈনিক তিনি। যুদ্ধের ট্র্যাটোজি তিনি অসম্ভব ভালো বোঝেন। কখন কীভাবে দলকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে, কখন থামতে হবে, ফ্রন্ট লাইন কোথায় হবে, এসব ব্যাপারে সিদ্ধান্ত দেন তিনি নির্বুত্তভাবে। নিজের কোম্পানি পরিচালনার পাশাপাশি নানাভাবে উপদেশ দিয়ে সাহায্য করেন আমাদের দল পরিচালনায়। লেফটেন্যান্ট মাসুদের হেড কোয়ার্টার পরিচালনায় সর্বত্তোভাবে সাহায্য করছেন সুবেদার খালেক। তার প্রত্যক্ষ সাহায্য ছাড়া নবীন অফিসার মাসুদের পক্ষে ফ্রন্ট পরিচালনার ব্যাপারটা দারুণ কষ্টকর হয়ে দাঁড়াতো।

পিন্টু বাঙ্কারে শয়ে তখন গলা খুলে গাইছিলো, “খোলো খোলো দার, রাখিও না আর, বাহিরে আমায় দাঁড়িয়ে ...” সুবেদার খালেককে দেখে তার গান থেমে যায়। বাঙ্কারের ভেতরে উকি দিয়ে উদার গলায় তিনি বলেন, পিন্টু দাদু গান গাইতে আছিলেন নি? যাই কল গলাটা আপনার মিড।

— কিন্তু আপনি তো গান পছন্দ করেন না দাদু।

— কেড়া কইলো? হ সেস? আই গান হচ্ছে কইত্তান্নো কিলাই? তয় যুদ্ধের মইধে গান করা ঠিক না, এই জন্য নিষেধ বুইজ্জেননি।

আসলেও কিন্তু দারুণ আমোদপ্রিয় তুখোড় রসিক আর আড়তাবাজ মানুষ খালেক সাহেব। যুদ্ধের তাংশ্বলীলার মধ্যে যেখানে নিজের অতিকৃত বাঁচিয়ে বন্ধুজন্ম মরণপণ সঞ্চাম, সেখানে সুবেদার খালেক একজন বলিষ্ঠ কমান্ডার। তার চেহারা ক্ষেত্রবার্তা আর ব্যবহারে তখন ফুটে ওঠে ব্রাবরই এক রং কাঠিন্য, ঝক্ষতা আর নিষ্ঠুরতা। একজন কঠোর ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ তিনি তখন, কঠোর শৃঙ্খলাপরায়ণ একজন সৈনিক। কিন্তু যুদ্ধ যখন থাকে না, আর যখন থাকে কমইন অলস অবসর, তখন ব্যক্তি সাজাকের আসল রূপ ফুটে ওঠে। তিনি চলে আসেন তখন আমাদের লাইনে। মন খুলে গঞ্জ করার জন্য। নিজের ইউনিটের মানুষজনের সঙ্গে তিনি মন খুলে কথা বলতে পারেন না, স্বতন্ত্র সেখানে তিনি সে রকম পরিবেশ পান না বলেই।

আজো হয়তো তেমনি এসেছেন। বাঙ্কারের সামনে রোদের মধ্যে ছড়ানো খড়ের গাদায় আমরা বসে পড়ি খালেক সাহেবকে নিয়ে। পিন্টু তার সামনে এগিয়ে ধরে পানামা সিগারেট। বকর এগিয়ে দেয় ধূমায়িত চা আর ফজলুল করিম সাহেবের দেয়া চিনজাত সেই বিস্তুট। অল্লাস্পের ভেতরেই জমে ওঠে জোর আড়ো। আর তারই সূত্র ধরে সুবেদার আপন মনে বলে চলেন নোয়াখালী জেলার অন্তর্ভুক্ত তার নিজের গ্রামের গল্প। নিজের স্ত্রী-পুত্র-কন্যা আর আচীয়স্বজনের কথাও বলেন। দীর্ঘ চাকরি জীবনের অনেক সময় তার কেটেছে পশ্চিম পাকিস্তানে। সেখানকারও নানা অভিজ্ঞতার কথা বলেন তিনি। ই.পি.আর একাডেমিতে তার ইন্স্ট্রাক্টর জীবনের গল্পও বলেন। আমরা শুনি তাঁর বিচিত্র আর বর্ণাদ্য চাকরি জীবনের কথা। বঙ্গবন্ধুর ডাকে কীভাবে দিনাঙ্গপুর ও ঠাকুরগাঁওয়ের ই.পি.আর.দের সংগঠিত করে তাদের নিয়ে বিদ্রোহ করিয়েছেন, দখল করেছেন অন্তর্ভুক্ত ভাগীর, আবাঙালি অফিসার আর জোয়ানদের কীভাবে নিরন্তর করেছেন, বলেন সেসব কথা। সবশেষে আসে বর্তমান ফ্রন্ট সম্পর্কে আলোচনা। নানা ধরনের ফোর্স এসে জুটেছে ফ্রন্টে। ডিসিপ্লিন রাখা মূশকিল হয়ে যাচ্ছে। যুদ্ধে, বিশেষ করে আজাডাস করার যুদ্ধে ডিসিপ্লিন হচ্ছে বড়ো জিনিস। কিন্তু সেটাই রাখা যাচ্ছে না, আর এ নিয়ে যে তিনি অসম্ভব চিহ্নিত, সে কথাও উল্লেখ করেন। সবশেষে আমার আর পিন্টুর দিকে তাকিয়ে তিনি বলেন, দাদু আপনের কিন্তু ছেলেদের টাইট দিয়ে রাখছেন। আপনাদের দলের ডিসিপ্লিন

চোখে পড়বার মতো। আর আস্তো ন কিলে, যে মাইরড দিলেন দাদু আপনে পোলাডারে!

সুবেদার সাহেব গতকাল সকালবেলার ঘটনাটার প্রসঙ্গ টেনে এনেছেন বুঝতে পারি। শিংপাড়া ফ্রন্ট লাইনের সব ক'জন যোদ্ধাকে রাতের বেলা কোনোরকম গুলি ছুঁড়তে নিষেধ করা হয়েছিলো। কিন্তু আমাদের তরঙ্গ বয়সী ছেলে মশিউর এ নিষেধাজ্ঞা ভঙ্গ করেছিল। রাতের বেলা ট্রেসার রাউন্ড দিয়ে গুলি করলে তা জ্বলতে জ্বলতে উড়ে যায়। এটা সে জগদলের যুক্তি দেখেছে। তার কাছে ট্রেসার রাউন্ডও ছিলো বেশ কিছু। রাতের ট্রেক্সের পাহারাদারিতে থাকবার সময় সে নিজেকে সামলে রাখতে পারে নি। জ্বলত ট্রেসার রাউন্ডের উড়ে যাওয়ার দৃশ্য দেখবার জন্য সে দুম করে ফায়ার করে বসে। ফলে পুরো ফ্রন্ট লাইন সচকিত হয়ে ওঠে। পাশের ট্রেক্সের ছেলেরা তাকে বাধা দিয়ে থামিয়ে দিয়েছে। সে আর গুলি ছোঁড়ে নি। কিন্তু সকাল হতেই নালিশ নিয়ে এসেছিলেন সুবেদার খালেক। নিষেধাজ্ঞা থাকা সঙ্গেও সেটা ভাঙা হলো কেনো চার্জ করার ভঙ্গিতে জানতে চান তিনি। তালমা যুদ্ধ থেকে ফিরে এসেছি এ ঘটনার মাত্র কিছুক্ষণ আগে। সুবেদার খালেকের চার্জের ভঙ্গিতে কথা বলার ধরনটা সেই তখন মাথায় আগুন ধরিয়ে দিয়েছিলো। ট্রেক্স থেকে তুলে আনতে বলি ছেলেটাকে। একরামুল হিড়হিড় করে তাকে টেনে আনে। আর আনতেই সঙ্গে সঙ্গে বাঁশের একটা কঁকিং দিয়ে সামনে বেধড়ক পেটাতে থাকি ছেলেটাকে। আর বলতে থাকি, বল হারামজাদা, আর করবি এমনটা কখনো? ছেলেটি কেঁদেকেটে একাকার হয়ে পা ধরে মাফ কর্তৃপক্ষ সেই মারার দৃশ্যটা সুবেদার খালেক তখন দেখেছিলেন, ঠাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। তার নালিশের বিচার যে তাৎক্ষণিকভাবে হবে এবং সেটা এ ধরনের পিটুনি দিয়ে, সে কয়ে কিম্বা তাবতেই পারেন নি। সেই ঘটনার উল্লেখ করেই তিনি এই এখন বলেন, আসলে ডিসিপ্লিন এভাবেই রাখতে হয়। সারা ফ্রন্টে এই ঘটনার কথা প্রচার হয়ে গেছে। তাই কথাসূচিশোনার ফলে এই শারীরিক শাস্তি দিয়ে দলের ডিসিপ্লিন ঠিক রাখার ব্যাপারটা উদাহরণ কর্তৃত প্রায় প্রত্যেকের মুখে মুখে আলোচিত হচ্ছে।

সুবেদার আরো বলেন, যুদ্ধের প্রথমদিন পর্যন্ত এভাবেই ডিসিপ্লিন রাখতে হবে দাদু। যুদ্ধের বাইরেও তো ডিসিপ্লিন উভয়কার। যুদ্ধের মাঠে ডিসিপ্লিনের এই শিক্ষা সারা জীবন কাজে লাগবে এটা মনে রাখবেন।

আড্ডার আসরটা একসময় ভাঙে। যাবার সময় সুবেদার আমাকে আর পিটুকে আলাদাভাবে ডেকে নিয়ে ফিসফিসিয়ে বলেন, আইজ রাইতে তৈরি থাকবেন দাদুরা। কিছু একটা ঘটতে পারে। অর্ডার আসতে পারে যে-কোনো সময় আড্ডাসের, বুইজ্জন নি!

মাথা নাড়ি আমরা। আর খোদা হাফেজ জ্য বাংলা বলে বাঁ কাঁধে ঘোলানো টেনগানটা পিঠের দিকে ঠেলে ধরে নিজস্ব স্টাইলে হেঁটে চলে যান তিনি তার লাইনের দিকে।

এগিয়ে যায় মিত্রবাহিনীর অকুতোভয় তরঙ্গ অফিসার

শীতের রাত ঘপ্প করে নেমে আসে। ফ্রন্ট জুড়ে নিসৌম নীরবতা। কিন্তু ট্রেক্সবাসী যোদ্ধাদের এর ভেতরেই তৈরি করে রাখা হয়। সদা প্রস্তুত অবস্থা। যে-কোনো সময় আসতে পারে মুভ করার অর্ডার। সম্মুখবর্তী শক্ত অবস্থান দখল করার জন্য তখন এগিয়ে যেতে হবে সবাইকে অন্ত বাগিয়ে ধরে। তাই সবকিছু বাঁধাচাদা করে যোদ্ধাদের সবাই তাদের হাতিয়ারসহ খোলা ট্রেক্সের ভিজে মাটির ওপর দাঁড়িয়ে থাকে। সতর্ক দৃষ্টি তাদের সামনে। আজ রাতে কিছু একটা ঘটবে। কিন্তু কী ঘটতে পারে, বুঝতে পারি না।

ছাউনিবিহীন খোলা ট্রেঞ্চ। আকাশ থেকে হিম ঝরে। বাতাস হিমালয়ের দিক থেকে বয়ে আসে কলকনে ঠাণ্ডা। শরীরে পরিধেয় কাপড়চোপড়ের বর্ষ সেই ঠাণ্ডাকে ঢেকিয়ে রাখতে পারে না। গায়ের ওপরকার বস্ত্রবর্ম ভেদ করে ঠাণ্ডা ঢুকে হাড়সুন্দ কঁপিয়ে দেয়। জমে যাওয়া এই রকম অবস্থায় কেউ জরুরিব হয়ে বসে থাকে, কেউবা দাঢ়িয়ে থাকে ট্রেঞ্চের ভেতরে। উষ্ণতা, একটুখানি উষ্ণতার জন্য মনের গভীরে চলে তৈরি আকুলিবিকুলি। এর মধ্যে ভারবাহী লোকজন খাবার নিয়ে আসে। প্রয়োজন অনুযায়ী অতিরিক্ত গোলাবারুদ পৌছে দেয়া হয় ট্রেঞ্চে ট্রেঞ্চে। ওয়্যারলেস এবং ওয়াকিটকি সেটে কমাত্তরের আদেশ-নির্দেশ আর সতর্কবাণী ভেসে আসে বারবার। কিন্তু সেই ইঙ্গিত মুভমেন্টের নির্দেশ আসে না।

ক্রমশ রাত বাড়ে। টুপটোপ করে বুয়াশার পানি ঝরে পড়ে গাছগাছালির লতাপাতা থেকে। বাঙ্কারে অপেক্ষার ঝাঁপ্তি নিয়ে শয়ে থাকি। সমস্ত নারুত্ব টান টান হয়ে থাকে উজ্জেন্নায়। ঠিক সেই সময়, এই রকম মুহূর্তে, রাত তখন প্রায় এগারোটা, ওয়াকিটকিতে ক্যাট্টেনের গলা ভেসে আসে। তিনি চৌক্ষ ছেলেদের নিয়ে একটা সেকশন তৈরি রাখার নির্দেশ দেন। মিত্রবাহিনীর একটা দল যাবে সামনে। তাদের সাথে দিতে হবে আমাদের তৈরি করা সেকশনটিকে। একরামুলের নেতৃত্বে ১২ জনের বাছাই করা ছেলেদের নিয়ে তৈরি করি সেকশনটা। ট্রেঞ্চ থেকে তুলে এনে তাদের স্ট্যান্ডার্ড রাখি আমার বাঙ্কারের পাশে। রাত ১২টার দিকে কম বয়সী একজন লেফটেন্যান্টের সঙ্গে আসে মিত্রবাহিনীর একজন প্রাইনেট। বাঙ্কারে বসে বসেই লেফটেন্যান্ট মুবকটির সঙ্গে কিছুক্ষণ আলোচনা হয়। তাদের সামনে যাবার ব্যাপার নিয়ে। গতরাতে তালমা দখল হয়ে গেছে। শক্রা পিছিয়ে একটু পক্ষগত শহর রক্ষার সর্বশেষ প্রচেষ্টা হিসেবে তাদের প্রথম ডিফেন্স লাইনে সমবেত লেফটেন্যান্টের নেতৃত্বে প্রাইনেট সামনে এগিয়ে তালমা-পক্ষগত সড়ক ধরতে চায়। এটা শক্রা করতে চায় ডানদিককার পাকবাহিনীর মূল ডিফেন্সকে পাশ কাটিয়ে। তালমা দখলে একজা বাহিনী সেখানে থেকে এগিয়ে আসবে সড়ক পথে পক্ষগড়ের দিকে। আর এরা এগিয়ে আসবে এদিক থেকে। তারপর তারা যৌথ শক্তিতে তালমার দিকে মুখ করে থাকা পাকবাহিনীর ডিফেন্স লাইনকে বেক ফ্রি বা ফাটল ধরানোর চেষ্টা করবে।

একরামুলকে ডেকে লেফটেন্যান্টের সাথে তাকে পরিচয় করিয়ে দিই। তার কাজ হবে মিত্রবাহিনীর দলটাকে গাইড করে নিয়ে যাওয়া এবং তাদের সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা। একরামুলকে বুঝিয়ে দিই ব্যাপারটা ভালোভাবে। ওরা সদলবলে রওনা হয় সামনে। শুধু বাই বলে তরুণ বয়সী লেফটেন্যান্ট তাঁর দলের সাথে এগিয়ে যান। কেনো জানি এগিয়ে যাওয়া ওই তরুণ অফিসারটির জন্য যায়া লাগে। ভিন্ন দেশী, একেবারে ছেলে মানুষ চেহারার অফিসারটি এই মধ্যরাতে কীভাবে এগিয়ে গেল যুদ্ধের দিকে অকুতোভয়ে! যুদ্ধটা তাদের নয়। কিন্তু তবুও সে এগিয়ে গেল।

শুরু হয় পক্ষগত দখলের যুদ্ধ

যাইহোক, মধ্য রাতের পর যুদ্ধক্ষেত্রের পরিস্থিতি পাল্টে যেতে শুরু করে। পক্ষগড়ের দক্ষিণ দিক থেকে ঘড়ঘড় শব্দ তুলে ভারি কিছু যানবাহনের চলাচল শুরু হয়। সেই সাথে শুধুম শুধুম কামান দাগানোর শব্দ হতে থাকে। ট্যাক্সের শব্দ কি? মিত্রবাহিনী কি তাহলে ট্যাক্স নামিয়েছে? না পাকবাহিনী ব্যবহার করছে তাদের ট্যাক্স? বোঝা যায় না কিছুই। তালমার দিক থেকেও গোলাগুলির শব্দ হতে থাকে। আমাদের ফ্রন্ট লাইনের ডান দিককার পাক

সড়কের ওধার থেকেও গোলাগুলি শুরু হয়। রাত দুটোর পর শুরু হয় ভয়াবহ গোলন্দাজ আক্রমণ। মুক্তিবাহিনীর মুজিব ব্যাটারিসহ মিত্রবাহিনীর সবগুলো আর্টিলারি পোস্ট থেকে শেল বর্ষণ শুরু হয় একযোগে। পঞ্চগড়কে কেন্দ্র করে শুরু হয় দক্ষফজ্জল, বিক্ষেপণের পর বিক্ষেপণের ভয়াবহ শব্দস্মৃত রাতের নিষ্ঠকৃতাকে বিনীর্ণ করে পুরোপুরি। পঞ্চগড় দখলে রাখা পাকবাহিনীরও প্রতিউত্তর আসে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই। কিন্তু সেগুলো তেমন জোরালো নয়। বোঝাই যায় তারা পারছে না পরিস্থিতি সামাল দিতে। সবদিক থেকে হানা হচ্ছে তাদের ওপর মরণ ছোবল। বেসামাল হয়ে উঠেছে তাদের অবস্থা।

রাত তিনটোর দিকে নির্দেশ আসে ফায়ার ওপেন করবার। সাথে সাথে গর্জে উঠে পুরো ফ্রন্ট। ট্রেঞ্চবাসী যোদ্ধাদের হাতিয়ার থেকে গোলাগুলির ফুলবুরি ছুটতে থাকে সামনের দিকে। পাকবাহিনীও সরব হয়ে উঠে। কিন্তু বিগত দিনগুলোর তুলনায় তাদের ফায়ার পাওয়ার আজ অনেক কম। তবে একটা মেশিনগান অঙ্ক আক্রোশে গজরাতে থাকে তাদের প্রতিরক্ষা লাইন থেকে। গোলন্দাজ আক্রমণের পাশাপাশি চলছে আমাদের ফ্রন্ট লাইনের আক্রমণ। আজকের আক্রমণের ধার অন্যান্য দিনের তুলনায় অনেক বেশি। এর মধ্যে সুসংহত হয়ে উঠেছে আমাদের পুরো ফ্রন্ট। গোলাবারুদের কমতি নেই। সরবরাহ এসেছে প্রচুর। এছাড়া বিগত দু'দিন ট্রেঞ্চে অলস সময় যাপন করবার পর শুলিবর্ষণের সুযোগ পেয়েছে ট্রেঞ্চবাসী যোদ্ধারা। ইচ্ছেমতো অনবরত শুলি ছাটিয়ে চলেছে যার যা হাতিয়ার আছে, তাই দিয়ে। আজ পাকবাহিনীর দিক থেকে ট্রেঞ্চ গোলন্দাজ আক্রমণও নেই। ট্রেঞ্চ-বাক্সারের পেটগুলো সেই আক্রমণের আঘাতে তচনচ কিম্বু ধূংসের কিনারে পৌছে যায়।

আমাদের দিক থেকে গোলন্দাজ আক্রমণ একসময়ে কমে যেতে থাকে। তবে একেবারে থেমে যায় না। বিচ্ছিন্নভাবে থেমে থেকে চলতেই থাকে আর্টিলারি মার্টারের আঘাত। রাত সাড়ে তিনটার দিকে শক্তির তরঙ্গ থেকে শুলিবর্ষণ বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু আমাদের ফ্রন্ট লাইন সজাগ-সক্রিয় থাকে অস্থির মতোই। রাত চারটার দিকে শুলিবর্ষণ বন্ধের নির্দেশ আসে। থেমে যায় ফ্রন্ট লাইন। নীরব-নিখর হয়ে যায় সবকিছু। কিন্তু পঞ্চগড়ের পেছন দিক থেকে একটানা ঘড়ঘড় আওয়াজ ভেসে আসতেই থাকে। মাঝে মাঝে শব্দ হতে থাকে শুড়ুম শুড়ুম। তালমার দিক থেকে ফুটফাট শব্দে বিচ্ছিন্নভাবে গোলাগুলি চলে। গোলন্দাজ আক্রমণ থেমে যায় একেবারেই।

সিও অফিস দখল, পঞ্চগড়ের উপকর্ত্তে উপস্থিতি

এর অল্পক্ষণ পরেই আসে মুভমেন্ট অর্ডার। সামনে শক্তির ডিফেন্স লাইনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে শুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে। অর্ডার পাওয়া মাত্র সবাই ট্রেঞ্চ-বাক্সার ছেড়ে লাফিয়ে বের হয়ে আসে। পুরো ফ্রন্ট অ্যাডভাক্স করার ভঙ্গিতে এগিয়ে চলে। শিশির ভেজা ধানখেতের ভেতর দিয়ে এগিয়ে হয়। কখনো দাঁড়িয়ে, কখনো বসে, কখনো-বা শয়ে থেকে, থেমে থেমে এগিয়ে যাবার প্রক্রিয়া চলে ধীর সতর্কতার সঙ্গে। পঞ্চগড়স্থ পাকবাহিনীর মূল প্রতিরক্ষা লাইন দখলের দায়িত্ব বর্তেছে আমাদের ওপর। সিও অফিসে তাদের মূল ঘাঁটি। সেটাকে কেন্দ্র করে দু'পাশে বিস্তৃত হয়েছে তাদের ট্রেঞ্চ-বাক্সারের প্রতিরক্ষা লাইন। আমরা সিও অফিসে স্থাপিত তাদের মূল ঘাঁটি দখলের জন্য এগিয়ে চলেছি।

শুবই কষ্টকর আর বিপজ্জনক আমাদের এই অধ্যাত্ম। রাতের বেলা শক্রঘঁটির দিকে এগিয়ে যাবার সময় থাকে ভয়ানক অনিষ্টয়তা। দিনের বেলা হলে দেখেওনে এগনো যায়। কিন্তু রাতের বেলা এগনোর ব্যাপারটা অনেকটা অঙ্গের মতোই। এরকম ক্ষেত্রে শক্র সুযোগ বেশি। নিজেদের নিরাপদ অঞ্চলে থেকে তারা অঞ্চলামী বাহিনীকে তাদের শুলির পাল্লায় ফেলে দিতে পারে আর ঝাড়ে-বংশে কলাগাছ ফেলার মতো করে শুইয়ে ফেলতে পারে। আর এভাবে তারা ঘটিয়ে ফেলতে পারে ভয়াবহ সর্বনাশ। এ ধরনের একটা বিপদের ঝুঁকি সামনে ঝুলিয়ে আমরা এগিয়ে চলি। শুলি ছাঁড়ি শক্র অবস্থান লক্ষ্য করে। আমরা জানি এই রকম শুলির মুখে তারা রিয়াষ্ট করতে বাধ্য। এজন্য শুলিবর্ষণের সাথে সাথে উয়ে পড়ি, ভিজে ধানগাছে শরীর জড়িয়ে, স্যাতসেতে মাটিতে। পুরো ফ্রন্টটাই এগোয় ঠিক এইভাবে। তবে পাকবাহিনীর প্রতিরোধের আলামত টের পাওয়া যায় না।

ধীরে ধীরে রাত ফুরিয়ে আসে। পুবের আকাশ ফর্সা হয়ে আসে। সামনে সি.ও. অফিসের লম্বা দোতলা দালান ঘর আর শাদা রঙের হল রুমটি দৃষ্টিতে ধরা পড়ে। বেশি দূর হবে না, একশো থেকে দেড়শো গজের মধ্যে। পেছন থেকে কমান্ডারের নির্দেশ আসে, দ্রুত এগিয়ে যাও, দখলে নাও সি.ও অফিস।

এরপর আর অপেক্ষা নয়। শুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে ছুটে চলি সি.ও. অফিসের দিকে। এখন আর অন্য কোনো চিন্তা নেই। ভয়ভীতির কোনোরকম অন্তর্ভুক্তি এসব কোথায় উবে গেছে। একটাই মাত্র লক্ষ্য এখন সি.ও অফিস দখল করা। শুলিশুল করে ছুটে যায় মুক্তিযোদ্ধার দল। এখন শক্র ডিফেন্স লাইন দখলে নিতে হবে, আর কোনো দ্বিতীয় ভাবনা নেই।

পৌছে যাই সি.ও অফিসে। দ্রুত পজিশন নেই হলরুম সংলগ্ন ভিজে ঘাসের ওপর। চারদিকে ট্রেকিং আর বাক্সারের সারি। দোতলায় ছাদের ওপর, হলরুমের ছাদের ওপর বালির বস্তা দিয়ে বানানো ৩/৪টি বড়ো বাক্স। তাতে মেশিনগান চালিয়েছিলো পাকবাহিনী সঞ্চার ওখান থেকেই। ছেলেদের বলি হচ্ছে বাক্স ট্রেকিংগুলো চার্জ করতে। ওরা দ্রুত সে কাজ করতে থাকে। না, শক্রসেনা নেই। তাদের সবাই পালিয়েছে। সঞ্চার কিছুক্ষণ আগেই। তড়িঘড়ি করেই এ কয়োটি করেছে তারা। তাই তারা ফেলে গেছে তাদের আনুষঙ্গিক বা প্রয়োজনীয় প্রায় সবকিছুই। শুধু হাতিয়ারগুলো সাথে নিয়ে গেছে। পুরো সি.ও অফিস আর তার আশপাশে তন্ত্রন্ত্র করে দেখা হয়। না শক্র উপস্থিতি বা অবস্থান নেই কোথাও।

যাইহোক, সি.ও অফিস আমাদের দখলে চলে আসে। মনের আনন্দে বাবলু শ্রোগান ধরে ‘জয় বাংলা’। আর সেই শ্রোগান ধ্বনিত হবার সঙ্গে সঙ্গে মুখরিত হয়ে ওঠে সবে দখলকরা সি.ও অফিসের প্রাঙ্গণ। আর তারি ফাঁকে দেখি পাকবাহিনীর ফিল্ড টেলিফোনের বিক্ষিণ্ডাবে ছড়ানো-ছিটানো তার। হলরুমের সামনে তাদের সকালের আহারের জন্য রান্না করা বড়ো বড়ো ডেকচিতে রাখা বিরিয়ানি জাতীয় খাদ্য। চুলোয় তখনো জুলছে কাঠ। তাদের রান্নাবানার ব্যাপারটা প্রায় শেষ হয়ে এসেছিলো, কিন্তু থেয়ে যাবার ফুরসত পায় নি।

সেট মারফত তখন তখনি জানিয়ে দিই কমান্ডারকে সি.ও অফিস দখল করার কথা। তিনি পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত দখল করা সি.ও অফিসের অবস্থান ধরে রাখার নির্দেশ দেন।

এখান থেকে আর সামান্য কিছুটা পথ এগনোই পঞ্চগড়। কেনো জানি মনে হয়, এ ধাক্কাতেই আমরা পঞ্চগড়ে পৌছে যেতে পারতাম। কিন্তু কমান্ডার তা চান না। পাকসেনারা মার থেয়ে সমবেত হয়েছে সব পঞ্চগড়ে। আঘাত জর্জের কেউটে সাপের মতোন অবস্থা

তাদের। তাই এখন তাদের মুখোমুখি হলে অথবাই শুধু ক্যাজুয়েলটিজ বাড়বে।

পুর আকাশে ভেসে উঠেছে সূর্য। সেই আলোর সোনালি আভায় চারদিক ঝলমল করে। চিকচিক করে রাতের শিশিরে ভেজা গাছগাছালি। পাতায় পাতায়, সবুজ ঘাসের ডগায় জমে থাকা শিশির বিনু মণিমুক্তের উজ্জ্বলতা ছড়ায়। সে এক মনোরম দৃশ্য। গভীর আনন্দ মেশানো একটা অপার ভালোলাগার অনুভূতি সারাটা মনে খুশির নাচন জাগায়। এরকম মুহূর্তে মন চলে যায় পেছনপানে। চকিতে মনের আয়নায় দেসে ওঠে অপেক্ষমান একটা মুখ। নরম, কোমল আর অফুরন্ত ভালোবাসার সেই মুখ। পরীর মতো উড়ে ঘুরে বেড়ানো সেই মেয়েটি হয়তো সীমান্তের ওপার থেকে যুদ্ধের এই তাও্রতা প্রত্যক্ষ করে ভয়ে-আতঙ্কে দিশেহারা হয়ে উঠেছে। আমরা যে এখন এভাবে ওয়ে আছি, সে হয়তো ব্যাপারটা সম্পর্কে কল্পনাও করতে পারছে না। কেনো জানি বুকের ভেতরটা নাম-না-জানা একটা অনুভূতিতে শিরশিরিয়ে ওঠে। পিছুটান। পিছুটান বড়ো আনন্দের। বড়ো কষ্টের। যুদ্ধের মধ্যে পিছুটান ভালোলাগার পাশাপাশি কঠও দেয় খুব।

শিস বাজিয়ে পিন্টু এগিয়ে আসে পেছন থেকে। সরল মুখে তার নির্মল আনন্দের হাসি।

এসেই আমার পাশে বসে পড়ে সে। তারপর তার দ্বিতীয়সূলভ কৌতুক মেশানো গলায় বলে, আমরা দৌড় দিছে কেমন করি দেখছেন?

— কেমন করে?

— লেংটি তুলি দৌড় যাক কয়, একেবারে তেমন হায়।

— বুবলে কেমন করে?

— দেখছেন না, ডেকচি ভর্তি রান্না করা প্রস্তাব কোরমা, খান সাহেবেরা তা খাওয়ারও টাইম পায় নি। কথা না বাড়িয়ে পিন্টুকে প্রশ্নাত বলি ছেলেদের অবস্থানগুলো ভালো করে। পাকসনাদের ফেলে যাওয়া কোনো জিনিস যাতে ছেলেরা হাত না দেয়, এ ব্যাপারটার দিকে লক্ষ্য রাখতে বলি তাকে।

পিন্টু চলে যায় তেমনি শিস বাজিয়ে ছেলেদের হাড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা অবস্থানগুলোর দিকে। পাকবাহিনীর মূল প্রতিরোধ ভেঙে গেছে। পঞ্জগড়ের উপকর্ত্তে আমরা পৌছে গেছি। পঞ্জগড় দখল করা এখন সময়ের ব্যাপার মাত্র। বিজ্ঞতাবে কিছু গোলাগুলি এখনো চলছে সামনে। পঞ্জগড় শহরকে চূড়াভাবে শক্রমুক্ত করার কাজ চলছে হয়তো।

আজ নভেম্বরের ২৯ তারিখ। আজকের এই ঐতিহাসিক মুহূর্তটিকে ধরে রাখবার জন্য পকেট হাতড়ে কালো রঙের নেট বইটি বের করি। পাতা উল্টে তাতে লিখি :

২৯ নভেম্বর, '৭১

“এগিয়ে চলেছি আমরা। পঞ্জগড় বলতে গেলে আমাদের দখলে। আমরা এখন C.O.Dev Office-এর পাশে বসে আছি। ভালো লাগছে খুব। মনের গতি ভাসায় ঠিকমতো প্রকাশ করা যাচ্ছে না। এখনে হঠাৎ শিবগঞ্জের একজন লোকের সাথে আলাপ। ও আমাদের সবাইকে চেনে। জানি না আমাদের যাত্রাপথে এমনি কতো চেনা মানুষের সাথে আলাপ-পরিচয় হবে।”

মুক্ত হলো পঞ্জগড়

সকাল ৮টার দিকে নির্দেশ আসে এগিয়ে যাবার। আমাদের সি.ও অফিসের বর্তমান অবস্থান থেকে সরাসরি এগিয়ে যেতে হবে পঞ্জগড় শহরের দিকে। অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে। পুরোপুরি শক্রমুক্ত হয় নি এখনো পঞ্জগড়। সুতরাং শক্রমুক্ত করার জন্য হয়তো যুদ্ধ করতে হতে পারে।

নির্দেশ অনুযায়ী যাত্রা পুরুর প্রস্তুতি চলে। বুকের মধ্যে দাক্ষল উত্তেজনা। পঞ্জগড় দখলের জন্য এগিয়ে যেতে হবে! ব্যাপারটা অবিষ্মাস্য মনে হলেও এখানকার এটাই রঢ় বাস্তবতা।

সুবেদার খালেক ডানদিকে তার দল সাজিয়ে নেন। আমার দলকে সেকশন এবং প্লাটনওয়ারি সাজিয়ে দ্রুত প্রস্তুত করে নিতে হবে। সিসেল লাইনে একটার পর একটা সেকশন এগিয়ে যাবে। প্লাটন কমান্ডার ও সেকশন কমান্ডাররা তাদের দল স্ব-স্ব সতর্কতার সঙ্গে এগিয়ে নেবে। হাতিয়ারগুলো ধরা থাকবে গুলি ছেঁড়ার ভঙ্গিতে। সেফটি ফিউজ থাকবে অন। যে-কোনো স্বৃহৃতে তারা শক্রের বাধার সম্মুখীন হতে পারে। শহরের অলিগনি আর বাড়িসমেষে বিচ্ছিন্ন শক্ররা লুকিয়ে থাকতে পারে। চোরাগোঁও হামলা করতে পারে ওরা। পাকবাহিনী যদি মরিয়া হয়ে পঞ্জগড়কে ধরে রাখতেই চায়, তাহলে হয়তো হাতাহাতি লড়ই করতেও হতে পারে। ছেলেদের এই সব সংক্ষিপ্ত ব্রিফিং দিয়ে অ্যাডভাল্স করার নির্দেশ দিই।

ডান কাঁধে ঝোলানো দীর্ঘদিনের সাথী আমার গ্রিয় টেনগান। ট্রেনিং সেন্টারে পাওয়ার পর থেকেই সেটা দিনরাতের সঙ্গী হিসেবে আমার সাথে সাথে প্রেরণ কৰে। দৈনন্দিন জীবনের সাথে, নিজের অস্তিত্বের সাথে একেবারে যেনো মিশে গেছে কান্দো-রঙের ধাতব এই অস্ত্রটি। কাঁধে টেনগান, ব্যাপারটা এখন অভ্যাসের অন্তর্গত। ডান প্লাটনের নিচে জামার অংশে টেনগানের ম্যাগজিন ঢোকানোর জায়গাটা ঘষা লেগে ক্ষমে প্রেরণ। ছিন হয়ে গেছে জামার সেই অংশটা। কাঁধে ঝোলানো নিয়সনী সেই টেনগানের প্লাটনের আঙুল রেখে এগিয়ে যাচ্ছি সবার আগে আগে। পিন্টু আমার পাশাপাশি। পঞ্জগড় দখলে নেবার অভিযানের শুরুত্বটা এরি মধ্যে হন্দয়স্ম করে ফেলেছে সে। এখন পুরুরাসকতা নয়। রীতিমতে যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনিকের কাঠিন্য তার চোখেমুখে। ছেলেরা লাইনে পিছে পিছে এগোয়। মাথায় অনেকের হেলমেট। কারো কারো মাথা শূন্য। কাঁধে ঝোলানো কাপড়ের ব্যাগে পুটলির মতো করে বেঁধে নেয়া কাপড়ের মধ্যে ব্যক্তিগত ব্যবহারিক সামগ্রী, পিঠে বাধা কবল, বুকে-কোমরে বাধা গুলির মালা, কোমরে জড়ানো ছেনেড। কারো পরনে প্যান্ট, কারো-বা লুঙ্গি, গায়ে চাপানো জামা, চাদর, রঙবেরঙের সোয়েটার। অনেকেরই পায়ে কাপড়ের লাল জুতো। আবার অনেকেরই খালি পা। কেউ কেউ হাঁটছে স্পঞ্জের স্যান্ডেল পায়ে দিয়ে। টেনগান, রাইফেল, এস.এল.আর, এল.এম.জি আর ২ ইঞ্জিন মুর্দা— এইসব অন্ত কাঁধে ঝুলিয়ে, নয়তো হাতে নিয়ে, পায়ে পায়ে এগোয় ছেলেরা। এই হলো আমাদের মুক্তিবাহিনী। আর সেই বাহিনীর সদস্য হিসেবে সতর্কতার সঙ্গে অথচ দৃঢ় পদবিক্ষেপে এগিয়ে চলি আমরা সামনে, পঞ্জগড় শহর অভিমুখে।

পঞ্জগড় শহর এসে যায় কোনো রকম বাধা আসে না শক্রবাহিনীর তরফ থেকে। সম্মুখবর্তী ইট বিছানো গলির মতো রাস্তাটি দিয়ে আমরা প্রবেশ করি। পঞ্জগড় বাজারের বাঁদিকের রাস্তা এটা। সোজাসুজি দিয়ে মিশেছে তালমাগামী মূল সড়কের সাথে। বাজার নেই। একেবারে পুড়ে ছারখার। ধৰ্মসন্তুপে পরিগত। আমরা তার পাশ দিয়ে শহরের মূল রাস্তায় গিয়ে উঠি। তারপর সে রাস্তা ধরে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে যাই শহরের প্রাণকেন্দ্রের অভিমুখে। না, কোনো দিক থেকেই বাধা আসে না। বাধাইনভাবে বন্যার স্রোতের মতো এগিয়ে যাই আমরা। কিছু

কিছু বাড়িয়ের তখনো আগুন জুলছে। বোৰা যায় কিছুক্ষণ আগেও পাকসেনারা শহরেই ছিলো। এখন পিছিয়ে গেছে সুগার মিলের দিকে। সেখানে গোলাগুলি চলছে এখনো।

অবশ্যে পঞ্চগড় শহরে প্রবেশ করা গেলো। দীর্ঘ ছ' ছটি মাস পঞ্চগড়কে কেন্দ্র করে এর চারদিকে শূন্ধ করেছি, পেরিলা শূন্ধ। পঞ্চগড়ে দখলদার পাকবাহিনীর বর্ষরতা আর নৃশংসতার অনেক কাহিনী শৈলেছি। পঞ্চগড়ে তখন ছিলো বিভীষিকাময় একটা জগৎ। এখানে আসবার ব্যাপারটা ছিলো প্রায় দৃঢ়সাধ্য। তাবাই যেতো না আর কখনো পঞ্চগড় যাওয়া যাবে, দেখা যাবে পঞ্চগড় শহর যাকে কেন্দ্র করে দিনের পর দিন পরিচালিত হয়েছে আমাদের অপারেশনের পর অপারেশন। তখন মনে হতো, কোনোদিনই আমরা পঞ্চগড় দখলে নিতে পারবো না। স্বপ্নের অতীত ছিলো যা, তা-ই এখন বাস্তব হতে যাচ্ছে। পঞ্চগড় শহরের প্রাণকেন্দ্র গোলাকৃতির আইল্যান্ডের মতো জায়গাটিতে এসে পৌছাই আমরা।

পঞ্চগড় শক্রমুক্ত হলো অবশ্যে। আজ ২৯ নভেম্বর, '৭১। এদিনটা অবশ্যই স্বর্গীয় হয়ে থাকবে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে।

পঞ্চগড় আমার চেনা শহর নয়। আগে কখনো আসা হয় নি এখানে। আসা না হলেও পঞ্চগড়ের রাস্তাঘাট, সরকারি অফিস-আদালত, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বাজার, বিশিষ্ট মানুষজনের বাড়িয়ের, করতোয়া নদীর ওপরকার দীর্ঘ লোহার ব্রিজ, সুগার মিলের অবস্থান, এসবই প্রায় পরিচিত হয়ে উঠেছিলো। পঞ্চগড়ের আশপাশে থাকতে প্রকৃতে বারবার শুনতে হয়েছে এগুলোর কথা। তাছাড়া পঞ্চগড় থেকে পালিয়ে যাওয়া হ্যারিষজন এবং রেকি মিশনে পাঠানো মুক্তিযোদ্ধা আর তাদের সাহায্যকারী মানুষজনের কাজ থেকেও জানা গেছে পঞ্চগড়ের বিভিন্ন সামরিক সংস্থাপনার কথা। পঞ্চগড়ে পাকবাহিনীর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার প্রায় নির্খন্ত ছবি কেচে ম্যাপে আঁকা রয়েছে নেট বইয়ের খাতার ৫০% মোট কথা, এই শহরকে কেন্দ্র করে বিগত মাসগুলোতে এতো বেশি চৰ্চা আর মনোভিবেশ করা হয়েছে যে, চোখ বক করে মুখস্থ বলে দেখা যায় পঞ্চগড়ের কোন জিনিসই কোথায়, অর্থাৎ পুরো শহরের বিবরণ।

কিন্তু এ কী হল আজকের পঞ্চগড়ের! কল্পনায় যে ছবি মনের গহনে আঁকা রয়েছে, এতো সেই পঞ্চগড় নয়। শহর বলে তো কোনো কিছুরই আর অঙ্গিত্ব নেই। বাজারঘাট, দোকানপাট, বাড়িয়ের সব পুড়ে ছারখার হয়ে গেছে। শুধু সামনে নদীর পাশ ঘেঁষে লাল রঙের থানা ভবন আর ডাকবাংলাটি নীরবে দাঁড়িয়ে রয়েছে। একটিও আন্ত বাড়িয়ের অঙ্গিত্ব নেই। কোনো দোকানপাট নেই। কোনো মানুষজন নেই। সবকিছুই ধূংসপ্রাণ। বিরান কোনো শুশানপুরী যেনো। মনে হয়। আমরা কোনো একটা মৃত শহরের ভেতরে এসে দাঁড়িয়েছি।

পঞ্চগড় শহরকে দু'ভাগে ভাগ করেছে করতোয়া নদী। নদীর ওপর দীর্ঘ লোহার পুল। ত্রিটিশ আমলের তৈরি। পুলের দু' মাথায় নদীর পাড় জুড়ে শুধু বাক্সার আর বাক্সার। বৃক্ষাকার আইল্যান্ডের মাঝখানে বেশ বড়ো আকারের একটা বাক্সার। বাক্সারটার চারদিকে ছিদ্র। বোৰা যায় সহজেই এই বাক্সারে সদা সতর্ক প্রহরী অঞ্চলের ডিউটি দিতো আর ওইসব ছিদ্র দিয়ে পর্যবেক্ষণের কাজ চালাতো। শহরের প্রাণকেন্দ্র বলতে যা বোৰায়, এ জায়গাটি তাই। এখান থেকে সব দিকে সতর্ক পর্যবেক্ষণ কাজ চালানোর ব্যাপারটা বেশ সুবিধেজনক ছিলো। মৃত্যুমান বিভীষিকার মতো দাঁড়িয়ে আছে বাক্সারটা, যেখানে কিছুক্ষণ আগেও হয়তো ছিলো পাকবাহিনীর শক্ত অবস্থান। থানার সামনেও বাক্সারের সারি। পঞ্চগড় শহরমূরী রাস্তার দু'পাশে একই ধরনের বাক্সারের পর বাক্সার। লোহার ত্রিজের ওপরও দেখা যায় বেশ ক'টা বাক্সার।

বাক্সারগুলো অত্যন্ত মজবুতভাবে তৈরি করা। কয়েকটা বাক্সারতো রীতিমতো কঢ়িত দিয়ে একেবারে স্থায়ীভাবে তৈরি। শত শত হাজার হাজার পাউন্ড বোমার আঘাত সহ্য করতে হয়েছে পাকবাহিনীর দখলে রাখা পঞ্জগড় শহরকে। আর সে কারণেই দখলদার বাহিনী তাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা মজবুত করার জন্য খুবই শক্তভাবে গড়ে তুলেছে তাদের বাক্সারগুলো।

দীর্ঘদিনের যুদ্ধের ধর্কল সহ্য করতে হয়েছে এই শহরকে। পাকবাহিনী প্রথমে এ শহরে দুকেই জালিয়ে-পুড়িয়ে দেয় এর সবচিহ্ন। তারপর মিত্রবাহিনী ও সুক্ষিবাহিনীর আর্টিলারি মার্টেরের শেল উড়ে এসে আঘাত করেছে নির্বিচারে এ শহরের বুকে শত সহস্রাবর। মাটি এর লাল হয়ে গেছে পুড়ে পুড়ে। বাস পুড়ে মরে গেছে। এমনকি গাছগাছালির পাতাও পুড়ে পুড়ে লাল হয়ে মরে গেছে। রাস্তার বাঁ পাশে গুদামের মতো একটা ঘরের কাঠামো দাঁড়িয়ে আছে। মতিয়ার বলে, এটা ছিল সিনেমা হল। এমপি কম্বুনিম মোজারের। আধা পোড়া প্রায় বিধ্বস্ত সিনেমা হলটার কাছাকাছি রাস্তার পাশে একটা বিরাট উঁচু গাছ। কয়েকটা মোটা কাঠের কাণ ও গুঁড়ি সেই গাছটার নিচে এলোমেলোভাবে জড়ে করে রাখা। একসময় একবাশ ক্লান্তি নিয়ে পড়ে থাকা একটা গুঁড়িতে হেলান দিয়ে বসে পড়ি মাটির ওপরেই। প্রিয় টেনগানটাও কাঁধ থেকে নামিয়ে কোলের ওপর রাখি। ছেলেরাও আমার দেখাদেখি, নির্দেশের অপেক্ষা না করেই যে যার মতো বসে যায় আশপাশের মাটির ওপর, কিংবা রাস্তার ওপর।

পঞ্জগড় দখলে এলো অবশ্যে। বাংলাদেশের সর্বউত্তর সুর্য্য থানা শহর ছিলো এটা। ছিমছাম ছবির মতো একটা শহর। অত্যন্ত জমজমাট স্থানে আর শান্তিপ্রিয় সুবী মানুষদের ভিড় কোলাহল সর্বাই মুখরিত। পঞ্জগড় দখলে আজীয় সম্পূর্ণ বাংলাদেশ দখল শুধু নয়, স্বাধীনতা যুদ্ধেরও চূড়ান্ত বিজয় হয়েছে, আনন্দ মেলানো এমন একটা মনোভাব সারাটা মনকে আপ্ত করে রাখে। সেই সাথে চোখ জাল করবার মতো একটা অনুভূতিও পাশাপাশি মনের ভেতরে গুরমের ওঠে। আমরা পঞ্জগড় দখলকরতে চেয়েছিলাম। তবে জুলে-পুড়ে ছারখার হয়ে যাওয়া শৃঙ্খানতুল্য জনবিবান এই বৃক্ষে পঞ্জগড় শহরকে তো আমরা আশা করি নি।

সিনেমা হলের সামনে একচুক্টো বাক্সার মাটির নিচে। সেই বাক্সারে ঢেকা বা বের হওয়ার জন্য একটা ছেটো গতের মতো মুখ। সেখান দিয়ে বাক্সারের ভেতরে উকি মারতে গেছে একরামুল। হাঁটা চিক্কার দিয়ে ওঠে, রাজাকার! রাজাকার! রাজাকার পাওয়া গেছে!

সবাই হৈচে করে ওঠে একরামুলের এই আবিষ্কারে। বাবু আর মুন্না দৌড়ে যায়। দেখা যায়, একজন হ্যাঙ্লা পাতলা মতোন লোককে একরামুল চুল ধরে টেনেছিড়ে বের করছে সেই বাক্সার থেকে। বের করা হয়ে গেলে হিড়িড়ি করে তাকে টেনে আনতে থাকে মুন্না আর পেছন থেকে একরামুল, শষু, নুরদিন আর জয়নাল এরা সবাই তাকে মার দিতে থাকে আচ্ছা মতোন। এ অবস্থায় লোকটাকে ওরা সামনে নিয়ে এলে, তাকে কিছু জিগ্যেস করবার সুযোগ না দিয়ে সে সোজা আচড়ে পড়ে আমার দু'পায়ের ওপর এবং কাঁকিয়ে কেঁদে উঠে বলতে থাকে, মুই মইচু গে, মোক মারনে না গে, মুই রাজাকার নহ।

— বল ব্যাটা তাহলে তুই কে? একরামুল আবার লোকটার চুল ধরে ঝাঁকুনি দেয়। আর তার জবাবে সে বলে, মুই রাজাকার নহ, মোর নাম মোজাফফর। এইঠে মুই দুকিছিনু বাঁচিবার তানহে। মোক তুমরা ছাড়ে দেন গে। মুই গরিব মানবি...।

একেবারে জনবিবান শৃঙ্খানতুল্য এই শহরে একমাত্র সিভিলিয়ান অর্থাৎ বেসামরিক নাগরিক হিসেবে পাওয়া গেছে এই রোগা হ্যাঙ্লা-পাতলা মানুষটিকে। হয়তো রাতে প্রাণ বাঁচানোর

তাগিদেই সে চুকে পড়ে আশ্রয় নিয়েছিলো এই বাক্সারে। পাকবাহিনী যে পঞ্জগড় ছেড়ে চলে গেছে, সেটা তার ধারণায় আসে নি। লিকলিকে হাডিসার এই লোকটা রাজাকার হতে পারে না, সেটা তার চেহারা দেবেই বোঝা যায়। হয়তো সে দিনমজুর, কামলা বা কিশোন। টুকটাক খেটেখুটে খাওয়া একজন গরিব সাধারণ মানুষ। পঞ্জগড় কাজের জন্য এসে হয়তো আটকা পড়ে গেছে। এছাড়া সদ্যমুক্ত পঞ্জগড়ে সেই একমাত্র সিভিলিয়ান, যার সঙ্গে আমাদের প্রথম দেখা হলো। পঞ্জগড় বিজয়ের ঘটনা শরণীয় করে রাখবার জন্য ছেড়ে দিই লোকটাকে। ছাড়া পেয়ে লোকটা দৌড় লাগায় উর্ধ্বাসে পুরুষো হয়ে করতোয়া নদী বরাবর।

আমরা বসে আছি গাছের গুড়িতে হেলান দিয়ে। একটার পর একটা দল পঞ্জগড়ে চুকছে বিভিন্ন দিক দিয়ে। সবারই চোখ-স্থৈর্যে আনন্দে উজ্জ্বল। আর সেই চিরায়ত শ্রোগান ‘জয় বাংলা’। আমরা বসে বসে বিভিন্ন মুক্তিযোদ্ধা দলের মুখরিত আনন্দের মাতামাতি দেখি, সেই সাথে অপেক্ষা করি পরবর্তী নির্দেশের।

কালিয়াগঞ্জের যুদ্ধ, শহীদ আবদুল খালেক

আমরা বসে আছি। আর সুবেদার খালেক অত্যন্ত ব্যক্তিসম্মতভাবে তাঁর কোম্পানির যোদ্ধাদের জয়ায়েত করার চেষ্টা করছেন। এখনো ত্রিজ পেরিয়ে ওপারে যাবার নির্দেশ আসে নি। সুগার মিল এলাকায় বিক্ষিণ্ডাবে গোলাগুলি বর্ষণের শব্দ থেমে আছে। শক্ত প্রতিরক্ষা ঘাঁটি ছিলো পাকবাহিনীর সুগার মিল এলাকায়। এখনো তারা জায়গাটা ধরে রেখেছে কি না বোঝা যাচ্ছে না। সুগার মিল এলাকা মুক্ত হবার অল ক্রিয়ার সিগনচেণ্টনা পাওয়া পর্যন্ত সদ্যমুক্ত পঞ্জগড়ের অবস্থান ধরে রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে আমাদের। সে অনুযায়ী পঞ্জগড় শহরে অবস্থান নিয়ে বসে আছি আমরা। সকালের নাস্তা পাঠে তখনো পৌছায় নি। পেটের ভেতর চোঁ-চোঁ করে ক্ষুধা।

সুবেদার খালেক তাঁর পরিচিন্তায় নিয়ে এগিয়ে আসেন আমাদের দিকে। পঞ্জগড় বিজয়ের আনন্দে তারও চোখে আনন্দের উজ্জ্বল প্রভা। তিনি এসে জড়িয়ে থরেন উঞ্চ অলিঙ্গনে। তারপর পরবর্তী পদক্ষেপ নিয়ে তাঁর সাথে কিছুক্ষণ কথাবার্তা হয়। এই রকম আলাপচারিতার মাঝখানেই পিছু খালেককে স্বরণ করিয়ে দেয় নাস্তার কথা। কেননা লঙ্ঘরখানা তারই আওতায়। আমাদেরও রেশন তৈরি হয় সেই লঙ্ঘরখানাতেই। ছেলেরা ক্ষুধায় ভয়ানক কাহিল হয়ে পড়েছে। খালেক জানান, নাস্তা এসে পড়বে যেকোনো সময়। মুভয়েন্টের আগে যদি আসে, তাহলে এখানেই খাওয়ার পাট চুকিয়ে ফেলতে হবে সবাইকে। তা না হলে সামনে সুবিধেমতো কোনো জায়গায়। তিনি চলে যান যেভাবে এসেছিলেন, ঠিক সেভাবেই। আমরা বসে থাকি পরবর্তী আদেশের অপেক্ষায়।

আহিদার আসে সাইকেল হাঁকিয়ে অমরখানার দিক থেকে। একেবারে ঝড়ো কাকের মতোন অবস্থা ওর। দেখতে লাগছে কিছুটা উদ্ভ্রান্তের মতো।

সদ্যমুক্ত পঞ্জগড়ে ওর সঙ্গে এভাবে দেখা হবে, ভাবতেই পারি নি। তার মধ্যে কোনো আনন্দ-উজ্জ্বল নেই। পঞ্জগড় দখল করা যে আমাদের কাছে কতো বড়ো একটা ঘটনা, আমাদের মতো সেও সেটা জানে। কিন্তু এ নিয়ে ওর মধ্যে কোনোরকম বোধই কাজ করে না যেনো। তার এই অবস্থা দেখে অনুমান করে নিতে পারি, নিক্ষয়ই ঘটেছে খারাপ কিছু একটা। সেই খারাপ খবরটি সে প্রথমে শোনাতে শিয়ে কেঁদে ওঠে ফুপিয়ে ফুপিয়ে।

সে বলে, খালেক মারা গেছে মাহবুব তাই। হঠাতে করে আহিদারের পরিবেশন করা মৃত্যু সংবাদটা বিশ্বাসই হতে চায় না। একেবারে ঝকঝকে তরুণ। মাঝারি গড়নের খালেকের ফর্সা মুখখানা চকিতে মনে পড়ে যায়। মুক্ত পঞ্জগড়ের এই আনন্দঘন পরিবেশে আহিদার বয়ে নিয়ে এলো এই রকম একটা গভীর শোকাবহ সংবাদ। ছেলেদের এই মৃত্যু সংবাদ শ্পর্শ করে দারুণভাবে। বিশ্ব হয়ে যায় সবাই। বুবই প্রিয় ছিলো সে সবার। পঞ্জগড় বিজয়ের মুহূর্তে হারিয়ে গেলো ছেলেটা। সহজে মেনে না নেয়ার মতোই ব্যাপার এটা।

আমার পাশে বসাই আহিদারকে। ওকে ধাতস্থ হওয়ার সময় দিই, নিজেও কিছুটা সময় নিই মনটাকে সুস্থির করার জন্য। তারপর আহিদারকে বলি, কীভাবে ও মারা গেলো বল।

— কালিয়াগঞ্জের যুদ্ধে। গতকাল বেলা এগারোটা-বারোটা র দিকে।

— কীভাবে লাগলো যুক্তা?

আহিদার আমার প্রশ্নের জবাবে যে বিবরণটা পেশ করে, সেটা এ রকমের : জগদলহাট দখলের পর মুক্তিবাহিনী তখন পঞ্জগড় দখলের জন্য এগুছে। তালমায় পাক ঘাঁটির পতন হয়েছে। পেয়াদাপাড়া-কালিয়াগঞ্জের আহিদার আর বদিউজ্জামানের এফ.এফ.কমান্ডকে যে-কোনো নির্দেশ প্রতিপালনের জন্য 'ষ্ট্যান্ডবাই' থাকবার নির্দেশ দিয়েছেন কমান্ডার সদরদপ্তর। সে অনুসারেই তারা নির্দেশের অপেক্ষায় বসে আছে। আর এন্দিককার যুদ্ধের গতিপ্রকৃতির দিকে লক্ষ্য রাখছে। এমনিতে কোনো নির্দিষ্ট কাজকর্ম নেই। প্রতিটি আর পেট্রল ডিউটি ছাড়া। পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে সরাসরি কোনো আ্যাকশনেও যাবেনা যাচ্ছে না। যুদ্ধের গতিপ্রকৃতি এতো দ্রুত পার্টটাছে যে, এর সাথে জড়িত না থাকার ফলে তার সশ্পর্কে কিছুই তারা বুঝতে পারছে না। তেমনি পাকবাহিনীর বিভিন্ন ঘাঁটির ওপর প্রতিটা যুদ্ধের নিয়মিত অভিযানও বুঝ রয়েছে। যেখানে পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে যুক্তি ও মিত্রবাহিনীর সর্বাত্মক যুদ্ধ তরু হয়ে গেছে, সেখানে তারা আগের মতোই ছেটোখাটো চোরাগোঞ্জ ছালালা চালানোর ব্যাপারে উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছে। তারাও সরাসরি অংশ নিতে চায় কিন্তু অভিযানের এই যুদ্ধে। কিন্তু কমান্ডার তাদের অপেক্ষা করতে বলেছেন। অবশ্য আর একটা কাজও কমান্ডারের তরফ থেকে এই সময় তাদের ওপর চাপিয়ে দেয়া হয়। আর সেটা হলো, পাকবাহিনীর পঞ্চাদপসরণের কৃট পাহারা দেয়া।

পঞ্জগড় এলাকায় পরাজিত বাহিনী কিংবা অন্যান্য জায়গায় ঘাঁটি গেড়ে বসে থাকা পাকবাহিনী পেছনে পালনের জন্য 'এসকেপ' কৃট বুঝিবে। সেই কৃটগুলো পাহারা দিতে হবে পেয়াদাপাড়া ও কালিয়াগঞ্জ কমান্ডকে। নির্দেশ অনুযায়ীই দায়িত্ব পালন করছিলো তারা। গতকাল সকালের দিকে সেন্ট্রির চোখে পড়ে একবোক সৈন্য আসছে পেয়াদাপাড়া-কালিয়াগঞ্জের রাস্তা ধরে। দূর থেকে সৈন্যদের এই দলটাকে প্রথমে তারা চিহ্নিত করতে পারে না পাকবাহিনী বলে। মিত্রবাহিনীর দল এদিক দিয়ে অগ্রসর হয়ে ময়দান দিঘি-বোদার পাকা সড়ক অবরোধ করে পাকবাহিনীর যোগাযোগ কৃট কাট করে দেবে বা ও দুটো শক্ত ঘাঁটি আক্রমণ করবে, ঠিক এ ধরনেরই একটা ধারণা সেন্ট্রি আর তার সঙ্গীরা প্রথমে করেছিলো। কিন্তু সেনাবাহিনীর ওই দলটা যতোই কাছে আসতে থাকে, সন্দেহ বাঢ়তে থাকে তাদের মনে ততোই। পঞ্জগড়ের দিক থেকে আসছিলো দলটা। তবে তাদের অবস্থা ছিলো বুবই বিধ্বস্ত। ভাবি হাতিয়ারপ্ত আর গোলাবারুদসহ রসদ ইত্যাদি বহন করে আনছিলো তারা। তবুও অসম্ভব ক্ষিপ্ততার সঙ্গে এগুচ্ছিলো তারা। তবে এখানে যে মুক্তিবাহিনীর ঘাঁটি রয়েছে, সে সশ্পর্কে তাদের কোনো ধারণাই ছিলো না।

তারা পালাঞ্জিলো তালমা পতনের পরপরই। পঞ্জগড় রক্ষাকারী দলের একাংশ, টুনিরহাট-গলেয়া থেকে পিছিয়ে যাওয়া দল। মণ্ডলেরহাটে অবস্থানকারী দলগুলো তখন নিজেদের পঞ্জগড়ের মূল গ্যারিসন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। পাকা সড়ক বরাবর যুদ্ধ চলায় তারা গ্রামের রাস্তাখাট দিয়ে পালানোর উপায় খুঁজছে। তারা গ্রামের পথ দিয়ে পালিয়ে পৌঁজুতে চায় তাদের মূল ক্যান্টনমেন্ট সৈয়দপুরে। তাদের কাছে এ পথ দীর্ঘ আর অচেনা। পুরো পথ হাঁটতে হবে। লটবহর, হাতিয়ারপত্র, আর গোলাবারুদসহ শুধুই কষ্টকর এ পথযাত্রা। কিন্তু উপায় কি! জীবন বাঁচাতে ফেলে তাদের জন্য এছাড়তো অন্য কোনো পথ আপাতত খোলা নেই। গ্রামের একজনকে আটকে তারা দৈবীগঞ্জ-নীলফামারী যাবার পথে হাদিস জেনে নেয়। সে লোকটা তাদেরকে ঠিক ঠিক চিনে ফেলে। চিনতে পেরেই সে কালবিলম্ব না করে দৌড়ে গিয়ে ব্যবর দেয় পেয়াদাপাড়ায় অবস্থান নিয়ে বসে থাকা মুক্তিযোদ্ধাদের। কালিয়াগঞ্জের রাস্তায় দুঁড়ানো সেক্স্ট্রিও চিনে ফেলে তাদের। উর্ধ্বর্খাসে দৌড়ে অন্যদের জানায়। ফলে একটা ভুলভুল পড়ে যায় হাইড আউট জুড়ে। যে যার মতো করে হাতিয়ার নিয়ে নেমে আসে রাস্তায়। একটা হৈচে কাণ আর কি! দূর থেকে আগত পাকসেনাদের দলটাকে সারেভার করার আহ্বান জানায়। কিন্তু তারা সারেভার করে না। প্রথমে হয়তো তারা বুঝতেই পারে না আসলে ব্যাপারটা কি। কারা এরা? যখন বুঝতে পারে, তখন তরুণ হয় শুলিবর্ষণ। তাদের এ শুলিবর্ষণের জবাব মুক্তিযোদ্ধারাও নিতে থাকে এলোপাতাড়ি শুলি চালিয়ে। কিন্তু তার আগেই থাকে স্ক্রিনে ছিলো আর চিংকার করছিলো পাকসেনাদের সারেভার করার জন্য। তার হয়তো ধারণা ছিলো, পাকসেনাদের দলটা সারেভার করার জন্যই এদিকে এসেছে। ঠিক এসময় পেঞ্জাপাড়ার দল এসে যোগ দেয় তাদের সাথে। গোলাগুলি চলতে থাকে তুমুল। নিজেদের রাজ্যনার জন্য মরিয়া হয়ে লড়ে যায় পাকসেনারা। তারা রাস্তার আড় নিয়ে গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে আগে যেতে থাকে করতোয়ার পাড় থেকে নয়াদীঘি-সাঁকোয়ার দিকে। তাদের পালিয়ে পালিয়ে রুট আটকে দিলেও তারা নদীর পাড় ধরে পেছনের দিকে সরে পড়তে থাকে এবং পেছনে সত্ত্ব সত্ত্ব সত্ত্ব হয়।

যাবার সময় তারা ফেলে যায় তাদের সাথে বহন করা প্রচুর অন্তর্শস্ত্র আর গোলাবারুদ। এর ভেতরে সিঙ্গু পাউভার আর্টিলারি, ও ইঞ্জিন মার্টের। মেশিনগানসহ ভারি অস্ত্রও রয়েছে। পাকবাহিনীর সংখ্যা ছিলো ৫০/৬০ জনের মতো। তাদের সাথে ছিলো ২০/২৫ জন রাজাকারণ। মুক্তিযোদ্ধারা সংখ্যায় বেশি থাকলেও পাকবাহিনীকে তারা আটকাতে পারে নি আগের থেকে প্রস্তুতি না থাকার জন্য। তবে তাদের পুরো অন্ত ভাগারটা তারা দখল করতে সক্ষম হয়। শুধু তাই নয়, আহতও করে দু'জন পাকসেনাকে। কিন্তু বিনিয়য়ে জীবন নিতে হয় সাহসী ছেলে টগবগে প্রাণ থালেককে। তাকে কবর দেয়া হয়েছে পেয়াদাপাড়ায়। সদরবন্দিন সাহেবের সাথে যোগাযোগ হলে, তিনি পাকসেনাদের কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ অন্ত উদ্ধার করার জন্য ছেলেদের অভিনন্দন জানান। সেই সাথে থালেকের মৃত্যুর জন্য প্রকাশ করেন তিনি তার গভীর শোক।

আহিদার বিমর্শ বদনে তার গতকালকের যুদ্ধের বিবরণ পেশ করে। গভীর আক্ষেপ মেশানো সুরে বলে, পাকবাহিনীর এ্যাতো অন্তর্শস্ত্র দখল করলাম। কিন্তু তাদের আটক করতে পারলাম না। থালেকটাও মরে গেলো।

— এ নিয়ে আর মন খারাপ করিস না। দখল করা অন্ত গোলাবারুদগুলো হেড

কোয়ার্টারে জমা দেয়া দরকার। এসবের ব্যবস্থা কর তাড়াতাড়ি করে।

— সে জন্যই তো সদরদিন সাহেবকে খুঁজছি। খুঁজতে খুঁজতে পঞ্চগড়ে এসে দেখা হয়ে গেলো আপনাদের সঙ্গে।

— আমরা কিছুক্ষণের ভেতরেই হয়তো আবার অ্যাডভাল্স শুরু করবো। তুই তালমা হয়ে সোজা চলে যা। দখল করা সব হাতিয়ারপত্র ট্রাকে তুলে হেড কোয়ার্টারে পৌছে দেবার ব্যবস্থা কর।

— ঠিক আছে, বলে আহিনীর সাইকেল চালিয়ে রওনা দেয়। ওর গমন পথের দিকে তাকিয়ে থাকি আমরা। মনের গভীর থেকে উঠে আসে একটা দীর্ঘস্থাস। চাউলহাটি ইউনিট বেসের আরেকজন সদস্য হারিয়ে গেলো। এই বেদনাবোধ নিয়ে মুক্ত পঞ্চগড়ে বসে থাকি আমরা অ্যাডভাল্স-এর আদেশের অপেক্ষায়।

মুক্ত সুগার মিল এলাকা, শহীদ হাকুম অর রশীদ রবি

অবশ্যেই মুভমেন্ট অর্ডার আসে। দশটা সাড়ে দশটার দিকে। ছেলেদের গুচ্ছিয়ে নিয়ে রওনা হই আবার। ভৱীভূত পঞ্চগড় পেছনে রেখে লম্বা লোহার ত্রিজের ওপর দিয়ে করতোয়া নদী পার হই আমরা। নদীর পানি করে গেছে অনেক। শীর্ণ হয়ে এসেছে শীতের নদী। চড়া পড়েছে নদীর বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে। ত্রিজের ওপর বালি~~বালি~~ বস্তা দিয়ে মাঝে মাঝে বাঙ্কার বানিয়েছে পাকসেনারা, ত্রিজের ওপর কয়েকটা জায়গায় গুঁট। দেখে মনে হয়, কামানের গোলা এসে পড়েছিলো ত্রিজের ওপর। অবশ্য ত্রিজের কেনেভুলিত হয় নি। লম্বা ত্রিজ। লোহার মোটা কাঠের পাটান্তন্যুক্ত। ত্রিজের ওপর থেকে~~গুঁটে~~ নদী, বালুর চড়া, পেছনে শহরের ধ্বনিবাশের আর সম্মুখে ভান দিকে পাকসেনার তৈরি করা বাঙ্কারের পর বাঙ্কারের সারি দেখতে দেখতে পার হয়ে আসি ত্রিজটা এক্ষে সময়। সবার চোখে-মুখে প্রচুর কৌতুহল। সেই সাথে উদ্বীপনার জোয়ার। পঞ্চগড়ে~~পুরুল~~ হয়ে গেছে, আমরা এখন এগুচ্ছি সামনে। পেছন থেকে ধাওয়া করছি পাকসেনার অভূত আর অবিষ্মাস্য মনে হয়।

ত্রিজ পার হতেই বাঁদিকে গাছগাছিল যেরা উচুমতো একটা জায়গা দেখিয়ে মতিয়ার বলে, গুটা ছিলো পঞ্চগড়ের ই.পি.আর ক্যাম্প। বলার সঙ্গে সঙ্গে উৎসুক হয়ে দেখি জায়গাটাকে। ক্যাম্প বলে এখন আর চেনবার উপায় নেই। সব কিছুই ধ্বনি হয়ে গেছে। আরো কিছুটা এগিয়ে দিয়ে আগুয়ান দলের ক'জন সদস্যকে রাস্তার বাঁদিকার ঢালে বোপৰাড়ের মধ্যে কিছু খুঁজতে দেখা যায়। জিগ্যেস করতেই জবাব মেলে, রাজাকারুরা এখানে অনেক হাতিয়ার ফেলে পালিয়েছে। এগারোটা রাইফেল পাওয়া গেছে এ পর্যন্ত। আরো কিছু পাওয়া যেতে পারে বলে জানায় তারা। তাদের ছেড়ে এগিয়ে যাই। পৌছে যাই রাস্তার তিন মাথায়। এখান থেকে বায়ে রাস্তাটা মোড় নিয়ে চলে গেছে সুন্দর মিলের দিকে। বোনা-ঠাকুরগাঁও-দিনাজপুরের দিকেও গেছে রাস্তাটা। সোজা রাস্তাটা গেছে আটোয়ারী-কৃহিয়ার দিকে। রাস্তার তিন মাথার মোড়ে একটা শান বাঁধানো উচু আইল্যান্ড। তার মাঝাখানে একটা মেশিনগান পোষ্ট। বালুর বস্তা দিয়ে তৈরি পোষ্টটা। মেশিনগানটা এখন নেই, কিন্তু বস্তার ওপর দিয়ে বেরিয়ে থাকা লম্বা গুলির মালা পড়ে থাকতে দেখা যায়। বেশ কটা। রোদের আলোয় চকচক করে মেশিনগানের গুলি। মনে হয় কিছুক্ষণ আগেও জীবন্ত ছিলো পোষ্টটা। খুব তাড়াতাড়ি সরে পড়তে হয়েছে এ পোষ্টের সৈনিকদের। তামার বড় বড় গুলির মালাগুলো নিয়ে যেতে পারে নি তারা। নিষেধ করে দেয়া

হয় পোষ্টের কাছে কাউকে যেতে। বলা যায় না মাইন কিংবা বিড়িট্রাপ যদি পাতা থাকে।

বাঁদিককার রাস্তা ধরে এগিয়ে যাই। মতিয়ার বাঁদিকের লম্বা টিনের ঘর দেখিয়ে বলে, এটা পঞ্চগড় হাইস্কুল। কামানের গোলার আঘাত সহ্য করতে হয়েছে এই স্কুল ঘরটাকেও। বিষ্ণু প্রায় অবস্থা তার। স্কুলের পাশেই লাগোয়া বাড়িটি দূরদের। মতিয়ার আঙুল দিয়ে দেখায় বাড়িটা। বাড়ি বলতে কিছু নেই এখন। একটা টিনের ঘরের কঙ্কাল যেনো দাঁড়িয়ে আছে। রাস্তার ঠিক ডান পাশে উল্টে থাকা একটা সামরিক গাড়ি জুলছে। পাকবাহিনীর গাড়ি। ডান পাশের অবশিষ্ট বাড়িয়রগুলোতে পাকবাহিনী পিছিয়ে যাবার সময় আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। জুলে-পুড়ে যাচ্ছে বাড়িয়রগুলো, নেভাবার কেউ নেই। এরকম জুলন্ত পরিবেশের ভেতর দিয়ে পাকা সড়ক ধরে ডানে মোড় নিয়ে এগিয়ে গিয়ে সুগার মিল এলাকায় পৌছে যাই আমরা। সকালের দিকে মৃত্যু হয়েছে এই এলাকাটি। যুদ্ধের চিহ্ন ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে চারদিকে। সুগার মিল এলাকায় বাক্সার আর বাক্সার। ডানে মিলের প্রবেশ পথের দু'ধারেও বাক্সার। বায়ে রেট হাউস আর কলোনির প্রবেশ মুখেও দু'সারিতে বাক্সার। বস্তা দিয়ে বাক্সারগুলো তৈরি। পেছন থেকে একজন বলে, এই বাক্সারগুলো সব চিনির বস্তা দিয়ে তৈরি। হতে পারে। এরকমটা হওয়া বিচিত্র কিছু নয়। পাকবাহিনী পারে না, হেন কাজ নেই। গোড়াউন থেকে চিনি ভর্তি বস্তা বের করে হয়তো তাড়াভোং করে বাক্সার তৈরি করা হয়েছে।

রেট হাউসের মুখে বাক্সার দুটোর প্রথমটাতে উকি যাইছে আঁতকে উঠতে হয়। একটা লোক মরে পড়ে আছে হাত ছড়িয়ে দিয়ে। শরীরটা তুষ বেতায় হেলান দেয়া। চিত হয়ে পড়ে আছে। লোকটার চোখ দুটো খোলা। যেনো স্বিন্টন কিছু দেখেছে সে প্রাণ হারাবার আগে। চোখ আর বক্স হয় নি। রক্ত ভিজে পেছে বুক আর শরীরের নিচের দিকটা। লোকটা রাজাকার। পাকবাহিনী পিছিয়ে যান্ত্রণ সময় শুলি করে মেরে রেখে গেছে। বিষ্ণু পদলেহী রাজাকারাটিকে যাবার সময় উচ্চতাক পুরকারই দিয়ে গেছে তার প্রতুরা।

সুগার মিলের দিকে পাঠিয়েছিল আত্মারাসহ একটা সেকশনকে। আমরা দাঁড়িয়েছিলাম রাস্তার ওপর। দেখছিলাম বিরাট জয়গা নিয়ে সুগার মিলের দালানকোঠা। চোখে ধূরার মতো। অনেক দিন পর যেনো সভ্য জগতে এসে পৌছেছি। দীর্ঘদিন বনে-জঙ্গলে কাটিয়ে এসে এই দালানকোঠার জগতে এসে যেনো অন্য রকম লাগে। ডানে সুগার মিল। কারখানার উচু টিনের তৈরি বিরাট মূল ভবন। একপাশে লম্বা উচু চিমনি। কারখানার টিনের ছাদে বেশ কটা কামানের গোলার আঘাতের চিহ্ন। ধসে পড়েছে সেসব জায়গা। মূল কারখানা গৃহের পাশে চিনির গুদাম। পেছনের দিকে গোলাকার কটি মোলাসেস বা চিটা গুড় রাখার ট্যাঙ্ক। বড়ো বড়ো তেলের ট্যাঙ্কের মতো লাগে। কালো রঙ দিয়ে ক্যামোফ্লেজ করা হয়েছে ট্যাঙ্কগুলো।

শুটিয়ে শুটিয়ে এসবই দেখছি। মতিয়ার তার দল নিয়ে মিলের ভেতর থেকে বের হয়ে এসে দুটো খবর দেয়। প্রথম খবর, দু'জন পেট মোটা খানসেনাকে পাকড়াও করে বেঁধে রাখা হয়েছে একটা শুটির সাথে। দ্বিতীয় খবর হচ্ছে, সুগার মিল দখলের যুদ্ধে মারা গেছে মুক্তিযোদ্ধা রবি। পঞ্চগড়েরই ছেলে সে। তাকে আমরা চিনি না। মিরগড়ের দিক থেকে রহিয়া-আটোয়ারী কুট দিয়ে মিত্রবাহিনীর সাথে সুগার মিল দখলের যুদ্ধে অংশ নিয়েছিল সে। এদিকে রাস্তার পাশে বাক্সারের ভেতর চোখ উল্টে পড়ে থাকা মৃত রাজাকার, শব্দিকে প্রায় ধৰ্মস্থান সুগার মিল, পেছনে জুলন্ত বাড়িয়র, জনপদ। মিলের পেছন দিকে শুলিতে শুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে মাওয়া সকালের যুদ্ধে নিহত মুক্তিযোদ্ধা রবি। সামনে সুগার মিলের কলোনির দোতলা-

তিনতলা দালানকোঠা। কোনো মানুষজন নেই তাতে। পরিত্যক্ত সব। সম্পূর্ণ ভিন্ন এক পরিবেশ। এর মধ্যে অনেকটা ঘোর লাগা অবস্থায় দাঢ়িয়ে থাকি আমরা। পাশ দিয়ে এগিয়ে যায় একটার পর একটা মুক্তিযোদ্ধার দল। মিত্রবাহিনীর সৈনিকরাও এগোয় পাশাপাশি। সামনে থেকে গোলাগুলির শব্দ ডেসে আসে। পাকবাহিনী পিছিয়ে গিয়ে ময়দান দিখিতে প্রতিরক্ষা লাইন তৈরি করেছে। এখন সেটাই ভাঙবার জন্য এগিয়ে যেতে হবে।

কমাত্তারের নির্দেশ আসে আমার ওপর। ১৫/২০ জনের একটা এফ.এফ দলকে মোতায়েন করতে হবে সুগার মিলের ভেতরে। তারা সুগার মিলের নিরাপত্তা ব্যবস্থার দেখাশোনা করবে। সেই সাথে পাহারা দেবে কারখানার মূল্যবান যন্ত্রপাতি, জিনিসপত্র, যানবাহন ইত্যাদি। সব থেকে যেটা জরুরি, সেটা হলো চিনির গোড়াউন পাহারা দেয়া। চিনির প্রচুর বস্তা রয়েছে সেখানে। অনেকেরই লোভী লক্ষ্য পড়তে পারে এখন সুগার মিলের প্রতি। যন্ত্রপাতি সরিয়ে নেয়ার চেষ্টা করবে তারা। চিনির গোড়াউন লুট করার চেষ্টা হতে পারে। মুক্তের পর দখলে আসা এলাকায় চিরদিনই লুটপাটের ঘটনা ঘটে থাকে। যুক্তের অন্যতম পরিষ্কার বলা চলে ব্যাপারটাকে। যুক্তে বিজয়ী বাহিনী এগিয়ে যাবে। আর পেছনে পড়ে থাকা নগর-বন্দর-জনপদে লুটপাটের ঘটনা একেবারে অবধারিত। একশ্রেণীর মানুষ থাকে যারা সর্বমূল্যেই এই কাজটি করে থাকে। বর্বর পাকবাহিনী আমাদের দেশটা তো এমনিতেই লুটপাট করে আর জুলিয়ে-পৃড়িয়ে ছাঁথার করে দিয়েছে। শেষ করে দিয়েছে নগর-বন্দর-জনপদ, সভ্যতা কৃষ্ণ সবিকৃষ্ণ। যেটুকু তার অবশিষ্ট আছে, তাকে আর কোনোমতেই এই জ্যৈষ্ঠ প্রবণতার শিকার হতে দেয়া যাবে না। দেশে মুক্তিমুক্ত চলছে। যুক্তাটা এগিয়ে যাচ্ছে তত চূড়ান্ত পর্যায়ের দিকে। একটার পর একটা জনপদ মুক্ত হচ্ছে। আরো হতে থাকলে। নিজেদের দেশে, নিজেদের মুক্তাধ্বলে, নিজেদের সম্পদ কোনোভাবেই লুট প্রয়োকরা চলবে না। কমাত্তার সদরুন্দিন এটা কোনোভাবেই হতে দিতে চান না। গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলোর নিরাপত্তা বিধান করা এবং সম্পদ পাহারা দেবার জন্য চাই বিশ্বস্ত দলের। সে জনাই তিনি বেছে নিয়েছেন আমাদের দলকে। তাঁর নির্দেশ অনুযায়ীই শহরসুলের নেতৃত্বে ১৫ জনের একটা দলকে সংক্ষিপ্ত ব্রিফিং দিয়ে নিয়োজিত করি সুগার মিলে। তারা নিজেদের নতুন দায়িত্ব পালনে মিল প্রাপ্তবের দিকে চলে যায়। আমরাও এগিয়ে যাই চলমান অন্য কলামগুলোর সাথে।

ভালোবাসা ভালোবাসা

জিন্নাহ,

আমি তোমাকে ভালোবাসি। কতো যে ভালোবাসি, তা বলবার ভাষা আমার নেই। তুমি যে কেনো আমাকে বুবাতে পারো না, তা আমি জানি না। আমার সমস্ত হৃদয় জুড়ে শুধু তুমি আর তুমি। রাত-দিন শুধু ভাবি তোমাকেই। তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচবো না। তোমাকে খুব দেখতে ইচ্ছে করে, সব সময় কাছে পেতে ইচ্ছে করে। বারবার বলতে ইচ্ছে করে জিন্নাহ তোমাকে আমি ভালোবাসি ভালোবাসি...।

নীল কাগজে লেখা চমৎকার একটা প্রেমের চিঠি। আমরা যেখানে বসে আছি তার কাছেই পরিত্যক্ত বাড়িটার আঙিনায় ছড়ানো কাগজপত্রের স্তুপ থেকে চিঠিটা উকার করে লাফাতে লাফাতে আসে বকর আর বলতে থাকে, পাইছি পাইছি!

হৈচে করে ওঠে ছেলেরা। বকর কী পেয়েছে সেটা জানতে চায় সবাই। তখন বকর

বলে, চিঠি। প্রেমের চিঠি।

পিন্টু তার হাত থেকে চিঠিটা নিয়ে তাতে একনজর চোখ বুলিয়ে বলে ওঠে, জিন্নাহ
মিয়াকে লেখা তার প্রেমিকার গভীর প্রেমের চিঠি মাহবুব ভাই। দারুণ ভালোবাসা! কিন্তু
কোন্ঠে যে এ্যালা জিন্নাহ মিয়া আর কোন্ঠে যে উয়ায়ার প্রেমিকা। পলেয়া বেড়াবার লাগছে
বুঝি এ্যালা ওমরা।

পিন্টুর এই রসিকতায় হেসে ওঠে সবাই। এবার আমি ওর হাত থেকে চিঠিটা তুলে নিই।
চমৎকার মেয়েলি হাতের গোটা গোটা হরফে লেখা। নিশ্চয়ই শিক্ষিত হবে মেয়েটি। কলেজে
কিংবা ভাসিটিতে পড়ে। জিন্নাহ মিয়া যে কে কিংবা কি সে করে, সেটা বুঝবার উপায় নেই।

নিশ্চয়ই সেও ছাত্র। কলেজ কিংবা ভাসিটির। নীল কাগজে এ চিঠি একজন মেয়ে লিখেছে
জিন্নাহ নামের ছেলেটিকে, যাকে সে ভালোবাসে গভীরভাবে। চিঠিটার একটা মাত্র পাতা উক্তার
করতে পেরেছে বকর। আরো পাতা ছিলো। পাওয়া যায় নি। ছেলেটার নাম জিন্নাহ। মেয়েটার
নাম জানা সঙ্গে হয় না। আমরা তাদের দু'জনের কাউকেই চিনি না। তবে দুটি ছেলেমেয়ের এক
নিটোল প্রেম আর তাদের দ্বন্দ্যের গভীর অনুভূতি প্রকাশিত হয়েছে নীল কাগজের ওপর গুটি
কতক লাইনের পরিচ্ছন্ন লেখাগুলোতে। এখন কোথায় এই প্রেমিক জুটি? ওরা বেঁচে আছে কি
না তাই-বা কে জানে? হয়তো যুক্ত তাদের দু'জনকেই শেষ করে দিয়েছে। নয়তো দু'জনের
একজনকে। হয় ছেলেটিকে, কিংবা মেয়েটিকে। ছেলেটি হয়েতু আমাদের মতোই যুক্তে গেছে।
মেয়েটি হয়তো বসে আছে অধীর আঘাত আর অপেক্ষা নিত্যে তার প্রেমিকের জন্য। এরকম প্রশ্নে
আন্দোলিত হতে আর তাবনা তাবনে এ মুহূর্তে ভালোই লাগে। আর কি হয়, মনে মনে সিদ্ধান্ত
নিয়ে ফেলি, দেশ যদি অবশ্যে সত্যিকার অধৈ ক্ষেত্রে হয়েই যায় আর সেদিন পর্যন্ত যদি বেঁচে
থাকতে পারি, তবে এখানে একবার আসেবাব দ্রুজে বের করবো জিন্নাহ নামের ছেলেটিকে।
জিগ্যেস করবো তাকে, সে তার প্রেমিককে দ্রুজের পর খুঁজে পেয়েছিলো কি না!

অবশ্যে খাবার আসে। অস্তরে বেশ বড়ো মতো একটা বাঁশঝাড়ের সামনে সবুজ
ঘাসের ওপর বসে আছি। সুগর টেলের এলাকা পার হয়ে পাকা সড়ক থেকে বাঁ দিক দিয়ে
চলে যাওয়া কাঁচা রাস্তা ধরে এগিয়ে যাবার নির্দেশ এসেছে। সে মোতাবেকই কাঁচা রাস্তা
ধরে কিছুটা এগিয়ে এসে বাঁশঝাড়ের তলায় সবুজ গালিচার মতো ঘাসে ছাওয়া মাটিতে
কিছুক্ষণ জিরিয়ে নেবার অবসর মিলেছে। আর এরকমই অবসরের কোন্ ফাঁকে পাশের
বাড়িটা থেকে বকর এই চিঠিটা উক্তার করে নিয়ে আসে। তারপর তো সেটা নিয়ে একটা
মোটামুটি হৈচৈ কাঞ্চে শুরু। চিঠিটা বকর রেখে দিয়েছে এই বলে যে, রাখি এটা আমার
কাছে খুব ভালো লাগলো চিঠিটা। আসলে বকরের বুকের ভেতরে গভীর এক প্রেমিক
পুরুষের বসবাস। নিজের স্ত্রীকে ফেলে যুক্তে এসেছে সে। সব সময় উন্ননা থাকে এ জন্য।

দিগন্তজোড়া ফসলের মাঠ, এগিয়ে চলা শুধু

খাবার আসে। রুটি আর মাস। পেটে দারুণ খিদে বলে গোছাসে গোলা হয় সেই খাবার। এখন
দুপুর বারোটার মতো বেলা। ঠিক এ সময়ই মুভমেন্টের অর্ডার আসে। আমাদের এগিয়ে যেতে
হবে সোজা মাঠঘাট প্রান্তের আর ফসলের খেত ইত্যাদি মাড়িয়ে, ডানে পাকা সড়ক রেখে।

সমস্ত ফ্রন্ট এগিয়ে চলে। ফসলের দিগন্ত জোড়া মাঠ। ধানখেত। সোনালি ধানের শীঘ্রের
ভাবে নৃয়ে পড়েছে ধানগাছের মাথা। কোথাও কোথাও উচু ডাঙা জমিতে আখখেত। ধানগাছের

গোছা কোমর পর্যন্ত জড়িয়ে ধরে। দু'পা দিয়ে ঠলে ঠলে এগতে হয়। পাকা ধানের সেই পরিচিত নেশা ধরানো গুৰু। শীতের দুপুর। রোদের চমৎকার আবেজ। ঝকঝকে দিন। বাংলাদেশের বুকের ভেতর দিয়ে অস্ত্র হাতে এভাবে এগিয়ে যাওয়া, কী যে ভালো লাগে!

মনের ভেতরে আনন্দের ফল্পন্থারা বায় যায় নির্বিশীর্ণ মতো। আর এই রকম পরিবেশে পিন্টুর শিল্পী হৃদয় উথলে ওঠে যেনো আবেগে। গলা ছেড়ে সে গেয়ে ওঠে 'আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে কখন আপনি...' পিন্টু গাইছে আর তার টেলিগানটা সিটারের মতো করে হাতে ধরা। তার গভীর উদাস গলার গান ছড়িয়ে পড়ে এই দিগন্তজোড়া ফসলের মাঠে। উদাস নির্মল আকাশে-বাতাসে। যুদ্ধের অ্যাডভাল করার সময় গান গাওয়া ঠিক নয়। সুবেদার খালেক কাছে-পিঠে থাকলে সঙ্গত একথা না বলে থাকতে পারতেন না। কিন্তু মুখে বললেও তিনি হয়তো কার্যত আজকের এই বিশেষ পরিস্থিতিতে বাধা দিতেন না পিন্টুকে। বিষ্ণুর এলাকা জুড়ে ফ্রন্ট এগিয়ে চলেছে। এ বিজয় যাত্রায় সবারই প্রাণে যে আনন্দ, যেরকম খুশির নাচন, সুবেদার খালেকও তার একজন অন্যতম অংশীদার। তিনি নিজেও হয়তো এই অহ্যাত্মায়, এই মন পাগল করা প্রাকৃতিক পরিবেশে স্তুপন করে গাইছেন নিজের হারানো দিনের কোনো প্রিয় গান।

এভাবে এগতে এগতে বিকেল হয়ে আসে। এরি মধ্যে বেশ কঠি গ্রাম জনবসতি পার হয়ে এসেছি। সামনে যে বড়ো ঘামটা পড়ে, প্রায় জনবিবান, সেটা ও একসময় পেরিয়ে যাই আমরা। সামনে পড়ে এবার বিরাট বিস্তৃত একটা ফসলের মাঠ। মাঝে মাঝে বরাবর পৌছুতেই আমরা আকর্ষিকভাবে পাকবাহিনীর বর্ষিত শেলের আওতার ভেতরে পড়ে যাই। প্রচণ্ড শেল আসতে থাকে সামনের দিক থেকে। দু' তিনশো গজ সামনে স্টেল্লা ফাটে একটার পর একটা। প্রচণ্ড বিক্ষেপণের শব্দ হয়। কালো ধোঁয়া কুকুরী পানিটো ওঠে ওপরের দিকে। বিক্ষেপণের জায়গায় বড়ো বড়ো গর্তের সৃষ্টি হয়। আর সেই গর্তের মাটি কাদা ছিটকে ওঠে ওপরে। প্রকৃতির এই সুন্দর পরিবেশের নিষ্ঠুরতা ভেঙে থম্ব কুম হয়ে যায়। জেগে ওঠে যুদ্ধের নিষ্ঠুরতা আর বিভাষিকার তাওব। সামনে থেকে উঠে উড়ে আসে একেবার পর এক মৃত্যুবাণ। এগুলোকে ঠেকাবার কোনো উপায় নেই। ক্ষেত্রের মাঠে মাটিতে বুক ঠেকিয়ে ঝুঁক নিষ্পাসে প্রতিটি শেল ফাটবার অপেক্ষা নিয়ে থাক। বুকের ভেতর শঙ্কা মাখানো দ্রিমি দ্রিমি শব্দ বেজে চলে। বোঝ শেলের এই অভিভূত আমাদের এর আশেই ভালো করে হয়েছে। মনে হয়, প্রতিটি উড়ে আসা শেলই বুঝি সোজা এসে পড়বে পিঠের ওপর। যখন পড়ে না, তখন স্বষ্টি ফিরে আসে মনে, কিন্তু পর মুহূর্তেই উড়ে আসা অপরাপর শেলের জন্য আবার দম বক হবার উপক্রম হয়।

পুরো বিকেলটাই চলে এই শেল আক্রমণ। আমাদের ফ্রন্টের বিস্তার এখন বেশ বড়ো। প্রায় আধামাহিল ছাড়িয়ে যাবে। ফলে পাকবাহিনীর আর্টিলারি আক্রমণ ফ্রন্টের তেমন কিছু ক্ষতি করতে পারে না। দু' চারজনের পিপাটারের সামান্য আঘাত ছাড়া বড়ো ধরনের কোনো ক্ষয়জ্যোলটিজ ঘটে না। এদিকে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে। আমাদের অহ্যাত্মা থেমে যায়। পঞ্চাঙ্গ থেকে প্রায় ৪ মাহল সামনে একটি কাঁচা রাস্তার আড় নিয়ে আমাদের যাত্রাবিরতি হয়।

ট্যাঙ্ক সমাবেশ

নায়েব সুবেদার মোসাদ্দেক উত্তেজনা-ভরা গলায় বলে ওঠেন, 'ট্যাঙ্ক আয়া পড়ছে দাদু, আর চিন্তা নাই। এইবার যুদ্ধটা কেমন জইম্যা উড়ে দেখবেন।'

উত্তেজনায় রীতিমতো জ্বলজ্বল করে মোসাদ্দেকের সারা মুখ। অহ্যামী ফ্রন্টের সাথে ট্যাঙ্ক

বাহিনী যোগ দিয়েছে। এটা নিশ্চয়ই একটা বিরাট ঘবর সবার জন্য। ট্যাক্সের সাপোর্ট নিয়ে শহরে বিকল্পে অ্যাডভালস করার ব্যাপারটা অনেক সহজতর হয়ে উঠেবে। পাকবাহিনীর সম্মুখবর্তী শক্ত বাধাগুলো ট্যাক্সের সাহায্যে সঁজিয়ে দেয়া যাবে সহজেই। পঞ্জগড় সুগার মিল এলাকায় পাকবাহিনীর বিকল্পে গতরাতেই ট্যাক্স ব্যবহার করেছে মিত্রবাহিনী প্রথমবারের মতো। পঞ্জগড় গ্যারিসনে পাকবাহিনীর কাছে কোনো ট্যাক্স ছিল না। আমাদের এতোদিনের পুরু রাখা ধারণা পাল্টে গেছে পঞ্জগড় দখলের পর। পাকিস্তানি বাহিনীর সমরসজ্জা সম্বন্ধে বিরাট ধারণা ছিল আমাদের সবারই মনে। এতো প্রতাপশালী বাহিনী তারা, এতো তাদের নাইডাক! কিংবদন্তির মতো তাদের শক্তি ও সাহস। সবকিছু মিলিয়ে আমাদের ধারণায় তারা ছিল অপ্রতিরোধ্য এক বাহিনী। এ বাহিনীর সাথে রিজার্ভ শক্তি হিসেবে অবশ্যই ট্যাক্স রয়েছে বলে আমার বক্তব্য ধারণা ছিল। ভয়ঙ্কর জিনিস এটা, যুদ্ধের মাঠে ট্যাক্সকে বলা হয় চল্লষ্ট দুর্দশ। এর মোকাবিলা করবার মতো পূর্ব প্রস্তুতি তথা অ্যান্টি ট্যাক্স অন্তর্পাতি, মাইন ফিল্ড আর ট্যাক্স প্রতিরোধ পরিষ্কা এগুলো না থাকলে কালো শরীর নিয়ে এগিয়ে আসা পুরু ইস্পাতের তৈরি পোকার মতো এ যন্ত্রনাবকে আটকাবার কোনো উপায় থাকে না। পঞ্জগড়ে পাকবাহিনীর হাতে ট্যাক্স ছিলো না। মিত্রবাহিনীর ট্যাক্স আক্রমণের মুখে টিকতে পারে নি তারা। টেকবার প্রশ্নই আসে না। তাই ঘাঁটি ছেড়ে তাদের পালাতে হয়েছে। তো, সেই ট্যাক্স বাহিনী এখন এসে যোগ দিয়েছে আমাদের সাথে। ন্যায়ের সুবেদার মোসাদ্দেক তাই এতোটা উত্তোলিত।

— কতোগুলো ট্যাক্স দাদু?

— শুনতাছি এক কোয়াজ্বন। ওরা আমাগো লাইলেই খাড়াইছে এখন।

বিমান বাহিনীতে ১২টি বিমান দিয়ে একটু ক্ষয়াজ্বন হয়। ট্যাক্সেরও কি তাই? আমার ঠিক জানা নেই। বিমান বাহিনীর মতো হচ্ছে তো ১২টি ট্যাক্স থাকবার কথা। এতোগুলো কি? কে জানে। ব্যাপারটা সম্পর্কে পেছু পেতে হয়।

ছেলেদের অবস্থান দেখিয়ে দিচ্ছেন্টে তারা মাটির গর্তে তাদের অশ্রয়ের জন্য ট্রেক্স খোঁড়ার কাজে লেগে যায়। বকর মিয়ার দাঁড়িতে আমাদের ট্রেক্স কাম বাক্সার। লে, মাসুদ আর সুবেদার খালেকের বাক্সারের পাশাপাশি জায়গা নিয়ে সেও কাজে লেগে যায়। কাঁধে স্টেনগান ঝুলিয়ে পিটুসহ আমরা দু'জন এগিয়ে যাই সামনের ট্যাক্সগুলোর অবস্থানের দিকে। গৌ-গৌ ঘড়জগড় শব্দ আসছে সেদিক থেকেই। সন্ধ্যার অক্ষকারের আগেই ট্যাক্সগুলো তাদের অবস্থান নিয়ে নিছে রাতের জন্য। প্রায় শ'দুয়েক গজ এগিয়ে যেতেই স্পষ্ট দেখা যায় ট্যাক্সগুলো। একটাৰ পাশে আরেকটা সারবদ্ধভাবে দাঁড়াচ্ছে সেগুলো। ঘন কালো রঙ তাদের, অক্ষকারেও চকচক করে। ট্যাক্স আসলে ট্যাক্সেরই মতো। ছবিতে, যুদ্ধের সিনেমায় বহুবার দেখেছি এই ট্যাক্স। সামনে নাকের মতো বেরিয়ে থাকা লঘা কামান। দু'পাশে কনভ্যোৱ বেল্ট। চাকা নেই। এই বেল্টের সাহায্যেই এগুলো চলে। ট্যাক্সের ওপরের দিকে একটা গোল ঢাকনা। ঢাকনাটা খোলা ও বন্ধ করা যায়। একটা লঘা এন্টিন সামনের দিকে প্রসারিত। রেডিও যোগাযোগের জন্য।

একটা উচুমতো ডাঙা জমিতে সমবেত হয়েছে ট্যাক্সগুলো। সংখ্যায় তারা মোট ৬। গাছের ডালপাতা দিয়ে ক্যামোফ্লেজ করা হয়েছে। ঘন বাঁশবাড়ের আড়ালে নিয়ে সুন্দর আস্তানা বেছে নিয়েছে ট্যাক্স বাহিনী। ট্যাক্সের চালক সৈনিকরা ব্যতিব্যস্ত নানা কাজ নিয়ে। একদল সৈনিক বাঁশবাড়ের চারদিকে ট্রেক্স করে সামনের দিকে মেশিনগান তাক করে বসে আছে। ট্যাক্সের সাথে চলমান পদাতিক বাহিনীর সদস্য এরা।

সামনের ট্যাক্সিলোর বাস্তব অবস্থান দেখে যুক্তি সারা শরীর রোমান্তিত হয়ে ওঠে। শক্রবাহিনীর সাথে সামনাসামনি যুদ্ধ করতে করতে এগিয়ে এসেছি অনেক দূর পর্যন্ত। যুদ্ধের এ কটা দিনে সব ধরনের যুক্তান্ত্রের অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হতে হয়েছে। কেবল ট্যাক্স বাদ ছিল। আজ সেগুলোও এসে যুক্ত হলো আমাদের ফ্রন্টে। এখন ট্যাক্সের সাথে সাথে এগিয়ে যাবো আমরা। একটা অলআউট যুদ্ধ তথা সর্বাত্মক যুদ্ধের প্রকৃত রূপ এখন আমাদের অভিজ্ঞতার বোলায় সঞ্চিত হবে। সিনেমায় দেখা ছিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শরণীয় বিভিন্ন দৃশ্য ভেসে ওঠে মনের পর্দায়। ট্যাক্স এগুচ্ছে। তার আগেগিছে এগিয়ে যাচ্ছে পদাতিক বাহিনী। কাল সকাল থেকে হয়তো-বা এই দৃশ্যের অবতারণা হবে। লঙ্ঘাদেহী একজন অফিসার ডাক দেন আমাদের। কাছে যেতেই তিনি বলেন, হ্যালো ইয়াংম্যান, হাউ ডু ইউ ডু?

— ফাইন। থ্যাক্স ইউ স্যার।

— মহানান্দিধি কেতনা দূর হোগা?

— তিন-চার মাইল হোগা।

তিনি আর কিছু বলেন না। ফিরে আসি আমরা আমাদের অবস্থানের দিকে। রাত নেয়ে এসেছে তখন। সঞ্চ্যা রাত। মাসুদের বাস্তারের কাছে আসতেই চমকে উঠতে হয়। ওয়্যারলেস সেট অন করা ছিলো। তাতে ক্যাপ্টেন শাহীরিয়ারের প্রচণ্ড ধর্মক ভেসে আসে। তিনি বলছেন, ইউ বাস্টার্ড কল দেম কার্ট। ডেট সে ট্যাক্স অভিভাব্যাট ওভার।

সিগনালম্যান ট্যাক্সের উপস্থিতির কথা বলে সম্ভবে স্টেশন দিছিলো ক্যাপ্টেনের কাছে। সে তার রিপোর্টে বারবার উল্লেখ করছিলো ‘ট্যাক্স’ শব্দটি। এতেই কেপে গেছেন ক্যাপ্টেন। ওয়্যারলেসের ম্যাসেজ শক্রপক্ষ ইন্টারসেপ্ট কর্তৃত পারে তাদের নিজস্ব সেটে। সেক্ষেত্রে ট্যাক্সগুলোর উপস্থিতি শক্রপক্ষও জেনে যান। সংখ্যাসহ। এতে তারা সাবধান হয়ে ট্যাক্স প্রতিরোধক প্রতিপক্ষ ব্যবস্থা নেবে। একবার ক্যাপ্টেনের এই রাগের বহির্প্রকাশ। তিনি ট্যাক্সের বদলে তাই ‘কার্ট’ শব্দটা ব্যবহার করতে বলছেন। অবশ্যই যুদ্ধের ভাষায় এটা ‘কোড ওয়ার্ড’।

সিগনালম্যান ছেলেটি ধূমকেঠোয়ে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যায়। মাসুদ দ্রুত ছুটে এসে সেটের স্পিকার হাতে নিয়ে ক্যাপ্টেনের উদ্দেশে রিপোর্ট দিতে থাকেন।

— কার্টস আর অলরেডি ইন দেয়ার পজিশন স্যার। ওভার।

— হাউ মেনি অফ দেয়ার নাশারঃ ওভার।

— দে আর সিঙ্গ স্যার। ওভার।

— হাউ ফার দে আর ফ্রম ইয়োর পজিশনঃ ওভার।

— অ্যাবাউট টু হান্ডেড ইয়ার্ডস ইন আওয়ার রাইট হ্যান্ড সাইড স্যার। ওভার।

তাদের কথাবার্তা চলতে থাকে। আমরা চলে আসি আমাদের অবস্থানে। আজ রাতে বিশ্বাস দরকার। কাল হয়তো অনেক ধক্কা যাবে শরীরের ওপর দিয়ে।

ট্যাক্স অভিযান

খুব সকালে নির্দেশ আসে কমান্ডারের এভাবে, ট্যাক্স কমান্ডারের কাছে রিপোর্ট করো ১৫ জনের একটি দল নিয়ে। ট্যাক্স বাহিনীকে গাইড করতে হবে। কুইক।

ভালোভাবে আলো ফোটে নি তখনো। কুয়াশা তার চাদর বিছিয়ে রেখেছে সারা ফ্রন্টে। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা পড়েছে। টুপটোপ করে হিম ঝরে পড়েছে গাছের লতাপাতা থেকে। কস্বলের

বাইরে বের হলে শরীর জমে যেতে চায়। তাড়াতাড়ি শিয়ে রিপোর্ট করতে হবে ট্যাঙ্ক বাহিনীর কমান্ডারের কাছে। তাদের পথ চিনিয়ে নিয়ে যেতে হবে ময়দানদিঘির দিকে। বটপট তুলে নিয়ে আসি চোখে তখনে ঘূম-জড়ানো ছেলেদের তাদের ট্রেক্সের ভেতরকার উষ্ণতা থেকে। ৫ থেকে ৭ মিনিটের ভেতরেই তৈরি হয়ে নিই। এরপর ১৫ জনের দল নিয়ে দ্রুত হাজির হই ট্যাঙ্কের সমাবেশস্থলে।

তাদের প্রস্তুতি প্রায় সম্পন্ন। অ্যাডভাস করার আগে ফাইনাল চেকিং হচ্ছে। গত সক্ষ্যায় সামান্য পরিচিত সেই অফিসারিটি ট্যাঙ্ক কমান্ড। একজন লেফটেন্যান্ট কর্নেল তিনি।

আমরা পৌছুতেই তিনি আন্তরিকভাবে স্বাগত জানান, হালো বলে।

আমি তাকে জানাই কমান্ডার আমাদের পাঠিয়েছেন তাদের গাইড করার জন্য। তিনি ঝুশি হন। তনে বলেন, ইয়েস ইয়াংম্যান, আই হোপ তুম সাব হামলোগোকে গাইড করনে সাকোগে। ইয়ে এরিয়া হামলোগ তো নেহি পহচানতা হ্যায়। এ্যান্ড উই ডোন্ট ওয়ান্ট টু সি আওয়ার-সেলভস্ লকড্ ইন এনিমিস ট্রাপ...।

কথা বলতে বলতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তিনি চা খাচ্ছিলেন। ট্যাঙ্ক বাহিনীর জন্য আলাদা ধরনের ইউনিফর্ম। প্যান্ট-শার্ট একসাথে সেলাই করা। বৈমানিকদের মতো। ট্যাঙ্কের কুদের পোশাক একই ধরনের। কোজি ভাষায় ‘ডাংরি’ বলে এই ইউনিফর্মকে। তবে কর্নেল স্বাভাবিক ইউনিফর্ম্মে সজ্জিত।

ঘড়ঘড় শব্দ করে চলে ট্যাঙ্কের ইঞ্জিনগুলো। কর্নেল জিম্যোস করেন,

— টেকেন ইয়োর ব্রেকফাস্ট!

কিছুটা অঙ্গুত হতে হয় এ প্রশ্নে। মিথ্যে কিছু বলে লাভ নেই। বলি, নো স্যার।

একজন জে.সি.ও.-কে ডেকে তিনি অফিসারের চা-নাস্তা দিতে বলেন। গরম পুরি আর চায়ের মগ ধরিয়ে দিয়ে যায় সুবেদার অফিস দু'জন সঙ্গীদের নিয়ে। আমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সেই পুরিতে কামড় দিই, চা খাই আন্তর্দেশি ওদের প্রস্তুতি।

ট্যাঙ্ক কমান্ডার ওয়্যারলেস প্রেটে কথা বলেন তাঁর হেড কোয়ার্টারের সাথে। আওয়ান মিত্রবাহিনীর কমান্ডারদের সাথে। কথা বলেন মুক্তিবাহিনীর কমান্ডারের সাথেও। তিনি গাইড পেয়েছেন পথ দেখাবার কাজে এ কথাও জানান তাকে। ট্যাঙ্ক বাহিনী এগুবে পদাতিক বাহিনীর সাপোর্টে। ট্যাঙ্কের সাথে সাথে এগিয়ে যাবে পদাতিক বাহিনী। এ পদাতিক বাহিনী যৌথভাবে মিত্র ও মুক্তিবাহিনী নিয়ে গঠিত। মিত্রবাহিনীর সৈনিকদের সবাই পেশাদার ভারি যুক্তসাজে সজ্জিত। মুক্তিবাহিনীর মূল শক্তি ই.পি.আর. আর তাদের সাথে যুক্ত হয়েছে অপেশাদার স্বল্প সময়ের প্রশিক্ষণগ্রাহণ মুক্তিফৌজসহ এফ.এফ. সদস্যরা। মিত্রবাহিনীর মতো ভারি যুদ্ধের সাজসজ্জা তাদের নেই। তো, এই পেশাদার, অপেশাদার, সামরিক, আধা-সামরিক ও বেসামরিক যোদ্ধাদের নিয়ে গঠিত যৌথ কমান্ড এখন পাকবাহিনীকে পিছু ধাওয়া করে এগিয়ে যাচ্ছে। তারা এখন শক্ত হয়ে প্রতিরোধ ঘাঁটি গেড়ে বসেছে ময়দানদিঘিতে। স্ট্র্যাটেজির দিক দিয়ে ময়দানদিঘির অবস্থান অত্যন্ত শুরুত্বপূর্ণ। পঞ্চগড়ের পর ময়দানদিঘিতে সমবেত পাকবাহিনী চাইবে যেভাবেই হোক ধরে রাখতে তাদের সেই অবস্থান। তাকে ভাঙ্গার প্রচেষ্টা অবশ্যই চলবে। ট্যাঙ্কের সাপোর্ট নিয়ে মিত্রবাহিনীর যৌথ সংখ্যা এবং শক্তি বেড়ে গেছে বহুগুণ। মুক্তিবাহিনীর শক্তি বর্তমানে প্রায় দেড় ব্যাটেলিয়নের মতো। মিত্রবাহিনীর দুটো ব্যাটেলিয়নও যোগ দিয়েছে। শোনা যাচ্ছে ব্যাটেলিয়ন দুটো ৭-মারাঠা এবং ২১-রাজপুত

রেজিমেন্টের। ট্যাঙ্ক কমান্ডার এখন যাত্রা শুরু করবেন। তাই ফ্রন্টের সবগুলো ইউনিটের সাথে সময়ের জন্য কথা বললেন। স্ট্র্যাটেজিও ঠিক করলেন। এগিয়ে যাবার সময়ে অবশ্যই সার্বক্ষণিক যোগাযোগ থাকবে সবার সাথে। রওনা দেবার আগে চূড়ান্ত আলোচনা শুরু হলো।

কর্নেল বললেন, প্রতি ট্যাঙ্কে দুই খেকে তিনজন করে ছেলে তুলে দাও। তুম হামারা সাথে রাহেগো, অন মাই ট্যাঙ্ক।

— ও.কে. স্যার বলে আমি ছেলেদের ভাগ করে দিলাম প্রতি ট্যাঙ্কের জন্য দু'জন করে। আমার সাথে রইলো হাফেজ আর পহর আলী। কর্নেল বললেন, তুম রুট চিনতা হ্যায় না? ডিরেকশন মে কোই মিসটেক তো নেই হোগা?

এ কথায় ধাক্কা খেতে হয়। কিছুটা অপ্রসূত আর অস্বত্তির ভাব জাগে। এ এলাকার পথগাট বলতে গেলে কিছুই চিনি না আমি। ময়দানদিঘি কোথায়, সেটাও জানি না। কিন্তু এখন সে কথা বলবার কোনো উপায়ই নেই। এরা জানে, এসব এলাকার সবকিছু আমাদের নথদর্পণে। বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধা ছেলেরা তাদের নিজেদের দেশের ভেতরে গাইড করে নিয়ে যাবে মিত্রাহিনীর ট্যাঙ্ক ইউনিটকে, এই আশা এবং বিশ্বাস তো তারা করতেই পারেন।

নির্দেশ পাবার সাথে সাথে ট্যাঙ্কের তুরা ওপরের ঢাকনা তোলা মুখ গলিয়ে ঝটপট তুকে যায় তার ভেতরে। প্রতিটি ট্যাঙ্কের ওপরে ঢাকনা তোলা মুখে মাথা উচিয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন প্রতিটি ট্যাঙ্কের কমান্ডার। কর্নেল তাঁর ট্যাঙ্কে ওঠেন। মাথা উচিয়ে ঝটপট ঢাকনা তোলা সেই গহবরের বাইরে। মাথায় তাঁর হেলমেট। গলায় দূরবীন। ট্যাঙ্কের উপর সমৃথবর্তী জায়গাটায় বসেছি আমি হাফেজ আর পহর আলীকে নিয়ে। পুরু ইস্পাত্তের প্রতির শরীর সামনের দিকে একাটুখানি ঢালু মতো। বসতে অসুবিধে হয় না বিশেষ। জলীয়াতায় ট্যাঙ্কের ওপরটা ক্যামোফ্লেজ করার চেষ্টা হয়েছে। বসে থাকি তার মধ্যেই। অবশ্যই বসেছে সেভাবেই। ট্যাঙ্কের ভেতরে নেয়া হয় নি আমাদের। পথ-প্রদর্শক আমরা ভেজতে নিলে তো আর পথ দেখানো যাবে না। ট্যাঙ্কের ওপর আক্রমণ হলে নিষ্পত্তিভাবেই আঞ্চলিক আঘাতপ্রাণ হবো আমরা। আর এরকম সংস্কার মনের মধ্যে যে উকি দেয় না, তা নয়। কিন্তু আমল দিই না তাতে। আমাদের প্রয়োজনে নিয়ে যাচ্ছি আমাদের বস্তুদের, এ রিস্কটুকু তো নিতেই হবে। ট্যাঙ্কের শরীর থেকে কেমন অন্যরকম একটা গাঢ় পাই। পেট্রোলের গন্ধও নাকে লাগে। প্রতিটি ট্যাঙ্কের পেছন দিকে অতিরিক্ত জ্বালানি মজুদ হিসেবে পেট্রোলের ড্রাম বেঁধে নেয়া হয়েছে। ইঞ্জিন চালু রয়েছে। একটা বানবান শব্দ হয়, থরথর করে কাঁপে চলত দুর্ঘের মতো ট্যাঙ্কটার বিরাট শরীর। মনের মধ্যে নানা ধরনের অনুভূতি কাজ করে চলে। ভয়-ভীতি তেমন নেই। প্রবলভাবে মনে যে অনুভূতিটা কাজ করে, তাহলো, এ যুদ্ধে তাহলে ট্যাঙ্কে ঢুকার অভিজ্ঞতাও হলো আমাদের!

ট্যাঙ্ক চলা শুরু করে। প্রথমে একটা বাঁকুনি লাগে। তারপর নড়ে ওঠে এর সারা শরীর। শব্দ তুলে কনভেয়ার বেল্ট ঘোরা শুরু করে। একটা দৃশুনি এবং ধাক্কা দিয়ে এগিয়ে যাওয়া শুরু করে যুদ্ধের মাঠের সেই চলত দুর্গ।

সামনের বাঁশঝাড়গুলোর ডানদিক দিয়ে বাড়িঘরগুলোকে পাশ কাটিয়ে নেমে পড়ে কর্নেলের প্রথম ট্যাঙ্ক দিগন্ত বিস্তৃত ফসল ভরা প্রান্তরে। দু'পাশ দিয়ে এগিয়ে আসে অন্য ট্যাঙ্কগুলোও। এবার ইঁরেজি অক্ষর ‘ভি’-এর উল্টো অর্থাৎ তীরের মাথার মতো ফরমেশন নিয়ে এগতে থাকে সেগুলো। ৫০/৬০ গজ দূর দিয়ে এগিয়ে যাওয়া কর্নেলের প্রথম ট্যাঙ্ককে অনুসরণ করে চলে অন্যগুলো। সোজাভাবে এগোয় না। ‘জিগজাগ’ ধরনের অর্থাৎ ২০/৩০

গজ ডানে গিয়ে আবার বাঁয়ে ঘোড় নেয়। এভাবে কিছুক্ষণ এগিয়ে আবার বাম দিকে যায়। এক সময় ট্যাঙ্কের শরীর গরম হয়ে ওঠে। রীতিমতো দুলুনি আর ঝাকুনি দিয়ে উচু-নিচু জমি আর আল এসব পার হতে থাকে। বানবন ঘড়ঘড় একেয়ে শব্দে কান তালা লাগাবার যোগাড় করে। কনভেয়ার বেল্টের ধারালো দাঁত রীতিমতো মাটিতে বসে গিয়ে অতিক্রান্ত দু'পাশের জমিতে এবড়োবেড়ো দাগের সৃষ্টি করে।

ট্যাঙ্কের শরীরের ওপর দু'হাতের তালু দিয়ে ভর করে শরীরের ভারসাম্য ঠিক রাখি। সামনের দিকে ছাড়ানো পা। মাঝে মাঝে প্রবল দুলুনিতে মনে হয়, বুঝি গড়িয়ে যাবো। প্রচও ইচ্ছেশ্বরি দিয়ে ভারসাম্য ঠিক রেখে বসে থাকবার নিরন্তর চেষ্টা চালিয়ে যেতে হয়। নাকের মতো লোক কামানের নলটি দুলুনির জন্য ঝটানামা করে। সামনে পুব আকাশে গোলাকৃতির সোনার থালার মতো সূর্য হেসে ওঠে। কুয়াশার চাদর সরে সরে যেতে থাকে।

কর্নেল জানেন, এ এলাকার পথঘাট সব আমাদের চেনাজানা। এটি সত্য নয়। কিন্তু ট্যাঙ্কের ওপর বসে রাস্তা চিনি না কোনোভাবেই সেটা বুঝতে দেয়া চলে না। পঞ্চগড় থেকে পাকা সড়কে গেলে ৬/৭ মাইলের মাথায় ময়দানদিঘির অবস্থান— বোনা আব পঞ্চগড়ের মাঝামাঝি জায়গায়। এ তথ্যটা আমার জানা। সেজন্য ডান পাশের পাকা সড়কটাকে ঠিক রেখে অনুমানের ওপর পথনির্দেশ ঠিক করে নিই। প্রায় ৪/৫ শ' গজ দূরে পাকা সড়কটা দেখা যায় একসময়। দু'পাশে তার দাঁড়িয়ে থাক গাছের সাবি পুঁষ্টি বরাবর রেখে ট্যাঙ্কের চলতি অবস্থান ঠিক করে নিই। এই পদ্ধতিতে মনে হয় পথ উচু করবার উপায় নেই কোনো। তাই ট্যাঙ্ক ক্ষোয়াড়কে সঠিক দিকনির্দেশনা দিয়ে যেতে পারেন্তে বোধহয় শেষ পর্যন্ত।

কর্নেল আমার দিকে তাকালেই আমি আঙুল শারা করে সামনের দিকটা দেখিয়ে দিই। সে অনুসারে তিনি চালককে নির্দেশ দেন '৩/৪ শ' গজ এগুবার পর হঠাতে করে হাতের ইশারায় সমস্ত ট্যাঙ্ক বহরকে তিনি ধূঁধুতে বলেন। সামনে নরম আর সদ্য খোঁড়া মাটি কিংবা উচু ঢিবির মতো কোনো কিছু নথলেই তিনি নির্দেশ দেন আমাদের নেমে গিয়ে দেখে আসতে। কখনো নিজেও নেই আসেন। পেছনে পেছনে এগিয়ে আসা পদাতিক বাহিনী তখন পজিশনে চলে যায়। নরম মাটি আর সন্দেহজনক জায়গাগুলো আসলে পরীক্ষা করে দেখতে হয় সে সবখানে কোনো রকম মাইনটাইন পোতা রয়েছে কি না। পাকবাহিনী ট্যাঙ্কের গতি থামাবার জন্য ব্যাপকভাবে মাইন পুঁতে রাখতে পারে। তাই এবারও মাটি পরীক্ষা করে দেখতে হয়। না, মাইন নেই।

আবার যাত্রা শুরু হয়। সূর্য দ্রুত ওপরের দিকে উঠতে থাকে। সময় গড়িয়ে যেতে থাকে। হঠাতে পেছন থেকে উড়ে এসে একটা হেলিকপ্টার যোগ দেয় আমাদের মাথার ওপরের আকাশে। ঘুরে ঘুরে আগে-পিছে যায় হেলিকপ্টারটা। চলমান কলামের সাথে উড়ে চলে আকাশ দিয়ে।

এখন আকাশে হেলিকপ্টার, নিচে ট্যাঙ্ক আর ভারি যুদ্ধের পোশাকে চলমান পদাতিক বাহিনী, একটা বাস্তব যুদ্ধক্ষেত্রের আবহ সৃষ্টি করে।

প্রায় মাইল দূরেক এগুবার পর শক্র চিহ্নিত করে ফেলে এই চলমান বাহিনীকে। প্রচও শেল বর্ষণের সাথে সাথে মেশিনগানের গুলি শুরু হয় সামনে থেকে। কর্নেল তাড়াতাড়ি আমাদের নামতে বলেন। ঝাকুনি দিয়ে ট্যাঙ্ক থেমে যায়। ঝাপ দিয়ে নেমে পড়ি ফসলের খেতে। শরীর ডুবিয়ে পজিশনে চলে যাই। সামনে শক্রের অবস্থানকে চিহ্নিত করা গেছে।

কর্নেল ওপরের ঢাকনি নামিয়ে ট্যাক্সের গহরে ঢুকে যান। আং-গুড়ুম করে শব্দ হয় ট্যাক্সের কামান থেকে। গোলা সোজা দৌড়ে যায় সঞ্চাব্য শক্তি অবস্থানের দিকে। ট্যাক্সের মেশিনগানগুলো থেকে শুরু হয় শক্তির দিকে একটানা শুলিবৰ্ষণ। পদাতিক বাহিনী থাকে শোয়া পজিশন। শক্তির গুলি আসে ঝড়ের গতিতে।

এভাবে গোলাগুলি চলে প্রায় আধ ঘণ্টার মতো। কর্নেল তার ট্যাক্স থেকে মুখ বের করে বলেন, তোমরা চলে যাও তোমাদের ইউনিটে। এনিমির পজিশন পাওয়া গেছে। এখন আমরা আ্যাডভাস করবো এনিকে। গুড বাই।

দুলে ওঠে আবার ট্যাক্সগুলো। গোলাগুলি ফুটিয়ে এগিয়ে চলে সামনের দিকে। তাদের পদাতিক বাহিনীও এগিয়ে চলে ট্যাক্সের পেছনে পেছনে। হেলিকপ্টারটা আগের মতোই মাথার ওপর দিয়ে চক্র দিয়ে চলে।

আমরা থেকে যাই। এখন খুঁজে নিতে হবে আমদের নিজেদের ফ্রন্টকে। নিশ্চয়ই তারা এগিয়ে আসে বাঁদিক দিয়ে। ট্যাক্স থেকে নেমে আসা ১৫ জনের দলটাকে নিয়ে এগিয়ে চলি সেদিকেই। ট্যাক্সের একঘেয়ে শক্ত কানে তালা দিয়ে গেছে আর মাথায় ভোঁ-ভোঁ শব্দের সেই রেশ রেখে গেছে। আর সে অবস্থাতেই এগিয়ে চলি আমরা বঙ্কুদের উদ্দেশ্যে। প্রায় কোয়ার্টার মাইল দূরে পাওয়া যায় তাদের।

এয়ার রেইড সিগনাল

হঠাতে করে খবর আসে ‘এয়ার রেইড’ অর্থাৎ বিমান হামলা হতে পারে। এজন্য সবাইকে নিরাপদ অবস্থায়ে যেতে বলা হয়।

সামনেই একটা ঘন গাছগাছালি দেরা হচ্ছে। সেখানে দ্রুত ঢুকে যায় সবাই। যারা দ্রুততে দেরি করে তাদের উদ্দেশ্যে সুবেদার কান্তিক নোয়াখালীর আঞ্চলিক ভাষা প্রয়োগে গালাগালি আর খিস্তি করতে থাকেন। আমি আজো ছেলেদের নিয়ে সুবিধেমতো একটা জায়গায় অবস্থান নিয়ে নিই। মাথার ওপর বিভিন্ন গাছগাছালির ভেতরে বেশ অস্কার। শুকনো লতাপাতা আর শক্ত মাটি। একটা পরিষ্কার ফাঁকা জায়গা নিয়ে বসে পড়ি। ছেলেরাও যে যার মতো করে বসে যায়। পিচু ও বকররা বসেছে আমার কাছাকাছি। সবার মনে গভীর উৎকষ্ট। বিমান হামলার খবরটা বেশ আতঙ্ক ছড়িয়েছে ফ্রন্টজুড়ে। পাকবাহিনী তাদের বিমান বহর নিয়ে হামলা করতে আসছে। বন-জঙ্গলে অবস্থায় নিলেই তো আর বিমান হামলার হাত থেকে বাঁচা যাবে না। এজন্য চাই মাটির নিচে নিরাপদ অবস্থায়। সেটি নেয়া হয় নি। তাই পাক বিমানবাহিনীর সঞ্চাব্য বিমান হামলার মুৰোয়াবি হবার জন্য দুরু দুরু বুক নিয়ে বসে থাকতে হয়। যুদ্ধের মাঠে ব্যাপারটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ আর স্বর্গীয় মৃহূর্ত। আর সেই মৃহূর্তটাকে ধরে রাখবার তাগিদে পকেট থেকে নেট বই বের করি। আজ নভেম্বরের ৩০ তারিখ। ডায়েরিতে লিখি—

৩০শে নভেম্বর, '৭১

“পঞ্চগড় ছেড়ে এসেছি আমরা কাল। একেবারে ৪ মাইল সামনে Position নিয়েছিলাম। ওরা শেলিং করছিলো, আমাদের অহগতি তাই রোধ হয়েছিলো। আজ সকালে আবার শুরু হয়েছে যাত্রা।

ঠিক কোনু �Direction-এ এগুচ্ছি আমরা জানি না। জায়গাগুলোর নামও জানি

না ! তবুও মাঠঘাট-প্রান্তর-গ্রাম সব ছেড়ে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি ; এগিয়ে যাবো আরো ! এবার লক্ষ্য বোদা ! Unexpected ভাবে এগিয়ে যাচ্ছি আমরা ! Indian Army all along সাথে রয়েছে আমাদের ! বলতে গেলে ওরাই আমাদের রাস্তা Clear করে চলেছে ; কাল ট্যাঙ্ক এসেছে বেশ কটা ! Indian রা এখন ট্যাঙ্ক নিয়ে মার্চ করছে আগে আগে ! পেছনে আমরা !

এখনই Information এলো Air Raid হতে পারে ! সূতরাং সমস্ত Company-টাকে জঙ্গলের ভেতর Camouflage করতে হয়েছে ! এবার হয়তো সত্যিই আসল Fight শুরু হবে !

তিন মাস ট্রেইনিংগ্রাউন্ড একজন লেফটেন্যান্ট কোম্পানির Command করছে ! B-Company মাসুদ ওর নাম ! বরিশাল বাড়ি ! আমি শুধু ওর Commandship লক্ষ্য করছি ! হাতে একটা Wireless Set নিয়ে ভীষণ ব্যস্ত বেচারা... !

মুম্মা এখন আমাদের সাথে রয়েছে ! ওর বাবা বলেছিলো, ওকে বাঁচিয়ে রাখতে ! দেখো যাক ট্রেইনিং না নিয়েও ও পুরোদস্তুর Fighter হয়ে গেছে !

ভালো লাগছে বেশ ! নাম-না-জানা কোনো এক এলাকার জঙ্গলের মধ্যে বসে লিখছি ! জীবনে এরকম Adventure কোনোদিন কঢ়ন্নাও করা যায় না !

হয়তো কোনোদিন আবছা হয়ে আসবে এই জঙ্গলের কথা ! অল্প অল্প মনে পড়বে, ঠিক দিনক্ষণ মুহূর্তের কথা মনে থাকবে না, কিন্তু এই লেখা পাতা কটা যদি টিকে থাকে, সেটা হবে জীবন্ত দলিল !

না, শেষ পর্যন্ত বিমান হামলা হয় না ! আজ্ঞা শা পাকিস্তানি বিমান বহর ! অল ক্রিয়ার সিগন্যাল পাওয়া যায় অবশেষে ! কিন্তু সজ্জার বিমান হামলার আশঙ্কায় জঙ্গলের ভেতরকার আশ্রয়ে কেটে গেছে তখন প্রায় ঘণ্টাধ্বনিক সময় ! তাই অল ক্রিয়ার সিগন্যাল পাওয়ায় সবাই হ্যাফ ছেড়ে বাঁচে ! একটা গভীর অভ্যন্তরের হাত থেকে আপাতত মৃত্যু হয় ! জন্মবুরু অবস্থায় জঙ্গলের অক্ষকারে ভূত্যন্তের ফটক বসে থাকার ভাবটা কেটে যায় ! গভীর স্বষ্টি নিয়ে বের হয়ে আসে সবাই ! সুবেদার খালেক হঁকড়াক দিয়ে আবার শৃঙ্খলাবদ্ধ করতে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েন এলোমেলো হয়ে পড়া ফ্রন্টকে ! মাসুদ ওয়্যারলেস সেটে কথা বলে চলেন ক্যাটেনের সাথে ! মুভমেন্ট অর্জন আসে ! শুরু হয় আবার আমাদের এগিয়ে চলা !

ট্যাঙ্ক বাহিনীর সাথে মিত্রবাহিনীর পদাতিক ইউনিট এগিয়ে গেছে সামনে ! আমাদের অঞ্চলে শুরু হয় বাঁদিক থেকে !

জঙ্গলে এলাকার লাগোয়া একটা বড়ো গ্রামীণ বসতি ! বাড়িগুলোর পাশ দিয়ে কোনো বাড়ির আভিনা দিয়ে এগুতে হয় ! গ্রামে লোকজন নেই বললেই চলে ! পালিয়েছে বউ-বাচ্চাসহ অধিকাংশ গ্রামবাসীই ! গ্রামের পরই আবার দিগন্তজোড়া ফসলের মাঠ ! বাঁদিক দিয়ে কাঁচা রাস্তা চলে গেছে সামনের দিকে ! মাঝখানে রাস্তাটা রেখে এগিয়ে যায় ফ্রন্ট ! আমরা থাকি ডানে, অন্যরা বাঁয়ে !

ময়দানদীষি মুক্ত হলো

কাছাকাছি পৌছনো গেছে ময়দানদীষির ! প্রচণ্ড গোলাগুলি চলছে তখন তার আশপাশে ! ময়দানদীষি দখলের লড়াই শুরু হয়েছে ! সে এক মহি দক্ষযজ্ঞ কাও ! মেশিনগানের অবিশ্রান্ত

গুলিবর্ষণ, ট্যাক্সের ঘড়ঘড় শব্দের পাশাপাশি অন্ত গুড়ুম শব্দের গোলাবর্ষণ। একেবারে ডাইরেক্ট হিট বা সরাসরি আঘাত। ট্যাক্সের কামান বা গান টার্গেটের ওপর সরাসরি আঘাত হানে। মর্টার কিংবা আর্টিলারির মতো ইনডাইরেক্ট অর্থাৎ আঙ্গেলের ওপর নির্ভর করে আকাশের দিকে গোলা ছুঁড়ে টার্গেটকে আঘাত করার চেষ্টা করতে হয় না। পাকবাহিনীর প্রতিআক্রমণের মুখ্য ক্ষ্যাপা দানবের মতো ট্যাক্ষণ্ডোও এগিয়ে-পিছিয়ে হামলা করে চলে তাদের ওপর। ট্যাক থেকে সরাসরি মেশিনগান ও কামানের সাহায্যে গোলাগুলি বর্ষিত হতে থাকে পাঞ্চা দিয়ে।

ডানে প্রায় আধ মাইলের বেশি ব্যর্থানে চলছে এ যুদ্ধ। আমাদের ফ্রন্টকে এ জায়গাতেই অবস্থান নিতে বলা হয়। ময়দানদিঘি থেকে শক্ররা এদিকে ছড়িয়ে পড়লে কিংবা তারা এদিক দিয়ে বেরিয়ে এসে পেছন দিয়ে কাউন্টার অ্যাট্যাক করার চেষ্টা করলে তাদের আটকাতে হবে। এই দায়িত্ব খুবই শক্তপূর্ণ। মূল হামলাকারী দলকে সহায়তা করার পাশাপাশি শক্র কাউন্টার অ্যাট্যাক তথা প্রতিআক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করার দায়িত্বেই অংশ এটা। আক্রমণকারী দলকে সব সময়ই এ ধরনের প্রস্তুতি রাখতে হয়। তা না হলে শক্রবাহিনীর হাত থেকে তাদের ঘাঁটি দখল এবং তা ধরে রাখা কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়।

আমরা বর্তমান কভার দল হিসেবে অবস্থান নিয়েছি। নিজেদের অবস্থান সুসংহত করার জন্য ব্যস্ত সবাই। ফ্রন্টের ডান ফ্লাঙ্কে অবস্থান নিই আমরা। এরপর ধীরে ধীরে খেতবাড়ির একটা উঁচু পাড় ধরে এগিয়ে যাই যুদ্ধের দিকে। অমোচনিত্বাতির মতো যুদ্ধ হলো টানে আমাদের। একটার পর একটা অবস্থান ছেড়ে এগিয়ে যাই সেদিকে। ময়দানদিঘির সিকি মাইলের কাছাকাছি একটি বাঁশবাড়ের তলায় এসে প্রত্যুছে আমরা। দিঘির উঁচু পাড়টা দেখা যায়। দেখা যায় দিঘির পাড় যেনে দাঁড়িয়ে শৌকল শাদ রঙের দালানঘরগুলোও। পাকা সড়কটাকে কেন্দ্র করে যুদ্ধ চলছে তুমুল। সবাইকে সুবিধেয়তে অবস্থান নিয়ে যাব আর মোতালেবকে পুরুরের পাড় লক্ষ্য করে শক্রজনক শক্ত করতে বলি। ওরা নির্দেশমতো তা-ই শক্ত করে। পিন্টুকে বলি ২ ইঞ্জিন মর্টার ছেড়ি। অন্যদেরও তাদের নিজের হাতিয়ার থেকে গুলিবর্ষণ শক্ত করতে বলি। শক্র অবস্থালভে ডান দিক থেকে এভাবেই শক্ত হয় তাদের প্রতি আমাদের আক্রমণ অভিযান। মূল যুদ্ধের সাথে জড়িয়ে পড়ি আমরাও। একটা জীবন্ত যুদ্ধকে ধরে রাখবার প্রচণ্ড তাপিদ থেকে পকেট হাতড়ে বের করে আনি কালো সোটবইটা। সম্মুখবর্তী উঁচু আলের আড়ালে শরীর ঠেকিয়ে ৩০ নভেম্বর, '৭১ তারিখের ভায়েরির পাতায় লিখে চলি আবার,

“আগের Position থেকে প্রায় মাইলখানেক এগিয়ে আছি আমরা। ময়দানদিঘির বরাবর পুবদিকে রয়েছি। বেলা ১২টা থেকে Position-এ রয়েছি একটা বাঁশ বাড়ির ভেতর। Individually শত্রু আমার দল নিয়ে রয়েছি আমরা। কোম্পানির আর সবাই পেছনে। বামে একটা প্রাটুন রয়েছে। ভীষণ Firing আর Shelling হচ্ছে ময়দানদিঘিতে।”

বিকেলের দিকে পাকবাহিনীর প্রতিরোধ ভেঙে যায়। ময়দানদিঘি ছেড়ে পিছিয়ে যেতে থাকে তারা। ট্যাক্ষণ্ডো পাকা সড়কের ওপর দিয়ে চুকে পড়ে ময়দানদিঘির বুকের ওপর। দখল হয়ে যায় শক্র আর একটা শক্তিশালী ঘাঁটি। কিছুক্ষণ বিরতি দিয়ে ট্যাক বহর এগিয়ে যায় সামনের দিকে পিছু হটা পাকসেনাদের ধাওয়া করতে করতে। নির্দেশ আসে আমাদের মার্চ করে এগিয়ে যাবার। অবস্থান গুটিয়ে দ্রুত এগিয়ে চলি আমরা সদ্য যুক্ত ময়দানদিঘির উদ্দেশে।

ভুলছে ময়দানদিঘি। যুদ্ধের এই আগুন ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে। ট্যাক্সের গোলার

সরাসরি আঘাত লেগেছে পুকুরের উত্তর পাশের সাদা দালান বাড়িগুলোতেও। কৃষি বিভাগের সিড গোড়াউন, ফার্টিলাইজার গোড়াইন ও অফিস ভবন হিসেবে ব্যবহৃত হতো ঘরগুলো। পুকুরের উত্তর দিক দিয়ে বিষ্ণুপুর সমূখ্যবর্তী জায়গা দিয়ে এগিয়ে আসি। পাকসেনারা এইসব দালানে তাদের ঘাঁটি গেড়ে বসেছিলো পাকাপোক্তভাবে। ট্যাঙ্কের গোলার সরাসরি আঘাতে এখন দালানঘর কটা যেনো হ্যামেলা ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে। সামনে দিয়ে গোলা এসে পেছন দিক দিয়ে বের হয়ে গেছে বিরাট গর্ত সৃষ্টি করে। দালানের সামনে উচু পুকুরের কোনার দিকে একটা বড়োসড়ো অথচ মজবুত বাস্কার ছিলো শক্তপক্ষের। ট্যাঙ্কের গোলা প্রথমে দালান ঘরটিকে তেদে করেছে। তারপর উড়িয়ে নিয়ে গেছে বাস্কারটিকেও। পড়ে থাকতে দেখা যায় ছিন্নভঙ্গ ২/৩ জন পাকসেনার মৃতদেহ। চেনবার উপায় নেই তাদের।

পুকুর ঘেঁষে এগিয়ে সোজা পাকা সড়কে এসে উঠি। আবার পাওয়া গেলো পাকা সড়ক। এগিয়ে যাই সামনে। পুকুরের মাঝ বরাবর ফাঁকা জায়গা কিছুটা। পুকুরে যাবার পথ এটা। জায়গাটার দু'পাশের উচু পাড়ে বাস্কার। একটা মেশিনগান পোস্ট। মেশিনগানসহ চকচকে শুলির মালা বেরিয়ে ঝুলে আছে। কিছুক্ষণ আগেও সক্রিয় ছিলো মেশিনগানটি। যাবার সময় তুলে নিয়ে যেতে পারে নি পোস্ট ছেড়ে পলায়নরত মেশিনগান চালক। সামনে উচু ব্যারেল রেখে দু'পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে আছে অন্তর্ভুক্তভাবে মেশিনগানটি। মনে হয়, ওটার ট্রিগারে আঙুল দিয়ে চাপ দিলেই জীবন্ত হয়ে উঠবে এক্সুণি। কিন্তু ছিন্নভঙ্গে যাওয়া নিষেধ। একজন সেন্ট্রি পাহারা দিয়ে রেখেছে সেটা। অতি উৎসাহী একজনস্বীকৃত্যোদ্ধা ছুটে গিয়ে তুলে নিতে গিয়েছিলো মেশিনগানটি। কিন্তু ছিন্নভঙ্গ হয়ে উচু ফাঁচে তার দেহ। মেশিনগান পোষ্টে চুক্বার মুখে বিব ট্র্যাপ লাগানো ছিলো। হতভাসে মুক্তিযোদ্ধা সে ব্যাপারটা বোধহয় আঁচ করতে পারে নি। পাকা সড়কের ডান পাশ দিয়ে যৌথ বাহিনীর সাথে আগুয়ান দলের সদস্য ছিলো সে। যয়দানদিঘির কঠকর যুদ্ধে অঞ্চলগ্রহণ এবং সেটা চূড়ান্তভাবে দখলে নেবার পর দৃঢ়ব্যবস্থাপ্রযোগে মৃত্যু হলো যুবকার্য।

পুকুরের ধারে-কাছে যেতে লাগিয়ে করে দিই দলের ছেলেদের। সমস্ত পুকুরের পাড় জুড়ে শুধু বাস্কার আর বাস্কার। পুকুরের উচু পাড়ে অত্যন্ত সুবিধেজনক অবস্থানে প্রতিরক্ষা ঘাঁটি গড়ে তুলেছিলো পাকবাহিনী। সেজন্য তাদের তুলতে বেগ পেতে হয়েছে খুব। সাধ্যতো চেষ্টা করেছে পাকবাহিনী একে ধরে রাখবার জন্য। পুকুরের চারদিকে মাইন ফিল্ড তৈরি করেছে তারা।

শক্র পরিত্যক্ত অত্যন্ত বিপজ্জনক অবস্থান এটা। এরি মধ্যে একজন মুক্তিযোদ্ধা মারা গেছে। আর হতে দেয়া যায় না। পিটুকে পাশে নিয়ে পুকুরের মুখে দাঁড়িয়ে ট্রাফিক কন্ট্রোলের দায়িত্ব নিই। সুবেদার খালেকও একইভাবে কাজ করতে থাকেন। যয়দানদিঘিতে কাউকে দাঁড়াতে দেয়া হচ্ছে না। আগুয়ান যোদ্ধা দলগুলোকে একটার পর একটাকে পার করে দেয়া হচ্ছে পুকুর এলাকা। সব যোদ্ধারই উৎসুক দৃষ্টি উচু হয়ে থাকা চকচকে শুলির মালা জড়ানো মেশিনগানটি; পুকুর পাড়ের বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে বাস্কারের সারিগুলো। তারা দেখে আর এগিয়ে যায়। কাছে আসতে দেয়া হয় না কাউকে।

সন্ধ্যার মুখে আমরাও রওনা দিই। মুক্ত নয়াদিঘি একদম জনবিরান। লোকজন দেখা যায় না। একটা নতুন চকচকে যাত্রীবাহী বাস পাওয়া যায় পাকা সড়কের ওপর। বাসটি যাত্রী নিয়ে নিয়মিত কুট ধরে আসছিলো ঠাকুরগাঁও থেকে যয়দানদিঘি-পঞ্চগড়ের দিকে।

ক্ষেত ম্যাপ-২৪

সমুদ্রসূর্য

পরগাত থেকে বেলা

২৫-১১-৭৩—২-১২-৭৩



পাকবাহিনীর অবস্থান

পাকা সড়ক

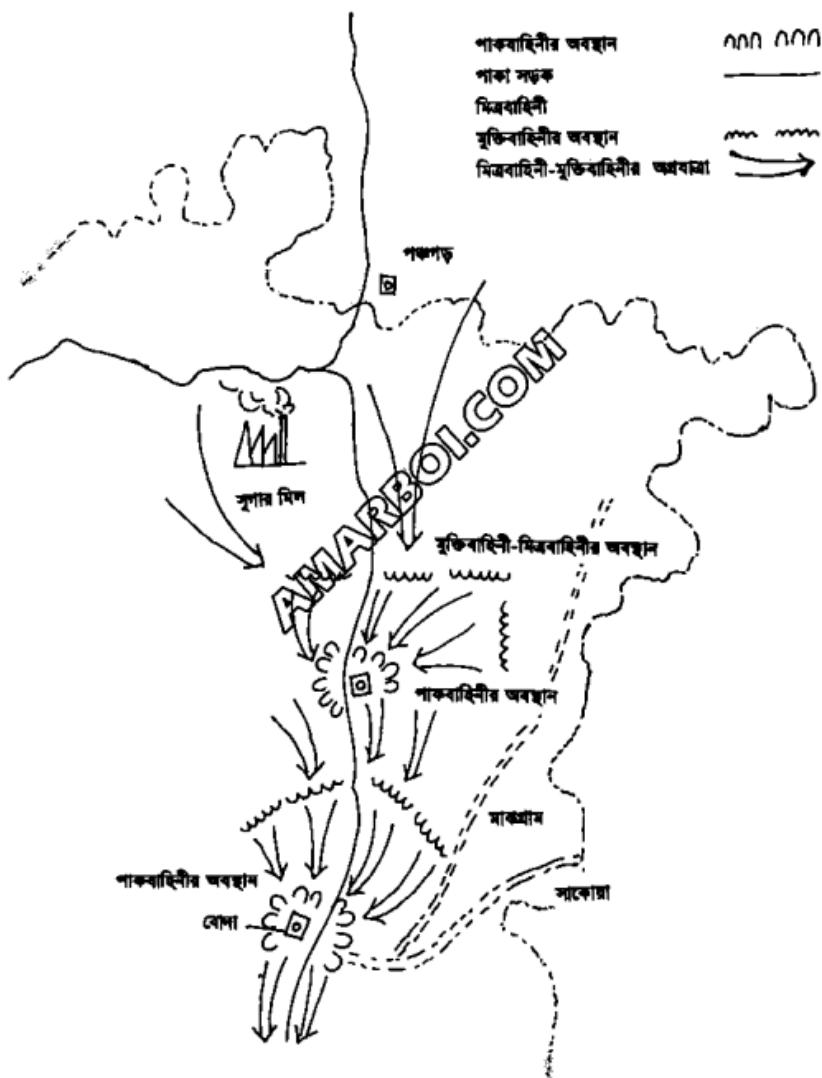
মিসেসাহিলী

মুক্তিবাহিনীর অবস্থান

মিসেসাহিলী-মুক্তিবাহিনীর আবাসন

০০০ ০০০

~~~~~



বাসচালকের ধারণায় ছিলো না ময়দানদিঘির পতন হতে পারে এতো তাড়াতাড়ি। ব্যাপারটা যখন সে বুবোছে, তখন আর সময় ছিলো না। রাস্তার ওপর বাসটি দাঁড় করিয়ে রেখে প্রাণ নিয়ে ভেগেছে সে। বাসের যাত্রীরাও হয়তো পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে নিরাপদ কোনো আশ্রয়ে। যাইহোক, অক্ষত নতুন একটা বাস দখলে এলো আমাদের। পরিবহন কাজে এখন ব্যবহার করা যাবে ওটাকে।

ময়দানদিঘি পেছনে ফেলে পাকা সড়ক ধরে প্রায় মাইলখানেক এগিয়ে এসে বাঁদিকে নাহতে হয়। কাঁচা একটা পথ। সেটা ধরে এগিয়ে গিয়ে রাতের মতো অবস্থান নেয়ার নির্দেশ আসে। সে অনুসারে সামনের বড়ো একটা ধামকে ডিঙিয়ে এসে রাতের অবস্থান ঠিক করা হয়। ছেলেরা লেগে যায় কাজে। পুরো ফ্রন্ট ব্যস্ত হয়ে পড়ে ট্রেঞ্চ ও বাঙ্কার তৈরি করার কাজে। আজ রাতের জন্য যাত্রাবিরতি এখানেই।

### এবার লক্ষ্য কৌশলগত অবস্থান বোদা

আজানের অর্ডার আসে সকাল ৮টার দিকে। এরি মধ্যে চা-নাস্তা খাওয়া শেষ হয়েছে। এই চলমান ফ্রন্টকে লঙ্ঘনখনার কমান্ডার কীভাবে যে তিনবেলাই আহার মুগিয়ে যাচ্ছেন, সেটাই এখন রীতিমতো গবেষণার বিষয়। লঙ্ঘন কমান্ডার নায়েব সুবেদার মানুষটি এজন্য অবশ্য ধন্যবাদ পাওয়ার যোগ্য। সুবেদার খালেকের অবদানও কৃম্মূল্য এই আয়োজনের পেছনে। এগিয়ে চলা ফ্রন্টের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আমাদের লঙ্ঘনস্ট্রাইট ও এগিয়ে চলেছে। সেই সাথে তিনবেলা রান্নাবান্না সেরে সন্নাতনী কায়দায় ভাববাটা লোকদের সাহায্যে সামনের ফ্রন্টের অবস্থান খুঁজে খুঁজে বিভিন্ন অবস্থানে যোদ্ধাদের সম্বাদ পাঠানোর ব্যাপারটা চাটিখানি কথা নয়! কিন্তু এক কাজটা চলছে এ যাবৎ সম্পর্কিতভাবেই। তবে দু'চারবার যে এর ব্যতিক্রম ঘটে নি, এমন নয়।

রাত কেটেছে একটা মাঝবয়সী ঠাট্টালগাছতলায় একটা বাঙ্কার কাম ট্রেঞ্চে। মাটিতে ট্রেঞ্চের গর্ত খুড়ে তার ওপর পেছনের বাড়িগুলো থেকে একটা ধারার বেড়া ওপর দিয়ে ছাউনির মতো ঢেকে দিয়েছে বকর। ওপর থেকে ঘরে পড়া হিমের হাত থেকে রক্ষা পাবার প্রচেষ্টা এটা। প্রতিদিনই শীতের প্রকোপ বাড়ছে। রাতের বেলা প্রচণ্ড ঠাণ্ডার কাহিল হয়ে পড়ে যোদ্ধারা। হি-হি ঠাণ্ডার মধ্যে উন্মুক্ত আকাশের তলে মাঠে-প্রাস্তরে এভাবে রাত্যাপন কারো অভিজ্ঞতাতেই নেই। আগুন জুলাবার উপায় নেই রাতে। কাপড়চোপড়ের অবস্থাও সুবিধের নয়। কিন্তু এর মধ্যেও প্রচণ্ড কষ্ট করে হলেও রাতগুলো কাটাতে হচ্ছে, কাটছেও।

মুড় করেছে পুরো ফ্রন্ট। এবার লক্ষ্য বোদা। ঠাকুরগাঁওয়ের আগে বোদা থানা হেড কোয়ার্টারে পাকবাহিনী সমবেত হয়েছে। তাদের সর্বশক্তি নিয়োজিত করে আগুয়ান যৌথ বাহিনীকে সেখানে তারা কৃত্যে দেয়ার প্রচেষ্টা নিয়েছে। বোদা থানার সাথে সরাসরি যোগাযোগ রয়েছে সড়কপথে দেবীগঞ্জ, ডোমার ও নীলফামারী। সৈয়দপুর ক্যাটনমেন্ট থেকে ওপথে বোদা প্রতিরক্ষার জন্য তাদের রিঃ-ইনফোর্মেন্ট আসতে পারে। দেবীগঞ্জ, ডোমার ও নীলফামারীর পতন হয় নি এখনো। সেখানকার পাক সেনাদলও বোদা প্রতিরক্ষার জন্য এগিয়ে আসতে পারে। ঠাকুরগাঁও গ্যারিসন তো বোদাকে রক্ষা করার জন্য সম্ভব্য সব ধরনের ব্যবস্থা নিয়েছেই। ময়দানদিঘির পর পাকা সড়কের রুট ধরে ট্যাক্সের সহযোগিতায় পুরো ফ্রন্ট এগিয়ে যাচ্ছে বোদার দিকে। আমাদের দায়িত্ব পড়েছে বোদা-

দেৰীগঞ্জ সড়ক অবৰোধেৰ। দেৰীগঞ্জ দিয়ে বোদায় কোনো সাহায্য আসতে পাৱে না, এ ব্যাপারটাই নিশ্চিত কৱতে হবে আমাদেৱ ফ্ৰন্টকে। এ উদ্দেশ্য নিয়েই সুবেদাৰৰ খালেক আৱ আমি এগিয়ে চলেছি আমাদেৱ ফ্ৰন্টসহ। লে. মাসুদ থাকছেন সব সময় আমাদেৱ সাথে। প্ৰয়োজনীয় আদেশ-নিৰ্দেশ আসছে এখন তাৱ মাধ্যমেই। আমাদেৱ কোম্পানি দুটোকে পৰিচালনাৰ দায়িত্ব অফিসাৰ হিসেবে বৰ্তেছে এখন তাৱ ওপৰ।

পুৱো ফ্ৰন্টেৰ সাথে এগিয়ে যাবাৰ ব্যাপারটা মনে হয় ধীৱগতিসম্পন্ন। এটা ঠিক পছন্দ হয় না আমাদেৱ। গেৱিলা যুক্তে অ্যাকশনধৰ্মী অপাৱেশনে অভ্যন্ত আমৰা, এ ধৰনেৰ শুধু গতি ফ্ৰন্টেৰ সাথে তাল মেলাতে কষ্ট হয়। সব সময় মনে হয়, দ্রুত এগিয়ে গিয়ে ঘোষ বাহিনীৰ মূল দলেৱ সাথে যোগ দিই। সৱাসৱি যুক্ত প্ৰক্ৰিয়াৰ মধ্যে জড়িত হৰাৰ মধ্যে রয়েছে আলাদা একটা উন্নাদন। বলতে গেলে ব্যাপারটা নেশাৰ মতো টানে সব সময়। কিন্তু উপায় নেই সে রকম স্বাধীনভাৱে এওনোৱ। পেছন থেকে কমাভাৱ আমাদেৱ চালিত কৱেছেন। তিনি যে স্ট্র্যাটেজি নিয়ে চালিত কৱেছেন, সেভাৱেই চলতে হচ্ছে আমাদেৱ। এই এখন যে দায়িত্ব আমাদেৱ ওপৰ অৰ্পিত, যুক্তেৰ প্ৰয়োজনে তাৱ পৰুষ্যত্বও কম নয়।

দৰ্থলে আসে দালাল রাজাকাৰ গ্ৰাম—মাৰ্বাহাম

সেই দিগন্তজোড়া ফসলে মাঠ, গ্ৰামীণ জনপদ, ছোটোখাটুজৰুল ঝোপঝাড়— এগুলোৰ ওপৰ দিয়েই ফ্ৰন্ট এগিয়ে চলে সামনে সোজা পুৰণিত বৃত্তিৰ। বেলা ১১টাৱ দিকে মাৰ্বাহাম নামে একটা বড়োসড়ো গ্ৰামে পৌছনো যায়। দীক্ষিকুণ্ড একটানা হাঁটৰাৰ পৰ আমাদেৱ যাত্ৰাবিৱতি ঘটে এখনে। ব্যক্তিগত তত্ত্বজ্ঞান যুক্তেৰ সাজে অন্ত-গোলাবাৰুদসহ বেশ ভাৱ লটিবহৰ নিয়ে দীৰ্ঘ পথযাত্রাৰ ক্লান্তিতে পৌছাই একসা হয়ে যাবাৰ যোগাড়। ক্লান্তিতে বসে পড়ে সবাই গ্ৰামেৰ মাৰামাবি কুকুৰ মাটিৰ ওপৰ শৰীৰ এলিয়ে দিয়ে। গ্ৰামটা বেশ বৰ্ধিষ্ঠ আৱ গ্ৰামেৰ লোকজনকে কেন্দ্ৰ অবস্থাশালী ও সচল মনে হয়। বোদাৰ দুৱৰ্তু এখন থেকে মাইলখানেক কিংবা তাৰ বেশ হতে পাৱে। এখন থেকে ডান দিকে কোনাকুনি বোদাৰ অবস্থান। গোলাগুলি চলছে বোদাকে কেন্দ্ৰ কৱে উভয়পক্ষেৰ মধ্যে। ট্যাঙ্কেৰ ঘড়ঘড় শব্দেৰ সাথে গোলাগুলিৰ প্ৰচণ্ডতা অনুভব কৱা যায় এখন থেকে ভালোভাৱেই। গ্ৰামেৰ লোকজন এখনে তাদেৱ বাঢ়িবৰেই আছে। সবে যায় নি। কে একজন বলে ওঠে, মাৰ্বাহামেৰ সবগুলান মানুষ খানেৰ দালাল আৱ রাজাকাৰ ছিলো গে...।

কথাটা শোনামাত্ৰ উভেজিত আৱ কেপে যায় অনেকেই। সন্দেহভাজন দু'চাৰজনকে ধৰে আনা হয় তলুশি চালিয়ে এৱ পৱেহই। গণধোলাই চলে তাদেৱ ওপৰ। এদেৱ মধ্যে দু'জন স্থীকাৰ যায় যে, তাৱা রাজাকাৱেৰ সদস্য ছিলো। কিন্তু পালিয়ে এসেছে খানদেৱ ডিফেন্স ছেড়ে ৩/৪ দিন আগে। অন্য দু'জন খানদেৱ পদলেই দালাল ছিলো, সেটাৱ তাদেৱ স্থীকাৰোকি থেকে পাওয়া যায়। দু'জন সুলপড়ুয়া ছেলে তাদেৱ চিহ্নিত কৱতে সাহায্য কৱে। আৱো অনেক তথ্য আৱ রাজাকাৰ-দালাল ও শান্তি কমিটিৰ লোকদেৱ নাম পাওয়া যায় তাদেৱ কাছ থেকে। কিন্তু সাৱা গ্ৰাম তলুশি চালিয়েও পাওয়া যায় না তাদেৱ। ভেগেছে তাৱা। এমনিতে পিপড়েৱ মতো পিলপিল কৱা অনুন্তি মুক্তিবৰ্যোদ্ধা ছেয়ে গেছে গ্ৰামখানা। হঠাৎ কৱে এভাৱে বিৱাট মুক্তিবাহিনীৰ দলেৱ আগমনে হতচকিত এবং আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে গ্ৰামেৰ মানুষজন। অপৱাধী মন এদেৱ। তাই ভয় পেয়ে গেছে সবাই। এৱ মধ্যে

চার রাজাকার-দালালের গণধোলাইয়ের ব্যাপারটা দেখে অনেকেই বাড়ির পেছন দিক দিয়ে গ্রাম ছেড়ে পালিয়েছে। তাদের সাথে পালিয়েছে রাজাকার আর দালাল শান্তিবাহিনীর লোকগুলোও। তাদের কাউকেই ধরা যায় না।

দু'জন সাইকেল চালিয়ে আসে বোদাগামী রাস্তা ধরে। লুঙ্গি আর জামা পরা লোক দুটোকে শিক্ষিত বলেই মনে হয়। আটক করে মুক্তিযোদ্ধারা তাদের। বোদা থেকে আসে তারা। কেন ছিলো তারা বোদায়? পাকিস্তানি স্পাই নাকি? মুক্তিযোদ্ধাদের খোজ নিতে আসা হয়েছে, কিন্তু হয়ে থাকা মুক্তিযোদ্ধারা এ ধরনের প্রশ্নে প্রশ্নে জর্জরিত করে চলে তাদের দু'জনকে। একজন জানান, তিনি শিক্ষক। বোদা স্কুলে শিক্ষকতা করেন। অন্যজন বোদায় থাকেন। অন্য কোনো পেশার সাথে জড়িত। বোদা সম্পর্কে সর্বশেষ তথ্য পাওয়া যায় তাদের কাছ থেকে। তারা জানান, বোদায় পাকবাহিনীর অবস্থা কাহিল একেবারে। খাদ্য নেই তাদের। আমের দিকে এসে কোনো রাকম খাদ্য যোগাড় করতে পারছে না তারা। আজ সকালে তাদের দু'জনকে ভেকে একজন খানসেনা চা-চিনি যোগাড় করে দিতে বলেছে। এজন্য ২০টি টাকাও দিয়েছে। মাট্টার লোকটি পকেট থেকে বের করেন কায়েদে আজমের জলছবি আঁকা দুটো দশ টাকার নোট। দেখান তিনি নোট দুটো আমাদের।

পিন্টু তখন এগিয়ে যায় তাদের দিকে। জিগ্যেস করে কঠিন গলায়, তা আপনারা তাদের জন্য চা-পাতি আর চিনি নিতে এসেছেন?

প্রশ্নটা তখন ভ্যাবাচ্যাক থেয়ে যায় লোক দুটো। জ্ঞাপন বলেন, না না, আমরা পালায় আসছি।

— পালালেন যখন, আজ কেনো? আগে কী করেছেন? আজ থানেরা চা-চিনি কেনার পয়সা দিলো, আজই আপনাদের পালায়ার শখ জাগলো? এতোদিন দালালি করেছেন, তাই না?

পিন্টুর কথার জবাব দিতে প্যাঞ্জি মুঠ লোক দুটো। পেছন থেকে হৈচে করে এগিয়ে আসে কয়েকজন যোদ্ধা। তাদের সামুক্তলি দুটো কেড়ে নেয় তারা। দু'জন তাদের মারতে থাকে শব্দ করে করে। এগিয়ে শিয়ে ঝাড়িয়ে নিই লোক দুটোকে।

আরো ২ জন তাহলে ধরা পড়লো। ধূত রাজাকার দালালের সংখ্যা এখন ৬ জন। তাদের পিছমোড়া করে বেঁধে নিয়ে সামনের দিকে অবস্থান নেয় যোদ্ধারা। ডানে বোদা থেকে তুমুল গোলাগুলির শব্দ ভেসে আসে। আমার দলে ছেলেদের আলাদাভাবে সমবেত করে যতোদূর সম্ভব বোদার দিকে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করি। একটা পাকা পানির নালার আড়াল নিয়ে। একটা ধানখেতের ভেতরে অবস্থান নিয়ে পড়ে থাকি যুদ্ধের কাছাকাছি। এখান থেকে বোদা-দেবীগঞ্জ ও বোদা-নয়াদিঘি রাস্তা দেখা যায় পরিষ্কার। চমৎকার কভার দেয়া যায় এখান থেকে রাস্তা দুটোর।

### মৃক্ত হলো বোদা ধানা

ধানখেতের ভেতরে এভাবে শরীর ঢুকিয়ে পড়ে থাকি সারাটা দিন। দুপুর গড়িয়ে বিকেল আসে। বিকেলের দিকে বোদার যুদ্ধের তাওর কমে যায়। বিচ্ছিন্নভাবে গুলির শব্দ শোনা যায় থেমে থেমে। যুদ্ধের গতিপ্রকৃতিই বলে দেয়, বোদা ছেড়ে পালিয়েছে পাকবাহিনী। বোদা দখলে এসে গৈছে আমাদের। এখন পাকিস্তানি অবস্থানগুলো চার্জ করা হচ্ছে চূড়ান্তভাবে।

আর কিছুক্ষণের মধ্যেই হয়তো মুক্ত করার আদেশ আসবে। ধানখেতের সেই অবস্থানে ডায়েরিটি বের করে তাতে লিখি :

১ ডিসেম্বর, '৭১

“কাল রাতে ময়দানদিঘি পার হয়ে এসেছি আমরা। প্রায় ২ মাইল সামনে রাতের জন্য ঘাঁটি করা হয়েছিলো। কাল ময়দানদিঘি Defence উচ্চেদ করার জন্য ট্যাঙ্ক USE করতে হয়েছে আমাদের।

এক এক করে ওদের সবগুলো ঘাঁটির পতন হচ্ছে। আজ সারাদিন একটা মাঠের মধ্যে ধানের জমিতে Position ছিলো আমাদের।”

মুভমেন্ট অর্ডার আসে পড়ত বিকেলে। সোজা এগিয়ে গিয়ে আমরা বোদা-দেবীগঞ্জ সড়কে উঠি। সে রাস্তা ধরে বোদা। বোদা থানার পাশ দিয়ে বিস্তৃত পাকিস্তানি বাস্কার আর ডিফেন্স লাইনের পাশ দিয়ে উঠে আসি বোদা বাজারে।

সঙ্ক্ষ্যা ঘনিয়ে এসেছে। লঙ্ঘণ যুদ্ধবিধান বোদা বাজারের অবস্থা। বিভিন্ন কুটে মুক্তি ও মিত্রবাহিনী এসে ঢুকছে বোদায়। পাকা সড়কের পাশেই বোদা বাজার। রাস্তাটি এখানে বাঁক নিয়েছে ধনুকের মতো করে। রাস্তার ওপারে একটা বড়ো ঘাঁট। আধ পাকা টিনের ছাউনি দেয়া লগ্ন ঘর। সঞ্চৰত ওটা স্কুল। ঘাঁটটার সামনে স্মরণেত হয়েছে অনেক যোদ্ধা। বাজারটার পেছন দিয়ে একটা ছোটো নদী। মতিয়ারের স্মার্টি বোদায়। সে জানায়, নদীটার নাম পাথরাজ। ওটার দু'পাড়কে বেঁধেছে একটা বিংশ তার ওপর দিয়ে চলে গেছে পাকা সড়ক। এখন ব্রিজটার প্রহরায় নিয়োজিত মিট্রোপলিসির সেন্ট্রিয়া। যোদ্ধাদের নিয়ন্ত্রণ করছে তারা। কেনো যেনো ব্রিজের ওপর দিয়ে প্রেতে নিয়ে করা হচ্ছে। কারণটা বোৰা যাচ্ছে না। ব্রিজের ওপর মাইনটাইন পাতা অঙ্গুষ্ঠিত না, কে জানে?

আজ একান্তর সালের ১ ডিসেম্বর বোদা থানা মুক্ত হলো আজ। এ থানার মুক্তির ঘটনা আনন্দে উছেল করে মুক্তিযোক্তিসের। তাদের ভিড় গিজগিজ করে রাস্তার মোড়ের ছোট পরিসরে। মারেয়া এলাকায় যুদ্ধ করার সময় আমাদের মূল লক্ষ্য ছিলো বোদা। তখন বোদা থেকে পরিচালিত পাক ও রাজাকার বাহিনীর বহু হামলাই মোকাবেলা করতে হয়েছে। বোদার ওপর আঘাত করার পরিকল্পনা ছিলো আমাদের। মনের মধ্যে শপথ ছিলো বোদায় একদিন আসবোই। সেই আসাটা আজ হলো। কৃখ্যাত রাজাকার কমান্ডার আকবরকে এ সময় মনে পড়ে। অসম্ভব নিষ্ঠুর আর অত্যাচারী ছিলো এই আকবর। পাকবাহিনীর সহায়তায় সে সীমাইন অত্যাচার আর বিভীষিকার রাজত্ব কার্যম করেছিলো। সে ছিলো এ এলাকার মানুষের জীবনে তাস। কতো নিরাই মানুষ মরেছে, কতো মা-বোনের ইজ্জত লুট হয়েছে ওর হাতে বা ওরই সাহায্যে, তার শেষ নেই। কতো শত বাড়িগৰ জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ছারখার করেছে। সীমাইন লুটতরাজ চালিয়ে কতো অসংখ্য পরিবারকে চিরকালের জন্য পথে বসিয়ে দিয়েছে, সে কথা এক ওপরালাই বুঝি জানেন। বোদা বন্দরের সঙ্ক্ষ্যার এই অক্ষকারে দাঁড়িয়ে মনে হয় সেই কৃখ্যাত রাজাকারের কথা। রাজাকার কমান্ডার আকবর নামে বহু পরিচিত সেই কৃখ্যাত লোকটাকে ধরা প্রয়োজন। কিন্তু এখন তাকে খুঁজবার মতো সময় হাতে নেই। আর তাছাড়া হয়তো এতোক্ষণে সে তার পাক দোসরদের সাথে সাথে পিছু হটছে ঠাকুরগাঁওয়ের দিকে, কিংবা পালিয়েছে জান নিয়ে একাকী। মনে মনে

বলি, পালাবি কোথায় শয়তান, একদিন তোকে অবশ্যই ধরা হবে। বিচার করা হবে গণআদালতে তোর প্রতিটি অপকর্ম আৱ পাপেৰ।

ব্ৰিজেৰ নিচ দিয়ে পাথৰাজ নদী পার হই স্বাই। হাঁটু সমান পানিৰ একটা ছেষ্ট ধাৰা নদীতে। তাতে কৰে জুতো প্যাটেৱ নিচৰে দিকটা ভিজে যায়। নদীটাৰ খাড়া পাঢ়। সকল একটা পথ বেয়ে ওপৱে উঠে আসি। শীত, কুয়াশা, বাতাসে পোড়া গন্ধ। আৱ অঙ্ককাৱেৱ ভেতৰ দিয়ে হেঠে হেঠে পাকা সড়কে উঠি। তখন একজন মুক্তিযোৱা যুবক সামনে এসে অ্যাটেনশন হয়ে দাঁড়িয়ে পা ঠুকে স্যালুট দেয়। তাৱপৰ বিপোষিত্যেৱ ভঙ্গিতে বলে, আমৱা সেফলি পৌছেছি স্যার। মো ক্যাজুয়েলটিজ। এখন মার্চ কৰিবো কোন্দিকে স্যার?

যুবকটি ভুল কৰেছে। সে আমাকে লেফটেন্যান্ট মাসুদ মনে কৰে মৃত্যুমেট অৰ্ডাৱ চাইছে। নিজে কিছুটা অগ্রসূত হলেও বুঝতে দিই না যুবকটিকে। কমান্ডাৱেৱ গলায় বলি, এভৱি থিৎ ও.কেঁ?

— ইয়েস স্যার।

— ইউ আৱ আভাৱ বি কোম্পানি অৱ সি কোম্পানি?

— সি কোম্পানি স্যার।

— হাউ মেনি বয়েজ ইউ হ্যাঙ?

— ফৱটি ফাইভ স্যার।

— আৱ ইউ প্লাটুন কমান্ডাৱ?

— ইয়েস স্যার।

— দেন ইউ গো রাইট সাইড অৱ দ্য মাইট্রি মিট ইয়োৱ কোম্পানি কমান্ডাৱ। ইউ উইল গেট ইয়োৱ পজিশন ফ্ৰম হিম। ও.কেঁ

— ইয়েস স্যার।

যুবকটি স্যালুট দিয়ে অ্যাবাইট উত্তৰ হয়ে সামনে তাৱ ছেলেদেৱ কাছে চলে যায়। আমৱা পাকা সড়ক ধৰে সামনে দিকে এগিয়ে চলি। পৰবৰ্তী নিৰ্দেশ না আসা পৰ্যন্ত এভাৱে এগিয়ে যেতে হবে। প্ৰায় মাইলখানেক পাকা সড়ক ধৰে এগনোৱ পৱ একটা কালভার্ট পাওয়া যায়। একটা খালেৱ মতো ছেষ্ট নদী সোজাসুজি উন্নৰ-দক্ষিণে চলে গেছে কালভার্টেৱ নিচ দিয়ে। কালভার্টা পার না হয়ে বাঁয়ে নেমে যাওয়াৱ নিৰ্দেশ আসে। সে অনুসৰে ছেষ্ট নদীটাৰ বাম তীৱ ধৰে এগিয়ে চলি আমৱা কুয়াশা ভেজা ঘোপৰাড় আৱ ঘাস ইত্যাদি মাড়িয়ে। আকাশেৱ চাঁদেৱ আলো কুয়াশাৰ জন্য কেমন ফ্যাকাশে দেখায়। সে আলোতে আন্দাজেৱ ওপৱ পা ফেলে ফেলে খানাখন্দ, গুলু আৱ কাঁটা ঘোপেৱ ওপৱ হোচ্চট খেতে খেতে আমাদেৱ এগিয়ে চলা এক সময় শেষ হয় পাকা সড়ক থেকে প্ৰায় আধ মাইল দূৱত্বে এসে। ছেষ্ট নাম-না-জানা এ নদীৱ পাড় জুড়ে নিতে বলা হয় আমাদেৱ ফ্ৰন্টেৱ পজিশন। সে অনুসৰে ছেলোৱ দ্রুত ট্ৰেঞ্চ খুড়তে থাকে।

আজ হাঁটতে হয়েছে অনেকখানি পথ। প্ৰায় ১০/১২ মাইল তো হবেই। শৱীৱেৱ ওপৱ দিয়ে ধকল গেছে প্ৰচণ্ড। বকৰ মিয়া দুঁজন সঙ্গী নিয়ে আমাদেৱ বাক্ষাৱ খুঁড়ে চলে। পিটুসহ শৱীৱ এলিয়ে দিয়ে বসে থাকি পেছনে ভিজে ঘাসেৱ ওপৱ। মুলু আমাদেৱ এই অগ্রাহ্যাত্মাৱ সাৱাটা সময় বাবলু আৱ মতিয়াৱদেৱ দলে রয়েছে। বাবলু আৱ মতিয়াৱেৱ সাথে থাকছে সে একই ট্ৰেঞ্চে। অগ্রাহ্যাত্মাৱেৱ সময় হৰু ইঞ্জিনিয়াৱ ছেলেটাৱ উৎসাহ-উদ্বীপনা দেখবাৱ

মতো । সব ব্যাপারে অঞ্চলী ভূমিকা নিয়ে সে দলের মধ্যে তার অবস্থান ভালোভাবেই প্রতিষ্ঠিত করেছে । প্রগাঢ় বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছে ওর বাবলু আর মতিয়ারের সাথে ।

মতিয়ার ও হাবিবকে আজ রাতের জন্য ছুটি দিয়েছি । পাথরাজ নদী পার হবার পর ওরা শুধুই সঙ্কুচিতভাবে বলেছিলো, তাদের বাড়ি বোনা থেকে মাইলখনেকের মধ্যে । তান দিকের রাস্তা ধরে হেঁটে গেলেই এক মাইলের মাথায় তাদের নিজেদের গ্রাম বলরামপুর । মা-বাবা, আঞ্চায়ঝজনদের সাথে দেখা করার জন্য যেতে চায় তারা । তাদের এই আবেদনের ভেতর দিয়ে দিবালোকের মতো একটা বাস্তব ছবি উপলব্ধিতে ভেসে উঠে । আর সেটা হচ্ছে, একটার পর একটা শক্র ঘাঁটি পদানত করে আমরা নিজেদের দেশের ভেতরেই তথু চুকছি না, নিজেদের বাড়িতেও পৌছে যাচ্ছি । আজ মতিয়ার ও হাবিব পৌছেছে তাদের বাড়ির দোরঘোড়ায় । কাল অন্য কেউ যাবে তাদের বাড়িঘরে । এমনিভাবে পিন্টু, আমি আর মুন্না ও পৌছে যাবো একদিন আমাদের আপন জেলা শহর রংপুরে ।

পেছনের বাড়িগুলোতে ছেলেরা গিয়েছিলো ট্রেক্সের জন্য ঘর আর বেড়াটোরা যোগাড় করতে । ট্রেক্স চাকবার জিনিসপত্র আনতে । ধূপাধপ শব্দ তুলে দৌড়ে আসে তারা । তারপর বলে হাঁপাতে হাঁপাতেই, পরমান আলী চেয়ারম্যান এখানে এসে লুকায়ে আছে ।

মনে পড়ে, এই সেই পরমান আলী চেয়ারম্যান, যে ছিলো ভেতরগড়ের আমাদের অপারেশনের অন্যতম টার্ণেট । এই লোক পালিয়ে একে একে কেতোদূরে আস্তানা গেড়েছে তাহলে! ছেলেদের সাথে পিটুকে নিয়ে দ্রুত যাই তাকে পুরুষবার উদ্দেশ্য নিয়ে । না, পাওয়া যায় না তাকে । মাটির তলায় গর্তের ওপরে ছাদ দেয়া তার গোপন আস্তানা এখন শূন্য । তার মানে আবার পালিয়েছে মুক্তিযোদ্ধাদের স্মৃতি বাৰ খবৰ পেয়ে । কিন্তু কেতোদূর পালাবে এই পরমান আলীরা? দেশটা যেভাবে দ্রুত ফুক হয়ে যাচ্ছে, এদের পালাবার জায়গা থাকবে না আর বেশি দিন ।

মাৰগ্যামে ধৃত শুণ্ডি রাজাকার ধৃশ্য পুত্রাহিনীৰ সদস্য আমাদের সাথেই রয়েছে । সুবেদার খালেক সারাটা পথ তাদের মেঝে বিহয়েছেন । ধৰা পড়া স্কুল মাস্টারসহ অন্য লোকটা এসে কেঁদে পড়ে আমার কাছে । বলে, স্যার, বাঁচান আমাদের । এদের মনের গভীরে এখন মৃত্যুভয় চুকেছে । মায়া লাগে লোক দুটোকে দেখে । তাদেরকে থাকতে বলি আমাদের দলের সাথে সাথে । এখন বিজয়ী দল আমরা । দ্বিতীয়বার মনের ভেতরে উদারতার এক প্রগাঢ় অনুভূতি কাজ করে । এ লোক দুটো রাজাকার-আলবদর বা শাস্তি কমিটিৰ লোক বা দালাল এগুলো কোনো কিছুৰ সাথেই জড়িত ছিলো না । নেহায়েত ছাপোষা মানুষ । সিঙ্কান্ত নিই, কাল দিনের বেলা এদেরকে মুক্ত করে দেবো এক ফাঁকে । রাতের গভীরতা ঘনিয়ে আসে ধীরে ধীরে । আজ রাতের মতো কাজ শেষ করে চলে যাই ট্রেক্সের আশ্রয়ে ।

পাঠান মুলুকেৰ নিঃসঙ্গ সৈনিক শুল মোহাম্মদ খান

নদীটা বাঁক নিয়ে চলে গোছে সামনে । সকালে ট্রেক্স থেকে বেৰ হয়ে সামনেৰ নদীৰ বাঁকেৰ চমৎকাৰ দৃশ্যে চোখ জুড়িয়ে যায় । সোনালি সূর্য জেগে উঠেছে পুৰবদিকেৰ আকাশে । নৱম আলো ছড়িয়ে পড়েছে চারাদিকে । নদীৰ বাঁকে বালুৰ চড়া । সোনালি রোদে চক্রক কৰে । বুনো কাঁটালতা, ছোটো ছোটো বোপঘাড়, গুলালতা, বাবলা গাছ, উচু উচু বেশ কিছু শাল-মেঝেনৰ গাছ নদীৰ পাড় জুড়ে । অপৰূপ মনোহৰ সেই দৃশ্য ।

মিষ্টি ভোরের হিম শীতল পরিবেশে নদীর বৈচিত্র্যময় এই গভিপথের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দর্শনে মনটা ভালো হয়ে যায় এমনিতে। রাতের ঘূম জাগা ক্লান্তি দূর হয়ে যায় বিরবিরে ঠাণ্ডা বাতাসের শীতল স্পর্শে। নদীর পানিতে হাত-মুখ ধুয়ে নিই। মনে মনে ভাবি, পিটু এ দৃশ্য দেখলে অবশ্যই গেয়ে উঠতো সেই বিখ্যাত গান, ‘ওগো নদী... পাগল পারা...’ কিন্তু পিটু এখন মরার মতো ঘুমুচ্ছে ট্রেক্সের ভেতরে গুটিসুটি মেরে। ওর ঘূম ভাঙতে ইচ্ছে করে নি। নদীর পাড়ে বসি সূর্যের দিকে মুখ করে। রাতের ঠাণ্ডায় জমে থাকা ট্রেক্স সূর্যের আলোয় জেগে উঠছে। সে আলোয় রয়েছে তাপ, রয়েছে জীবনের উৎসতা। সেই জীবনের উৎসতা পেয়ে আড়মোড়া ভেঙে জেগে উঠছে যেনো পুরো ট্রেক্স। পকেট থেকে বের করি নোট বই। তাতে লিখি :

## ২ ডিসেম্বর, '৭১

“আজ রাতে বেদা পার হয়ে এসেছি। প্রায় এক মাইল সামনে একটা ছোট নদীর ধারে ‘শেল্টার’ নিয়েছিলাম আমরা। কাল সারাদিন ভীষণ ধকল বয়ে গেছে শরীরের উপর দিয়ে। সারাদিন হাঁটতে হয়েছে। অবশ্য বিজয় উল্লাসে মন ছিলাম বলে আমরা সেই ক্লান্তি অনুভব করতে পারি নি।

বোদা দখল করতে খুব বেশি বেগ পেতে ইচ্ছে আমাদের। যিত্রাহিনী ট্যাঙ্ক থেকে গোলা মেরে মেরে সামনে এগিয়েজেঞ্জে পাকবাহিনী অবশ্য ভীষণভাবে গোলাবর্ষণ করে যাচ্ছিলো। কিন্তু তাদের অবস্থা তখন গভীর সমুদ্রে তৃণখণ্ড ধরে ভেসে থাকবার মতোই। বোদার পক্ষে ইওয়ার পর দিনজপুরের মোট ৪টি থানা মুক্ত হলো। এবার আমাদের লক্ষ্যটা কুরগাঁও ...।”

মুভয়েন্ট অর্ডার আসে। যাত্রা শুরু হয় আবার। এবার ফসলের মাঠে ধানখেতের পাশাপাশি বেশকিছু আখখেতে দেখতে হ্যায়। প্রায় প্রতিটি ডাঙা জমিতেই কৃষকেরা আখ লাগিয়েছে। পাশাপাশি দুটো স্ক্রিপ্ট হিল— পঞ্চগড় আর ঠাকুরগাঁও। চিনি উৎপাদনের কাঁচামাল হচ্ছে আখ। এ অঞ্চলে এ ফসলটিকে কেউ আখ বা ইচ্ছু বলে না। বলে কুশার। আখখেতকে বলে কুশার বাঢ়ি। আমরা মূলত এগোই ধানখেত ধরে, যতেটা সঙ্গে কুশার খেতকে পাশ কাটিয়ে। শক্র পিছিয়ে যাবার সময় ছড়িয়ে পড়েছে। তাদের দলভূট কোনো সেনিকেরা লুকিয়ে থাকতে পারে কুশার বাঢ়িগুলোতে। প্রতিটি কুশার বাঢ়িকে তাই গভীর সন্দেহের চোখে দেখতে হয়। মনে হয় যে-কোনো সময় ঝাঁকে ঝাঁকে বুলেট হয়তো ছুটে এসে আঘাত করবে যে-কোনো একটা কুশার খেত থেকে। সরু লম্বা কুশার গাছগুলোর আড়ালে যদি শক্র সত্যিকারভাবে লুকিয়ে থাকে, তবে আগেভাগে তাদের চিহ্নিত করা একেবারে অসম্ভব। তাই পুরো ফ্রন্টকে সতর্কাবস্থায় এগিয়ে যেতে হয়। কখনো পেছন থেকে নির্দেশ আসে থামবার। তখন থেমে যাই আমরা। তবে থাকি নাম-না-জানা কোনো এলাকায় ধানখেতে শরীর ডুবিয়ে। কখনো অবস্থান নিতে হয় কোনো গ্রামের পাশে, কোনো জঙ্গল বা বাঁশঝাড়ের আড়ালে। আবার কখনো ইরি থেতে পানি দেয়ার জন্য তৈরি করা ওয়াপদার পাকা ড্রেনের আড়ালে। ভুলিয়ে যুক্ত চলছে এখন। শক্রের ঠাকুরগাঁওয়ের পুবে সর্বশেষ বাধার সৃষ্টি করেছে ভুলি ত্রিজের ওপারে। বালিয়া নামের একটা বর্ধিষ্ঠ গ্রামের কাছাকাছি আমাদের যাত্রাবিবরিতি হয়। দুপুর গড়িয়ে গেছে তখন। দুপুরের আহর চলে আসে ম্যাজিকের মতো।

ক্রান্ত স্ফুর্ধাৰ্ত ছেলেৱা কলাপাতা কেটে এনে খাবাৰ দেয়। ভাত আৱ গুৰুৰ মাংসেৰ বোল। অত্যন্ত উপাদেয় খাবাৰ। 'জিন্দাবাদ লঙ্গৰখানা কমান্ডার' বলে দীৰ্ঘায়ু কামলা কৱতেই হয় তাৰ অভাবনীয় এই পাৰদৰ্শিতাৰ জন্য। মতিয়াৰ-হাবিবও এসে যোগ দেয়। ওদেৱ বাড়িৰ লোকজনেৰ কোনো ক্ষতি হয় নি। বহুদিন পৰ নিজ বাসভূমে নিজেৰ আঞ্চীয়াৰ্থজনেৰ সাথে মিলিত হয়ে ফিরে এসেছে ওৱা। আনন্দে-শুশিতে বলমল কৱে ওদেৱ চোখ-মুখ।

গুল মোহাম্মদ খানেৰ গল্প শোনায় মতিয়াৰ অসম্ভব রাসিয়ে রাসিয়ে। আজ সকালেৰ ঘটনা এটা। পাকবাহিনীৰ পাঠান সৈনিক গুল মোহাম্মদ খান বোদাৰ কিছুটা সামনে পজিশন নিয়েছিলো একটা কুশার বাড়িৰ ভেতৱে। ময়দানদিঘি থেকে আগুণ্যান যৌথ বাহিনীকে ঠেকানোৰ জন্য তাৰেৰ কঢ়নকে রাস্তাৰ ডান পাশ যৈষে কুশার থেতেৰ ভেতৱে পজিশনে রাখা হয়েছিলো। প্ৰচণ্ড যুক্তেৰ এক পৰ্যায়ে তাৰ সঙ্গীৰা কখন পিট্টোন দিয়েছে, বুৰতে পাৱে নি সে। সন্ধ্যা ঘনিয়ে রাত এসেছে। এৰি মধ্যে বোদাৰ পতন হয়েছে। যৌথ বাহিনী এগিয়ে গেছে বোদা ছাড়িয়ে আৱো সামনে। আৱ এদিকে পাকবাহিনী ভুঁটিতে পিছিয়ে এসে যে প্ৰতিৱেধ ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে, এসবেৰ সে কিছুই টেৱ পায় নি। তাৰ সঙ্গীৰা হয়তো আশপাশেই কোথাও আছে। এই ভেবে সে সারাটি রাত পড়ে থাকে কুশার থেতেৰ ভেতৱে। রাত পেৱিয়ে ভোৱ হয়। সূৰ্য ওঠে। সে তখন খোজাৰ্বুজি কৱে তাৰ সঙ্গীদেৱ থেতেৰ ভেতৱে। সাথীদেৱ নাম ধৰে ডাকাডাকি কৱে। কিন্তু জবাৰ পায় না কাৱো। তখন শুন্ধাৰে, তাৰ সঙ্গী-সাথীৰা হয়তো বোদাৰ দিকে চলে গেছে। আখথেতেৰ ভেতৱকাৰ অবস্থাসে একা থাকতে তাৰ আৱ ইচ্ছও কৱে না। খিদে আৱ ত্যানক পিপাসাও চেপে ধৰে ছাঁকে। তখন সে বেৱিয়ে আসে আখথেত থেকে। নিচিত্ত আৱ নিৰঙে চিণে হেঁটে চলে আন্তোলা পাক সড়কেৰ ওপৰ। তখন পৰ্মস্ত তাৰ ধাৰণাতে নেই যুক্তেৰ প্ৰকৃত অবস্থাটা একটু কিন্তু, কোন্দিকে প্ৰবাহিত তাৰ গতি কিংবা তাৰ দলেৰ অবস্থান এখন কোথায়? এখনো কোন্তা বোদা এলাকা দখল কৱে রেখেছে, এমনি নিচিত ধাৰণা নিয়ে সে হাঁটতে থাকে পাক সড়কেৰ ওপৰ দিয়ে। একটা জিপ ছুটে আসছিলো তখন ময়দানদিঘিৰ দিক থেকে। সে প্ৰিয় তুলে দাঁড় কৱায় জিপটিকে। জিপেৰ আৱোহীদেৱ ভেতৱে ছিলেন একজন অফিসাৰসহ ক জন মুক্তিযোদ্ধা। উচা লম্বা নিঃসঙ্গ পাঠান সৈনিকটিৰ পাশে ঘাঁচ কৱে শব্দ তুলে দাঁড়িয়ে পড়ে জিপটি। পাঠান সৈনিক জিপেৰ আৱোহীদেৱ নিজেদেৱ দলেৰ লোক মনে কৱে জিগ্যেস কৱে, ভেইয়া হামাৱা পজিশন আভি কিধাৰ হ্যায়? তাকে দেবেই কেমন সন্দেহ জানে জিপেৰ আৱোহীদেৱ। অফিসাৰ তাকে জিগ্যেস কৱেন, আপকা নাম কেয়া হ্যায়? বিনীত ভঙ্গিতে জবাৰ দেয় পাঠান সৈনিকটি, যেৱা নাম গুল মোহাম্মদ খান।

— মুলুক! অফিসাৰটি ফেৱ জিগ্যেস কৱেন। তখনো সে বিনীতভাৱে বলে, পাঠান মুলুক হ্যায় জি।

বলে কি! চমকে ওঠে জিপ আৱোহীৱা, আৱে এতো পাকিস্তানি সৈন্য! পথ হারিয়ে নিজেদেৱ দলেৰ সঞ্চান চাইছে। তড়াক কৱে লাফিয়ে পড়ে মুক্তিযোদ্ধাৰা জিপ থেকে। দ্রুত তাৱা ধৰে ফেলে দলছুট এই নিঃসঙ্গ পাঠান সৈনিকটিকে। তাৰ কিছু বুৰে উঠবাৰ আগেই তাৱা পিছমোড়া কৱে হাত বেঁধে ফেলে তাৰ। সেই সাথে কালবিলু না কৱে তাৱা তাৱ হতিয়াৰটিও নেয় ছিনয়ে। সৈনিকটিৰ তখনো সৱল প্ৰশ্ন, ভেইয়া আপলোগ কৌন হ্যায়?

— মুক্তিফৌজ হ্যায় হামলোগ, বলে জিপ আৱোহীৱা। জবাৰটা শোনামাৰ্ত পাঠান সৈনিক কেমন হতবিহুল হয়ে যায়। তাকায় ফ্যালফ্যাল দৃষ্টিতে। তাৰপৰ এই ভাবটা সৱে গিয়ে ধীৱে

ধীরে তার চোখে-মুখে ফুটে উঠে গভীর মৃত্যুভয় আর শঙ্কা। মৃত্যুবাহিনীর হাতে ধরা পড়ে গেছে সে, এখন আর করার কিছু নেই, ব্যাপারটা তার বুকে উঠতে অনেক দেরি হয়ে গেছে।

পাঠান সৈন্যটিকে এবার বেঁধেছেন জিপে বসানো হয়। তারপর উৎফুল্প জিপ আরোহীরা ছুটে চলে আবার পেছনে যায়দানদিঘির দিকে। একজন জীবন্ত পাক সৈনিক এখন তাদের হাতে বন্দি। অবশ্য মূল্যবান যুদ্ধবন্দি এই পাঠান। কমান্ডারের হেড কোয়ার্টারে তাকে পৌছে দেবার জন্য ঝাড়ের বেগে উড়ে চলে জিপ। পাঠান মুলুকের যুদ্ধবন্দি গুল মোহাম্মদ খান চুপচাপ বসে থাকে জিপের ভেতর অসহায় ভঙ্গিতে।

### ভুঁটীর পতন, সামনে ঠাকুরগাঁও

ভানুষকে ছুটে আসতে দেখা যায়। আটক করা হয় তাদেরকে বিনা দ্বিধায়। তরা যে প্রাণ হাতে করে ছুটে এসেছে, সেটা তাদের চোখমুখ দেখেই বোঝা যায়। তার ওপর এখানে আমাদের হাতে আটক হওয়ার পর ভয়ে-আতঙ্কে তাদের প্রাণ যাবার যোগাড়। অবশ্য তাদের ধোলাই দিতে হয় না। তার আগেই তারা আমাদের ধমকধামকের সঙ্গে সঙ্গেই গড়গড় করে বলে চলে পাকবাহিনীর বর্তমান অবস্থান আর তাদের পরিস্থিতি ইত্যাদি সম্পর্কে। তাদের কাছ থেকেই জানা যায়, ভুঁটীর ব্রিজ উড়িয়ে দিয়ে পাকবাহিনী তার ওপরে কিষ্টীর এলাকা জুড়ে প্রিশন নিয়েছে। পাকবাহিনী তাদেরকে জোর করে ধরে নিয়ে যাওয়া সারাদিন ধরে বাক্সার-ট্রেক্স তৈরি করিয়েছে। যৌথ বাহিনীর আক্রমণ শুরু হলে তারা প্রভাবিত সমর্থ হয়।

মানুষ তিনিটিকে অবিশ্বাস করবার মতো জ্ঞানে কারণ দেখা যায় না। তাদের কাছ থেকে সভ্যিকার অর্থেই কিছু তথ্য পাওয়া যাচ্ছে। আর সেটা হচ্ছে ভুঁটী নদীর ব্রিজ ভেঙে দিয়ে তারা পাকা সড়কের দু'ধারে জুড়ে জুড়ে নিয়েছে। এ পর্যন্ত অগ্রযাত্রার পাকা সড়কের ওপরকার কোনো ব্রিজ প্রচান্ডপ্রস্তুত পাকবাহিনী ভেঙে দেয় নি। ভুঁটীর ব্রিজ ভেঙে দিয়ে তারা এই প্রথমবারের মতো মিত্রবাহিনীর অগ্রযাত্রা ঠেকাবার প্রচেষ্টা নিয়েছে। বিশেষ করে ট্যাঙ্ক বাহিনীকে প্রতিহত করার জন্যই যে তাদের এই চেষ্টা সেটা বোঝা যায় সহজেই। ট্যাঙ্কগুলোকে ভুঁটীর ব্রিজের ওপর দিয়ে পার হতে হবে। ব্রিজটা ভেঙে ফেললে নদীর গভীর পানি ভেঙে ট্যাঙ্ক পার হতে পারবে না। এ জন্যই পিছিয়ে যাওয়া পাকবাহিনীর এই মরিয়া ধৰ্মসাধক প্রচেষ্টা। ঠাকুরগাঁও শহরকে রক্ষা করতে হবে তাদের যে করেই হোক।

ওপারে পাকবাহিনী এবং এপারে মুক্তি ও মিত্রবাহিনীর যৌথ অবস্থান। মাঝখানে গুড়িয়ে দেয়া ভুঁটীর ব্রিজ। দুপুর থেকে যুদ্ধ লেগে যায় ভাঙা ব্রিজের দু'পাশের সেনাদলের মধ্যে। প্রচণ্ড গোলাগুলি বিনিময় চলতে থাকে। পাকসেনারা পাকা সড়ক বরাবর তাদের অবস্থানে মাটি কামড়ে পড়ে থাকে। মিত্রবাহিনী সর্বাত্মক চেষ্টা করে চলে। সড়ক পথে এগনো যায় না। তখন ভানুষক থেকে এগিয়ে গিয়ে একটা কলাম নদী পার হতে সমর্থ হয়।

দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়ে এসেছে তখন। মিত্রবাহিনীর নদী পার হওয়া কলামটি সড়কের ওপর পাকবাহিনীর অবস্থানের প্রচণ্ড ঝড়ে অভিযান শুরু করে। সামনের দিক থেকে যৌথ বাহিনীও এগিয়ে আসে পাকা সড়কের দু'ধার দিয়ে। এ অবস্থায় পাকবাহিনীর অবস্থান ধরে রাখা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। অবস্থান ছেড়ে দিয়ে দ্রুত পিছিয়ে যায় তারা। মিত্রবাহিনীর নদী পার হওয়ার আধিঘট্টার মধ্যেই পরিক্ষার হয়ে যায় ভুঁটীর

পাকবাহিনীর অবস্থান। ভুঁটী আমাদের দখলে এসে যায়।

পড়স্ত বিকেলে মুভমেন্ট অর্ডার আসে। কাঁচা সড়ক পথ ধরে এগিয়ে চলি আমরা ভুঁটীর দিকে। সঙ্গ্যার মুখে ভুঁটী পৌছানো যায়।

ভুঁটীর ব্রিজ ভেঙে পড়ে কেমন হ্যাঁ হয়ে গেছে জায়গাটা। মিত্রবাহিনীর প্রকৌশলীদের একটা দল তখন ভুঁটী নদীর ওপর ভাসমান পন্টুন ব্রিজ তৈরিতে ব্যস্ত। অসম পারদর্শিতার সঙ্গে তারা ভাসমান বোটের ওপর বেইলি ব্রিজ স্থাপনের কাজ শেষ করে ফেলে। আর সেটা স্থাপন করতে সময় নেয় মাত্র আধা ঘণ্টা। এখন রাস্তার ডাইভারসনসহ অন্যসব দিকের ছূড়ান্ত পর্যায়ের কাজ চলছে।

ব্রিজের ওপর দিয়ে চলাচল শুরু হয়ে যায়। খাড়া পাকা সড়ক থেকে নেমে যাওয়া ঢাল বরাবর এখন ডাইভারসন রোড তৈরি হলেই ট্যাঙ্কগুলো পার হয়ে যেতে পারবে। পেছনে ঝুলের মাঠে সারবন্ধ অপেক্ষমাণ ট্যাঙ্কগুলো সমানে গর্জে চলেছে। ভাবটা তাদের এরকমের যে, তাদের যেনো জোর করে আটকে রাখা হয়েছে। ছাড়া পেয়ে সামনে এগিয়ে যাওয়ার জন্য তারা অস্ত্রির হয়ে উঠেছে আর সে কাবণেই তারা গর্জে চলেছে।

শীতের সঞ্চ্যা যেনো ঝপ করে নেমে আসে। কুয়াশার হালকা চাদর ঝুলে থাকে এদিকসেদিকে। দলে দলে মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনীর সদস্যরা এগিয়ে আসে। রাস্তার নিচ দিয়ে পন্টুন পার হয়ে যায় তারা ওপারে। পাকবাহিনী সুজ্ঞপিছিয়ে যাচ্ছে ঠাকুরগাঁওয়ের দিকে। তারা ঠাকুরগাঁওয়ে যাতে সংঘবন্ধ হয়ে বসতে প্রাৰম্ভ করে, সেই লক্ষ্য থেকেই পেছন পেছন দেয়ে যেতে চায় মিত্রবাহিনী।

আমাদের মূভ করার নির্দেশ আসে। আর সেই অনুযায়ী আমরা এগিয়ে যাই নির্মাণমাণ ডাইভারসন রাস্তা ধরে। নেমে যাই নিচে। একটি এ সময়ই একটা ঘটনা ঘটে।

পন্টুন ব্রিজ নির্মাণের কাজে নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন মিত্রবাহিনীর ইঞ্জিনিয়ার কোরের জনেক কর্নেল। ব্রিজে উঠবার সময় আমি প্রক্রিয়াবারে তার সামনে পড়ে যাই। আর পড়তেই হাতঁৎ করেই তিনি আমার হেলমেটটা ছেঁয়ে বসেন। মুখে তাঁর চমৎকার আপন অন্তরঙ্গ মানুষের হাসি। আর সেই হাসিমাঝা মুখেই তিনি বলেন, জেন্টলম্যান উড ইউ প্রিজ এক্রচেঞ্জ ইয়োৱাৰ হেলমেট উইথ মি?

ইচ্ছে ছিলো না হেলমেটটা দেয়ার। জগদলহাট বিজয়ের স্মৃতি এটা। সম্মুখ যুদ্ধের প্রায় শুরু থেকে এ পর্যন্ত সারাটা সময় ব্যবহার করে এসেছি। বহু ধরনের বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে মাথায় এটা খাকাতে নিরাপদ মনে হয়েছে নিজেকে। একটা যুদ্ধের ভয়াবহতা শেষে বিজয় মুহূর্তের স্মৃতি সমভাবে বহন করছে এই হেলমেটটা। তাই দিতে মন থেকে সায় মেলে না। কিন্তু মিত্রবাহিনীর এই কর্নেলের চাইবার ভঙ্গিতে এমন একটা কিছু ছিলো, যার জন্য সহজে না বলতে পারি না। হাসি মুখে তাই জিগ্যেস করি, ডু ইউ লাইক ইট!

— ইয়েস। আই লাইক টু টেক ইট টু মাই হোম অ্যাজ এ টোকেন ক্রম আ ক্রেত লাইক ইউ।

ভারতীয় এই কর্নেল বাংলাদেশ থেকে হেলমেটটা তাঁর নিজের দেশে নিজের বাড়িতে উপহার হিসেবে নিয়ে যেতে চান। তাঁর এই চাওয়ার মধ্যে কোনো ফাঁক নেই। এদেশে তিনি মিত্রবাহিনীর সদস্য হিসেবে যুদ্ধ করতে এসেছেন। দেশ স্বাধীন হলে সেটা হবে আমাদের নিজেদের দেশ। তাঁর বা তাঁদের কিছু না। তবে এ যুদ্ধে তিনি জড়িত ছিলেন এবং যুদ্ধ শেষে

যখন বিজয়ী বেশে তাঁর নিজের বাড়িতে, নিজের পরিবার-পরিজনের কাছে দিলবেন, তখন মাথা থেকে হেলমেটটা খুলে বলবেন, দেখো এটা এনেছি আমি বাংলাদেশ থেকে। বাংলাদেশের একজন মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার আমার সঙ্গে তার বস্তুত্বের নির্দর্শনস্বরূপ প্রেজেন্ট করেছে এটা। কর্নেলকে বলি, দেন লেট আস এক্সচেঞ্জ।

এরপর পাকিস্তানি কমান্ডারের হেলমেটটা চলে যায় মিত্রবাহিনীর একজন কমান্ডারের আর তারটা চলে আসে আমার মাথায়।

— খালক ইউ বলে কর্নেল খুশি ঘনে হাত মেলান। তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে পন্টুনের ওপর দিয়ে চলে আসি এপারে। তারপর এগিয়ে আবার পাকা সড়কে। মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনীর সদস্যরা দলে দলে পার হয়ে আসে এপারে। পাকা সড়ক ধরে চলমান মুক্তিযোদ্ধা কলাম ও মিত্রবাহিনী এগিয়ে চলে পাশাপাশি সামনে।

রাত ঘনিয়ে এসেছে। শীতের প্রচণ্ড কামড়। দ্রুত পা চালিয়ে শরীর গরম রাখবার প্রচেষ্টা। প্রায় এক মাইল এগিয়ে এসে বাঁ-দিককার কাঁচা রাস্তা ধরে নেমে যাওয়ার নির্দেশ আসে। সে অনুযায়ী কাঁচা পথ ধরে শান্তিনেক গজ এগিয়ে শিয়ে একটা বেশ বড়ো ধরনের পুরুরের ধারে পৌছানো যায়। রাতের মতো এখানেই যতি পড়ে অগ্রাভিয়ানের। পুরুরের চারদিকে রাতের অবস্থানের জন্য ট্রেঞ্চ ও বাস্কার খোঝার কাজে লেগে যায় যোদ্ধারা। '৭১-এর ২ ডিসেম্বর। আজকের এই তারিখেই শক্রঘাটি ভুলুম্বুলুন হলো। শক্রের শেষ বাধা অপসারিত হয়েছে। সামনে এখন ঠাকুরগাঁও।

### চলমান কলাম—মুক্তিবাহিনী মিত্রবাহিনী

সকালে জেগে ওঠে ফ্রন্ট। ভোরের কুয়াশগুলির ভাবি পর্দা ঝুলিয়ে রাখে অনেকক্ষণ। সূর্য উঠবার পর থেকে তা কেটে যেতে থাকে সেরাট পুরুর। রাতের বেলা বোবা যায় নি পুরুরটার আয়তন। তার পাড়গুলো খুব উঁচু পুরুর। ওটার পাড়ে কয়েকটা প্রাচীন গাছ আলগাভাবে এদিকওদিক ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। মজে যেতে বসেছে এই পুরানো পুরুরটা এখন। হয়তো-বা কোনো জমিদার আমলে খোঝা হয়েছিলো এটা। এরপর আর যত্ন নেয়া হয় নি। পুরুরের পাড় যেনে গ্রামের দিকে চলে যাওয়া রাস্তার নিচ দিয়ে দীর্ঘ ফ্রন্ট গড়ে উঠেছে। আমাদের কোম্পানির সমস্ত হলেই পুরুরপাড় জুড়ে ট্রেঞ্চ ও বাস্কার করে অবস্থান নিয়েছে।

পুরুরের পাড়ে একটা আধমরা পুরানো কঁঠাল গাছের শুভ্রিতে সূর্যের তাপে শরীর মেলে দিয়ে বসে ডায়েরিটা বের করি পকেট থেকে। সম্মুখ্যদের প্রতিটা দিনের অগ্রাভিয়ার বিবরণ লিখে রাখবার জোর তাগিদ মনের ভেতর উঠালপাথাল করছে। কিন্তু লেখার ফুরসত মেলে না সব সময়। রাতে প্রতিদিন যাত্রাবিবরতি শেষে প্রতিদিনকার ঘটনাপঞ্জি বিস্তারিতভাবে লিখে রাখা যেতো। কিন্তু বাস্কারট্রেঞ্চে কোনো আলোর ব্যবস্থা নেই। এ জন্য রাতে কিছু লেখা হয়ে ওঠে না।

আর অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই রওনা দিতে হবে। সকালের নাস্তা সেরেই শুরু হবে সেই যাত্রা। এই ফাঁকে ডায়েরির পাতা বের করে বসি। চলতি পথে লিখবার জন্য কালি-কলমও দাক্কণ সমস্যা। জগদলহাটে থাকতেই কলমের কালি ফুরিয়ে গিয়েছিলো। মলানী-শিংপাড়ায় কোনোভাবে কালি যোগাড় করা গেছে। এ কালি দিয়ে ক'দিন চলবে কে জানে!

শীতাত্ত রাতের পর সকালের সূর্যের তাপের উষ্ণতা সত্যিই আরামদায়ক। একটা চমৎকার

পরিবেশ বিরাজ করছে চারদিকে। আর একটা ঝকঝকে দিমের সূচনা হলো। দেশের ডেতরপানে ক্রমাগত এগিয়ে চলেছি। মুক্ত হচ্ছে একটার পর একটা অঙ্গল বা জায়গা। মনের গভীরে তাই প্রচণ্ড ভালোলাগার একটা অনুভূতি কাজ করে চলে। ছেলেরা ছুটোছুটি আর সোড়োবাপ করে নিজেদের তৈরি করে নিতে থাকে। সেই ফাঁকে আমি ডায়েরিতে লিখি,

৩ ডিসেম্বর, '৭১

“কাল রাতে ভুঁটীর ব্রিজ পার হয়ে এসেছিলাম আমরা। প্রায় ১ মাইল সামনে Shelter নিয়েছি একটা বিরাট পুরুরের ধারে। রাতের মতো ট্রেকিং করে, ওপরে Camouflage করে ছিলাম আমরা।

“ঠাকুরগাঁ এখান থেকে মাত্র ৫ মাইলের মতো। আজকেই হয়তো ঠাকুরগাঁ Fall করতে যাচ্ছে। পাকবাহিনী দাকুণভাবে মার যাচ্ছে। আর পিছিয়ে যাচ্ছে। ব্যাপারটা এতোখনি করুণ যে চিন্তাও করা যায় না। কাল পিছিয়ে যাবার সময় ওরা ভুঁটীর ব্রিজ খৎস করে দিয়ে গেছে। এভাবে ওরাই এখন আমাদের প্রথমদিককার নীতি গ্রহণ করছে।

“মাঝে মাঝে ভীষণ খারাপ লাগে। আমরা বিনা বাধায়, বিনা যুক্তেই শুধু এগিয়ে চলেছি ... যেভাবে Indian-রা ডেতরে চুক্তে একটা যে সহজেই বের হয়ে যাবে, তেমনটা মনে হয় না। মনের ডেতরে একটা আবিষ্কাস কেনো জানি দানা বেঁধে গঠে। এক খান তাড়িয়ে আমরা কি আবেক্ষণ্য খান ডেকে নিয়ে আসছি? কী জানি? আশা করি এমন হবে না।

“যতোই এগুচ্ছি ততোই ভবিষ্যতটা কেনো জানি সামনে আসছে। তার কল্প কী হবে, কেমন হবে, কে জানে?

আমার এই ভাবনা আর লেখাবেশিটির মুখে মৃত্যুমন্তের অর্ডার আসে। এবার পাকা সড়কের ওপর দিয়ে চলা শুরু হয়। এমনভাবে পাকা সড়ক জনবিরান। সাধারণ মানুষের চলাচল নেই। এখন রাস্তার রাজা এই আমরা অর্থাৎ মুক্তি ও মিত্রবাহিনী। দলে দলে যোদ্ধা সৈনিক এগিয়ে চলেছে। তাদের পোশাকআশাক একই ধরনের। মুক্তের পুরো সাজে এগিয়ে চলে তারা। কিন্তু মুক্তিবাহিনীর পোশাকে কোনো ইউনিফর্মিটি নেই। কিশোর-তরুণ-যুবা-মাঝবয়সী আর প্রবীণ সব বয়সী যোদ্ধাকে নিয়ে গড়ে তোলা একটা মিশ্র এই আমাদের সাধারণ মুক্তিবাহিনীর দল। পাশাপাশি চলেছে মুক্তিফৌজ ও মিত্রবাহিনীর কলাম। পুরোপুরি যুদ্ধ সাজে চলমান মিত্রবাহিনীর পাশে আমাদের বিচ্চির পোশাকের এই ফ্রন্ট ও বাহিনীকে বেশ বেমানানই লাগে যেনো। তবে নির্বিকার গভীর মুখে হেঁটে চলে মিত্রবাহিনীর সৈনিকরা। পক্ষান্তরে মুক্তিবাহিনীর সদস্যরা হাসিলুশিতে উচ্ছল ও প্রাপ্তবন্ত। আর এটোই সজীব করে রাখে চলমান ফ্রন্টকে। ফ্রন্ট সেকশনওয়ারি দলভূক্তভাবে হাঁটে। নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা, রঙসরসিকতা আর হাসিঠাপ্তা করে চলে। এতে অবশ্য কিছুটা গোলমাল আর বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। কিন্তু এইরকম এক বিজয় অভিযানের মুহূর্তে ব্যাপারটা তেমন বেমানান মনে হয় না। তবু সুবেদার খালেক মাঝেমধ্যেই ধমকধামক দিয়ে ওঠেন। কলরবমুখের ছেলেদের থামাতে চেষ্টা করেন। কিন্তু বন্যার স্রোতের মতো আগুয়ান বিজয়ী বাহিনীর কলহর তরুণ থামানো যায় না।

বেলা বেড়ে চলে। পাকা সড়ক ধরে নির্মল মিষ্টি রোদে হাঁটতে ভালো লাগে খুব।

অ্যাডভাসের সময় পাকা সড়কে এসেছি প্রতিটি বিজয় শেষে শক্রঘাটি পতনের পর। কিন্তু পাকা সড়ক ধরে দীর্ঘকণ ভাবে হাঁটা হয় নি। প্রতিবারই নেমে যেতে হয়েছে পাকা সড়ক ছেড়ে। পাড়ি দিতে হয়েছে মাঠঘাট-প্রান্তর আর দিগন্তজোড়া ফসলের মাঠ। আজ প্রথম পাকা সড়ক ধরে ভাবে এগিয়ে যাবার সুযোগ এসেছে। ভালোও লাগছে তাই।

পাকা সড়কের দু'পাশে বড়ো বড়ো বাস গজিয়েছে। বোনাই যায় এইসব এলাকা ও অনপদ যখন পাকবাহিনীর দখলে ছিলো, তখন সড়কপথে মানুষজন চলাচল করেছে খুব কমই। তাই সড়কের প্রান্ত দেখে ঢালের অংশগুলোয় বোপবাঢ়ি আর বুনো লতাপাতা গজিয়েছে প্রচুর পরিমাণে। ঘাসের সাথে লজ্জাবতী লতাও গজিয়েছে স্বাধীনভাবে। লজ্জাবতী লতায় খোকায় খোকায় লাল রঙের ফুল। সেইসব ফুলে জমে থাকা শিশির বিন্দু রোদের আলোতে ঝিকমিক করে যাযিমুক্তোর মতো। পায়ের শ্রীমণ পেলেই গুটিয়ে যায় লজ্জাবতী তার সহজাত লাজুকতা নিয়ে।

পাকা সড়ক ধরে হাঁটতে হাঁটতে প্রাণভরে দু'দিকে তাকাই। বাংলাদেশ! বাংলাদেশ! গভীর পিপাসার্ত চোখে স্বাধীন বাংলাকে দেখে চলি হৃদয় দিয়ে। কতো কষ্টই না করতে হয়েছে বিগত মাসগুলো জুড়ে। পুরো একটা বর্ষা গেছে শরীরের ওপর দিয়ে। খুটি মাসের কেননা রাতেই ঘূর হয় নি। হয় নি বিশ্রাম। দিনরাত এক কঠিন উত্তেজনাকর সময় যাপন করতে হয়েছে প্রতিটা মুহূর্ত।

রাস্তার ধারে ধারে মাইলপোষ্ট। প্রতি মাইল পরপর শায়ী তুলে দাঁড়িয়ে আছে তারা। ইট-সিমেন্ট দিয়ে তৈরি ফলকগুলোর বুকের ওপর আপ আপ ডাউনের মাইল নম্বর লিখিত। হাঁটার করেই চমকে উঠতে হয় মাইলপোষ্টের লেখাগুলো পড়ে। আগে এগুলোতে বাংলা এবং ইংরেজিতে মাইলের দূরত্ব ও স্থানের বিবরণ লেখিস্থায়া ছিলো। কিন্তু এখন তার পরিবর্তে প্রতিটি মাইলপোষ্টে উর্দু হরফে স্থানের বিবরণ লেখিস্থায়া বসানো হয়েছে। বাংলাকে নির্বাসিত করেছে পাক সামরিক জাতা তাহলে এইভাবে বাংলাদেশ, বাংলা ভাষা আর বাঙালি জাতিকে ধূংস করে দেবার কম চেষ্টা করে নি তারচেতাদের এই দীর্ঘ ন'মাসের রাজত্বে। সেই অপচেষ্টারই অংশ হিসেবে রাস্তার পার্শ্ববর্তী এইসব মাইলফলকের গায়ে বাংলা হরফের পরিবর্তে বসেছে উর্দু হরফ! ব্যাপারটা ধরার মতোই, মনে ধরেও। আর মুহূর্তে শরীরে জুলা ধরে যায়। ইচ্ছে হয়, এক্ষণি উর্দু হরফ আর সংখ্যা মাইলফলকগুলো থেকে নিচিহ্ন করে দিয়ে সেখানে বাংলা হরফ আর সংখ্যা বসিয়ে দিই। কিন্তু নিজের অঙ্ক ভাবাবেগ দমন করে মন বলে, এখনো সময় হয় নি। দেশটা আগে পুরোপুরি স্বাধীন হোক, তখন আবার সবকিছু ঠিকঠাক করে নেয়া যাবে।

রাতেই তুলী নদীর ওপর নির্মিত ভাসমান পটুন পার হয়ে এগিয়ে গেছে ট্যাক্সবহর। যৌথ অস্ত্রবর্তী বাহিনীও এগিয়ে গেছে ট্যাক্সের সাথে সাথে। ঠাকুরগাঁও দখলের কাজ শুরু করেছে তারা। ঠাকুরগাঁও মহকুমা শহর দখলে রাখার সর্বাঞ্চক চেষ্টা করবে পাকবাহিনী। কেননা সেখানে রয়েছে তাদের বড়ো ধরনের আর্মি গ্যারিসন। এছাড়া ঠাকুরগাঁও দখলে রাখার ব্যাপারটা তাদের জন্য যেমন কৌশলগত দিক দিয়ে খুবই জরুরি, তেমনি একটা বড়ো ধরনের প্রেস্টিজের ব্যাপারও। ঠাকুরগাঁও দখল হয়ে গেলেই দিনাজপুর-সৈয়দপুর-রংপুরের পথ উন্মুক্ত হয়ে যাবে। আগুন বাহিনীকে এরপর আর কোথাও ঠিকিয়ে রাখা মুশকিল হয়ে দাঁড়াবে। এসবই তাবছি আর হাঁটাছি। শুনছি পিন্টু আর বকরের খুনসুটি। পাশ থেকে শুনছি বাবলু-মুন্নার গল্প। শুনছি তাদের প্রাণ-মাতানো উচ্ছলে ওঠা হাসি। এ বিজয়

অভিযানের অন্যতম শরিক মুন্না নিজেকে মিশিয়ে দিয়েছে পুরোপুরি যুক্তের সাথে। আমাদের একের পর এক এই বিজয় অভিযান ওকে উঠে করে তুলেছে অন্য আর সবার মতোই।

### মাইন অপসারণের গুরুদায়িত্ব

কম্যান্ডারের নির্দেশ আসে বাঁদিকে নেমে যাবার। বেলা ১১টার মতো সময় তখন। এরি মধ্যে প্রায় দু'মাইলের বেশি পথ এগিয়ে এসেছি আমরা। সামনে আর মাত্র তিন-চার মাইলের ব্যবধানে ঠাকুরগাঁও। সোজাসুজি দ্রুত এগিয়ে গেলে ঠাকুরগাঁও দখলের যুক্তে জড়িয়ে পড়তে পারি আমরা। মনের ভেতরে তেমনি একটা তাগিদ কাজ করে প্রচণ্ডভাবে। কিন্তু আমাদের ওপর দায়িত্ব পড়ে অন্য একটা কাজের। কাজটা সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। ভয়ানক, প্রচণ্ড বিপজ্জনক আর ঝুকিপূর্ণও। কাজটা আর কিছু নয়, মাইন অপসারণের।

এ ধরনের কাজের নির্দেশ পাওয়াতে বুকের ভেতর কেমন একটা ধাক্কা লাগে প্রথম। সম্মুখবর্তী বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে পাকবাহিনী মাইন পেতে রেখেছে। মাইন ফিল্ডের সাহায্যে পাকবাহিনী আগুয়ান ট্যাঙ্ক, সাঁজোয়া বহর আর যৌথবাহিনীর গভৰণে করতে চেয়েছে। এরি মধ্যে তাদের মাইনের বিস্ফোরণে হতাহত হয়েছেন বেশ ক'জন যোদ্ধা। সাঁজোয়া বহরের একটা যানেরও ক্ষতি হয়েছে। পাকা সড়ক ছেড়ে নিচে নামবার উপায় নেই। পা দেয়া যাচ্ছে না কোথাও নিরাপদে। সুতরাং কম্যান্ডার নির্দেশ দেন, সামনে এগিয়ে গেলে একটা আখের খামার পাওয়া যাবে। 'সালান্দার ফার্ম' হিসেবে পরিচিত সেটা 'ক্রেয়েকশ' একের জমি জুড়ে আখ চাষ করা হয়েছে খামারটাতে। সেই আখবেতের ভেতর ফিল্ডে মাইন অপসারণ করে একটা 'সেফ করিডোর' বের করতে হবে এবং যৌথবাহিনী এগিয়ে যাবে সেই করিডোর দিয়ে। ঠাকুরগাঁওয়ের সামনে এই এখানে পাকা সড়কের ওপর একটা যৌথবাহিনী লকড় হয়ে গেছে। ওদিক থেকে ঠাকুরগাঁও শহরের প্রবেশমুখে পাকা সড়কের ওপরকার প্রশস্ত ব্রিজটা ভেঙে দিয়েছে পাকবাহিনী। সাবেক ই.পি.আর ব্যুরেন্ট্যান হেড কোয়ার্টার এবং বর্তমানে পাকআর্মি গ্যারিসনের সামনে ব্রিজটার অবস্থান। পাকবাহিনী ব্রিজের ওপারে ধরে রেখেছে তাদের প্রতিরক্ষা ধাঁচ। তবে এদিক দিয়ে ঠাকুরগাঁও শহরে প্রবেশপথে কোনোরকম ব্রিজ নেই। পাকবাহিনী তাই আগুয়ান বাহিনীকে তাদের ছড়ানো অবস্থান থেকে বিচ্ছিন্নভাবে বাধা দিয়ে চলেছে। আমাদের অনুমান 'সালান্দার ফার্ম' দিয়ে এগুতে পারলে ঠাকুরগাঁও শহর দখল করা সহজ হয়ে পড়বে।

এফ.এফ. কোম্পানি মূলত একটা গেরিলা দল। গেরিলা যুক্তের জন্য মাইন-এক্সপ্লোসিভ ইত্যাদি বিষয়ে তাদের ট্রেইনিং দেয়া হয়েছে। গেরিলা যুক্তের সময় এগুলো নিয়েই তাদের মূলত কাজ করতে হয়েছে। এ ফ্রন্টের মাইন বিশেষজ্ঞ একমাত্র এফ.এফ. কোম্পানির ছেলেরাই। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই এই গুরুদায়িত্ব চাপে আমাদের কাঁধে। যুক্তের মাঠে কম্যান্ডারের নির্দেশ সব সময়ই অবশ্য শিরোধার্য। 'না' বলবার উপায় নেই কোনোভাবেই। তাই মাইন অপসারণের এই দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে রাস্তার বাঁদিকে নেমে ফসলের খেত মাড়িয়ে দ্রুত এগিয়ে যেতে হয় অদ্বৰ্ত্তী সালান্দার ফার্মের দিকে।

বেশ বড় ধরনের এই ফার্ম। প্রায় অর্ধেক ফার্ম এলাকা জুড়েই আখ বা কুশারের চাষাবাদ। ফার্মের কুশার যেমন লবা, তেমনি ঘন আর পুরুষ। উন্নত জাতের কুশার সদেহ নেই। কিন্তু এ কী! হঠাৎ করেই চমকে উঠতে হয় কুশার খেতের সামনে এসে। মাইন! লাল রঙের, অনেকটা ইলেক্ট্রিক চুল্লি আকারের। খুবই তাড়াঢ়ো করে যে বসানো হয়েছে মাইনগুলো, সেটা সহজেই

অনুমান করা যায়। তৎক্ষেত্রে পাতা দিয়ে জমির ওপর মাইনগুলো ঢেকে রাখা হয়েছে। এরকম শত শত মাইন চারিদিকে। এই ভয়ঙ্কর জীবননাশী বিক্ষেপক মাটির তলায় পুঁতবারও অবসর পায় নি পাকবাহিনী। তৎক্ষেত্রে পাতা দিয়ে ঢেকে দিয়ে মাটির ওপর বসিয়ে রেখেছে শুধু। ঠিকভাবে ক্যামোফ্লেজ করবার সময় পায় নি। পাতার ফাঁকফোকুর দিয়ে মাটির ওপর বসানো লাল রঙের মাইনগুলো তাই এমনিতেই দেখা যায়। সবগুলো মাইনই জীবন্ত।

না, সত্যই, একটা দুটো নয়, শত শত মাইন। স্বল্প সময়ের ব্যবধানে আমার সহযোগদের দিয়ে অপসারণ করানো সত্ত্ব নয়। জীবন্ত মাইন সব। ডেটোনেট লাগানো। সামান্য এদিকওদিক হলৈই প্রচণ্ড বিক্ষেপণে একেবারে ছাতুফাতু করে দিতে পারে ছেলেদের। কুশার খেতগুলো ব্লকে ব্লকে বিভক্ত। দু'ব্লকের মাঝখানে প্রায় ১৫/২০ ফুটের মতো ফাঁকা মতো জায়গা। এ ধরনের দুটো ব্লকের মাঝখানকার ফাঁকা জায়গা পরিষ্কার করার সিদ্ধান্ত নিয়ে দলকে দু'ভাগে ভাগ করি। দু'দল দু'ব্লকের ফাঁকা জায়গা দিয়ে এগুবে পাশাপাশি। প্রত্যেক দলের ছেলেদের কাজ ভাগ করে দিই। একদল থীরে থীরে এগিয়ে দিয়ে মাইনটিকে 'নিউট্রোল' করে দেবে এবং সেটা তুলে নেবে। মাইন চিহ্নিত হলৈই তার কাছাকাছি মাটিতে রুক লাগিয়ে স্টোন অয়ে পড়তে হবে। তারপর আলতো হাতে তৎক্ষেত্রে পাতা সরিয়ে ফেলতে হবে মাইনের ওপর থেকে। এরপর দু'হাত সামনে বাড়িয়ে দিয়ে অত্যন্ত গভীরভাবে সংযোগ ও সতর্কতার সঙ্গে মাইনের মাঝখান থেকে ডেটোনেটেরটা বের করে আনতে হবে। আর সেটা এমনভাবে আনতে হবে, যাতে মাইনের ভেতরের বড়ির সাথে ডেটোনেটেরটি কোনো সংঘর্ষ না হয়। সংঘর্ষ হলৈই বিক্ষেপণ অবধারিত। তাহলে খুঁজ পাওয়া যাবে মাইন উভেলুনকারীসহ তার আশপাশের সঙ্গী-সাথীদেরও। প্রথম মাইনটি থেকে ডেটোনেটের বের করে দেখিয়ে দিই সবাইকে হাতেনাতে কীভাবে কাজ করতে হবে। কীভাবে 'ডেটোনেট' করতে হবে শক্তির মাইনকে।

কাজ শুরু হয়। পিন্টু থাকে প্রক্রিয়া, আমার নেতৃত্বে থাকে আরেকটা দল। পাকবাহিনী ফাঁকা জায়গায় মাইন বসায় নি। স্বাসয়েছে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে। গিজগিজ করছে মাইনের পর মাইন। সবগুলোই অ্যান্টি ট্যাক মাইন। অ্যান্টি পারসোনাল মাইন দেখা যায় না। ছেলেরা মাইন চিহ্নিত করে আর সঙ্গে সঙ্গে হৈচৈ করে ওঠে। মাইন উভেলুন করবার সময় জান্টা হাতে নিয়েই কাজ করতে হয়। মাইনের কাছে অয়ে জীবন্ত মাইন থেকে ডেটোনেটের বের করে নেবার সময় হাত কেঁপে ওঠে বারবার। নিষ্পাস বক্ষ হয়ে আসে। বুকের ধূকধূকানি বেড়ে যায় বহুগুণে। শরীর ঘেমে নেয়ে নেয়ে ওঠে উভেলুন আর অস্ত্রিভাত্য। যেই একটা মাইন তোলা হয়, অমনি স্পষ্ট পাওয়া যায় মনে। পরেরটা তুলতে গিয়ে আবারো সেই একই অবস্থা। ভাবাবে প্রায় দু'ঘণ্টা ধরে জীবন হাতে নিয়ে কাজ করার পর দু' ব্লকের ভেতর দিয়ে অবশ্যে পৌছানো যায় সালান্দার ফারমের সামনের রাস্তায়। দু'দলের কাছে তখন ৫০টার মতো মৃত মাইন। সেগুলো রাস্তার পাশে সাজিয়ে রেখে, মাইনকুক করিডোর দুটো সম্পর্কে সংবাদ পাঠিয়ে দিই দ্রুত পাকা সড়কের অবস্থানে অপেক্ষ্যাগ ফ্রন্টের কাছে। তারপর করিডোর দুটোর মুখে এবং ভেতরে মাঝে মাঝে দাঁড় করিয়ে রাখি সেন্ট্রি, যাতে করে করিডোরের বাইরে কেউ না যায়।

ফার্মের রাস্তাটা পাকা সড়ক থেকে নেমে এসেছে। বেশ প্রশংসন্ত রাস্তা। তার ওপর বসে পড়ি একরাশ ক্লান্সি নিয়ে। পেছনে ফার্মের অফিস। ট্রাইর, ট্রেইলর, যান্ত্রিক লাঙলসহ নানা ধরনের জিনিসপত্র এদিকেসেদিকে ছড়ানো-ছিটানো। এটা ঠাকুরগাঁও সুগার মিলের ফার্ম।

ফার্মের ভেতরে কাউকে পাওয়া যায় না। পালিয়েছে সব অফিসার-কর্মচারী। পরিভ্রান্ত ফার্ম-হাউস থেকে পানিটানি খেয়ে আসে একরাত্মুল-মতিয়ারসহ আরো কয়েকজন। হ্বু ইঞ্জিনিয়ার মূরা উৎসাহভরে দেখতে থাকে বাবলুসহ কয়েকজনকে নিয়ে ফার্মের ভেতরে ছড়ানো নানা রকমের যন্ত্রপাতি ইত্যাদি। পর আলী একটা বিরাট কলার কাঁদি নিয়ে আসে গাছ থেকে পেডে। কলাগুলো এখনো তেমনভাবে পাকে নি। কিন্তু খিদের চোটে গোয়াসে তাই গিলতে থাকে ছেলেরা কাঁদি থেকে ছিড়ে ছিড়ে।

### মুক্ত হলো ঠাকুরগাঁও

গুদিকে ফ্রন্টের কিছু অংশ এগিয়ে গেছে পাকা সড়ক ধরে। বাকি সবাই ছড়ছড় করে এগিয়ে আসে কুশার খেতের ভেতরের নিরাপদ পথ দিয়ে। কিছুক্ষণ বিরতি দিয়ে আবার যাত্রা শুরু হয় কাঁচা রাস্তা ধরে। সালান্দার গ্রামের পাশ দিয়ে আমরা আবার নিয়ে উঠি পাকা সড়কে। এরি মধ্যে মিত্রবাহিনীর একটা চৌকস দলও এগিয়ে এসেছে কুশার খেতের নিরাপদ করিডোর দিয়ে। তারা দ্রুত এগিয়ে গেছে সামনে। বিক্ষিণ্ণ গোলাগুলি চলে সামনে। ঘড়ঘড় আওয়াজের খনি বলে দেয়, ট্যাঙ্ক বাহিনী অত্যন্ত ব্যস্ত শক্তির বৃহৎ শুর্ডিয়ে দিয়ে সামনে এগিয়ে যাবার জন্য।

সঙ্ক্ষার মুখে আমরা পৌছে যাই ঠাকুরগাঁও বাসস্ট্যাডের কাছে। সেখান থেকে ঠাকুরগাঁও শহরের প্রাণকেন্দ্র আধ মাইলের মতো হবে। প্রসারিত পিছুজলা সড়কটা চলে গেছে ডানে শহর অভিযুক্তে। শহরে লোকজন প্রায় নেই বললেই চলে। মনে হয় একটা কাফন মোড়ানো শহরকে ডানে রেখে আমরা ফাঁকা বাসস্ট্যাডের এলাকাজুড়ে পজিশনে রয়েছি। বিক্ষিণ্ণ গোলাগুলি চলে শহরে। সঙ্গে যৌথবাহিনী শুর্ডিয়ে করে চলেছে।

প্রায় ঘন্টাখানেকের পর মুভমেন্ট অড়ার আসে। এবার পাকা সড়ক ধরে এগিয়ে পিয়ে আমরা অবস্থান নিই সি.ও অফিসের সামনে। ভ্রজো করে তাকাতেই দেখতে পাই সম্মুখবর্তী ব্রিজটা পাকবাহিনী ভেঙে দিয়েছে। বিজের স্টেটক দিয়ে ছেটো নদীটা অতিক্রমের জন্য ডাইভারশন তৈরি হচ্ছে। হাঁটু সমান পানি নন্দিতে। ট্যাঙ্কগুলো গো গো ঘড়ঘড় শব্দ তুলে পার হয়ে যায় এক সময় ডাইভারশন দিয়ে নদীটা। আমরা রাস্তার পাশে বসে থেকে মিত্রবাহিনীর তৎপরতা দেখতে থাকি। এরি মধ্যে যৌথবাহিনী পাকবাহিনীর গ্যারিসন অর্থাৎ সাবেক ই.পি.আর হেড কোয়ার্টার দখলে নিয়ে নিয়েছে। এটা এক সময় আমাদের সাথে আগুয়ান ফ্রন্টের অধিকাংশ ই.পি.আর-এর হেড কোয়ার্টার ছিলো। এখান থেকে বিদ্রোহ করে তারা বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্যা প্রকাশ করে এবং প্রতিরোধ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে প্রায় মাসাধিককাল মুক্ত রেখেছিলো ঠাকুরগাঁও-পঞ্জগড় এলাকা। এরপর বেশ কিছুটা সময় পেরিয়ে গেছে। অনেক কষ্ট সহ্য আর অমানবিক জীবনযাপন করতে হয়েছে। সামনে ছিলো তাদের তিমিরাক্রান্ত ভবিষ্যৎ। আর সেই ভবিষ্যতের মুখোমুখি তাদেরকে কাটাতে হয়েছে অনিচ্ছিত প্রহরের পর প্রহর। আজ আবার তারা ফিরতে পেরেছে তাদের প্রিয় ঠাকুরগাঁওয়ে। মুক্ত করতে পেরেছে তাদের নিজস্ব হেড কোয়ার্টার। ব্যবহৃত আনন্দে মাতোয়ারা অবস্থা তাদের। খুশিতে হল্লোড় করছে তারা তাদের ফিরে পাওয়া হেড কোয়ার্টারে। ‘জয় বাংলা’ শ্রেণানে শ্রেণানে মুখর হওয়ার পাশাপাশি ফাঁকা গুলির্বর্ষণ করে তারা তাদের বিজয়কে সেলিব্রেট করতে শুরু করে।

হঠাতে পিটু বলে, দেখছেন যাহুব ভাই!

তার দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাইতেই সে দেখিয়ে দেয় সি.ও. অফিসের সাদা দোতলা

ভবনটির দিকে। ঠাঁদের আলোয় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে সাদা চকচকে দালানটার ওপরে কালো কালি দিয়ে বড়ো বড়ো হরফে লেখা 'আলবদর একাডেমি' শব্দ দুটো। সি.ও অফিসটাকে আলবদর একাডেমি বানিয়েছিলো এবা। কতো শত আলবদর এখন থেকে ট্রেনিং নিয়ে অভ্যাচারের পর অভ্যাচার আর সীমাহীন বর্ষরতা চালিয়েছে অধিকৃত বাংলার নিরীহ যানুষজনের ওপর, তার ইয়ত্না নেই। কোথায় এখন আলবদর নামের সেই নরবাদক জানোয়ারের দল? নিচ্ছয়ই পালিয়েছে কিংবা কোথাও গা ঢাকা দিয়েছে। কিন্তু পালাবে কোথায় তারা? ধরা তাদের পড়তেই হবে। মনে পড়ে যায় সাইকেলিং বিনিউলের কথা। মানিকগঞ্জ শরণার্থী শিবিরের পাশে তাদের পার্টি অফিসে বসে শপথ বাক্যের মতো সে উচ্চারণ করেছিলো, ঠাকুরগাঁও যদি কখনো মুক্ত হয়, তাহলে দালাল শান্তিবাহিনীর নেতা তমিজউদ্দিন মঙ্গলনার সাথে নিজে সে হিসেব-নিকেশ করবে। ঠাকুরগাঁও শহরে বিনিউলের পুড়িয়ে দেয়া বাড়িটা যে কোথায়, কে জানে? আরেকজনের কথাও মনে পড়ে— আলম চৌধুরী। সীমান্ত পাড়ি দেয়ার মুহূর্তে সে ধরা পড়েছিলো রাজাকারুর বাহিনীর হাতে। মারেয়ার প্রথমদিনের মুক্তের কথা। সেদিনই আলম চৌধুরীকে রাজাকারুরা ধরে এনে সামনের ই.পি.আর ক্যাপ্সের বাষের খাঁচায় বন্দি করে রেখেছিলো। একদিকে বাষ, একদিকে আলম চৌধুরী। মাঝখানে লোহার রডের পার্টিশন বা বেড়া। আলম চৌধুরীকে শেষ পর্যন্ত তারা হিস্ত বাধের খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করে নি। বেঁচে ছিলো সে। এখন সে কোথায়, আসে ক্ষেত্রে আছে কি না, কে জানে?

ঠাকুরগাঁও সভিয় সভিই মুক্ত হলো অবশেষে। ভাজ ১৯৭১ সালের ৩ ডিসেম্বর। ঠাকুরগাঁও শহরকে ডানে রেখে, এই এখন সি.ও অফিসের অর্থাৎ আলবদর একাডেমির সামনে জ্যোৎস্নালোকিত সক্ষ্য রাতে আমরা বসে আছি। সামনে ভেঙে ফেলা ব্রিজ। ডাইভারশন দিয়ে পার হয়ে যায় মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনী দলের পর দল। কেহন যেনো অবিষ্কাশ্য লাগে সবকিছু। কতো দ্রুত ঘটে যাচ্ছে সব ঘটনা। আমরা যেনো পিটিয়ে তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছি পাকবাহিনীকে। ঠাকুরগাঁওয়ের মুক্তি আমাদের জন্য বিরাট একটা বিজয়হীনপ ঘটনাই। এরপর রয়েছে বীরগঞ্জের জন্য। বীরগঞ্জ পার হলেই দশমাইল নামের জায়গাটি। সেখান থেকে ১০ মাইল দূরে দিনাজপুর। তার ১৫ মাইল ব্যবধানে সৈয়দপুর। এখন আমাদের অভিযানের লক্ষ্য দিনাজপুর ও সৈয়দপুর দুটো জায়গাই।

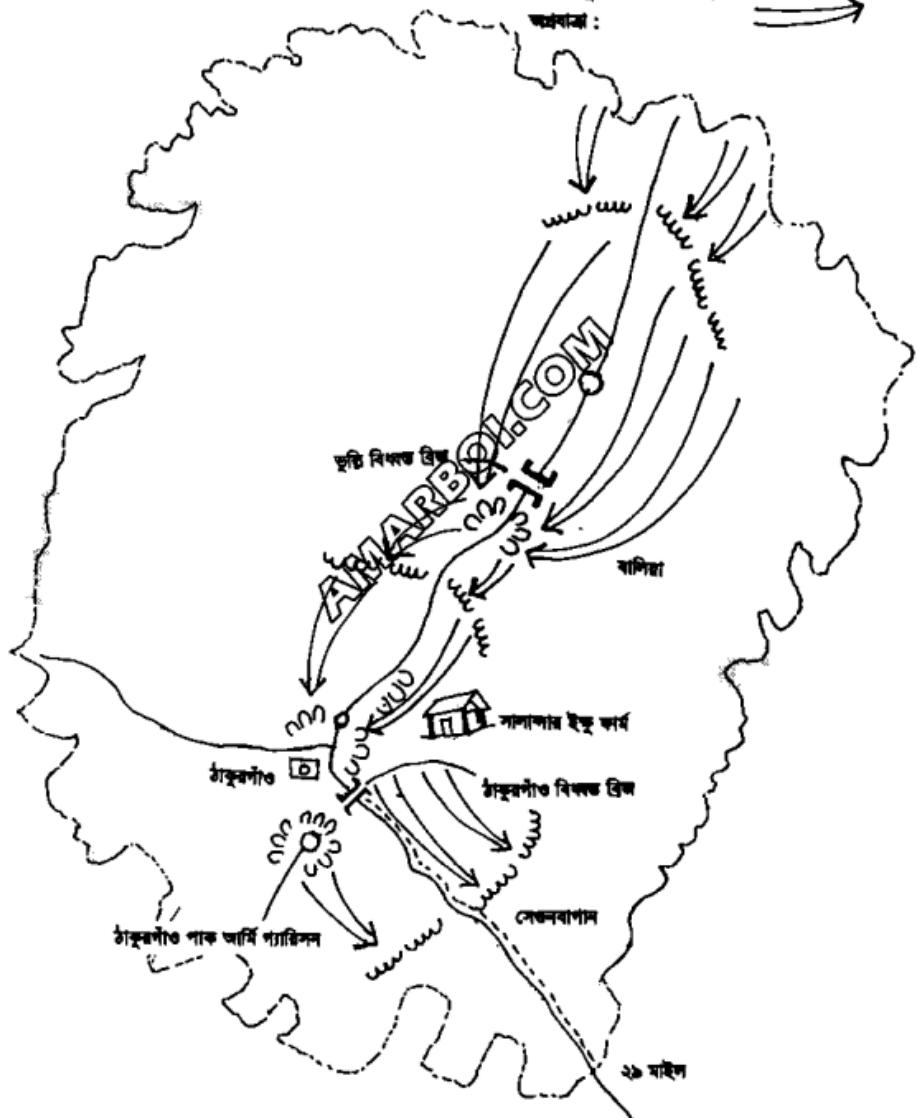
রাত ৮টায় মুভমেন্ট অর্ডার আসে। ঠাকুরগাঁও শহরকে পেছনে রেখে নদীর হাঁটুজল ভেঙে আবার সামনের দিকে এগিয়ে চলা শুরু হয় আমাদের।

### সেগুন বাগানের আশ্রয়

রাতের যাত্রাবিবরিতি হয়। পাকা সড়কের পাশে সেগুন বাগানের ভেতরে অবস্থান নেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়। সামনে পঁচিশ মাইল। সেখানে পাকবাহিনী ব্রিজ ভেঙে ফেলে বাধা দেয়ার চেষ্টা করেছে। মিত্রবাহিনীর ট্যাঙ্ক বহর আর পদাতিক বাহিনী পাকসেনাদের ধাওয়া করে নিয়ে গেছে পঁচিশ মাইল পর্যন্ত। মিত্রবাহিনীর আজকের রাতের অগ্রভিয়ন চলবে সেখানেই। আমাদেরকে রাতের মতো অশ্রুয় নিতে বলা হয় সেগুন বাগানের ভেতরে। এরি মধ্যে ঠাকুরগাঁও থেকে প্রায় তিনি মাইল এগিয়ে এসেছি আমরা। তুলী থেকে সালান্দাৰ ফাৰৰ্ম হয়ে ঠাকুরগাঁও এবং সেখান থেকে এ জায়গা পর্যন্ত আসতে প্রায় ১৫/১৬ মাইল পেরিয়ে আসতে হয়েছে। পুরো দূরবৃত্তাই পাড়ি দিতে হয়েছে আমাদের কঠকর হাঁটা পথে। বৰাবতই ক্লান্ত হয়ে পড়েছে ফ্রেন্টের সবাই।

কেচ স্টার্প-২৫  
সমুদ্রসূত  
ঠাকুরগাঁও-এর গভর্নর  
০-৩২-৭৩

পাতা সংখক :  
প্রক্রিয়াজির অবস্থা : ১১১ ৩৩  
বিজি ও মুক্তিবাহিনীর অবস্থা : ৩৩ ৩৩  
অবস্থা :



কিন্তু উপায় কি? রাতের মতো ট্রিপ্প-বাস্কারের অশ্রয় তো নিতেই হবে। খাবার আসে নি তখনো। আর সবার মতো আমার নিজেরও প্রচণ্ড স্মৃৎ লেগেছে। মনে হচ্ছে যেনো পেটের নাড়িভূঢ়িও হজম হয়ে যাবে। পিন্টুর অবস্থা আরো কাহিল। রাস্তার ওপর বসেছি দুঁজনে পাশাপাশি। সে বলে, কেবল নুন দিয়েই এখন এক হাঁড়ি ভাত খেয়ে ফেলতে পারবো।

— কী দিয়ে?

— খালি নুন দিয়ে। আর কিছু না। গরম ধোয়া-ওঠা ভাত আর শুধু নুন।

পিন্টুর কথায় গরম ধোয়া-ওঠা ভাতের গন্ধ যেনো নাকে এসে লাগে। আরো চনমনিয়ে ওঠে পেটের খিদে।

বি. কোম্পানির হাবিলদার মেজর শাহাদৎ এগিয়ে আসে। দাঢ়ি-গোফে মুখ প্রায় ঢেকে গেছে। বাবার চুল ঝুলে পড়েছে পেছন দিকে। লম্বা-চওড়া জ্বালান ই.পি.আর সৈনিক। এই মানুষটির সাথে এরি মধ্যে খাতিরটাতির জমে উঠেছে খুব। হাবিলদার মেজরের কাজ অনেকটা প্রশাসনিক ধরনের। যেমন, সবার তত্ত্ব-তালাশ নেয়া, অভাব-অভিযোগ শোনা, রাসদ-গোলাবারুণ এসব সরবরাহ করা। কোম্পানি হেড কোয়ার্টারের প্রশাসনিক কর্মকর্তার কাজ যাকে বলে। তাকে এই সময় হঠাৎ করে এগিয়ে আসতে দেখে হৈচে করে ওঠে ছেলেরা। একজনতো বলেই ওঠে, খাবার না আসিলে সেগুল গাছের পাতা খাবা হবে হামাক....।

পিন্টু বলে দাদু তাড়াতাড়ি খাবার দেখেন, তা নাহলে স্মৃত্যুকে খেয়ে ফেলবে সবাই।

কথা শুনে হাবিলদার মেজর হাসেন। হাসতে হাস্তাতেই বলেন, খাবার আয়া পড়েছে ঠাকুরগাঁও তক। ক্ষতি পাঠাইছি তাগো লইয়া আয়োহের জন্য। আরেকটু দৈর্ঘ্য ধাইরতে হইবো দাদুরা। আয়া পড়তাছে আমাগো ভাত আর মুক্তির ভার। আমি বাঁইচা থাইকতে আপনেরা না খায়া থাকবেন, এইডা হইতে দিয়ু না।

হাবিলদার মেজর কথাগুলো বক্তৃতা বলতে এগিয়ে যান সামনের দিকে। আমাদের আহাৰ্য-বাহকেরা আর কতো দুরে পাঠাই তিনি দেখতে যান। তুঁৰী পার হবার পরই ছেড়ে দিয়েছি বোদাৰ স্তুল শিক্ষকসহ কঞ্চ লোকটাকে। রাজাকার ও শাস্তি বাহিনীৰ সেই ধৰা পড়া ৪ সদস্য এখনো গুলিৰ বাক্স বহনের কাজ করে চলেছে। রাজাকারেৰ ক্ষমা নেই। কিন্তু মুক্তিবাহিনীৰ অঞ্চলিয়ানেৰ সাথে যুক্তেৰ প্ৰতিয়ায় তাদেৰ এই ভাৰ বহনেৰ কাজ মুক্তিযুক্তেৰ সহায়ক হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে এবং তাদেৰ এই অমানুষিক কঠেৰ ভেতৱে দিয়ে বলা যায়, তারা তাদেৰ পাপ আলনেৰ একটা ভালো সুযোগই পেয়েছে। যুক্তেৰ শেষ পৰ্যন্ত এভাৱে ঢিকে থাকলে সুবেদাৰ খালেক তাদেৰ ছেড়েও দিতে পাৱেন। তাঁকে যতেকটু জানা হয়েছে এৱি মধ্যে তাতে করে এ কাজটা যে তিনি কৰবেন, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

বকৰ সেগুল বাগানেৰ ভেতৱে একটা ফাঁকামতো জায়গা বেছে নিয়ে মাটি খুঁড়েছে। ঊচু গড়েৰ শক্ত মাটি। কোদালেৰ প্ৰতিটি কোপেৰ সঙ্গে কেমন ঘটাং ঘটাং একটা শব্দ হয়। আৱ সেই শব্দ জঙ্গল জুড়ে ধৰনি-প্ৰতিৰোধনি তুলে বাজতে থাকে। সেই সাথে ছোটোখাটো হাঁকডাক। ফলে রীতিমতো সৱেগৱে হয়ে ওঠে সেগুল বাগানটা। বকৰ মাটিতে কোদাল চালায় আৱ বলে, ক্যাঙ্কা শক্ত মাটি বাহে! মাটি নোয়ায় তো একেলে যান নোহ।

পিন্টু বকৱেৰ কথা যেনো মাটিতে পড়তে দেয় না। সোজা ওকে আক্ৰমণ কৰে বলে, শা... তুমি কি গ্যাটে আছো? মন গৈছে তোমাৰ পিতৃলা যুক্তৰ কাছে। মনোৱ চান মুখ দেখিয়া খৌড়েন বাজান, মাটি যদি নোয়া হয়, তো নোয়াই খৌড়েন। বকৰ মিয়া এৱপৰ চূপ মেৰে

যায়। আপন মনে গড়ের ওপর সেগুল বাগানের ফাঁকে মাটি ঝুঁড়তে থাকে শব্দ তুলে তুলে।

ঠাকুরগাঁও পার হবার পরই পাকা সড়কের বাম পাশ ঘেঁষে একটা উচু গড় শুরু হয়েছে। গড়টির ওপর ফরেষ্ট বিভাগ সেগুল গাছ লাগিয়েছে। মাঝবয়সী এই গাছগুলো গড় জুড়ে সৃষ্টি করেছে চমৎকার একটা বন। এ পর্যন্ত গড় আর তার এই সেগুল বাগান আমাদের বাঁ পাশ জুড়ে রয়েছে সমান্তরালভাবে। সামনে আর কতোদূর যাবে বোঝা যাচ্ছে না। তবে ফরেষ্টের ধাঁটি স্থাপনের জন্য উচু গড় একটা চমৎকার আর আদর্শ অবস্থান হিসেবে পছন্দ হয়েছে আমাদের সবারই। শুধু মাটিটাই একটুখানি যা শক্ত। কাছাকাছি পেছন দিকটাতে বাবল-মুয়ারা ও ট্রেঞ্চ-বাস্কার খুড়ছে। ওদের কথাবার্তায় নিবিড় বক্সুত্তোর ছোয়া।

আকাশে শীতের ঠাঁদ। শীতের কৃষাণীও তেমন ভারি নয়। আকাশ থেকে যেনো হিম নেমে আসে হলহল করে। এরি মধ্যে জুখুখু হয়ে বসে থাকতে থাকতে একসময় তয়ে পড়ি আমরা দু'জন। আমি আর পিটু। পিটু উদাস গলায় একসময় বলে, বাড়ির কথা মনে পড়ছে শুব। কবে যে যাওয়া হবে বাড়ি, কে জানে! তাকে আশ্বাস দিয়ে বলি, হবে একদিন, দেখে নিও। যে রেটে আগাছি আমরা, ক'দিন লাগবে আর?

পিটু কথা বলে না। উঠে বসে। সিগারেট ধরায় দু'জনার জন্য। সিগারেটে লো টান দিয়ে বলে, মাহবুব তাই, কোটগোছের কথা মনে পড়ে? চমকে উঠি তার কথায়। বুকের ভেতর ছলাং করে শব্দ হয় যেনো। জিগোস করি, কেনে—~~AMARBOI~~—

— না এমনি। সেবার আসবার সময় পুতুরপাড়ে আসে। যেনো কী বলেছিলেন আপনাকে। তারপর থেকে আপনাকে কেমন উন্মান দেখি মাঝে হাত্যে।

চালাক ছেলে পিটু। ব্যাপারটা সত্যি সত্যি কিছুটা অঁচ করে নিয়েছে। তাই নিজেকে গোপন না করে ওর কথায় হেসে উঠে হাত্যাক বলছিলো তবেও মাথা নাড়ে সে। বলি, রোমান্টিক কথা।

— বলেন কি?

বলেই পিটু উৎসাহে লাখিয়ে উঠে। তারপর বলে, আসলে কি বলছিলো বলেন তো?

— বলবো!

— হ্যাঁ।

— বলেছিলো সে অপেক্ষা করবে।

— আর আপনি?

— আমিও বলেছি, অপেক্ষা করো, ফিরে আসবো একদিন, যেদিন যুক্ত শেষ হবে আর যদি বেঁচে থাকি।

আমার কথা শনে শুব শুশি হয় পিটু। ঠাঁদের আলোয় ঝলমলে দেখায় তার মুখ।

তখন তাকে জিগোস করি, তুমি নিজেও মাঝে মাঝে কি ভাবো বলো তো? এতো গান, এতো আনন্দ, এতো হাসি আর রসিকতা তোমার মনে, তুমি গান গাইতে গাইতে উদাস হয়ে হঠাং হঠাং কোথায় হারিয়ে যাও বলোতো? কোন্ দুঃখবোধ থেকে? তুমিও কি ভাবো কারো জন্য?

বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে পিটু। তারপর সে বলে, আছে একজন মাহবুব ভাই। যুদ্ধের আগে তেমন কিছু মনে হয় নি। কিন্তু এই যুদ্ধের ভেতরে থেকে মনে হয়, তাকে আমি ভীষণ ভালোবাসি। আমাদের বাড়ির সামনেই তাদের বাড়ি। যুদ্ধের পর ফিরে পিয়ে

তাকে দেখতে পাবো কি না...?

পিন্টুর মাঝে মাঝে উদাস হয়ে যাওয়ার কারণ তাহলে এই! ফিরে গিয়ে মেয়েটিকে সে দেখতে পাবে কি না, কে জানে। তবুও তাকে বলি, বলি মনের সমস্ত বিষ্ণব নিয়েই, পাবে পিন্টু, দেখে নিও সবকিছু ঠিকঠাক থাকবে আমাদের...।

বকরের ট্রেঞ্চ কাম বাকার খৌড়ার কাজ শেষ হয়ে যায়। খাদ্য বাহকের দলও এসে পৌছয় এরি মধ্যে। ছেলেরা সব সেগুন গাছের বড়ো বড়ো পাতা ছিঁড়ে নিয়ে মাটিতে সেগুলো বিছিয়ে ভাত-মাংস নেয়। খাবার পাট চুকে যাবার সাথে সাথে হাবিলদার মেজের শাহাদাং দৌড়ে আসেন। উত্তেজিতভাবে বলেন, দাদু দারুণ খবর আছে!

— কী খবর?

— ইন্ডিয়া-পাকিস্তানে যুদ্ধ ডিক্রেয়ার হইয়া গেছে!

— জানলেন কোথা থেকে?

— খবর আইছে, সেটে।

— চলেন তো শুনি বলে পিন্টুসহ এগিয়ে যাই দ্রুত মাসুদের বাকারে। খবরটা সঠিক। জানবার পর আবার ফিরে আসি নিজেদের আস্তানায়। যুদ্ধের খবরে মনের ভেতরটা কেমন যেনে খচখচ করে ওঠে। ভারত-পাকিস্তান তাহলে যুদ্ধ বেধেই গেলো! ভারতের সাহায্য নিয়ে আমরা বিজয়ের একটা পর্যায়ে পৌছে গিয়েছিলাম প্রস্তুত তাহলে কী হবে? ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ করলে আমাদের বাংলাদেশ সমস্যার কী ভূমিকা? মাঝখানে এসে কি তারা রণে তঙ্গ দেবে? এতোদিন যুদ্ধ হচ্ছিলো বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য। যেটা ছিলো আমাদের মুক্তিযুদ্ধ। ভারত-পাকিস্তান সার্বিক যুদ্ধ লাগলে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের কী হবে? আমরাই-বা যাবো কোথায়? এসব নিয়েই ভেবে চলি হচ্ছিয়ে খুঁটিয়ে বাকারে শয়ে থেকে। গভীর একটা দৃষ্টিতা চেপে বসে বুকের ওপর। সারাঙ্গানংশুম কেটে যায় এই চিন্তার ঘোরেই।

যুদ্ধ ঘোষণা, উড়ে যাওয়া যুদ্ধ হিসান

সকালে মাসুদের বাকারে গিয়ে রেডিও শুনি। খবরে যুদ্ধের বিস্তারিত বিবরণ। এ যুদ্ধ সম্পর্কে ইন্দিরা গান্ধীর বক্তব্যের উকুত্তিও দেয়া হয়। তিনি তাঁর বক্তব্যে এ যুদ্ধের জন্য পাকিস্তানকে দায়ী করেছেন। তাঁর দেশের সশস্ত্র বাহিনীর প্রতি তিনি পাকিস্তানি হামলার যথাযথ জবাব দেয়ার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন। দেশবাসীকে তিনি এই ক্রান্তিলগ্নে এক্যবন্ধ থাকারও অনুরোধ জানিয়েছেন।

সর্বাঞ্চক যুদ্ধে বিমান হামলা অবশ্যজ্ঞাবী। এজন্য আমাদের আরো নিরাপদ আশ্রয় দরকার। তাই পিন্টুসহ আমি পেছনদিককার কুশার খেতগুলো জরিপ করতে যাই। ফিরবার সময় দেখি একটা পুরুরপাড়ে গ্রামের রাস্তার ওপর দুটো গরুগাড়ি। ই.পি.আর-এর একজন নায়েকের নেতৃত্বে ক'জন সৈনিক আটক করেছে গাড়ি ভর্তি বাচ্চাকাচাসহ মহিলাদের। ক'জন পুরুষ মানুষকেও দেখা যায়। ব্যাপারটা থেকে স্পষ্টতই বোঝা যায় যুদ্ধের এই অনিচ্ছিত অবস্থায় জীবনের নিরাপত্তা খৌজে তারা পালিয়ে যাচ্ছে এক জায়গা থেকে অন্য কোনো জায়গায়। গরুগাড়ির একজন বয়ঞ্চ লোকের সঙ্গে নায়েক কথা বলছেন উচু গলায়।

— তোমরা বিহারি?

— না বাবা আমরা বিহারি নই।

- বাড়ি কোথায় আসলে?
- রাজচাহী।
- রাজচাহী না মালদহ?
- রাজচাহী বাবা, রাজচাহী।

বয়ক লোকটার কথার টানই বলে দেয় তারা মালদহ জেলার উঁঠাস্তু। দেশ বিভাগের পর চলে এসেছে এদেশে। মালদহের লোকদের হাফ বিহারি বলেই সবাই ডাকে। এদের মধ্যে থেকে রাজকার আর দালালও হয়েছে অনেকে এবং তাদের সংখ্যা একেবারে নগণ্যও নয়। কেনো যে এরা মনে-প্রাণে পাকিস্তানিদের দালালি করছে কে জানে? দেশের এই মুক্তিলঞ্চে তাই এরা টাগেটি হয়ে যাচ্ছে। মুক্তিযোকাদের দীর্ঘদিনের পুষ্ট রাখা রোষানলের শিকার হয়ে যাচ্ছে। নায়েকের চেহারা অত্যন্ত কঠোর আর জেডারিত দেখায়। ‘রাজচাহী’ আর ‘রাজচাহী’ শব্দ দুটো নিয়ে তারা কথা বলতে থাকে। পিন্টুসহ ফিরে আসি আমাদের সেগুনবাগিচার বাঙ্কারে।

হঠাতে করে আকাশে মেঘ গর্জনের মতো শব্দে চমকে উঠতে হয়। যুদ্ধবিমান এটা বুঝবার পরই সবার মধ্যে একটা অতঙ্ক আর অস্ত্রিভূত ছড়িয়ে পড়ে। তাহলে কি পাকিস্তানি বিমান আমাদের হামলা করতে আসছে? না, বিমানগুলো আসছে পেছন থেকে। তার মানে মিত্রবাহিনীর বিমান। শব্দের উৎস সম্পর্কে ধারণা হতেই বিমান ঝুঁজবার আর দরকার হয় না। তারপরই সবার দৃষ্টিকে চমকে দিয়ে দুটো বিমানকে উচ্চে উচ্চে উচ্চে দেখা যায় পাকা সড়কের ডান দিককার ফসলের মাঠের ওপর দিয়ে। খুবই নিচে দিয়ে উড়ে যায় বিমান দুটো। শক্তির রাজারকে ফাঁকি দেয়ার কৌশল এটা। বিমান দুটো সামনে মিলিয়ে যেতে না যেতেই দেখা যায় আরো দুটো। এরপর আরো দুটো। এরকম দুটো দুটো করে জোড় বেঁধে যুদ্ধ বিমানগুলো উড়ে যায় সগর্জনে সামনের দিকে। দুটো পিলানের ঠিক পেছনেই দেখা যায় কালচে রঙের পেট মোটা দুটো বিমানকে। বোঝাই যাবে বোমারু বিমান এগুলো। আগে-পিছে ফাইটার বিমান পাহারা দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে বেসিনে বিমানগুলোকে।

গভীর উৎসুক্য নিয়ে সবাই আঁকড়ে থাকি ভারতীয় বিমান বাহিনীর যুদ্ধ বিমানগুলোর উড়ে যাওয়ার দিকে। একেবারে চোখের ওপর দিয়ে উড়ে যায় বিমান। যুদ্ধ বিমান! সকালের নরম রোদের আলোয় চকচক করে ফাইটার বিমানগুলোর চকচকে শরীর। গভীর আগ্রহ নিয়ে ট্রেক্ষও-বাঙ্কার ছেড়ে উঁচু গড়ের ফাঁকা জায়গায় দাঁড়িয়ে বাড়ের বেগে ছুটে যাওয়া যুদ্ধ বিমান দেখে ফ্রন্টের সব ছেলে। এদের মধ্যে অতি উৎসাহী কেউ কেউ পাকা সড়কে নেমে যায়। কিন্তু ধর্মকধামক দিয়ে তাদের ফিরিয়ে আনা হয় বনের ভেতরে। বিমানগুলো মিত্রবাহিনীর হলেও শক্ত ভেবে আমাদের অবস্থানকেও টাগেটি করে ফেলতে পারে তারা। ফলে ম্যাসাকারের শেষ থাকবে না। যুদ্ধের ভেতরে এ রকমের সেমসাইডের ঘটনা বিরল নয় একেবারে।

বিমানগুলো উড়ে আসছে পেছন থেকে। অর্থাৎ শিলিঙ্গড়ির বাঘড়োগরা বিমান ঘাঁটি থেকেই। ইন্টার্ন ফ্রন্টে ভারতীয় বিমান বাহিনীর সব থেকে বড়ো ঘাঁটি অবস্থিত বাঘড়োগরায়। অত্যন্ত চমৎকার নিরাপত্তা ব্যবস্থা। রানওয়ের চারদিকে ঘন বনজঙ্গল। সেই বনজঙ্গলের বেষ্টনীতে এক একটি বিমানকে গাছগাছালির ভেতরে লুকিয়ে রাখবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এখন সেখান থেকেই ধেয়ে আসছে এই বিমানগুলো।

তা হলে শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ বিমানও অংশ নিলো এই যুদ্ধে! প্রথমে শুধু পদাতিক বাহিনী, পরে ট্যাঙ্ক বহর, আজ যোগ দিলো যুদ্ধ বিমান। তার মানে সর্বাত্মক যুদ্ধ বলতে যা বোঝায়,

আজ থেকে সেটা শুরু হয়ে গেলো।

বিমানগুলো সব উড়ে যাচ্ছে সামনে। অদূরেই শক্রকবলিত গুরুত্বপূর্ণ এলাকা দিনাজপুর, রংপুর, সৈয়দপুর আর বগুড়া। সৈয়দপুর আর রংপুর ক্যাটলমেটকে পাকবাহিনী অত্যন্ত শক্তিশালী করে গড়ে তুলেছে। মিত্রবাহিনীর বিমানগুলো এখন সেদিকেই ধাবিত। শক্রর টার্গেটগুলোর ওপর আঘাতের পর আঘাত হানার জন্য। তাবি, ভারতীয় বিমান বহরের যুদ্ধে অংশ নেয়ার ঘটনা দ্রুত মোড় ফিরিয়ে দিতে পারে এই যুদ্ধের। আধুনিককালের যুদ্ধে বিমানবাহিনীর গুরুত্ব অপরিসীম। শক্রের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা আকাশপথে আক্রমণের পর আক্রমণে ধ্বনি করে দিয়ে পদাতিক বাহিনীকে দ্রুত এগিয়ে যেতে সাহায্য করে বিমান বাহিনী। এই রকম অবস্থায় পাকবাহিনীও সম্ভবত আজ ডোবে তাদের বিমানগুলো। যুদ্ধের সূচনায় শোনা গেছে, পাকিস্তান বিমান বাহিনীর বছ বিমান আছে। আর সেগুলো অবস্থান করছে ঢাকার তেজগাঁও বিমানবন্দরে। যুদ্ধ বাধবার পর এই সময়সীমার ভেতরে তারা নিচ্ছয়ই তাদের বিমান বহরকে আরো শক্তিশালী করে থাকবে। আর সেগুলো উড়ে এসে সীমান্তের আকাশে হয়তো ভারতীয় বিমানগুলোকে বাধা দিতে চাইবে। তাহলেই তো লেগে যাবে তুমুল আকাশযুদ্ধ। যাকে বলে 'ডগ ফাইট'। আর সে 'ডগ ফাইট' যদি শুরু হয়, তা হলে তার অন্যতম প্রধান শিকার হবো আমরাই। কে জানে কী হবে? তবে একটা অজানা আশঙ্কায় রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে সারা শরীর।

যাইহোক, যুদ্ধ বিমান আমাদের সাহায্যে অংশগ্রহণ করেছে এটা রোমাঞ্চিত হবার মতোই ঘটনা। তাই সারা ফ্রন্টই আনন্দে মাঝেঝে, মিত্রবাহিনীর যুদ্ধ বিমান দর্শনে। অনেকে হাত নেড়ে নেড়ে স্বাগত জানিয়ে নিজেদের উচ্চল খুশির অনুভূতি প্রকাশ করে। অনেকে গুগে চলে মোট কঢ়া বিমান উড়ে গোলো। আর সেই গণনা থেকে এ পর্যন্ত এককম মোট ১০টা বিমানকে উড়ে যেতে দেখা গোলো। আরো যাচ্ছে। এখন সমগ্র রণক্ষেত্রেই জঙ্গি বিমানগুলো ওড়াউড়ি করবে মাথার পেঁপের দিয়ে। আকাশপথে।

আজ ডিসেম্বরের ৪ তারিখ যুদ্ধ ঘোষিত হয়েছে পাকিস্তান আর ভারতের মধ্যে। পুর্ব-পশ্চিম দুর্ফল্টেই এখন যুদ্ধের ডামাডোল। বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য ভারতকে তাহলে সর্বাঙ্গ যুদ্ধেই নেমে পড়তে হলো। এখন শুধু বাংলাদেশের পূর্ব ফ্রন্টই নয়, তাদের লড়তে হচ্ছে পশ্চিম পাকিস্তানের বিস্তীর্ণ ফ্রন্ট জুড়েও।

যুদ্ধ আসলে কোনো রকম কথার কথা নয়। যুদ্ধ মানেই যুদ্ধ। গরিব দেশগুলোর জন্য সেটা অভিশাপের মতো। একেবারে দেউলিয়া করে ছাড়ে যুদ্ধরত দেশগুলোকে। তবুও গরিব দেশগুলো যুদ্ধের মতো ভয়কর খেলায় যেতে ওঠে। কখনো কারণ ছাড়াই। কখনো তৃষ্ণাতৃষ্ণ কারণে, কখনো এই যুদ্ধে তারা জড়িয়ে পড়ে যুক্তিযুক্ত কোনো কারণেই। আজ 'জয় বাংলা' অর্থাৎ বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য ভারতকেও যুদ্ধ নেমে পড়তে হলো। দুই ফ্রন্টের এই যুদ্ধে কতো যে জানমালের ক্ষতি হবে, তাৰ শেষ নেই। আমাদের এই যুদ্ধের জন্য মিত্র দেশ ভারতকে প্রায় এক কোটি শরণার্থীর বোৰা টানতে হচ্ছে দীর্ঘ ক'মাস ধৰে। পাশাপাশি এর আগে অঘোষিত যুদ্ধে আমাদের সাহায্যে আগুয়ান মিত্রবাহিনীর অজানাসংখ্যক সৈনিক প্রতিদিনই হতাহত হচ্ছে। আজ থেকে ঘোষিত সর্বাঙ্গ যুদ্ধে তাদের সেনাসদস্য ছাড়াও তাদের দেশের কতো নিরীহ মানুষকে যে জীবন বলি দিতে হবে কে জানে? এর সাথে যুক্ত বাংলাদেশের সমস্যাটিও। আর এই রকম একটা জুলন্ত সমস্যা পাক-

ভারত যুক্তের কারণে কি ঢাকা পড়ে যাবে? এই যুক্তে ভারত যদি হেরে যায়? তখন কি হবে? তবে ভারতের যে রকম প্রস্তুতি তাতে তো তার হারবার কথা নয়। তাদের হারবার তো প্রশ্নই আসে না। মন বলে ওঠে বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্যই আজকের এই পাক-ভারত যুক্তের সূচনা। বাংলাদেশ ইস্যুতেই এই যুক্ত। সুতরাং বাংলাদেশ ইস্যুটি যাবে কোথায়? এখন ইচ্ছে করলেও কেউ আর বাংলাদেশের সমস্যাটিকে চাপা দিয়ে রাখতে পারবে না।

আরো দুটো বিমান উড়ে যায় প্রচও গর্জন তুলে বলতে গেলে একেবারে চোখের ওপর দিয়ে। দারুণ সময় এটা! যুর্ভুতগুলো ধরে রাখতে তাই পকেট থেকে নেট বই বের করি। গড়ের শক্ত মাটিতে বসে ডায়েরির পাতায় লিখি।

৪ষ্ঠা ডিসেম্বর, '৭১

“যুক্ত Declare হয়ে গেছে আজ। সকাল থেকে বিভিন্ন ধরনের Fighter Plane ছুটে যাচ্ছে দিনাজপুর, রংপুর আর সৈয়দপুরের দিকে।

আজ Indian-বাও West Pakistan-এর বেশ কঠি জায়গায় Bombing করেছে। কাল অবশ্য Pakistan-ই প্রথম Plane Attack করেছিলো।

পাকিস্তানের অস্তিত্ব এবার বুঝি সত্যিই বিপন্ন হলো। পাক-ভারত যুক্ত লাগলে বাংলাদেশ সমস্যার যে কি হবে, কে জানে?

দুটো Plane এখনই উড়ে গেলো ডানদিক দিকে। কে জানে কোথায় Bombing করবে ওরা। সকালে আরো দশটা গেছে। রেডিও তনতে পাছি না একদম।

World policy যে কোন দিকে যাচ্ছে কে জানে?”

ডায়েরি লেখা সবে শেষ করেছি, অমনি দোড়ে আসতে দেখা যায় পহর আলী আর সফিজউদ্দিনকে। বীতিমতো হাঁপাচ্ছে তারা। দ্রুত তাদের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাই। আমি কিছু বলবার আগেই পিটু একজনকে ধরে ওঠে, কী হয়েছে বল? সফিজউদ্দিন বলে, রাজাকার দুইজন।

— রাজাকার তো কি হয়েছে? জিগ্যেস করি তাদের।

পহর আলী বলে, হামরা ধরেছিনো গে রাজাকার দুইটাক। লুকে আছিল ওমহারালা কুশার বাড়ির রাইফেল নিয়া হেনে।

— এখন কোথায়?

— গুলি করে মারহে ফেলাল ই.পি.আররা। হামরা রাইফেল আলিছি।

— কোথায় মারলো তাদের?

— কুশার বাড়ির কাছোত পুরুরটার ওপর।

— ঠিক আছে যা বলে দুই জুটিকে বিদায় করে দিই। রাইফেল দুটো পড়ে থাকে বাঙারের সামনে। যুক্তের প্রথমদিকে একটা রাইফেল উদ্ধার করার মানে ছিলো বড়ো ধরনের একটা ঘটনা। এখন পড়ে থাকা রাইফেল দুটো দেখে তেমন কোনো অনুভূতি হয় না। তখনে হয়, দুটো অতিরিক্ত ভার এসে চাপলো যুক্তের এই চলার পথে।

রাজাকার দু'জনকে ওরা হাতে পেয়েই মেরে ফেলেছে। সঠিক কাজই করেছে। রাজাকারদের শান্তি একমাত্র মৃত্যু। এদের বাঁচিয়ে রাখা যাবে না কোনোভাবেই। বড়ো অন্যায় আর পাপ করেছে তারা দেশ আর দেশের মানুষের কাছে। যুক্তের এই অঘ্যাতায়

রাজাকারদের ধরা যাচ্ছে না। তবে যুক্তিশেষে অবশ্যই ধরা যাবে। দেশের মানুষই ধরিয়ে দেবে তাদের সবাইকে।

### আপনজনের পিছু ডাক

সারাটা দিন কেটে যায় অলস অবসরে গল্পগুজব করে আর মাসুদের বাঙ্কারে গিয়ে যুদ্ধের খবর শুনে। পঞ্চিম রণাঙ্গনে যুদ্ধ চলছে পুরোদমে। বাংলাদেশের বিভিন্ন ফ্রন্ট দিয়েও ভেতরে চুক্ষে মিত্র ও যুক্তিবাহিনী। ফ্রন্ট পতন ঘটছে যৌথবাহিনীর হাতে একের পর এক পাকবাহিনীর বিভিন্ন এলাকা বা অঞ্চলের ঘাঁটি।

কিন্তু আমরা? আমরা কিন্তু সেই থেকে থমকে আছি এই সেগুন বাগানের অয়বর্তী লাইনে। পঞ্চিম মাইল ক্লিয়ার করার চেষ্টা করে চলেছে মিত্রবাহিনী ট্যাক্সের সহযোগিতায়। আমাদের এই অবস্থান ধরে রাখতে বলা হয়েছে। তৈরি থাকতে বলা হয়েছে যে-কোনো সময়ে মুভমেন্ট অর্ডারের জন্য। সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে পাক বিমান বাহিনীর অতর্কিত হামলা থেকে নিজেদের নিরাপদ রাখার জন্য।

গড়ের ঢালের নিচে সড়কপথে সারাদিন গাড়ির দৌড়াদৌড়ি। আর্মি লরি আর ভ্যানের চলাচল। গুটিকতক সিভিল গাড়ি আর হড় খোলা জিপও দেখা যায়। ক্যাটেন শাহরিয়ারকে ২/৩ বার হড় খোলা গাড়ি ছুটিয়ে ঠাকুরগাঁওয়ের দিকে চুক্ষে দেখা যায়। তিন মাইল পেছনেই সদ্যমুক্ত ঠাকুরগাঁও শহর। আমার পরিচিত এলাকা। উত্তরাঞ্চলের সর্বশেষ মহকুমা শহর এটা। ছোট শহর হলেও বেশ ব্যক্তিকে তক্ষতকে। শহরের পেছনে বাঁক খেলানো চমৎকার একটা নদী। ছোট নদী কিন্তু নামটা সুন্দর— টাঙ্গন। নদীটার লোহার ব্রিজ পেরিয়ে পাকা রাস্তা চলে গেছে রেল ব্রেকস্টের দিকে। রাস্তাটার নাম ঠাকুরগাঁও রোড। টেশনের পাশেই সুগার ফিল। সুগার ফিল অতিক্রম করেই রাস্তাটা আবার চলে গেছে শিবগঞ্জ অভিযুক্তে। শিবগঞ্জে একটা এয়ারপোর্ট আছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপানিদের আক্রমণ অভিযান ঠেকাবার জন্য ট্রাইটিশন্স রাতারাতি তৈরি করেছিলো সেখানকার সুবৃহৎ এয়ারপোর্টটি। এয়ারপোর্টের ধীর ঘেঁষে ছোট গ্রাম কৃষ্ণপুর। শৈশব-কৈশোরে মা-বাবার হাত ধরে কৃষ্ণপুর গ্রামে বছরে অন্তত একবার যাওয়া হতো। এছাড়া আমার বাবার জন্মস্থানও সেটা। কেন জানি না এখন, এই সেগুন বাগানের ভেতরে গড়ের ওপর বসে শৈশব-কৈশোরের কৃষ্ণপুরকে মনে পড়ে খুব। ১৯৩২ সালে রংপুর শহরে বাড়ি করেন আমার সরকারি চাকুরে বাবা। কিন্তু শিবগঞ্জ ও কৃষ্ণপুরের সাথে তাঁর যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয় নি কখনো। এয়ারপোর্ট গ্রাস করে তাঁর ৬০ একর জমি। সে শোক তিনি ভুলতে পারেন নি মৃত্যুর আগ পর্যন্ত। এয়ারপোর্ট বলতেন না তিনি। বলতেন ঘাঁটি। ঘাঁটির জন্য নিয়ে নেয়া জমির ক্ষতিপূরণের টাকাও পান নি তিনি। ছোটবেলায় বহুবার তাঁর কাছ থেকে শুনেছি এই কথা। কেনো যে সে কথা এখন হঠাৎ করে মনে পড়ে যায় জানি না। চোখ ভরে যায় পানিতে। একটা আবেগ-উচ্ছ্঵াস কান্দার ঝুপ নিয়ে গলা ঠেলে বেরিয়ে আসতে চায়।

ঠিক এই সময় পিন্টুর গলা শোনা যায়। একটা গানের কলি ভাজতে ভাজতে পেছন থেকে এগিয়ে আসে সে। নিজেকে সামলে নিই তাড়াতাড়ি। জানি যুদ্ধের ডামাডোলের ভেতরে আবেগ থাকতে নেই, থাকতে নেই পিছুটান, মায়া-মমতা, ভালোবাসা কিংবা ভালোলাগার মতো কিছু। যুদ্ধ যুদ্ধই। যুদ্ধ মানেই কঠোর শৃঙ্খলা আর যান্ত্রিক জীবনযাপন।

বাস্তবিকতাই মুক্তির ধর্ম। যদি তাই হবে, তাহলে মুক্তির সামান্য অবকাশে কৃষ্ণপুরের কথা কেনো মনে পড়ে? কোটিশোচ্চের কথা মনে পড়ে কেনো বারবার? এখান থেকে দু'থেকে তিন মাইল দূরে লক্ষণপুর গ্রাম। জামিল সাহেবের বাড়ি সেখানে। তার স্ত্রী রোকেয়া আমার বড়ো বেন। বড়ো মহতাময়ী সে বোনটি আমার। আমরা তাকে ডাকতাম রোকেয়া বু'বলে। তার ছেলে হলো। কী নাম রাখা যায় তার? বিভৃতিভূমণের 'পথের পাঁচালি' তখন সবে শেষ করেছি। অপু চিরিত গেঁথে গেছে মনের ভেতরে। সেই অপুর নামে নাম দিলাম রোকেয়া বু'র বাচ্চাটি। সেটাই মেনে নিলো সবাই। অপুর বড়ো ভাইটির নাম অতু। সেটাও আমার দেয়া। ফেলি নামের গোলগাল পুতুলের মতো দেখতে আদুরে একটা মেয়ে আছে তার। অপুর বড়ো। সেই আমার রোকেয়া বু'র বাড়ির কতো কাছাকাছি আমরা এখন। যদি কেনোভাবে জানতে পারতো, তাহলে আমাদের রোকেয়া বুকে আটকে রাখা খুবই কষ্টকর হতো। যেভাবেই হোক ছুটে আসতো সে আমাদের সেগুন বাগানের এই অবস্থান পর্যন্ত।

না, আর নয়। মুক্তির অবসরে সেগুন বাগানের এই গভীর আশ্রয়ে নিবিড় নিঃসঙ্গতা আমাকে বাববার নিয়ে যায় অন্তরঙ্গ আজ্ঞানদের কাছে। ত্বরিত সেই পিছুটান মন থেকে ঘেড়ে ফেলে পিছুকে সঙ্গে নিয়ে বের হয়ে আসি বন থেকে। গড় থেকে নেমে আসি নিচে। ক্যাপ্টেন শাহরিয়ার পেছন থেকে এসে গাড়ি থামান। ঝৌঝবর নেল ঘোকাদের। ফ্রন্টের খবর জানতে চাইলে সংক্ষিপ্তভাবে শু জানান, শুধু চলছে প্রতিরি থাকতে বলে জানিয়ে দেন সেই সাথে যে কোনো সময় আমাদের মুভমেন্ট অর্ডার প্রাপ্ত পারে। তারপর ঠাকুরগাঁও যেতে ইচ্ছুক ক'জনকে গাড়িতে তুলে নেন তিনি। প্রশ্ন আর আমার দিকে তাকিয়ে বলেন, যাবেন নাকি আপনারাঃ মাথা নেড়ে বলি, মজুমা না। জুলেপুড়ে ছাই হয়ে যাওয়া শহুর পঞ্চগড় দেখবার পর ঠাকুরগাঁওয়ের বিধুজ প্লাট দেখার সাথ মেলে না মনের গভীর থেকে।

শাহরিয়ার জিপ হাঁকিয়ে চলে যায়েক পর প্রচণ্ড গর্জনে পরপর চারটি প্লেন উড়ে যায় সামনের দিকে। এদের মধ্যে দুটো ফাইটার প্লেন, দুটো বোমারু। ফাইটার প্লেনগুলো চক্র দিয়ে দিয়ে পাহারা দেবে আকাশে। আর বোমারু বিমানগুলো তাদের পেটভর্তি বোমা খালাস করে যাবে টার্গেট লক্ষ্য করে।

দুপুর গড়িয়ে বিকেল আসে। শীতের বিকেল দ্রুত শেষ হয়ে যায়। নামে সক্ষাৎ। কুয়াশার হালকা আবরণে ঢেকে যায় সামনের গ্রামগুলো। হাড় কাঁপানো শীতসহ নামে রাত। আর আমরা সেগুন বাগানের অবস্থানের ভেতর মুভমেন্ট অর্ডারের জন্য অপেক্ষায় থাকি।

## উষ্ণ ভালোবাসার ডালা

মুভমেন্ট অর্ডার আসে পরদিন সকালে। সবাইকে দলবদ্ধভাবে এগিয়ে যেতে বলা হয় পাকা সড়কের ওপর দিয়ে। গড়ের ওপর লম্বা সেগুন বাগানটি ছেড়ে যেতে হচ্ছে আমাদের। দু' রাত একটা দিন কেটেছে আমাদের গড়ের ওপরকার এই বনভূমিতে। প্রাক্তিক সৌন্দর্যে অপরূপ জায়গাটা। কেমন যেনো মায়া জমে গিয়েছিলো এর ওপর। তাই ছেড়ে যেতে খারাপ লাগছে এখন। ছেলেরা শুছিয়ে নিতে থাকে তাদের মালসামানা ইত্যাদি।

আমার কোম্পানি হেড কোয়ার্টারের দায়িত্ব পিছু আর বকরের। বাকারের মালপত্র গোছাতে থাকে বকর। পিছু তদারকি করতে থাকে। পুরো কোম্পানির ছেলেদের বটপট তৈরি করে নিয়ে বের হবার কাজটি পিছু তার নিজস্ব স্টাইলে হাঁকড়াক দিয়ে করতে থাকে। সামনে

কতোদূর সিয়ে কোথায় অবস্থান নিতে হবে তার কিছুই জানি না । এই গোছগাছ করার অবসরে পকেট থেকে আলগোছে নেটবইটা বের করে আনি আর লিখি আজকের কথাগুলো এভাবে :

৫ই ডিসেম্বর, '৭১

“কাল ঠাকুরগাঁও পার হয়ে এসেছি । শুনছি দিনাজপুরেরও পতন হয়েছে । রেডিওর নিউজ, বাংলাদেশের অনেকগুলি শহরের পতন হয়েছে । Indian Air Force West-এর Rawalpindi আর Sargoda সহ অনেকগুলো শহরে Bombing করেছে ।

সোভিয়েত প্রধানমন্ত্রী এই মুক্তের জন্য পাকিস্তানকে দায়ী করেছেন ।

মনে হয় পাকিস্তান বাহিনী ভীষণভাবে মার খাচ্ছে । সবখানেই ওরা পিছু হটছে । অবশ্য পিছু হটবার সময় ওরা বাড়িঘর পুড়িয়ে, বিজ ইত্যাদি সবকিছু ধ্বংস করে দিয়ে চলে যাচ্ছে । Indian Army এতো Heavy Preapartition নিয়ে ভেতরে চুক্তছে যে, এদের আর পিছু হটবার মতো শক্তি পাকিস্তানের নেই ।

এখন World Politics-এর যা ধারা, তাতে করে মনে হয়, এ মুক্ত বোধহয় বেশিদিন Longer করবে না ।

UNO-তে সাধারণ পরিষদের অধিবেশন বসছে স্ট্রজ । দেখা যাক কোন্ দিকের পাছা ভারি হয় ।

চোখের সামনে পাকিস্তান ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে ।

“ঠাকুরগাঁও টাউনটা কী অবস্থায় আছে? দেখার ইচ্ছা ছিলো । আমরা প্রায় ৩ মাইল সামনে পাকা রাস্তার পাশে স্টেন বাগানের জঙ্গলে রাতের মতো আশ্রয় নিয়েছিলাম । এখনই আবার marching order এসেছে । এবার অনেকদূর যেতে হবে । কতোদূর ঠিক জানিন্না । আমের লোকের মধ্যে উৎসাহের শেষ নেই । ওরা প্রাণখোলা অভিনন্দন জানাচ্ছে আমাদের । সত্যিই এতোদিনে ওদের দুঃসময়ের অবসান হলো ।

আমরা যতোই এগিয়ে যাচ্ছি, পেছনে ফেলে আসা আমার কোম্পানির অবস্থা সম্পর্কে ততোই ভাবিয়ে তুলছে । ছেলেদের সবাই এদিকওদিক ছড়িয়ে আছে । একবার যখন সামনে এগিয়ে এসেছি, আবার পেছনে ফিরে যাবার উপায় নেই । এদের এক জায়গায় জড়ো করা আর Arms-Ammunition-এর হিসেব করতে সত্যিই বেগ পেতে হবে ।”

আমার ডায়েরি লেখা শেষ হয় : পিন্টু এসে রিপোর্ট দেয়, এভরিথিং ও.কে । আমরা এখন যেতে পারি । উচু গড় থেকে নেমে এসে ছেলেরা দাঁড়ায় নিজের নিজের দলের সারিতে । সুবেদার খালেকের কোম্পানি তৈরি । তিনি ইশারা দেন মার্চ করবার । পাকা সড়ক ধরে এগুতে থাকি আমরা ।

২/৩ মাইল এগিয়ে আসবার পর উন্নিশ মাইলের কাছে একদল মানুষকে সমবেত থাকতে দেখা যায় । আমাদের দেখে তারা ‘জয় বাংলা’ শ্বেগানে মুখের করে তোলে পুরো পরিপার্শকে । তাদের সবার মুখ হাসিখুশিতে উজ্জ্বল । কয়েকজনের হাতে ধরা চিড়ে-মুড়ির ডালা । মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য খাবার নিয়ে এসেছে তারা । ভালোবাসার ডালা নিয়ে প্রিয়জনদের

বরণ করবার ভঙ্গি তাদের সবার মধ্যে। দুতিনটা বালতিতে করে পানিও বহন করে এনেছে তারা। চোখেয়ে তাদের আপ্যায়নের প্রসন্ন হাসি।

— তামেরা খান। অনেক কষ্ট করিছেন তুমরালা।

যোদ্ধাদের কেউ কেউ পথ চলতে চলতে মুঠা ভরে ঘূড়ি আর চিড়ে তুলে নেয়। দাঁড়িয়ে পানিও খায় কেউ কেউ। উন্নিশ মাইল নামের এই জায়গাতে এসেই গড়টা শেষ হয়ে গেছে। বনভূমিরও শেষ এখানে। ডানে জেলা বোর্ডের একটা কাঁচা রাস্তা চলে গেছে নওপাড়া লক্ষণপূর গ্রামের দিকে। একটা ঝাঁকড়া বটগাছ দাঁড়িয়ে আছে রাস্তার মোড়ে। এ রাস্তা ধরে মাইল দূরেক গেলেই আমার সেই বোন রোকেয়া বুর বাড়ি।

আমি বেঁচে আছি, আর তাদের বাড়ির কাছাকাছি দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছি, কেনো জানি এ সংবাদটা তার কাছে পৌছানোর তাণি অনুভব করি ভেতর থেকে। আর এ ভাবনা থেকেই যুবক মতো একটা ছেলেকে ডাক দিই। তাকে জিগ্যেস করতেই সে চিনতে পারে আমার বোন-ভগ্নিপতিকে। তাকে বলি, সে যেনো জানিয়ে দেয় আমার কথা। বেঁচে আছি আমি। যুদ্ধ করছি। যুবকটি সামন্দে সায় দেয় আমার অনুরোধে।

এরপর আবার এগিয়ে চলা। মাইলখানেক এগিয়ে আটাশ মাইলে আসতেই কানের পর্দায় ধাক্কা লাগে। সামনের দিক থেকে ভেসে আসে প্রচও গোলাগুলির শব্দ। কথাভাবের নির্দেশ আসে, বাঁ দিকের রাস্তা ধরে গ্রামের ভেতরে ঢুকে যাওয়ার প্রস্তুত সেখান থেকে সামনে এগিয়ে গিয়ে নদীটার পাশ দিয়ে সোজাসুজি পঁচিশ মাইলের শব্দস্তু প্রতিরক্ষা লাইনের দিকে যুদ্ধ করে অবস্থান নেওয়ার। সে অনুসারে ঘটাখানেকের ভেতরে পুরো ফ্রন্ট অবস্থান নিয়ে নেয়। এবার আমাদের ভাগে পড়ে ডান দিকের অংশ। নদীর পাড়ে যেমনে একটা ডাঙা জমিতে অবস্থান নিয়ে পড়ে থাকি আমরা জমির উচ্চতাতে আলোর প্লাটারল নিয়ে। এখন ট্রেশ খোড়ার সহয় নেই। শক্ত একেবারে সামনে, আধ মাইল এক মাইলের মধ্যে। সুতরাং খোলা আকাশের নিচে শক্তির দিকে হাতিয়ার তাক করে পড়ে থাক্কি আমরা একইভাবে দিনমান। সামনে তখনো চলছে যুদ্ধের ভয়াবহ তাপ্তি। যুদ্ধস্তোত্র একেবারে কাছাকাছি আর সেই তাপ্তের প্রায় যুক্তেযুক্তি অবস্থানে আমরা অপেক্ষা করতে থাকি শক্তির গতিবিধির। শক্তি এদিকে মুভ করলেই সক্রিয় হয়ে উঠবো আমরা। বেধে যাবে ভয়কর যুদ্ধ। নার্টের ওপর প্রচও চাপ। নিচে শক্তি মাটি। এই রকম পরিবেশ-পরিস্থিতিতেই সদা সর্তক পজিশনে থাকি দিনাবসান পর্যন্ত।

### বিমান হামলা

সুবেদার খালেক সকালে এসে পিটুকে ডেকে নিয়ে গেছেন। নদী পার হয়ে তিনি ওপারে যাবেন। মিরবাহিনীর অবস্থান থেকে শক্তির প্রতিরক্ষা লাইনের অবস্থা দেখবেন তিনি, সেই সাথে জেনে আসবেন চলমান যুদ্ধের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে। ক্যাপ্টেনের সাথেও যোগাযোগ করবেন আমাদের পরবর্তী পরিকল্পনা সম্পর্কে অবহিত হওয়ার জন্য। পিটুর যাওয়ার ব্যাপারে ততোটা ইচ্ছে ছিলো না। কিন্তু স্বয়ং সুবেদার খালেক নিতে এসেছেন তাকে। তাই না করতে পারি না। যেতে বলি তার সাথে। কিছুটা এগিয়ে নদী পার হয়ে ওপারের বোপজঙ্গলের আড়ালে হারিয়ে যায় দুঁজন।

রাতে মোটেই ঘূর্মুবার ফুরসত মেলে নি। সারা ফ্রন্টকে এলাট রেখে জেগে থাকতে হয়েছে একনাগাড়ে। সামনে শক্তি রেখে ফ্রন্ট লাইন কখনোই নিরাপদে থাকতে পারে না।

সারারাতই তাই কেটেছে গভীর উদ্বেগ আর উত্তেজনার ভেতরে। এলাকার মাটি শুবই শক্ত। এ মাটিতে কোপ বসে না কোদালের সহজে। তবুও কষ্টসৃষ্টি ছেলেরা নিজেদের লুকিয়ে রাখবার চেষ্টা নিয়েছে। বকরের ট্রেক্সের অবস্থাও সে রকমেরই। হাঁটু সমান গর্তের ট্রেক্স। এতেই গানগানি করে কাটাতে হয়েছে রাত। ঝাঁকের পর ঝাঁক মশা আর এক ধরনের পোকা সারারাত জুলিয়েছে ত্যানকভাবে। আমাদের এই অগ্রাভিয়ানে যতো জায়গায় অবস্থান নিয়েছি, তার ভেতরে সব থেকে প্রতিকূল মনে হয় এই জায়গাটি। বাবু, মুন্না আর মতিয়ার ট্রেক্স করেছে আমাদের বাঁদিকে। দলের অন্য সদস্যরা পাশাপাশি ট্রেক্স করে চলে গেছে বাঁদিকার রাস্তা পর্যন্ত। খালেকের কোম্পানির অবস্থান শুরু হয়েছে ওখান থেকেই। মর্টার বাহিনী, মুজিব ব্যাটারি সবসময়ই ফ্রন্টের পেছনে পেছনে এসে সুবিধেমতো জায়গায় মর্টার বসিয়ে শক্র ওপর হামলা চালিয়ে এসেছে এতোদিন। এখানেও মর্টার ব্যাটারি পেছনের দিকে একটা বড়ো ঝিলের ওপারে অবস্থান নিয়েছে।

রাতের বেলা তেমন একটা যুদ্ধকূচ হয় নি। কিন্তু সকাল হতেই বিচ্ছিন্নভাবে থেমে থেমে শুরু হয়ে যায় গোলাগুলি। ট্যাঙ্কগুলো ঘর্ষণ আওয়াজ তুলে এগুবার চেষ্টা করছে। বেকায়দা মতো পঁচিশ মাইলের লোহার বিজ্টা ভেঙে দিয়ে পাকবাহিনী আটকে দিয়েছে যৌথবাহিনীকে। প্রাণপন চেষ্টা চলছে বিজের ওপরকার পাকবাহিনীর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ভাঙবার।

সকাল দশটা সাড়ে দশটার মতো সময় তখন। ঝকঝকে শোর। পরিষ্কার আকাশ। ফ্রন্টের সবার মধ্যে একটা ঢিলেচালা আলসে ভাব। ঠিক এই মুহূর্ম অবস্থায়, বলা নেই, কওয়া নেই, কোনো পূর্ব সঙ্কেত নেই, আমাদের মাথা সোজা অবস্থাটি হঠাত করে দুটো বিমানের আবির্ভাব ঘটে এবং কোনো কিছু বুঝে উঠবার আগেই হামলা করে বসে পুরো ফ্রন্টকে। সম্পূর্ণ আকশ্মিক আর অপ্রত্যাশিত বিমান হামলার ঘটনা। অন্ত পর্যন্ত আকশ্মিকতার মুখে ফ্রন্টজুড়ে হলসূল পড়ে যায়। শুরু হয়ে যায় হঞ্জাড়, হঁকডাক, চুক্কার ও চাঁচামুচি। সমস্ত ফ্রন্ট লাইনে দেখা দেয় চৱম বিশ্বজ্বল। ট্রেক্সবাসীদের ফ্রেন্টে তখন তাদের স্ব-স্ব অবস্থানে ছিলো না। হয় তারা ট্রেক্সের বাইরে বসে জমিয়ে গুরুত্বকরছিলো, কিংবা গিয়েছিলো অন্য ট্রেক্সের বস্তুদের সাথে আড়া দিতে, নয়তো ফ্রন্ট লাইনের এদিকসৌনিক ব্যন্তি ছিলো অলস পদচারণায়। সবাই নিশ্চিন্ত, নির্ভর। সামনে থেকে পাকবাহিনীর হুমকি তেমন নেই। রাতে সেটা হবার আশঙ্কা ছিলো। দিনের আলো ফুটবার সঙ্গে সঙ্গে শঙ্কা কেটে গেছে— এমনই ভাবনা ছিলো সবার মনে। তাই বলতে গেলে অনেকটা হৃতির আমেজ ও আবহ বিরাজ করছিলো ফ্রন্টজুড়ে। এছাড়া মিত্রবাহিনী দারুণভাবে মার দিয়ে চলেছে পঁচিশমাইল-এ আটকে রাখা পাকসেনাদের। তাই তাদের দিক থেকে বিপদ আসবার কোনো সম্ভাবনাই নেই এরকম মনোভাব থাকাটা অস্বাভাবিক কিছু ছিলো না। কিন্তু যুদ্ধের মাঠে বিপদ যে-কোনো মুহূর্তে যে-কোনো দিক দিয়ে হাজির যে হতে পারে, এই বিমান হামলা আবার সেটা প্রমাণ করলো।

পাকবাহিনীর দুটো বিমান উত্তরের আকাশ থেকে উড়ে এসে ছোঁ মারে মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনীর যৌথ ফ্রন্টের ওপর। বিমান দুটো প্রথমে আঘাত হালে সম্মুখবর্তী মিত্রবাহিনীর অবস্থানের ওপর। ঘুরে ঘুরে উড়ে আসে। তারপর নাক নিচু করে ডাইভ দিয়ে যায় চিলের ছোঁ মারার মতো করে। ডাইভ দেবার সময় ঠাঁ-ঠাঁ শব্দ তুলে বিমান থেকে গুলিবর্ষণ করতে থাকে টার্গেট লক্ষ্য করে করে। আবার উড়ে নিচু থেকে উঠে যায় আকাশে। চক্কর দিয়ে ঘুরেফিরে আসে আবার বিমান দুটো একই কায়দায়। আকাশজুড়ে প্রচণ্ড গর্জনের

ডামাডোল। ডাইভ দেয়ার সময় গর্জন আরো বেড়ে যায়।

প্রাথমিক হতচকিত ভাবখানা কেটে যেতেই নিজেদের অবস্থান ছেড়ে দৌড়ে যাই যেতবাড়ির পাশ যেমে দাঁড়ানো আম গাছগুলোর আড়ালে। শক্ত মাটিতে ট্রেক্সের মতো করে ট্রেক্স খোড়াই যায় নি, সামান্য গর্ত করা হয়েছে মাত্র। সেখানে থাকলে আকাশচারী পাইলট সহজেই চিহ্নিত করে ফেলবে আমাদের। তাই খোলা মাঠের ট্রেক্সের আশ্রয় নেয়া সবাইকে চিন্তকার করে ডেকে ডেকে গাছগুচ্ছালির তলায় আড়াল বা আশ্রয় নিয়ে শয়ে থাকতে বলি। আমার ডাকে পাগলের মতো দৌড়ে অবস্থান ছেড়ে ছুটে আসে সবাই।

গাছের নিচে দাঁড়িয়ে আছি। মূল্লা বলে, মামা হেলমেট।

আরে তাইভো! দৌড়ে ছুটে আসবার সময় আমরাই শুধু এসেছি। আমাদের হেলমেট আর হাতিয়ার-গোলাবারুন্দের বাক্স, জামা-কাপড়সহ অন্য আর সব মালপত্র আনতে ভুলেই গেছি। সেগুলো ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে ট্রেক্সের সামনে-পেছনে। চকচকে হেলমেটগুলোকে অবশ্য এই এখন বিপজ্জনক বলেই মনে হয়। কেননা আকাশ থেকে ওগুলো সহজেই বৈমানিকদের চোখে পড়তে পারে। ফলে তারা চিহ্নিত করে ফেলবে আমাদের এই ফ্রন্ট লাইনের অবস্থান। আর তার পরিণতি কী হতে পারে, সেটা সহজেই অনুমেয় অর্থাৎ আমরা সহজেই টার্ণেট হয়ে যাবো শক্রপক্ষের বিমান আক্রমণের। তাই কোনো রকম চিন্তা না করেই দৌড় দিই হেলমেটগুলো আনবার জন্য। আমার সাথে মতিয়ার ও সন্ধুরে অন্য ক'জনও দৌড় দেয়। বকর প্রথমে আমাকে বাধা দিলেও সেও ছুটে যায় আমার সাথে সাথে।

আর তখনি মাথার ওপর দিয়ে প্রচও গর্জন তুলে ডাইভ দিয়ে নেমে আসে একটা বিমান। এই আকস্মিক বিপদে হতভবের মতো ট্রেক্সের পিস্টন দাঁড়িয়ে থাকি। না বসতে পারি, না পারি শয়ে থাকতে। চকচকে ঝপোলি শরীরের বিমানটিকে একেবারে সামনে নেমে আসতে দেখি। ঠাঁ-ঠাঁ শব্দে গুলির রাশি বিমানটি থেকে চোরায়ে এসে মাত্র ২৫/৩০ গজ সন্ধুরবর্তী মাঠের মাটিতে মালা গাঁথবার মতো লঘা লালিম্বিটনে পরপর দ্রুত বিন্দ হতে থাকে। গুলির সেই লাইন নদীর বালুর চড়া অতিক্রম করে প্রস্তুতির ওপর দিয়ে চলে যায়। প্রচও গর্জন তুলে বিমান থেকে নিষিঙ্গ গোলাগুলি দুঁকানে একেবারে তালা লাগিয়ে দেয়। হঁশ-জ্ঞান লোপ পাবার দশা হয়। সম্পূর্ণ সম্মোহিতের মতো চোখের সামনে নেমে আসা বিমানটির এই কান্দকারখানা দেখে চলি। অন্যসব সহযোগীর অবস্থাও আমারই মতো। কেউ কেউ অবশ্য শয়ে-বসেও পড়েছে।

পাশের ট্রেক্সে তার ঢাঙা শরীর নিয়ে মূল্লাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে হঠাৎ করেই সঙ্গে ফেরে আমার। ঠিক এই সময় আরেকটা বিমানকে ছুটে আসতে দেখি। একইভাবে ডাইভ দিয়ে সেটাও গুলিবর্ষণ শুরু করে। চিন্তকার করে মূল্লাকে শয়ে পড়তে বলি। মূল্লা দেরি করে না। ঝাপিয়ে পড়ে সামনে। আমিও লাফ দেই ট্রেক্সের গর্তে। শক্ত পাথরের মতো মাটিতে ঝাপিয়ে পড়ার ফলে প্রচও আঘাত লাগে বুকের পাঁজরে। মনে হয় পাঁজরের হাড়গোড় সব বৃক্ষ খন্ডিয়ে গেলো। সে অবস্থাতেই বকরের গলা ধরে তাকে টেনে উইয়ে দিই। দাঁতে দাঁত চেপে ধরে, দুঁহাতের তালু কানে ঠিসে ধরে নিয়তির ওপর সঁপে দিই নিজেকে। মনে হয়, আগের বিমানটা যেভাবে মাটির বুকের ওপর বুলেটের মালা গৈথে গৈথে চলে গিয়েছিলো, এটাও ঠিক তেমনটাই করবে। তবে এবার সেই গুলি বিন্দ হবে, নিচিতই, আমাদের পিঠগুলোর ওপরে। কিন্তু না, কেবল প্রচও গর্জন তুলে মাটি ঘেঁষে অদূর দিয়ে উড়ে যায় সেটা। আমাদের তখন চরম দিশেহারা অবস্থা।

মানসিকভাবে ভয় পাওয়া ছাড়া আমাদের তেমন কিছু হলো না। বিমান দুটো আবারো চক্র দিয়ে আসবার আগেই এখান থেকে সরে পড়তে হবে, এই ভাবনা থেকে এবার উঠে দাঁড়াই। হেলমেট, হাতিয়ার আর জামাকাপড় ইত্যাদি অসম্ভব দ্রুততার সাথে তুলে নিয়ে মুদ্রার হাত ধরে ছুটে চলি সেই আম গাছগুলোর অশ্রয়ে। বুকের ভেতর তখন বাজে ঢাকের বাণি। নিষ্পাস-প্রস্তাব বন্ধ হবার উপক্রম। এ অবস্থায় আমগাছগুলোর শুঁড়ির আড়ালে নিজেদের লুকিয়ে রাখবার চেষ্টা করি। কিন্তু বিমান দুটো কেনো যেনো আর আসে না আমাদের অবস্থানের দিকে। কেবল অদূরবর্তী অন্যান্য টর্চেটের ওপর চক্র দিয়ে দিয়ে হামলা চালাতে দেখা যায় তাদের। এভাবে একনাগাড়ে প্রায় আধবট্টা পর্যন্ত আক্রমণ চালিয়ে এক সময় আকাশপথে হারিয়ে যায় বিমান দুটো। আর তাই দেখে হাঁফ ছেড়ে বাঁচি আমরা।

আবার নিজের অবস্থানে ফিরে আসে সবাই। বিমান হামলার প্রচণ্ড ভীতির ঘোর তখন কাটে নি। সামনে দৃষ্টি মেলতেই শুই সময় সুবেদার খালেক আর পিটুকে বিস্ফুল চেহারা নিয়ে আমাদের দিকে আসতে দেখা যায়। নদীর পানি আর কানা-বালিতে একেবারে মাঝামাঝি অবস্থা তাদের।

— ইয়ানো মইরতে মইরতে বাঁচি আইলাম দানু। খালেক সাহেব হাঁপাতে হাঁপাতে বলেন। তারাও পড়েছিলেন বিমান হামলার মুখে। জঙ্গের ভেতর দিয়ে দৌড়ে এসে নদীর খাড়া পাড় দিয়ে নামবার সময় তাদের শরীরের বিভিন্ন জায়গাগুলো চামড়া ছড়েছড়ে গেছে। লুঙ্গ শার্টও ছিড়ে গেছে দু'তিন জায়গায়।

বিমান হামলার শুরু সামলাতে বেশ খানিকটা সময় লাগে। আর সেটা সামলে নিতেই ফ্রন্টের অবস্থা আবার স্বাভাবিক হয়ে আসে। সৈকান্ত্য, চোখের সামনে এভাবে ডাইভ দিয়ে নেমে আসা বিমান হামলার মুখেও আমরা পেঁচে থাকলাম! ব্যাপারটা ভাবতেই গা-টা কেমন শিরশিরি করে ওঠে। অলৌকিকভাবে পেঁচায়াওয়া কি একেই বলে! সম্ভবত তাই। তা নইলে আমরা পেঁচে থাকলাম কীভাবে? কিন্তু একটু পরে সেই ভয়ঙ্কর খবরটা আসে। বিমান হামলা মিত্রবাহিনীর একটা ট্যাঙ্ক দুর্ঘটনার দিয়ে গেছে। হতাহতও হয়েছে তাদের অনেকেই। আমাদের মুক্তিবাহিনীও দু'তিনজন হতাহত হয়েছে। এর মধ্যে একজন জিপ গাড়ির চালক। তার অবস্থা শুরুতর। জানালার ক্ষয়ক্ষতি যা হবার সেটা হয়েছে মিত্রবাহিনীর। অর্থাৎ বিমান হামলার বড়ো বাপটাটা এবার তাদের ওপর দিয়েই গেছে। আমাদের ফ্রন্ট রয়ে গেছে একেবারেই অক্ষত। কী বলবো একে? অলৌকিক ব্যাপার বটে।

### শীকৃতি পেলো বাংলাদেশ

পেছন থেকে এগিয়ে আসে একজন অনেকটা ওটিসুটি মেরেই। তাকিয়ে দেখি, এ যে আমাদের দুলু! দুলুকে দেখে হৈচৈ করে ওঠে পিটু। ছেলেরাও আনন্দিত হয় তাকে পেয়ে। সেই নালাগঞ্জের দুলু। আমাদের খুঁজতে খুঁজতে দীর্ঘপথ পেরিয়ে সে এসেছে এ পর্যন্ত। তাকে এখানে এভাবে পেয়ে খুব ভালো লাগে।

পঞ্চগড়ে তাদের নিজেদের সেই বাড়িতে ফিরে এসেছে দুলু। একেবারে ধংসাত্মক অবস্থা বাড়িঘরের। তার পরিবারের সদস্যরা এখনো ওপারে, গোলজারাদার বাড়িতে। যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাদের হয়তো আনা যাবে না তাদের আজন্মের ঠাই পঞ্চগড়ের এই বাড়িঘরে। দুলুকে পেয়ে পুরনো হাইড আউটের দিনগুলোর কিনারে ফিরে যাই আবার। একটা প্রগাঢ়

বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিলো আমাদের এই সাহসী সহযোগীর সাথে। তার সঙ্গে অনেকগুলো দিন-মাস কেটেছে হাইড আউটের জীবনে। বলতে গেলে তখনকার প্রায় প্রত্যেকটা অপারেশনেই শরিক ছিলো সে। ছিলো আমাদের শুধু-দুঃখের সমভাগীদার।

— কিছু ভালো লাগে না মাহবুব ভাই। তাই খুজতে খুজতে চলে এসেছি আপনাদের কাছে। দুলুর নিজের শহর পঞ্চগড় মুক্ত হয়েছে। ফিরে পেয়েছে তার নিজ বাড়িয়র, আঘায়স্বজন আর বন্ধুবাঙ্কি সবকিছু। কিন্তু চলমান যে যুদ্ধ-প্রতিমার সঙ্গে একসময় দিনরাত সে জড়িত ছিলো, তার সঙ্গে সে আর এখন জড়িত নয়। এজনই দুলুর ভালো লাগে না কিছু। আর এই ভালো না লাগার বেধ থেকেই ছুটে এসেছে সে আমাদের কাছে, এই ফ্রন্টে।

দুপুরের দিকে বিদায় নেয় দুলু। তাকে ফ্রন্টে ধরে রাখার সাহস হয় না। কখন কোন বিপদ ঘনিয়ে আসে, কে জানে। এজন্য তাকে ছেড়ে দিতে হয়। বিষণ্ণ আর দুঃখী মন নিয়ে ফিরে যায় সে। তার যাবার পরপরই আসে শুয়াবাড়ির জোনাব আলী। সেও খুজতে খুজতে এসেছে ভেরগড় থেকে একটো পথ পেরিয়ে। কতো বিশ্বস্ত আর প্রয়োজনীয় মানুষ ছিলো এই জোনাব আলী আমাদের গেরিলা যুদ্ধের সেই দিনগুলোতে! সেই একই চেহারা। সেই একই দুবলা-পাতলা শরীর, মুখে সেই আগেকার হাল্কা কালো দাঢ়ির গোছা। সেই ভেঙে-পড়া চেহারাটা এখন আর তার নেই। মুক্তির আনন্দে ঝলমলে দেখায় তার সারাটা মুখ।

মোমের দুটো গাড়ি ভর্তি ধানের বস্তা। গাড়ি দুটোই খুবড়ে পড়ে আছে ফ্রন্টের লাগোয়া পেছন দিককার রাস্তায়। হয়তো পার করাইলে বস্তা ধান কোথাও কোনো গ্রামের জোতদার-টোতদার। ফ্রন্টকে এগিয়ে আসছে দেখে সভবত গাড়িতে ধানের বস্তাটারা রেখে গা ঢাকা দিয়েছে। ধান গাড়ি মহিম ক্ষেত্রে আটক করতে হয় নি। আপনাআপনি আমাদের দখলে এসে গেছে। এসব ধান ক্ষেত্রের মোমের গাড়ি দুটো ফ্রন্টের কোনো কাজেই আসবে না। এগুলো হয়তো এভাবেই ছেলে যেতে হতো বেওয়ারিশ মালের মতো। জোনাব আলীকে পেয়ে তাই ভালোই হয় নিজে দিই তাকে ধানভর্তি গাড়ি দুটো।

— কী করয় এগুলান নিয়ে প্রথমে ব্যাপারটা বুঝতে পারে না সে। তাই বলি, নিয়ে যাবে তুমি। বিক্রি করবে খাবে যা খুশি তাই করবে।

জোনাব আলী খুশিই হয় ব্যাপারটাতে। চোখেমুখে ফুটে ওঠে তার কৃতজ্ঞতার হাসি। মানুষের এই হঠাতে করে খুশি হওয়ার ব্যাপারটা অন্যরকম। ভালো লাগে দেখতে। তাকে একটা পরিচিতিপত্র লিখে দিই। লিখে দিই এ কারণে যে পাকা সড়ক ধরে চলাচল নিয়ন্ত্রিত। কেউ চ্যালেঞ্জ করলে তাকে, পরিচিতিপত্রটা তার কাজে লাগতে পারে। জোনাব আলী দেরি না করে দখল নেয় বোঝাই মোমের গাড়ি দুটোর। একা সে গাড়ি দুটো নিতে পারবে না জেনে মতিয়ার তাকে স্থানীয় দু'জন যোগাড় করে দিয়ে সাহায্য করে।

বেলা দুটোর দিকে হঠাতে করেই ফ্রন্ট জুড়ে হৈচৈ আর আনন্দধনি তরু হয়ে যায়। ব্যাপার কি? জবাব মিলতে দেরি হয় না। এই হৈচৈ আর উজ্জ্বল আনন্দ প্রকাশের উৎস বাংলাদেশকে ভারতের আজকেই স্বীকৃতি দেয়ার ঘটনা। বেলা একটায় ভারতীয় পার্লামেন্টে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী এই স্বীকৃতির ঘোষণা দিয়েছেন। রেডিওতে প্রচারিত হয়েছে এই সংবাদ। বাংলাদেশের স্বীকৃতি প্রাপ্তির দীর্ঘদিনের স্বপ্ন আজ সত্যি সত্যি বাস্তবে ঝুপ পেলো। ১৯৭১-এর শেষের আজ। আজকের এই দিন অবশ্যই ঐতিহাসিক এবং চিরস্মরণীয়। কতো অধীর প্রহর অপেক্ষা করে থাকতে হয়েছে আজকের এই দিনটির জন্য। তাই

বেড়িওতে প্রচারিত এই খবর বারবার শুনতে ইচ্ছে করে। কতো কষ্ট, কতো নির্যাতন, কতো রক্ত, কতো মৃত্যু আর যুদ্ধের এই তাওর, তার বীভৎসতা, নিষ্ঠুরতা সবকিছুই একটা দেশের স্বাধীনতার জন্য। একটা স্বাধীন জাতির জন্য। 'জয় বাংলা'র জন্য। আর সেই প্রেক্ষাপটে ভারতের বহু প্রতীক্ষিত এই স্বীকৃতির মাধ্যমে পৃথিবীর বুকে সৃষ্টি হলো একটা নতুন দেশের। বাংলাদেশ যার নাম। তাই সমস্ত ফ্রন্ট আনন্দ-উচ্চাসে উহুলে। ঝোগান ওঠে, জয় বাংলা। জয় বঙ্গবন্ধু। জয় ইন্দিরা গান্ধী...। ঝোগানে ঝোগানে মুখরিত হয়ে ওঠে ফ্রন্টের আকাশ-বাতাস। আর এ আনন্দ-উচ্চাসের জোয়ার প্রশংসিত হতে সময় লাগে।

### পঁচিশমাইলের পতন

বিকেল তিনটাৰ পৰ নিৰ্দেশ আসে পাকা সড়কে সমৰেত হওয়াৰ। পঁচিশমাইলের পতন হয়েছে। এবাৰ এগিয়ে যেতে হবে সামনে। সামনে এগলৈই এবাৰ পথে পড়বে বীৱগঞ্জ থানা। তাড়াছড়ো কৰে ফ্রন্ট গুটিয়ে নেয়াৰ কাজ চলতে থাকে।

এ জ্যোগাটাৰ নাম প্রাণনগৰ। পাকা একটা রাত আৰ প্ৰায় দুটো দিন কেটেছে এখানে। এখানে অবস্থান কৰাৰ সময় স্বাধীন বাংলাদেশেৰ প্ৰথম স্বীকৃতি মিললো। সেই শ্রবণীয় ঘটনাৰ স্বত্ত্বিভজিত প্ৰাণনগৰ। ছেড়ে যেতে হচ্ছে এখন আমাদেৱ। ছেলেৱা তাদেৱ জিনিসপত্ৰ গোছাতে থাকে। ছেট নদীটাৰ কাকচকু টলটোজু পানিৰ ধাৰ দেৰা শুকনো বালুৰ চড়াৰ ওপৰ বসে পড়ি আমি দ্রুত। নোট বই বেৱ তাত্ত্বিকি—

ডই ডিসেম্বৰ, '৭১

"আজ সকাল সাড়ে দশটাৰ দ্বিতীক *Plane Attack* কৰেছিলো। বাংলাদেশেৰ ভেতৱে এই প্ৰথম *Plane Attack* হলো আমাদেৱ ওপৰ। অবশ্য আমৰা এমনটাৰ বেশ ক'দিন ধৰেই আস্তাৰ কৰছিলাম। বিশেষ কিছু ক্ষতি কৰতে পাৱে নি আমাদেৱ।

পঁচিশমাইল বৱাবৰ প্ৰাণনগৰ হামে আমৰা *Shelter* নিয়েছি। ভীষণ শক্ত মাটি এখনকাৰ, বাংলাদেশ স্বীকৃতি পেলো অবশ্যে। আজ ১টাৰ সময় *INDIA* স্বীকৃতি দিয়েছে বাংলাদেশকে। *INDIA* তাৰ কথা রেখেছে। বাংলাদেশ আজ থেকে বিশ্বেৰ দৱাবাৰে স্বাধীন রাষ্ট্ৰৰ মৰ্যাদা পেতে থাকবে।

জাতিসংঘে নিৱাপত্তা পৰিবদেৱ বৈঠকে যুক্তবিৱতি প্ৰশংসন রাশিয়া ভেটো দিয়েছে।"

পাকা সড়ক ধৰে আমাদেৱ আবাৰ চলা শুৰু হয়। ডানে একটা সাঁওতাল বস্তি। তাদেৱ মাটিৰ ঘৰবাড়িগুলো রয়েছে কিন্তু মানুষজন নেই। ফ্রন্টেৰ অস্থায়ী হেড কোয়ার্টাৰ এখন এই সাঁওতাল বস্তি। বস্তিটা ছাড়িয়ে আৱো কিন্তুৰ এগিয়ে গিয়ে সড়কটা মোড় দেয় ডানে। একটা বড়ো তেঁতুল গাছ ডানপাশে। তাৰ নিচে পড়ে আছে একটা বিধৃষ্ট ট্যাঙ্ক। বিমান আক্ৰমণেৰ শিকার ট্যাঙ্কটা। ব্যতিব্যষ্ট দেখা যায় ট্যাঙ্কেৰ কুসহ অন্যদেৱ। আমাদেৱ আগে আগে অনেকদূৰ পৰ্যন্ত এগিয়ে এসেছিলো ট্যাঙ্কটা। এখন কেমন দলছুট অবস্থা তাৰ। একা নিঃসঙ্গ পড়ে আছে অসহায় রোগীৰ মতো। তাৰ গোত্রভুক্ত অন্যৱা এগিয়ে গেছে সামনে। কনভেয়াৰ বেল্ট ছিঁড়েচিড়ে কেমন জৰুৰতু অবস্থা তাৰ। কাত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে কালো মতোন যন্ত্ৰদানবটি। ওকে ছাড়িয়ে পাকা সড়কেৰ বাঁদিকে মোড় নিয়ে এগলৈই পঁচিশমাইলেৰ লোহার ব্ৰিজ সামনে

পড়ে। পাকবাহিনী ভেঙে গুড়িয়ে দিয়ে গেছে ত্রিজটা। এখান থেকে প্রতিরোধ সৃষ্টি করে দুদিন আটকে রেখেছিলো তারা আমাদের। ত্রিজের নিচে বাঁদিক দিয়ে ডাইভারশন। ছোটো নদীটাতে তেমন পানি নেই। ডাইভারশন ধরে হেঁটে আবার আমরা এসে উঠি পাকা সড়কে।

বেশ ক'টা লাল রঞ্জে ট্রলারকে রাস্তার পাশে আমাদের জন্য অপেক্ষমাণ দেখতে পাই। উঠে বসি তাতে। ২/৩টা ট্রাইট'র দ্রুত টেনে নিয়ে যায় তার পেছনে বাঁধা ট্রলারগুলোকে। আমরা তাতে বসে থাকি সামনের ফ্রন্টে পৌছানোর অপেক্ষা নিয়ে।

## মুক্ত বীরগঞ্জ

বীরগঞ্জ মুক্ত হলো অবশেষে ডিসেম্বরের ৬ তারিখে।

পাকা সড়কটা বাঁক নিয়ে ডানে চলে গেছে দিনাজপুর অভিমুখে। এই বাঁকের দু'পাশে দোকানপাট, বাড়িয়র, থানা ভবন আর সি.ও অফিস। বীরগঞ্জ দখলের জন্য কোনোরকম যুদ্ধ করতে হয় নি। পাকবাহিনী পঁচিশমাইলে মার থেকে বীরগঞ্জে আর দাঁড়াতে পারে নি। তারা একেবারে পিছিয়ে গিয়ে ভাতগা ত্রিজের ওপারে পজিশন নিয়েছে। নদীর ওপরকার বিরাট ত্রিজটা ভেঙে দিয়ে তারা আটকে দিয়েছে যৌথবাহিনীর অঞ্চলিয়ান।

বীরগঞ্জ থানা হেড কোয়ার্টার। ঠিক শহর বলা যাবে না একে। একটা বড়ো ধরনের বন্দরকে ঘিরে গড়ে ওঠা জনপদ। এখানে যুদ্ধ না হলেও কেমন ক্ষিপ্ত মনে হয় সবকিছু। যে ক'টা দোকানপাট দেখা যায়, সবই ভাঙচোরা। পঁচিশমাইলে মুক্ত চলাকার সময় বেপরোয়া লুটপাট যে এখানেও চলেছে, সেটা তার চেহারা দেখেই বোধ যায়। বেশিকিছু দোকানপাট আর বাড়িয়র আঙ্কন দিয়ে জ্বলিয়েও দেয়া হয়েছে। রাস্তার প্রান্তীর সাব-রেজিস্ট্রি অফিস ভবন হ্যাঁ করে খোলা। তার কাগজ, রেকর্ডপত্র ও বালমুক্তি বাইরের চতুরের চারদিকে এলোমেলোভাবে ছড়ানো। এপারের চেরিটেবল ডিসপেন্সারিয়ের অবস্থাও তেমনি। কেবল কিছু শূন্য শিশি-বোতল নিয়ে উন্মুক্ত পরিত্যক্ত ঘরটার ভেতরে একটা টেবিল দাঁড়িয়ে। থানাদারেরাও কেউ নেই। সবাই পালিয়েছে। একদল মুক্তিযোদ্ধা একেই থানা কমপ্লেক্সের চতুরে ক্যাম্প গেড়ে বসেছে।

মানুষজন নেই বললেই চলে সদ্যমুক্ত এই বীরগঞ্জে। গুটিকতক মানুষ যাও দেখা যায়, তাদের দেখে শ্পষ্টতই মনে হয়, তারা যেনো এতোদিন বসবাস করেছে একটা মৃত্যুপূর্বীতে। সার্বক্ষণিক মৃত্যুভীতি আর জুলজুলে বিভিন্নিকার ভেতরে। আজ কেটে গেছে সেসব। তাই তাদের চোখে-মুখে উপচেপড়া আনন্দ-উদ্বাস। নতুনভাবে বাঁচবার আকুলতা তাদের চোখে-মুখে। সারা বীরগঞ্জে অনেকগুলো ধানকল। সবগুলোই পরিত্যক্ত এখন। ধান শকনোর চাতালগুলোও শূন্য। ঝীঝী করে।

শুরু এখন দুদিকে। খানসামায় এবং ভাতগা ত্রিজের ওপারে। খানসামা যেতে হলেও নদীর বাধা। ভাতগা ত্রিজ ভেঙে দেয়ার ফলে সেখানেও নদীর বাধা। বেশ প্রশংস্ত সে নদী। মুক্তি ও মিত্রবাহিনীর দ্রুত অগ্রগতিকে পুরোপুরি রোধ করে দেয় নদীর এই প্রাকৃতিক বাধা। দুদিক দিয়ে এগিয়ে যেতে হলে এখন আমাদের নদী পার হওয়ার প্রস্তুতি নিতে হবে।

রেজিস্ট্রি অফিসের পেছনে বীরগঞ্জ বাজার। তার পাশ দিয়ে এগিয়ে গেলেই পড়ে বেশ বড়ো একটা আম বাগান। নদীটা উত্তর দিক থেকে এসে বাঁক নিয়ে গেছে পুবে ঠিক আম বাগানটা ঘেঁষে। রাতের মতো এখানেই অবস্থান নিতে বলা হয় আমাদের, আম বাগানের ভেতরেই নদীর পাশ ঘেঁষে। আমাদের সামনে শত্রুপক্ষ এখন সজ্জবন্ধভাবে প্রতিরক্ষা ঘাঁটি

গেড়ে বসে নেই। ছড়িয়ে-ছিটিয়ে অবস্থান নিয়েছে তারা নদীর ওপারে বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে। ভেঙে ফেলা ভাতগা ত্রিজের এপারে শক্তির মূল দলের মুখোমুখি অবস্থান নিয়েছে মুক্তি ও মিত্রবাহিনীর অগ্রবর্তী দল। মিত্রবাহিনীর ট্যাঙ্ক এগিয়ে গেছে সেদিকপানে। ছড়িয়ে পড়া পাকসেনারা যাতে এদিক দিয়ে নদী পেরিয়ে যৌথবাহিনীর পেছন থেকে কমাত্তো হামলা চালাতে না পারে, সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখার জন্যই সারারাত বীরগঞ্জকে পেছনে রেখে নদীর ধার যেঘে ট্রেঞ্চ ও বাস্কারে অবস্থান নিয়ে জেগে থাকতে হয়।

### রোড টু খানসামা

রাতে তেমন কিছু হয় না। সকালে আমাদের প্রতি খানসামার পথ ধরে এগিয়ে যাবার নির্দেশ আসে। নির্দেশ অনুসারে আমরা সদলে এগিয়ে ঢলি জেলা বোর্ডের রাস্তা ধরে উত্তরমুখী খানসামার দিকে। সময় সকাল আটটা কি নটা তখন। খানসামামুখী জেলা বোর্ডের ধূলো ধূসর রাস্তা ধরে আমাদের পাশ দিয়ে দ্রুত এগিয়ে যায় মিত্রবাহিনীর বেশ কঠি সামরিক লরি ও জিপ। ১০/১২ মাইলের পথ প্রায়। নদীর কাছাকাছি পৌছে রাস্তার বাঁ দিককার ঘাসে ছাঁওয়া মাঠের ওপর অবস্থান নিয়ে থাকতে হয় দিনভর। মিত্রবাহিনী থাকে রাস্তার ডানে। বেশ প্রশংসন নদী। নদীর ওপারে দেখা যায় বন্দর, খানসামা থানা হেড কোয়ার্টার। কৌশলগত দিক দিয়ে ভাতগার মতোই খানসামার অবস্থান পাকবাহিনীর জন্য স্ফুর্ত শুরুত্বপূর্ণ। খানসামা দখলে নিতে পারলেই আমাদের জন্য সৈয়দপুরের পথ উন্মুক্ত হয়ে যাবে। এখান থেকে সোজাসুজি ৮/১০ মাইল ব্যবধানেই রয়েছে পাকবাহিনীর সর্বত্রজুলের শক্তিশালী ক্যান্টনমেন্ট। খানসামা দখলে নিতে পারলে সৈয়দপুর ক্যান্টনমেন্ট দখল কৰার অভিযান ঠেকানো কষ্টকর হয়ে উঠবে পাকবাহিনীর পক্ষে। ভাতগা-দিনাজপুর ও চট্টগ্রাম বাইপাস করে খানসামা দিয়েই সৈয়দপুর অভিযান যুদ্ধের এই পর্যায়ে সহজতর হৃতক্ষেত্রেই আমাদের মনে হয়।

যৌথবাহিনীর এই সম্ভাব্য অভিযানের কথা ভেবেই পাকবাহিনী শক্ত প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে খানসামায়। তাদের এই বাধার ক্ষেত্রে নদী পার হওয়া আপাতত অসম্ভব। দু'চারবার নদীর দিকে এগিয়ে যাবার চেষ্টা বিফলে যায় পাকবাহিনীর প্রচণ্ড এলোপাতাড়ি গুলির্বর্ষণের কারণে। তাই নিজেদের বাঁচাতে এই অচেনা জায়গায় লম্বা লম্বা ঘাসের জঙ্গলের ভেতরে শরীর ঝুঁকিয়ে পড়ে থাকি সজাগ অথচ প্রায় নিঃসাড়। আর এভাবে পড়ে থাকতে থাকতে আপনাআপনি কেমন একটা বিজাতীয় বিদ্বান অনুভূতি মনের ভেতরে ভিড় করতে থাকে। মনে হয়, কোথায় ছিলাম আর এখন কোথায় এসেছি! গত বছরের এ সময়কার উত্তাল দিনগুলোর কথা মনের পর্দায় থেকে থেকে ভেসে ওঠে। আর তাই এক ফাঁকে এই ঘাসের জঙ্গলের ভেতরেই নোট বইটা বের করে আনি এবং তাতে লিখে ঢলি:

### ৭ই ডিসেম্বর '৭১

“গত বছর এরকম সময়ে দেশের সেই উৎসাহ-উদ্দীপনায় তরা দিনগুলোর কথা মনে পড়ছে আজ। ১২ই নভেম্বরের সেই বন্যার তাঙ্গবলীলা কিছুটা সামলে ওঠা গেছে তখন। সামনে ইলেকশন। কে জয়লাভ করবে, কে ক্ষমতা পাবে, দু দফা আর ১১ দফা এসব নিয়ে পথেঘাটে, হোটেলে রেস্টুরেন্টে তর্কের ধূম। কেমন একটা অনিশ্চিত পরিস্থিতি। তবুও সবাই কেমন আরামে ছিলাম। সেই তখন

পাবলিক সাইতের চারপাশের আবহাওয়া কেমন উজ্জ্বল ! কতো নীতির, কতো  
পার্টির কতো রকমের মতামত ! প্রায় প্রতিদিনই একটা না একটা Meeting  
লেগেই আছে । রাতে মশাল মিছিল... ।”

খানসামা ফ্রন্টে কিছু যোদ্ধাকে মিত্রবাহিনীর সাথে রেখে বিকেলের দিকে আবার বীরগঞ্জে  
ফেরার নির্দেশ আসে । একরাতের নেতৃত্বে ১৫ জনের একটা দল আমার কোম্পানি থেকে  
এবং খালেক সাহেবের কোম্পানি থেকে একজন হাবিলদারের নেতৃত্বে ১২ জনের একটা দল  
মিত্রবাহিনীর অবস্থানে রেখে ধূলো ধূসরিত দীর্ঘ পথ হেঁটে হেঁটে আবার ফিরে আসি বীরগঞ্জে ।

বীরগঞ্জের আগেই নিচপাড়ায় লে. মাসুদ তাঁর অস্থায়ী হেড কোর্যার্টের স্থাপন করেছেন  
একটা বাঁশবাড়ের তলায় । সামনে নদীর পাড় যেমনে বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে গড়ে উঠে আমাদের  
ফ্রন্ট লাইন । মাসুদের পাশাপাশি সুবেদার খালেক এবং আমাদের বাক্সার । সময় নিয়ে বকর  
মিয়া চমৎকারভাবে তৈরি করে আমাদের বাক্সারটা । রাত নেমে আসে রক্ত হিম জমাট করা  
ঠাণ্ডা নিয়ে । কম্বল মুড়ি দিয়ে আমরা তিনজন বকর, পিন্টু আর আমি পাশাপাশি শয়ে-বসে  
কাটিয়ে দিই রাতটা নিম্ন আর জাগরণের ভেতর দিয়ে ।

### এপারে আমরা, ওপারে ওরা

সকালে মাসুদের বাক্সারে রেডিও শুনে বের হই । পিন্টু ফ্রন্টচলে যাই বীরগঞ্জের দিকে ।  
রেডিওতে শুধু যুদ্ধের খবর । ওয়েষ্টার্ন ফ্রন্টে ট্যাঙ্ক যুদ্ধ দুই মনোয়ার তাবি নদীতে, বিভিন্ন  
এলাকার বিমান আক্রমণসহ ঘোরতর যুদ্ধের ডাম্পেজেল । আর এদিকে ইস্টার্ন ফ্রন্টে বিভিন্ন  
সেন্টার দিয়ে মুক্তিবাহিনীকে সাথে নিয়ে মিত্রপ্রিয়ী একটা পর একটা জাগরণা, শহর ও  
বন্দর দখল করে করে এগিয়ে চলেছে । জামালপুর দিয়ে বাহানুরাবাদ-জামালপুর রুট ও  
তেলিয়াপাড়া-আখাউড়া দিয়ে তৈরি রুট ধরে মিত্রবাহিনী এগিয়েছে অনেক দূর । আর  
আমরা এখন সৈয়দপুরের একেবারে সারগোড়ায় । কিন্তু এর আগে ঠাকুরগাঁও পতনের পর  
দিনাঞ্চলের পতন হয়েছিলো কিন্তু যে খবর পেয়েছিলাম, জানলাম, সেটা সঠিক নয় ।

বীরগঞ্জের বিভিন্ন এলাকায় ছাউনি ফেলেছে মিত্রবাহিনীর দলগুলো । গোলন্দাজ বহর  
তাদের বিভিন্ন পাল্টার কামান আর মর্টার বসিয়েছে সুবিধেমতো জায়গায় ।

ডিসপেনসারির স্মৃথিবর্তী মাঠে গাছগাছালির ফাঁকে তাঁবু ফেলে গড়ে তোলা হয়েছে  
মিত্রবাহিনীর অস্থায়ী সদর দফতর । আর্মি ভ্যান ছুটোছুটি করছে হরদম । ওখানটায় যেতেই  
একজন অফিসার আমাকে ডাক দেন । এগিয়ে যাই আমরা পাকা সড়কের ডানদিকে আমগাছের  
তলায় দাঁড়িয়ে থাকা তাঁবুর কাছে । চিনতে পারি তাঁকে । ট্যাঙ্ক বহরের সেই কমান্ডার লে.  
কর্নেলকে । তিনি আমাদের দেখে শুশি হন খুব । বলেন, হ্যালো ইয়াহ্যান, হাউ ডু ইউ ডু?

— ফাইন । থ্যাঙ্ক ইউ স্যার । ওর নেতৃত্বাধীন ট্যাঙ্কের সামনে বসে আমরা ময়দানদিঘি  
পর্যন্ত পথ চিনিয়ে দিয়েছিলাম । তারপর থেকে আর দেখা হয় নি । আবার বলেন তিনি, ম্যায়  
তুমকো বহুত তালাশ কিয়া মাগার পাতা নেই মিলা ।

জিগ্যেস করি, কিস লিয়ে স্যার? ট্যাঙ্ক গাইড করনে কি লিয়ে?

— নেই ইয়ার বলেই হাসেন তিনি । তারপর বলেন, অভিভো রুট পাহচান লিয়া ।  
সালে লোগ আভি লড়তা তো নেই । খালি ভাগতা হ্যায় । উই আর চেজিং দেয় নাউ... ।

তার কথার সূত্র ধরে এবার বলি, ওরা তো ভাতগা ব্রিজ ভেঙে দিয়েছে । খানসামা যেতে

হলেও তো বিরাট নদী। আব কেয়া হোগাঃ ক্যান ইউ ক্রস দ্য রিভারঃ

— নো ডিয়ার। হামরা ট্যাঙ্ক তো গ্রামফিলিয়ান নেই। তাব কুছ না কুছ ওয়ে তো জরুর ফাইভ আটুট করনেই হো গা। উই আব ট্রাইং টু ডু সো।

এই সময় মাথার ওপর দিয়ে ফটফট শব্দ তুলে একটা হেলিকপ্টার উড়তে সামনে ভাগগার দিকে যায়। আবার সেটা বাঁ দিক দিয়ে ঘুরে উড়ে যায় খানসামার দিকে। আকাশের দিকে তাকিয়ে কর্নেল বলেন, ইট ইজ ফর এসপায়োনেজ মিশন। এনিমিকা পজিশন লোকেট করনে কে লিয়ে। কর্নেলের তাঁবুর টেলিফোন বেজে ওঠে। তিনি ‘এক্সকিউজ সি’ বলে উঠে চলে যান টেলিফোন রিসিভ করতে। আব আমরা আকাশের দিকে দৃষ্টি মেলে দিয়ে দেখতে থাকি হেলিকপ্টারটার ওডাউড়ি। কর্নেল তাঁবু থেকে বের হয়ে জানান, হামারা সেঁটোর কমান্ডার ত্রিগেডিয়ার মৌলী ইজ কামিং। এক ঘন্টা কি বাদ। ফ্রন্ট দেখনে কি লিয়ে।

— আমরা তাহলে চলি স্যার, উঠতে চাই আমরা। কর্নেল বলেন, নেই ইয়ার এ্যায়সে নেই যা সাক্তা। লেট আস হ্যাত কফি।

আমরা তাঁর তাঁবুর সামনে বসি। কর্নেল অসম্ভব দিলখোলা মানুষ। অনর্গল কথা বলে চলেন তিনি। বলেন, বিজ ভেঙ্গে তো কী হয়েছে। আটকাতে পারবে না আমাদের। ওয়েট অ্যাস সি। ইট ইজ অনলি দা টাইম...।

কফি পান শেষে তাঁর কাছ থেকে এবার বিদায় নিষ্ঠা<sup>১</sup> ‘ফের মিলেঙ্গে’ বলে তিনি আমাদের বিদায় জানান।

বীরগঞ্জের লোকজন কিছু কিছু করে ফিরে আসছে তাদের বাড়িয়েরে। পাকবাহিনী বিতাড়িত হবার পর পুরো বীরগঞ্জে এখন মুক্তি সার মিত্রবাহিনীর অবস্থান। পুরো এলাকা এখন একটা সেনাছাউনির চেহারা নিয়েছে।

ফিরে আসতেই ক্যাণ্টেনের নিষ্ঠার আমাদের ফ্রন্টের ট্রেক্স-বাক্সেরে অবস্থা যাচাই করতে বেরহতে হয়। এসবই ঠিকভাবে করে নিতে বলা হয় সবাইকে। সামনে দিয়ে প্রবহমান নদী। এদিকে খাড়া পাড়। গুল্মে বিশ্রী বালুর চড়া। ফসলের মাঠ। গ্রামে গ্রামে বেশকিছু মানুষজন রয়ে গেছে তাদের পারিবার-পরিজনসহই। সব থেকে অবাক লাগে, বেশকিছু হিস্তু পরিবার এদিকে রয়ে গেছে দেখে। কিন্তু এরা থাকলো কীভাবে? সম্ভবত যাওয়ার সুযোগ পায় নি তারা। কিংবা শাস্তিবাহিনী বা রাজাকারেরা হয়তো তাদের আটকে দিয়েছে। সীমান্ত এলাকা না হওয়ায় ভেতরের এই গ্রামগুলোয় যুদ্ধের ধার্কা তেমন লাগে নি। দুপুর ১২টার দিকে তদারিকির কাজ শেষ হলে নদীর পাড়ে এসে বসি। নিচে তকতকে ঝকঝকে প্রবহমান পানির ধারা। বইছে শিরশিরে মণ্ডু মন্ড বাতাস। শরীরে-পিঠে রোদের তাপ লাগে। নদীর স্বচ্ছ পানিতে নেমে যেতে ইচ্ছে করে। সেই যে নভেম্বরের ২২ তারিখে ফ্রন্টে এসেছি। আজ ডিসেম্বরের ৮ তারিখ। আয় ১৭/১৮ দিন স্নান-গোসল নেই। রাত দিন এক কাপড়ে শোয়া-বসা আব চলা। শুধু আমার একার নয়, আমাদের সবারই জামাকাপড়ে উকুনের মতো এক ধরনের পোকা দেখা দিয়েছে। পোকাগুলো কুটকুট করে মাঝে মাঝেই কামড় বসায় শরীরের বিভিন্ন অংশে। ফলে চামড়ার ওপর জালা ধরলে কেউ কেউ এমন অস্থির হয়ে ওঠে যে জামা-সোয়েটার খুলে ফেলে আব সেইসব পোকা মেরে চলে গভীর অভিনিবেশে।

নদীতে কিছু ছলেমেয়েকে মাছ ধরতে দেখা যায়। গোসল করতেও দেখা যায় কিছু মানুষকে। ওপারে ক'জন বট-বিকে দেখা যায়। তারা এসেছে কলসি কাঁখে নদী থেকে পানি

কেত মাপ-২৬

সম্পর্কসূচক

২৫ মাইলের পতল—বীরগঞ্জ থানা দখল

১-১২-৭৩—১-১২-৭৩

সন্দৰ্ভ:

পুরো সত্ত্বক:

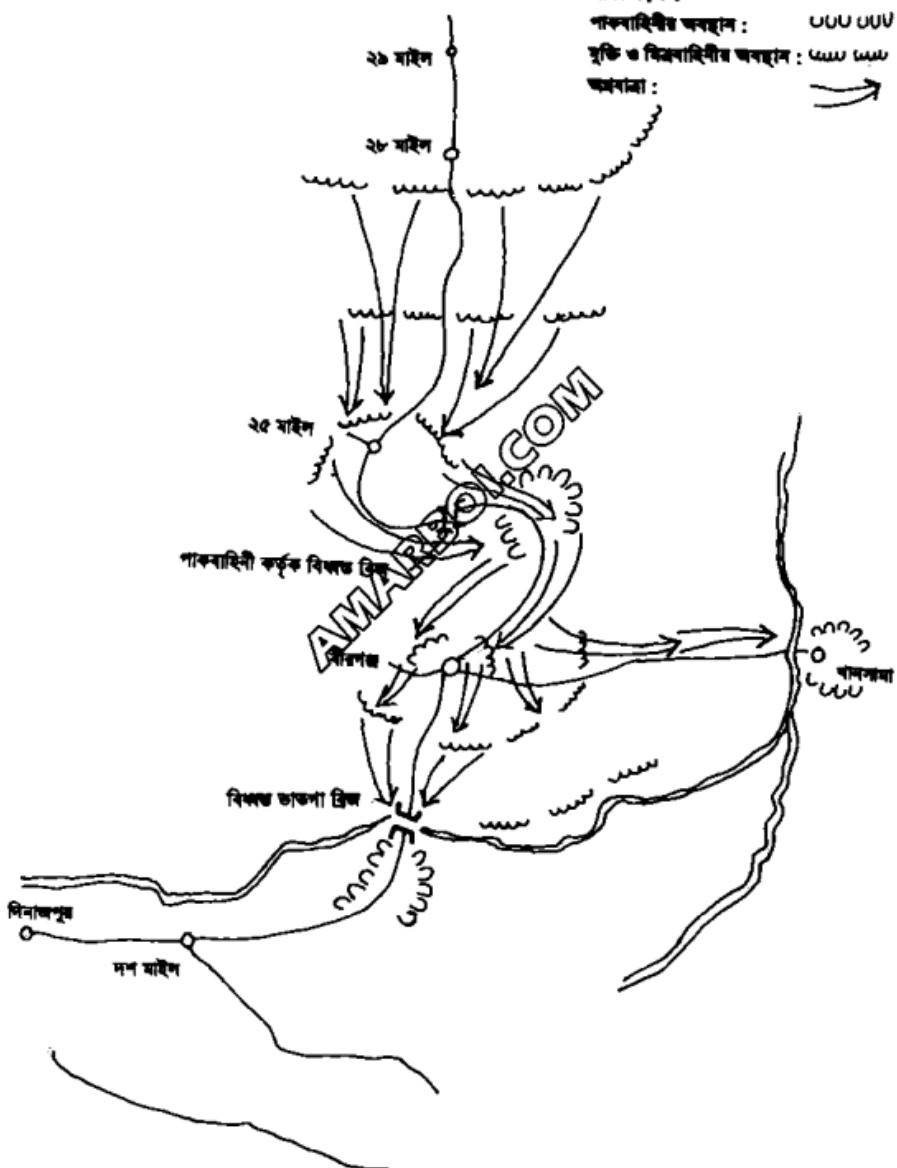
পদবাহিনীর অবস্থা:

৩০০ ৩০০

বৃক্ষ ও বিজ্ঞানীর অবস্থা: যেহে যেহে

অবস্থা:

→



নেবার জন্য। পাকসেনারা নেই, রাজাকারদের দাপট আর নেই। দালাল শান্তি কমিটির লোকজন লাগতা, তাই এই জীবনচাল্য। আশপাশের জনপদে আর নদীকে ঘিরে জেগে উঠেছে স্বাভাবিক জীবনযাত্রার চেউ। মুক্তিবাহিনীর অবস্থান নদীর এপারে থাকলেও তাদের তো ভয় নেই। মুক্তিবাহিনী এসেছে তাদের মুক্তি দিতে। তারা রাজাকার নয়, পাকবাহিনীও নয়। তাই তারা নিশ্চক্ষিত, ভয়হীন।

পাশ ফিরে দেখি, পিন্টুর চোখে মুষ্টভার আবেশ। শুণ্ণু করে সে গান গেয়ে যায়। অনেকটা আপন মনেই, ও আমার দেশের মাটি...। আর আমি আমার নেটবেইটা বের করে নদীর তীরে বসে দেখা এই চমৎকার ছবিটা ধরে রাখি এইভাবে :

৮ই ডিসেম্বর, '৭১

“একটা নদীর বাঁকে বসে লিখছি। লিখতে ভালো লাগছে। ঠাণ্ডা শিরশিরে বাতাস সমস্ত শরীরটা ঝড়িয়ে দিচ্ছে যেনো। নিচে নদীতে কয়েকটা ছেলে মাছ ধরছে। গড়ের হাসি-খুশি তরা প্রাণচার্যল্যে মনে হয়, দেশে কোনো যুদ্ধ নেই, অশান্তি নেই। সবকিছু যেনো আগের মতোই আছে।

সৈয়দপুরের সামনাসামনি রয়েছি আমরা এখন। সোজাসুজি গেলে এখান থেকে সৈয়দপুর মাত্র ৮/১০ মাইল। ওরা আমাদের অভিগ্রাম আর খানসামায় আটকে দিয়েছে। নদীর ওপারে ওরা *Shelter* নিয়েছে এপারে আমরা...।”

ভায়োরিতে আরো কিছু অনুভূতির কথা লিখতে চেয়েছিলাম। কিন্তু তাতে হেদ পড়ে। হঠাৎ পেছন থেকে দৌড়ে আসে আমার ব্যাটম্যানসমূহ খাল্যকারী চাঁদ মিয়া। ব্যাপার কি জিয়েস করতেই সে বলে, ক্যাপ্টেন সাহেবে জরুরি ক্ষেত্রে দিয়েছেন আপনাকে। কথা বলবেন সেটে। খবরটা পেয়ে দ্রুত ফিরে আসি আমার বাক্সের পোকে।

### লুটের মাল

ক্যাপ্টেনের ম্যাসেজ হচ্ছে, “শ্রায় মাইল দূরেক পেছনে একটা মালদহ পাড়া রয়েছে। ওপাড়ার লোকগুলো সবাই রাজাকার। বেশকিছু অন্তর জমা রয়েছে সেখানে। সেগুলো উক্তার করতে যেতে হবে। সাবধানে এবং সর্তর্কতার সঙ্গে যেতে হবে। কোনো লুটপাট বা অশোভন কোনোকিছু যাতে না হয়, লক্ষ্য রাখতে হবে। আর এজনাই তোমাদের এফ.এফ কোশানিকে এই দায়িত্ব দেয়া হয়েছে, অন্যদের নয়। রিমেবার ইট।”

২০ জনের একটা দল সাজিয়ে নিই। প্রত্যেকের কাছে থাকে হাতিয়ারসহ প্রয়োজনান্যায়ী গোলাবারুদ। পিন্টু চেক করে নেয় ছেলেদের চূড়ান্তভাবে। বেলা দুটোর পর আমরা রওনা দিই সেই মালদহ পাড়ার দিকে। রাস্তা হেড়ে আলপথ দিয়ে বেশ দ্রুতই পৌছে যাই সেখানে।

পাড়াটা বেশ বড়ো। অনেকগুলো ঘরবাড়ি। মুসা আর বকরকে দু’ দলে ভাগ হয়ে পাড়াটাকে ঘিরে ফেলতে বলি। নির্দেশ পাওয়া মাত্র কাজটা সেরে ফেলে ওরা খুবই তাড়াতাড়ি। তবে পাড়াটার প্রবেশমুখে কাউকে পাওয়া যায় না। পুরো বসতিটাতে পুরুষ মানুষ আছে কি না বোঝা যায় না। এবার পাড়ার মধ্যে ঢুকে পড়ি। দেখতে পাওয়া যায় শুধু মেয়ে মানুষ আর বাচ্চা ছেলেমেয়েদের। না, কোনো পুরুষ মানুষের চিহ্ন নেই। মেয়ে মানুষগুলো এরি মধ্যে ভীতসজ্জ হয়ে পড়েছে আমাদের উপস্থিতিতে। কিন্তু পুরুষগুলো কোথায় সে ব্যাপারে মুখ খোলে না

କେଉଁ । ଏବକମ ଅବଶ୍ୟ ଦଲେର ଛେଳେଦେର ସରେ ସରେ ତୁଳାଶି ଚାଲାନୋର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଇ ।

ତାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶମତୋ ଶୁଣୁ କରେ କାଜ । ପିନ୍ଟୁକେ ବଡ଼ୋ ବାଡ଼ିଟାର ଭେତରେ ଚୁକ୍ତେ ବଲି ଏବାର, ତବେ ଏକା ନୟ, କ'ଜନକେ ସଙ୍ଗେ ନିଯେ । ବାହିରେ ଦାଡ଼ିଯେ ଆମି ଛେଳେଦେର ତୁଳାଶି କାଜ ତଦାରକ କରନ୍ତେ ଥାକି ।

ସେ ବାଡ଼ିଟାତେ ପିନ୍ଟୁ ଚୁକେଛେ, ସେଖାନ ଥେକେ ଏକଜନ ମହିଳାର ବାଜିଥୀଇ ଗଲା ଭେସେ ଆସେ । ମହିଳା ବଲଛେ, ନା, ସରେର ଭେତର ଚୁକ୍ତେ ପାରବେନ ନା । କି ଦୋଷ କରେଛି ଆମରା? ପିନ୍ଟୁ ବଲେ, ଆମରା ରାଜାକାର ଆର ଅନ୍ତର ଥୁଣ୍ଝାଇ । ଚୁକ୍ତେଇ ହେବ ସରେ ।

— ଏଥାନେ କୋନୋ ରାଜାକାର ନେଇ । ଛବ ଲୋକ ଏଥାନକାର ଭାଲୋ । ଛାନ୍ତିବାହିନୀ-ଦାଲାଲ ନୟ କେହ ।

ପିନ୍ଟୁ ଧରିକେ ଉଠେ ମହିଳାକେ । ମେ ସମୟ ବାଡ଼ିଟାର ସାମନେର ଶୋଯାଲ ଘରେର ପାଶେ ଏକଟା ଉଚୁ ମତୋ ଜାଯଗାଯ ଦୃଢ଼ି ଆଟକେ ଯାଇ ଆମାର । ତକନୋ ଖଡ଼ ଦିଯେ ଢାକା ଜାଯଗାଟା । ବକରକେ ସଙ୍ଗେ ନିଯେ ଏଗିଯେ ଯାଇ ସେଖାନଟାଯ । ଯା ସନ୍ଦେହ କରେଛିଲାମ ତାଇ । ମାଟିର ନିଚେ ଏକଟା ବଡ଼ୋ ବାଞ୍ଚାର । ସାମନେର ଦିକେ ଓଟାର ଶୋଯାଲେର ଗର୍ତ୍ତରେ ମତୋ ମୁଖ । ଗର୍ତ୍ତର ଓପର ଯଜ୍ଞବୁତ ଟିନେର ଛାଉନି । ତାର ଓପର ମାଟି । ମାଟିର ଓପର ଖଡ଼ ବିଜ୍ଞୟେ ଓଟାକେ କ୍ୟାମୋଫ୍ରେଜ କରାର ଚେଷ୍ଟା କରା ହେଁବେ । ଏକଟୁ ଏଗିଯେ ଗିଯେ ବକର ସେଇ ଗର୍ତ୍ତର ମୁଖେ ଉକି ଦିଯେଇ ବଲେ, ଲୋକ ଦେଖା ଯାଇ ଭିତରେ!

ତାଇତୋ! ଉକି ଦିଯେ ଆମିଓ ଦେଖି ଶୁତୁଟି ମେରେ ବସେ ଥାଇଁ ଏକଜନ ।

ଇଯାସୀନ ଆଲୀକେ ଡେକେ ଗର୍ତ୍ତ ଚୁକ୍ତେ ବଲତେଇ ମେ ଶ୍ରେଷ୍ଠମେ ଉକି ମାରେ । ତାରପର ଚିରକାର ଦିଯେ ବଲତେ ଥାକେ, ରାଜାକାର, ରାଜାକାର! ରାଜାକାରର ଶ୍ରେଷ୍ଠୀ ଗେହିଁଛେ । ତାରପର ଝାଟିତେ ଗର୍ତ୍ତର ଭେତରେ ଚୁକେଇ ମେ ଚାଲ ଥରେ ଟେନେ ଆନେ ଲୋକଟାକ । ମାବବସାୟ ଲୋକଟା । ତାର ଚେହାରାଟାଇ କ୍ରିମିନାଲେର ମତୋ । ତାକେ ଦେଖେଇ ତୁରିତ ଶାନ୍ତିର ରକ୍ତ ଉଠେ ଯାଇ । ମାଟିତେ ପଡ଼େ ଥାକା ଏକଟା ବାଶେର କଷି ତୁଲେ ନିଯେ ତାକେ ଶପାଦିଶ୍ଵର କରେ ମାରତେ ଥାକି ଶରୀରେର ପୁରୋ ଶକ୍ତି ଢେଲେ । ଆର ମୁଖେ ବଲତେ ଥାକି, ଶାଲା ରାଜାକୁଟି, ତୋଦେର ଜନ୍ୟ ଆମାଦେର ଦେଶ ଛାଡ଼ତେ ହେଁବେ, କଟ୍ କରତେ ହେଁବେ ଦିନରାତ, ମରତେ ହେଁବେ । ରକ୍ତ ଦିତେ ହେଁବେ । ତୋରା ଆମାଦେର ମା-ବୋନଦେର ଇଞ୍ଜିନ ନଷ୍ଟ କରେଛିସ... ।

କଥା ବଲି ଆର ଶରୀରେର ସମନ୍ତ ଶକ୍ତି ଦିଯେ ମାରି ଲୋକଟାକେ । ମେ ମାର ଥାଇ ଆର ଚିରକାର କରେ କାନ୍ଦତେ କାନ୍ଦତେ ବଲେ, ମରେ ଶେନୁ । ଆମି ରାଜାକାର ନହି । ଆମି କିଛୁ କରି ନାହି । ଯା ଚାହିବେନ ଛବ ଦିବ, ହାମାକ ବାଚନ, ଜାନ ଭିକ୍ଷା ଦେନ... ।

କିନ୍ତୁ ହିତାହିତ ଜାନ ଲୋପ ପାଓୟା ଅବଶ୍ୟ ମାରତେ ମାଟିତେ ଶୁଇୟେ ଫେଲି ଧୂତ ଲୋକଟାକେ । ମାରେର ଚୋଟ ସହ୍ୟ କରତେ ନା ପେରେ ତଥିନ ମେ ଗଡ଼ଗଡ଼ କରେ ବଲେ ଦେୟ ସବ କଥା, ରାଇଫେଲଗୁଲୋ କୋଥାଯ ଆହେ, ରାଜାକାର କାରା କାରା, ଲୁଟେର ମାଲ କୋଥାଯ ଆହେ ଇତ୍ୟାଦି ସବ ।

ଲୋକଟା ଯେ ବାଞ୍ଚାରେ ଆଞ୍ଚଗୋପନ କରେଛିଲୋ ସେଖାନ ଥେକେ ପାଓୟା ଯାଇ ଏକଟା ରାଇଫେଲ । ଆର ପାଓୟା ଯାଇ ଏକ ଦଙ୍ଗଲ କାଂସାର ହାନ୍ତି-ପାତିଲିସହ ମୂଳ୍ୟବାନ ଶାନ୍ତି-ଗହନା । ଓଦିକେ ପିନ୍ଟୁ ଯେ ବାଡ଼ିତେ ଚୁକେଛିଲୋ ସେଖାନ ଥେକେ ବେରୋଯ ଏକଟା ରାଇଫେଲ । ସରେର ଭେତର ଥେକେ ଆନ୍ତିନାୟ ଏନେ କାଯେକଟା ବାଞ୍ଚାର ଖୋଲା ହେବ । ଏକର ଜିନିସପତ୍ର ସେଶୁଲୋତେ । ଘର ଥେକେ ପାଓୟା ଯାଇ କାଂସାର ବାସନପତ୍ର ଅନେକଗୁଲୋ । ବାଞ୍ଚ ହାତଡେ ଶାନ୍ତି-କାପଦ୍ରେ ନିଚ ଥେକେ ଅନେକଗୁଲୋ ଗହନ ପାଓୟା ଯାଇ । ବୋରାଇ ଯାଇ ଏଗୁଲୋ ସବଇ ଲୁଟେର ମାଲ । ମୁଖ ଗହନାଗୁଲୋଯ ହାତ ଦିତେଇ ମେହିନେ ବାଜିଥୀଇ ମହିଳା ଏଗିଯେ ଏସେ ବଲେ, ଗହନା ନିବେନ କେନୋ । ଓଶୁଲା ଛବ ଆମାର ବାପ

দিছে। আমার নিজের গহনা।

এবার আমি মহিলাটির দিকে এগিয়ে যাই। তারপর তাকে সোজাসুজি বলি, সব গয়না আপনার নয়। আপনার যেটা যেটা সেগুলো নিয়ে থান। আসেন।

কথাটা শব্দে মহিলা কিছুক্ষণ আমার দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। তারপর এগিয়ে এসে কালো সুতোয় বাধা বোলানো সোনার মালাটি তুলে নিয়ে বলে, এইটা আমার বাপে দিছে।

— বাকি শুনো? আমার প্রশ্ন।

এবার মহিলা আর কিছু বলে না। লুটের মালকে নিজের মাল বলে দাবি করার সাহস হারিয়ে ফেলেছে মহিলা।

সমস্ত পাড়ায় অভিযান চালিয়ে মোট তিনজন পুরুষকে পাওয়া যায়। রাইফেল পাওয়া যায় ৫টা। গুলি করেকশ্ব” রাউন্ডের মতো। লুটের মাল একরাশ। এর মধ্যে ১৫/২০ ভরি সোনাই হবে।

রাজাকার তিনজনকে মনের বাল মিটিয়ে মারে দলের ছেলেরা। তাদের মার দেয়ার এই ঘটনার ভেতর দিয়ে ছেলেদের এতেদিনকার পুঁজীভূত রাগ ও ক্ষেত্রের বহির্প্রকাশ ঘটে। দেশছাড়া, পরিবারপরিজন ছাড়া, সেই সাথে দীর্ঘ কয়েক মাসের এই সীমাবদ্ধ কষ্ট আর যাতনাই ক্ষেত্রের রূপে বেরিয়ে আসে তাদের ভেতর থেকে।

ধৃত তিনজনের মাথায় তাদেরই লুট করা মালপত্র দিয়ে যখন ফ্রন্টে ফিরি, তখন দিন ফুরিয়ে এসেছে। ক্যাটেনকে উদ্ধার করা জিনিসপত্রের দিসেব জানিয়ে দিই রাইফেল আর গোলাবারুদসহই। তিনি একটা সিজার লিষ্ট করে তাঙ্গুলো তার হেড কোয়ার্টারে পাঠিয়ে দিতে বলেন।

সিজার লিষ্ট তৈরির কাজে সাহায্য করেন সুবেদার খালেক। এ কাজে তারা আগে থেকেই অভ্যন্ত। এই সময় বকর ফিল্মসিস্টের আমাকে বলে, কিছু টাকা রেখে দেই আমরা।

তার দিকে তাকাতেই সে ঝুঁপড়ে যায়। আমতা আমতা করে বলে, আমাদের কোশ্চানির ছেলেদের নানা খরচ আছে, এইজন্য বলেছিলাম।

ওর কথার জবাবে বকরকে আমি বলি, এটা যুদ্ধের মাঠ। যে-কোনো সময় আমরা মারা যেতে পারি। একটা বুলেট এসে যদি তোকে আঘাত করে আর যদি তুই মারা যাস, তাহলে মনে হবে, এই লুটের টাকার জন্যই এমনটা হয়েছে। কি দরকার আমাদের টাকার? যুদ্ধের মাঠে কখন শক্তির গুলি এসে লাগবে বুকে, একথা কেউ জানে না। পিটুও সায় দেয় আমার কথায়।

এরকম কথাটিখা বলে আটক করা প্রায় ১৪ হাজার টাকা থেকে বকরের হাতে ১০০ টাকা তুলে দিয়ে শেষে বলি, এটা রাখ। সবাইকে সিগারেট কিনে দিস। পিটুও এই সময় দুটো জবা কুসুম তেলের শিশি হাতে নিয়ে বকরকে দেখিয়ে বলে, এ দুটো তেলের শিশি ও রাখ। মাথায় মাখবি। ঠাণ্ডা থাকবে তাহলে মাথা।

পিটুর কথা শব্দে উপস্থিত সবাই হেসে শুঠে। পরিস্থিতিটা সহজ হয়ে আসে।

১৫/২০ ভরি সোনা, প্রায় ১৪ হাজার নগদ টাকা, ৫টা রাইফেল আর ২০০ রাউন্ডের মতো গুলি সাথে লুটের মালপত্র সব লখ তালিকা করে বকরকে দিয়ে পাঠিয়ে দিই ক্যাটেনের পোষ্টে। ধৃত রাজাকার তিনজনের মাথায় লুটের মালগুলো আবার তুলে দেয়া হয়। দুজন সঙ্গীসহ বকর সঙ্ক্ষারে এগিয়ে যায় ফ্রন্ট হেড কোয়ার্টারে জমা দেয়ার জন্য। টাকা, সোনা আর মালপত্রের সবই জমা হবে স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের

কোষাগারে। আমাদের স্বাধীন বাংলার সরকারকে এই প্রথম সরাসরি কিছু দিতে পারায় মনের গভীরে ভালোভাগার এক নিবিড় অনুভূতি খেলা করে। সেই অনুভূতির রেশ বজায় থাকে সারা বাতের জগত প্রতিটি মুর্তু জুড়ে।

থেমে গেলো অঞ্চল্যাত্মা

হাঠাঁৎ কোথা থেকে একটা বিদেশী কুকুরের বাচ্চা সোজা এসে হাজির হয় আমার বাস্তারে। একেবারে ধ্বনিতে বরফ সাদা রঙ, তাপাড়া রোমশ শরীর। তুলতুলে নরম গা। কথা নেই, বার্তা নেই আমার কোলে উঠে বসে কাঁইকুই করতে শুরু করে। আদর চায়। আর আমারও কী হয়, ওকে বুকে তুলে নিয়ে পরম ম্রেহে আদর করতে থাকি। পিন্টু আর বকরের মধ্যেও কাঢ়াকড়ি পড়ে যায় নতুন অতিথিটিকে নিয়ে। ভেবে পাই না কোথা থেকে কেমন করে একেবারে সাক্ষাৎ যুদ্ধক্ষেত্রে এসে হাজির হলো চমৎকার এই পতঙ্গাবকটি। একজনকে দ্রুত দোকানে পাঠাই বিকুট আনতে। এরকম অভিবিত একজন মেহমানকে খাতির না করলেই নয়। কুকুরের বাচ্চাটি আমাদের ছেড়ে কোথাও যায় না। থেকেই যায় বাস্তারে। ওটি কোলে করে আমি পিন্টু এদিকওদিক যাই। ফ্রন্টের ছেলেদের খৌজখবর করতে যাই। সবাই কোলে তুলে নিয়ে আদর করে ওকে। আসলেও এরকম নিরীহ নিষ্পাপ তুলতুলে সুন্দর প্রাণীকে আদর না করে থাকা যায় না।

পুরো একদিন একবাত থাকে কুকুর ছানাটি আমাদের বাস্তারে একজন মানী মেহমানের মতোই পরম আদরযত্নের ভেতর দিয়ে।

পরদিন সকাল ৮টার দিকে একজন ভারতীয় সেনিক এসে বলে, ইয়ে কুন্তা কাহাসে প্যায়া? কিধার সে আয়া? ইয়ে হামারা হ্যায়।<sup>১০</sup>

— যাও মিয়া ভাগো। ইয়েতো হাস্তাচ্ছাকার মে আপোসমে আয়া।

— নেহি, ইয়ে হামারা হ্যায় স্বাস্থ্যে দে দো।

পিন্টু যেনে এবার তেলেবেগুজে জলে উঠে বলে, নেহি দেগো। কেয়া কারো গে কারো।

পিন্টুর ধর্মকথামকে সৈনিকটি এবার কিছুটা দমে যায় যেনে। তাই ঠাঁও সুরে বলে, দেখো ভাইয়া ইয়ে কুন্তা হামারা কর্মেল সাব কা হ্যায়। হামারা ক্যাল্প সে ভাগকার আয়া হ্যায়।

না, তাও দিই না আমরা কুকুর ছানাটিকে। তাই সৈনিকটি মুখ বেজার করে চলে যায়। কিন্তু এরপরেই কিছুক্ষণের মধ্যে একজন সুবেদার এসে হাজির। আর এসেই বলে, কর্মেল সাহেব তাকে পাঠিয়েছেন কুকুরের বাচ্চাটিকে নেয়ার জন্য। কি আর করা, এবার ওকে ফেরত দিতেই হয় আমাদের।

বেলা ১১টার দিকে কর্মেল সাহেব স্বয়ং ডেকে পাঠান আমাদের। কী জ্বালানরে বাবা! ধর্মকটমক দেবেন নাকি! এরকম একটা সংস্কার মনে মনে পুষে নিয়েই হাজির হই কর্মেল সাহেবের তাঁবুতে। না, আমাদের সে আশঙ্কা তুল। অত্যন্ত ভালো মুখে আমাদের অভ্যর্থনা করেন তিনি। সেই কুকুর ছানাটিকে দেখতে পাই তাঁর কোলে। কৃতকৃতে চোখে তাকায়। চিনতে পারে বোধহয় আমাদের।

কর্মেল বেশ খাতির করে বসান আমাদের। অঞ্চল্যের ভেতরেই কফি আসে। তারপর নানা প্রসঙ্গ নিয়ে তিনি আলাপ শুরু করেন। এক পর্যায়ে আমি তাকে বলি, আমেরিকা ইউ সেন্টারিং সেন্টেন্থ ফ্রিট। ইট ইজ দ্য নিউজ ফরম রেডিও। হোয়াট ইজ ইয়োর আইডিয়া স্যার?

— গোলি মারো ইয়ার। সেট দেম কাম। বিফোর দ্যাট ফ্লিট কাম উই শ্যাল ফিনিশ  
দ্য গেম।

এরপর যুদ্ধ নিয়ে আরো কথা হয়। তাকে বলি, আমরাতো আটকে গেলাম স্যার।  
আরতো এগুতে পারছি না।

— ভেরি সুন উই উইল ব্রেক ফ্রি দ্য এনিমিজ পজিশন। তৈরি থেকো তোমরা। কথা  
শেষ করে আসবাব সময় কর্নেল সাহেব তাঁর হারিয়ে যাওয়া কুকুর ছানাটিকে সংযতে রাখার  
জন্য ধন্যবাদ জানান। এবং আভ্যরিকভাবেই।

ফিরবার পথে সেই আমগাছের নিচেকার প্রথম পজিশনের ফ্রন্ট লাইন দেখতে যাবার  
সময় দুটো প্লেন মাথার ওপর দিয়ে উড়ে যায় খানসামার দিকে। নদীর তীরবর্তী ট্রেঞ্চে বসে  
প্লেন দুটোর আকাশান দেখি। চক্রাকারে ওরা ঘূরছে, ডাইভ দিয়ে নিচে নামছে, আবার খাড়া  
হয়ে ওপরে উঠছে। ঘূরে এসে আবার ডাইভ দিয়ে শক্র অবস্থান লক্ষ্য করে আক্রমণ রচনা  
করছে। উজ্জ্বল রোদে চকচক করে প্লেন দুটোর রংপোলি শৰীর। বিনা বাধায় ঘূরেফিরে  
টার্গেটের ওপর হামলা চালাতে থাকে প্লেন দুটি। দূর থেকে চমৎকার দেখা যায় এ দৃশ্য।  
ফ্রন্টের সবাই দেখে ব্যাপারটা। আর সম্ভবত আমারই মতো ভাবে, শুরু হয়েছে আসল  
কারবার। আর ক'নিন টিকবে শক্র?

বিকেলে নির্দেশ আসে, ১০ জনের একটা দলকে পাঠান্তে ভারতীয় বাহিনীর সাথে।  
কাহারোল হয়ে ভারতীয় দলটা দিনাজপুরে ঢুকবে। যান্ত থেকে তুলে এনে পাঠিয়ে দিই ১০  
জনের একটা দলকে তাদের রিপোর্টিংয়ের জায়গায়।

খানসামাগামী রাস্তায় ২/৩ শ' গজ পরপর স্টিলোরি সারি সারি। খানসামা ফ্রন্টে সম্ভবত  
একটা কিছু হতে যাচ্ছে। দেখা যাক কি হচ্ছে আজ '৭১ সালের ১২ ডিসেম্বর। তিন ডিনটা  
দিন এখানে আটকে থাকতে হয়েছে আমাদের। আসলে এখন যে প্রস্তুতির ডামাডোল চলছে,  
সেটা ব্রেক ফ্রির প্রস্তুতি। আমাদের প্রস্তুতি চলছে সমানে। কিন্তু শুধু প্রস্তুতি নিয়ে বসে  
থাকা ছাড়া আর কোনো কাজ নেই। ১২ তারিখের নোট বইয়ে লিখি :

### ১২ই ডিসেম্বর, '৭১

“এ তিন দিন লেখার মতো কিছু খুঁজে পাই নি। সেই একই জায়গায় Position  
নিয়ে বসে আছি। সামনের দিকে Progress করার কোনো লক্ষণ নেই বলতে  
গেলে। অবশ্য INDIAN ARMY-রা খুবই চেষ্টা করছে। সুবিধে করতে পারছে না  
কিছুতেই। শক্রের সহৃদয়বর্তী বিজীর্ণ Area নিয়ে চুপচাপ পড়ে আছে। এগুতে  
দিছে না কিছুতেই....।”

### শীরগঞ্জ-নিচপাড়া ফ্লিট

আমার অবস্থান সরিয়ে নিতে হয়। খানসামাগামী জেলা বোর্ডের রাস্তার বাঁদিকে একটা  
বাঁশবাড়ের তলায় ডাঙা মতো জমি। সেখানে ৩০ টি বাঙার এবং ৬০ টি ট্রেঞ্চ নিয়ে গড়ে ওঠে  
আমার এফ.এফ. কোম্পানি হেড কোয়ার্টার। ক্যাটেন এক ব্যান্ডের একটা রেডিও পাঠিয়েছেন।  
ফলে সুবিধে হয়েছে খুব। যুদ্ধের অগ্রগতির খবরাখবর জানা যাচ্ছে। জানা যাচ্ছে, আমাদের  
যুদ্ধের ব্যাপারে আন্তর্জাতিক তৎপরতা ও ত্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার গতি প্রকৃতি সম্পর্কে। জাতিসংঘে

যুদ্ধ বক্সের জন্য পাকিস্তানি তৎপরতা এখনো অব্যাহত। সেভিয়েত ইউনিয়ন ভেটো দিয়ে ঠেকিয়ে রেখেছে নিরাপত্তা পরিষদে যুদ্ধ বক্সের প্রস্তাব। বাংলাদেশ ফ্রন্টে যুদ্ধের যে অংগতি, তাতে করে এই অবস্থায় যুদ্ধ বক্স করলে মহাবিপদ দেখা দেবে। দুটো কলাম খুব দ্রুত ঢাকার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। জামালপুর, টাঙ্গাইল হয়ে একটা কলাম, আঙগঞ্জ-ভৈরব হয়ে অন্য একটা কলাম। আমেরিকা থেকে সংগৃহ নৌবহর থেয়ে আসছে বঙ্গোপসাগরের দিকে।

রেডিওতে এসব খবর শুনি আর শঙ্কা ও আনন্দের তোলপাড় চলে সমানে মন জুড়ে। এরই পাশাপাশি এরকম একটা শুজব ছড়িয়ে পড়েছে যে, পাকিস্তানের পক্ষ নিয়ে পূর্ব পাকিস্তান রক্ষায় সাহায্য করার জন্য চীন তাদের সৈন্য পাঠাচ্ছে। শুজবটার সত্যমিথে যাচাই করা যায় না। কিন্তু এসবের ভেতরে আমাদের যুক্তিবাহিনীর ফ্রন্ট জুড়ে দুটো খবর প্রভাব বিস্তার করে খুবই গভীরভাবে। প্রথমটা আমেরিকার সংগৃহ নৌবহর, দ্বিতীয়ত চীনা সৈন্য বাহিনীর আগমন সংক্রান্ত খবর। ফ্রন্ট জুড়ে তাই শুধু এ নিয়েই আলোচনা। সংগৃহ নৌবহর নিয়ে আমেরিকা এবং চীনা বাহিনী পাকিস্তানের পক্ষাবলম্বন করে সরাসরি আমাদের বিরক্তে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলে এই যুদ্ধের চেহারা নিশ্চিতই পাল্টাতে বাধা। যুদ্ধের বর্তমান রূপ আর তখন থাকবে না। বর্তমানে যুদ্ধে আমাদের যে অংগতি এবং যে সুবিধেজনক পরিশন, সেটা রাতারাতি পাল্টে যেতে পারে।

বর্তমানে আমাদের ফ্রন্টে পাকিস্তানিদের অবস্থা খুবই ছিছিল। ভাতগা এবং খানসামা নদীর প্রাকৃতিক বাধা দিয়ে তারা আমাদের অংগতি ঝুঁকে পারলেও, তাদের বর্তমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় আগের মতো তেমন আর ধার নেই। তাদের আর্টিলারি সাপোর্ট নেই। নেই বিমানবাহিনীর কোনো সাপোর্ট। নদীর পাড়ে ক্ষেত্রে বিস্তৃণ এলাকা জুড়ে তারা মেশিনগান ও হালকা অন্তর্শস্ত্র সফল করে প্রতিরক্ষাগত অস্ত্রজাল নিয়ে টিকে আছে। তাদের অবস্থা হয়েছে মরিয়া। প্রতিরক্ষা লাইনের গতানুগতিক প্রস্থায় অর্ধাং ট্রেক্স-বাক্সের লাইনে না গিয়ে তারা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ফসলের মাঠে ছিটিঘরের আড়ালে, গাছপালার নিচে, নয়তো বুনো ঝোপঝাড়ের ভেতরে অবস্থান নিয়েছে। আকাশপথে হেলিকপ্টার থেকে তাই পাকসেনাদের সঠিক অবস্থান লোকেট করা সম্ভব হচ্ছে না রিকোনাইসেন্স দলের পক্ষে।

রেডিওতে ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল মানেক শ'র বরাত দিয়ে বাংলাদেশের যুদ্ধের পাকবাহিনীকে আত্মসমর্পণ করার জন্য কিছুক্ষণ পরপর আহ্বান জানানো হচ্ছে। এটা একটা মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ। তাঁর সেই ঘোষণায় বলা হচ্ছে, তোমরা বাংলাদেশে চারদিক থেকে ঘেরাও হয়ে পড়েছো। আকাশপথ সমুদ্রপথ বক্স। পালানোর কোনো উপায় নেই। সুতরাং তোমরা সারেভার করো, নতুন মৃত্যু অনিবার্য। সারেভার করলে তোমাদের প্রতি যুদ্ধবন্দি হিসেবে জেনেভা ঘূর্ণি অনুযায়ী আচরণ করা হবে।

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র দারুণ সব উদ্দীপনাধৰ্মী অনুষ্ঠান প্রচার করছে। চরমপ্রতি জমে উঠেছে খুব। বজ্রকষ্টে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ আর যুদ্ধের অংগতির খবরাখবরের পাশাপাশি প্রচারিত হচ্ছে দুষ্ট, সংগ্রামী সব গানের পর গান। এসবের ভেতরে দুটো গান অসম্ভব জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। একটা 'মোরা একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে যুদ্ধ করি,' অন্যটা 'সালাম সালাম হাজার সালাম'।

বাক্সারের এই রকম অলস মুহূর্তে রেডিও ছেড়ে নড়তে ইচ্ছে করে না। এখানে আটকে আছি আজ পাকা ৪/৫ দিন হলো। খানসামা কিংবা ভাতগায় ব্রেক ফ্রি করা যায় নি। তবে

চেষ্টা চলছে আগ্রাণ। খানসামা অভিযান উপলক্ষে মিত্রবাহিনীর ব্যাপক প্রস্তুতি দেখবার মতো। প্রচুর ভারি সামরিক সাজসরঞ্জাম এবং নতুন নতুন দল এগিয়ে যাচ্ছে খানসামার রাস্তা ধরে। সহজেই বোধ যায় খানসামায় মূল প্রাক্ট-এর অংশ হিসেবেই মিত্রবাহিনীর এই ব্যাপক প্রস্তুতিবজ্জ্বল। আকাশপথে প্লেনের নিয়মিত ওড়াউড়ি ও ঘাঁটিগুলোর ওপর আঘাত হানার ঘটনা চলছে আগের মতোই। মাথার ওপর দিয়ে ফটোফট শব্দ তুলে তাদের হেলিকপ্টারগুলোও ঘুরে ঘুরে শক্তির সঠিক অবস্থান নিরূপণ করার প্রায় সার্বক্ষণিক চেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। বাক্সার পাশে বসানো আর্টিলিরি থেকে দূর দূর শব্দে শোলাবর্ধণও করা হচ্ছে মাঝে মাঝেই খানসামার শক্রঘঁটি লক্ষ্য করে। পুরো বীরগঞ্জ এলাকা এখন শুধু মুক্তি আর মিত্রবাহিনীর সদস্যদের ব্যক্তিসম্মত চলাকেরা আর তৎপরতায় সরব ও মুখ্যরিত।

সময় পেলেই সুবেদার খালেক চলে আসেন আমাদের পোষ্টে। আসলে এই মানবচিত্তের সঙ্গে আমার একটা নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। বাক্সারে তায়ে থাকতে দেখলেই বলেন, তায়ে থাকবেন না দানু। শরীরে আলসেমি এসে যাবে।

তারপর জুত করে বসে তিনি আমাদের সাথে চা খান, সিগারেট ফোঁকেন আর নানা প্রশ্ন তুলে কথাবার্তা বলে চলেন। তিনি এলেই একটা জমজমাট পরিবেশের সৃষ্টি হয় আমাদের বাশতলার এই পোষ্টে। লে. মাসুদও আসেন মাঝেমধ্যে। আমরাও তাঁর পোষ্টে গিয়ে কথাবার্তা আর গল্পগুজব করে আসি। এসবের ভেতরে যুদ্ধের বর্তমান প্রতিপক্ষতি নিয়েই কথা হয় বেশি। আর এইভাবে ব্যক্তিগত পর্যায়েও লে. মাসুদের সাথে আমাদের একটা নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। বন্ধুর মতো সেই সম্পর্ক। আমাদের দুটো ক্ষেত্রান্তির অফিসার ইনচার্জ হলেও তার মধ্যে কর্তস্তুত মনোভাব মোটাই নেই। সহজে বাভাবিক সৌজন্যমণ্ডিত মনোভাব নিয়ে আমরা যুদ্ধ বিষয়ে আলোচনা করি। পরিবেশলা করিং ফ্রন্ট পরিচালনার বিষয় ইত্যাদি নিয়ে। মাসুদের চা কফি দিয়ে আমাদের আপনার সুন্দর সুন্দর। মাঝে মাঝে হাবিলদার বারেক, হাবিলদার মেজের শাহাদত ও নায়েব সুবেদার সুসাদেক আসেন আড়তো দিতে। বারেক এলেই হৈচৈ করে মাতিয়ে রাখেন। শাহাদত কিমন আপন হয়ে গেছেন আমাদের। সময় পেলে ছুটে আসবেনই এখানে। যুদ্ধের টাটকা খবরের সাথে ফ্রন্টের নানা ধরনের ঘবর পাওয়া যায় তার কাছ থেকে। ডিসেম্বরের ১২ তারিখ পর্যন্ত আমাদের বীরগঞ্জ ফ্রন্ট মোটামুটি এ রকমেরই।

### একটি অনন্য রেকর্ড

খাবার এসেছে। ভাত-মাঙ্গস। লঙ্গরখানা এখন এগিয়ে এসেছে বীরগঞ্জ পর্যন্ত। ফ্রন্টের কিছুটা পেছনে একটা পরিত্যক্ত ধানকলের ভেতরে মোটামুটি স্থায়ীভাবেই এবার লঙ্গরখানা গড়ে তুলেছেন আমাদের লঙ্গর কমান্ডার। ভুলোক যে রকমের প্রতিকূল অবস্থার ভেতর দিয়ে তার চলমান লঙ্গরখানার সাহায্যে আমাদের আহার যুগিয়ে গেলেন, সজীব রাখলেন ফ্রন্টের যোদ্ধাদের, সে জন্য লঙ্গর কমান্ডার নায়েব সুবেদারকে ফ্রন্টের যোদ্ধাদ্বা চিরদিন শরণ রাখবে।

আমার বাক্সারের সম্মুখবর্তী দু'পাশের বাক্সার দুটোর একটাতে মতিয়ার, বাবলু ও মুর্মা, অন্যটায় মুসা ও হাবিব। পহর আলী ও সফিজউদ্দিনসহ ১৫/২০ জন ছেলের দলটি থাকে সামনের ট্রেণিংগুলোয়। মোতালেব, মধু, শরু আর মিনহাজসহ দলের অন্যরা রয়েছে মদীর তীরবর্তী ফ্রন্ট লাইনে।

সন্ধ্যার আগ মুহূর্তে খাবার আসে। প্রত্যেকটা বাক্সার-ট্রেন্সের ছেলেরা তাদের খাবার তুলে

নেয় কলাপাতায় ; প্রফুল্ল কলাপাতায় খাবার গহণের ব্যাপারটা সত্ত্বেই মজাদার, সুবিধেজনকও । খাবারশেষে পাতা ফেলে দিলেই মিটে যায় সবকিছু । তবে খাবার পানির সমস্যা হয় প্রায়ই । কিন্তু এখনে সেটা হবার জো নেই । আমাদের বর্তমান অবস্থানগত ব্যাপারটা মোটামুটি স্থায়ী হওয়ায় অন্ধবর্তী বসতিগুলো থেকে বালতি বালতি পানি চলে আসে ।

বাঙারের সম্মুখের চতুরে বকর মিয়া তার খাবারসহ পাতা নিয়ে বসেছে । সবাই একইভাবে বসেছে । খাবার শেষ করে কলাপাতা গুটিয়ে নেবার সময় পাতার নিচে শকনো কালো খড়খড়ে কী একটা জিনিস ঢোকে পড়ে । দেখে সহজেই চিনতে পারা যায়, মানুষের বিষ্ঠা । শুকিয়ে খড়খড়ে হয়ে আছে । তার ওপর কলার পাতা রেখে আহারপর্ব সেরে নিলাম আমি দিব্যি । মানুষের শকনো বিষ্ঠার ওপর পাতা রেখে খাবার খাচ্ছি ব্যাপারটা ভাবতেই কেমন লাগে । কিন্তু কী আর করা যাবে ! খেয়ে তো ফেলেছি । পিন্টুকে বলি, দেখোতো পিন্টু তোমরা পাতাটা উল্টে ।

খাওয়া হয়ে গিয়েছেলো ওরও । বলে সে, ক্যান ?

— দেখো না কিছু পাও নাকি ? আমার কথায়তো পিন্টু তার পাতা উল্টে নিচটা দেখতে থাকে সঙ্ক্ষার আধো অঙ্কুরের আনন্দ ভঙ্গিতে । তারপরেই তার বিশ্বযন্ত্রণা গলা, এতো দেখি মাইনষ্ট্যের হাগা মাহবুব ভাই ! শুকিয়া খড়খড়া নাগচে । আমরা তাহলে মাইনষ্ট্যের পায়খানার ওপর পাতা রাখিয়া খাইলো ?

আমি বলি, তাইতো মনে হয় । তবে শকনো, গক্ক নাই,

পিন্টু তখন দুষ্টমিভূত ঢোকে বকরের দিকে তারিষ্যে বলে, শালা, তৃষ্ণি হামারগুলাক কোন্ঠে খাওয়াইলেন ? বড়ো পবিত্র জিনিসের ওপর কী কর বকর মিয়া ?

বকর আর কি বলবে, একটুকু কাঁইকুই কল্পনা তার নিজস্ব ভঙ্গিতে ।

আমি বলি, ও কি করবে বলো ? অল্পে নেই, বেচারা দেখতে পায় নি । তাছাড়া এ ব্যাপারটা একটা রেকর্ড হয়ে থাকলো ।

— কীসের রেকর্ড ?

— এই যে তোমার ভাষায় প্রক্রিয়াজিনিসের ওপর পাতা রেখে খাবার খাওয়া । যুদ্ধের মধ্যে সবই চলে । এ নিয়ে ভেবে লাভ নেই ।

পিন্টু আর কিছু বলে না । বকরও বেঁচে যায় ।

রাত নেমে আসে শীতের প্রচণ্ডতা নিয়ে । পিন্টুকে নিয়ে আমি বের হই ফ্রন্টের রুটিন পরিদর্শনে ।

### মিত্র বাহিনীর হেডকোর্টারে

সকাল আটটার দিকে নির্দেশ আসে মিত্রবাহিনীর অস্থায়ী হেড কোয়ার্টারে যাবার জন্য । নির্দেশ অনুসারে মতিয়ার ও হাবিবসহ ৮ জনের একটা দল নিয়ে হাজির হই বীরগঞ্জ চেরিটেবল ডিসপেনসারিয়ের সম্মুখবর্তী চতুরে গড়ে ওঠা মিত্রবাহিনীর হেড কোয়ার্টারে । আমাদের সবার কাঁধেই ঝোলানো হতিয়ার । কিন্তু সেন্ট্রি আটকে দেয় । প্রথর দৃষ্টি মেলে ধরে সে আমাদের দিকে । তার সে দৃষ্টিতে প্রগাঢ় সন্দেহের ছাপ ।

— কাহা যায়েগা ?

— আন্দার মে ।

— কিউ ?

— হামকো ডাকা হ্যায় ।  
— কিউ বোলায়া হ্যায়?  
— নেহি জানতা ।  
— তব কোন যান্তাৎ?  
— তুমহারা অফিসার ।

তবু সেন্ট্রি ছাড়বার পাত্র নয় । তার কথার পিঠে কথা বলে চলেছি । ফলে বেচারার মধ্যে কিছুটা দ্বিধার সংশ্লার হ্যায় । তখন সে শেষ অন্ত প্রয়োগ করে । ডান্ডি কার্ড দেখাও ।

— নেহি হ্যায় ।  
— তব তো নেহি যানে সাকে গা ।

এবার যেনো জিতে যায় সে । ব্যাপারটা লক্ষ্য করা যায় কিছুটা তার মুখের হাসি থেকে ।

তখন তাকে বলি, ঠিক হ্যায়, হামলোগ ওয়াপাস যাতা হ্যায় । তুমহারা কর্নেল সাহাবকো বোলনা মুক্তিবাহিনী কা কমান্ডার মাহবুব আয়া থা । মাগার ওয়াপাস গিয়া । হাম ওয়ারলেস সেট মে কর্নেল সাব কো বলৈ গা, আপকা সেন্ট্রি হামকো আদ্দর ঘুচনে নেই দিয়া ।

মোক্ষম কাজ হ্যায় আমার শেষের কথাগুলোয় । সেন্ট্রি তব পেয়ে যায় । ‘ঠাইরিয়ে সাব’ বলে সে দৌড়ে যায় তাদের গার্ড পোস্টের দিকে । সেখান থেকে একজন সুবেদার বেরিয়ে আসেন । তিনি বলেন, আইয়ে, কর্নেল সাব ইন্ডেজার মেন্ট্রিয়ায় । এতোক্ষণ ধরে আমাদের আটকে রেখেছিলো যে সেন্ট্রি, সে বিগলিতভাবে এবার সেজতে থাকে, আইয়ে সাব, যাইয়ে সাব, বুড়া মাত মানিয়ে সাব... ।

সেন্ট্রি বেচারা এখন শক্ত মাটির একটা শেষ থেকে একেবারে নরম কাদা মাটি হয়ে যায় । অথচ মাত্র কিছুক্ষণ আগেও গোফে ঝুঁটিয়ে সে দারুণভাবে তার সেন্ট্রিপিলির ক্ষমতা দেখাইছিলো । আসলে মানুষের চেহারা ভীত ব্যভাবের কতো দ্রুত পরিবর্তন ঘটে । সময়ের ভিন্নতায় নানা সময় কতো না ভিন্ন ভিন্নভাবে তার অভিন্ন ! যেমন কিছুক্ষণ আগেও সে ছিলো একজন জাঁদরেল সেন্ট্রির ভূমিকায় । আর সামান্য সময়ের ব্যবধানে এখন সে একজন মেহমান অভ্যর্থনাকারী অতি বিমলী এক সুবোধ মানুষ মাত্র ।

যাক শেষ পর্যন্ত কর্নেল সাহেবের কাছে পৌছানো গেলো । ইনি সেই অফিসার, যাঁর বিদেশী তুলতুলে কুকুর ছানাটি পথ ভুলে হাজির হয়েছিলো সেদিন আমার বাস্তারে ।

— ইয়েস কমান্ডার, ওয়েলকাম । মুখে মোলায়েম মৃদু হাসি টেনে তিনি অভ্যর্থনা জানান । তাঁবুর সামনে পাতা একটা টেবিল । তার বিপরীতে ফোন্ডিং চেয়ারে বসে আছেন তিনি । তাঁকে ঘিরে বসে আছে আরো ক'জন অফিসার । টেবিলে পাতা একটা ফিল্ড ম্যাপ । বিভিন্ন জায়গায় লাল-নীল পেন্সিলের অংক দিয়ে দিয়ে শক্ত আর মিত্রবাহিনীর অবস্থান তাতে চিহ্নিত করা । একটা শূন্য চেয়ার দেখিয়ে তিনি বসতে বলেন তাতে । সঙ্গী ছেলেদের অদূরে ঘাসের ওপরে বসতে বলে আমি ভারতীয় অফিসারদের সঙ্গে আলোচনা চক্রে যোগ দিই ।

একজন মেজরের সঙ্গে যেতে হবে দশমাইলে । রেকি করার জন্য । দিনাজপুর এখনো শক্তরা ধরে রেখেছে কি না বোকা যাচ্ছে না । দশমাইল আসলে একটা তিন মাথার সংযোগস্থল । দিনাজপুর-সৈয়দপুর আর ঠাকুরগাঁওয়ের রাস্তা তিনিংক থেকে এসে মিলিত হয়েছে সেখানে । দশমাইলে শক্তর অবস্থান আছে কি না, সৈয়দপুর হয়ে দিনাজপুরে শক্তর কোনো মুভমেন্ট আছে কি না, কিংবা তাদের সামরিক যানবাহন ইত্যাদি চলাচল করছে কি

না, এসবই সরেজমিনে দেখেওনে আসতে হবে। কাজটা শুনই জরুরি। এরই ওপর নির্ভর করবে ভাতগার শক্রঘাটি বাইপাস করে দিনাজপুর-সৈয়দপুরমুখী অভিযান পরিচালনার ব্যাপারটা। মেজরের সাথে যাবে একটা সেকশন। সেই সাথে একজন জে.সি.ও এবং হাবিলদারও। আমরা তাদের গাইড করে নিয়ে যাবো।

সম্মুখ্যমুক্ত যিত্রবাহিনীকে বিভিন্ন সময়ে গাইড করে নিয়ে যাবার অভিজ্ঞতা আমাদের আগে থেকেই রয়েছে। তবে এ ধরনের কাজে প্রতিবারই যে প্রশ্নটির সম্মুখীন হতে হয়, আজও তাই করে কর্নেল সাহেব। বলেন, কমান্ডার তুম উয়ো এরিয়া তো পাহচানতা হ্যায়। সাকেগে না গাইড করনে হামরা ট্রাপস্কো?

আসলে এদিককার এলাকা আমি যোটেই চিনি না। কিন্তু গাইড করে যখন মেজরের দলকে নিয়ে যেতেই হবে তখন বলি, কোই প্রোত্ত্বে নেহি হোগা স্যার। উই কুড গাইড ইয়োর ট্রাপস্কো আপটু দশমাইল।

— থ্যাঙ্কস্, বলেন কর্নেল।

### পর্যবেক্ষণ ফিল্ম, দশমাইল

পনেরো থেকে বিশ মিনিটের ভেতরেই রঙনা দিই আমরা। এলাকাটা চিনি না। তবে মোটায়ুটি একটা ধারণা করে নিই। ভাতগা ব্রিজের ডানে নদীর ধার পিছে গেলে কান্তজীর সেই বিখ্যাত মন্দির পাওয়া যাবে। কান্তজীর মন্দিরের কিছুটা সামনে প্রতি পারলেই দশমাইলের একেবারে পেছনে নদীর এপারে পৌছানো যাবে। নদীর এপারে শুষ্টি নেই। কান্তজীর মন্দিরের দিকে শক্র না থাকলে কোনো সমস্যা নেই। বাঁয়ে নদীটা প্রতি ফসলের মাঠ আর বনবাদাড় পেরিয়ে ঠিকই পৌছে যাবো সিল্পিত ঠিকানায়।

বীরগঞ্জ পার হলেই বাঁয়ে বেশ ক্ষেত্রে একটা শালবাগান। লঘা লঘা শালগাছ। তার ডেতের দিয়ে রাস্তাটা চলে গেছে ক্ষেত্রে পর্যন্ত। শালবাগানের ফাঁকে ফাঁকে বিভিন্ন আর্মি ইউনিটের অবস্থানগত দৃশ্য সম্পর্কে চোখে পড়ে। শালবাগান পেরিয়ে ভাতগা ব্রিজের প্রায় আধ মাইল দূরত্বে পৌছে ডানাদিককার হাঁটা পথে নেমে যাই আমরা। এরি মধ্যে নানা কথাবার্তার ভেতর দিয়ে মেজরের সাথে সম্পর্কটা সহজ হয়ে উঠেছে। কাঁচা রাস্তায় নেমেই তিনি বলেন, কমান্ডার হামলোগ যা সাকেঙ্গে তো?

বলি, ইয়েস স্যার।

— ইধার কোই এনিমি পজিশন তো নেহি হ্যায় না?

— মালুম হোতা, হ্যায় নেই। চালিয়ে তো, দেখা যায় গা।

জাত সৈনিক এরা। শক্র এলাকার দিকে এগনোর সময় এরা সৈনিকের মতোই আচরণ আর সতর্কতা অবলম্বন করে। থেমে থেমে রেকি করে। সামনে শক্র কোনো অবস্থান আছে কি নেই, আমাদের ছেলেদের দিয়ে সেটা নিশ্চিত হবার পরই তারপর তারা এগোয়।

এভাবে ঘূরপথে প্রায় ষষ্ঠিটাইনেক চলবার পর কান্তজীর মন্দির পাওয়া যায়। কিন্তু ওটার বেশ দূর দিয়ে হেঁটে মন্দিরটাকে এড়িয়ে যাই আমরা। কে জানে শক্র সেখানে কোনো রকম ফাঁদ পেতে রেখেছে কি না। প্রায় আধ মাইল ঘূরপথে আমরা নদীর কাছাকাছি এসে দাঁড়াই। তারপর আরো কিছুটা এগন্তেই চোখে পড়ে দশমাইলের রাস্তার পার্শ্ববর্তী সেই উঁচু প্রাচীন বটগাছটা। আঙুল তুলে মেজরকে দশমাইলের অবস্থানটা দেখিয়ে দিই। এবার মাথা নিচু

করে ফসলের খেতের আড়াল নিয়ে কোমর বাঁকিয়ে আরো কিছুটা সামনে একটা সুবিধাজনক অবস্থানে পৌছে শোয়া অবস্থানে চলে যাই। দিনাজপুরমুখী পাকা সড়কটা এবার দেখা যায়। দেখা যায় দশমাইলের অবস্থান।

প্রায় ছফ্টবানেক এই অবস্থানে শুয়ে থাকি আমরা। এর মধ্যে মাত্র দুটো পাকিঙ্গানি আর্মি জিপকে ছুটে যেতে দেখা যায় পাকা সড়কের ওপর দিয়ে। একটা দিনাজপুরের দিক থেকে এসে চলে যায় সৈয়দপুরের দিকে। অন্যটা যায় দিনাজপুরের দিকে। রাস্তা একেবারে ঘাঁকা। কোনো সোক চলাচল নেই। দশমাইলের আশপাশে ছিটেকোটা দু'একজন দেখা যায়। কিন্তু তারা পাকিঙ্গানি সৈনিক কি না, দূর থেকে সেটা সঠিক ঠাহর করা যায় না। থাকতে পারে দশমাইলে পাকবাহিনীর ঘাঁটি, কিন্তু সেটা এমন বড়সড়ো কিছু নয় বলেই আপাতত মনে হয়।

যা দেখবার দেখে নেয়া হয়। এরপর দ্রুত ফিরবার পালা। তাই দ্রুত পা চালাই। বেলা তিনটার দিকে ফিরে আসি বীরগঞ্জে আমরা। এবার মেজর রিপোর্ট করবেন তার কর্ণেলের কাছে। আমাদের কাজ ফুরিয়েছে। মেজরের কাছ থেকে তাই বিদায় নিয়ে ফিরে আসি আমাদের বাঁশাতলার আস্তানায়।

বিকেলে আবার নির্দেশ আসে ১০ জনের একটা দল পাঠানোর জন্য। মিত্রবাহিনীর একটা ইউনিট যাবে দিনাজপুরের দিকে। একটা সূত্র থেকে খবর এসেছে, পাকবাহিনী দিনাজপুর ছেড়ে চলে গেছে। যদি তাই হয়ে থাকে, তাহলে তাহলে আমাদের দখলে নেয়া প্রয়োজন। আর যদি পাকবাহিনীর বৃক্ষসংখ্যক সদস্য দেখানে এখনো অবস্থান নিয়ে থাকে, তাহলে তাদের উৎখাত করে দিনাজপুর শহরের দক্ষিণ নেবে মিত্র ও মুক্তিবাহিনীর মৌখ দল। এ ভাবনা থেকেই মুক্তিবাহিনীর অন্যান্য প্রকল্পান্বিত থেকেও কিছুসংখ্যক যোদ্ধা চেয়ে পাঠানো হয়েছে। মৌখিক এ দলটা কলারোল থানা হয়ে দিনাজপুর শহরের উপকণ্ঠে প্রবেশ করবে এবং সুইহারী বাস্ট্যান্ড মিটিং এন্ড বে দিনাজপুরের দিকে।

বাসারতের নেতৃত্বে ১০ জন প্রতিটির করে তাদের রওনা করিয়ে দিই। খানসামাজুরী জেলা বোর্ডের রাস্তার পাশে আভিজ্ঞানির পজিশন আরো বেড়ে গেছে। মিলিটারি লারি ও ভ্যান ইত্যাদির পাশাপাশি বেসামরিক ট্রাকে করেও বিভিন্ন সাজ-সরঞ্জাম বয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। রাতের বেলা সেই পরিচিত ঘর্ষণ আওয়াজ তুলে ট্যাক্ষগুলোকে এগিয়ে যেতে দেখা যায় একটার পর একটা। সর্বাত্মক প্রস্তুতি নিয়ে এগুচ্ছে মিত্রবাহিনী। মনে মনে ভাবি, রাতের বেলায় ইই সম্ভবত নির্দেশ আসবে, এগিয়ে যাও খানসামা দখলের মুক্তের জন্য। এরকম একটা সম্ভাবনার কথা ভেবে শুয়ে থাকি বাস্তারে। কিন্তু রাতে আর আসে না কোনোরকম নির্দেশ। সারাদিনের শ্রান্তিতে রাজ্যের ঘূম নেমে আসে দু'চোখে। এক ঘুমেই কাবার হয়ে যায় রাত।

### জেনারেল মানেক শ'র আহ্বান : সারেন্ডার, সারেন্ডার কুইকলি

১৪ ডিসেম্বর সকালে রেডিওর খবর শোনার পর পকেট থেকে নেটুবই বের করে লেখা উন্মুক্ত করি। চোখ মেলে দেখি, সামনের রাস্তায় চলমান ট্রাকের মিছিল। প্রায় শতাধিক বেসামরিক ট্রাক। সবগুলো ভর্তি নানা সাজ-সরঞ্জামে। বড়ো বড়ো বোটও সেইসব ট্রাকের কোনো কোনোটির ওপর উল্টো করে রাখা। ভাসমান পটুন ব্রিজের জন্য বোট আর ইসব সরঞ্জাম নিয়ে যাওয়া হচ্ছে খানসামার দিকে। মিত্রবাহিনীর আজকের প্রস্তুতি আরো ব্যাপক।

রেডিওতে কিছুক্ষণ পরপরই জেনারেল মানেক শ'র উন্মুক্তি দিয়ে পাকসেনাদের

উদ্দেশে আঞ্চলিকপর্ণের আহবান জানানো হচ্ছে। জোর ওজব, সঙ্গম নৌবহরের এন্টারপ্রাইজ যুদ্ধজাহাজ বঙ্গোপসাগরের জলসীমার কাছাকাছি এসে গেছে। চাইনিজ সৈন্য এখনো এসে পৌছায় নি। এরকমই একটা অবস্থা এখন। আরো খবর, জেনারেল নিয়ন্ত্রীকে পাওয়া যাচ্ছে না। শোনা যাচ্ছে, জেনারেল রাও ফরমান আলীর কাছে দায়িত্ব দিয়ে তিনি পালিয়ে গেছেন পাকিস্তানে। জেনারেল মানেক শ' তাই সারেভারের আহবান জানাচ্ছেন রাও ফরমান আলীর প্রতি এবং বারবার।

আজ ১৪ ডিসেম্বর। ফ্রন্টের আজকের দিনটার এখনকার এই মুহূর্তগুলোকে জীবন্ত ধরে রাখবার জন্য নোটবইয়ের পাতায় লিখি :

১৪ই ডিসেম্বর, '৭১

"রেডিওতে বার বার জেনারেল ফরমান আলীর উদ্দেশে ইংশিয়ারি পাঠানো হচ্ছে Surrender করার জন্য। এবার নিয়ে এটা 3rd Message— Surrender Surrender quickly, you have no communication in air, sea or land....No chance of rescue....No need for the unnecessary casualties....So Surrender Surrender...। ইংরেজি, বাংলা, হিন্দি, উর্দু, পশ্চিম ও পাঞ্জাবি প্রত্তি ভাষায় একই ধরনের প্রচার করা হচ্ছে।

বগুড়ার পতন হয়েছে। ঢাকার উপকণ্ঠে মিয়ানমারী পৌছে গেছে। জয়দেবপুর ও তৈরেব ইত্যাদি জায়গাকে ঘিরে ফেলা হচ্ছে। মুহূর্ত গোলাবর্ষণ করা হচ্ছে ঢাকার বুকে।

গভর্নর মালেক তার কিছু উৎস্পন্দিত কর্মচারীসহ পদত্যাগ করেছেন। হোটেল ইন্টারকমিনেটাল আর হলিউড হাসপাতালকে নিরপেক্ষ এলাকা হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। International Red Cross-এর সহযোগিতাতেই এটা করা হয়েছে। গভর্নর মালেকও এখানে অশ্রয় নিয়েছেন। ঢাকার পতন অবশ্যভাবী, ঢাকায় যদিও প্রায় ২০,০০০ পাক সৈন্য রয়েছে।"

খানসামার পতন : সামনে সৈয়দপুর

নির্দেশ আসে ঝটপট তৈরি হয়ে নাও। খানসামা যেতে হবে। নির্দেশ মোতাবেক তাই ৩০ জনের একটা দল তৈরি করে নিই আধ ঘণ্টার ভেতরেই। ট্রাক এসে দাঁড়ায় রাস্তার পাশে। লাফিয়ে লাফিয়ে উঠে যায় ছেলেরা সেইসব ট্রাকের ওপর। আজ পিঁচু থাকে ফ্রন্টের চার্জে। একটু পরেই ধুলো উড়িয়ে ছুটে চলে ট্রাকগুলো সামনের দিকে। ট্রাকের সামনেকার কেবিনে বসে থেকে কামানের শব্দের জোরালো নিনাদে কেঁপে উঠতে হয় থেকে থেকে।

আমাদের আগে থেকেই আর্টিলারির মৰ্টারের আক্রমণ চলছে খানসামার ওপর। এক একটা পোস্ট থেকে ধমধম শব্দ তুলে উড়ে যায় বোম শেল খানসামার দিকে। মনে হয় যেনো আর্টিলারির ব্রাশফায়ার চলছে। এতো বেশিসংখ্যক আর্টিলারির সমাবেশ ঘটিয়েছে মিয়ানমারী যে ব্যাপারটা আগে থেকে আন্দোজই করা যায় নি। বিক্ষেপণের পর বিক্ষেপণ ঘটছে খানসামার ওপর। আর সেই বিক্ষেপণের মাত্রা এতো ব্যাপক আর প্রলয়করী যে, মনে হয়ে, গোটা খানসামায় কেয়ামতের ধূসহজ্জ শুরু হয়েছে। পাশাপাশি হেলিকপ্টার

উড়ছে ফটফট শব্দ তুলে, তবে বেশি উচু দিয়ে। ওটা অবশ্য ওপর থেকে আর্টিলারি ইউনিটগুলোর লক্ষ্যভোদ নিয়ন্ত্রণ করে চলেছে।

এ রকমেরই একটা দক্ষযজ্ঞ অবস্থার মধ্যে আমরা পৌছে যাই নদীর কাছাকাছি। ঢ্রাক থেকে বটপট নেমে দৌড়ে যাই এবং প্রথম দিনের জায়গায় যেয়ে পজিশন নিই।

প্রায় ঘন্টাখানেক সময় ধরে চলেছে আর্টিলারির এই নারকীয় আক্রমণ অভিযান। চোখের সামনে নদীর ওপারে খানসামার ওপর বিক্ষেপিত হয়েছে বোম শেল। একেবারে তুলোধুলো করে দেবার যোগাড় ওখানকার প্রতি ইক্ষিত মাটি। তারপর একসময় হঠাতে করেই থেমে যায় আর্টিলারির এই আক্রমণ ধারা। এবার আকাশপথে হঠাতে করে উদয় হয় দুটো বিমান। সেগুলো চক্র দেয়, আর ডাইভ দিয়ে দিয়ে আক্রমণ চালায় খানসামার সব সংগ্রহ শক্ত অবস্থানের ওপর।

নদীর এপারে প্রস্তুতি নিয়ে থাকা মিত্র ও মুক্তিবাহিনীকে তখন ফায়ার ওপেন করতে বলা হয়। নির্দেশ পেতেই নদীর এপারে অবস্থান নেয়া সমস্ত ফ্রন্ট যেনো জেগে উঠে। একযোগে নদীর ওপারে খানসামা বন্দর লক্ষ্য করে চলতে থাকে শত সহস্র অঙ্গের গোলাবৃষ্টি। সম্ভবত আমাদের ফ্রন্টের তরফ থেকে সর্বোচ্চ মাঝায় প্রচণ্ডতম ফায়ার পাওয়ার ব্যবহার করা হচ্ছে আজই প্রথম। এভাবে দশ পনেরো মিনিট গুলি চালানোর পর নির্দেশ আসে নদীর দিকে এগিয়ে যাবার। গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে এগিয়ে যায় সমস্ত ফ্রন্ট। প্লেন দুটো তখনো সমানে আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে। পাশাপাশি আমাদের ফ্রন্টের ছাতিয়ারগুলোও সচল থাকে। এই ফাঁকে মিত্রবাহিনীর ইঞ্জিনিয়ারিং কোরের দল তাঙ্গের কাজ শুরু করে দেয়। প্লেন দুটো আক্রমণ বন্ধ করে দিয়ে মাথার ওপর দিয়ে ফেলে চক্রের দিতে থাকে। একটুখনি দম নিয়ে আবার শুরু হয় সেই শত শত আর্টিলারি গোলাবর্ষণ। আকাশে প্লেনের কভার, পেছন থেকে ভেসে আসা শত শত রাউন্ড স্ক্যার্টজার মার্টার বোমার কভার, সেই সাথে নদীর প্রান্ত থেমে অবস্থান নেয়া পুরো ফ্রন্টের বিপুলবিহীন শুলিবর্ষণের কভার। এরই মধ্যে খুবই দ্রুততা আর পারদর্শিতার সাথে ইঞ্জিনিয়ার কোরের সদস্যরা ঘন্টাখানেকের সময়ের ব্যবধানে তাসমান পন্টুন সেতু তৈরির কাজ শেষ করে ফেলে।

সেতু তৈরির কাজ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে একটার পর একটা ট্যাঙ্ক নদী পার হয়ে যায়। ফলে অপ্লাকশের ভেতরেই দখল হয়ে যায় খানসামা। ট্যাঙ্কের সাথে সাথে এগিয়ে যায় মিত্রবাহিনী, মুক্তিবাহিনীর পদাতিক দল। আর এই রকম পরিস্থিতির মুখে পাকবাহিনীর বেঁচে থাকা অবশিষ্ট কাজন সদস্যের আমাদের কাছে আস্বাসমর্পণ করা ছাড়া আর কোনো উপায় থাকে না।

প্রথম ধরা পড়া ১১ জন পাকসেনাকে হাতের নাগালে পেয়ে তীব্র ঘৃণা আর ক্রোধে মুক্তিবাহিনীর একটা দল সরাসরি গুলি চালানোর পর বেয়নেট চার্জ করে মেরে ফেলে। এরপর ধরা পড়ে আরো ১৭ জন পাকসেনা। কিন্তু তাদেরকে আর মুক্তিবাহিনীর হাতে তুলে না দিয়ে মিত্রবাহিনী নিজেদের এখতিয়ারে রাখে। মিত্রবাহিনী ধারণা করে নেয় মুক্তিবাহিনীর হাতে পড়লে পাকসেনাদের তারা কোনোভাবেই বাঁচিয়ে রাখবে না। এটাই স্বাভাবিক। হিতীয় বিষয়ের সময় নার্থসি সৈন্যদের মতো যে ধরনের নৃশংস অত্যাচার আর হত্যার তাজে তারা এদেশের বুকে এতেদিন চালিয়েছে, মুক্তিবাহিনী তার প্রতিশোধ ধরা পড়া পাকসেনাদের ওপর নিতে চাইবেই। কিন্তু ধৃত পাকসেনা এখন প্রকৃতপক্ষে POW বা যুদ্ধবন্দি। মিত্রবাহিনীর

কেচ ম্যাপ-২৭

সমুদ্র মুক্ত

খনসামা ধানা ও দেশের ও সিন্দুরপুর অভিযান

১৩-১২-৭১—১৪-১২-৭১

সূর্য :

পূর্ব সক্ষেত্র

পাকবাহিনীর অবস্থান :

৫৫৫

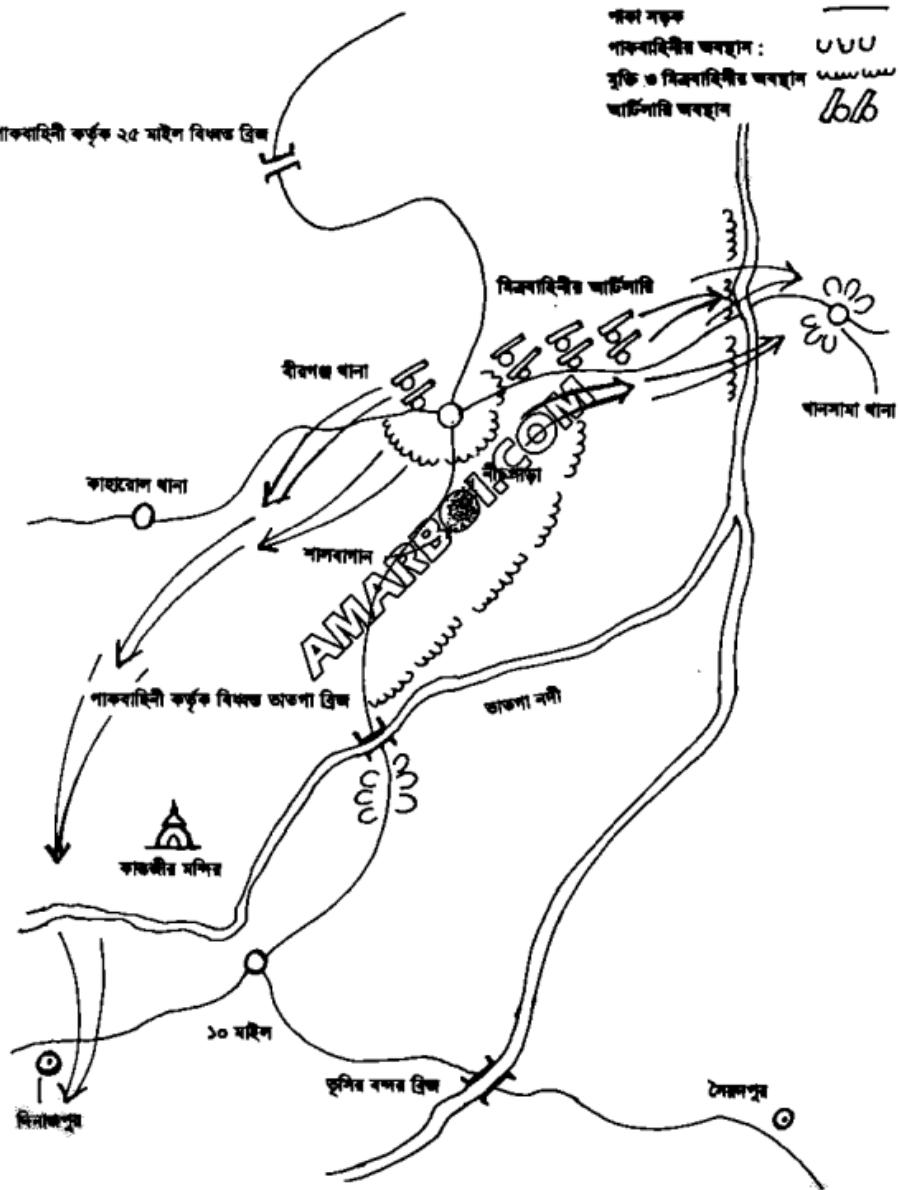
জুড়ি ও দিবলবাহিনীর অবস্থান

৩৩৩

আর্টিলারি অবস্থান

৬৬৬

পাকবাহিনী কর্তৃক ২৫ মাইল বিভক্ত ত্রিভু



কাছে প্রতিটি POW-এর মূল্য রয়েছে। এ জন্য ধরা পড়া বাদবাকি ১৭ জন পাকিস্তানকে তারা নিজেদের কড়া হেফাজতে নিয়ে রাখে।

খানসামা দখলের অর্থাৎ থানা হেড কোয়ার্টারে এমনিতেই এমন কোনো টাউনশিপ ছিলো না। আজকের গোলন্ডাজ এবং বিমান আক্রমণের ফলে সবকিছুই প্রায় ঠাঢ়িয়ে গেছে। মিত্রবাহিনী এই ফ্রন্টের পাক কমান্ডিং অফিসার মেজরাটিকেও গুরুতর আহত অবস্থায় ধরে ফেলে। জানা যায়, এ হচ্ছে সেই কুখ্যাত মেজর, সে অমরখানা আর জগদলহাটেও পাকবাহিনীর কমান্ডিং অফিসার ছিলো। জগদলহাটের পুরো কোশ্পানি অর্থাৎ প্রায় ১৫০ জন নিয়মিত সৈনিকের মধ্যে বেঁচে আছে এই ধরা পড়া মাত্র ১৭ জন। বাকি সবাই মারা গেছে জগদলহাট থেকে এখানে পৌছুতে পৌছুতে। তাদের দলটা এই খানসামায় এসে সর্বশেষ প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলো। আজ তাও শেষ হয় গেলো। আমরা একদিন তাদের পিটিয়ে এনে ধরার শপথ নিয়েছিলাম। আজকের যুদ্ধের মাধ্যমে তা পূর্ণ হয়।

### ফিল্ড টেলিফোনে সৈয়দপুর ব্রিগেড

খানসামা দখলের সঙ্গে পাকবাহিনীর ফিল্ড টেলিফোনের সাথে মিত্রবাহিনীর টেলিফোনের সংযোগ স্থাপন করে ফেলে তাদের সুদৃঢ় সিগনালম্যানরা। খানসামা থেকে সৈয়দপুর ক্যান্টনমেন্টের সঙ্গে পাকবাহিনীর সরাসরি যোগাযোগ ছিলো এই ফিল্ড টেলিফোনের মাধ্যমেই। এখনো সেটা অক্ষুণ্ণ। বোমাঘূর্ণের ফলে এই সংযোগ লাইনের কিছু অংশ নষ্ট হয়ে গেলেও দ্রুতই তা মেরামত করে ফেলেছে সিগনালম্যানরা।

তারপর খানসামা দখলের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন মিত্রবাহিনীর যে কর্নেল, তিনি ফিল্ড টেলিফোন লাইনের মাধ্যমে সৈয়দপুর ক্যান্টনমেন্টের কমান্ডারের সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করেন সরাসরি। দু'একবার 'হ্যালো', 'হ্যালো' বলতেই তিনি পেয়ে যান সেই সংযোগ। পেতেই মিত্রবাহিনীর কর্নেল প্রক্রিয়াগতে কমান্ডারকে বলেন, কিছুক্ষণ আগেই আমরা খানসামা দখল করে নিয়েছি। তামার জীবিত লোকেরা এখন আমাদের হাতে POW হিসেবে বন্দি। এখন তোমার পালা। তুমি কখন, কবে, কোথায় স্যারেভার করবে, দ্রুত জানাবে। না হলে এবার আমরা তোমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বো...।

আমার কাছে সত্যিই এ এক অবিশ্বাস্য ব্যাপার বলেই মনে হয়। পাকবাহিনীর ঘাঁটি দখল করার পর তাদেরই ফিল্ড টেলিফোনের মাধ্যমে তাদেরই গ্যারিসন কমান্ডারকে বলা হচ্ছে কি না সারেভার করো। না হলে ত্যক্ত বিপদ। তিনি সারেভার করলে সৈয়দপুর, দিনাজপুর, নীলফামারী আর রংপুর এসব জায়গা যুদ্ধ করে আর দখলে নিতে হয় না। তাতে করে বৃথা রক্তক্ষয়ের ব্যাপারটিকেও এড়ানো যাবে। এজন্যই মিত্রবাহিনীর কর্নেলের পাকিস্তানি অধিনায়কদের প্রতি এই আহমান। কিন্তু ওপাশ থেকে সৈয়দপুরের অধিনায়ক সারেভার করতে রাজি হন না। আর যদি তেমন কিছু করতেই হয়, তবে ঢাকার সাথে আলোচনা করার পরই করবেন বলে তিনি জানান। এজন্যই তিনি সময়ও চান।

খানসামা থানা হেড কোয়ার্টার জয় করা হলো অবশ্যে। কিন্তু করলে কি হবে, এখানকার সবকিছুই বলতে গেলে ধৰ্মস্তুপে পরিষ্কত। প্রায় সাত সাতটি দিন পর আজ ব্রেক ফ্রি করা গেছে শক্র অবস্থান। এখন খানসামা ধরে সৈয়দপুরের দিকে এগনো যেতে পারে ভাতগা বাইপাস করে। অবশ্য ব্যাপারটা এখন পুরোপুরি নির্ভর করবে সৈয়দপুরের পাকবাহিনীর

সারেভার করা-না-করার ওপর। এমনিতেই বিহারি অধ্যুষিত সৈয়দপুরের সব বিহারিই পাকিস্তানের ঘোর সমর্থক। পাকিস্তান টিকিয়ে রাখবার জন্য সৈয়দপুরকে রাজধানী করে বওড়া, রংপুর আর দিনাজপুরকে নিয়ে 'নিউ বিহার' নামে একটা নতুন প্রদেশ দাবি করে বসেছিলো তারা। তাই ধারণা করতে কষ্ট হয় না শেখদিন পর্যন্ত তারা মরিয়া হয়ে চাইবে পাকিস্তান টিকে থাকুক। এছাড়া সৈয়দপুর ক্যান্টনমেন্ট এখনো অস্বীকৃত শক্তিশালী। তাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাও খুবই মজবুত। তারা যদি সারেভার না করে তাহলে আবার প্রবল এক যুদ্ধের ভেতর দিয়ে আমাদের দখলে নিতে হবে সৈয়দপুরকে। আর সেটা করতে গোলে যুদ্ধ চলবে হয়তো আরো বেশ কিছুদিন। সঠিক কতোদিন সেই যুদ্ধ চলবে ভবিষ্যতই বলবে সে কথা।

বিকেলে ফিরে আসি আবার নিচপাড়ার অবস্থানে। চোখের সামনে এখনো যুদ্ধের জাতুব দৃশ্যাবলি ভাসতে থাকে।

শেন্টারে ফিরেই ঘাসের ওপর চিংপাত শয়ে থাকি। রেডিওর খবর বলে, আজ তৃতীয়বারের মতো যুদ্ধবিরতিতে ভেটো দিয়েছে সোভিয়েত ইউনিয়ন। কী দারক্ষ ব্যাপার! যুদ্ধ থামাবার জন্য একদিকে পাকিস্তানের সমর্থক জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদভুক্ত দেশগুলোর ভোট প্রদান, অন্যদিকে যুদ্ধ চালিয়ে যাবার পক্ষে সোভিয়েত ইউনিয়নের ভেটো প্রদান। ভেটো ক্ষমতা প্রয়োগ করে সোভিয়েত ইউনিয়ন ঠিকিয়ে রেখেছে জাতিসংঘকে। পাশাপাশি ভারতকে বলছে, চালিয়ে যাও যুদ্ধ। বাংলাদেশ জরুরী না করা পর্যন্ত থেমো না। সোভিয়েত ইউনিয়নের এই ভূমিকার জন্য কৃতজ্ঞতার জন্ম যুজে পাওয়া যায় না। নোটবই বের করে ১৪ তারিখের ডায়েরির পাতায় লিখি :

"এদিকে আমাদের সামনের শক্ত স্তুচি খানসামার পতন হয়েছে। একযোগে Plane, ট্যাঙ্ক সহকারে আক্রমণ করানো হয়েছিলো খানসামার ওপর।

America 3rd Time- এর মতো যুদ্ধবিরতির চেষ্টা করলে রাশিয়া ভেটো প্রদান করে। America-র সমর্থকদের চেষ্টা ব্যর্থ হলে তারা এখন ৭ম নৌবহর পাঠাবার ইমকি দিয়েছে।"

## দিনাজপুর অভিযান

খুব খারাপ সংবাদ আসে।

বাসারত একেবারে হাউহাউ করে কেঁদে ওঠে। অন্যরাও কাঁদে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। দিনাজপুর অভিযানে গিয়েছিলো তারা যিত্বাহিনীর একটা দলের সাথে। মোট ১০ জনের একটা দল। তার ভেতর থেকে ফিরে এসেছে ৮ জন। ২ জন মিসিং। একেবারে ভেঙেপড়া অবস্থা সবার। বোঝাই যায় একটা প্রচণ্ড ঝড় বয়ে গেছে তাদের ওপর দিয়ে। দুটো দিনের অভিযান ছেলেগুলোকে একেবারে বিধ্বন্ত করে ছেড়েছে। মিসিং দু'জন আর তাদের ভাগ্য সম্পর্কে এরা কিছুই বলতে পারছে না। মারা গেছে, না যুদ্ধবন্দি হয়েছে, নাকি আহত হয়ে কোথাও পড়ে আছে, এরকম প্রশ্নের কোনো রকম পরিষ্কার জবাব দিতে পারে না তারা।

ওদের সবাইকে বসাই। বকরকে কিছু খাবার আর চায়ের ব্যবস্থা করতে বলি। বাঁশবাগানের নিচে রাতের আধা ঘণ্টার নেমে এসেছে ততোক্ষণে। কুয়াশার ঝোয়াটে চাদর ঘিরে ধরেছে চারদিক। বাঙ্কার থেকে কম্বল বের করে ওদের শরীরে মুড়িয়ে দিই স্থলে।

কেঁদেকেটে অনেকটা হালকা হয়ে উঠেছে, কিছুটা সামলেও উঠেছে সহযোগ্য হারানোর

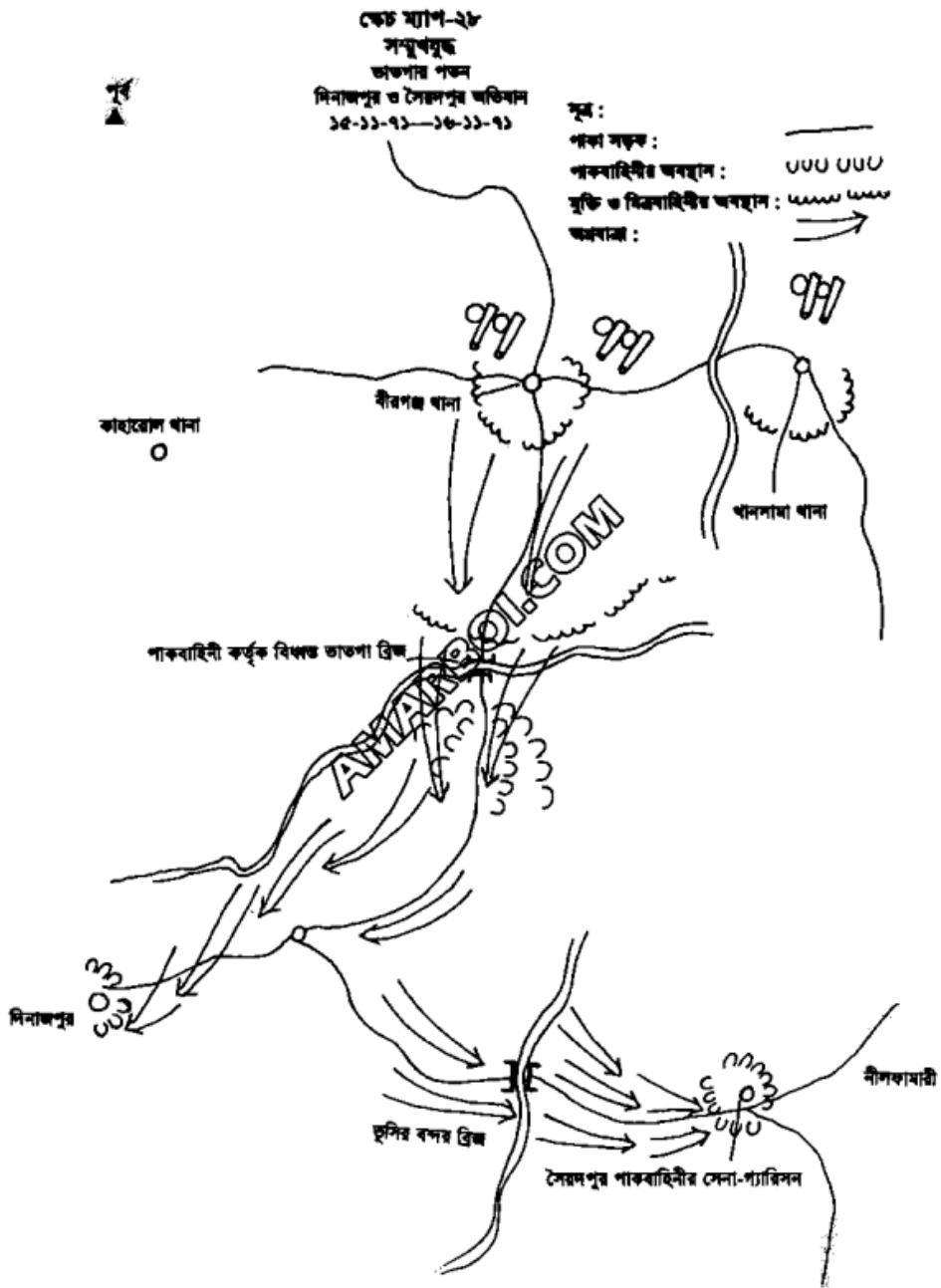
শোক বা দুঃখ। ওদের প্রত্যেকের চেহারায় প্রবল একটা ঘোর লাগার ছাপ ছিলো, কেটে গেছে সেটাও অনেকখানি। দিনাজপুর অভিযানের ভয়াবহ অভিজ্ঞতার কথা বলতে শুরু করে এবার তারা। আমরা ওদের ঘিরে ধরে শুনি সেসব কথা।

তাদের কাছ থেকে দিনাজপুর অভিযানের যে বিবরণ পাওয়া যায়, সেটা অনেকটা এরকমের :

গত পরাণ বিকেলে বীরগঞ্জ থেকে কাহারোল থানার পথে রওনা দেয় তারা। কাহারোল শক্রমুক্ত হয়ে গিয়েছিলো আগেই। বীরগঞ্জ আমাদের দখলে আসার সাথে সাথে কাহারোল থানা সদর থেকে শক্রবাহিনী ঢেলে গেছে। বলা যায় ফাঁকা অবস্থায় কাহারোলকে দখলে নেয়া হয়। এই অভিযান পরিকল্পনা আসলে করা হয়েছিলো দিনাজপুরের জন্য। দিনাজপুরে শক্র থাকতে পারে, নাও পারে, এরকম একটা সজ্ঞবন্ধন থেকে মিশ্রবাহিনীর এক কোশ্চানি এবং মুক্তিবাহিনীর এক প্লাটুন যোদ্ধার সমন্বয়ে গড়া দলটি রওনা দিয়েছিলো দিনাজপুর শহরে দোকার লক্ষ্য নিয়ে। দিনাজপুরে যদি এখন শক্র থেকেও থাকে, তবে বর্তমানে তাদের অবস্থা নিশ্চিতই দুর্বল এবং তাদের নেতৃত্ব শক্তিও নষ্ট হয়ে পড়েছে, এরকম ভাবনা থেকে যুদ্ধের পুরো সাজে সজ্জিত হয়ে রওনা দেয়া দলটা প্রয়োজনে তাদের সাথে লড়তে পারবে, সহজেই কাবু করে ফেলতে পারবে শক্রপক্ষকে। তবে তাদের চূড়ান্ত ত্রিফিং-এর সময় বলা হয়েছিলো, দিনাজপুরে চুক্তির মতো অবস্থা হলে তবেই তারা সেখানে চুক্তে। শক্র শক্তিশালী হচ্ছে এই ছোট দল নিয়ে আপাতত দিনাজপুর দখল নেয়ার চেষ্টা করার দরকার নেই এবং যোহেতু তাদের সাপোর্ট কভার কিছুই থাকছে না, সে কারণে শুধু দিনাজপুর-দশমাইল সুজ্ঞ সংযোগ কাট করে দিয়ে সৈয়দপুরের কাছ থেকে দিনাজপুরকে তারা কেবল বিচ্ছিন্ন করে দেবলে। পরবর্তী আয়কশন পরিচালিত হবে পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করে। হেড কোয়ার্টার্স সিঙ্কেন্ড জানাবে সেটের সাহায্যে। যাই হোক কাহারোল পর্যন্ত নির্বিস্তুই পৌছানো যাবে, তারপর এখান থেকে শুরু হয় মূল অভিযান। দুটো গরুগাড়ি নিতে হয়েছে তারি মেশিনগানে আর ও ইঞ্জিন মর্টারসহ গোলাবারুদের বাক্সগুলো বহন করার জন্য। কাঁচা রাস্তা, তাঁকি পুরু ভাঙাচোরা। গোলাবারুদ বহনকারী গরুগাড়ি দুটোকে মাঝখানে রেখে এগিয়ে চলে যৌথবাহিনী। মাঝে মাঝে সামান্য বিরতি দিয়ে দিয়ে রাতভর চলে এই অঘ্যাতা। শেষরাতের দিকে ভাতগা নদী পার হয় তারা। খুব সকালে চেলেল গাজীর মাজারের পার্শ্ববর্তী পাকা সড়কের ওপর পৌছে যায় দলটি। পাকা সড়ক একেবারে ফাঁকা। মানুষজনের কোনোরকম চলাচল নেই। নেই কোনো যানবাহনেরও চলাচল। এখানে প্রায় আধুনিক মতোন অবস্থান নেয়ার পর দলের কমাত্মাৰ সিঙ্কেন্ড নেন দিনাজপুর শহরমুখী অভিযানের। অবস্থাদ্বারে মনে হয়, দিনাজপুর শহর থেকে সরে পড়েছে পাকবাহিনী। এখন শূন্য দিনাজপুর শহর কেবল দখলে নেবার পালা। যেজন সাহেব হেড কোয়ার্টারে জানিয়ে দেন তাঁর এই সিঙ্কেন্ডের কথা। তারপর দিনাজপুর শহরের দিকে এগিয়ে চলে পুরো দলটি পাকা সড়কের ওপর দিয়েই। সাথে গোলাবারুদ বহনকারী সেই গরুগাড়ি দুটো। মোটামুটি চ্যাঙ্গদোলা করে কষ্টকরভাবেই নদী পার করা হয়েছে গাড়ি দুটোকে।

### ম্যাসাকার

পাকা সড়কের ওপর দিয়ে এগিয়ে চলে যৌথবাহিনী। রাস্তায় কোনো লোকজন নেই। আশপাশে জীবনের কোনো সাড়া নেই। সবকিছু যেনো শান্ত চৃপচাপ। শীতের সূর্য লাফিয়ে



লাফিয়ে ওপরে ওঠে । বাধাইনভাবে দলটি সুইহারী বাসস্ট্যান্ড পর্যন্ত পৌছে যায় । শহরমতো এলাকা । একেবারে থমথমে, বাড়িয়ের মানুষজন আছে কি নেই, বোৰা যায় না । যোদ্ধাদের সবার মধ্যে দারুণ এক অনুভূতি । দিনাজপুর শহরে চুক্তে যাচ্ছে তারা । এই তো দিনাজপুর শহর দখলে এসে যাচ্ছে তাদের । আর অশ্লকগের ভেতরেই ।

কিন্তু হঠাতে করেই মৃত্যুমান যমদূতের মতো সামনে এবং পেছন দিক থেকে আবির্ভূত হয় দুটো ছোট আকারের ট্যাঙ্ক । কিছু বুঝে উঠবার অবকাশ না দিয়েই ট্যাঙ্ক দুটো থেকে শুরু হয় অবিরাম গুলিবর্ষণ । চরমভাবে ফাঁদে পড়ার মতো অবস্থা যৌথবাহিনীর দলটির । আকস্মিক এই আক্রমণের মুখে প্রস্তুতি গ্রহণের আগেই বাড়ের আঘাতে পড়া কলাগাছের মতো পড়ে যেতে থাকে যোদ্ধারা । সে এক অভাবনীয় অবস্থা, মর্মাণ্ডিক দৃশ্য । ঘাপটি মেরে থাকা একদল পাকিস্তানি সেনা বেরিয়ে আসে তারপর । তারাও ঝাঁপিয়ে পড়ে ছত্রভঙ্গ যৌথবাহিনীর ওপর । গোলাগুলির পাশাপাশি কোথাও কোথাও হাতাহাতি যুদ্ধও শুরু হয়ে যায় । বাসারতের চোখের সামনেই বলিষ্ঠ দেহী একজন নেপালি হাবিদালার লুটিয়ে পড়ে পাকসেনাদের গুলির আঘাতে । অসংবেদ সাহসী সৈনিক ছিলো হাবিদালারটি । পাকিস্তানি ট্যাঙ্ক দুটোর ফাঁদে পড়া যৌথবাহিনীর সদস্যদের অনেকেই তখন রাস্তার পাশে লুকিয়ে পড়েছে, নয়তো বাড়িয়ের আড়ালে পজিশন নিয়ে লড়ে যাচ্ছে । অহবর্তী দলের পেছনে থাকা অংশটি ট্যাক্রের ফাঁদে পড়ে নি । তারা সাথে সাথে রাস্তার দু'পাশে পজিশন নিয়ে কভার ফায়ার দিতে প্রস্তুত প্রবলভাবে । সৃষ্টি হয় একটা অরাজক অবস্থার । কে কোন্দিকে গুলি করছে, তা বুঝায় কোনো উপায় থাকে না । আয় ঘটাখানেক সময় ধরে চলে এই রকম অবস্থা । অবস্থা ইতিমধ্যে ক্ষতি যা হবার, সেটা হয়ে গেছে । যৌথবাহিনীর বেঁচে থাকা সদস্যরা পিছিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত নেন । দলের প্রায় অর্ধেক সদস্যকে হারিয়ে ছত্রভঙ্গ অবস্থায় পাছিয়ে আসে দলটি অতি দ্রুত । দিনাজপুর দখল অভিযান অবশেষে ভাবেই হলো প্রত্যক্ষ । দিনাজপুর শহরে এসেও সেটা দখলে নেয়া গেলো না । ট্যাঙ্ক ইত্যাদি নিয়ে পাকসেনারা যে এখনো দিনাজপুরে রয়ে গেছে, সে কথা হ্রপ্তেও তাবা যায় নি । দলের অনেক সদস্যকে হারিয়ে তাই একরাশ ব্যাথা বুকে নিয়ে বিক্রিত দলটি ফিরে আসে বীরগঞ্জে অবশেষে । বাসারতের প্রাণে বেঁচে ফিরে এসেছে কোনোমতে । কিন্তু তার অন্য দু'জন সহযোদ্ধার ভাগ্যে কী ঘটেছে, কে জানে?

বাসারতের কাছ থেকে দিনাজপুর অভিযানের এই মর্মাণ্ডিক ও দৃঢ়বজ্ঞনক পরিণতির কথা শনে একেবারে বাকরুক্ষ হয়ে যাওয়ার মতো অবস্থা হয় আমাদের । মুহূর্তের ভেতরে একটা প্রবল প্রতিশোধ স্পৃহা আয় উন্নত করে তোলে । পিন্টুকে নিয়ে দ্রুত চলে যাই মিত্রবাহিনীর সদর দফতরে । সেখানকার পরিস্থিতি ও চরম বেদনাবিধুর । ফিরে আসা সৈনিকেরা তাদের হারিয়ে যাওয়া সহযোদ্ধাদের জন্য আহাজারিতে মন্ত । অফিসারদের সবাই নিশ্চূপ পাথর হয়ে গেছেন যেনো । একজন কর্নেল এরি মাঝে চিৎকার করে শপথ বাক্যের মতো বলে ওঠেন, উই শ্যাল টেইক রিভেঞ্জ... ।

রাতের মধ্যেই দিনাজপুরে সর্বাঞ্চক অভিযান চালানোর প্রস্তুতি শুরু হয়ে যায় । খানসামার কায়দায় ভাতগা দখল করে ভাসমান পটুন ব্রিজ দিয়ে ট্যাঙ্ক নিয়ে দশমাইল-সৈয়দপুরের দিকে এগিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত হয় । ট্যাঙ্ক বহরের কমাত্তার তাদের সৈয়দপুর পর্যন্ত গাইড করার জন্য মুক্তিবাহিনীর একটা সেকশনকে রিকুইজিশন দেন । ক্যাপ্টেন

নির্দেশ দেন আমার কোম্পানি থেকেই সেই দলটি পাঠাতে।

বাবলু, মতিয়ার ও একরামুলসহ মোট ১২ জনের একটা দল তৈরি করে তাদের নিয়ে হাজির হই ট্যাঙ্ক কমাত্তার লে. কর্নেলের সামনে। তিনি বলেন, মেহবুব দিনাজপুর কাস্যাড ইনসিডেন্টকা বাবে কৃত শুনা হ্যায়।

— ইয়েস স্যার। উই লট টু অব আওয়ার বয়েজ দেয়ার।

— ইট্স রিমেলি এ স্যাড ইনসিডেন্ট বাট দে উইল বি পানিশ্বড়। উই শ্যাল টিচ দেম এ গুড লেসন। উই আর গোয়িং টু গিড দেম এ ফাইনাল ওয়া...।

একরামুল সৈয়দপুরের ছেলে। সে এই এলাকার রাস্তাঘাট ভালো করে চেনে। তাকে দলনেতা বানিয়ে কর্নেল সাহেবের কাছে দলটাকে বুঝিয়ে দিয়ে ফিরে আসি বাঁশতলার আস্তানায়। মিত্রবাহিনী দারুণ প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে ভাতগাতে ব্রেক থ্রি করার জন্য। দিনাজপুর দখলের সব ধরনের প্রস্তুতিও প্রায় সম্পন্ন। সবকিছু দেখেননে বিষাদের ভেতরেও মনে জেগে উঠে চাঙ্গা হয়ে উঠবার মতো একটা সুন্দর অনুভূতি।

### অস্ত্রির আর দম বক্ষ করা সময়

ডিসেম্বরের ১৫ তারিখে ফ্রন্টজুড়ে দারুণ এক অস্ত্রিতা বিরাজ করে। সবার মনে কী হয়, কী হয়, এ ধরনের একটা উথলপাতাল করা ভাব। খানসাম ফিল্ডেল এসে গেছে। সৈয়দপুরকে সারেন্ডার করতে বলা হচ্ছে, কিন্তু তাদের তরফ থেকে ই-সূচক কোনো জবাব এখনো পাওয়া যায়নি। দিনাজপুর শহরের পতন ঘটেছে। তিনি যুদ্ধে পাকবাহিনী দিনাজপুর শহর ছেড়ে যে চলে গেছে, এ ধরনের খবরও এরি মনে পাওয়া গেছে।

এখন ভাতগাঁ দিয়ে এগুবার সর্বাস্তুক ঘটচৰ্ট চালাছে মিত্রবাহিনী। ওদিকে আবার খবর পাওয়া গেছে, সাব-সেন্টার কমাত্তার ফ্রন্টে লেফটেন্যান্ট ইকবাল মিত্রবাহিনীকে নিয়ে মীলফামারীর কাছাকাছি এসে প্রেরণ কৰিছে। দিনাজপুরের ফুলবাড়ী দিয়ে মিত্রবাহিনীর একটা শক্তিশালী দল রংপুর-বগুড়া পথে সড়ক দখলে নিয়ে দ্রুত চলে এসেছে রংপুরের উপকর্ত দমদমায়। পাকবাহিনী ঘাটট নদীর ওপর দমদমা ব্রিজটা ভেঙে দিয়ে মিত্রবাহিনীকে সেখানে আটকে রেখেছে কোনোভাবে। ওদিকে মেজর নওয়াজেশও কুড়িয়াম হয়ে এগিয়ে আসছেন রংপুরের দিকে। ভেবে নিতে কষ্ট হয় না, পাকবাহিনী মুক্তি ও মিত্রবাহিনী দ্বারা ঘেরাও হয়ে গেছে সৈয়দপুর আর রংপুরে। তাদের পালাবার আর কোনো রুট নেই। তারপরও সারেন্ডার করছে না তারা। পরিবর্তে সৈয়দপুর আর রংপুর শহরকে রক্ষা করবার জন্য তারা শক্তিশালী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে।

সপ্তম নৌবহরের জাহাজ এক্টারপ্রাইজ বঙ্গোপসাগরের সীমানায় এসে গেছে, এরকম খবরে সারা ফ্রন্টে দারুণ দুর্ঘট্য আর উৎকষ্ট। খবর পাই, ঢাকার একেবারে উপকর্ত পৌছে গেছে মিত্রবাহিনী। ভৈরব হয়ে ডেমরায় আর টাঙ্গাইল হয়ে সাভার দিয়ে মিরপুরের কাছাকাছি পৌছে গেছে মিত্রবাহিনীর দুটো কলাম। ঢাকা শহর বর্তমানে কামানের আওতায় এসে গেছে। রেডিওর সম্প্রচারে সারাদেশে এখন শুধু মিত্র আর মুক্তিবাহিনীর অধ্যাত্মার খবর। ওয়েস্টার্ন ফ্রন্টেও মনোয়ার তাবি নদীতে এবং বিভিন্ন ফ্রন্টে যোরতর ট্যাঙ্ক যুদ্ধের খবর পাওয়া যায় রেডিও মারফতই। এর সাথে বারবার প্রচারিত হতে থাকে জেনারেল রাও ফরমান আলীর উদ্দেশে জেনারেল মানেক শ'র আস্তসমর্পণের আহ্বান। কিন্তু পাকবাহিনীর

পক্ষ থেকে আত্মসমর্পণের কোনোরকম আভাস-ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। সৈয়দপুর  
ক্যাটেনমেন্টের কম্বারও আত্মসমর্পণ করবে বলে মনে হয় না।

সপ্তম নৌবহর আসছে আর সৈয়দপুর দখলের প্রচণ্ডতম যুদ্ধে আমাদের অংশ নিতে হবে, এ  
ধরনের সংজ্ঞা, আশঙ্কা আর অস্তিরতার ভেতর দিয়ে সহজ পেরুতে থাকে। এর মধ্যেই  
আমাদের পোষ্ট রাস্তার ডানে সরিয়ে নিতে হয়। ঘন বাঁশবাড়ের পাশে একটা ছেটো  
আমগাছের তলায় দিনমান খেটে বকর তার সৈনিক জীবনের শ্রেষ্ঠতম বাস্তার তৈরি করে  
ফেলে। বাস্কারটির অবস্থান নদীর বাঁকের কাছাকাছি, লে. মাসুদ আর সুবেদার খালেকের  
বাস্তার থেকে যাত্র ৩০/৪০ গজ সামনে।

এর মধ্যে মিত্রাহিমীর সদর দফতর ঘূরে আসা হয়েছে একবার। একটা দারুণ ব্যস্তসমস্ত  
আর সরগরম অবস্থা তাদের সদর দফতর জুড়ে। কর্নেল সাহেব পিন্টু আর আমাকে দেখেই  
ডাক দেন। তিনি তাঁরুর সামনে বসা ফুল ইউনিফর্মে। সেই ছটফটে চক্ষু বরফ সাদা রোমশ  
কুকুর ছানাটি তাঁর কোলে বসা। আমাদের দেখেই কাঁই কুই করে উঠে এটা আগের দিনের  
মতো। কর্নেল ব্যাপারটা লক্ষ্য করে হাসিমুরে বলেন, তুমকে পাহচান লিয়া। তারপর বলেন,  
হোয়াট ইজ দা লেটেট ডেভেলপমেন্ট অব ওয়ার? হ্যাত ইউ গট এনি আইডিয়া?

বলি, ইয়েস স্যার। ঢাকা ইজ সারাউডেড বাই এলায়েড ফোর্সেস। নাউ ঢাকা ইজ  
আভার দা রেঞ্জ অব আওয়ার গান ফাহ্যার।

— শুড় বলে কর্নেল সন্তোষের হাসি হাসেন। আমরা ফিরে আসি আবার আমাদের  
নিচপাড়া গ্রামের আমগাছ তলার সেই নতুন আশ্রয়ে।

না, সামনের ডেডলক আর কাটে না। শুক্র সুরেভার করে না। একটা চাপা অস্তিরতা  
আর দম বক্ষ করা অবস্থি নিয়ে কেটে যাব— এর ১৫ ডিসেম্বরের দিনটি।

## যুদ্ধবন্দি

আজ ১৬ ডিসেম্বর।

একেবারে সকালবেলাতে আমার বাস্তারে এসে হাজির হন হাবিলদার মেজর শাহাদাত।  
পরনে তার থাকি শার্ট আর লুঙ্গি। তার মুখের কালো দাঢ়ি প্রায় বৃকঅবধি নেমে এসেছে।  
এসেই বলেন, দাদু, চলেন যুদ্ধবন্দি দেখে আসি। খানসামায় ধরা পড়া খানসেনাদের  
বীরগঞ্জে নিয়ে এসেছে।

তাকে বলি, দেখার কি আছে বলেন? খানসামা দখলের যুদ্ধে আমাদের হাতেই তো ধরা  
পড়লো ওরা।

— আমি তো দেখি নাই। এতোদিন হারামজাদাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলাম। চোখে তো  
দেখি নাই কোনোদিন। আমাদের সেই চরম শক্তিদের দেখতে না পাওয়া পর্যন্ত শাস্তি  
পাইতেছি না মনের মইধ্যে। এতোদিন যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলাম সেই শক্তিদের একবারও  
দেখবো না, এটা হ্যাঁ নাকি দাদু! চলেন যাই....।

হাবিলদার মেজরের যুক্তিকে একেবারে খাটো বা তুচ্ছ করে দেখার উপায় নেই। যে  
শক্তিদের বিরুদ্ধে এতোদিন যুদ্ধ করলাম, তাদের চেহারাটা একবারের জন্য হলেও দেখা  
প্রয়োজন। ব্যাপারটা আর কিছু নয়, মনের ওঁৎসুক্য মেটানো আর কি।

— ঠিক আছে যাওয়া যাবে বলে হাবিলদার মেজরকে বসতে বলি।

এদিকে ডাক্তার দাদু তার প্রাত্যহিক রুটিন ভিজিটে আমাদের পোষ্টে এসেছেন। হাসপাতাল থেকে ডা. শামসুন্দিন নিয়ম করে দিয়েছেন মেডিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্টদের প্রতিদিন রুটিনমাফিক প্রতিটি ট্রেইঞ্চ-বাস্কারের পোষ্ট ভিজিটের জন্য। আর সে কারণেই ডাক্তার দাদু একজন মেডিক্যালয়্যানসহ ফার্স্ট এইডের বাস্কে ওশুধপত্র নিয়ে প্রতিদিন সকালের দিকে রুটিন ভিজিটে চলে আসেন। সব সময় তার মুখে এক মধুর অমলিন হাসি লেগেই থাকে। মুদ্রের এই তাত্ত্বিকীলার ভেতরেও প্রতিটি ট্রেইঞ্চ-বাস্কারে হেঠে গিয়ে গিয়ে যোদ্ধাদের চিকিৎসার মতো ত্রাস্তিকর দায়িত্ব পালনে তিনি বিস্মৃত বিরক্ত হন না। মুখের হাসিটি তার কোনো সময়ই হারিয়ে যায় না। তাঁকে দেখলেই মনে পড়ে যায়, গড়ালবাড়ি বি.ও.পির কমান্ডার নেপালি সুবেদার, আমাদের সেই ভিন্নদেশী দাদুটির কথা। তাঁর মুখেও সব সময় লেগে থাকতো এই ডাক্তার দাদুর মতোই একটা পরিত্র অমলিন হাসি।

মেডিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট এই প্রবীণ ব্যক্তিটি আমাদের খুবই প্রিয়ভাজন হয়ে উঠেছেন। এখন তিনি আমাদের সবাই ডাক্তার দাদু।

প্রতিদিনের মতো আজো তিনি এক মুঠো ভিটামিন ট্যাবলেট বের করে আমার হাতে তুলে দেন।

তাঁকে বলি, ডাক্তার দাদু আর কতো ভিটামিন খাওয়াবেন। আগের গুলোই তো রয়ে গেছে।

ডাক্তার দাদুর সরল-সোজা জবাব, আপনাগো ত্রুটি আর দিতে পারি না। নাওন-খাওনের ঠিক নাই। মুদ্র করার জাইন্যে শরীলভাঙ্গা ত্রুটি ঠিক রাখন লাইগবো। এই জন্য ভিটামিন হইতাছে উত্তম জিনিস। যতো খুশি মনো লহিবেন।

এ ধরনের কথা তিনি প্রতিদিনই ব্যক্তিগত আজও বলেছেন। ফ্রন্টের যোদ্ধাদের জন্য শরীর ঠিক রাখা প্রয়োজন। এজন্য ভিটামিনের মতো করে ভিটামিন দেন। আর নানা ধরনের উপদেশ দেন পরম আঝায়ের মতো সম্মুখ্যমুদ্রের এই চরমতম পর্যায়ে সবার জন্য ডাক্তার দাদুর এই দরদ মেশানো চিকিৎসাজ্ঞ কথা কোনোদিনই ভুলবার নয়।

হাবিলদার মেজর শাহাদাত মুদ্রবন্দিদের দেখবেনই। তাঁর এই দেখার আগ্রহকে বাধা দিতে ইচ্ছে করে না। পিন্টুসহ আমরা তিনজন তাই রওনা দিই বীরগঞ্জের উদ্দেশে।

বীরগঞ্জ কলেজের কাছাকাছি পাকা সড়কের ওপারে একটা ছোট দালান ঘরে রাখা হয়েছে মুদ্রবন্দিদের। চারদিকে বসানো হয়েছে কড়া পাহারা। তাদের নিরাপত্তা বিধানের দায়িত্ব বি.এস.এফ-এর ওপর। সে দায়িত্ব পালন করছে তারা অসমৰ কড়াকড়িভাবে। পাকিস্তানি সেনারা জীবন্ত ধরা পড়েছে এবং তাদেরকে আটকে রাখা হয়েছে বীরগঞ্জের এই পাকা দালান ঘরটায়, দারুণ এক চাষ্ট্যাকর খবর এটা সবার জন্যই।

বলতে গেলে প্রতিটি মুক্তিযোদ্ধাই এই মুদ্রবন্দিদের চেহারা এক নজর হলেও দেখবার জন্য ভয়ানকভাবে উত্সুক। দীর্ঘদিন এদের সাথে মুক্ত করতে হয়েছে আর সেই ঘৃণ্ণ শক্তরা দেখতে কেমন, এ নিয়ে কারো মধ্যেই আগ্রহের ঘাটতি নেই। তাছাড়া বীরগঞ্জের সাধারণ মানুষজনের মনেও এ ব্যাপারে সৃষ্টি হয়েছে উৎসুকের পাশাপাশি প্রবল চাষ্ট্যাক। কেলনা যে বর্বর সৈন্যরা এইতো মাত্র ক'নিন আগো ও অধিকৃত বীরগঞ্জের এলাকায় সশস্ত্র অবস্থায় দাপিয়ে বেড়িয়েছে বীরদর্পে, যাদের পরিচালিত নৃশংসতম যথেষ্ট্যাচার তারা দেখেছে, মুখ বুকে সহ্য করেছে, যাদের দিকে সামান্যতম চোখ তুলে দেখবার পর্যন্ত সাহস পায় নি তারা, সেই পাকিস্তানি

সৈন্যদের ক'জন কি না আজ বান্দি! বি.এস.এফ.-এর কঠোর প্রহরায় তারা বীরগঞ্জের একটা দালান ঘরে অসহায় আটক জীবনযাপন করছে। তাই তাদেরকে এক নজর দেখবার প্রবল তাড়না সবারই মনে টগবগ করতে থাকে। কিন্তু বি.এস.এফ'রা যেখানে ধূত পাকসেনাকে আটক করে রেখেছে, তার ধারেকাছে কাউকেই ভিড়তে দিচ্ছে না। এমনকি সামনের সেই দালানবাড়ি সংলগ্ন পাকা রাস্তায় কাউকে দাঁড়াতে পর্যন্ত দিচ্ছে না।

আমরাও এসেছি যুদ্ধবন্দিদের দেখবার জন্য। কাঁধে আমাদের খোলানো ষ্টেনগান, কোমরে গৌজা অতিরিক্ত ম্যাগজিন। সারা অব্যবে কঠিন রূপ্ত্ব। সেন্ট্রি উৎসুক অন্য সবার মতো আমাদের পথও রোধ করে। বিশেষ করে শাহাদাতের ওপর তাদের নজর বেশি করে পড়ে। লম্বা-চওড়া আর দাঢ়িগুঁফে জোয়ান পুরুষ হাবিলদার মেজর শাহাদাত। তাকে কেমন ঘেনো সন্দেহের চোখে দেখে বি.এস.এফ-রা।

শাহাদাত বলে, হামলোগ যুদ্ধবন্দি দেখে গা।

— আপকা পরিচয়?

আমাদের পরিচয় দিই তাকে। তবুও সন্দেহ ঘোচে না তাদের।

— দেখিয়ে জি পারমিশন নেহি হ্যায়। যুদ্ধবন্দি দেখনে কি লিয়ে জরুর পারমিশন লাগে গা।

কিন্তু কার কাছ থেকে পারমিশন নিই এখন? এদের ক্ষেত্রে ই.পি.আর সদস্যদের নিয়ে। খানসামায় ধরা পড়া ১১ জন পাকসেনাকে ই.পি.আর-দের হাতে তুলে দেয়ার সাথে সাথেই তারা তাদের মেরে ফেলেছিলো। হাবিলদার মেজর শাহাদাতও একজন ই.পি.আর. সদস্য। এজনই তাদের যতো আপত্তি।

না, সেন্ট্রির সাথে প্যাচাল পেরে লাগেই। তাই আমি তাঁবুর কাছে এগিয়ে যাই। তাঁবুটার সামনে বসা সুবেদারটির ঝুঁকিগুৰি হতেই তিনি তড়াক করে লাফিয়ে ওঠেন। চোখে-সুবে উজ্জ্বল হাসির রেখা মুক্তি পেতে তার, আরে ভাইয়া!

আমি চিনতে পারি না তাঁকে তথন তিনি বলেন, যুবাকো পাহচান নেহি সাকা! তালমা অপারেশনমে গিয়া থা...।

এইবার মনে পড়ে মেজর শৰ্মার বি.এস.এফ দলের সাথে তালমা নদী পার হয়ে তালমা ব্রিজে পাকবাহিনীর প্রতিরক্ষা ঘাঁটি দখল করার সেই অভিযানের কথা। সেদিন একজন সুবেদারও ছিলেন তাদের সেই দলে। ইনিই সেই সুবেদার। তাকে চিনতে পেরে এবার তাই বলি, হ্যাঁ হ্যাঁ পহচান লিয়া। ক্যায়া হ্যায় আব?

মাথা নেড়ে তিনি বলেন, আচ্ছা হ্যায়। তারপর আমাদের আগমনের হেতু বুঝতে পেরে বলেন, যুদ্ধবন্দি দেখনে কি লিয়ে আয়া?

জবাবে বলি, ইয়ে পাক আর্মিকো হামলোগ পাকড়াও কিয়া খানসামা মে। হামারা হাবিলদার মেজর সাহাব দেখনে চাহতা হ্যায়...।

— ঠিক হ্যায় আইয়ে।

তিনি সেন্ট্রি দু'জনকে আমাদের যুদ্ধবন্দিদের কাছে নিয়ে যাবার নির্দেশ দেন। নির্দেশ পাওয়া মাত্র সেন্ট্রি হ্রস্ব তামিলে তৎপর হয়। তবে বন্দিদের কামারার কাছে যাবার আগে আমাদের কাঁধে খোলানো ষ্টেনগান রেখে যেতে হয়। এটাই নিয়ম। অন্ত হাতে যুদ্ধবন্দিদের সাথে কাউকে দেখা করতে দেয়া হয় না। ধূত পাকসেনারা এখন যুদ্ধবন্দি বা POW।

জেনেভা চুক্তির আওতায় এদের সাথে আচরণ করতে হবে। এছাড়া যুদ্ধবন্দিদের দেখা মাত্রই মাথায় রক্ত চেপে গেলে তাদের কেউ গুলি করে বসতে পারে। বিশেষ করে মুক্তিযোদ্ধাদের তরফ থেকে এ ভয় বেশি। অতএব হাতিয়ার রেখে যেতে হয়।

মোট ১৭ জন ওরা। পাকিস্তানি যুদ্ধবন্দি সৈনিক। দেয়ালের সাথে হেলান দিয়ে সামনে পা ছড়িয়ে বসে রয়েছে। প্রত্যেকের চোখে-মুখে শক্ত ছায়া। চোখ তুলে ওদের কেউ কেউ আমাদের দেখে, কেউবা মাথা নিচু করে নেয়। অনেকে পশুর মতো ড্যাবড্যাব করে তাকায়। অধিকাংশ সৈনিকই একেবারে কম বয়সের। ২/৩ জনকে কিছুটা বয়স্ক দেখায়। চোখমুখ দেখে সহজেই বোৰা যায়, যুদ্ধের প্রচণ্ড ধক্কল বয়ে গেছে এদের ওপর দিয়ে। এই এখন সবকিছু দেখে কেমন একটা ভাবনার ঘোর লাগে মনে। পুরো ব্যাপারটা সহজে বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে না। ক'দিন আগেও এরা ছিলো আমাদের পরম শক্তি। ওরা আমাদের আর আমরাও ওদের হত্যা করবার জন্য গুলি ছুঁড়েছি। দু'দিন আগেও এরকম সামনাসামনি পেলে আমরা কেউ কাউকে ছাড়তাম না। এখন এরা আমাদের সামনে বসে আছে, আমরা এদের মারছি না। এদের যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে। যুদ্ধবন্দি হিসেবে এখানে এখন আটক হয়ে আছে। পশুর মতো ঝাঁচায় আটকে থাকা ওরা এখন আমাদের অনুকম্পাৰ পাত্র। এদের চোখেমুখেও অনুকম্পা আৱ কুণ্ঠণা ভিক্ষা চাওয়াৰ একটা গভীর ছায়া লক্ষ্য কৰি। যেনো আমাদের লক্ষ্য কৰে বলতে চায়, 'আমরা জীবন ভিক্ষা চাই। আমাদের তোমারা মেরো না।'

সময় যে কতো তাড়াতাড়ি অবস্থার পরিবর্তন আসে, তাৰ শেষ নেই। ক'দিন আগেও এদের কাছে আমাদের দেশের কতো নিরীহ মানব অনুকম্পা চেয়েছে, চেয়েছে প্রাণভিক্ষা। কিন্তু পরিস্থিতিৰ ফেরে এরাই আজ আমাদেৱ ক'ছৈ অনুকম্পা আৱ প্রাণভিক্ষা প্রাৰ্থি। দু'দিন আগেও যা এরা আমাদেৱ প্রতি, আমাদেৱ দেশেৱ মানুষেৱ প্রতি প্ৰদৰ্শন কৰে নি, এদেৱ প্রতি আজ আমাদেৱ তা-ই প্ৰদৰ্শন কৰুজ্ঞ হচ্ছে। একেই বলে সময়েৱ মাৰ, সময়েৱ খেলা। হাবিলদার মেজেৱ শাহাদাত এই ক্ষমতা একটা কাও কৰে বসেন। বন্দিদেৱ লক্ষ্য কৰে বলে ওঠেন তিনি, হামকো পহছানত হয়ে? মেৰা নাম হ্যায় শাহাদাত। হাবিলদার শাহাদাত।

পিন্টু ঝাট কৰে তাকায় হাবিলদার মেজেৱ শাহাদাতেৱ দিকে, বলে, আপনাকে এৱা চিনিবে কী কৰে? এদেৱ কেউ দেখেছে না কি আপনাকে? আপনিতো ই.পি.আর-এৱ লোক।

শাহাদাত এই রকম প্ৰশ্নেৱ জন্য যেনো প্ৰস্তুত ছিলেন না। তাই আমতা আমতা কৰে বলেন, না, মনে হচ্ছে এদেৱ কয়জনকে আমি চিনি। যুদ্ধেৱ আগে মনে হয় একসঙ্গে ছিলাম। যুদ্ধবন্দিদেৱ চেলেন, এ কথা বলে শাহাদাত তাদেৱ সাথে আলাপ জমাতে চান। তিনি বন্দিদেৱ লক্ষ্য কৰে বলেন, আপকা ঘৰ কিধৰার? বাংলাদেশ মে কৰ আয়া হ্যায়? অমৰখানামে কেত্না দিন থা?

বন্দিৱা তাৰ কোনো প্ৰশ্নেৱই উত্তৰ দেয় না। কেবল দিশেহারা দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে থাকে। এক সময় বেৰ হয়ে আসি আমরা। সেন্ট্ৰি জিগোস কৰে, কেয়া হাবিলদার মেজেৱ সাব, প্যাহচান লিয়া।

— হ্যাঁ দো আদমিকো প্যাহচান লিয়া। জবাৰ দেয় শাহাদাত সেন্ট্ৰিকে। পিন্টু তখন বলে, গুল, হাবিলদার মেজেৱ পুৱা গুল মাৰতেছে মাহবুব ভাই। শাহাদাত কথাটা শুনে বলেন, কী কইলেন দাদু।

— না কিছু না, চলেন। এৱপৰ আমরা ফিৰে আসি আমাদেৱ পোষ্টে।

## ভেসে ভাসে সেই বিজয়বার্তা

দুপুরের পর সুবেদার খালেক আসেন তাঁর সেই পরিচিত ভঙ্গি নিয়ে। কয়েকজন সৈনিক তাঁর সাথে।

বাঙ্কারে শয়েছিলাম আমরা। বলতে গোলে একটা বক্ষ্য সময় যাছে। জেনারেল রাও ফরমান আলীকে চূড়ান্ত সময় বেঁধে দেয়া হয়েছে আঞ্চলিক পর্ষের জন্য। কিন্তু তার তরফ থেকে কোনো রকম সাড়া-শব্দ নেই। এদিকে ফ্রন্টও চুপচাপ। মিত্র ও মুক্তিবাহিনীর তরফ থেকে কোনো আক্রমণাত্মক ভূমিকা নেই। শুধু সুবৰ্বর আসে, ভাতগা দখল হয়ে গেছে। শুধু তাই নয় ভাতগা ব্রিজের পাশ দিয়ে মন্দীর ওপর পন্টুন ব্রিজ তৈরি করে মিত্রবাহিনী ট্যাঙ্ক নিয়ে এগিয়ে গেছে দশমাইলের দিকে। মুক্তিবাহিনীর একটা অংশ আছে তাদের পদাতিক দলের সাথে। আমাদের বাবলু, মতিয়ার আর একবায়ুলুরা তো রয়েছেই।

সুবেদারকে বলি, যাবেন কোথায় দাদু?

— ইয়ানো, চলেন একটু লঙ্গরখানা থন ঘুইরা আসি। সময় কাটতাছে না বুঝছোন নি?

— ঠিক আছে চলেন, বলে পিন্টুকে সাথে করে রওনা দিই। ওয়াকিটকি সেটো ব্যাটারির অভাবে অচল ছিলো ক'দিন। গতকাল থেকে নতুন ব্যাটারি পেয়ে সচল হয়েছে সেট। পিন্টুকে বলি, ওয়াকিটকি সেটো সাথে নিতে। কেননা, কখন কোন নির্দেশ আসে বলা তো যায় না।

২০/২৫ মিনিট হাঁটুবার পর আমাদের লঙ্গরখানায় পৌছলো যায়। বেশ বড়ো একটা পরিত্যক্ত ধানকলের ভেতরে স্থাপন করা হয়েছে লঙ্গরখানাটি। এই লঙ্গরখানা থেকে প্রতিদিন আমাদের খাবার তৈরি হয়েছে, অমানুষিক পরিশ্রম করেছে লঙ্গরখানার প্রত্যেক সদস্য এ কাজে। নানা প্রতিকূল পরিবেশ-পরিস্থিতিতে, বিপদের জীবিত খুঁকি মাথায় নিয়েও। সনাতনী উপায়ে বাঁশের অংড়ে করে এখান থেকে খাবার পৌছাইয়ে হয়েছে ফ্রন্টের প্রতিটা বাঙ্কারে-ট্রেন্সের পোষ্টে। এ কাজ করতে গিয়ে অনেককেই জীৱন প্রত্যন্ত দিতে হয়েছে। আমাদের সম্মুখ-যুদ্ধে আসবার প্রথম দিন তৈরনপাড়ায় চারজন খুঁকিপুঁকী মানুষকে একেবারে ঢোকের সামনে বোমার আঘাতে ছিন্নিন্ন হয়ে যেতে দেখেছি। এর মাঝে কতোজন যে হতাহত হয়েছে, তার ইয়েতা নেই।

লঙ্গরখানার মানুষজন ব্যক্তি রাতের খাবার তৈরি করার কাজে। এখানকার কমাত্তার নায়েব সুবেদার এগিয়ে এসে আমাদের অভ্যর্থনা জানান। দৌড়াঁকাপ করে বসার আয়োজন করে লোকজন। এভাবে লঙ্গরখানা দেখতে আসায় খুশি হয়েছে সবাই খুব। নায়েব সুবেদার চা-নাস্তা দিয়ে আপ্যায়ন করেন। তারপর তাঁর কিছু কিছু সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেন সুবেদার খালেকের সাথে। যুদ্ধ এবং অন্যান্য প্রসঙ্গ নিয়েও কথা হয়। শেষে আমরা উঠি। ফিরে চলি আমাদের অবস্থানের দিকে।

বিকেল চারটা তখন। আমরা বীরগঞ্জ পেছনে রেখে আমাদের আস্তানার কাছাকাছি পৌছে গেছি। হঠাৎ করে ওয়াকিটকি সেটে ভেসে ক্যাপ্টেন শাহরিয়ারের গলা, টু ফোর ওয়ান। টু ফোর ওয়ান। ক্যান ইউ হিয়ার মি! ওভার।

জবাব দিই, ওয়ান ফোর টু। ওয়ান ফোর টু। লাউড অ্যান্ড ক্রিয়ার। ওভার।

— কঞ্চাচুলেশন্স্ মাহবুব! বিরাট সুবৰ্বর। আজ বিকেলে ঢাকা রেসকোর্সে পাকবাহিনী সারেভার করেছে। ওভার।

— কঞ্চাচুলেশন্স্ স্যার। বিরাট সুবৰ্বর। যুদ্ধ তা হলে শেষ। স্বাধীনতা এলো তাহলে। ওভার।

— ইয়েস বয়েজ। আমদের এ বার্তা সবগুলো বাক্সারে-ট্রেক্সে সব ছেলের কাছে পৌছে দাও। কিন্তু সংহত থাকবে সবাই। আজকে আনন্দ করবে না। সামনে অনেক কাজ। ওভার।

— ওকে স্যার। আপনার কাছ থেকে পাওয়া বিজয়ের প্রথম বার্তা সবার কাছে পৌছে দেয়া হবে। ওভার।

— আমাদের সম্মুখের সৈয়দপুর রণাঙ্গনের পাকসেনারা ভাতগা নদীর ওপারে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। তারা আজ সারেভার করতে পারে। সারেভারের বিধি অনুযায়ী তাদের সারেভার করাতে হবে। ফ্রন্টের কেউ ঘুমাবে না, হৈচে করবে না, সারারাত জেগে থাকবে। আজ রাতে হয়তো আমাদের শেষ কষ্ট। আগামীতে আনন্দ। বুৰতে পারছো! ওভার।

— ইয়েস স্যার। নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে মানা হবে। আমাদের সবার তরফ থেকে ফিল্ড কমার্ডার হিসেবে আপনাকে এবং সাব-সেন্টার কমার্ডার সদর্দলিন সাহেবকে আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন। ওভার।

— ধন্যবাদ। ওভার।

— ওভার।

কথোপকথন শেষে সুবেদার খালেক জড়িয়ে ধরলেন। হাউ হাউ করে কেঁদে ফেললেন আনন্দের অতিশয়ে। পাশে দাঁড়ানো আমার কোম্পানির সেকেন্ড ইন কমান্ড পিন্টু। জাপটে ধরে সে আমাকে। তারপর ছেড়ে দিয়ে দু'পাক ঘুরে সুরক্ষার ভঙ্গিতে হাত ওপরে তুলে টিংকার করে বলতে থাকে, ‘স্বাধীনতা স্বাধীনতা, মুক্তি-মুক্তি, সারেভার, সারেভার’ এবং সবশেষে তার মুখ থেকে বেরিয়ে এলো সেই চিরামছ গোগান, ‘জয় বাংলা...’।

শীতের সক্ষা তখন নেমে এসেছে। চারপাই কুয়াশার চাদর। সুবেদার খালেক তার সহকর্মী সেনাসদস্যদের নিয়ে চলে গেলেন তার বি. কোম্পানির অবস্থানের দিকে। পিন্টুসহ আমি চলে এলাম আমাদের এই মধ্যেওঁ কোম্পানির অবস্থানে। প্রতিটি বাক্সারে-ট্রেক্সে জানানো হলো এই আনন্দ সংবাদ। প্রকিণ্ঠানি সেনারা সারেভার করলে কী কী পদ্ধতি নিতে হবে, তা সবাইকে বুঝিয়ে দেয়েছিলো। ছেলেরা ছাড়তে চায় না। উষ্ণ আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরে। সবার চোখেমুখে আবেগ-উচ্ছ্বাস আর আনন্দের জোয়ার। কেউ বাধা মানে না। কাউকে থামানো যায় না। সমস্ত ফ্রন্টে আনন্দ-উল্লাস আর ‘জয় বাংলা’ ধ্বনি উত্তাল তরঙ্গের মতো জেগে ওঠে।

রাত আটটার দিকে আমরা বাঁশবাড়ের তলায় তৈরি আমাদের বাক্সারে ফিরে আসি এবং তার পরপরই শুরু হয় বস্তুস্বর। প্রথমে কোনো একটা বাক্সারের খড়ের চালে আগুন জ্বলে ওঠে। তারপর অন্য একটায়। এরপর ফ্রন্ট জুড়ে বাক্সার আর ট্রেক্সের ছাউনিগুলো আনন্দের কৃত্তীলত পরিণত হয়। এর সাথে চলতে থাকে উদাম ছুটোছুটি, হাঁকডাক আর উল্লাসধনির উৎসব। মুক্তির আনন্দবার্তা আজ আর কাউকে কোনোরকম নিয়ম-শৃঙ্খলার বকলে আটকাতে পারে না।

ডায়েরির শেষ পাতা

সারাটা রাত এমনিভাবেই কেটে গেলো। ভোরের আকাশ ফিকে হয়ে এলো অবশ্যে। বাক্সারের ভেতরে তখনো অক্ষকার। পিন্টুকে বললাম ম্যাচ জ্বালাতে। মোটবই আকারের ডায়েরিটা হাতে তুলে নিলাম। বিজয়ের এই মুহূর্তিকে ধরে রাখবার জন্য মনের ভেতর

প্রচণ্ড তাগিদ। সেই তাগিদ থেকে লেখা শুরু করলাম। পিছু একটার পর একটা ম্যাচ জ্বালিয়ে চলেছে আর আমি লিখছি। রাতের কুয়াশা ভেদ করে তোরের আলো ফুটে উঠলো। সোনার থালার মতো রঙিম সূর্য প্রথম উদয় হলো স্বাধীন বাংলাদেশের আকাশে। ডায়েরির পাতায় আমি লিখলাম :

১৭ই ডিসেম্বর, '৭১

"অবশ্যে তোর হলো। স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম তোর। এমন তোর মানুষের জীবনে ক'টা আসে; সূর্য উঠছে। ওটা ১০ লাখ শহীদের রক্তে রাঙানো। অন্যান্য দিনের চেয়ে সৃষ্টি তাই বুঝি অনেক লাল।

এবার ঘরে ফেরার পালা। গত ন' মাসের শত দৃঢ়কর্ত আর ক্রান্তির অবসান হয়েছে। এবার তাই ছুটি। ঘরে ফেরার তাগিদ। আঞ্চলিকজন, বহুবাক্ষবদের সাথে মিলিত হবার তাগিদ। কে জানে, কে বেঁচে আছে কে মারা গেছে? বাড়ির লোকের সাথে মিলন মিলনাঞ্চক হবে, না বিয়োগাঞ্চ হবে কেজনে?

না, আমরা মরি নি। অনেকে মারা গেছে। ভুবার অধিকাংশের মতো আমি বেঁচে আছি। স্বাধীনতা সংহ্যামে জয়ী হয়েছি। জীজ যদি গোলাম গউস বেঁচে থাকতো, আকাস বেঁচে থাকতো, মতিয়ার ত্রেচ থাকতো, কার কি ক্ষতি হতো? যদি আজ্ঞা নামের কিছু থেকে থাকে, তবে প্রদের আজ্ঞা সুবী হয়েছে, তৃণ হয়েছে নিচয়ই। প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার আলোয় ওদের আজ্ঞা এতোদিন ঘুরে বেড়িয়েছে, আজ ওদের সে আজ্ঞা তৃণ।

বীরগঞ্জের এই এলাকাটার কথা মনে থাকবে চিরকাল। এখান থেকে defence নিয়েই আমরা স্বাধীনতার মুখ দেবেছি। মুক্ত বাংলার বাতাস এহণ করেছি।

এবার হিসেব-নিকেশের পালা। শোরিলা যোকা থেকে শুরু করে সম্মুখযোড়া। এই পর্যায়ে কতো কি না দেবেছি, তনেছি, উপলক্ষ করেছি! অনেক কিছু শিখেছিও। বাক্সার আর ট্রেক্সের জীবন, ঠাণ্ডার মধ্যে হাত-পা জমে যাওয়া, বিভিন্ন অবস্থায় বাঁওয়াদাওয়া করা, আরো কতো কিছু! আর EPR-দের সাথে dealing.

অনেকের সাথে পরিচয় হয়েছে। পরিচয় হয়েছে অনেক চরিত্রের সাথেও। সভিই এগুলো মনে রাখবার মতো চরিত্র। যেমন খালেক সাহেব, শাহাদাত সাহেব, মোসাদেক সাহেব, বারেক সাহেব, সফি সাহেব, ডাক্তার দাদু এবং লেফটেন্যান্ট মাসুদসহ দেলী-বিদেশী কতো লোক। এদের কথা মনে থাকবে চিরদিন।

এমন দিনে সবার কথাই লেখা উচিত। ওর কথাও। কেমন আছে ও কে জানে? তালো নিচয়ই!"